দশটি উপন্যাস

সমীরণ গুহ



১৪১১৭

ভাষা
ও
সাহিত্য

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

172407

DASHTI UPANAYAS

Collection of Novels

By

SAMIRAN GUHA

BHASA O SAHITYA
10/2B, Ramanath Majumder Street
Kolkata 700 009 ✆ 2241-9101

ISBN : 81-86581-75-8
Rupees Three Hundred & Fifty only

প্রচ্ছদ · সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN . 81-86581-75-8

ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
স্বপনকুমার বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে রেজ ডট কম, ৪৪/১এ
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ এবং বসু মুদ্রণ
১৯/এ শিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯
হইতে মুদ্রিত।

আরতি বসু
'নবকল্লোল' পত্রিকার
সম্পাদকীয় বিভাগের যিনি প্রকৃতই সবার দিদি!
শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

রূপ নয় আগে মন
হৃদয়ে শিলাবৃষ্টি
পৃথিবীর উজ্জ্বল তুমি
টুকুনের নাকছাবি
দময়ন্তী উথাইয়া
উত্তরের বাতাস
নিঃশব্দের নিকটে
অশ্বক্ষুরের শব্দ
সাঙ্গ হলো খেলা
নিজের ছবি
শ্রাবণের মাঝামাঝি
আয়নার মধ্যে আয়না
সায়াহ্নের কাব্য
ভালো আছি
দেবী এবং একজন উপাসক
আঁচলের ছায়া
রাত্রিবাস
গাত্রহরিদ্রা
বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ
জীবনের পান্থশালায়
পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা
হৃদয়ের সংলাপ

দশটি উপন্যাস প্রসঙ্গে

আমার লেখক জীবনের প্রথম দিকের প্রয়াস এই উপন্যাসগুলো। মোটামুটিভাবে প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ার পর নানা কারণে—কোথাও প্রকাশকদের শরিকী কিছু অসুবিধে, কোথাও সংস্থাটাই উঠে গেছে, আবার কোথাও উদ্যমের অভাবে বইগুলো আর নতুন করে বের হয়নি।

সুদীর্ঘ সময়ের নিস্তরঙ্গ নদীতে সামান্য ঢেউ দেখা গেল। লক্ষ্য করা গেল, গত তিন-চার বছর ধরেই কলকাতা পুস্তকমেলা, বিভিন্ন জেলার বইমেলাগুলোতে গ্রন্থাগারিক, পাঠক-পাঠিকারা আমার প্রথম দিকের বইগুলোর খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। এবং বইগুলো পেতেও চাইছেন।

স্বভাবতই ভাষা ও সাহিত্যের তিন কর্ণধার—তিন ভাই স্বপনকুমার বিশ্বাস, তপনকুমার বিশ্বাস ও তরুণকুমার বিশ্বাস বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েন। এবং চাহিদা অনুযায়ী আমার দশটি উপন্যাস নিয়ে এই বইটি প্রকাশ করেন।

যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক, পাঠক-পাঠিকা পুরানো এই বইগুলোর ব্যাপারে এতো আগ্রহ দেখালেন তাঁদের সবাইকে অনিঃশেষ আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ এক নতুন উপলব্ধি। নতুন এক নিঃশ্বাস নিয়ে এটুকু বলতে পারি, এতো মানুষের আস্থার মর্যাদা দিতে চেষ্টা করে যাব আরও ভালো কিছু লিখতে।

সমীরণ গুহ

৯ ◆ হৃদয়ে শিলাবৃষ্টি
১২৭ ◆ পৃথিবীর উজ্জ্বল তুমি
২০৫ ◆ নিঃশব্দের নিকটে
২৬৩ ◆ টুকুনের নাকছাবি
৩২৭ ◆ রূপ নয় আগে মন
৪০৭ ◆ নিজের ছবি
৪৫৭ ◆ দময়ন্তী উথাইয়া
৫১১ ◆ অশ্বক্ষুরের শব্দ
৫৬৫ ◆ আয়নার মধ্যে আয়না
৬৩১ ◆ শ্রাবণের মাঝামাঝি

হৃদয়ে শিলাবৃষ্টি



ননীমামার বিয়েতে দমদমে গিয়েছিল সঞ্চয়ণ। দিল্লি থেকে সোজা চলে এসেছে দমদমে। ছুটি মাত্র আট দিনের। হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন যখন থামলো তখন বিকেল। ওখান থেকে ট্যাক্সি ধরে রওনা দিতেই হাওড়া পুলে ট্রাফিক জ্যাম। দেড় ঘন্টা সময় ওখানেই আটকে থাকতে হলো।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। শীতের সন্ধ্যা। চারিদিকে অন্ধকার। উৎসবের বাড়িতে বড়ো মামা, বড়ো মামিমা, দিদিমা সকলেরই এক কথা, সঞ্চয় এখনও আসছে না কেন? টেলিগ্রাম করেছে, আজকে এসে পৌঁছুবে। অথচ এখনও এলো না। ওদিকে আর দেরি করা চলে না। কন্যাপক্ষের লোক এসে বর ও বরযাত্রীদের নিয়ে গেছে। যায়নি শুধু তিনজন। দিদিমাই বললেন, তোরা সবাই মিলে চলে গেলে কেমন করে হবে? সঞ্চয় যদি এরমধ্যে এসে পড়ে! তারপরেই ছোট মেয়ে সবিতার দিকে চেয়ে বললেন, তুই থাক। পিণাক, তুমিও থাকো।

বড়ো মামিমার ছোট ভাই পিণাক। সর্বদা হাসিখুশি। সঞ্চয়েরই সমবয়েসী। সে বলে উঠলো, সঞ্চয়কে ছেড়ে আমি আগে আগে বরযাত্রী হবো, তা তুমি ভাবলে কেমন করে? আমি ওর জন্য অপেক্ষা করবো। কতোদিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না, প্রায় দু'বছর।

তৃতীয়জন যে নাকি বরযাত্রী দলের সঙ্গে গেল না, সে হলো মীনাক্ষী। সবিতার শুধুমাত্র বন্ধু বললে খুবই কম বলা হবে। অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। সুতরাং সবিতা থেকে গেলে সে যায় কেমন করে? সে-ও রইলো।

বাইরে ট্যাক্সির আওয়াজ উঠতেই বারান্দায় বেরিয়ে এলো সবিতা। তারপরেই অফুরন্ত আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, পিকুদা! সঞ্চয় এসেছে।

পিকু অর্থাৎ পিণাক ও দিদিমা ঘর থেকে বারান্দায় দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। সঞ্চয় ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, ছোট স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে ততোক্ষণে বারান্দায় উঠে এসেছে। দিদিমাকে প্রণাম সেরেই অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা দিদিমা, শত হলেও রাজধানীর লোক আমি। সবিতা কী এখনও আমাকে নাম ধরে ডাকবে? তারপরেই পিণাকের দিকে হাসি ভরা মুখে এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো, কতোদিন বাদে দেখা হলো বলোতো?

দু'বছর: পিণাক হাসলো। বললো, এক ঘন্টার ওপর হয়ে গেছে বরযাত্রীর দল চলে গেছে। আমরা শুধু তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবারে আর কথা নয়, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

সঞ্চয় ঘরে ঢুকলো। তখনই চোখে পড়লো মীনাক্ষীকে। বছর উনিশ-কুড়ির একটি উজ্জ্বল মেয়ে। সুঠাম শরীর। টানা আয়ত হাল্কা খয়েরি দুটি চোখ। মাথার ঘন চুলগুলিকে ছোট্ট একটু বিন্দুর মতো সিঁথি রেখে, কানের পাশ দিয়ে টানটান করে বাঁধা। খয়েরি চোখে অত্যন্ত পুরু করে কাজলটানা। যার ফলে চোখ দুটি এমনকি সম্পূর্ণ মুখখানাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। গায়ের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সঙ্গে পরনের শাড়িখানা চমৎকার মানিয়েছে। সঞ্চয় বিছানার উপরে স্যুটকেসটি রাখলো।

সবিতা তাড়া দিল, সঞ্চয় তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো—ওদিকে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে চলেছে।

তা তো বুঝলাম, জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে সঞ্চয় উত্তর দিল, তুই কী প্রতিজ্ঞা করেছিস, আমাকে মামা বলে ডাকবি না?

ইস ভারী তো চার বছরের বড়ো, সবিতা ঠোঁট ওল্টালো।

ও! চার বছরের বড়ো হলে বুঝি মামা ডাকতে নেই? তা কতো বছরের বড়ো হলে তোর হিসেবে মামা ডাকতে হয়, সেটা জানতে পারি কী? অ্যাফিডেফিট্ করে অনেকে তো নাম বদলায়,

পদবী পরিবর্তন করে, আমি না-হয় আমার বয়েসটাই বাড়াবো!

সঞ্চয়ের কথায় পিণাক উত্তাল হেসে উঠলো। মীনাক্ষীর দুই ঠোঁটের ফাঁকেও মৃদু হাসিব রেখা। সঞ্চয় ওর আযতচোখের দিকে তাকাতেই মীনাক্ষী সলজ্জ ভাবে চোখ সরিয়ে নিল। তাকালো বন্ধুব দিকে। সবিতা বলে উঠলো, তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মীনা, এই হচ্ছে আমার মামা সঞ্চয়ণ ঘোষ।

সঞ্চয় নমস্কার জানিযে বললো, আপনার সঙ্গে পবিচিত হ্বাব সূত্রে তবুও যাহোক একবার মামা ডাক শুনতে পেলাম।

মীনাক্ষী সে-কথার উত্তর দিল না। প্রতি নমস্কাব জানিযে শুধু অল্প একটু হাসলো। হাজারো কথার চেয়েও সে-হাসি অনেক বেশি মিষ্টি।

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ওবা যখন পৌছালো, তখন রাত সাড়ে আটটা। বিয়ের অনুষ্ঠান আর সামান্যই বাকি। ননীমামাকে একবার দেখা দিয়েই সঞ্চয় আসরে গিয়ে বসলো। বড়ো মামিমা বললেন, আসতে পেরেছো তাহলে?

হ্যাঁ মামিমা। ছুটি কি দিতে চায়? দরখাস্ত দিতেই চিফ ইঞ্জিনিযাব বলে উঠলেন, নিজের বিয়ে হলে না-হয় আলাদা কথা ছিল। মামার বিয়েতে পনেরো দিনের ছুটি? কোম্পানিকে কি মামাবাড়ি পেয়েছো?

হ্যাঁ! এবারে তো ভাগ্নেরও একটা বিয়ে দিতে হয়। বড়ো মামিমা হাসলেন! সঞ্চয তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। মীনাক্ষী দেখছিল সঞ্চয়কেই। ধরা পড়ে গেল চোখে চোখে। সবিতা মীনাক্ষী ও সঞ্চয়ের দুজনের মুখের দিকেই চেয়ে মৃদু হাসলো একবার।

সঞ্চয় বলে উঠলো, পনেবো দিনের ছুটিটা তাহলে তখনই পাবো। মামার বিয়েতে ছুটি স্যাংশন হয়েছে আট দিনের।

মাত্র! বড়ো মামিমা হতাশার সুরে বললেন।

ওর মধ্য থেকে চারটি দিন যাতায়াতের জন্য বাদ দাও—অর্থাৎ চারটে দিন থাকবো। সঞ্চয হাসলো।

এমন আসা আসতে তোমাকে কে· বলেছিল? সবিতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো।

কেন? তুই! তুই তো চিঠিতে একবার লিখেছিলি, দাদার বিয়েতে তোমাকে এবারে আসতেই হবে। প্রত্যেক চিঠিতেই কেবল লেখো ছুটি নেই, ছুটি নেই। ও-সব কথা আর শুনছি না। দুটো দিনও কি তোমার ছুটি মেলে না? একটু থেমে সঞ্চয় বললো, কি মনে পড়ে? দুটো দিনের পরিবর্তে আটটি দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

খুব হয়েছে থাক।

এই তো তোরা অল্পতে খুশি হতে পারিস না, এই জন্যই তো মানুষ এতো বেশি কষ্ট পায়। তবুও তো চারটে দিন সবাই মিলে হইচই করা যাবে। একেবারেই যদি না-আসতাম, ভেবে দেখতো।

তাহলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হতো না।

তা হয়তো হতো না, কিন্তু তুইও আমাকে এমনভাবে আক্রমণ অর্থাৎ একেবারে সম্মুখ আক্রমণ করার সুযোগ পেতিস না।

উঃ সঞ্চয়মামা! সবিতা রাগত সুরে উচ্চারণ করতেই সঞ্চয় বলে উঠলো, যাক, রেগে গেলে তোর মুখ দিয়ে মামা বের হয়, জানা গেল।

রাত সাড়ে-এগারোটা নাগাদ বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এলো সবাই। কোথায় কোথায় বিছানা হবে, মশারি টাঙানো হবে ইত্যাদি সবই করছে সবিতা ও মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর কাজের মধ্যে সঞ্চয় একটি জিনিস লক্ষ্য করলো, সে যেন এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত নয়, ঘরেরই মেয়ে। নীচে একটা বিছানা হবে। মীনাক্ষী নিজেই মেঝেটা পরিষ্কার করলো।

আমরা কোথায় শোবো? সঞ্চয়, সবিতার উদ্দেশে প্রশ্নটা করলেও চোখ মেলে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে।

আমরা বলতে? সবিতাই উল্টে প্রশ্ন করলো।

মানে আমি আর পিকু।

তোমরা দুজনে বাইরের ঘরে গিয়ে একটু বোসো—তোমাদের ব্যবস্থা পরে হচ্ছে।

এদিককার বিছানা-মশারি টাঙানোর কাজ শেষ করে সবিতা ও মীনাক্ষী বাইরের ঘরে অর্থাৎ বসবার ঘরে গেল। শীতের রাত। দরজা-জানলা বন্ধ। পিকু একের-পর-এক সিগারেট খেয়ে ঘরের ভিতর ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে।

ধুনুচি জ্বালিয়েছে কে? নিশ্চয়ই পিকুদা। সবিতা জানতে চাইলো।

কেন? তোর সঞ্চয়মামা হতে পারে না? পিকু হাসলো।

না। সঞ্চয় সিগারেট খায় না। মীনাক্ষী ঘরের বন্ধ জানলাটা খুলে দিয়ে বললো, পিকুদাটা এতো সিগারেট খেতে পারে না, সিগারেটের গন্ধে আমার কেমন যেন বিশ্রী লাগে।

সঞ্চয় পিকুর দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলো। বললো, সত্যি, কেন যে ও-সব বাজে জিনিস খাও বুঝি না।

দেখুন না, মীনাক্ষী এবারে সমর্থন পেয়ে উৎসাহ ভরে বললো, পয়সা খরচ করে শুধু ধোঁয়া খাওয়ার কোনও অর্থ হয়?

ব্যাপার কিরে সবিতা! পিকু তার স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বললো, দুজনে দেখছি এরই মধ্যে ভাবী মিলেমিশে কথা বলছে। শেষের কথায় লজ্জা পেল মীনাক্ষী। লজ্জা ঢাকতে তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আঃ পিকুদা! তুমি বড্ড বাজে কথা বলো।

সঞ্চয় এই সুযোগে একবার মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকালো। মীনাক্ষী পলকমাত্র তাকিয়েই পিকুর উদ্দেশে বললো, তোমরা এবারে একটু ওঠো—বিছানাটা করে দিই।

বিছানা আর কি? দুটো সোফাকে সমান করে একসঙ্গে জুড়ে দিযে বিছানা করে দিল। দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে মশারি টাঙিয়ে দিল। সঞ্চয় বললো, আমার কিন্তু একটা বালিশে অসুবিধা হয়। মাথা ধরে। তাই দুটো বালিশ না-হলে......

বিয়ে বাড়িতে ওইটুকু অসুবিধা ভোগ করতেই হবে। মীনাক্ষী সঞ্চয়ের চোখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো। বললো, লোকের হিসেব অনুযায়ী বালিশ কম। একটু কষ্ট করেই ঘুমাতে হবে। একটু থেমে কি যেন হিসেব করলো মীনাক্ষী। তারপরেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ফিরে এলো অল্প সময়ের মধ্যেই। হাতে একটি শাড়ি। সেই শাড়িটাই ভাঁজ ভাঁজ করে বালিশের আকারে এনে সঞ্চয়ের বালিশের নীচে রাখলো। বললো, বালিশের অভাব এটা দিয়েই পূরণ করুন।

দেবীজি! পিকু হাত দুটিকে বুকের ওপর নমস্কারের ভঙ্গিতে রেখে বললো, শাড়িটা কী আপনার?

পিকুর কথা বলার ধরণে হেসে ফেললো সবিতা। হাসতে হাসতেই তাকালো বন্ধুর দিকে। হাসলো মীনাক্ষীও। হাসি ভরা মুখেই বললো, তোমার অনুমান ঠিক নয় পিকুদা। শাড়িটা সবিতার।

আলো নিভিয়ে দিয়ে দুই বন্ধুতে শুয়ে পড়লো। পিণাক আর সঞ্চয়ণ। পিণাক বললো, তোমার দিল্লির খবর কি? ওখানকার কাজকর্ম কি রকম চলছে বলো। সঞ্চয় বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল, কোনও খবরই বলতে ভালো লাগছে না।

কি ভালো লাগছে তবে?

সত্যি বলবো? সঞ্চয় তার একটি হাত পিকুর গলাব উপরে আবেগে মেলে ধরলো।

পিকু কৌতুক সুরে বললো, তোমাকে আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। তবে আমার পাশে শুয়ে ও-সব চিন্তা করে কোনও লাভ নেই ভাই। সকাল হোক। বুঝিয়ে বলবো'খন।

সত্যি পিকু, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ওকে। সঞ্চয়ের সহজ ও সরল স্বীকারোক্তি। কথা বলার মধ্যে লুকানোর কোনও চেষ্টা নেই। কোথায় থাকে ও।

স্টেশনের ওপারে। সুভাষনগরে। পিকু বললো, তুমি এখানে থাকো না তাই, এ-বাড়িতে মীনাক্ষীর দারুণ প্রভাব। সকাল হলেই বুঝতে পারবে, তোমার দিদিমা, বড়ো মামিমা অর্থাৎ কিনা আমার দিদি পর্যন্ত অনেক সময় ওর ওপরই অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। পরের বাড়ির মেয়ে হয়েও বিয়ে

বাড়ির হাজারো ঝামেলা মীনাক্ষীকেই পোয়াতে হচ্ছে। একটু থেমে পিণাক আবার বললো, যাইহোক, ছাড়ো ও-সব, ঘুমাও।

ঘুম আসছে না।

ঘুমের ওষুধ তো পাশের ঘরেই রয়েছে। ডাকবো? পিকু আর দেরি করলো না। সত্যি সত্যিই ডাক দিল, মীনাক্ষী—

এই পিকু! কি ইয়ার্কি হচ্ছে? ডাক শুনে মীনাক্ষী এই ঘরে আসবে, তাতে সঞ্চয়ের আপত্তি নেই। বরং ভালোই লাগবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, পিকু যা প্রগলভ, কি বলতে কি বলে বসে, শেষে লজ্জার এক শেষ! সঞ্চয়ের তাই আশঙ্কা, মীনাক্ষী এলে পিকু যদি ওকে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে। তাই সাবধান করে দিল, অমন ডাকাডাকি কোরো না।

অন্ধকার ঘরখানা হঠাৎ আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মশারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মীনাক্ষী। বললো, ডাকছিলে কেন পিকুদা?

সঞ্চয়কে এক গ্লাস জল দাও। দেবী দর্শন করেছে। জল খেয়ে একটু ঠান্ডা হোক।

কথাটা শুনলো মীনাক্ষী। কিন্তু কথা বাড়াতে চাইলো না। সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস জল এনে দিল। খুব আস্তে বললো, খেয়ে নিন।

মশারিটা তুলে বের হয়ে এলো সঞ্চয়।

পিকু বললো, আমি এই মুহূর্ত হইতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলাম।

কথাটা শুনলো দুজনেই। সঞ্চয় ওর চোখের দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল। একবার ভাবলো, পরম আবেগে মীনাক্ষীর হাতখানা স্পর্শ করে। অশোভনীয় ভাবে নয়—শালীনতা বজায় রেখেই। কিন্তু পারলো না। মীনাক্ষী তাহলে কি ভাববে? জল খাওয়াটা তবে অজুহাত! না। সঞ্চয় তেমন কিছুই করলো না। শূন্য গ্লাসটা মীনাক্ষীর হাতে ফেরত দিয়ে বললো, আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি কিন্তু—

কষ্টের কিছুই নয়। পিকু বলে উঠলো, মেয়েদের কাজই তো এইসব। বিছানা করা, জল দেওয়া পান বানিয়ে দেওয়া—

আর কিছু নয়? ছন্দ তুলে হাসলো মীনাক্ষী।

বিয়ের আগে সাধারণত এ-সব ছোটখাটো কাজেই মেয়েরা আটকা থাকে, পরে কিন্তু কাজের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। যেমন মাঝরাতে উঠে ছেলের কাঁথা পাল্টানো, দুধ গরম করা, স্বামীর সহস্র ডাকে সাড়া দেওয়া—

পিকুদা! তুমি না একটা সাঙ্ঘাতিক মানুষ!! মীনাক্ষী আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল! পিকু ছোট্ট একটা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, জল খেয়ে ঠান্ডা হয়েছো তো?

পিপাসা আরও বেড়ে গেল!

জলের পিপাসা নয় যে, সুতরাং বাড়বেই। পিকু হাসলো। বললো, আর কথা নয়। ঘুমাও। কালকে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে আমাকে শান্তিতে একটুও ঘুমাতে দেবে না দেখছি।

এতো তাড়াতাড়ি কি ঘুমাবে! সঞ্চয় বললো, ন'শো মাইল দূর থেকে ছুটে এলাম কি ঘুমাবার জন্য? কোথায় হইচই করবো, আনন্দ করবো, তা নয়—যেন মহাশশ্মান পাহারা দিচ্ছি।

একটু অপেক্ষা করো বন্ধু। তোমারও ঘুমের ব্যবস্থা করছি। পিকু পাশ ফিরলো। বললো, আমি যদি কাল মীনাক্ষীকে সব কথা না-বলেছি, আমাকে তো জানোই, কোনও কিছুই আমার মুখে আটকায় না। পরিষ্কার বলবো, সঞ্চয় আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয়নি।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলেও ওরা বিছানা ছেড়ে উঠলো না। গল্প করছে শুয়ে শুয়ে। সবিতা চা নিয়ে এলো। পিকু জিজ্ঞেস করলো, মীনাক্ষী কোথায় রে?

রান্নাঘরে।

ওকে ডেকে দে তো একবার।

না। এখন আসতে পারবে না। ওর অনেক কাজ। মাসিমা, বড়ো পিসিমার ছেলে-মেয়েদের

খেতে দিচ্ছে। তাও কি একটু সুস্থির হয়ে খেতে দিতে পারছে? টিঙ্কু বলছে, আমাকে দাও। রাণু বলছে, আগে আমাকে। খোকন, স্বপন চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, আমাকে বেশি দাও। একসঙ্গে হাজারো বায়না। সহস্র আব্দার। উঃ বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার মতো ঝামেলার কাজ আর দুটি নেই।

তাও তো নিজের বাচ্চা নয়। পিকু চায়ের কাপে চুমুক বসিয়ে হাসলো।

তার মানে? সবিতা ও-কথার অর্থ ঠিক মতো বুঝতে পারলো না।

আরে বাবা আমি বলতে চাইছি, নিজের ছেলে বায়না ধরলে তবুও দু'ঘা বসিয়ে দেওয়া যায়। মাসি-পিসির ছেলে-মেয়েকে তো ঠিক ও-ভাবে ট্রিটমেন্ট করা যায় না।

চা খেয়ে বড়ো মামার সঙ্গে শিয়ালদা গেল সঞ্চয়। আগামীকাল বৌভাত। মাংস, মিষ্টিওয়ালাদের টাকা কিছু অগ্রিম দিতে হলো। তারপরে কাঁচা সবজির বাজার সেরে ট্যাক্সি করে ফিরলো। বেলা তখন এগারোটা হবে। জিনিসপত্র ভিতরকার বারান্দায় তুলে সঞ্চয় ঢুকলো রান্নাঘরে। রান্নাঘরে বড়ো মামিমা ছিলেন। আর ছিল ঝি লক্ষী, সবিতা ও মীনাক্ষী।

সঞ্চয় তুমি ও-ঘরে গিয়ে বসো। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবিতা কথাটি বলেই হাসলো একটু।

সঞ্চয় মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু ওর মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। মুখের একটা পাশ এবং প্রশস্ত পিঠের অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। উনুনের দিকে ফিরে সে লুচি ভাজছে।

থাক। ভাগ্যে এখানেই বসুক। বড়ো মামিমা বললেন, তুমি তো খুব দিল্লি-আগ্রা ঘুরে বেড়াচ্ছো। আমাদের পোড়াকপালে আর কিছুই হয়ে উঠছে না।

সে-দোষ তো তোমাদের মামিমা। কতোবার চিঠিতে লিখেছি চলে এসো। নয়াদিল্লিটা একবার দেখে যাও দু'চোখ ভরে। তা তোমরা যদি না-যাও, অতো বড়ো কোয়ার্টার। ফাঁকাই পড়ে থাকে। গতবারে তবুও মা-বাবা গিয়ে দু'মাস থেকে ছিলেন। তারপর থেকে আবার ফাঁকা। তোমরা যদি যাও, বেশ কাটবে তাহলে!

সে তো সাময়িক! বড়ো মামিমা হাসলেন, এবারে একটা বিয়ে করে ঘরে নতুন মানুষ নিয়ে এসো।

না। ওদিকটা ভাবিনি মামিমা। তবে—

তবে মামাদের বিয়ে করা দেখে বুঝি নিজেরও একটা বিয়ে করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তুমি তো ঘুরিয়ে আমাকে সেই একই জায়গায় নিয়ে এলে। সঞ্চয় হাসতে হাসতেই কথাটা বললো। বড়ো মামিমা কার ডাকে যেন বাইরে গেলেন। সঞ্চয় বললো, সবিতা তুই তো আমাকে মামা বলে ডাকবি না। আমিই তোকে বরং মাসি বলে ডাকবো।

হঠাৎ আমার এই প্রমোশন যে?

তা জানি না। তবে তোকে মাসি ডাকতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে।

তোমার আসল মতলবখানা কী বলোতো? সবিতা খুশির হাসি হেসে নীরবে চোখের কোণ দিয়ে মীনাক্ষীকে দেখিয়ে বললো, ওই জন্যে কী?

কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সঞ্চয়। বলতে পারলো না। মীনাক্ষী ভাজা লুচির থালাটা সবিতার দিকে এগিয়ে দিল। অর্থাৎ তোর সঞ্চয়মামাকে খেতে দে। দিদিমা একটা কাঁদুনে ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন, মীনাক্ষী, বাকু সকাল থেকে কিছু খায়নি। বড্ড কান্নাকাটি করছে। ওকে তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু খেতে দাও। দিদিমা চলে যেতেই মীনাক্ষী ছেলেটির দিকে তাকালো। ছোট্ট ছেলে। ক্ষিদেয় কাতর হয়ে কাঁদছিল। জিজ্ঞেস করলো, এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

বাইরে খেলছিলাম।

মীনাক্ষী আর দেরি করলো না। একটি ডিসে চারখানা লুচি আর মিষ্টি দিয়ে বাকুকে খেতে দিলো। তারপরে সঞ্চয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাকে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে। পরে সবিতার উদ্দেশে বললো, তুই তখন থেকে শুধু ময়দা মেখেই চলেছিস, বেলে দিবি কখন? আর লক্ষ্মীদি, তুমি কাপ-ডিসগুলি ধুয়ে নিয়ে এসো।

সঞ্চয় বললো, সবিতা তুই এবারে লুচিগুলি ভাজ, তোর বন্ধুকে একটু বিশ্রাম দে।

মুখটিপে হাসলো সবিতা। বললো, আমার বন্ধুর জন্য তোমার এতো মাথাব্যথা কেন? ওকি তোমার কাছে ওর কষ্টের জন্য কাঁদতে গেছে?

কাঁদবে কেন? সকালে বাজার করতে যাবার মুখে সেই যে দেখলাম উনুনের পাশে, ফিরে এসেও তাই দেখলাম। তাই বলছিলাম—

কষ্টটা মীনাক্ষীর যতো না হচ্ছে তোমার হচ্ছে তারচেয়েও বেশি। ব্যাপারটা কি বলোতো?

নিরপেক্ষ-ভাবে একটা কথা বললাম, এরমধ্যে ব্যাপারের কি আছে?

ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে রান্নাঘরে এসে জুটলো পিণাক। সে গিয়েছিল ডেকরেটারের দোকানে। এইমাত্র ফিরলো। বললো, সারা বাড়ি খুঁজে সঞ্চয়ণবাবুর দেখা নেই। তাই তো বলি গেল কোথায়?

আমি একটু আগেই ফিরেছি। সঞ্চয় হাসলো।

বাই দি বাই, কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কোনওরকম ভণিতা না-করে পিণাক স্পষ্ট বললো, আজ আর আমি সঞ্চয়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছি না।

এই পিকু! কি বাজে বকছো— কোন প্রসঙ্গের কথা উঠবে সঞ্চয় তা খুব ভালো করেই জানে। তাই ওকে থামাতে চাইলো।

বেশ, একটিও যদি মিথ্যে কথা বলি তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো।

আমি চললাম, বলেই সত্যি-সত্যিই সঞ্চয় চলে গেল। সবিতা ওকে ডাকলো, খেয়ে যাও—

পাঠিয়ে দিস। সঞ্চয় চলে গেলে পিকু তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। বললো, তোমার কাজ আরও একটি বাড়লো।

কি রকম?

শুনতেই যখন চাইছো বলছি। পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আজ থেকে বিছানা করে দিয়েই চলে যেতে পারবে না। অন্তত কিছুটা সময় ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে সঞ্চয়কে শান্ত করে তবেই তোমার ছুটি।

কেন পিকুদা? ব্যাপাব কী গুরুতর? সবিতা যেন রহস্যের সন্ধান পেল।

আর বলিস কেন? তোর মামা একখানা জিনিস বটে। সারা রাত কি আমাকে ঘুমাতে দিয়েছে নাকি? সর্বক্ষণ জ্বালিয়েছে।

কারণ? কারণ! পিণাকের সোজা-সুজি উত্তর, মীনাক্ষীদেবী!

কি যা-তা বকছো পিকুদা, ভ্রূকুটি হানলো মীনাক্ষী। আসলে সে যথেষ্ট পরিমাণে লজ্জা পেয়েছে। সেই লজ্জা ঢাকতেই একটু রাগের সুরে বললো, মুখে তোমার সবসময়েই যা-তা কথা লেগে রয়েছে।

হ্যাঁ। আমি তো সবসময়ে যা-তা কথাই বলি। তা সঞ্চয় অমন করে উঠে গেল কেন? সেটা বুঝতে পেরেছো কী? কাল সারারাত আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। মীনাক্ষী কোথায় থাকে, কি পড়ে, বাড়িতে আর কে কে আছে, ওকে দেখতে খুব সুন্দর। একবার দেখলেই মনে হয়, ভীষণ পরিচিত, অনেক কালের পরিচিত। ভারী ভালো মেয়ে। চেহারাটা বেশ মিষ্টি......আরও যে কি বলেছে, আর কি যে বলেনি, সে-সব আর আমার এখন মনে নেই। তাই বলছিলাম, আমাকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দিয়ো। কেন-না আমি অত্যন্ত নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিক।

তা আমি কি করবো? আমাকে বলছো কেন? একটি ডিসে লুচি সাজাতে সাজাতে মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো।

তুমি কি করবে মানে? আরে তুমিই তো সব। কি রে সবিতা, তুইই বল না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটা মীনাক্ষীর প্রেমে পড়েছে। আসলে কি জানিস, এইসব বিয়ে বাড়িগুলোতেই প্রেমের জন্ম হয় বেশি। মনটা সবসময়েই উড়ু উড়ু থাকে কি না।

আমি চললাম কিন্তু পিকুদা। মানাক্ষী উঠে দাঁড়ালো।

কোথায় আর যাবে! সঞ্চয় একটু আগে লজ্জা পেয়ে যে-ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরে কী?

উঃ! মীনাক্ষী আবার বসে পড়লো। তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা যাবে না। মীনাক্ষী তাকালো সবিতার দিকে। বললো, খাবারটা তোর মামাকে দিয়ে আয়। সবিতা চোখ নাচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, কেন তুই যা না—

তোরা কি আরম্ভ করলি বলতো?

আমরা করছি না তোমরা? এবারে উত্তরটা এলো পিণাকের কাছ থেকে। মীনাক্ষী বুঝতে পারলো, এখানে রাগারাগি করলে চলবে না। সহজ হতে হবে। তাই নির্মল হাসি হাসলো। বললো, অতো বকবক না-করে বন্ধুকে খাবারটা দিয়ে এসো তো— দেখি কেমন বন্ধুত্ব!

দুপুরে বারান্দায় এক লাইনে ছোটরা খেতে বসেছে। আট-নটি ছেলে-মেয়ে। ওদেরকে সামলাচ্ছে মীনাক্ষী। এরমধ্যে কখন একফাঁকে যেন স্নানটা সেরে নিয়েছে। জাফবাণী রঙের শাড়ি পরেছে। ভিজে চুল সারা পিঠময় ঢেউ খেলানো। উবু হয়ে বসে ডাল-ভাত-মাছ-তরকারী আর যা লাগবে তাই তাকে দিচ্ছে। উঠোনে প্যান্ডেলের কাজে দেখাশুনা করার ফাঁকে সঞ্চয় নীরব দৃষ্টিতে মীনাক্ষীকেও লক্ষ্য রাখছে। কেন জানি ওকে তার ভারী ভালো লাগছে। অনেক বেশি আপন মনে হচ্ছে। কিন্তু এমনটা তো কখনও কোনোদিনও হয়নি। মীনাক্ষীর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে সে এসেছে। তাদের সম্বন্ধে কোনও আকর্ষণ অনুভব করেনি। মীনাক্ষী যেন ব্যতিক্রম। ভালোলাগার মোড়কে জড়ানো মীনাক্ষী যেন রজনীগন্ধার সজীব দেহলতা। তরঙ্গায়িত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র নয়, শান্ত সমুদ্রের নিস্তব্ধ নিঃসীম নীরবতা যেন মীনাক্ষীকে ঘিরে রয়েছে। সবার অলক্ষ্যে সঞ্চয় ওকে চুরি করে দেখতে থাকে। কিন্তু চোখাচোখি হলো একবার। ধবা পড়তেই সঞ্চয় প্যান্ডেলের উপরের দিকে তাকালো। পরক্ষণেই চাইলো আবার ওর দিকে। মীনাক্ষীকে দৃষ্টি ছাড়া করতে মন চায় না। চোখে চোখেই কাছে রাখতে চায়। দিদিমা একবাব তাড়া দিলেন, সঞ্চয় স্নান করে খেয়ে নে, ওরা কাজ করছে, করুক।

পিকুতো এখনও আসেনি। ও আসুক—

ও এক্ষুনি এসে পড়বে, তুই স্নান করে আয়।

যাচ্ছি।

স্নান সেরে সঞ্চয় চুপচাপ বসে রইলো। পিণাক না-আসা পর্যন্ত সে খাবে না। বেলা বাড়তে থাকে। পিণাক ফিরতেই সঞ্চয় জোর তাড়া দিল, তোমাব জন্যই বসে আছি। শীগ্‌গির স্নান সেরে এসো।

দু'মিনিট সঞ্চয়বাবু। পিণাক অম্লান হাসলো। বাথরুমে ঢুকবো আর বেরুবো।

খেতে বাকি তখনও অনেকে। বড়ো পিসেমশাই, ননীমামার বন্ধু তরুণবাবু, বড়ো মামা, মেসোমশাই, ওঁদেরকে টেবিলে খেতে দেওযা হলো। তদারক করছেন বড়ো মামিমা। রান্নাঘরের মেঝেতে আসন পেতে বসেছে সঞ্চয় আর পিণাক। বড়ো মামিমা বললেন, সবিতা, তোরা দুই বন্ধুতেও একেবারে বসে যা, এদিককার একটা কাজ তাহলে শেষ হয়। তোদের হলে পরে আমরা বসবো। বড়ো মামিমা কথাটা শেষ করে তরকাবীর প্লেটটা নিয়ে চলে গেলেন।

সবিতা বললো, মীনাক্ষী তুই বোসে যা, আমি সকলের ভাত বাড়ছি।

হ্যাঁ, এবারে তুই একটু কাজ করতো! সকাল থেকে তো বন্ধুকে খুব বিশ্রাম দিয়েছিস। সঞ্চয় আরও বললো, আর আপনাকেও বলি, পারেন বটে কাজ করতে।

মীনাক্ষী ও-কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু নীরবে দুই ঠোঁটের মাঝে হাসির মৃদু একটি ঢেউ খেলে গেল। বারান্দা থেকে বড়ো মামির গলা শোনা গেল ঃ মীনাক্ষী! মাছের প্লেটগুলি সাজানো রয়েছে। নিয়ে এসো তো—আমি এখন এখান থেকে যেতে পারছি না।

যেমন নির্দেশ, তেমনিই কাজ! মীনাক্ষী দু'বারে চারটি প্লেট টেবিলে দিয়ে এলো। সঞ্চয় না-বলে থাকতে পারলো না, খেতে বসেও আপনার শান্তি নেই।

তোমার তাতে কি? সবিতা পিণাকের দিকে একবার মাত্র চেয়েই সঞ্চয়কে প্রশ্ন করলো।

ওই তো তোদের দোষ! একটা কিছু বললেই বলবি, তোমার তাতে কী? ব্যাপার কি বলোতো?

কিন্তু কথাটা কি আমি ভুল বলেছি? ঠিক মনে হচ্ছে কাজের জন্যই যেন..........

সঞ্চয়কে থামিয়ে দিল মীনাক্ষী। মিষ্টি হেসে বললো, বিয়ে বাড়িতে অমন একটু-আধটু কাজ করতেই হয়। তাছাড়া আমি তো এ-বাড়িতে নতুন নয়,—প্রত্যেক দিনের যাতায়াতে ঘরের মেয়ের মতোই হয়ে গেছি। কাজের হিসেবের তালিকা তুলে ধরে সঞ্চয় যাতে দীর্ঘ না-করে সেজন্যই সহজ করে কথাটা বললো মাত্র। কিন্তু সদা কৌতুকী পিণাক ওই কথাটিকে অন্যখাতে বইয়ে দিল। বললো, অর্ডার! অর্ডার!! হ্যাঁরে সবিতা, শেষের কথাটার অর্থ বুঝলি? ঘরের মেয়ে! তা তোমাকে পরের মেয়ে করে রাখতে কে চাইছে? সত্যি সত্যিই ঘরের মেয়ে হয়ে যাও না--তোমার কথা মনে ভেবেই বুঝি আমাদের ওই বুড়ো দাড়িওয়ালা লিখেছিলেন ঃ

'এসো এসো আমার ঘরে এসো।

আমার ঘরে।'

পিণাকের ওই কথায় রাগ করতে গিয়েও হেসে দিল মীনাক্ষী। রাগ করাটাই বোকামি। পিকুদা তাহলে পেয়ে বসবে। যা ফাজিল ছেলে, মুখে বিন্দুমাত্র কিছু আটকায় না। যা খুশি তাই বলবে। মীনাক্ষী মনে মনে শুধু বললো, 'তুমি যা জ্বালাতে পারো না পিকুদা!'

সঞ্চয় আর পিণাককে খেতে দিয়ে সবিতা একটি থালায় মীনাক্ষীকে নিয়ে খেতে বসলো। সঞ্চয় বললো, তোরা যেমন একটি থালায় খেতে বসেছিস, আমাদেরও তো একথালায় দিতে পারতিস। পরে সবিতাকে একটু রাগিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। মীনাক্ষীকে বললো, আমার মাসির সঙ্গে খাচ্ছেন, পেট ভরলে হয়। সবিতাও ছাড়বার মানুষ নয়। সে-ও হেসে উত্তর দিল, মনে হচ্ছে একমাত্র তোমার সঙ্গেই খেলে ওর পেট ভরবে। এমন ধরনের কথাবার্তায় সত্যই লজ্জা পাচ্ছে মীনাক্ষী। এ-সব কথার ইতি টানতেই সে বন্ধুকে শাসন করলো, খেতে বসে কি আরম্ভ করলি বলতো? প্রত্যেকটি কথারই উত্তর দেওয়া চাই। একটু চুপ করে থাকতে পারিস না?

তোর এতো লাগছে কেন? সবাইকে ছেড়ে মীনাক্ষীকেই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে সবিতা বললো, সঞ্চয়কে বললে তোর লাগছে, ওদিকে তোর কাজ করা দেখে সঞ্চয়ের কষ্ট হচ্ছে।

বাজে বকিস না, সঞ্চয় উত্তর দিল, সারাদিনের খাটুনির পর দুটো খেতে বসেছিস। চুপচাপ শান্তিতে খেয়ে নে—

কথাটা কী আমাকে বললে? সবিতা চাপা হাসলো। পিকু এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবারে সে মুখ খুললো। বললো, অত্যন্ত সহজ কথাটাও বুঝতে তোর যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তুই বোবা হয়ে থাক। যে বুঝবার সে ঠিক বুঝেছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না ঠিক কথা, কিন্তু চালাকির দ্বারা হাজার লোকের সামনেও আসল মানুষকে মনের কথা ঠিক বলা যায়।

বুঝিলাম তুমি অতি চালাক বিশারদ! সঞ্চয় হাসলো।

ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি বলে? চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলো পিণাক। তোমার সঙ্গে কথায় পারবো, এমন ভরসা আমার নেই। আমি মৌনব্রত পালন করছি।

খেয়ে উঠতে উঠতে তিনটে বাজলো। পিণাক, সঞ্চয় বারান্দার কোণের ছোট ঘরখানায় গিয়ে চৌকিতে শুয়ে পড়লো। সঞ্চয় ওখান থেকেই আবেদন জানালো, মাসি একটা পান দিয়ে যাবি। তারপরেই পিণাককে বললো, আনন্দের দিনগুলি কতো তাড়াতাড়ি কেটে যায়। চারটি দিন থাকবো, এখনই মনে হচ্ছে সময় যেন ফুরিয়ে আসছে।

ছুটি বাড়িয়ে নিতে পারবে না?

না পিকু। নির্দিষ্ট ওই আটদিনের মধ্যেই পৌঁছাতে হবে। দিল্লি থেকে আসবার সময়ে ভেবেছিলাম, মামার বিয়েতে আটদিনের ছুটি, এটাই খুব বেশি। এখন দেখছি ওই কটি দিন কিছুই নয়। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। চোখের পলক পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে।

এরজন্য মীনাক্ষীই দায়ী।

তুমি মিথ্যে বলোনি পিকু। মীনাক্ষীকে দেখার পর থেকে একটি কথাই মনে হচ্ছে ওকে হারাতে পারবো না। ওকে হারালে আমার কষ্ট হবে। পান নিয়ে ঘরে এলো সবিতা। শেষের কথাটি তার

কানে গেছে। বললো, কীসের কষ্ট হবে?

এখনও বুঝতে পারছিস না? পিকু বলে উঠলো, দিদির বিয়ের সময়ে তোকে যে ছোটটি দেখেছিলাম, আজও সেই ছোটই রয়ে গেছিস। তা যাক গিয়ে, সঞ্জয় তোকে মাসি ডেকে পান চাইলো। প্রথমে বুঝতে পারিনি, মাসিটা আবার কে? তা তুই কবে থেকে মাসি হলি? সঞ্জয় এর আগে তোকে ওই নামে ডেকেছে বলে তো কখনও মনে পড়ছে না। সবিতা দেখলো, এই সুযোগ। একটু আগে পিকুদার কথার যদি ফের দিয়ে হয়, এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর আসবে না। সবিতা পিকুর মুখের দিকে তাকালো। হাসলো বিজয়ীর মতো। বললো, বড়দার বিয়ের সময়ে তোমার যেটুকু বুদ্ধি ছিল, আজও সেই একই জায়গায় তা থেমে রয়েছে। একটুও বাড়েনি। একটুও পরিণত হয়নি।

কেন? হঠাৎ এ কথা বলছিস যে, পিণাক কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

আহা! যেন কিছুই বুঝতে পারছে না! একটি সুন্দরী মেয়ে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শব্দ তুলে হেসে চোখের কোণ দিয়ে মীনাক্ষীকে একবার দেখার চেষ্টা করলো সবিতা। তারপরেই বলে উঠলো, সুতরাং সঞ্জয় আমাকে মাসি ডাকবে না তো কি মেসোমশাই বলে ডাকবে?

বড়ো মামিমা, পিকুকে ডেকে কোথায় যেন পাঠালেন। সঞ্জয় চৌকির ওপাশে সরে গেল। সবিতা পা দুটিকে গুটিয়ে নিয়ে মেজাজে গল্প করার উদ্দেশে জাঁকিয়ে বসলো। হাসি ভরা মুখে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি বলো না, কার কথা জিজ্ঞেস করছিলে তখন?

সত্যি বলবো? সঞ্জয় হাসলো।

সত্যি বলার জন্যই তো তোমাকে অনুরোধ করছি। সঞ্জয় বারান্দার উত্তর কোণের দিকে তা · লো। মীনাক্ষী ওদিকে তিন-চারজনের সঙ্গে বসে গল্প করছে। সে ওই দিকে চোখ রেখেই আস্তে অস্তে বললো, মীনাক্ষীর!

ওকে তোমার ভালো লেগেছে? মুখ টিপে হাসলো সবিতা।

হ্যাঁ, মাসি। তোর কাছে লুকাবো না, ভীষণ ভালো লেগেছে।

তা আমার কাছে, পিকুদার কাছে হা-হুতাশ না-করে আসল জায়গায় গিয়েই তো বলতে পারো—

ওর বাড়িতে আর কে কে আছে রে মাসি? সঞ্জয় একটু একটু করে জানতে চাইলো।

মা, কাকা, দাদা, বৌদি ও একটি ছোট্ট ভাইঝি।

তুই ওদের বাড়িতে খুব যাস, না?

হ্যাঁ। ওদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আমার খুব ভাব। আসলে ওদের বাড়ির সকলেই খুব ভালোমানুষ। আমি ওদের বাড়িতে গেলে এতো আপন করে কাছে টেনে নেবে, মনে হবে আমি যেন ওই বাড়িরই মেয়ে। ওই বাড়িরই একজন। ওর মায়ের তো তুলনাই হয় না। মীনাক্ষীকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মেয়ের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে বলেই তো এতো স্বাধীনতা দিয়েছি। আমাকেও খুব স্নেহ করেন। এই দেখো না—গিয়ে বললাম যে, দাদার বিয়েতে কয়েকটা দিন খুব আনন্দ করবো, মীনাক্ষীকে ছেড়ে দিন। মাসিমা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উত্তর দিলেন, তা তোমার কথার অবাধ্য কী কোনোদিনও হয়েছি? এদিকে চার-পাঁচটা দিন আমাদের এখানে থাকবে শুনে মলয়দা আবার বেশ মুষড়ে পড়েছে।

মলয়দা কে?

মীনাক্ষীর দাদা। একটামাত্র বোন তো—মীনাক্ষী হচ্ছে সকলের নয়নের মণি। মীনাক্ষী বাড়িতে না-থাকলে সারা বাড়ি নিঝুমপুরী। আসলে ওর দু'বছরের সময়ে বাবা মারা যান। সেই কারণেও সকলের স্নেহটা গিয়ে জমা হয়েছে ওকে কেন্দ্র করেই।

তার মানে একমাত্র মেয়ে! অর্থাৎ আদুরে মেয়ে।

ঠিক তাই। সবিতা হেসে আরও জানালো, ভীষণ আদুরে। মলয়দা আসবার সময়ে কি বলে দিয়েছে জানো না! বলেছে, সবিতাদের বাড়ি তো আর হাজার মাইল দূর নয়—রেল স্টেশনের এ-পার আর ও-পার। সুতরাং দিনের মধ্যে অন্তত একবার যেন বাড়িতে গিয়ে দেখা দিয়ে যায়।

এই চার-পাঁচটা দিনের জন্য না-হয় এই ব্যবস্থা হলো, কিন্তু বিয়ের পরে? তখনও কী এই নিয়ম

চালু থাকবে?

থাকতেও পারে! সবিতা উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়লো।

থাকতেও পারে! সবিতার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো সঞ্জয়। শ্বশুরবাড়ি যদি সত্যি সত্যিই হাজার মাইল দূরে হয়?

তুমি কী তোমার দিক থেকে চিন্তা করছো? সবিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো। সঞ্জয়ের মাথার চুলগুলি টেনে দিয়ে বললো, যদি তাই হয়, তাহলে বলবো তুমি ভাগ্যবান। কেন-না মীনাক্ষীর মতো মেয়ে হয় না! রূপের কথা বলছি না, কেন-না তুমি তা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো, এবং তোমার মাথার মধ্যে ইতিমধ্যে কাজ করতেও শুরু করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিসও তুমি দেখেছো। কাজের মেয়ে বটে মানাক্ষী। সমস্ত কাজ একা নিজে হাতে করতে পারে। আর যা শোনোনি তা হলো ওর গান। চমৎকার গলা। অথচ রূপ বা গলার জন্য ওব কোনও অহঙ্কার নেই। অদ্ভুত ভালো মেয়ে!

সে তো আমি বুঝতেই পারছি। একঝিলিক হাসলো সঞ্জয়। নয়তো ওর জন্য আমার মন কেমন করবে কেন? ওকে আমি—কথা শেষ করতে পারলো না সঞ্জয়। বারান্দার উত্তর কোণ থেকে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো মীনাক্ষী। পান খেয়েছে। পাতলা ঠোঁট দুটি লাল। যেন পড়ন্তবেলার পশ্চিমের শেষ সূর্যের আভা। সবিতা বললো, বোস এখানে, সঞ্জয় শোওয়া থেকে উঠে বসলো। অর্থাৎ মীনাক্ষীকে বসবার জন্য জায়গা করে দিল। অল্প একটু সময় গল্প করেই সবিতা উঠে পড়লো। তোরা গল্প কর, আমি আসছি—বলেই সে বিদায় নিল।

সবিতা চলে গেলে সঞ্জয়ের মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকতে কেমন যেন লজ্জার আবরণ নেমে এলো মানীক্ষীর চারিদিকে। সঞ্জয়ের দিকে একবার তাকিয়েই সে জানালার বাইবে দৃষ্টি মেলে দিল। সঞ্জয় ওকে নীরবে কিছুক্ষণ দেখলো। পরে বললো, আপনি দিল্লি গিয়েছেন?

না। জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে এনে সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকালো। মীনাক্ষী মৃদু হেসে বললো, ওখানে আমার মাসিমা আছেন। গতবারে আমাদের যাবার কথা ছিল। প্রচন্ড শীত পড়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত আর আমাদের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে এবারে ফেব্রুযারি মাসে যেতে পারি। মীনাক্ষীর শেষের কথা শুনে মনে মনে যথেষ্ট আনন্দিত হলো সঞ্জয়। বললো, আপনার মাসিমা কোন এলাকায় থাকেন?

বিনয়নগর। মীনাক্ষীর ছোট্ট উত্তর।

আমার ওখান থেকে কাছেই।

দিল্লিতে আপনি কোথায় থাকেন? একটু থেমে মীনাক্ষী বললো, যদিও আমি বুঝতে পারবো না। যেহেতু এখনও যাইনি।

হাউজখাস এনক্লেভ। বি ব্লকে। একটু থেমে সঞ্জয় আরও যোগ করলো, ফেব্রুয়ারিতে যদি দিল্লিতে আসেন, সেই সঙ্গে আগ্রাটাও ঘুরে যাবেন। তাজ দর্শনের সুযোগ হারাবেন না। দূরও বেশি নয়।

যদি যাই, আপনাকেও তবে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনি ওখানকার বাসিন্দা। সমস্ত কিছু আমাদের চেয়ে বেশি চেনেন, বেশি জানেন।

নিশ্চয়ই যাবো।

আবার নীরবতা নেমে এলো। যেন দুজনের কথাই শেষ হয়ে গেছে। আর কারো কোনও কথা নেই। চুপচাপ বসে থাকাটা যেন আরও বেশি লজ্জার। কথা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে দুজনেই। মীনাক্ষী বললো, ননীদার বিয়েতে আপনার বাবা-মা তো এলেন না? সবিতার মুখে অবশ্য শুনেছিলাম, অনেক দূরে থাকেন। কোথায় সেটা?

পাঞ্জিম। সঞ্জয় শান্ত হাসলো। বাবা-মা থেকেও অনেক দূরে রয়েছেন। ইচ্ছা হলে যে একটু দেখবো, সে-উপায়ও নেই। গত বছর অবশ্য আমার কাছে দু'মাস ছিলেন। তারপর থেকে এই পর্যন্ত আর দেখা নেই। মাকে ছেড়ে থাকতে আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়।

ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলেই পারেন। সান্ত্বনার সুরেই বললো মীনাক্ষী।

[library stamp]

অতো দূরে গেলে কম করে একমাসের ছুটির প্রয়োজন। কিন্তু একটানা অতো ছুটি পাওয়াই যায় না। কোম্পানি বলছে, একসঙ্গে অতো ছুটি না-নিয়ে অল্প অল্প করে নাও। অল্প বলতে ছ-সাত দিনের। সে-রকম ছুটি নিয়ে আমার একেবারেই লাভ নেই। বছর দুই এমনভাবেই চলবে। সবচেয়ে অসুবিধা কি জানেন, পাঞ্জিম যাতায়াতেই অর্থাৎ পথে আমার ছুটি শেষ হয়ে যাবে। এই দেখুন না, এখানে আসবার জন্য পনেরো দিনের ছুটি চেয়েছিলাম। দু'বছর বাদে কলকাতা আসছি, দুটি সপ্তাহ হাতে না-থাকলে চলে? শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হলো আট দিনের। কিন্তু এখানে থাকতে পারছি চারটে দিন। এরমধ্যে একবার বাগবাজারে যেতে হবে। একটা দিন না-হোক অন্তত অর্ধেক দিন ওখানে কাটাতে হবে।

বাগবাজারে কে আছেন?

পিসিমা। বাবার বড়ো বোন। আগেরবার কলকাতা এসে পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। সেজন্য পিসিমার কি দুঃখ! অভিমান করে বাবার কাছে পর্যন্ত চিঠি লিখেছিলেন, দু'দিনের জন্য কলকাতা এলেও সঞ্চয় দমদমে ওর মামার বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে, আর পিসিমার কথা মনেও থাকে না। তাও যদি দমদম কমলাপুর এলাকা বাগবাজারের আগে হতো তাহলেও না-হয় বুঝতাম।

আপনার পিসিমার অভিযোগটা কিন্তু ভুল নয়। দমদমে আসতে হলে আপনাকে বাগবাজারের কাছ দিয়েই আসতে হয়। সুতরাং আগে ওখানে গেলেই পারেন।

কিন্তু এবারে তো সে-উপায়ও ছিল না। ননীমামার বিয়ের জন্য..........

এবারে না-হয় ননীমামার বিয়ে, আগেরবার নিশ্চয়ই বিয়ে ছিল না?

আপনিও যে পিসিমার মতোই অভিযোগ করতে শুরু করলেন, সঞ্চয় প্রশান্ত হাসলো। একটু থেমে পরে বললো, সবিতার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কতো দিনের?

দমদম গার্লস হাইস্কুলে যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন থেকেই শুরু। অর্থাৎ সেই ছোটবেলা থেকেই—তা-বলতে পারেন।

বাইরে থেকে এসে পিণাক বড়ো মামিমার ঘরে গেল। বারান্দা দিয়ে যাবার মুখে সঞ্চয়ের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো। মীনাক্ষী বললো, আমি এবারে উঠি। পিকুদা এক্ষুণি এসে পড়বে।

আপনি উঠবেন কেন? বসুন, সঞ্চয় আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার কথা শেষ করতে পারলো না। পিণাক ঘরে এলো। মুখে তার উচ্ছ্বল হাসি। একবার সঞ্চয়, আর একবার মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে, দুজনের উদ্দেশেই বললো, কি এতো সুখ-দুঃখের আলাপ হচ্ছিলো? ঘরখানাও তো খুব নিরিবিলি বেছে নিয়েছো।

ফের পাগলামো শুরু করে দিলে? মীনাক্ষী ধমকের সুরে শাসন করলো। একটু চুপ করেও তো থাকতে পারো।

এমন দৃশ্য দেখার পরেও যে নাকি চুপ করে থাকবে, সে তো সত্যি সত্যিই বোবা। আমি তো বোবা নই, যাক গিয়ে তোমাদের যখন এতো আপত্তি আমি চললাম।

আমাদের আপত্তি! সে-কথা কী আমরা একবারও বলেছি? মীনাক্ষী অসহায়ের সুরে বললো, তুমি ভীষণ উল্টো-পাল্টা কথা বলতে পারো পিকুদা।

দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমরা দুজনে কতোক্ষণ হলো গল্প করছিলে?

মিনিট পনেরো হবে। সঞ্চয়ই উত্তর দিল। উত্তরটা দিয়েই সে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে অর্থাৎ ভুল বলিনি তো? মীনাক্ষী সমর্থন জানিয়ে বললো, তা হবে।

তাহলে এই পনেরো মিনিটের অনেক গুণ আছে দেখছি। এরই মধ্যে আমাদের, আমরা অনেক কিছু হয়ে গেছে দেখছি!

বাজে বকো না, মীনাক্ষী এবারে রীতিমতো ধমক লাগালো। আমি সে-রকম অর্থে তোমাকে কিছু বলিনি।

কী রকম অর্থে বলেছিলে?

তুমি বলছিলে না, তোমাদের যখন আপত্তি, আমি ঠিক ওই কথার প্রসঙ্গেই বলতে চেয়েছি,

আমাদেব আবার আপত্তি কিসেব? একটু থেমে মীনাক্ষী আবার বললো, তোমার সঙ্গে কথা বললে পাগল হয়ে যাবো।

তুমি কেন পাগল হবে? পিণাক শব্দ করে হেসে উঠলো। তোমাব অসীম ক্ষমতা। তুমি তো পাগল করাবে।

ফের ফাজলামো। একটা মিনিটও তুমি সিরিয়াস হতে পারো না।

তুমি এতো রাগছো কেন? তোমাদের কথা কী এখনও শেষ হয়নি? না হয়তো বলো—আমি চলে যাচ্ছি।

তাই তুমি যাও। পিণাকেব সঙ্গে কথায় না-পেরে মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত ওই কথাই বলে বসলো। আর ওর কথা শেষ হওযার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ঘরখানি ভরিয়ে তুললো পিণাক। বললো, তা এই ছোট্ট কথাটা সবার আগে বললেই হতো—এতো শিবেব গীত গাওয়াব কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

ভদ্রলোকদের একবারে কিছু বলতে নেই। শিবের গীত গেযেই বুঝিতে দিতে হয়। মীনাক্ষী কথা বলার অন্যপথ ধরলো। কেন-না লাজুক ভাবে কথা বলে পিকুদার সঙ্গে পেবে ওঠা যাবে না। সমানে সমানে উত্তব দিতে হবে। তবেই যদি পিকুদা ঠান্ডা হয। তারপবে সারা মুখে হাসির ছায়া ফেলে বললো, কি হলো পিকুদা? চুপ করে বইলে যে?

তোমার সঙ্গে আর পারা যাবে না। তুমি চালাক হয়ে গেছো—

অনেক দেরিতে বুঝেছো। সঞ্চয় এবারে একটু খোঁচা দিল।

সে-কি! তুমিও ওর দলে? একলা আমাকে পেয়ে তোমরা দুজনে যদি একসঙ্গে আক্রমণ করো তাহলে যে আমায় সবিতাকে ডাকতে হয।

বেশ তো ডাকো না, সবিতাকে, মীনাক্ষীই বেশি উৎসাহ বোধ করলো। আমাব বন্ধু আমাব পক্ষেই থাকবে। তারপবেই দৃষ্টি পড়লো সঞ্চযের হাতঘড়ির দিকে। সওযা-চাবটে বাজে। বললো, উঠি এবাবে—

এখন আর কাজ কি? বসুন না। সঞ্চয় অনুযোগ করলো।

আমি বুঝি সবসময়ে কাজই করি? চাপা হাসলো মীনাক্ষী।

দেখছি তো তাই। কিন্তু আপনি তো কাজেব জন্য এ-বাড়িতে আসেননি।

তা ঠিক। তবে বিয়ে বাড়িতে কাজ যে একটু করতেই হয়।

সেজন্য আরও অনেকেই আছে।

খুব তো আমাকে পরাজিত করলে, পিণাক সুযোগ পেয়ে মীনাক্ষীকে কথা শোনালো, এবারে সঞ্চয়কে বোঝাও।

না। মীনাক্ষী খুশির হাসি হাসলো। তার আগে আমিই হেরে গেলাম।

কিন্তু আমি হারবো না। পিণাক বললো, মীনাক্ষীর হয়ে আমিই তোমাকে ওকালতি জেরা করছি, উত্তর দাও সঞ্চয়, মীনাক্ষী কাজ করুক-না-করুক তোমার এতো লাগছে কেন? সঞ্চয়, মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে একটু দেখে নিল। মেযেটা মেঝের দিকে দৃষ্টি ফেলে চুপ করে রয়েছে। এই মুহূর্তে ও কি কথা ভাবছে, বড় জানতে ইচ্ছা কবছে। হঠাৎ মীনাক্ষী ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠলো, আমি যাই। বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চৌকি ছেড়ে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালো। সঞ্চয় ধীরে ধীরে উত্তর দিল—আমার কেন লাগছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো না? সঞ্চয়ের ও-কথা শোনার পর লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারলো না মীনাক্ষী। দ্রুত পায়ে ঘরে ছেড়ে চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারকে দূর করতে টিউবের উজ্জ্বল আলোকমালা একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। আলোর বর্ণছটায় উঠোনের প্যান্ডেল সাজলো ষোড়শী। তরুণবাবু ও বড়ো মামা ছেলে-বৌ আনতে গেলেন। সঞ্চয় নীরবে সারা বাড়ি খুঁজছে। কিন্তু যাকে খুঁজছে, তাকে দেখতে পেল না কোথাও। সবিতারও দেখা নেই। কোথায় গেল ওরা দুটিতে? ডেকরেটিং-এর দোকান থেকে রান্না-করার জিনিসপত্র এসেছে। এক ঠেলাগাড়ি ভর্তি বাসনপত্র। পিণাক চালান দেখে সব কিছু মিলিয়ে নিচ্ছে। মাঝ উঠোনে পিণাকের

মেজদি—শোভনাদি আলপনা আঁকছে। খুব সুন্দর হয়েছে আলপনাটি। ছোটরা ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড়োরাও দেখছেন।

সঞ্জয় গেটের বাইরে এলো। গেটের একটি টিউব জ্বলছে না। পিণাককে জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল, আমি ইলেকট্রিকের দোকানে খবর পাঠিয়েছি। এক্ষুণি এসে পড়বে। অন্যান্য বাতির আলো গিয়ে পড়েছে সামনের প্রশস্ত ঝিলের বুকে। ঝিলের বুক ভরা জল। আলোর রেখা সেখানে পড়ে বাতাসের সঙ্গে কাঁপছে। মাথার ওপর দিয়ে রং-বেরং-এর আলো জেলে কয়েকটি প্লেন শূন্যে পাড়ি দিল। দূর থেকে সঞ্জয় আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল দুটি মেয়ে আসছে। কাছে আসতে পরিষ্কার হলো, মীনাক্ষী আর সবিতা। সঞ্জয় ডাকলো, সবিতা শোন, মীনাক্ষী কিন্তু দাঁড়ালো না। বাড়ির ভিতরে চলে গেল। সম্ভবত দুপুরের লজ্জা তার তখনও কাটেনি। সঞ্জয় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলি?

মীনাক্ষীদের বাড়িতে।

সবিতা ভেতরে চলে গেলে ঝিলের পাড়ে পায়চারী করতে লাগলো সঞ্জয়। মীনাক্ষীর চিন্তাই চক্রাকারে ঘুরছে তার মনে। ভেবে পায় না, এতো চিন্তার কি আছে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো সঞ্জয়। না-হয় মীনাক্ষী সুন্দরী। নিটোল শান্ত একটি ভালো মেয়ে। সেজন্য কি চিন্তায় ভাবনায় মিশে যেতে হবে? বছর তিনেক আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়লো সঞ্জয়ের। তারই সহকারী এবং বন্ধু সোমনাথ। হঠাৎ একদিন ছুটি থেকে এসে জানালো, জানো সঞ্জয়, বাড়ি থেকে ফিরে এসে কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছি না।

কেন?

সবসময়েই একটি মেয়ের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ আশ্চর্য কি জানো? তার সঙ্গে আমার কোনও আলাপ পরিচয় হয়নি। দুজনে, দুজনকে শুধু দু'চোখ ভরে দেখেছি। তাকে ভালোবেসেছি। কতোদিন যে সেই মেয়েরই গল্প শুনতে হয়েছে সে-হিসেব আর সঞ্জয়ের মনে নেই। শুধু মনে আছে, সে-সব কাহিনী শুনে সে মনে মনে হেসেছিল। একটি মেয়েকে দেখলাম আর অমনি তাকে ভালো লাগলো, তার চিন্তায় স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতে হবে, এতোটা কল্পনাবিলাসী সঞ্জয় নয়। ছিলও না। অথচ আজ! আজ তো সেই চিন্তাতেই পেয়ে বসেছে সঞ্জয়কে। মনকে কতোবার সান্ত্বনা দিয়েছে, মীনাক্ষী এমন কিছু আলাদা নয়। সাধারণ একটি মেয়ে। তার জন্য এতো ভাববার কি আছে? কিন্তু ওই প্রশ্নটুকু পর্যন্তই। সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর পেয়েছে, ওই মীনাক্ষীকেই তার প্রয়োজন। শীতের কুয়াশা সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখার মতো সঞ্জয়কেও মীনাক্ষী আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বাড়ির ভিতরে গেল সঞ্জয়। বারান্দায় একটি বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলো। মনে পড়লো অনেক দিন আগেকার একটি ঘটনা। প্রথম যখন চাকরি নিয়ে আমেদাবাদে যায়, তখনকার কথা। পাশের বাড়িতেই থাকতো একটি গুজরাটি মেয়ে। হ্যাঁ, নামটা এখনও মনে আছে। সুমতি। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারতো। সঞ্জয় যখন অফিস থেকে ফিরতো, মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকতো তাদের বাড়ির মেহেন্দী গাছে ঘেরা দরজাটার সামনে। সঞ্জয়কে দেখে শুধু হাসতো। সঞ্জয় একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে দেখে তুমি হাসো কেন?'

তোমাকে ভালো লাগে। কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল সঞ্জয়। এতো স্পষ্ট ভাবে, পরিষ্কার সুরে কোনও মেয়ে যে এতো সহজেই একটি ছেলেকে অমন ধরনের কথা বলতে পারে সঞ্জয়ের ধারণাই ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। গুজরাটি মেয়েরা খুব সহজ সরল। কোনও কিছু গোপন করে রাখতে পারে না। সুমতি বলেছে সেই সুরেতেই।

ভালো লাগলে এমনিভাবে হাসতে হয় বুঝি?

তুমি তো কোথাই বলতে চাও না। আমাকে দেখলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নাও। আমি কি দেখতে খারাপ আছি?

খুব সুন্দর তুমি দেখতে।

সাচ্ বলছো? সুমতির চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক।

বিলকুল সাচ্।

এমনিভাবেই সুমতির সঙ্গে আলাপ। পাশাপাশি থাকে। প্রতিবেশী। সেই হিসেবেই আলাপ করেছিল সঞ্চয়। তার বেশি কিছু নয়। সুমতিকে নিজের করে পাবে, সুমতি সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তেমন আশা সঞ্চয় কখনোই করেনি। আজ সে হিসাব করতে বসলো। মীনাক্ষীর চেয়ে সুমতি সুন্দরী ছিল। অথচ আপন করে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা সুমতিকে দেখে হয়নি, হয়েছে মীনাক্ষীকে দেখেই। সুমতিকে চাইলেই পেতো কিন্তু মীনাক্ষীকে কিছু বলতে কোথায় যেন সঙ্কোচ লাগছে। বাধ বাধ মনে হচ্ছে।

মীনাক্ষী চায়ের ট্রে-সমেত ছ-সাত কাপ চা বড়ো ঘরে নিয়ে গেল। রান্নাঘরে ফিরবার পথে সঞ্চয়কে অতো চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, চা খেয়েছেন?

কে দেবে? সঞ্চয় কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করলো, যেন তাকে দু'বেলা চা দেবাব দায়িত্ব মীনাক্ষীরই। সুতরাং সে যদি চা দিতে দেরি করে তাহলে সঞ্চয় চা পাবে কেমন করে? অভিযোগটা কান পেতে শুনলো মীনাক্ষী। হঠাৎ কেন জানি বলে বসলো, অতো রাগ হলো কেন? ঠিক মতো চা পাননি বলে? কাল থেকে চায়েব প্রথম কাপটি আপনিই পাবেন।

অতো সৌভাগ্য চাই না। সময় মতো পেলেই যথেষ্ট। পিণাককে এদিকে আসতে দেখে মীনাক্ষী বলে উঠলো, পিকুদা এখানে এসে বোসো। তোমাদের চা দিচ্ছি।

রাত দশটায় চা! ওটা তোমরাই খেয়ে নিয়ো।

তোমাদেব সকলেরই মেজাজ উল্টো। ব্যাপাব কি বলো তো? না-হয় আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি নেই বলে যে তোমরা চা পাবে না, সেটা আমি জানবো কেমন করে? আর রাত দশটার কথা বলছো? ছটা, সওয়া-ছটা বাজে এখন। তুমি কি সময়টাকে ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে নিয়ে যাবে নাকি?

রেগে গেলে আমি অমন বাড়িয়েই বলি। পরিষ্কার উত্তর পিণাকের। ঝিলমিলিয়ে হেসে উঠলো মীনাক্ষী। বললো, তুমি কিন্তু খুব সুন্দর রাগ করতে পারো। এমনটা আমি কখনোই দেখিনি।

পাকামো কোরো না, পিণাক হেসে দিল। চেষ্টা করেও রাগ করে থাকতে পারলো না। বললো, এখন লক্ষ্মীমেয়ের মতো তাড়াতাড়ি দু'কাপ চা নিয়ে এসো তো দেখি।

ননীমামা নতুন বৌ নিয়ে বাড়িতে এলো। উঠোনেব আলপনার সামনে দুটি চিত্রিত পিঁড়িতে ওরা দাঁড়ালো। বধূবরণ হবে। ছেলের মা থেকে শুরু করে মাসিমা, পিসিমার দল পর্যন্ত সবাই একে একে বৌ-এর মুখ দেখলেন। মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কানে মধু লেপে দিলেন। মুখে গুঁজে দিলেন সন্দেশের টুকরো।

বোরিং। যতোসব বাজে নিয়ম। পিণাক একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করলো।

এই নিয়মেই যে চলে আসছে। সঞ্চয় হাসতে হাসতে বললো, কানে মধু দেওয়ার অর্থ হলো নতুন বৌ সব কথাই মধুর মতো শুনবে।

ও-সব আলতু-ফালতু কথা রাখো দেখি, তুমি বৌকে খিস্তি দেবে, আর বৌ সেই খিস্তিকে মিষ্টি করে শুনবে।

আঃ পিকুদা! বাজে কথাগুলি একটু বন্ধ করবে? কাছেই দাঁড়িয়েছিল মীনাক্ষী। কথাটা তার কানে যেতেই সে পিণাককে একটু সাবধান হতে বললো।

নতুন কাপড়ের ওপর দিয়ে চলে নতুন বৌ ঘরে এলো। রাজ্যের ভিড় ভেঙে পড়লো সেই ঘরে। শুধু আত্মীয়-স্বজনরাই নয়—আশেপাশের বাড়ির মেয়েরাও এসে ভিড় করেছে। ঘরে ঢুকবার উপায় নেই। পিণাক তার মেজদিব সঙ্গে কি যেন কথা বলছে। সঞ্চয় বারান্দার কোণের সেই ছোট্ট ঘরে গিয়ে চৌকির ওপরে শুয়ে পড়লো। দিদিমা পাথরের একটি থালা নিয়ে নতুন বৌ-এর ঘরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়লো সঞ্চয়ের উপর। জিজ্ঞেস করলেন, ও সঞ্চয়, অমন করে শুয়ে আছিস কেন ভাই?

এমনি দিদিমা।

সন্ধ্যার সময়ে শুয়ে থাকতে নেই। উঠে বোস—এই ঘবে আয়।

অতো ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করা আমার পোযাবে না। এইখানেই বেশ আছি। সঞ্চয় আবার শুয়ে পড়লো। চৌকি দেখার ভিড় ঘর ছাপিয়ে বারান্দার উপরেও এসেছে। ওখান থেকেই মেয়ের দল ঘরেব ভিতর উঁকিঝুঁকি মারছে। সঞ্চয়ের চোখে পড়লো, একটি মেয়ে কিন্তু তার ঘরের দিকেই উঁকি দিচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি একটু হাসলো। সঞ্চয মেয়েটিকে চিনতে পারলো। যদিও আলাপ নেই। নেহাতই চোখের চেনা। আজ বিকেলে এসেছে। বড়ো মামার বন্ধুব মেয়ে। দোহারা গড়ন। দীর্ঘাঙ্গী। রংটা ফর্সাই বলা চলে। সব মিলিয়ে দেখতে মন্দ নয়। সঞ্চয় অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরালো। মনে পড়লো বিকেলবেলার কথা। মেয়েটির বাবার সঙ্গে বড়ো মামা যখন আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই হলো আমার ভাগ্নে সঞ্চয। দিল্লিতে থাকে। সেলস্ ইঞ্জিনিয়ার। বড়ো মামার কথা শুনে মেয়েটি তখন কেমন যেন মিটমিট কবে হাসছিল। সঞ্চয়েব ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। কথার বিনিময় না-হতেই অতো হাসবার কি হয়েছিল? মেয়েটা পায়ে পায়ে বারান্দা ছেড়ে ঘবে এলো। শান্ত হেসে জিজ্ঞেস কবলো, শুয়ে আছেন যে?

এমনিই। সঞ্চয় উঠে বসে ভদ্রতা কবলো।

আমি ভাবলাম বুঝি-বা শবীর খারাপ হয়েছে।

না-না, সে-রকম কিছু নয়।

দিল্লিতে কোথায় থাকেন? মেয়েটির আসল উদ্দেশ্য এবাবে বোঝা গেল। এতোক্ষণ শোওয়া, শবীর খাবাপেব যে-সমস্ত কথা বলছিল নিতান্তই তা ভূমিকামাত্র। মেয়েটি এমনভাবে সঞ্চয়কে জিজ্ঞেস কবলো, যেন দিল্লি শহবটা তাব কাছে খুবই পরিচিত। অন্তত ওর কথার সুরে সেই রকমেরই একটা আভাস ছিল। সঞ্চয় তাই উঠে ওকেই প্রশ্ন করলো, আপনি দিল্লিতে গেছেন? ওই প্রশ্নেব মধ্যেই সঞ্চয় যেন ওকে বোঝাতে চাইলো, তুমি তো দিল্লি থেকে দূরে থাক—দীঘাও যাওনি। সুতরাং আমি ওখানকার কোন এলাকায় থাকি, তাব নাম বললেই কী তুমি চিনবে?

আমি তো ওখানেই থাকি। মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

ওখানে থাকেন বলতে' বিস্ময় জাগলো সঞ্চযেব।

মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। থাকি হোস্টেলে।

ও। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো সঞ্চয়েব। বললো, তাই বলুন—ছোট্ট মেয়ের চুষে চুষে লজেন্স খাওযাব মতো মেয়েটি সঞ্চয়কে দেখতে থাকে। বললো, আপনি কোথায় থাকেন তা কিন্তু এখনও বলেননি।

ভুলে গিয়েছিলাম—সঞ্চয় একটু হেসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বললো, হাউজখাসে।

কবে ফিরছেন দিল্লিতে?

এই শুক্রবারে রওনা দেবো।

আমি বওনা দিচ্ছি শনিবার। আপনি একটা দিন থেকে যান না—একসঙ্গে তাহলে যাওয়া যাবে। মেয়েটি সমর্থন পাবার আশায সঞ্চয়েব মুখের দিকে চেযেই রইলো।

অসুবিধা আছে। সঞ্চয় ম্লান হাসলো। যেন একসঙ্গে যেতে না-পারার জন্য তাব কষ্টেব সীমা নেই।

একটা দিন তো?

ছুটি স্যাংশন নেই। নইলে একসঙ্গে গেলে তো বেশ গল্প করতে কবতে যাওয়া যেতো। পিণাক দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। সঞ্চয় ওকে ডাকলো ভিতরে এসো। পরে পিণাকেব সঙ্গে পবিচয় করিয়ে দেবার সময়ে বললো, আপনাব নামটা কিন্তু এখনও আমার অজানা।

রাখী বসু। মেয়েটি সারা মুখে হাসি ছড়ালো। বারান্দায় দূরের কোণে ওর বাবাকে দেখতে পেয়ে, আসছি বলে চলে গেল। পিণাক তাকালো সঞ্চয়ের দিকে। চোখে চোখেই দেখলো কিছুক্ষণ। পবে সঞ্চয়ের পাশ দিয়ে শুয়ে পডলো। জিজ্ঞেস করলো, আমদানি হলো কোথা থেকে?

বড়ো মামার বন্ধুর মেয়ে।

অ! তা উনি কোথায় যেতে চাইছিলেন—

দিল্লি।

সে কি! পিণাক চাপা হেসে জানতে চাইলো, গৃহিণী হয়ে নাকি?

মাথা খারাপ! সঞ্চয় কথাটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য আবও ভেঙে বললো, ও ওখানেই থাকে। মেডিকেল কলেজে পড়ে।

বলো কি? নাটক তো তাহলে এখানেই জমছে। রাখী আবার ফিরে এলো এ-ঘরে। সঞ্চয় ও পিণাক বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। রাখী গল্প করাব ভঙ্গিতে বললো, যাই বলুন, কলকাতায় কিন্তু তেমন শীত নেই। অথচ দিল্লির ঠান্ডাব কথা চিন্তা করলে গায়ে কাঁটা দেয়। তবে শীতের রেকর্ড গেছে গতবারে। আপনি ছিলেন তখন?

হ্যাঁ। সঞ্চয় জানালো। ওই শীতের মধ্যে আবার ভোররাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব দেখতে। সঙ্গে আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি। সেই ঠান্ডার কথা চিরদিন মনে থাকবে। দিল্লির আবহাওয়াও বিচিত্র। শীতেব সময়েও বর্ষার মতো বৃষ্টি ভেঙে নামবে। রাখীর বাবা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়ের উদ্দেশে বললেন, পি. কে. গুহ বোডে আমাদেব একজন আত্মীয় থাকেন। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হযনি। চলো একটু দেখা কবে আসি। খুব খুশি হবে। রাখীব ইচ্ছা ছিল না যাবাব। অন্তত উঠবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ না-কবাতে সঞ্চযের সে-কথাই মনে হলো। বাবাব দিকে একবার তাকিয়ে চোখ মেললো সঞ্চয়ের দিকে। চোখে চোখেই সে হাসলো। ভাবটা যেন, কী করি বলুন তো? বাবা এমন ভাবে বলছেন যে, না-গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু যেতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তবুও ক্ষীণ হেসে বললো, আচ্ছা, আমি আসছি—

একটু বাদেই এলো ননীমামা। তখনও ফুলেব মালাটা গলায় দুলছে। ঘবে ঢুকেই প্রথমে মালাটা খুলে কোণের টেবিলের ওপবে রেখে দিল। তাবপরে খুললো পাঞ্জাবিটা। পিণাক বললো, আচাব-অনুষ্ঠান কী সব শেষ করে এলে?

হ্যাঁ। ননীমামা পবিত্রাণের হাসি হাসলো। এদিকে আমিও শেষ। তোবা একটু সরে বোস— আমাকে শুতে দে। ননীমামা সঞ্চয়ের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে জানালো, নামেই বিয়ে বুঝলে ভাগ্নে, আসলে ঝামেলার চূড়ান্ত।

তা ঝামেলা না-পোযালে বৌ পাবে কেমন করে? বিয়েটাই তো ঝামেলার।

বটে! ননীমামা সামান্য একটু হেসে পবে আবাব জিজ্ঞেস করলো, নতুন মামিকে পছন্দ হলো?

ওই প্রশ্নটা তো আমিই তোমাকে করতে যাচ্ছিলাম—সঞ্চয় তার কথা শেষ করলো না। ভাগ্নের কাছে কোনও লজ্জা নয়। তারপরে আবার মামা-ভাগ্নে যদি প্রায় সমান সমান হয়, সুতরাং বলে ফেলো—

বৌ সুন্দরী হয়েছে—কথাটা আমিই তোমার মুখ থেকে শুনবো বলে মনে করেছি, তা নয়। তুমিই আমাকে বেঁধে দিলে। ভাগ্নের সঙ্গে চালাকিতে আর পারা যাবে না।

নতুন বৌ-এর সঙ্গে তার দুজন খুড়তুতো বোন এসেছে। তারাও ছোট ঘরে এলো। যেহেতু তাদের জামাইবাবু রয়েছে, সেই কারণেই। ননীমামা তাদের সঙ্গে পিণাক ও সঞ্চয়ের আলাপ কবিয়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পিণাক, সঞ্চয় দুজনেই। একবার রান্নাঘর, একবার বড়ো ঘর কবছেন বড়ো মামিমা। সবিতা ও লক্ষ্মীব নাম ধরে কয়েকবার ডাকাডাকিও করলেন।

বড়দি কী খুব ব্যস্ত আছো? পিণাক জিজ্ঞেস করলো।

কেন? বড়ো মামিমা শাড়ির আঁচল দিয়ে একটি প্লেট পরিষ্কার করতে করতে উত্তর দিলেন।

যে-ভাবে চিৎকার করছো আর ছোটাছুটি করছো........

তুই আর জ্বালাস না পিকু, নতুন বৌ-এর সঙ্গে ওর দুটি বোন এসেছে। জানিস, এখনও পর্যন্ত তাদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি! এরপরে তো ভাত খাবার সময় হয়ে যাবে।

সেটাই তো ভালো। পিণাক হাসতে হাসতে উত্তব দিল, দু'বার না-দিয়ে একবার খেতে দিবি।

তুই যা তো এখান থেকে। কথা বাড়াস না। বড়ো মামিমা সঞ্চয়ের শরণাপন্ন হলেন। পিকুকে তুমি নিয়ে যাও তো।

রাত্রে অন্য সকলে ভাত খেলেও সঞ্চয় আপত্তি জানালো। রাত্রে সে ভাত খায় না। দিল্লিতে গিয়ে রাত্রে রুটি খাওয়ার অভ্যেসটা করেছে। অবশ্য সঞ্চয় আগে থেকে কিছুই জানায়নি। সে-কারণে বাড়ির কেউই রুটি করেনি। আসলে সে-খেয়ালও ছিল না। দিদিমা সহজ বিচার করলেন। রুটির চেয়ে ভাত ভালো। তুই ভাত খাবি না কেন?

ভালো-মন্দ বুঝি না দিদিমা। রাত্রে ভাত খেতে পারি না। সবিতা আর বড়ো মামিমা সকলকে খেতে দিচ্ছিলেন। বারান্দার দু'সারিতে প্রায় জনা পনেরো একসঙ্গে খেতে বসেছে। রান্নাঘরের দরজার পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মীনাক্ষী। সবিতা ওকে এবেলা কাজ করতে দেয়নি। বলেছে, দুপুরে তুই সকলকে খেতে দিয়েছিস, এবেলা বৌদির সঙ্গে আমি কাজ করবো। সঞ্চয়ের কথা শুনে সবিতা উত্তর দিল, একটা দিন না-হয় ভাতই খেলে। ভাত পেলে কেউ আবার রুটি খেতে চায় নাকি? আমি তো পারি না।

আমার রুটি চাই।

দিল্লিতে গিয়ে তুই একেবারে রুটির দেশের লোক হয়ে গেছিস। দিদিমা পরমস্নেহে নাতির দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, তোর যা ভালো লাগে তুই তাই কর—কথাটা শেষ করেই তিনি রান্নঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মুখ বাড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকে দেখতে না-পেয়ে বললেন, লক্ষ্মীটা আবার গেল কোথায়?

রান্নার জন্য যে সব বাসনপত্র এসেছে, সে-গুলিই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে, সবিতা একটি থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে উত্তর দিল। মীনাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে দেখে দিদিমা এবারে ওকেই বললেন, তুই এক কাজ কর মা। আমার সঞ্চয়ের জন্য দুটো রুটি করে দে— ছেলেটা রাত্রে আবার ভাত খেতে পারে না। সদা হাসিখুশি মেয়েটা নীরবে সম্মতি জানালো। বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে সঞ্চয় ওকে লক্ষ্য করছিল। সময় নষ্ট না-করে মীনাক্ষী আটা মাখতে বসে গেল। আটা মাখবার সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহটা দুলে উঠছে। সমুদ্রের জলে বাতাসে ঢেউ লাগার মতো দুলছে। কেন যেন ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠলো সঞ্চয়ের। ওকে তার ভালো লেগেছে। নীরবে ভালোবেসেছে বলেই কী এই কৃতজ্ঞতা জেগেছে? মীনাক্ষী তার জন্য রুটি তৈরি করছে। এই কথাটা ভাবতে সঞ্চয়ের ভারী ভালো লাগছে। তবে খারাপ লাগছে এই কারণে যে, শেষ মুহূর্তে ওকে কষ্ট করতে হচ্ছে দেখে। আটা মাখা, রুটি বেলা, তৈরি করা কম ঝামেলার নয়। তবুও এই ঝামেলাকেই হাসিমুখে মেনে নিয়েছে মীনাক্ষী। এ-কারণেই কৃতজ্ঞতা জাগছে। কিন্তু রাখী রুটি তৈরি করলে কী এই কৃতজ্ঞতাটুকু মনেতে স্থান পেতো? না। সঞ্চয় তার নিজের মনেই উত্তর খুঁজে পায়। অন্য কোনও মেয়ে তার জন্য এই কষ্টটুকু করলে সঞ্চয়ের মনে এতোটুকু রেখাপাত করতো না। কাজটি করণীয় বলেই ওটাকে অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ধরা হতো। সঞ্চয় পিকুর দিকে তাকালো। পিকু খেতে বসেছে। প্রথমে অবশ্য সে বসতে চায়নি। বলেছিল, আমি সঞ্চয়ের সঙ্গে-ই একসঙ্গে খেতে বসবো। সঞ্চয়-ই ওকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলেছে, তুমি শুধু শুধু অপেক্ষা করবে কেন? তুমি তো রুটি খাবে না—

তা না খেলেই-বা! পিকুর সহজ উত্তর, তোমার জন্য তো অপেক্ষা করতে হবেই।

সেটা খাওয়ার পরে করলেও চলবে। সঞ্চয়ের ওই কথার পর পিকু আর কোনও আপত্তি করেনি।

সঞ্চয়কে খেতে দিলেন বড়ো মামিমা। ওর তৃপ্তিসহকারে রুটি খাওয়া দেখে বললেন, এর সঙ্গে যদি একটু আমের বা লেবুর আচার হতো তাহলে বোধহয় ভাগ্নের খাওয়াটা ভালোই হতো, তাই না?

দারুণ! তবে ও-কথা শুনিয়ে আর লোভ দেখিয়ো না মামিমা। তোমার মাংস-ভাতের চেয়ে ওই খাবারই আমার প্রিয়। সঞ্চয়ের থালার রুটি শেষ হয়ে এসেছে দেখে সবিতা বলে উঠলো, হিন্দুস্তানীটাকে রুটি দাও—কথাটা বলেই সে হেসে উঠলো। সঞ্চয় মৃদু হেসে উত্তর দিল, ঠাট্টা করছিস?

করবো না? এমন কী রুটি প্রিয় হয়ে গেছো যে একটি রাতের জন্যও তুমি ভাত খেতে পারো না? সঞ্চয় ও-কথার কোনও উত্তর দিল না। শুধু হাসতে লাগলো সবিতার দিকে চেয়ে। সঞ্চয়ের আর কি লাগবে-না-লাগবে ইত্যাদি সব জেনে নিয়ে নিজের কাজ সারলেন বড়ো মামিমা। এবারে তাকে ছুটতে হবে শোবার ব্যবস্থা করতে। গতকালের চেয়ে আজকে অতিথির সংখ্যা বেশি। যাবার সময়ে সঞ্চয়কে বলে গেলেন, ভাগ্নে! ওদিককার কাজ সারতে চললাম। সবিতা এখানে রইলো। যা লাগবে চেয়ে নিয়ো।

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি কি নিমন্ত্রিত অতিথি নাকি যে, বারবার তুমি অমন করে বলছো?

নীরবে খেয়ে চলেছে সঞ্চয়। তার পাশেই সবিতা। ধারে-কাছে পিকু নেই। খুব সম্ভব বাইরে গেছে। নয়তো ছাদে। খাওয়ার পর সিগারেটের সুখ করতে। মীনাক্ষী রান্নাঘরেই আছে। সঞ্চয় নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলো, তোর বন্ধু কী এখনও রুটি বানাচ্ছে?

না-বানিয়ে উপায় কি বলো? আমি নিজে এবেলা বৌদির সঙ্গে হাত লাগিয়ে সকলকে খেতে দিলাম, শুধুমাত্র ওকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। তা ভালো বিশ্রামই হলো ওর। রুটি না-খেলেই তোমার চলছিল না—একটু চুপ করে থেকে সবিতা আরও যোগ করলো, এমনিতে ওকে কাজ করতে দেখলো তোমার কষ্ট হয়। এইবেলা হয় না বুঝি?

না। অনাবিল হাসলো সঞ্চয়।

কেন?

আমার জন্য পরিশ্রম করলে ওর এতোটুকু কষ্ট হয় না।

ও! তুমি সেটা আগে থেকে জেনেই নিশ্চিত হয়ে আছো!

রান্নাঘর থেকে কাজ সেরে বেরিয়ে এলো মীনাক্ষী। সবিতার পাশে এসে দাঁড়ালো। টেবিলের পাশে আরও তিন-চারটি চেয়ার খালি পড়ে ছিল। মীনাক্ষী তারই একটিতে ঝুপ করে বসে পড়লো। সবিতা বললো, তুই বসে যা, আমি তোর খাবার এনে দিচ্ছি।

তুই আমি একসঙ্গে-ই খাবো।

তুই খেয়ে নে, আমি খাবো না। একেবারেই খিদে নেই। সবিতা উঠে গেল ওখান থেকে। সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গেই মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো।. বললো, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম তো?

এতে কষ্টের কি আছে! ম্লান হাসলো মীনাক্ষী। এ তো অনেক হালকা কাজ।

আপনার বন্ধু কিন্তু তখন থেকে আমাকে দোষারোপ করছে। একটা রাত চোখ বুজেও কি দুটি ভাত খাওয়া যায় না? এতোরাত্রে রুটি না-বানালেই তোমার চলছিল না—শুধু শুধু একজনকে পরিশ্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। ও এসেছে বেড়াতে। তা নয়, ওকে দিয়েই হাজারো কাজ করানো চাই। ব্যাপারটা হচ্ছেও তাই। সঞ্চয় থামলো একটু। তারপরে ম্লান সুরে বললো, এরপরে কিন্তু খেতে আমার ভারী খারাপ লাগছে।

এ আপনি কি বলছেন? সবিতার কথায় কি কিছু ধরতে আছে, না-মনে করে মন খারাপ করতে আছে? ও ঠাট্টা করে বলেছে আর আপনিও সেই নিয়ে ভেবে চলেছেন।

মীনাক্ষীর খাবার নিয়ে আসছিল সবিতা। শেষের কথাটা অবশ্যই তার কানে গেল। তাই প্রশ্ন করলো, কে ভেবে চলেছে?

কেউ না। মীনাক্ষী খাবারের থালাটা কাছে টেনে নিল। পরে প্রশ্ন করলো, তুই সঞ্চয়বাবুকে কি বলেছিস? প্রশ্ন শুনে সবিতা বন্ধুর দিকে তাকালো। পরে সঞ্চয়ের পাশের চেয়ারে বসে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

ইতিমধ্যে নালিশ করাও হয়ে গেছে? তারপরেই তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। কি নালিশ করলো রে, যে আমি আসতে-না-আসতেই তুইও আমাকে আক্রমণ করে বসলি? এরপরে দেখছি সঞ্চয়কে আর কিছু বলা যাবে না। তার আগেই তুই কথা শুনিয়ে দিবি।

অন্যায় ভাবে বললে আমি কথা শোনাবো। আমি কারো পক্ষ হয়ে কথা বলবো না।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তুই সঞ্চয়ের পক্ষে কথা বলছিস।

তাহলে সেটাই বুঝেনে, মীনাক্ষী একটু হেসে যোগ করলো, তুই আজকাল বড্ড বেশি বুঝতে শিখেছিস।

পিকু সিগারেট খাচ্ছিলো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ হতেই বাড়ির ভিতরে এলো। তখনও ওদের খাওয়া শেষ হয়নি। পিকু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। বললো, তাই তো ভাবি দুটো রুটি খেতে এতো সময় লাগে কেমন করে? মীনাক্ষীদেবী যে মুখোমুখি বসে আসর জমিয়ে রেখেছেন, তা জানবো কেমন করে? এমনভাবে বসে গল্পে মেতে উঠতে বেশ লাগে কিন্তু। তা সঞ্চয়বাবু এই জন্যই কী আমাকে জোর করে আগে আগে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে?

অনেকটা তাই। সঞ্চয় পরাজয় স্বীকার করলো না। তুমি ঠিকই ধরেছো। সঞ্চয়ের উত্তরটা লাজুকতা দিয়ে জড়ানো ছিল না। ছিল না কোনও আড়ষ্ঠতা। অত্যন্ত স্বাভাবিক চটুল সুরে উত্তর দিতেই মীনাক্ষী যেন মজা পেল। বললো, কেমন পিকুদা! জব্দ হয়েছো তো?

বটে! দুজনে খুব জোট বাঁধা হয়েছে। তা পিকুদাকে জব্দ করতেই এই জোট বাঁধা না সত্যি সত্যিই দুজনেব জোটের প্রয়োজন আছে— সেটা তো বুঝতে পারলাম না। পিকু সরস মন্তব্য করে নিজের উত্তরে নিজেই খুশি হয়ে হাসতে লাগলো। মীনাক্ষী যে এ-কথায় লজ্জা পেল না, তা নয়— লজ্জার আবীর লাগলো তার সারা মুখে। আবীরের রঙে রাঙা হলো মীনাক্ষী। একপলকের জন্য সঞ্চয়ের দিকে তাকালো। দৃষ্টি নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গেই। মুহূর্তে একটি অখন্ড নীরবতা নেমে এলো ওদের মধ্যে। এই নীরবতা ভালো লাগছে না মীনাক্ষীর। এই নীরবতার অর্থ প্রত্যেকেই নিজের নিজেব একমনে কিছু একটা ভাববার সুযোগ পাচ্ছে। কে কি ভেবে চলেছে কে জানে? পিকুদা হয়তো এরপরেও সরস মন্তব্য করবে। মাথায় তো সাবাক্ষণই দুষ্টবুদ্ধি জমা হচ্ছে। যা কিছু বলে, কোনওরকম ভেবে-চিন্তে বলে নাকি? যখন যেটা মনে আসছে, তাই বলেই মুক্ত হয়। পিকুদার মনে কোনও আবিলতা নেই। নেই কোনও জড়তা। যার ফলে সে অতো সহজ ভাবে চপল আলাপ করতে পারে। কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যায় মীনাক্ষীব। ওর নীরব ভাবটুকু লক্ষ্য করে সবিতা বললো, কি রে চুপ করে রইলি কেন? সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষী চোখ পাকিয়ে তাকালো। খোঁচাটুকু যদিও বন্ধুর কাছ থেকেই পেল, তবুও ওর উপব রাগ করলো না মীনাক্ষী। কেন-না সবিতার ওই প্রশ্ন তো আকস্মিক নয়। পিকুদাই সেই ক্ষেত্রটা তৈরি করে দিয়েছে। তাই সলজ্জ ভাবে বললো, দেখ না! পিকুদাটা বড্ড আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

আমি না-হয বাজে বলছি, পিকু অমায়িক হাসলো। যে ভালো ভালো কথা বলে, মিষ্টি কথা বলে, মীনাক্ষী সহজেই অনুমান করতে পারলো পিকুব কথার সুর কোন দিকে গতি নেবে। কোন দিকে ঢলে পড়বে তা তার অজানা নয়। সুতরাং আর একবার লজ্জার সাগরে তাকে ডুবতে হবে। তারচেয়ে পিকুদাকে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া ঠিক হবে। তাই করলো মীনাক্ষী। পিকুর কথা শেষ না-হতেই বলে উঠলো, প্লিজ পিকুদা! আর জ্বালাতন কোবো না। অনুনয়ের সুর মীনাক্ষীর কণ্ঠে। চুপ হয়ে যাবার ভঙ্গিমায় সামান্য একটু হাসলো পিকু। ওই হাসির মধ্য দিয়েই যেন বলতে চাইলো, বেশ! তুমি যখন অতো করে বলছো, আমি চুপ করছি। পিকুকে চুপ করে যেতে দেখে, তার উপর মৃদু শাসন করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না সঞ্চয়। অর্থাৎ পিকু যখন শান্ত হয়েছে, তখন এই তো সুযোগ। যাহোক কিছু একটা বলতে হলে এই হলো চরম সময়। অন্য সময়ে পিকুর মুখে কথার বন্যা নামে। তখন ওর সামনে দাঁড়ানোই মুশকিল। সরস কথার মন্তব্যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। সঞ্চয় তাই বললো, সত্যি! পিকুটার জ্বালাতন করার স্বভাব আর গেল না, শেষ পর্যন্ত একটা বাজে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে না-যায়! সময় নেই, অসময় নেই, সুযোগ পেলেই.........

মীনাক্ষী! বিচার চাওয়ার ভঙ্গিতে পিকু বলে উঠলো, আমি না-হয় জ্বালাতন করি। কিন্তু আমাকে যদি এমনভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তী অধ্যায়টা কি হবে বুঝতেই পারছো। তোমার কথা শুনে আমি তো চুপ করেই ছিলাম। সঞ্চয় আবার মধ্য থেকে হঠাৎ আমাকে এমন বিশ্রী

ভাবে আক্রমণ করলো কেন? পিকু এমনভাবে অভিযোগ জানালো যেন সঞ্চয়ের ভালো-মন্দ বুঝবার, ওকে ঠিকপথে চালিত করবার দায়িত্ব মীনাক্ষীরই। সুতরাং সঞ্চয়ের অপরাধের জন্য ওকে সরাসরি না-বলে মীনাক্ষীকে বললেই কাজ হবে। তাতেই সুফল পাওয়া যাবে। কার্যত হলোও তাই। সে বললো, পিকুদা তো চুপ করেই ছিল। আপনি আবার ও-সব বলতে গেলেন কেন? মীনাক্ষীর শাসনটুকু উপলব্ধি করে পিকু নীরবে সবিতার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওই হাসিটুকুর মধ্যেই যেন বলতে চাইলো, দেখেছিস! সঞ্চয়কে শাসন করার ভাবটুকু ও কেমন নিয়ে নিয়েছে।

বেশ তো! এবারে না-হয় আমার দোষ হয়েছে, সঞ্চয় স্বীকার করতে এতোটুকু দ্বিধা করলো না। কিন্তু পিকু যে........

আর কথা বাড়াবেন না। একেবারেই না, মীনাক্ষী নিজের আধিপত্য বিস্তার করে বললো, তাহলেই কথা বাড়বে। হাসির ফুলঝুরি ছোটালো পিকু। বললো, যাক— সঞ্চয়কে তাহলে একটি জায়গায় পর্যস্ত করা যাবে। সেখানকার শাসন সঞ্চয়ের কাছে বেদবাক্যের মতোন। শুনতেই হবে। মানতেই হবে।

পাশের বাড়ির একটি ঘরেতেই পিকু ও সঞ্চয়ের শোবার ব্যবস্থা হলো। কেন-না আজকে অতিথির সংখ্যা এমনিতেই বেশি। তায় আবার বেশি সংখ্যকই মহিলা। সুতরাং তাদের তো অন্য বাড়িতে পাঠানো যায় না। ঘরের লোকেরাই পাশের বাড়িতে শোবার আয়োজন করছে। পাশের বাড়িটা হলো খুকুদের। সবিতারই সমবয়েসী। ঠিক হলো সবিতা ও মীনাক্ষী ওদের বাড়ির একটি ঘরে শোবে। অপর ঘরেতে শোবে সঞ্চয় ও পিকু। অর্থাৎ খুকুরা মোট দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত মেলাতে। সঞ্চয়দের যে-ঘরে শোবার ব্যবস্থা হলো সেই ঘরে কয়েকটি চেয়ার ও শূন্য একটি চৌকি ছাড়া আর কিছুই নেই। পিকু একটি চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, হাঁ রে সবিতা, আমাদের কী সারা রাত এই মরা চৌকির উপরেই শুতে হবে? সেখানেও যে বিছানা থাকে।

আস্তে পিকুদা! আস্তে!! শুনতে পাবে যে---ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো সবিতা। শীতের দিনে কটা লোকের বাড়িতে অতিরিক্ত হাজার গন্ডা লেপ-তোষক থাকে যে তোমার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেবে? শোবার জন্য দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছে, এই তো যথেষ্ট।

সেজন্য... ....পিকুকে শেষ করতে দিল না সবিতা। সিগারেট খাচ্ছো সিগারেট খাও--- কোথা দিয়ে কি-হবে-না-হবে, সে আমরা বুঝবো। আগে থেকেই না জেনে শুনে হইচই করে লাফিয়ে উঠছো। খুকু, মীনাক্ষীর হাতে বিছানাপত্র সব পাঠিয়ে দিচ্ছে। সবিতার শেষের কথায় আশ্বস্ত হলো পিকু। বললো, এ-কথাটা প্রথমে বললেই ঝামেলা মিটে যেতো, একেবারে শেষ মুহূর্তে বলার প্রয়োজন কি ছিল?

তোমারও বোঝা উচিত ছিল, শুধুমাত্র একটি চৌকির উপরে এই শীতের দিনে কোনও মানুষ ঘুমাতে পারে না। ব্যবস্থা একটা হতোই। না-মরেই যে ভূত হচ্ছো—

তা অতোশত রাগবার কি আছে? মাথা গরম করিস না— নে, একটা সিগারেট খা।

ফের প্রলাপ বকছো? বকতে গিয়েও গম্ভীর থাকতে পারলো না সবিতা। হেসে দিল। পিকুদাকে নিয়ে সত্যিই যন্ত্রণার একশেষ। দুটো বালিশ, একটি চাদর ও পাতলা একটি তোষক নিয়ে ঘরে এলো মীনাক্ষী। শূন্য চৌকির উপর ও-গুলি রেখে দিয়ে বন্ধুর উদ্দেশে বললো, তুই বসে আছিস কেন? লেপ আর মশারিটা নিয়ে আয় না। সবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সঞ্চয়। চৌকির উপর থেকে বালিশ আর চাদরটা তুলে চেয়ারের উপরে রাখলো। তোষকটা মেলে ধরতেই মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, আপনি কি করছেন?

বিছানা করবো।

ওটা আপনাদের কাজ নয়। চুপচাপ চেয়ারটাতে গিয়ে বসুন। আমি বিছানা করছি।

আমাদের জন্য আপনার কষ্টের সীমা নেই। সারাক্ষণ কাজের মধ্যেই আটকা রইলেন। আপনি না-থাকলে......পিকু বাধা দিয়ে বলে উঠলো, একটা কথা সঞ্চয় না-বলে থাকতে পারছি না, ওই 'আমাদের' কথাটা বাদ দিতে হবে। কেন-না মীনাক্ষী আমার জন্য আটাও মাখেনি, রুটি বেলতেও

বসেনি। সুতরাং সত্যিই যদি ওর কোনও কষ্ট হয়ে থাকে তা তোমারই জন্য।

তোমার কথায় বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাচ্ছি না। সঞ্চয় কি যেন ভাবলো। মনের মধ্যে কথাগুলিকে বোধহয় পরপর সাজিয়ে নিল। পরে মীনাক্ষীর কথা মতো চেয়ারে বসে বললো, হ্যাঁ যা বলছিলাম—আপনাকে সারাক্ষণ কাজের মধ্যেই দেখলাম। কোথায় একটু বিশ্রাম নেবেন, বসবেন, গল্প করবেন—তা নয়। এতো কাজ করতে আপনার ভালো লাগে?

সঞ্চয় কিন্তু এবারে ঠিক বলেছে। চাপা হেসে পিকু উত্তর দিল, দুজনে মুখোমুখি বসবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। ঘন্টার-পর-ঘন্টা কাটিয়ে দেবে, তবেই না বিশ্রাম। এতো কাজ করতে মাথার দিব্যিটা কে দিয়েছে শুনি? পিকু থামলো একটু। দুজনের মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখে নিয়ে আবার বললো, এখন তো অফুরন্ত সময়। মাঝরাত-সারারাত পর্যন্ত করো না গল্প। বারণ করেছে কে? আশে-পাশে কেউ নেই। বিয়ে বাড়ির ঝামেলার ঢেউ এই ঘরে এসে আছড়ে পড়বে না, না-ঘুমিয়ে যদি একটু বেশি সময় নিয়ে গল্প করা যায়, তাহলে ও-বাড়ি থেকেও কেউ ছুটে এসে বলে যাবে না, "এই! গল্প করিস না! কালকে আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। ঘুমিয়ে পড়।" মীনাক্ষী ভাবলো, এই পরিবেশে পিকুদা যদি এমন আলগা হয় তাহলে ওকে কথার বাঁধনে বাঁধা যাবে না। এই ধরনের ফাজলামো সে করবেই। কিন্তু চুপ করে থাকলেও পিকুদা আরও পেয়ে বসবে। তাই সমানে সমানে উত্তর দিতে হবে। তাই দিল সে। হাসতে হাসতেই বললো, তোমার সামনে গল্প করবো নাকি? সে-নির্জনতা কোথায়?

বটে! আমি থাকলে সুবিধে হচ্ছে না—তাই তাড়াতে চাইছো। পিকু হেসে ফেললো। তাকালো বন্ধুর দিকে। হাসিমুখ নিয়েই জিজ্ঞেস করলো, কি সঞ্চয়জি! তোমারও সেই মত নাকি? সঞ্চয় এক ফাঁকে মীনাক্ষীর মুখের ওপর তড়িৎগতিতে চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে বললো, গেলে তো ভালোই হয়! কিন্তু যাবেটা কোথায়?

মশারি আর লেপ নিয়ে সবিতা ঘরে এলো। বিছানা পাতা আগেই হয়ে গেছে। তার উপরেই ও-গুলি রেখে দিল। চারদিকের দেওয়ালের ওপর একবার দৃষ্টি বোলালো। অর্থাৎ পেরেক পোঁতা আছে কিনা সেটাই দেখে নিল। কেন-না মশারি টাঙাতে হবে। একদিকের দু'পাশে দুটি পেরেক পোঁতা আছে। অন্যদিকে নেই। না-থাকলেও চলবে। সেদিকে জানলা রয়েছে। জানলার শিকের সঙ্গে দড়ি টাঙাতে হবে। মশারি টাঙিয়ে দিয়ে সবিতা একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, নাও, দুটিতে শুয়ে পড়ো এবারে। চল মীনাক্ষী।

কাকে বলছিস? এ-ঘর ছেড়ে নড়বার এতোটুকু ইচ্ছা ওর নেই। পিকু এই সুযোগে তার নালিশ জানালো। একটু আগেই দুজনে আমাকে এ-ঘর থেকে তাড়াতে চাইছিল। মীনাক্ষী তো পরিষ্কার বলেছে, তুমি থাকলে অসুবিধা হয়। নির্জনতা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সঞ্চয় বলে উঠলো, ও-সব কথা থাক, কাল থেকে কিন্তু আপনি একেবারেই কাজে হাত দিতে পারবেন না। কথা শুনে সবিতা সরাসরি আক্রমণ করলো, তবে কী তোমার সঙ্গে গল্প করবে?

হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে তাই করবে। সঞ্চয় স্পষ্ট উত্তর দিল।

বিয়ে বাড়িতে নির্জনতা পাবে কোথায়?

কোথাও খুঁজে নেবো।

কিরে? তোদের মধ্যে এতো বোঝাবুঝি কখন হলো? সবিতা, মীনাক্ষীর মুখ থেকেই কিছু শুনতে চাইলো। মীনাক্ষী সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অন্য কথা শোনালো, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

এরই মধ্যে? সবিতা অর্থপূর্ণ টিপ্পনী কাটলো।

ঘুমের দোষ কি? সারাদিন পরিশ্রম করলে ঘুম তো পাবেই। মীনাক্ষীর হয়ে সঞ্চয় কথাটা না-বলে পারলো না। সন্ধেবেলাতেই যে আপনার ঘুম পায়নি এই তো যথেষ্ট! সবিতা তার সঞ্চয়মামার দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ ওকে লক্ষ্য করে পরে বললো, তুমি কী ওকে শো-কেসে সাজিয়ে রাখতে চাও নাকি? ওখানেই নয়—সবিতা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললো, তোমাদের দুজনের মনের যা অবস্থা, যা ইচ্ছা, তাই যদি পূর্ণ হয়, বেঁচে থাকলে দেখবো কটা চাকর-বাকর রেখে তুমি ওকে

সুখের রাজেন্দ্রাণী করে রেখেছো? সবিতার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ না-বোঝার মতো নয়। বুঝলো মীনাক্ষীও। আব বুঝেছে বলেই দারুণ লজ্জা লাগছে। তবুও যাহোক সবিতা কথার আলঙ্কারিক শব্দ সাজিয়ে রেখে-ঢেকে বলেছে। পিকুদা হলে তার স্বভাবসুলভ ভাষায় আক্রমণ করতো। অতো যে বড়ো বড়ো বাত্ ছাড়ছো, বিয়ের পর কতো সুখে রাখো সেটা চ্যালেঞ্জ করে আমাদের একবার দেখিয়ে দাও না? পিকুদার কথা তো এমনি ধরণেরই। মীনাক্ষী আর দাঁড়ালো না। ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময়ে শুধু কোনওরকমে উচ্চারণ করলো, আমি ঘুমাতে গেলাম। সঞ্চয় ডাকলো, শুনুন— মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে ফিরে এলে সঞ্চয় বললো, পৌনে এগারোটা বাজে মাত্র! না-হয় আজকে একটু দেরিতেই ঘুমালেন। এই যে সকলে মিলে গল্প করছি, একসঙ্গে রয়েছি, কতো আনন্দ বলুন তো! এই দিনগুলি কি আর কখনও, কোনোদিনও ফিরে পাবো? তখন দেখবেন এই মুহূর্তগুলির কথাই বড়বেশি করে মনে পড়বে। খুকু দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। শোবার জন্য সবিতা ও মীনাক্ষীকে ডাকলো। সে চলে যেতেই পিকু টিপ্পনী কাটলো, এটাও কী বেশি কবে মনে পড়বে?

হ্যাঁ মনে পড়বে। সঞ্চয় গল্পের মতো বললো, একটি রাক্ষুসী এসে দুই রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রাজকন্যারা বলেছিল, আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যেয়ো না, রাজপুত্রদের সঙ্গে আমাদের যে অনেক কথা বলার আছে। আমরা যে অনেকদূর থেকে এসেছি রাজপুত্রদের মনের কথা খুলে বলতে, কিন্তু রাক্ষুসী তা শুনলো না। খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সবিতা। মীনাক্ষীকে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললো, এক রাজকন্যা অবশ্য থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু অপর রাজকন্যাটি তাকেও ধরে নিয়ে গেল।

সকাল সাতটা থেকে নটা অর্থাৎ এই দু'ঘন্টার মধ্যে মীনাক্ষী খুব কম করেও পঞ্চাশ কাপ চা করেছে। কিন্তু সঞ্চয়ের হাতে একটি কাপও তুলে দিতে পারলো না। দোষ অবশ্য তার নয়। আসলে সে সঞ্চয়কে খুঁজেই পাচ্ছে না। সারা বাড়ি খুঁজেছে, কোথাও নেই সে। কোথায় গেছে তাও জানে না। এ-নিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস কবাও যায় না। কেন-না যে সামনে নেই, নেই--- এলে পরে খাবে। সেজন্য অতো খোঁজাখুঁজি করার কি আছে? কিন্তু মীনাক্ষী ভাবছে অন্যকথা। গতকাল সঞ্চয়কে চা দিতে তার দেরি হওয়াতে ও রাগ করেছিল। তাতেই সে উত্তর দিয়েছিল, কাল থেকে চায়ের প্রথম কাপটি আপনিই পাবেন। সেখানে প্রথম তো নয়ই—পঞ্চাশ কাপের মধ্যেও সঞ্চয়ের ঠোঁট ভিজলো না। যদিও এখানে মীনাক্ষীর করবার কিছুই নেই, তবুও কেন জানি তার খারাপ লাগছে। পিকুদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য তার বন্ধুব একটা খোঁজ পাওয়া যায়, তবে তাকে খোঁচা দিয়ে সারাক্ষণ জ্বালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। ওই একই কারণে সবিতাকেও জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। হঠাৎ মীনাক্ষী নিজেব মনকেই প্রশ্ন করে বসলো। সঞ্চয় এসেছে তার মামার বাড়িতে। সেখানে সে চা খেলো-কি-খেলো তা নিযে তার নিজের এতো চিন্তা কেন? তবে কি সঞ্চয়েব দিকে সে ক্রমশ এগোতে শুরু করেছে? সবিতা আর পিকুদা তো সারাক্ষণ তাদের দুজনের পিছনে লেগে রয়েছে। তারই রং লেগেছে কি? মনে মনে হাসলো মীনাক্ষী। সঞ্চয় তার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছে পিকুদার কাছ থেকে। কৌতূহল প্রকাশ করেছে। আর ধরা পড়েছে মীনাক্ষীর চোখে। মীনাক্ষী লক্ষ্য কবেছে, সঞ্চয় প্রায়ই তার ধারে-কাছেই থাকতে চায়, থাকেও। কিন্তু আশ্চর্য! তাদের দুজনের সম্পর্কে পিকুদা আর সবিতা এতো ইঙ্গিতসূচক কথাবার্তা বলে, তা সত্ত্বেও তারা দুজনে কিন্তু দুজনের কাছে এখনও পরিষ্কার হতে পারেনি। সহজ হতে প্যারেনি। তাদের সম্বন্ধে ওরাই আলাপ-আলোচনা করে, গল্প তৈরি করে মাতিয়ে রাখে। অথচ তারা নিজেরা কিন্তু চুপ! প্রথম থেকেই দুজনের প্রতি দুজনের অনুরাগের ফলেই কি এই নীরব অধ্যায়ের সৃষ্টি? নয়তো সরাসরি এখনও তাদের মধ্যে সহজভাবে কথার ঢেউ নেমে আসেনি কেন? আলাপের সূত্র ধরে রাখবার জন্য এখনও তাদের প্রয়োজন হয় তৃতীয়জনের। গতকালই এমনটা হয়েছিল। পিকু, সঞ্চয় এবং সে একসঙ্গে বসে গল্প করছিল। কিছুক্ষণ বাদে পিকু উঠে যেতেই ওদের নিয়ে নীরবতার প্রাচীর নেমে এসেছিল। কারো মুখেই কোনও কথা ছিল না। যেন সব কথা হারিয়ে গেছে। কথার জাল বুনে দুজনের কেউ-ই আলাপের সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারেনি। শেষে অবশ্য সঞ্চয় সেই নীরব

পরিস্থিতিকে সাবলীল করে তুলতে কিছুটা চেষ্টা করেছিল, তবে দুজনেই আবার মুখরিত হয়ে উঠেছিল, পিকু ফিরে এসে গল্পের আসর যখন মাতিয়ে তুলেছিল—তখন।

দুটি বড়ো আকারের থলেতে মাংস ভর্তি করে নিয়ে ফিরলো সঞ্চয়। বারান্দায় থামের গায়ে থলে দু'টিকে রেখে টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে বসে পড়লো। ননীমামা তার নতুন শালী দুটির সঙ্গে গল্প করছিল। সঞ্চয় বললো, বুঝলে ননীমামা, আজকে বৌভাতে কাউকে আর মাংস খেতে হচ্ছিলো না— লোকটা বলে কিনা কুড়ি কেজি-র বেশি দিতে পারবো না।

তার এই ধর্মঘট কি কারণে?

বলছে, সারা কলকাতায় আজ সাড়ে তিন হাজারেরও ওপরে বিয়ে-শাদি হচ্ছে। তাই এর বেশি মাংস সে সাপ্লাই করতে পারবে না। আমি বললোম, ক'হাজার বিয়ে হচ্ছে তা নিয়ে আমার গবেষণা করার কথা নয়—আমি তো ভাই আপনার কাছে আগেই জানিয়ে রেখেছিল্‌ম যে আমার মোট এতো কেজি মাংস চাই। এরপরে বলে কি জানো? তাহলে বাবু কেজি প্রতি আরও একটাকা করে বেশি লাগবে। ব্যাপারটা বুঝলে এবারে? ডিম্যান্ডের সুযোগ নিয়ে মুনাফা বাড়িয়ে যাও—এই হলো অবস্থা! একজন মাংসওয়ালা থেকে একজন আমীরওয়ালা পর্যন্ত সকলেরই এই একই চিন্তা। সুতরাং কাকে কি বলবে? রান্নাঘর থেকে সবিতা ডেকে উঠলো, এই সঞ্চয়মামা এ-ঘরে এসো। শীগ্‌গির—

সঞ্চয় রান্নাঘরে ঢুকতেই মীনাক্ষী একটি আসন পেতে দিল। মুখেও বললো, বসুন। সবিতা লুচি ভাজছিল সঞ্চয়ের জন্য। সে প্রশ্ন করলো, মাংস আনতে সেই সাত-সকালে গেলে তবুও এতো দেরি হলো কেন? সঞ্চয় সমস্ত ঘটনাটুকু বর্ণনা করে বললো, দেরি আমার ইচ্ছায় হয়নি। আমি তো সবসময় এই বাড়ির মধ্যেই থাকতে চাই। কথার আসল রহস্য ধরতে পেরে সবিতা বলে উঠলো, বিয়ের পর তুমি কিন্তু বৌয়ের আঁচলধরা হয়ে পড়বে।

হয়তো হবো।

স্বীকার করছো?

অস্বীকার করবো কেন? যা হবো তা বলতে আমার লজ্জা নেই। আঁচলধরা হবো। সঙ্গে সঙ্গে, কাছে-কাছে থাকবো। যা বলবে তাই শুনবো। কথার অবাধ্য হবো না—হঠাৎ মীনাক্ষী হেসে ফেললো। সঞ্চয় ছাড়লো না। জিজ্ঞেস করলো, আপনি হাসছেন যে?

এমনিই! মীনাক্ষী এড়াতে চাইলো। ভাজা লুচিগুলি ডিসে রাখতে রাখতে সবিতা প্রশ্ন করলো, আর কি করবে শুনি?

আর.......সঞ্চয় একটু চুপ করে থেকে মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই ও দৃষ্টি সরিয়ে নিল। সঞ্চয় বললো, আর ভীষণ ভালোবাসবো—সবিতার কথার উত্তর দিলেও সঞ্চয় যেন কথাটা মীনাক্ষীকেই শোনালো। কোনোদিনও এতোটুকু দুঃখ দেবো না। এমন কাজও করবো না, যাতে সে আঘাত পায়। তাকে আমি শান্তি দেবো।

বিয়ের আগে এমন কথা সবাই বলে থাকে—পরে যে কে সেই! একটি ডিসে লুচি-তরকারী সাজিয়ে সঞ্চয়কে খেতে দিতে দিতে আলোচনায় অংশ নিল মীনাক্ষী। সঞ্চয় প্রথমেই কোনও উত্তর দিল না। নীরবে এক টুকরো লুচি মুখে দিল। ধীরে ধীরে খেলো সেটা। মীনাক্ষীকে একবার দেখলোও, ওকে বুঝবার চেষ্টা করলো। মীনাক্ষী কি তার কথা অবিশ্বাস করছে? যদিও তারা দুজনে সোজাসুজি আলোচনা করছে না। সবিতাকে তৃতীয় ব্যক্তি সাজিয়ে যার যার মনের কথা কি ওর মধ্যে দিয়ে পেশ করছে না? নিশ্চয়ই করছে। মীনাক্ষীকে সব কথা ভেঙে না-বললেও এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে, যে, সঞ্চয় তার প্রতি দুর্বল। একটু আগেই সঞ্চয় যা বলেছে তা সবিতাকে শুনিয়ে বললেও মুখ্যত তাকেই বলা হয়েছে। সেইজন্যই কি মীনাক্ষী সঞ্চয়ের উত্তর শুনে আরও নিশ্চিত হতে চাইছে? অসম্ভব নয়। সঞ্চয় স্পষ্ট উত্তর দিল, সবার সঙ্গে যে আমার মিলবে, এমনটা তো নাও হতে পারে। অনেকে শুনতে পাই স্ত্রীকে ধরে মারে। আপনি কি আমাকে সেই দলে ফেলতে চান? সঞ্চয় সুন্দর করে শিশুর মতো হাসলো।

তুমি ঠেঙ্গাবে বৌ? সবিতা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, তাহলে দু'বছরের মেয়েকে গালটেপার

মতো বৌকে সারাদিন আদর করবে কে? তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি, মীনাক্ষী ওকে আরও দু'খানা লুচি দে। সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা খেয়েছেন?

না। উত্তর দিল সবিতাই। তোমার আগে খাওয়া না-হলে, খাবে কি করে? কথাটির অর্থ উপভোগ করলো সঞ্চয়। ভালো লাগলো। এমনভাবে মৃদু একটু হাসলো যেন মেনে নিলো, সবিতা যে-অর্থে বলেছে তাদের সম্পর্ক তাই। সবিতা যে-সুরে রসিকতা করছে, সঞ্চয়ও একই সুরে উত্তর দিল, আমিও মাথার দিব্যি দিয়ে যাইনি যে, আগে খেতে পারবে না। ঘনচোখের পাতা কাঁপিয়ে মীনাক্ষী তাকালো। সঞ্চয় তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। লজ্জা ঢাকতে আরও খানিকটা তরকারী তাড়াতাড়ি ঢেলে দিল সঞ্চয়ের ডিশে।

আরে! আপনারা কি খাবেন যে আমাকে সব ঢেলে দিলেন? আমি এতোটা খাবো না।

তবে আর কি? সবিতার টিপ্পনীসূচক কথা, অর্ধেকটা রেখে দাও, মীনাক্ষী খাবে। এই সুযোগটুকু কাজে লাগালো সঞ্চয়। একটু একটু করে সাহসে ভর করে সে এগুচ্ছে। এবারে সে আরও বেশি সাহসী হলো। কিন্তু নিজেকে কেন জানি গুটিয়ে নিল। কোনও কিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়। বাড়াবাড়ি ভালো দেখায় না। সব জিনিসেরই একটা সীমা থাকা উচিত। তার বাইরে গেলেই খারাপ দেখায়। সঞ্চয় তাই বুদ্ধিমানের মতো কথাটাকে অনুনয়ের সুরে নিয়ে গিয়ে, উত্তর দেওয়ার ভারটাও মীনাক্ষীর ওপরেই ছেড়ে দিল। আমার এঁটো উনি খাবেন কেন? তায় আবার ব্রাহ্মণ! শেষের কথাটি বলে মীনাক্ষীকে জাতে তোলা হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবারে মীনাক্ষী যদি উত্তর দেয় তাহলে ওই 'ব্রাহ্মণ' কথাটিকে কেন্দ্র করেই তাকে উত্তর দিতে হবে। কেন-না সঞ্চয় ওটাকেই মুখ্য প্রশ্নের ভিতরে রেখেছে। এঁটো খাওযা-না-খাওয়াকে রেখেছে আড়ালে। যেন ওটার কোনও মূল্য নেই। ওটা গৌণ। কার্যত হলোও তাই। 'ব্রাহ্মণ' বলে বড়ো করে তুলে ধরতে লজ্জা পেল মীনাক্ষী। সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, আমি ও-সব মানি না।

অর্থাৎ তুই খেতে পারিস, এই তো! সবিতা তার বন্ধুকে যেন এই সুযোগে স্বীকার করিয়ে নিতে চায়।

পারি। মীনাক্ষী সহজ ভাবে হাসলো। আগেই তো বলেছি আমার কোনও আপত্তি নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণে আমি সবসময়েই উদার নীতিতে বিশ্বাসী। সঞ্চয়, মীনাক্ষীকে সমর্থন করে বললো, আমি জানি, আপনি ও-সব মানেন না। কেন-না এ দু'দিনে তো দেখলাম, সবিতার সঙ্গে একসঙ্গে খাচ্ছেন, এক থালায় দুজনের খাবার নিচ্ছেন, অথচ আশ্চর্য দেখুন, আমারই এক বন্ধুর কথা বলছি— জাতে ওই ব্রাহ্মণ। ওর বাবার একবার ভীষণ অসুখ হলো। দু'মাস ধরে যাকে বলে যমে-মানুষে টানাটানি চললো। বাড়ির লোক কতো আর রাতের-পর-রাত জেগে সেবা করবে? দেখাশুনা করবে? বন্ধুটি আমাদের কাছে এসে জানালো, তোদের কিন্তু রাত জেগে এবারে একটু দেখাশুনা করতে হবে। আমরা কেউ-ই আপত্তি করিনি। আমাদেরই এক বন্ধুর বাবা। দু'মাস ধরে কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। সুতরাং রাত জেগে সেবা-পরিচর্যা করবো এটা এমন বেশি কি! আমরা রাতের-পর-রাত জেগে সেবা-শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। বন্ধুটির বাবা একদিন মারা গেলেন। আমরা চারপাই কিনে আনলাম। ফুল দিয়ে মৃতদেহ সাজালাম। অর্থাৎ প্রাথমিক কাজগুলি সবই আমরা করলাম। নাটক শুরু হলো কিন্তু তার পরেই। সঞ্চয় একটু হাসলো। করুণ হাসি। বললো, চারপাই যখন আমরা কাঁধে তুলতে যাবো, তখনই বন্ধুটির বড়ো কাকা এসে নির্লজ্জের মতো বললেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ কাঁধ দেবেন না। আমাদের অবস্থাটা তখন বুঝতে পারছেন? যেহেতু আমরা ব্রাহ্মণ নই, সেই হিসেবে তার মতে আমরা হলাম শুদ্র! ওদের নিয়মে শুদ্রের কোনও অধিকার নেই ব্রাহ্মণের মৃতদেহ বহন করার। অথচ দেখুন, সেবাটুকু নিতে কিন্তু ওদের আপত্তি নেই। অর্থাৎ বিপদে পড়লে শুদ্রের মুখেরটাও খেতে রাজি, কিন্তু.....সঞ্চয়ের কথা শেষ হলো না। ঝিকমিকিয়ে হেসে উঠলো মীনাক্ষী। বললো, আমি কিন্তু বিপদে পড়িনি। অন্য সুরে কথার জাল বুনলো সঞ্চয়। বললো, আপনি শুদ্রের মুখেরটা খান, আপনি আবার ব্রাহ্মণ নাকি? সবিতা আপত্তি জানিয়ে বললো, বারবার অমন শুদ্র শুদ্র করো না তো! আমরা হলাম কাযস্থের মধ্যে কুলীন শ্রেষ্ঠ।

দেখেছিস! কায়স্থেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাতেই তুই এতো সচেতন। আর ব্রাহ্মণরা যদি জাতের গর্ব করে তাহলেই হয় তাদের দোষ? তবে জাত নিয়ে যাবা এতো চুলোচুলি করে তাবা সকলেই অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে মরছে। যাক গিয়ে ও-সব কথা। আসল কথা হলো—রান্নাঘরের দরজার বাইরে থেকেই লক্ষ্মী ডাক দিল, সঞ্চয়, তোমাব দিদিমা তোমাকে ডাকছেন। লক্ষ্মী এ-বাড়িব অনেক কালের পুরানো ঝি। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের উদারতায় সে ঠিক ঝিয়ের পর্যায়ে নেই। ঘরেবই একজন মানুষ হয়ে গেছে। সঞ্চয়, সবিতা ওদেরকে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। সেই কারণে ওদেবকে নাম ধরেই ডাকে।

কি জন্য লক্ষ্মীদি?

তা বলতে পারবো না। আমাকে শুধু বললেন, সঞ্চয়কে একটু ডেকে দে।

বলো গিয়ে যাচ্ছি। চা খেয়েই যাচ্ছি। পবে কি যেন ভাবলো সঞ্চয়। বললো, আচ্ছা চলো, শুনেই আসি আগে।

দিদিমা তার ঘবে বসে পান বানাচ্ছিলেন। দিদিমা একা নন। আরও কয়েকজন বয়স্কা মহিলা ছিলেন। সকলেই পান বানাচ্ছিলেন। কেউ সুপাবী কাটছিলেন। সঞ্চয়কে দেখে বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে দাদুভাই। একবার বিরাটিতে যেতে হবে।

কি? ব্যাপারটা কি?

তোর ন'দিদিমা আসবেন। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সবাইকে নিয়ে আসবেন। আমিই বলে দিয়েছিলাম যে বৌভাতেব দিন সকালে যে-কেউ একজনকে পাঠিয়ে দেবো। তুই যদি যাস তো ভালো হয—

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিলো সঞ্চয। বান্নাঘরে গিয়ে সবিতাকে জানালো চা খাওয়াটা আব হলো না বুঝলি, এক্ষুণি ছুটতে হবে বিবাটি, ন'দিদিমাকে আনতে। সবিতা বললো, দু'মিনিট দেরিতে এমন কী ক্ষতি হবে? চা-টা খেয়েই যাও।

থাক গিয়ে! একটা দিন চা না-খেলেও তো এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। সবিতার কথাটাই ওকে ফেরত দিয়ে সঞ্চয় একটু হাসলো।

খেয়ে গেলেই পারতেন—এবারে মীনাক্ষীকেই বলতে হলো, চা হয়ে এসেছে। সঞ্চয় আর আপত্তির সুর তুললো না। মীনাক্ষীর কথার উপরে কেন জানি না বলতে তার মন উঠলো না। নীরবে সম্মতি জানালো। সবিতা না-হেসে পারলো না। বললো, এখন থেকেই বুঝি বাধ্য হচ্ছো? অবশ্য তুমি একটু আগেই বলেছো, ও যা বলবে তাই শুনবে। কথার অবাধ্য হবে না। কথাটা যে তুমি এতো তাড়াতাড়ি সত্যে পরিণত করবে ভাবতে পারিনি। মীনাক্ষীর চেয়ে সঞ্চয়েরই বেশি লজ্জা লাগলো। লজ্জা পেলো এই কারণে যে, সঞ্চয় ওই কথাগুলি মীনাক্ষীকেই উদ্দেশ্য কবে বলেছে; সবিতা সেটাই প্রমাণ করে দিলো। তাই এ লজ্জা, ধরা পড়ার লজ্জা। সঞ্চয় তাই দাঁড়াতে পারলো না ওখানে।

রইলো তোর চা। ও আমার দরকার নেই। কথাটা বলেই আর অপেক্ষা করলো না সঞ্চয়। সোজা বেরিয়ে গেল কোনোদিকে না-তাকিয়ে। মীনাক্ষী, সবিতার দিকে চেয়ে একটু রুক্ষ সুরে বললো, চা খাওয়াটা নষ্ট করলি তো?

তোর কষ্ট হচ্ছে? সবিতা ঠোঁট টিপে হাসলো।

ফাজলামো করিস না। মীনাক্ষী গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো।

এলে পরে ক্ষমা চেয়ে নেবো। হবে তো?

ফেব ফাজলামো শুরু করেছিস? মীনাক্ষী আরও বেশি গম্ভীর হলো। সবিতা বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। পরে বললো, সঞ্চয় বলছিল বটে। কিন্তু তখন বুঝিনি। এখন মনে হচ্ছে সে ঠিকই বলেছিল। কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করলো মীনাক্ষী। সবিতা কি তাকে নিয়ে চপলতার খেলায় মেতে উঠবে? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সঞ্চয়ের নামে যদি সে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে তখনই চেপে ধরবে। সেই কারণেই বুঝি গল্প ফাঁদবার ওই চেষ্টা। মীনাক্ষী ভাবলো, না, ধরা সে

দেবে না। কিন্তু স্বাভাবিক কৌতূহল মানুষের যাবে কোথায়? মীনাক্ষী তাই জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারলো না। নিচু সুরে জানতে চাইলো, কি বলেছে রে?

ওর কাছ থেকেই জেনে নিস।

তুই আছিস কী করতে? মীনাক্ষী চোখে চোখে হাসলো।

বলেছে তোকে দেখলে মনে হয়, তুই কম কথা বলতে ভালোবাসিস। তুই আসলে রিজার্ভ টাইপের মেয়ে।

কথাটা মিথ্যে বলেনি। তবে—সামান্য একটু হাসলো মীনাক্ষী। এই দু'দিনে তোর পিকুদার আলগা কথা তো কম শুনলাম না। ওকে আমাকে নিয়ে মনের সুখে তোরা জল্পনা-কল্পনা ঠাট্টা ইত্যাদি করছিস। যা খুশি তাই বলছিস। কথা শুনতে শুনতে সবিতা দুষ্টুমী ভরা হাসিতে নিজেকে ছেয়ে রেখেছিল। মীনাক্ষী আবাব রাগ করবে, তাই কথাটা বলবে না, বলবে না ভেবেও শেষ পর্যন্ত বলেই বসলো, "ওকে বলতে?"

তুই জানিস না কে? তোর মামা—

তুই কী এখন থেকেই ওর নাম ধরতে অপারগ হলি?

ব্যাপারটা অবশ্য তাই দাঁড়াচ্ছে—মীনাক্ষী তার গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পাবলো না। হেসে দিল।

মীনাক্ষী আর সবিতা গল্প করছিল ছাদে বসে। সকালের জলখাবারের কাজ শেষ হতেই ওদেরও কাজ শেষ। কেন-না দুপুরে বাড়ির লোকজনদের রান্না ঠাকুরই করবে। দুপুবের রান্না সেরেই তারা আবার রাত্রের রান্না শুরু করবে। সুতরাং আপাতত তাদেব করণীয় কিছু নেই রান্না শেষ হলে সবাইকে খেতে দেওয়া ছাড়া। সবিতা, সঞ্চয়ের গল্প করছিল। এতো অল্প বয়সেব মধ্যেই কোম্পানির হয়ে প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘোরা হয়ে গেছে। এখন স্থির হয়ে বসেছে রাজধানীতে। সবিতা সঙ্গে সঙ্গে আফসোস করলো সঞ্চয় সারা ভারত ঘুবেছে, আর আমি দমদম টু বিবাটি। বড়জোর কাঁচরাপাড়া। অথচ সঞ্চয় প্রায়ই মাকে চিঠিতে লেখে, ভারতবর্ষ যে কতো সুন্দব মনোরম দেশ তা ওই একমাত্র কলকাতায় বসে থাকলে বুঝতে পারবে না। দু'চোখ ভবে দেখে নিজের মনকে যদি বিস্ময়ে ভরিয়ে তুলতে চাও, চলে এসো আগ্রা, কাশ্মীর, সিমলা, মানালী, কুলু, কেরালা, জয়পুর, চন্ডীগড়, আমেদাবাদ, নৈনিতাল, মুসৌরী, নাগপুর, পুণা, মহীশূর, কাঠগুদাম, বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, নয়াদিল্লি, মুম্বাই। যখন যেখানে থেকেছে, সেখান থেকেই চিঠি লিখেছে ঃ যদি দেখতে চাও তো তোমার কোলের মেয়েটাকে নিয়ে চলে এসো। সুযোগ বারবার আসবে না। পরে আফসোস করবে। সত্যই মা এখন আফসোস করছেন। তবে এবারে বোধহয় মা দিল্লিতে যাবেন। কারণ সঞ্চয় খুব ধর্ম-পুণ্যির লোভ দেখিয়েছে। দিল্লিকে ঘিরে রয়েছে মথুরা, বৃন্দাবন, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, হরিদ্বার। পুণ্য সঞ্চয়ের সেরা তীর্থস্থান। সঞ্চয়ের সবই দেখা। মা, তাই ওকে হিংসে করছেন। একদিন তো বলেই ফেলেছেন, তুমি দুধের বয়সে দাদুভাই সারা তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ালে অথচ আমি সংসারের মায়া কাটিয়ে ঘরের চৌকাঠও পাব হতে পারলাম না।

কতোদিন ধরে চাকরি করছে? হঠাৎ কেন জানি মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করে বসলো। কথাটা তার মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পর মীনাক্ষী নিজেই কেমন যেন লজ্জা পেল। নিজের মনেই ভাবলো, এ-প্রশ্নটা সে হঠাৎ করতে গেল কেন? কথাটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণও নয়। সে কিছু ভেবেও বলেনি। এমনিই জিজ্ঞেস করেছে। সঞ্চয়ের সম্বন্ধে জানতে চাইছে দেখে সবিতা ওকে নিয়ে এবারে কোনওরকম কৌতুক করলো না। পিকু কাছে থাকলে হয়তো করতো। সবিতা স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিল, তা প্রায় দশ বছর হতে চললো—পি. ইউ. পাশ করে আঠারো বছর বয়সে সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে চাকুরিতে ঢুকেছিল। এখন হয়েছে সেলস্ ইঞ্জিনিয়ার।

রাখী ছাদে উঠেছিল। মীনাক্ষী ও সবিতাকে গল্প করতে দেখে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। বসলো ছাদের অল্প উঁচু কার্নিশের উপরে। আসল উদ্দেশ্য, সবিতার কাছ থেকে জেনে নেওয়া, সঞ্চয়কে অনেকক্ষণ দেখছে না। সে কোথায় গেছে সেটাই জানা। কিন্তু প্রথমেই সে-কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই অন্য আলোচনায় কিছু সময় কাঠলো। চটুল আলোচনা। রাখী বললো, দাদার বিয়ে হলো।

এরপরেই সবিতার পালা। আবার হয়তো ছুটে আসতে হবে হাজার মাইল দূর থেকে।

তোমাকে ছুটে আসতে হবে না রাখী। ঝিলমিলিয়ে হেসে উঠলো সবিতা। বললো, তার আগেই তুমি কক্ষচ্যুত হয়ে আরও দূরে ছিটকে পড়বে। কেন-না এবারে তোমারই পালা। রাখীও হাসলো কথাটা শুনে। মিনিটখানেক ভাবলো। তারপরেই বললো, উল্টোটাও হতে পারে। কক্ষচ্যুত হয়ে দূরে ছিটকে না-পড়ে কাছেও তো আসতে পারি?

তোমার কি কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে? এই যে শুনলাম......রাখী মাঝপথেই সবিতাকে থামিয়ে দিল। ও-সব কথা থাক। সে ঝিলের দিকে তাকালো। একটি লোক ডিঙি বেয়ে চলেছে। জাল ফেলে মাছ ধরছে তিন-চারজন জেলে। এ-পাশে প্রশস্ত শান বাঁধানো ঘাট। স্নান করছে অনেকে। ঝিলের মাথার উপর দিয়ে বেশ কয়েকটা প্লেন উড়ে গেল। এয়ারপোর্ট কাছেই। তাই প্লেনের ঘনঘটা একটু বেশিই চোখে পড়ে। রাখী যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, আচ্ছা! সঞ্চয়ণবাবু কোথায় গেছেন? ওঁকে দেখছি না যে?

বিরাটি গেছে ন'মাসিমাকে আনতে। একটু থেমে সবিতা জিজ্ঞেস করলো, সঞ্চয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। রাখী যেন গর্ব অনুভব করলো। বললো, দুজনেই তো বর্তমানে রাজধানীর বাসিন্দা। তবে একটা অসুবিধে হয়েছে কি জানো সঞ্চয়ণবাবু দিল্লিতে ফিরছেন শুক্রবারে, আর আমি শনিবারে সে-কথাই বলেছিলাম, একটা দিন পিছিয়ে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

সঞ্চয় কী বললো? সবিতা টুক করে বলে বসলো।

ওঁর নাকি ছুটি স্যাংশন নেই। শুক্রবারেই রওনা দিতে হবে। উৎসবের উজ্জ্বল বাতি নিভে যাওয়ার পর ভরাট অন্ধকার নেমে আসার মতো রাখীর সারা মুখে ম্লান ছায়া পড়লো। ম্লান সুরে বললো, ভাবছি আমিই একদিন আগে যাবো।

রাখী চলে গেলে, মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো সবিতা। হাসলো ঠোঁট টিপে। বললো, বড়দার বন্ধুর মেয়ে রাখী। সঞ্চয়ের পিছনে পড়েছে বোধহয়।

দিল্লিতেই থাকে? ছোট্ট সুরে মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ। ওখানকার এক কলেজে ডাক্তারী পড়ে। সবিতা আরও বললো, রাখীর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে দিল্লিতে ফিরে গিয়ে সঞ্চয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা। তবে আমি যতোদূর জানি, সঞ্চয়ের দৃষ্টি এখন স্থির হয়ে আছে। মনপ্রাণ শান্ত। চিন্তা-ভাবনা একজনকে নিয়েই। সবিতা এবারে আরও স্পষ্ট হলো। সঞ্চয় আমাকে জানিয়েছে, তোকে ওর খুব ভালো লেগেছে। কথাটি শুনলো মীনাক্ষী। ও-কথার কি উত্তর দেবে সে? কিন্তু কিছু একটা না-বললে নিঃশব্দের মুহূর্তগুলি ভরাট হয়ে গড়ে উঠবে, তা আরও বিশ্রী। মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, কবে বলেছে?

দিন জিজ্ঞেস না-করে বল কতোবার বলেছে। তবে কথাটা বলেছে প্রথম দিনেই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো সকলের। সবাই একটু-আধটু বিশ্রাম নিচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকেই নিমন্ত্রিত অতিথিদের আসার ফলে সারা বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠবে। কথার ফুলঝুরি আর অনাবিল অফুরন্ত হাসির সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠবে সেই সঙ্গে। সকলের মধ্যে আনন্দের নির্মল ঢেউ বয়ে যাবে। সে-ঢেউ থাকবে অনেকরাত পর্যন্ত। নিমন্ত্রিতরা চলে যাবার পরেও বাড়ির লোকদের মনে উৎসবের ভাঁটা পড়বে না। জোয়ার থাকবে তখনও। তাই সকলেই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। কতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়, তার ঠিক কী? সঞ্চয় বারান্দার কোণের সেই ছোট্ট ঘরে শুয়েছিল। পিকু দুপুরবেলা খেয়েই আবার কোথায় যেন বেরিয়েছে। সবিতা আর মীনাক্ষী ঘর থেকে বারান্দায় এসে সিঁড়ির দিকে এগুতে যাবে, সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছিস রে?

কাছেই এক জায়গায় যাবো। উত্তর দিলো সবিতা। তুমি যাবে? ওদের সঙ্গে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশিই হলো সঞ্চয়। মীনাক্ষী সঙ্গে হাঁটবে। গল্প করবে। বাড়ির এই কোলাহলপূর্ণ আবহাওয়া থেকে অন্তত খানিকটা মুক্ত হবে। সঞ্চয় মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। সবিতা ধমক দিয়ে উঠলো। যাবে তো তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নাও দেরি করতে পারবো না।

দু'মিনিট! আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ওরা তিনজন পথে নামলো। সঞ্চয় ঝিলের দিকে তাকিয়ে বাড়ির দিকে একবার তাকালো। বড়ো মামিমার ঘরের জানলায় রাখী দাঁড়িয়ে। দেখছে তাদেরকেই। সঞ্চয় দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সোজা তাকালো পথের দিকে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এক সময়ে বললো, জানিস মাসি, রাখীর জন্য আমাকে এখন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। কতো আর মিথ্যে বলা যায়?

কেন? পথ চলতে চলতে প্রশ্ন করলো সবিতা।

ভীষণ যন্ত্রণায় পড়েছি। সঞ্চয় নৈরাশ্যে ডুবে গিয়ে বিপদ থেকে বাঁচবার সুরে বললো, মাত্র দু'মিনিটের আলাপ! তাতেই সে অধিকার প্রয়োগ করতে এগিয়ে আসতে চাইছে। তার দাবি, আমি শুক্রবারে দিল্লিতে যেন রওনা না-হই। ওরই সঙ্গে শনিবারে রওনা দিই। আমি উত্তর দিয়েছি, সম্ভব নয়। ছুটি নেই আমার। আজ আবার রাখীর অন্য সুর। কী বলছে জানিস? বলছে, আমিই একদিন আগে যাবো। এবারে বাধ্য হয়েই আমাকে মিথ্যে বলতে হলো।

কী বললে?

বললাম, কানপুরে আমাকে একদিন ব্রেক-জার্নী করতে হবে, কোম্পানির কাজের জন্যই। সেক্ষেত্রে, আপনার অসুবিধে হবে। সঞ্চয় শেষ মন্তব্য করলো, এমন বিপদে পড়বো, তা কে জানে?

আমি কিন্তু রাখীকে একটুও দোষারোপ করতে পারবো না। স্পষ্ট উত্তর দিল সবিতা, বরং তোমাকেই করবো।

আমাকে কেন?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। কোনও জটিলতা নেই এর মধ্যে। রাখী দেখতে তেমন সুন্দরী নয়। কিন্তু তাকে দেখতে যদি অতীব সুন্দরী হতো তাহলে কী তুমি পারতে রাখীকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে? অথচ এই তুমিই আবার অন্য একজনকে কাছে টানতে চাইছো। কারণ সে সুন্দরী। মীনাক্ষী চুপচাপ হাঁটছিল। সবিতার শেষের কথাগুলির কেন্দ্রবিন্দু সে নিজে। তা ওরা দুজনেই জানে। মীনাক্ষী তো জানেই। সুতরাং দৃষ্টি নিচু করে সে হাঁটতে লাগলো। সবিতা থামলো না। বললো, তুমি এটা অস্বীকার করতে পারবে?

অস্বীকার করবো কেন? সেটাই যে নিয়ম। মানুষ সুন্দরের পূজারী। সুন্দরকে সবাই চায়। সেক্ষেত্রে আমার দোষটা কোথায়?

রাখীরও দোষ নয়। তার চোখে তুমিও সুন্দর। সে-ও তো সুন্দরের পূজারী।

কিন্তু সেটাই সব কথা নয়—সঞ্চয় নিজের মতামত বলিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরলো। বললো, সেই সঙ্গে ভালোলাগার প্রশ্ন মিশে আছে এবং সেটা একপক্ষ থেকে নয়, দু'পক্ষ থেকেই। তবেই সেটা সম্পূর্ণতায় ভরে উঠে রূপ নেবে। নয়তো সম্ভব নয়। আমার তাকে ভালো নাও লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি সাড়া দেবো কেমন করে? আর না-দিলেই আমার দোষ?

হয়েছে! হয়েছে!! অতো বড়ো বড়ো কথা বলো না। সবিতা ঈষৎ খোঁচা দিয়ে বললো, রাখীর ডাকে সাড়া দিতে পারছো না। অথচ মরণঝাঁপও দিতে পারো যে সুন্দরের প্রতিমূর্তি তার কাছে। এবারে আমার একটি প্রশ্ন, একটু আগেই তুমি ভালোলাগার প্রশ্ন তুলেছিলে। তোমার কথাতেই ফিরে আসছি। ধরো, তোমার যাকে ভালো লাগছে তার তোমাকে ভালো নাও তো লাগতে পারে।

নিশ্চয়ই। এর উত্তর তো আমি আগেই দিয়েছি। একপক্ষ থেকে হলে চলবে না দু'পক্ষ থেকেই হতে হবে। আর একটা কথা, সুন্দরের উপরেও কিন্তু ভালোলাগার স্থান। এই ভালোলাগা থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। সেখানে একটি অসুন্দর মেয়েকেও একটি সুন্দর ছেলের পছন্দ হতে পারে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর গল্প বলছি। তাহলেই ব্যাপারটা সহজ হবে বুঝতে। আমার বন্ধু সুনীল ভালোবেসে যাকে বিয়ে করেছে, সেই মেয়েটি মোটেই সুন্দরী নয়। অথচ ওর মা যে মেয়েটিকে পুত্রবধূ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, সে যথার্থই সুন্দরী। ওর মায়ের অনুরোধে আমরা তিনজন বন্ধু সেই মনোনীত পাত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। সুনীল নিজেও সঙ্গে ছিল। মেয়েকে দেখে আমরা তো বটেই এমনকী সুনীল পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে তার

ভ্রমরের থেকে মায়ের মনোনীত মেয়েটিই অনেক বেশি সুন্দরী। তবুও ভ্রমরকেই সুনীল বিয়ে করলো। রূপের দিক দিয়ে ম্লান হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমরকে সে দূরে সরিয়ে দিতে পারলো, না, কেন বল তো?

ভালোলাগার জন্য। হাসির ঢেউ তুললো সবিতা।

ঠিক তাই। কথাটা যদিও বুঝেছিস তবে অনেক দেরিতে।

দমদম ক্যান্টনমেন্টের ওভার ব্রীজ পার হয়ে সামনের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওরা একটি একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

মীনাক্ষীদের বাড়ি এটা। সবিতা উত্তর দিল। কথাটা শোনা মাত্র সঞ্চয় তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। লজ্জিত হয়ে বললো, আগে জানলে আমি জোর করে আপনাদের সঙ্গে আসতে চাইতাম না। কেন-না বাড়ি আপনাদের আর আমি এলাম সবিতার কথায়.....আপনার কোনও নিমন্ত্রণ না-পেয়েই এমনভাবে চলে এসে যে—।

এবারে কিন্তু আমাকেই লজ্জায় ফেললেন। কলিং-বেলটা টিপে মীনাক্ষী বললো, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইনি ঠিক কথা; কিন্তু আপনার এই আসার ফলে আমি যে খুশি হয়নি তা আপনি জানলেন কেমন করে? সে-কথা ভাবছেনই-বা কেমন করে?

তবুও......সঞ্চয় ওর কথা শেষ করতে পারলো না। দরজা খুলে গেল। খুলে দিলেন একজন ভদ্রমহিলা। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বয়েস হবে। ফর্সা রং, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। সাদা ব্লাউজের উপরে কালো একটি ছাপা শাড়ি। টানা চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। মাথার সিঁথিতে পুরু করে অনেকটা পর্যন্ত সিঁদুর টানা। হাসির ছোঁওয়া দুই ঠোঁটে। সঞ্চয়ের মনে হলো ওই হাসিটা যেন সারাক্ষণ ওঁর মুখে ছায়ার মতো লেগে থাকে। সবিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আগে আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সঞ্চয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মীনাক্ষী বললো, কি হলো? ভেতরে চলুন—।

সঞ্চয়কে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলো মীনাক্ষী। জানলাগুলি বন্ধ ছিল। একে একে খুলে দিল সব গুলি। ঘরের ভারী পর্দাটা দরজার উপরে তোলা ছিল। সেটাকে নামিয়ে দিল। একটি সোফায় বসে সঞ্চয় সারা ঘরটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। সাজানো-গুছানো। ঘরের কোণে একটি সিঙ্গল খাট। বিছানা পাতা। তার উপরে একটি দামি বেডকভার। খাটের পাশেই মানুষ সমান একটি আয়না। সঙ্গে ড্রেসিং-টেবিল। টেবিলের উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রী। ঘরের এ-পাশে বুক-সমান উঁচু দামি কাঠের আলমারী। গোলাপী দেওয়ালে মীনাক্ষীর একটি ছবি। ফুলের বাগানে মীনাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তার চারিপাশে ছোট ছোট মৌসুমী ফুলের সমাবেশ। মীনাক্ষীর লাবণ্যময় মুখখানি যেন ফুলের মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে। মনে হয়, ছোট ছোট দোপাটির মধ্যে একটি বড়ো সূর্যমুখী। দেওয়ালের আর একপাশে তেল-রঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি।

যিনি দরজা খুলে দিলেন আপনার বৌদি নিশ্চয়ই? সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ। ভারী ভালোমানুষ। আমার সঙ্গে তো বৌদির একেবারে বন্ধুর সম্পর্ক। এতো হাসিখুশি যে সারা বাড়ি একা বৌদি-ই ভরিয়ে রাখে।

ওঁকে দেখেই সেটা মনে হয়।

কথা বলা ও কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে কি যেন খুঁজছে মীনাক্ষী। একবার এগিয়ে গেল আলমারীর কাছে। আলমারীর সমতল মাথার উপরে রেডিও, মাটির কয়েকটি পুতুল ইত্যাদি আরও কিছু শৌখিন জিনিস রয়েছে। সেখানে না-পেয়ে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ড্রেসিং-টেবিলের সামনে। একটু ঝুঁকে পড়ে ছোট্ট ড্রয়ারটি খুলে কি যেন দেখলো। মীনাক্ষীর দেহের সম্পূর্ণ ছায়া পড়েছে আয়নার বুকে। সোফায় বসে সঞ্চয় আয়নার মধ্য দিয়ে ওকে দেখছে। সঞ্চয়ের কেন জানি মনে হলো, এই ঘর তার। মীনাক্ষী তার। মীনাক্ষীকে কেন সে চুরি করে দেখবে? মীনাক্ষীর উপর তার সম্পূর্ণ অধিকার। তারা দুজনে যেন দুজনের কাছে একান্তভাবেই পরিচিত, ঘনিষ্ঠ। সম্পর্ক তাদের সহজ। ঘরের এই শান্ত পরিবেশে সঞ্চয়ের মনে হলো মীনাক্ষী যেন তার অত্যন্ত কাছের মানুষ। অত্যন্ত আপন মানুষ। মনের মানুষ। কেন যে এমনটা মনে হয় সঞ্চয় ঠিক গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। সে তাকিয়ে

রইলো। আয়নার মধ্য দিয়েই মীনাক্ষীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সঞ্চয় দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। সামনে ফিরলো মীনাক্ষী। দরজার পর্দাটা নড়ে উঠলো। বুলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফর্সা মোটাসোটা চেহারা। টোপাটোপা দুটি গাল। বছর পাঁচেক বয়েস হবে। মীনাক্ষীর ভাইঝি। জুলজুল করে তাকাতেই মীনাক্ষী ডাকলো, এদিকে এসো। ডাক শুনে বুলা ছোট ছোট পায়ে, দু'হাতে ফ্রকের কোণ দু'টি ধরে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সঞ্চয়ের দিকে একটি আঙুল দেখিয়ে মীনাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলো, পিসিমণি, পিসিমণি, লোকটা কে?

আমি? আমি তোমার বন্ধু। সঞ্চয় উঠে গিয়ে বুলাকে কাছে নিয়ে এসে কোলে তুলে নিল। আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনেছি, তুমিই আমাকে চিনতে পারোনি।

আমি যে আগে তোমাকে দেখিনি। চিনবো কেমন করে? অত্যন্ত সরল উত্তর বুলার। সত্যিই তো আগে না-দেখলে চেনা-জানা হয় কেমন করে? বুলা এবারে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করে বসলো, আমি তোমাদের বাড়িতে যাইনি। তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে? আগে দেখেছো?

হ্যাঁ। একটু আগেই তো তোমাকে দেখলাম। সঞ্চয় হাসলো। কলোচ্ছ্বাসে মুখরিত হলো বুলা। বললো, আমিও তোমাকে দেখেছি। একটু চুপ করে থেকে বুলা আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়ি কোথায়?

অনেক দূরে? রেলগাড়ি করে যেতে হয়।

জানো! আমি রোজ রেলগাড়ি দেখি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক দৌড়ে চলে যায়। আমি রেলগাড়িতে চড়েছি। কী মজা। তাই না?

বিধবা এক ভদ্রমহিলা ঘরে আসতেই সঞ্চয় উঠে দাঁড়ালো সোফা থেকে। মীনাক্ষী পরিচয় করিয়ে দিল, আমার মা। মীনাক্ষী না-বললেও সঞ্চয় অনুমান করেছিল ঠিকই। সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই পূর্ণশশী বলে উঠলেন, থাক বাবা! আমি এমনিতেই তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো—

আপনি বসুন আগে! পূর্ণশশী খাটের উপরে বসলেন। তারপরেই সঞ্চয় আবার তার নিজের আসন নিল। একটি প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে ঘরে এলো শোভনা। পিছনে সবিতা। সঞ্চয়ের সামনের টেবিলে মিষ্টির প্লেটটি রেখে শোভনা বললো, খেয়ে নিন ভাই। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে। সঞ্চয় মীনাক্ষীর দিকে একবার তাকালো। অর্থাৎ একটু আগেই তো ভাত খেয়ে এলাম। ঘন্টা দুইও কাটেনি। এরমধ্যে আবার এ-সবের আয়োজন কেন? মীনাক্ষী কিন্তু কোনও কথা না-বলে চুপ করে রইলো। সঞ্চয়কেই তাই বলতে হলো, একটু আগেই দুপুরের খাওয়া সেরেছি। এক্ষুণি আবার........

কোনও কথা শুনবো না ভাই। শোভনা স্নিগ্ধ হেসে বললো, দোকানের মিষ্টি নয়। বাড়ির তৈরি। আমি নিজে বানিয়েছি। তাছাড়া প্রথম দিন এসে খালিমুখে চলে যাবেন, তা কি হয়? খেতেই হবে। সঞ্চয় এবারে সবিতার দিকে তাকাতেই শোভনা বলে উঠলো, সবিতা রান্নাঘর থেকেই খাওয়ার পাটটুকু মিটিয়ে এসেছে। সুতরাং ওটা আপনার। সঞ্চয় একটি মিষ্টি বুলার হাতে তুলে দিল। প্রথমে সে কিছুতেই নেবে না। শেষে বললো, মা বকবে।

বকবে না। তুমি নাও—

মা বললে নেবো। বুলার পরিষ্কার উত্তর। ওর কথায় হেসে দিল সঞ্চয়। শোভনার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি ওকে অনুমতি দিন বৌদি। শোভনা অনুমতি দিতেই তবে মিষ্টি নিল বুলা। পরে সঞ্চয়কে বললো, সবিতার মুখে আপনার কথা এতো শুনেছি যে আপনাকে অপরিচিত বলে মনেই হচ্ছে না। আগ্রা থেকে ছবি-কার্ডে যে চিঠি লিখেছেন সবিতাকে, সে-সব ছবিও দেখেছি। তবে কালারে তাজমহলের যে-ছবি পাঠিয়েছেন, তার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। শোভনা মিষ্টি হেসে আরও বললো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোয় আমার যে কি আনন্দ! বেশ আছেন কিন্তু আপনি! আজ মুম্বাই, কাল মাদ্রাজ! সঞ্চয় ও-কথার কোনও উত্তর না-দিয়ে মৃদু হাসলো। অর্থাৎ মৃদু হেসেই ও-কথার সমর্থন জানালো। শেষে বললো, বৌদি! আপনি কিন্তু আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। তাহলে আবার 'আপনি' করে কথা বলছেন যে?

আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন। শোভনা হেসে উঠলো।

তোমার চাকরি কী বাইরে-বাইরেই। পূর্ণশশী জিজ্ঞেস করলেন।

তা একরকম বলতে পারেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতে হয়। যেখানে কোম্পানির কাজ সেখানেই যেতে হয়। তবে আগামী পাঁচ বছরেব মধ্যে অন্য কোথাও যাবো না। দিল্লিতেই থাকতে হবে।

সবিতার মুখে শুনেছি তোমাব বাবারও বদলীর চাকরি। তিনিও তোমার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি বলছিলাম, বাবা-মা সকলে মিলে এক জায়গায় একসঙ্গে থাকার যে-আনন্দ, সে-আনন্দ কি শুধু দেশ ঘুরে বেড়ালেই হয়? বাবা-মা রইলেন এক দেশে আর তুমি পড়ে রইলে অন্য দেশে। হয়তো বছরের মধ্যে একটিবার দেখা-সাক্ষাৎও নেই।

একবার কিন্তু খুবই হঠাৎ করে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সঞ্চয় গল্প করে সে-ঘটনা বললো। আমাদের বদলীর কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে-কোনও মুহূর্তে বদলী হতে পারে। যদিও এখন আর আমাকে তেমন ভাবে বদলী করতে পারে না। যাই হোক, সেবারে আমি আমেদাবাদ যাচ্ছি। বাবা যাচ্ছিলেন মুম্বাই। রাত দেড়টার সময়ে ভুসাওয়াল জংশনে দুজনের দেখা। আমি-ই বাবাকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম। স্টলে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুই? তুই কোথায যাচ্ছিস?

আমেদাবাদ!

বদলীর কথা তো আগেব চিঠিতে জানাসনি?

আজকেই অর্ডার পেয়েছি। ভেবেছিলাম একটা টেলিগ্রাম করে দিই কিন্তু এবারে বেশিদিন থাকতে হবে না। কযেকটা দিন মাত্র। তাই ওখানে পৌঁছেই টেলিগ্রামটা করতাম। গার্ডের শেষ বাঁশি বাজতেই বাবা গাড়িতে উঠে বসলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর গাড়ি কটায়?

রাত তিনটে পঞ্চান্নতে।

প্ল্যাটফরমে ঘোরাঘুরি করিস না। ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নে। ঘুমিয়ে পড়িস না যেন, একটা কুলিকে বলে রাখিস। সঞ্চয়ের কথা শেষ হলে পূর্ণশশী একটু হেসে অনুযোগ করলেন, তাহলেই বোঝো। বাবার সঙ্গে কোথায় ঘরে বসে কুশল প্রশ্ন করবে তা নয়, এখন সেটা সারতে হচ্ছে প্ল্যাটফরমে। শোভনা বললো, আমরা ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু আমাদের গাইড হবে।

নিশ্চযই। দিল্লির দর্শনীয় কোনও কিছুই আমার অজানা নয়। ব্যবসা সুলভ মনোভাব নিয়ে যে-সমস্ত গাইডরা কাজ করেন, তাদের চেয়ে ভালোই দেখাতে পারবো! দিল্লি তো দেখবেনই, দিল্লির গায়েই ফরিদাবাদ শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে পাহাড়ে ঘেরা একটি লেক আছে। ভাট্‌কল লেক। খুব সুন্দর দেখতে। অথচ আশ্চর্য কি জানেন? ভাট্‌কল লেকের অবস্থিতি অনেকেই জানে না। জানলেও দেখতে যায না। যারা দিল্লি দেখতে যায়, তারা গাইডবুকে ভাট্‌কলের নাম দেখেও উপেক্ষা করে। আপনারা যদি যান, তাহলে সে-ভুল আপনাদের করতে দেবো না।

সবই বুঝলাম। কিন্তু যেতে যে এখনও দু'মাস দেরি। শোভনা বললো, আমি তো এখন থেকেই দিন গুণতে শুরু করে দিয়েছি।

আপনি যাবেন না? সঞ্চয় পূর্ণশশীকে জিজ্ঞেস করলো। শোভনাই উত্তর দিল, মা আর কাকা বাড়িতে থাকবেন। পূর্ণশশী হাসলেন। বললেন, তবে দিল্লি আমার অদেখা নয়। দু'বার গিয়েছি। অবশ্য অনেক বছর আগে। তখন ট্রাম চলতো—

সে-দিল্লিকে এখন আর চিনতে পারবেন না। দিনে দিনে আরও সুন্দর হচ্ছে। হবেও—রাজধানী বলে কথা!

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চয় অল্প অল্প করে মিষ্টি খাচ্ছিলো। খাওয়া শেষ হলে শূন্য প্লেটটি টেবিলের উপর রাখতে যেতেই শোভনা ওর হাত থেকে সেটি নিজে নিয়ে নিল। এগিয়ে দিল জলের গ্লাস। জল খাওয়া শেষ হলে গ্লাস এবং প্লেট দুটোই রান্নাঘরে রেখে দিয়ে এলো। ঘরে এসে সবে দাঁড়িয়েছে মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বৌদি, আমার চাবিটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি

না। তুমি জানো?

জানি। শোভনা প্রাণ খুলে হাসলো। তার আগে আমি জানতে চাইছি, ওটা রেখেছিলে কোথায় শুনি?

কেন? আলমারীর মাথায়—

মোটেই না। বাথরুমের সেলফের উপরে ছিল।

শোভনা চাবি এনে দিলে মীনাক্ষী আলমারী খুললো। শাড়ির একটি বাক্স নামিয়ে আলমারী বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা আবার শোভনার হাতে দিয়ে বললো, আপাততো তুমিই রেখে দাও। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো মীনাক্ষী। দাদা যে কেন এখনও আসছে না? অন্যদিন তো এরই মধ্যে চলে আসে। কথাটা সবে শেষ করেছে মীনাক্ষী, বাইরে কলিং-বেল অশান্ত সুরে ডেকে উঠলো। পূর্ণশশী বললেন, ওই এসেছে বোধহয়। শোভনা চলে গেল দরজা খুলে দেবার জন্য। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো প্রায় পরক্ষণেই। বুঝতে অসুবিধার কোনও কারণই নেই, ইনি মীনাক্ষীর দাদা। সঞ্চয় মুখ তুলে তাকালো। স্বাস্থ্যবান চেহাবা। শ্যামবর্ণ গায়েব রং। ছোট ছোট একমাথা চুল। মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে। নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরনে, ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ হবে। শোভনা স্বামীব সঙ্গে সঞ্চয়ের পরিচয় করিয়ে দিল। সঞ্চয় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানাতেই মলয় বাধা দিয়ে বলে উঠলো, আরে না-না! আলাপ হলো, দুজনে বন্ধু হলাম। প্রণাম আবার কীসের? খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ কথা। সঞ্চয় খুশি হলো বাড়ির প্রত্যেকটি লোকেরই মিষ্টি ব্যবহারে। সকলেই হাসিখুশি। মিষ্টি কথার ফুলঝুরি। যেন বড়ো থেকে ছোট পর্যন্ত প্রত্যেকে একই সূত্রে গাঁথা।

তুমিই তাহলে সঞ্চয়। মলয় বললো, জানো, তোমাকে এতোদিন শুধু চোখে দেখিনি তবে সবিতা তোমার গল্প করতে পারলে আর কিছু চায় না। ওর মুখে তোমার কথা অনেকবার শুনেছি। তাতেই তুমি নেপথ্যে থেকেও আমাদের বিশেষ পরিচিত।

সবিতার নিয়মই তাই। দূরে থাকলে সুনাম করে, অথচ কাছে এলে---সঞ্চয়কে শেষ করতে দিল না সবিতা। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলো, সঞ্চয়ের পরের কথাটি কি হবে। তাই নিজেই বলে উঠলো, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি এই বলতে চাও তো?

আমি কি তাই বললাম? সঞ্চয় মৃদু হাসলো। আমাকে কথাটা তো শেষ করতেই দিলি না। আমি বলতে চেয়েছি যে, এখন কাছে এসেছি তবুও সবিতা থেমে থাকেনি। সুনামের পাবলিসিটি সমানে করে চলেছে। সঞ্চয়ের কথার জাল বোনার চাতুরীতে সবাই হাসিতে মেতে উঠলো। হাসলো না শুধু সবিতা। বললো, ও-সব চালাকি রাখো। ও-কথা তুমি মোটেই বলতে যাচ্ছিলে না। মলয় স্ত্রীর দিকে তাকালো। বললো, সঞ্চয়কে কিছু খেতে-টেতে দিয়েছিলে? সঞ্চয়ই সে-কথার উত্তর দিল। হ্যাঁ, একটু আগেই আমি খেয়েছি।

তা আমাকে খেতে দিচ্ছো না কেন? স্বামীর কথা শুনে শোভনা একবার চোখ দিয়ে শাসণ করলো। বললো, অফিস থেকে এসে হাত-মুখ না-ধুয়ে কবে খেয়েছে?

না-হয় আজ একটু নিয়মের বাইরেই গেলাম। মলয় বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, সেজন্য ঝগড়া করার কি আছে? কি বল মীনাক্ষী?

মা, আপনি তো সামনে রয়েছেন—মিনতির সুরে নালিশ জানালো শোভনা, আমি কী ঝগড়া করেছি? আবার বোনকে সাক্ষী ডাকছে! বলুক না, মীনাক্ষীই বলুক, বৌদির আবেদনে সাড়া নিয়ে মীনাক্ষী বললো, দাদা, আজকে কিন্তু তুমি শুধু শুধু লাগছো।

কোনদিনটা শুধু শুধু লাগে না? পূর্ণশশী বললেন, ও তো কারণ বিহীনই লাগে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধানো ওর ওই এক আনন্দ।

বাঃ তোমরা সবাই আমার বিপক্ষে গেলে চলবে কেন? মলয় হাসতে হাসতে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে বললো, তোমার মত কি মামণি? তুমি কার দলে? বুলা এতোটুকু চিন্তা-ভাবনা না-করে সোজাসুজি উত্তর দিল, আমি মা'র দলে।

কী হলো? বিজয়ীর হাসি হেসে শোভনা ঘোষণা করলো, দল ভারী করতে পারলে না তো?

আজ আমি সম্পূর্ণ পরাজিত। আচ্ছা, আর একদিন দেখা যাবে। মলয় হাসতে হাসতে বললো, তখন হয়তো সঞ্চয়কেই নিজের দলে পাবো।

আমিও কিন্তু বৌদির দলে। সঞ্চয়ের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের সম্মিলিত কলোচ্ছ্বাসে সারা ঘর মুখরিত হয়ে হাসির জলতরঙ্গ বেজে উঠলো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজনে নিঃশব্দে ওভারব্রীজটা পার হলো। মুখরিত স্টেশন। একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ওঠা-নামা করছে লোকজন। মানুষের কোলাহলে স্টেশন এলাকা যেন প্রাণ ফিরে পেল। ফেরিওয়ালাদের সম্মিলিত চিৎকার। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জিনিস বিক্রি করবার আশায় চিৎকার আর বক্তৃতার মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সবিতা আর মীনাক্ষী একটু আগে আগে হাঁটছিল। সামান্য পিছনে সঞ্চয়। দুটি ছেলে ওদের পিছনে লেগেছে। মীনাক্ষীর দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে নিচু সুরে কি যেন বলাবলি করছে। হাসছে। মীনাক্ষী কিন্তু টের পায়নি। সে তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছে। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছেলে দুটি মীনাক্ষীর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে সমানে দৃষ্টি ফেলছে। লম্বা মতো ছেলেটি একটি সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, বাংলা ছবিতে সেই দুটি একটি নায়িকা। এক মুখ। দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেল। অথচ রাস্তা-ঘাটে যে কতো সুন্দর সুন্দর মুখ দেখতে পাওয়া যায় প্রযোজকদের কি চোখে পড়ে না? মীনাক্ষী কথাটা শুনলোমাত্র। ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না। শুধু হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকালো পিছনের দিকে। সঞ্চয় এগিয়ে আসতেই তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিল আবার। ছেলে দুটি সঞ্চয়কে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে কোনও সুবিধে হবে না জেনে সোজা পা চালালো। সঞ্চয় বললো, আমি এতোক্ষণ আপনাদের বাড়ির কথা ভাবছিলাম। ভারী চমৎকার মানুষ আপনার মা, দাদা, বৌদি।

আমার কাকাকে দেখেননি তাই, উনি আরও ভালোমানুষ।

বাড়ির সবাইকে দেখেই সেটা বুঝতে পারছি। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কেমন সুন্দর বন্ধুর মতো সহজ-সরল সম্পর্ক। স্বতঃস্ফূর্ত, হাসিখুশি সবাই। তবে—সঞ্চয় একটু চুপ করে থেকে বললো, আপনাকে দেখলে মনে হয়........

কি? পথ চলতে চলতে মীনাক্ষী, সঞ্চয়ের দিকে চাইলো। কি মনে হয়?

না, থাক। কৌতূহল বাড়িয়ে তুলবার জন্য সঞ্চয় চেপে গেল। মীনাক্ষীর প্রতিক্রিয়াটুকু দেখাই যাক না—

আহা থাকবে কেন? অর্ধেক যখন বলেই ফেলেছেন, বাকিটাও শেষ করুন। সঞ্চয় মীনাক্ষীর চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। হাসতে হাসতেই বললো, বাড়ির সকলের চেয়ে আপনি একটু বেশি গম্ভীর। কথাটা শুনে মীনাক্ষী কোনও উত্তর দিল না। ম্লান হাসলো। কিন্তু খোঁচা দিল সবিতা। বললো, তোমার সঙ্গে রাতদিন কলকল করে যদি গল্প করতো; তাহলে ও নিশ্চয় তোমার বিচারে মুখর হতো।

আমি ঠিক সে-কথা বলতে চাইনি। পথ চলতে চলতে তর্ক করা যায় না। সবিতা ঠিক ওই পথেই নিয়ে যাবে। সব দিক বিবেচনা করে সঞ্চয় তাই চুপ করে গেল।

সন্ধ্যা হতে তখনও একটু দেরি আছে। কিন্তু ছোটদের সাজগোজ রবের সাড়া পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আসতে শুরু করবে। বৌভাতের আনন্দ উৎসবের পূর্ণ জোয়ার তখনও আসেনি। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাজগোজ করে কলকাকলীতে সারা বাড়িতে কল্লোলিত স্পন্দনের ঢেউ তুলে জোয়ারের আগমনী বার্তা জানাচ্ছে। মেয়ের দল নতুন বৌকে সাজিয়ে সুন্দর করে সুন্দরতম করে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ যেন সারা বাড়িতে ঢেউ আছড়ে পড়লো। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কাজে ব্যস্ত। সঞ্চয়, বড়ো মামার গলা শুনতে পেল।—কি রে হরি! কলাপাতা, গ্লাসগুলি ধুয়ে রেখেছিস তো? বড়ো ড্রামগুলি খালি দেখলাম। জল ভরবি কখন? তরুণকে একবার ডাক, চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে দিক। প্রাথমিক কাজগুলি সেরে নেওয়া ভালো। সঞ্চয় গেল কোথায়? ডাক শুনে সঞ্চয় এগিয়ে যেতেই বড়ো মামা বললেন, তোকে মিষ্টি আনতে যেতে হবে।

আমি একা?

হ্যাঁ। পিকুকে অন্য কাজে পাঠিয়েছি। অসুবিধে তো কিছুই নেই, একটা ট্যাক্সিতে মিষ্টিগুলি তুলে নিয়ে সোজা চলে আসবি। আর শোন, আড়াইশো টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া ছিল। এখন নিয়ে যা চারশো। তোর বড়ো মামির কাছে টাকা রয়েছে। দেরি করিস না যেন, যাবি আব আসবি। ডেকরেটিং-এর লোকটাকে চোখে পড়তেই বড়ো মামা তার কাছে এগিয়ে গেলেন।—এই যে মনোহর, সাতাশখানা চেয়ার কম দিয়েছো যে! এমন কাজ করো না তোমরা, যে-কাজের কোনও হিসাবই পাওয়া যায় না। লোকজন এসেই তো খেতে বসবে না, একটু বিশ্রাম নেবে বসবে। তা চেয়ার আনতে কাউকে পাঠিয়েছ তো?

যাকে পাঠিয়েছি, সে এক্ষুণি এসে পড়লো বলে—আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না।

বলছো যখন ব্যস্ত হবো না। কিন্তু দেখো শেষে যেন অসুবিধেয় পড়তে না-হয়। তুমি বরং এক কাজ করো। সাইকেলটা নিয়ে দোকানে চলে যাও। দেখো গিয়ে কতোদূর কি হলো!

এক এক করে নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। অর্থাৎ ভিড় বাড়তে শুরু করলো। নতুন বৌকে মাঝখানের বড়ো ঘরে অল্প উঁচু খাটের উপরে শো-কেসে সাজানোর মতো বসিয়ে রাখা হয়েছে। ফুলের গয়না পরা এক সৌন্দর্যময়ীকে দেখতে সে-ঘরে দর্শনার্থীর ভিড়।

সঞ্চয় মিষ্টি নিয়ে ফিরলো সময় মতোই। বড়ো মামাকে মিষ্টির হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে সে বড়োঘরে ঢুকতেই সবার আগে চোখে পড়লো যে-মেয়েটিকে, সে আর কেউ নয়—মীনাক্ষী! এই মীনাক্ষী কি তার আগের চেনা মীনাক্ষী? সঞ্চয় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। পলকহীন চোখে। মীনাক্ষীর পরনে নীল রঙের জর্জেটের শাড়ি। নীল রংয়ের ব্লাউজ। চুল বেঁধেছে ওই নীল ফিতে দিয়েই। চোখের কোলে যদিও পুরু করে কাজল টানা কিন্তু চোখের উপরের পাতা দুটি নীলাভ। সাবা মুখে, গলায় ক্রীম পাউডারের প্রলেপ। ঠোঁট দুটিতে খুব হালকা একটু লালের আভা। জর্জেটের শাড়িখানা মীনাক্ষীকে যেন গ্রাস করেছে। শুধু নীল আর নীল। মনে হয় একখন্ড মেঘমালা ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের একরাশ ঢেউ যেন এই ঘরের মধ্যেই আছড়ে পড়েছে। নীল সমুদ্রে ডুব দিয়ে মীনাক্ষী নীলাম্বরী সেজেছে। সঞ্চয় যতো দেখে, ততোই যেন আরও ভালো লাগে। এ যেন অন্য মীনাক্ষী। তার জানাশোনা আগের মীনাক্ষী নয়। আজকেই প্রথম দেখছে তাকে। মীনাক্ষী, সঞ্চয়ের দিকে তাকালো। দুজনেই চেয়ে রয়েছে দুজনের দিকে। সঞ্চয় দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। মীনাক্ষীও নয়। একটু একটু করে লজ্জা লাগছে। তবুও সে চেয়ে রইলো স্থির নেত্রে। সঞ্চয়ের দৃষ্টি ঝাপসা হতে থাকে। আর কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখের উপরে শুধু ভাসছে একখন্ড নীল মেঘ। নীল জলের তরঙ্গ। সারা ঘরখানা যেন নীল পর্দায় ঢাকা। দুজনে দুজনকে যেন প্রথম দেখছে। এই প্রথম! নীরব চাউনির মধ্যে যে অনুচ্চারিত, অনুক্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে তা-কি ভাষা পাবে না? মীনাক্ষীর ভাসা ভাসা আয়ত চোখ দুটি টল টল করছে। চোখেব পাতা কাঁপছে। নীলপাতা। সে আব তাকিয়ে থাকতে পারলো না সঞ্চয়ের চোখের দিকে চেয়ে। সঞ্চয়ের চোখে কি জাদু মিশে রয়েছে? একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। ফেরালেই মন খারাপ লাগে। ওদের চোখাচোখির এই লুকোচুরি খেলা ধরা পড়লো পিকুর চোখে। সে দবজার বাইরে থেকেই দুজনকে লক্ষ্য করছিল। এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সঞ্চয়ের কাছে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, ডাক্তার ডাকবো? সম্বিৎ ফিরে পেল সঞ্চয়। একটু নড়ে-চড়ে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলো কেন?

আমি ভাবলাম বুঝি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তোমার! দেখলাম, নট নড়ন চড়ন, নট কিছু, তারপরেই তাড়া দিয়ে বললো, এখানে থাকলে চলবে না। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে নাও। পরিবেশন করার ডাক এসেছে চলো!

রাত তখন নটা দুটো ব্যাচ শেষ হয়েছে। তৃতীয় ব্যাচ সবেমাত্র খেতে বসেছে। প্রত্যেক ব্যাচে ষাট-পঁয়ষট্টিজন লোক খেতে বসছে। পরিবেশনের একঘেয়ে ক্লান্তিতে সঞ্চয় ক্লান্ত। তারচেয়েও বড় কথা পরিবেশনে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। মন পড়ে আছে বড়ো ঘরে। পরিবেশনের মাঝে মাঝে বাববার দৃষ্টিটা সে দিকেই চলে যাচ্ছে। মন দেখতে চাইছে একজনকে। শুধু একজনকে। নীল

সমুদ্র। রাশি রাশি ঢেউ। এই নীল সাগরে ডুব দিতে ইচ্ছা করছে। রাখী এই ব্যাচে খেতে বসেছে। সে আজ আর থাকছে না। চলে যাবে। সে-কথাই বললো সঞ্চয়কে, আজ আমরা চলে যাচ্ছি। মনে মনে বিরক্ত হলো সঞ্চয়। রাখী চলে যাক অথবা থাক, তাতে তার কি আসে-যায়? আর সে-কথা তাকে জানিয়েই-বা ওর কি লাভ? চলে যাবে, যাবে—আগে থেকে নোটিস দেওয়ার কি আছে? পরক্ষণেই সঞ্চয় নরম হলো। বিচার ভঙ্গির দৃষ্টি পাল্টাল। হলো স্বাভাবিক। রাখীর কি দোষ? সে চলে যাবে, সে-কথাই শুধু জানিয়েছে। আলাপ পরিচয় থাকলে অমনভাবে তো লোকে জানায়ই। এতে রাগের কি আছে? আসলে সঞ্চয়ের মন-ই আজ বিক্ষুব্ধ। স্থির নেই। এলোমেলো মন। চোখের সামনে শুধু ভাসছে একখন্ড নীল আকাশ। মন পড়ে আছে তাকে কেন্দ্র করেই। সে-কারণেই রাখীর প্রতি সুবিচার করতে পারছে না।

দিল্লিতে ফিরে গিয়ে দেখা হবে আবার। সঞ্চয় ভদ্রতা করে বললো। ওটা না-করলে নয়, তাই বলা। অর্থাৎ কথার কথা! নচেৎ দেখা করার জন্য সে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। সঞ্চয় দু'খানা রাধাবল্লভী রাখীর পাতে তুলে দিল। বললো, চেয়ে নেবেন কিন্তু পরে যেন গাল-মন্দ করবেন না, লোকটার জন্য কিছু খেতে পারলাম না।

না দিলেও সে-কথা বলবো না। রাখী হাসলো। কথাটা বলতে পেরে সে যেন ভার মুক্ত হলো। অনুমান করে নিতে কষ্ট হলো না সঞ্চয়ের মিষ্টি কথার জালবুনে মোহ বিস্তারের চেষ্টা করছে রাখী। সুতরাং সময় থাকতে সরে যাওয়া ভালো। তাই করলো সঞ্চয়। রাধাবল্লভীর ঝুড়িটা নিয়ে ও-পাশে চলে গেল।

চতুর্থ ব্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের নিমন্ত্রিতদের খাওয়া শেষ হলো। এবাবে বাড়ির লোকেরা খেতে বসবে। আগের ব্যাচে ননীমামার পাড়ার বন্ধুবা খেয়েছে। এবারে তারাই পরিবেশনের ভার নেবে। সবিতা, মীনাক্ষীকে নিয়ে একটা কোণের দিকের জায়গা বেছে নিল। কোমরের তোয়ালেটা খুলে একজন পরিবেশনকারীর কাঁধে তুলে দিয়ে সঞ্চয়, পিকুকে ডাক দিল। পিকু ওর মায়েব সঙ্গে কথা বলছিল। ইশারায় জানালো, আসছে। সবিতা ডাক দিল, সঞ্চয়মামা এদিকে এসো। সঞ্চয় পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই সে চোখের ইশারায় বললো. ওই চেয়ারটাতে বোসো। ওই চেয়ারটা বলতে মীনাক্ষীর ডান পাশে একটি মাত্রই চেয়ার খালি রয়েছে। অর্থাৎ ওই সারির ওটাই প্রথম আসন। সঞ্চয় মীনাক্ষীর পাশে বসলো। এমনভাবে পাশাপাশি বসাও এই প্রথম। পা দুটি সামান্য একটু নড়াচড়া করলেও বুঝি-বা স্পর্শ হয়ে যাবে একের সঙ্গে অপরের। মৃদু বাতাস মীনাক্ষীর দেহের সুবাস নিয়ে মাতামাতি করছে। অদৃশ্য হয়ে লুকোচুরি খেলছে। সঞ্চয় অতো কাছাকাছি বসে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলো না লজ্জায়। পিকু আসতেই সবিতা তার পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললো, দেরি কোরো না। বসে যাও। পিকু বসতে বসতে নিচু কণ্ঠে বললো, সঞ্চয় দেখছি ভালো জায়গাটাই ম্যানেজ করেছে। ওটা কে আগলে রেখেছিল? মীনাক্ষী দেবী কি? কথাটা কানে গেল মীনাক্ষীর। সূর্যাস্তের শেষ আবীরে রাঙায়িত পাতলা ঠোঁটের মৃদু হাসিতে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ। কথাটা উচ্চারণ করতে মীনাক্ষী একটুও লজ্জা করলো না।

তা আমরা কি দেখতে সুন্দর নই? আমি—কি যেন বলতে যাচ্ছিলো পিকু। চুপ করে গেল। রাধাবল্লভী আর চপের লোক সামনে এসে পড়েছে। সুতরাং সকলের কাছে অর্থাৎ কিনা সকলকে জানিয়ে বেফাঁস কিছু বলা ঠিক নয়।

গল্প করে করে খাওয়া চলছে। মীনাক্ষীর পাতে একটু বেশি পরিমাণেই পোলাও ঢেলে দিল একজন। না-করবার কোনও সুযোগই পায়নি মীনাক্ষী। সে সবিতাকে অনুরোধ করলো, কিছুটা পোলাও তুলে নেবার জন্য। কিন্তু সবিতাই উল্টে তাকেও সেই একই অনুরোধ জানালো। হোক নিমন্ত্রণ বাড়ি, তবুও যথেচ্ছ ভাবে ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়াটা মীনাক্ষী পছন্দ করে না। কেন-না অপচয় করা ঠিক নয়। এমন অনেক লোক দেখেছে মীনাক্ষী, খেতে বসে পাতের উপর পাহাড় পরিমাণে সংগ্রহ-না-করলে তাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। অথচ খেতে পারে না কিছুই। সে যাই হোক—মীনাক্ষী কান্ডটা করলো তারপরেই। এতোটুকু চিন্তা-ভাবনা না-করে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজ ভাবেই নিজের

পাত থেকে বেশ কিছুটা পোলাও সঞ্চয়ের পাতে তুলে দিল। বললো, আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন আজ। সুতরাং আপনারই উচিত একটু বেশি খাওয়া। সঞ্চয় বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালো না। বরং মনে মনে সে খুশিই হলো। মীনাক্ষীর এই ছোট্ট কাজটুকুর মধ্য দিয়ে সঞ্চয় ঘনিষ্ঠতার, আপন হয়ে কাছাকাছি আসার সুর খুঁজে পেল। মীনাক্ষী যেন ক্রমশই তার কাছে এগিয়ে আসছে। এটা তো পরিষ্কার ব্যাপার যে, সঞ্চয়কে দূরের মানুষ ভাবলে কক্ষনোও সে এমনভাবে নিজেব পাতেরটা তুলে দিতে পারতো না। দিনের আলোব মতোই আরও পরিষ্কার তাহলো যাকে-তাকে এমন একান্ত-ভাবে দেওয়াও যায় না। ক্ষেত্র বিশেষ আছে। সঞ্চয় স্থান-কাল-পাত্র-ক্ষেত্র বিশেষের ঊর্ধ্বে। পিকু, মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। মুখে কিছু বললো না। কিন্তু জ্বালাতন শুরু কবে দিল খাওয়ার শেষে। মীনাক্ষী তখন দক্ষিণমুখী ঘরটায় ফুলশয্যার বিছানা খাট ইত্যাদি ফুল দিয়ে সাজাচ্ছিল। খাটের বাজুতে রজনীগন্ধার মেলা। যেন দোলনা নেমে এসেছে। বিছানার উপরে ফুলেব ছড়াছড়ি। পিকু বললো, খেতে বসে তোমরা যা আরম্ভ করেছিলে তাতে অনুষ্ঠানটুকু আর বাকি থাকে কেন! মীনাক্ষী হাসলো কথাটা শুনে। বললো, তোমার কথার কোনও উত্তর দেবো না। বড় জ্বালাতে পারো। এখন যাও তো—সাজাতে দাও।

তুমি কী নবকুমার যে পরের জন্যই সাবা জীবন কাঠ কেটে যাবে, নিজেব জন্য কিছুই করবে না? পরেরটা সাজিয়ে কি লাভ, নিজেরটা সাজাবে না? পিকু যেন কানে কানে মন্ত্র দিল।

ফেব পাগলামো শুরু করেছো? মীনাক্ষীর কথা শেষ হওয়ার আগেই সঞ্চয় ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওকে দেখেই পিকু বলে উঠলো, আচ্ছা সঞ্চয়! এই ঘব, এই শয্যা, ফুলের এই মেলা দেখে তোমার মনে কী কিছুই হচ্ছে না? কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে সঞ্চয সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কী আবাব হবে?

এই ধরো—মানে..............পিকু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছে না। শেষে রেগে গিয়ে বললো, তুমি একটা হোপ্‌লেস। আরে বাবা, বুকের মধ্যে বোম-টোমেব আওয়াজও হচ্ছে না? একেবারে নিরামিষ। তার কথার অর্থ ধরতে না-পারায় নিরাশ হলো পিকু। কোমল বিছানার উপবে দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, বেশ বিছানাটা। গ্রান্ড!! একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিই।

এতোই যখন শখ, তখন একজনকে আনলেই পারো?

হ্যাঁ। তারপরে রোজ রোজ কেন ফুলের বিছানা হবে না-বলে চিৎকার করে আমাকে ঘর ছাড়া করুক সেটাই চাও বুঝি? ও-সব বাজে ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। সবাই তোমার মতো লক্ষ্মী মেয়ে কিনা ফুলের বিছানা দূরে থাক, দড়ির খাটিয়াতেও আপত্তি নেই। অবশ্যই মনের মানুষ যদি কাছে থাকে। পিকুর কথা বলার ধরনে ছন্দ তুলে হাসলো মীনাক্ষী। একটু শাসনের সুরে বললো, বড্ড আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করেছো পিকুদা! একটু চুপ কবো, সবচেয়ে ভালো হয় এখান থেকে চলে গেলে।

তা না-হয় যাচ্ছি। সঞ্চয়ের দিকে চেয়ে সামান্য হেসে পিকু জানালো, ফুলের না-হোক অন্তত শুধু বিছানাটা তো পেতে দিয়ে যাও—

তোমরা যাও। সবিতাকে নিয়ে আমি পরে যাচ্ছি। এদিকে একটু কাজ রয়েছে।

কাজটা কি তা তো জানি, কিন্তু দেবী মীনাক্ষী, পরের ফুলশয্যা দেখে কি লাভ? তার চেয়ে আমাদের শরশয্যা পেতে দাও। দুই বন্ধুতে নিরামিষ রাতটা কাটিয়ে কণ্টকজ্বালার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করি।

অসভ্য কোথাকার! খালি উল্টো-পাল্টা কথা।

আজও পাশের বাড়িতেই ওদের বিছানা হলো। ওদের বলতে, পিকু আর সঞ্চয়। সবিতা ও মীনাক্ষী আজ ওই বাড়িতে শোবে না। কেন-না রাখী ও তার বাবা চলে গেছেন। সুতরাং এ-বাড়িতেই তাদের জায়গা হবে। সবিতা ও মীনাক্ষী দুজনে মিলেমিশে তোষক-চাদর ধরাধরি করে ওদের বিছানা পেতে দিচ্ছিলো। সঞ্চয় বললো, আজ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কথাটা শোনামাত্রই মীনাক্ষী একবার আড়চোখে সঞ্চয়ের দিকে তাকালো। পিকুর দৃষ্টি এড়ালো না তা সে

কৌতুক করে বললো, খেতে চাও দিতে পারি কিন্তু পারমিশন পেয়েছো কী খাবার? একজন যে সিগারেট পছন্দ করেন না। সঞ্চয়, মীনাক্ষীর তির্যক দৃষ্টির কথা না-ভুলে বললো, আমি-ই খাবোই তা তো বলিনি। শুধু বলেছি যে খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। শব্দ তুলে হেসে উঠলো পিকু। বললো, এতেই ভয় পেয়ে গেলে ব্রাদার!

বিছানা হয়ে গেছে তোমাদের, সবিতা বলে উঠলো। অর্থাৎ এবারে আমাদের ছুটি। তোমাদের কাজ করতে করতে অনেক সময় চলে গেল। এবারে আমরা যাবো। তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে যতোক্ষণ পারো গল্প করো। বকবক করো। আমরা চললাম—সঞ্চয় একটি গল্পের আসর বসাতে চাইছে। মীনাক্ষী গল্প করুক-না-করুক, কাছাকাছি থাকবে। চোখের সামনে থাকবে। ওর উপস্থিতিটুকুও ভালো লাগে যে! সেই উপস্থিতি যদি মুখর না-হয়ে নীরবও হয় তবুও ভালো। সঞ্চয় তাই বললো, এতো তাড়াতাড়ি?

হ্যাঁ। তুমি যদি ধ্যান করতে চাও অনায়াসেই তা করতে পারো। তবে আমাদের গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেরি করলে চলবে না। সবিতার উত্তর শুনে সঞ্চয় চোখে চোখে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। বালিশ দুটি ঠিক করতে করতে পিকু টিপ্পনী কাটলো, তোরা যখন যেতে চাইছিস যা, তবে বলছিলাম যে আমাদের বিছানা যখন ফুলের হলো না তখন তোদের মতো দুটো একটা সুন্দর ফুল যদি পাশে থাকে তাহলে মন্দ হয় না। সবিতা সোজাসুজি উত্তর দিল, আমি মোটেই সুন্দরী নই। অন্য কথা কিছু বলার থাকে তো বলো। পরে বন্ধুকে ডাকলো, চল মীনাক্ষী! দুজনে যখন ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছে সঞ্চয় অত্যন্ত কোমল সুরে ডাকলো, মাসি! থমকে দাঁড়ালো সবিতা। ফিরলো সঞ্চয়ের দিকে।

কি বলো? সঞ্চয় ওদের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে শান্ত দৃষ্টিতে মীনাক্ষীর চোখের ওপর চোখ রেখে উত্তর দিল, কিছু না। পরক্ষণেই আবার বললো, একটা কথা বলছিলাম.....সবিতার কোনওরকম রাখ-ঢাক নেই, যা বলবে সোজাসুজি। বাঁকা কথার জাল বুনে নয়, স্পষ্ট কথায়। সহজ ভাবেই তাই বললো, আমাকে না মীনাক্ষীকে? উত্তর না-পেয়ে পা চালালো বাড়ির দিকে। সঞ্চয় তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি যেন ভাবলো সবিতা। তার পরে ফিরে এলো আবার সঞ্চয়ের কাছে। নিচু গলায় প্রশ্ন করলো, মীনাক্ষীকে কিছু বলবে?

সুযোগ পেলাম কোথায়?

ডেকে দেবো?

না। সঞ্চয় আর দাঁড়ালো না। পাতা বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। সবিতা পায়ে পায়ে ফিরে এলো মীনাক্ষীর কাছে। আস্তে আস্তে বললো, আমার মনে হয় সঞ্চয় বোধহয় তোকে কিছু বলতে চাইছিল। তুই ওকে কিছু বলেছিলি নাকি? মীনাক্ষী সঞ্চয়ের কথাই ভাবছিল এতোক্ষণ। সঞ্চয় আজ মুখের কথা বেশি খরচ করেনি। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে। তখন থেকে সে বড়বেশি নীরবতা পালন করে চলেছে। অথচ কথা না-বলেও অনেক বেশি কথা বলেছে চোখের ওই অনুচ্চারিত দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কেমন যেন উদাস আর করুণ সে-দৃষ্টি। মায়া হয়। কেন মায়া জাগছে, একটু দুঃখও অনুভব হচ্ছে, মীনাক্ষী তার ব্যাখ্যা করতে পারবে না। সঞ্চয়ের গভীর মধুর দৃষ্টি তাকে বারবার অন্যমনস্ক, উদ্বেলিত করে তুলেছে। ওর সম্বন্ধে কিছু গভীর ভাবে ভাবতে গেলে সারা দেহে কাঁপন ধরে। বাতাসে ঝাউগাছের মতো হিল্লোল। নিস্তব্ধ পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মতো দেয় দোল। সবিতার প্রথম কথায় নতুন করে ভাবলো মীনাক্ষী। সত্যই কি সঞ্চয় তাকে কিছু বলতে চেয়েছিল, অবশ্য নতুন করে আর কি বলার আছে? মুখের বলাটাই তো সব নয়। মীনাক্ষী ওকে পাঠ করেছে, জেনেছে, চিনেছে। সঞ্চয় কিছু না-বলেও অনেক কিছু বলেছে। মীনাক্ষী, সবিতার শেষের কথাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করলো মনে মনে! বুঝতে পারলো, সবিতা নিশ্চয়ই অনুমান করেছে, সে বোধহয় সঞ্চয়কে কিছু জানিয়েছে। যে-কারণে সঞ্চয় তাকে বলবার জন্য কাছে পেতে চাইছে। মীনাক্ষী শুধু বললো, না আমি কিছু বলিনি।

আজ বৃহস্পতিবারের সকাল। আগামীকাল রাতের ট্রেনে সঞ্চয় দিল্লি রওনা হবে। সকালবেলা

ঘুম থেকে উঠেই যেন মনে হলো, সময় আর নেই। কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই নেমে আসবে দূরত্ব। সময় নষ্ট করতে চাইলো না সঞ্চয়। সামান্য সময়ও আজ তার কাছে মহামূল্যবান। এই মূল্যবান সময়ের মুহূর্ত দিয়ে গড়ে উঠবে তাব কাছে স্মৃতির তোরণ। সঞ্চয় স্মৃতিচারণা করবে। সে-স্মৃতি বেদনাদায়ক হলেও মধুর। অনেক বেশি আনন্দের। সঞ্চয় ও পিকু যখন ঘুম থেকে উঠে এলো, এ-বাড়িতে তখন নতুন বৌকে নিয়ে হাসি-আনন্দের গান শুরু হয়েছে। ওরা সেই আনন্দের ভিড়ে মিশে গেল না। ননীমামার নতুন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। মীনাক্ষী বড়ো ঘরের দরজার গায়ে কোমর ভেঙে আশ্চর্য এক ভঙ্গিমায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্চয় ওকে শুনিয়েই কথাটা বললো, কবে মরে যাই তার ঠিক কি, এ-সব বিশেষ বিছানায় একটু শুয়ে নিই। কথাটা যদি পিকু বলতো, মীনাক্ষী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতো, সকালবেলাতেই এ-সব অলুক্ষণে কথা কেন? এছাড়া কি কোনও কথা নেই? যেহেতু সঞ্চয় বলেছে, সুতরাং প্রতিবাদ করতে লজ্জা করছে। সবিতা বোধহয় ওদেরকে দেখতে পায়নি এতোক্ষণ; দেখতে পেয়ে চলে এলো সঞ্চয়ের কাছে। চাপা হাসি হেসে বললো, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?

কোনটা শুনলে তুই খুশি হবি? সঞ্চয় হাসলো। বললো, হয়েছিল। কালকে একটা সুন্দব স্বপ্ন দেখেছি। নীল ফুল। নীল একটা অপরাজিতার স্বপ্ন দেখেছি। ঘুম না-হবাব কোনও কাবণই নেই।

যতোই জোর দিয়ে আর হেসে বলো না কেন, আমি জানি। ঘুম তোমার হতে পাবে না। যাক গিয়ে ও-সব ছাড়ো। আজ একটা সিনেমার প্রোগ্রাম করলে কেমন হয়? সবাই মিলে সিনেমায় যাবো। দেখাবার দায়িত্ব তোমার।

বাঃ! এটা কেমন বিচার হলো? বিয়ে কবলো ননীমামা আর সিনেমা দেখাবো আমি? সঞ্চয়, পিকুকে নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো ননীমামার কাছে। ঘেরাও করলো তাকে। টাকা দিতে ননীমামার আপত্তি নেই আপত্তি শুধু একটা দিন যেতে-না-যেতেই গ্রাম্য জামাইয়ের মতো নতুন বৌকে পোঁটলা বেঁধে সিনেমায় নিয়ে যেতে। কিন্তু সঞ্চয় জানালো, আগামীকালই সে চলে যাবে, সুতরাং সময় কোথায়? ননীমামা তখন আর আপত্তির সুর তোলেনি। সঞ্চয়ের হাতে টাকা তুলে দিয়েছে।

শ্যামবাজার যেতে হবে টিকিট কাটতে। সঞ্চয় পিকুকে মনের কথা খুলে বললো। মীনাক্ষীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। পিকু কথাটা মেনে নিল। মীনাক্ষীকে কাছে ডেকে বললো, আমাদের সঙ্গে টিকিট কাটতে চলো। একখানা-দু'খানা নয়—আনলাকী থারটিন। দুজনকে যদি এতোগুলো না-দেয়?

সবিতাকে নিয়ে যাও।

সবিতা তো যাচ্ছেই। তুমিও চলো—

যেতে আমার ভালো লাগছে না। মীনাক্ষীর উত্তর শুনে পিকু চোখে চোখে সঞ্চয়ের দিকে তাকালো নীরব ভাষাতেই বললো, এবারে তুমি বলো। যদি কিছু হয় তুমি বললেই হবে। কোনওরকম ভূমিকা করলো না সঞ্চয়। পরিষ্কার বললো, যাবেন না কেন? আমরা এই চারজন এই কটি দিন একসঙ্গে মিলেমিশে থেকেছি, খেয়েছি, গল্প করেছি। এরপরে হয়তো আপনাকে আর অনুরোধ কববো না কেন-না আপনি থাকবেন এখানে। আমি চলে যাবো অনেক দূরে। আনন্দের মুহূর্তের এই দিনগুলিও আর ফিরে পাবো না। সুতরাং যেটুকু সময় পাওয়া যায় তাকে হাসিতে-খুশিতে ভরে তুলতে আপত্তি কীসের? চলুন—মেধাবী ছাত্রীর মতো একমনে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল মীনাক্ষী। শেষে কাঁপা দৃষ্টিতে সঞ্চয়ের চোখের দিকে তাকালো। ছেলেটি কি সুন্দর কথা বলতে জানে। কথার জাল বুনে সুপ্ত মনকে কেমন নাড়া দিতে পারে! মনটা যেন কোথায়, কোন দূরে হারিয়ে যায়। মীনাক্ষী আর আপত্তি করতে পারলো না। সে-সাহস তার নেই। নীরবে মেনে নিল সঞ্চয়ের কথা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চারজনে জেসপ্ কোম্পানির রেললাইন ধরে বাস রাস্তার দিকে এগোতে লাগলো। লাইনের উপরে দৈত্যের মতো রেলের কামরাগুলি এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কামরার দেহ থেকে নতুনের গন্ধ আসছে। অনেক উঁচুতে একটি কেন্দ্রের মাথায় ভারী যন্ত্রের কি যেন একটা

মেসিন খেলনার মতো ঝুলছে। নীচে দাঁড়িয়ে সেটাকে লক্ষ্য করছে কয়েকজন শ্রমিক। ওরা সাবধানে এ-পাশ দিয়ে হেঁটে চললো। পিকুর মাথা সবসময়েই দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা। কাউকে রাগিয়ে দিয়ে মজা উপভোগ করতে বেশ লাগে। সেই চেষ্টাই সে আরও একবার করলো।

খুব যে বলেছিলে আসবো না! ভালো লাগছে না!! এবারে কি হলো? আসলে আসবার ইচ্ছাটা পুরোপুরিই ছিল। শুধু সঞ্চয়ের অনুরোধের অপেক্ষায় ছিলে। নয়তো কি? আমি বললাম, তাতে মন উঠলো না। সঞ্চয় বলতেই এককথায় রাজি। অমনি কেটে গেল আপত্তির মেঘ।

এমন করে বললে কিন্তু আমি যাবো না। মীনাক্ষী যেন নোটিশে দিল, এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবো।

তাই যাও না। মীনাক্ষী অসহায়ের দৃষ্টিতে সঞ্চয়ের দিকে তাকালো সমর্থনের আশায়। অর্থাৎ যেন বলতে চাইছে, পিকুদার সাধ করে ঝগড়া বাধাবার কথাগুলি কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? নাকি আমাকে এমনভাবে বলাতে আপনার ভালোই লাগছে? চুপ করে থাকলো না মীনাক্ষী। মুখেও বললো, আপনি এবারে আপনার বন্ধুকে কিছু বলছেন না যে? নয়তো আমি সত্যি সত্যিই প্রমাণ করবো যে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। মীনাক্ষীর অভিযোগ শোনার পরেও চুপ করে থাকা সঞ্চয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সে পিকুকে ধমক লাগাল, আঃ পিকু! পিছনে লাগা তোমার একটা স্বভাব। থাকো না একটু চুপ করে।

বটে! আমারই সাহায্যে রাজ্য জয় করে এখন আমাকেই তাড়াতে চাইছো! একজনের মধুর সম্ভাষণে যখন প্রধান সেনাপতিকেই ভুলে গেলে তখন আমিও রাজি নই তোমার সঙ্গে থাকতে। আয় সবিতা, ওরা এ-পথে হাঁটুক। আমরা হাঁটবো ওই ফুটপাত দিয়ে।

তোমরা তাই যাও। মীনাক্ষী না-বলে আর থাকতে পারলো না। পিকুর মন আজ খুশিতে ভরা। একেই সে কৌতুকপ্রিয়। তায় আবার একজনের পিছনে লেগে তাকে সত্যিই রাগাতে পেরেছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সফল।

তাতে তোমার সুবিধে হবে কিছু? বলেই পিকু অর্থপূর্ণ হাসলো। সে-হাসির অর্থ পরিষ্কার। যদিও লজ্জা পেল মীনাক্ষী কথাটা শুনে তবুও সে অন্যান্য বারের মতো ভেঙে পড়লো না। কীসের লজ্জা! কার কাছে লজ্জা? পিকুদার কাছে ওই লজ্জার মূল্য আছে নাকি কিছু? মীনাক্ষীর সাবলীল উত্তর, অনেক!

এই তো দেখছি মুখ খুলেছে। পিকু হাসতে হাসতে আরও যোগ করলো তবে যে আমাদের সামনে মৌনব্রত পালন করে থাকো, সেটা তবে মিথ্যা? স্রেফ লোক দেখানো?

তোমাদের সামনে মুখ খুলতে যাবো কোন দুঃখে?

বাঃ! মীনাক্ষীদেবী যে অনেক কিছুই শিখে গেছে, তবে তো সত্যিই আর এখানে থাকা যায় না। কথাটা শেষ করেই পিকু ছেলেমানুষের মতো সবিতাকে নিয়ে অপর ফুটপাথে চলে গেল। ছোটরা যেমন খেলতে গিয়ে ঝগড়া করে, আড়ি-ভাব করে, এও অনেকটা সেই রকমই। ওরা ও-পাশে চলে যেতেই যথেষ্ট লজ্জা পেল মীনাক্ষী এবারে। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। সঞ্চয় মাঝে মাঝে মীনাক্ষীকে লক্ষ্য করছে। দুজনেই নীরব। চুপচাপ পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে ঠিক কোন কথাটি বললে ভালো হয়, মীনাক্ষী ভেবে পেল না। এমন পরিস্থিতিতে মীনাক্ষী এর আগে কখনও পড়েনি। ভারী খারাপ লাগছে তার। সবচেয়ে বেশি লাগছে লজ্জা। পিকুদা যে সত্যিই সবিতাকে নিয়ে ও-ফুটপাতে চলে যাবে তা কে জানতো? অমন ধরনের কথা তো এর আগে কতোই হয়েছে। কিন্তু সেই কথা অনুযায়ী কাজ হয়েছে কটা? আড়ষ্টতা কাটিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলো মীনাক্ষী। কথার অন্য কোনও সূত্র না-পেয়ে বললো, পিকুদা বড্ড বাজে কথা বলে।

কোন কথাটা বাজে লাগছে? সঞ্চয় মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তাতে আরও লজ্জা পেল মীনাক্ষী। বুঝতে পারলো সঞ্চয় তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার গোপন কথা আবিষ্কার করবে। প্রচেষ্টা তার সেই রকমই। হোক-না রাস্তায় পথচারীদের ভিড়। তবুও সেই ভিড়ের মধ্যে তারা দুজনে। তাদের মধ্যে এখন আর কোনও তৃতীয়জন নেই। দুজন দুজনকে জানবার, চিনবার, বলবার

এই সুযোগ। সঞ্জয় তাই একান্ত ভাবে ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পেরেছে। মীনাক্ষী তার প্রশস্ত বুকের সঙ্গে মাথাটিকে মিশিয়ে দৃষ্টি নিচু করে হাঁটছে। কোনও উত্তর না-দেওয়ার জন্য সঞ্জয় আবাবও জিজ্ঞেস করলো, কি বাজে বলেছে, বললেন না তো?

আপনি জানেন না? মাথা নিচু করেই মীনাক্ষী উত্তর দিল।

জানি।

তবে জানতে চাইছেন যে?

আপনার মুখ থেকে নতুন করে শুনবো বলে। সঞ্জয়ের মুখেব দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই মীনাক্ষী বললো, ওদেরকে ডাকুন।

হঠাৎ।

ওরা কি ভাবছে?

মানুষেব ভাবনার কি কোনও সীমাবেখা আছে? সুতরাং ওবা যা ভাবার ঠিক তাই ভাবছে। সঞ্জয় অম্লান হাসলো। একটু চুপ কবে থেকে কয়েক পা হাঁটলো। এক সময়ে আপন সুরে বললো, আগামীকাল যদিও রাত্রির ট্রেনে রওনা হচ্ছি, দমদম থেকে কিন্তু বেরুতে হচ্ছে সকালেই। পিসিমার বাড়িতে ওই একটি বেলা থাকতে হবে। সঞ্জয় একটু থামলো। এবপরে সে যে-কথাটি বলবে বলে স্থির করেছে, সেটাকে নিয়েই মনের মধ্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। বলাটা কি ঠিক হবে? অর্থাৎ শোভনীয় হবে কিনা সেদিকটাও খেয়াল করলো সঞ্জয়। তারপরেই বললো, আপনার একটা ফটো দেবেন আমাকে?

সবিতা ও পিকু কখন যে ও-ফুটপাথ থেকে এ-পাশে এসে ওদের পিছনে পিছনে হাঁটছে তা ওরা দুজনেব কেউই টের পায়নি। সঞ্জয়েব শেষের কথাটা কানে যেতেই পিকু বলে উঠলো, আলোচনাটা বেশ ভালোই জমে উঠেছে দেখছি। মন দেওয়া-নেওয়া সারা! এবারে কি ফটোর আদান-প্রদান চলছে? লজ্জায় মীনাক্ষীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দুই গালে আবীরেব রং লাগলো। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কোনও কথা-ই বলতে পারলো না। পিকুদার মুখের কোনও বাঁধন নেই। যা খুশি তাই অতি সহজে অনায়াসে বলে দিতে পারে। কোন কথায় কোন মানুষটা কতোখানি লজ্জায় পড়তে পারে, সে-হিসেব খুঁটিয়েও দেখে না। কিছু একটা বলতে পারলই সে আনন্দিত।

টিকিট কাটতে কোনও অসুবিধাই হলো না। একজনকেই তেরোখানা দিল। পিকু জিজ্ঞেস করলো, তেরোখানা টিকিট তো কাটা হলো, যাবে কে কে? পিকু এমনভাবে কথাটা বললো যেন সে বিরাট সমস্যায় পড়েছে। সিনেমায় যাবার লোক নেই অথচ টিকিট রয়েছে বেশি। সবিতা বললো, টিকিট একটিও বেশি হবে না। আমি নাম বলছি বড়দা, বড়োবৌদি, নতুনবৌদি, নতুনবৌদিব দুইবোন, ননীদা, ননীদার বন্ধু সাধনদা, শিশুদি, লক্ষীদি, তুমি, আমি—ক'জন হলো পিকুদা?

এগারোজন। আরও দুজন চাই--

আর নাম তো মনে আসছে না।

বাঃ! সঞ্জয় হাসলো। আমরা দুজন কি তালিকার বাইরে? কথাটা বলেই সঞ্জয় ওজন মাপবাব মেশিনে উঠে দাঁড়ালো। পয়সা ফেলতেই কাগজের টুকরোটা জানিয়ে দিল, সাতষট্টি কেজি। মীনাক্ষীকে বললো, আপনার ওয়েটটা দেখে নিন। উঠুন—

না! না!!

আপত্তি কীসের? উঠুন না—

হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঠো। পিকুও যোগ দিতে বলে উঠলো, আমাদের কাউকে বললো না বুঝলে মীনাক্ষী. তোমার ওজনটাই আগে ওর জানা দরকার। মেশিনে উঠতে যেটুকু রাজি হয়েছিল মীনাক্ষী, পিকুর কথায় এবারে সেই মতও পাল্টালো। বললো, আমি উঠবো না। রাগ কমাতে সঞ্জয়কেই এগিয়ে আসতে হলো। বললো, আপনি ওর কথায় রাগ করছেন কেন? উঠুন, সঞ্জয়ের বিনীত অনুরোধ এড়াতে পারলো না মীনাক্ষী। মেশিনে সবে মাত্র একটি পা তুলেছে...... শেষবারের মতো রাগাবার চেষ্টা করলো পিকু, সঞ্জয়ের কথা না-শুনে কি থাকা যায়? ওঠো ওঠো!

উঠবোই তো, তোমার কথায় তো উঠছি না।

সঞ্চয় ভীষণ আনন্দ পায়, পিকুর সঙ্গে মীনাক্ষীর এমন ধরনের ছেলেমানুষি সুলভ ঝগড়া শুনে। মীনাক্ষীব কথাগুলি তার ভালো লাগে। কেন-না ওর কথাগুলি তার পক্ষে যায়। তাকে সমর্থন করে। কাগজেব টুকবোটা বেরিয়ে আসতেই আয়ত চোখ দুটো ওব উপবে বুলিয়ে নিল মীনাক্ষী। সঞ্চয়েব দিকে চেয়ে হেসে ফেললো, সাতচল্লিশ কেজি।

অপূর্ব! পিকু এমনভাবে শব্দ তুলে হেসে উঠলো, যেন ভুলে গেল এটা সিনেমা হলেব লবি। বললো, আমরা না-হয় পিছনে লাগি। তোমাদেব সঙ্গে ফাজলামো কবি। কিন্তু এই যান্ত্রিক মেশিনটা? এ তো তোমাদের মধ্যেও মিল খুঁজে পেয়েছে। সাতষট্টি আর সাতচল্লিশ। সাতে সাতে মিলেছে ভালো। এখন সাতপাকে......পিকু তাব কথা শেষ কবতে পারলো না। মীনাক্ষী চোখ পাকালো তাব চোখের দিকে চেয়ে।

শ্যামবাজারেব পাঁচমাথাব মোড় থেকে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, মিনিট সাত-আটেব পথ। সঞ্চয় আগেই পিকুকে জানিয়ে রেখেছিল, টিকিট কেটে পিসিমার বাড়িতে যাবে। সুতরাং ওই পথে পা বাড়াতেই সবিতাও বুঝে নিল, এতো কাছে এসে সঞ্চয় তার পিসিমার বাড়িতে না-গিয়ে পাববে না। বুঝলো না শুধু মীনাক্ষী। সে শুধু জিজ্ঞেস কবলো, বাস তো মণীন্দ্র কলেজের দিকে, এদিকে যাচ্ছেন কোথায়?

সামনেই আমাব পিসিমাব বাড়ি। একটু ঘুরে আসবো চলুন—সঞ্চয়ের পাশাপাশি হাঁটছিল পিকু। সে এবারে মীনাক্ষীর পাশে চলে গেল। প্রায় ওব কানে কানে বললো, তোমার পিসিশাশুড়ীর বাড়ি। একটু ভালো হযে থেকো। প্রথম দর্শনেই যেন পছন্দ কবে নেয়। ও-কথা শুনে মীনাক্ষী কোনও উওর দিল না। বাস্তাব মধ্যে কি ঝগড়া কবা চলে? নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া ওই কথার মধ্যে মীনাক্ষী যেন বাস্তবের ছোঁয়া পেল। মন হলো উন্মনা, উদাস। মন চলে গেছে অনেক দূরে। একজনের স্ত্রী হিসাবে নিজেকে কল্পনা করলো। সত্যিই সে যেন পিসিশাশুড়ীর বাড়ি যাচ্ছে। সদর দরজার বেল টিপতেই ভেতব থেকে প্রশ্ন এলো, কে? সঞ্চয় উত্তর না-দিযে আরও বেশি করে বেল টিপতে লাগলো। দরজা খুললো শিবানী। পিসিমার ছোট মেয়ে। সঞ্চয়ের থেকে বছর দুয়ের ছোট হবে। আগে থেকে সঞ্চযের আসার কোনওরকম সংবাদ না-পেয়ে একেবারে রাজধানী থেকে কলকাতায় তাদেব বাড়ির দবজায় দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল শিবানী। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, মা, সঞ্চয়দা এসেছে।

শিবানী ওদেরকে ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালো। হেমলতা একটু বাদেই এলেন। সঞ্চয় প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, সবিতাকে দেখেই বুঝতে পারছি তুই দমদম থেকে আসছিস। দিল্লি থেকে কবে এলি?

এই সোমবারে এসেছি, কালকে রাতেব ট্রেনেই ফিরবো।

তবু যা হোক পিসিমাকে একবার মনে করেছিস। সেবারে কলকাতায এসে একবাব মুখও দেখিয়ে গেলি না। পিসিমা তোর কাছে ভীষণ পর তাই না রে সঞ্চয়! দুঃখ মেশানো কণ্ঠে হেমলতা বললেন, অথচ ছোটবেলায তুই আমার ভীষণ বাধ্য ছিলি। একমাত্র তোর মা ছাড়া আমার কোল থেকে অন্য কারও কোলে যেতে চাইতিস না। দুপুরে দলা মেখে পিসিমা না-খাইয়ে দিলে তোর খাওয়াই হতো না। এখন সেই পিসিমাকেই চিনিস না। কলকাতায় আসিস। অথচ আমার এখানে আসিস না। পিসিমাকে মনে থাকবে কেন বল? এখন তুই বড়ো হয়েছিস। ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিস। তোর বাবার চিঠিতে সবই জানতে পারি। অফিসে তোর অনেক সম্মান। হ্যাঁ রে সঞ্চয়! তা এই পিসিমার কাছে এলে কি তোর সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে?

কি যে বলো পিসিমা তার ঠিক নেই। আমার আবার কীসের সম্মান? তোমাদের কাছে আমি সেই সঞ্চয়ই আছি। সামান্য একটু থেমে সে আবার বললো, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এ-হলো পিণাক। বড়ো মামিমার ছোট ভাই। সঞ্চয় এবারে মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। বললো, সবিতার বন্ধু। সেই সঙ্গে আমাদেরও। সকলেই হেমলতাকে প্রণাম করলো। আশীর্বাদ করে হেমলতা মীনাক্ষীকে

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি মা?

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। হেমলতা শিবানীর দিকে চেয়ে বললেন, ওর মুখটা অনেকটা তোর দিপালীদির ননদের মতো। তাই না? শিবানী মীনাক্ষীর মুখের দিতে তাকিয়ে হাসলো। অর্থাৎ ঠিক তাই।

ননীমামাব বিবাহ-বৃত্তান্ত এবং সেই উপলক্ষেই তার কলকাতায় আসা সবই সঞ্চয় একে একে হেমলতাকে জানালো। সব শুনে হেমলতা আসল প্রশ্ন করলেন, চার-পাঁচদিন হলো এসেছিস অথচ সময় করে একবার আসতে পারলি না? সেই আসা এলি কিনা ঠিক চলে যাবার মুখে? মামাবাড়িতে অতোগুলি দিন রইলি পিসীমা কি অপরাধ কবলো যে তার বাড়িতে একটা দিনও থাকতে পারিস না, আজকেই চলে আয়।

কাল সকালেই আসবো পিসীমা। আজকে সবাই মিলে দুপুবে শ্যামবাজারে আসছি সিনেমা দেখতে। দমদম ফিরতে সন্ধ্যা হযে যাবে। তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাত করে নাই-বা এলাম।

কাল সকালেই আসবি তো?

তুমি নিশ্চিন্তে থাকো পিসীমা। আসবো। সঞ্চয় হাসলো। হেমলতা বললেন শিবানী ওদের জন্য চা কর মা। শিবানী চলে যেতেই হেমলতাও উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ যেন একটা মূল্যবান কথা মনে পড়ে গেছে যা এই মুহূর্তে না-বললেই নয়। হেমলতা তেমন সুরেই বললেন, হ্যাঁ রে সঞ্চয়। আমার হাতখানা একবার দেখে দিস। আগেব বারে যা-যা বলেছিলি সবই মিলে গেছে। তোর উপর তাই আমার খুব বিশ্বাস। হেমলতা ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, আপনি হাত দেখতে পারেন? সঞ্চয় ম্লান হেসে উত্তর দিল, একটু-আধটু পাবি এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। মীনাক্ষী তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো সঞ্চয়ের কাছে। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দেখুন আমার হাতটা—

সঞ্চয় যে-সোফাটায় বসেছিল সেটি দুজনেরই। তবুও সে একপাশে সরে গিয়ে মীনাক্ষীকে বললো, বসুন। সঞ্চয়ের পাশে বসলো মীনাক্ষী। স্বাস্থ্য কারোরই খারাপ নয়। তায় সোফার দু'পাশের হাতল আবার স্থানটুকুকে বেঁধে দিয়েছে। সুতরাং গায়ে গা লাগছে। সরে বসার কোনও উপায় নেই। সঞ্চয় ওর কোমল হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। মীনাক্ষী একবার বেতসপাতার মতো কেঁপে উঠলো। পিকু বললো, আমি যা জিজ্ঞেস করবো, মীনাক্ষীর হাত দেখে তুমি তার উত্তর দেবে। প্রথমেই ওর বিয়ে সম্পর্কে বলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকালো মীনাক্ষী, ও-সব বলতে হবে না। পিকু সে-কথা শুনলো না। প্রথম অস্ত্র ছাড়লো সে, বিয়েটা কি ভালোবাসাঘটিত হবে? মীনাক্ষীর হাতের রেখার উপরে চোখ দুটিকে নিবদ্ধ করে সঞ্চয় পরে উত্তর দিল, হবেই সে-কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। হলেও হতে পারে।

এই তো ব্রাদার এড়িয়ে যাচ্ছো। সঠিক করে একটা কিছু বলো। ইয়েস অর নো। যাক গিয়ে, ছেলেমেয়ের সংখ্যা? অর্থাৎ পোঁটলা-পুঁটলি কতো হবে? সঞ্চয় একটু হেসে উত্তর দিল, আজকের দিনে ওটা বলার কোনও অর্থ হয় না। তবুও গোটা দুই ধরতে পারো।

মাত্র! সখেদে উচ্চারণ করলো পিকু। তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। মীনাক্ষী বুঝতে পারলো পিকুদার মন্তব্য এবারে শুরু হবে। সুতরাং তার আগেই সাবধান হওয়া ভালো। সে বলে উঠলো, আমি আর হাত দেখাবো না। কথা শুনে হাসলো পিকু।

সে-কি! মাত্র দুটোতেই শখ মিটে গেল?

তোমার মতো একটা বিচ্ছু হলেই যথেষ্ট। দুটোরও তাহলে প্রয়োজন হবে না।

কটার প্রয়োজন হবে-না-হবে, সে-আয়োজন তো সেই মহাদেব নামক পুরুষটি করবেন। তুমি আর কি করবে? একযুগ বাদে একদিন দেখা হলে দেখতে পাবো মীনাক্ষীদেবী ভারতীয় ফুটবল দলকে নিজের এগারোজনকে দিয়েই ভরিয়ে রেখেছে। মীনাক্ষী রাগে ও লজ্জায় পিকুকে যে কি বলবে ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট দুটি শব্দের মাধ্যমে নিজের রাগ প্রকাশ করলো, একটা অসভ্য!

হেমলতাকে হাতের কাজে সাহায্য করেই ড্রইংরুমে ফিরে এলো শিবানী। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। সুন্দর স্বাস্থ্য। দেখতে সুন্দরীর পর্যায়েই সে পড়ে। হেমলতা বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের এক কথা। বিয়ে সে করবে না। সারা জীবন আবার বাবার কাঁধে চেপে বসে থাকতেও নারাজ। তাই বি.এ. পাশ করে নিবেদিতা গার্লস স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়েছে। গতবছর বি.টি. পাসও করেছে। ঘরে এসেই শিবানী বললো, দিল্লিতে আর কতোদিন থাকছো সঞ্চয়দা?

আরও বছর পাঁচেক তো বটেই তবে........সঞ্চয়ের কথা শেষ হলো না। ওকে থামিয়ে দিল পিকু। শিবানীর দিকে চেয়ে মিনতির সুরে বললো, এক মিনিট বিরক্ত করছি। হাত দেখার সময়ে সঞ্চয় ও মীনাক্ষী সেই যে একটি সোফায় গায়ে গা ঘেঁষে বসেছিল এখন তাই রয়েছে। উঠবার কথা কারো মনে হয়নি। অথচ ওই আসনের মধ্যে দুজনের বসতে সত্যই একটু অসুবিধা হচ্ছে.....পিকু সাবলীল ভঙ্গিমায় বললো, মীনাক্ষী তুমি কি এখনও সঞ্চয়ের পাশে বসে থাকবে? সিলিং-এর দিকে তাকালো পিকু। হাত দেখা তো অনেক আগেই শেষ হয়েছে। শিবানী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সকলের মুখ চাওয়া-চাউয়ি এবং মুখ টিপে হাসাহাসির মধ্য দিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে সে আসল রহস্য খুঁজে পেল। মীনাক্ষীর লজ্জা ভরা সুন্দর আনত মুখখানির দিকে চেয়ে ভারী মায়া হলো। মিষ্টি হেসে সে বললো, একমাত্র হাত দেখাতে হলেই বুঝি সঞ্চয়ের পাশে বসা যায়? অন্য সময়ে নয়? শিবানীর কথা শুনে মনে মনে ভীষণ খুশি হলো মীনাক্ষী। যোগ্য উত্তর পেয়েছে পিকুদা। মীনাক্ষী কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে শিবানীর দিকে চেয়ে হাসলো। পিকু হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে তুলে বললো, আর কোনও আক্রমণ নয়—আমি স্যারেন্ডার করছি।

একটি বড়ো ট্রে-তে করে খাবার সাজিয়ে আনলেন হেমলতা। মাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে গেল শিবানী। তাঁর হাত থেকে ট্রেখানি নিজে নিয়ে সবাইকে পরিবেশন করলো। দুটি করে স্যান্ডউইচ। তিন রকমের মিষ্টি। বেলা দশটার সময় খাবারের এতো আয়োজন দেখে সঞ্চয় বললো, এতো কিছু দিলে কেন পিসিমা? মিষ্টি-ই তিন রকমের।

তাতে কি হয়েছে? হেমলতা প্রশান্ত হাসলেন। ওরা তো এর আগে আসেনি। এই প্রথমবার এলো। শুধু মুখে ...পিকু হেমলতার কথা শেষ হতে দিল না। তার মানে, পিসিমা! দ্বিতীয়বার আপনার বাড়িতে এলে এতো সব খেতে দেবেন না। এই তো?

পাগল ছেলে! হেমলতা হেসে ফেললেন। হাসলো সকলেই। পিসিমার বাড়িতে প্রথম আর দ্বিতীয় কি? এলেই হলো। তারপরে সঞ্চয়ের দিকে পরম স্নেহে তাকালেন। তুই কি আবার বদলী-টদলী হবি নাকি?

আদৌ আর বদলী হই কিনা তাই দেখো। সঞ্চয় হাসতে হাসতে বললো, দিল্লি অফিসে আমার উপরে যদিও আর একজন রয়েছেন, কিন্তু সব কিছু দেখা-শুনা দায়-দায়িত্ব আমারই বেশি। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-সংস্থার কথা ছেড়ে দাও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে চিফের চেয়ে আমারই বেশি যোগাযোগ। কয়েকজন মন্ত্রী তো আবার কোম্পানিকে চেনে না। তারা জানে আমাকে। এবং সেই যোগাযোগের সূত্রে কোম্পানির সেল বর্তমানে আকাশ ছোঁয়া। সুতরাং এই অবস্থায় যদি বদলী করে.... ..

সবই তো বুঝলাম। এবারে একটা বিয়ে কর। বলিস তো মেয়ে দেখি। মায়ের কথা শুনে শিবানী বললো, তোমাকে দেখতে হবে না। সঞ্চয়দা নিজেই দেখে নেবে।

ঠিক বলেছেন। পিকু শিবানীকে সমর্থন করে হেমলতার দিকে তাকালো। বুঝলেন পিসিমা, ওটা সঞ্চয়ের ওপরেই ছেড়ে দিন। ভালো-মন্দ নিজেই দেখে-শুনে করুক।

তা তেমন যদি কেউ থাকে বল না? বুড়ী পিসিমার কাছে লজ্জা কীসের? হেমলতা স্নিগ্ধ হাসলেন। নিজে যদি বলতে না-পারিস না-হয় আমিই তোর বাবাকে জানাবো। সঞ্চয় দেখলো এই সুযোগ। মীনাক্ষীকে সে আপন করে নিজের কাছে পেতে চাইছে। যদিও সে-কথা ওকে কখনোই খুলে বলেনি অর্থাৎ ওই নিয়ে আলোচনা করেনি। যেটুকু ওদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছে তা হলো স্রেফ আভাসে,

ইঙ্গিতে। কিন্তু তার উপর কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই নিশ্চিন্তে ভর করে চুপ করে বসে থাকা যায় না। কেন-না মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্তের সেই পরম বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। সঞ্জয় তাই বললো, তোমার কাছে লুকাবো না পিসিমা। একজনকে ভালো লেগেছে তবে ওপক্ষ থেকে এখনও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কথাটা যদিও পিসিমার উদ্দেশে, মুখ্যত সঞ্জয় শোনালো মীনাক্ষীকেই।

কেন রে! তুই কী একতরফা চাইছিস তাকে? সে মেয়ে কি বলে?

সে মেয়ে কথা না-বলে আপাতত আমাকে দেখছে, কতোদূর বাড়তে পারি!

শিবানী একফাঁকে উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলো। প্রত্যেককে দিয়ে নিজেও একটি কাপ নিল। চায়ে চুমুক বসিয়ে নীরবে লক্ষ্য করলো মীনাক্ষীকে। সঞ্জয়দার ভাবী আপন মানুষ যে মীনাক্ষীই সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। ওদের কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে শিবানীর নিজস্ব যে-চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে তাতে মিলে গেছে আরও অনেক সূত্র। ওদের দুজনের দৃষ্টির নিবিড় গভীরতা শিবানী অনেকবার লক্ষ্য করেছে। তাতেই সে হয়েছে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এখনই কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। সেটা শোভনীয়ও নয়। সঞ্জয়দা কালকে আসছে। তখনই জেনে নেবে। শূন্য চায়ের কাপটি টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে সঞ্জয় বলে উঠলো, পিসিমা এবারে উঠবো। এগারোটা বাজে। দোরগোড়া পর্যন্ত হেমলতা ওদেরকে পৌঁছে দিলেন। বললেন, সঞ্জয় কলকাতায় থাকে না। সেইজন্য তোমরা কিন্তু আসতে দ্বিধা কোরো না। পিসিমার সঙ্গে আলাপ হলো, যে-কোনও দিন চলে এসো।

নির্দিষ্ট স্টপেজে বাস দাঁড়ালো না। বাস এসে থামলো 'হিজ্ মাস্টারর্স ভয়েসের' ওখানে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়লো চারজনে। এদিক দিয়ে বাড়ি পৌঁছাতে একটু বেশি সময় লাগবে। তা এখন আর কি করা যাবে? তবে এই পথে রেললাইন পড়বে না। রেলের স্লিপার ভেঙে পথ চলতে হবে না। মোড়ের দোকান থেকে পিকু সিগারেট কিনছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবিতা। সঞ্জয় মীনাক্ষীকে নিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ ওরা আসুক আমরা এগুতে থাকি। এমন ফাঁকা সময় সঞ্জয় এরপরে হয়তো আর পাবে না। সিনেমা দেখতে যাওয়ার আগেই কথাটা বলতে হবে। বাড়ি পৌঁছে বলা সম্ভব হবে না। কেন-না অনেক লোক থাকবে ঘরে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলাও অসম্ভব। ধরা পড়লে সেটা খারাপ দেখাবে। সুতরাং যদি বলতে হয় তবে এখনই। পিকু ও সবিতার আসার আগেই। সঞ্জয় আস্তে বললো, সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময়ে আপনি কিন্তু গতকালের শাড়িটা পরবেন। নীলাভ শাড়ি ও ব্লাউজের কথা মনে পড়লো মীনাক্ষীর। গতকাল যে ওই পোশাকেই নিজেকে সাজিয়েছিল। কিন্তু অবাক হলো মীনাক্ষী। এই কদিনে তো কতো শাড়ি, কতো রং-ই গায়ে জড়ালো অথচ বিশেষভাবে একটিমাত্র দিনের সাজ-সজ্জার কথা সঞ্জয় মনে রেখেছে কেন? অবশ্য এই মনে রাখার উৎস যে ভালোলাগা, সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অনুমানের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দেবে না মীনাক্ষী। সঞ্জয়ের মুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছে করছে। কথাটা যখন সে বলেছে সুতরাং সেই বলার পিছনে যুক্তিও রয়েছে। যুক্তিটাই সঞ্জয়কে ভেঙে বলতে হবে। মীনাক্ষী তাই ছোট্ট সুরে প্রশ্ন করলো, কেন? প্রশ্ন শুনে সঞ্জয় কোনওরকম ভূমিকা করলো না। মীনাক্ষী তাকে ফাঁসি দেবে না। স্পষ্ট বললো, ওই নীলাভ দ্যুতিতে আপনাকে খুব ভালো লাগছিল। সুন্দর দেখাচ্ছিল। শুধু নীল আর নীল। নীল বসনে আপনি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখে চারপাশে নীল সাগরের ঢেউ ছড়াচ্ছিলেন। আর আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি কোনওদিন সাগর দেখিনি। এই প্রথম নীল জলরাশির পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। কবিতার মতো মিষ্টি করে সঞ্জয়ের কথাগুলি মনকে স্পর্শ করছিল। সঞ্জয় থামলে লজ্জা পেল মীনাক্ষী। সেই লজ্জার বুঝি শেষ নেই। কথাগুলি তার কুমারী মনকে বারবার ভালোলাগার স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুললো। মনের সাগরে ঢেউ উঠলো। সে-ঢেউ বিক্ষুব্ধ নয়—সমুদ্রের গভীরতার মতোই শান্ত। তথাপি সে সেই নীলাভ শাড়ি পরে সিনেমায় যেতে পারবে না। যেহেতু সে সঞ্জয়ের ভালোলাগার কথা জানতে পেরেছে। সেই জানতে পারার লজ্জায় জেনে-শুনে মীনাক্ষী কেমন করে সঞ্জয়ের কল্পনায় আঁকা আটলান্টিক সাগরের রূপ নিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? সঞ্জয় তাতে

মুগ্ধ হবে ঠিক কিন্তু লজ্জা মীনাক্ষীর তাবচেয়েও বেশি। এ যে পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সরলিকৃত পথে চলা।

সিনেমা দেখতে যাওয়ার সময়ে মীনাক্ষী তাই সঞ্চয়েব ভালোলাগা সেই নীলাভ শাড়ি পরলো না। আজ সে নিজেকে সাজিয়েছে ফিকে গোলাপী রংঙের শাড়িতে। তাতেও চমৎকার দেখাচ্ছিল। কিন্তু প্রচন্ড আশাহত হলো সঞ্চয়। দুঃখ পেল সে। এতো অনুরোধ করা সত্ত্বেও মীনাক্ষী তার কথা শুনলো না। কিন্তু কেন? কেন শুনলো না সে? এই না-শোনার একটি মাত্র অর্থই সঞ্চয়ের মনে ফুটে উঠলো। তাহলো বিরোধিতা! তার কথামতো একটি কাজ করতে মীনাক্ষীর এতোটুকু আগ্রহ নেই। আগ্রহ যেখানে নেই, অনুরোধ বাখবাব ইচ্ছা যেখানে নেই সঞ্চয় কিনা সেখানে নিজের একান্ত একটি সাধ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তা কি কখনও হয়? জোর করে চাপিয়ে দিয়ে কিছু হয় না। কিছু কবা যায় না। সে-প্রমাণ তো মীনাক্ষীই দেখালো। এ এক দিক দিয়ে ভালোই হলো। এবপবে সে আব কোনওদিনও বলতে যাবে না। সবচেয়ে বেশি লাগছে সঞ্চয়েব একটি জায়গায়। সে কোনও চাটুকারের মতো মিথ্যা স্তুতি করেনি। কথাব জাল বোনেনি। কোনও কিছু লুকায়নি। যেটা সত্য, যে-কথা বলতে পারলে তাব ভালো লাগবে, সে-কথাই অত্যন্ত সহজ ভাবে সে বলেছে। এক কথায় যেটা দাঁড়ায়, আপনাকে নীলাভ শাড়িতে খুব সুন্দব দেখাচ্ছিল। আপনি তাই আজও ওই শাড়িই পরবেন। এই কথাই তো বলেছিল সঞ্চয়। এরমধ্যে কোনও মিথ্যা ছিল না। ছলনা ছিল না। তার কথা শুনে কি মীনাক্ষী তা বুঝতে পারেনি? অনুভব করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। তা সত্ত্বেও সে সেই অনুভবের মর্যাদা দেয়নি। তার অনুবোধ রাখেনি। একে কি বলা যায়? ভুল হয়ে গেছে? তা তো নয়। অর্থ একটিই। এড়িয়ে যাওযা। তাই যদি হয় সে-কথা তাকে বললেই হতো। তখন তো বেশ খুশিই দেখাচ্ছিল। যদিও মুখে কিছু বলেনি কিন্তু সেই সময়ে মীনাক্ষীর সাবা মুখে ছিল সলজ্জ রক্তিম আভার প্রথম সূর্যোদয়! সম্মতিব নীরব অভিব্যক্তি বলে ধবে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি সঞ্চয়ের। মীনাক্ষীর দুই ঠোঁটে জড়ানো ছিল মিষ্টি হাসি। তাতেই সঞ্চয় স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছিল। তবে কি সেই হাসিতে নিরুচ্চাবিত কথা লুকিয়ে ছিল? অর্থাৎ কিনা তুমি বকছো বকে যাও, কোন শাড়ি পরে সিনেমায় যাব-না-যাব সেটা নির্ভর করছে আমার ওপর। সঞ্চয় ভেবে দেখলো, কথা না-শোনার মধ্য দিয়ে মীনাক্ষী তাকে অপমান কবেছে। একে অপমান ছাড়া আর কি বলে? বলার সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষী যদি তখন আপত্তি জানাতো, তাহলে অবশ্য এতোটা গুরুতর হতো না। তখন তার অর্থ দাঁড়াতো অন্য। কিন্তু এখন যে অর্থ দাঁড়িয়েছে তাহলো পরিষ্কার অবজ্ঞা। অবজ্ঞা, অবহেলাব বেদনা সঞ্চয় আর যার কাছ থেকে হোক, মীনাক্ষীর কাছ থেকে অন্তত আশা করেনি। তেমন কল্পনাও করেনি। বেশি আশা করলে বুঝি এমনটাই হয। কিন্তু সঞ্চয় কি অতিরিক্ত আশা করেছিল? তা তো নয়। নিতান্তই সাধারণ, সঙ্গত, স্বাভাবিক একটি অনুরোধ করেছিল মাত্র। কিন্তু এমন কঠিন ভাবে, রুক্ষ ভাবে তার অনুরোধ মাটিতে মিশে যাবে তা সে কেমন করে জানবে? মীনাক্ষীর কাছ থেকে যে সে অনেক কিছু আশা করেছিল। মধুব রঙিন একটি ছবি এঁকেছিল মনের শ্লেটে। কিন্তু সে-ছবিতে সহসা কে যেন কালিব আঁচড় বুলিয়ে দিল। মীনাক্ষীকে কেন্দ্র কবে ভালোলাগার ছোট ছোট কয়েকটি মুহূর্ত রচনা করেছিল আপন মনে। কিন্তু তাতেও ঘুণ ধরলো। এই কদিন বৃথাই ছবি আঁকছিল। কল্পনার উপব দাঁড়িয়ে কল্পনাকেই আশ্রয় করে দৃঢ় হতে চাইছিল। কিন্তু তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। সব কিছুর উত্তর পাওয়া গেছে। সঞ্চয় অনুক্ত থেকেও যে-ভাবে ভালোবেসেছে মীনাক্ষী ততোটা পারেনি। পারলে তার অনুবোধটা রক্ষা হতো। এটাই তো সহজ হিসেব। আজ যদি মীনাক্ষীই তাকে কোনও অনুরোধ কবতো, সঞ্চয় কি সেটা পালন করতো না? নিশ্চয়ই করতো। পালন করে মীনাক্ষীকে খুশি করতো। আনন্দ দিতো। কিন্তু তাকে খুশি করার কোনও ইচ্ছা নেই মীনাক্ষীর। দায়িত্ব নেই। সঞ্চয় দুঃখ পেতে পারে, আহত হতে পারে, এটা সে বুঝতে চেষ্টা করলো না কেন? অবশ্য তাকে যদি মীনাক্ষীব ভালো না-লেগে থাকে তাহলে বুঝবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। এক তরফাব কোনও স্থায়িত্ব নেই। জোর করে, জোর খাটিয়ে সঞ্চয় তেমন করে পেতে চায় না! সে-পাওযার আনন্দ নেই। মূল্য নেই। তার স্থায়িত্ব সূর্য উঠলে শিশির বিন্দুব মিলিয়ে যাবার মতোই ক্ষণিকের। যেখানে মনের এমন শূন্যতা, হাহাকার

সঞ্চয় সেখানে নেই।

তেরোজনের একটি দল চলেছে সিনেমা দেখতে। দুজন তিনজন করে ছোট ছোট দলে গল্প করতে করতে চলেছে সবাই। ব্যতিক্রম শুধু সঞ্চয়। তার অনুরোধ অনুসারে মীনাক্ষীকে নীলাভ বসনে দেখতে না-পেয়ে এতোক্ষণের পুঞ্জিভূত আনন্দের বেলুনটা চুপসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করুণ চোখে একবার মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকালো। তাকিয়েছিল মীনাক্ষীও। অভিমানের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে সঞ্চয়ের মনে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। একটু গম্ভীর হলো। এরপরে মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। দলের থেকে একটু আলাদা হয়ে সঞ্চয় নীরবে সকলের আগে আগে হাঁটতে লাগলো। সিনেমা দেখার আনন্দ আর তার নেই। নষ্ট হয়ে গেছে। না-গেলে এখন খারাপ দেখাবে, তাই যাওয়া। কিন্তু এটা ঠিক এই যাওয়ার মধ্যে কোনও প্রাণ নেই। প্রাণের সজীবতা নেই। শুধু নিয়ম-রক্ষা করা। সবার পিছনে হাঁটছিল ওরা তিনজন। পিকু, সবিতা মীনাক্ষী। সবিতা হঠাৎ বললো, আচ্ছা সঞ্চয় অমন আগে আগে যাচ্ছে কেন? আসল লোক যে পরে রয়েছে এখানে! পিকু ডাক দিল, এই সঞ্চয়! শুনে যাও—

এখন যাবো না। যেমন হাঁটছিল সঞ্চয় তেমনি হাঁটতে লাগলো। মীনাক্ষীকে কেন্দ্র করে তার কোনও আকর্ষণ আর নেই। মীনাক্ষী তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। হতাশার চক্রাকারে সে এখন ঘুরছে। এখানে থাকতে পর্যন্ত ভালো লাগছে না। সঞ্চয় ঠিক করলো সিনেমা দেখে ফিরে এসেই সে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পিসিমার বাড়িতে চলে যাবে।

এক লাইনে পরপর তেরোটি আসনই ওদের। যে যেখানে খুশি বসুক, সবিতার তাতে মাথা-ব্যথা নেই। সে শুধু মীনাক্ষী আর সঞ্চয়কে পাশাপাশি বসিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ওদের দুজনেরই মনের কথা আর জানতে বাকি নেই। দুজনেই মুখ ফুটে শুধু বলতেই বাকি রেখেছে। সবিতা, মীনাক্ষীর পাশের আসনখানি ফাঁকা রেখে সঞ্চয়কে ডাকলো, এদিকে এসো। সঞ্চয়ের উত্তর পাওয়া গেল পরক্ষণেই, না থাকা! আমি এখানেই বসছি। অর্থাৎ সঞ্চয় বসলো ওই সারির শেষ মাথায়। সবিতা ও পিকু দুজনের কেউই ব্যাপারটা ঠিকমতো না-বুঝলেও মীনাক্ষীর বুঝতে বাকি রইলো না। মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হলো সে। সে কি আশা করেনি সঞ্চয় আজ তার পাশে বসবে? নিশ্চয়ই আশা করেছিল। কিন্তু সঞ্চয় পাশে না-বসে দূরে সরে রইলো। এই অভিমানের উৎস কোথায় মীনাক্ষীর তা জানা। সে নীলাভ অপরাজিতার সাজে সাজায়নি নিজেকে। কিন্তু সঞ্চয় এটা কেন বুঝতে পারছে না, একটি পুরুষের অমন আবেগ সঞ্চিত অনুরোধ রক্ষা করতে লজ্জার মাথা না-খেয়ে কোনও মেয়ে পালন করতে পারে না। অবশ্য কোন মেয়ে কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করবে মীনাক্ষী তা বলতে পারবে না। সে শুধু নিজের কথাই বলতে পারে। নিবিড় লজ্জার জন্যই সে পারেনি।

ছবি দেখা শেষ হলো। শ্যামবাজারের একটি কফি হাউসে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দমদমে গিয়ে যখন ওরা পৌঁছালো, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। বাড়ি পৌঁছেই সঞ্চয় নিজের স্যুটকেসটি সাজাতে লাগলো। জামা-প্যান্টগুলি ভাঁজ করে একে একে করে গুছিয়ে রাখলো। দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, এই তো এলি! এখনই স্যুটকেস গোছাতে বসলি যে?

এক্ষুণি চলে যাবো দিদিমা। সঞ্চয় ম্লান সুরে উত্তর দিল। স্যুটকেস থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেল ঘরের বারান্দার দিকের দরজার পাশে নিশ্চুপ এক প্রতিমূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মীনাক্ষী। সাবা মুখের কোথাও এতোটুকু আনন্দের রেখাও মিশে নেই। শ্রাবণের ভরা আকাশের মতো তার লাবণ্যময় মুখখানি থমথম করছে। এক্ষুণি বুঝি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

এক্ষুণি মানে? দিদিমা সঞ্চয়ের হঠাৎ এই মত পরিবর্তনে বিস্ময়ে ভেঙে পরলেন, তোর তো কাল সকালে পিসিমার বাড়িতে যাবার কথা। আজকে তো নয়। কি যেন একটু ভাবলেন তিনি। তারপরেই বড়ো ছেলেকে ডাকলেন। সুধীন এ-ঘরে আসতেই বললেন, হ্যাঁ রে! সঞ্চয় যে এক্ষুণি যেতে চাইছে! বড়ো মামা অর্থাৎ সুধীন তাকালেন ভাগ্নের দিকে।

তুই তো কাল সকালে যাবি বলেছিলি, তা এখন যেতে চাইছিস কেন? কাল সকালেই যাস।

আমার নিজের একটু কাজ রয়েছে। কিছু কেনাকাটা করতে হবে। আজকে রাতে যদি বাগবাজারে

যাই তাহলে কাল সকালটা পুরো কাজের জন্য পাবো। একটু থেমে সঞ্জয় আরও যোগ করলো, সকালে যাওয়া যা এখন যাওয়াই তাই। একই ব্যাপার। তোমরা শুধু শুধু অতো ভাবছো কেন?

পিকু একটি ট্যাক্সি ডেকে আনলো। গুরুজনদের সকলকে প্রণাম করলো সঞ্জয়। দিদিমা চোখে জল ধরে রাখতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। তোমার মায়ের সঙ্গে তো চার বছর হলো দেখা-সাক্ষাৎ নেই। অনেক আশা করেছিলাম ননীর বিয়েতে আসবে। কিন্তু আর হলো কই! তবুও তুমি এসেছো। সেটাই আমার শান্তি। পৌঁছে সংবাদ দিয়ো। সবিতা ও মীনাক্ষী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের গিয়ে সঞ্জয় দাঁড়াতেই সবিতা অভিযোগের সুরে বললো, দুপুরের পর থেকেই লক্ষ্য করেছি তুমি একটু গম্ভীর। অন্য কেউ ধরতে না-পারলেও আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে সারতে পারবে না। তায় তোমার পিসিমার বাড়িতে যাবার কথা ছিল আগামীকাল সকালে। সেখানে যাচ্ছো এখন। তোমার কি হয়েছে বলবে?

কি আবার হবে? সঞ্জয় করুণ হাসলো। তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। জোর করে সারা মুখে হাসি ধরে রেখে বললো, চলি মীনাক্ষীদেবী। এই কদিন সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে ছিলাম। বেশ আনন্দে ছিলাম। এই দিনগুলির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বিয়ে বাড়ির ভিড়ের মধ্যে আপনি যে যত্ন করেছেন, সব দিকে খেয়াল রেখেছেন, মনে থাকবে সে-কথাও। নমস্কার—

সঞ্জয়ের হঠাৎ এই চলে যাওয়ার বেদনায় মীনাক্ষী মূক। একটি কথাও সে বলতে পারলো না। তার যে-কথা বলার ছিল, সকলের উপস্থিতিতে সে-কথা বলা যায় না। কাজে কাজেই মীনাক্ষী চুপ করে থেকেছে। সে ভেবেছিল, সিনেমা দেখে ফিরে এসে একটু নির্জনতা পেতে ছাদে গিয়ে সঞ্জয়ের সমস্ত অভিমান ভেঙে দেবে। কিন্তু সঞ্জয় সে-সুযোগটুকুও তাকে দিল না। তার আগেই চলে গেল। সঞ্জয় যে তার উপরেই অভিমান করে চলে গেল, সে-কথা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে? একটা ফটো চেয়েছিল। তাও ওকে দিতে পারলো না। সঞ্জয় ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই পিকু বললো, তুমি কালকা মেলে যাচ্ছো তো?

হ্যাঁ!

স্টেশনে যাবো আমি।

যেয়ো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তখনই বলবো। যেয়ো কিন্তু।

নিশ্চয়ই।

সামান্য গর্জে উঠেই ট্যাক্সি গতি নিল। পিছনের লাল আলোর দিকে চেয়ে রইলো মীনাক্ষী। সঞ্জয়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মন খারাপ লাগছে। নিঃসঙ্গ এক শূন্যতা। মনের মধ্যে দুঃখ দুঃখ ভাব। একটু আগেও আনন্দের পূর্ণতা নিয়ে যে ছিল, সে তখন নেই। যাওয়া এবং আসা। ছোট্ট এই দুটি কথার মধ্যে মিশে রয়েছে কতো আনন্দ, কতো বেদনা। সঞ্জয় চলে যাওয়া মাত্র ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলো না। সঞ্জয়কে কেন্দ্র করে এই কদিনের মধুর স্মৃতিই বারবার উঁকি দিচ্ছে মনের মণিকোঠায়। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে মীনাক্ষীর স্মৃতির মন্দিরে সন্ধ্যারতির স্নিগ্ধপ্রদীপ হয়ে জ্বলবে। মানুষটা চলে যাওয়ার ফলে বাড়িটাও কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। যেন কেউ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চিন্তার জালে মীনাক্ষীর সারা মন ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ! একবার ভাবলো, সবিতাকে সব খুলে বলবে কি? পরক্ষণেই সে তার মত পাল্টাল। না, বলবে না। সঞ্জয়ের চলে যাওয়ার কারণ সে একাই জানুক। অন্য কারও কাছে নাই-বা হলো প্রকাশিত। কাউকেই সে বলবে না। রাত তখন আটটা বাজে। আজ বিকালেই মীনাক্ষীর বাড়ি ফিরবার কথা ছিল। অবশ্য পথ হাজারো মাইল দূর নয়। এখনই রওনা হবে সে। নিজের শাড়িগুলি এক এক করে গুছিয়ে নিল। নীল শাড়িটা ভাঁজ করবার সময়ে একবার আনমনা হলো। নতুন করে ভাবনা এলো মনে। এই শাড়িটার জন্যই তো এতো কিছু। এই শাড়িতে সঞ্জয় তাকে ভালো দেখেছে। এটা সে যত্ন করে তুলে রাখবে। দামি শাড়ি। এমনিতে সে সচরাচর পরবে না, বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া। এবারে তাও কমিয়ে দেবে।

মীনাক্ষীকে ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল পিকু ও সবিতা। বাইরে থেকেই চলে আসতে চাইছিল

পিকু। যদিও মীনাক্ষীদের বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই তার আলাপ আছে কিন্তু এই রাতে নতুন করে আর গল্পের আসর বসাতে তার মন চাইছিল না। সঞ্চয় চলে গেছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই মন তার উদাসীন। ওর মায়া কাটিয়ে সহজ হতে সময় লাগবে বই কী! মীনাক্ষী ছাড়লো না। বললো, বাড়ি পর্যন্ত এসে ভেতরে ঢুকবে না, তাই কি হয় নাকি? এসো। বললো, তোমরা বোসো, আমি বৌদিকে একটু চা করতে বলে আসি।

এতো রাত্রে আর চা করতে বোলো না, কি দরকার?

এতো রাত কি? মীনাক্ষী নিজের হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, আটটা কুড়ি। একটু চা খাওয়া যেতে পারে। রান্নাঘরে চায়ের নির্দেশটুকু দিয়েই ফিরে এলো মীনাক্ষী। পিকুর পাশের সোফাটায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল। সবিতা, পিকু ও মীনাক্ষী তিনজনেই চুপ! যেন কেউই কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। সব কথা শেষ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। নতুন করে আর কিছু যেন বলার নেই। অনেক পরে পিকু বললো, যেন নিজেকে শুনিয়েই বললো, সঞ্চয়টা চলে গেল! এতো খারাপ লাগছে যে কি বলবো! সবাই মিলে এই দিন কটি বেশ আনন্দে ছিলাম। আজ থেকে সব হারিয়ে গেল। এমন দিন আবার কবে ফিরে পাব কে জানে? সঞ্চয় নেই। তুমিও চলে এলে। আজ ওই বাড়িতে থাকবো শুধু আমি আর সবিতা। সারাক্ষণ মনে পড়বে গত দিনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলির কথা। আমরা কি আবার কখনও এমনভাবে মিলিত হতে পারবো? একটু থেমে পিকু আবার যোগ করলো, কাল স্টেশনে যাবো। আবার যে খুব শীগ্‌গির দেখা হবে তেমনটা মনে হয় না। চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি বটে কিন্তু তাও বেশি দিনের জন্য নয়। মাস দু-তিন প্রথম প্রথম দু'পক্ষ থেকেই চিঠির আদান-প্রদান হয় বটে তারপরে আস্তে আস্তে লেখার ঝোঁকটা উভয়পক্ষ থেকেই কমে আসে। পিকু চুপ করলো। মীনাক্ষী অলস ভাবে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আলমারীর কাছে। অ্যালবাম থেকে নিজের একটি বড়ো সাইজের ছবি বের করে কভারে ভরে রাখলো। যাবার সময় ওটা পিকুর হাতে দেবে সঞ্চয়কে দেবার জন্য।

শোভনা চা নিয়ে এলো। ঘরে আজ মিষ্টি ছিল না। ছিল বিস্কুট। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দিয়েছে। কিন্তু ঘরে এসে সঞ্চয়কে দেখতে না-পেয়ে তাই জিজ্ঞেস করলো, সঞ্চয় আসেনি?

না বৌদি। পিকুই উত্তর দিল। সঞ্চয় যদিও আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছে। তবে দমদম থেকে চলে গেছে একটু আগেই। বাগবাজারে ওর পিসিমা রয়েছেন। সেখানেই গেছে। শোভনা ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে উঠে পড়লো। বললো, তোমরা গল্প করো। রান্নাঘরে আমার কাজ রয়েছে। উঠতে হবে। মীনাক্ষীর মন বললো, আর কোনও গল্প নয়। গল্পের সুর কেটে গেছে। হ্যাঁ সঞ্চয় চলে গিয়ে সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় থাকাকালীন কিন্তু ওর জন্য এতো ভাবনা হয়নি। অথচ চলে যেতেই মন হয়েছে উতলা। সঞ্চয় চলে গিয়ে তাকে চিন্তার রাজ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। পিকু ও সবিতা বেশিক্ষণ বসলো না। চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো। দরজা পর্যন্ত ওদেরকে পৌঁছে দিল মীনাক্ষী। পরম বিশ্বাসে ডাক দিল, পিকুদা। সেই ডাকের সঙ্গে বুঝি বেদনা মিশেছিল। পিকু অকৃত্রিম স্নেহে মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারলো না মীনাক্ষী। মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চুপ করে রইলো। পিকু বুঝতে পারলো, ও কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছে না। লজ্জা ভেঙে দেবার জন্য পিকু অত্যন্ত আপন সুরে জিজ্ঞেস করলো, কিছু বলবে?

তুমি তো কাল স্টেশনে যাচ্ছো—

হ্যাঁ। পিকুর মনে হলো মীনাক্ষীর স্টেশনে যাবার ইচ্ছা আছে। তাই সে বললো, তুমি যাবে? একটু ভাবলো মীনাক্ষী। পরে জানালো, স্টেশনে অনেকেই যাবে! অর্থাৎ সেই অনেকের মধ্যে তার যাওয়া চলে না। খুবই স্বাভাবিক কথা। পিকু ও সবিতার কথা আলাদা। মীনাক্ষী যদি স্টেশনে যায় তাহলে সঞ্চয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা কি কিছু ভাববে না? নিশ্চয়ই ভাববে। সেই ভাবনার মধ্যে ওদেরকে ফেলতে চায় না মীনাক্ষী। সকলকে সন্দেহের জাল বুনবার সুযোগ সে দেবে না। মীনাক্ষী বললো, আমার একটা ফটো চেয়েছিল।

জানি।

এটা তুমি ওকে দিয়ে দেবে। ফটোর কভারটা পিকুর হাতে দিয়ে মীনাক্ষী ছোট্ট সুরে আরও বললো, কারো সামনে দিয়ো না। কেউ যেন জানতে না-পাবে। পিকুর মনে হলো, মীনাক্ষী শুধু সঞ্চয়কে ভালোইবাসেনি ওর ভালোবাসার সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো খুঁজে পেয়েছে। তাই এতো আকুল! এতো ব্যাকুল! ভালোবাসার গোপনতা তাই সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। মীনাক্ষীর করুণ মুখখানি দেখে মায়া হলো পিকুর। মনে মনে শুধু বললো, সঞ্চয়ের জন্য যদি তুমি এতোই উতলা, আমাকে তবে কেন আগে বলোনি? আমাকে তো তোমার অবিশ্বাস করার কথা নয়! কথা নয় ভয় পাবারও। যেখানে তোমার এতোখানি সুযোগ, সেক্ষেত্রেও যদি তুমি ইচ্ছা করে নীরবতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চাও তাহলে আমাকে একেবারে শেষ মুহূর্তে অল্প সময়ের মধ্যেও মনের সকল কথা বলতে এলে কেন? পিকু করুণ হেসে বললো, কাল সারা দিন সময় আছে। সঞ্চয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

না।

দেখা করতে ইচ্ছা করছে না? প্রশ্নটা শুনে মীনাক্ষী পাণ্ডুর হাসলো। এবারে সে এতোটুকু লজ্জা পেল না। স্পষ্ট উত্তর দিল, ইচ্ছা করছে।

পরদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েও সাড়ে-সাতটার আগে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে পারলো না পিকু! পথ কম নয়। কল্যাণী থেকে হাওড়া। তায় পুলের উপর ট্র্যাফিক জ্যাম। ওখানেই বাসের মধ্যে বসে দুশ্চিন্তা আর বিরক্তি ভরা মনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। পিকু একবার ভাবলো, বাস থেকে নেমে পায়ে হাঁটা শুরু করে দেয়, ঠিক তখনি আবার বাসটা চলতে থাকে। এমনিভাবেই পথ এক সময় শেষ হলো।

সঞ্চয়কে যখন খুঁজে বের করলো পিকু, তখন তার চারপাশে ছোট একটি ভিড়। পিসিমা, পিসেমশাই, শিবানী, সুধীনদা, ননীদা, বড়দি এবং সবিতা সকলেই উপস্থিত। প্রশান্ত হেসে সঞ্চয় পিকুর হাতখানা টেনে নিয়ে বললো, তুমি নিশ্চয়ই সোজা অফিস থেকে এখানে চলে এসেছো, চলো একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। দুই বন্ধুতে রেলের কামরা থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফরমের চায়ের স্টলে গিয়ে দাঁড়ালো। সঞ্চয় দুটি চায়ের অর্ডার দিয়েই জিজ্ঞেস করলো, মীনাক্ষী কিছু বলেছে? খুশির হাসি হাসলো পিকু। বললো, তোমরা যে এতোদূর এগিয়েছ তাতো জানতাম না! তুমি চলে আসার পর সে ভদ্রমহিলা শুধু কাঁদতে বাকি রেখেছে। স্টেশনে আসবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার একটি ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছে, ছবি দেওয়ার সময়ে কেউ যেন না-দেখে, না-জানে। পিকু ছবিটা সঞ্চয়ের হাতে দিয়ে বললো, তুমি চা খাওয়ার ডাক দিয়ে ভালোই করেছো। নয়তো আমাকেই এমন একটা পথ ধরতে হতো। সঞ্চয় ভেবেছিল, পিকুকে গতদিনের ঘটনাগুলি খুলে বলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে তার মত পাল্টালো।

রাত আটটায় ট্রেন ছাড়লো। পরিচিত মুখগুলিকে পিছনে ফেলে কাল্কা মেল তৈরি করা ছক বাঁধা পথে ক্রমশ এগিয়ে চললো। বেশ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে দিকে চেয়েছিল সঞ্চয়। এবারে উঠে দাঁড়ালো। হোল্ডঅল খুলে বিছানাটা পেতে নিল। টিফিন ক্যারিয়ারে পিসিমা লুচি-মাংস এবং মিষ্টি দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। একটা পত্রিকা নিয়ে শুয়ে পড়লো। বেশিক্ষণ পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ রাখতে পারলো না। একটু একটু করে ঘুম পাচ্ছে। কাল্কা মেলের প্রচণ্ড দ্রুত তালের দোলায় সঞ্চয় একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙল মোগলসরাই-এ। ট্রেনটা তখন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পথ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এলাহাবাদ, কানপুর, ফাপুন্দ, ইটাবা, ফিরোজাবাদ, আলিগড়, পার হয়ে যমুনা ব্রীজের একটু আগে এসে ট্রেনটা দাঁড়ালো। ওপারে দিল্লি। বাঁ দিকে দূরে ইন্দ্রপ্রস্থ পাওয়ার হাউসের সুউচ্চ লালবাতির সজাগ দৃষ্টি। আলোর মালার বিজ্ঞাপনে ওই দিককার আকাশটায় বিভিন্ন বর্ণের বর্ণছটায় রামধনু আঁকা। অন্ধকারের মধ্যে রাস্তার বাতিগুলি যেন ভেসে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে তাই মনে হয়। যমুনার ওপারেই অন্ধকারের মধ্যে নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লালকেল্লা।

সঞ্চয় ফিরে এলো পরিচিত পরিবেশে। এই শহর তার একান্তই পরিচিত। সেই জানা-শোনা শহরের চেনা ঘরে ফিরে এলো। কোম্পানির দেওয়া হাউজখাসের এই বাড়িটার তুলনা হয় না সৌন্দর্যে। অত্যন্ত নয়নাভিরাম সুদৃশ্য এবং আধুনিক ডিজাইনে তৈরি। বাড়ির সামনে ফুলের লন। নাম-না-জানা কতো মরসুমী ফুলের সমাবেশ সেখানে, মাঝখানে সমচতুষ্কোণ আকৃতির গাঢ় সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা। বাড়ির দোতলাটা সম্পূর্ণ সঞ্চয়ের নিজের এলাকা। দু'খানি বেডরুম, ডাইনিং-স্পেস, লবি, কিচেন-বাথরুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। বাড়ির সিংহ-দরজায় ট্যাক্সি থামলো। সঞ্চয়কে দেখতে পেয়েই ছুটে গেল ছোকরা ওয়াকরদে। পনেরো-ষোলো বছরের মরাঠি কিশোর। যদিও চাকর, সঞ্চয় কিন্তু ওকে গ্রহণ করেছে চাকর হিসাবে, ছোট ভাই হিসাবে, বন্ধু হিসাবেও। ওয়াকরদেকে পাবারও একটি ইতিহাস আছে। ওর চরিত্রের তেজস্বিতা, অন্যায়ের বিরোধিতা করার মতো বলিষ্ঠতা দেখে সঞ্চয় মুগ্ধ হয়েছে। কতই-বা বয়েস তখন ওয়াকরদের। এগারো-বারো বছর হবে। কিন্তু ওই বয়সেই বিপথগামিনী মায়েব প্রতি তার কি অপরিসীম ঘৃণা। সঞ্চয় ওর দৃঢ়তা দেখে, ওকে ওর দুঃখময় জীবন থেকে সরিয়ে এনে ওই গ্লানির মধ্যে থেকে বাব করে একটু স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে মুক্তির স্পর্শে ওকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

সেবার আকোলো গিয়েছিল সঞ্চয। মহারাষ্ট্রের একটি ডিস্ট্রিক্ট টাউন। এই ছোট্ট শহবে সঞ্চযকে মাস দুই থাকতে হবে। ওয়াকরদেকে প্রথম দেখেছিল সেখানকার স্পিনীং কোম্পানির অফিসার্স ক্যান্টিনে। বয়-এর কাজ করতো ওয়াকরদে। অন্যান্য বয়-রা যেখানে হইচই করে, ছোটাছুটি করে সারা ক্যান্টিন মাতিয়ে রাখতো, ওয়াকরদে সেখানে নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে অত্যন্ত ধীব-স্থিব হয়ে অফিসারদের চাহিদা অনুযায়ী টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতো। দু'দিন গিযেই সঞ্চয লক্ষ্য করেছে অন্যান্য ছেলেদের থেকে ও আলাদা। অথচ কাজ কিন্তু কারো থেকে কম করে না। যখন যে যা চাইছে ওর কাছে, সময়মতো ঠিক পাচ্ছে। ওর সারা মুখে কেমন যেন দুঃখ দুঃখ ভাব। চোখ দুটিও ভাসা ভাসা। বড়ো করুণ। ওর সঙ্গে কেন জানি ভাব করতে ইচ্ছা হলো সঞ্চয়ের। একদিন ডেকে জিজ্ঞেস কবলো, তোমার নাম কি?

ওযাকরদে।

এই অল্প বয়সে কাজে নেমেছো কেন? তোমার বাবা............সঞ্চয়ের কথা শেষ হয়নি। ওযাকরদে উত্তর দিল, আমার বাবা নেই। তিনমাস হলো মাবা গেছে।

ওঃ! বাড়িতে আব কে কে আছে?

মা আছে। কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। এখন আমার কেউ নেই। ওয়াকবদেব কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সঞ্চয। মা রয়েছে। তবুও বলছে ওব কেউ নেই। ওই কথার অর্থ সঞ্চয় জানতে পেরেছিল তারও পরে। ওয়াকবদেই তার দুঃখের কাহিনী শুনিযেছিল। সঞ্চয়ের সঙ্গে তখন তার বেশ আলাপ হয়ে গেছে। ওয়াকরদে বলেছিল, বাবা মারা যাবার পর, বাবার দোস্ত হবিলাল তাদের সংসারকে ধরে রাখাব জন্য এগিয়ে এসেছিল। টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে সে সাহায্য কবতো। কিন্তু সেই শয়তানের দৃষ্টি ছিল মায়ের উপরেই। কিন্তু বাবুজি বহুত আফসোসের কথা এই যে, মা সেই শয়তানকেই ভালোবাসলো। হরিলালের কাছে ধরা দিল। মাকে তখন আর একেবারেই ভালো লাগলো না। মায়ের উপর আমি বিশ্বাস হারালাম। বাবার স্মৃতি তখনও আমার মনে। মাকে আর আপন লাগছে না। তবুও হরিলালকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যখন মাকে এতো পেয়ার করছো তখন শাদি করছো না কেন? হরিলাল আমাকে অনেক মারলো বাবুজি। বললো, বড়োদের ব্যাপারে তোকে আসতে হবে না। আবও বললো, আমি শুধু পেয়ার করবো। তোর মাকে শাদি করতে পারবো না। আমি আরও কাঁদলাম বাবুজি। কেন-না মাকে তখন সবাই নিন্দা করছিল। মায়ের নিন্দা শুনতে ভালো লাগছিল না। আমি তাই মায়ের কাছেই ছুটে গেলাম। হরিলালের সব কথাই খুলে বললাম। বদনশীব বাবুজি। মা, হরিলালের কথাই মেনে নিল। উল্টে আমাকে গালাগাল করলো। আমাদের রিস্তেনাতে আদমীরা আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না, ঘৃণা করতো। আমি মাকে বললাম, চলো এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাই। মা রাজি হলো না। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম

বাবুজি। হমারা কোঈ নেহি। হমকো কুছ ন'মিলা। ন'মাতা, ন'ঘর!! ম্যয় একেলা হুঁ বাবুজি! ওব কথা শুনে সঞ্চয় বলেছিল, তুই থাকবি আমার সঙ্গে? ভাসা-ভাসা জল ভরা চোখে ওয়াকরদে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল সঞ্চয়ের চোখের দিকে। বলেছিল, রহেগা বাবুজি। সেই থেকে ওয়াকরদে সঞ্চয়ের কাছে। একাধারে সে এখন সঞ্চয়ের সারভেন্ট, বাড়ির সেক্রেটারি, তার লোকাল গার্জিয়ান।

তুমি ট্যাক্সিতে এসেছো কেন বাবুজি? ওয়াকরদে বললো, বসির আলি যে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গেছে তোমাকে আনতে।

না বসির, না গাড়ি কাউকেই দেখতে পেলাম না। কতোক্ষণ আব অপেক্ষা করবো? তাই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম।

রামসুভগ জল গরম করে দিল। সেই জলে স্নান করে পথের ক্লান্তি দূর কবলো সঞ্চয়। শরীরটা এখন ঝরঝরে তাজা লাগছে। রামসুভগ এক কাপ গরম কফি দিয়ে গেল। কোটের পকেটে মীনাক্ষীর ছবিখানা রয়েছে। সঞ্চয় বের করলো। গতকাল ছবিখানা পাওয়ার পব থেকে আজকের এই সময়ের মধ্যে সে একটি বারের জন্যও খুলে দেখেনি। দেখার অবকাশ কোথায়? ট্রেনের কামবার ওই হাজার জোড়া চোখের সামনে যেমন-তেমন করে মীনাক্ষীর ছবি দেখতে মন ওঠেনি। মনে মনে তাই ঠিক করেছিল, বাড়ি পৌঁছে নীরবে, নিভৃতে যতোক্ষণ খুশি মন ভরে সে ছবি দেখবে। এতোক্ষণে সঞ্চয় সেই ছবি দেখার সময় পেল। ছবিখানা দেখে মীনাক্ষীর জীবন্ত মুখখানা কল্পনা করলো। এতোটুকু প্রভেদ নেই। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো সঞ্চয়। ছবিখানা বিছানাব উপর বেখে দিয়ে শেষে চিঠি লিখতে বসলো। চারখানা চিঠি লিখতে হবে। পিকু, দিদিমা, পিসিমা ও বাবাকে। প্রথম চিঠিখানা শেষ করে দ্বিতীয়খানা শুরু কবতেই ওয়াকরদে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। ডাকলো, বাবুজি—

কি রে? লেখা থেকে মুখ তুললো সঞ্চয়।

বসির আলি এসেছে। সঞ্চয় দরজার দিকে তাকালো। পর্দায় এক পাশে লজ্জিত ভাবে দাঁড়িয়ে বয়েছে বসির আলি। তার ড্রাইভার। সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, কিছু বলবে?

ম্যয় স্টেশন গয়ে থে। লেকিন আপকো ন'মিলা সাব্।

তুমি আমাকে পাওনি। আমিও তোমাকে দেখতে পাইনি। মিটে গেল। সঞ্চয় কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, উসমে ক্যায়া হ্যায়!

ম্যয় শর্মিন্দা হুঁ সাব্।

লজ্জা পাবার কিছু নেই বসির আলি। সঞ্চয় হাসতে হাসতে বললো, কলকাতার রসগোল্লা খেয়ে যাও। ওয়াকরদে—

বাবুজি।

রামসুভগকে বলো বসির আলিকে মিষ্টি দিতে।

পরদিন রবিবার। নয়াদিল্লির শীতের সকাল। প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে। চারদিকে ঘন কুয়াশার কুন্ডলী। অল্প দূরেই কুতুবমিনার। কিন্তু সেটা এখন কুয়াশার চাদবে ঢাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য দেখার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেন-না পাশের বাড়িব শেষ অংশটুকুই দেখা যাচ্ছে না। সেখানে কুতুবমিনার অনেক দূর। যে-রকম কুয়াশা পড়েছে তাতে কুতুবের সন্ধান মিলতে বেলা এগারোটা, সাড়ে-এগারোটা বাজবে। রামসুভগ কফি তৈরি করলো। ওয়াকরদেকে জানাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়িত এক কাপ কফি নিয়ে সঞ্চয়ের ঘরে ঢুকলো। সঞ্চয ঘুমাচ্ছে। মাথার বালিশের পাশে একটি ফটো। ওয়াকরদে ছবিখানা একটু ঝুঁকে পড়ে দেখলো। ডাকলো, বাবুজি। চোখ মেলে চাইলো সঞ্চয়। তারপরেই ব্যস্ত ভাবে লেপ সরিয়ে উঠে বসলো। যেন ছবিখানা হারিয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ঠিক জায়গায় রয়েছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো। ওয়াকরদের হাত থেকে কফির কাপটি নিয়ে একটি চুমুক বসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুই এই ফটোটা দেখেছিস?

হ্যাঁ বাবুজি! তসবীর সুন্দর আছে। বহুৎ খুবসুরৎ। তোমার কে হয় বাবুজি?

কে হয়? সঞ্চয় আবৃত্তির মতো উচ্চারণ করলো। কি যেন ভাবলো। তারপরেই হেসে ফেললো, পরে বলবো, ভাগ্ এখন এখান থেকে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে সঞ্চয় অফিসের কাজ করতে বসলো। ডায়েরি, বিভিন্ন অফিসের চিঠি এবং কোম্পানির কাগজপত্র নিয়ে সেই যে ডুব দিয়েছে কাজ সেরে উঠলো সন্ধ্যার মুখোমুখি। এতো কাজ একসঙ্গে করতো না। যদিও এই ক'দিন ছুটিতে ছিল। তবুও যে-কাজগুলি পড়েছিল সে-গুলি তারই। সুতরাং দায়িত্ব তার। তাছাড়া যে কাজ করতেই হবে, তা যতোটা সম্ভব কমিয়ে রাখা যায়, ততোই ভালো। কাল অফিস আছে। অফিসে গিয়েই ফার্স্ট আওয়ারে চিঠিগুলি টাইপ করতে দেবে। আজকের মতো কাজ মিটে গেলে সঞ্চয় একটু হাল্কা বোধ করলো। ডানলোপিলোর কোমল সোফায় দেহটা ছেড়ে দিল। এতোক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবেছিল। অন্য দিকে খেয়াল ছিল না। ছিল না অন্য কোনও চিন্তা। এবারে দমদমের কথা মনের কোণে উঁকি দিল। মীনাক্ষীর কথা! পিকুর কথা, সবিতার কথা! বেশ ছিল চারজনে সেই কটা দিন। দমদমের দিনগুলি যে অমন সুন্দর কাটবে তা কি সঞ্চয় আগে জানতো? আসবার সময়ে যদিও একটু মন কষাকষি হয়েছে, জমেছে অভিমানের পাহাড়—তবুও মন পড়ে রয়েছে মীনাক্ষীকে কেন্দ্র করেই। ওর কথাই চিন্তা করতে ভালো লাগছে। ভালো লাগছে ওকে বারবার মনে করতে। টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ছে। সবিতা ও মীনাক্ষী দুজনে একসঙ্গে বাথরুমে ঢুকেছিল। সঞ্চয় মাথায় তেল মেখে কাঁধের ওপর একটি তোয়ালে জড়িয়ে একবার ঘর আর একবার বারান্দায় পায়চারী করছিল। স্নান সেরে ওরা বেরিয়ে এলেই সে বাথরুমে ঢুকবে। বড়ো মামা বললেন, দেরি না-করে ঝিল থেকে দুটি ডুব দিয়ে আয়। সকলের স্নান হলে একসঙ্গে খেতে বসবো যে—

তোমরা খেয়ে নাও। বাইরে দু'মিনিটের স্নানে আমার হবে না। ভালো করে সাবান মেখে অনেকক্ষণ ধরে স্নান না-করলে আমার বিশ্রী লাগে। তারপরে ছাদে উঠেছিল সঞ্চয়। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যখন নীচে নেমে এলো, দেখলো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সবিতা চুল আঁচড়াচ্ছে। অর্থাৎ ওদের স্নান তাহলে শেষ হয়েছে। বিপদটা বাধিয়েছিল সঞ্চয় বাথরুমে ঢুকেই। সবিতা স্নান শেষ করে বেরিয়ে এসেছে ঠিকই, মীনাক্ষী বের হয়নি। সে তখনও ভেতরে। সারা গায়ের জল মুছে সবে ছোট জামাটা পরেছে। সবিতা বেরিয়ে যাবার পরে দরজা বন্ধ করা হয়নি। বাইরে থেকে শুধু ভেজানো ছিল। চোখের পলকে মীনাক্ষী শাড়িখানা টেনে নিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েছে। ওর দেহের সৌন্দর্যে সঞ্চয় তন্ময়। সাধারণ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত ভুলে গেল। ওই অবস্থায় কোনও মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে লজ্জা দিতে নেই। ভুল করে যখন ঢুকে পড়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। সঞ্চয়ের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে মীনাক্ষী। প্রাথমিক তন্ময়তার ঘোর কাটতেই সঞ্চয় আর দাঁড়ালো না। বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। মীনাক্ষীর মুখভার কিন্তু কমেনি। সঞ্চয়কে দেখলেই গম্ভীর হতো। দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতো। সঞ্চয় বুঝতে পারলো, স্নানের ঘটনার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সত্যই তো তার কোনও দোষ নেই। ইচ্ছা করে সে বাথরুমে ঢুকে পড়েনি, এটা কেন মীনাক্ষী বুঝতে পারছে না। এ-নিয়ে যদি একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়, তাহলে সেটা ভীষণ খারাপ হবে। সঞ্চয়, মীনাক্ষীকে ফাঁকে ফাঁকে খুঁজছিল। ওকে একা পেয়েই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিনীত সুরে বললো, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি বুঝতে পারিনি। সবিতাকে ঘরের ভেতরে দেখে ভেবেছি, আপনিও বেরিয়ে এসেছেন। তাই আমি........তাছাড়া ভেতর থেকে দরজা বন্ধও ছিল না। কি করে বুঝবো বলুন তো?

আপনি কিছুই বোঝেন না?

তার মানে এখনও আপনার রাগ পড়েনি। আমাকে তাই দোষী হিসাবে দেখছেন। সঞ্চয়ের করুণ মুখের দিকে চেয়ে সোনাঝরা হাসলো মীনাক্ষী। হাসতে হাসতেই বললো, ঠিক তাই।

আর একদিনের ঘটনা! দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছে। সঞ্চয় একটি পান চেয়েছে সবিতার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল সবিতার মাথায়। সঞ্চয়কে জব্দ করতে হবে, ঠকাতে হবে। এর আগে পিকুকে একবার করেছে, আজ সঞ্চয়কে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। একটি বড়ো আকারের পানের ভেতরে একাকার করে শুধু চুন মেখে দিল, না-খয়ের, না-সুপারী। অর্থাৎ চুনের পান তৈরি করলো সবিতা। ব্যাপারটা শুধু মীনাক্ষী জানলো। তার মন কিন্তু এতে সায় দিচ্ছিলো না। খারাপ

লাগছিল। যদি সে না-জানতো তাহলে আলাদা কথা ছিল। না-জেনে তো সাপেরও বিষ পান করা যায়, কিন্তু জেনে? জেনে-শুনে মীনাক্ষী কি করে চুপ করে থাকে? তার চেয়েও বড়ো কথা তাকে গিয়েই পানটা দিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ সবিতা, সঞ্চয়কে নিজে হাতে করে দেবে না। মীনাক্ষীকে দিয়ে কাজটা করিয়ে তাকেই দুষ্টু বুদ্ধির কর্ত্রী বলে প্রমাণিত করে নিজে ভালোমানুষটি সেজে বসে থাকবে। মীনাক্ষী পান বানাবার ওই অল্প সময়ের মধ্যেই এক ফাঁকে জানিয়ে দিল সঞ্চয়কে, আপনি পান খাবেন না। ওতে চুন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পরে মীনাক্ষী যখন পান নিয়ে উপস্থিত হলো পিছনে পিছনে সবিতাও এলো। সারা মুখে তার চাপাহাসি। বললো, পান খাও সঞ্চয়। মিষ্টি হাতের মিষ্টি পান আরও মধুর লাগবে।

তা লাগবে। মীনাক্ষীর হাত থেকে পানটি নিয়ে সঞ্চয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো। তারপরে সবিতার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললো তাহলে খেয়ে নিই কি বল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ খেয়ে নাও। অনেক মিষ্টি মশলা দিয়ে মীনাক্ষী তৈরি করেছে। খেতে ভালো লাগবে।

এতো ভালো কি আমার সহ্য হবে? বলেই সঞ্চয় জোর করে পানটা সবিতার মুখে ঠেসে ধরলো। সবিতা মুখ খুললো না। দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রইলো। সঞ্চয় মজা পেল খুব। বললো, মুখ খুলছিস না যে? মিষ্টি মশলা দেওয়া পান তোকে খেতেই হবে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে সবিতা মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলো, নিশ্চয়ই তুই বলে দিয়েছিস।

বলেনি। মীনাক্ষীর হয়ে সঞ্চয়ই উত্তর দিল।

তুমি থামো। মীনাক্ষী ছাড়া অন্য কাউকে আমি জানাইনি। সুতরাং মীনাক্ষী যদি তোমাকে আগে থেকে না-বলে দেয়, তাহলে তুমি জানলে কেমন করে? ইতিমধ্যে পিকু এসে পড়লো। বললো, ছাদ থেকে তোর গলা শুনতে পেলাম, ব্যাপারখানা কি? নিখিল ভারত ঝগড়া সম্মেলন শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? সবিতা ঘটনাটা খুলে বলতেই পিকু বিশেষজ্ঞের মতো রায় দিল, এ-কাজ তো অন্য কারও দ্বারা সম্ভব নয়। এ-কাজ মীনাক্ষীদেবীর।

তুমি বুঝলে কীসে? অল্প হেসে প্রশ্ন তুললো মীনাক্ষী।

সঞ্চয়ের কাছ থেকে একটু আগেই তোমাকে বেরুতে দেখে। আমি সিনেমাটা ছাদ থেকেই দেখলাম। নায়িকা উল্কার মতো ঘরে ঢুকলো। কি যেন বললো। রকেটের গতিতে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস ছাদে উঠেছিলাম—পিকু অম্লান হাসলো। তাই না এতো বড়ো একটা কেসের প্রধান সাক্ষী হতে পেরেছি। মীনাক্ষীর দুই গালে তখন লজ্জার রক্তিমাভা। এমন করে বুঝি কেউ কখনও ধরা পড়েনি। পিকু তার স্বভাবসুলভ টিপ্পনী কাটলো, আর যদি তুমি বলো যে অমন ফিসফিস করে প্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করতে এসেছিলে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

বলেছি তো! ধরা পড়ে মীনাক্ষী তখন মরীয়া হয়ে উঠলো। স্পষ্টই বললো, আমিই বলেছি। একজনের জিভ পুড়বে চুন খেয়ে, আর একজন হাসবে! আমার খারাপ লেগেছে। তাই বলে দিয়েছি।

দাঁড়াও দাঁড়াও একটা পয়েন্ট পেয়েছি। পিকু যেন ওকালতি জেরা শুরু করে দিল। তোমার খারাপ লেগেছে মানলাম। তা এই খারাপটা আমার সময়ে লাগেনি কেন? সবিতা আমাকে চিনির সরবতের নামে স্রেফ নুনগোলা জল খাইয়েছে। তখনও কিন্তু তুমি জানতে। তবে যেহেতু আমি পিণাক সোম, অতোএব সে-বারে তোমার বিন্দুমাত্র খারাপ লাগেনি। অথচ এবারে লেগেছে, কারণ এই মামলার শিকার পিণাক সোম নয়—সঞ্চয়ণ ঘোষ। হাসিতে ভেঙে পড়লো পিকু। বললো, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, একটু আগেই প্রধানা আসামী কুমারী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তার খারাপ লাগার যে-কথা বলেছে, আসলে তা মোটেই খারাপ লাগা নয়—ওটা হলো সম্পূর্ণ ভালো লাগা। পিকু, সবিতার দিকে তাকিয়ে তার বক্তৃতা চালিয়ে গেল, ইওর অনার! মুজরিম সঞ্চয়ণ ঘোষকে ভালো লাগার এই সামান্য কথাটি যদি কুমারী মীনাক্ষী আগেই আমাদেরকে জানিয়ে দিতো, তাহলে এই কেস এতোদূর পর্যন্ত গড়াতো কিনা সন্দেহ আর মহামান্য আদালতেরও মূল্যবান সময় বাঁচতো। আমি মহামান্য হুজুরের কাছে প্রার্থনা করছি আসামী কুমারী মীনাক্ষীকে অপর আসামী সঞ্চয়ণ ঘোষের সঙ্গে যাবজ্জীবন একসঙ্গে থাকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।

এমন ধবনের ছোট ছোট কতো ঘটনা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। সঞ্চয় কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে ভাববে? অনেক ঘটনা। হাজারো কথা। সবই মনে আছে সঞ্চয়ের। সব কথা তার মনের অ্যালবামে গাঁথা থাকবে। সহজে কি ভোলা যায় তা? সে ফটো চেয়েছিল। মীনাক্ষী তাও পাঠিয়ে দিয়েছে। সবই করেছে। তবে কেন সেদিন তার কথাটা রাখলো না? এ-দুঃখ সঞ্চয়ের নিশ্চয়ই থাকবে। অতো আকুল হয়ে বলার কোনও মর্যাদাই মীনাক্ষী দিল না। শুনলো না তার একান্ত অনুরোধটুকু। অথচ কাজটা কি খুবই কঠিন ছিল? তাও নয়। ঠিক এই জায়গাতেই সঞ্চয় মীনাক্ষীকে চিনে উঠতে পাবছে না। বাইরের দিকে তাকালো সঞ্চয়। একটু একটু করে অন্ধকাব নামছে। লবির এক কোণে টুলের উপব চুপচাপ বসে আছে ওয়াকরদে। দৃষ্টি কুতুবের দিকে। উদাস ভাবে ওকে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন দুঃখ লাগল সঞ্চয়ের। ওয়াকরদে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, কি রে' কি ভাবছিলি?

কিছু না বাবুজি।

তবে অমন ভূতের মতো বসেছিলি কেন? আমাকে বিকেলে কিছু খেতেও দিলি না।

তুমি লেখাপড়া করছিলে, তাই দিইনি। ওয়াকরদে মনে করিয়ে দিল, তুমি একদিন বলে দিয়েছিলে বাবুজি, কাজের সময়ে বিরক্ত না-করতে।

খাবার না-পেয়েই বরং আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম। প্রশান্ত হেসে সঞ্চয় কথাটা বলতেই ওয়াকরদেও সেই হাসিতে যোগ দিল। তুমি এক কাজ কবো বাবুজি, হোটেলের মেনুর মতো আমাকে একটা চার্ট তৈবি করে দাও—কখন তুমি বিরক্ত হবে, আব কখন কখন হবে না। তাহলে আমার সুবিধা হয়।

ছবির মতো সুন্দর হাউজখাসের বাড়িগুলি। আধুনিক ডিজাইনের শৈল্পিক ছাপ প্রতিটি বাড়িতে। বাড়িগুলিও যত্রতত্র এদিক-ওদিক ছোটদের খেলনার মতো ছড়িয়ে নেই। মসৃণ চওড়া রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঞ্চয় গাড়ি নিল না। কেন-না মিনিট তিনেকের পথ মাত্র! তিন মিনিট হাঁটলেই বাঁ দিকে সুন্দর ছোট্ট একতলা পেঁয়াজ রঙের যে-বাড়িটি চোখে পড়বে সেটি হলো আদিত্যদাব। আদিত্য সেন। বছর ছত্রিশ বয়েস হবে। সর্বদা হাসিখুশি মানুষটা। নয়াদিল্লির বাংলা পত্রিকা ইন্দ্রপ্রস্থেব সম্পাদক। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' পত্রিকাই তার ধ্যান-জ্ঞান। কি করে পত্রিকাটিকে সুষ্ঠু ভাবে দাঁড় করানো যায়, সুন্দর তথ্যবহুল রচনাব মধ্য দিয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা আদিত্য সেনের মাথায়। পত্রিকার প্রধান কার্যালয় এবং অফিসও তার বাড়িতেই। নতুন ও পুরাতন লেখক বলে তার কাছে কোনও পার্থক্য নেই। লেখার গুণগত মান উচ্চাঙ্গের হলে সে লেখক যতোই নবাগত হন-না কেন আদিত্য সেন সেই রচনা প্রকাশ করতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করে না। সঞ্চয় গত বছরেই সে-প্রমাণ পেয়েছে। শারদীয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিবারেই একটিমাত্র সম্পূর্ণ উপন্যাস থাকে। সেই উপন্যাস সাধারণত একজন নামকরা সাহিত্যিকের রচনা হয়ে থাকে। গত বছরে হয়েছে তার ব্যতিক্রম। পূজার মাস তিন আগে সম্পূর্ণ নবাগত একজন তরুণ লেখক একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আদিত্যদার সঙ্গে দেখা করলো। সেই উপন্যাস পড়ে আদিত্যদা তো মুগ্ধ। নবাগত লেখক। তবুও সেই রচনা লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব কথা ঘোষণা করে। প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেই রচনার মধ্যে। আদিত্যদা নামকরা লেখকের রচনা বাদ দিয়ে সেই নবাগত লেখকের রচনাকে গ্রহণ করতেই সম্পাদকমণ্ডলীর অপরাপর সদস্যারা অসন্তুষ্ট হলো। একটিমাত্র উপন্যাস থাকবে। তাও যদি অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকের রচনা হয় তাহলে পত্রিকা বিক্রি হবে কি করে? সেদিনের সেই আসরে সঞ্চয় উপস্থিত ছিল। আদিত্যদা স্পষ্টই বলেছিল, পত্রিকার বিক্রিটা আমাদের একটা লক্ষ্য ঠিক কথা, কিন্তু সেটাই মুখ্য নয়। প্রথম ও প্রধান কথা হলো পত্রিকাকে আমরা সুন্দর করে গড়ে তুলবো। কোন লেখক জনপ্রিয় কোন লেখক নয় সেটা আমাদের বিবেচনা নয়। আমরা দেখবো রচনার উৎকর্ষতা! সে-ক্ষেত্রে নতুন পুরাতনের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পত্রিকা যদি বিক্রি না-হয়? একজন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিল, ইন্দ্রপ্রস্থকে বাঁচিয়ে রাখতে

হবে তো?

ভালো রচনা সব সময়েই আদরণীয় হবে। বিক্রিটাই সেখানে সব নয়।

তা ঠিক। তবে ইন্দ্রপ্রস্থের এখন শৈশব অবস্থা। মূলধন আমাদেব কম। ঠিক পূজাসংখ্যার উপর দিয়েই নতুনের এই পবীক্ষা-নিরীক্ষা.....মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আদিত্যদা বলেছিল, একদিন তো সকলেই নতুন থাকে। আজ যে নতুন---আগামীকাল সে পুরাতন। নতুনকে সুযোগ না-দিলে সে পুরাতন হবে কেমন করে? আর ব্যবসায়িক যে-দিকটা তুলে ধরেছেন তার উত্তরে শুধু বলবো, ইন্দ্রপ্রস্থের লোকসান হলে সে দায়িত্ব আমার। আমি একা সে ক্ষতির দায়িত্ব নেবো। আদিত্যদা তার বিশ্বাসে অবিচল। তার সেই বিশ্বাসের ফলও পাওয়া গিয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকে সেই বছরেই ইন্দ্রপ্রস্থের বিক্রিটা একটু বেশিই হয়েছিল। সেই আদিত্য সেনের বাড়িতে চলেছে সঞ্চয়। মাত্র দু'বছরের আলাপ। কিন্তু এরই মধ্যে সঞ্চয় সেই বাড়িরই একজন আপন মানুষ হয়ে উঠেছে।

সঞ্চয় ও-বাড়িতে গিয়ে যখন পৌছলো, আদিত্যদা নিজের লেখার একটি অংশ দূর্গাবৌদিকে পড়ে শোনাচ্ছিল। যা কিছু লিখবে প্রথমে স্ত্রীকে পড়ে শোনাবে। আদিত্যদার নিজের লেখা যাচাই করে নেবার এটি প্রথম ও প্রধান ঘাঁটি। ওখান থেকে ছাড়পত্র পেলেই তবে প্রকাশের জন্য পাঠায়। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দূর্গাবৌদির প্রচুর পড়াশোনা। আদিত্যদা যখন তার লেখা পড়ে শোনায, দূর্গাবৌদি কক্ষনও মনে করে না যে একান্ত প্রিয়জনের লেখা শুনছি। তখন সম্পাদকের মন নিয়ে লেখাব গুণাগুণ সম্পর্কে যাচাই করে চলে। যেখানে খাবাপ লাগে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়। রচনার কোনও জায়গায় যদি একটু কাটছাঁট করলে লেখাটা সুন্দর হয়, দূর্গাবৌদি তাও বলে থাকে। সঞ্চয ঘবে ঢুকতেই আদিত্য সেন পড়া থামালো। বললো, হ্যালো কলকাতা ফেরত! কখন এলে?

গতকাল রাত্রে। সঞ্চয় বসগোল্লার টিনটা দূর্গার হাতে দিয়ে বললো, বুঝলেন বৌদি অনেক দিন কলকাতা যাননি। সেই শোক ভুলিয়ে দিতে এই গোলক জিনিসটি এনেছি।

তা তো বুঝলাম। দূর্গা চাপা হাসলো। এবারে সত্যি করে বলো তো, মামার বিয়ের নাম করে যে কলকাতা গেলে আসলে সেটা তোমারই বিয়ে কিনা! তায় আবার এই মিষ্টি!! তারপর আবার এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি কলকাতা দৌড়াদৌড়ি। কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। আদিত্য এবারে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে সঞ্চযের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

আদিত্যদা' শেষে আপনিও! সঞ্চয় হেসে ফেললো। কলকাতা থেকে মিষ্টি নিয়ে এলাম। আপনাদের না-দিয়ে খাই কি করে? আর বিয়ের কথা বলছেন, আমাব বিয়ে হলে আপনারা জানবেন না— এটা কি যুক্তিসঙ্গত কথা হলো?

আরে! সঞ্চয়ের পিঠে একখানা হাত বুলিয়ে আদিত্য বললো, অনেক সময় বাবা-মাও জানতে পাবেন না। আমরা তো অনেক দূর। কথাটা শেষ করেই সে প্রবল হাসিতে সারা ঘব ভবিয়ে তুললো। তার হাসির ধরনই এমন। প্রাণখোলা হাসি। মুক্ত হাসি। সঞ্চয় দেখলো, আদিত্যদাব হাসির ঝর্ণাধারার রেশ তখনও বয়ে চলেছে। তাকে বেশি নবীন, বেশি সজীব দেখাচ্ছে। সঞ্চয জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কি আদিত্যদা! বৌদি কি আজ আপনাব লেখার ভুল-টুল ধরেননি?

ও-সব বলে লাইন ঘুরাবার চেষ্টা করো না ভাই। তোমার বৌদি যে প্রশ্ন করেছে আগে তার উত্তর দাও। সঞ্চয় অসহায় দৃষ্টি নিয়ে দুজনকেই বার কয়েক দেখলো। বললো, এক মিষ্টি নিয়ে যে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়বো আগে জানলে কে ওটা নিয়ে আসতো? এখন দেখছি আমার বাড়িতে আপনাদের নিয়ে গিয়েই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

সেটাই ঠিক হতো। দূর্গা আগের মতোই চাপা হাসি হেসে বললো, বৌ দেখা মিষ্টি মুখ দুটোই একসঙ্গে হতো তাহলে।

বৌকে পর্যন্ত বাড়িতে এনে ফেলেছেন, আপনাদের যে আজ কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বেশ আমি চললাম। সত্যি সত্যিই বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো সে। দু'পা এগোতেই দূর্গা স্নেহের সুরে ডাকলো, সঞ্চয়ণ। এসো এদিকে, লক্ষ্মীছেলের মতো তোমার দাদার পাশটিতে বসে যাও। পূজা দিলে। প্রসাদ খাবে না? দূর্গা চলে গেলে সঞ্চয় টেবিলের উপর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ পত্রিকাটি

তুলে নিয়ে মেঝেয ফরাসের উপর বসে পড়লো। পত্রিকাটি গত মাসের। সঞ্চয়ের বাড়িতেই রয়েছে। কেন-না ইন্দ্রপ্রস্থের গ্রাহক সে। তায় সম্পাদকেব বাড়ির কাছাকাছি থাকে। সুতরাং সময় মতো পত্রিকা পেতে তার কোনও অসুবিধাই হয় না। সঞ্চয় বললো, বৌদিকে কি শোনাচ্ছিলেন আদিত্যদা?

আমার উপন্যাসেব একটি অধ্যায়। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না সঞ্চয়ণ, গত পাঁচ বছর ধরে এটি লিখছি।

উপন্যাসটা শেষ করবেন কবে? নাকি কুড়ি বছরের পরিকল্পনা নিয়েছেন........

আরে না! না! তুমি কি ভেবেছো আমি শুধু পৃষ্ঠা বাড়িয়েই চলেছি। তা নয়। চারশো সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আমার শেষ। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো, বইটা লিখে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না। একবিন্দু আনন্দ অনুভব করতে পারছি না। লিখছি, কাটছি—আবার লিখছি। আজকে যেটা লিখছি, দু'দিন পরেই সেটাকে খারাপ লাগছে। তখন বাধ্য হই কাটাকুটি করতে। সপ্তাহ বাদে সে-লেখাও আর পছন্দ হয় না। শুধু ভাবি এব চেয়েও ভালো করা যায়। আমাকে সেই ভালো লিখতে হবে। ঠিক এই কারণেই এখনও পর্যন্ত শেষ করে উঠতে পারছি না। তোমার বৌদি বলে, একটা লেখা নিয়ে তুমি কতো আর অপেক্ষা করবে? দিয়ে দাও কোনও প্রকাশককে, আমি এখনও বাজি হতে পারছি না। এটাকে নিয়ে আমার অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা। আমাব সেই স্বপ্নের ফসলকে আমি যেমন-তেমন ভাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো না। এতে যদি তোমাব কথা মতো আমাকে আরও কুড়ি বছরও অপেক্ষা কবতে হয় তাও করবো। সাধনায় সিদ্ধিলাভ নাই-বা হলো সঞ্চয়ণ। মন তো জানবে সাধনা করতে গিয়ে এতোটুকু ফাঁকি দিইনি।

আপনাব উপন্যাসের বক্তব্য কি?

এই ভাবে প্রশ্ন করলে বলাটা মুশকিল। কেন-না আমি যা বলতে চেয়েছি এক কথায় তো তোমাকে বোঝাতে পারবো না। এই ধবো বিপ্লব নিয়ে আমরা বড়বেশি কথা বলি। কথা অন্তব ছুঁয়ে এলে তাকে বলি আন্তরিকতা। সেটাব বড়ো অভাব। সাম্যবাদ আসবে কিংবা আসুক এটা আমরা সবাই চাই। কী ভাবে আসবে জানি না। কারণ দেশের প্রতি আমাদের আন্তরিক টান নেই। ভুয়ো কথা দিয়ে বিপ্লব আসবে না। সেটাই আমি বলতে চেয়েছি। কেউ যদি ভেবে বসে আমি প্রতিক্রিয়াশীল আশ্চর্য হবো না। আন্তরিকতাকেও আমরা আজকাল প্রতিক্রিয়াশীল বলে থাকি। সেটা যুগের ফ্যাশন। তার থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছি।

দূর্গা ওদের দু'জনের জন্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। স্লাইজ রুটিতে সর মাখিয়ে, মিষ্টি দিয়ে প্লেট দু'টি এগিয়ে দিতে দিতে বললো, কলকাতার মিষ্টি না-হলে কখনও মন ভরে? এখানে যে কি ছাই রসগোল্লা বানায় খেতে আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

দূর্গা! আদিত্য স্ত্রীর দিকে খুশির চোখে তাকিয়ে বললো, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে রসগোল্লার দল টিন থেকে বের হবারও সুযোগ পায়নি। তার আগেই বোধহয় তুমি দু-একটা.......

ওমা! দূর্গার গলায় কান্নার সুর। তুমি আমাকে এমন রাক্ষুসী সার্টিফিকেট দিচ্ছো কেন? কোনও জিনিস না-খেযে শুধুমাত্র দেখে কি অনুভব করা যায় না সেটা ভালো কি মন্দ?

হ্যাঁ। যেমন আমি তোমার খাওয়া দেখিনি। অথচ তোমার মুখ দেখে দিব্যি অনুভব করতে পারছি।

কি পারছো? দূর্গা তির্যক ভাবে স্বামীর দিকে তাকালো। আদিত্য হাসির জলতরঙ্গে সারা ঘর ভরিয়ে তুলে বললো, তুমি খাওনি। শেষে একটু নিচু সুরে বললো, তুমি হলে আমার লেখার প্রথম ও প্রধান বিচারক। সেন্সর বোর্ড। তোমাকে চটিয়ে লাভ নেই।

আমাকে না-চটালেও তোমার কোনও সুবিধে হবে ভেবেছো? আজকে যেখানটা পড়ে শোনালে সেটা মোটেই ভালো হয়নি। অতিকথন দোষে গল্পের মর্মার্থ হারিয়ে গেছে। নতুন করে আবার লিখতে হবে।

দূর্গা তুমি নিশ্চয়ই রাগ করে এ-সব বলছো। আদিত্যর কথা শুনে সঞ্চয় হেসে উঠলো। কে কাকে চটায়, সেটাই এবারে দেখতে হবে। আদিত্য ফরাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সদ্য পাটভাঙা

পাজামা-পাঞ্জাবি এবং ব্লু রঙের জহরকোটে তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, দূর্গা এসো আমরা কম্প্রোমাইস করে নিই। সঞ্চয়ণ কিন্তু আমাদের নিটোল একটা ঝগড়া দেখতে চাইছে। দূর্গা মাথা নাড়ালো। বললো, তাহলে তো আমাদের আরও বেশি করে ঝগড়া করতে হয়। কথাটা শেষ করেই দূর্গা ঝর্ণাধারার মতো হেসে উঠলো। সে-হাসিতে যোগ দিল আদিত্য এবং সঞ্চয়ও।

বসির আলি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সঞ্চয় তখনও নীচে নামেনি। সবে খেতে বসেছে। খেতে দিচ্ছে রামসুভগ। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াকরদে। সঞ্চয়ের খাবার সময়ে সে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করে। আজ যেন সঞ্চয় একটু তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। অথচ অন্যান্য দিন সে বেশ ধীরে-সুস্থে খায়। এই পার্থক্যটুকু ওয়াকরদের দৃষ্টি এড়ালো না। সে তাই বলে উঠলো, বাবুজি এতো জলদি খাচ্ছো কেন?

কাজ আছে। খেতে খেতে উত্তর দিল সঞ্চয়, অফিসে যাবার আগে করোলবাগে একটা জরুরি কাজ সারতে হবে। আমাব খেয়ালই ছিল না আজ সেখানে যেতে হবে। সঞ্চয় জল খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অর্থাৎ খাওয়া শেষ। অবাক হলো ওয়াকরদে। দু'মিনিটের মধ্যে একে কি খাওয়া বলে? তাছাড়া সবই তো পরে রইলো। ভাজা, ফুলকপির স্টু, মাছ। ওয়াকরদে না-বলে পারলো না, কি হলো বাবুজি? কিছুই যে খেলে না—

খেতে ভালো লাগছে না।

রান্না ভালো হয়নি?

ভালো হয়েছে।

ওয়াকরদে আর কিছু বললো না। ওই এক খেয়াল বাবুজির। ফেলে ছড়িয়ে খাওয়া। তবে আজকেব মতো এতটা বোধহয় এর আগে কখনও করেনি।

সঞ্চয় নীচে নামতেই নীনার মুখোমুখি হলো। নীনা রণধাওয়া। গৌরবর্ণ গায়ের রং। দীর্ঘাঙ্গী। দেহের গঠন অনুযায়ী মুখখানা ততো সুন্দর নয়। তবে সারাক্ষণই প্রসাধন এবং পেন্টের উপরে থাকার ফলে দেখতে মন্দ লাগে না। বয়েস একুশ-বাইশ হবে। মৌলানা আজাদে ডাক্তারী পড়ছে। এই বাড়িব নীচের ফ্ল্যাটে ওরাই থাকে। বাবা-মা এবং ওই একটিমাত্র মেয়ে। সঞ্চয় ওকে দেখলো। চোস্ত সালোয়াব কামিজে দৈহিক সৌন্দর্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বুকের উপর পাতলা একটি ওড়না। নীনা মিষ্টি করে হাসলো। গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং। সঞ্চয়ও প্রত্যুত্তবে ভদ্রতা করতে কার্পণ্য করলো না। সময় নেই। সুতরাং কথা না-বাড়িয়ে সে সোজা গাড়িতে উঠে বসলো। বসির আলি গাড়িতে স্টার্ট দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি করলো না।

করোলবাগের কাজ সেরে নয়াদিল্লির প্রাণকেন্দ্র কর্ণট সার্কাসের অফিসে এসে সঞ্চয় যখন পৌঁছালো বেলা তখন সাড়ে দশটা। প্রথমেই দেখা হলো মিঃ সাক্সেনার সঙ্গে। দিল্লি অফিসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তারপরেই সঞ্চয়ের স্থান। মিঃ সাক্সেনা আগামী বছরে রিটায়ার করবেন। তার জায়গায় কে হবে, সেটা সঠিক ভাবে বলতে না-পারলেও প্রতিযোগিতাটা যে দুজনের মধ্যে হবে, সেটা সবাই জানে। দিল্লি অফিসের সঞ্চয়ণ ঘোষ এবং মুম্বাই অফিসের মিঃ নাগেশের মধ্যে যে কেউ একজন হবে। কোম্পানির সেল্ বাড়ানোর ক্ষমতা, কর্মতৎপরতা, দক্ষতা, এ-সব দিক দিয়ে বিচার হলে সঞ্চয় অনায়াসে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ডিগ্রির মূল্যে মিঃ নাগেশ উপরে। সার্ভিস পিরিয়ড দুজনেরই সমান। একই দিনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। কে হবে না-হবে তা অবশ্য সিলেকশান বোর্ডের মিটিংয়েই স্থির হবে। তবে শুধুমাত্র ডিগ্রির কারণেই যদি মিঃ নাগেশ চিফ হন তাহলে সঞ্চয়ের বলার কিছুই নেই। কেন-না শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি থাকার ফলেই মিঃ নাগেশ ওই পদ পাবেন। সঞ্চয়ের আফসোস অন্যখানে। পি. ইউ. পাস করার পর বাবা তাকে আরও পড়তে বলেছিলেন। সঞ্চয় শোনেনি। বাবা বলেছিলেন, এক্ষুণি তোর চাকরিতে ঢুকবার কি হলো? আমি তো রয়েছি। তোর অভাবটা কোথায়? শিক্ষার হার দিন দিন বেড়ে চলেছে। থেমে থাকলে কখনও চলে? স্কুল ফাইনাল

বা পি. ইউ. পাস করে এতো অল্পতে সন্তুষ্ট হলে জীবনে কোন উন্নতিটা করবি শুনি? সঞ্চয় শুধু বলেছিল, যে-চাকরিটা পেয়েছি, সেটা খুবই ভালো। ভবিষ্যতে উন্নতি করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। লেখাপড়া শিখে আরও ডিগ্রি পেলাম কিন্তু এমন চাকরির সুযোগ পরে আব আসবে না। তখন সেই ডিগ্রির মূল্য কি থাকবে আমার কাছে? অলকদাকে তো দেখছি। এম.এস.সি পাস করে হেলথ্ ডিপার্টমেন্টের এল.ডি ক্লার্ক। কোন কাজে লাগলো তার সেই ডিগ্রিগুলি? ওই কথার পরেও বাবা তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। সঞ্চয় তখন বোঝেনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে ডিগ্রির প্রয়োজন আছে। এই ডিগ্রির রক্ষা কবচই হয়তো মিঃ নাগেশকে দিল্লি অফিসের চিফের আসনে পৌঁছে দেবে। মিঃ সাক্সেনাকে দেখে কেন যে তার এতো সব কথা মনে হলো তা সঞ্চয় নিজেই ভেবে পেল না। মিঃ সাক্সেনাকে সুপ্রভাত জানিয়ে সে তার নিজেব ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মিনিট পনেরো বিশ্রাম নিয়েই কোম্পানির প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রগুলি একে একে পড়তে আরম্ভ করলো। চিঠিগুলি পড়া হলে প্রত্যেকটির উত্তর দিতে হবে। বেয়ারা শিউসবণ একটি ফাইল রেখে গেল তার টেবিলে। ওতে তার সই থাকবে, অর্থাৎ এখনই সই করে দিতে হবে। ফাইলের প্রথম দু-তিনটি পৃষ্ঠা উল্টে দেখলো সঞ্চয়। তারপরেই একটি একটি করে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সই করে দিল। মিনিট ছয়েব কাজ। শেষ হতেই সঞ্চয় বেল টিপলো। শিউসরণ এসে ফাইলটা নিয়ে যেতেই সঞ্চয় যে-কাজ করছিল, সেই কাজে আবার মন দিল। একটি চিঠি একবারের জায়গায় তিনবার পড়লো। পড়া শেষে বিরক্তিতে ভরে উঠলো তার সারা মুখ। ভ্রূ দুটি সহজেই ছোট হলো। সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপলো। শিউসরণ ঘরে ঢুকতেই সঞ্চয় চিঠি থেকে মুখ না-তুলেই একটু গম্ভীর গলায় শুধু বললো, কৃষ্ণমূর্তিকো বোলাও। মিনিট দুয়েক সময় পাব হলো না। কৃষ্ণমূর্তি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো। অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সঞ্চয় চেয়ারেব পিঠে দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে ওর দিকে তাকালো। একটু রুক্ষ সুরেই জিজ্ঞেস করলো, আমাদের নুতন যে-সুইস ট্যাবলেট বেরিয়েছে, তা স্টোরে নেই?

আছে স্যার।

আগ্রার দয়াভাই মেডিক্যাল ফার্মকে তবে কেন জানিয়েছেন ওটা এখানে নেই?

ওদেব চিঠিটা ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার। কৃষ্ণমূর্তি মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ভুলের গুরুত্বটুকু সে অনুভব করলো। সে-কারণেই আর একবার বলে উঠলো, স্যার এমন ভুল আমার এই প্রথম হলো। ওরা আমাদের সুইস ট্যাবলেট চেয়েছে। আমি ভেবেছি সুইস কোম্পানির জিনিস চেয়েছে। তাই জানিয়েছিলাম, এখানে নেই। সঞ্চয় ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। পরে বললো, দয়াভাই কলকাতার অফিসে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, তোমাদের কথা মতো আমরা দিল্লি অফিসে চিঠি দিয়েছিলাম ওষুধের জন্য। কিন্তু ওরা জানিয়েছে, সে-ওষুধ নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আবার তোমাদের এই চিঠি দিচ্ছি। সঞ্চয় একটি চিঠি টেবিলেব ও-পাশে কৃষ্ণমূর্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, হেড অফিস থেকে মিঃ আয়েঙ্গার এই চিঠিতে কৈফিয়ত চেয়েছেন, ওষুধ এখানে থাকা সত্ত্বেও দয়াভাইকে কেন জানানো হয়েছে ওটা এখানে নেই? আপনার এই ভুলের জন্য কোম্পানিব কতো ক্ষতি হলো জানেন? আর্থিক দিক দিয়ে এগারো হাজার টাকার লোকসানে হয়তো কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না কিন্তু আমাদের কোম্পানির প্রতি দয়াভাই ফার্মের যে অগাধ বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ আস্থা ছিল এবারে নিশ্চয়ই তা কমে যাবে। ওরা বছরে কতো লক্ষ টাকার ওষুধ আমাদের কাছ থেকে কেনে সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন? সঞ্চয় চেয়ে রইলো কৃষ্ণমূর্তির দিকে। কৃষ্ণমূর্তি কোনওরকমে বললো, ওষুধটা দয়াভাইকে পাঠিয়ে দিই স্যার! সঞ্চয় একটু ভাবলো। কি যেন চিন্তা করলো আপন মনে। গাম্ভীর্যটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখে বললো, দিন। আর শুনুন—এরপর থেকে চিঠিগুলি পড়ে একটু বুঝবার চেষ্টা করবেন। কেন-না এমন ধরনের কাজ করলে কোম্পানির ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিজেরও ক্ষতি কম নয়। তাই নয় কি? কৃষ্ণমূর্তি চুপ করে থেকে কথাটা মেনে নিল। সঞ্চয় নরম সুরে বললো, সামনেই প্রমোশনের সময়। এখন এমন ধরনের ভুল করলে সেটার চান্স পাবেন কেমন করে? অথচ আমি আপনার নামে রেকমেন্ড করেছি। কৃষ্ণমূর্তি বেরিয়ে গেলে সঞ্চয় বাকি চিঠিগুলি পড়া শেষ করলো। হাত-ঘড়িতে চোখ দুটি একবার

বুলিয়ে নিল। সওয়া দুটো বাজে। সাড়ে-তিনটার সময়ে অ্যাপয়েন্ট আছে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এই তারিখটি সে বাণিজ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে রেখেছিল কলকাতা যাবার আগেই। ড্রাইভার বসির আলিকে নিয়ে সঞ্চয় বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে।

সন্ধ্যা নেমে এলো রাজধানীর বুকে। দেওয়ালের গায়ে, বিল্ডিং-এর ছাদে রঙ্গীণ আলোর বিজ্ঞাপনের মেলা। গোলাকার নেহরু পার্কে নীলাভ বাতির দ্যুতির রেখা। সমস্ত কর্ণট সার্কাস এলাকাটি সন্ধ্যা আলোর আরাধনার মেতে উঠেছে। সেজেছে রূপসী ষোড়শী। দূর আকাশে রঙীন আলোর রামধনু। সারাপথ যেন আলোর বন্যায় ভাসছে। আজকের দিনের মতো অফিসের কাজ শেষ করলো সঞ্চয়। বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সে আবার অফিসে এসে এতো কাজ করলো। বসির আলিকে ছেড়ে দিয়েছে তখনই। বাড়িতে ওর নাকি একটা দরকারী কাজ আছে। ছুটি চাইতে সঞ্চয় আর আপত্তি জানায় নি। বিকেল চারটে নাগাদ ওকে ছেড়ে দিয়েছে। সঞ্চয় নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। লবিতে দাঁড়িয়ে ওয়াকরদে অপেক্ষা করছিল। সঞ্চয় আসতেই তার কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বললো, বাবুজি একজন মেমসাব এসেছে। বিকেল থেকে তোমার জন্য বসে আছে। মেমসাব বলার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় প্রথমে মীনাক্ষীকেই ভেবেছে। পরক্ষণেই ভেবেছে, মীনাক্ষীদের আসতে এখনও দেরি আছে। সুতরাং রাখী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। ঘরে ঢুকেই সঞ্চয় দেখলো, একটি সোফায় হেলান দিয়ে রাখী বসে আছে। ইলাসট্রেটেড উইক্লীর পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। ওয়াকরদের মুখ থেকে শোনা সত্ত্বেও সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, কতোক্ষণ হলো এসেছেন?

সেই বিকেল থেকে বসে আছি। প্রথম দিন আপনি এতোক্ষণ অফিস করবেন, কি করে বুঝবো?

তবুও যাহোক বুঝতে পারলেন যে আমি কাজের মানুষ। সঞ্চয় ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলো। একদিন দেরি করে আপনার সঙ্গে এলে কিন্তু আমার কাজের ভীষণ ক্ষতি হতো। আপনি তো মানতেই চাইছিলেন না, জানেন গতকাল সারাদিন ঘরে বসে অফিসের কাজ করেছি। সঞ্চয়ের কথাগুলি শুনলো রাখী। তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে চেয়ে। বড়ো ভালো ছেলে। বড়ো সুন্দর ছেলে সঞ্চয়। ওকে যে রাখীর কি ভালো লাগে তা সে কেমন করে বোঝাবে! সঞ্চয়ের টাকা-পয়সার প্রতি রাখীর এতোটুকু লোভ নেই। কেন-না অর্থ তারও রয়েছে। রূপাহীন ঘরের মেয়ে সে নয়। সে শুধু সঞ্চয়কে নিজের করে পেতে চায়। আপন করে। কাছে কাছে। মুগ্ধ চোখে রাখী তাকিয়ে থাকে সঞ্চয়ের দিকে। অনেকবার দেখা সঞ্চয়কে নতুন করে দেখে। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। দোহারা এবং অত্যন্ত স্মার্ট চেহারা। ফর্সা মুখে নীল চোখ দুটি যেন ভাসছে। মনে হয় আটলান্টিক সাগরের দু'ফোটা নীল জলবিন্দু স্থির হয়ে রয়েছে। সঞ্চয়কে পেলে রাখী এতো বড়ো পৃথিবীর আর কোনও কিছুতেই সে দাবি জানাতে, আরও বেশি কিছু পেতে চাইবে না। শুধুমাত্র ওকে নিয়েই সে সুখী হতে পারবে। সঞ্চয়ের ভালোবাসায় সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। রাখীর একটিই দুঃখ, সে সুন্দরী নয়। তাই প্রসাধনের সাহায্যে নিজেকে যতোটা সম্ভব সুন্দর করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করে। সঞ্চয়ের চোখে সে সুন্দরী হতে চায়। সঞ্চয় জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে ওয়াকরদেকে ডাকলো। বললো, মেমসায়েবকে খেতে-টেতে দিয়েছিলি তো নাকি— কথা শেষ হবার আগে রাখীই বলে উঠলো, ভদ্রতায় মনিবের চেয়ে ওয়াকরদে কম যায় না। আমাকে যত্ন করে একশডিস খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। একটু চুপ থেকে সে আবার বললো, আমাদের কলেজের একটি মেয়েকে নীচে দেখলাম।

হ্যাঁ নীনা রণধাওয়া। ওরা নীচের ফ্ল্যাটেই থাকে। কেন, আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?

না। আমার সিনিয়র। কলেজে দেখেছি এই পর্যন্ত! তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে ও বেশি মেলামেশাও করে না। বোধহয় পছন্দ করে না।

তবে কি প্রফেসরদের সঙ্গেই ওর বেশি বন্ধুত্ব? দু'পায়ের মোজা খুলে সঞ্চয় একটু হেসেই কথাটা জিজ্ঞেস করলো। ওর ফর্সা নগ্ন পায়ের দিকে তাকালো রাখী। কেন জানি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। সঞ্চয় হেসে কথা বলছে তার সঙ্গে, সেই কৃতজ্ঞতায় কি? কতো অল্পতে খুশি রাখী! কিন্তু এই মুহূর্তে এ-সব ভাবনা নয়। সঞ্চয়ের কথার উত্তর দিতে হবে আগে। বললো, ছেলেদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে নীনাজি পছন্দ করে। এই কারণে মেয়ের চেয়ে ছেলে বন্ধুর সংখ্যাই ওর

বেশি। ওব ক্লাসের একটি মেয়ে আমাব বন্ধু তারাই এ-সব বলাবলি করে। ওয়াকরদে দবজার বাইরে থেকে জানালো, বাবুজি জল গবম হয়ে গেছে।

আপনি একটু বসুন। আমি স্নানটা সেরে আসি।

নিশ্চয়ই! সঞ্চয় বেরিয়ে গেলে রাখী ভাবতে বসলো। সে-ভাবনা অবশ্যই সঞ্চয় আর নিজেকে কেন্দ্র করে। মনের গোপন কথা খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি বলাটা কি ঠিক হবে? আসলে সে নিশ্চয়তা খুঁজে পেতে চাইছে। পরম নিশ্চয়তা। যাকে পাবাব জন্য মন কাঁদছে সে শুধু তাবই কাছে ধরা দেবে। সঞ্চয়ের সঙ্গে রাখীর এখনও পর্যন্ত কোনও বোঝাবুঝি হয়নি কিন্তু তার আগেই সে তার মায়ের কাছে সঞ্চয়ের গল্প করেছে। গল্প কবেছে একটি সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষের। সব শুনে মা বলেছিলেন, তোর যখন এতো পছন্দ আমাদের আপত্তি কীসের। তা সেই ছেলে রাজি আছে কিনা সেটা তো জানতে হবে। রাখী উত্তবে বলেছিল, সঞ্চয়কে আমি রাজি করাবো মা। সঞ্চয়েব মত আছে কিনা সেই বিশ্বাসে রাখী এখন পৌঁছাতে চাইছে। সঞ্চয়ের ভালোবাসা পাবার জন্য সে বুঝি নবকেও যেতে প্রস্তুত আছে। এই মুহূর্তে মীনাক্ষীর কথা মনে পড়লো রাখীর। সঞ্চয় মীনাক্ষীকে পছন্দ কবে এটা তার বুঝতে এতোটুকু অসুবিধে হয়নি। ওদের দুজনে দুজনকে ভালোলাগার অনেক নীবব দৃশ্য ধরা পড়েছে তার চোখে। দমদমেব সেই কটি দিন উজ্জ্বল হযে ভেসে উঠলো তার চোখে। মীনাক্ষীকে কাছে কাছে বাখবার ওব সঙ্গে কথা বলবাব সঞ্চয়ের সেই আকুলতা তার অজানা নয়। সে সব কিছু দেখেছে। জেনেছে। তবুও সঞ্চয়কে ভালোবাসতে তাব মন-প্রাণ এক হযে মিশে বয়েছে। রাখী অস্বীকাব করে না মীনাক্ষী সুন্দবী। সঞ্চয়ের সঙ্গে ওকে মানাবে ভালো। কিন্তু তার অন্তরাত্মা যে গুমরে গুমবে কাঁদছে সেটা তো কাব চোখে ধবা পডাব দৃশ্য নয়।

স্নান সেরে ফিরে এলো সঞ্চয়। একটি সোফায় দেহটা ছড়িয়ে দিযে রাখীব দিকে তাকালো। কোটে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে মনে পড়লো মীনাক্ষীকে। রাখী না হযে ওই জায়গায যদি এই মুহূর্তে মীনাক্ষী বসে থাকতো তাহলে সে কি করতো? নিশ্চযই হাজাবো উচ্ছ্বাস প্রকাশ কবতো। মীনাক্ষী কিসে খুশি হবে সেই চেষ্টাই আগে করতো। নয়তো ভালোবাসার গভীব দৃষ্টি নিয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকতো মীনাক্ষীর হালকা খয়েরি চোখের তাবাব দিকে। অথচ রাখীর উপস্থিতিতে সে-সব কিছু মনে হচ্ছে না। মনেব মধ্যে কোনও সাড়া জাগছে না। অথচ সঞ্চয় জানে এই মুহূর্তে রাখীকে নিয়ে সে যা ইচ্ছা তাই, নিজের খেয়াল-খুশি মতো কাছে টেনে নিতে পারে। মেয়েটা এতোটুকু বাধা দেবে না। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জানাবে না। বরং নীববে খুশি মনেই ধরা দেবে। তা সত্ত্বেও সঞ্চয় নিস্পৃহ। তার মন পড়ে আছে মীনাক্ষীব চিন্তায়। কাউকে যদি চেয়ে থাকে, সে মীনাক্ষীই। তাব সমস্ত চিন্তা-ভাবনাব মধ্যমণি যেখানে মীনাক্ষী, সেখানে অন্য কারো সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে ছলনা করতে পারবে না। সঞ্চয়ের অজানা নয়, রাখীর মনের গতিপথ কোনদিকে? কিন্তু সে নিরুপায়। রাখীকে সে একমাত্র বন্ধু ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। ওয়াকরদে দু'কাপ কফি টেবিলেব ওপব রেখে দিয়ে চলে গেল। সঞ্চয় বললো, কফি খান—

একটু আগেই তো খেলাম।

তা হোক। না-হয় আর এক কাপ বেশিই খেলেন। অন্তত বাড়ি ফিরে অর্থাৎ হোস্টেলে ফিরে তো গালাগালি দিতে পারবেন না, আচ্ছা অভদ্রলোক তো! সামনে বসে কফি খেলো অথচ একবাব ভদ্রতা পর্যন্ত করলো না!! নিজের কথা শেষ করে সঞ্চয় হাসতেই সে-হাসিতে যোগ দিল রাখী। কোমল সুরে বললো, সত্যি সত্যি না-দিলেও ও-কথাটা কখনোই বলতে পারতাম না।

যদি খুব খারাপ ব্যবহার করি তাহলে?

তাহলেও না।

কেন? সঞ্চয়েব ওই ছোট্ট একটি প্রশ্নের জড়তায় জড়িয়ে পড়লো রাখী? সঞ্চয় কি তার মনের খবর, প্রাণের স্পন্দন কান পেতে শুনেছে? জানতে পেরেছে কি তাব গোপন বাসনার কথা? সেই কারণেই বুঝি সে তাকে প্রশ্ন করে একটু একটু করে শুনতে চাইছে। শোনাবার মন নিয়েই রাখী

উন্মুখ। ওই ছোট্ট 'কেন'-র উত্তর তার দুই ঠোঁটের মাঝে চাপা পড়ে আছে। ইচ্ছা করছে বলতে। কিন্তু রাখী নিজেকে সংযত করে নিল। না, এই মুহূর্তে ভালোলাগার কথা বলবে না। সেটা সময় সাপেক্ষ। আরও দু'দিন যাক। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে সঞ্চয়ের কাছের মানুষ হয়ে উঠুক। সঞ্চয়ের ভালোবাসার আবেগে ডুব দিয়ে ওর কানে কানে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবে মন রাঙানোর কথা। সে-পরিবেশ এখনও তৈরি হয়নি। শত হলেও সঞ্চয় হলো পুরুষ। মীনাক্ষী রয়েছে চোখের বাইরে। হাজার মাইল দূরে। সুতরাং তার কাছে থেকে, সংস্পর্শে থেকে সঞ্চয় একদিন-না-একদিন আত্মসমর্পণ করবেই। তার ভালোলাগার কথা তখন সঞ্চয় এড়াতে পারবে না। কিন্তু এখনই বললে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতে পারে। তাই সে বললো, তা বলতে পারবো না।

মেয়েদের এই একটা বিশ্রী অভ্যেস। সঞ্চয় হাসলো। সব কিছু জানে। তবুও মুখে বলবে জানি না, পারি না। রাখী উত্তর দিল, সেটাই নিয়ম। জেনেও না-জানার নিয়মটুকু মেয়েরা পালন করে বলেই সংসারের অনেক অঘটন অনেক সময়েই ঘটে না। তাছাড়া পুরুষরা সব সময়ের সব কথা সহ্য করতেও পারে না। সে-কারণেই মেয়েদের জানি না, পারি না বলে পরিবেশকে সামাল দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হয়।

তা আপনি কোন কারণে বললেন, সেটা জানতে পারলাম না তো--

সঞ্চয়ের চোখে চোখ রাখলো রাখী। একটু কাঁপা গলায় বললো, যদি বলি আপনাকে শান্ত রাখতে।

আমাকে কি খুবই অশান্ত বলে মনে হচ্ছে আপনার? সঞ্চয় অনাবিল হাসলো।

তা নয়। কিন্তু কথাটা শোনার পর অশান্ত হতে কতোক্ষণ? রাখী ঠোঁট টিপে হেসে বললো, আটটা বাজে। এবারে উঠতে হবে—

চলুন। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সঞ্চয় ভদ্রতায় কার্পণ্য করলো না।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলো সঞ্চয়। গাড়িতে যেতে রাখীর এতোটুকু আপত্তি নেই। বরং সঞ্চয়ের পাশে বসে যেতে মনে মনে সে যথেষ্ট খুশিই হচ্ছে। কিন্তু সঞ্চয়কে একটু বাজিয়ে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। মানুষটার আগ্রহ কতোখানি এবং কি উত্তর দেয় সেটাই শুনতে বড়ো ইচ্ছা করছে। আর সঞ্চয়ের সেই উত্তর যদি তার পক্ষে যায়, তাহলে আনন্দের সীমা থাকবে না। না-হয় দেখতে সে সুন্দরী নয়। কিন্তু সেই জন্য কি তার ভালোবাসার মন বলে কিছু নেই? আর সঞ্চয় কি পাবে না তাকে একটু ভালোবাসতে? একটু খুশির চোখে দেখতে? রাখী মনের গোপনতা চেপে বললো, আপনি অফিস থেকে এসেছেন। বিশ্রাম করুন। আমি বাসেই যেতে পারবো।

বিশ্রাম আমি নিয়েছি। আর বাসের কথা বলছেন? দিল্লির ট্রান্সপোর্টকে নিশ্চয়ই চেনেন দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়েও হয়তো বাস পাবেন না। অবশ্য ট্যাক্সি বা অটো স্কুটার আছে। কিন্তু আমি যে গাড়ি বের করেছি। আসুন—সঞ্চয় সামনের দরজাটা খুলে রাখীকে ডাক দিল। রাখীর মনে হলো সে যেন একটু একটু করে সঞ্চয়ের ভালোবাসা পেতে শুরু করেছে। ওর পাশে বসে আরও মনে হলো, এই মানুষটা একমাত্র তার ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না। আর তা যদি-না হয় সে-ব্যথার আঘাত রাখী সহ্য করবে কেমন করে? এ-সব অলুক্ষণে কথা ভাববে না। সঞ্চয় তার কাছাকাছি রয়েছে। ওর মনের দর্পণে মীনাক্ষীর ছায়া পড়তে দেবে না। যতোক্ষণ পারবে হাসিতে গল্পে সময়টুকু ভরিয়ে তুলবে। সঞ্চয় গাড়ি চালাচ্ছিল বেশ জোরেই। আগের গাড়িগুলিকে ঘনঘন পিছনে ফেলে তার ফিয়াট এগিয়ে চললো। সফ্‌দরজং এয়ার পোর্ট ছাড়াতেই রাখী একটু সরে এলো সঞ্চয়ের পাশে। বললো, আমার ভয় করছে। আস্তে চালান—রাখী সঞ্চয়ের বাঁ হাতখানা চেপে ধরলো। সামান্য স্পর্শেই তার সারা শরীরে বিদ্যুত খেলে গেল।

কীসের ভয়? অ্যাক্সিডেন্টের?

হ্যাঁ। রাখী হাতখানা নিজেই সরিয়ে নিল। আমার জন্য নয়, আপনার জন্য। সঞ্চয় চুপ করে রইলো ও-কথা শুনে। কোনও উত্তর দিল না। কেন-না রাখী কি বলতে চাইছে এবং এরপরে কোন প্রসঙ্গ তুলবে তা তার অজানা নয়। সেই কারণেই চুপ করে থেকে একটু গম্ভীর হওয়াই ভালো।

মিন্টো ব্রীজ পার হয়ে আরউইন হাসপাতালের সামনে গাড়ি আসতেই রাখী বললো, এখানেই থামুন। হাসপাতালের মধ্যে দিয়ে চলে যাবো। গাড়ি থেকে নেমে রাখী হাসি মিশিয়ে বললো, ধন্যবাদের পর্যায়ে আপনাকে ফেলবো না। এতোটা পথ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। রাখীর কথাগুলির মধ্যে বাউলের উদাস সুর। সে আর অপেক্ষা করলো না। হাসপাতালের গেট পার হয়ে হোস্টেলের দিকে পা বাড়ালো।

বাহাদুর শা জাফর মার্গের প্রশস্ত রাস্তা পেয়ে দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালালো সঞ্চয়। ইনকামট্যাক্স অফিস, তিলক ব্রীজ পার হয়ে যখন সুপ্রীম কোর্টের কাছাকাছি পৌঁছালো, দেখতে পেল, ফুটপাথের ছায়াঘন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে নির্জন রাস্তায় কি উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েটি অপেক্ষা করছে সঞ্চয় তা জানে। মেয়েটি রাস্তায় নেমে গাড়ি থামাবার জন্য হাত তুলে নাড়া দিল। ব্রেক কষলো সঞ্চয়। প্রথম বিচারেই তাকে খারাপ ভেবে অবহেলা করা উচিত নয়। এই শ্রেণীর মেয়েদের জন্য অনেক সময় সত্যিকারের বিপদে পড়া মেয়েদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। সঞ্চয় গাড়ি থামালো সেই কারণে। সত্যিই মেয়েটি বিপদে পড়েছে কি না সেটা একবার দেখে নিতে দোষ কি? গাড়ির কাছে মেয়েটি এগিয়ে এলো। হিন্দিতে বললো, অনেকক্ষণ বাস আসছে না। তুমি আমাকে একটু পৌঁছে দেবে? সঞ্চয় মেয়েটিকে আপাদা মস্তক একবার পরীক্ষা করার দৃষ্টি নিয়ে দেখলো। পরণে আঁটো সালোয়ার কামিজ। মুখখানি পেন্ট করা। হাতে একটি ব্যাগ। সঞ্চয়ের দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকালো। সেই বিভ্রম করা চোখ দুটি যেন ইশারা করছে। মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসলো। যেটুকু বুঝবার সঞ্চয় বুঝে নিয়েছে। তবুও সে রুক্ষ সুরে উত্তর দিল, তুমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছো বলে জানিয়েছ। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেটা আদৌ বাস স্টপেজ নয়। মেয়েটি এতোটা ভাবেনি। এতোটা তলিয়ে দেখার কথাও নয়। সে জানে হাত দেখালে গাড়ি থামে। এবং গাড়ির চালক হাসতে হাসতেই তুলে নেয়। এমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না। লোকটা যে এমন বেকুফের মতো কথা বলবে তা কে জানতো? সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিতে পারলো না। একটু ভাবলো। পরে বললো, সুন্দর নগর। এমনভাবে ব্যগ্রসুরে কথাটা বললো, সঞ্চয়ের মনে হলো একটি কবিতা মুখস্থ বলার সময়ে পরের লাইনটা যখন অনেক চিন্তার পর মনে এলে এক নিঃশ্বাসে তাড়াতাড়ি করে যেমন বলা হয় ঠিক তেমনি ভাবেই মেয়েটি বললো। সঞ্চয় আগেই বুঝেছিল, এবারে নিঃসন্দেহ হলো রাতের শিকার ধরাই মেয়েটির ব্যবসা।

সুন্দর নগরের রাস্তা এটা নয়। কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সঞ্চয় গাড়িতে স্টার্ট দিল। মেয়েটির শেষ কথাটা তার কানে এলো, ডরপক আদমী কাঁহাকা!

পরদিন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুলো সঞ্চয়। বিকেল তখন চারটে। পার্লামেন্ট স্ট্রিট ধরে যেতে ডান দিকে তাকাতেই সঞ্চয়ের চোখে পড়লো আকাশবাণী ভবণের সিংহ দরজার কাছে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আদিত্যদা কথা বলছে। হাতে তার পোর্টফলিও ব্যাগ। সঞ্চয়ের মনে হলো, আদিত্যদার অফিসের কাজ শেষ। এবারে নিশ্চয় বাড়ি ফিরবে। আলিকে গাড়ি থামাতে বললো সে। কথা সেরে আদিত্য এ-ফুটপাথে আসবার জন্য রাস্তায় নামতেই সঞ্চয় গাড়ির মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাক দিল, আদিত্যদা আসুন। আকাশবাণী ভবনে চাকরি করে আদিত্য সেন। গাড়ির কাছে আসতেই সঞ্চয় বললো, বাংলায় খবর বলা শেষ। এবারে বাড়ি ফিরবেন তো?

—তা ফিরবো। তবে বাংলায় খবর বলতে আবার একবার আসতে হবে।

বসির আলি গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সিটে বসে আদিত্য এবং সঞ্চয় গল্প করছে। সঞ্চয় বললো, দিন পাঁচেকের জন্য অফিসের কাজে জয়পুর যাচ্ছি আদিত্যদা। কালকে রওনা হচ্ছি। আপনাদের পত্রিকার তো অফিস রয়েছে ওখানে। আপনি একবার যাবেন বলেছিলেন। যাবেন নাকি? কি যেন একটু ভাবলো আদিত্য। তারপরে ম্লান হেসে উত্তর দিল, তোমার কথাটা কিন্তু শুনতে বেশ লাগলো সঞ্চয়ণ। 'পত্রিকার অফিস'। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতি সংখ্যায় 'জয়পুরের চিঠি' নামে একটি রচনা থাকে। ওটা জ্যোতির্ময় লেখে। ওকে আমরা আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি করেছি। কিন্তু অফিস করে প্রতিনিধি

পাঠানোর মতো নয়, আসলে জ্যোতির্ময় চাকরি সূত্রে ওখানেই থাকে। লেখা পাঠায়। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে। লোকে জানলো জয়পুরের প্রতিনিধি যখন, তখন নিশ্চয়ই ওখানে একটি অফিসও রয়েছে। তোমার কথামতো সেই পত্রিকা অফিস করে হবে সে-কথাই ভাবছি। যাক গিয়ে, অফিসের কাজে এখন কিছু দিন ব্যস্ত থাকতে হবে। যাওয়া দূরের কথা, একটি চিঠিও লেখা হবে না। তুমি জ্যোতির্ময়কে গিয়ে বলবে, এ-সংখ্যার লেখা যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আর যাবার সময়ে আমার কাছে থেকে তুমি কিছু বই নিয়ে যাবে। বাংলা উপন্যাস। জ্যোতির্ময়কে বলবে সমালোচনা করে দিতে। ছেলেটার লেখার হাত ভারী চমৎকার। সম্পূর্ণ নতুন একজন লেখককে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে এই ইন্দ্রপ্রস্থ। এ-কথা ভাবতে আমার ভারী আনন্দ হয় সঞ্চয়ণ, আমাদের হাতেখড়ি এবং লেখা প্রকাশের প্রথম সুযোগ দেয় 'ইন্দ্রপ্রস্থ পত্রিকা'। এই পত্রিকায় দিল্লির আর একটি ছেলেও ভালো লিখছে। অমল সরকার।

আদিত্যর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। সঞ্চয় নামলো না। আদিত্য বললো, বসে রইলে কেন? নেমে এসো।

ভাবছি কাল সকালেই আসবো।

বাড়ি পর্যন্ত এসে ঘরে ঢুকবে না তা কি হয়? নেমে পড়ো—সঞ্চয়কে নামতেই হলো। কি যেন ভাবলো সে। বসির আলিকে বললো, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আর শোনো আমার জয়পুর যাওয়ার কথাটা ওয়াকরদেকে জানিয়ে দেবে। সেই মতো সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবে। বলবে পাঁচদিনের ট্যুর। তাহলেই হবে—

জি সাব্। বসির আলি চলে গেলে সঞ্চয় এবং আদিত্য বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। বসবার ঘরে পা দিতেই চোখে পড়লো, সমান মাপের যে-তিনটি দামি বইয়ের আলমারী রয়েছে, সে-গুলি খোলা। মেঝের পুরু কার্পেটের ওপর একরাশ বই। পত্র-পত্রিকার একটি পাহাড়। দুর্গা বই সাজাচ্ছিল। সে যে অনেকক্ষণ ধরেই এই সাজানো-গুছানোর কাজে ব্যস্ত সেটা তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। স্বামীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, বিভিন্ন পত্রিকা এবং ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে গত সংখ্যা পর্যন্ত সবই পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি। ফের যদি সব কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে সারা ঘর ছড়িয়ে রাখো ভালো হবে না কিন্তু। দুপুর থেকে বসেছি এখনও শেষ করে উঠতে পারলাম না। কোমর আমার ধরে এলো।

খুবই স্বাভাবিক। আদিত্য এতোটুকু হাসলো না। কপট গাম্ভীর্যে কৌতুক করলো স্ত্রীর সঙ্গে, আগোছাল-অবিন্যস্ত বইপত্রগুলিকে সারা দুপুর ধরে গুছিয়ে রাখবার জন্য তো ওই কোমরের সৃষ্টি হয়নি। কি বলো সঞ্চয়ণ?

বৌদিকে বড়ো জ্বালাতন করেন আপনি। কোথায় ধন্যবাদ জানাবেন তা নয় আরও কটাক্ষ করছেন। দুর্গা স্বামীর দিকে তাকালো। কি যেন একটা বলবে। কিন্তু জুতসই কোনও ভাষা বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। ঠোঁট দুটিও এক হয়ে মিশে নেই একটু ফাঁক হয়েছে; এক্ষুণি কিছু একটা বলবে। কিন্তু তার আগেই আদিত্য কথাটা ছুঁড়ে দিল, অমন 'হ্যাঁ' করে রইলে কেন? তুমি কি অক্সিজেনের অভাব বোধ করছো? দুর্গা গম্ভীর থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষের কথাটি শুনে হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়ে বললো, বড্ড ছেলেমানুষি শুরু করেছো। আদিত্য বললো, দুর্গা ও-সব ছাড়ো এখন। আগে আমাদের একটু চা করে দাও! সঞ্চয় কাল চলে যাচ্ছে। ওকে তাই ধরে নিয়ে এলাম। দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের দিকে তাকালো। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছো নাকি? এই যে বলেছিলে, পাঁচ বছরের মধ্যে দিল্লি ছেড়ে আর কোথাও বদলী হবে না।

আরে সেই রকম বদলী নয় বৌদি। সঞ্চয় মৃদু হাসলো। দিন চার-পাঁচের জন্য বিশেষ একটা কাজে জয়পুর যাচ্ছি। কাজ শেষ করেই আবার ফিরে আসবো এখানে।

তাই বলো! দুর্গা সঞ্চয়ের দিকে চেয়ে পরম স্নেহে হাসলো। আমি ভাবলাম বুঝি একেবারেই দিল্লি ছেড়ে চলে যাচ্ছ। সত্যি, মনটা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছিল! তারপরেই আদিত্যকে নিয়ে পড়লো। তুমি আবার গল্প লেখো! সাহিত্যিক! কথাটাও একটু গুছিয়ে বলতে পারো না!!

আদিত্যদার কোনও দোষ নেই বৌদি। আসবার পথে আমরা যুক্তি করেছিলাম, সংবাদটা এমন ভাবে পরিবেশন করে আপনাকে অবাক করে দেবার জন্য। যাক গিয়ে, তাড়াতাড়ি চা আনুন বৌদি। আমি বেশিক্ষণ বসবো না।

দূর্গা শুধু চা আনলো না। ডিশে করে বটুরা এবং তরাকারী সাজিয়ে দিল। দিল্লির একটি প্রিয় খাবার এই বটুবা। দেখতে অনেকটা লুচির মতো। ভিতরে মশলা ইত্যাদি থাকে। যার ফলে সুস্বাদু হয় খেতে। সঞ্চয় বললো, যেখানে আমি সব সময়েই চেয়ে খাই, সেখানে এতো কিছু দেবার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। শুধু চা চেয়েছিলাম। এককাপ চা দিলেই পারতেন বৌদি।

অফিস থেকে ফিরছো এমন কিছু বেশি দিইনি। না-হয় বাড়ি গিয়ে জলখাবারটা খাবে না।

আচ্ছা দূর্গা, গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে যে-চারখানা উপন্যাস এসেছিল সমালোচনার জন্য; বইগুলি কোথায় বলো তো? দূর্গা ঠোঁট টিপে হাসলো। নিজে জানো না কোথায় রেখেছো?

আহা জানবো না কেন, ঠিক মনে আসছে না। শত হলেও তুমি হলে আমাব........কথার শেষ না-হতেই রাঙা হলো দূর্গা। সঞ্চয় বয়সে ছোট। অর্থাৎ ছোট ভাইয়ের মতো। তার সামনে কোনও চপলতা প্রকাশ করবে না তো? সেই লজ্জার আশঙ্কাতেই দূর্গা অস্বস্তি বোধ করছিল। আদিত্য সজীব হাসিতে কথাটা শেষ করলো, তুমি হলে আমার এই ছোট্ট লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান। আমার থেকে তো তুমিই বেশি জানবে। আমার অজানাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি জানবে না, সেটা অস্বাভাবিক। দূর্গা কথা না-বাড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেল। বইগুলি হাত নিয়ে ফিরে এলো একটু বাদেই। টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললো, ওয়াবড্রোবেব মধ্যে তুমি বইগুলিকে রেখেছিলে। কলকাতা থেকে যেদিন ডাক এসেছিল সেদিন তুমি ওই ঘবেই ছিলে। যখন যে-ঘরে থাকো সে-ঘরেই বইপত্র রেখে দাও। অথচ সব কিছুই এক জায়গায় সাজিয়ে রাখবার জন্য তোমাব যে একটা লাইব্রেরী আছে সেটা ভুলে যাও। তারপর যখন সময় মতো হাতের কাছে পাও না, তখনই চিৎকার করতে থাকো। আদিত্য প্রতিটি কথা নীরবে মেনে নিয়ে দূর্গার দিকে চেয়ে পরম নির্ভরতায় হাসলো। সঞ্চয়কে বললো, তুমি অবশ্যই এই বইগুলি জ্যোতির্ময়ের হাতে পৌঁছে দেবে। চারজন লেখকের চারখানা উপন্যাস—সুধীর রঞ্জন গুহ, চানক্য সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও বিমল কর। সঞ্চয় একটু হেসেই বললো, আপনার দাদারও একটি উপন্যাস রয়েছে এর মধ্যে। তা আপনি নিজে সেটার সমালোচনা করুন না কেন! আদিত্য হাসলো। হাসির রেশ থামিয়ে বললো, ওই দপ্তরটি জ্যোতির্ময়ের। তাই সে-ই সমালোচনা করবে। আসলে কথাটা কি জানো, এই সমালোচনা বিভাগে আগে আমিই ছিলাম। একবাব দাদার একটি বইয়ের সমালোচনা করেছিলাম আমি। ভালো বইয়ের প্রশংসা কে না করে। আমিও কবেছিলাম সমালোচক হিসেবেই। কিন্তু দাদা বলেছিলেন, "তুই সমালোচনা করলে আমার লেখার দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবো না। আমার ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিয়ে কোথায় আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবি তা নয় কাগজ-কলম পেয়ে মনের সুখে দাদার লেখার প্রশংসা কবেছিস। বইটি এমন কিছুই ভালো লিখিনি।" ভালো লিখেও ভালো হয়েছে বলে দাদা স্বীকার করেন না। তাঁর ওই এক কথা—সাহিত্যে ভালোর কি কখনও শেষ আছে? যাই হোক সেদিন থেকে পুস্তক সমালোচনার দায়িত্বটুকু জ্যোতির্ময়ের হাতেই তুলে দিয়েছি।

ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে একটি একটি করে দিনগুলির আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। বছর শেষ হলো। শুরু হলো নতুন বছর। নতুন বছরের প্রথম মাসটিও একদিন ফুরিয়ে গেল। এখন ফেব্রুয়ারি মাস। খুশিতে সঞ্চয়ের সারা মন-প্রাণ ভবে উঠলো। মীনাক্ষীদের আসবার কথা এই মাসেই। মীনাক্ষীর কথা মনে হলেই অভিমানে তার মন মেঘলা আকাশের মতো ছেয়ে যায়। অথচ অভিমান করতেও ভালো লাগে। মীনাক্ষী এখন কলকাতায়। তার কাছে নেই। নাই-বা রইলো? ওর কথা ভেবে দূরে বসেও এমনিভাবে অভিমান করার মধ্যেও একটা সুখ আছে। সেই সুখের স্বাদ আলাদা। সঞ্চয় ওকে কল্পনা করে মাঝে মাঝে সেই ভিন্ন স্বাদের আস্বাদ গ্রহণ কবে চিন্তার মধ্য দিয়ে। শুয়েছিল সে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। আলমারী খুলে মীনাক্ষীর ছবিখানা বের করলো। গভীর দৃষ্টি মেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। যতোবারই দেখে ততোবাবই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় সঞ্চয়। ওয়াকরদে

ডাকলো, বাবুজি।

কে? চকিতে পিছন ফিরে তাকালো সঞ্চয়। কফির কাপ নিয়ে পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াকবদে। সঞ্চয় তাকালো ওর দিকে। শ্যামলা রঙের একটি সরল মুখ। চোখ দুটি ভাসা ভাসা। নাকটা সামান্য বসা। মুখে গুটিকয়েক বসন্তের দাগ। ওই দাগগুলি ওর মুখখানাকে যেন আরও করুণ করে তুলেছে। সঞ্চয় ছবিটা রেখে দিয়ে আলমারী বন্ধ করে দিল। ওর হাতে থেকে কফির কাপটি নিয়ে একটি সোফায় গিয়ে বসলো। ওয়াকরদে যেমন নীরবে এসেছিল, চলে গেল তেমনি ভাবেই। গতকালের কথা ভাবতে বসলো সঞ্চয়। সন্ধ্যার পর রাখী এসেছিল। অন্যান্য দিনের মতোই সঞ্চয় ভদ্রতা করেছে। গল্প করেছে ওর সঙ্গে। অঘটনটা ঘটেছিল তারও অনেক পরে। প্রথমে সে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। আসলে রাখী যে তাকে অমন ভাবে কথাটা বলবে তা সে ভাবতেই পারেনি। আলমারী খুলে কি যেন খুঁজছিল সঞ্চয়। দূরের একটি সোফায় বসেছিল রাখী। কখন যে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল টের পায়নি সঞ্চয়। আলমারী বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হয়েছে রাখীর। সঞ্চয় তখন বিস্ময়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। নিস্তব্ধ। নির্জন পরিবেশ। পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল বুঝি সেই মুহূর্তে থেমে গেছে। রাখী গুনগুনিয়ে উঠলো। কোনওরকম ভূমিকা নয়, ঘুরিয়ে বলাও নয়, অত্যন্ত সহজ ভাবে তার আকাঙ্ক্ষার কথাটা জানালো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে সঞ্চয়। দেখতে আমি সুন্দরী নই, কিন্তু সারা জীবন ছায়ার মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। তোমাকে সুখী করা, শান্তি দেওয়াই হবে আমার একমাত্র কাজ। কথাটা শুনে প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারেনি সঞ্চয়। পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল রাখীর চোখের দিকে। করুণ সুরের কথাগুলি ঘরের সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে মায়ার বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সঞ্চয়ের পক্ষে সাড়া দেওয়া যে কতো কঠিন তা সে জানবে কেমন করে? রাখীকে নিয়ে কোনোদিনই সঞ্চয় তেমন চিন্তা করেনি। কল্পনায়ও স্থান দেয়নি মুহূর্তের জন্য। রাখীর বলার মধ্যে এমন একটা আবেদনের সুর ছিল যে সে সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলতে পারেনি। না বলতে বড়ো মায়া লেগেছিল। অথচ 'না' বলা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই নেই। রাখী দেখতে সুন্দরী নয়। রূপের দিক দিয়ে সঞ্চয় তাকে পছন্দ করবে না। এ-সত্যটুকু সে উপলব্ধি করেছে। তাই তার শেষের কথাটি কান্নার মতো শুনিয়েছিল, 'তোমাকে সুখী করা, শান্তি দেওয়াই হবে আমার একমাত্র কাজ।' অনেক বিশ্বাস নিয়ে পরম নির্ভরতায় বলেছিল রাখী। সঞ্চয় কোনও উত্তর দেয়নি। দিতে পারেনি। বোবা বিস্ময়ে সে শুধু তাকিয়েছিল। তাকিয়েছিল শূন্য দৃষ্টিতে। ওই দৃষ্টিতেই সে যেন বুঝিয়ে দিয়েছিল তা তো আর হবার উপায় নেই। কেমন করে সম্ভব হবে তা? রাখী আর একটি কথাও বলেনি। সঞ্চয়ের কাছ থেকে উত্তর না-পেয়ে যেটুকু বুঝবার সে বুঝেছে। অনেক আশা নিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিল! কিন্তু না-পাওয়ার বেদনায় সে মূক! বড়ো মুখ নিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু উত্তর না-পাওয়ার লজ্জায় সে আর দাঁড়াতে পারেনি। পালিয়ে গিয়ে লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছে। এই মুহূর্তে ওর জন্য দুঃখ অনুভব করলো সঞ্চয়। রাখী যে দুঃখ পেয়েছে তার কারণ সে হলেও তার তো কোনওই দোষ নেই। সেদিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। নিজেকে অপরাধী মনে করতো সঞ্চয় যদি সে রাখীর সঙ্গে মিলেমিশে বিশ্বাসঘাতকতা করতো। কিন্তু তা তো সে করেনি। প্রথম থেকেই সে ওর সঙ্গে একটা ব্যবধান রচনা করে এসেছে। তাতেও যদি রাখী বুঝে না-থেকে থাকে সে-অপরাধ তার নয়। তবে সঞ্চয় যদি আগে থেকেই জানিয়ে রাখতো তাহলে হয়তো রাখীকে এই দুঃখটুকু মাখতে হতো না। রাখী যে তাকে ও-কথা মুখ ফুটে বলবে তা সে ভাবেনি। তবে এটা সঞ্চয় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অদম্য উৎসাহ মেয়েটির। ভবিষ্যতে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ওই চেষ্টা তাও তার জানা। সুতরাং সে যদি তখনই অর্থাৎ প্রথমেই জানিয়ে রাখতো তার দুর্বলতা মীনাক্ষীর প্রতি তবে রাখী নিশ্চয়ই এতোটা এগিয়ে আসবার সাহস পেতো না। এরমধ্যেও অবশ্য ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কারণ রাখীর ওই ধরনের প্রশ্নের আগেই তাকে সে-রকম কিছু বলাটা ঠিক কি? নিশ্চয়ই নয়। সেটা শোভনীয়ও নয়। যদিও অন্য উপায়ে অর্থাৎ মীনাক্ষীর গল্প করে ওর সুখ্যাতি করে বোঝানো যেতো। সঞ্চয় সে-চেষ্টা করেনি। কেন-না সেটার কোনও সার্থকতা সে

খুঁজে পায়নি। যে-কারণে ওই ভাবে বোঝানো, তা কি রাখী জানে না? দমদমে মীনাক্ষীর সঙ্গে তার সম্পর্কেব রেশটুকু কি তার চোখে ধরা পড়েনি? হাজারো কাজের ঝামেলায় যে বড়ো মামিমা সদা ব্যস্ত ছিলেন, তিনিও জানতে পেরেছেন। একবার তো বলেই ফেলেছিলেন, ভাগ্নের কি মীনাক্ষীকেই পছন্দ হয়ে গেল নাকি? যার জানবার কথা নয় তিনিও জেনেছেন, আর রাখী বোঝেনি? জানতে পাবেনি?

বাবুজি নাহানের সময় হয়ে গেছে। চিন্তার সাগরে ডুবেছিল সঞ্জয়। ওয়াকরদে ওকে টেনে তুললো ভাবনার গভীর স্তর থেকে। সাড়ে-আটটা বাজে। অফিসের সময় হয়ে গেল, যাবে না?

যাবো। সঞ্জয় উঠে দাঁড়ালো। অলস মনে স্নান-খাওয়ার নিয়মটুকু পালন করে এক সময়ে অফিসে এসে পৌঁছালো। একবার ভেবেছিল অফিসে আজ যাবে না, কিন্তু এসে ভালোই করেছে। এতোক্ষণের অলস মনটিও মীনাক্ষীদের আসার সংবাদ পেয়ে মুহূর্তে সজীব হয়ে উঠেছে। মলয় অর্থাৎ মীনাক্ষীর দাদা একটি টেলিগ্রাম কবে জানিয়েছে আগামীকাল তারা কালকা মেলে দিল্লি এসে পৌঁছাচ্ছে। সঞ্জয় হিসেব করে দেখলো, একমাস ছাব্বিশ দিনের ওপর হলো সে কলকাতা থেকে এসেছে। আর ওই সংখ্যার দিনগুলি ধরে সে মীনাক্ষীকে দেখে না। দেখা হবে আগামীকাল। কিন্তু ওর কথা মনে হতেই আবার সেই অভিমান জাগতে শুরু হয়েছে। সঞ্জয় ঠিক করলো প্রথমে সে কথা বলবে না। তার ইচ্ছা মতো মীনাক্ষী সেদিন নীলাম্বরী সাজে সাজেনি— সে-ব্যথা এখনও সঞ্জয়ের মন থেকে মুছে যায়নি। ঘুণাক্ষরেও ভুলে যায়নি সে-ঘটনা। সেটাই সঞ্জয় মীনাক্ষীকে সর্ব প্রথমে বুঝিয়ে দেবে, ওই নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে। টেলিগ্রামটা সে তার অ্যাটাচিকেসে রেখে দিয়ে বেল টিপলো। শিউসরণকে নির্দেশ দিল, শঙ্কর মুখার্জীকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিতে। মিঃ কৃষ্ণাজিরাও কিছুক্ষণ আগে ওর নামে একটি অভিযোগ করে গেছেন। কি ব্যাপার সেটা দেখা দবকার।

আসবো স্যার? সঞ্জয় একটি কাগজের ওপর দৃষ্টি বুলাচ্ছিল। চোখ না-তুলেই উত্তর দিল, এসো। যে-পৃষ্ঠায় চোখ রেখেছিল সেই পৃষ্ঠার পড়া শেষ করেই শঙ্করের দিকে তাকালো। সতেরো-আঠারো বছরের একটি তরুণ। গত বছর হায়ার সেকেন্ডারী পাস করে তাদের এই অফিসে টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছে। সঞ্জয় নিজেই ওর ইন্টারভিউ নিয়েছিল। রেজাল্ট খুব একটা ভালো না-করা সত্ত্বেও সঞ্জয় কেন যে ওকে নিয়েছিল তা সে নিজেও জানে না। ওব মতো বয়সেই সঞ্জয় নিজেও একদিন এই কোম্পানিতে চাকরি করতে এসেছিল। ওই রকমই শান্ত এবং লাজুক ছিল। সঞ্জয় সেদিন নিজেরই ছায়া দেখেছিল শঙ্কবের মধ্যে। সেই দুর্বলতায় কিনা কে জানে? যাই হোক অভিযোগ এসেছে ওরই নামে।

তুমি নাকি কাজ করতে চাইছো না?

না স্যার। রোগা পাতলা গড়নের ছেলে শঙ্কব। দেখলেই বোঝা যায় খুব শান্ত। অভিযোগ শুনে কেমন যেন উত্তেজিত মনে হলো তাকে। বলিষ্ঠ ভাবে উত্তর দিল, আমি সে-কথা কক্ষনও বলিনি। ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি স্যার,—আমি এবং নগেন্দ্রম দুজনেই টাইপিস্ট। মিঃ কৃষ্ণাজিরাও গত তিনদিন ধবে আমাকে দিয়েই সব চিঠি টাইপ করিয়ে নিয়েছেন। নগেন্দ্রম ওঁর দেশের লোক বলে ওকে দিয়ে কোনও কাজ না-করিয়ে ববং ওর সঙ্গেই গল্প করেন। আজ সকালে হয়েছে কি, চারখানা চিঠি আমার টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে মিঃ কৃষ্ণাজিরাও বললেন, বিশেষ জরুরি কাজ। শীগ্‌গির টাইপ করে দাও। একটি চিঠি শেষ না-হতেই তিনি তাড়া দিলেন, কই হলো? এতো লেজি ম্যান তোমরা! আমি স্যার তখনই শুধু বলেছি, আপনার যখন এতোই তাড়াতাড়ি প্রয়োজন তখন চারখানা চিঠি একা আমাকে টাইপ করতে না-দিয়ে দু'খানা চিঠি নগেন্দ্রমকে দিন না—এর বেশি আমি আর কিছুই বলিনি স্যার। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো সঞ্জয়। হুঁ! ছোট্ট একটি শব্দ তুললমাত্র। এটুকু পরিষ্কার বোঝা গেল, শঙ্কর তাকে ভুল তথ্য পরিবেশন করেনি। তবুও সঞ্জয় বললো, শত হলেও মিঃ কৃষ্ণাজিরাও তোমার সুপারভাইজার। তার কথা মতো তোমার কাজ করা উচিত। পরে তুমি আমার কাছে এসে সে-কথা জানাতে পারতে। সেটাই ভালো হতো নাকি?

আপনি কি মনে করবেন সেই ভেবে বলতে সাহস পাইনি।

সাহস বা মনে করার কোনও প্রশ্ন নয়, তোমর ওপর যে অবিচারটা হচ্ছে তা তুমি যদি আমাকে না-বলো আমি জানবো কেমন করে? যাইহোক চিঠিগুলি সব টাইপ করে দাও। মিঃ কৃষ্ণাজিরাও-এর ব্যাপারটা আমি দেখছি। তারপরেই সঞ্চয় অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বললো, তুমি আর পড়াশোনা করছো না কেন? বয়েস কম, এখনও অনেক সময় আছে। তাছাড়া দিনে চাকরি করে রাত্রে আজকাল বহু ছেলেই পড়াশোনা করছে। সময়কে এই ভাবে বৃথা যেতে না-দিয়ে—সঞ্চয় একটু থামলো। পবে আবার যোগ করলো, এরপরে হয়তো দেখবে পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলেও সময় ও সুযোগ করে উঠতে পারবে না। তখন কিন্তু আফসোসের অন্ত থাকবে না। এই দিনগুলি আর ফিরে পাবে না। তাই বলছিলাম যে পড়াশোনাটা ঠিকমতো চালিয়ে যাও। অল্পতে থেমে থাকতে নেই। চিরদিন কি টাইপিস্ট হয়েই থাকবে? বড়ো হতে ইচ্ছা হয় না? অত্যন্ত আপন সুরের কথায় গভীরতায় অভিভূত হয়ে পড়লো শঙ্কর। সঞ্চয়ণ ঘোষ এতোবড়ো একজন অফিসার হয়েও তার মতো একটি সাধারণ টাইপিস্টের জন্য এতো ভাববে এতো কথা বলবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। সঞ্চয়ের কথা শেষ হয়নি, তখনও, অনেক ক্ষেত্রেই ডিগ্রির কোনও মূল্য থাকে না। কাজেও আসে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ওটার কোনও প্রয়োজন নেই। ভীষণ প্রয়োজন হয় শঙ্কর। কথাগুলি শঙ্করকে বললেও সঞ্চয় যেন নিজেকেই শোনালো। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো সে। উদাস দৃষ্টিতে বললো, এই আমাকেই দেখো না, আমার অ্যাকাডেমিক্যাল কোয়ালিফিকেশন যদি আরও উঁচুব দিকের হতো তাহলে বছর দুই আগেই আমষ্টবডম ঘুরে আসতে পারতাম। সেখানে আমার যোগ্যতা দক্ষতা যাচাই হয়নি। হয়েছে—সঞ্চয় ম্লান হাসলো। যাক গিয়ে! তুমি কিন্তু পড়াশোনা আবার আরম্ভ কবো। এসো এখন।

সঞ্চয় বিছানায় থাকতেই সাত-সকালে কফি দিয়ে গেল ওয়াকরদে। চলে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু বাধা দিল সঞ্চয়।

কি রে চলে যাচ্ছিস যে? খুশিতে, আনন্দের বন্যায় আজ তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। প্রথমে একবার ভেবেছিল অফিসে যাবে না। পবক্ষণেই মতো পাল্টিয়েছে। অফিস যাওয়াটা বন্ধ করবে না। আজ মীনাক্ষীরা আসছে। সঞ্চয় ভেবে দেখলো, ওরা আসবে রাত্রে। সুতরাং অফিস বন্ধ কবে সারাদিন ঘরে বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না। তাতে চিন্তা-ভাবনা এবং অস্থিরতা আরও বাড়বে। বারবার ঘড়ির ওপর চোখ পড়বে আর সারাক্ষণই মনে হবে সময় যেন ফুরাতেই চাইছে না। অর্থাৎ ভীষণ ভাবে সন্দেহ জাগবে ঘড়ির প্রতি। তার চেয়ে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময়টা সহজ ভাবেই কেটে যাবে। হঠাৎ সঞ্চয়ের মনে হলো দীর্ঘদিন ধরে সে মীনাক্ষীকে দেখে না। অনেক বছর বাদে যেন তার সঙ্গে আজ দেখা হবে। কেন এমনটা মনে হয় তা সে বলতে পারবে না। শুধু এইটুকুই বলতে পারে, মীনাক্ষীকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে মনে করতে তার ভালো লাগে না। সেই ভালো লাগার মানুষটা আজ আসবে। সেই কারণেই অনুরাগের ঝর্ণাধারায় উত্তাল হলো সঞ্চয়। ছোট্ট একটি শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে তার। শিশুর মতো সর্বদা ছোটাছুটি করবে, হইচই করে আনন্দ করবে। চাপা আবেগের অনুকম্পায় বোবার মতো চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ভালোবাসার পরাগরাঙা মনে ওয়াকরদেকে তাই ডাকলো।

কিছু বলবে বাবুজি? প্রশ্ন শুনে সঞ্চয়ের মনে হলো, কিছু কি? অনেক কিছুই তার আজ বলতে ইচ্ছা করছে। মীনাক্ষীর কথা। ওকে তার ভালো লাগার কথা। আরও বলবে, এতোদিন তুই আমার কাছে যে-ফটোটি দেখেছিস সেই ফটোর মানুষটাই আজ আসবে। সারা বাড়িতে মনের কথা খুলে বলবার মতো এক ওয়াকরদে ছাড়া আর কে আছে? সঞ্চয় যা কিছুটা সহজ-সরল তা ওই ওয়াকরদের কাছেই। রামসুভগ বা বসির আলির কাছেই সে শুধু পুরোপুরি সাব্। যে-সব কথা মনে হয়েছিল সঞ্চয় সে-সব কিছুই বললো না। ওয়াকরদে মুখের দিকে চেয়ে অল্প হেসে শুধু বললো, আমি ভাবছি তোর একটা বিয়ে দেবো।

তোমার নিজেরই একটা শাদি করা দরকার বাবুজি। ওয়াকরদে বেশ উজ্জ্বল হেসে বললো,

আমার কথা ভাবতে হবে না। কেন-না শাদি আমি করবো না।

কেন রে? এই সকালবেলা একটা ভালো কথা বললাম, তা পছন্দ হলো না বুঝি?

আমি তোমার কাছে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না। সঞ্জয়ের একবার বলতে ইচ্ছা হলো, আজ যদি তোর মা এসে তোকে নিয়ে যেতে চায় তাহলে কি যাবি না? কিন্তু তেমন কথা বললো না সে। নতুন করে আবার কোনও চিন্তা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সব কিছু ফেলে ও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে! পিছনের ইতিহাসকে ভুলে থাকতে চায় ওয়াকরদে। সুতরাং মায়ের কথা তুলে ওকে এই মুহূর্তে মনে করিয়ে না-দেওয়াই ভালো। তাছাড়া ওই প্রশ্নের উত্তর তো সঞ্জয়ের জানাই। সে যদি চলেই যাবে তবে মাকে ছেড়ে পথে নেমেছিল কেন? ওয়াকরদে ফর্সা দাঁতে ঝিকমিক করে হাসলো. তুমি তো আমাকে বলছো, তুমি নিজে কেন শাদি করছো না?

আমাকে কে শাদি করবে বল? ওই কথা শুনে ওয়াকরদে আরও হাসলো। খুশিতে উজ্জ্বল চোখে সে আলমারীর দিকে চেয়ে রইলো। একবার সঞ্জয়ের দিকে পরক্ষণেই আবার তাকালো আলমারীর দিকে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলো না সঞ্জয়। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আলমারীর দিকে কি দেখছিস? ওয়াকরদে শিশুর মতো হেসে সরল ভাবে উত্তর দিল, ওখানে তোমার মেমসাহেবের তস্‌বীর আছে। তুমি তাকেই শাদি করবে। ওয়াকরদে যে মীনাক্ষীর ছবিটা দেখেছে সঞ্জয় তা জানে। একদিন তো ওর চোখে ধরাই পড়ে গিয়েছিল। সঞ্জয় একটু চুপ করে থেকে বললো, আর মেমসাব যদি রাজি না-হয়?

বহুত রাজি হবে বাবুজি। ওয়াকরদে সঞ্জয়ের চোখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। সঞ্জয় এবারে খুশিতে একটি ধমক লাগালো. ভাগ্ এখান থেকে—

সঞ্জয় আজ অনেকক্ষণ ধরে ধীরে-সুস্থে ভাত খেলো। খেতে খেতে গল্প করলো ওয়াকরদের সঙ্গে। ওয়াকরদের দৃষ্টি কিন্তু সব দিকে। গল্প করলেও তার নজর এড়ালো না, সঞ্জয়ের ডিশের ভাত ফুরিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে রামসুভগকে ডাক দিল, রামজি থোবাসা চাউল লে আনা— অর্থাৎ বাবুজির জন্য ভাত নিয়ে এসো। সঞ্জয় একটু আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ওয়াকরদের শাসনে সেই আপত্তি টেকেনি।

সমস্ত সময় আমি তোমার এতো কথা শুনি বাবুজি অথচ খাবার সময়ে তুমি আমার একটা কথাও শুনতে চাও না। বেশি খেলে তো তোমার পেটেই যাবে। তোমারই শরীর ভালো হবে। রামজি, থোরাসা আউর চাউল বাবুজিকে দেনা! বলেই অল্প অল্প হাসতে থাকে ওয়াকরদে। ওর কথা শুনে হাসতে লাগলো সঞ্জয়ও। ওয়াকরদে ওই কথাগুলি তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছে। সে-বারে সঞ্জয়ের মা এবং বাবা বেশ কিছুদিন এখানে এসে থেকেছিলেন। সঞ্জয় খাবার নিতে না-চাইলেই মা বলতেন, বেশি খেলে তো তোর পেটেই যাবে। তোরই শরীর ভালো হবে। ওয়াকরদে সেই কথাগুলি শিখে এখন তারই ওপর প্রয়োগ করছে। ভাত দিয়ে চলে যাচ্ছিলো রামসুভগ। সঞ্জয় ওকে ডেকে বললো, কাল রাত্রের রুটি কিন্তু ভালো হয়নি, কাঁচা ছিল।

গলতি হো গয়া সাব্। আয়েন্দার নেহি হোগা—রামসুভগের ওই এক উত্তর। কোনও কৈফিয়ত দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি ধরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মাথা পেতে স্বীকার করে নেয়, অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখনও হবে না।

নদার্ন রেলওয়ের প্ল্যাটফরমে কাল্‌কা মেল যথা সময়েই এসে পৌঁছালো। ট্রেনের কামরাগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক নামছে। একের-পর-এক নেমেই চলেছে। দৃশ্যটা দেখতে মন্দ লাগে না। শুধু তাই নয়, ট্রেন থেকে নেমে প্রত্যেকটি মানুষের পা দুটিও সমান তালে চলেছে। এটাও একটা দেখবার জিনিস। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। অথচ মনে হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা যোগসূত্র রয়েছে। কুলিরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। এতোক্ষণ তারা ঝিমিয়েছিল। এবারে তাদের তৎপরতা দেখা দিল। মানুষের চিৎকার আর কোলাহল সারা স্টেশন মুখরিত। প্রত্যেকেরই গতিপথ স্টেশনের বাইরে যাবার গেটের দিকে। প্রথমে শোভনারই চোখে পড়লো। সঞ্জয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। চোখাচোখি হতেই হাসলো সঞ্জয়। মীনাক্ষী তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার

এতোদিনেব কল্পনার মীনাক্ষী, স্বপ্নের মীনাক্ষী, তিল তিল করে ভালোবাসার রেণু জড়ানো মীনাক্ষী। ট্রেন জার্নিতে ওর লাবণ্যময় মুখখানা এতোটুকু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। বরং এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে আসার ফলে আলুথালু বেশে একটা আলাদা শ্রী ফুটে উঠেছে। এই সৌন্দর্যটুকু অন্য কারও চোখেই ধরা পড়বে না। পড়বার কথাও নয়। এটা সঞ্চয়ের একান্তই অনুভবের সৌন্দর্য। আসবার সময়ে মীনাক্ষী পুরু করে কাজল পড়েছিল। সেই কাজলই এখন ওর চোখের পাতা, কোল লেপ্টে রয়েছে। যেন ছোট্ট শিশু তার দুষ্টু হাতে কাজল পরা চোখ দুটি লেপে এলোমেলো করে দিয়েছে। এর ফলে ওকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মায়াবী করে তুলেছে। কিন্তু মুগ্ধ হতে গিয়েও অভিমানের বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে জমা হতে শুরু করলো। এই মীনাক্ষীই একদিন তার কথা শোনেনি। সেদিন তো অনেক অনুনয় করেই বলেছিল সঞ্চয়। তবুও তার কথাটা রাখেনি। সেই দুঃখটা যেন বরফের মতো জমাট বাঁধতে শুরু করলো। সঞ্চয়ের মনে হলো আসলে বাগ করে অভিমান করেও যেন একটা আনন্দ আছে। সে কি এই মুহূর্তে আনন্দ পাচ্ছে না? নিশ্চয়ই পাচ্ছে। তবে অভিমান কববার একটি যখন সুযোগ পাওয়া গেছে তখন সেটাকে হাতছাড়া না-কবে কাজে লাগাতে চায় সঞ্চয়। দেখাই যাক-না মীনাক্ষীর তরফ থেকে আগে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কিনা? মলয়েব কোলে বুলা ছিল। সে ছোট্ট সুরে সঞ্চয়কে দেখে খুশিতে ডেকে উঠলো, বন্ধু!

বন্ধুকে তোমার এখনও মনে আছে! বলেই সঞ্চয় ওকে নিজেব কোলে টেনে নিল। মলয় জিজ্ঞেস করলো, টেলিগ্রামটা তাহলে সময়মতোই পেয়েছিলে, কি বলো?

হ্যাঁ। গতকাল দুপুরেই পেয়েছিলাম।

আমি জানতাম তুমি স্টেশনে আসবে অর্থাৎ, হাজার কাজের মধ্যেও তুমি সময় কবে নেবে। তবে তোমার বৌদি বলছিল কখন কোন কাজে ব্যস্ত থাকো যার ফলে হয়তো নাও আসতে পারো। সঞ্চয় একটু হাসলো মাত্র। তাকালো শোভনার দিকে।

তাহলে বৌদি, দিল্লি আসবার দিন গোনা শেষ পর্যন্ত শেষ হলো?

হ্যাঁ ভাই। শোভনা খুশিতে হেসে উঠলো। তবে স্টেশনটা দেখতে কিন্তু মোটেই সুন্দর নয়। এরচেয়ে আমাদের হাওড়া অনেক ভালো। আমি ভেবেছিলাম, রাজধানীর স্টেশন না-জানি কিনা কি একটা হবে!

এটা পুবানো স্টেশন। নিউদিল্লিব নিউ স্টেশন দেখবেন, আবও সুন্দর।

কুলির মাথায় জিনিসপত্রেব পাহাড় চাপিয়ে শঙ্কর এসে ওদেরকে ধ'ব ফেললো। তার ধারণা ছিল ওরা এতোক্ষণে পাব হয়ে গিয়েছে স্টেশনের সিংহ-দবজা। যে-কারণে সে ভিড এড়াবাব জন্য বলেছিল, তোমরা আগে স্টেশনের বাইরে চলে যাও। কুলি ঠিক করে জিনিসপত্র নিয়ে আমি আসছি। সঞ্চয়কে দেখতে পেয়ে শঙ্কব হাত দুটি এক করে বলে উঠলো নমস্কার স্যার।

নমস্কার! সঞ্চয় মাথাটা একটু ঝুঁকালো। কি ব্যাপাব তুমি এখানে?

আমার......শঙ্কর তার কথা শেষ করতে পারলো না। মলয় বলে উঠলো, শঙ্কর আমার মাসতুতো ভাই। তুমি ওকে চিনলে কবে?

আমরা এক সঙ্গেই কাজ করি। সঞ্চয় হাসলো। আর ওর কথা শুনে বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো শঙ্কর। কোথায় সে আর কোথায় সঞ্চয়ণ ঘোষ! একই অফিসে দুজনে কাজ করে ঠিক কথা কিন্তু দুজনের কাজের যে কি বিস্তর পার্থক্য তা মলয়দা কেমন করে জানবে? অথচ সঞ্চয়ণ ঘোষ কতো সহজে কথাটা বলতে পারলো 'আমরা এক সঙ্গে কাজ করি'। অফিসের অতো বড়ো একটি উঁচু আসনে বসে নিম্নপদস্থ একজন কর্মচারীর প্রতি এতোটা আন্তরিকতা, উদারতা, সর্বোপরি মনের প্রসারতা কেউ দেখাতে পারে কিনা; সেটাই চিন্তা করছে শঙ্কর।

স্টেশনের বাইরে সঞ্চয়েব গাড়ি ছিল। হোল্ডঅল, স্যুটকেস ইত্যাদি পিছনের ক্যারিয়ারে রেখে গাড়িতে উঠে বসলো সবাই। বসির আলিকে সঙ্গে আনেনি সঞ্চয়। চালকের সামনে তাই নিজেই বসলো। তার পাশে বসলো মলয়। শোভনা, মীনাক্ষী, শঙ্কর ও বুলা পিছনের সিটে। স্টেশনের বাইরের ভিড়টুকু কাটিয়ে রেডফোর্টের রাস্তা ধরে গাড়ি চালালো সঞ্চয়। জিজ্ঞেস করলো, কতোদিনের

ছুটি নিয়ে এসেছেন মলয়দা?

তা ধরো দেড়মাস থাকবো। এপ্রিল মাসেব তিন তারিখে ঠিক করেছি কলকাতা রওনা দেবো। এপ্রিল মাসেব তিন তারিখ! দিনটি যদিও দূরে, কিন্তু মনটা যেন এখন থেকেই উদাস হয়ে পড়লো সঞ্চয়ের। মনে হচ্ছে দিনটা বুঝি খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে। তাবপর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখবে মীনাক্ষীরা চলে গেছে। উঃ! সেই দিনটির কথা চিন্তা করতেই সারা মন শূন্যতায় ভরে উঠছে। সেই শূন্যতার কথা এখন থেকেই আর ভাববে না সঞ্চয়। মন থেকে ও-সব চিন্তা দূর করলো। বাস্তবের মুখোমুখি হলো আবার। সকলের সঙ্গেই কথা হয়েছে। হয়নি শুধু মীনাক্ষীর সঙ্গে। মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা না-বলে সঞ্চয় অভিমান দেখাতে পেরেছে বলে একটু খুশিই হলো। সত্যিই কি সে খুশি হয়েছে? চিন্তার রাজ্য থেকে মীনাক্ষীকে সরাতে পারছে কই? ওর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই যে সারা মন চাতকপাখির মতো উন্মুখ হয়ে রয়েছে। বাইরে যতোই গাম্ভীর্যের আবরণ দিয়ে নিজেকে আবৃত রাখুক না কেন সে তো নিজে জানে মনে মনে সে কতোখানি দুর্বল! তবে এই দুর্বলতা জয় করবে সঞ্চয়। সত্য সত্যই সে আগে কথা বলবে না। কিছুতেই নয়। তাহলে অভিমান করে কথা না-বলার প্রাথমিক এই আবহাওয়া সৃষ্টিটুকুর কোনওই মূল্য থাকে না। সেটা তখন নিতান্তই প্রহসনে দাঁড়াবে। অভিমান যখন করেছে তখন তা পুরো মাত্রায় বজায় রাখবে।

দিল্লির দর্শনীয় জিনিস দেখতে আমরা কিন্তু কালকেই বেরিয়ে পড়বো। বুঝলে সঞ্চয়? নতুন জায়গা নতুন দেশে এসে নতুন কিছু দেখার আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলো শোভনা। বাব্বাঃ, রাজধানী দেখবো বলে মনে মনে কি ভীষণ ইচ্ছা ছিল, শেষ পর্যন্ত এসেই পড়েছি। দু'চোখ ভরে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবো। কোনও কিছু বাদ দেবো না।

এসেছেন যখন নিশ্চয় দেখবেন বৌদি। সঞ্চয় পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উত্তর দিল, সময়ও হাতে আছে, সব কিছু ধীরে-সুস্থে দেখবার। একটা দিন বিশ্রাম নিন আগে।

তুমি ঠিকই বলেছো সঞ্চয়। মলয় ওকে সমর্থন জানিয়ে বললো, আমরা কি ঠিক করেছি জানো, একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিনই আগ্রায় চলে যাবো। ওখানে তিনটি দিন কাটিয়ে দিল্লিতে ফিরে এসে দর্শনীয় যা আছে সব কিছু ট্যাবলেট করে খাওয়া যাবে। কথাটা শেষ করেই মলয় হেসে উঠলো। তোমার কি মত বলো?

সেটাই ভালো। ওদিককারগুলি সেরে আসুন আগে। তবে সেই সঙ্গে মথুরা বৃন্দাবনও ঘুরে আসতে পারেন। আগ্রা থেকে দূরও বেশি নয়, কাছেই। দিল্লি থেকে যাবার পথেই পড়বে। সঞ্চয়ের কথাটা প্রত্যেকের কাছে ভালো লাগলেও ভালো লাগলো না মীনাক্ষীর। না-লাগার কারণটুকু সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানে না। দমদমে সঞ্চয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে মীনাক্ষী তাদের দিল্লি আগ্রা যাবার কথা উঠতেই জানিয়েছিল, 'আপনাকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আগ্রাতেও যেতে হবে'। সঞ্চয় তখন এতোটুকু আপত্তির সুর তোলেনি। বরং খুশিই হয়েছিল। বলেছিল নিশ্চয়ই যাবো। সে-কথা আর কেউ না-জানলেও মীনাক্ষী জানে। সে এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে কি করে? সঞ্চয় একটু আগে দাদাকে যে-কথা বললো তাতে মীনাক্ষীর বুঝতে এতোটুকু কষ্ট হলো না যে তাদের সঙ্গে সঞ্চয় আগ্রায় যাচ্ছে না। কিন্তু কেন? তার কথা মতো নীলশাড়ি পরেনি। সেই অভিমানটুকু কি এখনও মুছে ফেলতে পারেনি? মনে মনে হাসলো মীনাক্ষী। ভারী ছেলেমানুষ সঞ্চয়। কিন্তু দাদাও একটি বারের জন্য বলতে পারতো, সঞ্চয় তুমিও কিন্তু আমাদের সঙ্গে আগ্রা যাবে। অবশ্য সঞ্চয়ের অফিস আছে। কাজের দায়িত্ব তার বেশি। সেই সব বিবেচনা করেই দাদা ওকে যাবার জন্য বলেনি। কিন্তু মীনাক্ষী জানে, সেখানে সঞ্চয়ের যেতে আপত্তি থাকবার কথা নয়। ছুটি নেবার প্রয়োজন হলে সে ছুটিও নেবে। এ-বিশ্বাস মীনাক্ষীর আছে। অসুবিধে হয়েছে যাবার জন্য এবারে ওকে বলবে কে? তার নিজের পক্ষে বলাটা সম্ভব নয়। একটিমাত্র পথ আছে বৌদিকে দিয়ে বলানো। কিন্তু বৌদিকে সঞ্চয়ের যাবার কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়তে রাজি নয় মীনাক্ষী। এ-ব্যাপারটা সে একান্তই গোপন রাখতে চায়। কেউ জানবে না। কেউ শুনবে না। সঞ্চয় বাঁ দিকের একটি

গোলাকার পথের বাঁক নিয়েই আবার ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘুরালো শঙ্কর পরিচয় করিয়ে দিল, মীনাক্ষীদি পার্লামেন্ট। ওই যে দেখো রাষ্ট্রপতি ভবন। চিন্তা সূত্র ছিন্ন হলো মীনাক্ষীর। শঙ্করের কথায় কাঁচের জানালায় মুখ রেখে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু চলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে তায় রাত্রিবেলা কি ভালো করে দেখা যায়? সে-কথাই বললো শোভনা। এই ভাবে কি দেখা যায়? ফিরে আসি আগ্রা থেকে। নিশ্চিন্ত হয়ে সবই দেখবো। প্রশস্ত রাজপথের দুই দিকে চোখ রাখে শোভনা। একবার এদিকে আর একবার ওদিকে দেখতে দেখতে চলে। দুই ধারে গাছের সারি। নয়নাভিরাম প্রাসাদ, নীলাভ বাতির দ্যুতি। বেশ খানিকটা যাবার পর ডান দিকে একটি ফাঁকা মাঠ। একপাশে বিল্ডিং। একটি প্লেন নামছে। শোভনা জানতে চাইলো, এটাই কি পালাম এয়ার পোর্ট?

না। সঞ্চয় উত্তর দিল। পালাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এটা সফ্দরজং এয়ার পোর্ট। ডান দিকে বাঁক দিয়ে কিছুটা পথ যাবার পরই সঞ্চয় ডাকলো, শঙ্কর।

বলুন স্যার।

তুমি কি এখনও আমাকে স্যার স্যার বলে ডাকবে নাকি? সঞ্চয় হাসলো। না-হয় অফিসে আমি স্যার। কিন্তু বাইরে সঞ্চয়দা। একটু চুপ করলো সঞ্চয়। পরে বললো, বিনয়নগরের কোথায় তোমাদের বাড়ি?

পোষ্ট অফিসের উল্টোদিকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের কাছে। ওখানে গিয়েই গাড়ি থামলো সঞ্চয়। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনেই। গাড়ির শব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মণীন্দ্রবাবু এবং অমিয়া দেবী—শঙ্করের বাবা এবং মা। মলয়, মীনাক্ষীদের মাসিমা ও মেসোমশাই। বয়সে দুজনেই পৌঢ়ত্বের শেষ সীমা পেরিয়ে গেছেন। গাড়ি থেকে নামতেই অমিয়া দেবী মলয়কে ছোট ছেলের মতো কাছে টেনে নিলেন। সস্নেহে বললেন, সেই ছ'বছর আগে থেকে দিল্লি যাবো, দিল্লি যাবো করছিলি। আসবার সময় ও সুযোগই করে উঠতে পারছিলি না। আসতে পারলি তাহলে—ততোক্ষণে শোভনা, মীনাক্ষী ওর গাড়ি থেকে নেমেছে। প্রণাম করেছে মাসিমা ও মেসোমশাইকে। মণীন্দ্রবাবু বললেন, চলো ঘরে চলো। শোভনার কোল থেকে বুলাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন অমিয়া দেবী। অপত্যস্নেহে আদর করতে করতে বললেন, কি রে! চিনতে পারছিস? আমি যখন কলকাতা গিয়েছিলাম বুলা তখন নিতান্তই ছোট ছিল। মনে থাকবার কথাও নয়। শঙ্কর ব্যস্ত পায়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেল। নিচু সুরে সঞ্চয়ের পরিচয় জানাতেই মণীন্দ্রবাবু গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। গাড়ি থেকে সঞ্চয় নামেনি। বসেই ছিল। মণীন্দ্রবাবু আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন, আপনি ঘরে আসুন। মলয়ও বলে উঠলো, নেমে এসো সঞ্চয়।

আজ বরং আমি যাই! ম্লান সুরে কথাটা বলতেই মণীন্দ্রবাবু সঞ্চয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বললেন, তা কি করে হয়? বাড়ি পর্যন্ত এলেন অথচ ভিতরে আসবেন না, সেটা আমাদের খুব খারাপ লাগবে। আসুন আপনি। শঙ্কর ততোক্ষণে মায়ের কাছে গিয়েও সঞ্চয়ের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে, আমাদের অফিসের সেলস্ ইঞ্জিনিয়ার, সঞ্চয়ণ ঘোষ।

বাড়ির ভিতরে ঢুকলো সবাই। ঘরে পাঁচখানা চেয়ার সাজানো ছিল। মণীন্দ্রবাবু, অমিয়া দেবী, মলয়, শোভনা ও সঞ্চয় চেয়ারে বসলো। খাটের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসলো মীনাক্ষী ও শঙ্কর। মণীন্দ্রবাবু বললেন, তোমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও। তারপরে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে নিয়ো। ওদের জন্য জল গরম করেছো?

উনুনে বসিয়ে দিয়েছি। আরও গরম হোক। মণীন্দ্রবাবু এবারে সঞ্চয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, আপনার কথা কিন্তু শঙ্কর প্রায়ই বলে। আপনি ওকে..........মণীন্দ্রবাবুর কথা শেষ হলো না। সঞ্চয় বলে উঠলো, বয়সে আমি আপনার চেয়ে যে কতো ছোট তা আপনি নিজেও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সেক্ষেত্রে যদি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন সে-লজ্জা তাহলে একান্ত ভাবেই আমার হবে। কথাটা শেষ করেই সঞ্চয় ছোট্ট শিশুর মতো হেসে উঠলো। উপস্থিত সকলেই কথাটির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলো। অমিয়া দেবী বললেন, তোমার কথা শুনে ভারী ভালো লাগলো বাবা। সত্যই তো অফিসে তুমি যতো বড়ো অফিসারই হও না-কেন, আমাদের কাছে ঘরের ছেলের মতোই।

কতোই-বা বয়েস হবে তোমার, সাতাশ-আটাশ হবে! আমাব বড়ো ছেলে বেঁচে থাকলে সে তো আজ তোমাবই বয়সী হতো—

অথচ সেই ছেলেকেই এতোক্ষণ আপনি আপনি করে বলছিলেন। সঞ্চয়ের ওই কথার আর কোনও উত্তব দিতে পারে না অমিয়া দেবী। নীরবে একটু হাসলেন। তাকালেন শোভনার দিকে।

সঞ্চয়ের সঙ্গে তোমাদেব আলাপ হলো কোথায়?

শোভনা উত্তরটা দেবার আগে সঞ্চয়ের দিকে চেয়ে নির্ঝর হাসলো। বললো, আলাপ হয়েছে আমাদেব বাড়িতেই। মীনাক্ষীর বন্ধু সবিতাকে তোমার মনে আছে তো মাসিমা? সেই যে মীনাক্ষীর সঙ্গে যে-মেয়েটি তোমাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়েছিল সে-বাবে পুজো দিতে...............

হ্যাঁ, হ্যাঁ সবিতাকে খুব মনে পড়ছে। বড়ো ভালো মেয়েটি। পথে আমার এতোটুকু কষ্ট হয়নি ও ছিল বলে।

সঞ্চয়, সবিতাব মামা।

চা-জলখাবার খেলো সঞ্চয়। অমিয়া দেবী যত্ন করে খেতে দিয়ে ওর দিকে পরম স্নেহে চেয়ে বইলেন। যেন নিজেরই হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াচ্ছেন। খাবারের ইচ্ছা অবশ্য সঞ্চয়ের ছিল না। কেন-না আর একটু বাদেই বাড়ি ফিরে রাত্রির খাবার খাবে। অসময়ে এই বাড়তি খাবারটুকু খেতে তাই অনিচ্ছা। কিন্তু না-খেলে অমিয়া দেবী আবার দুঃখ পাবেন তাই কথা না-বাড়িয়ে নীরবে খেয়ে উঠলো। তারপরেও কিছুক্ষণ গল্প করে একসময়ে চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। স্মিত হেসে সকলের উদ্দেশ্যেই বললো, এবারে আমাকে যেতে হবে। সামান্য কথা দুটির বলার ফাঁকেই সঞ্চয় একবার মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নিচু করে নিল। এতো মানুষের সামনে সঞ্চয়েব চোখেব দিকে তাকিয়ে থাকতে তার লজ্জা কবে। মলয় প্রশ্ন কবলো, কালকে কখন আসছো সঞ্চয়? সঞ্চয় ভাবলো একটু। অফিসের কাজেব সময়ের হিসাব কবে পরে উত্তব দিল, বিকেল চারটে নাগাদ আসবো। বৌদি, আপনারা তৈবি হয়ে থাকবেন কিন্তু। আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো।

কতো দূর এখান থেকে? মলয় জিজ্ঞেস করলো।

কাছেই। গাড়িতে মিনিট পাঁচ-ছয় সময় নেবে।

স্যার আমার একটা কথা বলার ছিল--শঙ্কর এখনও সঞ্চয়েব সঙ্গে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছে না। তার সারা মনে সঞ্চয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা অফিসের একজন বড়ো অফিসাব হিসেবেই। সুতরাং যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে ওকে এতোদিন দেখে এসেছে তা সে সহজে ভুলবে কি করে? সঞ্চয় ওব মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো।

—বললো, তুমি কি প্রতিজ্ঞা কবেছো, অফিসের ডাকটা এখানেও চালাবে? দাদা বলে ডাকতে পারো না? হ্যাঁ—স্রেফ সঞ্চযদা। শঙ্করের পবের কথাটা কি দাঁড়াবে বুঝে নিতে এতোটুকু অসুবিধা হলো না সঞ্চয়েব। বললো, কি ছুটি চাই তো?

হ্যাঁ। শঙ্কব মাথা নিচু কবে সামান্য হাসলো।

বেশ তো! যে ক'দিনের ছুটির প্রয়োজন তা উল্লেখ করে একটা অ্যাপলিকেশন কালকে লিখে নিয়ে যেয়ো।

বাত এগারোটার সময়ে সকলে খেতে বসলো। খেতে দিচ্ছেন অমিয়া দেবী। এতো রাত হওযার কারণ সঞ্চয় চলে যাবার পরেই যদিও ওরা স্নান কবে প্রাথমিক কাজ সেরে নিয়েছে, কিন্তু দু'পক্ষেরই পারিবারিক কথায়-গল্পে সময় তার নির্দিষ্ট পথে এগোতে থাকে। রাত আরও বাড়তো, মণীন্দ্রবাবুই মনে কবিয়ে দিলেন, তোমাদের ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছে আজ তোমরা কেউ খাবে না। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আর আমাকে কতোক্ষণ না-খাইয়ে রাখবে?

ওই আরম্ভ হযেছে খাই জ্বালা। আমার হয়েছে আর এক জ্বালা। দু'দন্ড যদি স্থির হয়ে বসতে দেয়।

তোমাকেও বলি মলয়, মণীন্দ্রবাবু স্নিগ্ধ হাসলেন, এতোটা পথ ভেঙে এসেছো। কোথায় আগে হাড়ি-কুড়ি ভাঙবে তা নয় তুমি যদি আগে খেতে চাইতে তবে কি আমাকে তোমার মাসিমার

এতো কথা শুনতে হতো?

খেতে খেতে টুকরো টুকরো গল্প হচ্ছিলো। শঙ্কর বললো, মলয়দা তুমি যখন স্টেশনে সঞ্চয়দাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, 'তুমি ওকে চেন নাকি', তখন আমার দারুণ লজ্জা লাগছিল।

তা আমি জানবো কেমন করে বল যে তোরা এক অফিসে চাকরি করিস? সঞ্চয় তোর বস্।

আমার ইন্টারভিউও সঞ্চয়দাই নিয়েছিলেন। রেজাল্ট খুব একটা ভালো করিনি। তবুও আমাকে চাকরি দিলেন। শুধু বলেছিলেন, ওয়ার্ক ইজ ওয়রশিপ। খুব মন নিয়ে কাজ করবে। একটু থেমে শঙ্কর আবার বললো, তোমাদের আসবার তিন-চারদিন আগের ঘটনা। সঞ্চয়দা আমাকে তার রুমে ডেকে পাঠালেন। একজন সুপারভাইজার আমার নামে নালিশ করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি মলয়দা, অন্য কোনও অফিসার হলে ওইখানেই আমার চাকরি ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার হয়ে যেত—যদিও আমার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না। সঞ্চয়দা আমাকে বলবার সুযোগ দিলেন। আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বললাম আসল ব্যাপারটা কি, উনি খুব মন নিয়ে শুনলেন। অন্যান্য অফিসারদের মতো সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশন না-নিয়ে এই যে আমাকে বলবার সুযোগ দিলেন, বুঝবার চেষ্টা করলেন, তা ক'জনে করে বলো? অফিসাররা সুপারভাইজারদের কথাই মেনে নেন, আমাদের কথা শুনতে চান না। সঞ্চয়দা কিন্তু শুনলেন। এই ঘটনাটা যদি এখন ঘটতো তাহলে মনে করতে পারতাম, তোমাদের সঙ্গে সঞ্চয়দার পরিচয়ের সূত্রেই আমি রক্ষা পেলাম, কিন্তু তা তো নয়। আমাদের সঙ্গে সঞ্চয়দার এমন ভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন আমরা কেউই ভেবেছিলাম কি?

ঠিক চারটের সময়েই উপস্থিত হলো সঞ্চয়। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছে বিনয়নগর। বসির আলি গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল। সঞ্চয় নামলো। বারান্দার দরজার কাছের দেওয়ালে হেলান দিয়ে আশ্চর্য এক ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মীনাক্ষী। চোখাচোখি হলো। দুজনের কেউই দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। সঞ্চয়ের চোখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকতে আজ যেন মীনাক্ষীর বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। সে চেয়েই রইলো। কিন্তু এ-দৃষ্টি কুমারী মনের ভীরু ভালোবাসার মোহ জড়ানো দৃষ্টি নয়—এ যেন সঞ্চয়কে গভীর ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়ার দৃষ্টি। মুখখানি থমথমে। গতকাল থেকে সঞ্চয় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মতো অভিনয় করে চলেছে। অথচ ভাবলেও অবাক লাগে, দমদমের দিনগুলিতে এই মানুষটাই তার সঙ্গ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। সঞ্চয় ততোক্ষণে বারান্দায় উঠে এসেছে। দাঁড়িয়েছে মীনাক্ষীর কাছে গিয়ে। ওকে উপেক্ষা করে সোজা ঘরের ভেতরে চলে যাওয়া যায় না। সেই কারণেই তাকে থামতে হলো। দুজনের মধ্যে অভিমানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। মুখ খুলতে রাজি নয় কেউ। সঞ্চয় কাছে এসে দাঁড়াতে মীনাক্ষী দৃষ্টি নিচু করে নিল। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো। সঞ্চয়ের পায়ের দিকে চেয়ে রইলো। মানুষটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকছে না। ঘর থেকে কেউ যদি বেরিয়ে এসে এমন ভাবে তাদের দুজনকে দেখে মনে মনে তাহলে অনেক কিছুই ভাববার সুযোগ পাবে। মীনাক্ষী ধীরে ধীরে দৃষ্টি উপরে তুললো। সঞ্চয়ের চোখের দিকে তাকিয়েই ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। সঞ্চয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো। সময় নিল একটু। তারপরেই ঘরে ঢুকলো। শোভনা বুলাকে জামা পরিয়ে দিচ্ছিলো। বলে উঠলো, ওই তো সঞ্চয় এসে গেছে! বিছানায় শুয়েছিল মলয়। শোভনার কথা শুনেই উঠে বসলো। সঞ্চয় হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কেন বৌদি, আমি আসবো না তাই ভেবেছিলেন নাকি?

এক্ষুণি তোমার কথাই হচ্ছিলো ভাই। শোভনা হাসলো। মীনাক্ষী একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে। মলয় বিছানায়। শোভনার জামা-কাপড় পরা হয়নি। সঞ্চয় অবাক হলো!

কি হলো বৌদি, আপনারা এখনও কেউ তৈরিই হননি?

তোমার দাদাকে সে-কথা বলো, আমি তো বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। সঞ্চয় ঠিক চারটের সময়ে আসবে, খেয়াল আছে তো? ওঁর ওই এক উত্তর। জামা-প্যান্ট পড়তে আমার আর কতোক্ষণ! সঞ্চয় আসুক—

মলয়দা নেহাত মিথ্যে বলেননি। সাজতে-গুজতে আপনাদেরই তো দেরি। প্যান্টের উপর বুশসার্ট

চাপাতে মলয়দার আর কতোক্ষণ?

বলো, সঞ্চয় তুমিই বলো! মলয় সমর্থন পেয়ে বিজয় ঘোষণা করলো, আমি নাকি সব সময়েই ভুল বলি? কোথায় ভুল বলেছি তুমিই বিচার করো। শোভনা দেখলো সঞ্চয়ের সমর্থন এবারে পাওয়া যাবে না। কেন-না দোষ তাদেরও। তাদের তো এতোক্ষণে তৈরি হয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এবারে সে মীনাক্ষীকে নিয়ে পড়লো। তুমি বসে রয়েছ কেন? শাড়িটা পাল্টে নাও। মীনাক্ষীর একবার বলতে ইচ্ছে হলো, যাবো না। কিন্তু কেন জানি সাহস পেল না। সে না-গেলে সঞ্চয় আরও বেশি গম্ভীর হবে। অভিমান করবে। সেই অভিমান এক সময়ে হয়তো রাগের শেষ সীমায় পৌঁছবে। তার চেয়ে মুখ বুজে চুপচাপ শান্ত মেয়ের মতো কথা শোনাই ভালো।

সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। অমিয়া দেবীকে জানাতে ভুললো না সঞ্চয়, শঙ্কর এলে ওকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। অমিয়া দেবী জানালেন, নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

শঙ্করের ছুটি মঞ্জুর করলে? সামনের আয়না দিয়ে মুহূর্তের জন্য মীনাক্ষীর দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেল সঞ্চয়। আসলে ধরা পড়লো কে? সঞ্চয় না মীনাক্ষী? মীনাক্ষীই আগে থেকে তার ওপরে দৃষ্টি রেখেছিল। সঞ্চয় উত্তর দিল, হ্যাঁ। তিন দিনের ছুটি। আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন ওই তিন দিনেই যথেষ্ট। সারা শহর ঘুরে দেখবার কোনওই প্রয়োজন নেই। কেন-না শহরটা নোংরা এবং ঘিঞ্জি দুটোই। দেখবার মধ্যে ওই এক তাজমহল। তারপরেই ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা ও দয়ালবাগ। ভালো কথা মলয়দা, আগ্রাতে 'প্রবাসে বাঙালি' হোটেলে উঠবেন। ছোটর মধ্যে খুব পরিষ্কার এবং সাজানো-গুছানো। ব্যবহারও ভালো। সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ। আর মথুরা বৃন্দাবনে কক্ষনও পান্ডাদের পাল্লায় পড়বেন না। বৃন্দাবনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রম আছে। সেখানেই উঠবেন। অবশ্য শঙ্কর আপনাদের সঙ্গে থাকছে। সে নিশ্চয়ই সব জানে। বাড়ির সিংহ-দরজা দিয়ে গাড়ি ঢুকলো। নুড়ি বিছানো পথের ওপর জলতরঙ্গের শব্দ তুলে গাড়ি পোর্টিকোর নীচে এসে থামলো। বসির আলি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইলো। একে একে সকলে নামলো। বসির আলি বললো, সার ম্যয় রহুঙ্গা? অতিথিরা এসেছেন। এঁদেরকে নিশ্চয়ই পৌঁছে দিতে হবে। সুতরাং আমাকে কি থাকতে হবে? সঞ্চয় ভেবে দেখলো, তাড়াতাড়ি এদেরকে সে ছাড়ছে না। গল্পে গল্পে সময় কোনও ঘণ্টার কাঁটায় গিয়ে পৌঁছাবে তার ঠিক নেই। শুধু শুধু বসির আলিকে আটকে রাখার কোনও অর্থ হয় না। সঞ্চয় বললো, তুমি চলে যাও। ওদেরকে নিয়ে উপরে উঠলো সে। দোতলায় সিঁড়ির মুখেই সুদৃশ্য গ্রীলের দরজা। সেটি তালা দেওয়া। সঞ্চয় অফিসে চলে যাওয়ার পরেই ওয়াকরদে ওটা বন্ধ করে দেয়। বাইরের লোক যাতে যখন-তখন ভেতরে ঢুকতে না-পারে। সঞ্চয় ডাক দিল, ওয়াকরদে। একটিবার মাত্র ডাকলো সে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো ওয়াকরদে। তালা খুলে দিয়ে দরজা মেলে ধরলো। সব শেষে ভেতরে ঢুকলো মীনাক্ষী। ওয়াকরদে ওর মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকিয়ে রইলো। তারপরেই চাইলো সঞ্চয়ের দিকে। মীনাক্ষী একটু অবাক হলো। কিশোরটির দৃষ্টিতে মনে হলো তাকে যেন সে চেনে। ড্রইংরুমে গিয়ে ওরা বসলো। মলয় ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। অত্যন্ত আভিজাত্যে ভরা ঘরখানি। বাড়িটিও চমৎকার। ছবির মতো সুন্দর। চোখে লেগে থাকে। মলয় বললো, তোমার থাকবার জায়গাটি যে রাজপ্রাসাদ সঞ্চয়! সুন্দর জিনিসের তারিফ কে না করে? মলয়ও করলো। সামান্য একটু হেসে স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করলো সঞ্চয়, এতো টাকা ভাড়া দিয়ে নিজেকে থাকতে হলে পারতাম না মলয়দা, গাড়ি, বাড়ি সবই কোম্পানির দৌলতে।

উঁহু! ভুল বলা হলো। মলয় স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বললো, তোমার পজিশনের দৌলতে। ওই পজিশনে আছো তাই পাচ্ছো। না-থাকলে কোথায় পেতে?

ড্রইংরুমের প্রশস্ত জানলার ফাঁক দিয়ে দূরে দৃষ্টি মেলে ধরলো শোভনা। কি যেন দেখছে সে মন দিয়ে। শেষে জিজ্ঞেসই করে বসলো, দূরে ওই উঁচু মতো কি ওটা দেখা যাচ্ছে সঞ্চয়? শোভনার দৃষ্টির সঙ্গে সোজা তাকিয়ে সঞ্চয় উত্তর দিল, কুতুবমিনার!

সে-কি? আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলো শোভনা। আমার যে ভাই এক্ষুণি ছুটে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

তোমার এখন অনেক কিছুই ইচ্ছা করবে বুঝতে পারছি। মলয় টিপ্পনী কাটলো। তার কথা বলার সুরের ভঙ্গিমায় হেসে ফেললো মীনাক্ষী। আসবার পর থেকে এই প্রথম ওকে হাসতে দেখলো সঞ্চয়। শোভনা গম্ভীর হয়ে স্বামীর দিকে তাকাতেই মলয় এবারেও ঠাট্টা করলো, অমন করে তাকিয়ে থেকো না আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। তার রসিকতার ধরনের সকলেই হেসে উঠলো। এমনকী শোভনা নিজেও। মীনাক্ষী শুধু বললো, দাদা, বৌদির সঙ্গে তুমি বড্ড লাগছো আর এমন একটা ভাব দেখাচ্ছো যেন দিল্লি তোমার বহুদিনের পরিচিত শহর। ভুলে যেয়ো না আমাদের মতো তুমিও এই প্রথম এলে।

আমি আর কি বলবো? মীনাক্ষীকে সঙ্গে পেয়ে শোভনা বললো, নিজের বোনের কাছে নিজেই জব্দ হোক। কথাটা শেষ করেই সে হাসতে লাগলো। যেন তারই জয়লাভ হলো এই তর্ক-যুদ্ধে। সুতরাং সে খুশি।

ড্রইংরুম থেকে উঠে এক সময়ে ওরা সারা বাড়ি ঘুরে দেখলো। দেখা শেষে ফিরে এলো সঞ্চয়ের শোবার ঘরে। এ-ঘরে দুটি মাত্র সিঙ্গল সোফা। অল্প উঁচু ডবল খাটের কোমল বিছানা। শোভনা পা ঝুলিয়ে খাটেতেই বসলো। মীনাক্ষী ও মলয় বসলো সোফা দুটিতে। শোভনার ওইভাবে বসা দেখে সঞ্চয় ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললো, একি বৌদি! আপনি কি পরের বাড়িতে এসেছেন নাকি? নিজের বাড়ির মতো পা তুলে বসুন। আর যাই হোক বৌদি আমাকে অন্তত পর ভাববেন না। শোভনা ছেলেটাব সরল কথা শুনে পরম স্নেহে তাকালো। মনে মনে ভাবলো, সঞ্চয়েব সঙ্গে তাদের এমন কি সম্পর্ক? কিছুই নয়। অথচ ওর আন্তরিকতা দেখলে কে বলবে তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা নয়? শোভনা নিজেও কি এখন বলতে পারবে সঞ্চয় তাদের কেউ নয়? পাববে না। সঞ্চয় কেউ না-হয়েও অনেক বেশি আপন হয়ে গেছে। ওয়াকরদে ঘরের বাইবে থেকে জানালো, বাবুজি জল গরম হয়ে গেছে।

আচ্ছা। তুই ভেতরে আয়। কিশোর ছেলেটি পায়ে পায়ে ঘরের ভেতবে গিয়ে সঞ্চযের মুখোমুখি হলো। সঞ্চয় সস্নেহে ওর পিঠে একখানা হাত রেখে সকলেরই উদ্দেশ্যেই বললো, এই হলো ওযাকরদে। আমার লোকাল গার্জিয়ান। বলেই অনাবিল হাসলো। ওয়াকরদে সামান্য একটু হেসে হাত জোড় করে সকলকে নমস্তে জানিয়ে বললো, মেরে বারে মে বাবুজি বহুৎ কুছ বোলতে হ্যায় প্যারসে, লেকিন ম্যয়তো এক নোকর হুঁ। অর্থাৎ ভালোবেসে বাবুজি আমাকে বেশি বেশি করে অনেক কিছুই বলে। আসলে আমি একজন চাকর। ওয়াকরদে চলে গেলে সঞ্চয় ওর গল্প করলো। শেষে বললো, ওর মনের যে কি দৃঢ়তা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন মলয়দা। তবে আর একটি ঘটনা শুনলে আরও অবাক হয়ে যাবেন। কি প্রচন্ড আত্মসম্মান জ্ঞান ওই ওয়াকরদের। ও যে ক্যান্টিনে কাজ করতো সেখানকার একজন সুপারভাইজার কোনও একটি কারণে ওকে বলেছিল, চাকর চাকরের মতো থাকবি। আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে। ওয়াকরদে একটিও কথা না-বলে নীরবে জল ভরা চোখে শুধু তাকিয়ে থেকেছে। কীই-বা সে করবে? করার ক্ষমতা তার কতোটুকু? সেই সুপারভাইজারটি ওখান থেকে বদলী হওয়ার সময়ে ক্যান্টিনের প্রতিটি বয়কে কিছু টাকা বখ্‌শিস দিল। ওয়াকরদে কিন্তু নেয়নি। সুপারভাইজারটি না-নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করাতে কি বললো জানেন? বললো, আমি নোকর হতে পারি। কিন্তু কাজ করেই পয়সা নিই। কারও ভিক্ষা নিই না। সেলাম সাব্— সঞ্চয় এবার নিজের মন্তব্য যোগ করলো, ওয়াকরদে ওইটুকু ছেলে হলে কি হবে, ও অন্য ধাতুতে গড়া। অপমানকারীর দেওয়া রাজভোগের সম্মানকেও ছেলেটা উপেক্ষা করতে পারে।

সত্যিই আশ্চর্য! মলয় বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো, ওয়াকরদে কি ওর মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায় না?

না। ওয়াকরদে অতি সহজ বিচার। ওর মা ওকে ভুলে যেতে চায়। ওয়াকরদে জোর করে মায়ের স্নেহ পেতে চায় না।

কিন্তু মা তার সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারে এটা কি ভাবা যায়? শোভনা নিজেকে দিয়ে বিচার করে কম অবাক হলো না। সন্তান যে মায়ের মন কতোখানি জুড়ে থাকে শোভনা ছাড়া এখানে আর কে বেশি সেটা উপলব্ধি করতে পারবে? সারা দুনিয়া একদিকে আর তার বুলা হৃদয়ের মাঝখানে। সেই বুলাকে ছেড়ে থাকার কথা কি শোভনা কল্পনা করতে পারে? কক্ষনও না। সঞ্জয় বললো, বৌদি' সংসারে এমন অঘটনও ঘটে যে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আরা জেলার এক বাবা তার নিজের এগারো বছরের ছেলেকে খুন করেছে। ঘটনাটি কি অবিশ্বাস্য নয়? যে-সন্তান প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাকে কি করে তার বাবা হত্যা করতে পারে? ঘটনাটা প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি বৌদি, কিন্তু খুনী নিজেই আদালতে স্বীকার করেছে, তার গোপন পাপের নীরব সাক্ষী ছিল রোশন, তার সন্তান। তাই বলছি, কোথা দিয়ে কখন কি যে হয়ে যায় কেউ তা বলতে পারে না।

তুমি ঠিকই বলেছো সঞ্জয়। মলয় সোজা হয়ে বসলো। কেন তোমার মনে নেই শোভনা, কিছু দিন আগেই তো কাগজে ছিল। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে ছাদে বেড়াবার নাম করে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছে। মানুষ আজ কতো নিষ্ঠুর হয়ে গেছে ভাবতে পারো? বিয়ের সময়ে দুটো গহনা বেশি দেয়নি এই হলো অপরাধ। এতো ছোট কারণে যদি একটি জীবন শেষ হয়ে যায় এরপরেও অবিশ্বাস্য বলে কিছু আছে নাকি?

সঞ্জয় স্নান সেরে পরিপাটি হয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলো। পায়ের ওপর পা তুলে অলস ভঙ্গিমায় সোফায় বসেছিল মীনাক্ষী। একটি বিদেশি পত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সঞ্জয়কে ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি পা-টি নামিয়ে নিল। বৌদি ওরা ঘরে নেই। উপরে অর্থাৎ ছাদে গেছে। সঞ্জয় ড্রেসিং-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। প্রসাধনের সুগন্ধি জিনিসগুলি গায়ে, বাহুমূলে, গলায়, ও বুকে মাখলো। মুহূর্তে ঘরখানি মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠলো। যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। মীনাক্ষী দরজার দিকে একবার তাকালো। তারপরেই দৃষ্টি রাখলো সঞ্জয়ের ওপর। অস্ফুট কণ্ঠে কিন্তু সুরে প্রাধান্য রেখে জানতে চাইলো, আপনি আগ্রা যাবেন না? মীনাক্ষীর একটু কথা শুনবার জন্য এই দুটি দিন উন্মুখ হয়েছিল সঞ্জয়। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি প্রহর গুনেছে সে। সেই মীনাক্ষী কথার জাল বুনলো ছোট্ট করে। শুধু কথাই নয়---সেই সঙ্গে অভিযোগও মিশেছিল। দমদমে থাকতে কি বলেছিলেন? সে-সব কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছেন? আমি তখনই বুঝেছিলাম ওখানে আপনি একরকম, এখানে অন্যরকম বলবেন! অভিযোগটা নীরবে শুনলো সঞ্জয়। যাওয়ার ইচ্ছা তার প্রথম থেকেই। কিন্তু কেউ একবার না-বললে সে যায় কি করে? তবে ও-সব কথা সঞ্জয় তুললো না। কারণ দেখালো, অফিসে জরুরি কাজ রয়েছে।

ও-সব বাজে কথা। অফিসের কাজের দোহাই দেওয়া আপনার একটা স্বভাব। আমি জানি আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। আর এই রাগ করেই সেদিন দমদম থেকে বাগবাজারে আপনার পিসিমার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন? চুপ করে রইলো সঞ্জয়! কি উত্তর দেবে সে? উত্তর দেবার কিছুই নেই। মীনাক্ষী কি শুধু তার রাগই দেখেছে? অভিমানটুকু অনুভব করতে পারেনি? তাকে যদি এমন ভাবে ভুল বিচার করে তাহলে তার চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য কি উপায় আছে? সঞ্জয় ম্লান হাসলো। অত্যন্ত শান্ত গলায় বললো, আমি রাগ করেছি ঠিক কথা। আপনার যখন এতো কিছু মনে আছে, আমি কেন রাগ করেছি এটাও নিশ্চয়ই মনে আছে? সহসা আবীরের রং খেলে গেল মীনাক্ষীর সারা মুখে। ঘরের বাইরে থেকে কে যেন ডেকে উঠলো, সঞ্জয়দা! দরজার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালো সঞ্জয়। দেখলো সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে শঙ্কর।

আরে চলে এসো! সঞ্জয়ের ডাকে শঙ্কর ঘরে ঢুকে মীনাক্ষীর মুখোমুখি সোফাটায় বসলো। সঞ্জয় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সে সঙ্কুচিত ভাবে উঠে দাঁড়ালো। বললো, আপনি বসুন।

তুমি বসো---সঞ্জয় ওর কাঁধে একটি হাত রেখে বসিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, অফিসে কতো সময় তোমাদের বসতে বলতে পারি না। কিন্তু সে-সব নিয়ম কি বাড়িতে চলে? এখানে তুমি হলে আমার অতিথি। শঙ্কর কৃতজ্ঞতায় হাসলো। মাথা নিচু করে ছিল। মুখ তুললো এবারে।

মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, টিকিট কেটেছিস?

হ্যাঁ। শঙ্কর হাসলো। আগ্রা যাবার সবচেয়ে ভালো ট্রেন।

তাজ এক্সপ্রেস। সঞ্চয় কথাটা যোগ করে মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। মীনাক্ষী সঞ্চয়ের চোখে চোখ রেখেই পরক্ষণে তাকালো শঙ্করের দিকে। তার মাসতুতো ভাই। বয়সে বছর তিনেকের ছোট হবে। যদিও তাকে দিদি বলে সম্বোধন করে তবুও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের আন্তরিকতা যথেষ্ট। ওর কাছে মীনাক্ষী অত্যন্ত সহজ। কোনও কিছু লুকাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে না। কারণ শঙ্করকে ভয় পাবার কিছু নেই। তাই সে সঞ্চয়কে ওর সামনেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, আপনি তাহলে সত্যিই আগ্রায় যাবেন না? একটু অপ্রস্তুত হলো সঞ্চয়। শঙ্করের সামনে এ-নিয়ে মীনাক্ষীর সঙ্গে আলোচনা করতে তার যথেষ্ট সঙ্কোচ হচ্ছে। শঙ্কর তার অধঃস্তন কর্মচারী বলে নয়, ছেলেটা জেনে যাবে তার মীনাক্ষীদির সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কি, সেই লজ্জায়! শঙ্কর জানবে— জানুক। সঞ্চয় সেই লজ্জা জয় করবে। কিন্তু মীনাক্ষী যে-কথা বললো সেটা তো তার প্রশ্নের উত্তর নয়। সে জানতে চেয়েছিল, তার রাগের কারণটা মীনাক্ষীর মনে আছে কিনা? সঞ্চয় তাই বললো, এটা কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল না।

আমার প্রশ্ন এটাই। মীনাক্ষী নিজের আধিপত্য বিস্তার করলো। অস্বস্তি বোধ করছিল শঙ্কর। নেহাত ছেলেমানুষ নয় সে। মীনাক্ষী এবং সঞ্চয়ের যে-দুটি কথা শুনেছে তাতেই অনুমান করতে পেরেছে তার আসার আগে ওদের আলোচনাটা কোন পর্যায়ে চলছিল। বুঝে নিতে কষ্ট হলো না মান-অভিমানের পালা চলছে। সঞ্চয়দা খুব সম্ভব আগ্রা যেতে রাজি নয় আর মীনাক্ষীদির একান্ত ইচ্ছা, তাদের সঙ্গী হোক। এই নিয়েই হয়তো দুজনের কথা কাটাকাটি চলছে। একটা ব্যাপার শঙ্কর বুঝে উঠতে পারলো না দুজনের 'আপনি' সম্বোধনের কথা শুনে। সম্বোধনের দূরত্বটুকু কি তার উপস্থিতির জন্যই? না কি ওটাই সত্যি? হয়তো তাই। কেন-না তার সামনে মান-অভিমানের পালা চলতে পারলে ঘনিষ্ঠ সম্বোধনটুকুও অর্থাৎ আপনি থেকে তুমিতে নামা যেতে পারতো। শঙ্কর স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার উপস্থিতির জন্যই স্যার অর্থাৎ সঞ্চয়দা সহজ হতে পারছে না। ওদের থেকে এখন তারই বেশি লজ্জা হচ্ছে। নিজেদের বাড়ি হলে অন্য কথা ছিল। উঠে চলে গিয়ে ওদের কথা বলার সুযোগ করে দিতো। কিন্তু এখানে সে উঠে কোথায় যাবে? তাই বাধ্য হয়েই বসে থাকতে হচ্ছে। সঞ্চয় বেশি মাতামাতি করলো না। শঙ্কর সামনে। ব্যাপারটা যতো চেপে যাওয়া যায় ততোই ভালো। ঘটনার সমাপ্তি টানতে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যই সে বললো, অফিসে আমারও ওপর একজন রয়েছেন। যখন-তখন ছুটি চাইলেই ছুটি পাওয়া যায় না। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের দিকে তির্যক ভাবে তাকিয়ে রইলো মীনাক্ষী। কথাটা সে বিশ্বাস করলো না। কেমন করে বিশ্বাস করবে? একটা মানুষ যদি দু'রকমের কথা বলে তাহলে কোনটা ছেড়ে কোনটাকে সে সত্য বলে ধরে নেবে? দমদমের সোনাঝরা উজ্জ্বল দিনগুলির কথা মীনাক্ষীর বারবার মনে পড়ে যায়। যদিও সঞ্চয় প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু বলেনি কিন্তু তাকেই উদ্দেশ্য করে পরোক্ষ ভাবে সে অনেকবার ঘোষণা করেছে, যে আমার মনের মানুষ হবে সব সময়ে তার কথা শুনবো। যখন যে-কথা বলবে, তাই শুনবো। কথা না-শোনার অবাধ্য হয়ে কক্ষনও দুঃখ দেবো না। ও-সব কথা তাহলে নিশ্চয়ই আন্তরিক নয়। শুধুই কথার জাল বুনবার কথা। রামসুভগের কাজ যতো দূর হলো দেখবার জন্য সঞ্চয় ওদেরকে একটু অপেক্ষা করতে বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। চিন্তায় ডুব দিল মীনাক্ষী। না, সঞ্চয়ের ওপর সে রাগ করবে না। ওকে এতোটুকু দোষ দেবে না, দোষ ওর নয়। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে তাই-ই দাঁড়ায়। নীলাভ শাড়িতে সে নিজেকে সাজাতে না-পারার কারণেই ক্ষোভটা সঞ্চয়ের একটু বেশিই হয়েছে। এখনও তার রেশ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সেই ঘটনা যদি ভুলেই যাবে তাহলে এতোদিন পরেও ও-কথা তুলে তাকে আঘাত করবে কেন? আগ্রায় না-যাবার মূল কারণ সেটাই। অফিস, জরুরি কাজ, ছুটি না-পাবার অজুহাত ইত্যাদি সব বাজে কথা। মীনাক্ষী ভুলে যায়নি. সঞ্চয় নিজেই তাকে বলেছিল, তিন-চারদিনের জন্য ছুটি পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। চাইলেই পাওয়া যাবে। অবশ্য সেই ঘটনার অনেক আগের

কথা ও-সব। মীনাক্ষী যদি সেদিন ওর কথাটা শুনতো, তাহলে আজ সঞ্চয়কে ছুটি না-পাওয়ার মিথ্যা কারণ দেখাবার অভিনয় করতে হতো না। সঞ্চয়ের রাগ, ক্ষোভ, অভিমান সব কিছুকে স্বীকার করে নিল মীনাক্ষী। তবুও প্রয়োজনের সময়ে সাড়া দিতে ওর এই কার্পণ্যকে মেনে নিতে পারলো না। শঙ্কর মীনাক্ষীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকালো। ওকে খুশি করবার জন্যই বললো, জানো মীনাক্ষীদি, আমাদের বড়ো সাহেব মিঃ সাক্সেনা সঞ্চয়দার প্রতি দারুণ নির্ভরশীল এবং স্নেহশীলও। সুতরাং ছুটি পাওয়া এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়। সব চেয়ে বড়ো কথা, অফিসের অল-ইন্-অল বলতে সঞ্চয়দাই। তাঁর ছুটি আটকায় কে?

আমি জানি। মীনাক্ষী মৃদু হাসলো। তাদের মনোমালিন্যের যে-চিত্র শঙ্কর দেখলো তাতে সে যাতে বিরূপ ধারণা করতে না-পারে এবং যদিও-বা করে থাকে তাহলে সেটাকে ভাঙাবার জন্য নিজেকে শুনিয়েই যেন বললো, আসলে আগ্রা ওঁর বহুবার দেখা। তাই যাবার ইচ্ছে নেই। মলয় ওরা ছাদ থেকে নীচে নেমে এলো। শোভনা শঙ্করকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলো, ওমা! তুমি কখন এলে?

একটু আগেই। তোমরা কোথায় ছিলে বৌদি?

ছাদে। শোভা সূর্যকিরণের মতো ঝিকমিক করে হেসে উঠলো। উপর থেকে গ্র্যান্ড লাগছিল কুতুবকে। মনে হচ্ছিলো মাটি থেকে উঠে এক্ষুণি যেন আকাশটাকে বুড়িছোঁয়াব মতো ছুঁয়ে দেবে। মলয় হাসতে হাসতে কথাটা ছুঁড়ে দিল, দূর থেকে দেখেই এই কাছে গেলে যে তুমি আর একখানা মহাভারত রচনা করবে। তারপরেই সচেতন হলো। এর বেশি শোভনাকে খোঁচা দেওয়া ঠিক নয়। ব্যস্ততার সুরে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললো, সঞ্চয় কই? সে কি এখনও স্নান করে ফিবে আসেনি?

এসেছেন। উত্তরটা শঙ্করই দিল। ভেতরে গেলেন একটু আগে।

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে। সঞ্চয় সুইচ্ টিপলো। টিউবের উজ্জ্বল বাতির খেলায় সারা ঘর আলোময় হয়ে উঠলো। ওয়াকরদে এসে ঘরের জানলাগুলি একে একে বন্ধ করে দিল। তারপরে সঞ্চয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু সুরে বললো, বাবুজি খাবার দেওয়া হয়েছে। সঞ্চয় আর দেরি কবলো না। একেই একটু দেরি হয়ে গেছে। বিকেলের জলখাবার কি রাতে খাবে? ওদেরকে নিয়ে সে ডাইনিংরুমে গেল। ডিম্বাকৃতি টেবিলের নীচ থেকে প্রত্যেকটি চেয়ার বের করে সাজিয়ে দিল ওয়াকরদে। সকলে বসতেই একে একে ডিশগুলি এগিয়ে দিল রামসুভগ। লুচি, বেগুণভাজা, তরকারী, মিষ্টি। সেই সঙ্গে আছে দিল্লির বিখ্যাত খাবার গাজরের হালুয়া। মলয় বললো, তুমি জলখাবারের নাম করে রাতের খাওয়ার আয়োজন করেছো যে! এরপরে বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছুই খেতে পারবো না। সঞ্চয় কোনও উত্তর না-দিয়ে নীরবে ম্লান একটু হাসলো। তাকালো শোভনার দিকে। বললো, আগ্রা থেকে ফিরে এসে দিন কয়েক আমার এখানে থাকতে হবে বৌদি। আমি হয়তো আপনাদের তেমন আত্মীয় নই। কিন্তু যেটুকু হয়েছে সেটুকুই-বা কম কি? দমদমে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের কাছ থেকে যে স্নেহ-প্রীতি পেয়েছি তা আমি কোনোদিনও ভুলবো না।

তুমি বলছো যখন আমরা নিশ্চয়ই এসে থাকবো সঞ্চয়। মলয় বলতে শুরু করলো, কিন্তু কথাটা কি জানো, ওই যে আত্মীয়ের প্রশ্ন তুললে, আত্মীয়ের রক্ষা-কবচ নিয়ে সবসময়ে সব কিছু হয় না। স্নেহ-ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি এ-সব হচ্ছে আত্মীয়তার উর্ধ্বে। একজন নিঃসম্পর্ক লোকের সঙ্গেও এমন মধুর সম্পর্ক হতে পারে যে পরবর্তীকালে সেই লোকই তথাকথিত আত্মীয়ের চেয়েও আপন মানুষ হয়ে ওঠে। এই দেখো না, আমাদের এমন একজন আত্মীয় আছে তার বাড়িতে আমি গত পাঁচ বছর ধরে একটিবারের জন্যও পা দিইনি। অথচ তোমার কথায় এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই। তাই বলছিলাম সম্পর্কের আত্মীয়তা কিছু নয়—মনের মিলই হলো আসল আত্মীয়তা।

তাতো বুঝলাম। শোভনা এবারে আক্রমণ করলো সঞ্চয়কে, তোমার বাড়িতে এসে আমরা থাকবো আর তুমি সারাদিন পড়ে থাকবে অফিসে, সেটা হবে না। তোমাকেও অফিস ছুটি করতে হবে। সঞ্চয় হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, যা বলবেন তাই হবে।

সত্যি সত্যিই ছুটি নিল সঞ্চয়। মলয় ওরা আগ্রা থেকে ঘুরে এসে মাসিমার বাড়িতে দুটি

দিন থাকার পরে চলে এসেছে সঞ্চয়ের ওখানে। শোভনা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, ক'দিনের ছুটি নিয়েছো?

তিন দিন।

তাহলে আমরাও তিন দিন থাকবো।

তা কেন বৌদি? ছুটি আমি বেশি দিনের পেলাম না। সেজন্য আপনারা চলে যাবেন কেন? উজ্জ্বল হাসলো সঞ্চয়। একটি সপ্তাহের আগে এখান থেকে আপনাদের যাওয়া নিষেধ।

সংসারের যাবতীয় কাজ দুজনে গ্রহণ কবেছে। শোভনা ও মীনাক্ষী। বিশেষ করে মীনাক্ষী। কাজের দিক দিয়ে বৌদিকেও সে বসিয়ে বাখতে চায়। রামসুভগকে আগেই ছুটি দিয়েছে। বলেছে, আমরা যে-কটি দিন এখানে থাকবো তোমাকে বান্নার কোনও কাজই করতে হবে না। তুমি শুধু খাবে আর বিশ্রাম করবে, ঘুরে বেড়াবে। কৃতজ্ঞতায় সর্বোপরি খুশিতে একটু হাসলো রামসুভগ। শেষে হিন্দিতে উত্তর দিয়েছে, মেমসাব্ তুমি কাজ করবে আর আমি বসে থাকবো তাই কি হয়? তা হয় না। সাব্ গোঁসা করবে আমার ওপর।

গোঁসা করবে না। মীনাক্ষী আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে বললো, তোমার সায়েব যদি গোঁসা করে তাহলে আমার কথা বলো। রামসুভগ আর কথা বাড়াযনি। রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেছে। যায়নি ওয়াকরদে। মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে সে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই মীনাক্ষী বলে উঠলো, আচ্ছা ওযাকরদে, প্রথম দিন তুমি আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিলে তাতে মনে হয়েছিল আমি যেন তোমার অনেক দিনের পরিচিত।

হ্যাঁ মেমসাব্। ওয়াকবদে হাসলো। আমি তোমাকে আগে দেখেছি।

তাই নাকি? কোথায়? মীনাক্ষীর দুই ঠোঁটে চাপা হাসি।

তসবীরে! আমার বাবুজির কাছে তোমার একটা তসবীব আছে। মীনাক্ষী একটু চিন্তা কবলো এইবারে। তার ছবি ওয়াকরদে দেখেছে। তার মানে সঞ্চয় নিশ্চয়ই ওকে দেখিয়েছে। আর ছবি যখন দেখাতে পেবেছে মন-প্রাণ খুলেও হয়তো দু-চার কথা আলোচনা করেছে। সঞ্চয়ের কি লজ্জা বলে কিছু নেই? শেষ পর্যন্ত এই কিশোর ছেলেটির কাছেও মনের কথা চেপে রাখতে পাবেনি। ওয়াকরদে বললো, মেমসাব, বাবুজি প্রায় সময়ই তোমার তসবীর দেখতো। তসবীর দেখতে দেখতে কি যেন ভাবতো। তোমাকে বাবুজি বহুত পেয়ার করে মেম্সাব। সহসা লজ্জায় মাথাটি নিচু কবে নিল মীনাক্ষী। ওয়াকরদে অতি সরল ভাবে যা বুঝেছে সেই কথাটিই শুধু জানিয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ার লজ্জায় মীনাক্ষী কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলো না। সে বুঝতে পেরেছে ওয়াকরদে শুধু সঞ্চয়ের চাকরই নয়—তারও উপরে। ওর কাছে তাই সঞ্চয় বোধ করি কোনও কিছু গোপন করে না। তার সম্পর্কে ওদের দুজনের মধ্যে খুব সম্ভব আলোচনাও হয়েছে। মীনাক্ষীর তো তাই মনে হলো। কৌতূহল দানা বাঁধলো সেই কারণে। জিজ্ঞেস করেই ফেললো, এ-কথা কি তোমার বাবুজি বলেছে?

জি মেমসাব্। ছোট্ট ওই কথাটি গভীর ভাবে শুনলো মীনাক্ষী। দুই দাঁতের মাঝখানে গলার হারটাকে স্তব্ধ করে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। চাপা হেসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবুজি আর কি বলেছে?

কুছ নেহি। মাথা নাড়িয়ে মৃদু হাসলো ওযাকরদে। তুমি ভীষণ চালাক আছো মেমসাব্। বাবুজির সব কথা এই সুযোগে শুনে নিতে চাও।

কফি তৈরি করলো মীনাক্ষী। প্রথমে দিল মলয় ও শোভনাকে। তারপরে রামসুভগ ও ওয়াকরদেকে। সব শেষে দিল সঞ্চয়কে। ড্রইংরুমে বসে সঞ্চয় কি যেন লিখছিল। ওই ঘরখানাই বর্তমানে তার শোবার ঘরও হয়েছে। বড়ো ঘরটিতে থাকে মলয়দা, শোভনা বৌদি ও বুলা। ছোট শোবার ঘরখানাতে মীনাক্ষী। আর কোনও শোবার ঘর না-থাকাব ফলে ড্রইংরুমই এখন বেডরুমের কাজে লাগছে।

আপনার কফি! লেখা ছেড়ে মুখ না-তুলেই সঞ্চয় বললো, রেখে যা—

ঠোঁট টিপে হাসলো মীনাক্ষী। লেখায় ব্যস্ত থাকার ফলে সঞ্চয় তাকে চিনতে পারেনি। মীনাক্ষী দাঁড়িয়েই রইলো কফি নিয়ে। টেবিলের ওপর সে অবশ্য কফির কাপটা রেখে দিতে পারতো কিন্তু তা করলো না। লিখতে লিখতে সঞ্চয় বললো, হ্যাঁরে ওযাকরদে, বৌদি ওরা নাকি রান্নাঘরের কাজে হাত দিয়েছে? একটু আগে রামসুভগ এসে বললো, মীনাক্ষী মেমসাব্ বলেছে, আমরা যে-কটি দিন এখানে থাকবো তোমাদের কোনও কাজে হাত দিতে দেবো না। ওরা দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ-ভাবে কাজ করানোটা কি ঠিক? তুই কি বলিস? সঞ্চয় মুখ তুলে তাকালো। বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো সে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মীনাক্ষী হাসছে।

সেদিন সকাল দশটার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে ওরা সকলে বেরিয়ে পড়লো দিল্লি দর্শনে। গতকাল দেখেছে যন্তর-মন্তর, রেডিও স্টেশন, পার্লামেন্ট হাউস, রাষ্ট্রপতি ভবন, সফদরজং টুম্ব, সুপ্রীম কোর্ট, ইন্ডিয়া গেট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়। আজকে প্রথমেই যাবে লালকেল্লায়। গাড়ি পার্ক করে টিকিট কেটে সঞ্চয় ওদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। লালপাথরের সুউচ্চ বেষ্টনীর ভেতরে। লালকেল্লার অনেকখানি জায়গা জুড়ে মিলিটারী ক্যাম্প। দর্শকদের সেখানে যাবার হুকুম নেই। দু'টি দরজা পেরিয়ে ওরা গিয়ে পৌঁছালো দেওয়ান-ই-আমে। সেখান থেকে দেওয়ান-ই-খাসে। ওখানে চেয়ার পাতা ছিল। যেন একটু আগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেছে। ফাংশন শেষে চেয়ারগুলি ম্লান ভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, এখানে এতো চেয়ার কেন?

সন্ধ্যাবেলা একটি অনুষ্ঠান হয় এখানে। সন যেট লুমেযার। অর্থাৎ সাউন্ড এন্ড লাইট। শব্দ এবং আলোর মাধ্যমে লালকেল্লার অতীত কাহিনী সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

বলো কি? বিস্ময় প্রকাশ করলো মলয়। সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে বললো, হ্যাঁ মলযদা, এক কথায় এই প্রয়োগটি অপূর্ব। আমি নিজে দু'বার দেখেছি। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যাই বেশি যারা এটি অসংখ্য বার দেখেছে। অদ্ভুত প্রয়োগ কল্পনা পরিচালকের। সেই সঙ্গে ঠুংরী-গজলের প্রাণ মাতানো সঙ্গীত। সব কিছু যেন আপনার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠবে। বিশেষ করে নাদির শাহের সৈন্যেরা যখন ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে ছুটে আসছে আক্রমণ করবার জন্য তখন অশ্বের সম্মিলিত ক্ষুরের আওয়াজ ক্রমশ আপনার কানে দামামা বাজাবে। আপনি চেয়ারে বসেই স্পষ্ট অনুভব করবেন, এই বুঝি আক্রমণকারীরা এগিয়ে এলো। এগিয়ে এসেছে প্রায়। আর রক্ষে নেই। সেই মুহূর্তগুলি শব্দের মধ্য দিয়ে এমন পরিপূর্ণ ভাবে ধরা পড়েছে, না-শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। শেষে নাদির শাহের আক্রমণে নির্বিচারে হত্যা এবং অত্যাচারের সময়ে নারী-শিশু, যুবা-বৃদ্ধা সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের বুক-ফাটা কান্না, বাঁচবার জন্য শেষ কান্নার শব্দটুকুও আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কান্নার সেই শব্দ শুনে আপনার মনে হবে নাদির শাহের সেই আক্রমণ বুঝি এখনও চলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওরা এবারে। ঘুরে ঘুরে দেখলো দেওয়ান-ই-খাস। অতীব সুন্দর দেওযালের গায়ের কারুকার্যগুলি। পাথরের জাফরী কাটা ঘুলঘুলি। শোভনা তার নিজস্ব মতামত জানালো, যাই বলো, দিল্লির লালকেল্লা থেকে আগ্রা ফোর্ট অনেক বেশি সুন্দর। অনেক কিছু দেখার আছে সেখানে।

আপনি ভুল বলেননি বৌদি। সত্যিই তাই। পথ দেখিয়ে সঞ্চয় সামনে এগিয়ে চলে। ছোট্ট ওই যে মসজিদটা দেখছেন ওটা হলো মোতি মসজিদ। প্রার্থনা করবার জন্য আওরঙ্গজেব তৈরি করেছিলেন।

তুমি যে বলেছিলে সঞ্চয় এখানে একটি মিউজিযাম আছে। মলয় জিজ্ঞেস করলো, সেটা কোথায়?

হ্যাঁ, আসুন। ডান দিকের ওই কোণের বড়ো হলঘরটাই মিউজিয়াম। ফোর্টের পিছনে ওই যে সুন্দর রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো রিং রোড। ওই রাস্তার ওপরই গান্ধীজি, নেহেরুজি এবং শাস্ত্রীজির সমাধি। এখান থেকে শুধুমাত্র শাস্ত্রীজির সমাধিটাই দেখা যাচ্ছে। দূরে পিছনের ওই নদীই হলো যমুনা। যমুনা নদী আগে ছিল ফোর্টের গায়েই। সেটা ক্রমশ দূরে সরে ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে।

মিউজিয়ামটি বেশ সাজানো-গুছানো। ওখানে রয়েছে শাজাহান, আওরঙ্গজেব এবং মোঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্রাটদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র, ঢাল তলোয়ার, সোর্ড ড্যাগার ইত্যাদি। মোঘল আমলের

ভেলভেট, মসনদ, সাজনি, চিনাবাসন, থালা, ঘট, জগ, সুরাইপাত্র, ঘড়ির ডায়াল, টয়লেট বাক্স, চেস টেবিল, পাউডার হর্নস, পারফিউম বক্স, বেড পোস্টস, পারফিউম হোল্ডার, কাশ্মেরী এমব্রয়ডারী কার্পেট, বাহাদুর শাহের স্ত্রীর পরিধানের ঘাগরা, চোগা মোগল ঘরানাদের পরিধানের সোনালী কাজ করা কোট ইত্যাদি সব সাজানো রয়েছে। মলয়া, শোভনা, মীনাক্ষী ঘুরে ঘুরে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে থাকে প্রথম দেখার কৌতূহল নিয়ে। সঞ্জয় বুলাকে নিয়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। একটি কাঁচের আবরণীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মলয়। লেখা রয়েছে ঃ Old English & Indian Newspapers. The Delhi Gazette. Published every Wednesday & Saterday. যে-সংখ্যাটি ওখানে সাজানো রয়েছে ওটা প্রকাশের সময়, Delhi, Wednesday, July 26, 1848.

লালকেল্লা থেকে রাজঘাট গাড়িতে মিনিট তিনেক সময়ও লাগলো না। গেট দিয়ে ঢুকতেই শান বাঁধানো প্রশস্ত পথ। দু'পাশে সবুজ সমতল মাঠ। মাঝে মাঝে ফুলের সমাবেশ। সমতল সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন চারিদিক থেকেই ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে গেছে। যেন ছোটখাট একটি পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শান বাঁধানো রাস্তাটা দু'পাশের ক্রমশ উঁচু ঘাসের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে গান্ধীজির সমাধির দিকে। ওখানে পৌঁছাবার আগে সকলকে জুতো খুলতে হলো। জুতো খুলে দ্বিতীয় গেটটি পার হতেই ভেতরে গোলাকার একটি প্রশস্ত মাঠ। ঠিক মাঝখানটিতে সমাধি। কালো পাথরের চতুষ্কোণ বেদী। সমাধিতে লেখা রয়েছে 'হে রাম।' সঞ্জয় কথা প্রসঙ্গে জানালো, গান্ধীজির মৃত্যুস্থানটি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেননি, পরে এক সময়ে জায়গাটি দেখাবো। আর রাজঘাটের উল্টোদিকের চৌরাস্তার মোড়েই গান্ধী মিউজিয়াম। তবে আমরা আজ ওটা দেখবো না। কেন-না অনেক সময় লাগবে। অন্য একদিন আমরা দেখবো।

রাজঘাটের পরেই শান্তিবন অর্থাৎ নেহেরুজির সমাধি। মাঝখানে লালগোলাপের সতেজ হাসি। দু'পাশে লাল সুরকির পায়ে চলা পথ। ওই পথেই এগিয়ে চললো ওরা। প্রবেশমুখে অল্প বয়স্ক কয়েকটি ছেলে এবং একটি বৃদ্ধা ফুল বিক্রি করছে। লাল টকটকে তাজা গোলাপ। দর্শনার্থীরা ওই ফুল কিনে সমাধিতে দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শান্তিবন থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরেই বিজয়ঘাট। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধি। সঞ্জয় বললো, এই রিং রোড ধরে সোজা একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে আর একটি দর্শনীয় জিনিস আছে। তবে—সঞ্জয় হেসে বললো, না-দেখাই ভালো। ওর কথা বলার ধরন এবং চাপা হাসি দেখে কৌতূহল সকলের বাড়লো বই এতোটুকু কমলো না। দর্শনীয় স্থান অথচ না-দেখাই ভালো এমন কি হতে পারে সেটা মলয় তো ভেবেই কূলকিনারা পেল না। না-জানা পর্যন্ত কৌতূহল ক্রমশ বাড়তে থাকে। মলয় জিজ্ঞেস করলো, কি সেটা? উত্তর না-দিয়ে সঞ্জয় হাসতে লাগলো নীরবে। কৌতূহলে ভেঙে পড়লো শোভনা। ওখানে দেখবার কি আছে বলোই না?

শোনার পর রাগ করতে পারবেন না কিন্তু।

না-না! বিন্দুমাত্র রাগ করবো না।

আমাকে কোনওরকম দোষারোপও করতে পারবেন না। সঞ্জয় চোখ তুলে মীনাক্ষীকে একবার দেখলো। মেয়েটা মুখে কিছু জিজ্ঞেস করছে না বটে কিন্তু রুদ্ধ নিশ্বাসে যে প্রহর গুনছে সেটা ওর চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়। শোভনা ব্যগ্র সুরে বললো, না, বাবা না। তোমাকে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করবো না। সেখানে কি আছে আগে তাই বলো!

শ্মশান! সঞ্জয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে হেসে উঠলো। মলয় হাসি থামিয়ে বললো, তা বেশ তো দিল্লি দর্শনে এসে ওটাকে আর বাদ রাখা কেন? শ্মশানও দেখবো। এমন একটা সুন্দর জিনিস আগে বলতে হয়তো?

থাক। তোমাকে ফাজলামো করতে হবে না। শোভনা মৃদু তিরস্কার করলো স্বামীকে। সঞ্জয় হাত জোড় করে বললো, মাপ করবেন মলয়দা, ওটার কাছে জীবনে একটি দিনই যাবো। ঠিক প্রয়োজনের সময়ে।

শাস্ত্রীজির সমাধি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা গাড়িতে উঠলো। মলয় পিছনের সীটে গিয়ে বসলো।

যদিও সে এর আগে সঞ্চয়ের পাশে বসেছিল। কিন্তু এবাবে অতোসব খেয়াল করলো না। ভাবখানা যেন বরাবর একই জায়গায় বসতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এক জায়গায় বসলেই হলো। শোভনা বুলাকে নিয়ে প্রথমে গাড়ির ভেতরে যেতেই মলয়ও আপনমনে ওর পিছনে গিয়ে উঠে বসলো। মীনাক্ষী ভেবে পেল না, সে কি করবে? সঞ্চয়ের পাশে বসতে যে ইচ্ছা হচ্ছে না তা নয়—তবে দুর্বলতা থাকলে যা হয়! সারা মন নানারকম চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়লো। নিজে থেকে এগিয়ে গেলে দাদা যদি কিছু মনে করে? বিশেষ করে পিছনের সিটে যখন তিনজনে বসা যায়। জায়গা না-থাকলে আলাদা কথা ছিল। মীনাক্ষী গাড়ির পিছনের দরজা মেলে ধরতেই মলয় অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরেই বলে উঠলো, তুই আগে গিয়ে বোস—

গান্ধী মিউজিয়াম পার হয়ে রিং রোড ধরে সোজা গাড়ি চালালো সঞ্চয়। সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই সে বললো, জানেন মলয়দা, দিল্লির সবচেয়ে দীর্ঘ রাস্তা হচ্ছে এই রিং রোড। সারা দিল্লিকে রাস্তাটি একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। বাঁ দিকে উঁচু ওই যে চিমনীগুলি দেখছেন, ওটা হলো ইন্দ্রপ্রস্থ পাওয়ার স্টেশন। সোজা তাকিয়ে দেখুন ছাই রংয়ের সুদৃশ্য বাড়িটা........

হ্যাঁ। বাড়ির মাথায় লেখা রয়েছে ডবলু. এইচ্. ও. অর্থাৎ 'হু'।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেসন। কথাটা বলেই সঞ্চয় ডান দিকে গাড়ি ঘোরালো। ঘোরাবার মুখেই বাঁ দিকে অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনে সুন্দর বিল্ডিং। পরের বাড়িটাই ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসের। দিল্লির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সামান্যতমও কোনও কিছু বাদ দিতে রাজি নয় সঞ্চয়। পুরানো কেল্লার পাশ দিয়ে গাড়ি ছোটলো সে। মুখেও থেমে নেই। বললো, ডান দিকে যে গোলাকাব প্রাচীর দেখছেন তা হলো ন্যাশানাল স্টেডিয়াম। এদিকটায় প্রচুর মিলিটারী রয়েছে। গাড়ি থামে না। এগিয়ে চলে। বাঁ দিকের একটি সুদৃশ্য গেটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সঞ্চয় বললো, চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথ। ওটা যে চিড়িয়াখানা বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। দেখছেন না চারিদিকে কেমন গাছ-গাছড়ার ঝোপ-জঙ্গল! আসলে চিড়িয়াখানা সমতল রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচুতে। অন্য একদিন এখানে আসার প্রোগ্রাম করা যাবে।

সাদা বাঘ আছে? শোভনা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলো।

আছে। তবে কলকাতার মতো আলাদা দর্শনী দিতে হয় না। আর পশুর রাজা সিংহ সম্রাটদের কর্তৃপক্ষরা খাঁচায় পুরে রাখেনি। ওরা নীল আকাশের নীচে দিব্যি ঘোরা-ফেরা করে।

এতে কি বিপদের সম্ভাবনা নেই?

থাকলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এমন ভাবে ছেড়ে রাখতেন না। সিংহরা ছাড়া রয়েছে একটি কৃত্রিম উঁচু পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের চারিপাশে অবশ্য অনেকখানি পরিখা করা আছে। কাজেই উপরে আচ্ছাদন নেই ঠিক কথা, কিন্তু পরিখার দূরত্বটুকু অতিক্রম করে লাফিযে এ-পাবে আসাও সম্ভব নয়। সব রকম ক্যালকুলেশন করেই ওটা করা হয়েছে।

ওখলা ড্যামে গিয়ে ওরা পৌঁছালো। যমুনা নদীর বুকের ওপর বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধের বাঁ দিকের অংশে নীলজলের উচ্ছ্বাস। ওপারের নীল দিগন্তরেখার সঙ্গে জলের মিতালী হয়েছে। ডান দিকের অংশে জল অল্প। কিছুটা দূরেই বালির প্রশস্ত চরা। নদীতে ছিপ ফেলে, সূতো ফেলে মাছ ধরছে অনেকে। ডান দিকের তীরে ছোট্ট একটু পার্ক। বাঁ দিকে খোলামেলা জায়গায় রেস্টুরেন্ট। লনের ওপর চেয়ার-টেবিলগুলি থোকা-থোকা ফুলের মতো সাজানো। একটু বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে ওরা গিয়ে বসলো ওখানে। সময়টা যদিও শীতকাল। তবুও সকলে একটি করে ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করলো। ঠান্ডা সুমিষ্ট গোল্ডস্পটের স্বাদ পেয়ে বুলা মুহূর্তের মধ্যে সবটা শেষ করে সঞ্চয়ের দিকে তাকালো। বন্ধু, আমি আর একটা খাবো। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলো শোভনা। মিষ্টি করে বললো, না মা আর খায় না। ঠান্ডা লাগবে। বুলা মায়ের কথার প্রতিবার না-করে শুধু সঞ্চয়ের দিকে ছলছল করে চেয়ে রইলো পাবার আশায়। সঞ্চয় বুলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসলো। বয়কে ডেকে আর একটি পানীয় দিতে বললো। ওখলা ড্যামে ওরা আধঘন্টার মতো ছিল। তারপরেই রওনা দিল বুদ্ধ গার্ডেনের দিকে। এর আগে তারা আরও দুটি গার্ডেন দেখেছে। লোদি গার্ডেন

এবং মোঘল গার্ডেন। শেষেরটি রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে। জনসাধারণ সব সময়ে এই মোঘল গার্ডেনে ঢুকতে পারে না। দেওয়া হয়। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এবং মার্চ মাসের কয়েকটি দিন মাত্র সকলের দেখবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়। শোভনা, মলয় ও মীনাক্ষী তিনজনেই এক বাক্যে স্বীকার করেছে, মোঘল গার্ডেনের মতো এমন চোখ জুড়ানো ফুলের সমাবেশ এর আগে তারা কোথাও দেখেনি। সে-কথাই জিজ্ঞেস করলো শোভনা, বুদ্ধ গার্ডেন কী মোঘল গার্ডেনেব চেয়েও সুন্দর?

এক কথায় উত্তরটি হবে না। তবে সৌন্দর্য বুদ্ধ গার্ডেনেও কম নয়। পুরু ঘাসের কোমল গালিচা পায়ের নীচে। কতো রকমের যে মরসুমী ফুল ফোটে না-দেখা পর্যন্ত ঠিক অনুভব করতে পারবেন না। কৃত্রিম লেক, ঝরণা, কোথাও-বা সমতল সবুজ ঘাসের গালিচা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। বুদ্ধ গার্ডেন নিঃসন্দেহে মোঘল গার্ডেনের পাশে স্থান করে নিতে পারে। ঘুরে ঘুরে ওরা বুদ্ধ গার্ডেন দেখলো। সৌন্দর্যের সাগরে ডুব দিয়ে মনমাতানো বাগানটির তারিফ করলো বারবার। কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে পরপর পাথরের পিলার সাজানো রয়েছে। মীনাক্ষী শাড়ির প্রান্ত কিছুটা উপরে তুলে ছেলেমানুষের মতো খুশিতে মেতে উঠে ওই পাথরের উপর দিয়ে ছন্দ তুলে হেঁটে ওপারে চলে গিয়ে হাসিঝরা মুখে ডাক দিল, বৌদি এদিকে চলে এসো—

না ভাই। শোভনা পরিষ্কার উত্তর। এখন মোটা হয়ে গেছি। ওইটুকু পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে পারবো না। শেষে লোকে হাসাহাসি করুক আর কি! মীনাক্ষী বৌদির কাছে তেমন সাড়া না-পেয়ে নিজেই মেতে উঠলো আনন্দে। জলে স্নান করালো পা দুটিকে। হাত দিয়ে জলের সঙ্গে সখ্যতা পাতালো। তারপর আঁচলা ভরে শোভনার গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে গিয়েই লজ্জায় ভেঙে পড়লো। জল শোভনার গায়ে দু-এক ফোঁটা লাগলেও পুরোটা গিয়ে সঞ্চয়ের শার্টের বুকের অংশটুকুতে ভিজিয়ে দিল। এমন একটা মজার কান্ড দেখে শোভনা না-হেসে পারলো না। বোনকে হয়তো মৃদু শাসন করতো মলয়, কিন্তু স্ত্রীর অনাবিল হাসির ফোয়ারায় নিজেও অফুরন্ত মেজাজে হেসে উঠে বললো, কি যে করিস না! ছেলেটা এখন ভিজে জামায়.... মৃদু হেসে সঞ্চয় একবার তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। ওর সারা মুখখানার ওপরে চোখ দুটি বুলিয়ে নিল। হাসি ছোঁয়া লজ্জায় আনত রক্তিম মুখ। সঞ্চয় বললো, হাওয়া বইছে। এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে। বুদ্ধ গার্ডেনে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে সঞ্চয় গাড়ি চালালো সোজা পালামের দিকে। পালাম এয়ারপোর্ট। পথের দু'পাশে জনতার ভিড়। শিশুদের হাতে জাতীয় পতাকা আর ফুল। সঞ্চয়ের খেয়াল হলো আজ রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আসছেন শুভেচ্ছা সফরে। নয়াদিল্লিতে বসবাসকারী রাশিয়ান শিশুরাও পতাকা হাতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। সঞ্চয় গাড়ি পার্ক করে বললো, আপাততো আমরা আর এগিয়ে যেতে পারবো না। শোভনা জিজ্ঞেস করলো, এতো ভিড় কেন ওখানে?

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আসছেন।

ওমা তাই বুঝি! হঠাৎ পাওয়ার আনন্দে শোভনা বললো, ভালোই হলো। এতোটা যোগাযোগ আশা করিনি।

বিদেশি অতিথিরা চলে গেলে পালাম ফাঁকা হলো। প্রশস্ত সুসজ্জিত ঘর পেরিয়ে ওরা লাউঞ্জে গিয়ে বসলো। এখান থেকে পুরো এয়ারপোর্ট ছবির মতো চোখে ধরা পড়ে। গ্রাউন্ডে ইতস্তত এক-একটি দলে ভাগ হয়ে বেশ কিছু লোক নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে। একটু দূরে পাখা মেলে শান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে একটি প্লেন। চার-পাঁচজন মেকানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ওইদিকেই যাচ্ছে। নীল আকাশটা বহুদূরে এয়ারপোর্টের শেষ সীমানায় তারকাঁটার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। প্যান আমেরিকানের একটি প্লেন এসে নামলো। সিঁড়ির যোগাযোগ হতেই দলে দলে যাত্রীরা প্লেন থেকে নামতে শুরু করে দিল। দেশি মানুষের সঙ্গে বিদেশি মানুষের ভিড়। ধুতি-পাঞ্জাবি, স্যুট, শাড়ি, গাউন ও মিনি স্কার্টের চলমান প্রদর্শনী। ওরা অনেকক্ষণ বসলো ওখানে। পালাম এয়ারপোর্টের ওপর ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলো। আর নয়। এবারে বাড়ি ফিরবার পালা। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে সঞ্চয়। সেন্ট্রাল আই হসপিট্যালের কাছাকাছি আসতেই বাধা পেল। মলয় বললো, সঞ্চয় গাড়িটা থামাও

একটু। আমি ও শোভনা একবার মাসিমার ওখানে যাবো। গাড়ি থামলে মলয় দরজা খুলে মাটিতে পা দিতেই সঞ্জয় বললো, আপনারা নামছেন কেন? আমিই আপনাদের সেখানে পৌঁছে দিচ্ছি।

আরে না-না, এইটুকু তো পথ। গাড়ি থেকে নামলো মলয়। বললো, তোমরা বাড়ি যাও। আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে বসির আলিকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো তাহলে---

তুমি আমাদের জন্য বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ছো সঞ্জয়। শোভনা হাসলো। দুই বুড়োবুড়ি গল্প করতে করতে এই সামান্য পথটুকু দিব্যি পৌঁছে যেতে পারবো। তোমাকে আর গাড়ি পাঠাতে হবে না।

মীনাক্ষী বুলাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সঞ্জয় গাড়ি গ্যারেজে না-ঢুকিয়ে রওনা দিল আদিত্যর বাড়ির দিকে। একটি জরুরি কথা বলার আছে দুর্গাবৌদির সঙ্গে মীনাক্ষীর পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু নিরাশ হলো সঞ্জয়। আদিত্যদা ও দুর্গাবৌদি দুজনে কোথায় যেন বেরিয়েছে। শূন্য মনে ফিরে এলো সে। ড্রইংরুমে ঢুকবার সময়ে শোবার ঘরের দিকে তাকালো একবার। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে মীনাক্ষী। ওর শোবার ভঙ্গিটা ভারী ভালো লাগলো সঞ্জয়ের। ছন্দময় দেহের আকর্ষণীয় রূপ ফুটে উঠেছে। ঢেউ খেলানো শরীরের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো সঞ্জয়। সরু কোমরের নীচের সুঠাম অংশটুকু আঁটো করে শাড়ির প্যাঁচে জড়ানো। পায়ের ওপর থেকে শাড়িটা সরে গেছে। রেডিওতে দ্রুতলয়ের ইংলিশ মিউজিক। মীনাক্ষী পায়ে পা ঠুকে নাচের ছন্দ তুলছে। চলে যেতে মন চাইলো না সঞ্জয়ের। ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলো। মিউজিক ততোক্ষণে থেমে গেছে। অখন্ড নীরবতার স্তব্ধ প্রহর ঘরের মধ্যে। পায়ের ছন্দ থামলো। মীনাক্ষী মুখ তুলে রেডিওর দিকে তাকালো। তখনই চোখে পড়লো সঞ্জয়কে। ঘরের ও-পাশের দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো মীনাক্ষী। নতুন করে আবার মিউজিক শুরু হয়েছে। সঞ্জয় বেশি কিছু আর ভাবতে পারলো না। ভালো-মন্দের পরবর্তী অধ্যায়টিও বুঝতে চাইলো না। মীনাক্ষীর দুই চোখের দিকে দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে একেবারে ওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। সঞ্জয় নিজের মনের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে পারলো না। মীনাক্ষীর বাহুমূলে চাপ দিয়ে সজোরে টেনে নিল নিজের কাছে। প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেনি মীনাক্ষী। নিতান্তই আচমকা। বিস্ময় আর বিহ্বলতার ঘোর কাটলে অনুভব করলো তার সারা দেহটা সঞ্জয়ের বুকের মধ্যে। হাত-পা কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মীনাক্ষী অলস ভঙ্গিমায় সঞ্জয়ের কাঁধের ওপর নিজের হাত দুটি মেলে ধরে স্নায়ুর দুর্বলতা কাটাতে আঁকড়ে ধরলো। সাহস পেল সঞ্জয় তখনই। বুঝলো মীনাক্ষী তার কাছে ধরা দিয়েছে। ওর ঠোঁট দুটির উপরে নিজের মুখটা নামিয়ে টেনে নিল আরও কাছে। ওরা হয়তো নীরবতার সাগরে অনুক্ত থেকেই ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করতো ওই ভাবে আরও কিছুক্ষণ থেকে। কিন্তু সহসা মীনাক্ষীর চোখ দুটি দরজার কাছে গিয়ে স্থির হলো। ভারী পর্দাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বুলা। মীনাক্ষী অস্ফুট স্বরে কোনওরকমে বললো, বুলা দেখছে ছাড়ুন।

মলয় ও শোভনা ফিরে এলো একটু রাত করেই। ওরা খাবে না। মাসিমার ওখানে খেয়ে এসেছে। বুলাকে অনেক আগে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে মীনাক্ষী। খেতে বাকি আছে সে আর সঞ্জয়। ওয়াকরদে ও রামসুভগ একটু আগে তাদের খাওয়া শেষ করেছে। খাবার টেবিলে গিয়ে মীনাক্ষী দেখলো সঞ্জয় তখনও আসেনি। ওয়াকরদেকে বললো, বাবুজিকে খেতে ডাকো।

বাবুজি খাবে না বললো।

কেন? কথাটা বলেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হলো মীনাক্ষী। টেবিল ছেড়ে সোজা চলে গেল সঞ্জয়ের ঘরে। চোখাচোখি হতেই নিচু গলায় অথচ স্পষ্ট সুরে বললো, খেতে আসুন।

আপনি খেয়ে নিন। সঞ্জয় ওর মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা পেল। আসলে হঠাৎ ওই ঘটনার পর থেকেই একরাশ লজ্জা এসে তাকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। লজ্জার সমুদ্রে তাই ডুব দিয়েছে সঞ্জয়। মীনাক্ষীর সামনে বসে একসঙ্গে খাবে কি করে? অবশ্য লজ্জা ভাঙতে নিজের মনে নিজেই

যুক্তির জাল বুনছিল সঞ্জয়। মীনাক্ষী তো তাকে অপমান করেনি। বরং সহজ ভাবে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে তাকে সমর্থনই করেছে। হ্যাঁ, সমর্থনের সুরই খুঁজে পেয়েছে সঞ্জয়। মীনাক্ষী দু'হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল। তাছাড়া ওর ঠোঁটের ওপর নিজের মুখখানা নামিয়ে আনার সময়েও এতোটুকু আপত্তি জানায়নি সে। মেনে নেবার মতো মনের প্রস্তুতি না-থাকলে মীনাক্ষী নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হতো। কিন্তু তা সে হয়নি। সবই বুঝতে পারছে সঞ্জয়। তবুও লজ্জা লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে উল্টোটাও ভাবলো সে। মীনাক্ষী তো সত্যি সত্যি রাগও করতে পারে। হয়তো প্রকাশ করেনি। প্রকাশ করাটা অশোভনীয় হবে তাই। তাছাড়া তারই বাড়িতে তাকে আর যাই হোক অপমান করা চলে না। সেই সব ভেবেই মীনাক্ষী চুপচাপ থেকেছে। তাই-বা কেমন করে হবে? যদি তাই হয় তাহলে এটা ঠিক মীনাক্ষী নিজে এসে খাবার জন্য তাকে অনুরোধ করতো না। সঞ্জয় ওকে আরও একটু নিশ্চিত ভাবে বিচার করার জন্য বললো, খেতে ইচ্ছা করছে না।

কারণটা কী? মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকাতে পারলো না সঞ্জয়। বললো, এমনি! বেশ কিছুক্ষণ সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে রইলো মীনাক্ষী। পরে বললো, ছেলেমানুষি করবেন না। খেতে আসুন—

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরেই মলয় ও শোভনা আবার ছুটলো বিনয়নগরে। সঞ্জয় ঘুমাচ্ছিল। তাই ওকে বলা হয়নি। মীনাক্ষীকে জানিয়ে গেল কথাটা। আমরা মাসিমার ওখানে যাচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যা হবে। মীনাক্ষী ভেবে পেল না মাসিমার কাছে হঠাৎ এতো কী জরুরি প্রয়োজন হলো যে সঞ্জয়ের বাড়িতে এসেও ওখানে বারবার ছুটতে হচ্ছে? নিশ্চয়ই এর ভিতরে একটা কিছু রয়েছে। কিন্তু কি সেটা? দাদা অথবা বৌদি দুজনের কেউই তাকে ভেঙে কিছু জানায়নি। শুধু ওই একটিমাত্র কথা, প্রয়োজন আছে। সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। প্রয়োজন না-থাকলে কেউ এমন ভাবে ছোটাছুটি করে? কিন্তু সেটা এতো কী গোপনীয়? মীনাক্ষী স্পষ্ট বুঝতে পারছে দাদা এবং বৌদি দুজনেই তার কাছে কী যেন একটা লুকাতে চেষ্টা করছে। মীনাক্ষীর তো তাই মনে হচ্ছে। কেন-না প্রশ্ন করেও সে সদুত্তর পায়নি। সে তো স্পষ্টই জিজ্ঞেস করেছিল, গতকাল গিয়েছিলে আজ আবার ভোরেই যাচ্ছো, ব্যাপার কী দাদা? সিগারেটের ছাই ঝেড়ে মলয় উত্তর দিয়েছে, ও একটা জরুরি ব্যাপার আছে।

আটটা বাজতে-না বাজতেই বাথরুমে ঢুকলো মীনাক্ষী। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো। প্রসাধন সেরে রান্নাঘরে যাবার মুখে শুনতে পেল টেলিফোনের কান্না! ড্রইংরুমে গিয়ে দেখলো সঞ্জয় তখনও ঘুমাচ্ছে। টেলিফোন তুললো। হ্যালো কে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়িতে আছেন। আপনি ধরুন—টেলিফোনটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সঞ্জয়ের দিকে চাইলো মীনাক্ষী। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ডাকলো ছোট্ট সুরে, শুনছেন! ঘুম ভাঙবার কোনও লক্ষণ নেই। ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো মীনাক্ষী। এতোবেলা পর্যন্ত সঞ্জয় ঘুমায় না। অন্তত এই ক'দিনে তো সে দেখেনি। আজ ওর কী হলো? মীনাক্ষী আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত রাখলো। সামান্য ধাক্কা দিয়ে আবার ডাকলো, শুনছেন! আপনার ফোন! সঞ্জয় চোখ মেলে তাকাতেই মীনাক্ষী নিজের হাতখানা সরিয়ে নিল। বললো, আপনার অফিসের মিঃ সাকসেনা ফোন করেছেন। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এতোটুকু আর সময় নষ্ট করলো না সঞ্জয়। টেলিফোনটা কানে তুলে নিয়ে বললো, হ্যালো, হ্যাঁ, গুডমর্ণিং স্যার! মীনাক্ষী সদ্য ঘুম ভাঙা সঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ওর মুখখানা আজ কেমন যেন করুণ দেখাচ্ছে। মীনাক্ষী শুনতে পেল, টেলিফোনে অপর পক্ষকে সঞ্জয় জানিয়ে দিল, হ্যাঁ স্যার আমি যাবো। কী বলছেন? হ্যাঁ—এই ধরুন দশটা নাগাদ পৌঁছাবো। হ্যাঁ-হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি..........

আপনি কী অফিসে যাবেন?

একটু যেতে হবে। একটা জরুরি কাজ পড়েছে না-গেলে নয়।

সঞ্জয় স্নান করে আসতেই মীনাক্ষী নিজে তাকে খেতে দিল। খাওয়ার পুরো সময়টুকু কাছে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচর্যা করলো। খাওয়া শেষে সঞ্জয় যখন জামা-প্যান্ট পরছিল, মীনাক্ষী উপস্থিত হলো সেখানেও। সঞ্জয়কে কোট পরিয়ে দিতে সাহায্য করলো। নেকটাই বেঁধে দিল। সঞ্জয় বিস্ময়ে নীরবে শুধু মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অবাক হবার পালা কিন্তু সেখানেই শেষ হলো

না। নেকটাই বেঁধে দিয়ে মীনাক্ষী সু-কেস থেকে সঞ্চয়ের জুতো নিয়ে আসতেই সঞ্চয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর হাতখানা চেপে ধরলো।

ছিঃ ছিঃ এ আপনি কী করছেন! ঘরের ভেতরে বুলা আসতেই সঞ্চয় মীনাক্ষীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে জানলার দিকে সরে গেল। গতকাল রাত্রে এক ঘনিষ্ঠ এবং দুর্বল মুহূর্তে ওরা দুজনেই ধরা পড়েছিল বুলার কাছে। আজ সকালেও তাই। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ উপভোগ করলো মীনাক্ষী। বুলা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের হাত ছেড়ে দেওয়ার সলজ্জ ত্রস্ত ভাবটুকু তার মনে অব্যক্ত এক আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। মীনাক্ষী বুলার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো। বললো, তুমি ওই ঘরে গিয়ে খেলা করো যাও, আমি আসছি।

অফিস ছুটির পর শঙ্কর সোজা চলে এলো হাউজখাসে। বুলা ঘুমাচ্ছিল। মীনাক্ষীকে কোনও ঘরে খুঁজে পেল না। ওয়াকরদে জানালো, মেমসাব ছাদে। সিঁড়ি ভেঙে উপরের দিকে ছুটলো শঙ্কর। ছাদেই দেখা পেল মীনাক্ষীর। ছাদের কার্ণিশে হাতের কনুইয়ের ওপর ভর রেখে কুতুবের দিকে তাকিয়েছিল। শঙ্কর পিছন থেকেই ডাকলো, মীনাক্ষীদি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকালো মীনাক্ষী।

আয়! ছাদের ওপর কয়েকটি গার্ডেন চেয়ার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। মীনাক্ষী দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে একটিতে নিজে বসে অপরটি শঙ্করের দিকে এগিয়ে দিল। বললো, তারপর তোর খবর কী বল? শঙ্কর কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বললো, যে-খবরটা জানাতে এসেছি সেটা পুরোপুরি স্বার্থের ব্যাপার। বলতে আমার লজ্জা লাগলেও তোমাকে না-বলে উপায় নেই। কিন্তু স্যার মানে সঞ্চয়দাকে আমি কিছুতেই বলতে পারবো না। প্লীজ মীনাক্ষীদি, সেটা বলবে তুমি। তোমার কথা সঞ্চয়দা না-শুনেই পারবে না। মৃদু হাসলো মীনাক্ষী। শঙ্করের কথা শুনে তৃপ্তির হাসি খেলে গেল তার সারা-মুখে। সঞ্চয় তার কথা না-শুনেই পারবে না— সঞ্চয়ের প্রতি তার এই আধিপত্যের বিস্তার সেটা আর কেউ না-হোক অন্তত শঙ্কর বুঝতে পেরেছে। স্পষ্ট অনুভব করেছে ওদের অফিসের সেল্স ইঞ্জিনিয়ার মীনাক্ষীর কাছে অত্যন্ত দুর্বল। ব্যাপারটা ভাবতে ভারী ভালো লাগছে। শঙ্করের মুখ থেকে আরও কিছু ভালোলাগার কথা শুনবার জন্য মীনাক্ষী উল্টোপথে গেল। ছোট্ট প্রশ্ন করলো যদি আমার কথা না-শোনে?

এটা তোমার ভুল ধারণা। আমি জানি তোমার কথা শুনবে।

কী করে তুই অতো নিশ্চিত হচ্ছিস? মীনাক্ষী মিষ্টি করে হাসলো। সেদিন দেখলি তো? আগ্রা যাবার জন্য কতো করে বললাম শুনলো আমার কথা? তারপরেই হাসিতে ভেঙে পড়লো। বললো, বল? কী বলতে হবে ওকে?

ব্যাপারটা তোমাকে একটুখানি খুলেই বলি। আমার সঙ্গে যারা চাকরিতে ঢুকেছিল তাদের মধ্যে তিন-চারজনের প্রমোশন হচ্ছে। বুঝতেই পারছো মীনাক্ষীদি জানা-শোনা ভেতরে কেউ না-থাকলে প্রমোশন পাওয়া কতোখানি কঠিন! কোম্পানি কিছু সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ নেবে। অফিসের কর্মীদের ভেতর থেকেই নেবে। টাইপ করতে আমার আর ভালো লাগছে না। একঘেয়ে অলস কাজ। তুমি যদি সঞ্চয়দাকে বলে.............শঙ্কর মীনাক্ষীর চোখের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে তাকালো।

আচ্ছা আমি ওকে বলবো!

তুমি বললে নির্ঘাত হয়ে যাবে। শঙ্কর আবার তার বিশ্বাসের কথা বললো। আর তখনই দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় চাপলো মীনাক্ষীর। চোখের দুই কোণে চাপা হাসির ঝিলিক তুলে বললো, আর তোর সঞ্চয়দা কথা শুনে যদি ভীষণ রেগে যায় তাহলে? যদি প্রশ্ন করে অফিসের কাজের ব্যাপারে কাকে প্রমোশন দেবো কাকে দেবো না সেটা আমিই বুঝবো। এনিয়ে আমাকে উপদেশ-নির্দেশ না-দিলেই ভালো করতেন। তুই জানিস না শঙ্কর, লোকটা যে কখন কোন কথায় প্রচন্ড রেগে যায় কিছু বুঝবার উপায় থাকে না। শঙ্কর জানে মীনাক্ষীদির ওই কথাগুলি কপটতার মোড়কে জড়ানো। ওই কথাগুলি একটিও সত্যি নয়। সত্যি হতে পারে না। আর পারে না বলেই মীনাক্ষীর বলবার ধরনে অমন অবিশ্বাস ফুটিয়ে তোলার মিথ্যা প্রচেষ্টা। সঞ্চয়দা কথা শুনবে। সেই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তবে না মীনাক্ষীদি পরম নিশ্চিন্তে অনায়াস ভঙ্গিতে ওই ভাবে কথাগুলি বলতে পেরেছে।

নিশ্চয়তা না-থাকলে কথার সুরে অস্থিরতা মিশে থাকতো। সন্দেহের দোটানায় নিজেই দুলতো! কিন্তু মীনাক্ষীদির কথার মধ্যে সে-সবই অনুপস্থিত। যে জানে এটা হবেই—সেই তো বড়বেশি ভণিতার সুর তোলে। শঙ্কর তাই হাসতে হাসতে বললো, যদি সঞ্চয়দা রেগেই যায় ঠান্ডা করবার জন্য তো তুমি রয়েছো। আর সেই কারণেই তোমাকে বলা। নয়তো মলয়দাকে দিয়েই বলাতাম। মীনাক্ষী মেনে নিল শঙ্কর তার সম্বন্ধে যে-ধারণার জাল বুনেছে তা মিথ্যা নয়। তবুও চট করে তা স্বীকার করা যায় না। তাছাড়া সে-রকম স্বীকার করাতে আনন্দ নেই! সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়ার মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সাদামাটা। প্রাণ শূন্য। বরং তার চেয়ে ভালোলাগার রক্তিম রেশটুকু সারা মুখে আবীরের মতো ছড়িয়ে কপট রাগে বা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো করে অস্বীকার করতেই ভালো লাগে। প্রাণের ছোঁয়া লাগে। মীনাক্ষী শঙ্করের কথাটা তাই হাসিমুখে মেনে নিয়েও শাসনের সুরে মৃদু ধমক লাগালো, বড্ড ফাজিল হয়েছিস! সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। শঙ্কর বললো, আমি এবারে চলি মীনাক্ষীদি। সঞ্চয়দার আসবার সময় হয়েছে। আমাকে যদি এসে দেখেন তবে নিশ্চয়ই বুঝবেন আমিই তোমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছি।

ব্যাপারটা তো ঠিক তাই—মীনাক্ষী সহজ ভাবে হাসলো। পরে আবার বললো, হ্যাঁরে দাদা-বৌদি সেই সকালে তোদের ওখানে গেছে, এখনও এলো না। তুই বাড়ি গিয়ে ওঁদেরকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিস।

তা না-হয় পাঠিয়ে দেবো তবে বাড়িতে গিয়ে দেখা হলে তো?

কেন? বাড়িতে নেই তো গেছে কোথায়?

মায়ের সঙ্গে বিকেলে কৈলাশনগরে যাবার কথা আছে। যাই হোক বাড়িতে গিয়ে দেখলে তাড়াতাড়িই পাঠিয়ে দেবো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকারটা ক্রমশ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। অফিসের মিটিং সেরে বাড়ি ফিরলো সঞ্চয়। ড্রইংরুমে ঢুকেই বড়ো সোফাটায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে আধাশোয়া অবস্থায় পড়ে রইলো। জুতোটা খুললো। মোজা খুলে টাইখানা ঢিলে করে দিল একটু। তারপরেই উঠে দাঁড়ালো। কোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখলো। আবার বসলো সোফায়। মীনাক্ষীকে দেখছে না। কোথায় গেল সে? এতোক্ষণেও একটিবার কাছে এলো না? অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে সে তা কি মেয়েটা এখনও টের পায়নি? নতুন করে আবার মনে পড়লো সঞ্চয়ের সকালবেলা অফিসে যাওয়ার সময়টুকুর ঘটনা। মীনাক্ষী তার কাছে এসেছিল। অনেক কাছে। কোট পড়িয়ে দিয়েছিল। টাই বেঁধে দিয়েছিল। এমন কি সু-কেস থেকে তার জুতো পর্যন্ত এনেছিল। এতোটা সঞ্চয় আশা করেনি। তবে এটা ঠিক যে, ওই কাজটুকুর মধ্যে সঞ্চয় উপলব্ধি করেছে মীনাক্ষীকে। আর যাই হোক ভালোবাসার নিষ্ঠার মধ্যে এতোটুকু ফাঁক নেই মীনাক্ষীর! সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক একটি বিচার করতে বসলো। অন্য মেয়ে হলে কি এতোটা করতো? খুব বেশি হলে কোট এবং টাই বাঁধা পর্যন্তই। তার বেশি নয়। মীনাক্ষী কিন্তু সেখানেই থামেনি। আপন করে নেবার সহজ-সরল মনে ভালোবাসার সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে এসেছে আরও। সত্যিকারের প্রেরণা না-থাকলে সেই মানুষটির এতো কাছে কোনও মেয়ে আসে না। মীনাক্ষীকে সঞ্চয় পাঠ করেছে। চিনেছে। এখন আবার নতুন করে আবিষ্কার করলো। যাচাই করলো ভালোবাসার কষ্ঠিপাথরে। একটু একটু করে উপলব্ধি করলো। সে-উপলব্ধি নৈকট্যের। হ্যাঁ—সকালবেলার ঘটনার পর থেকেই মীনাক্ষী তার মনের সিংহ-দুয়ারে এসে পৌঁছেছে। সেই দুয়ার থেকে যেন আর ফিরে যাওয়া যায় না। কখনোই না। সঞ্চয় ডাক দিল, ওয়াকরদে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো রামসুভগ।

জি সাব।

ওয়াকরদে কিধার?

বুলা দিদিমণিকো লেকর ঘুমনে গয়ে বাহার।

আউর মীনাক্ষী মেমসাব?

মেমসাব উপ্পর হ্যায়। বুলায় গা?

নেহি। সঞ্চয় কি যেন একটু ভাবলো। তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করলো, দাদা-ভাবীজি আয়ে হ্যায়?

নেহি সাব্। আভিতক নেহি আয়ে।

রামসুভগ চলে গেলে সঞ্চয় ভাবতে বসলো। ছাদে সন্ধ্যার এই অন্ধকারে মীনাক্ষী একা একা কী করছে? যাবে নাকি সে একবার ছাদে? একান্তই নির্জন পরিবেশে ছাদের এক কোণে হয়তো মীনাক্ষীকে আবিষ্কার করবে। বেশিক্ষণ আর ভাবতে পারলো না সঞ্চয়। নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে গিয়ে পৌঁছালো সে। অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে সঞ্চয় দেখতে পেল কুতুবের দিকে মুখ করে মীনাক্ষী একটি চেয়ারে অলস ভঙ্গিমায় বসে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সঞ্চয়। মীনাক্ষীর অনাবৃত প্রশস্ত কাঁধে পরম নির্ভরতায় একটি হাত রাখলো। মীনাক্ষী এতোটুকু চমকায়নি। ঘার ফিরিয়ে মানুষটাকে একবার দেখে নিয়ে চেয়ারে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সঞ্চয় ওর সরু কোমরটুকু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিল। আজ আর অবাক হলো না মীনাক্ষী। বিস্ময়ও জাগলো না। যেন এইটাই স্বাভাবিক। এমনটাই হওয়ার কথা। সঞ্চয়ের প্রশস্ত বুকের মধ্যে সমস্ত মুখখানা লুকিয়ে ওকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো মীনাক্ষী। এমন করে আশ্রয় পেয়ে তার দেহে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। সঞ্চয়ের বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনের স্পর্শ সুখে আজ সে পুরোপুরি ধরা দিল। সঞ্চয় কোমর থেকে একটি হাত সরিয়ে এনে মীনাক্ষীর লুকানো মুখখানা উপরের দিকে তুলে ধরলো। এতোটুকু বাধা দিল না মীনাক্ষী। সঞ্চয় তার মাথাটা নামিয়ে আনলো। মীনাক্ষী নড়লো না। আপত্তি জানালো না। নিঃশব্দে পড়ে রইলো সঞ্চয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনের উত্তাল সমুদ্রে। সময়ের হিসাব কেউ রাখেনি। রাখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। কিন্তু সময় সেজন্য কম অতিবাহিত হলো না। সঞ্চয় লক্ষ্য করলো মীনাক্ষীর সারা দেহ কাঁপছে। ক্রমশই ভারী হয়ে নীচের দিকে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। সঞ্চয়ও ওকে আর ধরে রাখতে পারছে না। ওই শীতের মধ্যেও মীনাক্ষীর মুখ, গলা, ঘাড়, পিঠ যেন ঘামের সাগর থেকে ডুব দিয়ে উঠেছে। সঞ্চয় রুমাল দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিল। কোমল সুরে বললো, তুমি কী অসুস্থ বোধ করছো? মীনাক্ষী কথা না-বলে মাথা নাড়ালো। অর্থাৎ না। তারপরেই বললো, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সঞ্চয়ের প্রায় কানে কানে ফিসফিসিয়ে কথাটা বলেই মীনাক্ষী ওকে আরও চেপে ধরবার চেষ্টা করলো। সঞ্চয় আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিয়ে দিল। বললো, জল খাবে একটু?

না! মীনাক্ষীর উত্তর শুনে সঞ্চয় ওর দুই চোখের দিকে তাকালো। গতকাল ওকে কাছে টেনে নেওয়ার পর থেকে কেমন যেন এক লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল সে। ওর সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারেনি। রাত্রে তেমন করে খায়নি পর্যন্ত। কিন্তু আজ সঞ্চয় সেই লজ্জা হারিয়ে ফেলেছে। মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করছে না। বরং অনেক বেশি করে আপন লাগছে ওকে। মেয়েটা এখন বড়বেশি চুপচাপ। শান্ত। সঞ্চয় জিজ্ঞেস করলো, মীনাক্ষী তুমি কী অসন্তুষ্ট হয়েছো আমার ওপর? সঞ্চয়ের চোখের দিকে চাইলো মীনাক্ষী। একপলক মাত্র। তারপরেই মুখটা নিচু করে মাথা নেড়ে জানালো, না। নিঃশব্দে কয়েকটি মুহূর্ত ব্যয় হবার পর মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, আপনি বুঝি আজ সিগারেট খেয়েছেন?

তুমি জানলে কি করে? সঞ্চয় সাধারণত সিগারেট খায় না। তবে আজ সে দুটি খেয়েছে। কিন্তু মীনাক্ষী তা জানলো কেমন করে? ভারী আশ্চর্য তো! ওর চোখের দিকে তাকাতেই উত্তরটা খুঁজে পেল সঞ্চয়। আসলে হিসেব করতে তারই ভুল হয়েছে। সহজ উত্তরটি জানা সত্ত্বেও সে সাত-পাঁচ ভেবে আরও জটিল পথে এগিয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই ভুলটা করেছে। সঞ্চয় মৃদু হেসে বললো, তোমারই তো আজ বেশি করে জানবার কথা। তাই না? তারপরে কৈফিয়ত দেবার সুরে আরও যোগ করলো, মিটিং চলাকালীন সকলের সঙ্গে সিগারেট খেতে হলো। আপত্তি করেছিলাম। অন্যান্য বারে সকলে শুনলেও এবারে কিন্তু কেউ শুনলো না।

তাতে কী? মীনাক্ষী সামান্য একটু হেসে বললো, পুরুষ মানুষ তো সিগারেট খাবেই!

কিন্তু তুমি যে পছন্দ করো না। সঞ্চয়ের কথা শুনে মীনাক্ষী আবারও একটু হাসলো। খুশি

করবার ওর এই প্রচেষ্টাটুকু খুবই ভালো লাগলো। তাই বললো, করি। তবে বেশি খাওয়াটা পছন্দ করি না। সঞ্জয় ওই প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল। বললো, আগামীকাল আমরা ভাট্‌কল লেক দেখতে যাবো। তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

কী?

তুমি কিন্তু সেই নীল শাড়িটা পড়বে।

ওটা যে সঙ্গে এনেছি তা আপনাকে কে বললো?

বলছে আমার মন। না-এনেই তুমি পারো না। বলো না ঠিক বলেছি কিনা?

হ্যাঁ। ছোট্ট মেয়ের মতো মাথাটি কাৎ করে স্নিগ্ধ হাসলো মীনাক্ষী। সঞ্জয় ওর হাতের ওপর নিজের হাতখানা রাখলো। আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিল। বললো, সেদিন আমার কথাটি শোনোনি কেন? আমার খুব আশা ছিল তুমি শুনবে। ওই নীল শাড়িখানা পড়বে। চুপ করে থেকো না মীনাক্ষী বড়ো জানতে ইচ্ছা করছে।

মীনাক্ষী সঞ্জয়ের চোখের দিকে চেয়ে রইলো। দৃষ্টি সরালো না। খুব আস্তে অথচ গভীর সুরে বললো, তুমি বিশ্বাস করো তোমাকে দুঃখ দেওয়া বা অপমান করা, তোমার কথা না-শোনা ও-সব কিছুই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু লজ্জায় পড়িনি। পড়তে পারিনি। লজ্জা ভাঙতে চেষ্টা করেছিলাম। তাও পারিনি। তুমি শুধু আমার না-পরাটুকুই দেখলে অথচ তোমার ওই ভাবে চলে আসা দেখে আমার কান্না আসছিল তাতো তোমার চোখে ধরা পড়েনি। যে-যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে এলে। সে-কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন। কী রাগ দেখাতেই পারো! অথচ নীল শাড়িখানা পড়তে যে আমার কী ইচ্ছাই ছিল সে-খবর তুমি কতোটুকু রেখেছো?

টেবিলে সঞ্জয়ের খাবার সাজিয়ে পাশেই একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলো মীনাক্ষী। স্নান করে পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে সঞ্জয় এলো একটু বাদেই। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো একবার মীনাক্ষীর আয়ত দুই চোখের গভীরে। মৃদু হাসলো একটু। হাসি মুখেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়লো। হাসিটুকু মীনাক্ষীর দৃষ্টি এড়ালো না। জিজ্ঞেস করলো তাই, হঠাৎ হাসছো যে? কফিতে চুমুক বসিয়ে উত্তর দিল সঞ্জয়, দমদমের কথা মনে পড়ে গেল। তোমার সঙ্গে একটুখানি কথা বলবার জন্য তোমার পাশে মুহূর্ত সময়ও থাকবার জন্য সে কী ব্যাকুল চেষ্টাই না করেছিলাম। তোমার কাছে এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই প্রথমদিন তো পিকুকে ঘুমাতেই দিইনি। বারবার জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলাম তোমার কথা। আর আজ! হাসলো আবার সঞ্জয়। আজ তুমি আমার অনেক কাছে। অথচ বোঝাপড়ার এই যে সহজ সম্পর্ক নেমে এসেছে এটা তো দমদমেই হতে পারতো? কিন্তু আমরা তখন কেউই সহজ হতে পারিনি। তবে আমি তো তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলাম। তুমি তখন বড়বেশি নীরবতা পালন করছিলে।

তা জানি না। তবে আমরা কেউই কারও কাছে লুকিয়ে থাকতে পারিনি। কথাটা বলেই মীনাক্ষী থামলো। যা-যা বলবে বলে ঠিক করেছিল কথাগুলি যেন দল বেঁধে সব হারিয়ে যাচ্ছে। এর পরের কথা কী বলবে মীনাক্ষী ভেবে পেল না। তবে এর আগে এই ভাবে কথা হারিয়ে মূক হয়ে বসে থাকেনি। আজ যে তার কী হয়েছে! যে-কথাটাই গুছিয়ে বলতে যাচ্ছে সেটাই যেন কেমন ছোটাছুটি করছে মনের মধ্যে। ধরে রাখতে পারছে না। অথচ এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকাও যায় না। মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত অফিসের কথাই জিজ্ঞেস করে বসলো, ছুটির মধ্যেও আজ অফিসে গেলে যে? এতো কি জরুরি ছিল?

ও প্রমোশন, ইন্‌ক্রিমেন্টের ব্যাপার। কাকে কি দেওয়া যেতে পারে-না-পারে এ-নিয়ে একটা মিটিং ছিল।

মীনাক্ষী দেখলো এই সুযোগ। শঙ্করের সম্বন্ধে বলবার এমন সুযোগ ও পরিবেশ আর কখনোই হবে না। সুতরাং যদি কিছু বলতে হয় এখনই। বলবার পরিবেশটুকু মীনাক্ষীকেই তৈরি করে নিতে হতো। কিন্তু সেই রাস্তা যখন সঞ্জয় নিজেই খুলে দিয়েছে তখন এগিয়ে যেতে বাধা কীসের? সবচেয়ে

বড়ো কথা এই মুহূর্তে শঙ্করের কথাটা বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মীনাক্ষী তাকালো সঞ্চয়ের দিকে। কফিতে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক বসাচ্ছে ছেলেটা। কেমন যেন আনমনা। উদাস উদাস ভাব। মীনাক্ষী ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না। সোজাসুজি বললো, আমি শঙ্করের কথা বলছিলাম। তুমি যদি ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও—

সে-কথা আমি আগেই ভেবেছি এবং করেছিও তাই। তবে ওকে তুমি এখন কিছু বোলো না। সময় হলে আমিই জানাবো। আসছে মাস থেকে শঙ্কর আর টাইপিস্ট নয়। টাইপ সে করবে না। কেন-না ওই লাইনে থাকলে আমাদের অফিসে বড়ো হওয়ার কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই। তাই ওকে সেলস্-এর লাইনে নিয়ে এলাম। আসছে মাস থেকে শঙ্কর সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। একটু চুপ করে সঞ্চয় আবার বললো, তোমাকে বলতে হতো না মীনাক্ষী, শঙ্করের জন্য আমি নিজেই করতাম। তারপরেই সঞ্চয় হেসে দিল, আমারই স্বার্থে।

তোমার স্বার্থে? অবাক হলো মীনাক্ষী। স্বার্থের প্রশ্ন যদি ওঠে তবে সেটা তাদেরই। এরমধ্যে সঞ্চয়ের স্বার্থের বিন্দু-বিসর্গও নেই। অথচ সেই বলছে যে প্রয়োজনটা কিনা তারই।

অনেকটা তাই বলতে পারো। শঙ্করের উন্নতির পথ তৈরি করে দিয়ে পরোক্ষে তোমাকেই ঘুষ দিলাম। কারণ আর কিছুই নয়। তোমাকে খুশি করতে হবে না? সঞ্চয় এবারে উজ্জ্বল হাসলো। নয়তো তুমিই বলতে কতো বড়ো চাকরি করো বোঝা গেছে! শঙ্করটা টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছিল আজও সেই টাইপিস্টই রয়েছে!!

তাই বলতাম বুঝি! মীনাক্ষীর পাতলা দুই ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সঞ্চয় কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু আরম্ভই করতে পারলো না। ওয়াকরদের সঙ্গে বুলা ডাইনিংরুমে এসে ঢুকলো। সঞ্চয় এবং মীনাক্ষীকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে বুলা দুজনের মুখের ওপর দিয়ে নিজের চোখ দুটি একবার বুলিয়ে নিল। সঞ্চয় ভেবে পেল না হঠাৎ এমন ভাবে তাদের দুজনকে দেখবার কি আছে? তারপরেই মনে পড়লো গতকাল এবং আজ সকালের ঘটনাটুকু। দু'বারই তারা সম্পূর্ণ ভাবে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে বুলার কাছে। হোক-না বুলার অপরিণত মন—তবুও কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে সঞ্চয়ের। জড়তা কাটাতে সহজ হবার জন্য সে তাই বললো, কোথায় গিয়েছিলে বন্ধু? তোমাকে একটু আদর করবার জন্য কখন থেকে বসে আছি অথচ তুমি আসছোই না, এসো। সঞ্চয় বুলাকে পরম স্নেহে পাশের চেয়ারটাতে বসিয়ে দিল। বুলা কিছুক্ষণ সঞ্চয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো ওই কথার সত্যতা যাচাই করতে। তারপরে অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো, তুমি তো আমাকে আদর করো না। খালি পিসিমণিকে আদর করো। পিসিমণিকে হাম দাও। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় এবং মীনাক্ষীর মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। লজ্জা পেল দুজনেই। দৃষ্টি নিচু করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মীনাক্ষী। অবস্থাটা ঠিক কিভাবে সামলে নেবে ভেবে পাচ্ছে না। তাছাড়া এক টুকরো মেঘের মতো ভয় এসেও মনের কোণে বাসা বাধলো। সে-ভয় মোটেই অমূলক নয়। বুলা শিশু। বুলা অবুঝ। শিশুসুলভ চপলতায় সে যদি দাদা-বৌদির কাছে বলে দেয়? সেটাই তো স্বাভাবিক। বাঁচবার পক্ষে কি যুক্তি সে তখন দেখাবে? সেই কৈফিয়ত যতোই জোরালো হোক-না কেন আদৌ যে টিকবে সে-নিশ্চয়তা কোথায়? কেন-না বুলাকে এই ধূলি-ধূসর ধরণীর সামান্য মলিনতাও স্পর্শ করেনি। সে শিশু। শিশুরা আর যাই হোক মিথ্যে করে বানিয়ে বলতে পারে না। যেটা সত্যি তাই বলতেই অভ্যস্ত তারা। গতকাল রাত্রে বুলার কাছে ধরা পড়েছে ঠিক কথা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মীনাক্ষীর তখন এতোটুকু ভয় জাগেনি। কিন্তু আজ বুলার মুখে ওই কথা শোনার পর সত্যি সত্যিই ভয়ই হচ্ছে। বুলা বলবেই এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু যদি বলেই বসে তাহলে? মীনাক্ষী ওকে আদর করে ওর মন থেকে ও-সব ভুলিয়ে দিতে চাইলো। ওকে সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থাৎ হাসিখুশি করে তুলবার জন্য সস্নেহে ডাক দিল, আমার কাছে আয়। বুলাকে ডাক দিল বটে তবে মীনাক্ষী নিজেই ওর কাছে এগিয়ে গেল। ওকে কোলে নিয়ে গাঢ় গলায় বললো, এই তো তোমাকে ভালোবাসছি।

কাকে বেশি ভালোবাসো তুমি? বুলার সন্দেহ দূর হয় না। সে নিশ্চিত হতে চায়। আমাকে

ভালোবাসো না বন্ধুকে? অতর্কিত এবং আচমকা প্রশ্ন। এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াব জন্য প্রস্তুত ছিল না মীনাক্ষী। প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও অতি সহজ নয়। বুলা ছোট্ট। সুতবাং তার মন যুগিয়ে উত্তবটা দেওয়াই ঠিক। কিন্তু সঠিক গোলমাল শুরু হবে তখনই। অভিমান করবার আর একটি সুযোগ পাবে সঞ্জয। সে-ই তখন অবুঝ শিশু হয়ে পড়বে। আসল শিশুব থেকেও এক ডিগ্রি ওপবে যাবে অভিমানের দিক দিযে। আর সঞ্জয়কে বেশি ভালোবাসার কথা তো বুলাকে কোনওমতেই বলা যায় না। তাহলে? মীনাক্ষী অন্যভাবে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু কবলো। সে এতো সিরিয়াস হচ্ছে কেন? কথাটা তো তা নয়। শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তবও হবে ওই রকমেবই। বললো, তুমি তো খুব ভালো মেয়ে। তোমাকেই বেশি ভালোবাসি।

বন্ধু ভালো না? ছোট্ট বুলার ছোট্ট প্রশ্ন।

একেবারেই না। সারা মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলতে মীনাক্ষী ভ্রূ-যুগলকে কুঁচকে নীচের ঠোঁটখানি সামান্য উল্টে এমন একটি ছবি এঁকে সঞ্জযেব দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলো, তাতে ভালোলাগা এবং ভালোবাসার কথা না-বলেও অনেক বেশি কবে যেন বলা হলো।

কোমল বিছানায় শুয়ে শুয়ে পলকহীন চোখে দেওয়ালে টাঙ্গানো সঞ্জয়েব ছবিব দিকে চেয়ে রইলো মীনাক্ষী। যদিও ছবিটা সুন্দর উঠেছে, কিন্তু ছবিব চেযে আসল সঞ্জয়ই বেশি সুন্দর। মীনাক্ষী বারবার ছবিটা দেখছে। সকালবেলা সঞ্জয় দাদা-বৌদি আর বুলাকে নিয়ে ভাটকল লেক দেখতে গেছে। মীনাক্ষীবও যাবাব কথা ছিল। কিন্তু সে যাযনি। শরীরটা খাবাপ লাগছে। জ্বর-জ্বব ভাব। গা-হাত-পা ব্যথা। সঙ্গে মাথা ধরা। এব জন্য অবশ্য ডাক্তাব ডাকতে হয়নি। কেন-না সঞ্জয় নিজেই একজন ছোটখাট ডাক্তার। এই সাত-আট বছব ওষুধের মধ্যে কাটিয়ে সে এখন নিজেই বলে দিতে পাবে কোন রোগের কি ওষুধ। আর এ তো সামান্য ব্যাপার। সঞ্জয় বেশ কিছু ট্যাবলেট দিযে গেছে। দুটো মাত্র খেযেছে। বাকিগুলি পড়ে আছে টেবিলের ওপর। মাথাধবাটা ইতিমধ্যে ছেড়েছে। এতোক্ষণ সাবা মাথা ভার ভার লাগছিল। এবারে বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছে। বেলা দশটায় আব দুটো ট্যাবলেট খাবে। ও-পাশেব দেওযালে গিয়ে মীনাক্ষীব চোখ দুটি স্থিব হলো। সঞ্জয়ের বাবা-মা'ব ফটো। দুজনেব মুখেই প্রশান্ত হাসি। মীনাক্ষী বেশ কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ কেন জানি একটি কথা মনে হলো তাব। এই মুহূর্তে যদি সত্যি সত্যিই ওঁরা এসে পড়েন! নিতান্তই অসম্ভব চিন্তা। সুদূব পাঞ্জীম থেকে ঠিক আজকেই এই মুহূর্তেই এসে উপস্থিত হবেন এটা ভাবতে না-পারলেও আসাটা যে একেবারেই অসম্ভব তা তো নয়। আসলেও আসতে পারেন। তখন মীনাক্ষীর একার পক্ষে অবস্থা সামাল দেওযা বীতিমতো কঠিন হয়ে পড়বে। দুজনকেই বড়জোব টিপটিপ করে দুটো প্রণাম কবতে পাববে কিন্তু সঞ্জয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই মুখ ফুটে বলতে পারবে না। তাব মাথায় সিঁদুর থাকলে না-হয় আলাদা কথা ছিল। ওবা অনুমান করে নিতেন তাদের ছেলে না-জানিয়ে বিয়েব কাজটা সেরে নিয়েছে। এক্ষেত্রে মীনাক্ষী শুভ্র সীমন্তিনী। সুতরাং পরিস্থিতিব জটিলতা বাড়বে আবও। ওয়াকরদে কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ছোট ত্রিকোণ টেবিলেব ওপব কফির কাপটি রেখে মীনাক্ষীব শিয়রের কাছে এগিয়ে দিল। বললো, তবিয়ত কি একটু ভালো বুঝছো মেমসাব?

হ্যাঁ, তাচ্ছিল্যের সুবে মীনাক্ষী কপট অভিনয়ে বললো, তোমার বাবুজি যখন ডাক্তার তখন তার ওষুধে কি ভালো না-থেকে পারি? শুধু মাথা ধরাটাই কমেছে। আর কিছু সারেনি। ও-সব কথা শুনতে ওয়াকরদে রাজি নয়। ডাক্তারের ওপর যদি রোগীব আস্থা না-থাকে তাহলে রোগ সারা কঠিন। ওয়াকরদে তাই বললো, ও-কথা বোলো না মেমসাব। বাবুজির দাওয়াই-এ অসুখ সারে না এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। সে-বারে বাবুজির মা এখানে এসে অসুখে পড়লেন। বাবুজি তিন রোজ নিজে দাওয়াই দিল অমনি মা ভালো হয়ে উঠলেন। বাবুজি সত্যি সত্যি ডাক্তার নয়—তবে ডাক্তারের ওপরে। একটু থেমে ম্লান হাসলো ওয়াকরদে। বাবুজিব ওপর শুধু শুধু গোঁসা করে কি হবে, সবে তো তুমি দাওয়াই খেলে একটা দিন যাক। তবে তো ভালো হবে! এবারে হেসে দিল মীনাক্ষী। ওয়াকরদেকে আর দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ঠিক নয়। মিষ্টি সুরে বললো,

সত্যি! এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ক্রমশ ভালো হয়ে উঠেছি। মাথাধরাটা ছেড়েছে। গা-হাত-পায়ের ব্যথাটাও কমেছে তুমি ঠিকই বলেছো, তোমার বাবুজি ডাক্তার না-হয়েও সত্যি সত্যিই সে ডাক্তার। মীনাক্ষীর হাসি ভরা মুখের দিকে চাইলো ওয়াকরদে। শুধুমাত্র কথা শুনেই সে বিশ্বাস করলো না, সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্যই ওর মুখের দিকে চেয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালো। না, মেমসাব এবারে আর মিথ্যে বলছে না। চোখ-মুখের খুশির উজ্জ্বলতাই সে-কথা স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়। নিশ্চিত হয়ে ওয়াকরদে একটু সাহস সঞ্চয় করলো। এই মুহূর্তে কথাটা জানাবে কিনা তাও মনে মনে ভেবে নিল একবার। মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। বললো, মেমসাব, তুমি এখানে থাকবে! এই বাড়িতে! বাবুজি তো তোমাকে খুব পেয়ার করে। মন-প্রাণ দিয়ে কথাটা শুনলো মীনাক্ষী। অহেতুক লজ্জায় সে রাঙা হলো না। কেন-না তাদের দুজনের সম্পর্ক ওয়াকরদের অজানা নয়।

পেয়ার করলেই বুঝি থাকতে হয়? মীনাক্ষী অর্থপূর্ণ হাসলো। ওয়াকরদের আসল বক্তব্য কি, সেটাই সে ওর মুখ থেকে শুনতে চায়। নিজে এই মুহূর্তে কিছু বলতে চায় না।

বাবুজি তোমাকে শাদি করবে! স্নিগ্ধ গলায় ওয়াকরদে বললো, তুমি এই বাড়িতে থাকবে। আমি আর রামসুভগজি তোমাদের বিলকুল কাজ করে দেবো। তোমাকে কোনও কাজে হাত লাগাতে দেবো না। তোমার একটাই কাজ—তুমি শুধু বাবুজিকে পেয়ার করবে।

তাতেই তুমি খুশি হবে?

জি মেমসাব। বহুত খুশি হবো।

কিন্তু.......মীনাক্ষী থামলো। কথাটা বলতে তার কেমন যেন বাধো বাধো লাগছে। তার মনে যে-প্রশ্ন জেগেছে সেটা তো সত্যও হতে পারে। তাহলে? ওয়াকরদে একান্ত মনে যে ছবি এঁকেছে অর্থাৎ তার সামনে তুলে ধরেছে, সে-ছবি তো মীনাক্ষী অনেক আগেই এঁকেছে। এঁকেছে ভালোবাসার রং-তুলি দিয়ে। কিন্তু আঁকাই তো সব নয়। প্রয়োজন স্ব কৃতির। মীনাক্ষী ম্লান গলায় বললো, তোমার বাবুজির মা-বাবা যদি আমাকে পছন্দ না-করেন!

এ ঝুট্ মেমসাব। ওয়াকরদে এবার একটু হাসলো। তোমাকে বাবা মায়ের জরুর পসন্দ হবে। তুমি বহুত খুবসুরৎ মেমসাব। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

বাবুজির মা'র কথা আমি জানি। মাতাজি কি বলেন শুনবে? বলেন, আমার পসন্দ করা মেয়েকে যদি তোর শাদি করতে মন না-চায়, তাহলে তুই তোর পসন্দ করা মেয়েকেই শাদি কর। আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। জানো মেমসাব, বাবুজি আর মাতাজিকে দেখলে, তাদের বাতচিত শুনলে তোমার মনে হবে মা আর ছেলে নয়—মনে হবে দোস্ত। বন্ধু! ওয়াকরদেঁ খুশির ঢেউ তুললো। আর বাবুজিও উত্তর দেয় তেমনি। বলে, আমি যাকে পসন্দ করবো, তাকে দেখতে যদি বাংলার পাঁচের মতো হয়? ওয়াকরদে হাসতে হাসতে থেমে পড়লো। যেন হঠাৎ তার মনে পড়েছে। এই মুহূর্তেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ভ্রূ-যুগল কুঁচকে মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। আচ্ছা মেমসাব, বাংলার পাঁচ কি? ওয়াকরদের জিজ্ঞেস করার ধরন দেখে উত্তাল হাসিতে ভেঙে পড়লো মীনাক্ষী। হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, তার মানে দেখতে ভালো নয়। ভীষণ খারাপ। উপলব্ধি করবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ওয়াকরদে। বললো, আমিও মানেটা এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। ওয়াকরদে ওখানেই থামলো না। বললো, মাতাজি আরও কি বলেছেন জানো? বলেছেন, আমি চাই তুই একটা শাদি কর এবারে। ভালো-মন্দ, মাদ্রাজি, গুজরাটি আমি ও-সব কিচ্ছু মানি না। আমার কোনও বাছবিচার নেই। তোর পসন্দ হলেই হলো। সেখানে বাংলার পাঁচ কেন দশেও আমার আপত্তি নেই। তাহলে মেমসাব—ওয়াকরদে বিজয় হাসি হাসলো। তোমাকে তো বাবুজি সবার থেকে জ্যাদা পসন্দ করে।

সবার থেকে? একটু আশ্চর্য লাগলো মীনাক্ষীর। তার মানে আর কেউ আছে নাকি? নিশ্চয়ই তাই। নয়তো ওই 'সবার থেকে' কথাটা ওয়াকরদে শুধু শুধু বলতে যাবে কেন?

জি মেমসাব। সবার থেকে। নীচের ওই নীনা মেমসাব বাবুজির সাথে বাতচিত করতে আসে।

রাখী মেমসাব আসে। কিন্তু --

কে? কে আসে বললে ওয়াকরদে? সহসা মীনাক্ষীর সমস্ত মুখখানা কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠলো। বুঝি-বা একটু রুক্ষ। ওয়াকরদে তার কথা শেষ করলো, কিন্তু মেমসাব, নীনা ও রাখী মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলার চেয়েও বাবুজি তোমার তসবীর দেখতেই বস্তুত সময় কাটিয়ে দিতো।

ওয়াকরদে চলে গেলে ভাবনায় পড়লো মীনাক্ষী। এ ভাবনা নতুন। এ-চিন্তা নতুন। নীনা ও রাখীর সঙ্গে সঞ্চয়ের কথা হয়। গল্প হয়। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। নিতান্তই সাধারণ। মীনাক্ষী বোঝে তা। তবুও মনের কোণে কাঁটার মতো বিঁধছে। সেই ব্যথায় ক্ষত-বিক্ষত না হলেও মীনাক্ষী একটা অস্বস্তি বোধ করছে। তার চিন্তার আয়নায় প্রথমেই ছায়া পড়লো যার সে ওই নীচের পাঞ্জাবী মেয়েটা। নীনা রণধাওয়া। মেয়েটির মুখশ্রী সুন্দর নয় ঠিক কথা, কিন্তু দেহের সৌন্দর্যের আকর্ষণ অবহেলা করা যায় না। আর সঞ্চয়ের বয়সী ছেলেরা সেই আকর্ষণে সাড়া না-দিয়ে পারে না। নীনাকে সে অনেকবার দেখেছে। ওর নিটোল স্বাস্থ্যের গড়ন দেখে তার নিজেরই ভালো লেগেছে। সেক্ষেত্রে একজন পুরুষ মুগ্ধ হবে, সেটা আশ্চর্যের কি? কিন্তু সঞ্চয় কি ওকে ভালোবাসে? তার সঙ্গে সঞ্চয়ের আলাপ হয়েছে এই তো সেদিন। এখনও তিনমাস পূর্ণ হয়নি সেই আলাপের আয়ু। নীনা নিশ্চয়ই তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে রয়েছে। অর্থাৎ, সঞ্চয় নীনার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে প্রথমেই এবং এটাও সে তখন নিশ্চয়ই জানতো না যে দমদমের মামা বাড়িতে মীনাক্ষী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হবে। সুতরাং নীনার মতো একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েকে দিনের-পর-দিন সঞ্চয় উপেক্ষা করে থেকেছে—এটা সত্যি হলেও ভাবতে কেমন যেন সন্দেহ জাগে! সত্যিই একটু একটু করে সন্দেহ জাগছে। সঞ্চয় তাকে আদর জানিয়েছে। সেই আদরের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ কি নীনাও পায়নি? না-পাওয়াটাই ভাবা যায় না। সেটা যেন অসম্ভব। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেন-না মীনাক্ষী দু'দিনের জন্য এখানে এসে তার মধ্য থেকেও যদি সেই ক্ষণিক উত্তাপ মুহূর্তে তৈরি করে নিতে পারে সেক্ষেত্রে সঞ্চয় ও নীনার পক্ষে নীরব অধ্যায়ের জাল বোনা এমন কিছু কঠিন নয়। সেটা বরং আরও সহজ। ওদের মধ্যে ব্যবধান মাত্র কয়েকটি সিঁড়ি। আর সময় তো ওদেরই অধীনে। যে-কোনও মুহূর্তে কাছাকাছি হতে সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। দুটি ছবি ভেসে উঠলো এই মুহূর্তে মীনাক্ষীর চোখে। সেদিন বিকেলের পড়ন্ত বেলা। এমনিতেই ছায়া নেমেছে। কিন্তু বাগানের দু'পাশের দীর্ঘকায় পাইন ও ঝাউবীথির যে-মেলা বসেছে তাতে মাঝের লনটুকু যেন আরও বেশি ছায়া ভরা। একা বসেছিল নীনা গার্ডেন চেয়ারে। একটু হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিমায়। পায়ের নগ্ন ফর্সা পাতা দুটি মেলে ধরেছিল সামনের আর একটি চেয়ারের কোলে। একমনে উল বুনছিল। সঞ্চয় ফিরেছিল তখনই। গাড়ি থেকে নামতেই নীনা ডেকেছিল সঞ্চয়জি। কাছে ডেকে নীনা কি বলেছিল সে-কথা মীনাক্ষী শুনতে পায়নি। সে শুধু বারান্দা থেকে এইটুকুই দেখেছিল, সেই ডাকের সাড়া দিতে সঞ্চয় কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নীনা হাতের বোনা সোয়েটারটি সঞ্চয়ের বুকের উপর মেলে ধরলো। অর্থাৎ মাপ নিল। হয়তো ওর কোনও আত্মীয়ের জন্য ওটা কিন্তু মাপটা সঞ্চয়ের হওয়া চাই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিন এ-দৃশ্য দেখে হেসেছিল মীনাক্ষী। হেসেছিল, সোয়েটার বোনা উপলক্ষ্য করে একটি মেয়ের একজন পুরুষের সঙ্গে মিশবার আদিখ্যেতা দেখে। কিন্তু আজকে, এই মুহূর্তে সেদিনের মতো হাসতে পারছে না মীনাক্ষী। ওই দৃশ্যের মধ্যে সে সত্যের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছু পেল-কি-পেল না—সেটা কথা নয়। মন যে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। আর একদিন। সেদিনও বিকেলবেলা। কফি তৈরি করছে মীনাক্ষী। সঞ্চয়কে কফি দেওয়ার জন্য খুঁজে বেড়ালো সারা বাড়ি। কোথাও না-পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছাদেতেই আবিষ্কার করলো তাকে। ওই দুটি দৃশ্য থেকে এ-কথা কখনোই স্পষ্ট হয়-না যে সঞ্চয়ের মন নীনার প্রতি দুর্বল। সুতরাং নিজের মনে একা একা না-জেনে না-শুনে ভেবে ভেবে ক্লান্ত হওয়ার চেয়ে মনটা আরও উদার করাই ভালো। আর যাই হোক সন্দেহের কালিমা লাগে না তাতে। সবই বোঝে মীনাক্ষী। কিন্তু এটা অস্বীকার করবে কেমন করে যে সে একজন মেয়ে। চিন্তার আয়না থেকে সরে গেল নীনার ছবি। ভেসে উঠলো রাখী। রাখীকে সে দমদমেই দেখেছে। চিনেছে। এটুকুও জেনেছে সঞ্চয় তাকে

মন দিতে পারে না। সুতরাং রাখী যে এই বাড়িতে আসে, সঞ্চয়েব সঙ্গে গল্প করে, এটা সম্পূর্ণ এক তরফের। সঞ্চযের তাতে বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। একটি মেয়ে বাড়িতে এলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেটা ভদ্রতার বাইরে। সেই কারণেই সঞ্চয় গল্প করে রাখী এলে। এই পর্যন্ত মীনাক্ষী বেশ সরল ভাবেই চিন্তা করলো। কিন্তু একটা কথা! যদি তাই হবে, সঞ্চয় তবে রাখীর কথা তার কাছে কেন বলেনি? রাখীর কথা অনায়াসেই সে বলতে পারতো। যেহেতু মীনাক্ষী তাকে চেনে। আর সঞ্চয় নিজে তাকে অপছন্দ করে। এই রাখীকে কেন্দ্র করেই দমদমে তাদের মধ্যে একটু আলোচনাও হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাখীব কথা ওঠাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু সেই স্বাভাবিক নিয়মের পথ ধরে কথা প্রসঙ্গে সঞ্চয় একটিবারও রাখীব নামটা পর্যন্ত উচ্চাবণ করেনি। এটা কি ইচ্ছে করে চেপে যাওযার লক্ষণ নয়? নাকি সঞ্চয একসঙ্গে সকলের সাথেই লটাবীর মতো প্রেমের খেলায় মেতেছে। যে-কেউ একজন উঠলেই হলো। না। এ-সব কথা আব ভাববে না মীনাক্ষী। ভাবতেও কষ্ট লাগে। অন্য ছবি আঁকল মীনাক্ষী। সঞ্চয তেমন ছেলেই নয। অহেতুক সে এতোক্ষণ ওব সম্বন্ধে মন-গড়া কাহিনী ভেবে মরেছে। তেমন ভাবে ভাবলে তো অনেক কিছুই ভাবা যায। সত্য-মিথ্যার বিচারটা তাহলে থাকছে কোথায়? দমদমেব দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালো মীনাক্ষী। সেই দিনগুলিতে সঞ্চয় তার কাছে যে-ভাবে ধরা দিয়েছে, ধরা পড়েছে মীনাক্ষীর চোখে কাজল পডার মতো এখনও তা লেগে রয়েছে। বিশ্বাসের উৎস তার ওইখানেই। সঞ্চয তার সঙ্গে দুটি দিন মিশবার জন্য এগিয়ে আসেনি। সেটা ওব প্রতিটি পদক্ষেপে নিঁখুত ভাবে ধরা পড়েছে। রাখীব কথা বলেনি বলে একটা যে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে সেটা নিতান্তই বাজে ধারণা। আসলে রাখীব ব্যাপারটাকে এতোটুকু প্রাধান্য দিতেও চায়নি। বলবার মতোও মনে করেনি। এমনটাও তো হতে পারে! শুধু শুধু সঞ্চয়কে সন্দেহ কবা ঠিক নয়। সন্দেহের বিষ পান করে মীনাক্ষী একজনকে আসামীর কাঠগোড়ায় কিছুতেই দাঁড় কবাতে পারবে না। তার কাছে সব কিছু পরিষ্কার। নীনা ও রাখীর চিন্তা শেষ করে মীনাক্ষী একটি কথাই অনুভব করলো। সঞ্চয়কে সে সত্যিই ভালোবাসে। মনেব অ্যালবামে একটি মিষ্টি ছবি ধরে রাখলো। সঞ্চযের স্ত্রী হবে সে। সঞ্চয়ের মা-বাবা, তারও মা-বাবা হবে। চাকরি শেষে বাবা-মাকে নিয়ে চলে আসবেন এখানে। থাকবেন তাদের কাছে। সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে কি আনন্দটাই না হবে? একটি সুখী পরিবার। সঞ্চয়ের সঙ্গে তার আলাপ যদিও তিনমাসের কিন্তু এটুকু মীনাক্ষী বুঝতে পেরেছে, ওকে নিয়ে সে কক্ষনও অসুখী হবে না। সঞ্চয অত্যন্ত বাধ্যের। হ্যাঁ, সঞ্চয যথেষ্ট মন বুঝে চলতে পাবে। সঞ্চয় তার প্রতিটি কথা শুনবে। আর কথা শোনার পুরস্কার স্বরূপ মীনাক্ষী ওকে সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখবে তার গভীর ভালোবাসা দিয়ে। নিবিড় উষ্ণ উত্তাপ দিয়ে। বিবাহিত জীবনের ছবিটা কল্পনা করে একটু হাসলো মীনাক্ষী আপন মনে। সেই হাসির রেখা স্পর্শ করলো তার দুই ঠোঁটে। সঞ্চয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তাব করে ওকে সম্পূর্ণ নিজের অধিকারে ধরে রাখবে। মীনাক্ষী শুধু ভালোইবাসবে তা নয়, শাসনও করবে। ধমক দেবে। প্রয়োজন হলে বকবেও। কিন্তু সব কিছুরই ওপরে থাকবে তার নিটোল ভালোবাসা। যার ফলে সঞ্চয় যেন কোনও সময়ের জন্যই তার বিরুদ্ধে যেতে না-পারে। সে-বকমটা মীনাক্ষী হতেও দেবে না। মন তার অবশ্যই সহানুভূতিতে ভরা থাকবে। একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেই অহেতুক মনোমালিন্যেব দেওয়াল তুলবে না। তাকে শুধু একবার বলে যেতে হবে, অমুক কাজ আছে। বাড়ি ফিরতে তাই একটু দেরি হবে। তাহলেই হলো। দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি। ভেতরের বারান্দা থেকে ওয়াকরদে ড্রইংরুমের দিকে যাচ্ছিলো। মীনাক্ষী ডাকলো ওকে, ওয়াকরদে শুনে যাও।

জি মেমসাব।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তোমার সঙ্গে গল্প করবো। কিছুক্ষণ আগে ওয়াকরদে শেষ যে কথাটি বলে গিয়েছিল সেটাই মনে পড়লো মীনাক্ষীর। "নীনা ও রাখী মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলার চেয়েও বাবুজি তোমার তসবীর দেখতেই বহুত সময় কাটিয়ে দিতো।" ওই কথাটির সত্য-মিথ্যা একটু যাচাই করবার জন্য মনটা উন্মুখ হয়ে উঠলো। রাখীকে সে কোনও সময়েই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। কিন্তু নীনার প্রতি সঞ্চয়ের মনের খবরটা জানতে ইচ্ছা করে। তাহলেই প্রাথমিক

ভাবে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। মুখে হাসি টেনে মীনাক্ষী যেন নিতান্তই কথা প্রসঙ্গে বলার মতোই বললো, আচ্ছা ওয়াকরদে, নীচের নীনা মেমসাব তো খুব সুন্দর। তা তোমার বাবুজি তাকে শাদি করলেই পারে?

শাদি! ওয়াকরদে হালক মেজাজে বিজ্ঞের মতো হাসলো। মেমসাব, ওই একটি কথা সবাই বলে। মাতাজিও একবার বলেছিলেন। মাতাজি তখন এখানে। অসুখ করেছিল তাঁর। নীনা মেমসাব প্রত্যেক দিন আসতো দেখতে। মাতাজিকে দেখতো, নিজে ডাক্তারী পড়ে তাই কিছু উপদেশ দিতো, বাবুজির সঙ্গে গল্প করতো। মাতাজি তখন ভেবেছিলেন, বাবুজি বোধহয় নীনা মেমসাবকে পেয়ার করে। সেই কারণেই বাবুজি অন্য কাউকে শাদি করতে চায় না। শাদির কথা বললে এড়িয়ে যায়। তাই মাতাজিও একদিন বলেছিলেন, তুই যদি নীনাকে শাদি করতে চাসতো বল, আমার আপত্তি নেই বাবা। তা মেমসাব তুমিও সেই একই কথা বললে।

তোমার বাবুজির আপত্তিটা কীসে? মীনাক্ষী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ভেতরকার সব কথা জেনে নিতে চায়। এটা সে নিশ্চিত জানে, সঞ্চয়ের মনের খবর ওয়াকরদের নখদর্পণে।

মেমসাব, আপত্তি আছে। ওয়াকরদে প্রশান্ত হাসলো। যেন কতো অভিজ্ঞ সে। কতো পরিণত তার চিন্তাশক্তি। ওয়াকরদে বলতে শুরু করলো নীনা মেমসাহেবের অগুনতি দোস্ত। বেশির ভাগই লেড়কা! সকলকে নিয়ে পিকনিকে যাবে। বেড়াতে যাবে। হইহুল্লড করবে, নাচ-গান করবে। সেদিন কি হয়েছিল জানো না? তুমি তখন আসনি। নীনা মেমসাব তার তিনজন লেড়কা দোস্তকে নিয়ে নীচের ওই বাগানে গান বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছিল। আমি আমার কাজ করছিলাম। বাবুজি আমাকে ডাক দিল। বললো, ওয়াকরদে সিনেমা দেখবি? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। বাবুজি তখন বাগানের দিকে দেখিয়ে বললো, মেয়েটার কপালে অনেক দুঃখ আছে বুঝলি ওয়াকরদে। ওই যে তিনটি ছেলেকে আজ নাচতে দেখছিস আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে তাদের আর একটিবারের জন্যও দেখতে পাবি না। নিত্য-নতুন বন্ধু জুটছে। এতো বন্ধু জোটাতেও পারে। আমি উত্তরে বলেছিলাম, নীনা মেমসাহেবের দোস্ত ভাগ্য ভালো বাবুজি।

হ্যাঁ ভালো। যে ওকে শাদি করবে কেবলমাত্র সেই বুঝবে কেমন ভালো। বন্ধু পাল্টানোর ওর যা অভ্যাস দেখবি স্বামী পাল্টানোও ওর একটা নেশা হয়ে দাঁড়াবে। আসল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো মীনাক্ষী। এবারে তাই সহজ প্রশ্ন করলো, কই এখন তো তেমন হইচই করতে দেখি না?

সামনেই যে পরীক্ষা। তাই। ওয়াকরদের কাজ আছে। সে অনুমতি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে এলো। ডাক দিল, মেমসাব—

জি বাবুজি। কথাটা বলেই ছন্দ তুলে ঝর্ণাধারার মতোই হাসলো মীনাক্ষী। ওয়াকরদেকে আজ তার ভীষণ আপন মনে হচ্ছে। একান্তই আপন! ওয়াকরদে তার সকল সন্দেহের মেঘকে উড়িয়ে দিয়েছে। ওর কাছে সে কৃতজ্ঞ। ওয়াকরদে হাসলো। আনন্দের হাসি। বললো, তুমিও মেমসাব বাবুজির মতো কথা বলতে পারো। বাবুজিও মাঝে মাঝে আমাকে এমনি ভাবে ডাকে। যাক গিয়ে, ওয়াকরদে কাজের কথায় এলো। এইমাত্র ধোবী এসে বাবুজির জামা-প্যান্ট দিয়ে গেল। আর এই টাকাটাও দিয়ে গেল। মীনাক্ষীর হাতে টাকাটা দিয়ে ওয়াকরদে আবার বললো সাতান্ন টাকা। ওটা নাকি বাবুজির প্যান্টের পকেটে ছিল। প্রথমেই যে-কথাটি মীনাক্ষীর মনে হলো তাহলো জামা-কাপড় কাচে যে-লোকটি সে কতোখানি সৎ হতে পারে, যে এতোগুলি টাকা হাতে পেয়েও ফেরত দিয়ে যায়! একজন গরিব ধোবীর পক্ষে সাতান্নটি টাকা ফেরত দেওয়া কম নির্লোভের কথা নয়। লোকটি যথার্থই সৎ! মীনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো, ধোবী কি চলে গেছে? ওকে ডাকো তো একবার। শোনামাত্র বারান্দার দিকে ছুটে গেল ওয়াকরদে। বাড়ির সিংহ-দরজা পার হয়ে লোকটা তখন রাস্তায় পা দিয়েছে। ওয়াকরদে গলা ছাড়লো, এই লছমন ভাইয়া, উপ্পর আও। মেমসাব বুলায়া। ঘর থেকে মীনাক্ষী বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। একটু বাদেই লোকটা এসে উপস্থিত হলো। খাটো করে ধুতি পড়া। গায়ে ফতুয়া। মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুল। মুখে ছোট ছোট দাড়ি। বয়স প্রায় পঞ্চাশের মতো হবে।

মীনাক্ষীকে দেখেই হাত দুটি এক করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললো, নমস্তে মেমসাব।

নমস্তে। মীনাক্ষী ওকে সাতটি টাকা দিয়ে বললো, এটা তোমার পুরস্কার। তোমার সততার পুরস্কার। লক্ষণ আর একবার মীনাক্ষীকে নমস্কার জানালো। তাকালো ওয়াকরদের দিকে।

এক বাত শুন যা ওয়াকরদে। ছেলেটা লক্ষণের দিকে এগিয়ে যেতেই মীনাক্ষী আর সেখানে দাঁড়ালো না। সঞ্চয়ের বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো। উপস্থিত এই ঘরখানায় দাদা আর বৌদি থাকছে। সুসজ্জিত ঘরখানির ওপর চোখ বোলালো সে। যেন এই প্রথম দেখছে। পায়ে পায়ে ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের আসার ফলে সঞ্চয়কে এই ঘরেই থাকতে হচ্ছে। টেবিলের ওপর একটি বইয়ের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা রাখতে গিয়েও রাখলো না। নিজের আঁচলে বেঁধে রাখলো। ফিরে আসুক সঞ্চয়। মীনাক্ষী নিশ্চয়ই আজ ওকে একটু শাসন করবে। জামা-প্যান্ট ধুতে দেবার সময়ে কেন একবার পকেট দুটি দেখে নেয় না? এই অসাবধানতার জন্য ক্ষতি তো তার নিজেরই হবে। একটি দুটি নয়—সাতান্নটি টাকা। তাছাড়া হলোই-বা একটি-দুটি? একটি-দুটি টাকা নয়? লক্ষণ নেহাত ভালোমানুষ। তাই ফেরত দিয়েছে। কিন্তু সকলেই যে ওই সামান্য লোকটির মতো অসামান্য লোভ সংবরণ করে উদার হবে, সৎ হবে, এমন তো কথা নেই? মীনাক্ষীর আরও মনে হলো, এই টাকার কথা সঞ্চয়ের নিশ্চয়ই মনে নেই। মনে থাকলে একবার অন্তত খোঁজ পড়তো। কিন্তু সে-রকম কিছুই হয়নি, অর্থাৎ খোঁজ পড়েনি। কেন-না এই জামা-প্যান্ট কাচতে গেছে চারদিন হলো। ওই কটি দিন ধরে মীনাক্ষীরা তো এখানেই। সুতরাং খোঁজ পড়লে সে জানতে পারতো।

ওয়াকরদে ফিরে এলো। মীনাক্ষীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখে তার সতেজ হাসি। অতো হাসছো কেন?

লছমন ভাইয়া তোমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, সায়েবের মেমসাব বুঝি? আমি কি উত্তর দিলাম জানো? ওয়াকরদের চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও যা বলবে মীনাক্ষীর তা জানা। ঠোঁটে হাসির রেখা নিয়ে ধমক লাগালো, ওয়াকরদে তুমি এবারে পালাও তো এখান থেকে।

গোঁসা কোরো না। লছমন ভাইয়াকে বললাম এখনও হয়নি। তবে জলদি মেমসাব বনবে বাবুজির।

ভাটকল লেক দেখে ওরা ফিরে এলো। হরিয়ানা রাজ্যের মধ্যে ফরিদাবাদ টাউনের এই লেকটি সঞ্চয় অনেকবার দেখেছে। তাই সে নীরব। কিন্তু প্রথম দেখার আনন্দে এবং লেকের সৌন্দর্যে মলয় ও শোভনার মন-প্রাণ পূর্ণ। মলয় তো হইচই বাধিয়ে দিল ছেলেমানুষের মতো।

মীনাক্ষী বেছে বেছে আসল দিনটিতেই জ্বর বাধিয়েছিস! যদি দেখতিস না! তুই তো আর্টসের ছাত্রী। একটু-আধটু সাহিত্য করিস। তোর আরও ভালো লাগবে। আমারই এতো তাড়াতাড়ি চলে আসতে মন চাইছিল না। নেহাত রোদটা এমন চড়ে গেল যে এই শীতের সময়েও ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। অবশ্য গাছের ছায়া ছিল। কিন্তু সেটা মাত্র একদিকে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর দাদা-বৌদি বুলাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে। মীনাক্ষী নিজের ঘরে শুয়ে রয়েছে বটে কিন্তু ঘুম আসছে না। তার এই ঘরটি বড়ো বেডরুম আর ড্রইংরুমের ঠিক কোণাকুণি ভাবে মাঝখানে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো মীনাক্ষী। বাঁ দিকের ঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। দরজার ভারী পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, দাদা-বৌদি ঘুমাচ্ছে। মীনাক্ষী এবারে পায়ে পায়ে ড্রইংরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে দেখলো, ডবল সোফাটার ওপরে সঞ্চয়ও পরিত্রাণে ঘুমাচ্ছে। পা টিপে টিপে মীনাক্ষী ঘরের ভেতরে ঢুকলো। দাঁড়ালো সঞ্চয়ের শিয়রে গিয়ে। ওর মুখের দিকে পলকহীন চোখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে ওর মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুলগুলি বুলিয়ে দিল। না, ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হলো না। সঞ্চয় ঘুমাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছিল মীনাক্ষী। অশান্ত ভাবে মুরগি ডাকার মতো কঁকিয়ে উঠলো ফোনটা। সঞ্চয়ের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে নিজেই টেলিফোনটা তুলে নিল—হ্যালো। ওপার থেকে কথার সুর ভেসে এলো। কে? ওয়াকরদে? আমি রাখী মেমসাব বলছি। তোমার বাবুজির অফিসে ফোন করে জানতে পারলাম ছুটি নিয়েছে। তা বাড়িতেই আছে তো নাকি বেরিয়েছে? মীনাক্ষী ভাবলো একটু। সঞ্চয় ঘুমাচ্ছে। ওকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলাটা ঠিক নয়। সেই সকালে বেরিয়ে ফিরেছে একটু

আগে। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমানো মাত্রই ফোন এসে হাজির হলো। সঞ্চয়কে ডেকে তুলবার ইচ্ছা মীনাক্ষীর বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু কৌতূহল দানা বাধলো। কি বলবে রাখী সঞ্চয়কে? হৃদয়ের উত্তাপ জানাবে? ভাবনার মধ্যে আর ডুবে থাকলো না মীনাক্ষী। রাখীকে ফোন ধরতে বলে সঞ্চয়কে ডাকলো, শুনছো? তোমার ফোন— ফোনের কল্যাণে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার ফলে বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে সঞ্চয় টেলিফোন যন্ত্রটির দিকে চেয়ে রইলো। অসন্তুষ্ট ভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে আবার ফোন করলো? সঞ্চয়ের চোখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মীনাক্ষী। মুখে একটু গাম্ভীর্য বজায় রেখে ভারী গলায় উচ্চারণ করলো, রাখী।

মেয়েটা কেন যে এতো বিরক্ত করছে.......... বলতে বলতে সঞ্চয় এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে মীনাক্ষীর দিকে তাকালো। সে তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। মীনাক্ষী বললো আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

কী ছেলেমানুষি করছো? কথাটা বলেই সঞ্চয় ফোন ধরলো। হ্যালো—হ্যাঁ সঞ্চয়ণ ঘোষ বলছি। বেশ কিছুটা সময় ধরে সঞ্চয় ফোনের ওপারের কথা শুনলো। মাঝেমধ্যে কয়েকবার হ্যাঁ-না ইত্যাদি জানালো। একবার বললো, আমার পক্ষে আজ অসম্ভব। ভীষণ ব্যস্ত আছি। ছেড়ে দিচ্ছি। ফোন নামিয়ে রেখে সোফায় বসলো সঞ্চয়। তাকালো মীনাক্ষীর দিকে।

তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো—মীনাক্ষী বসলে সে আবার বলতে শুরু করলো, রাখী বলছিল, আজ ওদের কলেজের বাৎসরিক উৎসব। নাটক হবে। তাই যেতে বলছিল। অথচ আশ্চর্য! সঞ্চয় একটু থামলো। তোমাকে আমি বলিনি বোধহয়, রাখী আমার এখানে তিন-চারদিন এসেছিল। এমনিতে আসুক। গল্প করুক। আমার আপত্তি নেই। মানুষের সঙ্গেই মানুষ বন্ধুত্ব করে। গল্প করে। একদিন হয়েছে কি জানো? অবশ্য ওর মনের গতি কোন দিকে তা আমি জানতাম। কিন্তু প্রথম থেকেই তো তার সঙ্গে আমি অভদ্র ব্যবহার করতে পারি না! হ্যাঁ যে-কথা বলছিলাম। একদিন রাখী এসে বিয়ের প্রস্তাব করলো। জানতে চাইলো আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি কিনা! মীনাক্ষী এতোক্ষণ চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনছিল। শেষের কথায় মাথা তুললো। সঞ্চয়ের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার দৃষ্টি নিচু করে নিল। অস্ফুট সুরে বললো, ডাক্তারী পড়ছে। মেয়েটা খারাপ কিসে?

খারাপ তো তাকে আমি বলছি না। আমি আমার কথাগুলিই তোমাকে জানাচ্ছি। যাহোক সেদিন আমি মুখের ওপর 'না' বলতে পারিনি ঠিক কথা, তবে ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি সেটা সম্ভব নয়। ঠিক তারপরের দিনই আবার আমাকে টেলিফোন করলো। অফিসে নিজের রুমে বসে কাজ করছিলাম। ফোনে কি বললো শুনবে? সঞ্চয় থামলো। সময় নিল কিছুটা। মীনাক্ষীকেও দেখলো একবার। দৃষ্টি নিচু করে বসে আছে। তোমার নামটা বোধহয় রাখী জানে না। অথবা জেনেও ইচ্ছা করে উচ্চারণ করেনি। ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললো, দমদমের সেই মেয়েটার জন্যই কি আমাকে তোমার বিয়ে করায় বাধা? আমি তাকে উত্তর দিয়েছি, তোমার ধারণা ভুল নয়। মীনাক্ষীর দৃষ্টি আরও নিচু হলো। মাথাটা ঝুকে পড়লো বুকের ওপর। রাখী ওখানেই থামেনি। আরও বলেছে, আর যদি দমদমের ওই মেয়েটিই তোমাকে ফিরিয়ে দেয়? বলতে আমার এতোটুকু লজ্জা নেই সঞ্চয়, তখনও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

মিথ্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। মীনাক্ষী যদি ফিরিয়েই দেয় তাহলে আর কারো কাছেই আমি ফিরে যাবো না।

আমি ভেবে পাচ্ছি না এতো ঘটনার পরেও রাখী কেন আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছে?

হয়তো তোমাকে ভুলতে পারছে না!

দাদা-বৌদি-বুলা এবং সঞ্চয় আবার বেরিয়েছে। এবারে ওরা যাবে সূরজকুন্ড দেখতে। মীনাক্ষী আজ সারাদিনে কোথাও বেরুলো না ওদের সঙ্গে। না-দেখা হলো ভাটকল লেক, না-হলো সূরজকুণ্ড। তবে সত্যি সত্যিই যে ওই দুটো মীনাক্ষীর দেখা হবে না তা নয়। সময় করে পরে একদিন সঞ্চয়ের

সঙ্গে বেরিয়ে দেখা যাবে। মীনাক্ষী সে-সব ভাবছে না। সঞ্চয়ের একটি কথা নিয়েই সে বারবার ভেবে চলেছে—"মীনাক্ষী যদি ফিরিয়েই দেয় তাহলে আর কাবো কাছেই আমি ফিরে যাবো না।" অর্থাৎ সে সঞ্চয়কে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তেমনটা কি ঘটবে? ঘটতে পারে? সেটা কেমন করে হবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পেল না মীনাক্ষী। সঞ্চয়কে ফিরিযে দেবার মতো অকল্পনীয় কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না। নিজের মনের দিক দিয়ে তো বুঝতে পারছে সঞ্চয়কে সে কতোখানি ভালোবাসে। কতোখানি আপন করে তাকে কাছে পেতে চাইছে! তবে এরমধ্যে একটি প্রশ্ন আছে। মীনাক্ষীর চিন্তার মোড় এবারে অন্যদিকে। আসল সমস্যার মুখোমুখি সে। সঞ্চয়কে তার ভালোলাগে সত্যি কথা কিন্তু সেই তো সর্বেসর্বা নয়। তাব একার মতে কোনও কিছুই হবে না। মাথাব ওপরে মা আছেন। কাকা আছেন। আছে দাদা এবং বৌদি। ওঁদের কারও মতামতই অবহেলা কবার মতো নয়। বরং ওঁদেব মতামতের ওপরেই নির্ভব করছে সব কিছু। মীনাক্ষী আপন মনেই একবার ভাবলো ওই সমস্যাব বৈতরণী পার হতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দাদা ও বৌদিকে কি খুলে বলবে সঞ্চয়ের কথা? ওর প্রতি তার মন হৃদয় রাঙ্গানো কৃষ্ণচূড়ায় ছেয়ে রয়েছে সেই কথা! নাকি কলকাতায় ফিরে গিয়ে একেবারে আসল জায়গাটিতেই অর্থাৎ মাকে জানাবে? যদিও সাংসারিক সমস্ত কিছুর ব্যাপাবে দাদাই সব। কিন্তু মায়ের কাছে যে-কথা খুলে বলা যায় দাদাব কাছে তা বলা যায় না। দাদা যতোই স্নেহ করুক ভালোবাসুক না কেন সঞ্চয়ের কথা জানাতে মীনাক্ষীর লজ্জা আসবেই। সেক্ষেত্রে মাকে বা বৌদিকে দিয়ে দাদাকে জানালে ব্যাপাবটা দাঁড়াবে যেন ওদেরই পছন্দ। এর মধ্যে মীনাক্ষী নেই। সহজ ও সরল ভাবে সমস্ত কিছু চিন্তা করলো। উল্টো-পাল্টা হবাব মতো মীনাক্ষী কিছুটা দেখতে পেল না। এমন নয় যে বাড়ির কেউই সঞ্চয়কে দেখেনি। জানে না, চেনে না। দাদা, বৌদি তো সঞ্চয়কে যথেষ্ট স্নেহই করে। মাও খুব পছন্দ করেছেন ওকে। মায়েব একটি কথা মীনাক্ষীর কানে এখনও লেগে রয়েছে ঃ বেশ ছেলেটি। সঞ্চয়কে ভালোলাগার কথা তাদেব বাড়ির প্রত্যেকেরই কথায় এবং ব্যবহাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাকে অপছন্দ করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। মীনাক্ষী নিজের যুক্তিব সমর্থনে একের-পর-এক ভেবে চলে। ভেবে নিঃসন্দেহ হলো এ-ব্যাপারে কারোরই আপত্তি থাকতে পারে না। তবে একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়, তারা ব্রাহ্মণ। সঞ্চযরা নয়। কিন্তু এটা কি একটা বাধা? তাও আজকের দিনে! মানুষ যেখানে কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মুক্তিব পথ খুঁজে পাচ্ছে না সেখানে অতি সামান্য এই ছোট্ট একটি প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে নিজেদের কি আরও সমস্যা সঙ্কুল করে তুলবে? মা-কাকা-দাদার উদার দৃষ্টিভঙ্গির পবিচয় মীনাক্ষী অবশ্য পেয়েছে। এক্ষেত্রেও তাঁদের সেই উদারতার অভাব হবে না বলেই সে ধরে নিচ্ছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বারবাব মনে পড়ছে মীনাক্ষীর। দাদার তখনও বিয়ে হয়নি। কথাবার্তা চলছে। তাদের একজন আত্মীয় একটি মেয়ের খোঁজ দিয়েছিলেন। মেয়ে গ্র্যাজুয়েট! সুন্দরী। বাপের পয়সাও আছে। তবে ওই ব্রাহ্মণ নয। মা তখন বলেছিলেন, তা কি করে হয়? ব্রাহ্মণ মেয়েব কি আকাল পড়েছে এই দেশে? জেনে-শুনে ছেলের বিয়ে কায়স্থের সঙ্গে দিই কি কবে? মীনাক্ষী এখন ভাবছে, তার ক্ষেত্রেও কি মা ওই নিয়মই মেনে চলবেন? তবে একটি জাযগায় সে পুবোপুরি প্রশ্রয় পাবে। মুখ ফুটে শুধু একবার বললেই হয়! তাহলো বৌদির কাছে। যদিও কথাটা জানাতে খুবই লজ্জা করবে, তবে লজ্জাটা কোনও ব্যাপারেই-বা নেই? সব কিছুতেই লজ্জা। আবার মনে না-করলে কোনও কিছুতেই নয়। কথা সেটা নয়। মূল কথা হলো বৌদিকে জানাতে হবে। বৌদি জানাবে দাদাকে। দাদা বলবে মাকে। এমনি করেই ভেতরের কথাটা বাড়ির সকলের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়বে। মীনাক্ষী আড়ালে রইলো আড়ালেই থাকবে।

সঞ্চয়কে ভালোলাগার কথা বৌদির মারফত না-হয় জানানো গেল কিন্তু তার পরের স্তর? মা-কাকা যদি আপত্তি জানান? খারাপ দিকটাই মীনাক্ষী আগে থেকে চিন্তা করছে। তাহলে সে কি করবে? তার সামনে তখন দুটি মাত্র রাস্তা খোলা থাকবে। হয় সকলের জন্য সঞ্চয়কে ভুলে থাকা, নয়তো সঞ্চয়ের জন্য বাড়ির সকলকে ছাড়া। সমাধানের এই দুটি পথ ছাড়া তৃতীয় আর কোনও রাস্তা নেই। সবাইকে ছাড়তে হবে। মা-কাকা-দাদা-বৌদি ও বুলা—কথাটা ভাবতেই মীনাক্ষীর বুক

কেঁপে ওঠে। কেমন শূন্য শূন্য মনে হয়। বড়ো একা লাগে নিজেকে। আবার সঞ্চয়কে পাবে না; এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে! যাকে একমনে কাছে পাওয়ার আকাঙ্খা করে এসেছে অন্য একটি মেয়ে সেই সঞ্চয়েব স্ত্রী হবে—এটা মীনাক্ষী কিছুতেই ভাবতে পাবে না। সঞ্চয় সম্পূর্ণ তার একার হবে। তার ওপর দাবি একমাত্র মীনাক্ষীবই। সুতরাং বৌদির কাছে খোলাখুলিই বলতে হবে। নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে না-রেখে পরিষ্কার ধবা দিতে হবে। বৌদি যাতে বুঝতে পারে। অনুভব করতে পারে। নয়তো সমস্যার কোনও সুবাহাই হবে না। তবে এখনই মীনাক্ষী কিছু বলছে না। দিল্লিতে তারা আরও বেশ কিছুদিন থাকছে। সময় ও সুযোগ বুঝে একদিন বলা যাবে।

বিকেলের খাবার সাজিয়ে রামসুভগ ওয়াকরদেকে জানালো, মেমসাবকে টেবিলে আসতে বলতে পারো। মীনাক্ষীর ঘরে উঁকি দিল ওয়াকরদে। একটি সোফায় দেহ ছেড়ে দিয়ে চুপটি করে বসে আছে মীনাক্ষী। বাঁ হাতটি দিয়ে ছোট কপালটুকু চেপে ধবা। তাতে চোখ দুটিও ঢাকা পড়েছে। ওয়াকবদে বুঝলো. এটা ঘুম নয়, ভাবনাব তন্ময়তা। আস্তে ডাকলো মেমসাব। কপাল থেকে হাত সবালো মীনাক্ষী।

বলো।

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। তুমি ওখানে যাবে না আমি এখানে নিয়ে আসবো?

কোনওটারই দবকাব নেই। খেতে তেমন ইচ্ছা করছে না।

সরবত করে দেবো?

না। কিচ্ছু করতে হবে না। ওযাকরদে কিছুক্ষণ মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। যেন একটা কিছু আবিষ্কাব কবতে চাইলো, না-খাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে। পরে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস কবলো, তোমার তবিয়ত ভালো তো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ শরীর আমাব ভালো আছে। অতো ব্যস্ত হতে হবে না। মীনাক্ষী এবারে একটু হাসলো। ওই হাসিটুকুর মধ্য দিয়ে সে তার শরীরের সুস্থ্যতার কথা ঘোষণা করলো। ওয়াকরদের ভাবী সজাগ দৃষ্টি। স্বাভাবিক নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হলেই তাব ব্যস্ততার অন্ত নেই। সবাইকে সে এতো তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে পারে বলেই সহজে সকলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকেও জড়িযে ফেলে। ওকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করার জন্য মীনাক্ষী খুলেই বললো, আমি কয়েকটা কথা ভাবছিলাম ওয়াকরদে।

ও! সেইজন্য বুঝি খেতে চাইছিলে না? ওয়াকরদে হাসলো। বাবুজিকেও দেখি তোমারই মতো। হয়তো কোনও কিছু ভাবছে। খেতে ডাকলে ওই একই উত্তর। খাবো না, খেতে ভালো লাগছে না। তেমন ইচ্ছে নেই খেতে। আমি ভাবি বুঝি শরীর খারাপ! শুধু বাহানা আর বাহানা! এবারে তো সব বুঝতে পারলাম। তা ভাবনাকে একটু বিশ্রাম দাও মেমসাব। ভাবনা বহুত খারাপ চিজ্ আছে। তোমার জলখাবার আমি এখানে এনে দিচ্ছি। কথাটা শেষ করেই ওয়াকরদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মীনাক্ষীকে কোনও কিছু বলবার সুযোগ দিল না। ওর দিকে চেয়ে সন্তুষ্টেব হাসি হাসলো মীনাক্ষী। ছেলেটার লক্ষ্য সবদিকেই। সে শুধু বলেছে খাবে না। খেতে তেমন ইচ্ছা নেই। তাতেই কি রেহাই পাবার উপায় আছে? কেন খাবে না, কি কারণ, কি বৃত্তান্ত সব কিছু একের-পর-এক প্রশ্ন করে আসল ব্যাপারটি ঠিক জেনে নেবে ওয়াকরদে। মীনাক্ষী অনুভব করলো, এই কারণেই ছেলেটা সঞ্চয়ের এতো প্রিয়। ভালোবাসা তো কেউ কাউকে এমনি এমনি দেয় না। ও জিনিসটা আদায় করে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। হ্যাঁ, ওয়াকরদের সেই ক্ষমতা আছে। বরং একটু বেশিই আছে। যে-কারণে চাকর হয়েও সে ঠিক চাকরের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী তথা সংসারেরই একজন আপন মানুষ হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে কি ওয়াকরদে যে একজন চাকর এ-কথা মীনাক্ষীর একবারও মনে হয় না। ওয়াকরদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এই ক'দিনেই যদি মীনাক্ষীর এ-ধারণা হয়, তবে সঞ্চয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক যে কি পরিমাণে একমন, একপ্রাণ হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। হ্যাঁ, মনে পড়লো মীনাক্ষীর। একদিন সঞ্চয়কে বকছিল। এ-দৃশ্য সে নিজে দেখেছে। তখনই বুঝেছে এই কিশোর ছেলেটি সামান্য নয়! সেদিন সকালবেলা কোথায় যেন

বেরুচ্ছিল সঞ্চয়। প্যান্টের পকেটে, কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলো রুমালটা নেই। তখনই ডাক পড়েছিল ওয়াকরদের। পকেটে রুমাল নেই তার জন্যও যেন ছেলেটিই দায়ী। ওয়াকরদে কাছে এগিয়ে যেতেই সঞ্চয় ওর মুখের দিকে একবার তাকালো। জুতো পড়ছিল। ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললো, পকেটে রুমালটা ছিল। পাচ্ছি না। আলমারী থেকে আর একটা বের কর।

বাবুজি একটা কেন, দশটা বের করে দিতে পারি। কিন্তু কোন দিনটা তোমার পকেটে রুমাল ঠিক ঠিক থাকে? প্রায়ই শুনি রুমাল নেই। আবার সব রুমালই পাওয়া যায়। তবে বাড়িতে নয়— তোমার অফিসের টেবিলে, নয়তো ড্রয়ারে। এবারেও নিশ্চয়ই সেখানে ফেলে রেখে এসেছো। সঞ্চয়ের সারা মুখে লুকানো হাসি। ওয়াকরদে ওখানেই থামেনি। আরও বলেছে, আজ তোমাকে আলমারী থেকে রুমাল বের করে দেবো না। একদিন অন্তত খালি হাতে যাও। বাড়ির জিনিস একের-পর -এক অফিসে গিয়ে জমা হবে সেটি ঠিক নয়।

আর ভুল হবে না। ওয়াকরদে—অসহায় দৃষ্টি সঞ্চয়ের।

তুমি অমন করুণ ভাবে তাকিয়ো না বাবুজি। তাতে আমার দুঃখ লাগে। রুমাল তোমাকে বের করে দেবো না বলেছি দেবো না। সত্যিই ওয়াকরদে সেদিন আলমারী খোলেনি।

বিকেলের ডাকে সঞ্চয়ের একটি চিঠি এলো। ওয়াকরদেরই চিঠিখানি মীনাক্ষীর হাতে দিয়ে গেল। পাঞ্জাম থেকে সঞ্চয়ের মা লিখেছেন। একবার ইচ্ছা হলো মীনাক্ষীর চিঠিখানি খুলে দেখে। ছেলেকে কি কি লিখেছেন কেন জানি জানতে আজ বড়ো ইচ্ছা করছে। কিন্তু খুললো না সে। হোক-না সঞ্চয় তার আপন। তবুও তাকে না-জানিয়ে তার চিঠি খোলাটা শোভনতার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই উচ্চ পর্যায়ে পড়ে না। মীনাক্ষীর কৌতূহল আসলে অন্য কারণে। বারবার মনে হচ্ছে, মা তার সম্বন্ধে এই চিঠিতে নিশ্চয়ই কিছু কিছু লিখেছেন। কেন-না এটা ঠিক, সঞ্চয় তার সম্পর্কে মায়ের কাছে কিছু লেখেনি এটা হতে পারে না! সেই কারণে এই চিঠিটির প্রতি মীনাক্ষীর এতো আগ্রহ।

রাত হয়েছে। মীনাক্ষী দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। অর্থাৎ রাতের খাওয় শেষ হয়েছে একঘণ্টা আগে। দাদা-বৌদি এতোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ-হয়। মীনাক্ষী তার ঘরের বাঁ দিকের দরজার ভারী ছিটকিনি তুলে দিল। এই কদিন দরজাটা শুধু ভেজানো থাকতো। আজ বন্ধ করে দিল মীনাক্ষী। ঘরের ডান দিকের দরজাটি খুললো এবারে। খুবই আস্তে। কোনওরকম শব্দ না-তুলে। সঞ্চয়ের ঘরখানিতে আলো-আঁধারের খেলা। উজ্জ্বল আলোটা নেভানো। কোণের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে সে কি যেন লিখছে। ভারী পর্দাটা জড়িয়ে ধরে মীনাক্ষী দাঁড়িয়ে রইলো ওই দিকে চেয়ে। মুহূর্তে একরাশ ভাবনা এসে তাকে ছেয়ে ফেললো। ভাবনা আর ভাবনা! চিন্তা-ভাবনা যেন শেষ হতেই চায় না। অন্যান্য সময় সঞ্চয়ের এই ঘরখানিতে ঢুকতে তার এতোটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা হয় না। অথচ এই মুহূর্তে! রাত্রের এই একটানা নিভৃত পরিবেশে, সকলের অজ্ঞাতে-আড়ালে এমনি করে ঢুকছে বলেই কি এমন কাঁপন শুরু হয়েছে বুকে? পা দুটিও কেমন যেন ভার ভার হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি পায়ের সঙ্গে পাথর বেঁধে দিয়েছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না মীনাক্ষী। সঞ্চয় তো তার। একান্তই তার। তবে কেন আপন মানুষটার কাছে যেতে এতো দ্বিধা? ছোট্ট বুকখানাতে কেন তবে সমুদ্রের বিশাল উন্মত্ততা? মরুভূমি পার হওয়ার কষ্টের গভীরতা কেন দুই পায়ে? সামাজিক ছাড়পত্র সঙ্গে নেই—নাই-বা থাকলো! সে তো কোনও অন্যায় অপরাধ করতে যাচ্ছে না। চিঠি লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো সঞ্চয়। এ-পাশে ফিরতেই দরজার দিকে চোখ পড়লো। সামান্য আলোয় মনে হলো কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে। পর্দার সঙ্গে এক হয়ে মিশে। সুইচ টিপলো সঞ্চয়। ঘরের উজ্জ্বল বাতিটা আলোর ফোয়ারা ছড়াতেই স্পষ্ট হলো সব কিছু। মীনাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ওর কাছে সঞ্চয়। তাকিয়ে রইলো ওর চোখে চোখ রেখে। মীনাক্ষী দু'হাতে সঞ্চয়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে ওর বুকের মধ্যে মাথাটা রেখে চুপচাপ পড়ে রইলো। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ ওর ওই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। দুজনের কেউই একটিও কথা বললো না। কথা বললেই যেন সব কিছু ফুরিয়ে যাবে। সেই ভয়েই দুজনেই চুপ। সঞ্চয় ওকে আস্তে আস্তে সোফা-কাম-বেডের কাছে নিয়ে এলো। ওখানেই বসিয়ে দিল মীনাক্ষীকে। শান্ত

গলায় বললো, জানো তোমার কথা জানিয়ে মাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। মা উত্তর দিয়েছেন, "তোব পছন্দ করা মেয়েকে আমার কোনওমতেই অপছন্দ হবে না।" তবে মায়ের সঙ্গে বোধহয় তোমাদের দেখা হবে না। আসছে মাসে শেষ সপ্তাহে মা এখানে আসছেন। তোমরা চলে যাচ্ছো প্রথম সপ্তাহে! সঞ্চয় একটু থেমে পরে আবাব বললো, তোমাদের যাবার কথাটা ভাবতেও আমার ভীষণ খাবাপ লাগছে।

তোমাব এখান থেকেও তো কালকে চলে যাচ্ছি।

সত্যি খেয়াল ছিল না। এই দিন কটি আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে কাটাবার ফলে সময়ের হিসেব সঞ্চয় রাখেনি। নতুন করে শুধু আর একবাব উপলব্ধি করলো আনন্দের দিনগুলি বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। মনকে সান্ত্বনা দিল সঞ্চয়। তবুও যা হোক মীনাক্ষীরা দিল্লিতেই থাকছে। মাসিমার বাড়িতে। বিনয়নগরে। এ-পাড়া আর ও-পাড়া। কলকাতা তো চলে যাচ্ছে না। কিন্তু বিনয়নগবেই-বা কয়দিন? তারপর সঞ্চয় কোন সান্ত্বনা নিয়ে থাকবে? পাশাপাশি বসেছিল সঞ্চয়। এবারে মুখোমুখি হলো। মীনাক্ষীর কোলের মধ্যে মাথা রেখে সঞ্চয ওর কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বললো, মলযদার সঙ্গে কাল কিছু কথা বলার আছে।

কি ব্যাপারে?

মীনাক্ষী দেবীব সম্পর্কে! কথাটা বলেই সঞ্চয় হাসলো।

না। সঞ্চয়ের মুখের ওপব বাঁ হাতখানা চেপে ধরলো মীনাক্ষী। তুমি বলতে যেয়ো না। বলবো আমি। আর দাদাকে নয় আগে বৌদিকে।

মলযদা তো তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। ভালোবাসেন।

ঠিক কথা। তবুও বৌদিকেই আগে বলতে হবে। যে-কথা বৌদিকে খুলে বলা যায় সে-কথা দাদাকে তেমন কবে বলা যায় না। বুঝেছো?

তখন মধ্যরাত্রি। মীনাক্ষী আর ও-ঘবে যায়নি। সঞ্চয়ের বুকের মধ্যে এতোটুকু হয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম নামেনি সঞ্চযেব চোখে। নিষ্পলক চোখে সে শুধু মীনাক্ষীর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বড়ো লাবণ্যময় মুখখানি মীনাক্ষীব। পবম নিশ্চিন্তে, পরম বিশ্বাসে মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে। ওর একখানা হাত সঞ্চয়ের বুকেব ওপর। ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। একটু হাসলো সঞ্চয়। দমদমের দিনগুলির সঙ্গে আজকের এই দিনটির কতো তফাত! কতো ব্যবধান!! মীনাক্ষী আজ তার কতো ঘনিষ্ঠ আয়ত্তেব মধ্যে। সে-কথা ভাবতেও অবাক লাগে। মনে হয় সব কিছু যেন স্বপ্নে ঘটে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য মনে হয়। অথচ সত্যি! এরচেয়ে সত্যি আব কি হতে পারে? মীনাক্ষী তার বুকে মাথা রেখে একটি ছোট্ট শিশুর মতো পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। লজ্জা-ভয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনও কিছুই তার ঘুমেব ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। হঠাৎ পিকুব কথা মনে হলো সঞ্চয়েব। জানতে পারলে ছেলেটা খুশিই হবে। ও যা পাগল ছেলে হয়তো টেলিগ্রাম করেই বসবে। মিষ্টি খাচ্ছি কবে? পিকুর কথা সঞ্চয় একবার তুলেছিল।

পিকুদাকে এখন কিছু জানাতে হবে না। মীনাক্ষী আপত্তি জানিয়েছিল। বাব্বা, দমদমের সেই দিনগুলির কথা ভুলি কখনও? আমাকে শুধু পাগল করে ছাড়তে বাকি রেখেছিল। কোনও কিছু বলতে মুখে আবার আটকেছিল নাকি পিকুদার? তুমি আর কতোটুকু কি শুনেছো? তোমার অসাক্ষাতে হাজারো কথা শুনিয়েছে আমাকে। জানিস! সঞ্চয হচ্ছে হীবের টুকরো ছেলে, হিরের টুকরো।

আমার ও-সব টুকরো-ফুকরো ভালো লাগে না!

আহা চাঁদু আর কি! পিকুর কথা বলার ধরনই অমন। হীরের টুকরোতে ভালো লাগে না তবে কি আমার মতো এই পটলকুমারকে ভালো লাগবে? যত্তোসব। ও-সব পাকামো রেখে জীবনে যদি সুখী হতে চাও তবে ওই সঞ্চয়ের সঙ্গে গাঁটছড়াটি বাঁধো। নচেৎ কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে বলে রাখলাম। মীনাক্ষী থামতেই সঞ্চয় জিজ্ঞেস করেছিল, আর কি কি বলেছে পিকু?

না। সে-সব আমি আর মুখ ফুটে বলতে পারবো না।

এমনকী কথা যে বলতেই পারছো না?

শুনতে তোমার লজ্জা না-লাগলেও আমি নির্লজ্জ হতে পারবো না।

মীনাক্ষী নড়ে উঠলো একবার। বুকের আঁচলটা সরে গেল। সঞ্চয় যথাস্থানে আবার কাপড়টি ঠিক করে দিল। কপালের ওপর থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। মীনাক্ষী আজ তাকে শাসন করেছে। শাসন করার ভঙ্গিটুকু দারুণ উপভোগ করেছে সঞ্চয়। সেই কারণেই বারবার মনে করছে ঘটনাটা। আজ দুপুরেই বলছিল মীনাক্ষী, তোমার টাকা-পয়সা কি খুব বেশি হয়েছে? প্রশ্নের আকস্মিকতায় ওই কথার অর্থ ধরতে পারেনি সঞ্চয়। তাই অবাক হয়ে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার মুখের দিকে হাঁ করে দেখছো কি? উত্তরটা কি আমার মুখে লেখা আছে? আমি বলছিলাম তোমার টাকা নিশ্চয়ই বেশি হয়েছে আর এতো বেশি হয়েছে যে তুমি তার কোনও হিসেব পর্যন্ত রাখতে পারছো না।

ব্যাপারটা কি একটু খুলেই বলো না? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আহা! বাচ্চা ছেলে, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" তারপরেই আবার প্রশ্ন করেছে, তোমার টাকার হিসেব সব ঠিক আছে? মানে কম অথবা বেশি এ-সব কিছুই মনে হচ্ছে না? একটু ভেবে-চিন্তেই বলো। মীনাক্ষীর কথামতো একটু সময় নিয়েই ভাবলো। তারপরেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালো, না। টাকার হিসেব তো সব ঠিকমতোই পাচ্ছি।

তুমি ছাই পাচ্ছো। বড়ো আশ্চর্য সুন্দর এক ভঙ্গিমায় চোখ দুটি পাকিয়েছিল মীনাক্ষী। ঠিকমতোই যদি হিসেব পাবে তবে এই টাকাগুলি এলো কোথা থেকে? এটা কি তোমার হিসেবের বাইরে? বলেই মীনাক্ষী লছমন ধোপার ফেরত দেওয়া টাকাগুলি টেবিলের ওপর মেলে ধরেছিল। আসলে তোমার কোনোদিকে বিশেষ খেয়াল থাকে না। নেহাত ওয়াকরদে আছে। সেই তোমাকে সামলে নিয়ে চলছে। কিন্তু ওই কিশোর ছেলেটি একা কতো দিক সামলাবে? নিজে একটু দৃষ্টি রাখতে পারো না? লছমন ধোপাকে যে জামা-প্যান্ট কাচতে দিয়েছিলে সেটা মনে আছে তো? ওই প্যান্টের পকেটেই সাতান্নটি টাকা ছিল। লছমন এসে সেই টাকা ফেরত দিয়ে গেছে। সত্যি! সব ভালো মানুষগুলিই তোমার কপালে জোটে। লছমন যদি অসাধু বা লোভী হতো তাহলে এটা ফেরত পাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই বলছি, এবার থেকে বুঝে-সুঝে চলো। কথাটা খেয়াল থাকে যেন। আর শোনো, ওই টাকা থেকে আমি সাতটা টাকা লছমনকে দিয়েছি।

এটা আবার আমাকে বলার কি আছে? তুমি যা করবে তাতেই আমার মতো।

তা না-হয় হলো কিন্তু এরপরে যখন লছমনকে জামা-প্যান্ট দেবে দয়া করে একবার পকেটে হাত দিয়ে একটু দেখে-টেখে দিয়ো। সব সময়ে ওয়াকরদের ওপর নির্ভর করে থেকো না।

থাকবো না!

ঠিক বলছো?

ঠিক বলছি।

কথাটা মনে থাকবে তো?

নিশ্চয়ই থাকবে। তবে—

কি তবে?

তোমার ওপরেই এরপর থেকে নির্ভর করে থাকবো। সঞ্চয়ের চোখের ওপর নিজের চোখ দুটি রেখে খুশিতে ঝিকমিক করে হেসেছিল মীনাক্ষী। ওই কথার কি-ই-বা সে উত্তর দেবে?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মীনাক্ষীর। সারা ঘরের ওপর দিয়ে চোখ দুটি একবার বুলিয়ে নিয়ে বিছানার দিকে তাকালো। চাইলো সঞ্চয়ের মুখের দিকে। জেগে রয়েছে দেখে বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো। তুমি ঘুমাওনি?

না। সঞ্চয় হাসলো একটু। আজ আমার ঘুম আসছে না।

কটা বাজলো?

পৌনে তিনটে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মীনাক্ষী। পায়ে পায়ে বারান্দার দিকে দরজার কাছে

গিয়ে পৌঁছালো। ছিটকিনিতে সবে মাত্র হাত দিয়েছে, সঞ্জয় তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো?

বাথরুমে যাবো।

তোমার ঘরের মধ্য দিয়ে যাও। একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সঞ্জয়। আর একটু হলেই বিপদ ডেকে এনেছিলে আর কি! মীনাক্ষী বুঝতে পারলো ভুলটা তার কোথায় হয়েছে। সত্যিই সে প্রায় বিপদকেই ডেকে আনছিল। তা নয়তো কি? এতো রাত্রে সঞ্জয়ের ঘর থেকে দরজা খুলে তাকে যদি কেউ বের হতে দেখে, তাহলে অবস্থাটা যে অত্যন্ত চরমে উঠবে এতো জানা কথা। মীনাক্ষী লজ্জা পেল। সঞ্জয়ের মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। মিনিট পনেরো সময় নিল মীনাক্ষী ফিরে আসতে। ফিরে এলো আবার সঞ্জয়ের কাছে। ফিসফিসিয়ে প্রায় কানে কানে বললো, আমার ঘরে থাকতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আজকের রাতটা তোমার কাছে কাছেই থাকলাম। এরপরে তোমাকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হবে। তবুও সান্ত্বনা মনে মনে তোমাকেই চেয়েছিলাম হয়তো আমি তা পেয়েছি।

এরমধ্যে আবার সন্দেহ রাখছো কেন মীনাক্ষী? হয়তো! আমার কথা তো তোমার অজানা নয়। আমি তোমারই। নয়তো রাখী অথবা নীনাকে অনেক আগেই বিয়ে করতে পারতাম। সেই সুযোগ ওরা দুজনেই আমাকে দিয়েছিল। ভালোবাসার অভিনয় করে ওদের দুজনকেই আমি দুর্বল করতে পারতাম। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি তা পারিনি। কেন-না আমার মনে হয়েছে যাকে ভালোবাসি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাই সহজেই ফিরিয়ে দিতে পেরেছি নীনাকে, রাখীকে। অনেক ছেলে-মেয়েকে দেখেছি ভালোবাসার তারা এতোটুকু মূল্য দেয় না। একই সঙ্গে তিন-চারজনের সঙ্গে সমানে প্রেম করে চলেছে। এর নাম ভালোবাসা? এরই নাম কি বিশ্বাস? আমি তা মনে করি না। ভালোবাসা আর যাই হোক খেলা নয়। আমার ভালোবাসা হবে আমার কাছে পবিত্র। সেই পবিত্রতা নষ্ট করতে বড়ো কষ্ট হয়। তোমার কাছে আজ কোনও কিছুই লুকাবো না। দমদমে তোমার সঙ্গে আলাপের পর সেই দিনগুলির মধুর স্মৃতি নিয়ে আমি নয়াদিল্লিতে ফিরে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সারাক্ষণ শুধু তোমার কথা ভেবেছি। তোমার চিন্তায় ডুবে থেকেছি আর দিন গুনেছি কবে তোমরা দিল্লিতে আসবে! তখনকার ঘটনা। এমনিতে নীনা আমাকে খুব পছন্দ করে। ছুটির দিনে প্রায়ই সকালে অথবা বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ করে। সিনেমা দেখতে অনুরোধ করেছে, দেখেছি। কিন্তু তার বেশি কিছু নয় অর্থাৎ আর পাঁচজন সাধারণ বন্ধুর মতোই আমি তাকে মনে করেছি। সেদিন সারা বাড়িতে আমি একা। সন্ধে তখন সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে। ওয়াকরদে এবং রামসুভগ দুজনে সিনেমায় গেছে। আমি চুপচাপ শুয়েছিলাম। তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার আসার দিন কেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে না, তোমার সঙ্গে কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সর্ব প্রথমে কথা বলবো, নিশ্চয়ই সেই নীলাভ শাড়িখানা না-পরার কারণ নিয়ে এই সবই ভাবছিলাম। ঘরে এলো নীনা। আঁটো সালোয়ার কামিজে ছন্দ তুলে সোফায় না-বসে সরাসরি আমার বিছানায় এসে বসলো। শোওয়া ছেড়ে আমি উঠে বসলাম। নীনা ওর প্রসাধনী মুখে সুবাস ছড়িয়ে কলকাতার হালচাল জিজ্ঞেস করলো। ওর এক কাকা ভবানীপুরে থাকে। আমাকে দেখা করতে বলেছিল। সময়ের অভাবে পারিনি, সে-কথাই জানালাম। নীনা পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। ওর ওই দৃষ্টির ভাষা আমার অজানা নয়। আমার আদরে, সোহাগে, আলিঙ্গনে, নীনা ডুবে থাকতে চাইছে। আমার কাঁধে দুটি হাতও সে রেখেছিল। আলিঙ্গনের সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত! তুমি বিশ্বাস করো মীনাক্ষী আমি সাড়া দিইনি, দিতে পারিনি। তোমাকে কতো ভালোবাসি পরীক্ষা করবার জন্য নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, কে মীনাক্ষী? তার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্কই গড়ে উঠলো না, শুধু একটু চোখে চোখে রাখা আর দুই ঠোঁটের এক টুকরো হাসি এতেই কি ভালোবাসার সৃষ্টি হতে পারে? আর হলেই-বা কি? মীনাক্ষী রয়েছে সুদূর কলকাতায়—দমদমে। সে জানতে পারছে না, দেখতে আসছে না। এমন সুযোগ নীনাও আমাকে বারবার দেবে না। সুতরাং আপত্তি কেন? যুক্তির সমর্থনে এতো চিন্তার পরেও

নীনাকে উষ্ণ আলিঙ্গন দিতে পারিনি। কারণ একটাই। তোমার কথা তোমাব চিন্তায় আমার সারা মন ছেয়ে রয়েছে। তোমাকে ফাঁকি দিতে পারবো না। নাই-বা জানতে পারলে তুমি, নিজের কাছেই আমি ছোট হই কি করে? সঞ্চয়ের কথাগুলি একমনে শুনছিল মীনাক্ষী। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে নতুন করে দেখতে লাগলো ওকে। বললো, ভালোবাসার যে-মর্যাদা, যে-সংযম তুমি দেখালে তাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। মীনাক্ষী সঞ্চয়ের কাঁধ ও গলার মাঝখানে নিজের মুখটা রেখে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লো। তুমি অনেক অনেক বড়ো সঞ্চয় অনেক মহৎ!

মহতের প্রশ্ন নয় মীনাক্ষী। এটাই তো স্বাভাবিক। ভালোবাসাকে যারা বিশ্বাসঘাতকের নামাবলীতে লুকিয়ে রাখে, আমি শুধু তাদের দলে নই। একটু থেমে সঞ্চয় আবার বললো, জানো এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুব কথা মনে পড়ছে। যদিও বন্ধু বলে স্বীকার করতে লজ্জা হয়। দিল্লিরই ছেলে। অজিত অরোরা। আমাদের দিল্লি অফিসের সিনিয়র অফিসার। নিজের স্ত্রীকে দু'মাসের জন্য চন্ডীগড়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে অপর একটি মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে অনেক দিন। সে-কথা আবার গর্ব করে আমাদের কয়েকজন নিকট-বন্ধুর কাছে পরিবেশন করে বাহ্বা নিতে চেয়েছে। কথাটা শুনে আমি ভীষণ দুঃখ অনুভব করেছিলাম। এমনটা করা ঠিক নয়। অন্যায়। স্ত্রী নাই-বা কাছে রইলো। সেই কারণে কি এমন পথে পা বাড়াতে হবে? তাহলে স্ত্রীকে ভালোবাসার আবেগ রইলো কোথায়? অরোবাকে বলেছিলাম, বন্ধু, তুমি কিন্তু তোমার স্ত্রীর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। যা করেছো তা বাহবা পাবার যোগ্য নয়। অন্তত আমি তোমাকে এই ব্যাপারে সমর্থন করতে পারলাম না। আমার কথা শুনে প্রচন্ড ভাবে হেসে উঠেছিল অরোরা। ব্যঙ্গ করে আমাকে বলেছিল ঘোষ, তুমি কি বুদ্ধদেবের আমলের লোক নাকি? তোমার মতো এমন নিরামিষ ইয়াংম্যান জীবনে আমি এই প্রথম দেখলাম। বিয়ে করেছি তাতে হয়েছে কি? স্ত্রীর অনুপস্থিতে যদি কোনও সুযোগ পাই তা গ্রহণ না-করাই চরম বোকামিব। আমাকে তুমি কি বোকা হতে বলছো? সেটা পারবো না ভাই। এই জীবনটা বড়ো অল্প। যৌবন আরও অল্প! সেক্ষেত্রে যতোটুকু সুযোগ-সুবিধা পাবে গ্রহণ করে জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। সেই তো লাইফ! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, যখন যাকে পাবে তার সঙ্গে একটু মিলেমিশে যাবে। ব্যস। এরমধ্যে দোষের কি আছে? তুমি ম্যান, বড্ড সেকেলে। বাস করছো এইকালে, কথা বলছো ধর্মযুগের। এই নীতি নিয়ে চললে জীবনে তুমি দুঃখ পাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা স্ত্রী তো রইলোই। তাকে তো তাড়িয়ে দিচ্ছি না। বাড়তি দুটো মেয়ের সঙ্গে যদি মোহব্বৎ হয় তাহলে ক্ষতি কি? জীবনকে উপভোগ করো। এই হলো ওদের জীবনদর্শন মীনাক্ষী! এই অশ্লীলতা, বিশ্বাসঘাতকতা যদি জীবনকে উপভোগের নির্দশন হয়, তাহলে সত্যিকারের স্নিগ্ধ সুন্দর জীবন না-জানি ওর কাছে কতোই কদর্য। সঞ্চয় থামলো। মীনাক্ষীর মাথায় পরম আবেগে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললো, আমি তেমন হতে পারি না মীনাক্ষী। যাকে ভালোবাসি তার সুখ-স্মৃতি নিয়েই ডুবে থাকবো। তাকে নিয়েই বাঁচবো।

একটু একটু করে ভোর হচ্ছে। পুব আকাশ ফর্সা হচ্ছে ক্রমশ পাখিদের প্রভাত-বন্দনার সুর ভেসে আসছে। সঞ্চয় রাস্তার দিকে একটি জানলা খুলে দিল। সকালবেলার শিশির সিক্ত একঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে সমস্ত মুখখানাকে শীতল করে দিল। বাইরে শীতের হাওয়া বইছে। বড়ো রাস্তার আলো তখনও নেভেনি। একচক্ষুর মতো মিটমিট করে জ্বলছে। স্পষ্ট আলো নয়, কুয়াশার আস্তরণে জমাট বেঁধে কেমন যেন ক্ষয়িষ্ণু দেখাচ্ছে। ডি. টি. ইউ-র একখানা বাস প্রচন্ড গতিতে শব্দ তুলে চলে গেল। জানলা বন্ধ করে দিয়ে সঞ্চয় ফিরে এলো নিজের বিছানায়। একটু আগে মীনাক্ষী তার ঘরে ফিরে গেছে। এখন পৌনে-ছ'টা। সঞ্চয় হিসেব করলো আরও একঘণ্টা পনেরো মিনিট বিছানায় থাকতে পারবে। অর্থাৎ সাতটার আগে সে উঠবে না। পাশ ফিরতেই চোখে পড়লো দুটি চুলের কাঁটা পড়ে আছে। হাতে তুলে নিয়ে একবার ভাবলো কোথাও লুকিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু সেটা করা ঠিক নয়। পরে কেউ যদি সেটা আবিষ্কার করে? তার চেয়ে সময় থাকতে এখনই দিয়ে দেওয়া ভালো। সঞ্চয় অত্যন্ত মৃদু ভাবে ভেতরের দরজায় টোকা দিল। মীনাক্ষী ঘুমায়নি। চুপচাপ শুয়েছিল। গত রাতের স্মৃতিটকু নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল একান্ত মনে। পরবর্তী ঘটনার

জাল বুনছিল আপন মনে। তাতেই বুঝি-বা একটু বিভোর হয়েছিল। সেই কারণে দরজায় টোকা পড়ার শব্দ প্রথমে শুনতেই পায়নি। শুনেছে দ্বিতীয়বারে। অতি সন্তর্পণে দরজা খুললো। সঞ্চয় ডান হাতটা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের মধ্যে তার মাথার দুটি কাঁটা পড়ে আছে। সঞ্চয়ের চোখে চোখে রাখলো মীনাক্ষী। কাঁটা দুটি তুলে নিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে শেষে সামান্য একটু ফাঁক রাখলো। একটা চোখ রেখে দেখলো, সঞ্চয় তখনও দাঁড়িয়ে। আবার দরজাটা খুললো। দুই ঠোঁটের ভঙ্গিমায় নিঃশব্দে আদর জানাতেই হেসে দিল সঞ্চয়। দরজা বন্ধ করে দিতে মীনাক্ষীর আর অসুবিধে হয়নি।

সঞ্চয়ের বাড়ি থেকে বিনয়নগরে আসার পর চারটে দিন কেটে গেল। মীনাক্ষীর মনে হলো কতোদিন ধরে সে সঞ্চয়কে দেখে না। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। মাত্র চারটে দিন অদর্শনেই মনের এই অবস্থা! এর বেশি হলে মীনাক্ষী থাকবে কেমন করে! ভালোবাসলে মন এমন উন্মন হয়ে যায় কে জানতো? সারাক্ষণ শুধু একই চিন্তা, একই ভাবনা। মীনাক্ষী ঠিক করলো সে আর সময় নেবে না। আজকেই সব কথা খুলে বলবে বৌদিকে। কেন-না নয়াদিল্লিতে তারা আর বেশি দিন নেই। তারপরেই কলকাতা। সুতরাং সঞ্চয়ের কাছাকাছি থাকতেই সব কিছুর ফয়সলা হয়ে যাওয়া ভালো। মনে মনে অনেকবার রিহার্সাল দিল মীনাক্ষী। কোন কথার পর কি বলবে, বৌদি যদি অমত করে তাহলেইও-বা সে কি উত্তর দেবে, ইত্যাদি সবই লিখে রাখলো মনের শ্লেটে। সকাল থেকে সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত শোভনাকে ফাঁকায় পেল বিকেলের মুখে। একান্তে ডেকে নিয়ে গেল ছাদে। বললো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। অথচ ছাদে গিয়ে চট করে কিছু বলতে পারলো না মীনাক্ষী। তার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বের হলো না। সহসা সে বোবা হয়ে গেল। শোভনা তাড়া দিল, কি গো। কথা আছে বলে অমন চুপ করে রইলে কেন?

বৌদি। মীনাক্ষী অত্যন্ত শান্ত গলায় শোভনাব দিকে তাকালো। কথাটা কীভাবে শুরু করবে ভেবে পেল না। খেই হারিয়েই ফেললো। সকাল থেকে যতো কথা গুছিয়ে রেখেছিল বলবার জন্য কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। নতুন করে আবার মীনাক্ষী ভাবতে বসলো। শোভনা আর একবার তাড়া দিতেই সে বলে উঠলো, সঞ্চয়কে আমি ভালোবাসি বৌদি! নীরব কয়েকটি মুহূর্ত কাটলো। যেটুকু ভাববার ভেবে নিয়েছে শোভনা ওর মধ্যেই। তারপরেই মিষ্টি করে হাসলো। সস্নেহে মীনাক্ষীর কাঁধে একটি হাত রেখে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলো, কবে থেকে শুরু হয়েছে এ-সব? দৃষ্টি নিচু করে মেঝেব দিকে চেয়েছিল মীনাক্ষী। চোখ তুললো এবারে। শোভনাকে একবার দেখে নিয়েই আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। বললো, দমদম থেকেই।

'দমদম দাওয়াই' দিয়ে কাবু করেছিস বুঝি? হাসিতে ভেঙে পড়লো শোভনা। অফুরন্ত হাসি। মীনাক্ষীর মনে হলো বৌদির বয়েস যেন অনেক কমে গেছে। হয়েছে তারই সমবয়েসী। সম্বোধনের পার্থক্যটুকুও কান এড়ালো না। শোভনা এতোদিন তাকে তুমি বলেই ডাকতো। কিন্তু আজ হঠাৎ তুই সম্বোধন করাতে মীনাক্ষী আগের চেয়েও বেশি আপনত্বের স্বাদ পেল। তবে বৌদির মুখে ওই 'দমদম দাওয়াই' কথাটা শুনে বেশ লজ্জা পেল। লজ্জা ঢাকতেই বলে উঠলো, যাও—শোভনা রসিকতা করার লোভটুকু সংবরণ করতে পারলো না। বললো, তা তোরা তো দেখি এখন আপনি আপনি করে কথা বলিস! আপনি সম্বোধনেই এতো কাছে? মীনাক্ষীর দুই ঠোঁটে হাসির রেখা। সহজ-সরল ছোট মেয়ের মতো উত্তর দিল, সেটা তোমাদের সামনে।

তাই বুঝি! আর আমাদের আড়ালে?

সেটাও বলে দিতে হবে? শোভনার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসলো মীনাক্ষী। তুমি না বৌদি। সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে নেই।

বাঃ, আমাকে সব কিছু জানতে হবে না?

সবই তো বলে দিলাম। সঞ্চয় দাদাকেই বলতো। আমিই ওকে বারণ করে দিয়েছি। বলেছি, তোমাকে জানাতে হবে না। আমিই জানাবো। মীনাক্ষী একটু থামলো। দম নিয়ে আবার যোগ করলো, তাই তোমার কাছেই আগে বললাম বৌদি! তোমার কাছে আমি সব খুলে বলতে পারি কিন্তু দাদার

কাছে কিছুতেই নয়। সে-দাযিত্ব তোমাব। তুমিই.....

আচ্ছা আচ্ছা তোকে আর অতোশত বলতে হবে না। ভাবতেও হবে না। আমি তো রয়েছিই যা করবার আমিই করবো, যা ভাববার আমিই ভাববো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। শোভনা স্থির বিশ্বাসে হাসলো।

শঙ্করের জন্মদিন আজ। দুপুরেব খাওযা-দাওয়ার পর মীনাক্ষীরা বেব হলো। আর কিছুই নয় কনট্‌প্লেসে গিয়ে ওর জন্য একটি দামি শার্ট কিনবে আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম। সার্ট কিনবার পরেও বাড়তি লাভ হিসাবে সঞ্চয়ের সঙ্গে একটু দেখা করবে। ওকে দেখবার জন্য মন আনচান করছে। সেই কারণেই মলযের যাওয়া বন্ধ করে সে নিজেই যাচ্ছে। মলয অবশ্য আপত্তি তুলেছিল।

না-না, তোব গিয়ে কাজ নেই। রাস্তাঘাট সব জানিস না, চিনিস না। বাসরুটও সব ভালো করে জানা নেই। শেষে বিনয়নগরে আসতে গিয়ে হযতো জংপুরা বা করোলবাগে পৌঁছে গেলি সে এক কান্ড হবে আব কি!

শার্ট কিনবাব ব্যস্ততা এবং আগ্রহ দেখেই শোভনা যেটুকু বুঝবার ঠিকই বুঝেছে। মনে মনে সে হাসলো একবার। ভালোবাসলে প্রিয় মানুষটাকে একটুখানি দেখবার জন্য মন তো এমন উতলা হবেই। সুতরাং মীনাক্ষী তো যেতে চাইবেই। সেটাই স্বাভাবিক। অবুঝ হয়েছে মলয। তার স্বামী। অথচ ওই মানুষটাকে সে গতকালই মীনাক্ষীর সঙ্গে সঞ্চযের ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। মলয় অখুশি হয়নি কথাটা শুনে। বরং আনন্দিতই হয়েছে। এও বলেছে, দেখতে-শুনতে, চেহারায, চাকরিতে সঞ্চয় সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ও যদি মীনাক্ষীকে বিয়ে করতে চায আমাদেব বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকার কথা নয়। তারপরেই নিচু সুবে কৌতুক করেছে মলয়, মীনাক্ষী তাহলে অনেক বড়ো হযে গেছে কি বলো? আমি তো ওকে সেই ছোটটিই মনে করেছিলাম। তা কবে থেকে যে ওবা ভালোবাসা-বাসি শুরু করলো আমি যে কিছুই জানতে পারলাম না।

হ্যাঁ। ওরা তোমাকে নোটিস দিয়ে প্রেম করুক আর তুমি ওদেব মাঝখানে প্রাচীর হযে দাঁড়াও আর কি! বেশ বলছো!!

সত্যিকারেব একটি ভালো ছেলেকে যদি আমাব মীনাক্ষী ভালোবাসে, তাকে বিয়ে কবতে চায আমি কি ওদের বাধা দেবো? তুমি আমাকে কি ভাবো বলো তো?

একটা রসকষশূন্য ঠুটো জগন্নাথ! শোভনা ঠাট্টা কবেছিল।

না গো না—অম্লান হেসেছিল মলয। আমার আফসোস কোথায় হচ্ছে জানো? আমাদের চোখের সামনে আমারই বোনের সঙ্গে সঞ্চয় এতো বড়ো একটি কান্ড ঘটালো এতেও তো পানিশমেণ্ট হলোই না বরং বিয়ের পর উল্টে সেই আমাকে শালা বলে রাতদিন গালাগাল করবে এটা সহ্য করা যায় শোভনা? কথাটা শেষ করেই নির্মল আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল মলয়। অমলিন আবেগের হাসি! অথচ সেই মানুষটাই আজ সবচেয়ে অবুঝ হয়েছে। তার কি একবাবও বোঝা উচিত ছিল না যে মীনাক্ষী একা কেন বেরুতে চাইছে শার্ট কিনতে? কনট্‌প্লেসে কেনা-কাটা করবে, কনট্‌প্লেসেই সঞ্চয়েব অফিস। এরমধ্যেও কি সে যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছে না? আর তা যদি না-পায় তবে এতো কথা কীসের? চুপচাপ থাকলেই পারে। শোভনা এবারে স্বামীকে মৃদু ধমক লাগালো। বললো, তুমিও বড্ড বাজে কথা বলতে শুরু করেছো। এখান থেকে উনিশ নম্বর বাসে চড়ে যাবে ওই বাসেতেই ফিরে আসবে। এরমধ্যে নতুন শহর, নতুন জায়গা, বাস্তাঘাট চেনা নেই, বাসরুট জানা নেই—এতো সব আসছে কোথা থেকে? শঙ্করের সঙ্গে এই কদিন তো সারা দিল্লি ঘুরে বেড়ালো, পথ ভুল হবে কেমন করে? তোমার কেবল মিথ্যে আশঙ্কা। বলেই শোভনা ইশারা করলো মলয়কে চুপ করে যাবার জন্য। আরও বোঝাবার জন্য এবারে মীনাক্ষীকে বললো, তুই যা, আর শোন, শার্ট কেনার আগে একবার শঙ্কাপুরের অফিসে যাস। ওকে নিয়েই কিনিস। সঞ্চয়ের অফিস নয়—ওটা শঙ্করের অফিস। প্রচ্ছন্ন ভাবে ঘুড়িয়ে বলাতেই কাজ হলো। সাপের মাথায় মন্ত্র পড়ার মতো অবস্থা হলো মলয়ের। সে আর একটিও কথা বললো না অর্থাৎ আপত্তির সুর তুললো না।

বাস থেকে রিগ্যাল সিনেমার ষ্টপেজে নামলো মীনাক্ষী। একটা ষ্টপেজ আগে নেমেছে সে। রাস্তাটা

পার হয়ে কনট সার্কাসের মধ্যকার গোলাকার নেহেরু পার্কের ভিতর দিয়ে সোজা সঞ্চয়ের অফিসের সামনে এসে উপস্থিত হলো। ঢুকতে সামনেই অভ্যর্থনা কক্ষ। বুথের ও-পাশে সুসজ্জিত পোশাকে এনামেল করা মুখে একটি মেয়ে কি যেন লিখে চলেছে। মীনাক্ষী সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুললো। সুমিষ্ট স্বরে ইংরেজিতে বললো, বলুন আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

মিঃ সঞ্চয়ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কোনও কোম্পানি থেকে আসছেন কি?

না।

আগে থেকে অ্যাপয়েন্ট করা ছিল?

না।

ক্ষমা করবেন, মিঃ ঘোষ এই সময় বাইরের কারো সঙ্গে দেখা করেন না। ওঁর সঙ্গে দেখা করার সময় তিনটের পর থেকে। আপনার যদি অসুবিধে না-হয় তবে আপনি এখানে অপেক্ষা করতে পারেন। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মীনাক্ষীর। মেয়েটির ওপর একবার রাগও হলো। পরক্ষণেই আবার ভাবলো, মেয়েটির কি দোষ? সে তার ডিউটি করেছে। কিন্তু ওকে বুঝিয়ে দিতে হ্যাঁ মিঃ সঞ্চয়ণ ঘোষ নিয়ম মতো তিনটের পর বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করলেও বিশেষ কারও সাড়া পেলে সেই নিয়ম ভেঙে তারও আগে দেখা করে। হ্যাঁ, সে বিশ্বাস মীনাক্ষীর আছে। নিজের হাত-ঘড়ির ওপর চোখ দুটি একবার বোলালো। পৌনে দুটো। তারপরেই তাকালো মেয়েটির দিকে। বললো, অনুগ্রহ করে আপনি ওঁকে একবার বলুন মীনাক্ষী মুখার্জী দেখা করতে চাইছে। মেয়েটি ফোন তোলার আগে এমন একটা ভাব দেখালো যেন তুমি যখন এতো করে অনুরোধ করছো তখন বলছি। কিন্তু কোনও ফল হবে না। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিমায় টেলিফোনের মুখে মুখ রেখে টেনে বললো, মীনাক্ষী মুখার্জী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। ও-পাশ থেকে সঞ্চয়ের নির্দেশ এলো, পাঠিয়ে দাও। মেয়েটি এবারে ভালো করে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। মনে মনে রূপের প্রশংসা না-করে পারলো না। ভিজিটরস শিল্পের প্যাডটি এগিয়ে দিয়ে বললো, নাম লিখুন। বাধ্য মেয়ের মতো যা কিছু লিখবার সবই লিখলো মীনাক্ষী। মেয়েটি মিষ্টি করে হাসলো। বললো, এই করিডোর দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের শেষের ঘরটিই মিঃ ঘোষের। ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়ালো মীনাক্ষী। মাঝখানে কার্পেটে মোড়া সরুপথ। দু'পাশে কাঁচের ঘর। এক-একটি ঘর এক-একজন অফিসারের। প্রতিটি ঘরের দরজায় সেই ঘরের অফিসারের নাম লেখা রয়েছে। নাম পড়তে পড়তে এগিয়ে চললো মীনাক্ষী। শেষ মাথার ডান দিকের দরজার ওপরে চোখ পড়লো। মিঃ এস. ঘোষ। সেল্স ইঞ্জিনিয়ার। বেয়ারার হাতে শিল্প দিয়ে এতোটুকু অপেক্ষা করতে হলো না। ডাক পড়লো সঙ্গে সঙ্গেই। বেয়ারা দরজা মেলে ধরলে মীনাক্ষী ভেতরে ঢুকলো। বিরাট একটি কাঁচের টেবিলের ও-পাশে সঞ্চয় বসে আছে। ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। হাত দিয়ে ইশারায় বসতে বললো। মীনাক্ষী বসলো। আরও দুজন ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন। সঞ্চয় ফোনে বলে চলেছে, কি আশ্চর্য বলুন দেখি। সেই করে আপনাদের কাছে বিল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ধরুন গিয়ে দিন কুড়ি তো হবেই...হ্যালো শুনুন...আপনাদের দীর্ঘ সূত্রতার জন্য যদি আমাকে একমাস অপেক্ষা করতে হয় তবে তো বিজনেস গুটিয়ে নেওয়াই ভালো। ইতিমধ্যে দুটি চিঠি দিয়েছি, একটিরও উত্তর পাইনি। বলতে বাধ্য হচ্ছি এরপরে আপনাদের সহযোগিতা না-পেলে প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় থাকবে না। ওপারের কথাগুলি মিনিটখানেক শুনলো সঞ্চয়। তার পরেই আবার বললো, না-না, ওটা কোনও কাজের কথাই নয়। আমিও তো চাকরি করছি এটা বুঝতে পারছেন না কেন? আমার মাথার ওপরেও লোক রয়েছেন। কৈফিয়তটা তাঁকে আমাকেই দিতে হয়। ফোন নামিয়ে রেখে সঞ্চয় সামনে বসা এক ভদ্রলোকের দিকে তাকালো।

মিঃ কুট্টি! আপনি আজ আসুন। সিলিকনের একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি আপনাকে খবর দেবো।

আমি বরং পরশুদিন একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাবো।

আপনি একবার কেন—হাজারবার আমার এখানে আসতে পারেন। সঞ্চয় একটু হেসেই যোগ করলো, কিন্তু জিনিসটা জোগাড় করতে হবে তো! তাই বলছিলাম, আপনাকে ছোটাছুটি করতে হবে না। আমিই আপনাকে জানিয়ে দেবো। মিঃ কুট্টি নমস্কার করে চলে যেতেই সঞ্চয় টেবিলের ওপর থেকে একটি চিঠি তুলে নিয়ে রামানুজেব দিকে এগিয়ে দিল। তার সেক্রেটারী।

মিঃ জেমস্‌কে চিঠির উত্তরটা দিয়ে দিন। আর লিখে দেবেন যে, অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ যা চেয়েছেন এই মুহূর্তে অতোটা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কাজ চালিয়ে নেবার মতো পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিঃ রামানুজ চলে গেলে সঞ্চয় পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, প্লিজ আর একটু বোসো—বেল টিপতেই বেয়ারা এসে হাজির।

রঙ্গনাথনকো বোলাও। সঞ্চয় ততোক্ষণে একটি চিঠির ওপব চোখ দুটি দ্রুত বুলিয়ে যেতে লাগলো। মিনিট দুয়েক সময়। অনুমতি নিয়ে রঙ্গনাথন ঘরে ঢুকতেই সঞ্চয় ওর দিকে চাইলো।

আপনি সাহানী মেডিক্যাল ষ্টোর্সে যাননি কেন? ইউনিভারসালে গেছেন, আরোগ্য ক্লিনিকেও গেছেন অথচ এই দুটির মাঝখানে সাহানী মেডিক্যাল, সেখানে না-যাওয়ার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি রিটেন্‌ এক্সপ্লানেশন দেবেন।

স্যার! রঙ্গনাথনের সারা মুখ পান্ডুর হলো। ওই দোকানটি নতুন খুলেছে। আমি তাই জানতাম না।

আপনি একজন রিপ্রেজেনটেটিভ। আপনার এলাকায় কটি মেডিক্যাল ষ্টোর্স আছে-না-আছে ইত্যাদি জানবার দায়িত্ব তো আপনারই। সেখানে কটা নতুন হলো আর কতোগুলি পুরানো দোকান উঠে গেল সে-সব প্রশ্ন উঠতে পারে না। মোটকথা আপনাব এলাকা আপনার নখদর্পণে হওয়া চাই। তবেই তো কাজ করতে পারবেন। সেল বাড়াতে পারবেন।

খুব ভুল হয়ে গেছে স্যাব। এমনটা আর কখনও হবে না। রঙ্গনাথনের কণ্ঠে কাতর প্রার্থনার সুর ফুটে উঠলো।

আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। রঙ্গনাথন চলে গেল মাথা নিচু করে। অফিসের কাজ ও অফিসারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে সহজ সাধারণ মানুষ হয়ে উঠলো সঞ্চয়। মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসলো।

তুমি আমার অফিসে আসবে, এ-আমি ভাবতেই পাবিনি। তারপরে আবার একা! ভারী ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। মিস মাথুর যখন জানালো মীনাক্ষী মুখার্জী নামে একটি মেয়ে দেখা করতে চাইছে, তখন মনের মধ্যে কি যে আনন্দ হচ্ছিলো তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলেও যে এতো ঝামেলা পোহাতে হয়—আমিও ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারবো না। মীনাক্ষী উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বললো, একজন মন্ত্রীর সঙ্গেও বোধহয় এরচেয়ে সহজে দেখা করা যেতে পারে!

তোমাকে কি খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে?

নয়তো কি? কি নাম, কোথা থেকে আসছেন, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল কিনা, তিনটের আগে বাইরের কারও সঙ্গে মিঃ ঘোষ দেখা করেন না অতোএব আপনি অপেক্ষা করতে পারেন।

স্যরি! সঞ্চয় হাসলো। এরপর থেকে তোমাকে স্লিপ লিখতে হবে না। ফোনে জানাতেও হবে না। সোজা চলে আসবে আমার ঘরে। তুমি হলে মীনাক্ষী মুখার্জী, তোমার সঙ্গে কার তুলনা?

খুব হয়েছে। তোমাকে আর খুশি করতে হবে না। একটি বেয়ারা একরাশ ফাইল টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। সঞ্চয় স্তূপীকৃত ফাইলেব দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলো। এক্ষুণি এ-গুলি সই না-করলেও চলবে। মীনাক্ষীকে কতোক্ষণ বসিয়ে রাখা যায়? এখন ওর সঙ্গে একটু গল্প করবে। মীনাক্ষী চলে গেলেই সে আবার কাজে হাত দেবে। টেলিফোনটা কঁকিয়ে উঠতেই সঞ্চয় হাত বাড়লো। হ্যালো, হ্যাঁ সঞ্চয়ণ ঘোষ বলছি। বলুন কি খবর? হ্যাঁ.....হ্যাঁ....আপনি কারেক্ট। আমি এনকোয়ারী করেছি। মিঃ ভার্মা শুনুন.....আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ আগামীকাল আপনাদের ওখানে যাবে। আজকে? এখন তো প্রায় তিনটে বাজে। আজ আর সম্ভব নয়। আগামীকাল নিশ্চয়ই যাবে। আপনি কোনও

চিন্তা করবেন না। কথা দিচ্ছি আপনাকে। প্রয়োজন হলে আমি নিজে গিয়ে উপস্থিত হবো। কি বলছেন? তার আগে আপনিই এসে উপস্থিত হবেন। বেশ তো আসুন না, দুপুরের আগেই আসুন। একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, নমস্কার। ফোন ছেড়ে সঞ্চয় বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললো, দু'কাপ কফি।

তুমি কি আমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য এসেছো, নাকি অন্য কাজে?

যদিও শঙ্করের জন্য একটি শার্ট কিনতে এসেছি তবুও মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা। মীনাক্ষী এতোটুকু গোপনতার আশ্রয় নিল না। নয়তো আমি একা কিছুতেই বের হতাম না। শার্ট কিনতে দাদাই আসতো। তুমি আসছো তো আজকে।

শঙ্কর গতকাল বলেছিল বটে। আজকে সকালেও একবার মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ছুটির পরে আমাদের একটা মিটিং রয়েছে। শেষ হতে এই ধরো রাত সাড়ে আটটা-নটা তো হবেই।

যাই হোক, যেয়ো কিন্তু। আর শঙ্করকে যদি একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও খুব ভালো হয়। মাসিমা-মেসোমশাই অনেক করে বারণ করেছিলেন আজকে না-আসার জন্য। শঙ্কর আসবেই। বলে, জন্মদিনে অফিস ছুটি করার কোনও অর্থ হয় না। বরং আরও বেশি করে কাজ করতে হয়।

লক্ষণ সিং দু'কাপ কফি এবং বিস্কুট দিয়ে গেল। মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সঞ্চয় কফিতে চুমুক বসিয়ে বললো, শঙ্কর ঠিকই বলেছে। তবে তুমি যদি বলো, শঙ্করকে তাহলে ছেড়ে দিতে পারি। সঞ্চয় প্রাণখোলা হাসলো।

আহা! যেন কতো কথা শোনা হয় আমার!

শুনি না? আগামী পয়লা তারিখ থেকে শঙ্কর টাইপিস্ট থেকে রিপ্রেজেনটিটিভ হচ্ছে। একমাত্র তোমার কথাতেই ওকে এই প্রমোশন দিলাম। নয়তো সুইটেবল ক্যান্ডিডেটের তো অভাব ছিল না। কাকে প্রমোশন দিলাম আমি তা জানি না, আমি তো তোমাকেই চিনি।

থাক থাক, অনেক চিনেছো—আর চিনে কাজ নেই। এবারে উঠবো আমি।

শঙ্করকে নিয়ে যাও। ওকে ছেড়ে দিতে বললে যে—সঞ্চয় হাসতে হাসেত বললো, তোমার কথা না-শুনলে আমার চাকরি থাকবে?

তোমার শুধু ঠাট্টা আর ঠাট্টা। মীনাক্ষী ভ্রুকুটি হেনে বললো, আজ নয়, একদিন তোমাকে শায়েস্তা করবো।

সেই দিনটা কি বিয়ের দিনে?

ফের ফাজলামো? মীনাক্ষী রাগ করতে পারলো না। হেসে দিল।

সঞ্চয় বেয়ারাকে ডেকে নির্দেশ দিল, টাইপিস্ট পুল সেকশানের শঙ্কর মুখার্জী। মিনিট পাঁচেক বাদে দরজার সামনে এসে শঙ্কর দাঁড়ালো।

এসো। সঞ্চয়ের ডাকে ঘরের ভেতর ঢুকে মীনাক্ষীকে দেখতে পেয়েই অবাক হলো শঙ্কর। মীনাক্ষীদি একা। এখানে কখন এলে? ইত্যাদি দু-একটি প্রশ্ন যে তার মনে হয়নি তা নয়। তবে ভাববার বেশি সময় পেল না। সঞ্চয় বললো, আজ তোমার জন্মদিন। সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে মন্দ হয় না কি বলো? শঙ্কর লজ্জায় মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলো, এ-নিশ্চয়ই মীনাক্ষীদির কাজ। মীনাক্ষীদিই সঞ্চয়দাকে তার ছুটির কথা বলেছে। সঞ্চয় হাসি মুখে বললো, মীনাক্ষীদিকে নিয়ে তাহলে বাড়ি চলে যাও। তোমার জন্মদিনের ছুটি। আর শোনো! বাইরে বসির আলি আছে। ওকে বলো তোমাদের যেন পৌঁছে দেয়।

দিনগুলি একে একে ফুরিয়ে যেতে লাগলো। নয়াদিল্লির শীতের সকাল হারিয়ে যাচ্ছে একটি একটি করে। মীনাক্ষীদের কলকাতা যাবার দিন এগিয়ে এলো। ওরা বুধবার চলে যাবে। আজ রবিবার। মীনাক্ষীকে নিয়ে সঞ্চয় বিকেলবেলা ভাটকল লেক দেখতে যাবে। অর্থাৎ কলকাতা যাবার আগে আজকের এই দিনটিই সে ওকে কাছে পাচ্ছে। কোনও কথা জানাতে যদিও আর কিছু বাকি নেই তবুও নতুন করে যদি বলার থাকে, সেই কথা বলার সুযোগও আজ পাবে। এখন সকাল। মীনাক্ষী আসবে সেই বিকেলে। তিনটের সময়ে। সঞ্চয়ের মনে হচ্ছে, সময় যেন আর কিছুতেই কাটছে

না। আদিত্যদার বাড়িতে গিয়ে গল্প করে আসবে তাও ভালো লাগছে না। অথচ ঘরে বসে সময় গোনা সে-এক দুঃসহ ব্যাপার! সঞ্চয় তাড়াতাড়ি দাড়ি কেটে, স্নান করে দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত সেরে নিল। যেন এ-গুলি সে তাড়াতাড়ি করে নিলেই সময়টা গড়িয়ে বিকেলে গিয়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সময় কি কারো মুখ চেয়ে কাজ করে? আপন গতিতে চলাই তার ধর্ম। একটু ঘুমিয়ে নেবার উদ্দেশে সঞ্চয় বিছানায় শুয়ে পড়লো একটি ম্যাগাজিন নিয়ে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো একসময়। ঘুম যখন ভাঙলো ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। চারিদিকে শীতের রোদের রূপোলি ঝলমল। সঞ্চয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিতে হবে। মীনাক্ষী এক্ষুণি এসে পড়বে। এসে যদি দেখে সে তৈরি হয়নি তবে নিশ্চয়ই বেশ কিছুক্ষণ বকাবকি করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না-করে সঞ্চয় আলমারী খুলে দামি স্যুট বের করলো। প্যান্ট পরে সবে শার্টটি কোমরে গুঁজেছে সিঁড়ির বাবান্দায় পায়ের শব্দ। সঞ্চয় উন্মুখ হয়ে তাকালো। যাকে দেখবে বলে আশা করেছিল সে নয়, ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো রাখী। সেই ঘটনার পর এই প্রথম এলো রাখী। সঞ্চয় ভেবেছিল, মেয়েটি আর কখনও তার কাছে আসবে না। সেই পরিচয় তো রাখী সেদিনই পেয়েছে। তবে আজ আবার এসেছে কেন? সঞ্চয়, রাখীর মুখের দিকে তাকালো। কোনও কথা বললো না। কি-ই-বা বলবে সে, বলবার আর কিছুই নেই। যা জানবাব অনেক আগেই তা জানিয়ে দিয়েছে। রাখী মুখ খুললো। এতোটুকু ভনিতা করলো না, ভূমিকা করলো না, একরাশ লজ্জাও টেনে আনলো না সে। অত্যন্ত পরিস্কার সোজাসুজি কথা, নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে আবার এসেছি সঞ্চয়। করুণ সুরের কথাগুলি প্রথমেই মনকে স্পর্শ করে।

তুমি কি বলবে জানি। সঞ্চয় গম্ভীর হলো।

তুমি কিছুই জানো না। রাখীর গলায় কান্নার সুর। আমার মা এসেছেন এখানে। জড়িত কণ্ঠে রাখী বলতে শুরু করলো, আমার বিয়ে প্রায় ঠিক। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছেলেকে আমি ভালোবাসিনি আর বাসতেও পারবো না একমাত্র তোমাকে ছাড়া! তোমাকে ছাড়া আমি দ্বিতীয় আর কাউকেই ভাবতে পারছি না সঞ্চয়। আমি জানি, তুমি আমাকে লজ্জাহীনা, বেহায়া, অশালীন মেয়ে বলে ভাবছো কিন্তু আমার মনটা যদি তুমি দেখতে পেতে তাহলে আমাকে এমনটা ভাবতে পারতে না। তুমি আমাকে চাইছো না ঠিক কথা। আমি তোমাকে একমনে, নীরবে ভালোবেসে চলেছি। বলতে পারো যে, একপক্ষের ভালোবাসায় তোমাব কিছু আসে-যায় না! কিন্তু আমাব সারা মন যে প্রতিটি মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সেই ব্যথা তো আমারই। গরজ আমার, তোমাব দায় কীসের? তাই আমাকে বারবার ছুটে আসতে হয় তোমার কাছে। তোমার কাছে অপমানিত হয়ে সেই তোমাকেই ভালোবাসতে ইচ্ছা করে; আমাব এই ইচ্ছাটাকে তুমি শেষ করে দাও সঞ্চয়। সেই সঙ্গে আমাকেও। তোমাকে আর বিরক্ত করতে আসবো না।

এ-সব বলে আমার কাছে কি লাভ বলো? সঞ্চয় রাগ করতে পারলো না। বরং রাখীর প্রতি করুণায় সারা মন ছেয়ে গেল। শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলো, তোমার মা-বাবা যাকে পছন্দ করেছেন, তাকেই তোমার বিয়ে করা উচিত।

আমি পারবো না সঞ্চয়, পারবো না। রাখীর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। সঞ্চয় ওর দিকে তাকাতে পারলো না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এমন বিব্রত অসহায় পরিস্থিতিতে কেউ পড়ে সঞ্চয়ের জানা ছিল না। রাখীকে সে চায় না ঠিক কথা, কিন্তু একটি মেয়ের এমন স্বীকারোক্তি, করুণ কান্নার আবেদনকেও উপেক্ষা করতে মায়া হয়! অথচ সঞ্চয় নিরুপায়। রাখীকে ফিরিয়ে না-দিয়ে তার উপায় নেই। কান্না চেপে রাখী ভারী গলায় বললো, আমি তোমাকে কাছে পেতে চাইছি আর তুমি আমাকে দূর করে দিতে পারলেই বেঁচে যাও। কি আশ্চর্য বলো দেখি! তবুও তোমার ওপর রাগ করতে পারি না। তোমাকে ঘৃণা করতে পারলে বোধহয় বেঁচে যেতাম, ঘৃণাও জাগে না। সঞ্চয়ের পিঠের ওপর নিজের মুখখানা চেপে ধরলো রাখী। কাঁদছে সে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। সঞ্চয় নিজেকে ভারী অসহায় বোধ করলো। এটুকু বুঝলো, তীব্র শাসনে বা কঠোর ভর্ৎসনায় কোনও কাজ হবে না। শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে রাখীকে বোঝাতে হবে। সে তাই করলো। এ-পাশ ফিরে

রাখীর মুখোমুখি হলো। অত্যন্ত স্নেহে কাছে নিল ওকে। চোখের জল মুছিয়ে, চিবুক স্পর্শ করে বর্ষা ভরা মুখখানা তুলে ধরে বললো, তোমার মা-বাবা যাকে পছন্দ করেছেন, তাকেই তুমি বিয়ে করো। তুমি সুখী হবে রাখী আমি বলছি, তুমি সুখী হবে। তোমার এই মানসিক অবস্থার মধ্যে আমি যা বললাম সেটা পালন করতে খুবই কষ্ট হবে কিন্তু পরে দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। কারো অভাবেই কোনও কিছু আটকায় না। সময় মানুষের সবচেয়ে বড়ো ওষুধ। সেই সময়ই তোমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দেবে। না-দিয়েই পারে না। নয়তো মানুষ এতো দুঃখ-কষ্ট পেয়ে কি করে বেঁচে থাকে? তুমিও আমাকে তেমনি ভাবে ভুলে যাবে। এখন যেটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে তখন সেটা কতো সহজ বলে মনে হবে! জানো তো আমাদের সংসারের নিয়মটাই এমনি। ভালোবাসা হয় একজনের সঙ্গে, বিয়ে করতে হয় অপরজনকে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখো বিয়ের পরে তারা কেউই অখুশি বা অসুখী নয়। আমার সঙ্গে তখন যদি তোমার দেখা হয়, তুমিও নিশ্চয়ই মনে মনে ভাববে, ইস্! এই লোকটাকেই বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম, তাহলে কি আজকের মতো এমন সুখী হতে পারতাম? এমনটাই হয় রাখী!! ছোট্ট মেয়েকে আদর করার মতো সঞ্চয় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলো সঞ্চয়......থেমে পড়লো। ড্রেসিং-টেবিলের বড়ো আয়নায় ছায়া পড়লো মীনাক্ষীর। সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে তাকালো। মীনাক্ষী সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে তাদেরই দিকে! সে-দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্য। সে-দৃষ্টির সঙ্গে সঞ্চয় এর আগে কখনও পরিচিত হয়নি। কোথায় গেল মীনাক্ষীর সেই আয়ত চোখের কোমল দৃষ্টি। যে-চোখে সারাক্ষণ স্নিগ্ধতার কাজল লাগানো থাকতো সেই চোখে এখন আগুন জ্বলছে। রাগ-বিদ্বেষ আর ঘৃণার আগুন জ্বলছে মীনাক্ষীব চোখে। নিজের পাতলা ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে সজোড়ে কামড়ে ধরেছে। কেটে গেছে অনেকটা। ঠোঁটে রক্তের রেখা। সঞ্চয় বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। মীনাক্ষীর দিকে তাকালে সে বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মীনাক্ষী আর দাঁড়ালো না। পা বাড়ালো সিঁড়ির দিকে। তার পা দুটি টলছে। কাঁপছে সারা দেহ। আর একটি মুহূর্তও সে এই বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে পাববে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। কী যেন একটা পিন্ডের মতো বুকে আটকে রয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মীনাক্ষীব। তিল তিল করে গড়া স্বপ্নগুলি হঠাৎ একটা ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে কোথায় যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টুকবো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে মীনাক্ষী তার হিসেব পেল না। টলতে টলতে সে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ গিয়ে পৌঁছালো। সঞ্চয় যেন এতোক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। মীনাক্ষী চলে যেতেই সে সম্বিৎ ফিবে পেল। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পথ আটকালো মীনাক্ষীর।

তুমি চলে যাচ্ছো যে?

পথ ছেড়ে দাও। অনুনয়—নয় মীনাক্ষীর কণ্ঠে আদেশের সুর। একটা ভন্ড, প্রতারক, মিথ্যেবাদী।

ঘরে চলো মীনাক্ষী। মিথ্যে উত্তেজিত হয়ো না। তুমি যা বললে তার একটিও আমি নই। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি। এই ভাবে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না ঘরে চলো।

আর ঘরে নয়।

তোমাব সঙ্গে আর সম্পর্ক নয়—কথাটা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লো মীনাক্ষী। তুমি ভুল করছো। প্রচন্ড ভুল করছো! তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। আমি তা হতে পারি না। আমাকে এতো সহজে বিচার করে আমি যা নই সেই মিথ্যার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ো না।

তুমি আমাকে মিথ্যে বোঝাতে এসো না। বোঝাতে পারবে না। আমি নিজের চোখে যেটা দেখেছি সেটা অবিশ্বাস করবো কেমন করে? তোমাব সঙ্গে কথা বলতেও এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে। আসলে তুমি এতোটা নীচ তা কি আমি আগে ভাবতে পেরেছিলাম। তুমি প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক বলেই তো তোমার বন্ধু অরোরার মিথ্যে কাহিনী শুনিয়ে নিজেকে বড়বেশি সৎ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলে। আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

আমি কি সত্যিই সৎ নই? এবারে কঠিন হলো সঞ্চয়। সেই রাতের কথা চিন্তা করে তো সারা রাত তুমি আমার কাছে থেকেছিলে। আমি যদি অসৎ, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক হবো, ভালোবাসার ব্যবসা করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হবে, তাহলে সেদিন তোমার সম্মানটুকু নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ থাকতো

না! তুমিই চিন্তা করে দেখো মানীক্ষী, আমি ভন্ড নই বলেই তো তোমার সঙ্গে সেদিন বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছি। আমি নীচ নই বলেই তোমার সঙ্গে নীচতা করতে পারিনি। এ-সব কি তুমি একবারও ভেবে দেখবে না? আগে-পরে কিছু জানলে না, মাঝখানে কি দেখলে-না-দেখলে তার ওপর নির্ভর করে আর মনগড়া কিছু কাল্পনিক কাহিনী সাজিয়ে নিজে তো দুঃখ পাচ্ছোই সেই সঙ্গে আমাকেও অত্যন্ত ছোট করে হেয় প্রমাণ করার চেষ্টা করছো। এতে ক্ষতি আমাদেরই মীনাক্ষী। তুমি শুধু রাগারাগি না-করে মাথাটা একটু ঠান্ডা করো। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। রাখী তো ঘরেই রয়েছে। ওকেই তুমি জিজ্ঞেস করে দেখো—

সে-প্রবৃত্তি আমার নেই। যে-চোর, চুরি করার মধ্যে তারও যুক্তি থাকে। সুতরাং হাতে-নাতে ধরা পড়ে তুমি এখন হাজারো কথার বিন্যাস ঘটাবে সেটা আর বেশি কি? কিন্তু আমি? নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়লো মীনাক্ষী। এরপরে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো বলতে পারো! যাকে ভালোবেসে নিঃশেষ হতে চেয়েছি, সে আমাকে তার একটা শিকার ছাড়া অন্য কিছুই ভাবেনি। তুমি আমাকে এমন করে কেন শেষ করলে, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। আমি যে আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারবো না.....

সত্য-মিথ্যা যাচাই না-করে জোর করে তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো মীনাক্ষী। তুমি এখন অসুস্থ। তাই বড়বেশি অবুঝ হয়েছো। আমাকে তুমি যা খুশি তাই বলেছো তবুও তোমার ওপর আমি এতোটুকু রাগ করিনি। তুমি একটু স্বাভাবিক হলেই বুঝতে পারবে আমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। তখন নিজেই লজ্জা পাবে। সঞ্চয় মীনাক্ষীর কাঁধে একটি হাত রাখলো। সেই থেকে কেঁদেই চলেছো। ছিঃ। অতো কথা শুনলো না মীনাক্ষী। এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, ওই হাতে আমাকে স্পর্শ করবে না তুমি।

আমার দুর্ভাগ্য তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না, অসহায়ের সুরে বলে উঠলো সঞ্চয়। এরচেয়ে বড়ো সাজা কি হতে পারে? আমার কোনও কথাই শুনতে চাইছো না। অথচ তুমি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বসে আছো। তোমার কথাই ধরে নিলাম, আমি অপরাধী। কিন্তু অপরাধী হলেই যে তার কোনও বক্তব্য থাকবে না, সেটা তো ঠিক নয়। তুমি ঘরে এসো। রাখী সামনে রয়েছে। সব ঘটনা তোমাকে আমি একে একে বলে যাবো। তাহলেই বুঝতে পারবে। সঞ্চয় একটু থামলো। শান্ত গলায় আবার বললো, তুমি এমন ভাবে পাল্টে যেয়ো না মীনাক্ষী। তোমাকে যেমন ভাবে চিনেছি, তেমনি ভাবেই চিনতে দাও। তোমার ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে শুধু এইটুকুই বলবো, আমি রাখীকে চিনি না, নীনাকে চিনি না, অন্য কাউকেই চিনি না—আমি শুধু তোমাকে চিনি মীনাক্ষী, শুধু তোমাকেই জানি!

এমন করে কথা বলতে না-পারলে কি সেল্‌সের এতো বড়ো অফিসার হওয়া যায়? অপূর্ব! মীনাক্ষী ব্যঙ্গের সুরে হেসে উঠলো। ওকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো সঞ্চয়ের। হাসি থামিয়ে মীনাক্ষী বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, আমি ভালোবেসেছি তাই ঠকেছি। আমি বিশ্বাস করেছি তাই সব হারিয়েছি। শয়তানকে সাধু ভেবেছি। বেইমানকে পুজো করেছি, অসৎকে হৃদয়ের মাঝখানে বসিয়েছি, আমি দুঃখ পাবো না তো কে পাবে? এই পৃথিবীটাই তো এমন। যে যতো বেশি ভালো, সে ততো বেশি কষ্ট পায়। এখানে ভালোর স্থান নেই। সঞ্চয়ের মুখের দিকে তাকালো সে। তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে। কি কান্ড বলো দেখি। যাও যাও ঘরে যাও—রাখী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে!!

কি ছেলেমানুষি করছো মীনাক্ষী। সঞ্চয় ওর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবার উদ্দেশে কাছে টেনে নিতেই ফুঁসলে উঠলো মীনাক্ষী। সঞ্চয়কে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো, লজ্জা করছে না? ধাক্কা খেয়ে দেওয়ালের গায়ে ছিটকে পড়লো সঞ্চয়। তবু মীনাক্ষীর ওপর রাগ করলো না। মীনাক্ষী না-হয় অবুঝ হয়েছে সেইজন্য কি তাকেও অবুঝ হতে হবে? শান্ত কণ্ঠে সঞ্চয় শুধু বললো, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মীনাক্ষী? আমাকে এতোটা সাধারণ পর্যায়ের ভাবতে পারছো কেমন করে? আমার পরিচয় কি তুমি পাওনি? মীনাক্ষী সে-কথার কোনও উত্তর দিল না। আপন মনে বলতে

লাগলো, আমি পাগল! ঠিক বলেছো তুমি, আমি পাগল!! পাগল বলেই তোমাকে এতোদিন চিনতে পারিনি। আজ আমাকে তুমি একা পাগল বলে ডাকছো একটুখানি ভালোবাসা পাবার জন্য তুমিও একদিন পাগলের মতো ছোটাছুটি করবে, সহস্রলোকে তখন তোমাকে মহাপাগল বলে ডাকবে। লোকেই বিচার করবে, পাগল আমি না তুমি? কথাটা শেষ করেই কেমন যেন উন্মাদের মতো হেসে উঠলো মীনাক্ষী। সে আর দাঁড়ালো না। কক্ষচ্যুত তারার মতো সিঁড়ি ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় সঞ্চয় বিমূঢ়। মীনাক্ষীর অবুঝতার ফলে সে বোবা। স্নায়ুর চাপে তার দেহ-মন অবশ। অলস। ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো। রাখীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে উঠলো। তার জীবনের শনি। ওকে সঞ্চয় খুন করবে। মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। ভার ভার লাগছে। একসঙ্গে হাজারো চিন্তা এসে তাকে ছেয়ে ফেললো। নির্দিষ্ট একটিমাত্র চিন্তার মধ্যে মন ডুবে থাকছে না। একটা কথা ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র চিন্তায় আক্রান্ত হচ্ছে সঞ্চয়। কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে ভাববে সে? এই মুহূর্তে তার করণীয়ই-বা কি? কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সঞ্চয়। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মীনাক্ষীর সন্দেহের বিষ পান করে সে নীলকণ্ঠ হয়েছে। বিষের জ্বালায় জ্বলছে। রাখী পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে আসতেই সঞ্চয় দুই হাতে ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরলো।

আমার অভিশাপ, সর্বনাশ, তোমাকে আজ শেষ করেই ফেলবো। যেমন ভাবে আমাকে শেষ করেছো, তোমাকেও. ...

উঃ লাগছে! লাগছে সঞ্চয়!! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও আমাকে।

ছেড়ে দেবো? এতো সহজে!

ওয়াকরদে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ঘরে পা দিতে-না-দিতেই এমন দৃশ্য দেখে সে অবাক। বাবুজি রাখী মেমসাবের গলা টিপে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মুক্ত হবার জন্য রাখী মেমসাব সমানে চেষ্টা করে চলেছে। প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ওয়াকরদে। তারপরেই ছুটে গেছে। রাখীর গলা থেকে সঞ্চয়ের হাত দুটি ছাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, কি করছো বাবুজি, মরে যাবে যে? ছাড়া পেয়ে রাখী একটু দূরে সরে গেল। ব্যথার জায়গাটাতে বারবার হাত বোলাতে লাগলো। তাকালো সঞ্চয়ের দিকে। উসকো-খুসকো চুল। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ভাবলেশহীন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ওর যেন কোনও আগ্রহই নেই। ভারী মায়া হলো রাখীর। আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে সঞ্চয়ের কাছে। ক্লান্ত গলায় বললো, আমি মরে গেলে তুমি খুব খুশি হবে, তাই না সঞ্চয়? তোমার হাতে মরতে আমি আর ভয় পাই না। তবুও জানবো, তোমার অন্তত একটি খুশির কারণ আমাকে দিয়েই হয়েছে? সঞ্চয় একটি কথারও উত্তর দিল না। কথাগুলি সে শুনেছে বলেও মনে হলো না। আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগিয়ে সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিল। বড়ো ঘুম পাচ্ছে তার। ঘুমিয়ে একটু শান্তি পেতে চায় সঞ্চয়।

পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে এলো, সঞ্চয় তখনও ঘুম থেকে উঠলো না। অনেকবার এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলো-ওয়াকরদে না-ডেকে অনেক রকম কায়দা-কৌশল করে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সঞ্চয় পরিত্রাণে ঘুমাচ্ছে।

সকাল শেষ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। গাছের মাথায় শেষ বিকেলের ছায়া। সঞ্চয়ের ঘুম ভাঙলো। জানলার পাশেই বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় কুলায় ফেরা পাখিদের জটলা। একটানা কিচির-মিচির শব্দের তরঙ্গে তারা মুখরিত। সঞ্চয় বিছানায় উঠে বসলো। স্নান করে সামান্য খাবার গ্রহণ করলো। বসবার ঘরে গিয়ে সোফায় দেহটা ছেড়ে দিল। সব কিছু কেমন যেন লাগছে। মনে হয় যা ঘটে গেছে সেটা যেন তার কাহিনী নয়। অন্য কারো হবে। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। যেন বিরাট এক শূন্যতা তাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। সেই শূন্যতার তরঙ্গে সে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। মানসিক চিন্তা আর অবসাদে আবার জর্জরিত হয়ে উঠলো সঞ্চয়। মনকে সান্ত্বনা দিল, শুধু শুধু সে এতো চিন্তা করছে কেন? সত্যিই তো সে কোনও অন্যায় করেনি। তাহলে সে কেন দুর্বল হয়ে পড়ছে? এই দুর্বলতা আর যার হোক তার অন্তত সাজে না। মীনাক্ষীর সঙ্গে এখন দেখা করে লাভ নেই। তাকে দেখামাত্র আবার আক্রমণ করবে, কথা শোনাবে। নয় তো

দেখাই করবে না। সে এক বিশ্রী কান্ড হবে তাহলে। বরং ওকে একটা চিঠি লেখাই ভালো। আগামীকাল অফিসে গিয়ে শঙ্করের হাতে দেবে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য।

পরদিন অফিসে গিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ কর্ম করলো সঞ্চয়। গতকালের জমে থাকা প্রতিটি ফাইলের কাগজপত্র দেখে একে একে সই করেছে. নতুন তিনজন রিপ্রেজেনটেটিভদের তাদের এলাকা বুঝিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে শেষে ডাকলো শঙ্করকে। ওর এলাকা বুঝিয়ে দিয়ে, করণীয় কাজের ব্যাপারে সামান্য পরামর্শ দিয়ে শেষে চিঠিখানা এগিয়ে দিল।

তোমার মীনাক্ষীদিকে এটা দেবে।

মীনাক্ষীদিরা আজ কলকাতা চলে গেছে।

চলে গেছে! একরাশ বেদনা ঝরে পড়লো সঞ্চয়ের কণ্ঠে। এতোটা সে ভাবতে পারেনি। মীনাক্ষীদের কলকাতা রওনা হবার দিন ছিল আগামীকাল। অথচ ওরা চলে গেছে আজকেই। সঞ্চয় সেটা জানবে কেমন করে? কোনওরকমে বললো, আচ্ছা তুমি যাও। চিঠিখানি টেবিলের ওপরে রেখে ধীরে পায়ে বেরিয়ে গেল শঙ্কর।

এই ঘটনার পর একে একে সাতটি বছর পার হয়ে গেছে। নয়াদিল্লি থেকে বদলী হয়ে সঞ্চয় আম্বালায় তাদের নতুন অফিসে এসেছে আরও উঁচু পদ নিয়ে। আম্বালাতেই তার প্রায় পাঁচ বছর হতে চললো। নয়াদিল্লিতে থাকতেই সঞ্চয় মীনাক্ষীকে চারখানা চিঠি লিখেছিল, কিন্তু একটি চিঠিরও উত্তর সে পায়নি। অবশেষে নিরুপায় হয়েই সবিতাকে জানিয়েছিল সেই অঘটনের কথা। সবিতা জানিয়েছে, "মীনাক্ষী কোনও কথা শুনতে চায় না, বুঝতেও চায় না। তুমি আর ওকে চিঠি লিখো না। তোমার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-ভাবে মীনাক্ষী ও গুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দেখে আমারই কষ্ট হয়। তাই বলছি তুমি মীনাক্ষীকে আর চিঠি দিয়ো না।"

মীনাক্ষী যখন তাকে অবিশ্বাস করে এতো দূরে ঠেলে দিয়েছে, তাকে বুঝবার সামান্যতম চেষ্টাও করেনি, আর উপযাচক হয়ে সঞ্চয় যখন আবার নৈকট্যের সেতু রচনা করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে সেখানে বোঝা-বুঝির আর কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফল যেখানে পাওয়া যাবে না. সেখানে পরিশ্রম করে লাভ কি? সঞ্চয় সে-চেষ্টা আর করেনি। তবে মীনাক্ষীকে ভুলে থাকবার অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি। অবসর সময়ে এবং হাজারো কাজের মধ্যেও মীনাক্ষীর লাবণ্যময় মুখখানা ভেসে ওঠে, তার কথা বারবার মনে পড়ে।

ঔরঙ্গাবাদ সিটিতে কোম্পানির দু'দিনব্যাপী কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়ে আম্বালায় ফিরে যাচ্ছে সঞ্চয়। মানমাড জংশন থেকে ট্রেন ধরে প্রথমে সে নাগপুরে যাবে। সেখানে অফিসের কাজে একটি দিন থেকে পরের দিন প্লেনে আম্বালা রওনা হবে।

মানমাড জংশনে ট্রেন আসবে রাত একটা বেজে আট মিনিটে। হোটেল থেকে যথা সময়েই বেরিয়ে পড়লো সঞ্চয়। কিন্তু ঠিক মতো ট্যাক্সি না-পাওয়ার দরুণ অনেকখানি সময় নষ্ট হলো। স্টেশনে গিয়ে যখন পৌঁছালো, ট্রেন ছাড়তে তখন মিনিট চারেক বাকি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে, অ্যাটাচিকেসটি হাতে নিয়ে সঞ্চয় জোরে পা চালালো প্ল্যাটফরমের দিকে। যাত্রীদের ভিড় কম নয়। প্ল্যাটফরমের ওপরেই অনেকে শুয়েছিল, ঘুমিয়েছিল। সকলেই জেগে উঠেছে। ফেরিওয়ালাদের চিৎকার আর যাত্রীদের ব্যস্ততার ফলে মানমাড জংশন মাঝরাতেও মুখরিত। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্চয় ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে প্রথমশ্রেণীর কামরার দিকে এগোতে লাগলো। দরজার কাছাকাছি আসতেই তার দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এলো। সঞ্চয় ভুল দেখছে না তো! সে কি ঠিক দেখতে পাচ্ছে? সামনেই মীনাক্ষী। তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। না, সঞ্চয় কক্ষনও ভুল করতে পারে না। হোক সাত বছর পর তবুও মীনাক্ষীকে চিনতে তার ভুল হতে পারে না। সঞ্চয় ওর দিকে তাকালো। আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে। সিঁথির পথটুকুতে সূর্যাস্তের শেষ আভা। মীনাক্ষীর বিয়ের খবর অবশ্য আগেই পেয়েছিল সঞ্চয়। আম্বালায় আসবার মাসখানেক পরেই সবিতার একটি চিঠিতে সেটা জানতে পেরেছিল। সঞ্চয় দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ভাবতেও অবাক লাগে, বাংলাদেশের যে মেয়েটিকে সঞ্চয় একদিন হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতো সেই তাকেই আবার বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর

মহারাষ্ট্রের একটি রেলওয়ে জংশনে দুপুর রাতে দেখতে পাবে এটা সত্যই অভাবনীয়। অকল্পনীয়! মীনাক্ষীকে কেন্দ্র করে সঞ্চয় অনেক কিছু কল্পনা কবেছে কিন্তু এমনটা কোনোদিন ভেবেও দেখেনি। বাঁশি বেজে উঠলো। এক্ষুণি ট্রেন ছাড়বে। সঞ্চয় দরজাব দিকে পা বাড়াতেই মীনাক্ষীর সেই ডাক শুনতে পেল, 'সঞ্চয়'! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। মীনাক্ষী তাকে কতো অপমান করেছে তবুও তার সেই ডাককে উপেক্ষা করে সঞ্চয় কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারলো না। কেমন যেন বিহ্বল উদাস দৃষ্টিতে মীনাক্ষী তাকিয়ে আছে তার দিকে। বড়ো কারুণ্যময় সেই দৃষ্টি। সঞ্চয় ওর চোখের দিকে তাকালো। ট্রেন ততোক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। প্ল্যাটফরম ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। সঞ্চয় গতিময় ট্রেনের দিকে একবার তাকালো। এখনও দৌড়ে গিয়ে ট্রেনটিকে হয়তো ধরা যেতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে মীনাক্ষীকে উপেক্ষা করা যেতে পারে কি? না, সঞ্চয় তাকে অবহেলা করতে পারবে না। ট্রেনখানা চোখের আড়াল হতেই সঞ্চয় ম্লান হাসলো।

যেতে দিলে না তো? মীনাক্ষী সে-কথার উত্তর না-দিয়ে দু'চোখ ভরে শুধু সঞ্চয়কে দেখতে লাগলো। বললো, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো সঞ্চয়।

বয়েস তো বাড়ছে। সঞ্চয় হাসবার চেষ্টা করলো।. তাছাড়া, অফিসে আজকাল ভীষণ কাজের চাপ। আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি এখানে?

অজন্তা, ইলোরায় এসেছিলাম। নাসিকে ফিরে যাচ্ছি।

তোমার স্বামীকে দেখছি না যে?

উনি স্টেশন মাষ্টারের কাছে গেছেন। মুহূর্তে নীরবতা নেমে এলো দুজনেব মধ্যে। যেন সব কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু বলার নেই। মৌনতার মধ্যেই কাটলো কিছুক্ষণ। দুজনেই অনেক কথা বলতে চাইছে। কিন্তু হাজাবো কথা একসঙ্গে এসে ভিড় করছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে বলবে? মীনাক্ষী অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, বিয়ে করোনি কেন?

ইচ্ছে নেই বলে। প্রতিটি কথা হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছে সঞ্চয়। মীনাক্ষী ওর চোখেব ওপর থেকে নিজের চোখ দুটি সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরালো, আগে তো ছিল।

আগের কথা আলাদা। এখনকার কথা অন্য।

আমি একটা কথা বলবো! অত্যন্ত কোমল সুরে মীনাক্ষী বললো, তুমি রাখীকেই বিয়ে করো।

তোমার সন্দেহটাকে সত্যি প্রমাণ করতে? একটু চুপ করে থেকে সঞ্চয় আবাব বললো, রাখীকেই যদি বিয়ে করবো সেটা তো অনেক আগেই করতে পারতাম। কিন্তু তেমনটা যে আমি কোনোদিন, কখনও ভাবিনি। যেদিন তুমি আমাকে সন্দেহ করেছিলে, সেই দিনও নয়। সেদিন আমি...

চুপ করো সঞ্চয়, চুপ করো।

আজও আমাকে বলতে দেবে না?

আমি সব জানি। এরমধ্যে দু'বার দিল্লিতে গিয়েছি। আরউইন হাসপাতালে রাখীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ও ওই হাসাপাতালের ডাক্তার। রাখী আমাকে সব বলেছে সঞ্চয়। সব বলেছে। তোমার এতোটুকু দোষ নেই। দোষ তো আমার। তোমার মতো ছেলেকেও আমি শঠ, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক বলে কতো কথা শুনিয়েছি। সেই সব ব্যথা কি আমার বুকে ফিরে আসেনি বলতে চাও? তুমি আর কতোটুকু দুঃখ পেয়েছো তার চর্তুগুণ যন্ত্রনায় আমি সারাক্ষণ দগ্ধ হচ্ছি। তোমার চারখানা চিঠির একটিও আমি পড়িনি। সব কটি ছিঁড়ে ফেলেছি। সেই কষ্ট কি আমার থেকে তোমার বেশি? না-না! তা হতে পারে না। সেই ব্যথা একান্তই আমার। দিল্লিতে দু'বার গিয়ে প্রতিবারেই ভেবেছি ভাটকল লেক দেখতে যাবো। কিন্তু একবারও যেতে পারিনি। বারবার মনে পড়েছে তোমার কথা...যে মানুষটার সঙ্গে ভাটকল লেক দেখতে যাওয়ার কথা ছিল সেই মানুষটা তো আজ আমার পাশে নেই....মীনাক্ষী সঞ্চয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

ইতিমধ্যে আর একটি ট্রেন এসে থামলো। নাগপুর প্যাসেঞ্চার। এই ট্রেনে সঞ্চয়কে যেতেই হবে। নয়তো নাগপুরে পৌছে অফিসের কাজ করে নির্দিষ্ট প্লেন ধরতে পারবো না। সঞ্চয় বিদায় চাইলো। ওর মুখের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো মীনাক্ষী। চোখ দুটিতে ক্রমশ জল ভরে

আসছে। ক্ষীণ কণ্ঠে মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলো, আবার কবে দেখা হবে সঞ্চয়?

আবার হয়তো সাত বছর পর এমনি ভাবেই কোনোদিন কোন এক স্টেশনে দেখা হতে পারে।

শরীরের ওপর যত্ন নিয়ো। তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভেঙে গেছে। ওয়াকরদে কি আজকাল তেমন যত্ন নেয় না।

নেয়। তবে মন-প্রাণ ঢেলে তেমন আর কাজ করে না। রাত-দিন শুধু তোমার উদ্দেশ্যেই গালাগাল করে। একটু থামলো সঞ্চয়। ধরা গলায় বললো, আমার বন্ধুর খবর কি?

বুলা এখন বড়ো হয়ে গেছে। এবারে সেভেনে উঠবে। লেখাপড়ায় বেশ ভালো হয়েছে।

আমার কথা কি ওর মনে আছে? দেখলে যদি চিনতে পারে!

ট্রেন ছেড়ে দিল। সঞ্চয় এতোক্ষণ হেসে কথা বলছিল। এখন আর হাসতে পারছে না। শেষ মুহূর্তে একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলো না। গলা বুজে আসছে। এতোক্ষণের ধরে রাখা জল এবারে আর বাধা মানলো না। দু'গাল বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগলো। সঞ্চয়কে নিয়ে ট্রেনটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। মীনাক্ষী হাত নেড়ে বিদায় জানালো। ট্রেনটা চলে যাচ্ছে....দূরে....অনেক দূরে...ট্রেনের পিছনের লাল আলো দুটি রক্তচক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছে। জমাট অন্ধকারের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। মীনাক্ষী চেয়ে রইলো সেই দিকে। সেই আগুন কি তার বুকেও জ্বলছে না?

পৃথিবীর উজ্জ্বল তুমি



ক্যালকাটা ইনডোর স্টেডিয়ামে আজ থেকে শুরু হলো লোকের আনাগোনা। অনুষ্ঠান চলবে পুরো সাতটি দিন ধরে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। এই নৃত্যনাট্যে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কবিতা কাপূর। তেইশ বছরের পাঞ্জাবী মেয়েটা ইতিমধ্যেই বহু নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিজ প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছে। বহু কৃতিত্বের ও সুনামের অধিকারিণী কবিতা কাপূর গত তিন বছর ধরে একান্ত ভাবে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তাব কোমল মনে দাগ কাটে, সেদিন থেকেই সে করেছে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আজ সে সফল। সম্প্রতি মুম্বাই শহরে বাঙালি ক্লাবের উদ্যোগে বান্দ্রা অঞ্চলে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে, কলকাতা ফাইন আর্টসের একান্ত অনুরোধে কবিতা কাপূর তার সহশিল্পীদের নিয়ে এসেছে এখানে। অনুষ্ঠান শেষে আবার ফিরে যাবে মুম্বাই। সেখানকার যম্মুখানন্দ হলে তার আরও দুটি নৃত্যানুষ্ঠানের প্রোগ্রাম বাকি রয়েছে।

কলকাতায় কবিতা কাপূর অবশ্য এর আগে বহুবার এসেছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের ডালি নিয়ে নয়—তখন এসেছিল বিভিন্ন ফাংসানে— গরবা, মণিপুরি, ভারত নাট্যম, কত্থক নৃত্যের আসরে। নৃত্য শেষে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা। জয় করেছে সহস্র মানুষের মন। নৃত্যজগতে একটি স্থায়ী, অতি সুপরিচিত নাম কবিতা কাপূর। তাই তার নাচ দেখবার জন্য ইনডোর স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ণ। স্টডিয়ামের ভেতর যারা প্রবেশ লাভ করতে পেরেছে তারা সৌভাগ্যবান। আর যারা টিকিট পায়নি, তারা বিমর্ষ হয়ে ভিড় করেছে প্রবেশ পথের সামনে। পুলিশ দলবেঁধে ভিড় সরাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ের মতো অসামান্য ভিড়কে কেমন করে আয়ত্তে আনবে পুলিশ? কেউই নড়তে চাইছে না সেখান থেকে। পুলিশ সরিয়ে দিচ্ছে তো অপর এক জায়গায় গিয়ে আবার তারা ভিড় করছে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হতে এখনও আধঘণ্টা দেরি। আর একটু পরেই এসে পড়বে দক্ষিণ ভারতের তেইশ বছরের সুঠাম দেহের অধিকারিণী পাঞ্জাবী নৃত্যপটিয়সী কবিতা কাপূর। দর্শকরা তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়! এতো কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়তো আর হয়ে উঠবে না। ঠিক সেই কারণেই পুলিশের সহস্র তাড়া খেয়েও জনতা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত ছোটখাট একটা খণ্ডযুদ্ধই বেধে গেল দর্শকদের সঙ্গে পুলিশের। অবস্থা আয়ত্তে আনতে ছুটে এলেন পুলিশের বড়ো কর্তারা। সঙ্গে ফাইন আর্টসের কর্মকর্তা। এবং ভলান্টিয়ারগণ।

ফাইন আর্টসের সেক্রেটারী ভবেশবাবু তার বিরাট 'বুইক' গাড়িখানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তিমিরকে।। কবিতা কাপূরকে হোটেল থেকে নিয়ে আসতে। তিমির সাংবাদিকতা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেছে। বর্তমানে তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় সে এই বাংলার একজন কৃতি তরুণ সাংবাদিক।

ধর্মতলাতে নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে এসে ড্রাইভার গাড়ি থামালো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়লো তিমির। বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো সে। তার মনে সন্দেহ জাগলো, কলকাতার সমস্ত লোক কি এইখানে এসেই ভিড় করেছে? তিমিরের মনে হলো স্টেডিয়ামের বাইরে যতো লোকের ভিড় দেখে এসেছে, তার চেয়েও প্রচন্ড জনসমাবেশ এখানে। তিমির মনে মনে স্বীকার করলো, কবিতা কাপূর নামী শিল্পী। সেটা অস্বীকার করার অবশ্য কারোরই উপায় নেই। কিন্তু তার জনপ্রিয়তার ঢেউ যে এমন উত্তাল, পরিব্যাপ্ত সেটুকু স্বীকার করলো তিমির আজকের এই বিশাল ভিড় দেখে। অত্যুৎসাহী দর্শকদের মেলা দেখে। দর্শকদের কথা থাক। তিমির নিজেও কি একদিন ওই কবিতা কাপূরকে একটুখানি

কাছ থেকে দেখার জন্য ছোটাছুটি করেনি? বছর দুই আগে কবিতা কাপূর নেচেছিল রবীন্দ্র সদনে। সেদিন তিমির সাংবাদিক হিসাবে আজকের মতো এতো নাম করেনি। হ্যাঁ, এই দুই বছরেই তিমির যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। রবীন্দ্র সদনে নাচ দেখেছিল তিমিব কবিতা কাপূরের। বেশ কিছুটা দূর থেকেই। সঙ্গে ছিল আরও কয়েকজন তরুণ সাংবাদিক বন্ধু। নাচ চলার মধ্যেই এক বন্ধু বলেছিল, কি রিপোর্টিং করবো বলতো? এমন সুন্দর নাচ দেখলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। আব এক বন্ধু উত্তব দিয়েছিল, সত্যি! কবিতা কাপূর দারুণ নাচতে পারে। ওঁব কোনও তুলনা হয় না। নাচ শেষ হতেই সেদিন বিপোর্টাব আব ফটোগ্রাফাবেব দল একসঙ্গে ছুটে গিয়েছিল কবিতা কাপূরের কাছে। মুহূর্তে তাকে ঘিবে ধবেছিল সবাই। কে কার আগে কবিতার কাছে পৌঁছাতে পাবে, তারই যেন ছোট্ট একটি প্রতিযোগিতা দেখেছিল তিমির। অস্বীকার করার উপায় নেই। সেদিন তিমিবও এগিয়ে গিয়েছিল। তবে তথাকথিত নামী সাংবাদিকদের ভিড়ে সে কবিতাব ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেনি।

হোটেলের সিংহ দবজা দিয়ে কবিতা বেরিয়ে আসতেই দর্শকরা একেবারে ছেঁকে ধরলো তাকে। পায়ে চলার পথটুকু হলো সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতবো। অতি অতুৎসাহী জনাকয়েক দর্শক অর্থাৎ অটোগ্রাফ শিকারীব দল কাগজ-কলম এগিয়ে দিল। অনুরোধ, অটোগ্রাফ দিতেই হবে। মিষ্টি করে হাসলো কবিতা। খুশির হাসি। সন্তুষ্টের হাসি। সর্বোপরি জযের হাসি। যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গোটা কয়েক অটোগ্রাফ দিয়ে গাড়িব মধ্যে পালাতে যেতেই বাধা পেল আবার। অবশেষে পুলিশের সহায়তায় কোনওমতে গাড়িতে গিয়ে বসলো কবিতা।

গাড়ির পিছনেব সিটে কোমল দেহটা এলিয়ে দিল সে। গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভাব। তাব পাশে বসে আছে তিমির। তাকিয়ে রয়েছ বাইরেব দিকে। নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে। যেন ভারত বিখ্যাত এতো বড়ো একজন শিল্পীব সঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়ায় তাব মনে কোনও আনন্দেব সঞ্চাব হচ্ছে না। অথবা আনন্দেব সঞ্চাব হয়েছে বলেই কি সে নীরব? কোনটা কে জানে? তিমিব কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। দুই বছর আগে কবিতা কাপূরের কাছে পৌঁছাতে না-পারার ঘটনাটা যেন অযাচিত ভাবে উপহার হয়ে আজ তার কাছে ফিবে এসেছে। কবিতা ও সে আজ একই গাড়িতে। তিমিবের একবার ইচ্ছা হলো, ঘটনাটা কবিতাকে শোনায। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। না। কখনও সে উপযাচক হয়ে ও-সব বলবে না। অতো বড়ো একজন শিল্পীকে নিজেব থেকে বলতে যাওয়ার অর্থ-ই হলো স্তাবকতা করা। তার কাছে ধবা দেওয়া। তিমিব নিজেকে অতো সহজ করে তুলে ধরতে চায় না।

তিমিরের দিকে এতোক্ষণে ভালো করে দৃষ্টি পড়লো কবিতার। তার চঞ্চল কালো হরিণ চোখ দুটি এবারে স্থির হলো। দেখলো তিমিবকে চুরি করে। স্বাস্থ্যোজ্বল চেহারায পরনের পাঞ্জাবিটা ওকে মানিয়েছে সুন্দর। আর পাঞ্জাবির কাঁধ প্রায় চুম্বন করে নেমে এসেছে একমাথা কোঁকড়ানো চুল। চুল আর পাঞ্জাবিব মাঝের ফাঁকটুকু দিয়ে দেখা যাচ্ছে গায়ের হলুদ বর্ণটুকু। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো কবিতা। সবার অলক্ষ্যে, অজান্তে এমনি চুরি করে দেখতে বেশ লাগে।

সুসজ্জিত স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াতেই দর্শকরা সমবেত ভাবে দীর্ঘ করতালির মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানালো কবিতা কাপূরকে। উত্তরে পাতলা ঠোঁট দুটি টিপে মিষ্টি করে হাসলো কবিতা। হাত জোড় করে উপস্থিত দর্শকদেব নমস্কার জানাতে সে ভুললো না।

নাচ শেষ করলো কবিতা। এমন নাচ অনেক দিন কলকাতার দর্শকরা দেখেনি। অথবা আদৌ দেখেছে কি? বিশেষ করে অর্জুন যখন চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দিশেহারা, অসহায়া চিত্রাঙ্গদার মনে জেগেছে তখন দুঃখের ঢেউ। জেগেছে মহানিশা। নেপথ্যে শিল্পীর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে গান "রোদন ভরা এ বসন্ত" ধীর লয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে নেচেছে কবিতা। চিত্রাঙ্গদার চাপা ব্যথা কবিতাব নৃত্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। মূর্ত হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সব কিছু ছায়াছবির মতো নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে যেমন জীবন্ত করতে পেরেছে, ঠিক তেমনি হরিণ চোখের নীরব চাউনির মধ্য দিয়ে চিত্রাঙ্গদার মূক বেদনাকে সুন্দর ভাবে ভাষা দিয়েছে।

অনুষ্ঠান পর পর তিন দিন হলো। আজ চতুর্থ দিন। বিশ্রামের দিন কবিতার। তখন সকালবেলা। স্নান সেরে একটু হালকা প্রসাধন সেরে নিল সে। খাবার টেবিল তখন প্রস্তুত। বসতে যাবে, এমন সময়েই কলিং-বেলটা অশান্ত ভাবে একটা চিৎকার দিয়ে উঠলো। যেন ছোট্ট একটি ছেলেকে কেউ চড় বসিয়েছে। তাই সে অমন কঁকিয়ে উঠলো। দরজা খুলে দিল কবিতা। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তিমির। পরনে হালকা আকাশী রঙের স্যুট। হাতে পোর্টফলিও ব্যাগ, কবিতার মুখে বৃষ্টি ধোঁয়া সতেজ হাসি। আপনি! অস্ফুট স্বরে বললো সে। সে-কথার কোনও উত্তর দিল না তিমির। শুধু বললো, ভেতরে আসতে পারি?

নিশ্চয়ই। আসুন।

কবিতার মুখোমুখি সোফাটায় বসলো তিমির। চাইলো কবিতা কাপূরের মুখের দিকে। দীঘল চোখে পুরু করে কাজল আঁকা। চোখের ওপরের পাতার কোণেও কাজলের টান। পরনে মেরুণ রঙের শাড়ি। ওই রঙেরই ব্লাউজ। টানা দুই ভ্রূর মাঝখানে একই রঙের মাদ্রাজী টিপ। অনেক মেয়েরা যেমন ছোট্ট করে টিপ পরে, তেমনটা নয়। বেশ বড়ো করে টিপ পরেছে কবিতা। টিপ-এর রংটা যদি লাল হতো তাহলে মনে হতো যেন সূর্য উঠছে। মাথার চুল সারা পিঠময় ছড়ানো। কান দুটি ঢাকা পড়েছে সেই চুলের অরণ্যে। গলায় মোটা কালো পাথরের মালা। সব মিলিয়ে কবিতাকে অপূর্ব লাগছে। কবিতা এমনিতেই সুন্দরী। কিন্তু আজকে সকালের এই কবিতা যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা। তিমির বললো, সব সাংবাদিক যা করে থাকে, আমারও ঠিক তাই করা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাকে আগে থেকে কোনও খবর না-দিয়ে হুট করে চলে এসেছি বলে ক্ষমা করবেন।

আপনি.. . . . মানে আপনি রিপোর্টার! বিস্ময় তথা আনন্দের চাপা সুরে, একটু হাসি লুকিয়ে জানতে চাইলো কবিতা। আর কোটের বুক পকেট থেকে তৎক্ষনাৎ পরিচয়পত্রের ছোট্ট কার্ডখানা মেলে ধরলো তিমির কবিতার সামনে।

আপনাকে কিন্তু আমি অবিশ্বাস করিনি। স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল কবিতা। কিন্তু স্পষ্ট ভাবে কার্ডখানার ওপরে চোখ দুটি বোলাতে পারলো না। কেন-না, এ-দেখার মধ্যে যেন লজ্জা আছে। এ-লজ্জা একান্তই কবিতার। তিমিরের পরিচয়ে সন্দিহান হয়ে এ-যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করা। কিন্তু ব্যাপারটা তো সত্যই তা নয়। কবিতার এই মৌনমুখর লজ্জা হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে তিমির বললো, 'কার্ডখানা আমার দেখানো কর্তব্য, আর আপনারও উচিত ওটা দেখা।'

কবিতা তাকালো তিমিরের চোখের দিকে। একপলক মাত্র। তারপরেই আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। বললো, এই তিনদিন ধরে আপনাকে দেখলাম ফাইন আর্টসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে। আর আজ দেখছি সাংবাদিকের পরিচয়ে। একটু পার্থক্য আছে না এই দুটোর মধ্যে? তাই একটু অবাক হয়েছিলাম, এর বেশি কিছু নয়। তবে, একটু থামলো কবিতা কাপূর। তিমিরের সারা মুখে আয়ত চোখ দুটি বুলিয়ে বললো, আপনি সাংবাদিক জেনে ভারী খুশি হলাম। আপনাদের এই সংবাদ আহরণ জীবনের সঙ্গে আমারও প্রত্যক্ষ ভাবে না-থাকলেও পরোক্ষ ভাবে কিছুটা যোগ আছে।

আপনি কি...... ..তিমির কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলো কবিতা। তাই ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো, না আমি নই। আমার বড়দা উইক্‌লী টাইম্‌সের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। সাত বছর হতে চললো বড়দা মারা গেছেন। তিনি কি বলতেন জানেন, বলতেন, সৈনিকের মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রে, সাংবাদিকের মৃত্যু সংবাদ-আহরণ করতে। এর বেশি সৌভাগ্য আর কি থাকতে পারে?

আপনার বড়দা বুঝি..........এবারেও কবিতা বুঝে নিল, তিমির কি বলতে চাইছে। তাই সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আসামের বন্যায় দুর্গতদের সংবাদ আনতে গিয়ে রাক্ষুসী বন্যার নিষ্ঠুর আলিঙ্গন থেকে বড়দা বাদ পড়লেন না। সাংবাদিকদের মহান ব্রত। কঠিন দায়িত্ব। দীক্ষা নিয়ে যাঁরা এই ব্রত পালন করেন, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আমার বাবার বৃত্তিও সাংবাদিকতা। তিনি মাদ্রাজ ইভিনিং-এর এডিটর।

সুরজিৎ কাপূর আপনার বাবা! কবিতা কাপূরের মুখ থেকে তার বাবার নাম শোনার জন্য

অপেক্ষা করতে হলো না তিমিরের। সেই-ই আগে কথাটা বললো।

হ্যাঁ। মৃদু হেসে উত্তর দিল কবিতা। একটু চুপ করে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনি বাবাকে চিনলেন কেমন করে?

তিনি তো অনামী লোক নন যে তাঁকে চিনবো না—তিমির উচ্ছল হাসলো। তাছাড়া লাইনটা দুজনেরই এক। সেই কারণেই তাঁকে চেনা আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। জানুয়ারিতে তিনি নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। সম্মেলন শেষে তাঁকে আমরা আমাদের পত্রিকা অফিস দেখাতে নিয়ে যাই। আপনার বাবার সঙ্গে অবশ্য আমার ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় হয়নি। সে-সুযোগও হয়ে ওঠেনি। কেন-না তাঁকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাতে আমাদের পত্রিকার সম্পাদকই সারাক্ষণ ছিলেন। আর ছিলেন পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদকরা। আমরা সাংবাদিকরা ছিলাম সেই ভিড়ের মধ্যে তার মধ্যে আমি আবার সবার পিছনে। একটু হাসলো তিমির। পরে বললো, সুতরাং বুঝতেই পারছেন, পরিচয় হবার মতো এতোটুকু সুযোগও পাইনি। একটু থেমে তিমির আরও যোগ করলো, আমি কিন্তু ভাবছি অন্য কথা।

কি? গলার মোটা কালো পাথরের মালাটা হাত দিয়ে নাড়াতে নাড়াতে কবিতা আশ্চর্য সুন্দর ভাবে তিমিরের দিকে তাকালো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকায় আপনার জীবনী বহুবার ছাপা হয়েছে। আমাদের কলকাতার যে-কটি পত্রিকায় আপনার কথা লেখা হয়েছে, প্রায় সবই আমি পড়েছি। কিন্তু কোথাও আপনার বাবার কথাটা লেখা হয়নি অর্থাৎ আপনি যে তাঁর মেয়ে সে-কথার উল্লেখ নেই। থাকলে আপনাকে চেনাটা আমার পক্ষে আরও বেশি সহজ হতো।

এবারে কফি বানাতে মন দিল কবিতা। সামনের আসনে বসে তিমির ওকে দু'চোখ ভরে দেখছে। কেমন শান্ত হয়ে কফি বানাচ্ছে। আশ্চর্য লাগে এই মেয়েটাই স্টেজে উঠলে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। অথচ এখনকার এই ঘরোয়া পরিবেশে কেমন শান্ত লাগছে। ওর দেহের দিকেও একবার না-তাকিয়ে পারলো না তিমির। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। কেমন করে এই দীর্ঘ সুঠাম দেহের ওপর জলের মতো ঢেউ খেলাতে পারে? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলতরঙ্গের মতো কাঁপায়, অফুরন্ত ছন্দ জাগায় ওই সরু কোমরটুকুকে কেন্দ্র করে। নাচবার সময়েই-বা এই দেহটাকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকেও বড়বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে কেমন করে? যতো ভাবে ততোই অবাক হয় তিমির।

খাওয়ার পাট চুকলে প্রয়োজনীয় যা কিছু জানবার, জিজ্ঞাসা করবার সবই করলো তিমির। কবিতা কাপূরের প্রতিটি উত্তর সে লিখে নিল তার খাতায়। পরিশেষে তিমির আর একটি প্রশ্ন করলো, নাচ ছাড়া আর কি জানেন? শিশুসুলভ হাসি হাসলো কবিতা। ছোট্ট সুরে বললো, গানও গাইতে পারি।

আচ্ছা! কবিতার প্রশংসা করলো তিমির।

রবীন্দ্র-সংগীত!

বলেন কি? লেখা থেকে এবার ওর মুখের দিকে তাকালো তিমির। কবিতাও রইলো ওর চোখের দিকে চেয়ে। যেন তিমিরের ওই দৃষ্টিকে বুঝতে চাইছে। সে রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারে। তা কি ভাবতে পারছে না তিমির? ওর সন্দেহ দূর করবার জন্য দৃষ্টি না-নামিয়েই কবিতা বললো, শুনবেন নাকি? এবারে হেসে দিল তিমির। সে-হাসিতে যোগ দিল কবিতাও।

নমস্কার জানিয়ে সোফা ছেড়ে তিমির উঠে দাঁড়াতেই, কবিতা বললো, আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক আসরে আপনি আসছেন তো?

না! ম্লান হাসলো তিমির। আমার ওপর কাজের যে-দায়িত্বটুকু দেওয়া হয়েছিল, তা আমি এইমাত্র পালন করলাম। সন্ধ্যার আসরে যাবেন অন্য একজন রিপোর্টার।

আর........থেমে পড়লো কবিতা কাপূর। কি যেন বলতে গিয়ে সহসা সে নিজেকে গুটিয়ে নিল।

বলুন।

আগামীকাল সন্ধ্যায় এখানে আসছেন তো?

কি ব্যাপার বলুন তো?

বাঃ এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। কাল থেকে যে আবার প্রোগ্রাম। স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবেন না?

ও। তিমির হাসলো। স্নিগ্ধ হাসি। ওতো আসতেই হবে।

পরিচয়ের পরিবর্তন করে কিন্তু আসবেন না। কবিতার কথাটা তিমির বুঝতে পারলো না। তাই জিজ্ঞেস করলো, মানে? খিলখিল করে হেসে উঠলো কবিতা। যেন জলতরঙ্গের ধ্বনি উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো, বলছি ফাইন আর্টসের কমকর্তা হিসেবে আসবেন না। আসবেন সাংবাদিক হিসেব। কর্মকর্তাদের চেয়ে আমি সাংবাদিকদেরই বেশি পছন্দ করি।

কিন্তু আমাকে যে কর্মকর্তা হিসেবেই আসতে হবে।

তা হোক। আমার চোখে আপনি সাংবাদিকই রয়ে গেলেন।

তিমিরকে যতো দেখে ততোই ভাল লাগে কবিতার। ওর কথা ভেবে সারাক্ষণ কাটিয়ে দিতেও বেশ লাগে। একটু একটু করে ওকে যেন ভালো লাগছে। অথচ কবিতা কদিন ধরেই-বা ওর সঙ্গে মিশছে? আর যেটুকু মিশেছে তাও পরিচয় গাঢ় হয়ে ভালো লাগার মতো এমন কিছু হয়নি। তিমিরের সঙ্গে যে কবিতার কথার বিনিময়ও খুব একটা হয়েছে তা নয়। তবুও সব মিলিয়ে কেমন যেন ভালো লাগে কবিতার ওকে। এই ভালো লাগার উৎস যে কোথায় তা সে বেশ জানে। আর জানে বলেই আরও বেশি চিন্তা করে তিমিরের সম্বন্ধে। কবিতার মনের এই গোপন কথা যদি কেউ জানতে পারে, তাহলে হয়তো তারা কবিতাকে নিন্দা করবে। অপবাদ দিতেও ছাড়বে না কেউ। তবুও লোকলজ্জাকে, লোকভয়কে আর প্রশ্রয় দেবে না কবিতা। তার মন বলে একটা সত্তা আছে। তখন তার স্বাদ-আহ্লাদ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা বলেও কিছু আছে। সে শিল্পী। সাধারণ মানুষের কাছে সে যেন আলাদা জগতের মানুষ। তাহলেও রক্ত-মাংসের তো শরীর। সুতরাং কামনা থাকবে বই কী। জীবনের সুদীর্ঘ তেইশটা বছর একে একে পার হতে চলেছে। নাচের মধ্যেই ডুবে ছিল এতোটা কাল। সংসারী হবে। স্বামী পাবে। ছেলেমেয়ের মা হবে। মেয়েদের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার এই সাধটুকু কোনোদিনও আঁকেনি কবিতা। কিন্তু আজ সে আঁকছে। দু'চোখ ভরে আঁকছে। তিমিরকে দেখার পর থেকেই সংসারী হতে ইচ্ছা হচ্ছে। স্বামীকে নিয়ে, স্বামীর আপনজন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিব্যি সংসারধর্ম পালন করবে। কতো সুখ। কতো আনন্দ, এ-সুখ, এ-শান্তি আর কোথাও পাওয়া যাবে না। নেচে কবিতা প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে সত্যি, কিন্তু এ গুলি নেচে পাওয়া যায় না।

সারা রাত ঘুমাতে পারলো না কবিতা। আগামীকালই চিত্রাঙ্গদার শেষ নৃত্যানুষ্ঠান। অর্থাৎ আগামীকালও তিমির তাকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যেতে আসবে। তারপরেই সব শেষ। তিমির পড়ে থাকবে কলকাতায়। আর তাকে মুম্বাই হয়ে চলে যেতে হবে মাদ্রাজে। এতোদিনে একটি কথাও বলেনি তিমির। ভালোলাগার কথা বলতে পারেনি কবিতাও। তবে তিমির কিছু না-বললেও চোখের নীরব ভাষা পাঠ করেছে কবিতা। বুঝে নিতে এতোটুকু অসুবিধা হয়নি তিমিরের ওই চোখ দুটি কি বলতে চায়? কিন্তু তা সত্ত্বেও তিমির হৃদয়ের একটি কথাও শোনাতে পারেনি। উপযাচক হয়েই এবারে বলতে ইচ্ছা হয় কবিতার। সময় যে আর নেই। কবিতা সব কথাই খুলে বলবে ওকে। ভারতের বহু জায়গা ঘুরেছে কবিতা। ঘুরেছে বিদেশও বেশ কয়েকবার। বহু ছেলেকেও দেখেছে। কিন্তু বিয়ে করে সংসারী হওয়ার স্বপ্ন আঁকতে পারেনি কোনও ছেলেকে দেখে। অর্থাৎ কোনও ছেলেই তার মনের সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলে আন্দোলিত, পল্লবিত করতে পারেনি। ঘুমিয়েই ছিল কবিতা। ওর সেই ঘুম সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে ভেঙে দিল তিমির। নৃত্যশিল্পী আর নয়— একজনের স্ত্রী হতে মন চাইছে।

ভালোলাগার উন্মাদনায় যে-উন্মত্ত মন নিয়ে ছিল কবিতা সহসা তা কাচের পাত্রের মতো নিমিষে গুঁড়িয়ে গেল। যাকে আজ একান্ত ভাবে আশা করেছিল, সে আসেনি। গাড়িতে বসে আছে যে, সে তিমির নয় ফাইন আর্টসের সেক্রেটারী ভবেশবাবু। মনটা ভারী দমে গেল। সারা রাত চিন্তা করে অনেক কথা মনের মধ্যে গুছিয়ে রেখেছিল। সব বলবে বলে। অথচ যাকে বলবে সেই আসেনি। অনুক্ত কথা অনুক্তই রয়ে গেল। কবিতা নিরাশ ভরা মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলো,

এ-ভালোই হলো একদিক দিয়ে। অপমানিত হতে হলো না। কবিতার কথা শুনে তিমির হয়তো তাকে অপমান করতো। লজ্জার হাত থেকে সে বাঁচলো। কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই তাই হতো? তাকে কিছুতেই অপমান করতো না। কিছুতেই তা সে করতে পারতো না। নীরব থেকে কবিতা যে তাকে চিনেছে। এ-চেনার মধ্যে এতোটুকু ভুল হয়নি। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তিমির নিশ্চুপ থেকেও পরিপূর্ণ ভাবে ধরা পড়েছে কবিতার কাছে। কিন্তু আজ এলো না কেন সে? আজ যে তাকে অনেক কথা বলার ছিল কবিতার। অনেক ভেবে-চিন্তে কবিতা ধীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, তিমিরবাবু আজ এলেন না যে?

তিমির স্টেডিয়ামে আছে। অন্য একটি জরুরি কাজে সে ব্যস্ত। অবশ্য সেই আসতো, তবে আজ আমার আসার একটি উদ্দেশ্য আছে কবিতা। ফাইন আর্টসের সেক্রেটারী ভবেশবাবুর আমন্ত্রণে কবিতা কলকাতায় অনেকবারই এসেছে। কিন্তু আজকের মতো এমন চিন্তিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সে এর আগে কখনও দেখেনি। ভবেশবাবু বললেন, তোমাকে যে আর একটি দিনের প্রোগ্রাম করতে হবে কবিতা। আজ প্রচুর ভিড় স্টেডিয়ামে। যেমন বাইরে, তেমনি ভেতরে। অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু তাতো সিন্ধুতে বিন্দু মা। আর একটি দিন অন্তত তোমার প্রোগ্রামটা বাড়িয়ে দাও তাহলে বাইরের জনতাকে সামলাতে পারি। শেষ দিনের টিকিট না-পাওয়ার ফলে তারা ক্ষুব্ধ।

আর একটি দিন প্রোগ্রাম বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ কলকাতায় আরও একটি দিন বেশি থাকা। কলকাতায় থাকা অর্থে তিমিরেরই কাছে থাকা। এতোটুকু আপত্তি থাকার কথা নয় কবিতার। আপত্তি তার নেইও। তবে অসুবিধে আছে একটি। আগামীকাল তার মুম্বাই রওনা হওয়ার কথা। সেখানে একুশে এবং বাইশ তারিখে প্রোগ্রাম আছে। তারপরে তিন-চার দিনের একটু বিশ্রাম নেবে। বিশ্রাম শেষে সাতাশ-আটাশ তারিখ নাগাদ সে আবার কলকাতায় ফিরে এসে একটি দিনের প্রোগ্রাম করতে পারে। এর আগে নয়। সে-কথাই জানালো কবিতা। ভবেশবাবু আশ্বস্ত হলেন। বললেন, তাহলেও হবে।

ইনডোর স্টেডিয়ামে এসে কবিতা যখন পৌঁছালো সন্ধে তখন সাতটা। নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হতে তখনও আধঘণ্টা দেরি আছে। আজকের এই বিশাল জনাকীর্ণ দর্শক সমারেশ অন্যান্য দিনগুলির ভিড়কে অনায়াসে ম্লান করে দিয়েছে। কবিতার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে এদিকে-ওদিক ঘুরছে। কিন্তু তিমিরকে দেখতে পেল না কোথাও। বেশ কিছুক্ষণ পরে মেকআপ রুমে বসে কবিতা তিমিরের গলা শুনতে পেল। মাইকে তিমিরের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কবিতা কাপূর তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান আরও একদিন বাড়িয়ে দেবেন .....কথা শেষ হলো না তার আগেই দর্শকমন্ডলী করতালিতে ইনডোর স্টেডিয়াম মুখরিত করে তুললো। করতালির রেশ থামলে তিমির আবার জানালো ঃ যারা টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি, তাদের অধিকাংশই আমাদের কাছে আর একদিন অনুষ্ঠান আয়োজনের দাবি জানান। সেই মতো আমরা তাদের দাবির কথা শিল্পীর কাছে তুলে ধরেছিলাম। শিল্পী, শিল্পীসুলভ মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। অনুষ্ঠান আর একদিন বাড়াতেই শুধু রাজি হননি—এমনকী তাঁর পারিশ্রমিক বাবদ অর্থও তিনি বন্যার্ত তহবিলে দান করার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে....তিমিরের গলার সুর ডুবে গেল দীর্ঘস্থায়ী করতালির গুঞ্জরণে। করতালি আর করতালি। থামতেই যেন চায় না। করতালি একেবারে থেমে গেলে তিমির বললো ঃ আমরা আগামী আঠাশ তারিখে এই স্টেডিয়ামেই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যানুষ্ঠানের পুনরায়োজন করবো। তার আগে আয়োজন করা সম্ভব নয়। নমস্কার। স্টেজ থেকে চলে আসার আগে জানালো সর্বশেষ কথা, চিত্রাঙ্গদা এখনই শুরু হচ্ছে—

স্টেজের ওপর নেচে চলেছে কবিতা কাপূর। মুগ্ধ বিস্ময়ে নিঝুম রাত্রের নির্জনতার মতো নিশ্চুপ হয়ে দেখছে দর্শকরা। নেপথ্যে গান শুরু হয়েছে ঃ "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি—" মন-প্রাণ ঢেলে নাচছে কবিতা। স্টেজের চারপাশ থেকে বিভিন্ন রঙের আলোর বিন্দুগুলি এসে ঠিকরে পড়েছে কবিতার দেহের ওপরে। এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে দেখছে তিমির। ওর

নাচ দেখলে শুধু একটা কথাই মনে হয় তিমিরের, কবিতা নাচছে না তো, যেন ওর সারা দেহে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাছাড়া নাচবার সময়ে ঠোটের চাপা হাসি আর চোখের বিভিন্ন ধরনের চাউনির অভিব্যক্তিতে চিত্রাঙ্গদার মনের বিভিন্ন রূপ সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। সত্যই আশ্চর্য শিল্পী এই কবিতা কাপূর। অবাঙালি হয়েও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়াশোনা করেছে জেনে ওর প্রতি শ্রদ্ধা জাগে তিমিরের।

নাচ শেষে স্টেজ থেকে নেমে আসতেই ডান দিকের কোনটিতে চোখ পড়লো কবিতার। দেখলো, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তিমির। চোখাচোখি হতেই তিমির এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। বললো, এতোদিনে এই প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদা দেখলাম। অপূর্ব নেচেছেন আপনি। সত্যি অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা। প্রশংসা করতে গিয়ে হয়তো আপনাকে ছোট করে ফেলবো। তাই প্রশংসা আমি করবো না। তবে আপনার প্রতিভাকে স্বীকার করতেই হবে। তিমিরের কথাগুলি নির্লিপ্তের মতো শুনলো কবিতা। পরে ওর দিকে ডাগর চোখ মেলে চেয়ে রইল। এই মুহূর্তে অনেক কথাই তার বলতে ইচ্ছা হলো। অধিকারের দাবি নিয়ে তিমিরকে শোনাতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু তা কি সম্ভব? না। সেই কারণেই কবিতা শুধু চেয়েই রইলো। যেন হাজারো কথা প্রকাশ হতে না-পেরে সহসা স্তব্ধ হয়ে মূক হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে কোনও কথা বলতে পারলো না কবিতা। কেন-না অভিমানে পূর্ণ তখন তার সারা বুক। কি বলতে গিয়ে কি বলে বসে তার ঠিক নেই। তাই রইলো চুপ করে।

এতো চুপচাপ কেন আপনি? তিমির একটু হাসতে চেষ্টা করলো।

আজ সন্ধ্যায় আমাকে আনতে যাননি কেন? উল্টে কবিতাই ওকে প্রশ্ন করলো। উত্তর দিতে পারলো না তিমির। তবে তার ওই প্রশ্নের পর কবিতার প্রশ্নটা অভিযোগের সুরে ধরা পড়েছে। এ-অভিযোগের উৎস কোথা থেকে এলো? ভাবতে থাকে তিমির। বুঝতে চেষ্টা করে সব কিছু চুপ করে থেকে।

ড্রাইভার মধ্যগতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সিটে পাশাপাশি বসে আছে কবিতা আর তিমির। এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম তিমির ওর পাশে এসে বসলো। অন্যান্য দিনের মতো আজও সে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসতে যাচ্ছিলো। কবিতাই ছোট্ট করে শাসন করেছে। আপত্তি তুলে বলেছে, ওখানে কেন? একটি সপ্তাহের আলাপ। তবুও দূরত্বটাকে কমাতে পারলেন না? কবিতার কথা শুনে চুপ করেই ছিল তিমির। ভেবেছিল, কোনও উত্তর দেবে না ও-কথার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না-দিয়েও পারলো না থাকতে, বললো, দূরত্ব কমানোর দায়িত্ব আমার একার নয়—আপনারও। কই আপনিও তো আজকের মতো আগে কোনোদিন পাশে ডেকে বসাননি?

আমারই অন্যায় হয়েছে। অতি অনায়াসেই নিজের দোষটুকু স্বীকার করে নিয়ে একটু হাসলো কবিতা। পরিশ্রান্তের ভারে সে দেহটা এলিয়ে দিল। তেইশ বছরের নৃত্যপটিয়সী উজ্জ্বল যৌবনবতী মেয়েটা। কিছুক্ষণ আগে নাচ শেষ করেছে। এখনও ওর মুখে লেগে আছে প্রসাধনের চিহ্ন। কবরীতে রজনীগন্ধা, বেলফুলের মালা জড়ানো। সারা দেহে লেগে আছে মিষ্টি গন্ধ। গাড়ির মধ্যকার বাতাসটুকু সেই সুমিষ্ট গন্ধ নিয়ে পরিত্রাণে খেলা করছে! গাড়ির এই পরিবেশটুকু বড়ো নির্জন। কবিতা আপন-সুরে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করলো, আপনি থাকেন কোথায়?

টালিগঞ্জের দিকে, নাকতলায়। ছোট্ট উত্তর তিমিরের।

বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন?

মা, দাদা, বৌদি, বোন এবং একজন কাজের লোক।

বাবা নেই?

না। বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় বাইশ বছর হতে চললো। তখন আমি ছোট। ছ-সাত বছরের হবো। বাবার কথা সব মনেই নেই। একটু চুপ করে থেকে তিমির এবার কবিতাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলো, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

অনেক! রামধনুর বর্ণছটায় হেসে উঠলো কবিতা। উত্তর দিল, মা, বাবা, ঠাকুমা, মেজদা, মেজবৌদি, সেজদা, সেজবৌদি, পাঁচটি ভাইপো ভাইঝি। আর বড়দার কথা তো আপনি আগেই জানেন।

আপনার বড়ো বৌদি নেই?

না। বড়দা বিয়ে করেননি। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে তিমির বললো, দুর্ভাগ্যের দিক দিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যেই একটি মিল রয়েছে। আমরা দুজনেই পবিবারের একজন আপন মানুষকে হারিয়েছে।

ধর্মতলার মুখে এসে গাড়ি থামলো পুলিশের সঙ্কেতে। তিমির বাইরের দিকে তাকালো। চলমান জনস্রোত। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর রং-বেরং-এর বিজ্ঞাপনের মেলা। গাড়ি চলতেই তিমির জিজ্ঞেস করলো, কাল সকালেই তাহলে রওনা দিচ্ছেন—

হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তরটা দিয়েই কবিতার মাথায় নতুন একটা চিন্তা এলো। কাল সে মুম্বাই চলে যাবে। সেখানে দিন সাতেক কাটিয়েই আবার ফিরে আসছে এই শহরে। তিমিরকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়? সত্যি কথা স্বীকাব করতে কবিতার লজ্জা নেই। তিমিরকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই তার কেমন যেন কষ্ট হয়। আসলে সে তিমিরকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু তিমির? সে তো তার মনের কথাটা কবিতার কাছে প্রকাশ করতে পারতো? পরক্ষণেই কবিতা বিশ্লেষণ করতে বসে। না। সেটা সম্ভব নয়। হিসেবটা সহজ। সে একজন ভারত বিখ্যাত শিল্পী। তার কাছে প্রাণের স্পন্দনের গুরুভার নামাতে তিমিরের সঙ্কোচ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিমির এটা কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না, কবিতা ভারত বিখ্যাত শিল্পী বটে কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সে একজন মেয়ে। কবিতা মনে মনে ঠিক করলো, মুম্বাই সফরে তিমিরকে সঙ্গে নিতেই হবে। সে যদি অনুরোধ করে, তিমির কি না-গিয়ে থাকতে পারবে? কবিতার মনে হয়, না সে করবে না।

হোটেলে ফিরে কবিতা বললো, প্লিজ আপনি একটু বসুন। আমি স্নানটা সেরে আসছি। নাচের শেষে স্নান না-করা পর্যন্ত আমার ক্লান্তি সহজে দূর হতে চায় না।

নিশ্চয়ই! আপনি স্নান সেরে আসুন।

তিমির সামনের টেবিল থেকে একটি পত্রিকা টেনে নিল। পত্রিকার পাতায় নৃত্যরত অবস্থায় কবিতার বিভিন্ন ছবি। ছবিগুলি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের। এই ছবিগুলি তুলেছে বিজয়। তাদেরই পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার। তিমিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। একের-পর-এক পত্রিকাব পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকে তিমির। যেখানে ভালো লাগছে সেখানকার দু-চার লাইন আবার পড়ছেও। স্নান সেরে ঘরে এলো কবিতা। দুধ সাদা রঙের শাড়ি পরেছে। ব্লাউজও সাদা রঙেরই। যেন শরতেব একখন্ড মেঘ আকাশ থেকে নেমে এসেছে এই ঘরের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেয়ারা কফির সেট দিয়ে গেছে। কবিতা চুল আঁচড়িয়ে কফি বানাতে বসলো। তিমির মন দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। কবিতা ওর মুখের দিকে তাকালো। বড়ো শান্ত সুরে ডাক দিল, তিমিরবাবু।

বলুন। পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুললো তিমির।

মুম্বাই নিশ্চয়ই গিয়েছেন আপনি?

না। মৃদু হেসে উত্তর দিল সে। আমি নিজে বিখ্যাত না-হলেও একটি বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক। তবে ঘোরাঘুরি কিন্তু আমার কপালে বিশেষ জোটেনি। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আর রাজধানী নয়াদিল্লিতে মাঝেমধ্যে যেতে হয়। আমার ভ্রমণ মোটামুটি এই দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা হঠাৎ মুম্বাই-এর কথা বললেন যে? কোনওরকম লুকোচুরি নয়। নয় কোনও মিথ্যার জাল বোনা। কবিতা পরিস্কার বললো, আমার খুব ইচ্ছে আপনি আমার সঙ্গে মুম্বাই যান। আপনারও এক কাজে দুই কাজ হবে। আমার তো ওখানে প্রোগ্রাম আছেই। আপনি সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্টিং করবেন। সেই সঙ্গে মুম্বাই শহরটা দেখবেন। অর্থাৎ আর একটি নূতন জায়গা দেখা হবে কি বলেন? তারপরে দিন সাতেক বাদে তো আবার কলকাতায় ফিরেই আসছি। কফির কাপটা এগিয়ে দিয়ে কবিতা কোমল সুরে বললো, যাবেন আপনি? কবিতার চোখের দিকে চেয়ে রইলো তিমির। এ-যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। নয়তো কি? ভারত বিখ্যাত শিল্পী কবিতা কাপূর কিনা মুম্বাই সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার মতো একজন সাধারণ সাংবাদিককে। যেতে বলছে তারাই সঙ্গে! হোক-না সে একজন সাংবাদিক, ফাইন আর্টসের একজন কর্মকর্তা, কিন্তু কবিতা কাপূরের তুলনায় সে-পরিচয় কতোটুকু? নিশ্চয়ই

একই সারির নয়। তবুও কবিতা আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশের এতো সাংবাদিকের মধ্য থেকে একমাত্র তাকেই। পুরানো কথাটা এই মুহূর্তে আবার মনে পড়ে গেল তিমিরের। দুই বছর আগের সেই ঘটনাটা। কবিতা কাপূরের কাছে আগে যাবার প্রতিযোগিতা। সেদিন তিমির তার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। অতো বড়ো একজন শিল্পীর কাছে গিয়ে তার ইন্টারভিউ নেওয়া কি সব সাংবাদিক পারে? আর আজকে তিমির সেই বিখ্যাত শিল্পীর ঘরে। তার মখোমুখি বসে। শুধু তাই নয়—সেই ধরা-ছোঁয়ার আয়ত্তের বাইরে শিল্পী কিনা তাকেই সঙ্গী কবছে মুম্বাই সফরের। এ-যেন পাওয়ার অতিরিক্ত। সত্যই তাই। না-চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ার মতো। সুতরাং এটাকে সৌভাগ্য বলে তিমির নিশ্চয়ই মনে করতে পারে। কবিতা কাপূরের সাহচর্যে একটি সপ্তাহ কাটাতে কার না ভালো লাগে? সুতরাং তিমির আপত্তি জানাবে কেমন করে? আপত্তি জানাবার প্রশ্নই ওঠে না। তিমির শুধু ভাবছে সময়েব ব্যবধানে জীবনে কতো ঘটনাই ঘটে যায়। শত্রু মিত্র হয়। মিত্র শত্রু হয়। দুঃখে জীবন ভরে যায়। আবার পর মুহূর্তেই আনন্দ আসে। আপন পর হয়ে যায় আবার পর আপন হয়ে ওঠে। সময়ই তো আমাদের সব কিছু করাচ্ছে। শোক পর্যন্ত সে ভুলিয়ে দিতে পারে। অসীম তার ক্ষমতা। নয়তো কবিতা কাপূর তাকে আজ কফি বানিয়ে খাওযাবে কেন? তাকে এমন ভাবে অনুরোধ জানাবে কেন, 'যাবেন আপনি'? সময়ের স্রোত যে তার নির্দিষ্ট পথে বয়ে চলেছে। তিমির আব বেশি কিছু ভাবতে পারে না। সৌভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে সে আর চিন্তা করতে পারছে না। যতো চিন্তা করে—ততোই সে বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে। তিমির ওর মুখের দিকে চেয়েই রইলো। চেয়ে রয়েছে কবিতা কাপূবও। ভাসা-ভাসা বড়ো সুন্দর তার চোখ দুটি। আয়ত-দীঘল সেই চোখের ফাঁদে তিমির ধরা দিল। বললো, আপনি যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিশ্চয়ই যাবো।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরে তিমির শুধু মাকে জানালো, আগামীকাল অফিসেব কাজে মুম্বাই যাচ্ছি।

ফিরবি কবে? ছায়াদেবী প্রত্যেকবারের মতো এবারেও সেই একই কথা জানতে চাইলেন।

ছ-সাত দিনের মধ্যেই ফিরবো। এর বেশি আব কিছু তিমির বললো না। কোনওরকমে দুটি খেয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। ইজিচেয়ারে বসে একটি সিগারেট ধরালো। ভাবতে বসলো ব্যাপারটা আবার নতুন করে। কবিতা কি তাকে একটু পছন্দ করে? কবিতার কথায় ব্যবহারে তো তারই প্রকাশ! তিমির ভাবছে কবিতার আর একটি কথা নিয়ে। সে আজ তাকে হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যেতে পারেনি। সেই কারণে কবিতা তাকে অভিমান ভরা কণ্ঠে কথা শুনিয়েছে, "আজ সন্ধ্যায় আমাকে আনতে যাননি কেন"? অর্থাৎ অন্য একজন কবিতাকে আনতে গেছে, সেটা তাব পছন্দ হয়নি। হয়নি মনোঃপুত। সে তিমিরকে চেয়েছে। এটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে কবিতা অন্যান্য সাংবাদিকদের চেয়ে তিমিরকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এটা ঠিক যে, উদ্যোক্তা কমিটির তিমির একজন কর্মকর্তা। কিন্তু কর্মকর্তা তো আরও কতোজনই ছিল। অবশ্য কবিতা কাপূর স্পষ্ট সুবেই জানিয়েছে, কর্মকর্তাদের চেয়ে আমি সাংবাদিকদেরই বেশি পছন্দ করি। সেই সাংবাদিকদের মধ্য থেকে কবিতা কি আবার তাকে বেশি পছন্দ করছে না?

ভোর হতেই গুছানোর পালা শুরু হয়েছে। কবিতার সহশিল্পীরা চলে গেছে দমদম এয়ারপোর্টে। হোটেলে শুধু কবিতা রয়েছে। তিমিরের জন্য অপেক্ষা করছে সে। একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো। যথেষ্ট সময় আছে। তিমির নিশ্চয়ই এরমধ্যে এসে পড়বে। হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হলো কবিতার। আসলে সন্দেহটাই আপন গতিতে তার মনের মধ্যে স্নান করে নিল। তিমির আসবে তো? পরক্ষণেই দৃঢ় হলো সে। না। কোনওরকম সন্দেহের দোলায় সে দুলবে না। এই ক'দিনে তিমিরকে যেটুকু চিনেছে, তাতে তার ভুল হবার নয়। কথা যখন তিমির দিয়েছে—সে তার কথা রাখবে। এ-বিশ্বাস কবিতার আছে। এ-বিশ্বাস তিমিরই তাকে দিয়েছে। ওর কথাটা তো এতো সহজে ভুলে যাবার নয়। মুম্বাই যাওয়ার প্রশ্নে তিমিরের উত্তরটা কবিতাব দুই কানে এখনও যে রিনরিন করে বাজছে, "আপনি যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিশ্চয়ই যাবো"। অর্থাৎ অন্য কারো আমন্ত্রণ হলে তিমির যেতো না। শুধুমাত্র কবিতার কথাতেই যেতে পারে। কবিতার কথাই সে শুনতে পারে। এমন গভীর কথা, স্নিগ্ধ, শান্ত কথা কবিতাকে কেউ বলেনি। কেউ শোনায়নি। যারা শুনিয়েছে তারা শুধু লোভীর

মতো নিজেদের নির্লজ্জ মনেরই পরিচয় দিয়েছে। কবিতা তাদেরকে ঘৃণা করে। অথচ সহজ কথাটা তিমির কেমন সুন্দর সরল মনে সংযত এবং ছোট্ট ছেলের মতো পরিস্কার করে বলেছে, আপনি যখন বলেছেন, তখন নিশ্চযই যাবো। সহজ-সরল মনের খোলাখুলি উত্তর। সেখানে কোনওবকম ভনিতা নয়, আঁকাবাঁকা পথে বিচরণও নয়। সুতরাং কবিতা তিমিরকে চিনেছে। এ-চেনাব মধ্যে কোনও ভুল নেই। তাই তিমিব আসবে না—এ হতেই পারে না। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে রইলো। নীচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। তিমির এলেই একসঙ্গে রওনা হবে। ফাইন আর্টসের যে-কয়েকজন কর্মকর্তা এতোক্ষণ এখানে ছিল, কবিতা তাদেরকে ও তার সহশিল্পীদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আপনাবা যান আমি একটু বাদে যাচ্ছি। একজন কর্মকর্তা শুধু বলেছিল, আপনি একা এখানে থাকবেন, যদি কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়.........

না-না কোনও অসুবিধা হবে না। তিমিরের নামটা বলবে না, বলবে না, করেও শেষ পর্যন্ত বলেই বসলো কবিতা, তাছাড়া একটু বাদেই তিমিরবাবু এসে পড়বেন। আমি তাঁর সঙ্গেই যাবো।

সময় মতোই এলো তিমির। কবিতাকে অমন চুপচাপ বসে থাকতে দেখে একটু সঙ্কোচ বোধ করলো। ম্লান সুরে বললো, আমি বোধহয দেবি করে ফেললাম—কবিতা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। বললো, দেরি হয়নি আপনার। তবে সবাই চলে গেছে এয়ারপোর্টে, আমরা আব এখানে অপেক্ষা করবো না। চলুন—

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো দুজনে। কবিতাকে সেলাম ঠুকলো সিংহ দরজার বিশালাকাব দারোযান। কবিতা একটা পঞ্চাশ টাকাব নোট ওব হাতে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতবে গিযে উঠে বসলো। তিমির আসছিল পিছনে পিছনেই। একটু ইতস্তত ভাব। কবিতা তাড়া দিল, কি হলো? আজও কি সামনের সিটে গিয়ে বসবার কথা ভাবছেন নাকি? কথাটা শেষ করেই ঝর্নাধারার মতো হেসে উঠলো। তিমির অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। সহজ হবার জন্য তাডাতাড়ি বলে উঠলো, না, তা নয়। বলেই কবিতাব পাশে গিয়ে বসলো।

এয়ারপোর্টে পৌছেই তিমির দেখলো, ওই সাত-সকালেই বেশ কিছু ফটোগ্রাফারের ভিড়। তাব মধ্যে তাদের পত্রিকার বিজয়ও আছে। বিজয়, তিমিরকে এক ফাঁকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলে উঠলো, কি করছো গুরু? কবিতা কাপূরের সঙ্গে মুম্বাই যাচ্ছ, কবিতা কাপূর তোমাকে ছাড়া একটি পা চলতে রাজি নয়। হোটেলে ফাইন আর্টসের কেষ্টবিষ্টুরা ছিল। কবিতা দেবী তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে বলেছেন, আমি তিমিরবাবুব সঙ্গে যাবো। ব্যাপারটা কি গুরু? অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু বিজয় চোখ দুটি নাচিয়ে প্রশ্ন করলো। ওর প্রশ্ন করার ধরন দেখে হেসে দিল তিমির। বললো, ব্যাপারটা মনে হচ্ছে ভেতরের।

নিউজটা কাগজে ছাপতে দেবো নাকি? বিজয়ের কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে পড়লো তিমির। পাগল ছেলে বিজয়। অর্থাৎ কাজ পাগলা। খবর সংগ্রহের জন্য, ফটো তোলার জন্য শিকারীর দৃষ্টিতে সাবা শহর ঘুরে বেড়ায়। কখন কি কাগজে লিখে দেয় বা ছবি তুলে নেয—তার ঠিক কি? তিমির তাড়াতাড়ি তাই বলে উঠলো, তুই পাগল হলি নাকি? নিতান্তই একটা খেয়ালের বশে কবিতা কাপূর মুম্বাই সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর বেশি কিছু নয়। তোরা সব কিছু না-জেনে বিজ্ঞের মতো আগে থেকে উল্টো-পাল্টা কাগজে লিখে দিস না। তাহলে কিন্তু কবিতার কাছে আমার লজ্জার সীমা থাকবে না। প্লিজ সেটা করিস না বিজয়। আর কেউ না-জানুক, আমরা রিপোর্টাররা তো বেশ ভালো করেই জানি যে, কতো সময় কতো সাধারণ ছোট্ট ঘটনাকে আমরা কাগজে ফুলিয়ে -ফাঁপিয়ে, বাড়িয়ে তিলকে তাল করে লিখি— সে-রকম যেন না-হয় বিজয়। আমি তাহলে কবিতা কাপূরকে কোনোদিনও মুখ দেখাতে পারবো না। তাছাড়া তিনিই-বা কি মনে করবেন বলতো? তার এই বন্ধুত্বটাকে যদি আমরা বাঁকাপথে দেখবার চেষ্টা করি......

তুই থাম! বিজয় শাসনের ভঙ্গীতে বলে উঠল, এতো বড়ো একটা সংবাদ আবিষ্কার করলাম আর তুই আমাকে চেপে যেতে বলছিস? ঠিক হ্যায়। স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে যেমন চেপে যাচ্ছি ঠিক তেমনি বন্ধুত্বের খাতিরেই তোকে জিজ্ঞেস করছি, তোর কথাই মেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করছি

নিতান্ত খেয়ালের বশে কবিতাদেবী তোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু বন্ধু! তোমাদের সংস্থার দু-চারজন বিষ্টুরদলকে কবিতা কাপূর কি বলেছেন জানো? যারা ওই সকালে হোটেলে গিয়েছিল, তাদেরকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন : আপনাদের হোটেলে থাকার আর প্রয়োজন নেই। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। অহেতুক আপনারা এখানে না-থেকে এয়ারপোর্টে চলে যান। ওদিককার ব্যবস্থা করুন। একটু থেমে বিজয় আবার বললো, তা সবাইকে তাড়িয়ে কবিতা কাপূর এলেন কার সঙ্গে? আমার আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু তিমির রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তা বন্ধুবর! হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এই দীর্ঘপথটুকু নিভৃতে তোমার সঙ্গে আসাটাও কি সেই আমন্ত্রণের অঙ্গ? স্বীকার করো বন্ধু! স্বীকার করো!! নিউজটা দিতে পারলেই আমার একটা প্রমোশন আটকায় কে? তুমি কি আমাকে সে-সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে বন্ধুবর।

ফাজলামো রাখ। এবারে ধমকে উঠলো তিমির। অনেক পাকামো করেছিস এবারে একটু বন্ধ কর। আর গুজবে কখনও কান দিস না। তবে একটা কথা বুঝলি, ফটোগ্রাফার না-হয়ে তোর রিপোর্টার হওয়াই উচিত ছিল। এখন দেখছি সেটাই তোকে মানাতো ভালো। একটা পোস্ট খালি আছে। অ্যাপ্লাই করে দে---

ও-সব যতোই গালাগাল দাও-না কেন, ভবী ভুলবার নয়। আমি যা বোঝার বুঝেছি। সে তুমি গঙ্গাজল দূরের কথা আটলান্টিক সাগরে ডুবেও যদি অস্বীকার করো আমি বিজয় চট্টোপাধ্যায় তা মানছি না। মানতে পারছি না গুরু। তবে হ্যাঁ---আমি খুশি। খু-উ-ব খুশি।

পাকা সাংবাদিকের চাল দিয়েছিস যে, অর্থাৎ স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছিস। তিমির অনুযোগে করলো, তোদের ধারণা ভুল। আসলে তোরা যেটাকে একটা বিরাট খবর বলে ভাবছিস, সেটা খবরই নয়। মিথ্যার মধ্যেই তোরা মাথা খুঁড়ে মরছিস।

বুঝেছি। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বিজয় বললো, কবিতা কাপূর বেশ ভালো করেই তোমার ব্রেন ওয়াশটি করেছে।

প্লেনে ওঠার আগে উপস্থিত ফটোগ্রাফাররা কবিতার ছবি তুললো। বিজয় একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। কবিতাকে গিয়ে বললো, প্লিজ! তিমিরের সঙ্গে আপনার একটি ছবি তুলবো। এতোটুকু বিরক্ত হলো না কবিতা। বরং সে অত্যন্ত খুশিই হলো। তবে একপলকে বিজয়কে একবার দেখে নিল। ফটোগ্রাফারটি কি তবে সব কিছু জেনে গেছে? তার মনের গোপন কথা কি ওই ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে? নয়তো এমন ভাবে তাকে সে ও-কথা বলতে পারতো না। অবশ্য ধরা পড়লে কবিতার লজ্জা পাওয়ার মতো কিছু নেই। লজ্জিত হওয়ার ঘটনা যেটা নয়, তাতে সে লজ্জিত হবে কেমন করে? ভালোবাসা কি লজ্জার? তা তো নয়। কবিতা প্রাণখোলা হাসি নিয়ে তিমিরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ের ক্যামেরা সাড়া দিল সেই ছবিটাকে ধরে রাখবার জন্য। পরে তিমিরের কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে বলেছে : জিনিসটা তোলা রইলো বুঝলি, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তিমির বেশি কিছু বলবার সময় পেল না। শুধু বললো, তুই না একটা যাচ্ছেতাই।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমে গাড়িতে করে সেখান থেকে সোজা হোটেল। হোটেল তাজমহল। কলকাতা বসেই তিমির মুম্বাই শহরের এই সুদৃশ্য ও সুবিখ্যাত হোটেলের নাম শুনেছিল। আর আজ কি-না সেই হোটেলেই এসে উঠেছে তিমির। অবশ্য সে উঠেছে বললে ভুল বলা হবে। কবিতা কাপূরের দৌলতেই তার এই থাকা! চারতলার রাস্তার দিকে একটি ঘর তিমিরের। জানলা দিয়ে সামনেই দেখা যাচ্ছে নীল জলরাশি। আরব সাগরের ঢেউ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ঘাটে এসে বারবার সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সামনের অংশের জলটা অবশ্য বেশ ঘোলা। তবে যতো দূরে দৃষ্টি যাবে তাতে নীল জলরাশিই চোখে পড়বে। জল দেখেই তিমিরের স্নানের কথাটা মনে পড়লো! ভোরবেলাতেই সে একবার স্নান করেছিল। তবুও এখন একবার করবে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে স্নান করলো তিমির। শুধুমাত্র স্নান করবার জন্য বাথরুমের এতো সাজ-সজ্জার আয়োজন, বিলাসের পর্যাপ্ত উপকরণ তা ভাবাই যায় না। বাথরুম থেকে বের হতেই চোখে পড়লো, কবিতা কাপূর

ঘরে এসে বসে আছে। কবিতা বললো, আমার ঘরেই আপনার খাবাব দিতে বলেছি। দুজনে একসঙ্গে খাবো। একটু থেমে থেকে সে যোগ করলো ঃ আপত্তি নেই তো? প্রথমে তিমির কোনও উত্তর দিল না। কবিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কৃতজ্ঞতা মেশানো সে চাউনি। শুধু বললো, আপনি আমাব জন্য অনেক কবছেন। আপনি যেমন ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এমন ভাবে এর আগে আমি কোথাও কাবো কাছ থেকেই আমন্ত্রিত হইনি। কাজেই আপনাব ওই কথায় তো আমার আপত্তি থাকবার কথা নয়। কথা প্রসঙ্গে কবিতা জানালো, আজ কিন্তু আমরা কোথাও বের হচ্ছি না। পুরোপুরি বিশ্রাম নেবো। কাল, পরশু প্রোগ্রাম। তারপরেই আপনাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবো। অবশ্য আজ যদি আপনি বেড়াতে যেতে চান তবে সে-ব্যবস্থা.....তার প্রয়োজন নেই। তিমিব কবিতাকে থামিয়ে দিযে বলে উঠলো, আগে আপনার প্রোগ্রাম সুষ্ঠু ভাবে শেষ হোক। তাবপবে দেখা যাবে।

মুম্বাই-এর যন্মুখানন্দ হল। হাজাব তিনেক দর্শকদের উপস্থিতিতে কবিতা তার নাচ শুরু করলো। ভারতনাট্যম। পুরো দু'ঘণ্টা নাচলো কবিতা। নাচের পারদর্শিতায়, দেহের হিল্লোলিত বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমায, চোখের ইশারায় আর ঠোঁটের কোণে চাপা হাসিব বিদ্যুৎছটায কবিতা কাপূর উপস্থিত দর্শকমন্ডলীকে যেন জাদুমন্ত্রে একেবাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। নাচের ক্ষমতা আছে মেয়েটার। নতুন কবে তারিফ কবলো তিমির। নাচকে যেন সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে কবিতা তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পাবে। কবছেও তাই। নাচতে নাচতে এক-একসময় সারা দেহে যখন ছন্দের ঢেউ তোলে সত্যিই তখন সেটা হয় দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক দৃশ্য। নাচ শেষ হলে যন্মুখানন্দ হল কবতালিতে মুখরিত হলো। একটি নিটোল ভারতনাট্যম উপহার দেবার জন্য দর্শকবা তার প্রশংসায সাবা হল ভরিয়ে তুললো। আজকের কৃতিত্ব একা কবিতা কাপূরেব। আজকের অনুষ্ঠান ছিল তাব একাব। আগামীকাল অবশ্য তাব সহশিল্পীদের প্রয়োজন হবে। কেন-না আগামীকালের অনুষ্ঠান সেই চিত্রাঙ্গদাব।

কবিতার সঙ্গে একই গাড়িতে ফিবলো তিমিব। কবিতা পবিশ্রান্ত। তার সঙ্গে এখন কথা বলে বিরক্ত করাটা ঠিক নয়। সেই চিন্তা করেই তিমির চুপচাপ ছিল। একটানা দু'ঘণ্টা নাচলে কি ধরনেব পরিশ্রম হয় সেটা তিমির অনুমান করে নিতে পারে। সামান্য সংবাদ সংগ্রহের আশায় কলকাতার দক্ষিণ থেকে একবার উত্তরে ছুটতে হলেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, সেখানে এই ধরনের নাচ নাচতে গেলে পরিশ্রমের মাত্রাটা যে কি পবিমাণ বেড়ে যায় সেটা তিমির নিজেকে দিযেই বুঝতে পাবে। কবিতা গাড়ির পিছনের সিটে দেহটা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। ছোট্ট সুরে জিজ্ঞেস করলো ঃ কেমন দেখলেন? এই মুহূর্তে কবিতা তাকে এমন ধরনের প্রশ্ন করবে সেজন্য প্রস্তুত ছিল না তিমির। কি বলবে সে? যা বলবে তা কবিতার প্রশস্তি গাওযাই হবে। অথচ সেটাই সত্যি। তিমির শুধু বললো, সাবা দেশ আপনাকে শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর যে-সম্মান দিয়েছে তা মিথ্যে নয়। তবে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এই কারণে, কলকাতা থেকে আপনি যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে না-আসতেন তবে এমন একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠানে নিজেকে ধন্য করতে পারতাম কি-না সন্দেহ! আপনি অদ্ভুত নেচেছেন কবিতা দেবী।

তিমিরের উত্তরটা শুনে ভারী খুশি হয়েছে কবিতা। খুশি হয়েছে সে অন্য কারণে। নেচে সে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তিমিরকে। এটাই তার সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনা। নাচ দেখে অন্য কে কতোটুকু খুশি হলো তাতে যেন কবিতাব কোনও কিছু আসে-যায় না। তিমির সন্তুষ্ট হয়েছে তাতেই সে আনন্দ ভরপুর। যেন ওর খুশি হওয়াটাই কবিতার কাছে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। মুখেও তাই বললো, আপনি যখন খুশি হয়েছেন, আমার পরিশ্রম তাহলে সার্থক হয়েছে বলুন!

আমাকে অহেতুক আপনি বড়বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। আপনার নাচ দেখে শুধু আমি কেন সারা দেশের মানুষই মুগ্ধ। তাছাড়া আমি নৃত্য বা সঙ্গীত সমালোচক নই। সে-কারণে আপনার নাচের সমালোচনা করা, আপনার নাচ বুঝবার ক্ষমতা আমার সামান্যই। সুতরাং সেই মানুষের খুশি হওয়াতে আপনার মতো একজন শিল্পীর পরিশ্রম সার্থক হবে, এতোটা আমি ভাবতে পারি না। তিমির বিনয় প্রকাশ করলো। এতো বড়ো শিল্পীর কাছে সে বিনয় প্রকাশ ছাড়া আর কি-ই-বা করতে পারে?

পরদিন চিত্রাঙ্গদার অনুষ্ঠানে তিমিরে সঙ্গে দেখা হলো ঘোষদার। বরেন ঘোষ। তিমিরের চেয়ে

খুব কম করে কুড়ি বছরের বড়ো হবে। তাদের পত্রিকার মুম্বাই অফিসের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ভাবী প্রাণখোলা মানুষ। বয়সে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অল্প বয়সীদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেন। কলকাতা অফিসে প্রায়ই যান। তিমিরের সঙ্গে তাব প্রায় বন্ধুর মতোই সম্পর্ক। তিমিরকে তিনি তুই সম্বোধন করেই কথা বলেন। আসলে তিমিরকে বিশেষ স্নেহ করেন। ঘোষদা বললেন, তুই তিনদিন হলো এখানে এসেছিস আর এরমধ্যে আমার সঙ্গে একটিবারও দেখা করিসনি। অন্তত পক্ষে পত্রিকার খাতিরেও তো একবার আসতে পারতি?

তিনদিন হলো এসেছি জানলেন কেমন করে?

মাঝে-মাঝেই ভাবি তোকে মুম্বাই অফিসের চিফ করার জন্য সুপারিশ করবো। কিন্তু পারি না কেন জানিস? মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে ঘোষদা তিমিবের দিকে তাকালেন। বললেন, সব ব্যাপারেই তুই বড়ো লেটে বুঝিস! আমাকে কি-না তুই একজন রিপোর্টার হয়ে জিজ্ঞেস করছিস, তোর আসার খবর জানলাম কেমন করে? আমরা না খবরের যোগানদার! ঘোষদা প্রশান্ত হাসলেন। খবরকে খুঁজে বের করাই আমাদের ধর্ম। খবর থাক বা না-থাক, খবর একটা দাঁড় করানোই আমাদের কর্ম। কলমের একটি খোঁচায় যে-কোনও নেতার দর্প আমরা অনায়াসে করি চূর্ণ। জাতির উন্নতিকল্পে প্রধানমন্ত্রী আগামী কাল সংসদে যে-কথা বলবেন এবং অবশ্যই যে-কথা বলবেন না, তা নিয়েও আমরা কাগজে পাতার-পর-পাতা করবো পরিপূর্ণ; সেই মানুষকে তুই কি-না জিজ্ঞেস করেছিস, কেমন করে জানলেন? প্রেমে পড়লে মানুষ খুব বোকা হয়ে পড়ে তাই না-রে?

সে-অভিজ্ঞতা নেই। তিমির হাসলো। কবিতার প্রসঙ্গ যাতে না-এসে পড়ে তিমির তাই বললো, কলকাতা আবার কবে যাচ্ছেন ঘোষদা? শেষ গিয়েছিলেন সেই মাস দেড়েক আগে।

ভাবছি এই সাতাশ তারিখের বিকেলের প্লেনে একবার কলকাতা যাবো। ঘোষদা অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, যতো দিন না ফিরি সেই ক'দিন তুই এখানে থাকবি। কি বলিস? বড়ো কঠিন কথা শোনালাম। তাই না? তিমির বললো, ঘোষদা, আপনি সাংবাদিকতার জন্য বৃত্তি পেয়েছিলেন। কেন পেয়েছিলেন; আজ বুঝতে পারছি। তিমির সহজেই ধবা দিয়ে এবারে বললো, এতো খবর রাখেন কেমন করে? কাক-পক্ষী যা টের পায়নি...

উঁহু! তোদের ওই কথাটা ভুল। এ-কথা পাল্টানোর প্রয়োজন এখন। কাক-পক্ষী যা টের পায় না, সাংবাদিকদরা তাও টের পায়। ঘোষদার কথাটা মনে মনে স্বীকার করে নিল তিমির। সত্যই তাই। নয়তো যে-কথাটা কারো জানবার নয়, সেটাও ঘোষদার নখদর্পণে। লোকটা খবর রাখে বটে। মাইকে ঘোষণা হলো ঃ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য আরম্ভ হচ্ছে। ঘোষদা তার নির্দিষ্ট আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। হলের চাবিদিকে একবার চোখ বোলালো তিমির। আজকের দর্শকদের মধ্যে বেশির ভাগই বাঙালি। মুম্বাই চিত্রজগতের অনেক রথী-মহারথীও উপস্থিত। হলের বাইরে বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য গাড়িব মেলা বসেছে যেন। অর্থাৎ দর্শকদেব মধ্যে অধিকাংশই উচ্চমহলের। এটা কিন্তু ভালো লাগেনি তিমিরের। কেন-না কবিতা কাপূরের নাচের সমঝদার কি শুধু ওরাই? কলকাতার বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়েব ফাংসানেও তিমির এটাই দেখেছে। অর্থাৎ সেই গাড়িওযালা লোকেরই ভিড়। যারা পঞ্চাশ-একশো টাকার টিকিট অনায়াসে কাটতে পারে, তারা সবাই যে রসজ্ঞ তাও নয়। টাকা আছে, টিকিট কেটেছে— এই পর্যন্ত। অথচ তিমির এটা বেশ ভালো কবেই জানে, অতো দামের টিকিট কিনে অর্থাৎ বেশি দাম দিয়ে টিকিট কেনার যাদের ক্ষমতা নেই; তারা কারো চেয়ে কম সমঝদার নয়। তিমির নিজেও সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সেই কারণেই যে সে এই পক্ষপাতমূলক সমালোচনা করলো তা নয়। সত্যিকারের বাস্তব চিত্রটা তো এই-ই।

চিত্রাঙ্গদা অনুষ্ঠান শেষ। যন্মুখানন্দ হলের চার দেওয়ালের মধ্যে করতালি যেন বিস্ফোরণ ঘটালো। ফটোগ্রাফাররা ছুটলেন কবিতার কাছে। ছুটলেন কিছু প্রযোজক-পরিচালকের দল। যদি একবার সিনেমায় কবিতাকে নামাতে পারে সেই আশায়। তিমির বেশ ভালো করেই জানে, কবিতা সিনেমায় নামবে না। কবিতার সঙ্গে এ-প্রসঙ্গে তার একদিন বেশ কিছুটা আলোচনাও হয়েছে। তাতেই জানতে পেরেছে, রূপালি পর্দায় দেখা দিতে রাজি নয় কবিতা। গতকাল হোটেলেই এসেছিলেন মুম্বাই-এর এক বিখ্যাত

প্রযোজক পরিচালক। কবিতাকে নায়িকা হতে হবে তার ছবির। শুধুমাত্র একটি নাচের দৃশ্যে তাকে আটকে রাখা যায় না। তার যা আসামান্য রূপ, তাতে সে অনায়াসেই নায়িকা হতে পারে। কাকে বোঝানো? কবিতার সেই একই উত্তর, না। সিনেমায় কক্ষনও নয়। নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন প্রযোজক। সেই প্রযোজকই আবার আজ এগিয়ে গেলেন। মানুষ যে আশা নিয়েই বাসা বাঁধে। তিমির বেশ বুঝতে পারছে, আজকেও তাদের রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকে ফিরে আসতে হবে। তিমিরের দৃষ্টি পড়লো ঘোষদার ওপর। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তিমির পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ঘোষদা বললেন, চলি রে তিমির। কাজের তাড়া আছে এক জায়গায়। এখন সেখানেই ছুটতে হবে। এরমধ্যে তুই আসিস একদিন অফিসে।

আসবো।

ঘোষদা চলে গেলেন। তিমির তার গন্তব্য পথের দিকে চেয়ে রইলো। এই মুহূর্তে সে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলো। এতোক্ষণ ঘোষদা কাছে ছিলেন। তিমিরের মনে হয়েছিল যেন আপনজনের কাছেই সে ছিল। এখন মনে হলো নতুন এই শহরে সে একা। পরিচিত পরিবেশের কেউ একজন কাছে না-থাকলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, একা একা লাগে। একজন কর্মকর্তা গোছের ভদ্রলোক তিমিরের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে কবিতাজি ডাকছেন। তিমির কাছে এগিয়ে যেতেই কবিতা উপস্থিত কয়েকজন সাংবাদিক, কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিমিরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, কলকাতার সাংবাদিক, তিমির রায়চৌধুরী। আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক-ক্লিক করে উঠলো। হঠাৎ তিমিরের মনে হলো সে বুঝি রাতারাতি এক বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। তার চারপাশে রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারের দল। সবাই তার ছবি তুলতে ব্যস্ত। কিন্তু সে তো ওই পর্যায়ের ব্যক্তি নয়। কবিতা কাপূরের জন্যই তার এই সম্মান। অর্থাৎ এই সম্মান তাকে কবিতা কাপূরই এনে দিয়েছে। এই মুহূর্তে বিজয়ের কথা মনে হলো। এখানে আসার সময়ে বিজয় তাকে জানিয়েছিল, কবিতা কাপূর তোকে বড্ড বেশি পছন্দ করে ফেলেছে। তোকে ছাড়া একটি পা'ও সে চলতে রাজি নয়। তিমির নতুন করে ভাবতে শুরু করলো। সত্যই কি তাই? কবিতা যা করছে তা খেয়ালের বশে করছে না। আসলে তাকে পছন্দই করে কবিতা। একে একে স্বপক্ষে যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলো তিমির। কলকাতার সাতটি দিনের মধুর ব্যবহার, কলকাতা থেকে সুদূর এই মুম্বাইতে আনা তদুপরি নিজের খরচায় তাজমহলের মতো বিলাস বহুল হোটেলে রাখা, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সব কিছুর মধ্যে তিমির একে একে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে। আর যাই হোক খামখেয়ালী করে এতো সব কেউ করে না। উদ্দেশ্য একটা থাকেই। সেই উদ্দেশ্যেরই নাম কি পছন্দ করা? যার ভালো নাম ভালোবাসা। নয়তো অনুষ্ঠান শেষে সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার কি প্রয়োজন ছিল? কবিতা কি আগে থেকেই তার পরিচয়ের গন্ডি ছড়িয়ে গিয়ে ভালোবাসার রাস্তাটা সহজ করে তুলতে চাইছে? শিল্পী মানুষ কবিতা কাপূর। শিল্পীদের সব কিছু আবার বোঝা সহজ হয়ে ওঠে না। কিন্তু গত পরশুদিনের ঘটনা যে তিমিরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। সেখানে কবিতা পরিষ্কার ধরা দিয়েছে। হোটেলে কবিতার ঘরে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসেছিল। তিমিরের ডিশে প্রতিটি খাবার সাজিয়ে দিয়েছিল সে। অত্যন্ত যত্ন করে, অত্যন্ত আবেগভরে। তিমির আর ভাত নিতে চায়নি। কবিতা সেখানে চোখ দিয়ে মিষ্টি শাসন করেছে। মুখেও ধমক দিয়েছে, বলেছে না-খেলে চলবে কেন? আজ না-হয় দু'দিন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু খবর সংগ্রহের কাজে তো সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। না, বলতে নেই—একরাশ হাসি ছড়িয়ে কবিতা বলেছিল, খেয়ে নিন। যে-ধরনের পরিশ্রম করেন তাতে না-খেলে শরীর টিকবে কেন? বলেই সে আরও মাংস তার ডিশে সস্নেহে মমতায় ঢেলে দিয়েছিল। তিমির ওর চোখের দিকে নিরুপায় হয়ে শুধু তাকিয়েছিল মাত্র, কবিতা উত্তর দিয়েছে, এই বয়সে না-খেলে খাবেন কখন? তারপরেই কপট বিরক্তি প্রকাশ করেছে, আপনার মুখে শুধু না আর না। আপনাকে খাইয়ে তৃপ্তি নেই। যা দেবো, লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে উঠবেন, তবেই না আনন্দ! খাওয়াতে আমি বড়ো ভালোবাসি। এখন তিমিরের মনে হচ্ছে খাওয়ানো নয়—কবিতা তাকেই ভালোবাসতে চেয়েছে। ঘরোয়া এই ছবিটুকু তিমিরের চোখে

মধুর হয়ে জড়িয়ে আছে।

পরদিন বেড়াতে যাওয়ার জন্য কবিতা তিমিরের ঘরে এলো। তিমিরকে মুম্বাই শহর ঘুরিয়ে দেখাবে। কবিতা ব্যবস্থা করে ওকে অন্যের সঙ্গে পাঠাতে পারতো। কিন্তু কবিতার তাতে মন ভরবে না। সে নিজে সঙ্গে থেকে তিমিরকে সব কিছু দেখাবে। তার তৃপ্তি ওইখানেই।

কবিতা আজ চমৎকার সেজেছে। মোহনীয় এমন রূপ সচরাচর দেখা যায় না। কবিতাকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তিমির অপলক চোখে ওর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। বিরাট বড়ো সুউন্নত এক খোঁপা করেছে কবিতা। ফুলের মালায় সমস্ত খোঁপাটা জড়ানো। কান দুটি চুলের মধ্যে যদিও ঢাকা পড়ে আছে তবে ঝুমকো দুটি দুলছে। গলায় জড়োয়া সেট। কাঁধ পর্যন্ত ব্লাউজ। সুঠাম দেহ জড়িয়ে আছে দামি মহীশূর সিল্কের কালো শাড়ি। গায়ের ফর্সা রংয়ের সঙ্গে কালো শাড়ির সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। সারা দেহ থেকে সুবাসিত গন্ধ বেরুচ্ছে। তিমির মুখে কিছু বললো না। কবিতার সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়েই অপেক্ষারত গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো। গাড়ি ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তির পাশ কাটিয়ে ফ্লোরা-ফাউন্টেন হয়ে ইরোস সিনেমার পাশ দিয়ে মেরিণ ড্রাইভে গিয়ে পৌঁছালো। কবিতা বাঁ দিকে দৃষ্টি চালিয়ে বললো, ওই হলো ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম। মেরিণ ড্রাইভের প্রশস্ত মসৃণ রাজপথ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে ওপর দিয়ে চলে গেছে ফ্লাই-ওয়ে। ও-পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। তার পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে ডবল-ডেকার। অবশ্য ট্রেন লাইনের দু'পাশ দিয়ে রেলিঙে ঘেরা। গাড়ি এসে থামলো তারাপোরওয়ালা অ্যাকোরিয়ামে। দুটি টিকিট কিনে কবিতা তিমিরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। দেওয়ালের গায়ে বড়ো আকারের কাচের ভাগ ভাগ করা চেম্বার। প্রতিটি চেম্বারের ভেতরে জল, পাথর, শ্যাওলা ইত্যাদি। আলোর খেলা তো রয়েছেই। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন মাছের কি নাম, কোন দেশের মাছ ইত্যাদি সব কিছু প্রতিটি চেম্বারের গায়ে লেখা রয়েছে। ভেতরে ঢুকতে প্রথম চেম্বারেই চিংড়িমাছের মেলা। বেশ বড়ো আকৃতির। দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। তিমি, শঙ্কর, কচ্ছপ, সাপের মতো লম্বা আকৃতির এক ধরনের মাছ, কি নেই সেখানে? ছোট্ট একটা অক্টোপাশ পর্যন্ত। তার পাশের ঘরটিই হচ্ছে ছোট অ্যাকোরিয়াম। সেখানে ছোট্ট ছোট্ট মাছেদের মেলা। শুধু ছোট্টই নয়—বিভিন্ন রং-বেরং-এরও। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। যেন রামধনু রংগুলি মাছেদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অদ্ভুত!

অ্যাকোরিয়াম থেকে বেরিয়ে দুজনে এসে গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। বাঁ দিকে চৌপাট্টি বীচকে রেখে গাড়ি এবার উপরে উঠতে শুরু করলো। সামনেই মালবার হিল। যে আরবসাগরের জলের মধ্যে থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠতে হয়। দু'পাশে সর্বাধুনিক ডিজাইনের সব ঘর-বাড়ি। প্রতিটি বাড়িই আকাশকে ছুঁতে চাইছে। দুই বাড়ির মাঝখানে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই। মনে হয় এই বুঝি সব কিছুকে নিয়ে ভেঙে-গুঁড়িয়ে নীচে নেমে আসবে। গাড়ি একেবারে মালাবার হিলের ওপরে গিয়ে থামলো। তারও ওপরে হ্যাঙ্গিং গার্ডেন। কবিতার সঙ্গে ঘুরে দেখতে লাগলো তিমির। বিভিন্ন ফুলের, লতাপাতা ও বোগেনভিলার সমাবেশ। কোমর সমান উঁচু গাছের ছোট ছোট পাতাকে সমান করে ছেঁটে গন্ডার, হনুমান, ময়ূর ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। প্রকাশ্যেই গাছের নীচে একটি ছেলে, একটি মেয়েকে নিয়ে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে শুয়ে রয়েছে। গল্প করছে দুজনে। তিমির মনে মনে বললো, শালীনতা বলে কি এদের কিছুই নেই? আর একটি ঝোঁপের আড়ালে ছেলেটা মেয়েটিকে তো প্রায় আলিঙ্গন করেই বসে আছে। চক্ষুলজ্জা, দশজনের সামনে প্রকাশ্যে প্রিয়াকে আদর জানাতে সামান্য চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত এদের নেই। এর নাম কি সভ্যতা? আদর জানাতে কার-না ইচ্ছা হয়? সেজন্য রাস্তায়, পার্কে? হাজার লোকের সামেন? তবে তিমির এটুকু স্বীকার করলো, আবেগের জোয়ারের ওর গা ভাসালেও দর্শকেরা কেউ ওদেরকে বিরক্ত করলো না। অথচ কলকাতা হলে? অমন ভাবে আদর জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র পাশাপাশি দুজনে বসে থাকলেই হলো। তিমিরের মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। বি.এ. পরীক্ষা সবে দিয়েছে। ওর বন্ধু রাতুল তখন বীথি বলে একটি মেয়ের ভালোবাসায় ডুব দিয়েছে। বীথিই তখন তার ধ্যান-জ্ঞান। সেই রাতুল একদিন তার কাছে এসে হাজির। বললো, কি কান্ড বল দেখি।

বীথি একটা জরুরী চিঠি দিয়েছে, আজ দুপুরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে লেকে।

তা আমাকে কি করতে হবে?

তুই আমার সঙ্গে যাবি।

বীথিকে ভালেবাসবে তুমি, আমি কি বাগড়া দিতে যাবো? ও-সব যাওয়া-টাওয়া আমার হবে না। যেতে হয় তুই একা যাবি। পরিষ্কার উত্তর তিমিরের। এই সব ব্যাপারে কেউ কাউকে নিয়ে যায় না।

ঝামেলা বাধাস না। তুই চলতো—সেই রাতুলের সঙ্গে তিমিরে সেদিন লেকে গিয়েছিল। তারা ব্রীজের ওপারের ছোট দ্বীপটাতে বসেছিল। রাতুলের পাশেই বীথি। তিমির বসেছিল সামান্য একটু পেছনে। ব্যস। একটু পরেই আরম্ভ হলো ছেলেদের নানা ধরনের মন্তব্য। শুনবার মতো একটিও নয়। লজ্জায় তিমির সেদিন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

তিমিরকে নিয়ে গার্ডেনের শেষ মাথায় রেলিঙ-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালো কবিতা। দিগন্ত জুড়ে শুধু সাগরের জল। সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। নীল জলরাশির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো তিমির পরে বললো, এদিককার জলটা বেশ শান্ত। তাই না!

ঠিক তাই, কবিতা হাসলো। তবে জুহু বীচের ওখানে আবার অশান্ত। যেমন ঢেউ তেমনই গর্জন।

হ্যাঙ্গিং গার্ডেনের পাশেই সামান্য একটু নীচে কমলা নেহেরু পার্ক। পার্কের শেষ মাথায় রেস্টুরেন্ট। হোটেল নাজ। নাজের দোতলায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে কোণের দিকে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে ওবা বসলো। এখান থেকে নীচের চৌপাট্টি বীচ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে মেরিণ ড্রাইভ। নরীম্যান পয়েন্টের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটা হাজারো অট্টালিকার ভিড়ের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। মনে হয় আকাশকে বাড়িটা যেন চুম্বন করে আছে। ওখানে ওরা বেশিক্ষণ বসলো না। ঠান্ডা কুলপি খেয়েই উঠে পড়লো। মালাবার হিল থেকে সোজা জুহু বীচে। কবিতার কথাই ঠিক। এখানে জলের উচ্ছ্বাস বড়বেশি ঢেউ আছে। আছে একটানা গর্জনের গুম-গুম আওয়াজ। শত শত ছেলে-মেয়েরা স্নান করছে। তিমিরের মনে হলো এখানকার মেয়েরা বড়বেশি সাহসী। কোমরে এবং বুকে সামান্য, নামমাত্র কাপড় জড়িয়ে স্নানেব উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। কবিতা তিমিরকে নিয়ে ঢুকলো নারকেল কুঞ্জে ঘেরা বিলাসের প্রাচুর্যতায় ভরপুর সান্ এন স্যান্ড হোটেলে। কফি খাওয়ার পাট টা এখানেই সেরে নিতে হবে।

ফিববার পথে ওরা ঘুরলো খার, বান্দ্রা, মহালছমী, মাহীম, দাদর, শিবাজী পার্ক, সায়ন হয়ে বীর বন্দর-এ এসে পৌঁছালো। কবিতা ডান দিকের বিল্ডিংটা দেখিয়ে বললো, টাইম অফ ইন্ডিয়া। আপনাদেরটা কোথায়?

পেডার রোডে।

মুম্বাই হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গাড়ি এসে পৌঁছালো জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীর সামনে। দোতলার একটি ঘরে বড়ো বড়ো শিল্পীদের আঁকা ছবি রয়েছে। জল রং, তেল রং-এ আঁকা সব ছবি। কবিতা মুম্বাইতে এলে হাজারো কাজ থাকার মধ্যেও সময় করে নিয়ে এই আর্ট গ্যালারীতে আসে। শিল্পীদের আঁকা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলি বিক্রীও হয়। বহু ছবি কবিতা এখানে থেকে কিনেছে। সেই ছবিগুলি দিয়ে সে তার মাদ্রাজের বাড়ির ড্রয়িংরুম মনের মতো সাজিয়েছে। কবিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন ওখানকার মস্ত বড়ো এক শিল্পী। হুসেন সাহেব। কবিতা প্রথমেই তার সঙ্গে তিমিরের পরিচয় করিয়ে দিল, মিঃ রায়চৌধুরী। কলকাতার সাংবাদিক। নমস্কার বিনিময় হলে হুসেন সাহেব তাদের দুজনকে প্রতিটি ছবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন এবং আঁকাছবির শিল্পকর্মের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে গুণাগুণ বিশ্লেষণ করলেন। আর্ট গ্যালারীর পিছনেই মিউজিয়াম। গম্বুজপূর্ণ মসজিদের আকৃতিতে এই মিউজিয়াম। সামনে লন। পামগাছের সারি। ওরা ভেতরে ঢুকলো বটে তবে বেশিক্ষণ রইলো না। মিনিট কুড়ি দেখার পরই বেরিয়ে এলো। ওখান থেকে হোটেল তাজমহল খুবই কাছে।

ওই দিন রাতের শো-তে ওরা ছবি দেখতে গেল। মরাঠা মন্দিরের ছবিটা দেখার ইচ্ছা থাকলেও অপ্সরা সিনেমা হলের খুব নাম-ডাক শুনেছে তিমির। তাই ওই হলের ছবিটা দেখতেই ওরা গেল।

অর্থাৎ ছবি দেখতে না-গিয়ে তিমির মূলত হল দেখতেই গেল। ফেরার পথে গাড়ির মধ্য থেকে দেখলো রাতের মুম্বাইকে। অস্বীকার করার উপায় নেই মুম্বাই শহর নোংরা নয়—তবে নগ্ন।

ভোরবেলা কাগজ পড়ার সময়ই তিমিরের খেয়াল হলো আজ রোভার্সের ফাইনাল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কলকাতার সেই দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এমন সুযোগ কি বারবার আসে? আর যোগাযোগটাও কেমন সুন্দর! প্রথমতো মুম্বাই আসার তার কোনও কথাই ছিল না। তবুও এসেছে কবিতা কাপুরের শেষ মুহূর্তের ডাকে ফাইনাল খেলাটা তাদের আসার আগে অথবা পরে হলেও পারতো? তা হয়নি। এখানে থাকাকালীনই সেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাও আবার, কলকাতার দুই দলের মধ্যে। তিমিরের প্রিয় দল ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানের। সুতরাং এ-সুযোগ হারানো ঠিক নয়। কাগজটা হাতে নিয়েই তিমির পাশের ঘরে কবিতার কাছে গেল। কবিতা একটি চিঠি লিখছিল। কলম থামিয়ে দিয়ে তিমিরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, বসুন।

আজকে রোর্ভাসের ফাইনাল—

হ্যাঁ। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো কবিতার। বললো, দুটি দলই তো আপনাদের কলকাতার! ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান।

আপনি দেখছি অনেক খবরই রাখেন। অত্যন্ত খুশি হলো তিমির।

ক্রিকেট-ফুটবলের প্রতি আমার আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। সুযোগ পেলে খেলা দেখতে ছাড়ি না।

আজকে যাবেন নাকি? কথাটা বলেই ফেললো তিমির, তাহলে আমাদের পত্রিকা অফিসে ফোন করে দু'খানা টিকিটের....

আপনাকে অতো ভাবতে হবে না। কবিতা, তিমিরকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, যথাসময়ে টিকিট এখানে এসে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কোন দলের? কোন দল জিতলে আপনি খুশি হবেন? চোখ দুটিকে নাচের ছন্দে নাচিয়ে কবিতা জিজ্ঞেস করলো। কবিতার চোখে চোখ রেখে তিমির একগাল হেসে দিল। বললো, ইস্টবেঙ্গল।

খেলা আরম্ভ হবে সেই বিকেলে। সুতরাং সকালবেলাটা হোটেলে বসে কাটিয়ে দিয়ে কি লাভ? তিমিরকে যতো দূর সম্ভব মুম্বাই-এর সব কিছু, বিভিন্ন এলাকা ইত্যাদি দর্শনীয় যা-যা আছে সবই দেখানোর জন্য কবিতা এই সকালেই আবার তিমিরকে নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লো। এবারে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিল না। ড্রাইভারের আসনে কবিতা নিজেই বসলো। বললো, এবারে আবার পিছনের সীটে গিয়ে বসবেন না—কথাটা বলেই হেসে ফেললো কবিতা। সে-হাসিতে যোগ দিল তিমিরও। বললো, আর ভুল হবে না। এখন থেকে আপনি যেখানে, আমিও সেখানে।

কথাটা মনে থাকবে তো? তিমিরের কথাটা শুনে অজানা এক আনন্দ অনুভব করলো কবিতা।

নিশ্চয়ই।

কুপারেজ মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে কবিতা বললো, ঘেরা যে-জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই কুপারেজ। এই মাঠেই বিকেলে ফুটবলের আসর বসবে। ডান দিকের এই অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতির বাড়িটা দেখুন। লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিল্ডিং। কাছাকাছিই রয়েছে সচিবালয়। তারপরে দেখালো আকাশবাণী। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, কর্পোরেশন বিল্ডিং হয়ে গাড়ি সোজা ছুটে চললো। অত্যন্ত চওড়া রাস্তা। ঝকঝক করছে। কাজেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল কবিতা। সোজা গিয়ে পৌঁছালো চেম্বুরে। আর. কে. স্টুডিও দেখে, ভাবা অ্যাটোমিক, এসো রিফাইনারী সিন্ধ্রী সোসাইটি হয়ে একের-পর-এক সারা রাস্তা ঘুরে বেড়ালো। প্রভাদেবী, রবীন্দ্র-নাট্যমন্দির, কেডল রোড, হাজিয়ালী, কুর্লা, বায়কুলা, প্যারেল, মাতুঙ্গা, শীতলাদেবী,. ওরলি ইত্যাদি বহু এলাকা ক্লান্তিহীন ভাবে কবিতা তিমিরকে নিয়ে ঘুরলো। খুঁটিনাটি যা মনে হয়েছে, মনে পড়েছে তাই দেখিয়েছে। মনের মধ্যে বারবারই শুধু অস্বস্তি হতে থাকে—এই বুঝি ওটা দেখাতে বাদ পড়ে গেছে। অমুকটা তো দেখানো হয়নি। যার ফলে কবিতা পথের ওপর যা পড়েছে— তারই সঙ্গে তিমিরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গর্ভমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, মহালক্ষ্মী রেস কোর্স, ফেমাস সিনেমা ল্যাবরেটরী, বেঙ্গল ক্যামিক্যাল, কোডাক, সায়ন

হাসপাতাল, টাটা ক্যান্সার হাসপাতাল, ব্রিটানিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরী ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌঁছালো চার্চ গেটে। পথে আসতে আসতে তিমির দেখেছে নীচের রাস্তায় তাদের গাড়ি। ওপরে ছুটে চলেছে ট্রেন। আবার কোথাও-বা ওপর দিয়ে গাড়ি, নীচ দিয়ে ট্রেন।

বেলা একটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলো ওরা। স্নান-খাওয়া সেরে তিমির কোমল দুধসাদা বিছানায় আশ্রয় নিল। কবিতা তার জন্য অনেক কিছু করেছে, করছেও। প্রতিদানে সে-তুলনায় তিমির কিছুই করেনি। করতে পারেনি। অবশ্য ঋণ শোধ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কেন-না কবিতা যে-ভাবে তাকে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছে তার তুলনা হয় না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। নয়তো যে-কবিতা কাপূরকে একটু সেবা করবার জন্য লোক প্রায় উন্মুখ হয়ে থাকে—সেই কবিতা কাপূর কি-না তার জন্য এতো করছে!! ভাবলেও আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কি পরিশোধ দেওয়া যায়। তিমিরের হঠাৎ মনে হলো, কবিতাকে একটা শাড়ি কিনে দিলে কেমন হয়? আসলে কবিতাকে একটা কিছু উপহার দিতে মন চাইছে। একবার এও ভাবলো যদি কবিতা কিছু না-নেয় অর্থাৎ নিতে অস্বীকার করে? না। তেমনটা হবার সম্ভবনা নেই। ওটা তিমিরেরই অহেতুক সন্দেহ। কবিতা এই ক'দিন যে মনের পরিচয় দিয়েছে তাতে আর যাই হোক তিমিরের সঙ্গে বিরোধিতা করবে—তেমন মনের পরিচয় সে দেয়নি। সুতরাং কবিতাকে সেই ভাবে বিচার করা ভুল হবে। তাতে তার প্রতি অন্যায় করাই হবে। প্রতিটি, এমনকী ছোট-খাট কাজের মধ্য দিয়েও কবিতা তার কোমল মনের স্পর্শে তিমিরকে ভরিয়ে দিয়েছে। সেই মানুষ অসহযোগিতা করবে এমনটা ভাবা ঠিক কি? গতকাল যখন ওরা বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, কবিতার তখনকার কাজটুকুই কি কম? সামান্য ওই কাজের মধ্যে অসামান্য ভালোবাসার রূপটুকু কি অঙ্কুর হয়ে দেখা দেয়নি? কবিতা যখন সেজে-গুজে তার ঘরে এসেছিল, তখন তার প্যান্ট ও শার্ট পরে সবে কোটের দিকে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু সেই কাজটুকু করলো কবিতাই। পরম যত্নে আপন মানুষটার মতোই সে তিমিরকে কোটটি পরিয়ে দিল। সুন্দর করে টাই বেঁধে দিল। এই ছোট্ট কাজটুকুর মধ্যে আন্তরিকতার স্পষ্ট একটি ছবিই কি ফুটে ওঠেনি? আর শুধু কি এই-ই? নিজের খোঁপা থেকে একটি ফুলের কুঁড়ি তুলে কোটের বুকেও গুঁজে দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি—সেই মুহূর্তে কবিতাকে অত্যন্ত আপন, অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে তিমিরের মনে হয়েছিল। আরও ভেঙে বলতে গেলে বলতে হয়, কবিতাকে একমাত্র তারই বলে মনে হয়েছিল। সেদিন দুপুরে কাছে বসে খাওয়ানোর সময়েও তিমিরের মনে এই একই কথারই দাগ কেটেছিল। তিমির আস্তে আস্তে বড়বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে কবিতার ওপরে একমাত্র তারই যেন অধিকার। কবিতাকে ছাড়া সে এখন অন্য কোনও কথাই ভাবতে পারে না। এই সব ভাববার সুযোগ কবিতাই তাকে করে দিয়েছে। কবিতার হাসি, কবিতার গভীর চাউনি, ওর কথাবার্তা কাজ সবই তাকে ওই সব কল্পনা করার পথ ধরিয়ে দিয়েছে। সে-পথ থেকে তিমির আর এখন ফিরতে পারে না। স্বাভাবিক কারণেই এতোদিন তার মনে হয়েছিল, কবিতা কাপূরের নাম-যশ-অর্থ-সম্মান-প্রতিপত্তির তুলনায় তার ব্যক্তিগত নজির খুবই সামান্য। সুতরাং আর যাই হোক কবিতাকে পাওয়ার আশা করা তিমিরের পক্ষে ঠিক যুক্তি-যুক্ত নয়। মনের মধ্যে তেমনটা স্থান দেওয়াই ঠিক নয়। তেমন করে তা এতোদিন ভাবেওনি তিমির। যা হবার নয়—সেটা কল্পনা করে স্বর্গসুখ রচনা করা বুদ্ধিমানের, বিচক্ষণতার কাজ নয়। তাই সেই আকাশকুসুম রচনাও করেনি তিমির। কিন্তু এতো কিছুর পরেও কি সে চুপ করে থাকবে? কবিতা কি একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে না? সে কি তার প্রতিটি কাজের মধ্যেই ধরা দেওয়ার খেলায় মেতে উঠছে না? সে একজন শিল্পী। সূক্ষ্ম তার রসবোধ। সেই সূক্ষ্ম আঁকার মধ্যে দিয়ে কি তার ভালোবাসার ছবি ফুটে ওঠেনি? নিরুচ্চার, অনুক্ত ভালোবাসা। ছবিটা কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার। এখন আর আকাশে মেঘের ঘনঘটা নয়—মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। সূর্যকিরণের সোনা আলোয় তিমির কবিতাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে। মেঘমেদুর আকাশের বর্ষণমুখর দিন নয়, ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে সূর্য ওঠার দিন। আলোময় দিন। সেই আলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কবিতা। ওকে চিনে নিতে আর ভুল হওয়ার কথা নয়। এই ক'দিন দুজনে যে-ভাবে একসঙ্গে ঘুরেছে,

বেড়িয়েছে, খেয়েছে, টুকরো টুকরো অন্তরঙ্গতার ছবি যে-ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে তিমির এরপরে কবিতাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারে না। কবিতাকে সে হারাতে পারবে না। এলোমেলো অনেক কথাই ভাবলো তিমির। ভাবনাটা শুরু করেছিল কবিতাকে শাড়ি দেওয়া নিয়ে। শাড়ি দেওয়াটা অবশ্য এমন কিছু নয়। প্রশ্ন হলো, দেওয়াটা শোভনীয় হবে কি-না? নিজের মনেই আবার যুক্তি দাঁড় করালো সে। এরমধ্যে অশোভনীয়ের কি আছে? কবিতা তার কাছে বন্ধুর মতো এগিয়ে এসেছে। বন্ধুত্বের নির্দশন হিসাবেও তো একটা কিছু উপহার দেওয়া যায়। এরমধ্যে খারাপ লাগার কি থাকতে পারে? অবশ্য খারাপ ভাবলেই খারাপ। কবিতা তার টাই বাঁধবার সময়ে অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছিল। কই, সে তো তাতে খারাপ কিছু মনে করেনি। দশহাত দূর থেকে টাই বাঁধা যায় না। কাছে আসতেই হয়! এই স্বাভাবিক দিকটা মেনে নিলেই মন্দ দিকটা চিন্তার প্রয়োজন হয় না। আর মন যদি সেই মন্দের দিকেই টানে, তবে যে-কোনও ভালো কাজের মধ্যেও সে খারাপেবই সন্ধান কববে। তাহলে তো সংসারে কোনও ভাল কাজই করা যায় না। দুষ্টুজনেরা সমালোচনা করবেই। ঘটনা তাতে আটকে থাকে না। পরিণতির দিকে এগোবেই। তিমির ঠিক করলো, খেলা দেখার শেষে আজকেই সে কবিতার জন্য শাড়ি কিনবে।

কুপারেজে পাশাপাশি আসন নিল ওরা। বোভার্সের পরিচালক মন্ডলীর কয়েকজন অভ্যর্থনা জানালো কবিতাকে। লাইনের ধারে রঙিন বেতের চেয়ারে তাদেরকে বসানো হলো। কবিতাকে যারা চিনতে পারলো, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তারা বারবার দেখতে লাগলো তাকে। দর্শকদের ওই দৃষ্টির কোপ থেকে রক্ষা পেতে কবিতা ব্যাগ থেকে তাব বড়ো গগল্‌সটা বের করে চোখে দিল। তাতেই কি রক্ষে আছে? তবুও একটা আববণ এই যা! তিমিব সারা মাঠের দিকে একে একে চোখ ফেরালো। সমস্ত গ্যালারী দর্শকে পরিপূর্ণ। মাঠের চারকোণে উঁচু কাঠের বোর্ড। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা আছে। অর্থাৎ ফ্লাড লাইটেও খেলা হতে পারে। মাঠ দর্শকে যদিও পরিপূর্ণ, তিমিরের মনে হলো কলকাতার তুলনায় কুপারেজ বেশ ছোট। দর্শক সঙ্কুলানই সে-কথার প্রমাণ দেবে। এখানে যা লোক হয়েছে তার প্রায় ডবল না-হলেও কাছাকাছি লোক ধবে কলকাতার মাঠে। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা এলো। লাল-হলুদে মাখা ছেলের দল। একজন খেলোয়াড় এগিয়ে এলো তিমিরে কাছে। তিমিরের বিশেষ বন্ধু। একসঙ্গে আশুতোষ কলেজে পড়াশোনা করেছে। তিমির যদিও তাদের পত্রিকার ক্রীড়া-সাংবাদিক নয়...তবু খেলাব দিনে বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিনে সে মাঠে হাজিরা দেবেই। সে-কারণে যোগাযোগটা সমানেই রয়েছে।

কি রে! তুই এখানে? কবে এসেছিস? একসঙ্গেই সে প্রশ্নগুলি করে বসলো। তিমির হেসে উত্তর দিল, দিন চারেক হলো।

তা এই ক'দিনে একটা খোঁজ নিতে পারিসনি? মুম্বাইতে এসেছিস সেটা জানলাম গতকাল। এখানকার কাগজে কবিতা কাপূরের সঙ্গে তোর একটা ছবি দেখে—পরের কথাগুলি যাতে বেফাঁস কিছু একটা না-বেরিয়ে আসে তিমির তাড়াতাড়ি নীরবে চোখের কারসাজিয়ে বুঝিয়ে দিল পাশের ভদ্রমহিলাই কবিতা কাপূর। কবিতার মুখের অর্ধেকটা জুড়েই যে বড়ো গগল্‌স। চট করে চেনা সহজ নয়। তিমির নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে ফুটবলের একজন নিপুণ শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, কলকাতার বেস্ট ফুটবলার অফ দি ইয়ার।

বিরতির বেশ খানিকটা সময় পরে দিনেব আলো নিভে আসতেই ফ্লাড লাইটে খেলা চলতে লাগলো। সেই সময় পর্যন্ত খেলার ফলাফল সমান সমান। তারপরেই অতর্কিতে এক আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল একটি গোল করে বসলো। তাদের দাপটে মোহনবাগানেব রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা দিশেহারা। সেই সুযোগ পেনাল্টির মাধ্যমে ইস্টবেঙ্গল আরও একটি গোল দিয়ে বসলো। অর্থাৎ জয় হলো পরিষ্কার দুই গোলে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী রোভার্স কাপ ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়কেব হাতে তুলে দিতেই কবিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, কি! খুশি তো?

ভীষণ! তিমির জয়ের হাসি হাসলো।

কুপারেজ থেকে বেরিয়ে সোজা মালাবার হিলের নাজ-এ গিয়ে উঠলো। সুস্বাদু কিছু খাবার

নিয়ে দুজনে আগের দিনের মতোই কোণের দিকে গিয়ে বসলো। অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ আগেই। নীচে আরবসাগর। জলের রং এখন গভীব কালো দেখাচ্ছে। অন্ধকার সেখানে জমাট বেঁধে আছে। দূরে মেরিণ ড্রাইভ অর্ধ গোলাকার আকৃতিতে। রাস্তার আলোগুলি তারার মতো জ্বলছে। এখান থেকে সেই আলোমযকে এক-একটি মুক্তার দানার মতো মনে হচ্ছে। মেরিণ ড্রাইভ অর্ধগোলাকার হওয়ার ফলে রাস্তার আলোগুলির অবস্থানও সেই রকমের। ফলে পাহাড়ের এই ওপর থেকে মনে হয়, কোনও এক সুন্দরী বুঝি গলায় মুক্তোর মালা পড়ে আছে। এই কারণে নাকি মেরিণ ড্রাইভারের রাত্রের নাম কুইন্স নেকলেস? দূরের ঘর-বাড়িগুলি বাত্রিবেলা চোখে পড়ে না। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু আলো আর আলো। আলোব সেই মোহনীয় রূপ অপূর্ব। মনে হচ্ছে নক্ষত্রখচিত আকাশটা বুঝি মুম্বাই শহরের মাথার ওপরে নেমে এসেছে।

ফিরবার পথে কবিতা তিমিরের অনুবোধে একটি কাপড়ের দোকানেব সামনে এসে গাড়ি থামালো। কবিতা জিজ্ঞেস করলো কি কিনবেন?

কিছু শাড়ি কিনবো বৌদি-বোনের জন্য। অজস্র রঙেব, বিভিন্ন ধরনের শাড়ির মেলা বসিয়ে দিল সেলস্‌ম্যানেরা। তিমিব বললো, কেনা-কাটার ব্যাপাবে আমি অনভিজ্ঞ। পছন্দ যা করবার আপনিই করবেন। সেই সঙ্গে আপনার জন্যও কিন্তু একটা শাড়ি পছন্দ করবেন কবিতা দেবী। কবিতার চোখে চোখ রেখে তিমির অত্যন্ত শান্ত সুরে কথাটা জানালো। প্লিজ! আপত্তি জানাবেন না। আপত্তি? কবিতা স্বপ্নমাখা চোখে নতুন করে তাকিয়ে দেখলো তিমিরকে। তিমিরের কথায় সে আপত্তি জানাবে? তাই কি কখনও হতে পাবে? যে-তিমিরকে নিয়ে মনেব মধ্যে সে তিল তিল করে ঘরোয়া পবিবেশের একটা নিখুঁত ছবি এঁকে চলেছে, যাকে পাবার জন্য কলকাতা থেকে সুদূব এখানে নির্জন পরিবেশে নিয়ে এসেছে, যাকে একটুখানি সন্তুষ্ট করার জন্য সে সারাক্ষণ একই চিন্তা করে, সেই তিমিরেই কথায় আপত্তি জানাবে কবিতা? শাড়ি পাওয়াটা কবিতার কাছে বড়ো নয়। ওটা কোনও ব্যাপাবই নয়। তাকে কিছু দেবার তিমিরের এই যেন মন, কবিতা সবচেয়ে খুশি হয়েছে সেই মনেবই পরিচয় পেযে। তবে কি তার পূজা এতোদিনে সার্থক হলো? তিমিব মুখ ফুটে তাকে শাড়ি দিতে চাইছে। উপহার তো মানুষ তার প্রিয়জনকেই দেয়। তিমির কি তাকে প্রিযজন ভাবতে শুরু করেছে? নিশ্চয়ই তাই। নয়তো এই উপহারের প্রয়োজন ছিল না। কবিতা আরও খুশি হলো এই কারণে, তিমির এতোদিন প্রায় মুখ বুজেই ছিল। অর্থাৎ ভাঁলোবাসার একটি কথাও বলেনি। যদিও অনুচ্চারিত কণ্ঠে সে ধরা দিয়েছে। কথাই যদি না-শোনালো তবে সেই ধরা দেওয়ার মূল্য কোথায়? আজ তার কথাও শোনা গেছে। তিমিরের কথাগুলির গানের সুরের মতো কবিতার কানে বেজে উঠলো। কি উত্তর দেবে সে ও-কথার? দুষ্টু-বুদ্ধি মাথায় চাপলো কবিতাব। আপত্তি জানিয়ে শুনতে ইচ্ছা করছে তিমির কি বলে? পরক্ষণেই ও মতলব ত্যাগ করলো কবিতা ভেতরকার রহস্য বুঝতে পারবে না তিমির। বুঝতে না-পেরে তার মুখ কালো হবে। আশাহত সেই করুণ মুখের ছবি কবিতা দেখতে পারবে না। তিমিবের কথাই মেনে নিয়ে বললো, আপনার বৌদি ও বোনেরটা আমি পছন্দ করে দিচ্ছি, তবে আমারটা আমি কখনোই করবো না। ওটা পছন্দ করবেন আপনি—

রাত্রে খাবার জন্য কবিতার ঘরে ঢুকতেই তিমিব থেমে পড়লো। বড়ো আয়নার সামনে কবিতা দাঁড়িয়ে। পরনে তিমিরের দেওয়া সদ্য কেনা শাড়িটা। মাথায় ঘোমটা টেনে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে। নিতান্তই কৌতূহলবশে হলেও গোপন বাসনাটুকু সহজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রথমে খেয়াল করেনি কবিতা। আয়নার মধ্য দিয়ে চোখাচোখি হতেই ঘুরে দাঁড়ালো। একরাশ লজ্জা এসে আলিঙ্গন করতেই ধীরে ধীরে ঘোমটা সরিয়ে নিল মাথা থেকে। বড়ো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে কবিতা। আসলে ধরা পড়ার লজ্জায় সে ম্লান। কেমন যেন মায়া হলো তিমিরের। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল। শাড়ির আঁচলখানি ওর মাথায় তুলে দিতেই একপলক কবিতা তাকালো মাত্র তারপরেই গভীর ভাবে তিমিরকে জড়িয়ে ধরলো। ভারত জোড়া নামের অধিকারিণী শিল্পী কবিতা কাপূর তিমিরের বুকে আশ্রয় চাইছে। তিমির আর কোনওরকম দ্বিধা-সঙ্কোচ করলো না। সব লজ্জা, সব দ্বিধা তার ভেঙে গেছে এই মুহূর্তে। কবিতাকে সে আপন করে কাছে টেনে নিল। কবিতার

প্রশস্ত কাঁধে মুখ গুঁজে বারবার আদব জানাতে লাগলো। কোমল দেহের সুগন্ধে তিমির তখন অশান্ত। বাধ ভাঙার ঝর্ণাধারাব মতো চঞ্চল। ভালোবাসার শান্তি খুঁজে পেয়েছে সে। ফুলের মতো সুগন্ধময় দেহটা তিমিরকে আঁকড়ে ধরে আছে। কোনও সাড়া শব্দ নেই তার। শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাসের তাপে তিমিরকে আশ্চর্য এক তাপ দিতে থাকে। কতোক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিল, সে-হিসেব কারোরই থাকার কথা নয়। সে-হিসেব তারা রাখেওনি। বাইরের বেলটা বেজে উঠতেই দুজনে যেন জ্ঞান ফিরে পেল। একে অপরের কাছ থেকে আলাদা হলো। না, কবিতার ঘরে আসার জন্য কেউ বেল বাজায়নি। ওটা অন্য ঘরের শব্দ। তিমির লজ্জায় এবার তাকাতে পারলো না কবিতার দিকে। এখন যেন আরও বেশি করে লজ্জা লাগছে। তিমির ধীর-পায়ে কবিতার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে বাধা দিতে পারলো না কবিতা। বাত্রের খাবার না-খেযেই সে চলে গেল। ওকে ডাকবার ইচ্ছা থাকলেও কবিতা ডাকতে পারলো না। তার সারা মন-প্রাণ-দেহ আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর খুশির অবসাদে ভারাক্রান্ত। খাওয়া এখন মূল কথা নয়। এইমাত্র যা ঘটে গেল, সেটাকে নিয়ে প্রাণের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবতেই সারা মন বড়বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছে। কবিতা বিছানায় নিজেকে ভাসিয়ে দিল। আর কোনও কিছু করতে ভালো লাগছে না। খেতে তো ভালো লাগছে নাই-ই! মন খুশিতে ভরে উঠছে শুধু ভাবতে। এইমাত্র তিমির তার সারা দেহে স্পর্শ রেখে গেছে। স্পর্শ সুখ যে এতো কে জানতো! ভাবতে ভাবতেই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে কবিতা। একঘুমেই রাত শেষ। ভোরের আলো ঘরে আসতেই ভ্রমর কালো চোখ মেললো কবিতা। দীর্ঘ রাত্রি অবসানের পর যেমন করে ফুলের দল চোখে মেলে। ঘবের পুরু কার্পেটের ওপর সোনাঝরা রোদ। কবিতা বিছানা ছেড়ে উঠলো। গত রাত্রের সুখস্মৃতি নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না, তবুও উঠতে হলো। কেন-না আজ সকালে তারা অ্যালিফেনটায যাবে। কবিতাব এই ঘর থেকেই সেটা দেখা যায়। আরবসাগরের মাঝে এই অ্যালিফেনটা কেভ্। অজন্তা-ইলোরার নিদর্শনের কিছু কিছু ওখানেও দেখা যাবে। আর দেরি করলো না কবিতা। স্নান করে নিজেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিল। তিমিরের ঘরে গিয়ে সে অবাক হলো ছেলেটা তখনও পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। ঘুমন্ত দেহটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। যেন একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে। কবিতা ওর শিয়রে কাছে দাঁড়ালো। মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে ডাকলো, তিমির ওঠো! আপনি সম্বোধনে অনেক দিন দূরে রেখেছে। আর রাখবে না। কবিতা তাই বললো, সকাল হয়েছে উঠে পড়ো—কোমল ডাকে ঘুম ভাঙল তিমিরেব। চোখ মেলেই দেখলো কবিতাকে। সোনামাখা হাসলো কবিতা। বললো, অ্যালিফেনটায় যাবে না? তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ব্রেক ফাস্ট রেডি। দেরি করো না? কাল রাতে খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েছে।

তোমার জন্য তো? তিমির এই প্রথম কবিতাকে 'তুমি' সম্বোধন করে তৃপ্তি অনুভব করলো। চোখের আশ্চর্য এক ভঙ্গিমায় ছন্দ তুললো কবিতা। ময়ূরের পেখম মেলার মতো নিজেকে মেলে ধরে বললো, আর তুমি? তোমার বুঝি কোনও গরজ ছিল না? উত্তরটা শুনে হাসলো তিমির। পরদার আড়ালে লুকিয়ে না-থেকে পাদপ্রদীপের সামনে এসে নিজেকে প্রকাশিত করলো, গরজ না-থাকলে মা-কে মিথ্যে বলে তোমার সঙ্গে এখানে ছুটে আসি?

সেটা কি রকম?

মা-কে বললাম অফিসের কাজে মুম্বাই যাচ্ছি—অথচ সেই অফিসে এখন পর্যন্ত একটি পা-ও দিলাম না। একটু চুপ করে থেকে তিমির আবার বললো, কলকাতায় ফিরে গিয়ে মা-কে সত্যি কথাটাই জানাবো। সব কিছুই বলবো। চোখ কপালে তুলে কবিতা বললো, তার মানে গত রাত্রের.......উত্তাল সমুদ্রের মতো হেসে উঠলো তিমির। পৃথিবীর সমস্ত আবর্জনা-আবীলতা সেই বাঁধ-ভাঙা হাসির স্রোতে খড়-কুটোর মতো অনায়াসে ভেসে যেতে পারে। রহস্য করে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, সব—

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ওখান থেকে লঞ্চে উঠলো দুজনে। আরও বেশ কিছু লোক যাচ্ছে অ্যালিফেনটা দেখতে। তরুণ-তরুণীর ভিড়টাই চোখে পড়ে বেশি। বাঁ দিকে অদূরে দেখা যাচ্ছে

আ্যাপলো-বন্দর। অ্যালিফেনটা গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার উল্টোদিকেই। তবে দূরত্ব আছে। সাগরের মাঝখান থেকে একটি পাহাড় মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। ওরই মধ্যে অ্যালিফেনটা কেভ্।

ওখান থেকে ওরা ফিরে এলো দুপুর সাড়ে-বারোটা নাগাদ। অ্যালিফেনটা দেখা হলো এই পর্যন্ত! খুব যে একটা খুশি হলো তিমির তা নয়। দেখার তালিকায় নতুন একটি স্থান যোগ হলো এইটুকু বলা চলে। লঞ্চ থেকে হোটেলের দিকে চলার ফাঁকে তিমির কি যেন ভাবলো। তারপরেই থেমে পড়লো সে।

কি হলো?

তুমি হোটেলে ফিরে যাও কবিতা। আমি একবার আমাদের অফিস থেকে ঘুরে আসবো। আগামীকাল চলে যাবো। আজ একবার না-গেলেই নয়।

বেশ তো! বিকেলে তো বেরুবোই, তখন না-হয় যাওয়া যাবে। আমিও সেই সুযোগে তোমাদের অফিসে...কবিতাকে থামিয়ে দিল তিমির। বললো, না কবিতা। সেখানে তোমার যাওয়া হলে একটু অসুবিধেয় পড়তে হবে।

আমি না-গেলেই কি কিছু সুবিধে হবে?

না। ঠিক তা নয়। ফিরে এসে তোমাকে বলবো।

যাবেই যখন তখন এক কাজ করো না, একেবারে খেয়েই যাও। না-খেয়ে সারা দুপুর কতোক্ষণ থাকবে?

—অনেক দেরি হয়ে যাবে তাহলে। আমার জন্য ভেবো না, আমি তাড়াতাড়িই ফিরবার চেষ্টা করবো।

হোটেলে ফিরেই কবিতা বাড়ির একটা চিঠি পেল। বাবা লিখেছেন। সেই সঙ্গে মা-ও দু'কলম লিখেছেন। মাদ্রাজে সে কবে পৌঁছাবে, সেটাই জানতে চেয়েছে। মা-বাবার চিঠিখানা তিন-চারবার পড়লো কবিতা। আসলে একবার পড়লে কিছুতেই মন ভরে না, বাইরে থাকলে বাড়ির চিঠিকে এতো বেশি আপন লাগে যে বলবার নয়। গত বছর ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যা হয়ে সে প্রথম বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল। ছিল দু'মাস। মা-বাবার স্নেহের ছায়া থেকে দূরে থাকার শূন্যতার অভাব তখনই অনুভব করেছিল। বাড়ির চিঠি পাওয়ার জন্য সারা মন কি উন্মুখ হয়েই-না থাকতো। তারপরে চিঠি হাতে এলে সেই চিঠির ওপর যেন বিপ্লব ঘটিয়ে দিতো। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে, প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, এপিঠ-ওপিঠ করে বারকয়েক পড়ার পর তবেই শান্ত হতো।

ঘড়িতে দু'টো বাজলো। তিমির তখন আসেনি। কবিতা ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। সে-ও খায়নি। এই ক'দিন একসঙ্গে খেয়েছে। এখন ওকে ফেলে কবিতা একা একা খায় কি করে? সেটা ভীষণ খারাপ দেখায়। খারাপ দেখানোর চেয়েও বড়ো প্রশ্ন হলো মনের। মন থেকে কবিতা তেমনটা করতে পারবে না। তিমির না-খেয়ে আছে আর সে খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আরাম করবে—এটা আগে হলেও এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। সে-ও না-খেয়ে থাকবে। হোক কষ্ট। না-খেয়ে থাকার জন্য তিমিরেরও তো কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া রোজ তো নয়। একটা দিন একটু বেলায় খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

তিমির এলো আরও অনেক পরে। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি। কবিতার আশ্চর্য সহ্য ক্ষমতা। এতোটুকু রাগ করলো না বা বিরক্তি প্রকাশ করলো না। শুধু বললো, আসতে পারলে? নাও—আর দেরি কোরো না। হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

খেতে বসে দুটি ডিশ সাজানো দেখেই তিমির তাকালো কবিতার দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো সে। অস্ফুট সুরে বললো, তুমি খাওনি কেন কবিতা? শুধু শুধু আমার জন্য, আমার জন্য তুমি এতো কষ্ট করতে গেলে কেন? খেয়ে নিলেই পারতে।

এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক কষ্ট স্বীকার করিনি। কবিতা তিমিরের লজ্জিত ভাবটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য উজ্জ্বল হাসলো। ওকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বললো, কই! বললে না-তো তোমাদের

অফিসে আমাকে নিয়ে যেতে চাওনি কেন?

অফিসের সবাই জেনে গেছে .... কথাটা শেষ না-করেই তিমির থামলো।

কি জেনে গেছে? কবিতার চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ওর চোখে চোখ রেখে তিমির অল্প একটু হাসলো। বললো, এই আমরা যে-সব শুরু করেছি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদের বেলা। হোটেলের ও-পাশে বড়ো বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় লাল শালুর আচ্ছাদন। পাখিরা ভিড় করেছে সেখানে। একটানা কিচির মিচির আওয়াজ যেন গানের সুর তুলেছে ক্রমাগত। চারিদিকের শান্ত পরিবেশের মধ্যে পাখিদের সঙ্গীত বেশ লাগছে শুনতে। ওরা বেড়িয়ে পড়লো। আজও কবিতা ড্রাইভার সঙ্গে নিল না। স্টিয়ারিং তার হাতে পড়লে গাড়ি তীব্র গতি নেয়। শহরের পথ পরিক্রমায় কবিতা তিমিরকে দেখালো, জি পি ও জ্যোতিবা ফুলে মার্কেট, ফোর্ট গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া গার্ডেন, সবশেষে ন্যাশনাল পার্ক। পার্কের ভেতরে বিশ্রামের জন্য গোলাকার ধরনের গান্ধী-কুটির। নাম-জানা এবং নাম-না-জানা রং-বেরং এর ফুলের সমাবেশ। নীচে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা। ভারী সুন্দর এই ন্যাশনাল পার্ক। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজ অরণ্যের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া। দূরে নীল আকাশ দিগন্তের সঙ্গে সখ্যতা পাতিয়েছে। ছেলে মেয়ের দল বন্ধুত্ব পাতিয়েছে পার্কের এদিকে-ওদিকে। উজ্জ্বল রঙের জামা, শাড়ি, মিনি স্কার্ট, চোস্ত সালোয়ার কামিজের দলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন প্রজাপতি পাখা মেলেছে। হঠাৎ মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। বাতাসের বেগে শনশন আওয়াজ। ঝড় উঠবে এবারে। নারকোল গাছের মাথায় বাতাসের দাপট। তিমির বললো, চলো হোটেলে ফিরি।

হোটেলে ফিরে আসারও বেশ কিছু পরে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির কান্না ঝরে পড়েছে সারা মুম্বাই শহরের ওপরে। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি। আরবসাগরের বুকে ঢেউ উঠেছে। গর্জনের মাতামাতি বুঝি সব কিছুকে গুঁড়িয়ে দেবে। তিমির বললো, কলকাতার হোটেলে বসে তুমি জানিয়েছিলে গান জানো। শুধু তাই নয়, গান গেয়ে শোনাতেও চেয়েছিল। আজকের সময়টা সেই গান শোনার—

আগে তুমি গাও। কবিতা অনুরোধ জানালো।

আমি! বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো তিমির। আমি গাইতে পারি এমন খবরটা তোমাকে কে দিল? কার কাছ থেকে তুমি এটা আবিষ্কার করলে?

আমি নিজেই আবিষ্কার করেছি। কবিতা হাসিমুখে বললো, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তোমাদের বাংলাদেশ। বাঙালি কবিতা লিখতে পারে না, গান গাইতে জানে না—এটা হতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ গান লিখতেন, সুর দিতেন, সেই গান আবার কণ্ঠেও তুলে নিতেন। কাজী নজরুল ইসলাম-ও তাই। এমন আরও অনেকে হয়তো আছেন। কবিতা নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে বললো, আমি তো সকলের নাম জানি না। তেমন পড়াশোনাও আমার নেই। যাই হোক তোমরা তো তাঁদেরই উত্তর সাধক। গান গাইতে পারো না এটা ভাবা যায় যায় না। বাঙালির প্রতি কবিতা যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল তা তার কথার প্রতিটি ছত্রে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বাঙালিকে, বাঙালির সংস্কৃতিকে সে সকলের উঁচুতে স্থান দিয়েছে। তিমিরের প্রতি কবিতা পক্ষপাত কি সেই কারণে? হতেও পারে। অসম্ভব নয়। তিমির শেষ পর্যন্ত গান গেয়েছে গেয়েছে নজরুলের একটি অপূর্ব কোরাস সঙ্গীত। কোরাস সঙ্গীত হলেও তিমিরকে গাইতে হলো একাঃ

দুর্গম গিরি কান্তর মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!

যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমাব মাতৃমুক্তি পণ!
'হিন্দ না ওরা মুসলিম'? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'ব।

তিমিরের গান শেষ হলে কবিতার চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভালোলাগার উজ্জ্বল ধারা। প্রশংসা করতে এতোটুকু কার্পণ্য করলো না, চমৎকাব গেয়েছো তুমি। তিমির সঙ্গে সঙ্গে জানালো, আমার গাওয়ার গুণে তোমার এটা ভালো লাগার কথা নয়। আসলে নজরুলের এই গানটির তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এমন সঙ্গীত বাংলাদেশে খুবই কমই আছে। সত্যিই তাই কবিতা। এই গানের ভাব, ভাষা, সুর তোমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি শুধু ঠোঁট মিলিয়েছি মাত্র! এবারে কিন্তু তোমার পালা! আমার গানের গলা নয়—খাওয়াব গলা। সেই গলাতেই যখন গাইতে পারলাম তখন প্রকৃত শিল্পী হয়ে তুমি নীরব থাকবে, তা হবে না। আর অনুরোধ করতে হয়নি কবিতাকে। সে গেয়েছে তার দরদী গলায় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত।

আজ বারি ঝবে ঝর ঝর ভরা বাদরে।
আকাশ ভাঙ্গা আকুল ধাবা কোথাও না ধরে।।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।
জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে মাঠের পরে।।
আজ মেঘেব জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন লুটেছে ঐ ঝড়ে।
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে
অন্তরে আজ কী কলোরোল দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গল আগল
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।।

বাইরে বর্ষণ মুখর প্রকৃতির সঙ্গে গানটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতি আর গানের সঙ্গে আবার একান্ত হতে পেরেছে কবিতা। অদ্ভুত ভালো গেয়েছে সে। কবিতাব গাওয়ার গুণে ভরা বাদলের আকাশ ভাঙা আকুল ধারা যেন এই ঘরের মধ্যেই নেমে এসেছিল। কবিতা এমন চমৎকার গায় তিমিরের সে-ধারণা ছিল না। অহেতুক মিথ্যে প্রশংসার বাণীতে সে সম্বর্ধনা জানালো না। খাঁটি কথাটাই বললো, তুমি শুধুমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিল্পী হিসেবেই পরিচিত হতে পারতে—দারুণ গেয়েছো!

তুমি বাড়িয়ে বলছো! তোমার কথাই তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমারও গানের গলা নয়—খাওয়ার গলা। কথাটা বলেই হাসিতে লুটিয়ে পড়লো কবিতা।

আমি মিথ্যে করে বেশি বেশি কারও প্রশংসা করি না। তিমির ভরাট গলায় বললো, যে যতোটুকু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য আমি তাকে ঠিক ততোটুকু মর্যাদা দিই। বাড়িয়ে আমি এতোটুকু বলতে পারি না। বা লিখতেও পারি না। তেমন স্বভাবই আমার নয়।

সে আমি জানি। কবিতা সমর্থন করতেই তিমির তাকে পাল্টা আক্রমণ করলো, তাহলে স্বীকার করছো আমি যা বললাম সেটা ঠিক।

তার মানে? কবিতা কথার অর্থ ধরতে না-পেরে প্রশ্ন করলো।

অর্থাৎ কি-না তুমি....তিমিরের কথা শেষ হলো না। তার আগেই কবিতা হাসির ফোয়ারা ছোটালো, এই কারণেই তোমরা পাকা রিপোর্টার। ঠিক মনের কথাটা বের করে নিয়ে তা দিয়েই আবার তাকে আক্রমণ করতে পারো।

কথা বের করাই তো আমাদের কাজ! তিমির সহজেই স্বীকার করলো, সে-বার কি হয়েছো জানো—প্রেস কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সোজা-সুজি উত্তর দেননি। এড়িয়ে গেছেন। অথচ উত্তরটা আমার চাই-ই। তারপব চললো অন্যান্য বিষয়েব একটানা প্রশ্ন উত্তরের পালা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা ধরনের প্রশ্নের মধ্যে আমি আমার আসল প্রশ্নেব উত্তর যথাযথই পেয়ে গেলাম। তবে একবার একটু বকা খেয়েছিলাম। তিমির হাসতে হাসতেই বললো, আমাদেব পশ্চিমবাংলার এক মুখ্যমন্ত্রীকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি স্পষ্টই বলেছেন ঃ ও-ব্যাপারে আমি মুখ খুলবো না। আমি বলবো এক, তোমরা লিখবে আর এক—সেটি হবে না। এ-সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি কোনওরকম মন্তব্য করবো না। আমি কিন্তু চুপ করে থাকিনি। যে-সব তথ্যসংগ্রহ করেছি তার ওপর নির্ভর করেই কাগজে লিখেছি। ব্যস! পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ডাক পড়লো। এটা কি লিখেছো? আমি তো এমনটা বলিনি।

আজ্ঞে গত কাল আমাকে বলেননি বটে তবে এক জনসভায় সে-কথা আপনি বলেছিলেন। দিন তেরো আগে কুচবিহারের চারদোঁয়া গ্রামের এক সভাতেই আপনি কথাটা বলেছিলেন। অবশ্য পরেব মিটিং হাজিগঞ্জেব মুন্সিথানাব সমাবেশে আবাব অন্যরকম বলেছেন।

এর অর্থ শুধুমাত্র কথা বের করাই তোমাদের একমাত্র কাজ নয়, কবিতা আরও যোগ করলো, প্রতিটি কথা মনে রেখে সযত্নে পালন করাও তোমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ!

নিশ্চয়ই। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তিমিব বললো, নির্বাচনেব আগে একজন নেতা এক সপ্তাহে পনেবো-ষোলটি জায়গায় ভাষণ দেন। কোন জায়গায় কোন কথাটি বলেন আর কোন মিটিং-এ বলেন না সেটা তাঁদের চেয়ে আমাদেরই বেশি করে মনে রাখতে হয়। তাই স্পষ্ট কথা লিখতে আমি এতোটুকু ভয় পাই না।

শুধু বলতে ভয় পাও!

কি রকম! তেমন প্রমাণ কিছু পেয়েছে নাকি?

হ্যাঁ পেয়েছি। কবিতা ছোট মেয়েব মতো মাথা দোলালো। সত্যি কথাটা আমাকে স্পষ্ট করে বলতে পারোনি! অথচ আমার সঙ্গে মুম্বাই এসেছো এককথায়, আমাকে শাড়িব কিনে দিয়েছো, আমার সঙ্গে দিনের-পর-দিন থাকছো, সেই তুলনায় মুখ খুলেছো কতোটুকু?

তুমি সত্যি কথাই বলেছো কবিতা। তবে কথাটা কি জানো, তোমাব মান-সম্মান, অর্থ-যশ-প্রতিপত্তিতে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে বড়ো। এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তোমার জনপ্রিয়তার কাছে আমার নজির অত্যন্ত ম্লান। সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ একজন সাংবাদিক। কোনও কিছুতেই তোমার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। এটা তোমাকে বড়ো করে তুলে ধরা নয়, দুজনের পার্থক্য যা আমি তাই-ই বললাম। এটাকে তুমিও অস্বীকার করতে পারো না। বিদেশের আমন্ত্রণে তুমি ভাবত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে দু'বার বাইরে গেছো, আর দেশের মাটিতে নিতান্তই পাড়ার বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আমাকে বড়ো একটা কেউ চেনে না। দুজনের যেখানে এতো ব্যবধান সেক্ষেত্রে আমি তোমার কাছে আগে এগিয়ে গিয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দেবো, সেটা আর কেউ পারলেও আমি অন্তত পারি না। আকাশকুসুম কল্পনায় আমার বাস নয়—আমার বিচরণ এই সংসারে। এই ক'দিন তাই তোমাকে নীরব থেকে চিনতে, জানতে, বুঝতে চেষ্টা করেছি।

কি বুঝলে? কবিতার দুই চোখে কৌতূহলের গভীর ছায়া।

বুঝলাম—তিমির হেসে ফেললো, এগিয়ে যাওয়া যায়। মেয়েটা এমন কিছু বিপজ্জনক নয়।

এতোদিন বুঝলে? কবিতা লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই বসলো, কলকাতা থাকতেই কি সেটা বোঝা উচিত ছিল না? আমি তো প্রথম দিনেই তোমার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিলাম।—অন্য ছেলে হলে বুঝতে পারতো।

—অন্যের চেয়ে আমি আলাদা। নিশ্চিত না-হয়ে আমি কোনও কিছু করি না। কোনও কাজে এগোই না। এগোনোটা সহজ কিন্তু সম্মান একবার খোয়া গেলে ওটা সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। ওই কারণেই আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও

না।" তুমিই বলো না কবিতা, আহাম্মকের মতো আমি যদি উল্টো-পাল্টা কিছু করতাম, তুমি কি তবে আমার কাছে এতোখানি এগিয়ে আসতে?

আমার সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়েছো, নিজে তুমি অনেক বিনয় প্রকাশ করেছ, আমার বড়োত্বের একটা ছবিও এঁকেছো কিন্তু আমি তো একজন মানুষ! সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের রূপও এক। স্তরভেদে শুধু আলাদা। এ-ঠিক শিশুর কান্নার মতো। সব জাতের সব শিশুদের ভাষা আলাদা কিন্তু তাদের কান্নার সুর এক। সেখানে কোনও পার্থক্য নেই। সংসারে আমরা এক-একজনের এক-একটা গুণ নিয়ে আসি বটে তবে আমরা সকলেই সমান। সেখানে কেউ ছোট নই, কেউ বড়ো নই।

তুমি প্রকৃতই শিল্পী কবিতা। তাই এমন সুন্দর কথা বলছো। কিন্তু তোমার মতো মন নিয়ে কেউ কথা বলেবে না এই সংসারে।

ও-সব কথা বাদ দাও, কবিতা নিজের প্রশংসা শুনতে চাইলো না। আমি তোমার একটি কথা নিয়েই ভাবছিলাম, কথাটা ভুল বলেছো।

কি?

একটু আগেই বলেছো, আমি সব কিছুতেই তোমার চেয়ে বড়ো! তার মানে আমি বুঝি তোমার দিদির বয়সী?

না, তা নও। বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট-ই হবে। একটু থেমে তিমির জিজ্ঞেস করলো, কতো হলো?

চুপ! কৃত্রিম সুরে ধমকে উঠলো কবিতা, সাঙ্ঘাতিক মানুষ তো তুমি! মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করতে নেই জানো না? বলেই ফল্গুধারার মতো হেসে উঠলো, আসল বয়েস তেইশ কিন্তু তোমরা মানে কাগজে লোকেরা সেই তিন বছর আগে আমার বয়েস কুড়ি লিখতে আজও ঠিক তাই লিখছো। এই দেখো! গোপন কথাটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম; পারতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কাগজে লিখতে বসে যেয়ো না! কবিতা আশ্চর্য ভঙ্গিমায় হেসে উঠলো। সুন্দর সাজানো ঝকঝকে দাঁতগুলি যেন একটি মুক্তোর মালা! চঞ্চল হাসির ঝর্ণায় তার সারা দেহ বারবার কেঁপে উঠতে থাকে। বুকের আঁচলটা সামলে নিয়ে আবারও বললো, গোপনে শুধু তোমাকেই বললাম, শুধু তোমাকে—

মুম্বাই থেকে কলকাতা। সান্তাক্রুজ এয়ার পোর্ট থেকে দমদম এয়ার পোর্টে এসে নামলো ওরা। আবার কলকাতা। তিমিরের নিজস্ব শহর। পরিচিত শহর। মনে হলো যেন কতোদিন বাদে সে ফিরে এলো এখানে। শহরের সব কিছু কেমন যেন নতুন লাগছে। আসলে সবইতো ঠিক আছে। তিমিরই নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো শহরের রাস্তাঘাট, বাড়ি গাছপালা। মানুষজন আর যানবাহন! সব কিছু দেখতেই আজ ভীষণ ভালো লাগছে। ভালো লাগার অবশ্য আরও কারণ আছে। বর্ষণসিক্ত দিনে মুম্বাই-এর তাজমহল হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে মুখোমুখি হয়ে কবিতা তাকে পেতে চেয়েছে— সারা জীবনের সুখে-দুঃখে, অভাবে-অভিযোগে, বেদনায়-আনন্দের সঙ্গী হিসেবে। কবিতা তার স্ত্রী হতে চেয়েছে। কোনওরকম লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়, দ্বিধা নয়, জড়তা নয়! পরিষ্কার মুখ ফুটে বলেছে, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। কবিতাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া যে-কোনও সাধারণ ছেলের পক্ষেই কল্পনার বাইরে। সেখানে কবিতা নিজে এসে ধরা দিয়েছে। যেন স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে মাটির বুকে। আশ্রয় চাইছে মাটিতেই। সেদিক দিয়ে তিমির আনন্দিত। জীবনে যা চেয়েছে—পেয়েছে তারচেয়েও শতগুণে বেশি। কবিতাকে পাওয়া গর্বের বই কী! কিন্তু তিমির অন্য কথা ভাবছে। ভাবছে মা'র কথা। মা আগেকার দিনের মানুষ। ধর্মের প্রতি তাঁর গোঁড়ামি অত্যন্ত প্রবল। তিনি কি সহজে এ-বিয়েতে রাজি হবেন? কবিতা তার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি ভাবছো?

ভাবছি মায়ের কথা! এতোটুকু রেখে-ঢেকে লুকিয়ে কথা বলেনি তিমির। খোলাখুলিই আলোচনা করেছে, তোমার প্রতি আমার মনের কথা তো তুমি জানোই। যাঁর কথা জানে না, তিনি হলেন আমার মা। মা এই বিয়েতে রাজি হবেন না। তার মানে এই নয় যে আমি তোমার সঙ্গে এতোদিন

মিশে সরে দাঁড়াবো প্রযোজনের সময়ে! আমাকে ভুল বুঝবার চেষ্টা কোরো না কবিতা, আমি শুধু আমার মায়ের কথাই বলছি। অবশ্য এটাও ঠিক তাকে আমার রাজি করাতেই হবে।

মা, রাজি হবেন না কেন? আমি পাঞ্জাবী বলে?

ঠিক তাও নয়। তিমিরের সাবা মুখে অব্যক্ত বেদনার ছাপ। মেয়েদের এই নাচ-গান করা মা একেবারেই পছন্দ করেন না।

নাচ আমি ছেড়ে দেবো। তিমিরকে পাবার জন্যে অতি অনায়াসে নাচ ছেড়ে দেবার কথাটা বলতে পারলো কবিতা।

ঠাট্টা করছো! অবাক হলো তিমির।

কীসের ঠাট্টা?

তোমার সম্মান আজ অনেক উঁচুতে, তা তুমি ভালো করেই জানো। নিজস্ব জগৎ ছেড়ে, নাম-ডাক মান-সম্মান যশ এ-সব ছেড়ে দিয়ে তুমি একটা সাধাবণ পরিবারেব অতি সাধারণ একজনের স্ত্রী হয়ে সব কিছু ভুলে থাকবে শুধু...

তোমার কথা শুনে আমার শুধুই দুঃখ হচ্ছে। বলার আমাব আর কিছুই নেই। তবে যা তোমার কাছে বললাম, জীবনের সত্য কথাই বললাম। এতোটুকু ফাঁক নেই তাতে।

কিন্তু কবিতা এতে ক্ষতি তোমারই।

লাভ তার চেয়েও অনেক বেশি। আমি তোমাকে পাবো।

তবে আমি নিজের কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে যাবো। সে আমাব ভারী খাবাপ লাগবে। আমাব জন্য তুমি তোমার সব কিছু ছাড়বে এ-কক্ষনও হয় না। হতে পারে না।

কিন্তু মা যখন নাচ-গান পছন্দ করেন না---আমাকে তো তখন ও-সব ছাড়তেই হবে। উত্তেজনায় অন্তরের নিগূঢ় কথাটা অতি নির্লজ্জের মতো বলে বসলো সে, আমি সব ছাড়তে পারি কিন্তু তোমাকে নয়, তিমির তোমাকে নয়!!

বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই মায়ের সংবাদ নিল তিমির। কিছুক্ষণ গল্প করলো। রাতের খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা-ভাবনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, কবিতাকেই সে বিয়ে কববে। ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরের মেয়েটা নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছে তার কাছে। যা তিমিব কেন যে-কোনও সাধারণ ছেলের পক্ষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সেই কবিতাকে তিমির কিছুতেই হারাতে পারবে না। ভাবতেও অবাক লাগে। দেহটা দুলে ওঠে। আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে সারা মন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী, নৃত্যপটিযসী কবিতা কাপুর তারই স্ত্রী হবে। যাকে একটুখানি চোখের দেখা দেখবার জন্য সারা শহরের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায়, যার একটি অটোগ্রাফ পাবার আশায় ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে অপেক্ষা করতে হয় বিপুল অটোগ্রাফ শিকাবীর দলকে, যাব একটুখানি সঙ্গ পাবার জন্য ফটোগ্রাফাররা উন্মুখ, সাংবাদিকদের মধ্যে জাগে চাঞ্চল্য, যার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে সবাই নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করে, সেই মৃগনয়নী কবিতা কাপুর আসবে তিমিরেরই ঘরে। তার স্ত্রী হয়ে। দাদা-বৌদি, মা কেউই রাজি হবেন না। তাঁরা রাজি না-হলেও তিমির ওকে বিয়ে করবেই । তবে মাকে রাজি করাতে পারলে ভালো হতো। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোনও কিছুই ভালো হয না।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো চন্দনার ডাকে। তিমিরের ছোটবোন চন্দনা। যোগমায়া কলেজে বি. এ পড়ে।

চা নাও। তিমিরের হাতে চায়ের কাপটা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো চন্দনা। তিমির ডাকলো, এই চন্দনা শোন। মা কোথায় রে?

পুজোর ঘরে।

পুজো শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ।

মাকে একবার পাঠিয়ে দে-তো।

একটু পরেই তিমিরের ঘরে এলেন ছায়াদেবী। ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে পঞ্চাশের ওপরে। শরীরটা এখনও বাঁধা আছে সুন্দর স্বাস্থ্যে। গৌরবর্ণ গায়ের রং। কাঁচা-পাকায় মেশানো মাথার চুল। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। দেখলেই বোঝা যায় বেশ গম্ভীর, রাশভারী মানুষ। এই সংসারটিকে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে শক্ত হাতে আজও ধরে রেখেছেন। সমুদ্রের উত্তাল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যেও পাকা মাঝি যেমন নিপুণ হাতে নৌকাটিকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে যায় তেমনি ছায়াদেবীও সংসারটিকে স্নেহের আঁচল দিয়ে আগলে রেখেছেন।

কি রে? এই সাত-সকালে এমন কি দরকার পড়লো তার? ছায়াদেবী ছেলেকে জিজ্ঞেস করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তিমির একটু ইতস্তত করলো। কীভাবে কথাটা শুরু করবে সেটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে সাজাতে লাগলো। একটা জিনিস ঠিক করলো, কোনওরকম লুকোচুরি, ভনিতা ইত্যাদি করবে না। যা বলবে মাকে স্পষ্ট বলবে। মা এতে যদি তাকে নির্লজ্জ ভাবেন, ভাবুন। তবুও সে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কিছু বলবে না। এতো ভাবার পরেও বাঁধো বাঁধো লাগছে। ছায়াদেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিরে? কিছু বলবি?

মা! তিমির মাথা নিচু করে বলেই ফেললো, আমি কবিতাকে বিয়ে করবো। শুধু ওই একটিমাত্র কথাই নয়, কবিতার সম্বন্ধে মোটামুটি সবই জানালো। ছায়াদেবী তিমিরে প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন। তিমির বলে কি? শেষ পর্যন্ত একটা অবাঙ্গালিও সঙ্গে ছেলেব বিয়ে দিতে হবে! তাই কি কখনও হয়? বাংলাদেশে কি বাঙালি মেয়ের রাতারাতি অভাব পড়ে গেল নাকি? জাতে-বেজাতে তিমিরের বিয়ে দিতে হবে এমনটা যে ছায়াদেবী স্বপ্নেও ভাবেননি। তারচেয়েও বড়ো কথা মেয়েটা নেচে বেড়ায়। না-না! ছায়াদেবী আর ভাবতে পারেন না। তাঁর কতো আশা সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো স্নিগ্ধ, শান্ত শীতল লক্ষ্মী বৌ আনবেন ঘরে, স্বামী, পরিজনদের সেবা করবে, ঘরের কাজ করবে, এমন বৌ-এরই একটি পরিচ্ছন্ন ছবি এঁকেছিলেন তিনি। সেখানে কিনা কবিতা কাপূর! ঠোঁটে-মুখে রং মেখে হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে নাচবে, বেড়াবে, খেলবে, আজ এখানে কাল সেখানে করে বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দেবে। ঘরের দিকে মন দেওয়া তো দূরের কথা স্বামীরই ঠিকমতো পরিচর্যা করবে না; এমন মেয়েকে ঘরের বৌ করে তিনি আনেন কেমন করে? তিমিব না-হয় অবুঝ। বয়সের জোয়ারে সে সব কিছুকেই রঙিন দেখতে আরম্ভ করেছে, ভালো-মন্দ বুঝবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তিনি তো তিমির নন। তিনি অবুঝ হন কি করে? বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি অনেক ওপরে। সেখানে ভাবাবেগ স্থান পেতে পারে না। ছায়াদেবী ছেলের দিকে তাকালেন। রাগে বিস্ময়ে তিনি ভেঙে পড়লেন, তুই ক্ষেপেছিস? লজ্জার মাথা কি একেবারেই খেয়েছিস? কি করে ভাবতে পারলি যে পাঞ্জাবী একটি মেয়েকে বৌ করবো? ওই নর্তকী মেয়েকে ঘরের তুলবো?

অমন বিকৃত মানে কোরো না মা। সে নর্তকীর নয়। মানে নর্তকী বলতে যা বোঝায়? কবিতা সে-জাতের নয়।

আমাদের জাতেরও তো সে নয়, তুই থাম। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন ছায়াদেবী। এ-বিয়ে হবে না। পাঞ্জাবী, নর্তকী মেয়ের স্থান আমার বাড়িতে কিছুতেই হবে না। মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো তিমির। অনেক কথাই ভাবলো সে। কেমন করে মাকে সন্তুষ্ট করিয়ে রাজি করানো যায় তারই ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগলো তিমির। বললো, আচ্ছা মা। জাতের কি আসে-যায় বলতো? আমরা সকলেই মানুষের জাত; এটাই কি বড়ো পরিচয় নয়?

আমাদের ঘুঁটে দেয় বুধুনী. তার ছেলের সঙ্গে তাই বলে তুই তোর বোনের বিয়ে দিতে পারবি?

তোমার এই তুলনাটা কি ঠিক হলো?

বেঠিক কি হলো বল? বুধুনীর ছেলেও তো মানুষ! এরপরেই গলার সুর আর এক পর্দা চড়িয়ে তুললেন ছায়াদেবী, ও-সব বড়ো বড়ো কথা তুই তোর কাগজেই লিখিস, আর যারা বোঝে না, তাদেরকে বোঝাস। আমাকে তুই বোঝাতে আসিস না।

মা, শোনো মা! তিমিরের কণ্ঠে মিনতির সুর। তুমি যা ভাবছো কবিতা তেমন মেয়ে নয়! ও খুব ভালো! খুব ভালো!! তুমি নাচ পছন্দ করো না জেনে ও নাচ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি, বিনিময়ে কবিতা শুধু তোমার ঘরে আসতে চাইছে। তুমি না করো না মা!

তোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তো আমি চলবো না। ছায়াদেবী খেদ মেশানো সুরে বললেন, তুই দিন দিন ভীষণ পাজী হয়ে উঠছিস, নয়তো আমার যেখানে আপত্তি তোর পছন্দ সেখানেই! আমি কি কোনোদিনও ভেবেছিলাম যে, তুই এমন অবাধ্য হয়ে উঠবি? পাঁচজনের কাছে কতো প্রশংসা করেছি, গল্প করেছি, তিমির আমার সোনার টুকরো ছেলে। এখন বড়ো হয়েছে তবুও যা বলছি তাই শোনে। মুখে মুখে একটা কথা পর্যন্ত বলে না। সেই তুই আমাকে এমন করে দুঃখ দিলি—প্রথম থেকেই যদি এমন ব্যবহার করতি তবে আজ আমি এই আঘাত পেতাম না!

মিথ্যে তুমি দুঃখ আঘাত এই সব বলে কষ্ট পাচ্ছো। আসলে এরমধ্যে আঘাত পাওয়ার কিছুই নেই। জোর করে তুমি যদি কষ্ট পাও তবে আমি কি করতে পারি বলো?

তোর সঙ্গে অতো বকবক করতে পারবো না—ছায়াদেবী স্পষ্টই বললেন, এ-বিয়ে হবে না। উত্তরে তিমির কি বলবে, কিছু ভেবে উঠতে পারলো না। গুম হয়ে বসে রইলো দূরের চেয়ারটাতে। সারা মুখ গম্ভীর। থমথমে ভাব। যেন ঝড় উঠবে। মায়ের মুখের দিকে একবার তাঁকালো কি যেন পাঠ করার চেষ্টা করলো, সে তারপরেই উঠে দাঁড়ালো। ঘরের-মধ্যে পায়চারি করলো কয়েকবার। বললো, তুমি কবিতার সঙ্গে আলাপ করবে? একবার আলাপ করলেই তুমি বুঝতে পারবে।.....তার দরকার হবে না। আমি ছেলেমানুষই নই যে সব কিছু বুঝবার জন্য একটা মিটিং করতে হবে? তিমিরের মনের আয়নায় ছায়াদেবীর মনোভাব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং তিমির তার লক্ষ্যপথে পৌছালো, আমি কবিতাকেই বিয়ে করবো।

তুই যা বলবি তাই হবে? রীতিমতো ধমকে উঠলেন ছায়াদেবী। তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? সাহসটা তো দিন দিন এমন বাড়ছে কোথা থেকে? আশ্চর্য তিমিরের কথাবার্তা শুনে রাগে সর্বশরীর জ্বলে যায় ছায়াদেবীর। বড়ো ছেলে সুবীরকে ডেকে আনলেন। বললেন, শুনেছিস বাবা, তিমুর কথাবার্তা। শেষ পর্যন্ত একটা নর্তকীকে বিয়ে করতে চাইছে। তাও যদি স্বজাতি হতো—পাঞ্জাবী। এমন মেয়েকে আমি কেমন করে ঘরে তুলি বল? কান্নার মতো ভেজা শোনালো ছায়াদেবীর গলা।

এ-সব বাজে, পাগলামো মতলব ছেড়ে দে তিমু। বড়ো ভাই সুবীর শাসন করলো ছোট ভাইকে।

পাগলামো আমি করছি না। স্পষ্ট উত্তর তিমিরের।

পাগলামো করছিস না, জেদ করছিস। গোয়ার্তুমি করছিস। তোর মতো কল্পনা বিলাসী হলে আমরা মত দিতাম। কিন্তু জীবনটা বড়ো কঠিন। রূঢ়-রুক্ষ্ম বাস্তব। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতির সঙ্গে ওই মেয়ের কোন জায়গায় মিলটা হবে বল? তাছাড়া সে নাচে। তার সোসাইটি আলাদা। সে আমাদের এই মধ্যবিত্ত পরিবারের এসে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। তার জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উঁচু ধাপে বাধা। সাময়িক দুটো দিন হয়তো সে ভালো থাকবে কিন্তু মোহ কেটে গেলেই সে আর আমাদের এই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। তখন সংঘাত আসবেই।

সে তো এখনই বুঝতে পারছি। তিমির কথাটা না-বলে থাকতে পারলো না।

এ-কথার অর্থ?

প্রথম সংঘাত তো তোমরাই ডেকে আনছো। কবিতাকে বিয়ে করতে চাইছি, তোমরা বাধা দিচ্ছো।

সেজন্য তুই সমাজ-সংস্কার মানবি না? এবারে রেগে উঠলেন ছায়াদেবী।

সমাজ! প্রচণ্ড অবজ্ঞার সুর ঝরে পড়লো তিমিরে ওই একটি কথায়। ও-তো কিছু সুবিধেবাদী লোকের তৈরি। আশি বছরের জমিদার যখন তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করতো তখন তোমাদের ওই সমাজ ছিল কোথায়? তাছাড়া বিয়ে করছি কবিতাকে, সমাজকে নয়।

তোর যা খুশি তুই তাই কব। আমি ওই নাচিয়ে মেয়েকে ঘরে তুলবো না। এই আমাব শেষ কথা।

আমারও শেষ কথা আমি আগেই জানিয়েছি। তিমিরেব কথা শুনে ছায়াদেবী বড়ো ছেলের দিকে চাইলেন। বললেন, কি করে তুই যে চুপ করে রইলি? তিমুকে কিছু বলবি না? অসহায়ের সুর ছায়াদেবীর। নিজে তিমিরেব সঙ্গে না-পেরে উঠে বড়ো ছেলেব সাহায্য চাইলেন। যদি তিমিরকে বুঝিয়ে ঠান্ডা কবা যায়। কেন-না এটা ঠিক, তিমির যদি কবিতাকে বিয়েই করে তাহলে তিনি ঘরে না-তুলে পারবেন না। ছেলেকে তিনি কি কবে তাড়িয়ে দেবেন? এতোটা বছর বুকের আগলে বড়ো করেছেন, মানুষ করেছেন তার কি দূবে সরিয়ে দেবার জন্য? সেই কারণেই বিয়েটা যাতে না-হয় তাবই চেষ্টা করতে হবে।

যে কথা শুনবে না-বলে প্রতিজ্ঞা কবেছে তাকে তো কথা শোনানো যায় না মা। আব মা দাদার কথা শোনে না অমন অবাধ্য ছেলেকেও আমি কিছু বলতে চাই না। ওব যা খুশি ও তাই করুক। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, ভবিষ্যতে আমাদের কোনওরকম দোষারোপ কবতে পারবে না। কথাটা বলে সুবীর আব দাঁড়ালো না। ছাযাদেবীও অগ্নিদৃষ্টিতে তিমিরেব দিকে চেয়ে বললেন, দূর হযে যা আমার চোখেব সামনে থেকে।

কবিতাকে বিয়ে করাব ঘোষণার পর থেকেই তিমিব যেন দেখবাব বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন-না স্বাতীবৌদি. চন্দনা তাকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা কবাই তাব সাক্ষ্য দেয। সারা শরীর রী-রী-করে উঠলো তিমিবের। ইচ্ছা হয স্বাতীবৌদিকে ডেকে বেশ কবে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। একেই তার সঙ্গে তিমিবেব সম্পর্ক তেমন মধুব নয। সারা দিন কথা হয কি না তাও সন্দেহ। আসলে তিমির স্বাতীবৌদির ছোট মনের জন্য তাকে সহ্যই করতে পাবে না। অথচ অন্যান্য বাড়ির বৌদিরা কেমন সুন্দব! যেমন সহজ-সবল মিষ্টি কথা, তেমনি ব্যবহাব। আর তার বৌদি? সম্পূর্ণ বিপরীত।

এবারেও জানলায দুটি চোখেব ছায়া পড়লো। তিমিব বুঝতে পাবলো ওটা চন্দনাব। তাই রুক্ষকণ্ঠে ডাক দিল, চন্দনা শুনে যা তো। পাযে পাযে তিমিবের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো চন্দনা। তিমিব ওব আপাদমস্তক একবাব লক্ষ্য করলো। দিনেব-পর দিন মেয়েটার সাহস বেড়েই চলেছে। আব বাড়বে নাই-বা-কেন? যে-পবিমাণে বৌদি আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছে....এমনিতে আদব কবা, স্নেহ করা আলাদা. কিন্তু এমন সর্বনাশী আদব ক'জনে কবে? মার শাসনও অন্য সবক্ষেত্রে কঠিন হলেও মেয়েব ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই দুর্বলতাব পরিচয় দিয়েছেন, নযতো চন্দনাব এমন সাহস, তাকে এমন কবে...রাগে ফেটে পড়লো তিমিব। মাববে নাকি একটি চড় ওর গালে? কোনোদিন যাতে আর কোনও বেয়াদপি না-কবে সেই শিক্ষাই দেওয়া উচিত। নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণ করে বললো, তোরা কি পেয়েছিস, কি ভেবেছিস আমাকে?

তুমি, তুমি ওই কবিতা কাপূরকে বিয়ে করবে?

তাতে তোব এতো মাথাব্যথা কীসেব?

শেষ পর্যন্ত তুমি পাঞ্জাবী মেয়েকে....

থাম—ধমকে উঠলো তিমির। সে জানে ও-সমস্ত একটিও চন্দনার কথা নয়। চন্দনা তো তাবই বোন। এতো সাহস তার নেই। তাকে দিয়া যা বলানো হয় সে তাই বলে। চন্দনার পিছনেব শক্তিটুকু উপলব্ধি করে বললো. তোদেব কাউকেই আমাব অভিভাবক হতে হবে না। পাঞ্জাবী মেয়ে! তা ওই পাঞ্জাবী-মেয়ের নাচ দেখতে অমন হুড়মুড় কবে পরপর দু'দিন ছুটে গিয়েছিলি কেন?

নাচ দেখা আর একজন বিজাতীয় মেয়েকে বৌদি ডাকা দুটোর মধ্যে ব্যবধান আছে। এমন কিছু আছে, যা ভাবলে ভালোই লাগে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহলে কিছুতেই ভালো দেখায় না।

পাকামো রাখ, বৌদি কি তোকে আজকাল এই সব শেখাচ্ছে?

বৌদি শেখাবে কেন?

তাহলে কলেজের পড়া না-শিখে এ-সবই শিখছিস বল? যা, পালা এখান থেকে।

সকাল তখন সওযা-ন'টা। বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল তিমির। পাশের ঘর থেকে স্বাতীবৌদি চন্দনাকে

বলছে, তুমি দেখে নিয়ো ঠাকুরঝি, ও-মেয়ে কক্ষনও এখানে টিকতে পারবে না। তাছাড়া সে হলো নাচিয়ে মেয়ে। ঠাকুরপোকে নিয়েই কতো নাচানাচি করে তাই দেখো না! স্বাতীবৌদির কথা শুনে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালো তিমির। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করছে। আবার স্বাতীবৌদির সঙ্গে কথা বলবারও প্রবৃত্তি হয় না। মাঝে মাঝে তিমির ভাবে, এমন বৌদিও মানুষের হয়? অথচ তার সঙ্গে তো এমন সম্পর্ক হওয়ার কারণ ছিল না। আসলে স্বাতীবৌদি চেয়েছিল, তার মামাতো বোন ইতির সঙ্গে তিমিরের বিয়ের ঘটকালি করা। তিমিরকে বলেও ছিল সে-কথা। শুনে সে পরিষ্কার উত্তর দিয়েছিল, ও-সব ইতি-টিতিকে বিয়ে করতে পারবো না।

না কেন? স্বাতীবৌদি প্রশ্ন তুলেছিল। আমার বোন সে।

তোমার বোন, ওটাই কি তার বিয়ের বাজারে সবচেয়ে বড়ো পরিচয়? তুমি কিছু মনে কোরো না বৌদি, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি বলতে কিছুই নেই তোমার ইতির। এমনকী মোটামুটি রূপটুকু পর্যন্ত নয়। সেক্ষেত্রে তুমি কি করে আশা করো যে আমি তাকে বিয়ে করবো? ব্যস। ওই কথা জানানোর পর থেকেই তিমির ভীষণ খারাপ মানুষে পরিণত হয়েছে স্বাতীবৌদির কাছে। রাতারাতি বিষ নজরের কোপে পড়ে হয়েছে শত্রুপক্ষ। যাবার মুখে কথাগুলি শুনে মনটা দমে গেল ওর। তিমির যাচ্ছিলো কবিতার কাছেই। কিন্তু ফিরে এলো নিজের ঘরে। শার্টটা একটানে খুলে আলনার দিকে ছুঁড়ে মারলো। শুয়ে পড়লো বিছানায়। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলো চন্দনা। তিমির ডাকলো ওকে। এই চন্দনা, শুনে যা—

কি বলছো?

এ-বাড়িতে আমার সম্বন্ধে কেউ যেন কোনওরকম আলোচনা না-করে। কথাটা খেয়াল থাকে যেন বুঝলি? চলে যা—আদেশের সুরে তিমির বললো।

দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো তিমির। কবিতার কথা বেশ কিছুক্ষণ ভাবলো। মায়ের দিকটাও চিন্তা করলো। চিন্তায়-ভাবনায় একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। সেই ঘুম ভাঙলো বিকেলের একটু আগে। হাত-মুখ ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে ঘর থেকে বেরুতেই চা নিয়ে এলো স্বাতীবৌদি।

চা খেয়ে যাও।

দরকার নেই। নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিল তিমির। পা চালালো সিঁড়ির দিকে।

হুঁ। তিমিরের পিছন দিকে চেয়ে একটা শব্দ করলো স্বাতীবৌদি। তিমিরের কানে গেল তা। তাই ফিরে এলো। স্বাতীবৌদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হুঁ' করলে কেন?

এমনি। স্বাতীবৌদির ও-কথার ওপরে আর কথা বাড়ালো না তিমির। ঠিক যাবার মুখেই যতো রাজ্যের ঝামেলা। সকালে যে-জন্য তার যাওয়াই হলো না। বিকেলেও তাই। এবার আর মন খারাপ করে ঘরে গিয়ে বসে রইলো না তিমির। কেন-না আজ আবার কবিতার প্রোগ্রাম। সোজা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আর স্বাতীবৌদিকে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছায়াদেবী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, কেন যে গোঁয়ার-গোবিন্দটার সঙ্গে কথা বলতে যাও দেখলে তো আজ সকালবেলা আমাকে কেমন দুমদুম করে অপমানটা করলো।

কবিতার হোটেলে গিয়ে তিমির দেখলো, সে চুপচাপ বসে একটি বিলিতি পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে।

এসো! পুরু করে কাজল পরা আয়ত চোখের গভীর ফাঁদ মেলে কবিতা হাসলো। তিমিরকে কফি, সুস্বাদু খাবার সাজিয়ে দিয়ে গল্প শুরু করে দিল। খাবারটা না-খেয়ে শুধু কফিতে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক বসিয়ে তিমির শুনতে লাগলো কবিতার গল্প। কফি খাওয়া শেষ হলে শূন্য কাপটা শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে বললো, জানো তোমার কথা মাকে বললাম।

কি বললেন মা? উৎসাহ ভরা মন নিয়ে জানতে চাইলো কবিতা। ওর মিষ্টি সতেজ মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছা হলো না তিমিরের। কি হবে বলে? মধ্য থেকে কবিতা দুঃখ পাবে। তাই একটু ঘুরিয়েই বললো, মা যদিও রাজি হচ্ছে না বটে তবে বাধাও তিনি দেবেন না। তিমিরের কথা শুনে হাসি ঝরা মুখে কবিতা বললো, তুমি দেখো, আমি সবাইকেই একেবারে আপন করে নেবো। তোমার মাকে, দাদা-বৌদিকে তোমার বোনকে। কবিতার সরল কথা শুনে

তিমির শুধু মনে মনে ভাবলো, যারা তোমার আপন হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের কি তুমি পারবে আপন করে নিতে?

পরদিনই কলকাতা ছাড়লো কবিতা। তিনঘন্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছালো মাদ্রাজে। হান্টার রোডের নিজেদের বাড়িতে। মা অরুণা দেবী মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পরম স্নেহে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তুললেন। কবিতা যেন তার এখনও সেই ছোট্ট মেয়েটিই আছে। বললেন, বেটি, তুই বড়ো দুব্‌লা হয়ে গেছিস এই ক'দিনে। খুব প্রোগাম করেছিস বুঝি?

শরীর আমার ঠিক আছে মা। কবিতা মায়ের স্নেহেব পরশে ছোট্ট মেয়ের মতো আদুরে হয়ে উঠলো। বললো, কলকাতায় একটু বেশি প্রোগ্রাম করতে হয়েছে। আসলে কলকাতার দর্শক খুব সমঝ্‌দার। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যকে তারা ভালো ভাবে গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ ছিল। সেই কারণেই ওখানে....

আচ্ছা! আচ্ছা!! তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন সুরজিৎ কাপূর। কবিতার বাবা। কাপূরজি বললেন, কলকাতা এবারে খুব ভালোই লেগেছে তাই না বেটি? কথাটা বলেই কাপূরজি স্ত্রীর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে চেয়ে একটু হাসলেন। সেই মৃদু হাসিতে যোগ দিলেন অরুণা দেবীও।

হ্যাঁ বাবা। এককথায় সায় দিয়ে বলে উঠলো কবিতা, বহুত আচ্ছা, লাগা!

কিঁউ নেহি? কিঁউ নেহি? কবিতাকে সমর্থন জানালেন কাপূরজি। এটা ঠিক, শিল্পকলার সত্যিকারের গুণগ্রাহী, সমঝ্‌দার আদমী বঙ্গালমে। ওখানকার মানুষরা অহেতুক কাউকে তারিফ করে না, যার মধ্যে গুণ আছে তাকেই প্রশংসা জানায়। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি রির্পোটার পর্যন্ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অন্যান্যবারের তুলনায় তুমি অনেক বেশি সম্বর্ধনা পেয়েছো এবাবে, সুতরাং কলকাতাকে তোমার ভালো লাগবে বই কী! ঠাকুমা ধমকে উঠলেন। বললেন, তোমরা তখন থেকে বকবকই করছো। মেয়েটা এতোদিন বাদে এলো, কতোদূর থেকে এলো, ওকে একটু বিশ্রাম দাও। তারপরে যতো পারো বঙ্গাল আউর কলকাত্তার গল্প কোরো।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দুই বৌদি পুনম ও সুষ্মা কবিতাকে ছেঁকে ধরলো। কবিতা শুয়েছিল বিছানায়। বুঝি-বা একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। কিন্তু ঘুমাতে পারলো না। দুই বৌদি এসে তাকে জাগিয়ে দিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়লো। দুইজনে চোখে চোখে কি যেন কথা হলো। তারপরেই কথার ফুলঝুরি ছোটালো পুনম, ডুব ডুবকে আপ বহুত পানি পিতা কবিতাজি...কলকাতা সুন্দর, কলকাতা ভালো। হঠাৎ কলকাতার ওপর এতো ভালো লাগার কারণ কি? কলকাতা তোমাকে এমন কি দিয়েছে?

অনেক কিছু দিয়েছে। এবারে যোগ দিল সুষ্মা। হাসিতে, চোখের চাউনিতে সে যেন চোখে-মুখে কথা বলে উঠলো, তুমি ভেবেছো আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু সব জানি। কলকাতার এক বাঙ্গালী রির্পোটার ছোকরার সঙ্গে তুমি মহাব্বত করেছো, তাকে নিয়ে মুম্বাই গেছো, তাকে তুমি পেয়ার দিয়েছো ...দুই বৌদি একসঙ্গে হাসিতে ভেঙে পড়লো। যেন শব্দ তুলে কলের জলের ধারা নামছে। ধরা পড়ে কবিতা বোকা বনে গেল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ধরা পড়ার লজ্জায় রইলো চুপ করে। কিন্তু এমন করে তো চুপচাপ থাকা যায় না, থাকা উচিত নয়, হঠাৎ এ-কথাটা মনে হতেই কবিতা লজ্জা ভেঙে প্রশান্ত হাসলো। সহজ সুরেই জিজ্ঞেস করলো, এমন গুরুত্বপূর্ণ খবরটা তোমাদের কে দিল? মনে হচ্ছে যেন প্রতিদিনের ডায়েরী লিখে লিখে তোমাদের জানিয়েছে। দূতটি কে? কথাটা শেষ করে কবিতা এমন ভাবে দুই বৌদির দিকে তাকিয়ে হাসলো, যেন কিছুই হয়নি। শুধু শুধুই এক উড়ো খবর নিয়ে তোমরা মাতামাতি করছো। চলনে-বলনে কবিতা তেমন একটা ভাবই ফুটিয়ে তুললো। সুষ্মা হাসি চেপে বললো, তাই নাকি? বাবুজিকে ডাকবো? তোমার ও-সব কথা বাবুজিকেই বোলো। সাপের মাথায় মন্ত্র পড়ার মতো অবস্থা হলো কবিতার। তার মানে বাবাও জেনে গেছেন? আশ্চর্য! অবশ্য জেনে যাওয়াতে কবিতা এতোটুকু অখুশি নয়। কেন-না বাবা-মাকে তো তার জানাতেই হতো। সেক্ষেত্রে কাজটা বরং ভালোই হয়েছে। একধাপ এগিয়ে গেছে। প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হলো বাড়ির সবাই জানলেন কেমন করে? এই মুহূর্তে সকালের ছবিটা ভেসে উঠলো। বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কলকাতা এবারে তোমার খুব ভালোই লেগেছে তাই

না বেটি? বলেই তিনি মায়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু হেসেছিলেন। কবিতার এখন মনে হচ্ছে ওটা ছিল বাবার সব জানতে পারার হাসি। কবিতার মাথা নাড়িয়ে দিয়ে পুনম বললো, একেব নম্বরেব বুদ্ধু তুমি। তাই আমাদেব জিজ্ঞেস কবছো. কেমন করে জানলে? ঘরমে রিপোর্টার বাহারমে ভি রিপোর্টার। জানতে বাকি থাকে নাকি কিছু? বাবুজির মাদ্রাজ ইভিনিংয়ের কলকাতা-মুম্বাই অফিসের রিপোর্টারবাই সব কিছু জানিয়েছে। যাকে বলে হাতে-নাতে ধরা। আর অস্বীকার করার উপায় নেই। এরপরেও অস্বীকার করলে বৌদিরা তাকে মারতে শুরু করবে। হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে কবিতাকে কেমন যে বিহ্বল কবে তুললো। বালিশে মুখ ঢেকে সে লজ্জা দূর করলো। কিন্তু সহজে রেহাই পেল না। পুনম বালিশ কেড়ে নিল। সুস্মা ওর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, কিঁউজি? আভি মুখ বন্ধ কিঁউ হ্যায়। খুব তো লাফাঝাঁপি করছিলে, এখন যে মুখ দিয়ে একটি কথাও সরছে না। কিছু তো বলো। কি বলবে কবিতা? যা বলাব সবই ওদের জানা হয়ে গেছে। সুতরাং নতুন করে আর কিছু বলার নেই। এখন তারই জানবার পালা। তিমিরের কথা জানতে পেরে বাবা-মা'র মনেব প্রতিক্রিয়া, তাঁদের মনোভাব বৌদিরা নিশ্চয়ই জানে। সুতরাং কবিতাকে এখন ওদের কাছ থেকেই জেনে নিতে হবে। হাওয়া কোন দিকে বইছে সেটা ভালো করে না-জানা পর্যন্ত সে মুখ খুলবে না। অবশ্য এটা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, পরিবেশ কবিতারই পক্ষে। বৌদিদেব হাসিখুশি ভাবই সে-কথার সাক্ষ্য দেয়। কবিতা তাই মোটামুটি নিশ্চিন্ত। জিজ্ঞেস কবলো, বাবা কি বললেন?

কোঈ এত্‌রাজ নেহি! পুনম আরও যোগ করলো, বাবুজিব স্পষ্ট কথা, বেটি আমার শাদিই করবে না-বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে এখন যদি শাদি করতে চায়, পঞ্জাবী, হিন্দুস্তানী, মদ্রাজী, বঙ্গালী কোঈ বাত নেহি, আমার কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই। আমার বেটি যাকে পছন্দ করে শাদি করবে, তাতেই আমার সুখ। বেটি সুখী হলেই আমিও সুখী। এ-ক্ষেত্রে বরং আমি একটু বেশিই খুশি। রির্পোটারকো বেটি এক রির্পোটারকো পসন্দ কিয়া। মেয়ের আমার পছন্দ আছে। আসলে সে আমাকে খুশি কবতে জানে। রিপোটারদের প্রতি আমাদের দুর্বলতার কারণ তো মেয়ের অজানা নয়। বাবার মনোভাবের ছোঁওয়া পেয়ে সতেজ হয়ে উঠলো কবিতা। সত্যি কথা বলতে কি, এমনটা যে হবে কবিতা তা জানতো। তার শিক্ষা-দীক্ষা-রুচির ওপর বাবা-মার অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং সে যে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তাব পছন্দ, অন্য মানুষের অপছন্দ হবে—এমন হতে পারে না। সেই কারণেই বাবা কোনওরকম খোঁজ খবর না-নিয়েই তার পছন্দের ওপর নির্ভর করে অমন কথা বলতে পেরেছেন। আর যাই হোক কবিতার রুচি-পছন্দ নিশ্চয়ই নিম্ন মানের হবে না। হতে পারে না। ছিন্ন হলো কবিতার ভাবনা। সুস্মা খোঁচা দিল। বললো, পত্রিকায় অবশ্য তোমাদের দুজনের একটি ছবি দেখেছি। কিন্তু তাতে ঠিক বোঝা যায় না। তোমার কাছে ফটো-টটো কিছু আছে তো দেখাও—

নেই। কবিতা চোখ দুটি এদিক-ওদিক একবাব ঘুরিয়ে চাপা হাসলো।

ফির বাহানা! শীগ্‌গির বের করো বলছি।

দেখাও না। ছোট মেয়ের মতো আব্দার জানালো পুনম। এরপরে আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মতোই কবিতা তার এয়ার ব্যাগটা ওদের দুজনের মাঝখানে এনে রেখে দিয়েই দ্বিতীয়বার বালিশে মুখ গুঁজলো। চাপা সুরে বললো, ওর মধ্যেই সব আছে। প্রাণ ভরে দেখে নাও—

ওমা! আমরা কেন প্রাণ ভরে দেখতে যাবো? তুমি দেখবে অমন ভাবে। আমরা শুধু চোখের দেখা দেখবো। কথাটা বলেই পুনম ব্যাগ খুলতে বসে গেল। তিমিরের ফটো আছে ওর মধ্যে। কবিতার নিজের হাতে তোলা চার-পাঁচখানি ফটো। দুই বৌতে সৌন্দর্য বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফটো দেখতে লাগলো। তাদের ননদ তো আর পাঁচজন সাধারণ মেয়েব মতো নয়— একে সে সারা দেশে বিশেষ পরিচিত তায় আবার সত্যিকারের সুন্দরী। সুতরাং তার জন্য যে-জামাই আসবে

তার রূপগুণ একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে বই কী! অবশ্য যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে, তবুও ওরা সেই মন নিয়েই তিমিরের ফটোগুলি একে একে দেখলো। পাস করলো তিমির তাদের বিচারে। পুনম বললো, বঙ্গালী লেড়কার রূপ আছে।

বহুত খুপসুরত! সুষ্মা যোগ করলো, কিন্তু শুধু রূপ ধুয়ে কি জল খাবে? এবারে বলো কি কি গুণ আছে? তোমাকে পেয়াব করবে তো—

ভাগো হিঁয়াসে। বৌদির কথায় লজ্জা পেয়ে কপট শাসনের সুরে ধমকে উঠলো কবিতা। বৌদিরা ঘর ছেড়ে কেউ গেল না। কবিতাই চলে গেল অন্য ঘরে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। ফিরে এলো একটু বাদেই। বিছানায় শুয়ে পড়লো টানটান হয়ে। বললো, তোমরা এবারে যাও তো—আমাকে একটু ঘুমাতে দাও। কবিতাব পাশ দিয়ে শুয়ে পড়লো পুনম। বললো, শাদির নাম শুনে কোন মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পাবে নাকি? তার পরেই কনুই দিয়ে এক ঠেলা দিয়েছে ছোট-জা সুষ্মাকে, তোমার ঘুম এসেছিল নাকি? সুষ্মা চট করে উত্তর দিল না। অতো বোকা সে নয়। সে উত্তব দিক, আর ওরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে খ্যাপাবে—সেটি হবে না। সুষ্মা, পুনমের দিকে একবার তাকালো। তারপরেই চাইলো কবিতার দিকে। দুজনকে ভালো করে লক্ষ্য করলো কিছুক্ষণ। শেষে বললো, আমি বলবো না। আগে তুমি বলো—ওর কথা বলার ধরন দেখে দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। হাসি থামলে কবিতা পুনমকে জিজ্ঞেস করলো, তিমিরের কথা শুনে দাদারা কে কি বললো, কই তা তো একবারও বললে না? তাদের মতামতটা কি?

তোমার দুই ভাইয়ার মতামত একই। তুমি তিমিরবাবুর সঙ্গে ঘুরেছো, মিশেছো, সুতবাং তাকে চিনে নিতে তোমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেদিক দিয়ে তুমি তাকে শাদি করলে তাদের বলবার কিছু নেই। আসলে তোমার কোনও কিছুতেই তারা মন থেকে আপত্তি জানাতে চায় না। তবে আপনা আদমীর মধ্যে শাদি করলেই ভালো হতো। বঙ্গালি লেড়কা! ওদের সামাজিক রীতি-নীতি আলাদা। ভাষা আলাদা। খানা-পিনাও আলাদা। সুতরাং সব কিছু মানিয়ে নেওয়া কি সহজ হবে?

রাত্রে খেয়েদেয়ে কবিতা শুযে পড়লো বটে কিন্তু ঘুম এলো না। লবিতে এসে আরাম কেদারায় বসলো। বাইরের দিকে তাকালো সে। একটু দূরেই বেসিন ব্রীজ পাওয়ার হাউস। লাল বাতিগুলি রক্তচক্ষু করে কাকে শাসন করছে কে জানে? সামনেই চিড়িয়াখানা। স্টেডিয়াম। পাশে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন। মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের গর্জন আর হুইসেলের বুক ভরা ডাক কানে ভেসে আসছে। রেলগাড়ির ওই ডাক শুনলে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় কবিতা। বিশেষ করে রাত্রের ডাক শুনলে। মনে হয় সে যেন এই পৃথিবীতে একা। মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই তার। বড়োই নিঃসঙ্গ জীবন। রেলের ওই বিলিয়মান ডাক তখন তার কানে ভীষণ করুণ লাগে। মনে হতে থাকে তার মা যেন তাকে ডাকছে! সন্তানকে কাছে পাওয়ার জন্য মা ডাকছে। এই সব মনে হওয়ার কথা অবশ্য কবিতা কাউকে বলে না। এ-সব মনে হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই। তাছাড়া এই সব বলে সে কাউকে কিছু বোঝাতেও পারবে না। তাই কবিতা কাউকেই জানায়নি, বলেনি।

ঘরে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লো সে। বাবার কথাগুলি অলস মনে এসে ভিড় জমালো। বিকেলেই বাবা তাকে ডেকেছিলেন। কবিতা প্রথমেই বুঝেছিল, এ-ডাক কীসের জন্য। তাই সে প্রস্তুত হয়েই বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুরজিৎ কাপূর কি যেন লিখছিলেন। লেখা থামিয়ে দিয়ে বললেন, বোসো মা—তোমার সঙ্গে জরুরি কয়েকটি কথা আছে। কলমের মুখ বন্ধ করে টেবিলের ওপরে সেটি নামিয়ে রাখলেন কাপূরজি। একটি সিগারেট ধরিয়ে সামান্য সময় নিয়ে কি যেন ভাবলেন। বললেন, কলকাতায় যে-ছেলেটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, তা কি শুধুই আলাপ না....তার পরের অংশটুকু বলতে গিয়ে কেমন যেন জড়িয়ে ফেললেন কাপূরজি। বললেন, তুমি এখন বড়ো হয়েছো বেটি। লজ্জা পেয়ো না—তা কি শুধুই আলাপ না...নিজেই লজ্জা পাচ্ছেন কাপূরজি। মেয়েকে কথাটা কেমন ভাবে জানাবেন, ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। তাই সহজ হবার ভঙ্গিতে

তিনি প্রশান্ত হেসে স্ত্রীকে বললেন, কি গো! মেয়েকে তুমিই বলো না—স্বামীর কথায় হেসে ফেললেন অরুণা দেবী। হাসি দিয়েই তিনি যেন সমস্ত পরিস্থিতিটা অত্যন্ত সহজ করে তুললেন। কোনওরকম ভনিতা নয়। ভূমিকা নয়। অরুণা দেবী সোজা-সুজি প্রশ্ন করলেন, তুই কি তিমিরকে বিয়ে করতে চাস? মানে তোদের মধ্যে কি তেমন কথাবার্তা কিছু হয়েছে? কবিতা কোনওরকমে মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই মেঝের দিকে তাকালো। দৃষ্টি নিচু করেই নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ, হয়েছে। তিমিরের বিষয় নিয়ে একটানা অনেকক্ষণ আলোচনার পর কবিতা একটু একটু করে সহজে হয়েছে। তারপরেই কথাটা বলেছে, জানো বাবা, তোমাকে সে চেনে।

তাই নাকি? কাপূরজি মেয়েকে উৎসাহ দিলেন।

হ্যাঁ। গত বছর জানুয়ারি মাসে তুমি কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়ে ওদের পত্রিকা অফিসও দেখতে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে।

তোমাকে যাঁরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাচ্ছিলেন, সে-দলের মধ্যে...

তিমিরও ছিল তাই না? বলেই স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন কাপূরজি। বললেন, কোন ছেলেটি এখন আর ঠিক মনে নেই মা। আমার সঙ্গে তো সকলের আলাপ হয়নি। সম্পাদক এবং দু-চারজনের সঙ্গে যা একটু কথাবার্তা হয়েছে।

এখনও চোখের পাতায় ঘুম নামলো না। বারবার মনে পড়ছে তিমিরের কথা। সত্যিকারেরই ভালো ছেলে সে। কথাবার্তা, ব্যবহার, সব কিছুই তার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, মার্জিত। কলকাতায় হোটেল থেকে ইনডোর স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবার পথে গাড়িতে প্রথম তিন দিন সে একটি কথাও বলেনি। আসলে অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে, তোষামোদের কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করতে চায়নি। তিমিরের ব্যক্তিত্বকে কবিতা শ্রদ্ধা করে। এই মুহূর্তে তিমিরকেই বড়বেশি করে মনে পড়ছে কবিতার। সামান্য কয়েকটি দিনের আলাপ। অথচ মনে হয় যেন অনেক দিনের গভীরতা। তিমিরের হাসিতে, কথাতে কোন জাদুর সুর মিশে আছে কে জানে, কবিতা শুধু ওকে ভুলে থাকতে পারে না। ভুলে থাকা যায় না। মনে হয় তিমির বুঝি এই বাড়িতেই আছে। এক্ষুণি হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়াবে। এমনটা যে কেন মনে হয় কে জানে? গতকালও তিমিরের কাছে ছিল সে। আর আজ? সময়ের ব্যবধানে আজ সে কতো দূরে! নির্লজ্জের মতো কথাটা শোনালেও কবিতা মনে প্রাণে স্বীকার করে, কয়েকটি দিনের জন্য হলেও তিমিরকে ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হয়!

একটু একটু করে ভোর হচ্ছে। গাছের মাথায়-কোটরে বসে শুরু হয়েছে পাখিদের প্রভাত সঙ্গীত। তারা সকলে মিলে কিচির-মিচির শব্দে বন্দনা গান গাইছে। অন্ধকার দূর হয়ে ফর্সা হচ্ছে পূর্ব আকাশ। ভোরের একঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে কবিতার মুখখানাকে শীতল করে দিল। বড়ো ভালো লাগে ভোরের এই শান্ত পরিবেশটুকু। মনে হয়, পৃথিবীর এই যে এতো হানাহানি, মারামারি, দলাদলি সব কিছুই যেন জাদুমন্ত্র বলে থেমে গেছে ভোরের এই শান্ত মূর্তির কাছে।

সুষ্মা চা নিয়ে এলো। কবিতা চোখ মেলে চুপচাপ শুয়েছিল। রাত জাগার সুস্পষ্ট ছাপ কবিতার সারা মুখে। চা দিয়ে সুষ্মা বললো, তুমি সারা রাতে একটুও ঘুমওনি? চায়ের কাপে ছোট্ট করে চুমুক বসালো কবিতা। হেসে দিল বৌদির কথায়। বললো, নিদ্ নেহি আয়া।

দিদি! পুনমের উদ্দেশ্যে বেশ জোরেই ডাক দিল সুষ্মা। তারপরেই ছুটে গেল ঘর ছেড়ে। ফিরে এলো পুনমকে সঙ্গে নিয়ে।.. সামালো উনকো! আভি বোলতা হ্যায় নিদ্ নেহি আয়া।

তাই নাকি? চোখে চোখে হাসির ঢেউ খেলে গেল। পুনম্ বললো, এখন থেকেই এই সব শুরু হয়েছে, আর তো দিন পড়েই আছে। তখন কি করবে শুনি?

তার চেয়ে একটু ঘুমাতে চেষ্টা কোরো। সুষ্মা টিপ্পনী কাটলো, তাতে বরং কাজ হবে। স্বপ্নে দু-একবার দেখাও হয়ে যেতে পারে মানুষটার সঙ্গে। বলেই নিজের হাসিতে নিজেই ভেঙে পড়লো। এবারে ধমকে উঠলো কবিতা। বুঝতে পারলো, বৌদি দুটি সহজে এই ঘর ছেড়ে এখন নড়বে

মা। তাকে নিয়ে ঠাটা-ফাজলামো কববে। আসলে দুটি হচ্ছে শয়তান। মজা-কৌতুক করবে। ওরা সেই আনন্দেই মশগুল। কবিতা তাই বললো, এই সাত-সকালে দুটিতে এসেছো আমাকে জ্বালাতে তাই না? ভাগো বলছি কিন্তু। কাকে বলা? দুজনের কেউ-ই চলে যেতে রাজি নয়। লেগে রইলো আঠার মতো। পুনমেব বড়ো ছেলে সুরিন্দর। আট বছরেব ফর্সা টুকটুকে ছেলে। ঘরের দরজার ভারী পর্দাটা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বললো, মামনি পিতাজি ডাকছে।

বলো গিয়ে আসছি। সঙ্গে সঙ্গে পুনমকে চেপে ধরলো কবিতা। কেন? এখন যাবে কেন? কখন থেকে বলেছি যাও যাও, সে-বেলা যাবার কোনও নাম নেই। আর এখন? এক ডাকেই কাৎ। অনেকক্ষণ বাদে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছে কবিতা। সুতরাং সহজে ছাড়লো না। বললো, তোমরা সব সমান। শুধু শুধু আমাকে এক এতোক্ষণ খ্যাপানো হচ্ছিলো। সুঁচ বলে, আমি জামা-কাপড ফুটো ফুটো করে সেলাই করি। অথচ তার পিছনেই ফুটো, তা সে জানে না।

তা কি করবো বলো! অসহায়েব সুরে পুনম বললো, তোমার ভাইয়া ডাকছে যে।

যাও যাও আর বেশি দেরি কোরো না। এখন তো শুধু সুরিন্দর একা এসেছে, এরপরে তোমার চারজনের পুরো ব্যাটেলিয়ন চলে আসবে তখন কিন্তু তুমিই বিপদে পড়বে। সময় থাকতে পালাও।

করুণ সুবে একটানা সানাই বাজছে। হান্টার রোডের কবিতা ভবন আলোয় আলোময়। বাড়ির সামনের লনে সারিবদ্ধ ভাবে ঝাউ আর পামগাছেব মেলা। আলোর মুকুট মাথায় পড়ে তারাও সেজেছে। নিমন্ত্রিত লোকেব আনাগোনায় সারা বাড়ির উৎসবে মেতে উঠেছে। গেটের দু'পাশে গাড়িব ভিড়। বাড়ির পোষা কুকুর বাচ্চুন। বিশালকার চেহারা। মনে হয় বুঝি একটি হিংস্র বাঘই। গোলমাল একেবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু আজ গাড়িব শব্দে আর নিমন্ত্রিত অতিথিদেব ভিড়ের কোলাহলেও সে একটি আওয়াজও তুললো না। বাচ্চুন চুপ করে আছে। শুধু দু'চোখে মেলে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখছে। তবে সে-ও বুঝতে পেরেছে আজ চিৎকার করাব দিন নয? সুবজিৎ কাপূর গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁদেবকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। মাদ্রাজের একজন মন্ত্রী এলেন। গাড়ি থেকে মাটিতে পা দিতেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কাপূরজি। ভেতরের খোলা বাগান জুড়ে বিরাট প্যান্ডেল কবা হয়েছে। নীলাভ আলোর দ্যুতি। মাথার ওপরে ফুলের তোড়া ঝুলছে। প্যান্ডেলের দেওয়ালেও ফুলেব মালা। সারি সারি চেয়াব সাজানো। কাপূরজি মন্ত্রীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। প্রশান্ত হেসে বললেন, খুব খুশি হয়েছি, আপনি এসেছেন! মেয়েরা ভিড় করে আছে গেটের সামনে। বর আসছে না কেন? এতো দেরি তো হবার কথা নয়। বর এবং বরযাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে পিকনিকে। সুতরাং সেখানে থেকে আসতে এতো সময় লাগবার কথা নয়। তারপরেই গুঞ্জরণ উঠলো। বর এসেছে! ফুলে-ফুলে সাজানো গাড়িখানা তিমিরকে নিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকলো। মেয়েরা ঘিরে ধরলো চারদিক থেকে। গাড়ি থেকে প্রথমে নামলো কবিতার দুই দাদা। তিমির তখনও ভেতরে বসে। ওকে বরণ করে নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে গিয়ে বসালো পুনম ও সুষ্মা। দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করলো কবিতার পছন্দ আছে। লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যের গৌরবর্ণ খুপসুরত বঙ্গালি লেড়কাকে ঠিক চিনে নিয়েছে তাদের ননদ। কবিতার চোখ আছে।

তিমিরের সঙ্গে বরযাত্রী এসেছে পনেরোজন। সকলেই বন্ধু-বান্ধব। পত্রিকা অফিসের ও পাড়ার। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয়। তিমির এবং কবিতা যেদিন কলকাতা থেকে মুম্বাই রওনা হয়েছিল সেদিন ওদের দুজনকে পাশাপাশি রেখে একমাত্র বিজয়ই ফটো তুলেছিল। বলেছিল, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। গত সপ্তাহে সে যখন প্রথম জানতে পারলো যে, কবিতার সঙ্গেই তিমিরের বিয়ে হচ্ছে তখন অফুরন্ত খুশিতে বিজয় বলে উঠেছিল, তোকে যে কি বলবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। সেদিন তাহলে অস্বীকার করেছিলি কেন? তোকে না ভীষণ গালাগাল করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিনটি গোল্ড স্পটের বোতল শেষ করে বিজয় তার ক্যামেরা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল তিমিরের কাছে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে আস্তে বললো, বধূরূপি কবিতাজির

ছবি নিয়ে আসি। মনে হয় এখনও ফটোগ্রাফারেব ভিড় বাড়েনি। অন্তত দু একজনকে তাহলে চোখে পড়তো। প্রথম ছবি তোলার কৃতিত্বটুকু এই বেলা সেরে আসি।

আনন্দেব মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলো। কান্নার বোল উঠলো তার পরের দিন। বিদায় বেলায়। হাসি-কান্না! এ-যেন মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। বোধনের পর যেমন বিসর্জন তেমনি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো কবিতা। অরুণা দেবী মেয়েকে সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে পুনম আর সুস্মা! কবিতা দুই বৌদিকে প্রণাম করতেই তিনজনের কান্নায় সেখানকার আবহাওয়া ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কবিতার দুই দাদা যোগীন্দর ও মহিন্দর সহজে ভেঙে পড়লো না। শক্ত কবে নিজেদেব ধরে রাখলো। সজলচোখে বোনকে স্নেহাশীর্বাদ জানালো। সুরজিৎ কাপূর মেয়েকে বুকেব মধ্যে সস্নেহে টেনে নিয়ে ওর মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিমিবকে শুধু বললেন, ও আমার বড়ো আদরের। ওকে দেখো!

আবার কলকাতা। কবিতাব সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক বাঁধা হলো। বাড়ির কাছে শব্দ করে ট্যাক্সিটা থামতেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ছাযা দেবী। সঙ্গে স্বাতীবৌদি আর চন্দনা। বাবান্দা থেকে ছুটে নীচে নেমে এলো পশুপতি। তিমির জিনিস-পত্র, স্যুটকেস ইত্যাদি ওর কাঁধে চাপিয়ে দিল। বারান্দার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ছোট্ট সুরে কবিতাকে বললো, মাথায় ঘোমটা টেনে দাও। তাই করলো কবিতা। পবে তিমিরকে অনুসরণ কবে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

কবিতা তিমিরেব নির্দেশে মা আর স্বাতীবৌদিকে প্রণাম কবতে গেল। ছায়া দেবী বললেন থাক, থাক। আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না। স্বাতীবৌদি প্রণাম তো দূরেব কথা, দ্রুত ঘর ছেড়ে চলেই গেল। ব্যর্থ হয়ে ফিবে এলো কবিতা নিজেদের ঘরে। ওব ম্লান মুখের দিকে চেয়ে তিমির ব্যগ্রসুবে জানতে চাইলো, কি হলো?

মা, বৌদি কেউই আমার প্রণাম নিলেন না।

হুঁ। কি যেন ভাবতে থাকে তিমির।

দাঁড়াও না—প্রণাম না-নেবার জন্য কিন্তু এতোটুকু দমলো না কবিতা। উল্টে আবও উৎসাহ ভরা কণ্ঠে বিজয় ঘোষণা করার মতো বললো, প্রণাম ওঁদের নিতেই হবে। ভালোবাসলে, ভালোবাসা না-দিয়ে কেমন করে থাকতে পারেন, আমিও দেখবো।

রাত্রের খাওযা শেষ হলে তিমির ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কবিতার দুঃখের আবীলতা দূর কবে দেবার জন্য সহজ হতে চেষ্টা করলো। কবিতাকে পাশে বসিয়ে ওর কাঁধে একটু চাপ দিয়ে তিমির বললো, তুমি না বলেছিলে খুব ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারো। অবশ্য মুম্বাইতে তোমার গান একদিন শুনেছিলাম। কিন্তু অমন সুন্দর গলায় একটি গানে কি কখনও মন ভরে? আজকে তুমি গানে গানে মন প্রাণ ভরিযে দাও।

আমার ভালো লাগছে না।

সে-কি! এরই মধ্যে ভেঙে মুষড়ে পড়লে? এই মন নিয়ে আবার তুমি মায়ের মন জয় করবে? কখনও নয়। পারবে না তুমি।

পারবো না? এবারে ভ্রূকুটি হেনে দুষ্টু হাসলো কবিতা।

পারবে না? কবিতাকে নিরুৎসাহ করা নয়, আসলে ওকে উৎসাহ দেবার জন্যই তিমির অমন ভাবে কথা বলতে লাগলো। যাতে মনে দৃঢ়তা এনে কবিতা আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পারে। এখন তো শুধু প্রণাম নেননি তাতেই তোমাব গান বন্ধ। এরপরে তো অনেক কিছু বাকি। ওই কথার পরে আর গান না-শুনিয়ে থাকতে পারেনি কবিতা। একের-পর-এক গান গেয়েছে। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে তিমির। কবিতার চোখ দুটিও ঘুমে ভেঙে আসছে। তাড়াতাড়ি বালিশ দুটো ঠিক করে সাজিয়ে তিমিরের মাথার নীচে রেখে দিল। পরে উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ম্লান রঙিন আলোটা জ্বেলে তিমিরের পাশ দিয়ে শুয়ে পড়লো কবিতা। যদিও রাত খুব বেশি

হয়নি তবুও কেন জানি আজ বড়ো ঘুম পাচ্ছে। একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল কবিতার। দরজায় টোকা পড়লো। ছায়া দেবী ডাকছেন, ছোট বৌমা ও ছোট বৌমা! মুহূর্ত দেরি করে না কবিতা। উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। দরজা খুলে দিল ঘুমভাঙা চোখে।

তিমু ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ, কাঁধের কাপড়ের অংশটুকু টেনে মাথার ওপরে তুলে দিল কবিতা।

এক কাজ করো—এই চাবিটা তুমি ওকে দিয়ে দিয়ো। কবিতার হাতে চাবির গোছাটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে যান ছায়া দেবী। কবিতা সেই দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। শেষে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

পরদিন সেই চাবি কবিতার হাত থেকে নেবার সময়ে যেমন অবাক হলো তেমনি দুঃখও কম হলো না তিমিরের। মায়ের এই ব্যবহার কি ঠিক হয়েছে? সবার অমতে না-হয় সে কবিতাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু সেজন্য কি মায়ের মন থেকেও দূরে সরে গেছে? তাই কি হয়? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাই হলো। তা নয়তো কি? চিরকাল তিমিরের স্যুটকেসের এই চাবিটা ছায়া দেবীর কাছেই রয়েছে। সেই চাবিই মা গতকাল ফেরত দিয়ে গেলেন। তিমির কি এতোই পর হয়ে গেছে? নাকি তাকেই পর করে দেবার প্রথম পদক্ষেপ এটি। বেশ, দুঃখ তিমির করবে না। কেন-না যেটুকু হবার বাকি ছিল তাই হলো। দিন মা তাকে পর করে। তিমির এতোটুকু অভিযোগ করবে না। কিন্তু এতো ভেবেও চুপ করে থাকতে পারলো না সে। ওই চাবিছড়া নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো মায়ের ঘরে। ছায়া দেবী তখন ঘরে ছিলেন না। তিমির পূজার ঘরে গেল। সেখানেও নেই। তবে কি স্বাতীবৌদির ঘরে? তা হতে পারে। তবে তিমির সে-ঘরে যাবে না। বারান্দা দিয়ে পশুপতি যাচ্ছিলো। তিমির ওকেই ডাকলো, মা কোথায় রে?

মায় নীচে বসবার ঘরে আছে। কে যেন আইছে। তার লগে কথা কইতেছে।

কে এসেছে, কে?

অতোশত কইতে পাকম না। পশুপতির সাফ কথা। তয় আইছে ঘণ্টা দুই হইলো। আর পারেও বকবক করতে। আমি বার তিনেক নীচে গেছিলাম, কাম আমার সারা। ঝালাপালা কইর‍্যা দিছে দুই কান। বারান্দার শেষ প্রান্তে সিঁড়ির মুখে ছায়া দেবীকে দেখা গেল। পশুপতি আর দাঁড়ালো না। বললো, বইয়া বইয়া গল্প করলে চলবো না। আমার মেলা কাম আছে। ছায়া দেবী কাছে আসতেই তিমির জিজ্ঞেস করলো, মা—এ-সব কি মা?

কীসের?

এই যে কাল রাতে তুমি কবিতার হাতে আমার চাবিটা দিয়ে এলে।

অন্যায়টা কি হয়েছে বল?

ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমি তুলছি না। চাবিটা তোমার কাছে থাকলে কি এমন ক্ষতি হচ্ছিলো? এতোদিন তো তোমার কাছেই ছিল, তেমনই থাকতো!

এখন তোর বৌ এসেছে। এ-সব তো সেই দেখাশোনা করবে।

ও! আর কথা বাড়ালো না তিমির। নিজের ঘরে ফিরে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

তিমির যতোক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততোক্ষণেই যেন কবিতার প্রাণটুকু ওর সাহচর্যে, স্পর্শে, সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। তিমির অফিসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার প্রাণটাও যেন নিভে যায়। এর অবশ্য কারণ আছে। তিমির চলে গেলে সারাক্ষণ কবিতাকে নিজের ঘরে বন্দি হয়ে একা একা থাকতে হয়। অথচ বাড়িতে তো কথা বলার বা গল্প করার লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাহলে কি হয়? কবিতার সঙ্গে সাধারণত কেউই বড়ো একটা কথা বলে না। যেটুকু বলে তা নিতান্ত প্রয়োজনে। তাও বাঁকা সুরে। কবিতা বেশ বুঝতে পারে, তাকে বাড়ির সবাই বিশেষ করে স্বাতীবৌদি আর চন্দনা যেন এড়িয়ে চলতে পারলেই বেঁচে যায়। অথচ ওদের দুজনে কতো গলা জড়াজড়ি। কতো কথা হয়, গল্প হয়। আড়াল থেকে সবই দেখে কবিতা। কেন ওরা তার সঙ্গে ভালোবাসার কথা

বলে না? এমন কি দোষ করেছে কবিতা যার জন্য ওরা তাকে অতি অনায়াসেই এতো অবহেলা ভবে নির্বাসন দিতে পেরেছে? তাছাড়া ছায়াদেবী সংসারের যাবতীয় কাজের ব্যাপারে মেয়ে আর বড়ো বৌয়ের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের সঙ্গেই তাঁর যা কিছু পরামর্শ। কবিতা এ-বাড়ির যেন কেউ নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিতা নিঃসম্পর্কীয় একজন বাইরের মানুষ। তাকে কোনও কিছু জিজ্ঞেস করবার যেন প্রয়োজন নেই কারো। সংসারের কোনও কাজেও কেউ তাকে ডাকে না। তবুও কবিতা নিজেই রান্না ঘরে ঢোকে। টুকটাক কাজকর্ম করে। কিন্তু এটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার এই কাজ করা কেউ পছন্দ করে না। স্বাতীবৌদি তো রীতিমতো বিরক্তি ভরা দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। অর্থাৎ সহ্য করতেও পারে না। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়, তাকে সে দেখতে পারে না। কবিতা ভেবে পায় না, তার সঙ্গে এতোটা করার সঙ্গত কি কারণ থাকতে পারে? তবুও কবিতা পরিস্থিতি সহজ করে তুলবার জন্য রান্না ঘরে যায়। কাজ করবার সময়ে যথেষ্ট আড়ষ্ট লাগে, তবুও করে। নিজের সংসার বলেও সেখানে তার কোনও নিজস্ব স্বাধীনতা নেই। অধিকার নেই। ক্ষমতা নেই। কবিতার তাই দুঃখ হয়, এমনি করেই কি তার দিনগুলি কাটবে?

সকালবেলা তিমিরের ঘুম ভাঙলো ছায়া দেবীর গলা শুনতে পেয়ে। কান পেতে একটু শুনবার চেষ্টা করলো সে। মা যেন কি বলছেন কবিতাকে। পুজার ঘর থেকেই কথাগুলি ভেসে আসছে। তিমির আর শুয়ে থাকতে পারলো না। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। আস্তে আস্তে মায়ের পূজার ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলো, কবিতা মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা পাণ্ডুর। দৃষ্টি কাঁপা।

কি হয়েছে মা? অত্যন্ত শান্ত সুরে তিমির জিজ্ঞেস করলো।

কি আবার হবে! একরাশ বিরক্তির ঝরে পড়লো ছায়া দেবীর কণ্ঠ থেকে। বললেন, স্নান সেরে সবে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছি, দিল ছুঁয়ে বাসী-কাপড়ে। এতো বড়ো মেয়ে হয়েছে, এই বয়সেও যদি এতোটুকু বুদ্ধি না-হয় তবে কবে হবে বলতে পারিস? আমাকে আবার ছুটতে হবে এখন স্নানের জন্য।

ঘরে এসে ঈজিচেয়ারে কপালটা চেপে বসে পড়লো তিমির। জড়িত পায়ে, লজ্জিত মুখে ঘরে এলো কবিতাও। খাটের বাজুটা চেপে ধরে জানলার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। একপলক ওকে একবার দেখে নিল তিমির। কপালটা চেপে ধরে রইলো আবার। শান্ত গলায় জানতে চাইল, কি হয়েছিল কি?

বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছা করে করিনি। আমি বুঝতে পারিনি এমনটা হবে। একটু চুপ করে থেকে পরে আবার কবিতা যোগ করলো, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেক দিন আমার মাকে আমি প্রণাম করি। ছোটবেলা থেকেই এটা আমার অভ্যেস। তোমার মা তো এখন আমারও মা। তাই প্রণাম করেছিলাম। তাতেই...কবিতা থামলো।

আর প্রণাম করতে যাবে? অত্যন্ত দুঃখে হতাশা মেশানো সুরে তিমির প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ। ছোট্ট মেয়ের মতোই মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো কবিতা। বললো, এবার থেকে ঘুম ভাঙার পরেই স্নানটা সেরে নেবো। বাসী-কাপড় পাল্টাবো। তাহলে তো আর মাকে প্রণাম করলে দোষ হবে না। মা তো আজ আমাকে স্নান, বাসী কাপড় না-ছাড়ার জন্যই বকলেন।

ঠাকুর ঘর থেকে আবার ছায়াদেবীর গলা শোনা গেল। ছোট বৌমা! ও ছোট বৌমা! তড়িৎগতিতে তিমিরের কাছ থেকে ছুটে চলে যায় কবিতা। ছায়াদেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দৃষ্টি নত করে। আবার একটা কিছু বেধেছে মনে করে তিমিরও ঘরে বসে থাকতে পারলো না। কবিতার পিছন পিছন সে-ও নিল।

পূজোর এই ফুল কে তুলেছে? তুমি? ছায়া দেবী ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

হ্যাঁ। নিচু সুরে মাথাও নিচু করেই উত্তর দিল কবিতা। প্রত্যেক দিন দেখি আপনি স্নান শেষ

করে পূজোর ফুল তোলেন। আপনার কষ্ট হয় দেখে ওই কাজটা আমিই করেছি।

আচ্ছা! তোমার কি আক্কেল বলে কিছু নেই নাকি? ওই বাসী-কাপড়েই ফুল তুলেছো তো?

হ্যাঁ।

আবার 'হ্যাঁ' বলছো? আর কতোদিন এমন ছোটটি থাকবে? এ-সব কি কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে। না শিখিয়ে দেয? এই সাধারণ কান্ডজ্ঞানটুকু তো নিজের থেকেই হওযা উচিত। আবাব আমাকে ঢুকতে হবে স্নানের ঘরে। আমার হয়েছে জ্বালা। আর পারি না বাপু। এই এক সকালের মধ্যেই তিনবার স্নান করতে হলো। কখন যে পুজো হবে কে জানে? যা সব শুরু হয়েছে, তাতে বাড়িতে যে আর পূজো করতে পারবো বলে মনে হয় না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিল তিমির মায়ের কথাগুলি। দেখলো কবিতাকে। মাথা নিচু করে দেওযালের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। বেচারী লজ্জায এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে, তা বোধহয় সে একটিবারের জন্যও ভাবতে পারেনি। সত্যই তো এমন অনাসৃষ্টি কান্ড ঘটবে তা কি কল্পনা করতে পেরেছিল কবিতা? ফুল তুলতে ছায়া দেবীর কষ্ট হয়। সেই কষ্ট লাঘব করবার জন্যই না সে এগিয়ে এসেছিল। অথচ... এবাবে মায়ের কথার প্রতিবাদ করলো। বললো, কবিতাব কি দোষ মা? ও তো তোমার ভালোর জন্যই করেছিল।

তুই থাম দেখি। গর্জে ওঠেন ছাযা দেবী। ছেলের এ-ধরনের কথাতে তিনি বেশ অপমানিত বোধ করলেন। বুঝতে পারলেন, তিমির আর আগেব তিমির নেই। দু'দিনেই পাল্টে গেছে। তিনিও ছেলেকে ছেড়ে কথা বললেন না। বললেন, তুই কি তোর বৌয়ের হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কবতে এসেছিস?

পক্ষ হয়ে কথা বলাব প্রশ্ন নয মা। তিমিব সংযত হয়ে উত্তর দিল, সত্যি যেটা, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বললেই ঝগড়া কবছি—এমন ভুলটা তুমি করছো কেন? আচ্ছা মা, তুমিই বলো না, কতোটুকু ওর দোষ? যেটুকু করেছে ভালো মনেই করেছে। তোমাব উপকাব যাতে হয সেই কারণেই এগিয়ে এসেছে। আর বাসী-কাপড়েব কথা বলছো, তা ওকে একটু বুঝিযে বললেই হতো। ওর ভুলত্রুটি তো তুমিই ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে।

সব শত্রু। শত্রু পেটে ধরেছিল। নয়তো তুই আজ আমাকে.....এতোদূব সাহস হয়েছে তোর।

জানি তুমি ভুল বুঝবে। কিন্তু মা, আমিও তো এর আগে বাসী-কাপড়ে তোমাকে কতোদিন ছুঁয়েছি। কই, সেদিন তো তুমি এতোটা বাড়াবাড়ি কবোনি। আমি জানি, আজ কবিতাব সামান্য দোষ দেখলেই...কবিতার ভালো লাগছিল না, তাকে কেন্দ্র কবে মায়ের সঙ্গে তিমিরের এমন কথা কাটাকাটি। বিব্রতবোধ করছে সে। আবাব মায়ের সামনে তিমিরকে বলতেও পারছে না কিছু। কিন্তু তিমিরের শেষেব কথাগুলি শুনে সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। মা না-হয অবুঝ হয়েছেন, তবুও তিনি মা। তাঁব মুখের ওপব এমন ভাবে সমানে তর্ক করা তিমিরের পক্ষে ভালো দেখায় না। তাই বিবক্তিব পাতলা আবরণ ছেয়ে গেল কবিতাব সারা মুখে। চোখ দুটি ছোট হয়ে ভ্রূ-যুগল কুঁচকে গেল। ফিসফিসিয়ে তিমিবের প্রায় কানে কানে সে বললো, কি হচ্ছে এ-সব? তুমি একটু চুপ কববে? কবিতার সে-কথায় কর্ণপাত করলো না তিমির। সমানে বলেই চললো, আসলে তোমরা কেউ ওকে পছন্দ করো না। তাই ওর মধ্যে একটু দোষ পেলেই....লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে কবিতার। এমন ছেলেকে নিয়ে সে কি কববে? সমানে তর্ক কবে চলেছে মায়ের সঙ্গে। একটা কথা পর্যন্ত কবিতা ওকে শোনাতে পারছে না। আর বেশি কিছু তিমির যাতে বলতে না-পারে সেই লজ্জায় কবিতা ওকে প্রায় টানতে টানতেই ঘরে নিয়ে গেল। ইজিচেয়ারে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো, আচ্ছা, তুমি কি বলো তো? আমারই সামনে তুমি মায়ের সঙ্গে অমন করে....মা যে কি ভাবছেন? তোমাব কান্ডকারখানা দেখলে লজ্জায় আমি মরে যাই।

কবিতা কিন্তু দমলো না। পরদিনই সে সাত-সকালে বিছানা ছেড়ে বাথরুমে ঢুকলো। স্নান শেষ করে বাসী-কাপড় ছেড়ে নূতন শাড়ি গায়ে জড়ালো: ভিজে চুলগুলি সারা পিঠের ওপর দিয়ে

ছড়িয়ে, বেশ বড়ো করে কপালে আঁকলো সিঁদূরের টিপ। বাগানে পূজোর ফুল তুললো। ছায়া দেবী স্নান সেরে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে যাবেন, কবিতা ওঁর পা স্পর্শ কবে প্রণাম করলো। ব্যস্ত হয়ে ছায়া দেবী ওর সারা দেহে চোখ বোলাতে অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটা এতো ভোরে উঠে স্নান করছে। বাসী- কাপড় ছেড়ে নতুন শাড়ি জড়িয়েছে। কপালের উজ্জ্বল সিঁদুবেব টিপটা জ্বলজ্বল করছে। চুলের প্রান্তে মুক্তোর মতো জলবিন্দুগুলি টলটল কবছে। এবারে আস্বস্ত হলেন ছায়া দেবী। না, মেয়েটা আর ভুল করেনি। ছায়া দেবী কিছু বললেন না। ঠাকুর ঘরে ঢুকে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর ওই বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থেকে মিষ্টি করে একটু হাসলো কবিতা। ঢুকলো গিয়ে রান্নাঘরে।

চা-জলখাবার তৈরি করে একে একে সুবীরকে, স্বাতীবৌদি ও চন্দনাকে দিল কবিতা। চন্দনার ঘবে চা দিতে গিয়ে কবিতা ভাবলো, আজ ওর সঙ্গে একটু সম্পর্কটা গাঢ় কবে নেবে। কিন্তু তা হলো না। চা নিয়ে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দনা বললো, টেবিলের ওপর রেখে যাও। চা-জলখাবার টেবিলের ওপর রেখে দিয়েও বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো কবিতা। পরে ধীর পায়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখলো পশুপতি পা ছড়িয়ে বসে আছে।

ছোট বৌদিমণি! খিদা পাইছে বড়ো।

খাবার দেবাব জন্য আমিই তো তোমাকে খুঁজছি। কবিতা হাসলো একটু

কয়েন কি—-খাইবার জন্যি আমিও আপনার খোঁজতাছি। পশুপতিও হাসলো। ওকে খাবার দিয়ে কবিতা এবারে তিমিরের খাবার সাজালো প্লেটে। ঘরে গিয়ে দেখলো, তিমির তখনও পরিত্রাণে ঘুমুচ্ছে। টেবিল ক্লকটা জানালো, সকাল সাড়ে-আটটা বাজে। তিমিরের ঘুমন্ত দেহের দিকে চেয়ে চাপা হাসলো কবিতা। ওর গায়ে হাত রেখে হাসলো, তাই বলো! তুমি এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছো? অফিসে কে যাবে শুনি, তুমি না আমি? এই শুনতে পারছো আমার কথা, কবিতা আরও জোরে ধাক্কা দিল তিমিরকে।

কোনওরকমে স্নান সেরে জামা-প্যান্ট পড়েই খেতে বসলো তিমির। চা ততোক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গেছে। চা ফেলে দিয়ে কবিতা আবার নতুন করে চা বানিযে আনলো। পরে তিমিরের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, গতকাল কি কি সংবাদ সংগ্রহ করলে বলো?

অনেক কিছু। ছোট্ট উত্তর দিল তিমির।

যেমন?

এই ধরো, এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বটগাছের মধ্য দিয়ে খেজুর গাছের আবির্ভাব হয়েছে। প্রকৃতির সে-এক অদ্ভুত খেয়াল। অপর একটি বাড়ির বাগানের লাউ গাছের একটি মাত্র ডগায় সতেরোটি লাউ হয়েছে। এক ভদ্রমহিলার একসঙ্গে বেশি নয়—মাত্র চারটি সন্তান হয়েছে। তিমিরের কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলো কবিতা।

তুমি হাসছো যে? তিমির ওর গায়ে ছোট্ট একটু ধাক্কা দিয়ে হাসার কারণটুকু জানতে চাইলো।

তুমি এতো বড়ো বড়ো সংবাদ সংগ্রহ করেছো জেনে। আবারও হাসলো কবিতা। সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়ে কাজের কাজ না-করে এই সমস্ত বুঝি জোগাড় করো? রাজনৈতিক সাংবাদিক হয়েও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ না-পেয়ে ওই সব করে বেড়াচ্ছো বুঝি!

ঠিক তা নয়—তিমির কবিতার অভিযোগটুকু ঢাকবাব চেষ্টা করে ম্লান হাসলো। বললো, আসলে কি জানো, এই দেখো না, মস্ত বড়ো এক আশ্চর্য, বিস্ময়কর, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঠিকমতো সংগ্রহ করেছিলাম। এডিটরের ঘরে গিয়ে দেখি আমার আগেই আর একজন রিপোর্টার এডিটরের টেবিলে তুলে দিয়েছে।

কি সেই সংবাদটা? কৌতূহল জাগলো কবিতার। এমন কি মস্ত বড়ো আশ্চর্য আর বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, সেটা বলবে না?

কালকের পত্রিকায় দেখতে পাবো। হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো তিমির।

সর্বনাশ! প্রচুর বেলা হয়ে গেছে। চাকরি বুঝি আর রাখা যাবে না। আমি চলি।

আজ কখন আসবে? নিচু গলায় কবিতা জানতে চাইলো।

বেলা দেড়টার আগেই আসবো। দু-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। তিমির হাসলো। সেজন্য ঘড়ি নিয়ে সময় মেলাতে বসে যেয়ো না।

একটা বাজার কিছু পরেই বাসায় ফিরলো তিমির। ফিরলো পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে। পোর্টফলিও ব্যাগটি টেবিলের ওপর রাখলো। ইজিচেয়ারে বসে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। বাড়ির আব সবাই খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছে। জেগে শুধু কবিতা। না-খেয়ে তিমিরের জন্যই সে এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল। এবারে রান্নাঘরে গেল খাবারের ব্যবস্থা করতে। বারান্দার পাশ দিয়ে যাবার সময়েই চোখ পড়লো টবের দিকে। টগর, জুই আর বেলফুলের টব কবিতার আন্তরিক যত্নে ওরা যেন নতুন রসে সঞ্জীবিত হয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ওই এক শখ কবিতার। হাতে কাজ না-থাকলে সারা দিনের সময়টুকু তার ব্যয় হয় এই কাজে। কবিতার কোমল হাতের স্পর্শে গাছগুলি ফুলে ভরে গেছে।

খেতে বসে তিমির বললো, জানো আজ বড়ো করুণ আর মর্মান্তিক একটা সংবাদ আছে। সে নিদারুণ নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখলে চোখে জল রাখা যায় না।

কি হয়েছে? কবিতা জানতে চাইলো।

বড়ো গঙ্গায় নৌকাডুবির ফলে স্ত্রীলোক আর শিশুসহ মোট একচল্লিশজনের সলিল সমাধি। এক ভদ্রমহিলা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন, কিন্তু তার কোলের শিশু সন্তানটি রাক্ষুসী গঙ্গা ছিনিয়ে নিয়েছে। ভদ্রমহিলার সে-কি কান্না! আকুল-করা বুক ভরা কান্না!! ব্যথাতুর মন নিয়ে শুনলো কবিতা। রইলো চুপ করে। কিই-বা সে বলবে? দুঃখ হলো ওই অভাগিনীব জন্য। পুত্রহারার জ্বালা যে কি, যার যায় সে বোঝে। নিজের দাদাকে হারিয়েই প্রিয়জন হারানোর গভীর ব্যথা কবিতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে।

পরের দিন সংবাদপত্রের ছায়াছবির পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতেই কবিতার চঞ্চল চোখ দুটি স্থির হলো। ওপরের দিকে এক জায়গায় লেখা রয়েছে ঃ তরুণ সাংবাদিক তিমির রায়চৌধুরীব সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যপটীয়সী কবিতা কাপূরের শুভ পরিণয়। নীচের ছোট হরফের লেখাগুলিও মন দিয়ে পড়লো কবিতা। পড়ছে আর হাসছে মনে মনে। ঘরে ঢুকলো তিমির। কাপড়টাকে দু'ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে কোমরে জড়ানো। খালি গা চুলগুলি এলোমেলো। কবিতা সেদিনের পত্রিকাটি দিয়ে তিমিরের মাথাটা চেপে ধরলো। বললো, ও হরি, এই বুঝি তোমার সেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ? তিমির কবিতার সরু কোমরটুকু জড়িয়ে ধরে ওর চোখের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো। অম্লান হেসে উত্তর দিল, শুধু গুরুত্বপূর্ণ? স্মরণীয়ও বটে!

কেন?

বাঃ আমার নামটাও যে তোমার সঙ্গে কাগজে ছেপেছে।

আহা—ডান হাতের ছোট্ট কিল তুলে তিমিরের পিঠে মৃদু ভাবে বসিয়ে দিয়ে কবিতা বললো, এর আগে যেন ছাপা হয়নি! সব সময়ে খালি বিনয়ের অবতার। তিমির কবিতার ভালোবাসার ছোট্ট আঘাতটুকু উপভোগ করে বললো, নাম ছেপেছে ঠিক। তবে এতো বড়ো অক্ষরে এই প্রথম। তুমি সঙ্গে আছো কিনা!

বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আরম্ভ হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। তিনদিনব্যাপী এ উৎসব হবে। উদ্যোক্তাদের প্রধান কর্মকর্তারা স্থির করলো প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে কবিতাকে নাচের আসরে উপস্থিত করতেই হবে। তার নৃত্য ক্ষমতা আজ সমালোচনার উর্ধ্বে। সর্বজনবিদিত, জন-বন্দিতা কবিতাকে উপস্থিত করলে টিকিট বিক্রির ফলে আশাতিরিক্ত অর্থ সমাগম হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা কবিতা কলকাতায়। সুদূর মাদ্রাজ থেকে তাকে প্লেনে নিয়ে আসবার, হোটেলে শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখবার খরচা বহন করতে হবে না। সুতরাং এ-সুযোগ কর্তৃপক্ষ হারাতে রাজি নয়। তারা দেখা করলো

কবিতার সঙ্গে।

কলিং-বেলটা বেজে উঠতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল পশুপতি। দেখলো, দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই বিরাট এক গাড়ি নিশ্চুপ হয়ে থেমে আছে। পশুপতি বললো, কারে চান?

কবিতাদেবী আছেন? একজন জিজ্ঞেস করলো।

হ আছেন।

ডেকে দিতে পারো? বিশেষ প্রয়োজন। বাইরের ঘরে ভদ্রলোক দুজনকে বসালো পশুপতি। বললো, আপনেরা চুপ কইরা বয়েন, আমি ডাইকা দেই। পশুপতির কথার ধরনে একজন কৌতুক অনুভব করলো। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলো, আমাদের দেখে কি তোমার মনে হলো যে, গন্ডগোল করতে এসেছি?

না, সেইডা ঠিক কথা না, পশুপতি অমায়িক হেসে বললো, আপনেরা দোষ নেবেন না, আমার কথা কওনের ধরন-ধারণটাই এ্যামনি।

পশুপতি খবর দিতেই কবিতা নিজেকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিল। পরে দেখা করলো অপেক্ষারত ভদ্রলোক দুজনের সঙ্গে। শুনলো ওদের কথা। আলাপ-আলোচনা হলো কিছু সময়। সব শেষে কবিতা জানালো, আপনারা কালকে একবার আসুন। কেন-না ওঁর মতামত না-নিয়ে আমার পক্ষে আগে থেকে আপনাদের কথা দেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা নমস্কার—

যথারীতি পরদিনই ওরা আবার এলো। ওদের সঙ্গে কথা বললো তিমির। সে কোনও আপত্তির সুর তোলেনি। খুশি মনেই রাজি হয়েছে। অভিনেত্রী অভিনয় করবে, নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করবে। এতে মত না-দেওয়ার কি আছে? তবে মায়ের দিকটাও একবার চিন্তা করলো তিমির! সে জানে, মা এতে রাজি হবে না। তা জানা সত্ত্বেও বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের যে-দুজন ভদ্রলোক এসেছিল, তাদেরকে মত দিয়েছে। কেন-না তিমির অনেক ভেবে দেখেছে, সব মানুষেরই স্বাদ-আহ্লাদ আছে। তাছাড়া কবিতা যেখানে একজন সার্থকনামা শিল্পী, তার পক্ষে এক ঘরে এমন বন্দির মতো জীবন-যাপন করার কোনও অর্থ হয় না। এ-বাড়িতে সবাই থেকেও প্রকৃতপক্ষে তিমির ছাড়া কবিতার আর কেউ নেই। সেক্ষেত্রে কবিতা এমন সঙ্গীহীন হয়ে নিরাশ মনে বাঁচবে কেমন করে? তাকে ওই নাচ-গানের মধ্যেই ভুলিয়ে রাখতে হবে। ডুবিয়ে রাখতে হবে তার একান্তই নিজস্ব সাধনায়। কবিতার প্রাণ, কবিতার সাধনাকে তিমির নষ্ট করতে চায় না। চায় না বিসর্জন দিতে। সৃজনশীল লেখককে যদি লিখতে না-দেওয়া হয়, গায়ককে যদি গান গাইতে বারণ করা হয়, নৃত্যশিল্পীকে যদি ময়ূরের পেখম মেলতে না-দেওয়া হয় তবে সেটা হত্যা করারই ব্যাপার হয়। শিল্প রস-পিপাসু মানুষ হয়ে তিমির তা করে কেমন করে? এ-সব ভেবেই সে মতো দিয়েছে।

ভদ্রলোক দুজন চলে গেলে কবিতা অভিযোগের সুরে বললো, তুমি তো দিব্যি এক-কথায় মতো দিয়ে দিলে, কিন্তু মা যদি রাজি না-হন?

কেন হবেন না? কবিতাকেই উল্টে প্রশ্ন করলো তিমির। তুমি নৃত্যশিল্পী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচো, মা কি তা জানেন না?

যা ভয় করেছিল কবিতা, ঠিক তাই হলো! মাকে জানানো উচিত মনে করে তিমির ছায়াদেবীকে কথাটা বলতেই তিনি জ্বলে উঠলেন। এমন অসম্ভব, অবাস্তব, নির্লজ্জ কথা যে তিনি ছেলের মুখ থেকে শুনবেন তা ভাবতে পারেননি। তিমুটা বলে কি? বুদ্ধিশুদ্ধি কি ওর লোপ পেল? বাড়িটাকেই না একদিন স্টেজ বানিয়ে ফেলে—ছায়াদেবীর এখন এই আশঙ্কা হলো। বললেন, ঘরের বৌ যাবে স্টেজে নাচতে? ওই একগাদা লোকের সামনে? তোর কি আক্কেল বলে কিছু নেই?

কেন থাকবে না? তিমির সহজ সুরেই বললো, নাচতো স্টেজেই হয়। আর ওই একগাদা লোকের সামনেই হয়। ফাঁকা মাঠে হয় না। তুমি বারবার ঘরের বৌ ঘরের বৌ বলো, ঘরের বৌ যদি সিনেমা জলসায় যেতে পারে, খেলার মাঠে, পার্টিতে যোগ দিতে পারে, আর যতো দোষ নাচলেই? এরমধ্যে তুমি খারাপটা কি দেখছো? আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

কেমন করে বুঝবি? তোর মাথা যে একেবারেই গেছে। সন্দেহ প্রকাশ নয়, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ছায়া দেবী। তিমিরের বুদ্ধি বলে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। বললেন, এমন সব উদ্ভট কথা তুই বলিস কি করে? ঘরের বৌ যাবে ধিঙ্গীপনা করতে? লোকে আমায় বলবে কি? আত্মীয়-স্বজনকে আমি এর পরে মুখ দেখাতে পারবো?

নাচতে জানা বা নাচতে পারাটা এমন কিছু অন্যায় নয় যে তুমি মুখই দেখাতে পারবে না।

বলিস কি? ছায়া দেবী স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বললেন, আমি তো ভাবতেই পারি না, ছোট বৌমা নাচতে যাবে বাইরে।

চুরি-ডাকাতি তো করতে যাচ্ছে না।

তুই থাম তিমু। সর্বশরীর জ্বলে উঠলো ছায়া দেবীর। ছেলের এমন টিপ্পনীসূচক কথা শুনে কোন মায়েরই-বা শরীর না-জ্বলে? ছায়া দেবী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বৌয়ের হয়ে আমার মুখে মুখে এমন বেয়াড়া তর্ক তুই আর কখন করিস না। এর ফল ভালো হবে না কিন্তু—

দেখো মা, দুটো কথা বললেই তর্ক করা হয়, এমন ভুল ধারণা কোরো না। আমি কি বলতে চাই তুমি আগে সেটা বোঝো। কবিতা নাচতে যাচ্ছে, এটা ঠিক। কিন্তু সে এমন মারাত্মক অন্যায় করতে যাচ্ছে না যাতে তোমার নাক-মুখ কাটা যায়।

মায়ের সঙ্গে কথা বলার ছিরি দেখেছো! আফসোসেব সুরে ছায়া দেবী বললেন।

আমি কিছুই বলিনি। তোমার কথাই শুধু নতুন করে বললাম। তুমি বললে, আত্মীয়-স্বজনকে মুখ দেখাতে পারবে না। নাচাটা কি এতোই জঘন্য যে তুমি...এ-গুলি যদি খারাপই হবে তাহলে আর লোকে আগুন দাম দিয়ে টিকিট কেটে দেখতে যেতো না।

টিকিট কেটে লোকে তো রেস খেলে, সেজন্য সেটা কি খুব মহৎ কাজ? আসলে আমি কি বলতে চাইছি তা বোঝবার বয়েস তোর হয়নি। একটু থেমে ছায়া দেবী আবার বললেন, বয়েস হয়েছে ঠিকই। ইচ্ছে করে বুঝতে চেষ্টা করছিস না। বুঝলে অন্তত আমার সঙ্গে এই ধরনের বেয়াড়া কথা কাটাকাটি করতিস না। তা মনে যখন ঠিক করেছিস বৌমাকে নাচতে পাঠাবিই, তখন আর আমার কাছে এলি কেন? অবহেলা ভরে জানিয়ে এই নিয়ম রক্ষাটুকু না-করলেই পারতিস।

তবুও তোমাকে আমার বলা উচিত। তোমরা আমাকে পর ভাবতে পারলেও, আমি তা পারি না।

ভালো কথা! তবে আমাকে শেষ মুহূর্তে এই ভাবে জানানোর কোনও মানে হয় না। এ-যেন ঘর থেকে রাস্তায় বের হয়ে গিয়ে তুই আমাব অনুমতি চাইছিস, মা বেড়াতে যাই? বিয়েব পর তুই আরও বেশি অবাধ্য হয়ে গেছিস। আমাকে মা বলে পর্যন্ত জ্ঞান করতে তুই চাস না! গভীর দুঃখে শেষ পর্যন্ত ওই কথা ছাড়া ছায়া দেবীর মুখে দ্বিতীয় আর কিছু বের হলো না।

পত্রিকায় সেদিন বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স অনুষ্ঠান সূচীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নামের তালিকা প্রকাশিত হলো। পত্রিকায় সব নামের ওপরে কবিতার নামটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিতা রায়চৌধুরী। পাশে বন্ধনীর মধ্যে আবার কাপূরের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তার বিয়ের আগের পদবী।

নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে এলো। কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন আজ। একক নাচ এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। কবিতা দুপুরের দিকে তিমিরকে একা পেয়ে এক সময় বললো, আমার কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে না নাচতে।

কেন?

সেদিন মা-র সঙ্গে তোমার এই নিয়ে......

তাতে কি হয়েছে? মা যাতে মত দেন সেই জন্যই তো অতো কথা বললাম সেদিন। এখন তুমি বলছো, যেতে ইচ্ছে নেই! পাপ সঞ্চয় করতে যাচ্ছো না তো—আমার কথা হলো নাচবার

তোমার ক্ষমতা, প্রতিভা আছে। সামান্য সেন্টিমেন্টের প্রশ্নে তোমার এতো বছরের সাধনা নষ্ট হোক, এটা আমি চাই না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তোমার এই নাচবার অনিচ্ছা, সম্পূর্ণই মাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিতা, এটাও তেমনি ঠিক সত্যই কি তুমি মনপ্রাণ থেকে বলছো নাচবার তোমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই? তা তুমি কক্ষনও বলতে পারো না। আর তাই যদি তুমি স্বীকার করো, তাহলে বলবো, নাচেব সাধনা কখনও করোনি। মন-প্রাণ ঢেলে একাত্ম হয়ে ভালোবাসতে পারোনি।

দেখো কোনও জিনিস ভালোবাসলেও জীবনে এমন অনেক পরিস্থিতি আসে, কর্তব্যের খাতিরে না-হলেও অন্ততপক্ষে শান্তি বজায় রাখার জন্য সেই জিনিসকে ছাড়তে হয় বই-কী।

তাহলেই ফিরে আসছো আমাব কথায়। আব মায়েব অসন্তোষের কথা বলছো, তার উত্তবে বলতে চাই দিন পাল্টাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। এখন শুধু নতুনের আবির্ভাব। নতুনের পদক্ষেপ। চারিদিকেই শুধু নতুনের জয়গান। মা এখনও সেই পুরাতন যুগে পড়ে আছেন। তোমার নাচ-গান তাই মা পছন্দ করেন না। অথচ আমি করি। ভীষণ ভাবে করি। শিল্পকলাকে কেই-বা পছন্দ না-করে? সেই কারণেই মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু তাব মানে এই নয় যে, তোমার হয়ে মাকে জব্দ করেছি বা মায়ের অবাধ্য হয়ে আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করছি।

ছায়া দেবীব অনুমতি আনতে ওঁর ঘরে গেল কবিতা। নাচতে সে যাবে কিনা? কবিতা ঠিক করেছে, ছায়া দেবী যা বলবেন, সে তাই শুনবে। সারাটা জীবন যাঁর কাছে থাকতে হবে, তাঁর মন ভেঙে দিয়ে আর যাই হোক, কোনও সমাধান হয় না।

বিছানায় শুয়েছিলেন ছায়া দেবী। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছেন অনেকক্ষণ হলো। ঘুমাবাব চেষ্টা করেও একটিবারের জন্য দুটি পাতা এক করতে পাবেননি। কবিতা অনুমতি চাইলে, পাশ ফিরে ছায়া দেবী ক্ষোভ মেশানো গলায় বললেন, আমি আর কি বলবো বৌমা! যার মত নেওয়া তোমাব একান্ত প্রয়োজন, সে তো তোমাকে অনুমতি দিয়েছেই। তিমু যখন মত দিয়েছে, তখন আর আমার বলবার কি থাকতে পারে? বলার আমাব কিছু নেই। নাচতে যাবে বই-কী!

না। তা হয় না। আপনার মতেরও প্রয়োজন আছে।

আমার মতামত তো তোমার অজানা নয়। স্পষ্ট উত্তর দিলেন ছায়া দেবী। ঘরের বৌ হয়ে দশজন লোকের সামনে তুমি নাচবে, আমার বাপের বয়সেও শুনিনি। বিয়ের আগে যা কবার করেছো, বিয়ের পরেও কি তাই মানায়?

আপনার কথাই হবে মা। নাচতে আমি যাবো না।

এবারে কবিতার দিকে পাশ ফিরে তাকালেন ছায়া দেবী। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, অমন কাজও করো না। শেষে তিমুটা আবার ছুটে এসে আক্রমণ করবে আমাকে। ও-সব আমার সহ্য হয় না। ঝামেলা পোয়াতে পোয়াতে এতো বছর কাটলো, শেষের দিন কটা একটু শান্তিতে থাকতে চাই। তিমিরের প্রতি যাতে ছায়া দেবী অন্য কোনও বাজে ধারণা না-করেন এবং যেটুকু ভেঙে দেবার জন্যই কবিতা বললো, উনি আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। ভক্তি করেন।

আমার পেটের ছেলেকে বৌমা তুমি আমাকে চেনাবে? কাউকে চিনতে আমার বাকি নেই। তুমি যাও—

বারবার দুলে দুলে, ফুলে ফুলে উঠছে কোমল দেহটা। বেতস পাতার মতো কাঁপছে সারা শরীর। ঝর্ণার জলের ওপর রামধনুর সাতটি রং খেলার মতো ঝলমলিয়ে উঠছে। পাথরের মতো নিকষ কালো চোখ দুটি যেন হাসছে। কথা বলছে চুপিসারে। যেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে। দেহবল্লরী ধনুকের মতো এঁকে-বেঁকে নৃত্য পরিবেশন করছে। শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে নেচে চলেছে কবিতা। বিভিন্ন দিক থেকে নানা রঙের আলোর বিন্দুগুলি এসে ওর সারা শরীরে ঠিকরে পড়ছে। মুগ্ধ দর্শককুলকে সাক্ষী রেখে হরিণ-চপল পায়ে নেচেই চলেছে কবিতা। এতোটুকু বিরাম নেই। ক্লান্তি নেই। ছন্দপতন নেই।

নাচ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় তিমির। এই ক'দিন বাড়িতে কবিতাকে দেখেছে এক ভাবে, আজ আবাব অন্য ভাবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। এই দুই দেখার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কবিতার এতো চপলতা, নৃত্যকুশলতা যে হারিয়ে গিয়েছিল তাদেব বাড়ির চার দেওয়ালের গন্ডির মধ্যে। নিজস্ব পবিবেশ পেয়ে কবিতা আবার ফিরে পেয়েছে তাব স্বভাবসুলভ ক্ষমতা। মুহূর্তে কবিতার এই পরিবর্তন তিমিরকে তাই অবাক করেছে। তিমিরের সঙ্গে ছিল বিজয়। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কবিতার বিভিন্ন পোজের ছবি তুললো সে। ছবি তোলা শেষ হলে তিমিরের পাশে এসে ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে টিপ্পনী কাটলো, কি রে, আব ছবি তুলবো?

—বাজে বকিস না, নাচ দেখতে দে।

—নাচ তো সবে শুরু হয়েছে বন্ধু! সারা জীবনের নাচ তো পড়েই আছে।

বাসায় ফিরতে ওদেব বেশ রাত হয়ে গেল। প্রায় পৌনে-একটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতো রাত্রে কলিং-বেলটা না-বাজিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালালো তিমিব। মেঝেতে মাদুর পেতে পশুপতি ঘুমাচ্ছে।

এই পশু! পশু! তিমির চাপাস্বরে ডাকলো।

কাকে ডাকছো? কবিতা বুঝতে পারে না, পশুপতিব সংক্ষিপ্ত নামই পশু।

পশুপতিকে।

পশুপতি ঘুম জড়ানো চোখ দরজা খুলে দিল। একটা বিরাট হাই তুলে সে বললো, আপনেবা আইছেন। আমি তো জাইগা জাইগা শোয়ে ঘুমাইয়া পড়ছি।

বেশ করেছিস। কবিতাকে নিয়ে তিমিব সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ঘরে ঢুকেই ড্রেসিং-টেবিলেব সামনের টুলটায় বসলো কবিতা, জামা-প্যান্ট ছেড়ে স্লিপিং-ড্রেসটা পরলো তিমির। দবজা বন্ধ কবতে গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিবে চাইলো কবিতার দকে। স্বর্ণালঙ্কারগুলি একে একে খুলে টেবিলেব ওপর সাজিয়ে রাখছে কবিতা। তিমির জিজ্ঞেস কবলো, বাইরে যাবে নাকি?

না। ছোট্ট উত্তর দিল কবিতা। দরজাটা বন্ধ কবে দিল তিমিব। বিছানাব প্রশস্ত বুকে নিজেকে এলিয়ে দিল। পাশবালিশটাকে টেনে নিয়ে কবিতার দিকে তাকালো। বললো, সত্যি অপূর্ব নাচতে পারো তুমি।

এই প্রথম দেখলে তাই না? আয়নার মধ্য দিয়ে কবিতা চেয়ে রইলো তিমিরের দিকে।

তা নয়। হাই তুললো তিমিব। ঘুম আসছে।

তবে?

আসলে তোমার নাচ দেখলে মনে হয়, এতো সুন্দর নাচ এর আগে কখনও দেখিনি। তাই প্রতিবারই নতুন মনে হয়। একটু থেমে তিমির বললো, আলোটা নিভিয়ে দাও। আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

সেদিন গিরিডি থেকে ছায়া দেবীর দূর সম্পর্কের এক বোন এলেন। বিধবা তরুলতা ছায়া দেবীর চেয়ে বয়সে বছর তিনেকের বড়োই হবেন। এই মাসিটিকে তিমির এর আগে দু'বার মাত্র দেখেছে। আর এও জেনেছে, এমন শুচিবাইগ্রস্ত মহিলা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

তিমির অফিসে চলে যাবাব পরেই তরুলতা আরম্ভ করলেন তার আসল বক্তব্য। ছায়া দেবীকেই তিনি দায়ী করলেন এজন্য। বললেন, তোরই-বা কেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছায়া? তিমুর বিয়ে দিলি শেষ পর্যন্ত একটা পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে? কেন, এতো বড়ো বাংলাদেশের বাঙালি মেয়েরা কি সবাই এক জোট হয়ে তিমিরকে বয়কট করে জানিয়েছিল যে, তারা কেউ ওকে বিয়ে করবে না? কি লজ্জার কথা বল দেখি! আত্মীয়-স্বজনরা যে এখনও তোকে একঘরে করেনি, এটাই ঢের। আমি বাপু এতোটা অনাচার সহ্য করতে পারতাম না! আর তোকেই-বা দোষ দিয়ে কি হবে; আজকাল ছেলে-ছোকবাদের মতি-গতিব কিছু ঠিক আছে কি?

সবই কপাল তরুদি। ছেলের বিয়ে কি আমি দিয়েছি না আমার মতেই হয়েছে? সবাই স্বাধীন হয়েছে আজকাল। আমার কথা শুনবে কেন?

আমি বাপু এটা মেনে নিতে পারলাম না। আগেই বলেছি, তোকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে কথাটা কি জানিস, তোর ছেলে তোরই হাতে। শাসন কবলে হাতছাড়া হয় কি করে বুঝি না। এই তো আমার ননদের ছোট মেয়েটা, বলে কি না একজন মুসলমান ছোকরার সঙ্গে তার ভাব আছে। তাকেই বিয়ে করবে। তা বললেই হলো? ননদের কঠিন শাসনে এখন বাধ্য মেয়ের মতো চুপচাপ রয়েছে। আসছে মাসেই গিবিডির এক ধনী বাঙালি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে। তাই বলছিলাম—তোর আর একটু কঠিন হাওয়া উচিত ছিল । তাহলেই দেখতিস, জায়গায় ঘুঁটি ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছে। এতোটা বাড়তে তিমু সাহস পেতো না। বলছি বটে, তবে আজকালকার ছেলেরা এই দুঃসাহস কোথা থেকে পায় বুঝি না। নইলে মায়ের অবাধ্য হয়ে পাঞ্জাবী মুসলমান খ্রীষ্টান বিয়ে করতে চায়। ধন্যি শখ বাপু বিয়ের! কিন্তু তুই কি করে পাঞ্জাবী বৌ নিয়ে ঘর করছিস—সেটাই আমি ভেবে পাই না।

বৌ নাচতে যাবে, মত দিতে চাইনি। ওতে মন্দ হয়ে গেলাম। আর তুমি বলছো, কেমন করে ঘর করছি? ঘর না-করে উপায় কি বলো? নয়তো এতোদিনে আমাব নিন্দে আবও জোরালো হয়ে ছড়িয়ে পড়তো। ছায়া দেবী মনের দুঃখ প্রকাশের সুযোগ পেয়ে ধরা গলায় আগের ইতিহাস টেনে আনলেন।

বলিস কি! আর হবে নাই-বা কেন, ওদের মধ্যে সভ্যতা, শালীনতা বলে কিছু আছে নাকি? তুই এক কাজ কর ছায়া, আমি বলি, তুই চল আমার সঙ্গে গিরিডিতে। দিব্যি থাকবি।

গেলে তো বেঁচে যেতাম তরুদি। কিন্তু তা হয় না। যতো দিন চন্দনার একটা বিয়ে ঠিক করতে না-পারছি, ততোদিন আমি এ-সংসারে আটকেই থাকবো।

ছায়া দেবীর ঘরেতেই তরুলতাব খাবার নিয়ে আসছিল কবিতা, কিন্তু ভেতবকার আলোচনা শুনে নিথর নিশ্চুপ পাথরে মতো প্রাণশূন্য হলো সে। ওঁদের কথা শুনে যথেষ্ট আঘাত পেল কবিতা। তাব সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, এই সংসারকে, এই সংসারের প্রতিটি মানুষকে সে আপন করে বুকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে কিন্তু ভাগ্য তার নিতান্তই খারাপ। ভাগ্য শুধু তাকে পিছনেই ডাকে। সরিয়ে রাখে দূরে। কি করবে তাহলে কবিতা? সে কি তাহলে কারও স্নেহ-ভালোবাসা পাবে না? এমনি অবহেলিত, উপেক্ষিতের মতো দিন কাটবে তার? তাহলে বাঁচবে কেমন করে? আপনজনের, প্রিয়জনের, স্নেহ-ভালোবাসায় সবাই যে ধন্য হতে চায়। বুক ঠেলে কান্না আসছে কবিতার। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে ছায়া দেবীর দু'পা জড়িয়ে ধরে বলে, মা তোমবা আমাকে আর যাই করো, পর করে দূরে সরিয়ে রেখো না। দূরের মানুষ না-ভেবে আমাকে কাছে টেনে নাও। তোমাদের কাছ থেকে অবহেলা পেলে মনে বড়ো কষ্ট হয়। ভীষণ ভাবে আঘাতটা বুকে সাজে।

দরজার আড়ালে আর দাঁড়িয়ে রইলো না কবিতা। কতোক্ষণ আর এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? নিজেকে সংযত করে নিয়ে খাবারের প্লেট হাতে এবারে সে ছায়াদেবীর ঘরে ঢুকলো। তরুলতার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি কবিতার সারা শরীরে একবার চোখ বোলালেন। পরে ভ্রূকুটি হেনে বললেন, তুমি বাপু খাবারটা নিয়ে যাও। আমাকে ওরাই দেবেখ'ন।

খাবারের প্লেটটা নিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই কবিতা স্পষ্ট শুনতে পেল, তরুলতা বলছেন, তুই যাই বলিস ছায়া, আমি বাপু যার-তার হাতেরটা খেয়ে জাত খোয়াতে পারবো না। বলে, আমাদের হিঁদুর ঘরের ছোট জাতেরটাই খাই না, সেখানে কিনা তোর বৌ পাঞ্জাবী। তরুলতার কথা শুনে ওঁর মুখের দিকে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন ছায়া দেবী। হতে পারে তার বৌ পাঞ্জাবী, কিন্তু অস্পৃশ্য তো নয়। তার হাতেরটা খেলে জাত চ'লে যাবে, এমনটা মেনে নিতেও ছায়া দেবী রাজি নন। এটা তরুদি কি বললেন! অসন্তুষ্টই হলেন ছায়া দেবী মনে মনে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না। অবশ্য বলবার তার অনেক কিছুই ছিল। তবুও একটি কথাও বলতে পারলেন না। পথ যে

তার সব দিক দিয়েই বন্ধ। তা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে ছায়া দেবী কবিতার পক্ষেই গেলেন! কেন-না তরুদি ঠিক যুক্তিযুক্ত কথা বলেননি।

তরুলতার কথা শুনে বুকটা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠলো কবিতার। দেহের রক্ত সঞ্চালন বুঝি বন্ধ হবার উপক্রম। শরীরের স্নায়ুগুলিও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো। দাঁড়াবার ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে কবিতা। কাঁপছে হাত। ভাঙছে মন। কাঁপছে সারা দেহ। পা দুটিও টানছে। খাবারের প্লেটটা পড়ে যাচ্ছিলো, দু'হাতে জোর করে। চেপে ধরলো সে।

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লো কবিতা। জাত তুলে এমন ধরনের কথা যে তাকে শুনতে হবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। বাঙালি পরিবারের মধ্যে সে একা পাঞ্জাবী। ভিন্ন জাতি, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি? সে কি এতোই অশুচি-অস্পৃশ্য যে হাতেরটা খেলে জাতই চলে যাবে? তাই কি কখনও হয়?

কবিতা বুঝে উঠতে পারে না, কি কি উপাদানে এই জাতটা তৈরি! জাতটা কি এতোই ঠুনকো জিনিস যে, সামান্য হাতের স্পর্শ কাচের পাত্র ভেঙে যাবার মতোই জাতের গৌরব নষ্ট হয়ে যাবে? ক্ষুণ্ণ হবে! পবিত্রতা মানুষের মনের মন্দিরে। সেখানে জাতি বিচারের সংকীর্ণতা কিছুতেই থাকতে পারে না। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত থাকা উচিতও নয়। কবিতার আরও দুঃখ বাড়লো এই কারণে যে, কই মা তো তরুলতার ও-কথার কোনও প্রতিবাদ করলেন না? তবে কি মায়েরও ওই একই মত? তা কি করে হয়? কবিতার স্থির বিশ্বাস ছায়া দেবী এতোটা ভাবতে পারেন না। কেন-না এর আগেও সে ছায়া দেবীকে খেতে দিয়েছে, পা ছুঁয়ে তো রোজই প্রণাম করছে, এমন কী পূজার ফুল পর্যন্ত তুলে দিচ্ছে। কই তিনি তা তো কোনও আপত্তি জানাননি। জাতের কথাও তোলেননি। শুধু বাসী-কাপড় ছেড়ে স্নানটা সেরে নিলেই হলো। তারপরে যতো অন্যায়ই করো না কেন মায়ের কাছে সাতখুন মাপ। জাতের ওপর ছায়া দেবীর ঘৃণা বা অবহেলা নেই, তাঁর যতো আক্রোশ সবই ওই বাসী-কাপড়ের ওপর। সুতরাং ছায়া দেবীকে কবিতা তরুলতার সমপর্যায়ে ফেলতে পারলো না। তবে তরুলতার কথা, একটু প্রতিবাদ শুনবার আশা করেছিল মায়ের কাছ থেকে। সে হতে পারে পাঞ্জাবী, তাঁর ছেলের বৌ তো। সুতরাং আপনজনও বটে। আর ভাবতে পারে না কবিতা। কান্না এসে চেপে ধরলো তাকে। চোখ দুটি ভরে উঠলো জলে। যেন বর্ষার টলমল একটি দিঘি। কাণায়-কাণায় পূর্ণ জল। এক সময়ে চোখের দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবন নেমে এলো। এতো ব্যথা, এতো দুঃখ সে রাখবে কোথায়? কাকে জানিয়ে বুকের এই পাথর চাপা ব্যথা একটু হাল্কা করবে? এখানে সবার থেকে সে আলাদা। কারোও সঙ্গে তার মিল নেই। সংসারের এই বিশাল অরণ্যে কবিতা একা! অসহায়! যেন পথ ভোলা এক পথিক। কেউ তাকে চেনে না। জানে না। কবিতা নিঃস্ব। কবিতা শূন্য। সবাইকে পেয়েও সে কাউকেই পায়নি। পায়নি আপন করে, মনের মতো করে। এরচেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে? তার ব্যথা-বেদনা বুঝবার মতো এই বাড়িতে এক তিমির ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। কবিতা এজন্য তিমিরকে কোনোদিনই দোষারোপ করবে না। তার কোনও দোষ নেই। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই সংসারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু মানুষ যা চায়, তাই কি সব সময়ে পাওয়া যায়? যা করে, তারই কি সুফল পায়? তবুও কবিতার বড়ো সান্ত্বনা, এই মরুভূমিতে তার তৃষ্ণার জল মেটাতে আছে একজন। অবশ্যই সে তিমির। সে-সব বোঝে। সব জানে। তার দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্য সে সব সময় প্রাণের কাছাকাছি থাকে। এটাই কবিতার মস্ত বড়ো পাওয়া। জীবনের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার পাওয়া। তিমিরকে প্রথম দেখেই এটা যেন সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল, ও অত্যন্ত ভালোমানুষ। সহজ মানুষ। ও কিছুতেই খারাপ হতে পারে না। কবিতার সে-উপলব্ধি সার্থক। মানুষ চিনতে তার ভুল হয়নি।

দুপুরের আগেই বাসায় ফিরলো তিমির। ঘরের কাছে আসতেই দেখলো, দরজা ভেজানো। একটু ঠেলা দিতেই ফাঁক হলো। বিছানায় দিকে চোখ পড়লো। কবিতা ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলো, দু'চোখের কোলে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগ। চিক্কন কালো চুলগুলি এলোমেলো হয়ে সারা পিঠ

ছড়িয়ে আছে। ঘুমন্ত মুখে অব্যক্ত বেদনার ছাপ আঁকা। বড়ো করুণ লাগছে ওর মুখখানা। ঘুমন্ত ওই করুণ মুখের দিকে চেয়ে ভারী মায়া লাগলো তিমিরের। আহত দৃষ্টিতে তাই বেশ কিছুক্ষণ সে চেয়েই রইলো। পরে ওর কোমল দেহে হাতখানা রেখে বুলিয়ে দিল সারা পিঠ, মাথা। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। তবে কি কেউ ওকে কিছু বলেছে? কে বলেছে? মা? তরুমাসিমা কিছু বলতে পারেন না, এটা ঠিক। কেন-না আজকেই তিনি এসেছেন। প্রথম দিনেই নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারেন না যা কবিতাকে এই ভাবে কাঁদাতে পারে?

কবিতা! এই—ওর পিঠে কোমল ভাবে চাপ দিয়ে নাড়া দিল তিমির। ভিজে কাঁপা পাতায় চোখ মেলে চাইলো কবিতা। একান্ত প্রিয় মানুষটার স্পর্শ পেয়ে ওর এতোক্ষণের চাপা ব্যথাটা সোনার কাঠির পরশের মতো জেগে উঠলো। ফল্গুধারা পাথরের স্তূপে বাধা পাওয়ার পরে যেমন করে ছুটে যায়, নতুন করে তেমনি ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়লো কবিতা। বালিশে মুখ গুঁজে সে নীরবে কাঁদতে থাকে। আরও কান্না দেখে মুষড়ে পড়ে তিমির। না-জানি কবিতা কতো আঘাত পেয়েছে। নয়তো এমন করে কাঁদতে ও পারে না। বালিশ মুখ গুঁজে রয়েছে কবিতা। তিমির ওর মুখটা নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে ম্লান সুরে জিজ্ঞেস করলো, এই কবিতা কি হয়েছে তোমার? কোনও সাড়াশব্দ নেই। কবিতা নিশ্চুপ। যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে সে। তিমির আবার বললো, বলো না কি হয়েছে তোমার? বলবে না আমাকে? জল ভরা চোখে এবার তিমিরের দিকে তাকালো কবিতা। চোখে চোখ রেখে, শূন্য দৃষ্টিতে। প্রচন্ড অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো, আমি তো পাঞ্জাবী, তোমাদের জাতের নই। আমাকে তুমি ছুঁয়ো না।

কে বলেছে এ-সব? রুক্ষ দৃষ্টি মেলে কঠিন সুরে জানতে চাইলো তিমির। কবিতাকে নিরুত্তর দেখে তিমির আবার বললো, বলো, তোমাকে কে কি বলেছে?

তরুমাসিমা! কবিতা আর চুপ করে রইলো না, একে একে সমস্ত কথা খুলে বললো।

সব শুনে গুম হয়ে বসে রইলো তিমির। কি করবে ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে অনেক কিছুই। কিন্তু সে-সব ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে অসুবিধা অনেক। আর তা করলেও লোকে উল্টে তাকেই পাগল বলবে। ইচ্ছে হচ্ছে, তরুমাসিমাকে এক্ষুণি ঘর থেকে টেনে হিড়হিড় করে একেবারে পথে নামিয়ে দেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই কবিতার ব্যথায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তিমির। এর কি কোনও প্রতিকার করা যায় না? সহজ কোনও উপায়ও তিমির খুঁজে পাচ্ছে না।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো চন্দনা। ডাকলো তিমিরকে, দাদা, বৌদিকে নিয়ে খেতে এসো। সাধারণত চন্দনা কবিতার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না। আর বললেও বৌদি বলে সম্বোধন আজও পর্যন্ত করেনি। ওটা উহ্য রেখে এসেছে। কিন্তু আজ বলতে হলো। না-বলে কোনও উপায় ছিল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলা। যেমন করে চুপ করে বসেছিল তিমির, চন্দনার ডাক শোনার পরেও ঠিক সেই ভাবেই রইলো। তাই চন্দনা আবারও বললো, কি? খেতে আসবে না?

না। প্রায় চিৎকার করে উঠলো তিমির। আমি খাবো না। কবিতাও খাবে না। তিমিরের কথা শুনে চমকে উঠলো কবিতা। তাকালো তাই ওর দিকে। কবিতা এবারে বিছানা ছেড়ে উঠে এলো তিমিরের পাশটিতে। নিচু সুরে বললো, খাবে না কেন? পাগলামো কোরো না।

পাগালামো আমি করছি না। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো তিমির। ব্যস্ত পায়ে দরজা পর্যন্ত একবার এগিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়লো থমকে। ছায়া দেবীর ঘরের দিকে তাকিয়ে একটু জোরেই ডাক দিল মা, একবার শুনে যাও তো। শঙ্কিত হয়ে উঠলো কবিতা। না-জানি তিমির কী কান্ডটাই এই মুহূর্তে করে বসে! শেষে লজ্জার এক শেষ! ভারী বিশ্রী পরিস্থিতিতে পড়লো সে। একটা কিছু না-করে যে তিমির ছাড়বে না, তা ওর মুখ দেখেই অর্থাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারছে কবিতা। ভয় হলো তাই। তিমিরের পাশে এসে একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে ঘেঁষে দাঁড়ালো কবিতা আসলে ওকে সন্তুষ্ট করতে, সহজ করে তুলতে চেষ্টা করলো।

তুমি কিছু বলতে পারবে না মাকে। তিমিরের হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চেপে ধরলো কবিতা। মায়ের এতোটুকু দোষ নেই। মা আমাকে কিছু বলেননি। ছায়া দেবীকে যদি কোনও কথা শোনায় তিমিব, তাহলে কবিতার বড়ো লজ্জা। খুব লাগবে তাহলে। তাই বারবার অনুরোধ করলো ওকে। মিনতি জানালো।

ছায়া দেবী ঘরে আসতেই তিমির ছোট্ট ছেলের নালিশ করার ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে। কেমন করে কথাটা আরম্ভ করবে সে-কথাই ভাবছে তিমির। আর আকুল ভরা চোখে তিমিরেই ঠোঁটের দিকে চেয়ে রয়েছে কবিতা। কি বলে বসে কে জানে!

তরুমাসিমা আর কতোদিন থাকবেন এখানে? অত্যন্ত সোজা, অতিস্পষ্ট এবং কঠিন প্রশ্ন তিমিরের।

দু-তিনদিন থাকবে। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ছায়া দেবী। অবুঝ নন তিনি। বুঝতে পারলেন সবই। তিমির কি যেন একটু ভাবলো। পরে কবিতার উদ্দেশ্যে বললো, তোমার কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। কথাটা শোনার পর ছেলের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকালেন ছাযা দেবী। তিমির খেদ মেশানো সুরে বললো, কবিতা যখন পাঞ্জাবী, তখন তোমাদেব ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রশ্ন আছে। যদিও এটা এতোদিন ছিল না। তাই বলছিলাম, তরুমাসিমা যে-দু'দিন এখানে থাকবেন, আমি কবিতাকে নিয়ে আমাব এক বন্ধুর বাড়িতেই থাকবো। তরুমাসিমা কবিতার ছোঁয়া জিনিস খাবেন না, খুব ভালো কথা। কিন্তু সেটা ওকে এমন গভীর ভাবে বুঝিয়ে দেবার কোনওই প্রয়োজন ছিল না। তুমি তো বাড়িতেই ছিলে, আর এটা তোমার সামনেই হয়েছে। আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এখানেই।

ছায়া দেবীর বলবার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু তিনি বলতে পাবলেন না। বলতে পারলেন না একটি কথাও। কেন-না ব্যাপারটা যে খুব ভালো হয়নি তা তিনি প্রথমেই অনুভব করেছিলেন। নতুন করে বুঝবার আর কিছুই বাকি ছিল না। এমনকী এই কারণে তরুলতার ওপরে একটু অসন্তুষ্টও যে না-হয়েছিলেন, এমন নয়। কিন্তু তিনিও যে নিরুপায়। বাধ্য হয়েই তাকে অবস্থার চাপে নির্বিকাব থাকতে হয়েছে। তিমিরের কথা শুনেও তিনি চুপ করে রইলেন। রইলেন অপরাধীর মতো। সত্যিই, তরুদিটা এমন বাড়াবাড়িই করলো যে...তিমিবকে বাঁধা দিতে পারছেন না ছায়া দেবী। সে-শক্তি হারিযে ফেলেছেন তিনি। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে তবুও বললেন, না-খেয়ে যেতে নেই। দুটি ভাত মুখে দিয়ে.... ছাযা দেবীকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিল তিমির। বললো, এখন খাওয়া-না-খাওয়া দুটোই আমাব কাছে সমান। সুতরাং খেয়ে কোনও লাভ নেই। তুমি যে-কথা কোনও দিনও বলোনি তরুমাসিমা দু'দিনের জন্য এসে সে-কথাই শুনিয়ে দিলেন। অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই অনুমান করতো, তুমিই শিখিয়ে দিযেছ এ-সব! নয়তো তরুমাসিমা এমন সাহস পেতেন না। কিন্তু আমি বাঁকাপথে, বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি নিযে চলি না। আমি ভালো করেই জানি তুমি শিখিয়ে-পড়িয়ে দাওনি। সে-কারণে অভিযোগ করবো না তবে তরুমাসিমার ও-কথার প্রায়শ্চিত্ত করবো না-খেয়ে। সুতরাং খাওয়ার জন্য তুমি আব একটি কথাও বলো না।

ওই দুপুরে কবিতাকে নিয়ে বিজয়ের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল তিমির। পশুপতি ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। দুজন গাড়িতে উঠে বসতেই পশুপতি বললো, বৌদিমণি, ওই বুড়ি চইলা যাইবো দুইডা দিন বাদেই। তারপরে যেন দ্যাখতে পাই তোমাগো দুই জনারে। যদি না-দ্যাখি তয় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে গিয়া রিপোর্টো লিখবো, বাড়ি থিকা ছোটবাবু আর ছোট বৌদিমণি খোয়া গেছে। তোমরা তালাশ কইরা দাও—

বিজয়ের বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা শব্দ করে থামলো। বিজয় বেরুচ্ছিল ক্যামেরা কাঁধে ঝুঁলিয়ে বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে। সময় একেবারেই নেই। ট্যাক্সির দরকার তারও। তাই নিজের বাড়ির কাছে এসে যখন গাড়িটা দাঁড়ালো, তখন নিজের মনকেই প্রশ্ন করে বসলো, কে বলে ভগবান নেই? বিজয় ছুটে গেল ট্যাক্সির কাছে। গাড়ি থেকে ততোক্ষণে পথে নেমে দাঁড়িছে তিমির, কবিতা দুজনেই।

তোরা! মানে বৌদিকে নিযে অসময়ে ....।

তোর কাছেই এসেছি। দিনকয়েক থাকবো।

হুঁ-র-রে! আনন্দে ছোট ছেলেদের মতোই নেচে উঠলো বিজয়। পরে তিমিরের হাতে ঘরের চাবিটা দিয়ে একলাফে ট্যাক্সির মধ্যে গিয়ে উঠে বসলো। কবিতার উদ্দেশে বললো, অভ্যর্থনা জানাতে পারলুম না বৌদি। নিজের বাড়ির মনে করে নিজেই নিজেকে অভ্যর্থনা করুন। প্রচণ্ড তাড়া। আগেই বলে রাখছি, ভদ্রতা করতে পারলুম না। কিছু মনে করবেন না কিন্তু—

—তুই চললি কোথায়? তিমির প্রশ্ন করলো।

"ক্রিস্টফার রোডের একটি ফ্ল্যাটে এক তরুণী খুন হয়েছে। তার স্বামীকেই সন্দেহ করা হচ্ছে। যাই হোক ফটো তুলতে হবে। কয়েক ঘণ্টা পরেই ফিরে আসছি। চলি বৌদি আর হ্যাঁ—ফ্রিজে খাবার-টাবার সবই আছে। পরের বলে না-ভেবে নিজের জিনিস মনে করে খাবেন। কথায় কথায় ট্যাক্সির ভাড়া দেওয়া হয়নি এতোক্ষণ। অবশ্য সে-সুযোগও তিমির পায়নি। এবারে দিতে গিয়েই বাধা পেল। বিজয় বললো ও কি রে? ও-সব ঝুট-ঝামেলা ছাড়। তোর ওই মিটারেই আমি রান করবো। তারপরেই নিচু সুরে কথাটা যোগ করলো, যদিও তা কবিতার কান এড়ালো না, আমার সঙ্গে তোর এই ধরনের শান্তিপুরী ভদ্রতা আর পাকামোর বেয়াড়াপনা দেখলে মনে হয় দিই তোকে শেষ করে। নেহাত বিয়ে করেছিস! আর একটা মানুষকে তাই কাঁদাতে চাই না। নে পালা এখান থেকে—

আশ্চর্য বন্ধুটি তোমার! ভারী ছেলেমানুষ! বিজয়ের ঘরে ঢুকেই কবিতা মন্তব্য করলো।

ও একটা দারুণ ছেলে! কবিতাকে সমর্থন করে তিমির বললো, কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিনসিয়ার। ফাঁকি দেওয়া কি জিনিস তা ও জানে না। তাই অনডিউটি আর অফ ডিউটি বলে ওর কাছে কিছু নেই। খবর পেলেই হলো। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছুটছে। অনেকে ওকে তাই বিজয় পাগলা বলে ডাকে। ও প্রতিবাদ করে বলেছে, কক্ষনও আর বিজয় পাগলা বলে ডাকবে না। তারপরেই একগাল হেসে বলেছে, বলবে বিজয় ফটোগ্রাফার; ফটোগ্রাফীই আমার ধ্যান-জ্ঞান, মান-মর্যাদা, বংশ-পরিচয়। অনেকের টাইটেল তো তরফদার, দফাদার, আমারও না-হয় তেমন হলো বিজয় ফটোগ্রাফার। এতে তোমাদের আপত্তি আছে কিছু? আমরা জানিয়েছি, না। আপত্তি নেই।

তাহা হইলে দয়া করিয়া আমাকে বিজয় ফটোগ্রাফার বলিয়া ডাকিলেই অত্যন্ত খুশি হইবো। এই হলো বিজয়! একটু চুপ করে থেকে তিমির আবার বললো, তোমার সঙ্গে যেদিন মুম্বাই রওনা হই, সেদিন আমাকে আড়ালে ডেকে কি বলেছিল জানো না? গুরু! কবিতাজির পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াও। একটা ছবি তুলে রাখি। আমি বলেছিলাম, ও-সব মতলব ছাড়ো। কবিতা আমাকে নিতান্তই ভদ্রতা করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তোরা এমন শুরু করলে তিনি কি ভাববেন বলতো?

কে কি ভাববে তার মধ্যে আমি নেই। আমি সেখানেই আছি যেখানে গন্ধ পাই। আমি প্রজাপতির গন্ধ পাচ্ছি। সুতরাং বাজে না-বকে পাশাপাশি দাঁড়া। ভবিষ্যতে ছবিটা অনেক কাজ দেবে। তার পরেই না তোমার কাছে ছুটে গেছে। তোমাকে বলেছে একসঙ্গে দাঁড়াতে।

ছবিটা কি কাজ দিয়েছে? চোখে চোখে ঝিলিক তুলে হাসলো কবিতা।

ভীষণ ভাবে দিয়েছে। তিমির নির্মল হাসলো। ছবির মানুষটাকেই একেবারে কাছে এনে দিয়েছে। বলেই তিমির কবিতাকে টেনে নিয়েছে। বুকের মধ্যে এতোটুকু করে জড়িয়ে ধরে গভীর ভাবে আস্তে আস্তে বলেছে, হোটেল থেকে ইনডোর স্টেডিয়ামে তোমাকে রোজ পৌঁছে দিয়েছি, এনেছি, মুম্বাইতে একসঙ্গে থেকেছি, কিন্তু তখনও কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছি...ঘরের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি উঠলো। গভীর নিমগ্নের ছবিটা তুলেই পিছন ফিরে দাঁড়ালো বিজয়। আবেশে তিমিরের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ওর গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কথাগুলি শুনছিল কবিতা। আলোর ঝিলিক উঠতেই ছাড়াছাড়ি হলো চোখের পলকে। কিন্তু ছবি যা ওঠার উঠে গেছে। লজ্জায় রীতিমতো ঘামছে কবিতা। তিমির জিজ্ঞেস করলো, তুই এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলি যে! বিজয় সে-কথাটার উত্তর দিল না। শুধু হাসলো একটু। তারপরেই অত্যন্ত অপরাধীর সুরে বললো, বৌদি! মনে কিছু

করবেন না। অযাচিত ভাবে একটা সুযোগ পেতেই ছবিটা তুলে ফেললাম। ফটোগ্রাফার, রিপোর্টারদের তো জানেন, সুযোগ সন্ধানী তাদের দৃষ্টি। যদিও ছবিটা তোলা আমার উচিত হয়নি, তাই ক্ষমা চাইছি। ছোট ভাই হিসেবে ক্ষমা চাইছি! বৌদি! আন্তরিক ভাবে ডাকলো বিজয়। প্লিজ বৌদি! এইবারটির মতো ক্ষমা করে দিন। একটু সহজে হলো কবিতা। অস্ফুট সুরে বললো, বারবার আপনাকে এমন করে ক্ষমা চাইতে হবে না।

তা নয় বৌদি! আসলে ছবিটা তুলে কিন্তু আমি আনন্দিত। তবে আপনি লজ্জায় ভেঙে পড়েছেন দেখে ভীষণ অনুতপ্ত। দুঃখিত। ক্ষমা চেয়েছি সেই কারণেই। আর আপনাকেও বলি, এতে এতো লজ্জা পাওয়ারই-বা কি আছে? আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা ধমক দিয়ে বলতে পারতেন তো, হতভাগা! বৌদিদের বুঝি এমন করে বিপদে ফেলতে হয়? দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। অনায়াসেই বলতে পারতেন বৌদি। সত্যি আমি তাতে কিছু মনে করতাম না। এখন আপনি যে কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে, তা ভেবেই আমার মন খারাপ লাগছে।

আমি কিছু মনে করিনি। কবিতা শান্ত হাসলো।

কিন্তু মনে করেননি তো? তাহলে বলি, বিজয় শিশুর মতো হাসলো। বললো, একটা প্রবাদ আছে বৌদি যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামনি। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। নইলে এই দেখুন না বিয়ের আগে আপনাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটি ছবি তোলার জন্য কি অনুরোধটাই না তিমিরকে করেছি। সেদিন আমার কথা শোনেনি। আমাকে পাগল-ছাগল বলে তাড়িয়েই দিয়েছিল। এখন তাড়াতে পারলি না কেন? নিজেই ধরা দিলি। আসলে ওই যে বললাম বৌদি, যে তোলে ছবি, তার সামনেই থাকে দৃশ্যের ছড়াছড়ি! বিজয়ের কথাটা উপভোগ করলো তিমির ও কবিতা। দুজনেই একসঙ্গে প্রাণখোলা হাসিতে সারা ঘরখানি ভরিয়ে তুললো। তিমিরের মনে হলো, এমন প্রাণখোলা হাসি সে অনেক দিন হাসেনি।

রাত্রে দুজনকে একই সঙ্গে খেতে দিল কবিতা। বিজয়ের থালা শূন্য হতেই আরও খাবার তুলে দিল সে ওর পাতে। বিজয় আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু তার কোনও কথা শোনেনি কবিতা। খাওয়া শেষ হলে তৃপ্তির হাসি হাসলো বিজয়। কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তাকালো কবিতার দিকে। বললো, সত্যি বৌদি, এমন পেট ভরে, তৃপ্তি সহকারে এর আগে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। একা মানুষ। নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাই। তাও রান্না করতে ভালো জানি না। আলু সিদ্ধ আর ডিম ভাতের ওপর দিয়েই সারাটা বছর চলিয়ে দিই। অথচ আজ যা খেলাম!

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো হলো। কবিতা একটু হেসে বললো, আপনার জিনিস, আপনিই খেলেন।

তা ঠিক। তবে এই যে আপনি রান্না করে, যত্ন করে আসন পেতে খাওয়ালেন— এটার মূল্য আমার কাছে অনেক বৌদি! তার চেয়েও বড়ো হলো আপনাকে বৌদি হিসেবে পাওয়া। আপনাকে বড়ো করে তুলে ধরা নয়, খবরের কাগজে চাকরি করার সুযোগ আমি তো নানা জায়গা ঘুরছি, দেখছি, তাতে শুধু একটি কথাই বলবো, আপনার মতো এমন স্নেহশীলা বৌদি যেন প্রতি ঘরে ঘরে থাকে। বুঝলি তিমির, আমি বলছিলাম বৌদিকে নিয়ে তুই এখানেই থাক। আর তোদের সংসারে আমি না পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকবো।

তোকে পেয়িংগেস্ট হতে হবে না। বরং ঘরে একজন গেষ্ট নিয়ে আয়। বিয়ে কর। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেই ভালো। কবিতা তিমিরকে সমর্থন করলো।

তা হয় না বৌদি! বিয়ে আমি এই যাত্রা আর করলাম না। ঘরে তাহলে দারুণ অশান্তি শুরু হবে। কেন-না আমি বাড়িতে থাকি কতোটুকু সময়? এই আছি, এই নেই। তিন দিনের মাথায় দেখবেন—লজ্জার ভারে অবনত হয়ে এক হাত ঘোমটা টেনে যে মেয়েটি বৌ হয়ে এলো, তারই সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা। অন্য রূপ। একেবারে চামুণ্ডা কালী! গলায় তার যে কটি নরমুণ্ডের মালা থাকবে, তার প্রথমে মুণ্ডুটাই নিশ্চয় জানবেন এই বান্দার! বলেই উত্তাল হেসে উঠলো বিজয়। হাসি

থামলে আবার ও বললো, এই বেশ আছি বুঝলেন বৌদি!

বিয়ে করবেন না, তাই ও-সব বানিয়ে বানিয়ে বললেন। আসলে বাঙালি মেয়েরা মোটেই অমন নয়। তাদের ধৈর্য, সহনশীলতা অনেক বেশি। ধীর-স্থির বুদ্ধির কোনও তুলনাই হয় না! তারা সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে।

দাঁড়ান—দাঁড়ান বৌদি। বিস্ময় প্রকাশ করে বিজয় বললো, আপনার ধারণাটুকু ভেঙে দেবার অভিপ্রায় আমার বিন্দুমাত্র নেই। তবে যা বললেন, তেমন রত্ন খুঁজে পাওয়া এই ডামাডোলের বাজারে অতো সহজ নয়। আলাপ হোক দু-একটা স্যাম্পেলের সঙ্গে, বুঝবেন তখন। হঠাৎ মনে পড়ে যাওযার ভঙ্গিতে বিজয় বলে উঠলো, আরে অতো দূরে যেতে হবে কেন? আপনাদের ওই তরু মাসিমাকেই দেখুন না, তিমিরের মুখে তো সবই শুনলাম। এই বুড়ি বয়সেও যে এতোখানি জ্বালাতে পারে, বয়সের সময়ে যে তার স্বামীর মাথাটা মুড়োর মতো চিবোয়নি—এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? তাই বলছি, আর যাই করুন বিয়ের সুপারিশ করবেন না—বেশ শান্তিতে আছি বৌদি!

রাত্রিবেলা শোবার সময়েই জায়গার অভাব হলো। কেন-না বিজয়ের ঘর মাত্র একটি। কিন্তু এতো কিছু চিন্তা করলো না বিজয়। দিব্যি সে এর সমাধান করে দিল। মাদুর, চাদর আর একটি বালিশ নিয়ে সে বারান্দায় গেল। অর্থাৎ ঘরে শোবে কবিতা ও তিমির। এটা কিন্তু পছন্দ হলো না তিমিরের। যদিও বিজয় তার ডিউটি করেছে। কিন্তু তিমিরের তো ভদ্রতা বোধ আছে। সে বললো, এটা কেমন হলো? তোর বাড়ি, আর তুই কি-না বাইরে। আমি বলছি, কবিতা ঘরে থাক। তুই আর আমি বাইরে শোবো।

পাকামো একটু কম কম করিস। ধমকে উঠলো বিজয়। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ভদ্রতার? যা-যা ঘরে যা! জোর করে বিজয় তিমিরকে ঘরের ভেতর ঠেলে দেয়। বলে, বৌদিকে একা ফেলে আমার কাছে শুবি, এমন জংলীর মতো কথা বলিস কি করে?

বিজয়ের কাছে মাত্র চারটি দিন ছিল ওরা। ইচ্ছে করেই তিমির দুটো দিন বেশি থেকেছে। কি জানি তরুমাসিমা যদি দু'দিনের মাথায় না-গিয়ে থাকে। এই কারণেই আরও দুটো দিন হাতে নিয়েছে। ওরা চলে আসবার সময়ে সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হয়েছে বিজয়ের। এই চারটে দিন বেশ সুখেই ছিল সে। মা, দিদি, বোন, বৌদি সবার একত্রিত স্নেহ-ভালোবাসা বিজয় কবিতার একার কাছ থেকেই পেয়েছে। সে-কথাই সে বললো, স্নেহের মূল্য এতোদিন বুঝতাম না। এই ক'দিনে আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার মূল্য আমার কাছে সব মূল্যবান জিনিসেরও ওপরে। সত্যি বৌদি, আপনারা চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এরপরে এই মরুভূমি দিনগুলি কাটাতে আমার ভারী কষ্ট হবে। হাসতে হাসতে কবিতা উত্তর দিয়েছে, আর একটু কষ্ট করে না-হয় বৌদির বাড়িতেই যাবেন। কষ্ট দূর করে দেবো। বিজয় একটি বড়ো আকারের খাম তিমিরের হাতে দিয়ে বললো, তোদের ছবিটা। নেগেটিভটাও সঙ্গে আছে। বৌদিকে সারা জীবন এমন ভাবে সুখে রাখিস, এই কামনা করি। আচ্ছা বৌদি নমস্কার। বিজয় হাত দুটি বুকের ওপর এক করে বললো, আবার দেখা হবে—

নিশ্চয়ই। কবিতা পরম আন্তরিকতার সুরে দৃপ্ত ভাবে বললো।

তরুমাসিমা চলে গেছে। কবিতা আর তিমির ট্যাক্সি থেকে নামতেই সে-খবর প্রথমেই জানিয়ে দিল পশুপতি। তিমিরকে আরও জানালো, এমন বুড়ি আর দুইডা আইলেই কাম সারছিল আর কি! এমন শুচিবাই মাইয়ামানুষের পাল্লায় পইড়া খাটিতে-খাটতে আমার জেবনডা কালা- কালা হইয়া গেছে এই দুইডা দিনেই। উঃ কি ভোগানটাই-না-ভোগাইয়া গেল। আর রাতদিন বকর বকর কইরা ছোট বৌদিমণির নামে উল্টাসিধা একগাদা কথাই কইছে।

কি বলেছে রে? এ-সব আলোচনা পশুপতির সঙ্গে করা উচিত নয়। তা তিমির জানে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম কৌতূহল তা তো একটু থাকবেই।

কইতেছিল, অমন নাচন-কুঁদন মাইয়া লইয়া ঘর করোন ঠিক কামের কাম নয়। তাতে সংসারে আগুন লাগবো। সেই আগুনে বেবাক কিছু পুইড়া ছারখার হইয়া যাইবো। আমি কিন্তু ছোটবাবু

হক কথা শুনাইয়া দিছি। ছোট বৌদিমণিব নিন্দাটা আর সহ্য করতে পারলাম না। বুড়ি যখন বড়ো-বৌদিমণির লগে এই সব কইতেছিল, তখন আমি পষ্ট কইয়া ফেললাম, ছোট বৌদিমণি সংসারে আগুন লাগাবো ক্যান? আগুন লাগাইতে আইছেন আপনে। এই দ্যাখেন না—আপনে এই বাড়িতে আসার লগে লগেই ছোট বৌদিমণিবে তাড়াইছেন। তাইলে আগুন লাগাইলো কেডা? আক্ষেপের সুরে পশুপতি আরও বললো, ওই পষ্ট কথা কওনই আমার কাল হইলো ছোটবাবু। ত্যালের মইধ্যে বেইগুন পড়ার মতো লাফাইয়া উঠলো বুড়ি, চাকর চাকরের মতো থাকতে পারোস না? হারামজাদা তোর মুখ যেন পইচা-গইলা খইসা পড়ে। তারপরেই আস্তে আস্তে পশুপতি কান্নাভেজা গলায় বলেছে, চাকর আমি ঠিক কথা। কিন্তু ছোট বৌদিমণির নামে মিছামিছি নিন্দা করবে, সব কিছু জাইন্যা ক্যামন কইরা আমি চুপ থাকি?

আজ সকালে অফিসে যাবে না তিমির। দুপুরে যাবে। তাই ভোরবেলা আর বিছানা ছেড়ে উঠলো না। শুয়ে শুয়েই তিন-চার কাপ চা খেলো। সেদিনেব পত্রিকাটাও পড়লো। পড়া শেষে পত্রিকাটা টেবিলে রাখতে গিয়ে দেখলো, গত কয়েক দিনের পত্রিকাগুলি ভিড় করে জমে আছে। আর ওরই মধ্যেকার একটি পত্রিকার বুক চিরে নৃত্যরত অবস্থায় কবিতার একটি বিশেষ ভঙ্গিমার ছবি উঁকি দিচ্ছে। বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সে নাচবার পরের দিনেব পত্রিকা ওটা। সযত্নে কাগজটা তুলে নিয়ে নতুন দৃষ্টিতে কবিতাকে দেখতে থাকে তিমিব। এর আগে ওই ছবিটা বহুবার দেখেছে সে। তবুও নিজের ক্ষমতাময়ী স্ত্রীব ছবি দেখতে যেন এতোটুকু ক্লান্তি নেই। বহুবার দেখেও সাধ মেটে না। তাই তো বারবার দেখতে ইচ্ছা করে। কবিতা ঘরে এলে তিমিব অভিযোগের সুরে বললো, আচ্ছা, পত্রিকাটা যত্ন করে তুলে রাখতে পাবো না?

কেন, কি আছে ওতে? বলতে বলতে তিমিবের পাশে এসে দাঁড়ালো কবিতা। দেখলো, নিজের ছবিখানা। পবে বললো, আহা, এইজন্যে বুঝি—কথা শেষ হলো না। ঘরের ভেতব ঢুকে পড়লো পশুপতি।

ছোটবাবু তোমারে বড়োবাবু ডাকতিছে।

সুবীরের ঘব থেকে বেরুলো তিমির বেশ কিছুক্ষণ পরে। সময় কম তাড়াহুড়ো করে স্নান-খাওয়া সেরেই উল্টো করে শার্ট গায়ে চড়ালো, কবিতা ভুল ধরিয়ে দিলে তিমির শার্টটা খুলে আবার সোজা ভাবে পড়লো। এক্ষুনি ছুটতে হবে অফিসে। ছোটা আর ছোটা। জীবনটাই যেন সময়ের সঙ্গে পা চালিয়ে ছুটে চলেছে। একটু এদিকে-ওদিক হলেই সব কিছু গন্ডগোল। তিমিরকে কোট পরিয়ে দিয়ে কবিতা জিজ্ঞেস করলো, বড়দা তোমাকে ডেকেছিলেন কেন?

ও, চন্দনার একটা বিয়ের ব্যাপাবে।

দুপুরের খাওযা-দাওয়ার পর একটু গড়িয়েছিল কবিতা। সেই ঘুম ভাঙলো শেষ বিকেলে। রোদের তেজ তখন একেবারেই নেই। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সূর্য ডুব দিয়েছে। শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো কবিতা। অনেক ঘুমিয়েছে আজ। বালিশ দুটো বিছানার ওপরে ঠিক করে সাজিয়ে রেখে কুঁচকানো বেড-কভারটা টানটান করে মেলে দিল। পরে চিরুনি আর ফিতে নিয়ে রাস্তার দিকের জানলার পাশে গিয়ে বসলো। চুল বাঁধতে বাঁধতে তাকালো বাগানের দিকে। দুপুরের কঠিন রোদের তাপে ম্রিয়মান হয়েছিল গাছগুলি। শোকের সেই বিশাদ চিহ্ন এখন আব নেই। ঝরঝরে সতেজ ভাব মিশে রয়েছে ওদের অঙ্গে অঙ্গে। মাধবীলতা গাছটি বড়ো হয়ে কবিতার ঘরের জানলার কাছে প্রায় এসে গেছে। সন্ধে নামলে বেশ মিষ্টি গন্ধে ভরে যায় তার ঘব। চুল বেঁধে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে আসে কবিতা। ফর্সা শাড়িটা পড়ে সামান্য একটু প্রসাধন করে নেয় নিজেকে সাজাতে।

পশুপতি চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। একগাল হেসে বললো, ছোট বৌদিমণি তোমার চা।

তুমি আবার আনতে গেলে কেন পশুপতি? আমিই তো যাচ্ছিলাম—

তাতে কি হইছে বৌদিমণি, আপনে খায়েন। পশুপতির হাত থেকে চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে কবিতা জিজ্ঞেস করলো, আসলে ওর সঙ্গে একটু গল্প করার মেজাজে বললো, তোমার ছোটবাবু

বুঝি তোমাকে ডাকেন......কবিতাকে থামিয়ে দিয়ে পশুপতি বলে উঠলো, পশু বইলা ডাকেন। পশুপতি থিকা পশু হইছি। আর কয়েন কেন বৌদিমণি—একগাল হাসলো সে। আমি তো তবু ভালো আছি। পশু-বিশু তো মানুষেরই নাম হয়। আমাগো গেরামের একটা ছাওয়ালের নাম শোনবেন? তার নাম হইলে গিয়া আনোয়ার। কিন্তু তারও ওই আমাবই মতোন অবস্থা। আনোয়ার থিকা সে হইছে জানোয়ার। ওই বাড়ির বাবুরা নাকি কইছে আনোয়ার বইলা ডাকতে তাগো অসুবিধা হয়। তাই সুবিধা কইবা ডাকে জানোয়ার। আনোয়ার রাইগা যায়। কিন্তু বাবুগো ওপর তো কবণের কিছু নাই। তাই আমাগো কাছে আইসা কয়, ও-সব পাগলের সাড়া দিতে নাই।

তোমার ছোটবাবুকেও বলে দেবো, তোমাকে যেন পশু বলে না-ডাকেন! কবিতা হাসি মেখে কথাটা বললো।

না, বৌদিমণি না! যেন আঘাত পেয়েছে পশুপতি। করুণ সুরে বললো, আমি আনোয়ার না যে বাবুর ওপর বাগ করুম। ছোটবাবু আমাবে খুব ভালোবাসে। সেই জন্যি তো আমারে আদব কইরা পশু বইলা ডাকে।

তিমির এলো অফিস থেকে। ছোটবাবু এখন বিশ্রাম করবে। বৌদিমণির সঙ্গে গল্প করবে। সুতরাং এই মুহূর্তে সেখানে থাকা আর ঠিক নয়। পশুপতি তা বোঝে। আব বোঝে বলেই তিমিরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল। পশুপতি চলে যেতেই কবিতার হাতের চায়ের কাপটি তুলে নিল তিমিব। চুমুক বসাবার আগে বললো, এখন চা-টা দারুণ জমবে।

ওটা খেয়ো না। আমার মুখের—কবিতার কথা শুনে মুখোমুখি দাঁড়ালো তিমির। তাকালো ওর চোখের দিকে। স্থির নেত্রে। রসহ্য ভরা সুরে নিচু গলায় বললো, মুখের? তাবপরেই দু'চুমুকে চা-টুকু শেষ করে বললো, মুখের চায়ের 'টেষ্ট'ই আলাদা।

জামা আর গেঞ্জিটা খুলে তিমির কবিতাব হাতে দিয়ে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলো। কবিতা ও-দুটো ভাঁজ করে আলনায় সাজিয়ে রেখে ইজিচেযারের প্রশস্ত হাতলের ওপর এসে বসলো। তাকিযে রইলো তিমিরেব বুকের দিকে। তিমিরও লক্ষ্য করলো তা। পরে এক সময় হাসতে হাসতে বললো, লোকে মুখ দেখে কিন্তু তুমি দেখছো বুক দেখছো কি ব্যাপার বলতো?

কিছু না, ছন্দ তুলে হাসলো কবিতা। এমনিই দেখছিলাম তাবপরেই ভাঙলো আসল কথা। এই বুকেই মাথা গুঁজতে গিয়ে তোমার বন্ধুর ক্যামেবায ধরা পড়েছি। বিজয়বাবু এলে আর তোমার ধারে-কাছে এসে দাঁড়াচ্ছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে।

ছায়া দেবীর মাসতুতো বোন শেফালীর সেজমেযেব বিয়ে। শেফালী নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গেছে। বারবার করে বলে গেছে, ছেলে-মেয়ে, বৌদের এমনকী পশুপতি পর্যন্ত সবাইকেই নিয়ে যেন ছায়া দেবী যান কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুই ছেলেব একজনও যেতে পারছে না। সুবীরের নাইট ডিউটি! আর তিমির বলছে, ওর শরীরটা ভালো নয। সেই কাবণেই সে যাবে না।

বুকের ওপর জার্নালিজমের একখানা বই রেখে শুয়েছিল তিমির। পাশে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প করছিল কবিতা। ওদের ঘরেতে ছায়া দেবী ঢুকলেন। ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে মাথায় ঘামটা টেনে দিল কবিতা।

খাট থেকে নেমে সরে দাঁড়ালো কোণে। আড়চোখে একবার ছায়া দেবীকে দেখে পরক্ষণে দৃষ্টি নামালো মেঝের দিকে।

কি রে তুই যাবি না?

বলেছি তো আমার শরীর ভালো নয়।

বারবার শেফালীটা বলে গেল। সুধীর যেতে পারছে না। তুইও বলছিস যাবি না।

কি করবো বলো? শরীর ভালো থাকলে যেতাম।

তা বৌমা তুমি তো যাবে। এখনও তো দেখছি কিছুই করোনি। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নাও। কবিতাকে নির্দেশ দিলেন ছায়া দেবী। কিন্তু তার যাওযাতেও বাধ সাধলো তিমির। স্পষ্ট

ভাবে মাকে বললো, কবিতা যাবে না।

কেন?

কেন ওকে যেতে বারণ করছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। ওকে বাদ দিয়েই তোমরা যাও।

তোর এ-ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমি আর রাজি নই। নিজের অধিকার প্রয়োগ করলেন ছায়া দেবী। তবে এটা বুঝলেন, তিমির কেন কবিতাকে যেতে বারণ করছে। কিন্তু সমাজে বাস করতে হলে সামাজিক ভদ্রতায় উৎসবে-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবেই। আর ছোট বৌমাকে ফেলে রেখে বড়োবৌমা ও মেয়েকে নিয়েই-বা তিনি কেমন করে বিয়ে বাড়িতে যান? সেটা আরও খারাপ দেখায়। গেলে সকলেরই যাওয়া উচিত। নয়তো কেউই নয। সেই কারণেই ছায়া দেবী আদেশের সুরে বললেন, তুমি তৈরি হয়ে নাও বৌমা—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। বলেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ছায়া দেবী। কারও উত্তর শোনার অপেক্ষায় রইলেন না।

বিয়ে বাড়িতে যাও আমার আপত্তি নেই। তিমির কবিতাকে সাবধান করে দিল, তবে ফিরে এসে কান্নাকাটি করতে পারবে না।

কান্নাকাটি কেন? না-বুঝতে পেরে বলে উঠলো কবিতা। সরল দৃষ্টিতে চেয়েই রইলো তিমিরের দিকে। তিমির উত্তর দিল না দেখে কবিতা আবার বললো, কই বললে না তো।

বলার কিছু নেই। ওখানে গেলেই বুঝবে।

তুমি তাহলে সেখানে না-গিয়ে আগে থেকেই কেমন করে বুঝলে? কবিতাই উল্টে প্রশ্ন করলো।

বয়েসটা তোমার থেকে আমার বেশি। সেই অভিজ্ঞতায় বুঝলাম।

প্রসাধন সেরে, তিমিরের দিকে পিছন ফিরে বেনারসী শাড়িটা পড়লো কবিতা। তিমির কবিতাব দিকে চেয়ে রইলো। আশ্চর্য সুঠাম আর দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা। লম্বায় প্রায় তিমিরেই কাছাকাছি। অদ্ভুত ছন্দে ওর দেহলতা ঠাসবুনোনের মতো বাঁধা। বারান্দা থেকে ছায়া দেবী তাড়া দিলেন, কই হলো ছোট বৌমা?

যাচ্ছি মা। ব্যস্ত সুরে শাড়ির কুচির অংশ পাতলা মেদশূন্য কোমরে গুঁজতে গুঁজতে উত্তর দিল কবিতা।

একটু তাড়াতাড়ি করো।

কবিতার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তিমির। গোলাপী রঙের শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে ওর গায়ের রংটুকু একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তিমির কথা না-বলে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে ওকে দেখে। গোলাপ সজ্জিতা কবিতাকে। তারই স্ত্রীকে। কবিতাকে এই ভাবেই চুরি করে দেখার মধ্যে যেন বিরাট আনন্দ লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে নিদারুণ রহস্য। এ-যেন তিমির তার স্ত্রীকে দেখছে না। দেখছে তার প্রেমাস্পদকে। তিমির বললো, আমার কিন্তু ভারী আফসোস হচ্ছে।

কীসের?

এই যে তুমি আজকে সেজেছো! তিমির ক্ষীণ হাসলো।

তাতে কি? কবিতা বুঝে উঠতে পারছে না, কি বলতে চাইছে তিমির।

কই, বিয়ের দিন তো এতো সুন্দর করে সাজোনি?

ও হরি! তুমি বুঝি শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ এই সব ভাবছিলে! বুঝেছি--নীচের ঠোঁটটি সামান্য কামড়ে ধরে চাপা হাসলো কবিতা। আসলে তোমার আবার একটা বিয়ে করতে ইচ্ছা হচ্ছে। নয়তো বিয়ের দিন বন্ধুরা, বৌদিরা আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। সব কিছু তুমি এখন ভুলে যাচ্ছো! তাই মনে পড়ছে না। খাট থেকে নেমে এলো তিমির। কবিতার দেহের সুবাসটুকু গ্রহণ করে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, এই মেয়েটাকেই আবার বিয়ে করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ছোট বৌমা! বাইরে থেকে ছায়া দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এই যে যাচ্ছি মা—প্রায় ছুটেই দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল কবিতা। পরে আবার ফিরে এলো

তিমিরের পাশে। ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে নিচু গলায় বললো, ফিরে না-আসা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ো না কিন্তু। কেমন?

তিমিরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ততোক্ষণে ওরা নীচে নেমে গেছে।

মা, স্বাতীবৌদি, চন্দনা, কবিতা আর পশুপতি। তিমির ওদের দিকে চেয়ে থাকে। একই পরিবারের কতো ঘনিষ্ঠ, নিকটতম ওরা। অথচ মনে-প্রাণে একজন অন্যজনের থেকে কতো পৃথক! বাইরে থেকে এ-সব অবশ্য বুঝবার কোনও উপায়ই নেই। মা তবু আজকাল কবিতাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু স্বাতীবৌদি আর চন্দনা বড়বেশি বিমুখ। ওরা কবিতাকে মেনে নিতে নারাজ। অন্তরেব এই বিরোধ তিমিরের চোখ এড়ায়নি। স্বাতীবৌদির কথাবার্তা, হাঁটাচলা আচার ব্যবহার দেখলে স্পষ্টই মনে হয়, কবিতাকে সে আমল দিতে চায় না। চায় না প্রশ্রয় দিতে। কবিতা যেন এই সংসারে ভেসে এসেছে। তার কোনও মূল্য নেই। স্বাতীবৌদিই সর্বেসর্বা। কবিতাকে সে কি মনে করে? বাইরের একজন অবহেলিত মানুষ? স্বাতীবৌদির সঙ্গে তিমির কথা বলে না। নয়তো বুঝিয়ে বলতো তার মতো কবিতাও এই সংসারে প্রতিষ্ঠিত। স্বাতীবৌদির যেটুকু আদর, স্বাধীনতা, সেটুকু কবিতারও প্রাপ্য। কবিতা এখানে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত নয়। সে কেন তবে এতো অনাদব সহ্য কববে? কিন্তু বিস্ময় জাগে তিমিরের। কবিতা সমস্ত কিছুই নীরবে সহ্য করছে। তবে এটা ঠিক, অন্য কেউ হলে এতো অপমান কিছুতেই সহ্য করতো না। মুখ বুজে নীরবে বিষ পান করে কবিতা নীলকণ্ঠ হচ্ছে। ওব কাছে তাই মাঝে-মাঝে মুখ দেখাতেও লজ্জা হয় তিমিরের। একমাত্র তিমিবেব জন্যই তো মেয়েটা এতো কিছু সহ্য করছে? অথচ সে তার কতোটুকু মূল্য দিতে পারছে? কিছুই নয়। আরও আশ্চর্য লাগে, এতো নিষ্ঠুবতা যেন গায়েই মাখে না কবিতা। মাখতে চায়ও না। মান-অপমান ভুলে গেছে। মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও, এতোটুকু ক্ষুণ্ণ না-হয়ে, পরদিনই আবার শুচিশুভ্র বেশে মাকে প্রণাম করতে গেছে। অন্য মেয়ে হলে এতো সহজে এই কাজটুকু করতে পারত কি-না সে-বিষয়ে তিমিরের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্য দিয়ে তিমিব দেখতে পেল, কবিতার আন্তরিকতা, মাকে ভালোবাসার আর শ্রদ্ধাভক্তি কববাব অপূর্ব এক উদাহরণ। সত্যি কথা বলতে কি, কবিতার মতো এতোটা বোধ করি তিমিবও করতে পারেনি। এই অল্প ক'দিনেই কবিতা মাকে আপন করে নিয়েছে। যেন ছায়া দেবী তার শাশুড়ী নয়—নিজেরই মা।

রাত প্রায় এগারোটা বাজলো। ওরা কখন আসবে কে জানে? বিয়ে বাড়িতে গেছে—সুতরাং দেরি একটু হবেই। এরমধ্যেই ট্যাক্সি থামার শব্দ হলো। জানলা দিয়েই দেখতে পেল, ওরা ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে তিমির জার্নালিজমের বইটা বুকে চেপে চোখ বুজে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। যেন পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হাসি মুখে ঘরে ঢুকলো কবিতা। সে আশা করেছিল তিমির জেগে থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলো, তার উল্টো। মানুষটা দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। ভ্রূ কুঁচকে তাই কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো ঘুমন্ত তিমিরের দিকে। পরে ওকে নাড়া দিয়ে বললো, এই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এতো করে বলে গেলাম তবুও শুনলে না আমার কথা। আর শোবার ধরনটা একবাব দেখো না, মাথার বালিশ মাথার তলাতেই নেই। বালিশ দুটো সাজিয়ে তিমিরের মাথাটা দু'হাতে তুলে নামিয়ে দিল। ঘুমের যাতে এতোটুকু অসুবিধা না-হয়। বুকের ওপর থেকে সন্তর্পণে তিমিরের হাত-দুটি নামিয়ে বইটাকে মুক্ত করলো। বললো, বইটাকে কেমন মানুষ চাপা চেপেছে দেখো—

দরজা বন্ধ করে দিয়ে উজ্জ্বল আলোটা নেভালো কবিতা। জ্বালালো হালকা নীল বাল্‌বের ম্লান আলো। নীল আকাশটা বুঝি নেমে এলো ঘরের মধ্যে। একেবারে অন্ধকার ঘরে কোনোদিনই ঘুমাতে পারে না কবিতা। কেমন যেন ওর ভয় করে। ছমছম করে শরীর। তাই সারা রাত এই ম্লান আলো জ্বলে। যদিও সে-আলোয় ঘর আলোকিত হয় না, তা অন্ধকারেই নামান্তর। তবুও ওটা জ্বলার মধ্যে কবিতা একটু সাহস খুঁজে পায়।

অলঙ্কারগুলি একে একে খুলে রাখলো সে। শাড়ি ব্লাউজ কিছুই ছাড়লো না। ওই কাপড়েই শুয়ে পড়লো তিমিরের পাশে। ওর দিকে একবার চেয়ে পাশ ফিরে ঘুমাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুমাতে পারলো না। বুকের ওপর তিমিরের হাতটা নেমে এলো। ঘুমালে নাকি? তিমিরের কথা শুনে বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো কবিতা। পাশ ফিরলো তাই সঙ্গে সঙ্গে। ম্লান আলোয় তীক্ষ্ণ নজর রাখলো তিমিরের চোখের দিকে। মানুষটা চেয়ে আছে।

তুমি জেগে? এর বেশি আর কিছু বলতে পারলো না কবিতা।

সারাক্ষণই তো জেগে রয়েছি।

বাব্বা কি সাঙ্ঘাতিক মানুষ তুমি! জেগে থেকেও ঘুমের ভান করে এতোক্ষণ থাকতে পারো? আমি হলে কিন্তু কিছুতেই পারতাম না। যদিও-বা পারতাম, তা নিতান্তই অল্প সময়ের জন্য। তোমার মতো এতো নয়। কথাটা শেষ করেই খুশিতে হাসলো কবিতা। উজ্জ্বল হাসি। তিমির বুঝলো, কোনও অঘটন ঘটেনি। অন্তত ঘটলে অফুরন্ত খুশির হাসি হাসতে পারতো না কবিতা। তিমির তাই সন্তুষ্ট হলো মনে মনে। তার স্ত্রী পাঞ্জাবী বলে বিয়ে বাড়িতে কবিতাকে কেউ কথা শোনায়নি। বড়ো ভাবনায় ছিল তিমির। নিশ্চিন্ত হলো সে। দুশ্চিন্তার পাথরটা নেমে গেল বুক থেকে। যেন বিরাট বরফ খন্ডটা মুহূর্তে জল হয়ে গলে গেল। তবুও একবার জিজ্ঞেস করলো, এখানে তোমাকে কেউ কিছু বলেনি তো?

হ্যাঁ, বলেছিল। কিন্তু জানো, মা তাকে এমন কথা শুনিয়ে দিলেন যে শেষে আমার সঙ্গে তার ভাবই হয়ে গেল। জলতরঙ্গের মতো হেসে উঠলো কবিতা।

বলো কি! তোমার হয়ে মা তাকে কথা শুনিয়েছেন? বিস্ময় প্রকাশ করলো তিমির। আসলে কবিতার মুখ থেকে ঘটনাটা জানতে চায়। সেই কারণেই ওই ভাবে জিজ্ঞেস করা।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ছায়া দেবীর এক পিসিমাকে নিয়ে। মেয়ে এবং দুই বৌকে প্রণাম করবার নির্দেশ দিলেন ছায়া দেবী। সবশেষে প্রণাম করল কবিতা। পিসিমা বললেন, এই বুঝি তোর অবাঙালি-বৌ? কথাটা শুনেই মাথা নিচু করলো কবিতা। মুখটাও হলো পান্ডুর! এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করলেন ছায়া দেবী। পিসিমার ওপর তিনি রেগেই গেলেন। তার বৌ অবাঙালি হোক আর সিংহলীই হোক তাতে ওদের কি? এটা ছায়াদেবীর নিজস্ব ব্যাপার। তাছাড়া পিসিমার বুদ্ধিটাই-বা কেমন? কবিতার সামনেই কি তার ওই ধরনের কথা বলা উচিত হয়েছে? হোক কবিতা অবাঙালি। তার ছেলের বৌ-তো। সুতরাং ছায়াদেবীর লাগলো। একবার তিনি যে ভুল করেছেন, দ্বিতীয়বার আর সে-ভুল করলেন না। তরুদি তবুও যাহোক আঘাতের মধ্য দিয়ে একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কবিতা তার আপনজন। স্নেহের জন। ছায়া দেবীর লাগল বই-কী। তাই তিনি পিসিমাকে কথা শোনাতে ছাড়লেন না। হাসতে হাসতেই বললেন, অবাঙালি আর বাঙালি কি পিসিমা? আমার ছেলের বৌ সে। বৌদের কি আলাদা জাত আছে?

আমি সে-কথা বলছি না রে, পিসিমা বললেন, বলছি বাংলা কথাবার্তা বলতে-টলতে পারে তো? আমি তো ও-সব বুঝতেই পারি না বাপু—কেয়া করতা হ্যায়। খাতা হ্যায়, যাতা হ্যায়। তাই বলেছিলাম—

সুরেতে প্রচ্ছন্ন রাগ মিশিয়ে ছায়া দেবী বললেন, ছোট বৌমা, তোমার পিসি-শাশুড়ীকে একটু বাংলা শুনিয়ে দাও তো।

ওমা! তুমি বাংলা বলতে পারো বুঝি? হাসলেন পিসিমা। পরে তো কবিতার সঙ্গে ভাবই করে বসলেন। বললেন, জানো নাচ-গানে আমার তেমন শখ-আহ্লাদ নেই। তবে আমার ছেলে-মেয়ে আর বৌমারা যাকে বলে এককথায় নাচ পাগল। আমার ছোট মেয়ে মিলি তো নাচের স্কুলে ভর্তিই হয়ে গেছে। আর টাকা কি কম যাচ্ছে? কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় ফাংসান। প্রত্যেকটি ফাংসানেই ওদের যেতে হবে। দেখতে হবে। এই যে তুমি চিত্রাঙ্গদা না কি নাচলে, কি বলবো মা, নীচের দিকের টিকিট না-পেয়ে আমার বড়ো ছেলে তো পঁচিশ টাকা দামের চারখানা টিকিটই কেটে বসলো।

তাও পাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত তিমিরই জোগাড় করে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সংসারে অতোগুলি টাকা বেরিয়ে গেল তবুও নাচ দেখা চাই। এবারে কিন্তু আর টিকিট কাটবো না বৌমা, তা বলে রাখছি আগে থেকেই। অমায়িক হাসলেন পিসিমা। পিসিমার সতের বছরের ছোট মেয়ে মিলি এসে পড়লো। রংটাই শুধু ফর্সা। চেহারায় কোনও জৌলুষ নেই। ডল পুতুলের মতো মোটা চেহারা। কবিতার সান্নিধ্যে নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করলো। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে তার চোখ-মুখ।

খুশির চপলতায় মিলির চোখ দুটি ঝিকমিক করছে। স্থির থাকতে পারলো না সে। শেষ পর্যন্ত বলেই বসলো, আমাকে কিন্তু নাচ শেখাতে হবে। কথাটা শুনলো পশুপতি। সে সামনেই ছিল। দেখলো মিলিকে। এই মোটা দেহ নিয়ে মিলির পক্ষে নাচা তো দূরের কথা, গান গাওয়াও সম্ভব নয়। দুটো কথা বলতেই যে-মেয়ে দশতলা বাড়ির সিঁড়ি ভাঙার মতো হাঁপিয়ে ওঠে সে কেমন করে নাচবে? অসম্ভব। তাই সে সরল মনেই বললো, হক কথা কই মিলিদিদি, মনে কিছুই কইরো না! তোমার দ্বারা নাচন হইবো না। বৌদিমণির মতো ঠ্যাং কাঁপাইতেই তুমি পারবা না।

শান্ত জলের মধ্যে টুপ করে ঢিল পড়ার মতো তরঙ্গায়িত হলো। তিমিরের মন-সমুদ্র। রাতের এই স্তব্ধ পরিবেশে, সে ছায়া দেবীর কথাই ভাবছে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় এই মুহূর্তে মাথাটা নত হয়ে এলো। এতো পালটে গেছেন মা? কবিতাকে তিনি এতোটা আপন করে কাছে টেনে নিয়েছেন? কই তিমির তো একটিবারের জন্যও জানতে বা বুঝতে পারেনি। এই মা-ই একদিন অপ্রস্তুত করেছিলেন কবিতাকে, আবার আজকে তিনি কবিতাকে কাছে টেনে নিয়ে রক্ষা করলেন পিসিমার অপমানের হাত থেকে। অথচ এই সেদিনও মা কি ব্যবহারটাই-না করলেন! বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে নাচবার পরের দিন। পারিশ্রমিক বাবদ পুরো টাকাটা নিয়েই কবিতা উপস্থিত হয়েছিল ছায়া দেবীর ঘরে ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন ছায়া দেবী। বলেছিলেন, তোমার ওই নাচের পয়সা আমি নেবো তা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে? উত্তরে সেদিন অনেক কিছুই বলার ছিল কবিতার। তিমিরেরও। তিমির বলতেও যাচ্ছিলো, কিন্তু ওকে বাঁধা দিয়েছিল কবিতা। তবে মনে মনে বলেছিল নাচের পয়সার মধ্যে আপনি পাপটা কোথায় দেখলেন মা, যে সেই পয়সা আপনি গ্রহণ করতেও পারলেন না। যার-যার নিজস্ব গুণে, নিজস্ব ক্ষমতায় অর্থ উপার্জন করে। অবশ্য এরমধ্যে যে ভালো-মন্দ নেই তা নয়। তবে খেলোয়াড় খেলে পয়সা উপার্জন করবে, গায়ক গান গেয়ে, লেখক বই লিখে, নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে—এরমধ্যে পাপের চিহ্ন কোথায়? ছায়া দেবী কিন্তু ওখানেই থামেননি। আরও বলেছিলেন, বাইরে-বাইরে তুমি নাচ দেখিয়ে পয়সা উপায় করবে, আর সেই পয়সা নেবো আমি? এমন জঘন্য প্রবৃত্তি যেন আমার না-হয়।

তিমির ভাবে আর অবাক হয়। সেই মা এতো পালটে গেছেন। তবে কি তিনি কবিতাকে ভালোবেসেই ফেললেন। কি জানি!

সেদিন বিকেলের আগে থেকেই সাজতে বসলো চন্দনা। সঙ্গে স্বাতীবৌদি। তা দেখেই ছায়া দেবী মেয়েকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ রে তোরা যাচ্ছিস নাকি কোথাও?

সিনেমায়।

কে কে যাচ্ছিস?

বড়ো বৌদি আর আমি। পাউডারের পাফ্‌টা গালে বোলাতে বোলাতে চন্দনা উত্তর দিল।

তা ছোটো বৌমা কি দোষ করলো? অত্যন্ত সহজ আক্রমণ করে ছায়া দেবী বললেন, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যা।

দুটো টিকিটে তিনজন যাবো কেমন করে? বিস্ময় প্রকাশ করলো চন্দনা।

দুটো টিকিটে তিনজন যাওয়া যায় না, এটা তো বেশ বুঝেছিস কিন্তু বাড়িতে তিনজন থাকলে দুটো টিকিট কাটা উচিত নয়—কই এটা তো বুঝিসনি? তোরা দুজনে চলে যাবি আর ও একা ঘরে চুপচাপ বসে থাকবে?

এখন আর কি করা যাবে? আগে বললে না-হয় হতো।

বলবেটা কে তোকে? আমি? এ-কথা কি আমার বলে দেবার? তোর মন কি বলে? লেখাপড়া শিখে এমন অবুঝ হবি, আমি জানতাম না। মুর্খ হবার জন্য যদি লেখাপড়া করিস তাহলে পড়াশোনা তোর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আর অপেক্ষা করলেন না ছায়া দেবী। বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু পিছনের কথাটা তাঁর কানে গেল। চন্দনার গলাই ছায়া দেবী শুনতে পেলেন ওর প্রতি এতো দরদটা জাগলো কীসে? চন্দনার কথাই মেনে নিলেন ছায়া দেবী মনে মনে। হ্যাঁ। জেগেছে বই-কী। ভীষণ ভাবে জেগেছে। সব জিনিসেরই কারণ থাকে। কবিতার প্রতি স্নেহ দরদ জাগারও যথেষ্ট কারণ আছে। ওর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে দিয়ে ছায়া দেবী কবিতাকে অপরূপ ভাবে চিনেছেন। গভীর ভাবে জেনেছেন। তাঁকে প্রণাম করা, পূজার ফুল তোলা, খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নেওয়া, পাশে এসে বসা এবং কতোটা কি খেলেন, না-খেলেন তা লক্ষ্য রাখা, তার শোবার বিছানা পাতা, এমনকী তার বাসনটুকুও ধোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে ছায়া দেবী সম্পূর্ণ নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছেন কবিতাকে। মেয়েটাকে তিনি যা ভেবেছিলেন, আসলে সে তা নয়। কবিতা ছায়া দেবীব সেই ভুল ভেঙে দিয়েছে। ছায়া দেবীর তাই দুঃখ হয়, এতোদিন এই সরল মেয়েটার ওপর তিনিও না-জানি কতো অবিচার করেছেন। ভাবতেও অবাক লাগে, এতো কিছু সত্ত্বেও এই ধূলি-ধূসর পৃথিবীর সামান্য মলিনতাও তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। নর্তকী বলে যে বিরুদ্ধ মনোভাব ছায়া দেবী নিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি আজ সত্যি লজ্জিত। দুঃখিত তো বটেই। কবিতা তার ছেলের বৌ। অত্যন্ত স্নেহের জন। যাকে নিয়ে এ-বাড়িতে একই সঙ্গে থাকতে হবে তার সঙ্গে আর যাই হোক, মনোমালিন্য করা চলে না। মিলেমিশেই থাকতে হবে। সমাধানের এই সহজ সুন্দর পথটুকু ছায়া দেবী আবিষ্কার করেছেন কবিতারই ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে। এ-প্রসঙ্গে ছায়া দেবীর আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়লো। যদিও সে-ঘটনাগুলি অতি সামান্য। তুচ্ছ। কিন্তু তুচ্ছ হয়েও আজ ছায়া দেবীব মনে তা জ্বলজ্বল করে। যতোদিন বেঁচে থাকবেন, কখনও তা ভুলবেন না।

ছায়া দেবী মুগের ডাল ভিজিয়ে, তার সঙ্গে চিনি আর নাবকেল দিয়ে খেতে বড়ো ভালোবাসেন। এটা কবিতা বোধহয় তিমিরের কাছ থেকেই জেনেছে। তার ফলে কবিতা প্রায়ই ছায়া দেবীর জন্য ওই খাবারটা তৈরি করে দেয়। ছায়া দেবী তাই ভাবেন, কই বড়ো বৌমা বা নিজের মেয়েটা তো কোনোদিন এমনটা করেনি। শুধু কি তাই? খাওয়া-দাওয়ার শেষে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, এমনকী পা টিপে দেওয়া পর্যন্ত! কবিতার প্রতি দরদটা এমনি জাগেনি। আসলে কবিতা তার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজও সুষ্ঠু ভাবে করে ছায়া দেবীকে মুগ্ধ করে তার এই পরিবর্তন আনতে বাধ্য করিয়েছে।

চন্দনা ও স্বাতীবৌদি চলে গেল সিনেমা দেখতে। কবিতা নিজের ঘরে বসেই সব দেখলো। তার এই নীরব দেখাটুকু আবার দেখে ফেললেন ছায়া দেবী। কবিতার ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও তিনি যেতে পারলেন না। ছায়া দেবী সহসা যেন ছোট হয়ে গেলেন। কবিতার কাছে এই মুহূর্তে যেতে তার যথেষ্ট লজ্জা লাগছে। এ কি কৈফিয়ত দেবেন তিনি ওই মেয়েটার কাছে? যদিও কবিতা এ-সবের বিন্দু-বিসর্গও জানতে চাইবেন না। ছায়া দেবী কবিতার ঘরেব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, ছোট বৌমা!

বলুন। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল কবিতা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছায়া দেবীর কাছে।

বলছিলাম...বিব্রত বোধ করেন ছায়া দেবী। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, ওরা তো চলে গেল। তুমি শুধু শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন, পাশের বাড়ির ওই বৌটার সঙ্গে গিয়ে একটু গল্প করে এসো। ছায়া দেবীর কথা বলার ধরন দেখে কবিতার মনে হলো, এ-যেন অপরাধীর স্বীকারোক্তি। সে বুঝলো, ছায়া দেবীর কোথায় লেগেছে। আর বুঝতে পেরেছে বলেই চুপ করে থেকে কথা বাড়ালো না। কেন-না এটা ঠিক, পাশের বাড়ির বৌটার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও কবিতা আর কোনোদিনই ওর কাছে যাবে না। কারণ ওই বৌটার কাছে যাওয়া নিয়েই একদিন ঝড় উঠেছিল এ-বাড়িতে। সেদিন ছায়া দেবীই তিমিরের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন এ-নিয়ে। কবিতার স্পষ্ট

মনে আছে ছায়া দেবী বলেছিলেন, তিমু, তোর বৌকে নিয়ে আমি কি করবো বলতে পারিস? ঘরের বৌ হয়ে যদি এমন ভাবে পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়, তাহলে আমার, এ-বাড়ির সম্মানটা থাকে কোথায় বল? পাড়ার আর কটা বৌ ওর মতো ঘুরে বেড়ায়, ক'জনই-বা আমাদেব বাড়িতে আসে?

কবিতার আরও মনে পড়ে। নালিশ শুনে পরে তিমিরও তাকে বলেছিল, পাশেব বাড়িতে মাকে বলে গিয়েছিলে কি?

না। মা তখন বাড়িতে ছিলেন না!

তাহলে সেখানে গিয়েছিলে কেন?

বৌটা আমাকে জানলা দিয়ে ডাকলো, তাই—

ডাকলেই তোমাকে চলে যেতে হবে? কেউ যদি তোমাকে এই মুহূর্তে ঘর ছাড়তে বলে তাহলে তো দেখছি তুমি আমাকেও ছেড়ে যেতে পারবে!

কক্ষনও না। বড়ো বড়ো চোখ করে সরল দৃষ্টিতে দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়ালো কবিতা।

তবে গেলে কেন? দেখো যে মা অসন্তুষ্ট হন।

আর কোনোদিনও যাবো না। তুমি দেখো—তিমিরকে সেদিন গভীর আশ্বাস দিয়েছিল কবিতা।

এতো ছোট একটা ঘটনা নিয়ে যে এতো বাড়াবাড়ি হবে তা কবিতা ভাবতেও পারেনি। অঙ্কুর যেন মহীরুহ হয়ে প্রকাশ পেল। সুবীরের জ্বর হয়েছে কয়েকদিন ধরে। ডাক্তারবাবু দিনে বার্লি এবং রাত্রে আটার রুটি খাবার নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাতীবৌদি দিনরাত স্বামীর পাশে থাকে। আর থাকেন ছাযা দেবী। ফলের রস খাওয়ানো, গা স্পঞ্জ করা, সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় জ্বরের তাপমাত্রার চার্ট লেখা ইত্যাদি হাজারো কাজে আটকা থাকে স্বাতীবৌদি। এতো পরিশ্রম দেখে সেদিন দুপুবে কবিতাই বার্লি তৈরি করতে বসলো। জলের পরিমাণটা একটু বেশি হওযাতে বার্লিটা পাতলা হয়ে পড়ার দরুনই ওকে কথা শোনালো স্বাতীবৌদি। সবশেষে বললো, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে আর সামান্য এই বার্লিটুকু বানাতে পারলে না? স্বাতীবৌদির কথার সুরে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যেন মেয়ে হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই বার্লিটা ভালো করে তৈরি করা যায়। যাই হোক স্বাতীবৌদির কথার কোনও প্রতিবাদ করেনি কবিতা। এমনকী তার চোখের সামনেও যখন সব বার্লিটুকু ঢেলে ফেলে দিল তখনও নয়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হলো রাত্রে। দুপুরে ভালো করে বার্লি তৈরি করতে পারেনি কবিতা। স্বাতীবৌদি তাই অসন্তুষ্ট হয়ে কথা শুনিয়েছে তাকে। কিন্তু তাতেও দমেনি কবিতা। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে, জিনিসটা ঠিক মতো পারেনি বলেই স্বাতীবৌদি তাকে অনুযোগ-অভিযোগ কবেছে। এবার ঠিক করলো কবিতা, বড়দার জন্য রাত্রের খাবারটাও সে তৈরি করবে। এবং সুষ্ঠু ভাবেই সেই কাজটুকু কববে। যাতে স্বাতীবৌদি খুশি হয়। অর্থাৎ স্বাতীবৌদিকে খুশি কবাব জন্যই কবিতার এই আয়োজন। দুপুরে এতো গঞ্জনা শুনেও সেই বৌদির মুখে একটুখানি হাসি ফোটানোর জন্য কবিতা রাত্রের রুটিও নিজেই তৈরি করলো। কাজের শেষে ভাবলো, এবারে নিশ্চয় স্বাতীবৌদি সন্তুষ্ট হবে। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষকে খুশি করবার জন্য কবিতার এমনই আগ্রহ। অপমান গায়ে মাখে না। অবহেলা মনেতে দাগ কাটে না। ছুটে যায় আবার যে-কাজের জন্য কটু কথা শুনেছে সেই কাজকেই সার্থক করে তুলবার জন্য। কিন্তু এ-মনের পবিচয় কেউ পেল না। ভুল বুঝলো স্বাতীবৌদি এবারেও। রুটিগুলি হাতে নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে দেখলো। পরে ফেলে দিল ছুঁড়ে। শোনালো অজস্র কথা। বললো, এমন কাঁচা রুটি মানুষে করে? তুমি কি তাকে শান্তিতে দুটো খেতে দেবে, না কি? দুপুরে বার্লি এমন তৈরি করলে স্রেফ জল। এবারে রুটি বানালে তাও কাঁচা। কি ভেবেছো তুমি? এই কাঁচা রুটি খাইয়ে মানুষটাকে কি মেরে ফেলতে চাও? তুমি কি আমার সঙ্গে, ওর সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করলে? কেবল ধিঙ্গী মেয়ের মতো নাচানাচি করলেই চলে না, কাজও অল্প-বিস্তর শিখতে হয়। সে চেষ্টা তো কোনোদিন করোনি; কেবল ফাংসানই করে বেড়ালে।

আমি বুঝতে পারিনি দিদি! কবিতা অসহায়েব সুবে বললো।

শুধু এইটাই বোঝো না কেমন, কই আর তো সব খুব ভালোই বোঝো। তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই। সবটাই তোমার চালাকি।

চালাকি! বিস্ময়ে বোবা হলো কবিতা। বুঝে উঠতেই পারলো না, কি বলতে চাইছে স্বাতীবৌদি। এরমধ্যে চালাকির কি আছে?

তুমি বুঝে উঠতে পারছো না কীসের চালাকি? তুমি চাও উনি না-খেয়ে থাকুন। এমন শত্রুতা করে তোমার লাভটা কি বলতে পাবো। তুমি তোমার ঘর নিয়েই থেকো—আমার ব্যাপারটায় নাক গলাতে কক্ষনও এসো না। কোনও কাজ যখন করতে জানো না তখন করতেও এসো না।

বেশ তো আপনিই আমাকে শিখিয়ে দেবেন। কাজ না-জেনে অকর্মণ্য হয়ে তো থাকতে পারবো না। অত্যন্ত সহজ-সরল বুদ্ধিতে, শিখবার আগ্রহ নিয়েই কথাগুলি বললো কবিতা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই ভুল বুঝতে থাকে স্বাতীবৌদি। তাই চিৎকার করে বলে উঠলো, যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা। এতো বড়ো কথা তুমি আমাকে শোনাতে পাবলে কেমন করে? কোন সাহসে? তোমার আমি খাই না পরি।

খাওয়া-পবার কোনও প্রশ্নই হচ্ছে না দিদি। অত্যন্ত কোমল সুরে জানালো কবিতা। আপনাকে আমি কথা শোনাবার চেষ্টাও করিনি আপনি আমার চেয়ে বড়ো। বয়সে এবং সম্পর্কেও। বড়োদের কথা শোনাতে নেই। আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, আমি শুধু আপনার কাছে কাজ শিখতেই চেয়েছি। যেটা জানি না, পারি না, সেটা দেখিয়ে-শুনিয়ে দেবেন। এরমধ্যে আপনি বড়ো কথা শোনানোব কি পেলেন?

কবিতার সঙ্গে আব কথা বাড়ালো না স্বাতীবৌদি। গেল সুবীরের ঘরে। ছায়া দেবী বড়ো ছেলের মাথায় হাতটা বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সেখানে গিয়েই কান্নায় ভেঙে পড়লো স্বাতীবৌদি। নিজের মন মতো করে ঘটনাটা ছায়া দেবীব কাছে বললো।

ছোট বৌমা তোমাকে অপমান করেছে? কেন জানি বিশ্বাস করতে মন চাইলো না। অবিশ্বাসেব ভঙ্গিতে ছায়া দেবী তাকালেন। কেন-না তিনি এটা ঠিক মেনে নিতে পাবছেন না। কবিতাকে তিনি খুব ভালোকরেই চিনেছেন। ওব প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো কবিতা তো সে-ধরনের মেয়েই নয়। অপমান করাব 'অ'কেই যে নাকি চিনলো না, সে আবার কাকে কি অপমান করবে? ওদিকে স্ত্রীর অপমান ততোক্ষণে স্পর্শ করেছে সুবীরকে। লাগলো তারও। জ্বলে উঠলো সে। বললো, মা তুমি এর একটা বিহিত করো। দু'দিনের বৌ হয়ে সে স্বাতীকে অপমান করে কোন স্পর্দ্ধায়?

অফিস থেকে এসে স্নান সেরে বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল তিমিব। বড়দার শেষের কথাটা তার কানে গেল। মাঝ পথে চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে দিয়ে কি যেন ভাবলো। পরে ওই অবস্থাতেই গিয়ে দাঁড়ালো বড়দার ঘরে। দেখলো, স্বাতীবৌদির চোখে জল। বড়দা থমকে বসে আছে। আর মা একবার স্বাতীবৌদি আর একবার বড়দাব মুখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ করেছেন। সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলো তিমির। জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে মা?

ছোটো বৌমা নাকি তোর বৌদিকে অপমান করেছে।

কবিতা! এতটুকু দেরি নয়, তৎক্ষণাৎ তিমির স্ত্রীকে ডাকলো। ওর ডাক শুনে রান্নাঘব থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো কবিতা। সে ঠিক করলো, অহেতুক চুপ করে থাকলে ক্ষতি তারই। সর্বনাশ যা হবার, তারই হবে। অতোএব আসল ঘটনা খুলেই বলবে। যেখানে মান-সম্মানের প্রশ্ন, ভালো-মন্দ, খারাপ-নিন্দের প্রশ্ন, সেখানে চুপ করে থেকে বোবা সাজবার কোনও অর্থ হয় না। তাই প্রস্তুত হয়েই কবিতা তিমিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বৌদিকে তুমি অপমান করেছো?

না। দৃঢ়কণ্ঠে জানালো কবিতা। কবিতার উত্তর শুনে তিমির মা-ব দিকে তাকালো। বললো, আমার আর কিছু বলবার নেই মা। আর যাই হোক, কবিতা মিথ্যে বলবে না। এটা আমি জানি।

তুই কি বলতে চাস? এবারে আক্রমণ করলো সুবীর। তোর স্বাতীবৌদিই তাহলে মিথ্যে বলছে? এ-কথার উত্তর জানা থাকলেও দিতে পারলো না তিমির। অন্তত এখানে দেওয়া যায় না। তাহলে উত্তরটা বড়ো রূঢ় আর কঠিন হয়ে পড়বে। শুধু বললো, কবিতা বৌদিকে অপমান করেনি, এটাই আমার প্রমাণ করার উদ্দেশ্য, তোমার সঙ্গে তর্ক করা নয়।

কবিতাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে তিমির জিজ্ঞেস করলো, সুত্রপাতটা কি নিয়ে? উত্তরে কবিতা দুপুরে বার্লি তৈরি করা থেকে রাত্রের রুটি বানাবাব ঘটনা সবই একে একে সবিস্তারে বললো। শুনে বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলো তিমির। পরে বিরক্ত ভরা কণ্ঠে উত্তাপ মিশিয়ে বললো, আমার হয়েছে যন্ত্রণা। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি, খাটা-খাটুনীর পর বাড়িতে এসেও যদি একটু শান্তি না-পাই তাহলে.... আর তোমাকেও বলি, তোমার কি দরকারটা পড়েছিল ওই সব বার্লি-রুটি বানাবাব?

বৌদির কষ্ট হয় দেখে... কবিতাকে শেষ করতে না-দিয়ে একটু চড়া সুরেই তিমির ধমকে উঠলো, বৌদির কষ্টর জন্য কি সে তোমাকে ডেকেছিল? তোমাদের এ-সব ঝামেলা সহ্য করাও আমার পক্ষে আর এক কষ্ট। যাও না, যাও, আরও একটু বার্লি-রুটি তৈরি করে দিয়ে এসো। তোমাকে এতো কবে বলেছি, মা যা বলবেন, তুমি শুধু তাই করবে। তার বেশি নয়। তাহলে ফালতু আমাকে এখন এই সব ঝামেলা সহ্য করতে হতো না। এতো করে তো বলেছি, শুনেছো আমার কথা? দয়াবতী হতে গিয়ে এখন বদনাম কুড়াচ্ছো।

ভাঙাধনুর মতো ভ্রূ-যুগলকে কুঁচকে কবিতা অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে তিমিবের কথাগুলি শুনছিল। ওর কথা শেষ হতেই এবারে সে বললো, এই সংসারেব কাউকেই আমি চিনে উঠতে পারলাম না। সকলের মন পাবার জন্য এতো কবলাম, কিন্তু সবই বৃথা। কবিতার চোখ দুটি জলে ভবে উঠলো। গলাটাও এলো ধরে।

বড়ো লেটে বুঝেছো। তবু যাহোক বুঝতে যখন পেরেছো, এবার থেকে সেই ভাবে চলতেই চেষ্টা করো। সংসারের কোনও ব্যাপারে তোমাকে থাকতে হবে না। অন্তত কেউ না-ডাকলে কিছুতেই যাবে না। আমাকে একটু শান্তি দাও। অফিস করার পর যদি তোমাদের এই ঝগড়া মনোমালিন্যের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে আমার বাড়িতে আসবার আনন্দটা কোথায় রইলো? আর আমিও বুঝে উঠতে পাবি না, দুপুরে বার্লি করার পর যখন তুমি দেখলে বৌদি খুশি হয়নি, তারপবেও তোমার রুটি বানাতে যাবার কি দরকারটা ছিল? বুঝলাম, তুমি ভালো মন নিয়েই করেছিলে, কিন্তু তার মূল্যটুকু কি পেলে? নিজে তো কথা শুনলেই, সেই সঙ্গে আমাকেও শুনতে হলো।

সে-রাত্রে পেট ভরে ভাত খেলো না কবিতা। খেতে না-বসলে নয় তাই বসা। কোনওরকমে নিয়মরক্ষা কবলো এই মাত্র। সবই দেখলো তিমির। কিছু বললো না। একটু বেশি খাবার জন্য অনুরোধও করলো না।

খাওয়া শেষ করে ইজিচেয়ারের দেহটা এলিয়ে দিল তিমির। বিছানায় শুতে গেল না। ভাবতে লাগল অনেক কথা। বিশেষ করে আজকের এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা নিয়ে। তায় আবার কবিতা পেট ভরে খায়নি। এই ছোট্ট ঘটনাটাও তাকে আঘাত দিল বেশি পরিমাণেই। মাথা নিচু করে ভাবছিল তিমির। ঘরে ঢুকলো কবিতা। তিমির মুখ তুলে ওর দিকে চাইলো। এমন করুণ মুখ সে এর আগে আর দেখেনি।

ড্রেসিং-টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল কবিতা। আড়চোখে তিমির ওকে একবার দেখলো। আঁচল থেকে চাবি ছড়া খুলে টেবিলের ওপর রেখে দিল কবিতা। ধীর পায়ে হেঁটে এলো খাটের কাছে। আগের সেই হরিণছন্দ যেন সহসা জাদুমন্ত্রবলে থমকে গেছে। এ-যেন জোয়ারের পর ভাঁটা নেমে আসার মতো। পূজার আনন্দের পর পূজামন্ডপে বিষাদ নেমে আসার মতো। কাপড়টাকে গুছিয়ে, পা দুটিকে গুটিয়ে নিয়ে খাটে উঠলো কবিতা। দেহটা সামান্য একটু ভাঁজ করে তিমিরের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রইলো।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো তিমিব। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলো।

কবিতার এই নিস্পৃহ উদাস বৈরাগ্যের আবরণটুকু তাব মনকে ভাবী ব্যথাতুর করে তুললো। অন্যান্য দিন কবিতা খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলটায় বসে একটু প্রসাধন সেরে নেয়। মুখে ক্রিম এবং সারা দেহে পাউডার ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু আজ কিছুই করেনি। এই ব্যতিক্রমের কারণটুকু তিমিরের অজানা নয়। কবিতা আজ সত্যই বড়বেশি আঘাত পেয়েছে। যে-কাজই সে ভালো মনে করতে গেছে, আন্তরিকতার সঙ্গে করতে গেছে, সেটাই খারাপ হয়েছে। অথচ সেই খারাপটুকুর জন্য কবিতার এতোটুকু দোষ নেই। তাকে দায়ী করাও চলে না। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, দোষ না-কবেও প্রতিক্ষেত্রে কবিতা দোষী হয়ে পড়ে। আসলে ওর কপালটাই মন্দ। দুর্ভাগ্য যেন ওকে আলিঙ্গন করে আছে। এ-সংসারে এসে অহেতুক কথা শুনতে হয়েছে কবিতাকে। অকারণে পেয়েছে আঘাত। তাই ওর জন্য দুঃখ হয় তিমিরের। অথচ তাদের এই সংসারে এসে কতোই -না সুখী হতে চেয়েছিল সে; কিন্তু আশা যা-করেছিল, পেয়েছে তার উল্টো। অদৃষ্ট যেন ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর এক খেলায় উন্মত্ত হয়ে মেতে উঠেছে। আর কবিতাব হার হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। অন্যায় না-করেও দুর্নামেব অংশীদার হতে হচ্ছে তাকে। ভালোবাসা, আশ্রয়, সান্ত্বনা, তার যেন শেষ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। সেই মানুষকে তিমির কথা শুনিয়েছে। এতো কথা অবশ্য না-বললেই ভালো হতো। রাগের মাথায় অনেক কিছুই সে কবিতাকে বলেছে। কিন্তু এতোটা বাড়াবাড়ি না-করলেও চলতো। কবিতাব দিকে চাইলো তিমির। মেয়েটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সকলের কাছ থেকে অজস্র কথা শুনে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেমন যেন মায়া হলো তিমিরের। এই মুহূর্তে দুঃখ হলো কবিতাব জন্য। ওকে ডেকে তুলবে নাকি একবার? আদর করবে। সব দুঃখ-ব্যথা আদরের ঘনঘটায় ডুবিয়ে দেবে। থাক। এতো রাত্রে ওকে ঘুম থেকে জাগিযে তুলে আদব না-করলেও চলবে।

চিন্তার স্রোত এবার অন্যদিকে। তিমির স্বাতীবৌদিব কথাই ভাবছে। আশ্চর্য! এতো ছোট, এতো সাধারণ ঘটনাকে এতো বড়ো করে তুলতে পারে যে ভাবলেও বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। সত্যিই তো কবিতা তাকে অপমান করেনি বা সে-চেষ্টাও করেনি। তবে কেন এমন মিথ্যার আশ্রয় নিল স্বাতীবৌদি? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কবিতাকে পরোক্ষে ছোট করার জন্যই স্বাতীবৌদির এই আয়োজন। কিন্তু কেন? কবিতা কি এতোই শত্রু হয়ে উঠেছে তার কাছে যে, স্বাতীবৌদি শেষ পর্যন্ত ওকে সহ্য পর্যন্ত করতে পারছে না। স্বাতীবৌদির সমবয়েসী কবিতা নয়। বয়সে-সম্পর্কে সব বিষয়েই কবিতা ছোট। সুতরাং স্বাতীবৌদি কোথায় তাকে স্নেহ করবে, ভালোবাসবে তা নয়...আর এমনি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে যদি দিনের-পর-দিন অশান্তি বেড়ে চলে, তাহলে তো এ-বাড়িতে বাস করাই কঠিন হয়ে পড়বে। কবিতাকে কেউ যদি আপন করে নিতে না-পারে, তাহলে সেই-ই-বা যাবে কোথায়? এই সেদিনও ওর সঙ্গে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে লেগেছিল চন্দনার। লেগেছিল ঠিক, তবে কবিতার দোষ ছিল না। সে শুধু তার ঠাকুরঝির ওপর স্নেহের জোর খাটাতে গিয়েছিল। বোধকরি সেটাই হয়েছিল তার অন্যায়। অপরাধ!

সেদিন কলেজে যাবার সময়ে শাড়ি শাড়ি করে চিৎকার করছিল চন্দনা। অন্যান্য দিন ঠিক সময় মতো কাচা জামা-কাপড় বাড়িতে পৌঁছে দিলেও ধোপা সেদিন দেয়নি। তাই চিৎকার করছিল চন্দনা। তা শুনেই কবিতা নিজের অত্যন্ত দামী একখানা শাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল চন্দনার কাছে।

এই শাড়িটা পরো।

তোমারটা আমি পরবো না। নির্ভেজাল উত্তর চন্দনার। রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ।

পরবে না কেন? চন্দনার নিষ্ঠুর উত্তর শুনে মনে যথেষ্ট আঘাত পেল কবিতা। কিন্তু তার শাড়ি না-পরবার কারণটুকু জানতে পারলো না। তাই জিজ্ঞেস করলো, না-পরবার কি আছে? একজায়গায় থাকলে অমন মিলেমিশে পরতে হয। তোমারটা আমি পরবো, আমারটা তুমি।

বলছি তো তোমার জিনিস আমি পরবো না।

দিদিরটা পরতে পারো অথচ আমারটা নয় কেন? সরল মানুষ কবিতা। সহজে মনের সরল প্রশ্ন করে বসলো।

স্বাতীবৌদি আর তুমি এক নও। তাছাড়া স্বাতীবৌদিব সঙ্গে আমার আলাদা সম্পর্ক।

সে-রকম সম্পর্ক তো তুমি আমার সঙ্গেও তৈরি করতে পাবো। তবুও হাল ছাড়ে না কবিতা।

না, পারি না। অবুঝ চন্দনাকে বোঝাবার জন্য কবিতা আগের কথাতেই ফিরে গেল। বললো, দিদির শাড়ি যখন পরো, তখন আমারটাও তোমাকে পরতে হবে। স্নেহের-ভালোবাসার সর্বোপরি অধিকারের দাবি নিয়ে খুব বড়ো গলায় কবিতা কথাটা বললো। কিন্তু তার ফল এমন তিক্ত হবে তা সে আগে বুঝতে পারেনি। ওর হাত থেকে শাড়িটা মুহূর্তে টেনে নিল চন্দনা। তারপরেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে মেঝেতে।

চন্দনা আসলে শাড়ি নয়, কবিতাও নয়, তিমিরকেই ছুড়ে ফেলেছে। কবিতার উপর দিয়ে তাকেই অপমানটা করেছে। এই অপমানের কারণ আছে। মাঝে চন্দনা নাকতলারই একটি ছেলের সঙ্গে খুব মিশতো। ছেলেটি যদি ভালো হতো তিমিরের কোনওরকম আপত্তি ছিল না। কিন্তু দিবাকর অত্যন্ত বাজে টাইপের ছেলে। কোনও মেয়েকেই সে বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় না। প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়েকে সে তার বান্ধবী হিসেবে পেতে চায়। ওটাই তার খেলা। এটা জেনে-শুনে কি করে তিমির ওর সঙ্গে নিজের বোনকে মিশতে দেয়? চন্দনা সেটা বুঝতে চায় না। তিমিরের সঙ্গে চন্দনার সংঘাতটা এখান থেকেই শুরু। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিমির দিবাকরের সঙ্গে মেশাটা বন্ধ করে দিতে পেরেছে কিন্তু চন্দনার সেই রাগ তুষের আগুনের মতো এখন জ্বলছে। .

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! তিমির স্বাতীবৌদির বোন ইতিকে বিয়ে করতে চায়নি। স্বাতীবৌদির সেই রাগ এখন তাকে ছাড়িয়ে কবিতাকে গ্রাস করেছে। সত্যিকারের একটা বাজে ছেলের সঙ্গে মিশতে দেয়নি বলে চন্দনা তিমিরকে ছেড়ে সূক্ষ্ম এক প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছে। স্বাতীবৌদি এবং চন্দনা এই দুজনের রাগের কেন্দ্রবিন্দু সে নিজে অথচ তার জের টানতে হচ্ছে কবিতাকে। পরিস্থিতির অসহায় শিকার সে। ওর জন্য তিমিরের খুবই দুঃখ হতে লাগলো কিন্তু অসুবিধেটা হয়েছে এই নিয়ে তো স্বাতীবৌদ বা চন্দনার সঙ্গে ঝগড়া-তর্ক করা যায় না। ওরা যে তাকে আর কবিতাকে একই বিচারে দুজনকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

অনেক দিনের অনেক কথাই একমনে ভেবে চলেছে তিমির। সবচেয়ে যন্ত্রণা হয়েছে তার। না-পারে কবিতাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে, না-পারে ওদেরকে কিছু বলতে। এই সঙ্গে আরেক দিনের ঘটনাও মনে পড়ে তিমিরের। ঠিক ঘটনা নয় সেটা, একটি দৃশ্য। নিশ্চুপ, নীরব একটি করুণ দৃশ্য। যে-দৃশ্যের অন্তর্নিহিত ব্যথার সুরটুকু তিমির মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। কারুণ্যময় সেই দৃশ্যটা জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে তিমিরের সামনে।

মা-র ঘরে চন্দনা আর স্বাতীবৌদি দুজনে দুজনকে আদর করছে। কি যেন বলাবলি করছে কানে কানে। আর নিজের ঘরের বারান্দার দিকের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রীলের ফাঁক দিয়ে করুণ চোখ দুটি মেলে ধরে ওই দিকে পলকহীন ভাবে চেয়ে রয়েছে কবিতা। নীরব এই চাউনির মধ্যে তিমির কবিতার ব্যথার উৎসটুকুর সন্ধান পেল।

এক ঘুম দিয়ে পাশ ফিরতেই চোখ মেললো কবিতা। দেখতে পেল তিমির পাশে নেই। বিছানায় উঠে বসলো। ঘরের ওই কোণের দিকের একটি চেয়ারে দুই হাঁটুর ওপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে কপাল চেপে বসে আছে তিমির। সন্ন্যাসীর ধ্যানমগ্নের মতো। অবাক লাগলো কবিতার। এতোক্ষণেও মানুষটা শোয়নি। রাত এখন কতো কে জানে? বিছানার ওপর বসেই কবিতা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কি হলো? শোবে না?

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর তিমিরের। সত্যই সে আজ শোবে না বলে ঠিক করেছে। সারা রাত শুধু ভাববে। সকলের কথা এমনি বসে বসেই ভাববে।

সারারাত জেগে থাকবে নাকি?

হ্যাঁ।

প্রচন্ড ঝড়ের পর যেমন অরণ্যের অবস্থা হয় ঠিক তেমনি হলো কবিতার। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বড়বেশি ম্লান হয়ে পড়লো। বুঝি-বা একটু গম্ভীর। চোখের দৃষ্টিতেও নেই আগেব সেই মধুর গভীরতা। সজল ক্লান্ত আজ কবিতার দৃষ্টি। এই বুঝি বৃষ্টি হয় হয়। গতরাত্রের ঘটনার পর থেকেই ও বড়বেশি দমে গেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অন্যান্য দিন কতো কথা হয় কবিতার তিমিরেব সঙ্গে। কিন্তু আজ হয়নি একটিও। যেন মৌনব্রত পালনের দিন আজ। কবিতা কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। যেন সে বোবা। আসলে কারো সঙ্গে কথা বলতেই ওর ভয় করে এখন। কি জানি, কে কখন কোন দিক দিয়ে অপরাধ ধরে বসে।

ওদিকে ঠাকুর ঘরে গিয়ে পুজোর ফুলের ডালির দিকে চোখ পড়তেই ছায়া দেবী দেখলেন, ফুলশূন্য ডালিটা ম্লানমুখে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। একটু খটকা লাগল ছায়া দেবীর। কবিতা আজ পুজোর ফুল তুললো না কেন? তাকে প্রণাম করতেও মেয়েটা আসেনি। কি হলো কি ওর আজ? আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন ছায়া দেবী। তিমিরের ঘরে গিয়ে দেখলেন, খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে পান্ডুর মুখে বসে আছে কবিতা। তিমির বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে।

কি হলো ছোট বৌমা, আজ পুজোব ফুল তুললে না যে....

শরীরটা ভালো লাগছে না মা।

অসুখ-বিসুখ করেনি তো? খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন ছাযা দেবী।

না। সে-সব কিছু নয়। মাথার ঘোমটাটা ঠিকমতো টেনে তুলে দিয়ে ম্লান কণ্ঠে উত্তর দিল কবিতা।

তবু ভালো। আমি ভাবলাম বুঝি জ্বর-জ্বাড়ি হয়েছে। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, অসুখ তো চারিদিকে লেগেই আছে। একটু সাবধানে থেকো। বলতে বলতে ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়ালেন ছায়া দেবী।

দাড়ি কামাতে কামাতে তিমিব একসময় বললো, যাই বলো, মা কিন্তু তোমাকে বেশ ভালোবাসেন। তিমিরেব কথাটা শুনে একটু ভেবে নিয়ে কবিতা উত্তর দিল, শুধু মা কেন, সবাই ভালোবাসে। প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর কবিতার কণ্ঠে স্পষ্ট ধরা পড়লো।

অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তিমির। কবিতা একসময়ে বললো, মাদ্রাজ থেকে দিনকয়েক ঘুরে আসবো ভাবছিলাম—তিমির তাকালো কবিতার দিকে। মাদ্রাজ যেতে চাইবার কারণটুকু অনায়াসেই সে ধরতে পারলো। আসলে দুঃখের দিনে, অসহায় অবস্থার মধ্যে প্রিয়জনদের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। বিশেষ করে মা-বাবাব কথা। তাদের স্নেহের ছায়ায় গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেতেই মন চায়। সেইজন্যই যেতে চাওয়া। তিমিব তাই আপত্তির সুর তুললো না। সঙ্গত কারণেই বললো, নিশ্চয়ই যাবে। কবিতা সঙ্গে সঙ্গে আবার জানালো, আজকেই যাবো। এবারে আশ্চর্য লাগলো তিমিরের। হঠাৎ কেন জানি তার মনে হলো, কবিতা বুঝি যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছে। অথচ এমন ধরনের তো সে নয়। কবিতা যথেষ্ট ধীর-স্থির, শান্ত-সংযত। যেটুকু কাজই সে করে—সেটুকু অনেক ভেবে-চিন্তেই করে। ভাবনা-চিন্তা ছাড়া হুট করে সে কোনও কিছুই করে না। গতকালের ঘটনার পর থেকে কবিতার মানসিক অশান্তি বেড়েছে, মনের উপর দিয়ে প্রচন্ড বেগে সেই অশান্তির ঝড় বয়ে গেছে, তিমির তা অস্বীকার করে না। শান্তির সন্ধানেই কবিতা কিছুদিনের জন্য বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে চায়। তার মনের বিধ্বস্ত চারাগাছটা বাবা-মা, দাদা-বৌদি-ঠাকুমার স্নেহের বারিবর্ষণে নতুন কবে প্রাণ ফিরে পাবে। সতেজ-সজীব হয়ে উঠবে। এতো কিছু ভেবেই তো তিমির মত দিয়েছে কবিতাকে মাদ্রাজে যেতে। অমত করার তো কিছুই নেই। বাবা-মাকে দেখতে যেতে কোন মেয়ের-না ইচ্ছা হয়? সেক্ষেত্রে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। খোলা মনেই এককথায় রাজি হয়েছে তিমির। এই পর্যন্ত হলেই জিনিসটা সুন্দর হতো কিন্তু তা হয়নি। কবিতা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছে, আজকেই! শান্ত-শীতল কোমল

মনোভাবের কবিতাব পক্ষে একটু বেশি এগিয়ে যাওয়া হলো নাকি? এমন করে কবিতা কোনোদিন বলেনি। এমন করে কবিতা কোনোদিন তার মত প্রকাশ করেনি। তিমির তো তাকে যেতেই বলেছে। দু-চারদিন বাদে গেলেই হয়। আজকেই যেতে হবে এমনকী কথা আছে? তিমির পরমুহূর্তেই মেনে নিল, ওটা নিশ্চয়ই কবিতার মনের কথা নয়। মনের কথা হতেই পারে না। বিষাদে পরিপূর্ণ ব্যথাতুর ভাঙা মনেব অনুযোগের কথা। কিছুটা আব্দার মিশিয়ে দুঃখ জানানোর সুবে অভিযোগের কথা। সর্বোপরি তিমিরের কাছে নির্ভরতার সঙ্গে দাবি জানানোব কথা। সুতরাং কবিতা এমন করে বলতে পারে বই-কী। সবই মেনে নিল তিমির। বিচার বিশ্লেষণ কবে এটাও বুঝলো, কবিতা মাদ্রাজ যাবে ঠিক কথা কিন্তু আজকেই যাবে বলে যেটা স্থির কবেছে সেটা নিশ্চিত নয়। আসলে ওটা একটা কথার কথা। কথা প্রসঙ্গেই কথা। সেই জন্য সে যেতে চাইলেও রওনা আজ কিছুতেই দেবে না। এই বিশ্বাসটুকু নিয়েই তিমির হাসি মুখেই বললো, বেশ তো যেয়ো—

অফিস থেকে ফিরে এসে কিন্তু তিমিরের সেই হাসি মুখ আর রইলো না। সে ভাবতেও পারেনি যে, নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবে কথাটা বলা সত্ত্বেও, সেটাকেই কবিতা চূড়ান্ত বলে ধরে নেবে। তিমিরের ওই শান্ত সুরের হাসি মাখা কথার ওপর নির্ভব করেই কবিতা মাদ্রাজে চলে গেছে। তিমির প্রথমেই ছুটে গেল মাযের কাছে। ছায়া দেবী চুপচাপ শুয়েছিলেন। কবিতা চলে যাওয়াতে আব কারো না-লাগুক তার লেগেছে! বিদায় বেলার বেদনার সুর তার বুকে বেজেছে। ছায়া দেবী তাই কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছেন। পশুপতির কাছ থেকে খবরটা পেয়েই তিমিব সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

মা, কবিতা নাকি চলে গেছে?

হ্যাঁ। ছোট্ট শব্দটুকু কবেই ছায়া দেবীর কেমন সন্দেহ হলো। তিনি ছেলের মুখের দিকে চেয়েই রইলেন। জিজ্ঞেস কবলেন, কেন, তুই কি জানতিস না? ছোট বৌমা যে বললো, তুই মত দিয়েছিস মাদ্রাজে গিয়ে কিছুদিন থাকার জন্য।

তা অবশ্য বলেছিলাম...তিমির ম্লান মুখে থেমে পড়লো।

তবে?

আজকেই চলে যাবে...সেটা ভাবিনি!

আজকে যাবার কথা বলতে, তুই তো সে মতও দিয়েছিলি! কবিতার কাছ থেকে ছায়া দেবী যেমন ভাবে জেনেছেন, তেমন ভাবেই জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ছেলেকে। এবারে তার সন্দেহ গাঢ় হলো। তিমির কি তবে ছোটবৌমাকে কিছু বলেছে? আহা! মেয়েটার কি দোষ! তাকে শুধু শুধু তিমির বলতে গেল কেন? নিশ্চয়ই কবিতাকে কিছু বলেছে। তিনি তাই জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারলেন না।

ছোট বৌমাকে তুই কিছু বলেছিস নাকি? মায়েব প্রশ্নটা শুনে মনে মনে যথেষ্ট খুশি হলো তিমির। ওই প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কবিতাকে ভালোবাসার আগ্রহ। মা তাই কবিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তাকে দোষী সন্দেহ করেই ওই প্রশ্ন করেছেন।

না মা। খুব ধীর কণ্ঠে তিমিব উত্তর দিল, আমি কিছুই বলিনি। কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করলেন না ছায়া দেবী। একটু চুপ করে থেকে ফের জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে গেল কেন?

তা কি তুমি জানো না? এবারে তিমিরই উল্টো প্রশ্ন করে বসলো মাকে।

আমারই হয়েছে জ্বালা। অপরাধীর তালিকায় ছায়া দেবী একা তিমিরকে জড়ালেন না, বাড়ির সকলকে টেনেই বললেন, তোরা সবাই মিলে মেয়েটাকে যদি এমন করিস, তাহলে সেই-ই-বা যাবে কোথায়? পড়ে পড়ে এখানে মার খাওয়ার চেয়ে ঠিকই করেছে চলে গিয়ে। আসুক দিনকতক থেকে। তারপরেই আক্ষেপের সুরে বললেন, মেয়েটা রোজ পুজোর ফুল তুলে দিতো, আমার খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নিতো, বিছানা পেতে আমাকে শুইয়ে দিয়ে, গা-হাত-পা পর্যন্ত টিপে দিতো। কতো বারণ করেছি। কে শোনে কার কথা! সে এ-সব করবেই। এ-সব করতেই তার আনন্দ। সে তো চলে গেল।

এখন আমি যে কি অসুবিধায় পড়েছি তা কি একবারও বুঝতে পারছে না? আমার আর ভাল লাগে না কিছু। ইচ্ছে হয় যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই। চন্দনার বিয়েটা ঠিক হলেও বাঁচতাম। তোদের সংসার থেকে মুক্তি পেতাম। চুপ করলেন ছায়া দেবী। অন্যমনস্ক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। কি যেন ভাবছেন। তাঁর সমস্ত মুখে চিন্তার ঘনছায়া। যেন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। ছেলের দিকে চাইলেন ছায়া দেবী। বললেন, ছোট বৌমা তার বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে সেটা তো ভালো কথা। কিন্তু যে-দুঃখ পেয়ে গেছে, অবহেলা নিয়ে গেছে তাতে ওর মনের উপর ভীষণ চাপ পড়েছে। আমি বলছিলাম, তুই গিয়ে ওকে নিয়ে আয়। সেটাই বরং ভালো হবে।

মাদ্রাজের হান্টার রোডের কবিতা-ভবনে গিয়ে পৌঁছালো কবিতা। মেয়েকে দেখলে কোন বাবা-মা খুশি না-হন? প্রিয়জন কাছে এলে সারা বাড়িতেই খুশির কারণ ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। কিন্তু এ-কবিতা যে ভিন্ন। সম্পূর্ণ অন্য কবিতা। কোথায় তার চেহারার সেই জৌলুষ? কোথায় তার রূপের ছটা? সবই যেন ম্লান। নিস্তেজ। কোথায় তার সেই হরিণ-চপল ছন্দ? যেন সহসা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ছন্দময় পদক্ষেপ হারিয়ে গেছে অজানা আতঙ্কে। যে-কবিতা খুশির উচ্ছলতায় সারা সময় ভরপুর থাকতো সেই কবিতা আজ নীরবতাকে বড়বেশি আপন করে কাছে টেনে নিয়েছে। এ-পরিবর্তন রাতারাতি হয় না। এ-ভূমিকম্প নয় যে, মুহূর্তের মধ্যে সুন্দর মনোরম একটি শহরকে শ্মশানে পরিণত করতে পারে! এ হলো সংসারের ভাঙা-গড়ার খেলা। তিল তিল করে দিনের-পর-দিন জমে ওঠে হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ। তাহলেই মেনে নিতে হয় কবিতাব ওই অবস্থা একদিনে হয়নি। বঞ্চিত হয়ে, ব্যথিত হয়ে তবেই-না চেহারার ওই পরিবর্তন। এর অর্থ ওই সংসারে গিয়ে কবিতা ক্রমাগত আঘাত পেয়ে এসেছে। দুঃখের পাহাড় জমা হয়েছে তার বুকের মধ্যে। কাপূরজি মেয়েকে পরম স্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুজিয়ে দিলেন। যেন বাইশ বছর আগের তার সেই এক বছরের ছোট্ট কবিতা। কাপূরজি বললেন, কি হয়েছে মা? হঠাৎ কোনওরকম খবর না-দিয়ে এসেছো, তিমিরকেও সঙ্গে আনোনি। তোমাকেও খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না।

তোমার কাছে আসতে হলে কি খবর দিয়ে আসতে হয়? কবিতা কষ্ট করে একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

তা নয় বেটি। মেয়েকে কীভাবে বুঝিয়ে বলবেন কাপূরজি ঠিক করতে পারলেন না। অরুণা দেবী কিন্তু সোজা-সুজি প্রশ্ন করলেন, তিমির কি তোকে সুখী করতে পারেনি?

না মা, না—ও-কথা বোলো না। ও-কথা শুনলেও আমার পাপ হবে। ওর মতো মানুষ হয় না। কবিতা যেন আর্তনাদ করে উঠলো শত দুঃখ-কটে, ঝড়-ঝঞ্ঝা যে-কোনও অবস্থাতেই ওর কাছে পরম নিশ্চিন্তে, শান্তিতে থাকা যায়। এমন মানুষকে তোমরা ভুল বুঝো না। তারপরেই কবিতা হেসে দিল। সোনাঝবা হাসি। যেন আবার সেই আগের কবিতা। বললো, অনেকদিন তোমাদের দেখি না। ক'দিন ধরে তোমাদের চিন্তায় মনটা ভীষণ খারাপ লাগছিল। মাঝে মাঝে ভারী কান্না পেতো। শাশুড়ীকে বলতেই তিনি এককথায় রাজি। তাই চলে এলাম—কবিতা এবারে অরুণা দেবীকে জড়িয়ে ধরলো। যেন সেই-ই মা, অরুণা দেবী মেয়ে। মাকে জড়িয়ে ধরে বড়ো শান্তি পেল কবিতা। বড়ো তৃপ্তি! বুকের মধ্যে ব্যথার পাহাড়টা বুঝি গলতে শুরু করেছে। সূর্য উঠছে যে! আনন্দের সূর্য। দুঃখের শিশির বিন্দু তার আয়ু নিয়ে কতোক্ষণ আর সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে?

তখন সকাল। বেলা সাড়ে সাতটা হবে। তখনও কবিতা ঘুমাচ্ছে। এরমধ্যে চা খেয়েছে একবার। পুনমকে বলেছে, বৌদি আমাকে আজ একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে দাও। কেউ ডেকো না আমাকে নিজের থেকে যখন ঘুম ভাঙবে, তখনই উঠবো। কবিতার কথাই শুনতো পুনম। কক্ষনও ডাকতো না। কিন্তু এখন যে না-ডেকে কোনও উপায় নেই। কবিতার মাথায় হাত রেখে ব্যস্ততার সুরে পুনম ডাকলো।

এই ওঠো! ওঠো। তিমির এসেছে। চোখ মেললো কবিতা পুনমের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। যেন বুঝতে চেষ্টা করছে সত্যি না মিথ্যা! ধমকে উঠলো পুনম এবারে, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে

কি দেখছো তোমার কর্তা ছুটে এসেছে। জব্দ করতে পেরেছো বটে, তিনটি দিন ছেড়ে থাকতে পারলো না। নীচের ঘরে বাবুজি আর তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলছে। আমি কিন্তু...পুনমের কথা শেষ হলো না। ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো তিমির। পুনম বুদ্ধির পরিচয় দিতে এতোটুকু কার্পণ্য করলো না। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। শুধু বললো, এসে গেছে—এখন সামলাও!

বিছানায় শুয়েছিল কবিতা। উঠে বসলো। মাত্র তিনদিনে একি চেহারা হয়েছে তিমিরের। এলোমেলো একমাথা চুল। সিঁথি পর্যন্ত নেই। মুখখানা পান্ডুর। একটু যেন রোগা-রোগা! সারা দেহে ক্লান্তির ছাপ। তিমির, কবিতার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। অনেকক্ষণ ধরে। এক সময়ে তার চোখ দুটি জলে পূর্ণ হয়ে উঠলো। বিছানা ছেড়ে নেমে এলো কবিতা। পরম যত্নে আঁচল দিয়ে তিমিরের চোখের জল মুছিয়ে দিল। অস্ফুট স্বরে বললো, তুমি কাঁদছো! সে-কথার উত্তর দিল না তিমির। বললো, আমি তোমাকে এমনিই বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি এখানে আসবে না। সেই কারণেই আমি বলেছিলাম, 'বেশ তো যেয়ো'। আর সেই কথা শুনেই তুমি চলে এসেছো! আমার কথাটা একবারও ভাবলে না? ছলছল চোখে তিমির তাকিয়ে রইলো। কবিতা ওকে কাছে টেনে নিল। একেবারে বুকের মধ্যে। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললো, পাগল ছেলে। আমি কি তোমার ওপর রাগ করে এসেছি নাকি? তোমাকে তো জানিয়েই এলাম, তাহলে তুমি শুধু শুধু মন খারাপ করছো কেন? তোমার ওপর তো আমার কোনও অভিযোগ নেই।

সেদিন তোমাকে আমি অনেক কথা শুনিয়েছিলাম। আমার মন খারাপ লাগছে সেই কারণেই। মনে হচ্ছে আমার জন্যই বুঝি তুমি চলে এসেছো—

পাগলছেলে। সোনাছেলে আমার—কবিতা গভীর ভাবে আদর করে তিমিরকে। তারপরে অনুযোগের সুরে বললো, একি চেহারা করেছো?

একে তুমি নেই। তার ওপর ট্রেনে এসেছি। পথের ক্লান্তিতে এর চেয়ে ভালো চেহারা আর কি হবে? তিমির আর কথা বাড়ালো না। ছোট্ট ছেলের মতো আদর খেয়ে শান্ত হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার বললো, তুমি এই ভাবে চলে এসেছো, তোমার বাড়ির সবাই কি ভাবছেন বলোতো? আমার তো যথেষ্ট লজ্জা লাগছে। কেউ বোকা নন। তুমি কি মনে করো তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না? ভাবছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার ওপর অনেক অবিচার অত্যাচার করেছি। আর সহ্য করতে না-পেরেই তুমি শেষ পর্যন্ত চলে এসেছো। এমন ভাবাটাই তো স্বাভাবিক। তুমি এলে এখানে। তোমার তিনদিন পর আবার আমি! ওঁরা কে কি ভাবছেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। ছিঃ ছিঃ আমাদের তো এখানে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো মনের অবস্থা এতোটুকু নেই। তুমি খুব অন্যায় করেছো কবিতা চলে এসে—খুব অন্যায়! তোমার বাড়ির লোককে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা হচ্ছে। আমার এই অবস্থায় যদি তুমি থাকতে তাহলেই বুঝতে পারতে। শ্বশুর বাড়িতে কোনও মানুষ এই ভাবে আসে? আমার পজিশনটা কি হয়েছে বলোতো?

সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে। কবিতা আস্তে আস্তে তিমিরের পায়ে হাত রেখে বললো, আর কোনওদিনও এমনটা হবে না। তিমির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার হাতটা চেপে ধরে বললো, এমন ভাবে তো তোমাকে অন্যায় স্বীকার করতে বলিনি। অন্যায়টা বুঝতে পেরেছো এইটুকুই যথেষ্ট! তুমি চলে আসাতে মায়ের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তোমার কথা বলে বারবার দুঃখ করছিলেন। এমনকী এখানে আমাকে পাঠিয়েছেনও তিনি। অবশ্য বাড়ি এসে যখন জানতে পারলাম যে তুমি নেই, তখন এমনিতেই আমি আসতাম। একটু চুপ করে তিমিরে এদিক-ওদিক তাকালো। ঘরের আশেপাশে কেউ আছেন কি-না সেটাই দেখে নিল। প্রশ্ন করলো, তোমাদের বাড়ির কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেননি? প্রশ্নটা করলো বটে তিমির কিন্তু সে জানে, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। সেই কারণেই তিমির আবার বললো, তোমার বাবা কি বললেন? দাদারা মারতে চাননি আমাকে? তিমির একটু হাসলো।

তারা তো তোমাকে পুলিশে দেবার কথা বলছিল। কবিতা মন খুলে হাসলো। বললো, তুমি একেবারেই অবুঝ। আমি এখানে এসেছি বেড়াতে। শ্বশুরবাড়ির নিন্দে করতে এসেছি নাকি যে

আমার বাড়ির লোকেরা সব কিছু জেনে তোমাকে একেবারে সাজা দেবার জন্য ওত পেতে রয়েছে? তোমার বাড়ির নিন্দে করবো আমি কোন প্রাণে? তোমার মান-সম্মান যেখানে জড়িত, তোমাকে ছোট করবো কোন সাহসে? তুমি আমাকে এতোই ছোট্ট ভাবো নাকি?

তা নয়তো কি? একটু বকেছি অমনিই কান্নাকাটি করে চলে এসেছো! ছোট্ট মেয়ে ছাড়া এমন ছেলেমানুষি কাজ কেউ করে নাকি?

দরজার ভারী পর্দার আড়ালেই দুই বৌ অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল। পুনম আর সুষ্মা। খাবার হাতে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে তারা। ভেতর ঢুকতে পারছে না। সে-উপায় নেই। তিমির আর কবিতা যা শুরু করেছে তাতে ভেতরে ঢুকে ওদের লজ্জায় ফেলে কি লাভ? কবিতা তিমিরকে বুকের মধ্যে নিয়ে সেই কখন থেকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবার ছলে আদর করেই চলেছে। এই অবস্থায় খাবার কেন রাজ-সিংহাসন নিয়েও তো যাওয়া যায় না। অতো উত্তাপহীন মানুষ পুনম, সুষ্মা দুজনেরই কেউ নয়। তারা বোঝে আদরের কি স্বাদ! সব মূল্যের ওপরে এর মূল্য! কবিতার বড়ো ভাই অর্থাৎ পুনমের স্বামী যোগীন্দর আসছিল এদিকেই। পুনম আগে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, যাচ্ছো কোথায়?

তিমিরকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুবো।

আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তুমি! পুনম ধমক উঠলো স্বামীকে! ও কি তোমার সঙ্গে বেড়াবার জন্য অতো দূর থেকে ছুটে এসেছে নাকি? বয়েস বাড়ছে আর দিন দিন বুদ্ধি হারাচ্ছো! শাসনটুকু গায়ে মাখলো না যোগীন্দর। প্রশ্ন করলো, খাবারের ডিশ নিয়ে তোমরাই-বা এখানে দারোয়ানের মতো দুজনে দুই দিকে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওরা কি ভেতরে নেই?

আছে। ছোট্ট উত্তর দিল পুনম। কথাটা শুনেই ঘরের ভেতরে ঢুকবার জন্য পা বাড়ালো যোগীন্দর। ওর জামাটা এক হাত দিয়ে টেনে ধরলো পুনম। চোখে চোখে শাসন করেই দ্বিতীয়বার ধমকে উঠলো, ভেতরেও যেয়ো না—তাহলে আমরা এখানে চৌকিদারি করছি কেন? তোমার আগেই ভেতরে ঢুকতে পারতাম। কথাটা বলেই পুনম চোখ দিয়ে নীরবে একটু ইঙ্গিত করতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলো যোগীন্দর। না-বুঝে এতোক্ষণ অনেক অল্প বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে স্ত্রী ও ছোট ভাইয়ের বৌ-এর কাছে। যোগীন্দর আর দাঁড়ালো না। এসেছিল যেমন ভাবে তারচেয়েও বেশি জোরে পা চালিয়ে চলে গেল।

দুপুরে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসলেন কাপূরজি। মেয়ে জামাই, ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়ার তৃপ্তি অনেক। অরুণা দেবীই শুধু খেতে বসলেন না। বললেন, আমি তোমাদেরকে পরিবেশন করবো। কাপূরজি শুনলেন না। বললেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে যাও না, চরণ আছে, যোগাভানু রয়েছে, ওরাই খেতে দেবে'খন।

ওদের দিয়ে পরিবেশনের কাজ চলবে ঠিক কথা, কিন্তু আমাকে আজকের এই আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত করছো কেন? আমারও তো তৃপ্তি বলে একটা কিছু আছে। সত্যি কথাই বলেছেন অরুণা দেবী। কাপূরজি তাই আর কথা বাড়াননি। দুটি বৌ-ই নিজেরা না-বসে পরিবেশনের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল। অরুণা দেবী তাদেরকে বাধা দিয়ে বলেছেন, তোমরা আমাকে সামান্যতম কাজও করতে না-দিয়ে কুঁড়ে বানাতে চাও নাকি? তোমরা তো রোজই করো। একটা দিন অন্তত আমাকে সুযোগ দাও।

সবাইকে খেতে দিচ্ছেন আর গল্প করেছেন অরুণা দেবী। বললেন, আমার কিন্তু একটা ইচ্ছা হচ্ছে।

বলে ফেলো। সূত্র ধরিয়ে দিলেন কাপূরজি।

সেই তিন বছর আগে একবার গিয়েছি। তারপরে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি! এবারে তিমিরও রয়েছে। চলো, সবাই মিলে আমরা মাদুরাই যাই। মীনাক্ষী মন্দির দেখে আসি।

উত্তম প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন জানালেন কাপূরজি। পরে বললেন, তবে আমাকে বাদ দিয়ে

তোমাদের যেতে হবে।

কেন? অরুণাদেবী প্রশ্ন তুললেন।

তোমাব না-যাওয়ার কি আছে? এবারে কবিতা বাবাকে কোণঠাসা করলো। পুনম ও সুস্মা দুজনেই বললো, আপনি না-গেলে আমরা কেউ যাবো না।

হামভি নেহি। পুনমের বড়ো ছেলে সুরিন্দরও শিশুসুলভ ভঙ্গিতে তার মতামত জানালো।

মা যখন এতো করে বলছেন, তখন চলোই না, যোগীন্দরের কথায় ছোট ভাই মহিন্দরও সুর মেলালো।

কী ব্যাপার! কাপূরজি একগাল হেসে সকলের দিকে তাকালেন। তোমরা দেখছি সকলেই তোমাদের মাযের দলে। কোঈ বাত নেহি—আর হাসলেন কাপূরজি। আমার দলে অন্তত একজনকে পাবো। সে হলো তিমিব। তোমরা তো বুঝতে চাইবে না, ওকেই জিজ্ঞেস করো না—খববের কাগজে চাকরি করলে অতো সহজে ছুটি-ছাটা পাওয়া যায় নাকি? হরতাল-ধর্মঘটের দিনে যাদের কাজে বের হতে হয, তাদের মীনাক্ষী মন্দির দেখা তো দূরের কথা, মরতে বললেও মরবার সময় পাবে না। তবে হ্যাঁ, আগে থেকে জানা থাকলে ছুটি নেওয়া যেতে পারে। সে-সময়ও তো নেই। আমার মতো তিমিরও তো কাগজের লোক। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে, আমি ভুল বলছি কিনা?

একেবারেই বাজে কথা বলবে না। অরুণা দেবী এবারে রেগে গেলেন। জিজ্ঞেস করে আর জানতে হবে না। চল্লিশ বছব ধরে তো দেখতেই পাচ্ছি। আসলে ছুটি-ছাটা তুমি ইচ্ছে করেই নিতে চাও না। নযতো ছুটি নেওয়ার উপায় ঠিকই আছে। তিমির নিচ্ছে কি করে? লজ্জায় পড়লো তিমির। এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল সে। এবারে তাকে কিছু বলতেই হয়। অরুণা দেবীর দিকে একবার চেয়েই সে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বললো, বাবুজির সঙ্গে আমার তুলনা দেবেন না। আমি একজন সাধারণ রিপোর্টার! আর উনি হলেন এডিটর। বিরাট ব্যবধান। বিস্তব পার্থক্য। কোনোদিক দিয়েই তুলনা হয না। দায়িত্ব এডিটরের অনেক বেশি।

আমি ঠিকই বলছি। জামাইয়ের কথাও মেনে নিতে পারলেন না অরুণা দেবী। আমার তো মনে হয় দায়িত্ব রিপোর্টারদেরই বেশি। তোমরা চতুর্দিক ছোটাছুটি করে, সারা রাজ্য তোলপাড় করে সংবাদ সংগ্রহ করে ওই মানুষগুলির হাতে তুলে দাও। অরুণা দেবী স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন, আর ওঁরা 'এনে দাও বসে মারি' নীতি অনুসবণ করে দিব্যি ঠান্ডা ঘরে অতি আরামে চেয়ারের সঙ্গে আঠা লাগিয়ে বসে আছেন। কোথাও দৌড়ঝাঁপ করতে হয় না, বিপদ-আপদের মুখোমুখি হতেও হয় না—এই তো ওঁদের কেরামতি! ও-সব আমার জানা আছে।

বাবা তুমি আর আপত্তি কোরো না। কবিতা বড়ো করুণ ভাবে বললো, সকলে মিলে যখন এক জায়গায় হয়েছি.....আবার কবে আসবো তার তো কোনও ঠিক নেই। নিথর দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন কাপূরজি। কবিতা হয়তো আরও কিছু বলতো। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। ওই কথাতেই কাজ হলো অনেক। কাপূরজির মন-প্রাণ স্নেহের আর্দ্রতায় ভরে উঠলো। 'আবার কবে আসবো তার তো কোনও ঠিক নেই।' কবিতার কথাটা মনোবীণায় একটানা বেজে চলেছে। মেয়ের দিকে চেয়ে কাপূরজি ম্লান হাসলেন। বললেন, তোমার কাছে আর জিততে পারলাম না বেটি। তোমার কথা না-শুনে কি উপায় আছে? সবাই যখন বলছো—তখন চলো।

ওরা মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দিরেই শুধু দেখলো না—দেখলো রামেশ্বরমের মন্দিরও। সেখান থেকে কন্যাকুমারিকা। ওই সব দর্শনীয় স্থান ও মন্দির এক-একজনের তিন-চারবার করে দেখা। তবে তিমিরের কথা আলাদা। সে এই প্রথম দেখেছে। সেই কারণে তার খুবই ভালো লেগেছে। মন্দিরময় ভারত। ভারতের দক্ষিণ দিকটা ঘুরলে ওই কথাই মনে হবে।

একটি সপ্তাহ কেটে গেল মাদ্রাজে। সত্যি কথা বলতে কি এতোদিন থাকবে মনে করে তিমির এখানে আসেনি। এখানে পৌঁছেই কবিতাকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলে সেটা অবশ্যই খারাপ দেখায়। সেই জন্যই তিমির ঠিক করেছিল দিন চারেক থাকবে। সেখানে আরও কয়েকটি দিন বেড়ে গেল।

আর দেরি করা যায় না। এবারে রওনা হবার পালা। মা ওদিকে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। কতো কি ভাবছেন নিশ্চয়ই। যদিও তিমির এখানে আসার দ্বিতীয় দিনে একটি চিঠি লিখে দিয়েছে। তবুও বাড়ি গিয়ে না-পৌঁছানো পর্যন্ত মায়ের শান্তি নেই—তিমির তা জানে।

মাদ্রাজ সেন্ট্রাল থেকে হাওড়া স্টেশন। হাওড়া থেকে ট্যাক্সিতে নাকতলা, টালিগঞ্জ। ট্যাক্সি থেকে নামতেই কবিতার প্রথম দিনের কথা মনে পড়লো। যেদিন সে নতুন বৌ হয়ে এসেছিল। সেদিন বারান্দায় ছায়া দেবী দাঁড়িয়েছিলেন। আজও ঠিক তাই। মনে হয় কোথাও কোনও কিছুর পরিবর্তন ঘটেনি। সবই ঠিক আছে। পশুপতি জল ভরা চোখে কবিতাকে প্রণাম সেরে বললো, 'আপনে ছোট-বৌদিমণি মানুষ বড়ো সুবিধার না। আমাগো দুঃখু দেতে পারেন। আমি আর কি বলবো, মায়ের কাছে যায়েন। আপনে চইলা যাবার পর থিকা সেই যে প্যাঁচাল পারতেছেন, এখন সামনে গিয়া খাঁড়াইলে যদি চুপ করেন।

ছায়া দেবীকে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, থাক, থাক। আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না। সেই একই কথা। একই সুর। একই ভঙ্গিমা! কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম দিনের চেয়ে আজকের এই বলাটুকুর মধ্যে কতো ব্যবধান। কতো প্রভেদ! আজকের সুরটুকু সম্পূর্ণ অভিমানের। আধিপত্যের। অধিকারের। কবিতার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু বললেন, আসতে পেরেছো তাহলে!

সেদিন অফিসে গেল আর চলে এলো তিমির। আগামী পরশু নয়াদিল্লিতে নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে রাতের ট্রেনেই তিমিরকে রওনা দিতে হবে। হাতে একেবারেই সময় নেই। জিনিসপত্র গুছাতে হবে। তিমির তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে অফিস থেকে।

স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেই কবিতা দেখতে পেল তিমিরকে। জিজ্ঞেস করলো, কখন এসেছো?

এইমাত্র।

আজ এতো তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?

আজকেই দিল্লি যেতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে হবে আমাকে।

তুমি চলে যাবে! নিস্তেজ গলায় কবিতা বললো, তুমি থাকবে না—আমি একা একা থাকবো কেমন করে?

তোমার কোনও ভয় নেই। আমি মাকে সব বলে যাবো। তাছাড়া মাত্র তিনটি দিনের জন্য তো যাচ্ছি। দেখতে-না-দেখতেই কেটে যাবে।

তুমি তো বলছো কেটে যাবে, কিন্তু আমার সময় যে কাটতেই চাইবে না। তা তুমি কেমন করে বুঝবে? সত্যই বড়ো ভয় হলো কবিতার। তিমির থাকতেই তাকে এতো অবাঞ্ছিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, আর সে না-থাকলে যে সেই ঘটনার রেশ কতোদূর গড়াবে তা কবিতা ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই মনটা তার অস্বাভাবিক দমে গেল। ছোট্ট মেয়ের মতো গোমড়া মুখে বারবার তাকাতে লাগলো তিমিরের দিকে। যেন সব দোষ তারই। কবিতাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে সে অনায়াস ভঙ্গিতে পাড়ি দিচ্ছে।

আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট মেয়ের বায়নাকেও হার মানিয়ে বলে বসলো কবিতা।

এই যা ভেবেছিলাম এতোক্ষণ! তুমি ঠিক এই কথাটিই বলবে। বলতে বলতে তিমির এগিয়ে এলো কবিতার কাছে। দাঁড়ালো ঘনিষ্ঠ হয়ে। ওর সজল কালো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে হাসলো একটু। পরে কবিতার মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে একটু নাড়িয়ে দিয়ে বললো, ভয় কি? আমি নেই, মা'তো থাকবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিমিরের জামা-প্যান্ট গুছাতে বসলো কবিতা। এক সময় বললো, সত্যিই তো তিনদিন পর ফিরে আসবে? কবিতার কণ্ঠে সন্দেহের সুর। নাকি আর বেশি দিন থাকবে?

ঠিক তিনদিন। একটু হেসে তিমির ওর সন্দেহকে দূর করে বিশ্বাসকে গাঢ় করলো।

নীচে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। তিমির গাড়িতে গিয়ে বসলো। পশুপতি স্যুটকেসটা গাড়ির ভেতর আগেই তুলে দিয়েছে। বারান্দার দিকে চাইলো তিমির। ছায়াদেবী আর কবিতা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মা-র ডান হাতখানা পরম স্নেহে কবিতার কাঁধের ওপর পড়ে আছে। মায়ের এই আমূল পরিবর্তনটুকু দেখে গভীর আনন্দে তিমিরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো।

পশু! তিমির ডাকলো।

কয়েন ছোটবাবু।

তোর ছোট বৌদি রইলো। ওকে একটু দেখাশোনা করিস। এই কথাটা বলার কারণ আছে। তিমির খুব ভালোভাবেই জানে, পশুপতি কবিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে।

আপনে কোনও চিন্তা করবেন না ছোটবাবু। আন্তরিকতার সঙ্গে পশুপতি তিমিরকে আশ্বাস দিল।

সেদিন সকালবেলা চা-জলখাবার বানালো স্বাতীবৌদি। সুবীর আর চন্দনাকে নিজেই গিয়ে খাবার দিয়ে এলো। পরে নিজে খেয়ে ডাকলো পশুপতিকে। ওর হাতে চা-খাবারটা দিয়ে বললো, মহারাণীকে দিয়ে আয়। স্বাতীবৌদি কাকে মহারাণী সম্বোধন করলো তা পশুপতি ভালো করেই বুঝতে পারলো। বুঝতে না-পারার মতো বোকা সে নয়। স্বাতীবৌদি ছোট বৌদিমণিকেই মহারাণী বলে উল্লেখ করলো। পশুপতি চা-খাবার নিয়ে চলে না-গিয়ে সম্পূর্ণ বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবখানা এই, সে এ-সবের কিছুই জানে না, বা বোঝে না। তাকিয়ে রইলো বোবা দৃষ্টিতে।

দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দিয়ে আয়।

কারে দিয়া আসুম? স্পষ্ট জানতে চাইলো পশুপতি।

এ-বাড়ির মহারাণী অধিরাণীকে।

মহারাণী অধিরাণী বইলা তো এ-বাড়িতে কেউ নাই। পশুপতির পরিষ্কার উত্তর।

আছে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো স্বাতীবৌদি। তোর ছোটবৌদি, বুঝলি?

তাই বলেন—একগাল হাসলো পশুপতি। বোকা হাসি। পরে বললো, তা ও-সব রাণী-ফাণী না-কইয়া ছোট বৌদি কইলেই তো হইতো। এই আমি আমার কথাই ধরেন না ক্যান, আমার নাম হইল গিয়ে আপনের পশুপতি। এহন আপনে যদি আমারে বিশ্বপতি বা জগৎপতি কইয়া ডাক পাড়েন, তায় আমি ক্যামনে বুঝুম। কয়েন?

রাত অনেক হলো। এখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। কবিতার মনটা আনচান করছে। ঘুম আসছে না। শুধু আজকের এই রাতটা শেষ হলেই বাঁচে। বেশ কয়েকদিন একটানা বৃষ্টি হওয়ার পর সূর্য ওঠার আনন্দের মতোই খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠবে কবিতার সারা মন-প্রাণ। কাল সকালেই দিল্লি থেকে ফিরে আসছে তিমির। কিন্তু এই রাতটা যে কিছুতেই শেষ হতে চাইছে না। দীর্ঘ রাত্রিটা আসলে কবিতার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে। রাত্রিটা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ সে এতো তাড়াতাড়ি বিদায় নেবে না। কবিতা মধ্যে মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে বড়ো ঘড়িটা দেখে। ঘড়ি দেখে আর মনে-মনে হিসেব করে ভোরের আর বাকি কতো। তিমিরকে ছেড়ে এই তিনটি দিন থাকতেই ওর মন হাঁপিয়ে উঠেছে, না-জানি আর কয়েকদিন থাকলে... অতো দীর্ঘ দিন কবিতা সহ্য করতেই পারবে না। তাহলে সে-ও তিমিরের সঙ্গ দেবে।

তিমির এলো সকালে। ছায়া দেবী কবিতাকে ডেকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তিমু যে-সব জিনিস খেতে ভালোবাসে, সে-গুলি রান্না করো। ছায়া দেবীর কথা মতো কবিতা রান্না ঘরে গেল বটে, কিন্তু এই যাওয়া নিয়েই যে এতো বড়ো একটা কান্ড ঘটবে তা সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি।

কবিতাকে রান্নার নির্দেশ দেওয়াতে স্বাতীবৌদির হলো রাগ। তাই পরোক্ষে কবিতাকে শোনাতে লাগল বাঙালির ঘরে জন্ম আমার। রান্না করতে তো শিখিনি, তাই এবারে শিখতে হবে.... দেখি কেমন রান্না করে? উনি যে কতো গুণের রাধা তা তো জানাই আছে।

কবিতা বুঝতে পারলো, স্বাতীবৌদি তাকেই বলছে। কিন্তু সে কোনওরকম উত্তর দিল না। রইলো চুপ করে। তার ধারণা, সে যদি চুপ করে থাকে, তাহলে স্বাতীবৌদি কতোক্ষণ আর তাকে বলবে?

ছোট টুলটায় বসে রান্না করছে কবিতা। পিছনে স্বাতীবৌদি মেঝেয় বসে নিজের কাজ করছে। কড়াইটা উনুনে চাপিযে দিয়ে আলমারী থেকে তেলের টিনটা নামালো কবিতা। শিশিতে তেলটা ঢালবার সময় হাতটা হঠাৎ ফসকে যাওয়ার ফলে টিনেব সমস্ত তেলটুকু মেঝেতে পড়ে গেল। আর যায় কোথা? এবাবে আব পবোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ ভাবেই স্বাতীবৌদি তীব্র ভাবে আক্রমণ কবলো কবিতাকে। যে-কথা শোনাবার তা শোনালো। আর যে-কথা শোনাবার নয়, তাও শোনাতে ছাড়লো না। বললো, গরিবের সংসার একটু বুঝে চলতে শেখো। জিনিসপত্রের দাম দিন দিন যে-ভাবে বাড়ছে, তাতে এই সংসার টেকাই দায়। কোথা থেকে টাকা আসে, কীভাবে কি চলছে-না-চলছে, তা তুমি জানবে কেমন করে। বড়োকর্তা তো উদয়-অস্ত খেটে যা উপার্জন করছে তাই ঢালছে সংসারের জন্য। আর তুমি কি-না সেই রক্ত জল করা অর্থের অপব্যয় করছো? বলি, কটা টাকাই-বা এই সংসারে তোমাব কর্তা দেয়? করে তো ওই রিপোর্টারের কাজ! তাচ্ছিল্যের সুরে স্বাতীবৌদি বলে চলে, কতোখানি ক্ষমতা তা আমার জানা আছে। দুটো টাকা বেশি চাও। হাত দিয়ে জল গলে না, অথচ তুমি একাই দিনের-পর-দিন খবচা বাড়িয়ে চলেছো। আজ তেল ফেলে দিচ্ছো, কাল কাপডিশ ভেঙে তছনছ করছো, এ তো লেগেই আছে। কর্তাকে আবও বেশি টাকা দিতে বোলো বুঝলে। তারপরে যতো খুশি তেল ঢেলো, কাপডিশ ভেঙো। পবের ঘাড়ে বসে এতো নবাবী একটু কম করলে ভালো হয় নাকি? ইতিমধ্যে স্বাতীবৌদির কথা শুনে অনেক আগেই রান্না ঘবেব সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ছায়া দেবী। সঙ্গে তিমির। সব কথাই তাদের কানে গেছে। স্বাতীবৌদি তার শেষ অস্ত্র ছাড়লো, আব নবাবী তুমি করবে-বা কেন? একগাদা লোকের সামনে একটু কোমর দোলাতে পারলেই তোমার পয়সা, আমাদের তো তা নয়। খাটুনীর পয়সা। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পয়সা। তাই গায়ে লাগে। তোমার কর্তা তো তোমাকে দিয়ে ফাংসানে নাচিয়ে দিব্যি টাকাগুলি ব্যাঙ্কে জমা করছে তা কি আমি বুঝি না? সেই রকম মনোভাব বড়োকর্তার থাকলে এতোদিনে বাড়ি-গাড়ি করতে পারতাম। স্বাতীবৌদির ওই কাটাকাটি কথা শুনে দুঃখে-অভিমানে, ব্যথায়-বেদনায় নীল হলো তিমির। যেন বিষ পান করেছে। স্বাতীবৌদির কথাগুলি শুনে বিস্ময়ে আহত দৃষ্টিতে তাকালো সে ছায়া দেবীর দিকে। যেন করুণ চোখেই বলতে চাইলো, এরপরেও তুমি আমাকে এই বাড়িতে থাকতে বলবে? ছেলের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারলেন না ছায়া দেবী। লজ্জায় ঘৃণায় তাঁর মাথাটাও মাটির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। আর আঘাত পেয়ে প্রাণশূন্য পাথরের মূর্তির মতো মাথা নিচু করে বসে আছে কবিতা। এই সংসারে এসে ও শুধু দুঃখই পাচ্ছে। আঘাতের-পর-আঘাত। যেন বিরাম নেই। কতো আর সহ্য করবে? কবিতার দিকে চেয়ে ভারী মমতা হলো তিমিরের। সে আর অপেক্ষা করলো না। কবিতার হাতটা ধরে প্রায় টেনেই সোজা ঘরে নিয়ে এলো। অনেক অপমান সহ্য করেছে তিমির, অনেক শিক্ষা হয়েছে তার। কিন্তু আর নয়। জিনিসপত্র গোছাতে থাকে সে। কথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। তাতে ঝগড়াই বাড়বে। সমাধান হবে না। স্থির সিদ্ধান্তে পৌছালো তিমির। এ-বাড়ি ছেড়ে সে চলে যাবে। যে-বাড়িতে কবিতা থাকলে এতো অশান্তি, এতো যন্ত্রণা সেখানে থাকার চেয়ে না-থাকাই ভালো।

ছায়া দেবী অপরাধীর মতো ঘরের কোণে এসে দাঁড়ালেন। জিনিসপত্র বাধা হচ্ছে। নীরবে কিছুক্ষণ দেখলেন ছায়া দেবী। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কোনও কারণই নেই। তিনি ব্যাকুল হয়ে তাই জিজ্ঞেস করলেন, কি রে চললি কোথায়?

—যেখানেই যাই এই বাড়িতে আর নয়। এবারে আর দুঃখ নয়—রেগে উঠলো তিমির। বললো, কবিতাকে না-হয় তোমাদের অমতে বিয়ে করেছি। সে-কারণে ও দিনের-পর-দিন এমন ভাবে অপমান অবহেলা সহ্য করবে— তা তো হতে পারে না! এই সংসারে এসে পুরস্কার হিসাবে ওই গুলি পাওয়া ছাড়া কবিতা আর কি পাচ্ছে বলতে পারো মা? ছায়া দেবী স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, তিমিরকে

বাধা দিয়েও ধরে রাখতে পারবেন না। তাই তিনি কবিতাব শরণাপন্ন হলেন। বললেন, বৌমা, তুমি ওকে বারণ করো।

না, মা। কারও বারণই আমি শুনবো না। ইস্পাত কঠিন সুর তিমিরেব গলায়। তারপরেই খেদ মিশিয়ে বললো, অনেক তো হলো, আর কতো সহ্য করতে বলো? সবারই সহ্য করবার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে-ক্ষমতার উর্ধ্বে গেলে আর কিছু কবার থাকে না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না মা। সত্যই তো কটা টাকাই-বা আমি সংসাবে দিই! কিন্তু তুমি তো জানো, টাকা হয়তো আমি কম আয় করি, তবে যা পাই তোমার হাতে এনে সবই তুলে দিই। বড়দার টাকার অঙ্কের কাছে আমারটা হয়তো কিছু নয়। কিন্তু আমি তো আমার আয়ের সবটাই দিতে চেষ্টা করি। সেটাই কি সব নয় মা? সেখানে বৌদি আজ কি কথাই না শোনালো! তার কি ধারণা আমি বেশি আয় করে সংসাবে কম দিচ্ছি? এখানে থেকে আমি চলে যাবো। তুমি আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। লোকে আমাদেব চলে যাওয়াটা দেখবে। হয় তো নিন্দেও করবে কেউ কেউ কিন্তু আমার যে কোথায় কতোখানি লেগেছে তা কেউ এতোটুকু বুঝতে পারবে না। না-পারবো কাউকে বলতে, না-পাববো কাউকে বোঝাতে, লোকে শুনলে বিশ্বাসও করতে চাইবে না। এতো ছোট এতো সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এমন অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারে? তুমিই বলো না মা, কার হাত থেকে তেল পড়লো, কাপ ভাঙলো, একি হিসেব করার বিষয? আজ কবিতার হাতে হয়েছে কিন্তু বৌদি বা চন্দনার হাতেও এটা হতে পারতো। এতে হিসাব-নিকাশ বা হা-হুতাশ করার কি আছে? আর সংসাবে আমার কম টাকা দেবার মতো জঘন্য প্রশ্নই-বা আসছে কোথা থেকে? কোমর দুলিয়ে পয়সা উপার্জন করে ব্যাঙ্কে জমানোর মতো নোংবা ইঙ্গিত করার সাহসই-বা পায় কোথা থেকে? সুতরাং পরিষ্কাব বোঝা যাচ্ছে আমাকে আঘাত দেবার জন্যই বৌদির এ-সব কথা বলা। আচ্ছা মা—এতো আঘাত পেয়েও কি তুমি আমাকে আরও সহ্য করে এখানে থাকতে বলো?

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে কবিতার সঙ্গে করে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলো তিমির। চোখের পাতা দুটি তাব ভিজে উঠেছে। তাকাতে পাবছে না মায়ের দিকে।

তুই তাহলে যাবিই? কান্নাভেজা গলায় শেষবারের মতো জানতে চাইলেন ছায়া দেবী।

হ্যাঁ মা।

ছায়া দেবীব দুই চোখে তখন কবিতার সেবা-যত্নের ছবিটা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করেই তাকে প্রণাম করা, পুজোর ফুল তুলে দেওয়া, পরিপাটি করে খেতে দেওয়া, খাওয়ার সময়ে সর্বক্ষণ কাছে বসে থেকে তদারক করা, এমনকী এঁটো বাসন পর্যন্ত পরিষ্কার করা, কি-না করে কবিতা! খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তার খেয়াল। মুগের ডাল ভিজিয়ে চিনি, নারকেল দিয়ে খেতে ভালোবাসেন ছায়া দেবী। কবিতা তাও তৈরি করে তার হাতে তুলে দেয়। তারপর আছে বিছানা করা, মশারি টাঙ্গানো, হাত-পা টিপে দেওয়া: সব কাজ কবিতা একা তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। প্রতিটি কাজই সে আন্তরিকতার সঙ্গে করে। আব যাই হোক দিনের-পর-দিন লোক দেখানো কাজ এমন ভাবে কক্ষনও করা যায় না। তাতে ক্লান্তি আসে। কবিতার কিন্তু ক্লান্তি নেই। সে যা করে, প্রাণ ঢেলে করে। সেবার প্রতিমূর্তি মেয়েটা। অথচ ছায়া দেবী নিজেও তো কি অপমানটাই না করেছিলেন প্রথম দিনে। কবিতা এতোটুকু দমে যায়নি। রাগ করে দূরেও সরে থাকেনি। পরদিনই আবার হাসিমুখে এগিয়ে এসেছে সেবার ডালি সাজিয়ে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি কবিতার। এ-সব কাজ তো সে না-করলেও পারতো। কেনা-না সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘবের মেয়ে সে নয়। তবুও কবিতা করেছে। ছায়া দেবীর মুখে হাসি ফোটাতে, তাঁর মন জয় করতে নিরলস ভাবে কবিতা কাজ করেছে। সেই কবিতার জন্য ছায়া দেবী নিজে কি করেছেন? কিছুই করেননি। সেই কারণেই ছায়া দেবীর মনটা দুঃখে ভরে উঠলো। কবিতা চলে গেলে সে শাস্তি যে ছায়া দেবীরই। বারবার, ঘুরে-ফিরে তাঁব মনের মধ্যে একটি কথাই তোলপাড় কবছে। কবিতা তার জন্য অনেক কিছুই করেছে—কিন্তু কবিতার জন্য তিনি কিছুই করেননি। এ-বেদনা, এ-লজ্জা ছায়া দেবী রাখবেন কোথায়? কবিতার

দিকে তাকালেন ছায়া দেবী। মেয়েটা মাথা নিচু করে মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে। দৃষ্টি তুলতে পারছে না। একবার চোখে তুলে তার দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে আবার দৃষ্টি নিচু করে নিল। ছায়া দেবী পরিষ্কার ওই পলকের মধ্যেই অনুভব করলেন এতো কান্ডের পরেও তাকে ছেড়ে যেতে কবিতার ইচ্ছে নেই। কিন্তু স্বামীর কথা না-শুনেও তো ওর উপায় নেই। ছায়া দেবী ভেতরে ভেতরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। যদিও বাইরে তা প্রকাশ হতে দিলেন না। শুধু আবিষ্কার করলেন কবিতাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারবেন না। কবিতার জন্য তিনি সব কিছু ছাড়তে পারেন কিন্তু কোনও কিছুর জন্য কবিতাকে ছাড়তে পারবেন না! ছায়া দেবী বললেন, তবে আমাকে সঙ্গে নে—আমিও তোদের সঙ্গে যাবো।

শেষ পর্যন্ত বিজাতীয় বৌকে নিয়ে ঘব করতে পারবেন তো। ঘর থেকে বারান্দায় এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো স্বাতীবৌদি। শাশুড়ীর উদ্দেশে কথাটা বলেই তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো কবিতার দিকে।

জাতের কালিমা আমাব মনের মধ্যে আর নেই বড়ো বৌমা, করুণ হাসলেন ছায়া দেবী। আর জাতেব পার্থক্য বলেও কিছু নেই আমরা সবাই একজাতি। আমরা ভারতীয়!!

———

নিঃশব্দের নিকটে



বাসের জন্য যশোর রোডে দাঁড়িয়ে ছিল সুধীমন। প্রাইভেট বাসগুলো একের-পর-এক আসছে, থামছে, আবার ছুটে চলেছে। কিন্তু দীর্ঘ ন'বছর কলকাতায় না-থাকার দরুণ ভিড় বাসে ঠেলে ঠুলে ওঠার কৌশল অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। একটু আগে একটা বাসে উঠবার চেষ্টা করেছিল। সুধীমনের পাটাকেই ফুটবোর্ড ভেবে একজন দিব্যি একটা লাফ মেরে উঠে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাটাকে সরিয়ে নিয়েছে সে। তারপর থেকে আর বাসে ওঠার চেষ্টা করেনি। মিনি বাসিগুলোও ভর্তি হয়ে আসছে। তবে ওঠা যায়। ইচ্ছে করেই সুধীমন উঠছে না। কারণ ছ'ফুটের কাছাকাছি হাইট নিয়ে একটা মিনিবাসের কাছে মাথা নত করার যে-যন্ত্রণা সেটা সে গতকালই ভালো ভাবে টের পেয়েছে। আর নয়। বসার জায়গা না-পেলে মিনিবাসে আর ওঠা নেই। সুধীমন ঘাড়ে হাত বুলিয়ে কষ্টটা আর একবার অনুভব করলো।

সিগারেট ধরালো সুধীমন। তার অতো তাড়া নেই। হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া কোনও কাজ নেই। অফিসের কাজে কলকাতা এসেছে কয়েকটা দিনের জন্য। আগামীকালই বিকেলে বাঙ্গালোর চলে যাবে। দমদমে এসেছিল বিশেষ একটা কাজে। এসপ্ল্যানেডের হোটেলে ফিরবাব পথেই এই ঝামেলা।

ইতিমধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সুধীমন কোথাও নিরাপদ আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলো না। ওই সামান্য বৃষ্টিতে কিছুই হবে না, এমনই একটা ভাব নিয়ে সে দাঁড়িয়েই রইলো। কিছুক্ষণ পরেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামলো। বাস স্টপেজের লোকেরা যে যেদিক পারলো দৌড় লাগালো। কেউ কেউ আশ্রয় নিল সামনের দোকানগুলোতে। বেশিরভাগ লোকই ঠেলাঠুলি করে জটলা পাকালো বাস-স্ট্যান্ডের ছোট্ট ছাউনীতে। সুধীমনের সামনে এসে একটি মেয়ে দাঁড়ালো।

সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারা। গায়ে বৃষ্টি ভেজা ঘামের গন্ধ। জলের ছাঁট থেকে বাঁচতে সে ক্রমশ পেছনে সরতে গিয়ে সুধীমনকেই শাড়িতে জড়াতে লাগলো। অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুধীমন সামনে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। বৃষ্টিতেই ভিজবে সে। এগারো বছর আগে এমনি বৃষ্টিতে সে প্রায়ই ভিজতো। অবশ্য তখন সঙ্গে থাকতো সুচেতা। তাদের বিয়েটা না-হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। খুব অবাক করে দিয়ে সুচেতা বিয়ে করলো দেবুকে। খুবই কষ্ট পেয়েছিল সুধীমন। সেই কষ্টটা এখনও বুকের মধ্যে লেগে রয়েছে। সেটা সুচেতাকে না-পাবার জন্য যতোটা নয়, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এগুলো কতো তাড়াতাড়ি মানুষের জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে দেখে।

সুচেতার কথা আর ভাববে না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য সুধীমন রাস্তার চারপাশে একবার চোখ বোলালো। ভিজতে ভিজতে অলস ভঙ্গিতে দুটি ছেলে-মেয়ে হেঁটে চলেছে। নিজেদের কথাতেই ওরা মশগুল। কতো গুরুত্বপূর্ণ হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কে জানে? শখ করে কেউ এ-ভাবে জলে ভেজে না। সুধীমনের সামনে ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট ফিয়াট এসে থামলো। চালকের আসন থেকে বাঁ পাশের জানলায় সরে এসে মুখ বাড়ালো সুচেতা। সমস্ত বিস্ময় গলায় ঢেলে দিয়ে সে বললো, তুমি?

সুধীমন কোনও উত্তর না-দিয়ে সুচেতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এগারো বছর আগের সেই সুচেতা। একটু আগেই যার কথা সে ভাবছিল। খুব বেশি বদলায়নি ও। একটু মোটা হয়েছে এই যা। মুখখানা আগের মতোই লাবণ্যময়। সুধীমন ভেবে পেল না, এই মুহূর্তে সে কী বলবে? নাকি না-চেনার ভান করে চুপ করে থাকবে? সেটা অবশ্য সম্ভব নয়। প্রিয়জনকে দেখার আকাঙ্ক্ষা

সুধীমনের দুই চোখে লেগে রয়েছে। এটাকে জোর করে অস্বীকার করা যায় না। সে খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, হ্যাঁ আমি।

সুচেতা যেন তার চেতনা ফিরে পেল। সুধীমন বৃষ্টিতে ভিজছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বললো, উঠে এসো। সুধীমনের দ্বিধা দেখে সুচেতা আবার অনুনয়ের সুরে বললো, আমি বলছি, উঠে এসো প্লিজ।

সুধীমনের সঙ্কটটা অন্য কারো বোঝার ব্যাপার নয়। বাস-ছাউনি এবং দোকানগুলোতে আটকে থাকা মানুষগুলোর কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নিজেকে কতোক্ষণ অসহায় ভাবে তুলে ধরা যায়? তাছাড়া দু-চারজন হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। দুটি অল্প বয়সী ছেলে সুচেতার মুখের ওপর থেকে চোখই সরাচ্ছে না। একজন তো মন্তব্যই করে বসলো, দাদা আপনি ভাগ্যবান। দেরি না-করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন—

আলগা ধরনের সেই পরিবেশ থেকে মুহূর্তে সরে যাওয়া দরকার। মানুষের চোখগুলো ক্রমশই লোভী হয়ে উঠছে। সুধীমন তার সমস্ত সঙ্কোচকে দূরে সরিয়ে রেখে গাড়িতে উঠে বসতে বসতে ভাবলো, আমি কী ভুল করলাম?

নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। সুধীমন পকেট থেকে রুমাল বের করে গা-মাথা মুছতে গিয়ে দেখলো সেটাও প্রায় ভিজে গেছে। তবুও তা দিয়ে মাথা মুছবার চেষ্টা করতেই গভীব এক মমতায় সুচেতা তার শাড়ির আঁচলখানা এগিয়ে দিয়ে বললো। না-মুছলে কষ্ট পাবো। কল্পনার চোখে চেয়ে রইলো সুধীমন। সুচেতার কথাগুলো কী সুন্দর! কতো আন্তরিক মনে হচ্ছে। জড়তাহীন অত্যন্ত সহজ সুরের কথা, যা মনকে খুবই স্পর্শ করে। কিন্তু সুধীমনের কেন যেন কিছুই ভালো লাগছে না। সে উত্তর দিল, তুমি কষ্ট পাবে মাত্র একদিন আর আমি ওটা প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করি। আমার কষ্টের নাগাল তুমি পাবে কেমন করে?

কথাটা শুনে চমকে উঠলো সুচেতা। সুধীমনকে একপলক দেখেই পথের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিয়ে করোনি?

খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। সুধীমন সামান্য একটু সময় নিয়ে বললো, তাছাড়া ভালোবাসার অবশিষ্ট বলে আমার মধ্যে আর কিছুই নেই। শুধু শুধু একজনকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?

এতোদিন কোথায় ছিলে? শুনেছিলাম পশ্চিম জার্মানি গিয়েছিলে। ফিরলে কবে?

সুচেতার মুখের ওপর থেকে চোখ না-সরিয়ে সুধীমন যেন দীর্ঘশ্বাসের পাহাড় ভেঙে উদাস গলায় বললো, তুমি দেবুকে বিয়ে করার মাস তিন-চার পরেই আমি মিউনিখে চলে যাই। ওখানে দু'বছরের একটা কোর্স কমপ্লিট করে কলকাতা ফিরেই বাঙ্গালোরের কোম্পানিতে যোগ দিই। সেই থেকে আর কলকাতা আসিনি। আট-ন'বছর পর এই প্রথম এলাম।

বৃষ্টিটা আবার ঝেঁপে নামলো। মাঝে একটু ধরে এসেছিল, বড়ো বড়ো ফোঁটায় আবার সব কিছু ঝাপসা করে দিল। চওড়া মসৃণ রাস্তার মাঝ বরাবর সবুজ গাছের সারি। বৃষ্টিতে সেই সবুজ গাছগুলোকেও সাদা দেখাচ্ছে। পেঁজা তুলোর বোঝা নিয়ে দাঁড়ানো সেই গাছের নীচে দুটি ছেলে-মেয়ে কাঁপছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হৃদয়ের উত্তাপ নিতে দুজনেই এখন ঘনিষ্ঠ। সুধীমন পথের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে সুচেতা সারা মুখে একবার চোখ দুটি বুলিয়ে নিল। খুব আস্তে আস্তে বললো, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তবে তোমার সঙ্গে দেখা হোক এটা চাইনি।

এই কারণেই কলকাতা আসতে চাও না?

তা বলতে পারো। কলকাতায় আমার খুব কষ্ট হয় আসতে। এখানে আমার অনেক স্মৃতি।

শুধু তোমার? সুচেতার ইচ্ছে হচ্ছিলো সুধীমনের চোখের ওপর নিজের চোখ দুটো স্থির করে ধরে রাখে। কিন্তু গাড়ি চালিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। ভাঙা গলায় শুধু বললো, আমার নয়?

না। সুধীমনের স্পষ্ট উত্তর। তুমি এখন আলাদা। দেবুর স্ত্রী।

কিন্তু তোমার কষ্টটা তো আমারই জন্য?

তাও নয়। যে-সুচেতা আমার মনের মধ্যে সে তুমি নও।

গাড়ি তখন বেলেঘাটা ব্রিজে ওঠবার মুখে। একটা ট্রেন ধীর গতিতে শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকছে। অন্য একটা স্পীড নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গতির এই তারতম্য জীবনের ক্ষেত্রেও। সুচেতা একসময়ে দুরন্ত স্রোতে ভেসেছিল। এখন তার মন উজান গঙ্গার নির্জন পার ঘেষে চলেছে। কোমল সুরে সুচেতা জিজ্ঞেস করলো, বাঙ্গালোর ফিরছো কবে?

কালকে বিকেলের ট্রেনে যাবো।

এখানে উঠেছো কোথায়?

রিজ হোটেলে। একটু চুপ করে থেকে সুধীমন আবার বললো, তুমি আমাকে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দিয়ো।

আমি তোমাকে কোথাও নামাবো না। সুচেতা এতোক্ষণের একটা নিস্তেজ ভাব থেকে হঠাৎ যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। আগের দিনগুলোর মেজাজে ফিরে গিয়ে আদেশ দেবার সুরে বললো, তুমি এখন আমার ফ্ল্যাটে যাবে। আমার সঙ্গে দুপুরে খাবে। কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সুধীমন। সুচেতা ধমক লাগালো, আমি তোমার কোনও কথা শুনছি না।

নিরুত্তাপ এক হাসি নিয়ে সুধীমন বললো, সে তো তুমি কোনোদিনও শুনতে না।

তাই নাকি? সুচেতার কণ্ঠে সেই আগের ঝাঁঝ।

আগে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেও একধরনের আনন্দ পেতাম। সেই উপলব্ধি এখন আর নেই। সুতরাং কথা বাড়াবো না। যেখানে নিয়ে যাবে চলো।

তোমার কথাবার্তা বড়ো দায়সারা! সুচেতা দুঃখ করে বললো, তুমি কী আজকাল মেপে মেপে কথা বলো নাকি?

আমার যা কিছু সবই তো তোমার কাছে শেখা। এখন অভিযোগ করে কী লাভ?

কথায় আমি কোনোদিনও কারো কাছে হারিনি। আজ তুমি সহজেই আমাকে হারিয়ে দিচ্ছো। সুচেতা সামান্য হাসলো। কিন্তু তার ওই হাসিটুকুর মধ্যেও যে একধরনের তৃপ্তি মিশে রয়েছে, তারই জ্যোতি ওর সারা মুখে। আসলে হেরে গিয়েও সে বিজয়ীর স্বাদ বুকের গভীরে যত্ন করে তুলে রাখতে চাইলো। সুধীমন যখন বাঙ্গালোর চলে যাবে, আজকের এই কথাগুলোর উত্তাপ নিয়ে সুচেতা তখন নিজেকে বেশ কিছুটা সময় ভরিয়ে রাখতে পারবে।

লাউডন স্ট্রিটের বারোতলা 'হিরণ মিনারে' এগারো তলায় সুচেতাদের ফ্ল্যাট। পোর্টিকোর নীচে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করে সুচেতা সুধীমনকে নিয়ে লিফটের দিকে এগোতেই লিফটম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, কারেন্ট নেই।

সে-কী! কখন গেল?

আধঘন্টার ওপর হয়ে গেছে।

এতোক্ষণে তো তাহলে এসে যাওয়া উচিত ছিল। কথাটা বলেই সুচেতা দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সুধীমনের মুখের দিকে তাকালো। একরাশ হতাশা ছড়িয়ে বললো, কী হবে এখন? সুধীমন আস্তে আস্তে বললো, চলো—সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে থাকি।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! এই শরীর নিয়ে আমি এখন অতো ওপরে উঠতে পারি?

আমারই ভুল হয়েছে। একটুকরো লজ্জার হাসি নিয়ে সুধীমন বললো, আমি হঠাৎ আগের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম।

চকিতে সুধীমনের মুখের দিকে তাকিয়ে সুচেতা কী যেন ভাবলো একটু। স্নিগ্ধ হেসে বললো, না সুধীমন, তুমি এমন কিছু ভুল বলোনি। আসলে আমরাই মাঝে মাঝে জীবন থেকে দূরে সরে যাই। আমাদের ভেতরের একটা দুঃখকে ভুলতে গিয়ে আনন্দের দরজাগুলো অনেক সময়েই বন্ধ করে দিই। যেমন এখন—এগারতলায় উঠতে আমি পিছিয়ে গেলাম অথচ তুমি তোমার সেই সজীব মনটা এতোটুকু হারাওনি।

আমি কী হারিয়েছি আর কী হারাইনি, সে-হিসেব থাক। সুধীমন হাসবার একটু চেষ্টা করলো।

কষ্টের সেই সামান্য হাসিটুকুও লুকিয়ে রেখে বললো, উপরে উঠতে অনেক পরিশ্রম হবে, হাঁপিয়ে পড়বো, এই চিন্তাটা আমার মাথায় কখনওই আসেনি। আমি শুধু ভেবেছিলাম, তুমি তো সঙ্গে রয়েছো।

শূন্যতার যে-দ্বীপটাতে সুচেতা হাহাকার মন নিয়ে বাস করছিল, দক্ষিণের এক শীতল বাতাস এসে ওকে ভরিয়ে দিল। সুচেতা উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে সুধীমনকে শুধু দেখতে লাগলো। অনেকক্ষণ পর সে আস্তে আস্তে অথচ গভীর সুরে বললো, আমার ভেতরের অনুভূতিগুলো যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে! আমি কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ.......সুচেতা হঠাৎ একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে, আর আবেগ নিয়ে বললো, সুধীমন আমরা হেঁটেই ওপরে উঠি কী বলো?

পারবে?

এখন মনে হচ্ছে পারবো।

আগে তাহলে অন্যরকম মনে হয়েছিল কেন?

তখন খেয়াল ছিল না যে তুমি সঙ্গে রয়েছো। সুচেতার চোখ দুটো গভীর এক বিশ্বাসে দীপ্ত হয়ে উঠলো। মুখেও সে সে-কথা বললো, আমার বিশ্বাসটা তুমি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছো। কঠিন কাজটা এখন বেশ সহজ লাগছে!

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সুচেতা বলতে লাগলো, বছর চারেক হলো এই ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছে। প্রায় তিন লাখ টাকার মতো লেগেছে। দেবুকে বলেছিলাম, এতো টাকাই যখন লাগছে জমি কিনে বাড়ি করাই তো ভালো। তবু একটু হাঁটা-চলা করা যাবে, গাছ-গাছালি লাগানো যাবে। সামনে একটা ফুলের বাগানের সৌন্দর্যই আলাদা! আমার এই স্বাভাবিক কথাগুলোও শুনে বেশ রেগে গিয়েছিল দেবু। সুচেতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আরও বললো, আজকাল অবশ্য ও আমার সব কথাতেই রেগে যায়।

কেন? সুধীমন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

পুরনো হয়ে গেছি কিনা। প্রাণশূন্য এক হাসি নিয়ে সুচেতা বললো, ওর সময় কোথায়? আমাকে কী উত্তর দিয়েছিল জানো? তোমার ফুলবাগানের শখের জন্য জমি কিনে বাড়ি তৈরি করার আমার অতো সময় নেই। টাকা ছড়ালে দুনিয়ার সব কিছু মুহূর্তে পাওয়া যায়। আমি ওই পরিশ্রম, ঝামেলার মধ্যে কেন যাবো?

আমার যদি একটু শখ হয়, আমি যদি একটু শান্তি পাই সেটা তুমি করবে না? এ-গুলোকে তুমি পরিশ্রম, ঝামেলা মনে করবে?

আবেগ, উচ্ছ্বাসের কাছে আমি নিজেকে সঁপে দিতে রাজি নই। বাস্তব চিন্তা এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলাটাকেই আমি বড়ো মনে করি।

দেবু, তুমি তোমার মনটা অনেক হারিয়ে ফেলেছো।

হয়তো সেইজন্যই আমি কখনও দুঃখ পাবো না। তোমাদের মতো মন হলে প্রতিটি মুহূর্ত দুঃখের পাহাড় ডিঙোতে হতো। অহেতুক কষ্ট পুষে রেখে চোখের জল ফেলার বিলাসিতা আমার নেই। এটাকে তুমি নিশ্চয়ই অন্যায় বলতে পারো না?

অন্যায়টা তোমার নয়—তোমাকে বলাটাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

গল্প করতে করতে ওরা এগারো তলায় পৌঁছে গেল। সুচেতা সুধীমনের মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে দিল। অদ্ভুত এক কোমল গলায় বললো, জীবনে ভাবিনি সিঁড়ি ভেঙে এই এগারো তলায় কোনোদিন পৌঁছাবো। অথচ তেমন একটা কষ্টও হলো না। কী করে পারলাম বলোতো?

আসলে আমরা আগেই ভয় পেয়ে যাই। আর এই ভয়টাই মনকে বড়বেশি দুর্বল করে দেয়।

ঠিক সেটাও নয় সুধীমন। সুচেতার গলায় বিসর্জনের সুর। ওই ভয় দূর করার জন্যেও তো একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। সবাই কী সব সময় তা পায়? কথাটা শেষ করে সুচেতা বেল টিপতে গিয়ে খেয়াল হলো ওখানে ডিং-ডং শব্দের জলতরঙ্গ বেজে উঠবে না। টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক পাল্লার মেহগনি পালিশের ভারী দরজাটা খুলে গেল। কাজের ছেলে ভরত একপাশে

সরে দাঁড়াতে সুচেতা সুধীমনকে নিয়ে ড্রইং-রুম পেরিয়ে সোজা নিজেব শোবার ঘরে গিয়ে বসালো। আঠারো বাই আঠারোর বড়ো আকারের ঘর। বিশাল নিচু হাইটের খাট। হালকা আকাশী রঙের বেড কভার। ওই রঙেরই কোমল তুলতুলে বালিশ। বেডসাইড টেবিলে কিছু বই। আধুনিক বাংলা উপন্যাস। বিদেশী বইও রয়েছে। বিছানার শিয়রের দিকেও একটা বই পড়ে আছে। লাইফ অন দি মিসিসিপি। দরজাব দিকের দেওয়াল জুড়ে চমৎকার কারুকার্যময় আলমাবি। এক কোণে ড্রেসিং-টেবিল। হাজারো রকমের প্রসাধনের জিনিস সেখানে। চার দেওয়ালের গায়ে আকাশী বং। মেঝেতে পুরু কার্পেট। দক্ষিণের প্রায় পুরোটাই জানলা। হুহু করে বাতাস আসছে।

সুধীমন পায়ে পায়ে জানলাব কাছে এগিয়ে গিয়ে গ্রীল ধরে দাঁড়ালো। এতো উঁচু থেকে নীচের মানুষগুলোকে, সারবন্দী গাড়িব মিছিল, নিবিড় ঘন সবুজ ছায়া বেশ লাগছে দেখতে। কলকাতা শহরে নাকি নির্জনতা হারিয়ে গেছে, সুচেতার শোবার ঘরে সেই নির্জনতা দারুণ ভাবে ফিবে এসেছে। মানুষের কোলাহল, গাড়ির হর্ন, বাইরের কোনও শব্দই এখানে এসে পৌঁছায় না। সুধীমন জানলা থেকে সবে এসে একটা চেয়ারে বসলো।

রান্নাঘরে গিয়ে ভরতকে কফি বানাতে বলে সুচেতা আবার শোবাব ঘরে ফিবে এলো। কফি খেযে সে স্নান করতে বাথরুমে ঢুকবে। সে-কথাই সুধীমনকে বললো, এইবেলা স্নানটা সেরে নিই। আমার তো আবার অনেকক্ষণ সময় লাগে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি যাও।

তুমি দেখছি আমাকে সবাতে পাবলেই বাঁচো—সুচেতা ছন্দ তুলে হাসলো। বললো, ভরতকে কফি বানাতে বলে এলাম। কফিটা আগে খাই। তাবপবে তো স্নানে যাবো।

তুমি কী এখনও ওই এক ঘন্টা সময় নিয়ে স্নান কবো?

এই অভ্যেসটা আব পাল্টাতে পারলাম না। কতোদিন ভেবেছি এই তো জীবন' এতো ঘটা কবে সুখের স্নানের কী দবকাব? কিন্তু বাথরুমে ঢুকে জলের স্পর্শ পেলেই মনে হয়, আমাদের বাইরে এবং ভেতরে এতো ময়লা জমছে তা কী সহজে যাবার?

তোমার কথাগুলো যেন কেমন কেমন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সুধীমন সামান্য একটু হেসে বললো, আগে কিন্তু তুমি এই ব্যাখ্যাটা দিতে না। তখন বলতে, আমার শরীরে এতো বেশি রাগ, তেজ যে ঠান্ডা হওয়াব জন্য জলের তলায় ঘন্টাখানেক থাকতেই হয়।

তাই বলতাম বুঝি? হালকা মেজাজে হাসতে হাসতে সুচেতা বললো, আগের দিনগুলো আমাব কাছে এখন স্বপ্ন মনে হয়।

সুচেতাব মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীমন কী যেন ভাবতে লাগলো। অলস দৃষ্টিতে ঘবের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবাব সুচেতাকে দেখতে লাগলো। কিছু একটা মনে পড়েছে বোধহয়। অথচ কথাটা না-বলে সে নিঃশব্দে একটু হাসলো। সুচেতার নজর এড়ালো না তা। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী একা একাই নিজের মনে কথা বলবে?

নিঃশব্দের ছোট্ট হাসিটাকে সুধীমন আর বন্দি করে রাখলো না। আহত মনের জানলা খুলে দিয়ে সে বেশ সহজ ভাবেই বলে উঠলো, সত্যি তোমার যা জেদ, তেজ ছিল এমনটা আর কারো মধ্যেই দেখলাম না। তোমার ওই সাঙ্ঘাতিক রাগ যে কী করে সামলাতাম......তবুও তো শেষবক্ষা হলো না। তুমি দেবুকে বিয়ে করলে সেটাও তো ওই জেদ করেই।

আমার শরীরে এখন এক ফোঁটাও রাগ নেই। কর্পূরের মতো জেদ, তেজও উবে গেছে। তাতে আমার কী লাভ হলো বলো?

সুচেতা গভীর ভাবে সুধীমনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কী যেন বলতে গিযেও থেমে গেল। তার সেই দৃষ্টিতে ছিল একরাশ শূন্যতা। অপরাধী মনের সলতেটা উসকে উঠতেই সুচেতা নিজেকে গুটিয়ে নিল। অস্ফুট সুরে বললো, আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি তাই না?

আসলে রাগ দেখাবার নিরাপদ আশ্রয় তো আমার কাছেই ছিল। কষ্ট তো এখন তোমার।

সত্যিই তাই সুধীমন। দেবুর রাগ ভাঙাতেই আমার সব রাগ ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে

ভেসে আসা এক ক্ষীণকণ্ঠে সুচেতা বললো, রাগ দেখিয়ে এখন আর আমি তৃপ্তি পাই না। তবে—সুচেতা থেমে পড়লো। জোর করে একটু হাসি ধরে রেখে আরও বললো, তোমার মতো ক'জনে এতো মূল্য দেবে আমাকে? আমি একটু রাগ করেছি কী করিনি, পৃথিবী তোমার কাছে অন্ধকার হয়ে যেতো। যাই বলো, খুব জ্বালিয়েছি কিন্তু তোমাকে।

কারেন্ট চলে আসতেই সুচেতার ঘরের দু'খানা পাখা ঘুরতে লাগলো। ফ্যানের দিকে একটু তাকিয়েই সুচেতা সুধীমনের মুখের দিকে চেয়ে হেসে দিল। ভালোলাগার এক উত্তাপ মিশিয়ে আস্তে আস্তে বললো, কারেন্ট চলে এসেছে অথচ কষ্ট করে এতোটা উঁচুতে উঠে আসার জন্য আমার কোনও আফসোসই হচ্ছে না। অসুবিধে যে একটু হয়নি তা নয়—তবে আমি আনন্দ পেয়েছি অনেক। এই তৃপ্তিটুকু একান্তই আমার।

পরিষ্কার ভাবে ছবিটা ফুটে না-উঠলেও সুধীমন বুঝতে পারছিল দেবুর সঙ্গে সুচেতার মনের দিক দিয়ে কোথায় যেন একটা ধস নেমেছে। সেই ধসটা এতোই সূক্ষ্ম যে চট করে কিছু বোঝার উপায় নেই অথচ সুচেতার কথাগুলো মনকে কেমন যেন উদাসী করে তোলে। সুধীমনেব সঙ্গে সুচেতার যা সম্পর্ক তাতে সে অনায়াসেই ওকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু এতো বছর পর সুধীমন নিজেকে শুধু অসহায়ই ভাবছে না, সুচেতার কাছে তো বটেই নিজের কাছেও নিজেকে নতুন লাগছে। এই অবস্থায় সে তাই কৌতূহলের গভীরে যেতে চাইলো না। তাছাড়া তার দরকারটা কী? সুচেতা এখন দেবুর স্ত্রী। ওর ভালো-মন্দ দেবুই বুঝবে। সুধীমনের কাছে চিন্তা-ভাবনার অবশিষ্ট বলে আর কিছু নেই। তবুও কোথায় যেন একটা ব্যথা লুকিয়ে রয়েছে। সেই ব্যথাটাকে সুধীমন এতোদিন ধরে আরও বেশি করে লুকিয়ে রেখেছিল। সুচেতাকে দেখার পব ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত থেকে যে আবার রক্ত বের হবে সেটা জানা ছিল না। সুচেতা পর, ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, এ-সব ভেবে ওকে সাময়িক ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা যেতে পারে—তবে কোনও ভাবেই মন থেকে সরিয়ে রাখা যায় না। সত্যকে আড়াল করতে গেলেই বিপত্তি। সুধীমন সে-চেষ্টাও করলো না। এটা তো ঠিক, সুচেতা তার সারা মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে। কতো আর অস্বীকার করা যায়? তবুও সুধীমন খোলা মনে একটা প্রশ্নও করলো না। সে জানে, সুচেতাকে একটু নাড়া দিলেই তার বাঁধ ভেঙে যেতে পারে।

ভরত কফির ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিলো। সুচেতা ওকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোর রান্নার কতো দূর?

এই তো আরম্ভ করলাম। একটু চুপ করে থেকে ভরত আবার বললো, তাড়াতাড়ি করতে হবে?

না। আজকে আর আমি কোথাও বের হচ্ছি না। তুই যতো পারিস সময় নে—তবে রান্নাটা আজ চমৎকার করা চাই।

ভরতের বয়স আঠারো-উনিশ হবে। দেবুর অফিসের ড্রাইভার রাজনের ছেলে। রাজন কোনোদিন তার ছেলের চাকরির জন্য দেবুকে বলেনি। কাকে বললে কাজ হবে তা সে জানে। তাই আসল জায়গাতেই রাজন কথাটা বলেছিল, মা, আমার ছেলেটাকে একটা চাকরি দিতেই হবে। এতো বড়ো সংসারটাকে আমি আর একা টানতে পারছি না।

সুচেতা হাসতে হাসতে বলেছিল, তা তোমাদের সাহেবকে বলবে তো। চাকরিটা কী আমার কাছে?

চাকরিটা আপনার কাছেই মা—

কী রকম?

ভরত আমার লেখাপড়া বিশেষ জানে না। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। এই বিদ্যেয় কোথাও কিছু করতে পারবে না। তবে মা—রান্নাটা কিন্তু খুব ভালো করে। আপনি ওকে ওই কাজেই নেয়ে নিন।

সে-সব বছর তিনেক আগের কথা। সেই থেকে ভরত এই বাড়িতে। সুচেতাকে শুধু যে ডাকার জন্যই মা বলে, তা নয়। নিজের মায়ের মতোই মনে করে। আসলে এরা ভীষণ কৃতজ্ঞ। কার

কাছে একটু উপকার পেলে তার জন্য বোধহয় জীবনটাও দিতে পারে।

ভরত সুচেতার দিকে তাকিয়ে গভীর এক প্রত্যয় নিয়ে হাসলো একটু। তারপরেই আস্তে অথচ স্পষ্ট সুরে বললো, মা, আপনি যখন মুখ ফুটে বলেছেন, রান্নাটা তখন চমৎকারই হবে। আজকে আমি আরও বেশি মন দিয়ে রাঁধবো।

ভরত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুধীমন বলে উঠলো, ছেলেটা তোমাকে অদ্ভুত অনার দিল তো! কথাগুলোর মধ্যে এতো আন্তরিকতা—সত্যি ভাবা যায় না!

ওর কোনও কিছুই আন্তরিকতা শূন্য নয়! প্রথম মাসের মায়না পেয়ে ভরত কী করেছিল জানো? আমার জন্য একটা সিঁদুরের কৌটো কিনে এনেছিল। লজ্জা ভেঙে কোনওরকমে বলেছিল, মা, আপনাকে বড়ো জিনিস দিতে পারি সে-সামর্থ আমার নেই। ছোটর মধ্যে এটাই অনেক বড়ো বলে মনে হলো।

খুব সুন্দর কথাটা বলেছে ভরত! তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সুধীমন আরও বললো, তবে কী জানো—ওই সিঁদুরের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

জানি তুমি কী বলবে—সুচেতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিচু সুরে বললো, তুমি হলং-এর কথা বলবে তো?

তোমার এখনও মনে আছে দেখছি!

তোমার মনে আছে, আমার থাকবে না?

আমার কাছে ওই স্মৃতিটাই উজ্জ্বল, কিন্তু তোমার কাছে ওটার মূল্য কতোটুকু?

তুমি জানো না সুধীমন—তোমার চেয়েও ওই ছবিটা আমার কাছে বেশি প্রিয়। ওই দিনগুলোর কথা আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারবো না। মনে রাখা মানেই তো অনেক বেশি কষ্ট পাওয়া। একটু চুপ করে থেকে সুচেতা আরও ঘন গলায় বললো, আসলে কী জানো, আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়েই বড়বেশি চিন্তা-ভাবনা করি। এতো ব্যস্ততার মধ্যে কে আর কতোটুকু অপরের কথা মনে রাখে? তুমি ভাবছো সব কষ্ট তোমারই। আমি ভাবছি আমার মতো দুঃখী কে?

তুমি দুঃখী হতে যাবে কোন দুঃখে! সুধীমন হঠাৎ একটু গম্ভীর হলো। সুচেতাকে দেখার পর থেকে এই পর্যন্ত সে যখন তার ভেতরের হাজারো আগুনকে নিভিয়ে রাখার চেষ্টা করে ক্রমশ সহজ হয়ে আসছিল, তখনি আবার তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি করে তার মনটা পুড়তে আরম্ভ করলো। অভিমানে কেউ কেউ অসংযমী, হয়তো-বা একটু শোভনীয়তার বাইরে চলে গেলেও সুধীমন নিজেকে কখনওই সেই ভাবে ছেড়ে দিতে পারে না। শত অভিমানের পাহাড় জমলেও সে মার্জিত ব্যবহারে ধীর-স্থির হয়ে থাকতে পারে। সেই সুধীমনও বেশ কিছুটা আহত হলো। আগে চুপ করে থেকে সুচেতাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতো। শান্তি রক্ষার জন্য ওর সব কথার উত্তর দিতো না। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আলাদা। আর এই মুহূর্তে সুচেতাকে কিছু বলাও প্রয়োজন। ও বড়বেশি নিজেকে দুঃখী দুঃখী করে তুলতে চাইছে। কিন্তু কেন? নিজের অপরাধ ঢাকতে প্রলেপের এই আশ্রয় নেওয়া কী এতোই জরুরি? সে তো ওকে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করছে না। সুধীমন বললো, অনেক বেশি সুখে থাকলে মানুষ বৈচিত্র খোঁজে। সেই হিসেবে নিজেকে দুঃখী বলাটা একটা ফ্যাশন।

কথাটা শুনে সুচেতা হাসলো। তার সেই হাসিতে রামধনুর রং ছিল না। বর্ণহীন সেই শুষ্ক হাসিতে নিজেকে আড়াল করে রাখার একটা চেষ্টা ছিল। হঠাৎ সে বললো, কথায় কথায় খেয়ালই ছিল না যে তুমি ভিজে জামা-প্যান্টে রয়েছো। কী অন্যায় বলো দেখি?

এই ছোট্ট ব্যাপারটাতেই নিজেকে দোষী ভাবছো?

বাঃ যেটা ভুল সেটা স্বীকার করবো না?

স্বীকার করে নিলেই সব সময় শূন্য জায়গাটা পূর্ণ হয়ে ওঠে না—সুধীমন সহজ ভঙ্গিমায় হেসে উঠলো। একটু সময় নিয়ে সুচেতার মুখের ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে ভরাট গলায় বললো, বরং অন্যায়টা স্বীকার না-করাই ভালো।

কেন?

অপর পক্ষ হয়তো আরও বেশি ভেঙে পড়তে পারে। ওই সান্ত্বনায় তার কী লাভ বলো? সুধীমন, তুমি কিন্তু আগে এমন সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারতে না।

তুমি অতোটা সময় দিতে কোথায়? সুধীমন এবারে একটু জোরেই হেসে উঠলো, প্রতিটা ব্যাপারে তুমি আমাকে ধমকেই ওপরে থাকতে চাইতে। কথা বলা তো অনেক দূরের ঘটনা, একটা 'চিঁ' শব্দ পর্যন্ত করতে দিতে না। আমাকে জানার আব সুযোগ পেলে কোথায়?

আমার দিন ফুরিয়েছে। তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। সুচেতো সুধীমনকে একপলক দেখলো মাত্র। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সে দরজার দিকের দেওয়াল জোড়া আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিশাল পাল্লা খুলে পরিষ্কার একটা ধুতি বের করে সুধীমনের হাতে দিয়ে বললো, ভেজা জামা-প্যান্ট ছেড়ে এটা পরে নাও। অ্যাটাচ বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়ে আবাব বললো, ভেতরে যাও। ভেজা জামা-প্যান্ট ওখানেই রেখে দিয়ো। তারপরেই কী মনে করে আবার আলমারির কাছে ফিরে এলো। একটা চিকনের কাজ কবা পাঞ্জাবি বের করে সুধীমনের হাতে সেটাও তুলে দিয়ে হাসতে হাসতেই বললো, তুমি তো আবার মেয়েদের সামনে খালি গায়ে থাকাটা বাজে ব্যাপার বলে মনে করো।

পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে এবং ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো দু'ভাজ করে পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো সুধীমন। সুচেতা বললো, এবারে আমি বাথরুমে ঢুকবো। তোমাকে কী আব এক কাপ কফি দেবে?

তোমার বাথরুম যাওয়া মানে তো একটা ঘন্টাব ব্যাপার। এক কাপ কফিতে কী অতোটা সময কাটবে?

ভরত তো রইলোই। যতো খুশি খেয়ো। সুচেতা আর কথা বাড়ালো না। হালকা এক হাসির রেণু ছড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কফি খেতে খেতে সুধীমন আকাশের দিকে তাকালো। উন্মুখ নীল আকাশটা যেন মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতো ভেসে রয়েছে। এই এলাকার বিশাল বিশাল বাড়িগুলোর সঙ্গে সখ্যতা পাতাতে এক্ষুণি বুঝি আর নীচে নেমে আসবে। পাশের বাড়ির ছাদে একটি মেয়ে ভিজে শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি মেলে দিতে ব্যস্ত। ওই বাড়িরই বারোতলার এক ফ্ল্যাটের ব্যালকনীতে বছর কুড়ি-বাইশের একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো। খুব সম্ভবত এইমাত্র স্নান করে উঠেছে। ভিজে চুলগুলো তোয়ালে দিয়ে ঘষতে ঘষতে মুখোমুখি হতেই সুধীমনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মেয়েটি যেন একটু বিরক্ত। অন্তত ওর মুখ দেখে তাই মনে হলো। সে দ্রুত ঘরের মধ্যে চলে যেতেই সুধীমন ভাবলো, মেয়েটি কী তাকে খুব সহজ এবং সাধারণ মনে করলো? তার কী দোষ? সে তো প্রথম থেকেই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। মেয়েটি আবার ব্যালকনীতে ফিরে এলো চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে। গভীর দৃষ্টি নিয়ে এবারে দেখতে লাগলো সুধীমনকে। সারা মুখে বিরক্তির পরিবর্তে রহস্যে ঘেরা এক নিবিড় ছায়া। মেয়েটি যেন বেশ উৎসাহী। সুধীমন নিজেকে গুটিয়ে নিল। এতোক্ষণ সে জানলা থেকে সরে দাঁড়াবার প্রয়োজন মনে করেনি। এখন ওটাই আগে দরকার। আস্তে আস্তে সে ওখান থেকে সরে গেল করুণার এক হাসি নিয়ে।

কফি খাওয়া শেষ করে শূন্য কাপটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সুধীমন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে সিগারেটের প্যাকেটের যা অবস্থা হয়েছে তাতে ওটা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ভরতকে দিয়ে অবশ্য আনানো যায় কিন্তু ও রান্নায় ব্যস্ত। এই মুহূর্তে ওকে বিরক্ত না-করাই ভালো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় সুধীমন ভালোলাগার দৃষ্টি নিয়ে ঘরের চারদিকে নতুন করে আর একবার চোখ বোলালো। তার সেই দৃষ্টিতে স্বপ্নের এক জাদু মিশে রয়েছে। কল্পনার এক রঙিন নেশা। সুধীমনের মনে হলো, সুচেতার এই শোবার ঘরটা তারও শোবার ঘর হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। তবুও এই ঘরে বসে থাকতে দারুণ ভালো লাগছে। এগারো বছর আগে

সুধীমন যে-শান্তির ঘর দেখতে চেয়েছিল এই কী সেই ঘর? সেই আকাঙ্খার আশ্রয়? সুধীমনের মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগলো। অতীতের সুন্দর ছবিটা আঁকতে গিয়ে বারবারই অনুভব করলো, এটা শুধুমাত্র সুচেতারই শোবার ঘর। তার নিজের নয়। সঙ্গে সঙ্গে সুচেতাকে ভীষণ পর মনে হতে লাগলো। এই সুচেতার সঙ্গে তার যেন কোনও সম্পর্ক নেই। যাকে সে একদিন একান্ত ভাবে পেতে চেয়েছিল তার কাছে এই মুহূর্তে থাকার কোনও আকর্ষণই অনুভব করতে পারছে না। বরং এই এগারো বছর ধরে তিল তিল করে সে যে-স্বপ্নের টুকরো টুকরো স্মৃতি দিয়ে এক নিটোল ভালোবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরতার ছবি এঁকেছে তা অনেক বেশি প্রেরণাময় বলে মনে হলো। এগারো বছর আগের দিনগুলোতে সুধীমন প্রায়ই বলতো, তোমার কাছে আসার জন্য মনটা সারাক্ষণ একমুখী হয়ে থাকে। তোমার কাছে এলে আমি আমার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা হারিয়ে ফেলি। নিজের প্রতি বিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। আর আমি অদ্ভুত ধরনের এক শান্তি পাই।

পুরনো দিনের ছবি ধরে রেখেও সুধীমন কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো। না, এই মুহূর্তে এই ঘরে বসে সে এতোটুকু শান্তি পাচ্ছে না। আসলে সুচেতাকে দেখার প্রথম থেকেই ওকে আগের মতো আপন করে ভাবতে পারছে না। সারাক্ষণ শুধু মনে হচ্ছে, এর চেয়ে দেখা না-হওয়াই ভালো ছিল। পলিমাটির চড়া পড়ে দ্বীপের মতো শেষ হয়ে যাওয়া অধ্যায়টা আবার জেগে উঠবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? চিন্তার জট পাকিয়ে মাথাটা ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। সিগারেটটা এই সময়ে খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার পরে তো ওটা চাইই। সুতরাং নীচে একবার নামতেই হবে। সুধীমন বাথরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেতরে জলের ঝর্ণাধারার ঐক্যতান। সুধীমন বললো, সুচেতা, আমি একটু নীচে যাচ্ছি। সিগারেট কিনতে হবে।

শুনতে পাচ্ছি না জোরে বলো।

তুমি আগে শাওয়ারটা বন্ধ করো।

ভেতরের কৃত্রিম বৃষ্টিটা থেমে গেল। জল-ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন শান্ত হয় এখন অনেকটা সেই রকম। সুচেতা এবারে একটু জোরেই জিজ্ঞেস করলো, কী বলছিলে বলো?

সিগারেট কিনতে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

তুমি কেন? ভরতকে পাঠিয়ে দাও।

ওকে আবার বিরক্ত করা কেন, ও রান্না করছে করুক।

যদিও আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি সুধীমন, নিজের প্রতি আগের সেই বিশ্বাস আর তোমার নেই। একা একা আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে তুমি ভয় পাচ্ছো।

আমি কোনও অন্যায় করিনি। ভয় পাবো কেন?

নিজেকেই জিজ্ঞেস করো না—তোমার আর আমার মাঝে সারাক্ষণ একজন তৃতীয় মানুষকে রাখতে চাইছো। দু'মিনিটের জন্য ভরত বাইরে গেলে এমন কিছু ভূমিকম্প হবে না।

তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাবো। সুধীমন খুবই সাধারণ ভাবে বললো, আমি এতোটা ভেবে বলিনি একটু থেমে পরে আবারও বললো, ভরতকে যদিও বা পাঠাতাম এখন আর পাঠাচ্ছি না। আমিই যাচ্ছি—

লিফট থেকে নেমে চওড়া পোর্টিকো পার হয়ে এসে সুধীমন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে তাকালো। সুচেতার সঙ্গে আসার সময়ে বাঁ দিকে একটা ঝকঝকে পান সিগারেটের দোকান দেখেছিল। কিছুটা পথ অবশ্য এগিয়ে যেতে হবে। সুধীমন পা বাড়াতেই দেখতে পেল, বারোতলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনীতে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন?

দূর থেকে সুধীমন যাকে কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে বলে মনে করেছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে সে ঠিক অতোটা কম বয়সী নয়। যদিও চমৎকার স্বাস্থ্যের সুগঠনা তবুও ভদ্রমহিলার বয়সটা তেত্রিশ-চৌত্রিশের কম নয়। যাইহোক, সুধীমন যে কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে ধুতিটাকে

লুঙ্গির মতো দু'ভাজ করে পরে আছে। তাকে কী অনেক দূরে যাবার মতো দেখাচ্ছে? সুধীমন নিরুত্তাপ গলায় বললো, আমি কোথাও যাচ্ছি না। সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলাম—

হিরণ মিনারে কী আপনি নতুন এসেছেন?

না, সুধীমন একটু ভেবে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, আমার এক আত্মীয়ের কাছে এসেছি।

কতোদিন থাকবেন? ভদ্রমহিলার দুই ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ রেখা।

সুধীমন নির্বোধ নয়। ভদ্রমহিলার উৎসাহটা জোয়ারের জলের মতো বাড়ছিল সেটা প্রথম থেকেই টের পাওয়া গেছে। ব্যালকনীতে যে-বিরক্তির ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছিল সেটা ইচ্ছাকৃত। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই ওই ছলনাটুকুর আশ্রয় নেওয়া। আসলে এরা নিজেকে বড়বেশি দামি করে তুলে ধরতে চায়। সুধীমন এবারে অন্যরকম ভাবে একটু চিন্তা করলো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ের কোন ব্যাপারই নেই। অথচ সে দিব্যি প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে চলেছে। বাস্তব কোনও পটভূমিতে না-দাঁড়িয়ে এই ভাবে এই মোহনীয় দৃষ্টির মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা সুধীমনের চিন্তাকে দু'টুকরো করে দিয়ে বলে উঠলো, কতোদিন থাকবেন বললেন না তো?

আজকেই চলে যাবো।

আবার কবে আসবেন বলুন? আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপই হলো না! আমার নাম সুনীতা মেহতা। আপনার?

সুধীমন অবাক হয়ে সুনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এ-ভাবে কেউ এগিয়ে এসে আলাপ জমাতে পারে, বিশেষ করে একজন মহিলা—এটা সুধীমনের কল্পনার বাইরে। সব চেয়ে বড়ো কথা, পূর্ব পরিচয়ের সূত্র-টুত্র কিচ্ছু নেই অথচ দিব্যি কথা আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা! নাকি এক বিশেষ কৌশল? সুধীমন একফাঁকে ভেবে নিল, কী কুক্ষণেই যে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আচমকা একপলকে সুনীতাকে দেখেছিল। এখন তারই খেসারত দিতে হচ্ছে। এমনিতে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। যে-কোনও সময়েই সেটা হতে পারে। কিন্তু সুনীতার সঙ্গে যেটা হচ্ছে তার ব্যাখ্যাটা সুধীমনের কাছে মোটেই সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। আলাপের সূত্রটা কী, না ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে একবার দেখেছিল মাত্র। আর তারই ওপর ভিত্তি করে সুনীতা হাঁটু জলেই সাঁতার কেটে চলেছে।

সুনীতা সুধীমনের মুখের ওপর চোখ দুটোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতেই বললো, আমি কিন্তু আপনার নামটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। এখনও উত্তর পাইনি।

এখানে নাম বলাবলির কী আছে? সুধীমনের কাছে ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই লাগছে। এবারে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। আলগা কথার রাশ ধরে এ-ভাবে আর বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দু'দিনের জন্য অফিসের কাজে কলকাতায় এসে শেষে বিশ্রী এক পরিস্থিতির মধ্যে যেন পড়তে না-হয়। তখন লজ্জার সীমা থাকবে না। কিন্তু সুনীতার ওই নাম জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নটাকে এড়াতে গেলেও তো অন্য দু-একটা কথা বলতে হয়। তবুও খানিকটা নিরাপদ থাকার জন্য সুধীমন নিজের নাম না-বলে অলস কথা তুলে সুনীতাকে আসল প্রশ্ন থেকে দূরে সরিয়ে দিল, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন। মনেই হয় না আপনি অবাঙালি।

কথাটা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো সুনীতা। বললো, বিয়ের পর আমি মেহতা হয়েছি। আসলে আমি বাঙালিই।

তাই বলুন! জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করে সুধীমন বললো, আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সিগারেট কিনে আমারও তাড়াতাড়ি ফেরা প্রয়োজন।

আবার কবে আসছেন? সুনীতার চোখের গভীরে আমন্ত্রণের ঝিলিক।

কোথায়?

এই হিরণ মিনারে।

আমার আসার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো ন'বছর পর আবার কখনও যদি কলকাতায় আসি তখন একবার—

সুনীতা গাড়িতে স্টার্ট নিয়ে প্রায় ঝড়ের গতিতে চলে গেল।

যাবার আগে সুধীমনের দিকে অদ্ভুত ধরনের এক হাসিতে মাখিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল, আপনি বুদ্ধিমান। তবে আমি যতোটা ভেবেছিলাম ততোটা নয়। সে যাক গিয়ে, আপনার আত্মীয়টি এখানে কে? দেবু না সুচেতা?

কথাগুলো বলে সুনীতা একমুহূর্ত অপেক্ষা করেনি। নয়তো সুধীমন উত্তর দিতো, ওরা দুজনেই আমার বন্ধু। কিন্তু সুনীতার শেষের কথাটায় কেমন যেন একটু খোঁচা ছিল। অমন ভাবে বলার দরকারটা কী ছিল— যে-কথাটা স্বাভাবিক এবং সুন্দর ভাবে বলা যায় সেটাকেই এমন সন্দেহের দোলায় রেখে জিজ্ঞাসা করাটা মোটেই পরিষ্কার মনের ছবি নয়। সুনীতার নিশ্চয়ই কোথাও একটা অন্ধকার দিক রয়েছে।

হিরণ মিনারে ফিরে এসে সুধীমন চেয়ারটা টেনে নিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো। দোকান থেকে ফিরে আসার পথে একটা সিগারেট খেয়েছে। এখন আবার আর একটা ধরালো। গোটা দুই-তিন টান দিয়েছে, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো সুচেতা। ভেজা মাথাটা গোলাপী রংয়ের তোয়ালে দিয়ে জড়ানো। গায়ে দুধ সাদা রংয়ের স্লিভলেস ব্লাউজ। হালকা আকাশী রংয়ের শাড়ি। ঘরের চার দেওয়ালেরও আকাশী নীল রঙের মধ্যে সুচেতাকে সমুদ্র কন্যা মনে হতে লাগল। নাকি আকাশ সুন্দরী? সুচেতার সারা শরীরে শিশির ভেজা সজীবতা। শিউলী ফুলের গন্ধ মেখে ও এই বেলা এগারোটাকে চমৎকার সকাল করে দিল। সুধীমন ওকে একপলক দেখলো। এই মুহূর্তে সুচেতাকে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে। বয়স কাউকে কাউকে নিশ্চযই বুড়িয়ে দেয়, কিন্তু সুচেতাকে বোধহয় এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। কতো বয়স হলো ওর? তা ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ তো হবেই। হঠাৎ সুধীমন নিজেকেই একটা ধমক লাগালো। এ-সব কী ভাবতে বসেছে সে? এখন আর ওকে নিয়ে চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। সুচেতা এখন দেবুর স্ত্রী। সুধীমন বললো, সত্যি সত্যিই তুমি স্নানে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলে।

এটা চুক্তির মধ্যেই ছিল। সুচেতা যেন হাসির প্রসাদ বিতরণ করলো। সিগারেট কিনে তুমি ফিরলে কখন?

এই মাত্র।

এতো দেরি হলো যে—

সেটাই তো তোমাকে বলতে চাইছি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সুধীমন। দক্ষিণ দিকের জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুচেতাকে ডাকলো, এখানে এসো।

সিগারেট কিনতে গিয়ে দেরি হওয়ার সঙ্গে জানলার কাছে এগিযে যাওয়ার কী সম্পর্ক— সেটা সুচেতা বুঝতে পারলো না। সে চেষ্টাও করলো না। সুধীমন যেমন যেমন বলছে, তেমনটা করে দেখা যাক না। পায়ে পায়ে জানলার কাছে এগিযে গিয়ে সে সুধীমনের চোখের দিকে তাকিযে নীরবেই যেন প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার?

ওই যে একটা ওনিয়ন কালারের শাড়ি ঝুলছে--দেখতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ।

ওই ফ্ল্যাটটা সুনীতা মেহতার?

তুমি জানলে কেমন করে? সুচেতা একটু অবাক হয়ে সুধীমনের মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। তার দৃষ্টিটা ক্রমশ রুক্ষ হয়ে উঠতেই সুধীমন হেসে দিল। বললো, আজকে একটা কান্ডই হয়েছে। তার আগে আমি আমার অপরাধের কথাটা বলে নিই। তুমি বাথরুমে ঢুকলে স্নান করতে। ভরতের দেওয়া কফির কাপটা নিয়ে আমি তখন এই জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মানুষ যেমন সাধারণ ভাবে আর পাঁচটা জিনিস দেখে, তেমন ভাবেই—

আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে বলো? সুচেতা যেন ধৈর্য রাখতে পারছিল না।

প্রথমটা না-শুনলে পরেরটুকু ধরতে পারবে না। সঠিক চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টায় সুধীমন খোলাখুলি বললো, হঠাৎ আমার নজরে পড়লো সুনীতা মেহতা নামের ভদ্রমহিলাটি ওই ফ্ল্যাটের ব্যালকনীতে

দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই প্রথমে বিরক্ত এবং পরে মোটামুটি প্রসন্ন বলেই মনে হলো। এই হলো ভূমিকা। সুধীমন ওই পর্যন্ত বলে সামান্য একটু হাসলো। সে ভেবেছিল, তার কাছে গল্প শুনে সুচেতা খুব হাসাহাসি করবে। কিন্তু মজা বা কৌতুকের পরিবর্তে সুচেতা কেমন যেন কঠিন আর প্রাণশূন্য হয়ে উঠছে। ভোরের শিউলী ফুলটা এখন শুকিয়ে বর্ণহীন। সুচেতা কোনওরকমে জিজ্ঞেস করলো, ভূমিকার পরের অধ্যায়টা কে বলবে?

আমিই বলবো। কিন্তু সুচেতা— তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে!

কী রকম?

আমার চেনা-জানা সেই সুচেতা নয়। তোমাকে খুব অপরিচিত লাগছে।

আমারই ভুল হয়ে গেছে। আসলে তুমি আমার যন্ত্রণাটা কেমন করে বুঝবে? কথাটা শেষ করেই সুচেতা সুধীমনের মুখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে হেসে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো, আমি খুব পালটে গিয়েছিলাম তাই না?

আমি তো রীতি মতো ভয় পাচ্ছিলাম।

তাই বুঝি? সুচেতা আরও জোরে হেসে উঠলো। কৌতুকের সুরে বললো, সুনীতার ব্যাপারটা বলবে নাকি ধামা-চাপা দেওয়ার ইচ্ছে আছে?

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুনীতার সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছে প্রতিটি শব্দ এক এক করে সুচেতার কাছে তুলে ধরলো সুধীমন। কোনও কথা বাদ যাচ্ছে কিনা অথবা আগে-পরে হচ্ছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রেখে সুধীমন যখন ওর কথা শেষ করলো তার অনেক আগে থেকেই সুচেতার মুখে মেঘ জমতে শুরু করে দিয়েছে। সুধীমন সেটা লক্ষ্য করে বলে উঠলো, তুমি কিন্তু আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।

সুচেতা নিজেকে সামলে নিল। তার বিরক্তির ভাবটুকু পুরোপুরি কাটলো না। সে এবারে সুধীমনকে নিয়েই পড়লো। বেশ ঝাঁঝালো সুরে বললো, তোমার রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়! কোন যুক্তিতে তুমি সুনীতার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে গেছো? কে তোমাকে ওর সঙ্গে অতোক্ষণ কথা বলতে বলেছে?

নীট ফলটা তাহলে এই দাঁড়ালো আমিই দোষী?

আমি সে-কথা বলছি না।

সেটাই তো বলছো।

তুমি জানো না সুধীমন—সুনীতা মেহতা আসলে—আমি কী বলতে চাইছি তুমি কী কিছুই বুঝতে পারছো না?

সামান্য হেসে সুধীমন উত্তর দিল, একটু একটু পারছি।

ওর নাম শুনলেই আমার সারা শরীরে রাগ ধরে যায়। খুব আস্তে আস্তে সুচেতা বলতে লাগলো, কিন্তু ও বিজয়ী হতে পেরেছে। ওর কাছে আমি হেরে গেছি। আমার রাগটা এই কারণে। দুঃখ আর লজ্জাটা কোথায় জানো? ও আমাকে করুণার চোখে দেখে।

তুমি যা বলছো ব্যাপারটা আমি ঠিক—

আর কতো ভেঙে বলবো সুধীমন? সুচেতা করুণ হেসে খুব স্পষ্ট করে বললো, দেবু ওকে নিয়ে প্রায়ই বাইরে রাত কাটায়। উটি, সিমলা, কাশ্মীর যখন যেখানে ইচ্ছে দুজনে বেড়াতে যাচ্ছে। এখন তো সুনীতাই দেবুর সব।

ওর স্বামী কিছু বলেন না?

স্বামী! সুচেতার সারা মুখে একরাশ হতাশার ছবি ফুটে উঠলো। যখন বেঁচে ছিল তখনই কিছু বলতো না, এখন তো বলা-কওয়ার বাইরে। বছর দুই হলো মারা গেছে। তাছাড়া মিঃ মেহতাও ছিল একটা শয়তান। তোমাকে সব বলবো সুধীমন। সব।

আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে উঠছে দেখে সুধীমন অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলো। তাছাড়া সমস্যার গভীরে যেতে তার ভয় হয়। এই বুঝি আরও জড়িয়ে পড়ে। কেন-না সুচেতাকে মুখে যতোই

অস্বীকার করুক আজও সে ওকে ভুলতে পারেনি। দু'চার ঘন্টার জন্য এসে মন খারাপ করার তাই কোনও মানে হয় না। সুধীমন ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললো, তোমার ঘরখানা কিন্তু দারুণ!

তোমার ভালো লেগেছে? সুচেতা মিষ্টি করে হাসলো।

সুন্দর জিনিস কার না পছন্দ?

সুন্দর তো আমিও। আমাকে কিন্তু দেবু আর পছন্দ করে না।

তোমাকে কে কতোটুকু পছন্দ করলো-না-করলো জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি তাতে তোমার সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র কমেনি।

কথাটা শুনে স্নিগ্ধ হাসলো সুচেতা। ওকে আরও বেশি মায়াবী আর কোমল দেখাতে লাগলো। সুধীমন বললো, তুমি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেছো।

কী করে বুঝলে? সুচেতার দুই ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। সুধীমনের মনে হলো ওই সামান্য মৃদু হাসিটুকু দিয়েও সুচেতা তার মনের অনেক কিছুই যেন লুকোতে চায়। সে বললো, তুমি আগে অনেক অস্থির ছিলে। খুব রাগী আর জেদী। তোমার সঙ্গে বন্ধুরা কেউ পেরে উঠতো না। অনেক সময় দেখা যেতো তর্কে হেরে যাচ্ছো। তবুও হার মানতে চাইতে না। সবার ওপরে তোমার কথা থাকবেই। অন্যান্য বন্ধুরাও তোমার সঙ্গে সমানে লড়ে যেতো, একমাত্র আমিই তোমাকে মেনে নিতাম। আর মানিয়েও চলতাম। আসলে এতো সামান্য ঘটনায় এবং অনেক সময় প্রায় বিনা কারণেও তুমি এমন রাগ দেখাতে যে আমারই মাঝে মধ্যে খুবই খারাপ লাগতো। একটু চুপ করে থেকে সুধীমন আরও বললো, এখন যদি তোমাকে মনে করিয়ে দিই, তোমার ব্যবহারে তুমি নিজেই হাসবে।

সিনেমার দু'খানা টিকিট কেটে সুধীমন বসুশ্রীর নীচে অপেক্ষা করছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে সুচেতাকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে এখানে চলে আসার জন্য। ওর আসার সময়ও হয়ে গেছে। সুধীমন তাই বারবার ঘড়ি দেখছিল আর রাস্তার দিকে উন্মুখ হয়ে চোখ বোলাচ্ছিল। ওদিকে শো আরম্ভ হবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। হঠাৎ সুধীমনের একটু আশঙ্কা হলো। সুচেতা আসবে তো? কেন-না আসবে বলে সুচেতা আসেনি এমন ঘটনাও ঘটেছে। সেটাও হয়েছে এই সিনেমা দেখা নিয়েই। ভারতী হলের সামনে সেবারে সুধীমন ঠায় দাঁড়িয়ে। তিনটের শো। চারটে বেজে গেছে তখনও সুচেতা উত্তর দিয়েছে, বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় মায়ের সঙ্গে কী একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটিতে তার মন ভেঙে গেছে। সেই কারণে যেতে পারেনি। সুতরাং কখন যে সুচেতার মন ভাঙবে আর কখন ভাঙবে না—সেটা একটা গবেষণার ব্যাপার।

সুধীমন চলমান জনস্রোতের ওপর চোখ রাখলো। জনতার সেই স্রোতের ঢেউ বারবার তার সামনে এসে আছড়ে পড়ছে। বেনোজল ঢুকবার মতো তারাও হলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করলো, সুচেতা নামের একটা সুন্দর ঢেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে কুলকুল শব্দে হাসছে।

এতোক্ষণে তোমার সময় হলো?

কতোটা পথ বলতো? সুচেতাই উল্টে প্রশ্ন রাখলো।

সুধীমন বলতে যাচ্ছিল, স্বভাবটা ঠিক রেখেছো। কিছুতেই হার স্বীকার না-করে উল্টে অপর পক্ষকে চাপের মুখে রাখা চাই। কিন্তু এ-কথা তো ওকে বলা যাবে না। যাবে না মানে সুধীমনেরই বলার ক্ষমতা নেই। ওই ক্ষমতাটুকু দেখাতে গেলেই তুলকালাম কান্ড ঘটে যাবে। তার চেয়ে শান্তিতে থাকাই ভালো। সুধীমন স্বাভাবিক সুরে শুধু বললো, গড়িয়াহাটা থেকে হাজরা। দশ-বারো মিনিটের তো পথ।

তবুও তো এসেছি। সুচেতার মুখে সূর্যকিরণের ছটা। না-এলে বুঝি তোমার ভালো লাগতো?

তুমি আমার জন্য এতো ভাবো!

ভাবিই তো।

তবে এতো দেরি করলে কেন? সিনেমা আরম্ভ হলে সেই ছবি দেখতে আমার খুব বাজে লাগে।

একটু গম্ভীর হয়ে সুধীমন রাগ দেখাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ও-সবে অন্য কোথাও কাজ চলতে পারে, সুচেতার কাছে নয়। সুচেতা আরও বেশি গম্ভীর হয়ে বললো, দেখো রাগটা তো জানতাম আমারই একচেটিয়া। তুমি আবার কবে থেকে রাগ করা শুরু করলে?

ছবি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মৃদু আলোর অন্ধকার ঘরে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। সুচেতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, কতো দামের টিকিট কেটেছো?

তিন টাকা নব্বই করে। খুব স্বাভাবিক গলায় সুধীমন জানতে চাইলো, কেন বলতো?

উত্তরটা সুচেতা মুখে দিল না। দিল কাজে। ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সুধীমনের হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে সুধীমন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, টাকাটা দেবার কী হয়েছে?

আমিই না-হয় দেখালাম।

সেটা আমিও বলতে পারি।

না। আজকের খরচ আমার। আমিই তোমাকে দেখাচ্ছি। সুচেতার দৃপ্ত ঘোষণা।

সুচেতাকে যেটুকু চিনেছে তাইই যথেষ্ট। অন্য সময় হলে সুধীমন ওখানেই থেমে যায়। ব্যাপারটা মেনে নিয়ে একেবারে চুপ করে থাকে। কিন্তু তারও যে সেদিন কী হলো কে জানে? যথাসম্ভব অপরের কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করে বললো, আমার কথাটা রাখো। প্লিজ—টাকাটা নাও। সুধীমন ওর হাতের মধ্যে টাকাটা রাখতেই সুচেতা রেগে গেল। বললো, দিন দিন তুমি কিন্তু খুবই অবাধ্য হচ্ছো।

ওই কথাটা তো আমিই তোমাকে বলবো ভাবছিলাম।

তাই নাকি? সত্যিকারের রাগলো সুচেতা তখনই। এবারে যেটা করলো তার মধ্যে যথেষ্ট পাগলামোও মিশে ছিল। টাকাটা সে সুধীমনের হাতে আর দিল না, ওর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেললো। সঠিক জায়গায় না-পড়ে টাকাটা আসনের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে যতোটা সম্ভব হাতড়ে হাতড়ে মিনিট দুই চেষ্টা করলো সুধীমন। টাকাটা পেল না। বিরতি এবং ছবি ভাঙার পরেও সুধীমন এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে খুঁজেছিল কিন্তু যেটা হারাবার তা কী কখনও ফিরে আসে?

ফেলে আসা দিনের ছবি দূরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে সুধীমন উজ্জ্বল চোখে সুচেতার মুখের দিকে তাকালো। বললো, কী যে রাগ দেখাতে পারতে! তবে যতো চোট-পাট সবই আমার ওপরে।

তোমাকে রাগ দেখিয়ে আনন্দ পেতাম।

সত্যি বলছো?

বিশ্বাস করো—তখন শুধু মনে হতো এই পৃথিবীতে আমার মতো সুখী কে? রাগ দেখাবার এমন একটা জায়গা পেলে যে-কোনও মেয়ে বিশ্বজয় করতে পারে। সুচেতা এবারে খুশির হাসি হাসলো। বললো, আমার সব দাবি একমাত্র তুমিই মানতে। অন্য বন্ধুরা আমাকে সহজে মেনে নিতো না। তর্ক জুড়ে দিতো। সেদিক দিয়ে তুমি অনেক আদর্শ মানে ভালো ছেলে ছিলে। যা বলতাম সব শুনতে। শুধু সেদিনই যা একটু বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলে।

সুচেতা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে কুশন দেওয়া টুলটায় বসলো। মাথা থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেলতেই দক্ষিণের খোলা হাওয়ায় শ্যাম্পু করা কাঁধ পর্যন্ত মসৃণ চুলগুলো উড়তে লাগলো। সুচেতা প্রথমেই সাদা একটা ফিতে দিয়ে বেঁধে বশে আনলো। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ক্রীমটা সারা মুখে আস্তে আস্তে ঘষে বসিয়ে দিল। পরে ফর্সা শুকনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে আলতো করে মুছে নিয়ে নতুন করে কোল্ড ক্রীম মাখলো। দুই চোখে লাগালো শিঙ্গার ডিলাক্স-এর কাজল। ছোট সিঁথিতে সিঁদুরের আবীর ছড়ালো। টিপস অ্যান্ড টোজ দিয়ে হাতের এবং পায়ের নখকে করে তুললো ঝকঝকে মনোলভা। হাতের নখে লাগালো স্ট্রবেরী ক্রীম আর পায়ের নখে ডাস্কি পিংক। সারা শরীরে স্প্রে করে ঘরটাকে মিষ্টি গন্ধে ভরিয়ে তুললো।

দেওয়ালে ছোট একটা মেয়ের ফটো টাঙানো। সুধীমন বেশ কিছুক্ষণ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে

রইলো। আসলে সে ওই ছবির সঙ্গে সুচেতাব মুখের মিল খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো। একসময় জিজ্ঞেস করলো, ছবিটা তোমার মেয়ের?

হ্যাঁ।

ওকে দেখলাম না তো। স্কুলে গেছে?

টিয়ারা দার্জিলিংয়ে থেকে পড়াশোনা কবে। আগে অবশ্য সাউথ পয়েণ্টে পড়তো। গত বছর থেকে দার্জিলিংয়ে দিয়েছি।

পড়াশোনায় কেমন হয়েছে?

ভালো।

তোমার চেয়েও? সুধীমন সুচেতারই প্রশংসা করলো।

তা বলতে পারো। সুচেতা মিষ্টি হেসে এবারে মেয়ের প্রশংসা করলো, টিয়ারা পড়াশোনায় সত্যিই ভালো হয়েছে। আর ঠিক ওই ওই জন্যেই আরও ভালো জায়গায় দিলাম।

দেবু অফিস থেকে ফিরবে কখন?

ও! তোমাকে তো বলাই হয়নি এতোক্ষণ। দেবুকেই তো এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ও অফিসের কাজে আজ ত্রিবান্দ্রাম গেল। পাঁচ-ছ'দিন থাকবে ওখানে।

সুচেতা সুধীমনকে নিয়ে টেবিলে খেতে বসলো। সরু চালের ভাত, ঘি, পটলভাজা, রুইমাছের মাথা দিয়ে মুঘের ডাল, শুক্তো, মাছের ঝাল, আনারসের চাটনী, দই, সন্দেশ ইত্যাদি সব কিছু সাজিয়ে নিয়েও কিসের যেন একটা অভাব বোধ করলো। ভরতকে হুকুম করলে সেটাও এক্ষুনি পেতে পারে কিন্তু না—সে নিজে হাতে করবে। চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সুধীমন ওর মুখের দিকে তাকালো। সুচেতা সামান্য হেসে ছোট্ট সুরে বললো, তোমার প্রিয় খাবারটাই নেই। আমি এক্ষুনি তৈরি করে আনছি। সুধীমনের প্রথমেই মনে হলো, সুচেতাকে থামানো দরকার। অন্তত এটুকুও বলা উচিত, না-না ও-সব ঝামেলায় যেতে হবে না। তাছাড়া কতো জিনিস! কে খাবে এতো? কিন্তু সুধীমন ও-সব কিছুই বলতে পারলো না। খুশির একটা স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য সুরে জানতে চাইলো, তোমার মনে আছে এখনও?

আমাব সব কিছু মনে থাকে বলেই আমি অসুখী। কথাটা শেষ করে আর দাঁড়ালো না। সুচেতা পা বাড়ালো রান্না ঘরের দিকে।

সুধীবন ওর শেষ কথাটা নিয়েই ভাবতে বসলো। অসুখী শব্দটা কেন সে উচ্চারণ করলো? কীসের দুঃখ ওর? না-কি সুধীমনকে একধরনের সান্ত্বনা দেবার জন্যই অমন উদাস সুরে কথা বলা? আসলে ওর অপরাধী মনটা বোধহয় কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে ভেতরে আব একটা মনের সঙ্গে। সুধীমন তো ভেবে পেল না কী দুঃখ সুচেতার থাকতে পাবে?

নিজের চোখে যেটুকু দেখালো তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, অত্যন্ত সুখের এবং বিলাসের জীবনযাত্রা সুচেতাদেব। এর চেয়ে বেশি আব কি আকাঙ্খা থাকতে পারে?

একটু একটু করে সুধীমনের চিন্তাটা অন্য দিকে কীসের যেন সন্ধান করতে থাকে। নতুন করে সে ভাবতে থাকে। নিজস্ব ঝকঝকে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, টিভি, ফ্রিজ আর অফুরন্ত বাহ্যিক বিলাসিতার মধ্যে থাকলেই কেউ সুখী হয় না। এ-গুলো তো তারও রয়েছে। সে তবে সুখী নয় কেন? সুখের চাবিটা অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি। সকলে এর সন্ধান পায় না। আবার অনেকে পেয়েও হারিয়ে ফেলে। সুচেতা কী দেবুর কাছ থেকে সেই চাবিটা এখনও পায়নি?

সুধীমনের আজকাল প্রায়ই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। অনেক কথা মনে রেখেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, সুচেতা তো একটু আগেই বলছিল বাড়ির ওপর দেবুর আর টান নেই। সুনীতার সঙ্গে ওর একটা ভালো সম্পর্ক চলছে। সুচেতা তো সেই কারণেও অসুখী হতে পারে।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এলো সুচেতা। বসলো চেয়ারটা টেনে নিয়ে। ডিমের পোচটা সুধীমনের ডিসের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, খাওয়া শুরু করো—

সুধীমন কিন্তু খাওয়া শুরু করলো না। ব্যথাতুর এক দৃষ্টি নিয়ে সে সুচেতার দিকে তাকিয়ে রইলো। এই মুহূর্তে একরাশ প্রশ্ন এসে তাকে বেশ কিছুটা ভাবিয়ে তুললো। কোন প্রশ্নটা আগে করবে সুধীমন সেটাই ভাবতে ভাবতে সব কিছু গুলিয়ে ফেলে আরও বেশি মূক হয়ে গেল। আজকের সুচেতা বড্ড ক্লান্ত। ধূসর ছায়ার মধ্যে নিজেকে যেন লুকিয়ে রেখেছে। এই সুচেতাকে সে চেনে না। চিনতে পারছে না। সুধীমন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই আগের সুচেতাকে খুঁজতে লাগলো।

কী হলো, খাও? সুচেতা আন্তরিক ভাবে তাড়া দিয়ে বললো, আজকের দুপুরে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবো ভাবতেই পারিনি। সকালে উঠে কী ভেবেছিলাম, এই দিনটা এতো সুন্দর হবে?

সুচেতার কথাগুলো সুধীমনের মাথায় ঢোকেনি। 'অসুখী' শব্দটা তার মাথায় তখনও পেরেকের মতো সমানে খোঁচা দিয়ে ক্ষত তৈরি করে চলছিল। নিঃশব্দের গহ্বর থেকে সে এবারে বেরিয়ে এলো। খুব আস্তে আস্তে গভীর গলায় সুধীমন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী সত্যিই অসুখী? সুধীমনের প্রশ্নটা শুনে সুচেতা ওর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মনের মধ্যে থেকে সব রকমের জড়তা, দ্বিধা দূরে সরিয়ে রেখে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল সে। উপর থেকে ভাসা ভাসা সুরে শুধু জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী মনে হয়?

আমার তো মনে হয় তুমি দারুণ সুখী।

ঘর-বাড়ি দেখে?

তাও বলতে পারো। কথাটা বলেই ছেলেমানুষের মতো হেসে দিল সুধীমন। খুব সহজ ভঙ্গিতে হালকা মেজাজে আবও বললো, অনেকটা হিন্দি ছবির নায়িকাদের মতো।

তার মানে? সরু ভ্রূ দুটিকে সামান্য কুঁচকে অবাক হয়ে হাসলো সুচেতা। আসলে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না সুধীমন কী বলতে চায়।

হিন্দি ছবির নায়িকারা যেমন ডল পুতুলের মতো দেখতে, তুমিও তো ঠিক তাই। সারাক্ষণ পেন্ট করে থাকে। দারুণ দারুণ পোশাক পরে যখন-তখন সুইজাবল্যান্ড, প্যারিস, রোম যাচ্ছে, শুধু নাচ আর গান করা ছাড়া এই পৃথিবীতে তাদের দ্বিতীয় আর কোনও কাজ নেই। অভাব কী জিনিস তারা জানে না, ভুলেও এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে হয় না। সব সময়েই একটা সুখী সুখী আদুরে ভাব।

আমাকে দেখে তোমার তাই মনে হয় বুঝি?

ঠিক তাই।

খুব ভুল জানো তবে। সুচেতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।

হতে পারে—কেন-না তোমার মনের অসুখ কী তাতো আমি জানি না। সুধীমন একটু থামলো। কাকে কখন কতোটুকু কী বলা উচিত— সে-ব্যাপারে সুধীমন খুব সিবিয়াস। বলবার আগের মুহূর্তেও সে চিন্তা করে, এটা বলা যেতে পারে তো? তা সে যতোই আপনজন হোক না কেন। সুধীমনের নিয়মের এই হিসেবটা সবার ক্ষেত্রেই এক। এবারেও সে কিছুটা সময় নিয়ে একটু ভাবলো। আস্তে আস্তে বললো, তুমি অবশ্য দেবুর কথা একবার বলেছিলে। সুনীতার সঙ্গে—আসলে আমি তখন অতোটা গুরুত্ব দিইনি তোমার কথায়। ভেবেছিলাম, বেশি সুখে থাকলে কেউ কেউ রজ্জুতে সর্প দেখে থাকে। ওটা এমন কিছু নয়। অথচ তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে নাক উঁচু করে কোনওরকমে অগাধ জলে সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করে চলেছো।

খেতে খেতে সুচেতা সুধীমনের কথাগুলো শুনলো। মনের মধ্যে ওই কথার রেকর্ড চালিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। তাবপর গভীর এক উদাস সুরে বললো, আমাব প্রতি দেবু আর কোনও আকর্ষণ বোধ করে না। মনে প্রাণে সে আমাকে চায়ও না।

সে-কী! সুধীমন যেন একটা ধাক্কা খেলো। নিজেকে শুনিয়েই করুণ গলায় বললো, তুমি কষ্ট পাও, অসুখী হও এ-আমি কখনওই চাইনি। দেবুকে বিয়ে করার পর প্রচন্ড মানসিক কষ্টের মধ্যে ছিলাম—কিন্তু তবুও কামনা করিনি তুমি অশান্তি পেয়ে তার শাস্তি ভোগ করো। সেই কারণে,

তুমি যখন বলেছিলে, দেবু সুনীতাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যায়, রাত কাটায়, তখন বিশ্বাস করতে মন চায়নি। মিথ্যে ব্যাপার বলে ভুলে থাকতে চেয়েছি। কিন্তু যেটা সত্যি—চোখ বন্ধ করেও সেটাকে তো আর ঠেকানো যাবে না। আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে কী জানো? তোমাকে আমি কতোটুকু ভালবাসতাম দেবু সেটা জানতো আর সেই জানার পরেও সে তোমাকেই পাবার জন্য রীতিমতো আকুল হয়ে উঠেছিল। অথচ তোমাকে দেবু—

এখন আর আমাকে নয় সুধীমন। সুচেতা মৃদু হাসলো। তার ওই হাসির মধ্যে যে-অনুক্ত কথা ওকে বিষণ্ণ করে তুলেছে, সেই সহানুভূতি নিয়ে সুধীমন কোমন সুরে বললো, আমি ঠিক মতো হিসেব মেলাতে পারছি না। দেবু একদিন আমাকে শুনিয়ে বলেছিল, 'আমি আমার সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, শুধু মাত্র সুচেতার জন্যে।'

কথাটা দেবু ঠিক বলেছে। সুচেতা নিজেকে সহজ করার জন্যে আরও সহজ ভঙ্গিতে বললো, শুধু সুচেতার জায়গায় সুনীতা বসিয়ে দিলেই হবে। তুমি আর কতোটুকু কী জানো সুধীমন—ওই সুনীতা মেহতাই হচ্ছে এখন দেবুর ধ্যান-জ্ঞান। ওদের সুইডিস ফার্ম জিকরোল কোম্পানির চেয়ারম্যান কিষাণ মেহতার স্ত্রী। এখন দেবুই চেয়ারম্যান। কিষাণ মেহতার সময় ও জেনারেল ম্যানেজার ছিল।

তার মানে বসের স্ত্রীর সঙ্গেই দেবু—

হ্যাঁ।

উনি এটা কী করে মেনে নিতেন সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।

সেই তো এগিয়ে দিয়েছে। করুণ হাসলো সুচেতা। আবেগ মিশিয়ে বললো, সুধীমন, তোমার তো একটা মন রয়েছে। আর সেই মনটা দারুণ খাঁটি। তাই তোমাব মাথায় এ-সব ঢুকবে না। যেদিন এই অনুভূতিগুলো হারিয়ে ফেলবে সেদিন দেখবে তুমিও একজন দেবু বা একজন কিষাণ মেহতা হয়ে গেছো।

তোমার কথাগুলো অস্বীকার করি না সুচেতা, তবুও—

তুমি এদের সম্পর্কে কিছু জানো না তাই এতো অবাক হচ্ছো। বলবো না, বলবো না করেও সুচেতা বলেই ফেললো, কিষাণ মেহতা দেবুর দিকে তাঁর স্ত্রীকে এগিয়ে দিয়েছিল। কেন জানো? নয় তো সে আবার আর এক জায়গায় যাবার পাসপোর্ট পাবে কেমন করে? এরা যে কতো অনুভূতিহীন, হৃদয়-শূন্য তুমি চিন্তা করতেও পারবে না। এদের কাছে ন্যায়-নীতি বলে কিছু নেই। আদর্শ-টাদর্শকে অনেক আগেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুচেতা একটু সময় নেবার জন্য থামলো। তার কাছে ও-সব চাপাচাপির কোনও ব্যাপার নেই। বিশেষ করে সুধীমনকে সে কোনও কথাই লুকাতে চায় না। তাই স্পষ্টই বললো, আসলে কী জানো, কিষাণ মেহতা আমার দিকেই ঝুঁকেছিল। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। খুব বুদ্ধিমান লোক তো। হাসি-গল্পে আপন করে নিয়ে প্রথমেই প্রমাণ করে দিয়েছিল, আমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু। কিষাণ মেহতা এবং সুনীতা প্রায়ই আমাদের ফ্ল্যাটে আসতো। রাতের-খাওয়া দাওয়া সারতো। আমরাও যেতাম। একটা সুস্থ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে অন্যরকম সেটা টের পেলাম কয়েক দিন পর। একদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিতেই অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। লোকটা একটা চোখ ছোট করে বিশেষ এক ইশারায় হাসছে। ব্যাপারটা বুঝতে আমার যেটুকু সময় লাগলো, শক্ত হয়ে দাঁড়াতে সেটুকু সময়ও লাগলো না।

আপনি খুব ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন মিঃ মেহতা।

এনিথিং রং বেবি? লোকটা তখন হাসছে।

সেটা তো আপনি আমার চেয়েও ভালো বুঝতে পারছেন। তাছাড়া 'বেবি' ডাক শোনার স্থূল মানসিকতা আমার নেই। ওই সম্বোধনটা অন্য কাউকে করবেন।

আপনি এতো রেগে গেলেন কেন—এতে রাগের কী আছে? কিষাণ মেহতা, জিকরোল কোম্পানির চেয়ারম্যান যিনি শূন্য মনে কোথা থেকেও ফিরে আসেননি তিনি একটু ধাক্কা খেলেন। কিন্তু দমলেন

না। তার কাছে এই বাঁধাটা নিতান্তই সূতোর পলকা। যখন যা চেয়েছেন পেয়েছেন। প্রত্যাখ্যান শব্দটাব সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না। সেই কারণে একটু অবাক হলেন। সেটা সাময়িক। তিনি অভিজ্ঞ লোক। কোন পাখিকে কী কৌশলে বাঁধতে হয় সেটা অনেকের চেয়েই ভালো জানেন। সুচেতার ছন্দময় শরীরের ওপব চোখ রেখে গাঢ় গলায় বললেন, আমি আপনার সৌন্দর্যের তারিফ করি।

এই কথাটা মিসেস মেহতাকে গিয়ে বলবেন। তিনি খুশি হবেন।

খুব ভুল বললেন। কিষাণ মেহতা খোলামেলা হাসলেন। কাউকে তার ভয় পাবার ছিল না। কারো কাছে জবাবদিহি করারও প্রশ্ন ছিল না। হাসতে হাসতে তাই স্পষ্টই বলে ফেললেন, এই দুনিয়ায় সত্যি কথাটা কেউ স্বীকার করে না। আমি করি। আমার ও-সব অহেতুক লজ্জা-টজ্জা নেই। বিয়ের দু-তিন বছর বাদে প্রত্যেকেই একটু অন্যায় খেলা খেলতে চায়। সেখানে পুরনো সঙ্গীর কথায় কেউ খুশি হয় না। একটু চুপ করে কিষাণ মেহতা অভয় দিলেন, আপনি কী দেবুকে ভয় পাচ্ছেন? ও-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

সুচেতা ক্রমশই ফুসছিল। লোকটা জিকরোল কোম্পানির চেয়ারম্যান হতে পারে তার মাথার ওপরে নিশ্চয়ই নয়। কিষাণ মেহতা দেবুর বস, দেবুর ওপরেই খবরদারি করুক, তাকে কেন বিরক্ত কবতে আসা? সুচেতা টান টান হয়ে দাঁড়ালো। ভেতব থেকে সে একটা শক্তি পাচ্ছিলো। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলো, তার মানে? আপনি কী বলতে চাইছেন কী?

তুমি কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি—সব কিছু মানিয়ে নিয়ে চলতে শেখো।

আপনি আমাকে কী ভাবছেন বলুন তো? রুক্ষ মেজাজে ঝাঁকিয়ে উঠলো সুচেতা। অনেকক্ষণ ধরেই অপমানটা সহ্য করছিল। আর নয়। চাকরের মতো চেয়ারম্যানকে হুকুম দিল, এই বাড়িতে আসার যোগ্যতা আপনার নেই। আর কখনও আসবেন না।

কিষাণ মেহতা নির্লিপ্তের মতো কথাটা শুনলো মাত্র, নড়বার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। ওরা আসলে অনেক উঁচু তলার লোক। নীচে নেমে অনেক কাজ কর্ম করতে হয় বলেই কোনও মান-অপমান গায়ে মাখে না। মাখতেও নেই। তাতে আসল জায়গায় কখনওই পৌঁছানো যায় না। কিষাণ মেহতা দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়াতেই সুচেতা একঝটকায় সরে গেল। রাগে অপমানে সে তখন কাঁপছে। রুক্ষ গলায় গর্জে উঠলো, সাহস নয়, আপনি অনেক দুঃসাহস দেখিয়েছেন আর আমি নেহাত কম ধৈর্যের পরিচয় দিইনি। কিন্তু সব জিনিসেরই তো একটা সীমা আছে। আমার কাছে আপনার আর কোনও সম্মান নেই তবে চাকরি সূত্রে চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার যে মর্যাদাটুকু রয়েছে অন্তত সেটুকু নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। বাইরের দরজা খোলা আছে—তবে আপনি চলে যাবার পর সেই দরজা চিরদিনের মতো আপনার জন্যে বন্ধ থাকবে। আশা করি এটা কখনও ভুলে যাবেন না।

যদি ভুলে যাই? অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো কিষাণ মেহতা তখনও হাসছে।

সুচেতার সারা শরীরটা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। লোকটা তাকে যথেষ্ট অপমান করেছে। ভেতরে ভেতরে তার একধরনের কান্না আসছিল। ওই কিষাণ মেহতা তাকে কতোখানি সহজ লভ্য ভেবেছে—শুধু এই কথাটা মনে করেই তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিলো কিন্তু ও-সব কান্নার সময় এখন নয়। সুচেতার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বাঘিনীর গর্জন নিয়ে উত্তর দিল, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষাই পাবেন। কথাটা শেষ করেই সুচেতা একটু জোরের সঙ্গেই ডেকে উঠলো, ভরত।

মা। সঙ্গে সঙ্গে ভরত এসে হাজির।

উনি বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না—রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দে।

চাকরের সামনে এই ধরনের কথা! বাইরের ইজ্জতে বেশ আঘাত লাগলো। কিষাণ মেহতা একবার ভরত একবার সুচেতার দিকে তাকিয়ে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দেবুকে ডেকে বলতে হবে, এমন সতী-লক্ষ্মী বৌ ঘরে রাখলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়।

সুচেতা সুধীমনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। সুধীমন বেশ বুঝতে পারছে

ওর সব কথা এখনও শেষ হয়নি। আরও অনেক কথা বলার আছে। সুচেতার চোখ দুটো অন্তত সেই কথাই বলছে। সুধীমন ওকে তাই কোনওরকম বিরক্ত করলো না। ধ্যান মগ্ন এক সন্ন্যাসীর মৌনতা নিয়ে সে শুধু নিঃশব্দের প্রহর গুনতে লাগলো। তার অনুমান মিথ্যে নয়। একটু পরেই সুচেতা আবার বলতে আরম্ভ করলো, তোমার বন্ধুর কথা শুনবে? সে তো এক ইতিহাস। সেদিন রাতেই দেবু খুব হিংস্র হয়ে উঠেছিল। কথাবার্তা ছিল একেবারে প্রাণ-শূন্য। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস ছিল সহস্র মাইল দূরে। আমার অবস্থাটা একবার চিন্তা করো। ঘরে-বাইরে সবাই আমার বিপক্ষে। আমি যে কতো সুখে আছি তা একমাত্র আমিই জানি। দেবু সেদিন খেপে গিয়ে আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছিল।

দেবু তোমাকে মেরেছে?

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলিনি সুচেতা—এ-সব শুনে আমার খুব লাগছে।

এতেই ভেঙে পড়ছো? এখনও তো সব কথা শোননি—ওই দিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেবু আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি জানো কিষাণ মেহতা আমার বস?

কেন জানবো না? সুচেতাই উল্টে প্রশ্ন করেছিল, সেজন্য কী সম্মান বিকিয়ে দিয়ে তার সেবা করতে হবে আমাকে? কী বলতে চাও তুমি?

ও-সব লেকচার অন্তত আমাকে দিয়ো না সুচেতা। ব্যঙ্গের সুরে দেবু বললো, তোমাদের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিষাণ মেহতা তোমার কাঁধে একটু হাত রেখেছে তাতেই গেল গেল রব তুললে। আর বিয়ের আগেই যে তুমি সুধীমনের সঙ্গে হলং-য়ে গিয়ে সাতটা দিন কাটিয়ে এলে তাতে তোমার ইজ্জতটা বুঝি খুব বেড়ে গিয়েছিল।

সে-সব তো জেনেই বিয়ে করেছিলে। বিয়ের পরে এ-সব কথা তোলার অর্থ? তাছাড়া সুধীমনের সঙ্গে আমার কোনও কদর্য সম্পর্ক ছিল না। ও কতোখানি অনেষ্ট সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো। এ-সব বলে ওকে ছোট কোরো না।

কিন্তু আমাকে তুমি কিষাণ মেহতার কাছে অনেক ছোট করে দিয়েছো।

ছিঃ দেবু ছিঃ! তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।

সুধীমন ভাত খাচ্ছিলো, না বিষ পান করছিল বলা শক্ত। শুক্তো দিয়ে ভাতটা মেখে কোনও রকমে নাড়াচাড়া করছিল। কোমল দৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করলো সুচেতা। অনুনয়ের সুরে বললো, খেয়ে নাও সুধীমন। ভেবে তুমি আর কী করবে? এ-সব কথা তোমাকে বলবার ইচ্ছে ছিল না। জানি তুমি আরও কষ্ট পাবে। কিন্তু তুমি আমাকে এতো বেশি সুখী দেখলে যে—তাছাড়া আমিই-বা হালকা হবো কী করে?

দেবু তো এমন ছিল না। ভাঙা মন নিয়েই সুধীমন বলতে লাগলো, লেখাপড়ায় ও বরাবরই ভালো ছেলে ছিল। সেই সঙ্গে ছিল মনটাও। কোনওরকম অন্যায় বরদাস্ত করতে পারতো না। একবার এক প্রফেসরের সঙ্গে কী তর্কটাই-না করলো! দেবু তখন কলেজের গেম সেক্রেটারী ছিল। ওর মাথায় ওপরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন এস. কে. বি। আমাদের ফুটবল টিম তখন দুর্ধর্ষ। একবার ইলিয়ট না হেরম্ব মৈত্র শিল্ডের ফাইনাল ঠিক মনে নেই, দেবু তো ক্যাপ্টেনকে নিয়ে, কমিটির মিটিংয়ে প্রথম এগারোজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করলো। এস. কে. বি আপত্তি জানালেন। প্রথম এগারোজনের মধ্যে বাবলুকে রাখতেই হবে। বাবলু ওঁর ছেলে। উনি বললেন, রঞ্জনকে বাদ দিয়ে বাবলুকে নামাতে হবে। দেবু এটা কিছুতেই মানতে চাইছিল না। সে সমানে তর্ক জুড়ে দিয়েছিল এস. কে. বি-র সঙ্গে। কেন-না ওর একটাই যুক্তি, রঞ্জন বাবুলের চেয়ে ভালো প্লেয়ার। সুতরাং ও বাদ যায় কী করে? এটা অন্যায়। আমরা সবাই তখন দেবুকে বোঝাতে লাগলাম, স্যার যখন বলছেন, স্যারের কথাটা রাখো। বাবুল খারাপ খেললে তখন না-হয় রঞ্জনকে নামানো যাবে।

স্যার অন্যায় ভাবে তাঁর ছেলেকে ঢোকাচ্ছেন—এটা মেনে নিতে হবে? বাবুল খারাপ খেলুক

কী ভালো খেলুক সেটা পরের প্রশ্ন। দেবুর মুখটা তখন গনগনে আঁচের মতো লাল দেখাচ্ছিল।

সব মানছি দেবু, তোর কথাই ঠিক। তবুও বলছি স্যারের দিকে তাকিয়ে তুই এটা মেনে নে। আমরা সব বন্ধুরা মিলে দেবুকে ওই একটা কথা বোঝাতে লাগলাম। এমনকী যে রঞ্জন বাদ পড়েছে, সে ও পর্যন্ত বললো, একটা প্লেয়াবে এমন কিছু হেরফের হয় না। দেবু টেক ইট ইজি। বাবলু খেললেও আমরা জিতবো। আমরা সত্যিই সেই ম্যাচ জিতেছিলাম। কিন্তু দেবুকে আর গেম সেক্রেটারী হিসেবে পেলাম না। ও একটা কথা প্রায়ই বলতো, 'প্রতিবাদ কোনও কাজ হোক আর নাই হোক সেটা বড়ো কথা নয়—অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদ করাটাই বড়ো কথা'। সেই দেবু—

সেই দেবু এখন মিসেস মেহতা মানে সুনীতাকে ভালোবাসে। আর আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে লোক দেখানো সিনেমায় যায়। আলাদা বিছানায় ঘুমায়। দু-তিন মাস অন্তর দু-একদিন দয়া দেখাতে আমার বিছানায় আসে। ঘণ্টাখানেক থেকে নিঃশব্দে চলে যায়। সংসারের কথা-বার্তায় একেবারেই মাথা গলায় না। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে কখনও দু-একটা কথা বলে। ছুটির দিনে যতোক্ষণ বাড়ি থাকে ততোক্ষণই বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেয়। অফিস থেকে চাব-পাঁচ দিনের টানা ছুটি নিয়ে সুনীতাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে। আর মাস গেলে তিন হাজার টাকা আমাব হাতে তুলে দেয় স্বাচ্ছন্দের জন্য, বিলাসিতার জন্য, অভাবকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে না-দেবাব জন্য। এর চেয়ে কতো বেশি সুখে তুমি আমাকে বাখতে পাবতে সুধীমন? সুচেতা হাসতে গিয়েও হাসতে পাবলো না। ভেতর থেকে একটা কান্না এসে তার গলাটাকে বুজিয়ে দিয়ে ভারী করে তুললো। চোখের কোণ দুটোও উঠলো চিক চিক করে।

ভেতরে ভেতরে সুধীমন খুব অস্থিব হয়ে উঠলো। বুকেব মধ্যে একটা যন্ত্রণা শুরু হযেছে। চিন্তার বোঝাটা যখন কাঁটার মতো মাথায় ফুটতে থাকে, তখনই সেই যন্ত্রণাটা তাকে গিযে ছেলে খেলা খেলতে থাকে। এই সময় সে যতো বেশি চুপচাপ থাকে ব্যথাটা ততোই চেপে বসে। সুতরাং কথার মধ্যে ডুবে থাকাটা একান্তই জরুবি। সুধীমন ধীরে ধীরে প্রতিটা কথা কেটে কেটে বলতে লাগলো তোমাকে আমি খুবই যোগ্য ভাবতাম। আসলে তোমার কোনও যোগ্যতাই নেই। মূলত দেবু একটা ভালো ছেলে। তাকে তুমি নিজের কাছে ধবে রাখতে পারলে না?

তুমি ঠিকই বলেছো সুধীমন, আমার কোনও যোগ্যতাই নেই। মিঃ মেহতাকে খুশি করতে পারলেই আমি কিন্তু আমার যোগ্যতা ফিবে পেতাম।

না-না সুচেতা—আহত দৃষ্টি নিয়ে সুধীমন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমাকে তা বলতে চাইনি। একটু চুপ করে থেকে সুধীমন আবাব বললো, কে তোমাকে কতোটুকু চিনলো, জানলো, কে তোমার নিন্দে রটালো তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি তো তোমাকে চিনি। আমি তো জানি তুমি কী!! হলং-এর স্মৃতি নিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। হলং-এর দিনগুলোতে তোমার কথা প্রতিদিন ভাবি। অন্য মেয়েরা যেখানে অতি সহজেই সহজ হয়ে উঠতো, তুমি সেখানেও অনন্যা। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি সুচেতা।

সুধীমনেব শেষের কথাগুলো শুনতে শুনতে ঝবঝর করে কেঁদে ফেললো সুচেতা। অনেক দিন সে এমন স্নিগ্ধ, এমন সান্ত্বনাব কোমল কথা শোনেনি। জলের কাছে থেকেও সে যেন মরুভূমিতেই বাস করছিল। দেবুর কাছ থেকে সে কিছুই পাচ্ছিলো না। সেই চাপা দুঃখটাই এখন বাইরে বেরিয়ে আসছে। সুধীমন ওকে বাঁধা দিল না। সুচেতা কাঁদুক। একটু বেশি সময় নিয়ে কাঁদুক। বৃষ্টির পর মনের আকাশটা পরিষ্কার হোক।

বেশ কিছুটা সময় দুজনেব কেউ কোনও কথা বললো না। সুধীমন ভাতগুলোকে নাড়াচাড়া করতে করতে দু-একবার সুচেতার চোখেব দিকে তাকিয়ে যা করছিল তাই করতে লাগলো। সুচেতার দুই চোখে তখন বনানীর শীতল ছায়া। প্রকৃতির শান্ত রূপ ওর চোখের পালককে ঘিরে রয়েছে। সুধীমনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও খুব ক্লান্ত সুরে জানতে চাইলো, কিন্তু আমি কি পেলাম বলো? আমি অবশ্য ওকে জব্দ করতে পারতাম। খোলাখুলিই বলছি, দেবুকে মুক্তি দিয়ে আমিও মুক্ত হতে

পারতাম। হয়তো তোমার কথা মতো সেই সুখীও হতে পারতাম। কিন্তু টিয়ারার কথা ভেবে সব কিছু সহ্য করি। তাছাড়া এই বয়সে নাটক করারও ইচ্ছে নেই। আর বাবা মার সম্মানের দিকটাও তো দেখতে হবে। তাই সব কিছু নীরবে মেনে নিয়ে আমি একাই অ্যাডজাস্ট করে চলেছি।

এই ভাবে মূল্য দিয়ে?

তা কী করা যাবে বলে—আমি তো দেবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ধরনের অন্যায় করতে পারবো না। সুচেতা অসহায়ের হাসি হাসলো। এটাই আমার ভাগ্য। আমি এই জীবনকেই মেনে নিয়েছি। আমার কোনও দুঃখ নেই সুধীমন। কোনও দুঃখ নেই। কথাটা বলতে বলতে সুচেতা আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটো একবার মুছে নিয়ে আরও বললো, আসছে মাসে টিয়ারা আমার কাছে আসবে। দেড় মাসের মতো থাকবে। উঃ কী আনন্দ যে তখন! সে তুমি ভাবতেও পারবে না। তখন আমি আর টিয়ারা। টিয়ারা আর আমি। সারা বছর তো বেঁচে থাকি শুধু এই সময়টুকুর জন্যেই।

ভাতের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে নির্বিকার হয়ে কথাগুলো শুনছিল সুধীমন। সুচেতা টিয়ারাকে পেলে খুবই খুশি হয় কিন্তু তার সুখের পাত্রটা তাতে কতোটুকু ভরাট হয়? ওর মতো একজন মেয়ের জীবন যে এই ভাবে নষ্ট হতে পারে এটা চিন্তার বাইরে। কী নেই সুচেতার? ওর সব কিছুই আছে। আর সংবেদনশীল একটা মনও আছে। যে-কারণে দেবুকে পানিশমেন্ট দেবার ক্ষমতা থাকলেও দিতে পারছে না। সংসারের সমস্ত গরল সে একাই পান করে টিয়ারার ভবিষ্যতকে টিকিয়ে রেখেছে।

সুধীমন হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সুচেতা প্রশ্ন করলো, কী হলো?

সুচেতা, আমার না একেবারেই খেতে ভালো লাগছে না। কিছু মনে করো না—

খুবই মনে করবো। হঠাৎ সুচেতা ওর মন থেকে সমস্ত হতাশার চিহ্ন-টিহ্নগুলো মুছে ফেলে আগের মতোই সজীব হয়ে উঠলো। একমুখ হাসি নিয়ে বললো, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে।

না-না। তা নয়।

তাহলে খেতে বসো।

সুধীমন তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে সুচেতা আবার বললো, তুমি কী চাও আমিও না-খেয়ে থাকি? সুচেতা কপট রাগে চোখ পাকালো। বোসো শীগ্গির—সব কিছু খেয়ে তবে উঠবে।

খেতে খেতে সুধীমন এক সময় বললো, ভরতের রান্নাটা কিন্তু চমৎকার!

ও দারুণ রাঁধে। নেহাত খাওয়াটা আমিই নষ্ট করে দিলাম—

তাহলেও স্বাদ পেতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তবে সুচেতা তুমি কিন্তু জোরাজুরি কোরো না। আমি আগে থেকেই বলে রাখছি এতো পদ খেতে পারবো না।

পেট ভরে খাবে তো?

তা খাবো। নির্ঝর হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে তুলে সুধীমন বললো, তোমার রান্না হলে কিন্তু খেতাম না।

কেন? সুচেতার ভ্রূ আরও শীর্ষে উঠলো।

তোমার রান্না খাওয়া মানেই তো কাঁদা।

তুমি সাঙ্ঘাতিক মানুষ তো—এখনও মনে করে রেখেছো?

মনে রাখার কাজ করেছো মনে থাকবে না!

সেবার সুচেতাদের বাড়িতে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ ছিল কয়েকজন বন্ধুর। বনানী, অনিন্দিতা আর মৈত্রালীর সঙ্গে সুধীমন, দেবুরও আমন্ত্রণ ছিল। বন্ধু ছিল আরও অনেকেই। তবে এই ছ'জনের মনটা ছিল খুব কাছাকাছি। প্রত্যেকের মানসিকতা যেন একই ছাঁচে গড়া। সেই কারণে বন্ধুত্বের গন্ডি এই ছ'জনের বাইরে খুব বেশি একটা এগোতে পারেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, লেখাপড়াতেও এই ছ'জন ছিল অত্যন্ত ভালো। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কে হবে কেউ জানে না—কিন্তু

এটা জানা ছিল, ওই ছ'জনের বাইরে নিশ্চয়ই কেউ নয়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কেউ কিন্তু কোনও নোট লুকাতো না। বিভিন্ন প্রফেসারের কাছ থেকে যে কেউই বিশেষ কিছু লেখা-টেখা পাক না কেন, ছ'জনই ছ'জনকে দেখাতো, আলোচনা করতো। সেই গ্রুপটাই সেদিন হাজির হলো সুচেতাদেব বাড়িতে। খাওযা-দাওয়া হবে সেই রাত্রিতে। তখন সন্ধে। সুচেতা ঝকঝকে হাসিতে সকলেব মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, রান্না-বান্না যা করার তা তো সব ঠাকুরেই করছে। আমি নিজে হাতে যেটা বানিয়েছি চায়ের আগে সেটাই এক্ষুনি খেতে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, সুচেতা প্রত্যেককে এক বাটি করে মাংসের ঘুগনি দিয়ে গেল। এটা নাকি ও নিজে রান্না করেছে। সুতরাং খেতেই হবে। বনানী, অনিন্দিতা, মৈত্রালী অবলীলায় খেয়ে নিলো। ঝামেলা হলো দেবু আব সুধীমনকে নিয়ে। বিশেষ করে সুধীমনকে নিয়ে। একেই সে ঝাল-টাল খুবই কম খায়। সুচেতা মাংসের ঘুগনী রেঁধেছে যেন স্রেফ লঙ্কা দিয়ে। এতো ঝাল খাওয়া সুধীমনের জীবনে ওই প্রথম। তার জিভ, ঠোঁট সব জ্বলে যেতে লাগলো। সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। কান দুটোকে গরম করে দিয়ে সেই ঝাঁঝ মাথায় গিয়ে পৌঁছাতেই সুধীমন বেশ কয়েকটা বিষম খেলো। কাশতে কাশতে কোনওরকমে বললো, জল—জল! মুহূর্তে জল এসে গেল। এক গ্লাসের জাযগায় সে তিন-চার গ্লাস জল খেলো। কিন্তু লঙ্কার চারাগাছটা বুঝি ততোক্ষণে তাব পেটের মধ্যে শিকড় ছড়িযে বসেছে। মাংসের ঘুগনী-টুগনি ফেলে দিয়ে সুধীমন বাথরুমে দৌড়ালো। ভালো কবে মুখ-টুখ ধুয়ে, চোখে, কানে এবং ঘাড়ে জল দিয়ে কোনওরকমে একটু সুস্থ হয়ে আবাব ঘরে এসে বসলো।

ওর ওই অবস্থা দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল সুচেতা। হাতের কাছে মিষ্টি জাতীয় যা পেয়েছে তাইই নিয়ে এসেছে। পাযেস, আইসক্রীম, চিনি সব কিছু সুধীমনেব মুখেব সামনে তুলে ধবেছে।

এ-গুলো খেয়ে নাও। ঝাল কেটে যাবে।

সুধীমন সে-কথার কোনও উত্তর দিল না। জিভে বাতাস টেনে নিযে শুধু বললো, এমন রান্না মানুষে রাঁধে? মাংসের ঘুগনি না-বলে লঙ্কার ঘুগনি বললেই পারতে। তাহলে খেতামই না।

জিনিসটা যে প্রচন্ড ঝাল হয়েছে সে-কথা দেবুও বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই সুচেতা সুধীমনের ওই অবস্থা দেখেও চোখ পাকালো, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না তো—দুধের শিশু যেন। সামান্য একটু ঝালও সহ্য হয় না।

এটা তোমার সামান্য হলো?

নয়তো কী? ওই তো অনিন্দিতা, বনানী, মৈত্রালী চেটে-পুটে খেয়ে উঠলো। ক'বার নোলা ফেলতে বাথরুমে দৌড়েছে? এই হলো সুচেতা। যখন যাকে ধরবে তাকে একেবারে কোণঠাসা করে ছাড়বে। নয়তো অনর্গল শাসাতে থাকবে।

সুধীমন বললো মেয়েদের কথা ছাড়ো। ওদের কথা শুনলেই বোঝা যায় প্রত্যেকের মুখের ভেতরটা এক একটা লঙ্কার আড়ৎ। তুমি দেবুকেই জিজ্ঞেস করো না? কী রে দেবু, ঝাল হয়নি? বল—

দেবু সুচেতার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন মিইযে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। সুচেতা তখনও বড়ো বড়ো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দেবু সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করে সামান্য হেসে বললো, ঝাল একটু হয়নি তা নয় তবে খাওয়া যায়। ঘুঘনীতে আবার একটু ঝাল না-হলেও চলে না। সুচেতার চোখের দিকে তাকিয়ে দেবু উদার হবার চেষ্টা করতেই সুধীমন ওকে ধমকে উঠলো, এই জন্যই তোকে গালাগাল করি। তুই তাহলে বনানীকে তোর ঘুঘনীটা ঢেলে দিলি কেন?

সুচেতা অমলিন এক হাসি নিয়ে উজ্জ্বল চোখে সুধীমনের দিকে তাকালো। গভীর সুরে বললো, সত্যি কী চমৎকার ভাবেই না আমাদের সেই সব দিনগুলো কাটতো! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ফেলে আসা ঘটনাগুলো মনকে সর্বদাই দারুণ ভাবে নাড়া দেয়।

সুচেতার ওই কথার সূত্র ধরে সুধীমন অনেকটা গভীরে ঢুকতে পারতো। কিন্তু সে ও-সব কথা আর তুললো না। হালকা মেজাজে জিজ্ঞেস করলো, ওরা এখন কে কোথায় আছে জানো? কতোদিন ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। বনানী, অনিন্দিতা, মৈত্রালী।

বনানী ওর স্বামীর সঙ্গে কানাডায় থাকে। বিয়েব পবেই ওখানে চলে যায়। কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে। এই ক'বছরে বার তিনেক দেখা হয়েছে। ওদের একটা ছেলে, একটা মেয়ে। বেশ সুখেই আছে ওরা।

অনিন্দিতার কী খবর?

অনিন্দিতা এতোদিন কলকাতাতেই ছিল। ওর স্বামী সুব্রত চাকরি করে জয়পুরে। গত বছর থেকে অনিন্দিতা জয়পুরের বাসিন্দা। ওদের দুটি মেয়ে। যমজ হয়েছিল।

আর মৈত্রালী?

মৈত্রালীর খবর তুমি কিছু শোনোনি?

আমি জানবো কেমন করে? পশ্চিম জার্মানি আব বাঙ্গালোর কাটিয়ে এতো বছব বাদে এই তো প্রথম কলকাতায এলাম। সুধীমন একটু থামলো। সুচেতাব চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীবে বলতে লাগলো আমার শুধু মনে আছে আমাদেব বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মৈত্রালীরই প্রথম বিয়ে হয়েছিল। ও কিছুতেই বিযে কবতে বাজি হচ্ছিলো না। বিশেষ করে পড়াশুনো শেষ না-কবে তো নযই। কিন্তু ভালো পাত্র পেযে গেলেন বলে ওব বাবা অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বিয়ের দিন আমি হাজরা মোড়ের এক নির্দিষ্ট জাযগায দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি আমাকে সেখান থেকেই তোমাদের গাড়িতে তুলে নিলে। ট্রাফিক-জ্যামের জন্য আমরা যখন এন্টালীতে মৈত্রালীর বাড়িতে গিয়ে পৌছালাম শুভময়েব সঙ্গে ওর বিযে ততোক্ষণে অর্দ্ধেক সারা। তবুও আমরা দারুণ আনন্দ করলাম। ওই অল্প সময়ের মধ্যেও শুভময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল। বছর ঘুবতেই মৈত্রালীর কোলে ফুটফুটে বাচ্চা এলো। আর আমরা একদিন হইচই করে ওর ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। মৈত্রালীব সঙ্গে এই পর্যন্ত আমাব যোগাযোগ। এব পরের কোনও খবরাখবরই আর জানি না। যদিও কলকাতায আরও চার বছর ছিলাম।

খুবই স্যাড ব্যাপার। সুচেতা কথাটা বলেই সুধীমনের চোখের ওপরে নিজেব চোখ দুটো স্থির করে ধরে রাখলো। সুধীমন বুঝতে পারছিল অঘটন একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু কী সেটা? সে ব্যগ্র সুরে জিজ্ঞাসা কবলো, মৈত্রালী ভালো আছে তো?

তা আছে। তবে—

তবে?

শুভময আব নেই।

সে-কী! কবে মারা গেল?

তাও তো বছব সাত-আট হয়ে গেল। সুচেতা ধীবে ধীবে বলতে লাগলো, মিলিটারিতে বড়ো অফিসাব ছিল শুভময। আর ছিল দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ। সেবারেব যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদারদের বোমাবিং-এ মারা গেল। ওর হয়তো কিছুই হতো না। সৈনিকবা নাকি বাববাব বলেছিল, স্যার আপনি ভেতরে চলে যান। কিন্তু শুভময একলা পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়নি। সবাইকে নিরাপদে পাঠিয়ে সে যখন ফিরে আসছিল ঠিক তখনই—

সুচেতার কথাগুলো শোনার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিল সুধীমন। একসময় জানতে চাইলো মৈত্রালী কী ওর শ্বশুরবাড়ি সেই বেণীনন্দন রোডেই আছে?

হ্যাঁ।

আজকে বিকেলে একবার যাবে? কতোদিন যে দেখি না—এখন খুবই কষ্ট লাগছে। চলো যাই। একটু থেমে সুচেতা আবার বললো, আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগটা ভালোই রয়েছে। আমি প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাই। মৈত্রালীও আসে। তবে স্বাভাবিক কারণেই ওর আসাটা কম।

মৈত্রালীর ছেলেটা কতো বড়ো হয়েছে?

অনেক বড়ো হয়েছে। খুব ভালো ছেলে হযেছে ও। এবাবে মাধ্যমিকে তো সুদীপ্ত ফোর্থ হয়েছে।

তাই নাকি! খুব আনন্দ পেল সুধীমন। বললো, এই শান্তিটুকু নিয়ে মৈত্রালী তবু বেঁচে থাকতে

পারবে।

ছেলেটাও হয়েছে তেমনি মা ভক্ত। একেবারে মা অন্ত প্রাণ! আসলে শুভময় তার ছেলেকে দারুণ ভালোবাসতো। আট বছরের ছেলের সঙ্গে কী বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই-না ছিল! শুভময় এই ভাবে চলে যাওয়ার ফলে সুদীপ্ত ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৈত্রালীকে শক্ত হতে বললাম। সেই যে ও ছেলেকে আঁকড়ে ধরলো—সুদীপ্ত এখন এই জগতে একমাত্র তার মাকেই জানে।

সুধীমন কী যেন একটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললো, মৈত্রালীর দৃষ্টি ছিল খুব সূক্ষ্ম আর মনটা ছিল অনুভূতিতে ভরা। ছোট্ট একটা ব্যাপারও ও এতো অনুভব করতে পারতো সেবারে তিন-তিনটে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে কলেজে উৎসব লেগে গেল। অতো আনন্দের মধ্যেও আমি ঠিক আনন্দ করতে পারছিলাম না। বাবার দেওয়া খয়েরী আর সোনালী রংয়ের পেনটা মাঠেই হারিয়ে এসেছি। মৈত্রালী ঠিক ধরেছিল আমার কিছু একটা হয়েছে। আমি দারুণ গলায় ওকে শুধু বলেছিলাম, একটা পেন আমার কাছে বড়ো নয়—স্মৃতিটাই বড়ো। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে বাবা হঠাৎ আমাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, খোকা তুই প্রায়ই পেনের কথা বলিস। কিনে দিতে পারিনি। আজকে একটা পছন্দ কর। যেটা পছন্দ করবি সেটাই কিনে দেবো। সেই পেনটাই আজ হারিয়ে এলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে মৈত্রালী ঠিক তার পরের দিনই একটা খয়েরী এবং সোনালী রঙের ঝকঝকে পেন কিনে এনে বলেছিল, সুধীমন এই পেনটার মধ্যে কোথাও তোমার বাবার স্মৃতি মিশে নেই ঠিক কথা, কিন্তু তোমার যেটা হারিয়েছে—মনে করো না সেটাকেই তুমি ফিরে পেয়েছো। মৈত্রালী আমার বান্ধবী, আমারই সমবয়সী। কিন্তু সেদিন ওকে বুক ভরে কেন জানি আমার দিদি বলে ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছিলো।

খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকলে সুধীমন আবার সুচেতার শোবার ঘরে এসেই বসলো। তখনও সিগারেট ধরায়নি। সুগন্ধি জর্দা দেওয়া পানটা মুখে ফেলে খোশ মেজাজে চিবোতে লাগলো। মিনিট দু-তিন পরে সুচেতা এ-ঘরে এসে সুধীমনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলো, পান পেলে কোথায়?

তোমার চাই? সুধীমন ওর দিকে পানের ছোট্ট প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললো, সিগারেট কিনবার সময়ে হঠাৎ মনে পড়লো, মাঝে মধ্যে সুগন্ধি জর্দা দিয়ে পান-টান খেতে তুমি ভালোবাসতে। তাই কিনে নিয়ে এলাম।

সত্যি সুধীমন, তোমার মনটারও কোনও তুলনা হয় না।

আমি এমন কিছু করিনি। সুধীমন হালকা সুরে বললো, সিনেমা হলে ঢুকবার সময়ে পান না-পেলে তুমি একটু-আধটু ঝগড়া করতে। তাই ঠিক করলাম তুমি আজ যাতে কোনওরকম কথা শোনাবার সুযোগ না-পাও—

না সুধীমন, তোমাকে কথা শোনাবার আর আমার অধিকার নেই।

আমি দূরের মানুষ তাই?

তুমি নও—আমিই দূরে সরে গিয়েছি।

কী যেন একটা বলতে গিয়েও সুধীমন নিজেকে ধরে রাখলো। নিজের মনেই হিসেব করলো বলাটা ঠিক হবে না। সে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দুই ঠোঁটে চেপে ধরে লাইটারটা জ্বালালো। অস্থির মনটাকে শান্ত করা দরকার। সুচেতার শেষের কথাটার উত্তরে অনেকগুলো প্রশ্ন এসে যায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটাও করা যাবে না। এতো বছর বাদে নতুন করে সে-সব তুলে লাভও নেই। সুধীমন আশ্চর্য ঠান্ডা দৃষ্টিতে সুচেতাকে একবার দেখে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, বিকেলে ওদের ওখানে যাবো। মৈত্রালীকে কী একটা ফোন করে জানিয়ে দেবে?

না।

না কেন?

ও তাহলে অবাক হবে না।

সারপ্রাইজ দিতে চাও ভালো কথা তবে—ও যদি বাড়িতে না-থাকে? আমার কথাটা না-জানিয়েও ওকে থাকার কথাটা বলা যেতে পারে। তুমি কী বলো?

বেশ ফোন করে দিচ্ছি।

মৈত্রালী বাড়িতে ছিল না। ফোন ধরলো ওর বড়ো জা শিখা। সুচেতার ফোনের উত্তরে সে বললো, মৈত্রালী যদিও বাড়িতে নেই তবে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে। ও আজ সকালে এন্টালীতে গেছে। তারপরেই হাসতে হাসতে জানতে চেয়েছে এই ভর দুপুরে বন্ধুকে ফোন। ব্যাপারখানা খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। সুচেতাও কৌতুকের সুরে উত্তর দিয়েছে সাঙ্ঘাতিক! তবে আগে থেকে বলা যাবে না। দিদি, আপনি শুধু ওকে জানিয়ে দেবেন, আবার যেন কোথাও বের না-হয়। বিকেলের দিকে আমি আজ আপনাদের ওখানে যাচ্ছি।

ফোন রেখে দিয়ে সুচেতা আবার সুধীমনের সঙ্গে নানা কথায় মেতে উঠলো। নিজেদের কথা অপরের কথাও চলে এলো। আবার একসময় কখনও যে কিষাণ মেহতা এবং সুনীতা মেহতার প্রসঙ্গটাও এসে গেল কেউই টের পেল না। সুচেতা হঠাৎ বললো, সুনীতাটা কী পাজি খেয়াল করেছো?

কী রকম?

ওই যে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো না আপনি কী হিরণ মিনারে নতুন এসেছেন? কী শয়তান মেয়ে দেখো---তোমাকে আমাদের ফ্ল্যাটের জানলায় দেখার পরেও এই কথা জিজ্ঞেস করলো। যেন ও কিছুই জানে না। আসলে তোমার সঙ্গে আরও আলাপ করে নতুন কিছু শোনার আশায় ছিল। যার জন্যই ওই প্রশ্নটা, আপনি কার বন্ধু? দেবুর না সুচেতার? তবে এ-কথা মানতেই হবে, প্রচন্ড বুদ্ধিমতী মেয়ে ও।

তোমার চেয়েও?

আমি তো বোকা। ইনফ্যাক্ট সুধীমন, আমি এখন সুনীতার দয়ার ওপরেই আছি। ও দেবুকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। যেমন ভাবে চালাবে তেমনই চলবে। দেবু যদি ওকে বিয়ে করে অসহায় হয়ে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকবে না। না সুধীমন, ও-সব কোর্ট কাছারী আমি করতে পারবো না। দাবির চেয়েও সম্মানটাই আমার কাছে বড়ো।

দেবু কী তোমাকে সে-রকম কিছু বলেছে?

ও তো রাতদিনই বলছে।

তুমি কী উত্তর দাও?

কিছুই না। বুঝতে পারছি, ও আমাকে মানসিক চাপের মধ্যে রাখতে চায়। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি সুধীমন, সব কিছুর জন্যই আমি প্রস্তুত। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হলো না তখন নতুন করে হারাবার আর কী আছে! শুধু মেয়েটার জন্য কষ্ট হয়। আমার টিয়াবার মতো মেয়ে হয় না।

মেয়েকে দেবু কী রকম ভালোবাসে?

তা বাসে। সেদিক দিয়ে কোনও ত্রুটি নেই। তবে টিয়ারাও তার বাবাকে ধরে রাখতে পারবে না। দেবু সুনীতার জন্য সবাইকেই ছাড়তে পারে।

সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে সুধীমন ওটা শেষ করেই সুচেতাকে একবার লক্ষ্য করলো। বিয়ের আগে কী দারুণ উজ্জ্বল ছিল ও। অথচ এই মুহূর্তে দেখলে কে বলবে ও সেই সুচেতাই? সারা মুখে বিষাদের ছায়া। গলার স্বরে হতাশার ক্লান্ত সুর। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে ওর যেন কোনও মোহই নেই। এই সুচেতার সঙ্গে সুধীমনের কোনও পরিচয়ই ছিল না। সে শুধু ভাবতে লাগলো, পরিস্থিতি, পরিবেশ সুচেতাকে কতোখানি পাল্টে দিয়েছে নিজে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো। সুধীমন গম্ভীর গলায় বললো, তুমি সুনীতার সঙ্গে এ-ব্যাপারে কখনও কথা বলেছো?

কী বলবো?

তোমার সংসারটা ও কেন নষ্ট করছে?

তাহলে তো সত্যি কথাটাই স্বীকার কবতে হয়, সুনীতার কী দোষ? ঘবেব মানুষটাই ঠিক নেই। বাইবের একজনকে বলতে যাবো কোন মুখে?

বেশ তো দেবুকেই বলো—

তুমি কী মনে করো কিছুই বলিনি? অনেকবার বুঝিয়েছি। দেবু বুঝবে না। ওর ওই এক উত্তর, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। তোমার যদি ভালো না- লাগে তুমি চলে যেতে পারো। এরপরে আর কী বলা যেতে পারে? আমি তাই এখন কিছু বলি না। ওর ইচ্ছে মতো ও চলুক। দু'বেলা ঝগড়া করে অশান্তি পেতে আর ভালো লাগে না।

সুনীতাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

কেমন করে?

আমি বলতে চাইছি, সুধীমন গভীর ভাবে কী যেন একটা চিন্তা কবতে করতে থেমে গেল। নতুন করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, দেবুর কাছ থেকে ওকে শুধু সরাতে হবে। দুজনের কাছাকাছি থাকাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। ওদেবকে আলাদা করে দিতে পারলেই তোমার সুখ, তোমার শান্তি সুচেতা। এই কাজটা করতেই হবে—করতেই হবে। সুধীমনেব গলায় যতোটা আবেগ ছিল, প্রতিজ্ঞার সুরটুকু ফুটে উঠলো তাব চেয়েও বেশি।

আমি বুঝতে পারছি না তুমি তা কেমন ভাবে করবে? কিন্তু সুধীমন, আমি তো তোমাকে এতোটুকু শান্তি দিলাম না। বরং তোমাব জীবনটাই নষ্ট কবে দিলাম—তুমি কেন আমার শান্তির জন্য এতো কষ্ট করবে?

যেহেতু আমি চাই তুমি সুখে থাকো। ভালো থাকো।

তাতে তোমার লাভ?

তোমার জন্য আর কখনও মন খারাপ করতে হবে না। সুধীমন হাসলো একটু। সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু তার আগেই সুধীমন ওটা নিভিয়ে ফেলে জানালার গ্রীলেব ফাঁক দিয়ে নীচে ফেলে দিল। সুচেতার দিকে না-ফিরেই সে আস্তে কবে ডাকলো, সুচেতা শুনে যাও—

সুচেতা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই জানতে চাইলো, কী ব্যাপার? তারপরেই অল্প একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, ও-পাশেব জানালায় নিশ্চয়ই সুনীতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে সুধীমন পিছনে ফিরলো। সুচেতার মুখোমুখি হয়ে ছোট্ট প্রশ্ন কবলো, তুমি জানলে কেমন করে?

এতে অবাক হবার কিছু নেই। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

তোমার কল্পনাশক্তি কিন্তু প্রখর! ঠিক ধরতে পেরেছো।

শত হলেও আমি একজন মেয়ে। সুচেতা হালকা সুরেই বলতে লাগলো, সুনীতা যখন আমার ঘরে তোমাকে দেখেছে ওর কৌতূহল ক্রমশ বাড়বেই। তুমি খেয়াল কবে দেখো, ও তোমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি বলোনি সেটা আলাদা প্রশ্ন। ওর দৃষ্টি এখন সারাক্ষণ এই বাড়ির ওপরেই থাকবে। যেটুকু বোঝার তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝবার চেষ্টা করবে। কারণ দেবু এলে ওর কানে তো কিছু একটা লাগাতে হবে।

তুমি কী দেবুকে আমার কথা বলবে?

কেন বলবো না? তুমি তো দেবুরও বন্ধু।

দেবু কী সেটা মানবে? সে অন্য কথা বলবে।

সে কী বলবে-না-বলবে জানি না—তবে তোমাকে কিন্তু খুবই ভালোবাসে।

তাই? কথাটা শুনে সুধীমন নিষ্পাপ হাসলো।

প্রথম প্রথম দেবু প্রায়ই বলতো সুধীমনকে আমি ঠকালাম। বন্ধু হয়েও সুধীমনেব সঠিক বন্ধু

হয়ে উঠতে পারলাম না। ওর সঙ্গে আমি বেইমানি করলাম। এমনি ধরনের অনেক কথাই দেবুর মুখে শোনা যেতো। ইদানিং এতোটা বলে না ঠিক কথা, কিন্তু এটা তো মাঝে মধ্যে এখনও বলে, সুধীমনের জন্য আমার কষ্ট হয়। আর—

কী আর?

সুচেতা দারুণ ভাবে হেসে উঠলো। বলবো?

আপত্তি না-থাকলে বলতো পারো।

সুনীতাকে নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে দূরত্বটা বেড়ে যায়, দেবু তখন এই কথাটা প্রায়ই বলে, 'তোমার সুধীমনকেই বিয়ে করা উচিত ছিল।'

শেষেরটা নিশ্চয়ই ভালোবেসে বলে না! সুধীমন কৌতুকের সুরে কথাটা বললেও সুচেতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে নিশ্চয়ই স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলেছে। সেই সব রঙিন দিনগুলোর কথা কী মনে না-পড়ে পারে? এটা কে-না জানতো সুচেতা সুধীমনকেই বিয়ে করছে? অথচ সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। এর জন্য সে কাউকেই দোষারোপ করতে পারবে না। সব দোষ তার। একমাত্র তার ওই ধরনের বাজে জেদ এবং তেজের জন্যই এই খেসারতটা দিতে হলো। এখন আফসোস করে কোনও লাভ নেই। সে আজ অপরের স্ত্রী। মানসিক এতো চাপ এবং কষ্টের মধ্যেও সুচেতা কিন্তু একটা সান্ত্বনা নিয়ে গর্ব করতে পারে। মাথা উঁচু করে আছেও সেই কারণে। দেবুকে সে একটা দিনের জন্যেও ঠকায়নি। ভন্ডামী করেনি। বিয়ের পর দেবুকেই ভালোবেসে সুখে থাকতে চেয়েছে। তার দুর্ভাগ্য, দেবুই এখন এটা বিশ্বাস করতে চায় না। তাছাড়া দেবুর কোনও টানও নেই তার ওপর। সেই জন্যেই ওই কথা বলা, 'তোমার সুধীমনকেই বিয়ে করা উচিত ছিল।'

সুধীমন এখন এই ঘরে অর্থাৎ সুচেতার শোবার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সুচেতা পাশের ঘরে চলে যাবার আগে ভারী পর্দাগুলো সব টেনে দিয়েছে—যাতে বাইরের রোদ এসে সুধীমনের চোখের ওপরে না-পড়ে। মুখে বলেছে, এবারে একটু ঘুমিয়ে নাও। সন্ধ্যায় আবার মৈত্রালীদের বাড়িতে যেতে হবে।

তুমি এখন কী করবে?

আমিও একটু গড়িয়ে নেবো, তবে ঘুমাবো না। সমরেশ বসুর একটা উপন্যাস প্রায় অর্দ্ধেকটা পড়েছি—বাকিটা শেষ করবো। আর কথা বাড়িয়ো না। ঘুমোও—ম্লান একটু হেসে সুচেতা ধীর পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুধীমন সত্যিই একটু ঘুমোতে চাইছিল কিন্তু সেটা কিছুতেই আসছিল না। সুচেতার সঙ্গে এই পর্যন্ত হাজারো কথা বলার মধ্যেও বিশেষ একটা কথা বারবার তাকে খোঁচা দিতে লাগলো। কথাটা সুচেতা খাওয়ার টেবিলেই বলেছিল। তখন সুধীমন এতোটা গুরুত্ব দিয়ে শোনেনি। এখন তার দুই কানে একটু অন্যরকম ভাবে বাজছে। 'মেহতা তোমার কাঁধে একটু হাত রেখেছে তাতেই গেল গেল রব তুললে, আর বিয়ের আগে সুধীমনের সঙ্গে হলং-য়ে গিয়ে সাতদিন কাটিয়ে এলে তাতে তোমার ইজ্জতটা বুঝি বেড়ে গিয়েছিল?'

দেবু যদি সুচেতাকে জব্দ করবার জন্য, বাধ্য করার জন্য ও কথা বলে থাকে সেটা আলাদা প্রশ্ন। ওর বিশ্বাসটা কী? ও-তো সবই জানে। তবে কেন ওই ধরনের কথা বলে একটা মানুষকে ছোট করা!

সুধীমনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো হলং-এর ছবি। উজ্জ্বল সেই ছবিতে এতোটুকু দাগ পড়েনি। বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি। সেই দিনগুলোর কথা সুধীমন এ-জীবনে আর ভুলতে পারবে না। এতো বছর আগের ঘটনা, অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। সব কিছু স্পষ্ট মনে আছে। একটা কথা, একটা ঘটনাও সুধীমন ভোলেনি।

এক সপ্তাহ হলো এম এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে দু-চারজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াতে গেছে। একদিন সুচেতা এসে ধরলো, সুধীমন, চলো না আমরাও কোথায় বেড়াতে যাই।

কোথায় যাবে? হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে পা দুটোকে নাচিয়ে প্রশ্ন করলো সুধীমন। সুধীমনের পা নাচানোর অর্থই হলো কোনও কথাকে গুরুত্ব না-দেওয়া। সুচেতা ওর সঙ্গে মিশে সেটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। তাই প্রথমেই সে রেগে গেল। বললো, আগে তোমার পায়ের তুর্কি নাচনটা বন্ধ করো। তারপর অন্য কথা। বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনতেই সুচেতা বেশ নরম গলায় বললো, একটা জায়গায় যাবে? হলং—

সে তো অনেকদূর, নিউজলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে জলদাপাড়া ফরেস্ট।

ওটা যে কাছের সে-কথা কী আমি একবারও বলেছি? সুচেতা কটাক্ষ করে আরও বললো, তাছাড়া আমি তোমাকে ব্যান্ডেল অথবা দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাবার কথা বলতে আসিনি। গেলাম আর ফিরে এলাম। সুচেতা এবারে একটু ঠান্ডা হয়ে মিষ্টি করে হাসলো। হলং-এর জঙ্গলে গিয়ে প্রকৃতির কোলে ছ-সাত দিন কাটিয়ে আসবো। যাবে? সুধীমনকে চুপ করে থাকতে দেখে সুচেতা আন্তরিকতার সুরে খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করলো, টাকার কথা ভাবছো?

পাগল নাকি! তুমি থাকতে টাকার চিন্তা করবো? সুধীমন বললো, তোমার বাবা শিল্পপতি, কাকা মিনিস্টার। টাকার কথা চিন্তা করতে যাবো কোন দুঃখে? আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

বলোই না—

সেই জঙ্গলের মধ্যে বাংলোর একটা ঘরে থাকতে আমার খুবই ভয় করবে। তুমি যদি ...সুধীমন ওর কথা শেষ করতে পারলো না। খিল খিল করে হেসে উঠলো সুচেতা। ধমক লাগিয়ে বললো, বড্ড ঘুরিয়ে কথা বলতে পারো আজকাল আর তেমনই ফাজিল হচ্ছো। একা ঘরে থাকতে ভয় করে! আর কী কী তোমার নিয়ম-কানুন আছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। ওখানে পৌঁছে কিন্তু কোনও কথা গ্রাহ্য হবে না। যা বলার এখান থেকেই বলে-টলে নাও।

দুজনে এক ঘরে থাকবো। এমনিতে তোমার অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। অথচ আমি একটা পয়সাও দিতে পারবো না। তাই তোমার যতো কম খরচ হয় সেদিকটাও আমার দেখা উচিত। শুধু শুধু দুটো ঘরের ভাড়া দিয়ে কী লাভ?

দারুণ সাশ্রয় করতে চাইছো তো—সুচেতা হেসে ফেললো। ও-সব শয়তানি মাথা থেকে ছাড়িয়ে দেবো।

সিরিয়াসলি বলছি সুচেতা। আমি একদম ফাজলামো করছি না।

সত্যি সত্যি একটা রুমে থাকবে নাকি? এবারে সুচেতার অবাক হওয়ার পালা।

না। পুরো হলং বাংলোটা নিয়ে থাকার কথা বলছি। সুধীমন টিপ্পনী কাটলো। সুচেতা অনেকক্ষণ সুধীমনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন ওকে বুঝতে চাইছে, জানতে চাইছে। ভেতর থেকে সুচেতা মাঝে মাঝে এক ধরনের প্রেরণা পায়। যা তাকে মেরুদন্ড সোজা করে ধরে রাখে। মনকে নির্ভীক এবং বলিষ্ঠতার ঊর্ধ্বে পৌঁছে দেয়। সুচেতা তেমনই এক প্রেরণা নিয়ে বললো, বেশ এক রুমেই থাকবো। কিন্তু লোকে কী বলবে? ওখানে তো আরও পাঁচজন থাকবে।

তারা জানবে তুমি আমার স্ত্রী।

বিয়ে না-হতেই স্ত্রী!

হ্যাঁ। সুধীমন খুব সহজেই বললো, একটু সিঁদুর-টিদুর সঙ্গে নেবে এই আর কী! সুচেতা ওর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। হাসি চেপে দুই চোখের তারায় ঝিলিক তুলে জানতে চাইলো, তারপরে স্বামীর মতো ব্যবহার শুরু করে দেবে না তো?

ও-সব সত্যিকারের বিয়ের পর। সেদিক দিয়ে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

আমি জানি তো। সুচেতা খুশির হাসি হেসে বললো, এই জন্যই তো তুমি সুধীমন। দারুণ নামটা কিন্তু তোমার। কে রেখেছেন?

আমার বাবা। সুধীমন এক অনন্য প্রত্যয় নিয়ে বললো, আমার নামের মর্যাদা দিতে আমি সব সময়েই চেষ্টা করি। চেষ্টা করবোও।

শিয়ালদা স্টেশনের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সুচেতা অপেক্ষা করতে লাগলো। বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। ও-সবের প্রয়োজন নেই। কেন-না হলং বাংলো সব দিক দিয়ে কমপ্লিট। বিছানা, খাট, মশারী, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি কোনও কিছুরই অভাব নেই। যাই হোক সুচেতা শুধু জামা-কাপড় আর কিছু টুকিটাকি জিনিসের একটা স্যুটকেস নিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যাকে প্রয়োজন সেই মানুষটারই দেখা নেই। রাগে রীতিমতো ফুঁসছে সুচেতা। যদিও দার্জিলিং মেল ছাড়তে তখনও আধঘণ্টার মতো দেরি আছে কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে মানুষজনের ঠেলাঠেলি আর জড়াজড়ির বিশ্রী এক জটলার মধ্যে না-পড়লেই কী নয়? একটু আগে এসে ফাঁকায় ফাঁকায় নিজের আসনটা খুঁজে নিয়ে বসাই তো ভালো। সুধীমনটা কী যে করে না—সুচেতা হাত ঘড়ির ওপরে চোখ বোলালো। অবশ্য তার অস্থির হবার কারণ আছে, সুধীমন আসবে না—এ-আশঙ্কা তার নেই। সে নিশ্চিত জানে ও আসবে। আসল কারণটা নিজেকে নিয়েই। বিশেষ একটা সাজে সে সেজেছে। হঠাৎ যদি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হাজারো কৈফিয়ত দিতে হবে। কীরে কবে বিয়ে হলো? ওমা নিমন্ত্রণ করতেই ভুলে গিয়েছিস। কর্তাটি কোথায়? তার সঙ্গে আলাপ না-করে এখান থেকে নড়ছি না। সে এক বিশ্রি ঝামেলা। সুচেতা সম্ভাব্য এই সব বিপদ থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি সুধীমনের দেখা পেতে চাইছে। হলং যাবার প্রোগ্রামটা ও দারুণ ভাবে গ্রহণ করেছিল। সেখানে কিনা ওরই পাত্তা নেই। ভেতরে ভেতরে সুচেতা এতো রেগে গেল যে এই মুহূর্তে ওকে কাছে পেলে প্রথমেই হয়তো ওর পিঠে বেশ কয়েকটা কিল বসিয়ে দেবে। এতে যদি হলং যাওয়া না-হয়, না-হবে।

ছোট একটা স্যুটকেস নিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে সুচেতার সামনে এসে দাঁড়ালো সুধীমন। সুচেতার রাগ প্রকাশের প্রথম লক্ষণ বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলা। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বেশ গম্ভীর সুরেই বললো আর আধঘণ্টা পরে এলে পারতে না? সুধীমন ওই কথার জবাব না-দিয়ে ওর মুখের দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। তার পরেই একগাল হেসে দিল। সুচেতার সিঁথিতে টকটকে লাল কৃষ্ণচূড়ার আভা। কপালের টিপটা দেখে মনে হচ্ছে যেন ভোরের সূর্য উঠছে। হাতে একটা শাঁখা পর্যন্ত পরেছে। সুধীমন খুব আস্তে বললো, আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই কী বলো?

তুমি জানো আমি ভীষণ রেগে আছি? সুচেতা সুধীমনের কোনও কথাতেই ভুললো না।

তা এতোক্ষণে বলবে তো? আমি তাহলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিতাম। তারপরেই সুধীমন সরল এক হাসিতে সুচেতার রাগের সব মেঘ উড়িয়ে দিয়ে বললো, যাই বলো সুচেতা সিঁদূরের টিপে মেয়েদের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। দারুণ লাগছে তোমাকে দেখতে। সত্যিকারের বিয়ে হলেও এতোটা লাগতো না। সুচেতা আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলো না। বাঁধ ভাঙার কলোচ্ছ্বাসে সে হেসে উঠলো। বললো অনেক জ্বালিয়েছো এবারে চলো। এখানে এই সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে কী পানিশমেন্ট! সারাক্ষণই বুকটা টিবটিব করছিল।

লুকানোর একটা ব্যাপার আছে তাই—নয়তো অরিজিনাল সং সাজলেও কিছু লোক তোমার দিকে এমন ভাবে তাকাবে তাতেই বুক কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। একা কোথাও পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করারও উপায় নেই। কলকাতাটা দিনদিনই কেমন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আসলে আমরাই খারাপ হয়ে যাচ্ছি।

সুধীমন ঠাট্টা করে বললো, ভালো হওয়ার জন্যই আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি বলো!

এই ফাজিল ছেলে—তোমার বক্তৃতাটা বন্ধ করো! ট্রেন ছাড়তে আর দশ মিনিট বাকি আছে। তাড়াতাড়ি পা চালাও—

সকালবেলা ওরা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে গেল। স্টেশনের বাইরে এসে দেখলো বাস, মিনিবাস, ডিল্যুক্স, ট্যাক্সি আর সাইকেল রিক্সার মেলা বসে গেছে। সুচেতা চারদিকে বিশেষ করে দূরে আকাশের দিকে তাকালো। ঝকঝকে রুপোলি মেঘ পেঁজা তুলোর মতো ভেসে চলেছে। বাতাসে একটা হিমেল ভাব। চমৎকার আবহাওয়া। রোদ্দুরের মিঠে আমেজ গায়ে মেখে সুচেতা বললো, সুধীমন আগে

আমবা কিছু খেয়ে নিই। এখান থেকে হলং তিন সাড়ে-তিনঘণ্টা তো লাগবেই। অতোক্ষণ আমি না-খেয়ে থাকতে পারবো না।

আমিও পারবো না। সুধীমন উচ্ছ্বল হেসে কথাটা বলতেই সুচেতা চোখ রাঙিয়ে শাসন করলো ঠাট্টা করছো নাকি?

তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করার মতো অতো সাহস আমার নেই। তোমাকে আমি প্রচন্ড ভয় পাই।

এটাও কিন্তু ঠাট্টা হয়ে যাচ্ছে!

যাঃ বাবা, একটা কথা বললেই যদি ঠাট্টা হয়ে যায় তাহলে কোনও কথাই বলার নেই। যা খাওয়াবে খাওয়াও, আমি চুপচাপ থাকছি।

ওরা স্টেশনের ক্যান্টিনে গিয়ে ডিমের পোচ, পাউরুটি আর কফি খেলো। সুচেতা অনুনয়ের সুরে বললো, সুধীমন তুমি আর একটা পোচ খাও। সুধীমন কথাটা শুনলো কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। সুচেতা একটা ধমক লাগলো, তুমি কালা নাকি? ও-পক্ষ তখনও নীবব দেখে সুচেতা শেষ অস্ত্র ছাড়লো বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।

কথা বলে বলবে ঠাট্টা করছি। না-বললে বলবে বাড়াবাড়ি করছি। বিপদ তো দেখছি এখন আমার—ভেতরের হাসিটা চেপে রেখে সুধীমন একটু গম্ভীর সুরে বললো, আমি কখন কতোটুকু কী বললো তার একটা চার্ট করে দিয়ো। সেটাই বরং ভালো হবে।

এটা কিন্তু দারুণ বলেছো। সুচেতা হাসির ঢেউয়ে দুলতে লাগলো। সেই ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়লো সুধীমনেব গায়েও। আব সেই মুহূর্তেই সুচেতা আবার অনুবোধ করলো, তুমি আর একটা ডিমের পোচ খাও সুধীমন। এটা তো তোমার খুব প্রিয়।

প্রিয় তো তুমিও। সুধীমনের দৃষ্টিতে রহস্যের গভীরতা।

তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। সলজ্জ হাসিতে সুচেতা বললো, তুমি একটা যাচ্ছেতাই মানুষ।

ট্যাক্সি ভাড়া করার সময় সুচেতা প্রথমেই জানিয়েছিল, আমরা কিন্তু সেবক ব্রীজ হয়ে যাবো। ট্যাক্সিওয়ালার উত্তর ছিল, তাহলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে। কুড়ি টাকা বেশি লাগবে। সুচেতারও চটপট জবাব, তার জন্য আটকাবে না।

সেই মতো সেবক ব্রীজের সামনে এসে ট্যাক্সি থামলো। বাঁ দিক দিয়ে কালিম্পঙেব, গ্যাংটকের রাস্তা চলে গেছে। পাহাড়েব কোলে একটা মন্দির। পাশে ফুটপাথের মতো প্রশস্ত চাতাল। সুধীমন আর সুচেতা ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়ালো। চারদিকে পাহাড় আব পাহাড়। হিমালয়ের রেঞ্জ চলে গেছে এক আকাশ ডিঙিয়ে আর এক আকাশে। মেঘের কী সুন্দর খেলা আর কী বাহারী রং! মুহূর্তের মধ্যে বং পালটাচ্ছে। সে-এক বিচিত্র দৃশ্য! পাহাড়েব গায়ে দীর্ঘকায় সব গাছেদের ঘন বুনোট। যেদিকেই তাকানো যায় তারই সবুজ ছায়া। মনে হয় সমস্ত অঞ্চলটা যেন এক খন্ড সবুজের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। এপাব এবং ওপারের দুই সবুজ ছবির মধ্যে সেবক ব্রীজটাকে একটা দড়ির মতো দেখাচ্ছে। ব্রীজ থেকে এক দেড় হাজার ফুট নীচে তিস্তা। ভয়ঙ্করী তিস্তা। পাহাড়ের গা থেকে জল এসে সব ওই তিস্তায় পড়ছে। অফুরন্ত জলরাশি ঢালু পথ বেয়ে সমতলের দিকে দূরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা খেয়ে নতুন করে আবার পথ করে নিতে সেই জলোচ্ছ্বাসের উদ্দামতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। জলের রংটাও হালকা সবুজ। মনে হয় গাছের পাতার রং গোলা সব জল ওই নদীতেই পড়ছে। আর কী শব্দ! জলের কলোচ্ছ্বাসের ওই গর্জন মিলিটারির দামামা বাজিয়ে চলেছে। এক্ষুনি যেন সব কিছুকে ভেঙে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে। নিস্তব্ধ সেই পরিবেশের মধ্যে ওই একটানা শাসানি যেন মানুষকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে।

দু-একজনকে নদীতে ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারতে দেখে সুচেতাও একটা টুকরো তুলে ব্রীজের ওপর থেকে নীচে ফেললো। পর মুহূর্তেই সুধীমনের হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, ইটের টুকরোটা কোথায় পড়লো বলোতো?

আমি দেখে আসবো গিয়ে? সুধীমনের ঠাট্টাটা গায়ে মাখলো না সুচেতা। বললো, আশ্চর্য লাগছে কিন্তু। মনে হচ্ছে, মাঝ পথ থেকেই ইটের টুকবোটা হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওটা তো জলেই পড়ছে।

উপরেও যেতে পারে। হাসি চেপে খুব স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা কবলো সুধীমন। সুচেতার সারা শরীরে তখন বিন্দুমাত্র রাগ নেই। হাসির রিমঝিম শব্দ তুলে সে বললো, কথাটা মন্দ বলোনি।

বাস রাস্তার মেনগেট থেকে হলং গেস্ট হাউস দশ বারো মাইল জঙ্গলের ভেতরে। নুড়ি বিছানো পথের দু'পাশে জঙ্গলের পাহাড়। বড়ো মাঝারি এবং ছোট সব ধরনের গাছই একে অপরকে জড়াজড়ি করে ধরে রাজত্ব বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে কোথাও দেখা যাচ্ছে হলং নদীটা তিরতির কবে কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে। কোথাও আবার বেশ খানিকটা চওড়া হয়ে সমানে গর্জন কবতে করতে বনভূমিকে সচকিত করে তুলছে। বিরাট বিরাট পাথরের খানা-খন্দের মধ্যে থেকে দুর্বার জলধারা মুখ বেব করে ঝর্ণাব সৃষ্টি করেছে। জল আব জঙ্গল। প্রকৃতির সে এক আলাদা রূপ। আলাদা সেই জগতের মধ্যে ভেসে যাচ্ছিলো সুচেতা আর সুধীমন।

লাল নুড়ি বিছানো পথে ট্যাক্সিটা মোটামুটি মধ্য গতিতেই ছুটছিল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল হঠাৎ। সামনের দৃশ্যটা দেখে ওরা স্বপ্নময় সেই জগতের মধ্যে ডুবে গেল। মোহনীয় ওই রূপের ছটায় চেতনা যেন ক্রমশ হাবিয়ে যাচ্ছে। পথের ওপব একটা ময়ূর নিজের রং-বাহারী পেখমটা সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে সুষম ছন্দে নাচছে। এতো বড়ো দুনিয়ার কে ওকে দেখলো-না-দেখলো, তাতে ওব কিছু আসে যায় না। নিজের আনন্দে, নিজের তৃপ্তিতে সে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছে। উঁচু ঘরাণার এক নৃত্য দেখতে দেখতে, ওরা যখন মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ের অন্য স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, ওদিক থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা জীপ এগিয়ে আসতেই ময়ূরটা ওর পাগল করা নাচ থামিয়ে দিল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কর্কশ গলায প্রতিবাদ জানিযে জঙ্গলের মধ্যে প্রায় উড়ে গেল।

একানা বেশ কিছুটা সোজা রাস্তা গিয়ে বাঁদিকে ঘুবতেই কাঠের চওড়া পাটাতনের একটা ব্রীজ পড়লো। হলং নদীটা বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে আবার ওদিকটায় এসে পড়েছে। এখানটা বেশ চওড়া। কী পরিস্কার আর টলটলে জল! জলের নীচের সব কিছু আয়নাব মতো দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য ছোট-বড়ো মাছের দল এদিক-ওদিক ঘুরে বেরিয়ে খেলা করছে।

এই সুধীমন, এখানে মাছ ধবতে আসবে? খুশিতে সুচেতার গলা প্রায় বুজে এলো।

জেলেব ছেলে আমি। মাছ ধববো না মানে—

প্লিজ, সুধীমন প্লিজ। সুচেতা আন্তরিক সুরে বললো, এখানে এই সময়ে ঠাট্টা কোরো না। ওটা কলকাতা ফিরে গিয়ে।

সমান করে ছাঁটা বুক সমান মেহেদি গাছের ঘন বৃত্তের মাঝখানে গেস্ট হাউস। চাবপাশে লন। ছোট ছোট নুড়ি বিছানো পায়ে চলাব পথ। পথের পাশেই সবুজ ঘাসেব কোমল কার্পেট। বেতের গার্ডেন-চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সাজানো। লনের প্রায় কোলেই পাহাড়ী ঝর্ণার নদী। কোমর সমান জলও হবে না। তবে চুল আঁচড়ে নিয়ে টিপ পড়া যায়। এতো পরিস্কার! চারদিকে বনের হাজাব রকমের নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। গেস্ট হাউসকে ঘিরে রয়েছে মরসুমী ফুলের উজ্জ্বল হাসি। মাথা দুলিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে তারা সদাই ব্যস্ত।

সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি হলং বাংলোর দোতলার পূব-দক্ষিণ কোণেব ঘরখানাই ওরা পেল। সারা ঘর জুড়ে কার্পেট পাতা। মাঝখানে পাশাপাশি দু'খানা সিঙ্গল খাট। দুধ সাদা বিছানা। তুলতুলে বালিশ। সাদা নেটেব মশারী। একপাশে আলমারী, ড্রেসিং-টেবিল। দুই দিকে ডবল সাইজের বড়ো বড়ো জানলা। চমৎকার পর্দা ঝুলছে সেখানে। পর্দা সরাতেই দূরের জঙ্গলটা যেন কাছে এসে নৈঃসর্গের কাজল পরিয়ে দিল।

জানলা থেকে সরে এলো সুচেতা। ঘবের পাশে অ্যাটাচবাথ। সুচেতা উঁকি মারলো সেদিকেও। বাথটব, বেসিন, আয়না ঠান্ডা এবং গরম জলেব নিখুঁত সব ব্যবস্থা। দারুণ খুশি হলো সে। উপচে পড়া একঝলক হাসি নিয়ে সুচেতা বলে উঠলো, ফাইন! এখানকার সব আয়োজন এক কথায়

ফ্যানটাসটিক!

ওরা ছ'দিন থাকার জন্য এখানে এসেছে। তার মধ্যে চারটে দিন যে কেমন করে কেটে গেল টেরই পেল না। কখন সূর্য উঠছে, কখন ওরা খাচ্ছে, বেড়াতে বেরুচ্ছে, নিজেদের মধ্যে কী যে কথা বলছে আর কোন সময় যে সূর্য ডুব দিয়ে হলং-এর ওপর অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে, সে-হিসেব ওরা দিতে পারবে না। প্রকৃতির কাছে এসে মনটাও বড়ো মায়াবী হয়ে উঠছে।

তখন পড়ন্ত বিকেল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সুচেতা আর সুধীমন একটু ঘুমিয়েছিল। সেই ঘুমও ভেঙেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। সুচেতা হঠাৎ বললো, সুধীমন উঠে পড়ো। আজ সকালে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে সেই বৃদ্ধা মহিলাটি আসতে পারেন।

তুমি কী নিমন্ত্রণ করে এসেছো নাকি?

নিমন্ত্রণ করতে হয়নি। তিনি নিজেই আসবেন বলেছেন।

ওঁরা কী হানিমুনে বেরিয়েছেন? সুধীমনের চোখে-মুখে চাপা হাসি।

সত্যিই তাই। সুচেতা স্নিগ্ধ এক হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে দিয়ে বললো, আসলে কী জানো, সংসারের হাজারো অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিন কাটিয়ে ছেলেদের দৌলতে এই বুড়ো বয়সে হনিমুনে বেরিয়েছেন। সেই তাজা শখ-আহ্লাদ তো আর নেই তবুও একটু গল্প করবেন—এরমধ্যে তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন?

ভয় আমি পাচ্ছি না। তবে তোমার চেয়ে বয়সে যখন বড়ো তখন অভিজ্ঞতাও একটু বেশিই। সেই হিসেবে বলছি, আর যাই গল্প কোরো—নতুন বিয়ে হয়েছে এ-কথা একবারও বলবে না।

কী বলবো তাহলে?

বলবে চার-পাঁচ বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

এই পরিকল্পনা কী কারণে? সুচেতার দুই চোখে অসহায়ের দৃষ্টি। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না।

আরে বাবা এই সাধারণ ব্যাপারটাও বুঝতে পারছো না—এই জন্যেই বলে বিয়ে না-হলে মেয়েদের বুদ্ধি খোলে না। সুধীমন খুব সহজ ভঙ্গিতে হেসে বললো, নতুন বিয়ে হয়েছে বললেই দেখবে চোদ্দ হাজার ফুট লম্বা প্রশ্ন তোমার সামনে। কবে বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি কোথায়, ওখান থেকে কী পেলে, বাপের বাড়ির থেকে কী কী দিয়েছে, বাউটি সলিড সোনার কিনা, স্বামীর আপনজনের কে কী রকম ব্যবহার করে, ছেলেকে পণ দিতে হয়েছে কিনা, দিলেও মুন্ডুপাত না-দিলেও মুন্ডুপাত। আমি বলছি ও-সব হাজারো ঝামেলার মধ্যে পড়তে যেয়ো না সুচেতা। তার চেয়ে সেফ সাইডে থাকো—চার-পাঁচ বছর হলো বিয়ে হয়েছে। ও-সব একটা প্রশ্নও তাহলে আসবে না।

ও-সব আসবে না ঠিক কথা—তবে আর একটা প্রশ্ন উঠবে। সুচেতা চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো। হাসতে হাসতেই বললো, নকল বিয়ে করলে ছেলেদের বুদ্ধি-টুদ্ধি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। চার-পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে বললে ছেলে-মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করবে না?

তাতে হলোটা কী? একটাই উত্তর দেবে, হয়নি—মানে ভগবান দেয়নি। তখন দেখবে তুমি আর পিকচারে নেই। বৃদ্ধা মহিলা তার পাঁচ ছেলে আর সাত মেয়ের কাহিনী নিয়ে পড়েছে। ঠিকমতো এন্ট্রি নিতে পারলে ওই পাঁচ ছেলের পাঁচ বৌয়েরাও এসে যেতে পারে। কোন বৌ কতোটুকু জ্বালাচ্ছে সে-সব তুমি নির্বিকার মুখে চুপচাপ শুধু শুনে যাবে তখন—

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো সুধীমন। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পাহাড়ী নদীটার ওপারেই একটা স্পট। জঙ্গলের পশুরা ওখানে এসে নুন মেশানো মাটি খেয়ে যায়। সন্ধ্যার পরেই ওরা খেতে আসবে। সারা দিনে জঙ্গলের মধ্যে যাই খাক না কেন, ওই নুন মেশানো মাটি একটু চাই-ই। ওটা খেয়েই নদীর দিকে এগিয়ে আসবে। পেট ভরে জল খেয়ে আবার ফিরে যাবে অরণ্যে। এই চার দিন একই দৃশ্য দেখেছে সে আর সুচেতা। তবে সেটা এই জানলা থেকেই।

নীচের লনে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে নয় জনের জমজমাট একটা দল। পঁয়ত্রিশ থেকে সাতচল্লিশের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের অফুরন্ত প্রাণশক্তির ন'জন মানুষ। সুধীমন, সুচেতার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওঁরা এসেছেন দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা অঞ্চল থেকে। একই পাড়ার ন'জন অসম বয়সী ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রত্যেকেই বুদ্ধিদীপ্ত, ঝকঝকে। বস্তুত এমন একটা গ্রুপ সচরাচব চোখে পড়ে না। ঠাট্টা, কৌতুক, সিগারেট খাওয়া সবই একসঙ্গে চলছে। পঁয়ত্রিশ আর সাতচল্লিশের মধ্যে কোনও ফারাক থাকছে না। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বয়সের সম্মানটুকু ঠিকই দিচ্ছে। আলাপ হবার সময়ে সুধীমন ভেবেছিল ওদের নামগুলো মনে থাকবে না। কিন্তু নামগুলো খুব ভালোই মনে আছে। অবশ্য সেটা ওদেরই গুণে। নূপুব সেন, সুপ্রিয় সেন, ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, শিবনাথ ভট্টাচার্য, কুমার সেন, ভুলু গুহ, পীযূষ সবকার, বাচ্চু সেন, আর কল্যাণ দাস। ওদের মধ্যে আবার মজাদার হলো ভুলু গুহ আর শিবনাথ ভট্টাচার্য। ওই দুজনে হাসাতে পারে বটে। যেন চলমান বিচিত্রানুষ্ঠান। ভুলুবাবু সিভিল ইঞ্জিনিযার। দেখতে যতোটা সুন্দর গানের গলা কিন্তু মোটেও তা নয়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, উনি গাইতে না-পারলেও আবৃত্তির মতো করে হলেও দু-এক লাইন গাইবেনই। সবচেয়ে প্রিয় গান, 'খোলো খোলো মন্দির দ্বার'। গত চার দিন ধরে ওই একটা গান না-হলেও হাজারবাব শোনা হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে অন্য দু-একটা গানও করেন। যেমন শিবনাথ ভট্টাচার্য এবং ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে গাইবেন, 'ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়। দাড়ি নেড়ে কাঁচা খায়, পাকাও খায়।'

সেই গান শুনে হাসতে হাসতে সুধীমন আর সুচেতাব তো দম বেরিযে যাবাব মতো অবস্থা। চোখের কোণে জল পর্যন্ত জমা হয়ে গিয়েছিল। সুচেতা তো শেষে হাত জোড় করে অনুনয় করেছিল, ভুলুদা গান থামান। আব হাসতে পারছি না। পেটে ব্যথা ধরে গেল।

সুচেতাও বিছানা ছাড়লো। জানলার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। দাঁড়ালো গিয়ে সুধীমনের গা ঘেঁষে। নীচেব লন থেকে উত্তাল হাসির ঢেউ উঠলো। সুধীমন ওখান থেকেই জিজ্ঞেস করলো, ভুলুদার 'খোলো খোলো মন্দির দ্বাব' শুরু হয়েছে নাকি?

ঠাট্টা হচ্ছে? ভুলুবাবু হুঙ্কাব ছাড়লেন। সুচেতার উদ্দেশে বললেন, বৌমা কর্তাটিকে সামলাও কিন্তু—নয়তো সারা রাত গান গেয়ে জ্বালাবো।

সুধীমন আর সুচেতা নীচে নেমে গেল। নয় জন প্রাণখোলা সজীব জীবনের মধ্যে গিয়ে বসলো। নূপুর সেন বললেন, বৌমা আপনি কী ভুলুব একটা কথা মার্ক করেছেন? ও বলেছে, সারা রাত গান গেয়ে জ্বালাবে। নিজের গান সম্বন্ধে ওর কনফিডেন্সটা দেখেছেন? কথার ইঙ্গিতটুকু সহজেই ধরে নিল সুচেতা। ভুলুবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কী বাড়িতেও এমন গান কবেন?

চন্দনা থাকলে গাই না। ভুলু একেবারে খোলাখুলি বললেন, এ-ব্যাপাবে ওব স্পষ্ট নির্দেশ, বেসুরো গলায় গান গেয়ে ওর শান্তি যেন নষ্ট না করি।

তাহলে গান করেন কখন?

ওই সিনেমা-টিনেমা গেলে বা বাপের বাড়ি গেলে তখন একবার চান্স নিই।

সে তো মাঝে মধ্যে ব্যাপার। সুধীমন এবারে খুব কৌতূহল নিয়ে বললো, অন্য সময়ে?

হাঃ হাঃ হাঃ। অট্টহাসিতে শিবনাথ হলং-এর জঙ্গল কাঁপিয়ে বললেন, আমাদের নিরীহ বৌয়েরা রয়েছে কী করতে? এই দুনিয়ায় যতো রকমের যন্ত্রণা আছে সব চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা হলো ভুলুর গান শোনা। ওই কাজটা সর্বংসহা হয়ে আমাদের শ্রীমতিরা করে চলেছে। একটা কথা বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারলাম জয়ন্তী রান্না-বান্না কিছুই করেনি। জিজ্ঞেস করতেই ও উত্তর দিল, ভুলুদা এতক্ষণ গান শুনিয়ে গেছে। আমার প্রচন্ড মাথা ধরেছে, রান্না করতে পারবো না। হোটেল থেকে খেয়ে আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসো। ভুলুর গান শোনার জন্য নগদ একুশটা টাকা বেরিয়ে গেল। বুঝলেন সুধীমনবাবু, দুঃখের কথা কতো আর বলবো!

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে। একঝাঁক বাইসন নুন-মাটি খেয়ে এদিকে আসছে জল খেতে। ওরা এগারোজন মানুষ এপারের বাঁধানো ঘাটের পাশে মেহেদি গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে। কারো মুখেই কথা নেই। একটু শব্দ পেলেই ওরা নিমেষে উধাও হয়ে যাবে। আগের দিন এই করেই দেখা হয়নি। বাইসনের একটা দল জল খেতে সবে নদীতে নেমেছে, পীযূষ শুধু বলেছিল, সুপ্রিয়দা টর্চটা দিন তো। ব্যস! চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বাইসনের দল গভীর অরণ্যের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছুটলো। আজ তাই প্রত্যেকেই সাবধান। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। বাইসনের দলটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। অনেকটা কাছে। জল খেতে নদীতে নামলো। জল খেলো। এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে ওরা আবার জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল। পুরো ব্যাপারটা একটা রুদ্ধশ্বাসে মুখোমুখি বসে দেখলো সুধীমন সুচেতা এবং ওরা সবাই। ভয় আর আনন্দের মধ্যে সে-এক বিচিত্র উপলব্ধি। এ-সব মুহূর্ত মানুষের জীবনে বারবার আসে না। যাঁরা জঙ্গলকে ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা।

বৈদ্যনাথ, শিবনাথ এবং ভুলু ভোর চারটেয় উঠে প্রতিটি রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভাত-সঙ্গীত গেয়ে সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছেন। বাইরে তখন অন্ধকার। কিন্তু এখনই উঠে প্রস্তুতি না-নিলে দেরি হয়ে যাবে। আর কিছুক্ষণ পরেই চারজন মাহুত চারটে হাতি নিয়ে আসবে। এক একটা হাতির পিঠে তিনজন করে বসবেন অর্থাৎ মোট বারোজন মানুষ হাওদায় বসে জঙ্গল থেকে গভীর জঙ্গলে যাবে। অরণ্যব ে।লে দেখবে পশুদের বিচবণ।

সুচেতা আর সুধীমন তখনও ঘুমিয়ে। অন্যরা ঘুম থেকে উঠে পড়লেও ওদের ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। বৈদ্যনাথ আর ভুলু 'ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ' ধবলেন। শিবনাথ মুখের বিচিত্র শব্দে খোল করতাল বাজিয়ে চলেছেন। কিন্তু সবই বৃথা! দরজা খোলার কোনও নাম গন্ধ নেই। হঠাৎ মনে পড়ে যাওযায ভুলু বলে উঠলেন, আবে, এটা তো দরজা খোলাব ব্যাপাব! তারপরেই অত্যন্ত বেসুরো গলায় ধরলেন, 'পূজাবিনী, খোলো খোলো মন্দিব দ্বাব।' হ্যাঁ। দরজাটা তখনি খুলে গেল। সুধীমন ঘুম জড়ানো চোখ নিয়েও হেসে ফেললো। বললো, সত্যি ভুলুদা, আপনার গান শোনার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়াকে আমি বেশি প্রেফার করি। সুধীমনের কথা শুনে শিবনাথ দারুণ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তেই গামাব কাঠেব তিনতলা বাংলোটা ওই ভোর রাত্রে প্রচন্ড ভাবে কেঁপে উঠলো।

দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া দীর্ঘকায় গাছেব সাবি। ইউক্যালিপটাসেব মেলা। বাংলোর পেছন দিকের লাগোয়া এই পথটুকুই সাজানো গুছানো। তারপরেই আরম্ভ হবে একটানা শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। গভীর অরণ্যের সেই সবুজ আহ্বানে সাড়া দিতে চারটে হাতি খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। ভোরের আলো তখনও ভালো করে ফুটে ওঠেনি। চাবপাশের সবুজ অন্ধকারটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে এই পর্যন্ত। গেস্টহাউসের এলাকা শেষ। সামনেই একটা পাহাড়ী নদী। অনেকটা চওড়া তবে জল বেশি নেই। চারটে হাতি এবং সঙ্গের তিনমাসের বাচ্চা হাতিটাও শুঁড় মাথা দোলাতে দোলাতে নদীটা পার হয়ে গেল।

ভোরের আলো সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল ওই বাচ্চা হাতিটা। ও যে দেখতে এতো সুন্দর সেটা এতোক্ষণ বোঝা যাচ্ছিলো না। দারুণ মিষ্টি আর ওর কান্ডকাবখানাগুলো এতো মজাব যে দেখলেই হাসি পায়। যেমন বড়ো হাতিরা পথ চলার সময়ে সামনের ডালপালা ভাঙছে আর মুখে দিচ্ছে। ওদের দেখাদেখি বাচ্চা হাতিটাও শুঁড় পেঁচিয়ে গাছের একটা ডাল ভাঙার চেষ্টা করলো। না-পেরে ওই গাছের গোড়ায় একটা লাথি বসিয়ে দিয়ে সোজা এগিয়ে চললো। তাছাড়া চার পা এগিয়ে যাচ্ছে তো একবার করে ওর মায়ের দুধ খাওয়া চাই-ই। মাঝে মাঝে আবার সবার আগে এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাবে। ভাবখানা এমন, তোমাদের মতো বুড়োদের নিয়ে আর যাই হোক জঙ্গলে যাওয়া যায় না। তোমরা কতো পেছনে! তারপরেই ঘাস ছিঁড়ে খেতে থাকবে। সেই সুযোগে অন্য হাতিরা তখন এগিয়ে যায়। বাচ্চাটা ঘাস খেতেই

থাকে। হঠাৎ এক সময় আবির্ভাব করে সে অনেকটা পেছনে। তখন ওর দৃষ্টিটা বড়ো করুণ দেখায়। যেন বলতে চায়, আমাকে ফেলেই তোমরা চলে যাচ্ছো? তোমাদের এতোটুকু মায়া-দয়া নেই? তারপরেই ওর গলার ঘণ্টার টুংটাং শব্দের সুর তুলে শুঁড় দোলানো দৌড়। সে-একটা দেখবার জিনিস!

আর একটা পাহাড়ী নদীকে অনেকটা পেছনে ফেলে রেখে, ক্রমশ উঁচু ঝোপ-জঙ্গলের মেঠো পথ বেয়ে উপরে উঠতেই বেশ খানিকটা খোলা মেলা মাঠ। শত শত হরিণ সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতিদের দেখতে পেয়েই তারা পড়ি-কী-মরি এক দৌড় লাগালো। কয়েকটা আবার সামান্য দৌড়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে। সুচেতা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কী সুন্দর কাজল কালো টানা টানা চোখ ওই হরিণগুলোর। সারা গায়ে বিস্কুট আর কালো, সোনালী আর খয়েরী রংয়ের বাটিক প্রিন্টের ছাপ।

হাতির দল এগিয়ে চলে। কোথাও জল-কাদা মেশানো পথ, কোথাও উঁচু-নিচু পাহাড়ী ঢাল, পাথর চাঁই-এর অসমতল খানা-খন্দ। অ্যালিফ্যান্ট গ্রাসের কোমল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা নির্বিকার ভাবে এগিয়েই চলে। হাতির পিঠ থেকে সুচেতা একটু নীচে নেমে যাচ্ছিলো, নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসলো। ওর পাশেই সুধীমন বসেছিল। সুধীমনের একবার ইচ্ছা হলো ওর সরু কোমরটুকুতে একটু হাত রাখে—অথচ সারা রাত সুচেতা তার পাশে শুয়ে থাকে। একটু স্পর্শ পর্যন্ত করে না। সেদিক দিয়ে সুচেতা এবং সে দুজনের কাছে এক নিটোল বিশ্বাসের আপন মানুষ হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসের সম্মানটুকু যেন কখনওই বুদবুদের মতো উড়ে না-যায় সেদিকে দুজনেরই সমান দৃষ্টি। আর এখন? প্রকৃতির এই উন্মুক্ত পরিবেশে সুধীমনের সেই ইচ্ছেটাই জেগে উঠলো। আসলে হাতির চলার ছন্দময় গতির দুলুনীতে সেই ঢেউ উঠছে সুচেতার কোমরে। সুধীমনের চোখে সকালের ঘুম জড়ানো প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের সঙ্গে সুচেতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। নেশাটা তারই। সুধীমন অন্যদিকে দৃষ্টি দিল। চারটে সম্বর জুল জুল করে তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। বাচ্চু সেন আওয়াজ দিল, ভুলুদা আপনার গান শুনতে চাইছে।

ফাজিল ছেলে, দাদার সঙ্গে ঠাট্টা!

অন্যায় হয়ে গেছে। মারুন তবে দু-চার গাট্টা—

নো গাট্টা—অনাবিল হেসে ভুলু বললেন, তোমার অনারটা রাখা উচিত। কথাটা শেষ করেই আর মুহূর্ত দেরি করলেন না। ক্যারক্যারে গলায় 'পূজারিনী' ধরতেই সম্বর চারটে প্রাণ ভয়ে যে যেদিকে পারলো দৌড়ে পালালো। শিবনাথের আবার সেই হাসির ঝড় উঠলো, ভুলু—তোমার গান শুনে সম্বর পালাচ্ছে। চন্দনাকে গিয়ে এটা বলা হবে।

কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর বড়ো চারটে হাতিই আর সামনে বাড়তে চাইলো না। বাচ্চাটাকে মাঝখানে ঘিরে রেখে শুঁড় তুলে প্যাঁ-প্যাঁ ডাকে অস্থির করে তুললো। কুমার সেন মাহুতের উদ্দেশে বললেন, ব্যাপারটা কী হলো? হাতিদের কান্না কীসের?

আজ্ঞে বাবু হাতি বাঘের গন্ধ পেয়েছে। ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

অ্যাঁ—কুমার সেনের গলা দিয়ে আর কিছু বেরুলো না। সুপ্রিয় সেন ওই অবস্থার মধ্যেও রসিকতা করতে ছাড়লেন না, কী হলো কুমার সেন? এবারে দেখি আপনারই কান্নার পালা।

বৈদ্যনাথ বললেন, ভুলুদা আপনার গান-টান ধরুন। সম্বরের মতো যদি উনি প্রাণ ভয়ে পালান।

নিজের প্রাণ রাখাই এখন দায়—বড়ো কঠিন অবস্থা। ভুলু পরিষ্কার বললেন, গান নয়—এখন GUN-এর দরকার এই সময়ে চ্যাংড়ামো করে গান গাইলে নির্ঘাত ও আমার প্রাণ নিয়ে ছাড়বে। আমি ভাই চন্দনার কাছে ফিরে যেতে চাই।

প্রায় মিনিট দশেক হাতিরা ওই অবস্থাতেই রইলো। নট নড়ন-চড়ন। একটানা প্যাঁ-প্যাঁ করে গলা সাধা। মাঝে মাঝে বাতাসে কী যেন শুঁকছে। সুধীমন বিশেষ করে সুচেতা তো ভয়ে কাঠ। ওদের চিন্তা আবার আর এক ধরনের। সত্যি যদি এখানে কিছু একটা হয়ে যায়, স্বামী-স্ত্রী সেজে অ্যাডভেঞ্চারের

নাটক বের হয়ে যাবে তাহলে। জানাজানি হলে লোকে কী ভাববে তাদের সম্বন্ধে? সে যাই হোক, বাঘটা কী এতোক্ষণেও দূরে চলে যায়নি? বড়ো বড়ো অ্যালিফ্যান্টগ্রাসের আড়ালে সামনের কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। সুচেতার ভয় সেই কারণেই। কোথায় থেকে যে একটা লাফ-টাফ দিয়ে বসবে—সুধীমনের ডান হাতটা খুব শক্ত করে চেপে ধরলো সে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললো, কী হবে সুধীমন? ভয় পাওয়াতে সুধীমনও কারো থেকে কম যায় না। কিন্তু সে বেশ সাহস দেখিয়ে বললো, এতো ভয় পাচ্ছো কেন? আমাদের সঙ্গে চার-চারটে হাতি। আর যতো দূর জানি বাঘ হাতিকে মোটেই পিঁপড়ে মনে করে না। তার চেয়েও শক্তিশালী ভেবে বেশ সমীহ করেই চলে।

ওই অবস্থায় আরও মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পর অবশেষে মাহুতের কাছ থেকে অল ক্লিয়ারের নির্দেশ পাওয়া গেল। হাতিরা আবার শুরু করলো তাদের পথ চলা। বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর একজন মাহুত বললো, ওই যে দেখুন বাবু, বাঘের পায়ের ছাপ। ওই যে গোল গোল দাগ—হাতির পিঠের ওপর বসেই সকলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে বাঘের শ্রীচরণের ছাপ দেখতে লাগলো। কল্যাণ বললো, প্রভু তোমার পায়ের ছাপ দেখেছি এই-ই যথেষ্ট। তুমি আর কষ্ট করে আমাদের দেখা দিয়ে' না। দু-দুবার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছি আর যে পারি না প্রভু।

চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। ওরই মধ্যে দিয়ে ডালপালা সরাতে সরাতে, কোনটাকে আবার ভেঙে ফেলেই হাতি চারটে এগিয়ে চলেছে। বাচ্চাটা ফেউ-এর মতো আগে আগে রয়েছে। মন্দিরের ঘন্টাধ্বনির মতো একটানা বেজে চলেছে ওর গলার ঘন্টাটা। কল্যাণ ওদের হাতির মাহুতকে বললো, বাচ্চাটার গলায় তো ঘন্টা বেঁধেছো, তা কানেও দুটো দুল পরিয়ে দিলে না কেন?

মাহুতের হয়ে পীযূষ উত্তর দিল, ডানলপের দুটো সাইকেলের টায়ারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। শিবনাথ তাঁর অরণ্য কাঁপানো হাসি দিয়ে বললেন, পীযূষটা ফোকরামী করলে হবে কী, দারুণ বলেছে কিন্তু। সুচেতা স্নিগ্ধ এক হাসি ছড়িয়ে বললো, রসিকতায় আপনারা কেউই কারও থেকে কম যান না।

একটা জঙ্গল পেরিয়ে আর একটা গভীর জঙ্গলে ঢুকবার মুখেই একজন মাহুত খুশির গলায় বলে উঠলো, ওই দেখুন, গন্ডার—সকলেই উঁকি ঝুঁকি মারলো। কিন্তু কেউই দেখতে পেল না। সুচেতা ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় তোমার গন্ডার?

ওই তো দেখুন না—মাহুত আঙুল তুলে দেখলা, ওই যে বড়ো জারুল গাছটা, পাশেই একটা পাকুড় গাছের ঝোপে........

জারুল গাছও চিনলাম, পাকুড় গাছও চিনলাম। সুচেতা হতাশ সুরে কথাটা বলতেই মাহুত উত্তর দিল, দাঁড়ান—গন্ডারটাকে আমরা তিন দিক দিয়ে ঘিরে ধরছি।

যেমন বলা তেমনি কাজ। মাহুতরা এ-গাছের পাশ কাটিয়ে ও-গাছের বেড়া ডিঙিয়ে বড়ো একটা ঝোপকে পেছনে ফেলে একেবারে গন্ডারের মুখোমুখি। বুক সমান অ্যালিফ্যান্ট-গ্রাসের মধ্যে সে অত্যন্ত নিরীহ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, নূপুর সেন ফটো তুললেন। গন্ডারটা তবুও নড়ে না। শান্ত ভাবে তাকিয়ে রয়েছে। ওর ভাবখানা হচ্ছে, কলকাতা থেকে এতো কষ্ট করে যখন এখানে এসেছো একটু বেশি করেই ফটো-টটো তুলে নাও। কোনটা নষ্ট হয় ঠিক আছে কিছু? পরে তো আমাকে আর পাবে না।

গন্ডারটা যে এতোটা টাইম দেবে সুপ্রিয় সেন আগে বুঝতে পারেননি। ঝটপট তিনি তাঁর ক্যামেরা বরে করে গোটা চারেক ফটো তুলে নিলেন। গন্ডারটা তবুও নড়ে না। কল্যাণদের হাতির মাহুতটা একটু এগিয়ে যেতেই গন্ডারটা এবারে পেছনে সরতে থাকে। দু'পাশের অ্যালিফ্যান্ট-গ্রাসকে দোলাতে দোলাতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গভীর অন্ধকার একটা জঙ্গল-এর শেষ মাথায় পৌঁছেই ক্রমশ ঢালু পথ বেয়ে হাতির দল নীচের দিকে নামতে লাগলো। সামনেই হোগলার বন। যেমন ঘন তেমই বিস্তৃত। ওই হোগলা বনের মধ্য

দিয়েই রাজসিক চালে হাতিরা এগিয়ে চলেছে। হলং নদীটা তার প্রশস্ত বুকে বেশ কিছু জল ধরে আপন খেয়ালে ছুটে চলেছে ঢালু পথের সন্ধানে। হাতিরা সেই জলে নেমে পড়লো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পা দুটো গুটিয়ে নিলো ভিজে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে। ওপারে উঠেই দেখা গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণের দল পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, ঘাস খাচ্ছে। হাতিব দলকে সেই মুহূর্তে ওরা আশা করেনি। একপলক দেখলো মাত্র তারপরেই তারা কোথায় যেন হাবিয়ে গেল।

অনেকটা দূরে বাইসনের একটা দল থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা হাতিদের উপস্থিতিটা অনেক আগেই টের পেয়েছে। এখন আসলে নিজেদেব নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়েই ওদের ওই মিটিং। একজন মাহুত বললো সোজা গেলে ওরা পালিয়ে যাবে। আমরা বরং ঘুরে যাই।

নিঃশব্দে হাতি চারটে জঙ্গলের শর্টকার্ট বাস্তা ধরলো যাতে পেছন দিক থেকে ওই বাইসন টিমটার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কিন্তু বাচ্চা হাতিটাকে নিয়েই যতো মুশকিল। ও কোনও নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। চলতে জানে না। খুব সম্ভব ওর স্বভাবটাও তা নয়। জোরে দৌড়তে গিয়ে তিনবার আছাড় খাচ্ছে, চারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, গলা শুকিয়ে গেলে মায়ের দুধ খেয়ে শক্তি ফিরে পেয়ে অসম্ভব রকমে গলার ঘন্টা বাজিয়ে চলেছে। বাইসনের দল আর সেখানে থাকে? ঘন্টার শব্দ শুনেই ফিরে গেছে আরও গভীর অরণ্যে।

হাতির পিঠে সারা জঙ্গল ঘুরে বেলা সাড়ে-ন'টা নাগাদ ওরা গেস্ট হাইসে ফিরে এলো। ফিরেই চমক। লনের গার্ডেন চেয়াবে একটা বোগেনভিলিযার ছায়ায় বসে আছেন কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পল্লীগীতি আর লোক সংগীতের বিখ্যাত শিল্পী। টিকোলো নাক। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। মেজাজে সিগারেট টেনে চলেছেন।

শিবনাথ বললেন, দারুণ মুডে আছেন মনে হচ্ছে—

ভুলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তব দিলেন, মুড-টুড বুঝি না। চলো আমরা সবাই মিলে ওঁর কাছে যাই।

যদি বিবক্ত বোধ করেন?

ওটা কোনও ব্যাপারই না—ভুলু একগাল হেসে বললেন, একজন সংগীত শিল্পী আর একজন সংগীত শিল্পীর কাছে যাবে। এরমধ্যে বিরক্ত হওয়ার কী আছে?

সত্যিই তাই। কমল বন্দ্যোপাধ্যায় এতোটুকু বিরক্ত হলেন না। প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে কথা বললেন, আলাপ করলেন। ওরই ফাঁকে সুচেতা টুক করে বলে বসলো, কিন্তু এতেই হবে না—আমরা আপনার গান শুনতে চাই।

বেশ তো! তাও হবে। কমল বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সহজ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন।

নিজেদের ঘরে এসে সুধীমন টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সুচেতা ঢুকলো বাথরুমে। একঘন্টা বাদে সে স্নান সেরে বেরিয়ে এলো। সুধীমনকে তাড়া লাগালো শুয়ে থেকো না। স্নানটা করে নাও। খুব ফ্রেস লাগবে।

দাঁড়াও একটা সিগারেট খেয়ে নিই। বড়োদের সামনে এতোক্ষণ সিগারেট খেতে না-পেরে এতো বাজে লাগছিল—

খেলেই পারতে! সুচেতা স্বাভাবিক গলায় বললো, ওঁদের মধ্যে নূপুরদা সুপ্রিয়দা আর কমলদা বয়সে সবচেয়ে বড়ো। তাঁরাই তোমাকে বারবার সিগারেট খেতে বলেছেন। ওঁদের ও-সব বাধা নিষেধের প্রাচীর নেই। দেখছিলে না সুপ্রিয়দা বারবার পীযূষবাবুর কাছ থেকে কেমন বিড়ি চেয়ে খাচ্ছিলেন। পীযূষবাবু তো বয়সে সবার ছোট।

ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কুড়ি বছরের। আমি এতো তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি?

সুধীমন একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, জঙ্গলটা বেশ ঘুরলাম কিন্তু সুচেতা—আমি আমার সারা জীবনে হলং-এর এই দিনগুলোর কথা ভুলবো না। যাই বলো, সুধীমন হঠাৎ একটু থামলো। অল্প হেসে বললো, বিয়ের পর সুচেতা এখানে আর একবার আসতেই হবে।

এখন এটা কী হচ্ছে? সুচেতার চোখের তারায় রং-মশালের ঝিলিক। বিয়ের পরেই তো এলাম।

এটা হলো রিহার্সাল। সুধীমন নিঃশব্দে হাসতে হাসতে বললো, আমরা প্রক্সির ভূমিকায় অভিনয় করে গেলাম শুধু—

বাঃ বেশ বলেছো তো! প্রক্সির ভূমিকা! না সুধীমন, আসল ভূমিকাতেও আমরা থাকবো।

বনের মধ্যে ময়ূরদের কর্কশ চিৎকারের মাতলামো ভেসে এলো। সুচেতা জানলার কাছে সরে এসে মুখোমুখি স্পটটায় চোখ রেখেই বললো, সুধীমন দেখবে এসো—কতো ময়ূর! গাছের এক ডাল থেকে অন্য এক ডালে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুচেতার ডাকে সাড়া দিয়ে জানলার কাছে এসে সুধীমন ময়ূরদের ট্রাপিজের খেলা দেখলো কিছুক্ষণ। তারপরেই আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সুচেতা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে নিজেকে মোহনীয় করে সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সবশেষে কপালে সিঁদুরের টিপ পরে সিঁথিতে একটু ছোঁয়ালো। সুধীমন বললো, এই যে সিঁদুর পরছো, তোমার হাতটা একটুও কাঁপছে না?

তা কেন হবে? এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। সুচেতা খুবই শান্ত হেসে বললো, অসুবিধেটা কোথায় হবে জানো? বাড়িতে গিয়ে। সিঁদুর না-পরলে কপালটা খুবই ফাঁকা ফাঁকা দেখাবে। তখনি বিশ্রী লাগবে।

কথা শুনে সুধীমন একটু হাসলো। কিছু বললো না। তারপরেই মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, আচ্ছা সুচেতা, তোমার কাকা কোন দপ্তরের মন্ত্রী যেন? বনের নয়তো মানে বন-দপ্তরের.....

রাঙাকাকা তো শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী। বন-মন্ত্রী হতে যাবে কেন? তারপরেই সুচেতা সন্দেহের সুরে প্রশ্নটা তুললো, হঠাৎ এ-কথা বললে যে?

আগামীকাল বন-মন্ত্রী এখানে আসছেন শুনলাম। খবরটা শুনেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কী জানি, গোপনসূত্রে খবর-টবর পেয়ে সিঁদুরের খেলা দেখতে আসছেন নাকি? কৌতুকের সুরে সুধীমন শেষ কথাটা ছুঁড়ে দিল, আচ্ছা বন-মন্ত্রীর সঙ্গে শিল্প-মন্ত্রীও তো বেড়াতে আসতে পারেন—পারেন না?

তোমার মাথায় এখন শয়তানির ভূত চেপেছে। ও-সব ছাড়িয়ে দেবো।

মারধোর করবে নাকি?

প্রয়োজনে তাও করতে পারি। সুচেতা হাসতে হাসতে খাটের কাছে এগিয়ে গেল। সুধীমনের মাথায় পরম এক মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, ঈস্ এই ছেলের গায়ে হাত তুলবো আমার এতো সাহস! ক'জন মেয়ে এই রকম ছেলে পাবে? তারপরেই সুচেতা কোমল গলায় অনুনয় করে বললো, আর দেরি কোরো না। স্নানটা সেরে এসো এবার।

রাত্রে গানের আসর বসলো। তিনতলার বিরাট হলঘরের ফরাসের ওপর সবাই গোল হয়ে বসেছেন। ছুটে এসেছেন গেস্ট হাউসের অফিসার এবং কর্মীরাও। জঙ্গলের মধ্যে থেকে এমন সুযাগ কি বারবার আসে? আসলে কমল বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকেরই একটা ফাংশানে এসেছিলেন। ফেরার পথে এই হলং ঘুরে যাওয়া। জলদাপাড়ার অনেক নাম শুনেছেন। না-দেখে কলকাতা ফিরে যান কীভাবে?

একের-পর-এক গান গেয়ে চলেছেন কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, বাউল কী নয়? বেতার, টিভি এবং ফাংশানের জনপ্রিয় শিল্পী এখানে আরও বেশি জীবন্ত। তাঁর গলার জাদুতে সকলে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। একসময় রসিকতা করে বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, এতো চুপচাপ ক্যান? ভালো লাগতেছে না?

সকলেই বলে উঠলেন, দারুণ!

ভুলু তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বললেন, আমার চেয়েও অনেক ভালো গাইছেন।

সম্মিলিত হাসির ফোয়ারা একটু নিস্তেজ হতেই কমল বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বেশি রসিকতা করে উত্তর দিলেন, এই সার্টিফিকেটটা আমার দারুণ কামে লাগবো!

ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী তার চোখের চশমাটা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, কমলবাবু পাগল

খেপিয়েছেন। সামলাতে পারবেন তো?

অমায়িক হাসলেন কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, কতো শত ক্যানকাইন্না-খ্যানখাইন্না গলা ঠিক কইরা দিলাম—এতো তৈবি গলা। দ্বিতীয়বাব হাসিব ফোয়ারা ছুটলো। তবে সব চেয়ে উজ্জ্বল হাসিটি ভুলুবাবুর। তাঁব ভাবখানা হলো, তোমরা তো আমাকে চিনলে না—যিনি চিনবার তিনি ঠিকই চিনেছেন।

রাত্রে পাশাপাশি খাটে শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলো সুচেতা আর সুধীমন। সুধীমন একসময় বললো, আজকেই শেষ বাত আমাদেব তাই না সুচেতা?

হ্যাঁ। ভাঙা মন নিয়ে সুচেতা বললো, কলকাতায় ফিবতে আমার বাজে লাগছে।

আমার অবশ্য ততোটা নয়।

নয় কেন?

আমি তোমার কাছে থাকতে পারলেই খুব শান্তি পাই। সুধীমন ধীর গলায় বলতে লাগলো, হলং-এ থাকলাম কী শিলং এ রইলাম ওটা কোনও ব্যাপার নয। আসল কথা হলো তুমি। তুমি আমাব কাছে একটা শান্তিব দ্বীপ সুচেতা—সত্যি বলছি, আমাব সব সময়েই মনে হয়, সুখের চাবিটা তোমাব ওই আঁচলেই যেন বাধা আছে।

তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো তাই না সুধীমন?

সুধীমন হেসে ফেললো. অতো শত ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না। তবে থামলে কেন?

তোমাকে ছাড়া স্ত্রী হিসেবে আমি অন্য কাউকে ভাবতেই পারি না। জানো সুচেতা—আমি না অনেক সময়ে ওই আসনে অন্য একজন মেয়েকে কল্পনায় বসিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা একা একা মনে হয়।

আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি মহৎ· সুচেতা আবেগ নিয়ে বললো, আমি তোমাকেই পেতে চাই সুধীমন। তোমাকে বিশ্বাস করে. তোমার ওপর আস্থা রেখে স্বামী স্ত্রী সেজে ছটা দিন কাটিয়েও গেলাম অথচ দেখো, সেই আমিও মাঝেমধ্যে দেবুর কথা ভাবি।

দিনেব আলো নিভে আসছে সুচেতাব শোবাব ঘবেব বিছানায় সুধীমন তখনও পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। দুপুবেব খাওয়া-দাওযাব পব থেকে সেই যে ঘুমাচ্ছে এখনও তা ভাঙেনি। প্রথমে এই ঘবে শুতে চায়নি সুধীমন। শুধু বলেছিল. সুচেতা আমাব না ঘুম আসছে। নিজেব সাজানো-গুছানো ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছে সুচেতা। বলেছে. এই ঘরখানা যখন তোমাব এতো পছন্দ হযেছে তুমি এখানেই ঘুমাও। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি।

তারপর সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল, সন্ধ্যাও প্রায় হযে আসছে অথচ সুধীমনের ঘুম ভাঙলো না। এমন নিশ্চিন্তেব ঘুম মানুষ যখন-তখন ঘুমাতে পারে না। সুচেতাব মনে পড়লো. তার কাছে এলে সুধীমন এক ধরনেব শান্তি পেতো—সেই শান্তিতেই কী ঘুমাচ্ছে? সুচেতা একবার ভাবলো, সুধীমনকে ডাকবে না। যতোক্ষণ পাবে ও ঘুমাক। কিন্তু মুশকিলটা হয়েছে ওদেব আবার মৈত্রালীদের বাড়িতে যাবার কথা আছে। সুধীমন আগামীকাল বাঙ্গালোর চলে যাবে। সুতরাং আজকে ওখানে একবার যেতেই হবে নযতো পবে আব সময হযে উঠবে না। তাছাড়া মৈত্রালীব বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে তো অনেক আশা নিয়ে থাকবে। অবশ্য সুচেতা একা যাচ্ছে—মৈত্রালী শুধু এটাই জেনেছে। সুধীমনকে দেখলে দাকণ খুশি হবে। পুবনো দিনেব স্মৃতি শীতের লেপের মতো গাযে জড়িয়েই থাকে। সে-সব কী ভোলা যায? অনেককাল পরে মৈত্রালীও আগেব দিনের মতো সহজ এবং স্বাভাবিক হযে উঠবে।

সুচেতা গভীর এক মমতায় সুধীমনের মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। সুধীমন চোখ মেলে তাকাতেই সে বললো, আব কতো ঘুমাবে? মৈত্রালীদেব বাড়িতে যাবে না?

যাবো।

আমি তো সেই বিকেল থেকে অপেক্ষা কবছি কখন তোমাব ঘুম ভাঙে?

সত্যি দারুণ একখানা ঘুম দিলাম। সুধীমনের সারা মুখে লজ্জা পাওয়ার হাসি। আস্তে আস্তে সে বললো, মনে হলো আমি অনেক দিন বাদে ঘুমালাম আর ঘুমটাও কিছুতেই কাটছিল না। তুমি ডাকাডাকি করলে বলেই......

সুচেতা হঠাৎ বলে ফেললো, মৈত্রালীদের বাড়িতে যাবার প্রোগ্রাম না-থাকলে আমি তোমাকে আজ কিছুতেই ডাকতাম না সুধীমন।

কিন্তু আমার তো এখানে থাকার কথা নয়।

তবুও ঘুম ভাঙাতাম না।

সুধীমন কথাটা খুব মন দিয়ে শুনলো। সুচেতার চোখে চোখ রেখে বিহ্বল দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ কী যেন দেখলো। নতুন কোনও ভাবনার মধ্যে সে আর যেতে চাইলো না। একটু তাড়া দিয়ে তাই বলে উঠলো, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এবারে মৈত্রালীদের বাড়িতে রওনা দেওয়া যাক কী বলো?

আমি তো তৈরিই আছি। সমস্যা তো তোমাকে নিয়ে।

সরি! সুধীমন সামান্য একটু হেসে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, সুচেতা তার আগেই ওর সাফারি স্যুটটা এগিয়ে দিল। সকালের বৃষ্টিতে ওটা ভালোই ভিজেছিল। শুকিয়ে যাবার পর সুচেতা নিজে হাতে ইস্ত্রী করে ঝকঝকে করে দিয়েছে। দু-তিনবার এ-ঘর ও-ঘর করে সুচেতা যখন বুঝতে পারলো সুধীমন এতো তাড়াতাড়ি উঠবে না, অথচ তার হাতেও বিশেষ কোনও কাজ নেই, তখনি সুচেতার একবার খেয়াল হলো, সুধীমনের সাফারী স্যুটটা তো শুকিয়ে গেছে। ইস্ত্রী করে দিলে কেমন হয়? পরিপাটী করে ওই কাজটুকু সে ভালোই করেছে।

সুচেতার হাত থেকে সাফারী স্যুটটা নেওয়ার সময়ে সুধীমন হেসে দিল। কিন্তু তার ওই হাসিটা ছিল বেশ করুণ! সুচেতাকে নিয়ে সে যে-ছবি এঁকেছিল, সেই ছবিটার ওপরে বহুকাল আগেই ধুলো জমে ওটাকে বাতিল করে দিয়েছে। বিবর্ণ সেই ছবিটাই কী পাগল হাওয়ায় তার সমস্ত ময়লা কাটিয়ে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে? সাংসারিক জীবনের এই ছোট্ট অথচ সূক্ষ্ম কাজগুলো ভালোবাসার নিবিড় কাজল পরিয়ে সম্পর্ককে যে-গভীর স্তরে পৌঁছে দেয়, সুধীমন আজ সেখান থেকে অনেকটা দূরে। সুচেতা অপর একজনের স্ত্রী। রিণরিণ করে একটা ব্যথা সুধীমনের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কতো কাছে থেকেও সে কতো দূরে? হাহাকার এই মনটাই তাকে নিয়ে যখন-যেমন খুশি খেলা করে। সুধীমন কী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে? জীবনের স্বপ্ন দেখতে সে বড়ো ভালোবাসতো। সেই জীবনই এখন তার কাছে মহাশূন্যের এক আঁধার। সুচেতার সঙ্গে এতোক্ষণ সময় কাটানোর ফলে সুধীমনের বুভুক্ষু মনটা বুঝি একটু স্থিমিত হয়ে এসেছে। জীবন, স্বপ্ন, এবং ছবির কথা ভুলে গিয়ে সে-সব কিছুকেই ক্ষমার চোখে দেখতে লাগলো সুধীমন বললো, তুমি অনেক বুঝে চলতে শিখে গেছো।

কী রকম?

আগে তোমার এতো নিঁখুত দৃষ্টি ছিল না। তোমার দায়িত্বই অন্যাকে নিতে হতো।

এখন আমিই দায়িত্ব নিচ্ছি তাই না?

প্রায় তাই।

প্রায় না পুরোপুরি?

সেটা আমি কী করে বলি— সুধীমন হেসে উঠলো। তোমার সঙ্গে থাকার সুযোগ আর দিলে কোথায় যে ওই ভালো কাজগুলোর স্পর্শ বারবার অনুভব করবো? কথাটা যদিও সুধীমন হেসে হেসেই বললো কিন্তু তার চোখ দুটো সম্পূণ অন্য কথা বলছে। বর্ষার জলে কী কিছু ভরে উঠছে? সুধীমন নিজেকে সংযত করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, চলো সুচেতা, মৈত্রালীদের বাড়িতে যাবার কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে—

লাউডন স্ট্রিট থেকে মৈত্রালীদের বেনীনন্দন রোডের বাড়িতে যাবার পথে সুধীমনের অনুরোধে

সুচেতা একবার গাড়ি থামালো। কোনও প্রশ্ন না-করে সে শুধু ভ্রূ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাতেই সুধীমন মৃদু হাসলো। মৈত্রালীর ছেলে সুদীপ্ত মাধ্যমিকে ফোর্থ হয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো হওয়া এই ছেলেটির সঙ্গে তার যোগাযোগের সূত্রটা শুধু অন্নপ্রাশনের একটা মধুর উৎসব। সুদীপ্ত তখন নেহাতই এক আপনভোলা শিশু। বিস্ময় ভবা দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিজের মাকে চেনা ছাড়া তার আর কোনও বোধ ছিল না। চিনিয়ে না-দিলে সুধীমনের পক্ষেও ওকে চেনাটা এখন অসম্ভবের ব্যাপার। সে যাই হোক, সেই সুদীপ্ত ফোর্থ হয়েছে! ওকে নিশ্চয়ই একটা কিছু দেওয়া দরকার। সুধীমন বললো, একটা ভালো দোকানে চলো—সুদীপ্তর জন্য দুটো পেন নেবো।

মৈত্রালীদের বাড়িতে গিয়ে যখন ওরা পৌঁছালো তখন পুরো এলাকা লোডশেডিং-এর কবলে। চারদিকের জমাটবাধা অন্ধকারে চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগছে। সুধীমন বললো, তোমাদের কলকাতার এই একটা জিনিস ভারী বিরক্তিকর। এতো অন্ধকারে সুস্থ-ভাবে কোনও কিছু চিন্তা-ভাবনা করা যায়?

সুচেতা জিজ্ঞেস কবলো, কলকাতা তোমার নয়?

মোটেই না। জন্মেছি ওপাব বাংলায, ছেলেবেলা কেটেছে গোরক্ষপুরে, পড়াশোনা করেছি কলকাতায়, আরও বেশি পড়াশোনার জন্য পশ্চিম জার্মানিতে ছিলাম। এখন চাকরি করেছি বাঙ্গালোরে। নির্দিষ্ট করে কোনও জায়গাই আমার নয়। সম্ভবত অন্য কোনও জিনিসও নয়।

ইতিমধ্যে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে উপর থেকে নীচে নেমে এলো মৈত্রালী। দরজা খুলে ঘরের ল্যাম্পেব আবছা আলোয় সে সুধীমনকে দেখতেই পায়নি। তাছাড়া সুধীমন ছিলও অনেকটা পেছনে। সুচেতাকে হাসি মুখ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমেই ঝঙ্কার তুললো, তুই কী রে? সেই বিকেলে আসবি বলে এই সওয়া সাতটার সময়ে এলি? অপেক্ষা করে করে আমি তো ভাবলাম আর বুঝি আসবিই না—তারপরেই হেসে গভীর গলায় আহ্বান জানালো, আয়, ভেতরে আয়!

আমি একা ভেতবে যাবো—

কেন, কে আছে তোর সঙ্গে?

এক ভদ্রলোক রয়েছেন।

ওমা! সে-কথা আগে বলবি তো—কোথায় তিনি?

সুচেতা উত্তরটা দেবাব আগেই সারা বাড়ি এবং পাড়া আলোয় স্নান করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে এলো। খুব সম্ভবত সেটা ছোটদের উল্লাস, এসেছে—এসেছে। উজ্জ্বল সেই আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে মৈত্রালী সুধীমনকে দেখতে পেল। আধ মিনিট সময়ও সে নেয়নি কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ সহপাঠীকে চিনতে। উচ্ছ্বাস আর আবেগে মৈত্রালীর গলা বুজে এলো, সুধীমন তুমি!

সুধীমন হেসে বললো, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

মৈত্রালী ওদেরকে উপরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। শাশুড়ি উত্তরা বড়ো জা শিখা এবং শ্বশুর দীপমোহনের সঙ্গে সুধীমনের আলাপ করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এটা বলতেও ভুললো না, সুদীপ্তর অন্নপ্রাশনের আমার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সুধীমনও এই বাড়িতে এসেছিল। তখন অতো হইচই আনন্দের মধ্যে কারো সঙ্গেই কারো পরিচয়ের সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

দীপমোহন, উত্তরা এবং শিখা তিনজনেই সুধীমনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন। সুধীমনের কে কে আছেন, কোথায় সে চাকরি করছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। বাঙ্গালোরে আছে শুনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও আন্তরিক ভাবে জানতে চাইলেন, ওখানে কোথায় থাকা হয়—হোটেল না কোম্পানির ভাড়া করা বাড়িতে? খাওয়ার কী ব্যবস্থা? যেখানে থাকে সেখানে থেকে অফিস কতো দূরে? যাতায়াতের ব্যবস্থাই-বা কী? সুধীমন এখনও বিয়ে করেনি শুনে শিখা তো বলেই বসলো, ওটা তাহলে আর কবে করবেন? সে-কথায় উত্তর না-দিয়ে সুধীমন নীরবে হাসলো একটু। উত্তরা একেবারে মায়ের মতো সহজ সুরে বলে উঠলেন, এমন কিছু বয়স হয়নি তোমার। আজকাল তো বহু ছেলেই এই বয়সেই বিয়ে করছে।

সে-রকম ইচ্ছে আমার নেই।

ইচ্ছে না-থাকাটা মোটেই ভালো কথা নয়।

দীপমোহন বললেন, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো একা থাকা! তোমার যখন মা, বাবা, ভাই বোন কেউই নেই, একজনকে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে। তারপরেই সামান্য হেসে আরও যোগ করলেন, অনধিকার কিছু কথাবার্তা হয়তো বলে ফেললাম। কিছু মনে কোরো না। এতোদিন বাদে তোমাদের দেখা হয়েছে, তোমরাই কথা বলার সুযোগ পাচ্ছো না। আমরা চলি-- তোমরা গল্প-টল্প করো।

সুধীমন এক বোবা দৃষ্টিতে মৈত্রালীকে দেখছিল। মেয়েদের জীবনের অবলম্বন এবং নিরাপত্তার প্রধান পুরুষটিই ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সাত-আট বছর আগের পাগল করা সেই শোক বাইরে থেকে এখন অনেক স্তিমিত— কিন্তু অন্তরে সে প্রতিনিয়তই একজনকে বুঝি খুঁজে বেড়ায়। মৈত্রালীর ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে আগের সেই ধার নেই। চেহারাটা একটু ভেঙেছে আর বয়সটাও মনে হয় অনেক বেড়ে গেছে। এই মুহূর্তে ওর পরনে সাদা রংয়ের ব্লাউজ আর ঘিয়ে রংয়ের শাড়ি। সাধারণ একটা খোঁপায় চুলগুলো জড়াজড়ি করে কাঁধের উপর পড়ে আছে। কানে কিছুই নেই তবে গলায় সরু চেনের একটা হার। হাতে দু'গাছা করে চুড়ি।

সুধীমন প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল শুভময়ের প্রসঙ্গে একটা কথাও সে মৈত্রালীকে জিজ্ঞেস করবে না। অন্যান্য আলোচনা করে ওকে একটু হাসিয়ে মাতিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভরিয়ে তুলবে। সুধীমন পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কতো দিন বাদে দেখা হলো বলতো?

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে মৈত্রালী স্নিগ্ধ হেসে বললো, কী যে ভালো লাগছে সুধীমন তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। কলেজের বন্ধুদের দেখলে মনটা ভারী উদাস উদাস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এক ধরনের তৃপ্তিতে খুশিও হয়ে ওঠে। বনানী কানাডা থেকে কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করে। সুচেতাকে তখন ফোন করে দিই। তিনজনে মিলে তখন যা করি না—কথাগুলো বলেই মৈত্রালী একটু থামলো। সুধীমনের মুখের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, তুমি আর কতোদিন কলকাতায় আছো?

কালকেই তো চলে যাচ্ছি।

এসেছো কবে?

দিন চারেক হলো কোম্পানির কাজে এখানে এসেছি।

তবুও তো তুমি এলে---অনিন্দিতা জয়পুরে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। মৈত্রালী বিষণ্ণ গলায় বললো, হয়তো সময় করে উঠতে পারেনি।

তোমার বাড়িতে আসার ব্যাপারে সুচেতার কৃতিত্বই বেশি।

তাই নাকি?

তাছাড়া আর কী বলো---প্রথমত ন'বছর বাদে এই প্রথম এলাম কলকাতায়। কোম্পানির কাজ সেরে তিন-চার দিনের মধ্যেই আবার বাঙ্গালোরে ফিরে যাবো। এই প্রোগ্রামের মধ্যে কারো সঙ্গে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। কেন-না বন্ধু-বান্ধব কে কোথায় আছে আমি জানি না। তবে তোমার ঠিকানাটা না-জানলেও বাড়িটা মোটামুটি চিনতাম। যাই হোক সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিল সুচেতা।

এবারে সুচেতাই মুখ খুললো। মৈত্রালীর ডান হাতটা চেপে ধরে বলতে লাগলো, কী হয়েছিল জানিস? দেবু তো আজ অফিসের কাজে ত্রিবান্দ্রম চলে গেল। ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথেই সুধীমনের সঙ্গে দেখা। যাকে প্রায় এক যুগ দেখি না, সেই ছেলেটা বাস-স্টপেজে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। অবাক লাগে কিনা বল? সুধীমন তো কিছুতেই আমার গাড়িতে উঠবে না বাড়িতেও আসবে না। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করার পরেই ও স্বাভাবিক হলো। তারপরে আমরা দুজনে অনেক অনেক গল্প করলাম। নিজেদের কথা, বন্ধুদের কথা। তখনি

তোর কথা উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে সুধীমন বললো, 'মৈত্রালীকে কতোদিন দেখি না। ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

কৃতজ্ঞতায় মৈত্রালীর দুই চোখে কিছুটা জল ভরে উঠেছিল। সযত্নে সেটাকে লুকিয়ে সে আবেগের সুরে বললো, সুধীমনের মতো ছেলে হয় না। ও সেই আগের মতোই আছে।

তুমিও পাল্টাওনি!

কী করে বুঝলে?

বন্ধুদের জন্য এখনও তোমার চোখে জল আসে! আমাদের যেটা অনেক কাল আগেই শুকিয়ে গেছে।

ওটা এমন কিছু নয়। অনেকদিন বাদে দেখা হলো তো—মৈত্রালী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সুচেতার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, তোরা একটু বোস—চায়ের ব্যবস্থাটা করে আসি।

তোর ওঠার দরকার নেই। চায়ের সরঞ্জাম এবং খাবার-দাবার ইত্যাদি বড়ো ট্রে-তে সাজিয়ে-গুছিয়ে শিখা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। এক মুখ হাসি নিয়ে ওটা টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে বললো, আমার ওপরে এ-ব্যাপারে একটু আস্থা রাখতে পারিস। কথাটা শেষ করেই সে বাটার টোস্ট এবং মিষ্টির প্লেটটা সুচেতা আর সুধীমনের সামনে এগিয়ে দিল। অত্যন্ত স্নেহের সুরে এই প্রথম সম্বোধনের দূরত্বটাকে কমিয়ে আনলো, এটুকু খেয়ে নাও ভাই। সুচেতা তুমিও আরম্ভ করে দাও—

মৈত্রালী শিখার মুখের দিকে চেয়ে পরিপূর্ণ এক হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দিদিভাই বাড়িতে ডিম আছে?

কেন রে?

সুধীমন না ডিম খেতে দারুণ ভালোবাসে।

ওমা সেটা আগে বলবি তো—শিখা প্রসন্ন এক দৃষ্টিতে সুধীমনকে একটু দেখে নিয়ে আরও বেশি হাসি মেখে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ ডিম রয়েছে। কী খাবে তুমি? ডিমের পোচ না ওমলেট?

সুধীমন খুবই লজ্জা পেল। সে শিখা, সুচেতা আর মৈত্রালীর মুখের দিকে একবার চেয়ে মাথা নিচু করে নীরবে হাসতে লাগলো। কোনওরকমে শুধু বললো, আপনাকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না। তাহলেই আমি খুব অস্বস্তিতে পড়বো।

ডিমের নামে অস্বস্তি! সুচেতা মুখ টিপে হাসলো।

মৈত্রালী খুশির গলায় বললো, একবার কী হয়েছে জানো দিদিভাই? ডিমের ওপরে সুধীমনের দুর্বলতার কথা আমাদের সারা যাদবপুরে চাউর হয়ে গেছে। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা পর্যন্ত বলতে শুরু করে দিয়েছে, 'সুধীমনদা ডিম খাবেন।' এই যখন অবস্থা তখন একদিন চিপ ক্যান্টিনের ছেলেটা কোথা থেকে চারটে বেশ বড়ো বড়ো সাইজের ডিম নিয়ে হাজির হলো। সুধীমন যেন ওরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। হুমড়ি খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় পেলি রে? এতো বড়ো ডিম জীবনেও দেখিনি।

ওই রেল লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল।

দেবু টিপ্পনী কেটে বলেছিল, মনে হচ্ছে রবের কোনও হাঁসের ডিম।

আমি, সুচেতা, বনানী আর অনিন্দিতা চারজনে কিন্তু প্রথম থেকেই একটা কথা বারবার বলছিলাম, প্লিজ সুধীমন এইগুলো খেয়োনা। কীসের-না-কীসের ডিম। না-জেনে-শুনে খাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু দিদিভাই, কে শোনে কার কথা? অতো বড়ো ডিম দেখে সুধীমন ঠিক থাকতে পারে? আধ মণ ওজনের একটা ওমলেট করে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে উঠলো। ওটা কীসের ডিম ছিল জানো দিদিভাই? শকুনের—

সে-কী! শিখা প্রায় আঁতকে উঠলো।

তবে আর বলছি কী দিদিভাই—

পরে সুধীমনের কিছু হয়নি?

কিচ্ছু না।

সেই থেকেই তো শকুনের ডিম সুধীমনের এতো প্রিয়। সুচেতা কথাটা বলেই প্রচন্ড জোরে হেসে উঠলো।

সুধীমন বললো, তোমাদের যাব যা খুশি এই বেলা বলে নাও। নেহাত ডিমটা একটু—

একটু!

না-হয় বেশিই পছন্দ করি—সুধীমন হেসে ফেলতেই শিখাও একরাশ হাসি ছড়িয়ে বললো, তাহলে ডিমের ওমলেট করে আনতেই হয় কী বলো?

দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে-আটটা বাজাব একটা মধুর ঝঙ্কাব উঠলো। সুদীপ্ত তখনও বন্ধুব বাড়ি থেকে ফিরে আসেনি। অথচ সুধীমন অপেক্ষা করে আছে ওরই জন্যে। যার অন্নপ্রাশনে এতো খাওয়া-দাওয়া কবলো, তাকে একবার দেখে যাবে না? সবচেয়ে বড়ো কথা সুদীপ্ত মৈত্রালীর ভবিষ্যৎ। দেখা না-কবে চলে যেতেও মন চাইছে না।

ইতিমধ্যে শিখার স্বামী মুকুল অফিস থেকে ফিরেছেন। অফিসের জামা-প্যান্ট না-ছেড়ে এবং বিশ্রাম টিশ্রাম না-নিয়েই তিনি বেশ কিছুক্ষণ সুধীমনের সঙ্গে গল্প করলেন। কথায় কথায় সুধীমন একবার বলতে যাচ্ছিলো, সুদীপ্তর অন্নপ্রাশনেব সময শুভময আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে নেই তার কথা তুলে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। যতো বছরই পার হয়ে যাক না কেন, প্রিয়জনকে হাবানোর ব্যথা সব সময়েই মনে লাগে। সুধীমন শুধু বললো, সুদীপ্তর অন্নপ্রাশনের সময আমরা একবার এসেছিলাম। তখন আপনাব সঙ্গে এক মুহূর্তেব আলাপ হযেছিল।

অনেক বছর আগেব কথা তো ....

হ্যাঁ। তা প্রায পনেরো-ষোলো বছর হতে চললো—

ওই সময়ে ঘরে এসে ঢুকলো একটি কিশোব। ঠিক রোগা নয তবে পাতলা চেহারা। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের ছেলেটির চোখ দুটো বড়ো গভীর আর মাযাবী। টান টান নাকের ওপর কপালটা বেশ ছোট্ট। মাথা ভর্তি মিশমিশে কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সাবা মুখেই একটা সরলতাব ছাপ। সে আস্তে আস্তে মৈত্রালীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নিচু গলায় বললো, মা, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল—বাসে খুব ভীড় ছিল। উঠতে পারছিলাম না। তাই হেঁটেই চলে এলাম।

সুচেতা জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে হেঁটে এসেছো?

টালিগঞ্জ রেল ব্রীজ থেকে। সুদীপ্ত হেসে দিল।

মৈত্রালী ছেলের দিকে সস্নেহে তাকালো। সুধীমনকে দেখিয়ে শান্ত গলায বললো, ইনি তোব একজন মামা হন। ব্যস—সুদীপ্তকে আর কিছু বলতে হলো না। সে সঙ্গে সঙ্গে সুধীমনেব কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর পায়ে হাত দিযে প্রণাম করলো। শুধু তাই নয়—ঘরের উপস্থিত বড়োদেরও সে প্রণাম করতে ভুললো না।

সুধীমন ওকে কাছে ডেকে নিজের পাশে বসালো। শুভময়ের মুখটা কী ভেসে উঠছে? সুদীপ্তর মুখেব দিকে অনেক মমতা নিযে তাকিয়ে রইলো সুধীমন। সামান্য হেসে একসময় বললো, জানো, তোমার অন্নপ্রাশনের সময় একবার এসেছিলাম—আর এই এলাম! এরমধ্যেই এতো কান্ড হয়ে গেল, তুমি হামাগুড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জ বেল ব্রীজ থেকে হেঁটে এলে। মাধ্যমিকে ফোর্থ হলে! কথাটা শুনে বেশ লজ্জা পেল সুদীপ্ত। লাজুক সেই হাসি নিয়েই সে সুধীমনকে একবার দেখে মায়ের দিকে তাকালো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুধীমন আরও বেশি সহজ সুরে বলে উঠলো, না-না এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? যার যতোটুকু প্রসংশা পাওয়া উচিত তাকে সেটুকু তো দিতেই হয়? মাধ্যমিকে ফোর্থ হওয়াটা মোটেই সহজ ব্যাপাব নয়। তবে এখানেই থেমে থাকলে কিন্তু চলবে না—পরের পরীক্ষাগুলোতে আরও ভালো রেজাল্ট তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?

আমি চেষ্টা করবো। সুদীপ্ত ছোট্ট সুরে বললেও বলার মধ্যে গভীর এক প্রত্যয় এমন ভাবে মিশেছিল, মনে হলো ওই চেষ্টাটা শুধু কথার কথা নয়—ইচ্ছে কবলে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ

দিতে পাবে।

চেষ্টা করলে হয় না বলে কোনও কথা নেই। তুমি নিশ্চয়ই পারবে একটু থেকে সুধীমন আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার টোটাল কতো ছিল?

আটশো সতাত্তর।

তোমাদের হাজারে পরীক্ষা তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুধীমন সুচেতা এবং মৈত্রালীর মুখেব দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। বললো, এই নম্বর পেয়ে ফোর্থ ভাবা যায়! মনে হচ্ছে এটাই ফার্স্ট বয়ের মার্কস।

সুদীপ্ত শান্ত গলায় উত্তর দিল, যে ফার্স্ট হয়েছে সে পেয়েছে আটশো নব্বুই।

বলো কী? পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক পাওয়া খুবই টাফ ব্যাপার—সুধীমন হাসতে হাসতে আরও জানতে চাইলো, তা তোমরা এই নম্ববটাকে আব কতো উপরে নিয়ে যেতে পাববে বলে আশা করছো?

ন'শোর কাছাকাছি থাকতে চাই। তবে কতো দূর কী করবো সেটা প্রশ্নপত্রের ওপর নির্ভর করছে। সেই সঙ্গে উত্তর লেখাব ব্যাপাবটা তো আছেই।

সুধীমন পেনের সুদৃশ্য বাক্সটা সুদীপ্তর হাতে তুলে দিয়ে হইহই কবে বলে উঠলো, কী আশ্চর্য বলো দেখি, তোমার জিনিসটা তোমাকেই দেওয়া হচ্ছিলো না—এমনি ভাবে গল্প করতে থাকলে এটা সম্ভবত আমার পকেটেই থেকে যেতো। তাবপবেই সুদীপ্তব মাথায গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে বললো, আমি এখন উঠবো সুদীপ্ত। অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেলাম তোমাদেব বাড়িতে—সত্যি খুব ভালো লাগলো! সুধীমন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সুদীপ্ত আবাব একবাব প্রণাম কবলো।

মৈত্রালী, সুধীমন এবং সুদীপ্তেব দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। উষ্ণ গলায ছেলেকে বললো, দীপ তোব এই মামাটাও লেখাপড়ায দারুণ ছিল। সেই কাবণেই ওর এতো আগ্রহ! আমবা যাদবপুবে যখন ভর্তি হই, সেই ব্যাচে একমাত্র সুধীমনই ছিল র‍্যাঙ্ক পাওয়া স্টুডেন্ট। ও স্কুলফাইনালে সেকেন্ড হয়েছিল। আর এম. এ. পরীক্ষায আমাদেব সবাইকে হারিয়ে দিয়ে একেবারে ফার্স্ট।

সুদীপ্ত মায়ের কথাগুলো শোনার পব সুধীমনের মুখেব দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। অনেক লজ্জার মধ্যে সে যেন পড়ে গেল। বেশ খানিকটা সঙ্কোচের সঙ্গেই বললো, এই পেন দুটো এখন আপনাকেই দেওয়া উচিত! আমার রেকর্ডকে আপনি ম্লান করে দিয়েছেন।

এটা বলা ঠিক নয়।

কেন?

আমার পরীক্ষা শেষ। তোমার সবে শুরু—কে বলতে পারে তুমি আমার চেয়েও ভালো রেকর্ড করতে পাববে না? সুতরাং ওই দুটো তোমার। তবে তুমি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যা-বললে সেই হিসেবে আমিও একটা পুরস্কার পেয়ে গেছি। তোমার মায়ের কাছ থেকে আমিও একটা কলম পেয়েছিলাম।

সুচেতা চালকেব আসনে প্রথমেই উঠে বসেছিল। এবাবে সুধীমন ওর পাশে গিয়ে বসলো। তখনও গাড়ির গা ঘেঁষে শিখা, মৈত্রালী আর সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে। মৈত্রালী বললো, সুধীমন আবার এসো!

কলকাতায় এলে নিশ্চয়ই আসবো।

তোমার আসা তো সেই পনেরো বছব বাদে—

সুধীমন সামান্য একটু হেসে বললো, আগামী মাসেও তো আসতে পারি!

তাহলে তাড়াতাড়িই দেখা হবে। সুদীপ্ত কথাটা বলতেই সুধীমন প্রশান্ত হেসে ওর প্রশংসা করলো, দারুণ বলেছো তো! পরে শিখাকে বললো, দিদি চলি তাহলে—

এসো ভাই! তোমার কথাই তোমাকে বলছি—কলকাতায় এলে অবশ্যই এসো!

সুচেতার হাত দুটো স্টীয়ারিং স্পর্শ করতেই গাড়িটা গতি নিয়ে এসপ্ল্যানেডেব দিকে এগিয়ে গেল তিনজন নীরব সাক্ষীকে পেছনে ফেলে রেখে! মৈত্রালীর হঠাৎ মনে পড়লো কলেজে পড়ার সময় সুধীমন একবার তার কাছে দুঃখ কবে বলেছিল, 'মা-বাবা, ভাই-বোন আমার কেউ নেই।

সব কষ্টই তো মানিয়ে নিয়েছি—তবে ভাইফোঁটার দিনে মনটা খুবই খারাপ লাগে।' সুধীমন কী তার কাছে ফোঁটা চেয়েছিল? জলভাবে চোখ নামিয়ে নিল মৈত্রালী। ব্যাপারটা নিয়ে সে নতুন করে ভাবতে লাগলো। অস্ফুট সুরে শিখাকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলো, দিদি, ভাইফোঁটা করে যেন?

সে তো অনেক দেরি।

তাই বুঝি! মৈত্রালীর শূন্য দৃষ্টিটা অসীম-শূন্যে মিলিয়ে গেল। এতোদিন সে একটা ভুল করে আসছিল, এবারে সেটার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

সুধীমনকে হোটেলে ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসতেই সুচেতার নজরে পড়লো তার ঘরের বেড-সাইড টেবিলের ওপর সিগারেট প্যাকেট আর একটা লাইটার পড়ে আছে। সুচেতা প্যাকেটটা খুলে একবার দেখলো। খুব বেশি খরচ হয়নি। যাওয়ার সময়ে সুধীমন ও-গুলো নিতে ভুলে গেছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়—তবুও কেমন যেন এক ধরনের কষ্ট অনুভব করলো সুচেতা। ওর মনে হতে লাগলো, সুধীমন না-জানি কতো দূরে চলে গেছে। তার হয়তো কখনও ওর সঙ্গে দেখা হবে না। অথচ যে-জিনিসটা ফেলে গেল তার ওপরেই মায়া জন্মাতে শুরু করে দিয়েছে। সুধীমনের স্পর্শ নিয়ে সিগারেট আর লাইটারটা নিতান্ত অনাদরেই যেন পড়ে আছে। পরম যত্নে সুচেতা ও-দুটো আলমারীতে তুলে রাখলো। সুধীমনকে সী-অফ্ করতে তো স্টেশনে যাবেই—তখনি ওকে দিয়ে দেবে। হঠাৎ কী মনে করে সে পায়ে পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ফোন করাটা কী ঠিক হবে? একটু আগেই তো ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এতো তাড়াতাড়ি ফোন করার মধ্যে কী কোনও ব্যাকুলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে না? সিগারেটের প্যাকেট-ট্যাকেট তো একটা উপলক্ষ মাত্র! না, বাইরের ওই ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে সুচেতা বিশেষ মাথা ঘামালো না। ফোনটা করবে সে সুধীমনকে। নিরুচ্চার এক টান থাকা সত্ত্বেও যার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভোরের শিউলী ফুলের স্নিগ্ধ পবিত্র ভাবের চেয়েও অনেক বেশি।

সারা রাত ঘুম এলো না সুচেতার। অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু চোখের পাতা দুটো কিছুতেই এক হলো না। ভেতরের অস্থিরতা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। শুধু শুধু বিছানায় পড়ে থেকে কী লাভ? সুচেতা বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে কানের দু'পাশে এবং ঘাড়ে জল দিয়ে এলো। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। সুচেতা পরপর দু'গ্লাস জল খেয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার মুখোমুখি বসলো। নিজের অজান্তেই চোখ দুটো চলে গেল সুনীতার ফ্ল্যাটে। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে দেবু ওকে নিয়ে যে-কোনও দিন আলাদা হয়ে যেতে পারে। অস্বীকার করার উপায় নেই সুনীতার জন্যে দেবু সব কিছু ছাড়তে পারে। সুধীমন অবশ্য বলেছে, এমনটা হবে না। দেবুকে ফিরিয়ে আনবেই। তার শান্তির জন্যে সুধীমন একটা-না-একটা ব্যবস্থা করবেই। কিন্তু কী করবে সে? জটিল এই সমস্যাটা সে কোন পথে সমাধান করবে? কোনও চিন্তাই এখন আর মাথায় ধরে রাখতে পারছে না সুচেতা! তার মনোভাবটা হয়ে গেছে যা হবার হোক। অতো চিন্তা-ভাবনা করে আর পারা যায় না। কাগজের নৌকোর মতো মনকে ছেড়ে দিল। যেখানে খুশি ভেসে বেড়াক অথবা ডুবে যাক কিচ্ছু যায় আসে না। সুচেতা তার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। ভাগ্য? সে যদি ঠিক থাকতো তার ভাগ্য কী আজ অন্যরকম হতে পারতো না? অবশ্য তখন কে-ই-বা জানতো দেবু এমন ভাবে পাল্টে যাবে? তবে এটা ঠিক, অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় সুচেতার রাগটা ছিল অনেক বেশি উগ্র। গাঢ় চিন্তা-ভাবনা না-করেই একেবারে ছেলেমানুষের মতো খেয়াল খুশীর রথে চড়ে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতো। পরবর্তী সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তার নেওয়া সেই সিদ্ধান্তগুলো তাকে বেশ ভালভাবেই ডুবিয়েছে, কাঁদিয়েছে। সুচেতা তবুও তার দাপটের খোলস ছেড়ে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। দেবুকে বিয়ে করাটাই কী তার সেই অস্থির মনের প্রতিচ্ছবি নয়?

এম. এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে যাবারও বেশ কয়েক মাস পরের ঘটনা এটা। সুচেতা রাঁচিতে

ওর সেজো কাকার বাড়িতে গিয়ে দিন পনেরো-কুড়ি থেকে আসবে। এমনিতে ঠিক ছিল ও একাই যাবে। কিন্তু যাবার দু-তিন দিন আগে সে হঠাৎ সুধীমনের কাছে এসে বায়না ধরলো, তুমি আমাকে রাঁচিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে চলো—

পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটাতে সুধীমনের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। অন্য সময়ে হলে সে ওই এক কথাতেই রাজি হয়ে যায়। কিন্তু সুচেতা যেদিনে রওনা দিতে বলেছে সেদিনই সুধীমনের একটা ইন্টারভ্যু রয়েছে। নামী-দামি কোম্পানি। সিলেক্ট হতে পারলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এটা ছেড়ে সে কী করে রাঁচি যায়? এই ধরনের বোকামি কেউ করে? সেই কথাই ওকে বুঝিয়ে বললো সুধীমন। আমি কেমন করে যাই বলো? ওই তারিখে আমার একটা ইন্টারভ্যু রয়েছে।

জাহান্নামে যাক তোমার ইন্টারভ্যু।

এটা কী ছেলেখেলা নাকি? চাকরি হবেই এই গ্যারান্টি যেমন নেই— তেমনি এতো বড়ো কোম্পানির ইন্টারভ্যুটা ছাড়াও ঠিক নয় সুচেতা। তাছাড়া চাকরিটা হলে সেটা তো তোমার আমার উপকারেও আসবে। কী আসবে না? সুধীমন খুশির আলো ছড়িয়ে অনেক কিছুই বোঝাতে চাইলো। কিন্তু সুচেতা বুঝলে তো—সে সুধীমনের কোনও কথাই শুনতে চাইলো না। তার স্পষ্ট নির্দেশ, আমি যখন বলেছি তোমাকে যেতেই হবে।

আমার সুবিধে-অসুবিধেটা তুমি তাহলে দেখবে না?

না।

এ-সব কথা আমি তবে কাকে গিয়ে বলবো?

আমি ও-সব জানি না।

এই খামখেয়ালীপনার কোনও মানে হয়—সুধীমন তখনও সুচেতাকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করলো, হয়তো এই চাকরিটাই আমাদের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত করবে। তুমি নিজেই যদি এতো অবুঝ হও তাহলে আমার মঙ্গল কামনা করতে অন্য কেউ তো এগিয়ে আসবে না।

তুমি যাচ্ছো না এই তো?

এতো কথা বলার পরেও তুমি যখন আমাকে বুঝতে চাইলে না—তখন 'না' করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। সুধীমনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো সুচেতা। প্রচন্ড রেগে আছে সে । আসলে সুধীমন তার মুখের ওপরে না-করে দিয়েছে—এটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ সুধীমন যে নিরুপায়, ওর যুক্তিগুলো যে একটাও মিথ্যে নয়—সুচেতা সেটাও মানবে না। তার অযৌক্তিক দাবিগুলোও সুধীমন নিরীহ ছেলের মতো শুনবে সুচেতা এতেই অভ্যস্ত। সেই ছেলে কিনা পরিষ্কার বলে দিল যাবে না। এরপরেও মাথা ঠিক থাকে? সুচেতা কাটা কাটা সুরে বললো তুমি একটা অকৃতজ্ঞ।

তুমি রেগে আছো, এখন তাই অনেক কথাই বলবে।

আমার রাগটা কী অন্যায়?

এতোক্ষণ হেসে হেসে কথা বললেও সুধীমন এবারে যথেষ্ট রেগে গেল। সুচেতার ওই কথা শুনে নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারলো না। সারা মুখে অসন্তোষের ছোঁয়া নিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললো, তুমি তো এম. এ পাশ করেছো। তোমার এই রাগ করাটা কতোখানি অন্যায় হচ্ছে নিজে বুঝতে পারছো না? আসলে তুমি কখনওই যুক্তি-তর্ক মানতে চাও না—এই ধরনের অবাস্তব জেদাজেদিতে খারাপ ছাড়া ভালো কিছুতেই হতে পারে না। তুমি যে এ-সব বোঝো না তা নয়, তবে কেন অপরকে এতো বিপন্ন করে তোলো? ইন্টারভ্যু না-দিয়ে তোমাকে রাঁচিতে পৌঁছে দেওয়া উচিত— রাঁচির পাগলেও বোধহয় এমন আব্দার করতো না। অস্বাভাবিক এই জেদের কাছে তোমার বিচার বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ো না সুচেতা। একটা সময় পর্যন্ত এ-সব জিনিস চলতে পারে। কিন্তু সব সময়েই যদি—

যথেষ্ট কথা শুনিয়েছো। এবারে তুমি থামতে পারো—সুচেতা তখন রীতিমতো ফুঁসছে। তার

চোখের সেই কোমল ভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। রুক্ষ এক দৃষ্টি ছড়িয়ে সে আবও বললো, তোমাকে এতো রিকোয়েস্ট কবাটাই আমাব ভুল হয়েছে। দেবুকে বললে সে একবারেই রাজি হয়ে যেতো।

তোমাকে রাঁচিতে পৌঁছে দেওযা দেবুর পক্ষেও সম্ভব নয়।

কেন?

ওরও সেদিন ইন্টারভ্যু রয়েছে।

দেবু ইন্টারভ্যু দেবে না।

দেবু কী সেটা তোমাকে জানিয়েছে?

জানাবাব প্রয়োজন নেই। সুচেতা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কঠিন সুরে বললো, তুমি দেখতে চাও?

তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবাব আমাব বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সুচেতা। তবে এটা ঠিক, তোমার মতো ভালো মেয়েও যেমন হয় না—তেমনি এতো অসুস্থ মেয়েও আমি জীবনে আর একটাও দেখলাম না।

ওদের কথাবার্তাব মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলো দেবু। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে। একপলকে সুধীমন এবং সুচেতার মুখ দেখেই বুঝতে পাবলো দ্বিতীয় ভিসুভিয়াস সৃষ্টি হতে চলেছে। কোনওরকম টুঁ শব্দটিও করা এখন ঠিক হবে না। অথচ একবার যখন এসে পড়েছে তখন বেরিয়েও যাওয়া যায় না। দেবু শিথিল পায়ে এগিয়ে গিয়ে সুধীমনেব বিছানাব ওপবে উঠে বসলো। হাতের কাছে একটা বই থাকলেও তাতে ডুবে থাকতে পাবতো—দেবু বাইরের দিকে তাকিয়ে নীরবতার প্রহর গুণতে লাগলো। ওই অবস্থাতেই কেটে গেল মিনিট পাঁচেক সময়। যদিও খুবই লাগছে তবুও দেবু মনে মনে ঠিক করে নিলো, প্রথমে সে কিছুতেই মুখ খুলবে না। ওদের দুজনের মধ্যে যে-ঝড় বইছে তার ব্যাপকতা কতোখানি তা সে জানে না। সুতবাং পরিস্থিতি না-জেনে, না-বুঝে দুম করে কোনও কথা বলে কারওরই বিরাগভাজন হতে চাইলো না দেবু। দেখতে যতোই খারাপ লাগুক, বোবার শত্রু নেই নীতিটা মেনে চলার ওপবেই ওর আস্থাটা এখন অনেক বেশি। মৌনতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো সুচেতা। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, দেবু তুমি আমাকে রাঁচি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে? প্রশ্নটা করেই সুচেতা ওঁর চোখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে রইলো। সে জানে, শত অসুবিধে হলেও দেবুর ক্ষমতা নেই না-করে। সুধীমনকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তার ওপরে দেবুর যে একটা দুর্বার টান রয়েছে সেটা না-বোঝার মতো মেয়ে সে নয়। ওর দুর্বলতা জানে বলেই সুচেতা অনেকটা আদেশ দেবার সুরেই ওই প্রশ্নটা রাখলো।

কবে যেতে হবে?

আঠারো তারিখে।

তারিখটা শুনেই দেবু সঙ্গে সঙ্গে সুধীমনের মুখের দিকে তাকালো। ওর অসহায় অবস্থাটা সুধীমন খুব ভালোই বুঝতে পারছে। কিন্তু বেশি ভাবার সুযোগ সে পেল না। তাকে অবাক করে দিয়ে দেবু অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল, যাবো।

সুধীমনের গলায় বিস্ময়ের সুর, তোর ইন্টারভ্যু রয়েছে না?

হ্যাঁ।

তাহলে?

ইন্টারভ্যু দেবো না।

পাগলামো করিস না দেবু—অতো বড়ো একটা কোম্পানির.........

আমার ভাবনাটা আমাকেই ভাবতে দে। অমন ইন্টারভ্যু আমি হাজারটা পাবো। কিন্তু সুচেতাকে মূল্য না-দিলে ও খুব কষ্ট পাবে।

সাম্রাজ্য জেতার দৃষ্টি নিয়ে সুচেতা সুধীমনের দিকে তাকালো। ব্যঙ্গের সুরে বললো, তুমি কিন্তু আমার বিরাট উপকার করলে সুধীমন। কাকে বিশ্বাস করতে হবে, কার ওপরে আস্থা রাখতে হবে

সেটা তুমি বেশ ভালোভাবেই প্রমাণ করে দিলে। ভবিষ্যতে যে আমাকে ঠকতে হবে না—সেটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে একটা ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। সুচেতা তড়িঘড়ি করে বিয়ে করলো দেবুকে। বন্ধুরা অনেক রকমভাবে বোঝালেও একমাত্র মৈত্রালীই সুচেতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। বলেছিল কাজটা ভালো করছিস না!

আমি অনেক ভেবে-চিন্তেই করছি।

সুধীমনকে এই আঘাত দেওয়াটা ভেবে-চিন্তে?

এটা ওর প্রয়োজন ছিল।

একটা জীবন নিয়ে তুই কিন্তু দারুণ ছেলে-খেলা করছিস।

সুধীমনকে ভালোবাসতাম, বিশ্বাস করতাম আমি—তুই কী আমার চেয়েও ওকে বেশি চিনিস? তোর যদি এতো মায়া তবে তুইই ওকে বিয়ে কর না!

ছিঃ সুচেতা ছিঃ! রাগলে তুই একটা যাচ্ছেতাই হয়ে যাস। তুই এখন বোঝার বাইরে চলে গেছিস—তোকে কোনও কথা বলাই বৃথা তবে একটা কথা আমি হাজারবার বলবো, তুই সুধীমনের যোগ্য নোস। ওর জন্যে তোকে কাঁদতে হবে। সারা জীবন তুই কাঁদবি—

সুচেতা কী এখন সেই কান্নাই কাঁদছে? সে ভুল করুক, যাই-ই করুক, দেবুকে নিয়েই তো সে সুখী হতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য তাকে আজ এ কোন ঘূর্ণিস্রোতের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? যে-ভালোবাসা আর বিশ্বাসের অহঙ্কারে সুধীমনকে ত্যাগ করে দেবুর ওপরে নির্ভর করেছিল—সেই ভালোবাসা, বিশ্বাস যে সুধীমনের আশ্রয়েই রয়েছে সেটা কী সুচেতা সেদিনই জানতো না? মা মাঝে মাঝে ঠিকই বলতেন, রাগলে সে চন্ডাল হয়ে যায়। সুচেতার জীবনের সামনে এখন পড়ে আছে শুধু হাহাকার আর শূন্যতা! এই নিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। এর চেয়ে কষ্টের আর কী আছে? সুচেতার চারপাশে এখন নীল সমুদ্রের বেয়াদপ উচ্ছ্বাস। ক্লান্ত শরীরটাকে টানছিল শুধু ওপারের সর্ব সুখের আশায়। কিন্তু বাইরের সবুজ অরণ্যটা যে ভেতরে ভেতরে খরায় পুড়ে যাচ্ছে সে-হিসেব তো কেউ রাখছে না। সুচেতা কতো সহ্য করবে? সে তো আর পারছে না। এক এক সময় ইচ্ছে হয় একা ঘরে বসে হাউ হাউ করে কাঁদে। ব্যথা-জ্বালা যন্ত্রণা তাতে এতোটুকু কমবে না। কিন্তু কিছুটা সময়ের জন্য অন্তত মনটা একটু হালকা হবে। উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটতে কাটতে সুচেতা খুবই ক্লান্ত। সে শুধু একটু নিঃশ্বাস নিতে চায়।

খোলা জানলা দিয়ে চমৎকার ঠান্ডা বাতাস এসে সুচেতাকে বারবার ছুঁয়ে যেতে লাগলো। এখনও তার ঘুম এলো না। রাত প্রায় শেষ হতে চললো আর কখন ঘুম আসবে? দু'পাশের গাছের ঘন ছায়ায় রাস্তার আলোগুলো কাঁপছে। মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ি তীব্র গতি নিয়ে ছোটাছুটি করলেও রাস্তাটা এই মুহূর্তে বড়বেশি নির্জন। জীবনের কোলাহল সেখানে স্তব্ধ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুচেতার চোখ দুটো আবার চলে গেল সুনীতার ফ্ল্যাটে। এতোক্ষণ সে নিজের চিন্তাতেই ছিল। তাই খেয়াল করেনি। সুনীতার ফ্ল্যাটটা অন্ধকার দেখে তার খুবই অবাক লাগলো। কেন-না সুনীতা যে-ঘরে শোয় অন্তত সেই ঘরটাতে অল্প আলোর ছোট্ট একটা বাল্‌ব জ্বললেও জ্বলে। অন্ধকার ঘরে সে ঘুমোতেই পারে না—তবে লোডশেডিং থাকলে আলাদা কথা। সুনীতার ওই অভ্যেসের গল্প সে এর আগে বহুবার শুনেছে এবং এতোদিন ধরে দেখেও আসছে। তবে কী ও আজ বাড়িতে নেই? সুচেতার একটা আশঙ্কা হলো। সকালের ফ্লাইটে দেবু যদিও একাই ত্রিবান্দ্রমে গেছে—পরে হয়তো সুনীতার যাবার ব্যবস্থা করে গেছে। ওদের মধ্যে আগে থেকে কী কী কথা হয়ে রয়েছে তা সে কেমন করে জানবে?

সুনীতা কিন্তু ত্রিবান্দ্রমে যায়নি। যায়নি অন্য কোথাও। সে এই কলকাতাতেই রয়েছে। এখন তো রাত শেষ হয়ে আসছে। আর একটু পরেই হয়তো সূর্য লালজামা পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

খুব অবাক লাগলেও সুনীতা এই মুহূর্তে রীজ হোটেলে সুধীমনের ঘরে শুয়ে আছে। একটা আরাম কেদারায় বসে একের-পর-এক সিগারেট খেয়ে চলেছে সুধীমন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুনীতা ওকেই দেখছে আর হাসছে। হ্যাঁ, সুচেতার মতো ওরাও সারা রাত ঘুমোয়নি। ঘুমাতে পারেনি। ওদের সামনে এখন নতুন চিন্তা। নতুন ভাবনা। সেই পরিকল্পনাতেই ওরা বিভোর।

ব্যাপারটা ঘটেছিল মৈত্রালীদের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পরেই। সুচেতা তাকে এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে দেওয়ার পরেও সুধীমন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সামনেই মাথা উঁচু করে আকাশের তারা দেখছিল রীজ হোটেলটা, আর হোটেলে না-ঢুকে রূপসী কলকাতাকে দেখছিল সুধীমন। কলকাতাকে যে যতোই অপবাদ দিক, গালমন্দ করুক—কলকাতার আকর্ষণই আলাদা। এতোদিন বাদে এসেও সুধীমন সেটাই লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করলো তার পাশে যে-মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে সে আর কেউ নয়—সুনীতা! তার দেহের সুবাসে এবং চমৎকার সাজসজ্জায় তাকে বেশ অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সুধীমনের সারা মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠলো। পা চালিয়ে হোটেলে ঢুকবে কিনা সেটাই সে ভাবছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুতের একঝলক আলো খেলে যেতেই মুহূর্ত আগের মনোভাব পাল্টে ফেললো। সুধীমন বেশ সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, আপনি!

হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে সুনীতা কোমল গলায় উত্তর দিল, টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনলাম। বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সুচেতা আপনাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আর আপনি দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রাম থেকে আসা এক ছেলের মতো কলকাতা শহরকে দেখছেন। কথাটা শেষ করেই সে ছোট্ট শব্দের আশ্চর্য এক ছন্দ তুলে সমানে হাসতে লাগলো। ওর দুই গালে এখন স্থায়ী দুটো টোল। হাসি না-থামা পর্যন্ত ওই টোল দুটো অপরের চোখে, স্বপ্নের কাজল এঁকে চলবে। হাসলে একজন মানুষকে এতো সুন্দর দেখায়! এতো আকর্ষণীয় লাগে?

সুধীমন মিনিট দুয়েক কোনও কথাই বললো না। সুনীতার চোখে চোখ রেখে সে শুধু ওকে নতুন ভাবে জরীপ করতে লাগলো। তার সেই দৃষ্টিতে রয়েছে একঝাঁক বিস্ময় আর বিস্ময়! এই সুনীতা কী আজকে সকালে দেখা সেই সুনীতা? এই সুনীতাই কী সুচেতার শান্তির ঘুম কেড়ে নিয়েছে? মোহনীয় এক হাসির ঢেউয়ে সুধীমন যেন অসহায় ভাবে ভাসতে লাগলো।

সুনীতা চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করলো, একজন মহিলার সঙ্গে কথা না-বলে তার দিকে শুধু এমনি ভাবে তাকিয়েই থাকবেন?

একটু লজ্জিত হলো সুধীমন। লজ্জা ঢাকতে তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, গ্রাম থেকে এসেছি তো!

দারুণ রিটার্ন দিয়েছেন আমাকে—আমি কিন্তু খুশি। হাসির মুক্তো ছড়িয়ে সুনীতা আরও বললো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই ভাবে গল্প করবেন? আশে-পাশের লোকেরা ভীষণ চুরি করে দেখছে। বরং চলুন কোথাও বসে একটু চা খেয়ে নিই।

আমি রীজ হোটেলে উঠেছি। আমার ওখানে যাবেন?

আপনি নিয়ে গেলে আপত্তির কী আছে—তবে ও-সব হোটেল-টোটেলে গেলে আমার আবার চায়ের নেশাটা থাকে না। তখন একটু ড্রিঙ্ক করতেই হয়।

একটু কেন? আপনি না-হয় বেশিই করবেন।

সামলাতে পারবেন তো? চাপা হেসে সুনীতা বলতে লাগলো, আমি আপনার ঘর-দোর, বিছানা-পত্র, জামা-কাপড় সব কিছু নোংরা করে দিতে পারি।

আমি নিজে হাতে সেই সব পরিষ্কার করবো।

আপনি পারবেন?

পারবো বলেই তো বলছি।

আপনি আমার মনটাকে একটু পরিষ্কার করে দেবেন—আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমি কিন্তু

ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন ছ'মাস পর্যন্ত টাচও করিনি। কিন্তু দেবুটা কিছুতেই ছাড়লো না—সেবারে আলমোড়া বেড়াতে নিয়ে গিয়ে জোর করে খাইয়ে দিল। আমি আবার আগের মতো অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। সবচেয়ে কষ্টটা কী জানেন—শুনে আপনি হাসবেন না তো?

আপনি বলুন—

ড্রিঙ্ক করতে আমার এখন খুব খারাপ লাগে, বিচ্ছিরি লাগে। অথচ আমি না-খেয়ে পারি না—তাই বলছিলাম, আপনি আমার মনটাকে পরিষ্কার করে দিতে পারবেন?

ওটা তো আরও সহজ। তারপরেই সুধীমন নিচু সুরে অনেক বেশি মজা করলো, আমাদের চারপাশের লোকেরা কিন্তু এখন আর কেউ চুরিতে সন্তুষ্ট নয়—রীতিমতো ডাকাতি করছে। আসুন—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়া যাক।

রীজ হোটেলের সাতাশ নম্বর ঘরের নিচু হাইটের খাটের ওপরে যে-নরম বিছানা পাতা রয়েছে সুনীতা সেখানে খুব আরাম করে বসে আছে। সে সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করেছে। সুধীমন অবশ্য হাসতে হাসতে একবার বলেছিল, লজ্জা করে কম খেলেন তো?

লজ্জা! ওটা আমার একটু কমই আছে। তবে আপনি খেলে আমি আর একটু চেষ্টা করতাম।

দুঃখিত! আমি ড্রিঙ্ক করি না।

কোনোদিনও খাননি?

এখন পর্যন্ত স্পর্শও করিনি—

কী করে পারেন বলুন তো? আপনার এই মনটাকে আমার ভেতরে বসিয়ে দিন না—আমিও তাহলে আপনার মতো হয়ে উঠতে পারি।

গল্পে গল্পে রাত বাড়ছিল। তবে ঘড়ির দিকে কারোরই নজর ছিল না। সুধীমন প্রথম থেকেই পরিষ্কার একটা বোঝাপড়ায় আসতে আগ্রহী বলে কোনও কথাই লুকোয়নি। একেবারে সহজ-সরল ভাবে খোলামেলা কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে দেবু এবং সুচেতার সঙ্গে তার সম্পর্কের ছবিটা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছে। কী বলেনি সে? যাদবপুরে কয়েকটা বছর একসঙ্গে পড়াশুনা করা, সুচেতাকে গভীর ভাবে ভালোবাসা, সুচেতার কাছে হাজারবার বকুনি খাওয়া কিছুই বাদ দেয়নি। কলেজ জীবনে দেবু তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিল। দেবু খুব ভালো করেই জানতো আর দু'দিন বাদেই সে সুচেতাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে—অথচ ও নিজেই কিনা ওকে বিয়ে করে বসলো। সুধীমন ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, আমি কাউকেই দোষ দিই না। তবে একটা কথা কী জানেন—জেনে-শুনে দেবু এটা কী করে করতে পারলো? বিশেষ করে আমার সঙ্গেই? বিশ্বাস করুন আমি হলে কিছুতেই পারতাম না। আমার বন্ধু কষ্ট পাবে এই দুঃখটাই আমাকে ডুবিয়ে দিতো। সুধীমন এটাও গল্প করলো তারপরেই সে পশ্চিম জার্মানিতে চলে যায়। ফিরে এসেই বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এরোনেটিক্সের এক্সিকিউটিভের এই চাকরি। শুধু তাই নয়, এতো বছর পর এই প্রথম সে কলকাতায় এলো। না, এরমধ্যে আর বিয়ে করার কথাটা একবারও মনে হয়নি। সুনীতার চোখের দিকে চেয়ে সুধীমন একটু হাসলো। মা নেই, বাবা নেই—জোর করে আমাকে কে আর বিয়ে দিচ্ছে বলুন?

নিজেই তো করতে পারেন।

তা পারি। কিন্তু যে-সময়ের যা—বয়স হারিয়ে এখন আর—

আহা? এমন কিছু বয়স হয়নি আপনার।

আপনি যেন আমাকে জন্মাতে দেখেছেন মনে হচ্ছে। অনেক দিন বাদে সুধীমন প্রাণ খুলে হাসলো। হাসলে যে-মনটা এমন হালকা হয় জানা ছিল না। সুনীতাও তার মোহনীয় হাসির পেখম ছড়িয়ে ইশারার ভঙ্গিতে জানতে চাইলো, কতো হলো? ছত্রিশের বেশি নিশ্চয়ই নয়—

আমার এখন আটত্রিশ চলছে।

নেহাতই বাচ্চা! কথাটা বলেই সুনীতা ঢেউয়ের মতো ফুলতে থাকে। দুলুনি শরীরে ধরেছে

কাঁপন। ওর মসৃণ দুই গালের দিকে চেয়ে সুধীমনের মনে হলো ছোটবেলায় গুলি খেলার সময়ে ছোট ছোট গর্তের পিল বানাতো! হারিয়ে যাওয়া সেই পিল দুটোই বুঝি শৈশবের স্মৃতি থেকে আবার উঠে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে সুনীতার দুই গালে। সুধীমনকে একটু চিন্তিত দেখালো। সে আগের কথার উত্তর না-দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো। নিচু সুরে একসময় বললো, আপনাকে ঠিক লুকাইনি তবে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—

কী?

বিয়ের আগে সুচেতাকে নিয়ে আমি একবার হলং-এ—

জানি।

আমরা দুজনে এক ঘরে পুরো সাতটা দিন একসঙ্গে থেকেছি কিন্তু—

তাও জানি। দুই ঠোঁটের চাপা হাসিতে সুনীতা বললো, এটাও বুঝি আমাকে বলতে হয়? কোনও কথাই তো লুকাইনি। এটাই-বা লুকাবো কেন?

তবুও কিছু কথা থাকে যে-গুলো লুকাতেই হয়।

গোপন করার জন্য আপনি তো আমাকে খাবাপ ভাবতে পারেন।

সত্যি ভারী ছেলেমানুষ আপনি! সুনীতাও খোলামেলা বললো, আপনার সঙ্গে যতো আলাপ হচ্ছে ততোই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি! ভাবতে এখন আমার খুব অবাকই লাগছে, আপনাকে ছেড়ে সুচেতা কী করে দেবুকে বিয়ে করলো? আর যাই হোক সুচেতাকে নিশ্চয়ই কেউ বোকা বলবে না।

ওটা তো আমিও আপনাকে বলতে পারি।

কেমন করে?

আপনিও তো সেই দেবুর সঙ্গেই মিশছেন। দেবু বিবাহিত। ওর একটা মেয়ে রয়েছে। এ-সব জেনেও—

আমি জানতাম আপনি এই কথাগুলো তুলবেন। আজকে সারাটা দিন আমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছেন এবং মোটামুটি একটা ধারণাও নিশ্চয়ই করে নিয়েছেন। সুনীতা একটু ঝুঁকে এবং ভ্রূ দুটো কপালে তুলে অদ্ভুত এক ভঙ্গিমায় তাকালো! সুধীমনের বুকের ভেতরটা পর্যন্ত সে বুঝি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে! আশ্চর্য এক যাদুময় সুরে বলতে লাগলো, আপনি আমাকে যতোটা খারাপ ভাবছেন আমি কিন্তু ঠিক ততোটা নই। এটা আমার সাফাই গাওয়া নয়—কেন-না আপনি কি মনে করলেন-না-করলেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো। যা করার তাই-ই করবো। তবে কথাটা কী জানেন সুধীমনবাবু, আপনার সুচেতাও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি।

সুধীমন একটু হেসে বললো, সুচেতা আমার নয়—দেবুর!

ওই হলো! দারুণ মিষ্টি করে চোখ পাকালো সুনীতা। একদিন ও আমাকে যথেষ্ট অপমান করলো। আর সেই সঙ্গে গর্ব করে শোনালো, দেবুর মতো নাকি আদর্শ স্বামী হয় না। মিঃ মেহতা যেন ওর পা ধোয়া জল-টল ইত্যাদি খায়। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু ওই অপমান সইতে পারি না। সুচেতার গর্বকে তাই একটু ভাঙতে ইচ্ছে হলো। ওর আদর্শবান স্বামীটি এখন আমার কথা ছাড়া নিজের স্ত্রীর কাছেও ঘুমায় না।

পায়ে পায়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল সুধীমন। সামান্য ঝুঁকে সুনীতার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। গভীর এক দুশ্চিন্তার জট খুলে যাচ্ছে। কিন্তু তার হাতে মাত্র একটাই তীর। অনেক অনেক হিসেব করে তাকে সেই অব্যর্থ নিশানায় পৌঁছতে হবে। সুধীমন দেখলো এই সেই সময়। সুনীতা খাটের ওপরে গা ছেড়ে বসে আছে। পায়ের ওপর থেকে শাড়িটা একটু উঠে আসতে টানাটানি করে নিজেকে ঠিক মতো গুছিয়ে নেবার আগেই সুধীমন দু'হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে তুললো। চোখ না-সরিয়ে খুব স্পষ্ট করেই বললো, তুমি এক মিথ্যে খেলায় মেতে আছো সুনীতা। আর এতেই তোমার আনন্দ! সুচেতা তোমার হাতে এক নকল দেবতা তুলে দিয়েছে।

নকল!

নয়তো কী? আসল কোনটা তুমি জানো না?

অবাক বিস্ময়ে সুনীতা সুধীমনেব মুখের দিকে তাকিয়ে বইলো। স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। সুধীমন ওকে আরও ঘন করে টেনে নিয়ে অন্য এক জগতে পৌঁছে দিল। বললো, তুমি জিততে চাও না সুনীতা?

ভীষণ ভাবে জিততে চাই।

সেই সুযোগ তো তোমার কাছেই রয়েছে।

সুধীমনের বুকে মুখ গুঁজে সুনীতা আবেগের সঙ্গে কাঁপা কাঁপা সুরে বললো, সুধীমন তুমি আমাকে বিয়ে করবে? আমি আর এই মিথ্যে খেলার মধ্যে ডুবে থাকতে চাই না। আমি জানি সুচেতার গর্ব ভেঙে দিলেও ও আমাকে ঘৃণা করে। কিন্তু তুমি পাশে থাকলে সুচেতা সারা জীবন জ্বলবে।

সুধীমন ঠাট্টা করলো, তুমি তাহলে শুধু সুচেতাকে জ্বালাতেই বিয়েটা করবে, আমাকে ভালোবাসবে না?

তোমাকে? সুধীমনের কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সুনীতা গভীর সুরে উত্তর দিল, এক অপমান ছাড়া সুচেতার কাছ থেকে তুমি কিছুই পাওনি—আমার কাছ থেকে পাবে সেই মর্যাদা! আর ভালোবাসা! তবে ওই জিনিসটা বুঝি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলতে হয়? কথাটা শেষ করেই সুনীতা বিশেষ এক ইশাবায় নিজের মুখখানা তুলে ধরলো। প্রথম লজ্জাব বিহ্বল দৃষ্টি সুধীমনের। অসহায় হয়ে সে এদিক-ওদিক একবাব তাকালো। আবও বেশি লজ্জায় তার মাথাটা বুকের ওপর ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে। সব জড়তা কাটাতে স্নিগ্ধ হেসে সুধীমন বলে উঠলো, কালকে ভোরে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মাযের পাবমিশনটা আগে নিয়ে আসি—

দারুণ বীরপুরুষ তো তুমি? সুনীতার সারা মুখে কৌতুকের একঝলক হাসি। হাসি থামলে সে বেশ গভীর গলায় বললো, সুধীমন তোমার মতো একজন সৎ এবং আন্তরিক ছেলেকেই আমার একান্ত প্রয়োজন। যার ছায়ায় 'মানুষ' হবো আর—

আর কী?

আর কখনও নিজেকে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলবো না। আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সুধীমন! আমি তোমাব কাছে—সুনীতাব গলাটা আবেগে বুজে এলো। পূর্ণ নদীর জল ওর দুই গভীর চোখে। যে-কোনও মুহূর্তে বাঁধ ভাঙ্গতে পারে। সুধীমন নিজের রুমাল দিয়ে সুনীতাব চোখের জল মুছিয়ে কোমল সুরে বললো, এমন ভাবে কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনও ব্যাপার নেই সুনীতা আমরা সকলেই সাধারণ মানুষ। দোষ-ক্রটি কম-বেশি আমাদের সবার মধ্যেই বয়েছে। আমিও তোমার থেকে এমন কিছু মহৎ নই। তোমার এই যে উপলব্ধি এতেই তুমি শুদ্ধ হয়ে গেছো। শুধু আমার কাছে নয়—তোমার কাছেই তুমি বড়ো হয়ে গেলে!

অস্ফুট সুরে সুনীতার মুখ থেকে একটা কথাই বেরিয়ে এলো, সুধীমন, তোমাব সঙ্গে আমার আরও আগে কেন দেখা হলো না?

রাত বাড়তে থাকে, ওদের গল্পও চলতে লাগলো। কথা যেন আর শেষ হতেই চাইছে না। ইতিমধ্যে রাতের খাওয়াটা এক ফাঁকে খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু কী যে খেয়েছে আর কতোটুকুই-বা খেয়েছে দুজনের কেউই সেটা বলতে পারবে না। নিজেদের গল্পে নিজেরাই বিভোর হয়ে আছে। সুনীতা একবার বললো, দেবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথম দিকের দিনগুলোতে ও কিন্তু তোমার কথা বলতো।

তোমার কাছে দেবু আমার গল্প করতো সুধীমন ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। আশ্চর্য হয়ে তাই জিজ্ঞেস করলো, কী বলতো?

বলতো, সুধীমন আমাব বেস্ট ফ্রেন্ড। ওর মতো চমৎকার ছেলে সহজে দুটো পাওয়া যাবে

না। অথচ ওর সঙ্গেই আমি বেইমানি করলাম।

দেবুর এই অনুশোচনা তোমাকে দেখার পর থেকেই সম্ভবত শুরু হয়ে গেছে। এই কথাটা নিশ্চয়ই বলেছে, সুচেতাকে সুধীমনের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কী? বলেনি? সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধীমন সুনীতাকে দেখতে লাগলো। পরে আবার বললো দেবুর কথা ছেড়ে দাও সুনীতা— ও-সব কথা শুনে এখন আর আমার কী লাভ বলো? আমি তো সব কিছুই ভুলে আছি। ভুলে থাকতেও চাই।

সুধীমনের প্রতিটা কথা খুবই মন দিয়ে শুনলো সুনীতা। অনেকক্ষণ ধরেই সে উসখুস করছিল কিছু বলার জন্য। কিন্তু বলতে পারছিল না। সুধীমনের শেষ কথাটা শোনার পরেই সে বেশ খানিকটা সঙ্কোচ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে একটা কথা বলবো সুধীমন?

বলো—

ধরো এরপরে যখন সুচেতার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তোমার আবার কোনও অনুশোচনা আসবে না তো? আমার কিন্তু তখন কোথাও যাবার জায়গা থাকবে না। বারবার আমি অসহায় হতে পারবো না।

অহেতুক তুমি চিন্তা করছো। সুধীমন স্পষ্ট করেই বললো, যে মর্যাদা তোমাকে দেবো তেমনটা কোনও স্ত্রী তার স্বামীর কাছে পায়নি। আমি কখনও কোনও অবস্থাতেই মিথ্যে কথা বলি না সুনীতা। ভবিষ্যতে তুমি মিলিয়ে নিয়ো।

খাট থেকে নেমে পায়ে পায়ে সুধীমনের দিকে এগিয়ে গেল সুনীতা। এক দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুধীমন জানে না, তার ওই একটা কথায় একজন মানুষ কতোখানি 'বেঁচে' উঠতে পারে! এই বিশ্বাস খুঁজে পাওয়ার নামই বোধহয় আশ্রয়। নির্ভরতার সেই আশ্রয় পেয়েই সুনীতা সুধীমনকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে কাঁপতে লাগলো পরে ওর বুকে-মুখ লুকিয়ে চোখে জলে একাকার করে ফেললো।

সুধীমন ছোট্ট সুরে বললো, ছোটরাই কিন্তু এমনি করে কাঁদে।

আমি তাদের চেয়েও ছোট।

সুধীমন হাসতে হাসতে উত্তর দিল, সেটা না-হয় আমি বুঝলাম। কিন্তু পুরোহিত কী এতো ছোট্ট মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হবে? কথাটা শেষ করেই সে তাড়া লাগালো, নাও আর দেরি কোরো না— ভোর হয়ে আসছে। বিয়ে থেকে আরম্ভ করে ট্রেন ধরা পর্যন্ত প্রচুর কাজ। হাতে সময় বেশি নেই। সব কিছু গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও।

হ্যাঁ। আমাকে তো একবার বাড়িও যেতে হবে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমি কী একবার সুচেতার সঙ্গে দেখা করে আসবো?

কোনও দরকার নেই। এখন থেকে আর পেছনের দিকে তাকাবে না—অতীতের কথা ভাববে না। সামনের দিকে তাকিয়ে শুধু আগামী দিনের কথা চিন্তা করো।

গাড়ি ছাড়ার এক ঘণ্টা আগেই সুনীতাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেল সুধীমন। প্ল্যাটফরমে তখনও ট্রেন আসেনি। ভিড়টাও একটু কম। আসলে ট্রেনের যাত্রীরা এতো আগে থেকে স্টেশনে আসার প্রয়োজন মনে করেনি। তার চেয়ে বরং সেই সময়টুকু বাড়িতে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটাই অনেক বেশি আনন্দের। কলকাতায় সুধীমনের সে-টান নেই। যেতে যখন হবেই, হোটেল থেকে স্টেশনই ভালো।

সুনীতা ঠোঁট উল্টালো। ধমকের সুরে বললো, তোমার শুধু তাড়া আর তাড়া। হোটেল থেকে তো তাড়িয়ে আনলে, এখন এই এক ঘণ্টা কী ফেরিওয়ালাদের চিৎকার শুনবো?

তোমার ধমকটুকু কিন্তু দারুণ লাগলো। সামান্য হেসে সুধীমন উত্তর দিল, আসলে কী জানো,

আমি ইচ্ছে করেই হোটেল থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছি।

সুচেতার ভয়ে?

তা নয়।

তবে?

সুধীমন কী যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার আগেই চোখে পড়লো সুচেতা দ্রুত এদিকেই আসছে। আর এসেই ঝড় তুললো, কী ব্যাপার কী তোমার বলো তো? কালকে রাতে দু'বার ফোন করে তোমাকে পেলাম না। আজও তাই। খুব কম করেও আট থেকে ন'বার ফোন করেছি তোমার হোটেলে। প্রতিবারেই এক উত্তর, খুব সকালে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন জানি না। সারাদিন কোথায় ছিলে? আমি তো অনেক রকম ভেবেও কোন কূল-কিনারা—সুচেতা কথা হারিয়ে ফেললো। এতোক্ষণ সে শুধু সুধীমনকেই দেখছিল। একজন মহিলার উপস্থিতি যদিও অনুভব করতে পারছিল, কিন্তু সে যে সুনীতা হতে পারে মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তেমন ছিল না। সুচেতা বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সুনীতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সুধীমনকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার তাকালো সুনীতার দিকে। এমনিতেই ও দেখতে সুন্দরী। তবে আজকে যেন রূপের এক অলৌকিক দেবী বলে ওকে মনে হচ্ছে। পান পাতা গড়নের চমৎকার মুখ। নাকে ছোট্ট একটা হীরের নাকছাবি। সুনীতার ভরাট মুখের তুলনায় নাকছাবিটা যদিও ছোট কিন্তু ওটাই যেন ওকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। আর সিঁদুরের টিপটা? এক মাথা ঘন কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানের সিঁথিটা? হোলির আমেজ যেন ফিরে এসেছে সুনীতার সারা দেহে। কৃষ্ণচূড়ার রং মেখে সে একাই বসন্ত উৎসবকে আহ্বান জানাচ্ছে।

সুচেতার বিস্ময় ভরা দৃষ্টি দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করলো সুনীতা। সে ওকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। অদ্ভুত এক ঠান্ডা গলায় শুধু বললো, কী আশ্চর্য বলো দেখি সুচেতা? এবারেও আমি জিতে গেলাম।

তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না সুচেতার। সে নিরুত্তাপ গলায় বললো, তাই তো দেখলাম।

ইতিমধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে ঢুকলো। স্বভাবতই যাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো কার আগে কে উঠবে। অথচ প্রত্যেকেরই আসন সংরক্ষিত। সুনীতা এ. সি কোচের মধ্যে অদৃশ্য হতেই সুচেতা করুণ চোখে সুধীমনের দিকে তাকালো। অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করলো, এ তুমি কী করলে সুধীমন?

সুধীমন সে কথার কোনও উত্তর দিল না। কী উত্তর দেবে সে? কীই-বা দেবার আছে? সবই তো জানা ব্যাপার। বরং সুচেতাই তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারছে, কেন সে এটা করলো! তবুও সুচেতা তাকেও ও-কথা জিজ্ঞেস করতেই পারে। প্রত্যেক মানুষের বুকের মধ্যেই এক ধরনের কষ্ট লুকিয়ে থাকে। সেই কষ্ট কাউকে কাউকে আরও বেশি অসহায় করে তোলে। তেমনি এক অস্থিরতার মধ্যেও সুচেতা স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের দিকটাই চিন্তা করেনি—সুধীমনের কথাও ভেবেছে। আর সেই কারণেই ওই করুণ জিজ্ঞাসা, 'এ তুমি কী করলে সুধীমন?'

সুধীমন আস্তে আস্তে বললো, তুমি সুখে থেকো সুচেতা তুমি সুখে থেকো। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তো সব সময় পূর্ণ হয় না। তবুও তুমি এমন নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে আর সুনীতাও কখনও কলকাতায় পা রাখবে না। এই ব্যবস্থাটুকু অন্তত করতে পারার জন্য..........।

এই ব্যবস্থা তো আমি চাইনি সুধীমন। এ-আমি চাইনি। সুচেতার গলাটা কান্নায় প্রায় বুজে গেল। তাকে মোটেই সুখী মনে হলো না। আর তখনি সুধীমন অপার বিস্ময় নিয়ে সুচেতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তিরতির করে ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। নাকের পাটা দুটোও বারবার ফুলে উঠছে। এ-সবই সুধীমনের চেনাজানা। মানসিক চাপ সহ্য করতে না-পারলে সুচেতার এমনটাই হয়। সে তাই আরও বেশি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ-তুমি কী বলছো?

কান্না ঢাকতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সুচেতা চাপা সুরে বললো, তুমি অন্ধ সুধীমন, তুমি অন্ধ!

আলস্যের জামা খুলে করমন্ডল এক্সপ্রেসটা একটু নড়ে উঠলো। প্ল্যাটফরমকে বিদায় চুম্বন জানিয়ে এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। ট্রেনটা একসময় চোখের বাইরে চলে যেতেই সুচেতা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। এতোক্ষণের জমে থাকা কান্নাটা সারা বুক তোলপাড় করে মুষল ধারায় নেমে এলো। হাজার হাজার চোখের সামনেই সুচেতা ছোট্ট মেয়ের মতো কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কে তাকে দেখলো-না-দেখলো, কে কী মনে করলো তাতে তার কিছু যায়-আসে না। সে সমানে কেঁদে চলেছে। সুধীমনকে এই মুহূর্তে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। যতো বেশি সুচেতা ওর কথা ভাবছে এতো বিদ্বেষ সত্ত্বেও ওর জন্যেই চোখের জল ফেলছে। সে-এক আশ্চর্য কান্না!

এক বৃদ্ধ দম্পতি সুচেতার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কোমল গলায় বললেন, আহা মেয়েটা কী রকম কাঁদছে দেখেছো!

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আরও কোমল সুরে উত্তর দিলেন, ওর স্বামী হয়তো এই প্রথম বাইরে চলে গেল।

সুচেতা নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

টুকুনের নাকছাবি



মাত্র দু'খানা উপন্যাস লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল তরুণ লেখক কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম উপন্যাস 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' চব্বিশ সংস্করণ চলছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'অন্তঃসত্ত্বা' ঊনিশ সংস্করণ। কিন্তু শুধুমাত্র সংস্করণ দিয়ে ওই দুটি উপন্যাসের গুণগত বিচারই সব নয়, সাহিত্যের বিচারে কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই লেখা দুটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। পাঠক পাঠিকারা, সমালোচকরা অন্তত সে-কথাই বলছেন। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও নতুন লেখক সমালোচকদের এতো প্রশংসা সাম্প্রতিককালে কেউ পায়নি। কবি সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান। একটা প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার পুস্তক সমালোচক তো লিখেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি অবশ্য এতোটা স্বীকার করে না। সে বলে, আমি ওঁদের পায়ের কাছে বসে লিখবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

কবির বয়স এখন সাতাশ-আঠাশ হবে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির মতো হাইট। দোহারা চেহারা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। টানা নাক আর গভীর দুই চোখে সরু ফ্রেমের স্কোয়ার চশমা। সারা মাথা ভর্তি ছোট ছোট সামান্য বাদামী রংয়ের চুল। সব মিলিয়ে কবিকে ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত বলে মনে হয়।

লিখবার ঘরে বসে কবি শুধু ভাবছে। সামনে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে প্রথম উপন্যাস 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি।' কবি কিছুতেই ভুলতে পারে না, কী নিদারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করেছে সে এই লেখাটা নিয়ে। প্রথমে গিয়েছিল বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। তাঁরা যদি কেউ ধারাবাহিক ভাবে অথবা সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একটা সংখ্যাতেই ছাপেন। কিন্তু না, কেউই সেটি ছাপাবার আগ্রহ দেখাননি। হতাশ হয়নি কবি। নতুন উৎসাহ নিয়ে আবার ছুটেছে বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে।

কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ার নামী প্রকাশক জগৎবাণী। ওই সংস্থার কর্ণধার হরিকিশোর মণ্ডল কবিকে পুরো ছ'টি মাস ঘুরিয়েছেন। শেষে একদিন বললেন, ছুটি কাটাতে সিমলা যাচ্ছি। ফিরে এসে কথা হবে। ফিরে এসে উনি সাফ জানিয়ে দিলেন, এখন নতুন লেখকের উপন্যাস ছাপাবার ব্যাপারে কিছু ভাবছি না। নামী লেখকের উপন্যাসই জমে রয়েছে। তাছাড়া খুবই খারাপ চলছে বইয়ের বাজার। বিক্রি-বাটা একেবারেই নেই। বইয়ের ব্যবসা এবারে গুটিয়ে ফেলতে হবে।

এরপরে কবি গেছে দে ব্রাদার্সে। বিরাট প্রকাশনালয়। প্রতিমাসেই এঁদের চার-পাঁচখানা বই বের হয়। দে ব্রাদার্সের প্রাণপুরুষ বুদ্ধাংশু দে। তিনি কবিকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে নভেম্বরে দেখা করতে বললেন। তখন সবে মার্চ চলছে। তার মানে আরও সাত-আট মাস অপেক্ষা করতে হবে। কবি তাতেই রাজি। তারপরে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একদিন গিয়ে পাণ্ডুলিপি দিয়ে এসেছে। বুদ্ধাংশু দে বললেন, আপনাকে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো লেখাটা আমাদের পছন্দ হলো কী হলো না! সেই এক সপ্তাহের জায়গায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। দে ব্রাদার্স থেকে কবি কোনও চিঠি পেল না। শেষে সে নিজেই একদিন গিয়ে হাজির হলো। বুদ্ধাংশু অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পাণ্ডুলিপিখানা কবির হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, লেখাটা পড়ে উঠতে পারিনি। ভীষণ ব্যস্ত আছি।

বেশ তো আপনি আরও একমাস সময় নিন।

না-না পড়ার সময়ই পাবো না। আপনি ফেরত নিয়ে যান। এখন ছাপতে পারছি না।

বই পাড়ার যে-প্রকাশকের কাছেই কবি গেছে তিনি একবাক্যে না-করে দিয়েছেন। কেউ কেউ অতিরিক্ত জ্ঞান জুড়ে বলেছেন, আরে ভাই ছোট গল্প-টল্প বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লিখে হাতটাকে পাকাও।

আগেই এতো বড়ো একটা উপন্যাস লেখার শখ হলো?

শখ নয়, এটা আমার সাধনা। কবি প্রতিবাদ করেছে।

বেশ তো, বুঝলাম এটা আপনাব সাধনা। কিন্তু কাগজেব ফর্মার দাম বেড়েছে, ছাপাব খবচও বেড়েছে। এ-অবস্থায় একেবারে আনকোরা নতুন লেখককে নিতে ক'জনে সাহস করবে?

কবি উত্তবে বলেছে, আজকে যাঁরা নামী তাঁবাও তো একদিন নতুন ছিলেন। আপনাবা নতুন বলে আমাদেরকে সুযোগ না-দিলে আমরা পুরোনো হবো কেমন করে? সেই প্রকাশক তখন বিরক্ত হযে বলেছেন, মশাই আপনার সঙ্গে এঁড়ে তক্ক করার আমার সময় নেই। আপনি যান দেখি—

অর্থাৎ তাড়িয়ে দিয়েছেন। কবি নিরুৎসাহ হযেছে ঠিক কথা কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েনি। কলেজ স্ট্রিটে হাজার হাজার পাবলিশাব রয়েছেন। প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ঘুরবে কবি। একজন-না-একজন তার লেখা নেবেনই। হয়েছেও তাই।

কলেজ স্ট্রিটে বড়ো রাস্তার ওপরেই সবস্বতী লাইব্রেরী। সামনের কাউন্টারে তিনজন কর্মচাবী বইপত্র বিক্রি করছে। তাদের পেছনেই বড়ো একটা টেবিলেব দু'পাশে দুজন বসে আছেন। হিসেবপত্র লেখালেখি করছেন। একজনের বয়স সাতান্ন-আটান্ন হবে, অপবজনেব চব্বিশ-পঁচিশ। অমিতবাবু আর রাতুল। বাবা আর ছেলে। সরস্বতী লাইব্রেরী ওঁদেরই। কবি ওব পাণ্ডুলিপি নিয়ে ওঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই অমিতবাবু জিজ্ঞেস কবলেন, কী চাই?

আজ্ঞে আমি অমিত মুখার্জীর সঙ্গে....কবিব কথা শেষ হলো না। অমিতবাবু হিসেবের কাগজপত্রেব ওপর চোখ বেখে বলে উঠলেন, আমাব নাম অমিত মুখার্জী। বলুন—

আমি একটা উপন্যাস নিযে এসেছি। আপনি যদি......এবারেও কবির কথা শেষ হলো না। অমিতবাবু বললেন, দুঃখিত ভাই। আমাদের কাছে প্রচুর উপন্যাস জমে আছে। সে-গুলি প্রকাশ-না-করে নতুন করে আর কোনও লেখা নিতে পাবছি না।

কবি তবুও দাঁড়িয়ে রইলো। রাতুল আর অমিতবাবু দুজনেই এবারে কবির মুখের দিকে তাকালেন। কেন জানি আজ হঠাৎ কবি হতাশায় ভেঙে পড়লো। আসলে সেই কারণেই বোধহয় কিছুটা জল জমা হয়েছিল তার দুই চোখে। একবার রাতুল একবার অমিতবাবুব মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় গলায় সে বললো, আপনারা একবার পড়েও দেখলেন না লেখাটা! অথচ তিন বছর ধরে আমি অনেক পরিশ্রম করে, যত্ন নিয়ে উপন্যাসখানা লিখেছি। আমি আপনাদের আগেই ছাপতে বলছি না, অনুগ্রহ করে একবার পড়ে দেখুন। একটু চুপ করে রইল কবি। তার মনের গভীরে যে-বিষাদময় প্রত্যাখানের নদী নিঃশব্দে বয়ে গিয়েছে সেখানে যেন ডুব দিয়ে কবি আবও বললো, লেখাটা পড়ে যদি খারাপ লাগে নষ্ট করে ফেলবেন। আমি আব এটা কোনোদিনও নিতে আসবো না। কিন্তু ভালো লাগলে ছাপতে হবে। কবিব কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সুর।

রাতুল বাবার মুখের দিকে তাকালো। তার চোখের সেই নীরব দৃষ্টিতে সম্মতির ছাযা। অমিতবাবু বললেন, ঠিক আছে, পাণ্ডুলিপিটা রেখে যান। ওতে আপনার ঠিকানা লেখা আছে তো?

হ্যাঁ।

তারপরের ঘটনা সকলের জানা। শুধু সাফল্য আর প্রশংসা। বইটা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির নামটা সকলেব কাছে স্বীকৃতি পেল বলিষ্ঠ লেখক হিসাবে। কবির নিজের ভাষায়, বইটা ভালো লিখতে আন্তরিক চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতো প্রশংসা আর খ্যাতি কল্পনা করিনি। অমিতবাবু বলেছেন, কবি আর একখানা ছাড়ো। পাঠকরা যে রোজই খোঁজ নিচ্ছেন আর কিছু নতুন বেরুলো কিনা? রাতুল কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। সেই হিসেবে কবি অমিতবাবুকে মেসোমশাই বলে ডাকে। সে বিনীত ভাবে বললো, পাঠকরা দাবি জানাবেনই, কিন্তু মেসোমশাই বেশি লিখে খারাপের পাহাড় জমাতে চাই না। অল্প লিখবো কিন্তু যেটুকু লিখবো তা যেন ভালো হয়।

কবি সেই ভালো লেখারই চেষ্টা করে চলেছে। প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর দু'বছর ধরে গড়ে তুললো আর একখানা উপন্যাস। নাম 'অন্তঃসত্ত্বা'। বিস্তর কাটাকাটি আর লেখালেখির পর চারবার সে নিজে পড়লো। না, কোথাও আর কাটাকাটি করার প্রয়োজন নেই। কোনও শব্দই

কানে ঠোক্কর খাচ্ছে না, কোথাও অসংলগ্ন বা খাপছাড়া লাগছে না। হ্যাঁ এইবারে ছাপতে দেওয়া যায়। কবি ওর ঝোলানো ব্যাগে পাণ্ডুলিপি নিয়ে সরস্বতী লাইব্রেরীতে পৌঁছালো। অমিতবাবু ছিলেন না। বাতুল কবিকে দেখে একগাল হেসে বললো, বোস, ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস। নিরাপদকে এক্ষুনি চা আনতে পাঠাচ্ছিলাম। যাক গিয়ে, লেখা এনেছিস?

এখনও কমপ্লিট হয়নি। কবি সামান্য হাসলো। রাতুল বলে উঠলো, তুই কী রে? এক সপ্তাহ আগেই তো শেষ হবার কথা ছিল। তুই কী আগ্রার দয়ালবাগের সঙ্গে পাল্লা দিবি নাকি? আমার জন্মের পর থেকে শুনছি দয়ালবাগ তৈরি হচ্ছে। আজও শুনছি তৈরিই হচ্ছে। রাতুল কর্মচারীদের কান বাঁচিয়ে গলা নামিয়ে আস্তে বললো, আমি বিয়ে করলে আমার ছেলেও শুনবে—তা তোর লেখাটা শেষ হবে কবে বলতে পারিস? দু'বছর ধরে তো খুব ঝোলাচ্ছিস—

তোরা মানে পাবলিশাররা আমাকে কম ঝুলিয়েছিস? কবি প্রাণখোলা এক হাসি হেসে বললো, কেউ সিমলা যাচ্ছে, কেউ মাসের-পর-মাস ঘুরিয়েছে। বইটা আর কেউ পড়তেই চায় না। নেহাত সেদিন তোদের এই কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম......

বুঝতে পেরেছি। রাতুল কবির আগের কথায় আমল না-দিয়ে উল্টে ওকেই আক্রমণ করে বললো, তোর এখন প্রচুর নাম হয়েছে সুতরাং ল্যাজে একটু খেলাবিই। তারপরেই হুঙ্কার ছাড়লো, নিরাপদ আমাকে একটা চা দে। অর্থাৎ লেখা দাওনি চা পাবে না—এই রকমই একটা ভাব রাতুলের সুরে।

কবি নীরবে ঝোলার মধ্যে থেকে পাণ্ডুলিপিখানা বের করে টেবিলের ওপরে রেখে বললো, আমার খুব নাম হয়েছে! তোকে খুব ল্যাজে খেলাচ্ছি না? তাই নিজেই বয়ে এনেছি তোকে দেবার জন্য। এবারে রাতুলের গলা আরও জোরে হলো, নিরাপদ দু'কাপ চা। তারপরেই দুজনে হাসিতে ভেঙে পড়লো।

নিরাপদের বয়স বছর বাইশ হবে। গরিব ঘরের ছেলে। অভাবের মধ্যেই মানুষ হয়েছে। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আর সুযোগ পায়নি কলেজে পড়ার। বাধ্য হয়েই দারিদ্রের সংসারে কিছুটা সুরাহা করতে সরস্বতী লাইব্রেরীর এই চাকরিটা নিয়েছে। কী-না করে সে? কাউন্টারে বসে বই বিক্রি করে। লেখকদের বাড়ি গিয়ে প্রুফ পৌঁছে দিচ্ছে, লেখকদের দেখা শেষ হলে সেই প্রুফ আবার নিয়ে এসে প্রেসে সময় মতো হাজির হচ্ছে। রাতুলের ফাই-ফরমাস খাটছে। দোকান থেকে চা আনছে, সিগারেট আনছে অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। নিরাপদর সৌন্দর্য হচ্ছে ওর হাসিটি। কোন কাজেই না নেই। হাজার পরিশ্রমের পরেও মিষ্টি হাসিটি ওর মুখে ঠিক লেগেই আছে। রাতুল, অমিতবাবু দুজনেই দারুণ ভালোবাসেন ওকে। আর কবি তো ওকে খুবই পছন্দ করে।

নিরাপদ দু'কাপ চা টেবিলের ওপরে রাখতেই কবি ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে দিল। বললো, নিরাপদ তোমার সঙ্গে আমার একটা সিরিয়াস কথা আছে। ঠিক ঠিক ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবে। মালিকের পক্ষ টেনে কথা বলবে না।

আপনি তো আগে থেকেই শর্ত-টর্ত জুড়ে দিয়ে আমাকে আরও বেশি চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলেন। নিষ্পাপ হেসে নিরাপদ বললো, এর পরেও ঠিক ঠিক চিন্তা আসবে কী? আপনার সিরিয়াস কথাটা বলুন—

লেখা না-আনার অভিযোগে রাতুল মানে তোমার দাদা আমাকে প্রথমে চা দিতে বারণ করেছিল। তুমি কী সত্যি সত্যিই আমাকে চা দিতে না?

কবির কথা শুনে খুব হাসলো নিরাপদ। প্রথমে সে ভেবেছিল কবি না-জানি কী বিরাট সমস্যার প্রশ্ন তুলবেন। উত্তর দিতে তাকে হয়তো খুবই মুশকিলে পড়তে হবে। কিন্তু এতো তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে এতো সাধারণ একটা প্রশ্ন করলেন যা কবির মতো সরল লেখককেই মানায়। কবি ঠিক এইখানেই কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। সামান্য একটা কথা বা ঘটনাকেও অত্যন্ত আবেগ মিশিয়ে তুলে ধরতে পারেন। নিরাপদ হাসতে হাসতেই বললো, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই চা দিতাম।

তোমার দাদার বারণ সত্ত্বেও দিতে? কবি ঠিক ঠিক ভাবে আবার মনে করিয়ে দেয়।

হ্যাঁ। বারণ সত্ত্বেও দিতাম। নয়তো আমারই চাকরি থাকতো না। উত্তাল হেসে নিরাপদ বললো, আপনাকে চা না-দিলে দাদা প্রথমেই আমাকে এক হাত নিতেন। কবিকে সামনে বসিয়ে রেখে আমি কবে একা একা চা খেয়েছি? তোর কী চাকরি করার ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে? নিরাপদর বলার ধরনে দু'বন্ধু দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে সারা দোকান ভরিয়ে তুললো। রাতুল খুব খুশি হয়ে বললো, তুই তো আমার চেয়েও আমাকে বেশি চিনে ফেলেছিস দেখছি!

কবির দ্বিতীয় উপন্যাস 'অন্তঃসত্ত্বা' প্রকাশিত হলো। প্রকাশক বিজ্ঞাপনে লিখলেন ঃ "ওদেরকে ঘৃণা নয়—ভালোবাসা, বঞ্চনা নয়—বিশ্বাসের সেতু বানিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শিশুরা সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়—জাতির ভবিষ্যৎ। কুমারী মায়েদের সমস্যা ও জটিল মানসিকতা নিয়ে এতো মমতা দিয়ে এর আগে কেউ লেখেননি।" প্রকাশকের সঙ্গে সুর মেলালেন সাহিত্য সমালোচকরাও। তাঁরাও স্বীকার করলেন, কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ভীক, বলিষ্ঠ এবং সার্থক রচনা এটি।

সেদিন সরস্বতী লাইব্রেরীতে বসেছিল কবি। রাতুল তখনও দোকানে আসেনি। কর্মচারীরা বইপত্র বিক্রি করছে। কাউন্টারে পাঁচ-ছজনের ভিড়। দোকানের সামনে দুধ-সাদা রংয়ের একটা গাড়ি এসে থামলো। দরজা খুলে মাটিতে নেমে দোকানে উঠে এলো একটি মেয়ে। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। কোমর সমান ছড়ানো একঢাল কালো চুল। আয়ত দুটি গভীর চোখ। তাতে পুরু করে কাজল আঁকা। নাকটা সামান্য একটু চাপা, কিন্তু ওই নাকেই সাদা পাথরের নাকছাবিটা জ্বলজ্বল করে একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য দান করছে। সারা শরীরে যেন হলুদের আভা। পরনে হলদে রঙের শাড়ি আর ওই রঙেরই ব্লাউজ। কপালে বড়ো করে হলুদ টিপ। কবির মনে হলো যেন হলুদ বসন্ত। মেয়েটি কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলো, কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইটা আছে? নিরাপদ কবিকে একপলক দেখে নিয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞে না।

আমি তিন-চারটে দোকানে খোঁজ করেছি। পাইনি। ওরা বললো, আপনাদের কাছে খোঁজ নিতে। আপনারাই তো প্রকাশক?

হ্যাঁ। নিরাপদ সম্মতি জানিয়ে বললো, ব্যাপারটা হচ্ছে গত সপ্তাহে ওই বইয়ের চব্বিশ সংস্করণ-এর সব কপি বিক্রি হয়ে গেছে। পঁচিশ-সংস্করণের কপি বাজারে বেরুতে এখনও সপ্তাহ দুয়েক লাগবে। এর আগে আপনি কোথাও পাচ্ছেন না, তবে—নিরাপদ একটু থামলো। আস্তে আস্তে বললো, আপনি ভেতরে যান। ওই যে টেবিলে যিনি বসে আছেন তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এক কপি দিতে পারেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টুকুন। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই কবি বললো, বসুন—

টুকুন বসলো। একরাশ সুমিষ্ট বাতাস যেন খেলে গেল। এতো রূপ কবি এর আগে বুঝি দেখেনি। সবচেয়ে তাকে মুগ্ধ করেছে ওই নাকছাবিটা। একটা নাকছাবি যে একটা মেয়েকে এতো রূপসী করে তুলতে পারে এই প্রথম অনুভব করলো।

সে খুব শান্ত গলায় বললো, আপনার কী প্রয়োজন বলুন—

টুকুন কবির মুখের দিকে তাকালো। দোহারা গড়নের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সাতাশ-আঠাশ বছরের একটা ছেলে। গভীর দুই চোখের ওপর সরু ফ্রেমের স্কোয়ার চশমা বসানো। ঈষৎ বাদামি-রংয়ের একমাথা ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল। সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য ছিমছাম ধরনের ঝকঝকে যুবক। সবচেয়ে বড়ো কথা ওর ওই গভীর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন হাজারো কথা লেখা রয়েছে ওখানে। কী নিষ্পাপ সরল মুখ! যেন একটা শিশু। টুকুনের কেন জানি-না মনে হলো এই ছেলেটির কাছে সে তার আকাঙ্খিত বইটা পেয়ে যাবে। সুতরাং এর কাছে খোলামেলা কথা বলাই ভালো। টুকুন বললো, আমি দিল্লিতে থাকি। কলকাতায় এসেছি কয়েক দিনের জন্য। আমার কাকার বাড়িতে কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তঃসত্ত্বা' উপন্যাসটা পড়ে আমি অভিভূত। কাকা বললেন, এরচেয়েও নাকি ওই লেখকের ভালো লেখা 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি।' টুকুন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললো, কাকার কাছে ওই বইটা ছিল। কিন্তু কে যেন পড়ার নাম করে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। আমি

অনেক দোকানে খুঁজেছি পাইনি। সকলেই বলেছে যা ছিল বিক্রি হয়ে গেছে। নেক্সট এডিশন না-বেরুনো পর্যন্ত পাবেন না। কিন্তু আমাকে যে পেতেই হবে। বইটা না-পড়া পর্যন্ত আমি কোনও কিছুতে মন দিতে পারছি না। দোকানের একজন বললেন, আপনার কাছে এটা পাওয়া যেতে পারে। আপনি কী আমাকে এক কপি দিতে পারেন?

কবির তরুণ হৃদয়ে ভালোলাগার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো। এমন একটা সুন্দরী মেয়ে তার লেখা পরে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কোন লেখকের আনন্দ না-হয়? এক্ষেত্রে কবির একটু বেশিই। কেন-না লেখার প্রায় শুরুতেই সে পাঠক-পাঠিকাদেব মন জয় করে নিয়েছে। বয়স অনুপাতে কবি এমনিতেই সহজ-সবল। আরও সহজ হয়ে তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো একবাব বলে, আপনি যে-বইটা খুঁজছেন সেটা আমারই লেখা। কিন্তু না, সংযম হারালে চলবে না। যাব-তার-কাছে যখন-তখন নিজের নামটাকে সহজ ভাবে তুলে ধরার মধ্যে আব যাই হোক ব্যক্তিত্ব থাকে না। সব চেয়ে বড়ো কথা হলো মেয়েটি তো তার পরিচয় জানতে চায়নি। তার নামটা জিজ্ঞেস করারও এতোটুকু আগ্রহ দেখাযনি। সে শুধু তার লেখা বইটাই চেয়েছে। কবি বললো, আপনি কাল এমনি সময়ে এখানে আসতে পারবেন?

নিশ্চয়ই পারবো। টুকুন চাপা অথচ দারুণ মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলো, বইটা পাচ্ছি তো? আশা করছি পেয়ে যাবেন।

সন্ধ্যা নেমে আসার একটু পবেই বাড়ি ফিরলো কবি। কালিঘাট ব্রিজ পেরিয়ে চেতলাব রাখালদাস আঢ্য রোডে ঢুকবাব মুখেই প্রথম দোতলা বাড়িটাই হচ্ছে কবিদেব। কবির ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। গোলাকাব বিশাল বিশাল থামওয়ালা, একই সমান উচ্চতার দরজা ও জানলা এবং আগাগোড়া কাঠেব সিঁড়ি বাড়িটির আভিজাত্য বহন কবে চলেছে। নীচেব তলাব পুরোটাই ভাড়া দেওয়া। স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ মিস্টার এবং মিসেস কর থাকেন। বাসু কবের বযস তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হবে। একটা বৃটিশ কোম্পানির কলকাতা অফিসের টপ।

কাঠের সিঁড়িতে খুব আস্তে আস্তে শব্দ তুলে কবি দোতলায় পৌঁছে গেল। বাঁ দিকের ঘরখানাই তার। কিন্তু সেদিকে গেল না। ডান দিকে চারখানা ঘর। বড়ো রাস্তার দিকে পাশাপাশি দু'খানা আঠারো বাই ষোলোর ঘব। একটাতে দাদা-বৌদি অপবটাতে মা-বাবা থাকেন। বাকি দু'খানা ঘর মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। দিদি জামাইবাবু বা আত্মীয-স্বজন কেউ এলে তখনই সে-ঘরগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে। কবির ভাইপো বুলানেব বযস দশ-এগাব হবে। কবি অনেকদিন ওকে বলেছে, তুই এখনও তোর মা-বাবার কাছে ঘুমাস কেন? ঘর পড়ে আছে। এর একটাতে থাকতে পারিস না?

আমি মা-বাবার কাছ ছাড়া অন্য কোথাও শোবো না। বুলানের স্পষ্ট উত্তব। ওব দিকে তাকিয়ে কবি অর্থপূর্ণ এক হাসিতে পরেব প্রশ্নটা কবেছিল, এই প্রতিজ্ঞা মানে ভীষ্মেব প্রতিজ্ঞাটা কতোদিন রাখতে পারবি?

অনেকদিন। বাচ্চারা যেমন দেখে, শোনে এবং বোঝে বুলানও ঠিক তেমনি ভাবে উত্তর দিয়েছিল, বৌ হলে তো লোকে বৌয়ের কাছে ঘুমায়। এখন তো আমি ছোট। লেখাপড়া শিখবো, চাকরি করবো। তারপরে তো!

সেই বুলান কবির একেবারে মুখোমুখি হয়েই প্রশ্নের ঝড় তুললো। কাকা আজকেও আনলে না? তুমি কী? আব তোমাকে কাকা বলে ডাকবো না। আজকে যে অফিসে যাবার সময়ে বলেছিলে নিয়ে আসবে। তাহলে মিথ্যে বলেছিলে কেন? কাকা হয়ে মিথ্যে কথা বলে—বুলান একটু কান্নার আওয়াজ তুললো।

বিশাল উঁচু খাটে শুয়ে শুয়ে চন্দ্রনাথ একটা বই পড়ছিলেন। স্নেহলতা খাটের পাশে মেঝেতেই পানের বাটা নিয়ে বসেছিলেন। নাতির কান্নার সুর আঁদের কানে যেতে দুজনেই ছেলের দিকে তাকালেন। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, বুলানের বায়না মিটাসনি বুঝি? কবি একটু অপ্রস্তুত হয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, না মানে আসলে আমি একেবারেই ভুলে গেছি।

দাদুভাইকে আর কাঁদাস না। এক্ষুনি ওকে নিয়ে কিনে আন—স্নেহলতা ছেলের দিকে তাকিয়ে

হুকুম দিলেন।

আরে! আমি কী ওকে দেবো না বলেছি? কিন্তু কেঁদে এই ভাবে দাবি আদায় করবে তা হবে না, ওকে হাসতে হবে।

ব্যাট না-পেলে আমি হাসবো না বুলানের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

তোর কান্না আমি বের করছি দাঁড়া—পাশের ঘর থেকে মহুয়া এসে বুলানের দিকে এগিয়ে যেতেই কবি প্রায় ধমকে উঠলো বৌদিকে, তুমি আবার এরমধ্যে আসছ কেন? কে তোমাকে শাসন করতে ডেকেছে? এটা আমাব আর বুলানের ব্যাপাব। কবি বুলানের দিকে চেয়ে একগাল হেসে বললো, কীরে তাই তো?

তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো না। তুমি আমার কাকা না--

আমি কী তবে?

তুমি একটা বাজে লেখক। কথাটা বলে বুলান একরাশ আনন্দ পেতে চাইলো। কাকা যেমন তাকে দুঃখ দিয়েছে সে-ও তেমনি কথাটা শুনিয়ে দিয়ে প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে বিজয়ী হতে পেরেছে।

বুলানের বিক্ষোভের কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো কবি। চন্দ্রনাথ স্নেহলতাও হেসে ফেললেন। মহুয়া অনেক কষ্টে নিজেকে ধরে বেখেছিল। শেষ পর্যন্ত সে-ও পারলো না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তবুও যাহোক কিছুটা আড়াল করে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে ছেলেকে বললো, অনেক কান্নাকাটি করেছিস। এবারে একটু চুপ কর। কাকা তো বলেছেই কিনে দেবে। আজকে আনতে ভুলে গেছে—

পিপিনেব বিস্কুট আনতে তো কাকার ভুল হয না। বুলান ছোট হলে কী হবে, একেবাবে মোক্ষম অস্ত্রটি ছুড়ে দিয়েছে।

কবি বুলানের মুখের দিকে চেয়ে পরাজয়ের ম্লান হাসি হাসলো। সত্যিই তাই। আজ সে কিছুতেই বুলানের কাছে সুবিধা করতে পারছে না। বুলানের ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাব পক্ষে একটু মুশকিল হয়ে পড়েছে। পিপিন হচ্ছে তাব অতি আদরের কুকুব। বুলানের চেযে ছ'মাসের ছোট। পিপিন নামের কুকুরটি এবং বুলান দুজনেই ছোটবেলা থেকে তার কাছেই আদর আর ভালোবাসা, শাসন আর বকুনি পেয়েই এতো বড়ো হযেছে। একদিন হঠাৎ কবি অফিস ফেরত কিছু বিস্কুট এনে পিপিনের মুখে দিয়েছিল। সেই শুরু। মাঝে একদিন না-এনে পিপিনকে একটু বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল। তার ফল হলো পিপিন কবিকে জড়িয়ে ধরে বারবার ওর প্যান্টেব পকেটে নিজের মুখটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। কবি যতো বলে আজকে বিস্কুট আনিনি, কে শোনে কাব কথা! পিপিন ততই ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে কবিকে ছেড়ে দিয়ে গুটিগুটি পায়ে ঘরের কোণে গিয়ে অভিমানে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। খুব দুঃখ পেযেছিল কবি সেদিন। তারপর থেকে আর কখনও ভুল হয়নি। যতো রাতেই কবি বাড়ি ফিবে আসুক না কেন, তার পকেটে পিপিনের বিস্কুট থাকবেই।

বুলানের মন থেকে সব অসন্তোষের মেঘ উড়িয়ে দিয়ে কবি বললো, চল, এক্ষুণি তোকে ব্যাট কিনে দেবো। কথাটা শোনামাত্র বুলানের মুখে ঝিকমিক হাসি। সঙ্গে সঙ্গে কবির হাত ধরে একরাশ উচ্ছ্বাস নিয়ে বললো, কাকা, গাভাসকর ব্যাট কিনে দেবে কিন্তু।

গাভাসকর বিশ্বনাথ বুঝি না, তোর যেটা পছন্দ হবে সেটাই কিনে দেবো।

বুলানকে নিয়ে কবি তিন-চারটে দোকান ঘুবলো। অনেক ব্যাট অবশ্য দেখা হলো কিন্তু বুলানের পছন্দসই সাভাসকর নামের ছাপ মারা ব্যাট নেই। তাই আরও কয়েকটা দোকান দেখতে হলো। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল আকাঙ্খিত জিনিসটি। ব্যাটের ওপর বড়ো বড়ো হরফে লেখা গাভাসকর। কী খুশি বুলান! ওর চকচকে দুই চোখে আনন্দ যেন উপছে পড়ছে। বুলানের সেই তৃপ্তির মৃদু বাতাস কবির মনকেও দোলা দিল। তার সেই ছোট্ট ভাইপো আজ দশ-এগারো বছরের বড়ো হয়ে তার সঙ্গে রীতিমতো তর্ক-যুদ্ধ করে এখন খুশির সিংহাসনে বসে আছে। ওর হাতে ব্যাট। সুতরাং এই মুহূর্তে কাকার চেয়ে প্রিয় এই পৃথিবীতে তার আর কেউ নয়!

ব্যাট কিনে ওবা যখন বাড়ি এসে পৌঁছালো সকলে তখন টেবিলে গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছিলেন। ববি অর্থাৎ কবিব দাদাও অফিস থেকে এসে গেছে। মা-বাবার সঙ্গে বসে সেও চা খাচ্ছিলো। মহুয়া কবির দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললো, চা-টা আগে খেয়ে নাও। হাত-মুখ ধুয়ে পরে খাবার খেয়ো—

সন্ধ্যে থেকে তোমার ছেলে আমাকে যে নাকানি চোবানি-খাওয়ালো, এর পরেও নতুন করে কিছু খাবার দরকার আছে কী? কথাটা শেষ করেই কবি বুলানেব দিকে তাকালো। কাকা ভাইপোতে একঝলক হাসিব বিনিময় হলো চোখে চোখে। কবি ববির দিকে তাকালো। বললো, দাদা, বুলান আমাকে কী বলেছে জানো? আমি নাকি বাজে লেখক!

কাকা ভাইপোর খুনসুটির মধ্যে রবির থাকার বড়ো একটা ইচ্ছে নেই। কেন-না ওদের মধ্যে প্রত্যেকদিন ঝগড়া হচ্ছে, পর মুহূর্তেই আবার ভাব হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনের মনোমালিন্যের বিচার করতে গিয়ে বহুদিন রবি একেবারে বোকা বনে গেছে। যাদেব ঝগড়া মেটাতে গেছে তার আগেই তারা ভাব করে বসে আছে। ববি তাই যথেষ্ট সাবধান হয়ে ছেলে এবং ভাই দুজনেব মুখেই চোখ রেখে ব্যাপারটা একটু বুঝবার চেষ্টা করলো। বুলানের হাতে নতুন ঝকঝকে ব্যাট। কবি ওকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কিনে দিয়েছে। সুতবাং ওদের দুজনেব মধ্যে এখন সখ্যতার শক্ত প্রাচীর। নতুন কোনও দাবি-দাওয়ার সমস্যা না উঠলে ওই প্রাচীর ভাঙা যাবে না। রবি তাই বললো, বুলান এক মস্ত বড়ো পাঠক। আর ও তোকে বাজে লেখক বলেছে। তোদের দুজনের ব্যাপারটা তোরাই মিটিয়ে নে। আমাকে আবার এরমধ্যে.....

ব্যাট পাবার আগে তো আমি বাজে লেখক বলেছি। বুলান নিজেব দোষ ঢাকাব চেষ্টা করলো। এখন কাকাকে ঘুষ দিয়ে বলে উঠলো, আমি কী সত্যি তোমাকে বাজে লেখক বলেছি নাকি?

অনেক হয়েছে, এবারে একটু থামো। রবি ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বললো, তা ব্যাট যখন পেয়েছিস, একটু প্র্যাকটিস করবি না?

না। বাবার কথার মারপ্যাঁচ বুলান অনায়াসেই ধরে ফেললো। বললো, এখন আমি পড়তে বসবো।

সেটা এতোক্ষণে মনে পড়লো?

মা—পড়াবে এসো। মহুয়ার দিকে কথাটা ছুড়ে দিয়ে বুলান পরম মমতায় ব্যাটটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে নিজেদেব ঘরের দিকে পা বাড়ালো। মহুযাও ছেলের উদ্দেশে কথাটা ছুড়ে দিল, তুই গিয়ে পড়তে বোস—আমি কাকাকে খেতে দিয়ে পরে যাচ্ছি।

নিজের পড়ার টেবিলে বসে কবি একমনে লিখে চলেছে। পায়ের কাছে গুটি গুটি হয়ে বসে আছে পিপিন। বার দুয়েক পা চেটে আদর জানিয়েছে। কবি ওর লেখা থামিয়ে পিপিনকে আদর করেছে। রীতিমতো কথা বলেছে, বিস্কুট খেয়েছিস এখন চুপচাপ বসে থাকে। আমি এখন লিখছি। বিরক্ত করিস না। ভৌ করে একটা মৃদু সুর তুললো পিপিন। কবি ওর ভাষা বোঝে। পশুটা শুধু কথা বলতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন সুবের ওই ভৌ ডাক আর নীবব চাউনির মধ্য দিয়ে পিপিন অনেক কথাই বুঝিয়ে দেয়। কবিব আদর পেয়ে পিপিন তাই খুশি। সে আর বিরক্ত কবেনি। আধঘণ্টার মতো একটানা লিখেছে কবি। তারপরেই লোডশেডিং নামের যন্ত্রনাদায়ক কালো চাদরটা সারা চেতলাকে মুড়ে দিল। কখন আলো আসবে কেউ জানে না। ওনাব আসা-যাওয়ার হদিশ তাই কেউ দিতেও পারবে না। সব রকমের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন বিসর্জন দিয়ে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং চলছে। হাজার রকম মানুষের হাজার ধবনেব ক্ষতি। তাতে কী? দেশ অন্ধকারে ডুবছে ডুববে। পার্টি ঠিক থাকলেই হলো। দেশের চেয়ে পার্টি আফটাব অল অনেক বড়ো!

অন্ধকারে হাতড়ে লেখার কাগজপত্র চাপা দিয়ে কলমের মুখটা বন্ধ করে একরাশ হতাশা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কবি। সঙ্গে সঙ্গে পিপিনও উঠে দাঁড়ালো। কবি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, অন্ধকারের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিস না। চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাক।

কবি মা-বাবার ঘরে গেল। ঘরের এক কোণে মোম জ্বলছিল। মোমের এই নিস্তেজ আলোতে গল্প করা যায় কিন্তু ঠিকমতো লেখাপড়া করা যায় না। চোখের ওপর খুব চাপ পড়ে। বুলানের

পড়া তাই বন্ধ। সে খাটেতে চন্দ্রনাথের পাশটিতে চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। বাবার পায়ের কাছে রবি বসে। একটা বড়ো সোফায় মহুয়া আর স্নেহলতা বসে। কবি ঘরে ঢুকেই বললো, কী রে বুলান পড়া হয়ে গেল?

দেখছো না লোডশেডিং?

তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এই দেশের পড়ুয়া হয়ে বেশ সুখেই আছিস! কিন্তু এই অন্ধকার তো অন্ধকার নয়, তোদের ভবিষ্যৎটাই অন্ধকার।

আলো জ্বললে অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। বুলানের চটপট উত্তর। নাতির কথা শুনে চন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন। রবিও বাদ গেল না। সে শুধু বললো, তোরা দুটিতে আছিস বেশ!

কবি সে-কথার উত্তর দিল না। সে একটু সিরিয়াস হয়ে রবির দিকে তাকালো। বললো, দাদা তুমি ভাবতে পারছো দিন দিন লোডশেডিং-এর দাপটে আমাদের কোথায় নেমে যেতে হচ্ছে? দু-চারদিন অল্প সময়ের জন্য হয় আলাদা কথা। এতো রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে গেছে। প্রত্যেকদিন কী এ-জিনিস ভালো লাগে? আমার কথা না-হয় ছেড়ে দাও। একখানা বই না-লিখলে দেশের কোনও ক্ষতি হবে না কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ, কল-কারখানা বন্ধ, কতো যে ছোটখাটো কোম্পানি উঠে যাচ্ছে তার তো কোনও হিসেবই নেই। বলতে পারো, বিদ্যুতের সুরাহার জন্য কেউ কিছু করছেন? করলে এই অবস্থা চলতো না। জানি বিদ্যুৎ স্নো-সেন্ট-পাউডার নয়, দোকানে গিয়ে চাইলেই পাওয়া যাবে। এটা তৈরি করতে সময়ের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোথায়? এতো গড়িমসিতে আর যাই হোক বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। গত তিন বছর ধরে তো একই জিনিস চলছে। অবস্থার এতোটুকু উন্নতি নেই। সামান্য হেসে মহুয়া বললো, আজ তুমি এতো রেগে গেলে কেন?

সারা দিনের শেষে সবে গুছিয়ে লিখতে বসেছি.........

রোজই তো তাই হয়!

আরে! কবি একটু থামলো। বললো, মানুষের মন-মেজাজ বলে কিছু নেই? সব দিন মনের অবস্থা এক থাকে? আজ আমি মনে-প্রাণে তৈরি ছিলাম অনেকটা লিখবো বলে। চিন্তা ভাবনাগুলিও ঠিকমতো সেজে-গুজে এসেছিল কিন্তু আলো এলেও বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে নতুন করে এখন আর লেখা যাবে না।

যন্ত্রণা হতাশার মধ্যেই তো ভালো লেখা যায়। এ-গুলিও আমাদের জীবনের একটা দিক। স্নেহলতা বললেন, এটাকে তুই বাদ দিতে পারিস না।

মা, কথাটা যে তুমি ভুল বলেছো তা নয়। তবে সব যন্ত্রণার ওপরে এই লোডশেডিং-এর নরক যন্ত্রণা। এই একটা সময়েই আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। নয়তো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো...ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে মোমটা নিভিয়ে দিল। বুলান বলে উঠলো, কাকা লিখতে যাও।

তুই এখনও শুয়ে আছিস কেন? কবি উত্তর দিল, পড়তে যা—

আজ তবু তাড়াতাড়ি কারেন্ট এসেছে। রবির কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি। কবি বললো, দেখছো তো দাদা, আমাদের মানসিকতা কিভাবে তৈরি হয়ে গেছে। আলো দিতে না-পারাটা ব্যর্থতার পর্যায়ে পড়ে। আমরা কিন্তু সে-সব ভুলে গেছি। আলো একটু তাড়াতাড়ি এলেই আমরা কেমন কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ হয়ে যাই। এতো অল্পতে সন্তুষ্ট জাতটাকেও যারা সামান্য খুশি করতে পারে না........কিচ্ছু হবে না, এই দেশের কিচ্ছু হবে না। কথাটা বলতে বলতে কবি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

কিন্তু দুর্ভোগ আর কাকে বলে? আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিটের মতো কবি লিখেছে, আবার আলো চলে গেল। না, এই ভাবে পারা যায় না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কোনও কিছুই আর ভালো লাগে না। অথচ মজাটা হলো ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই। কাউকে দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই। এই ভাবেই চলছে। এই ভাবেই চলবে।

মহুয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে কবির পড়ার টেবিলে রাখলো। হাসতে হাসতে বললো, লেখাটা থামিও না। এই আলোতেই চালিয়ে যাও।

তুমি হাসছো? কবি প্রচন্ড ভাবে রাগের ঝাঁঝ মিশিয়ে বললো, এই ফাজলামোর কী দরকার ছিল? তার চেয়ে একটানাই লোডশেডিং চলতো। মাঝখানে এই আধঘণ্টার জন্য আলো দিয়ে কোন পবিত্র কর্মটি সেরে দিল তা ওরাই জানে। একটু চুপ করে থেকে কবি ফের বললো, তুমি এই লণ্ঠন দেবতাটিকে নিয়ে যাও। তুমি তো জানো বৌদি এই আলোতে আমি লিখতে পারি না। আমার মাথা ধরে যায়।

মাথা ধরলে চলবে না, চেষ্টা করতে হবে।

তোমাকে সরকারের এজেন্ট বলে মনে হচ্ছে। এতোক্ষণে কবি হেসে ফেললো। তারপরে মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, ও, ওই ব্যাপারটা তো আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার বড়দা তো আবার বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার। কোথায় আছেন যেন—

ব্যান্ডেলে। মহুয়ার ছোট্ট উত্তর।

দারুণ! খোশ-মেজাজে কবি ফিরিস্তি দিল, আজকের কাগজেই রয়েছে ব্যান্ডেলের চারটে ইউনিটের মধ্যে তিনটিই বন্ধ। একটা ইউনিট মাত্র কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়েছে। সাঁওতালদির অবস্থাও এক। তোমার বড়দা তো সেখানেও ছিলেন তাই না?

হ্যাঁ।

উনি আর কোথায় কোথায় যাবেন? কৌতুকের মোড়কে কবির গম্ভীর প্রশ্ন। মহুয়া অতোশত বোঝে না। যেমন প্রশ্ন তেমনিই উত্তর। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল, শুনছি কোলাঘাটে যাবে। কবে যাবে তা জানি না।

ব্যস! হয়ে গেল! কবি এবারে প্রচ্ছন্ন হেসে বললো, কোলাঘাট থেকে যে-বিদ্যুৎ পাবো সেটাও গেল। আচ্ছা বৌদি, তোমার বড়দা তো শুনেছি বছরে তিন-চার মাস সপরিবারে আগ্রা, দিল্লি, কাশ্মীর ঘুরে বেড়ান। তা যেখানে যান সেখানেও কী সঙ্গে সঙ্গে.....

আচ্ছা তুমি কি পেয়েছো বলোতো—এতোক্ষণে মহুয়া গা ঝাড়া দিল, আমার দাদার পেছনে এই ভাবে লাগবার মানেটা কী? মাকে ডাকবো? কথাটা শেষ করে মহুয়া নিজেই হেসে ফেললো।

কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, বৌদি আলোটা তুমি নিয়ে যাও। আমি বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসছি।

লাইট যদি এসে যায়?

আসুক। আজ আর লিখবো না। এই ভাবে ইন্টারভ্যাল দিয়ে লেখা যায় না। আমি অন্তত পারি না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কবি গোপাল নগরের মোড়ে গিয়ে পৌঁছালো। এইখানেই তার আড্ডা। একেবারে ছেলেবেলাকার বন্ধু সব। পল্টু, কুমার, সুশীল, অলোক, সীতানাথ। একসঙ্গে চেতলা বয়েজ স্কুলে পড়াশুনা করেছে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মাঠে ফুটবল খেলেছে। সীতানাথ ছাড়া বাকি সকলে একসঙ্গে আশুতোষ কলেজেও পড়েছে। সীতানাথ ওই সময়ে যাদবপুরে ভর্তি হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। ও এখন গ্রিস্টার কোম্পানির মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। অলোক আর কুমার বসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। আপার ডিভিশন ক্লার্ক। সুশীল বামা লরীর জুনিয়র অফিসার। পল্টু ভারত বিখ্যাত ফুটবলার। এই বছর মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। গত চার বছর ধরে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য হয়ে কম করেও বাহান্নটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। দেশের বাইরে প্রচুর ঘুরেছে। অনেক সংস্থায় চাকরি করেছে। এ-বেলা চাকরি পেয়ে ও-বেলায় ছেড়েছে এমন ঘটনাও হয়েছে। অবশ্য এই সবই খেলার দৌলতে। এখন স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। কবি চাকরি করে ব্যাংকক এন্ড উইলকক্সে। জুনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট।

পল্টু কুমার সুশীল অলোক আড্ডা দিচ্ছিল। পাঞ্জাবী রেষ্টুরেন্টের ভেতরে ওদের বসার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। আজ ওরা কেউই ওখানে বসেনি। রেষ্টুরেন্টের বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে

গল্প করছিল। বাচ্চা ছেলে মোহন ভাঁড়ে করে চারটে চা দেবার সময়েই কবি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। সুশীল বললো, মোহন আর একটা চা নিয়ে আয়। মিনিট তিনেক পরে মোহন আর এক ভাঁড় চা এনে কবির হাতে দিতেই বাস থেকে নেমে সীতানাথ বন্ধুদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। সুশীল বললো, এই ভাবে ক্ষেপে ক্ষেপে তোদের আসর কোনও মানে হয়? মোহন যা তো, আর একটা চা নিয়ে আয় বাবা!

মোহন চলে গেলে সীতানাথ বললো, সরকারকে ফাঁকি দিলাম তিরিশ পয়সা, আমার বেরিয়ে গেল চোদ্দ টাকার পেনটা। চায়ের ভাঁড়েতে সবে একটা চুমুক দিয়েছিল কবি, সীতানাথের কথা শুনে জোরে একটা বিষম খেলো। মুখের চা ফুলঝুরি হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বাইরে। সীতানাথ সামনেই দাঁড়ানো ছিল। ওর সার্টের বুকের বেশ কিছুটা অংশ ভিজে গেলেও সীতানাথ বিন্দুমাত্র রাগলো না। ম্যাকলিনসের হাসি হেসে বললো, লেখকরা মাল খায়। তুই চা খেয়েই ধ্যাড়াচ্ছিস—

পল্টু বলে উঠলো, জোক এ ডে! তা তোর পেনটা গেল কিভাবে? একটুও টের পেলি না!

আমার কী মনে হয় জানিস? পেনটা কেউ মেরে দেয়নি। বাসটায় প্রচন্ড ভিড় ছিল। একটা মেয়ে সামনে এগোতে না-পেরে জেন্টসের দিকে সরে এলো। দাঁড়ালো এসে একেবারে আমার সামনে। বুকের কাছে। লম্বা বিনুনী থেকে বেশ সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ আমেজ এনে দিচ্ছিলো। আমি খুব ঘনঘন তখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। যখন নেমে গেল তখনও আমি বাতাসে সুগন্ধ টানছি। তখন যদি একটু খেয়াল রাখতাম—আমার মনে হয় ওর বিনুনীর সঙ্গেই ওটা গেছে। বাসের ভিড় দেখে একবার ভেবেছিলাম ট্রামে উঠবো। কী যে দুর্মতি হলো গুঁতিয়ে-গাঁতিয়ে ওই ভিড় বাসেই উঠলাম।

মোহন সীতানাথের হাতে চায়ের ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুশীল চারমিনারের একটা নতুন প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে কুমার অলোক সীতানাথকে দিয়ে নিজেও একটা ধরালো। কবি আর পল্টু মদ সিগারেট খায় না। এ-ব্যাপারে পল্টুর শেষ কথা, যেদিন ফুটবল ছাড়বো তার পরের দিন থেকে ও-দুটো ধরবো। যাইহোক সকলের সিগারেট ধরানো শেষ হলে সীতানাথ একটা লম্বা টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়লো। চায়ে চুমুক বসিয়ে একটা আলাদা আমেজ নিয়ে বললো, আজ আমাদের অফিসে একটা কেলো হয়েছে। তিন-চার দিন হলো একটা মেয়ে এসেছে। বাঙালি মেয়ে। ম্যানেজারের পি.এ। টিফিন-টাইমে ওর হাতে কবির 'অন্তঃসত্ত্বা' বইটা দেখে দারুণ ভালো লাগলো। আনন্দে নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। বলার মধ্যে শুধু বলছিলাম, কবি বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু। কী বিষ কোবরা মেয়ে রে মাইরি! মুখের ওপরে দুম করে কী বললো জানিস? আজকাল আলাপ করবার লেটেস্ট ফ্যাশন এটাই। আমি যে কোম্পানির একজন ইঞ্জিনিয়ার সেটা পর্যন্ত মনে রাখলো না। সীতানাথ সিগারেটের আর এক কিস্তি ধোঁয়া ছেড়ে বললো, পল্টুর ব্যাপারেও এমনটা হয়েছিল। কোম্পানিতে তখন সবে ঢুকেছি। ফুটবল খেলার জম-জমাট আলোচনা চলছিল। তার পরের দিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচ। পল্টুর প্রশংসায় সকলে খুব মাতামাতি করছিল। ওই অবস্থায় কেউ চুপ করে থাকতে পারে বল? ওই একটা কথাই বলেছিলাম, পল্টু আমার বন্ধু। ছেলেগুলো কী বিচ্ছিরি ভাবে যে আওয়াজ দিয়েছিল আজও ভুলিনি। আমাকে প্রায় পাগল বানিয়ে ছাড়লো। একজন উত্তর দিল, জানেন গাভাসকর আমার বন্ধু। আর একজন টিপ্পনী কাটলো, পেলে আমার বন্ধু। আর এক গোঁড়ে বললো, প্রকাশ পাড়ুকোন আমার ন্যাংটো বয়সের বন্ধু। অবস্থাটা বোঝ একবার। আমাকে বেমালুম মিথ্যেবাদী তৈরি করে দিল। দেশটার কী হলো বলতো? সত্যি কথাটাও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর সেই অপমানের শোধ তুললাম পল্টুকে একদিন অফিসে নিয়ে গিয়ে। এখন তো আমার টেরিফিক খাতির। একখানা খেলার টিকিটের জন্যে আমার পায়ে পায়ে কুকুর ছানার মতো ঘুরে বেড়ায়। এখন সব ব্যাটাকে ল্যাজে খেলাচ্ছি। তা কবি—সীতানাথ কবির মুখের দিকে চেয়ে পরম বিশ্বাসে উজ্জ্বল হাসলো। আবেগ মিশিয়ে বললো, তুই কবে যাচ্ছিস?

কোথায়?

আমাদের অফিসে। মেয়েটাকে জব্দ করতেই হবে। প্রথমে হয়তো খুব ধানাই-পানাই করবে। এতো

ইয়াং ছেলে কবি বন্দ্যোপাধ্যায হতেই পারে না। কিন্তু যেটা সত্যি সেটা তো প্রকাশিত হবেই, তখন দেখবো কোথায় যায় লাবণ্য সরকার? ওকে কাবু করাটা একান্তই দরকার! তুই মাইরি কালকেই একবার চল—মুখের ওপর জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

ও-সব পাগলামো ছাড় তো! কবি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলো।

ছাড়বো কী বলছিস? সীতানাথ বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, আমি দারুণ অপমানিত বোধ করছি। তুই কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই আমাকে বাঁচাবি না?

পল্টু দুজনের কথাবার্তা শুনে খুব কৌতুক বোধ করলো। অলোক, সুশীল আর কুমারের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা কবলো। অর্থাৎ এখন সীতানাথেব পেছনে একটু লাগতে হবে। ও গম্ভীর হবার চেষ্টা কবে বললো, আমাব মনে হয় কবি তোর যাওয়াটা ঠিক হবে না। কেন-না লাবণ্য সবকার নামের মেয়েটি খুবই ক্ষেপে রয়েছে। এখন ওকে প্রমাণ দিতে যাওযাটা বেশ বোকামির কাজ হবে। তার চেয়ে ধীরে-সুস্থে পবে অন্য কোনও দিন. . .

পল্টু তুই আমাব অনেক উপকার করেছিস। কিন্তু এই মুহূর্তে আর দালালি করতে হবে না। সীতানাথ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললো, এটা আমার মরন-বাঁচন সমস্যা। তোরা ঘটনাটাকে খুব ইজি করে দেখছিস। কিন্তু আমাকে যে কোথায় আঘাতটা দিয়েছে সেটা তোরা কেউ একবারও চিন্তা করে দেখছিস না। কবি, আমি শুধু তোব মুখ থেকে একবাব শুনতে চাই তুই যাবি কি-না বল?

পল্টু চোখ টিপে কবিকে কী যেন ইঙ্গিত করলো। যা-বুঝবার কবি বুঝে নিল সঙ্গে সঙ্গেই। সে-ও ঠিক করলো আজ সীতানাথকে একটু রাগানোই যাক। কবি চিন্তিত মুখে উত্তর দিল, পল্টু যখন বারণ করছে তখন যাওযাটা কি ঠিক হবে? সীতানাথের মাথায় আগুন জ্বললো। প্রায় খেঁকিয়ে বলে উঠলো, পল্টু! হু ইজ পল্টু? এটা খেলার মাঠ নয় যে ও কর্তৃত্ব কববে। এখানে তুই-ই সব। তুই কালই যাবি কিনা তাই বল? তারপরেই আক্ষেপের সুরে বললো, এই তোরা বন্ধু? আমি একটা চূড়ান্ত অপমানের অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি আর তোবা এখন আমার সঙ্গে মজা কবছিস?

সীতানাথকে বাগিয়ে যেটুকু মজা করার উদ্দেশ্য ছিল, ও তার চেয়েও অনেক বেশি রেগে গেছে। আব বাড়াবাড়ি কবা ঠিক নয়। ওকে এবারে ঠান্ডা কবা দরকার। কুমার খুব শান্ত গলায় বললো, কবি, সীতানাথের অফিসে তুই কালকে একবার যা না—সত্যিই তো, ও যখন এতো করে বলছে. ....

বল কুমার, তুইই বল—সীতানাথ প্রশ্রয় পেয়ে কুটো ধবে ভাসতে চাইলো।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। তুই শুধু শান্ত হয়ে বোস। সীতানাথকে আশ্বাস দিয়ে কুমাব যেন বিচারকের রায় পাঠ করাব ভঙ্গিতে বললো, কবি কালকে তুই অবশ্যই যাচ্ছিস।

তোরা সব ব্যাপাবটা তড়িঘড়ি করে গুলিয়ে ফেলিস না। কবি খুব সংযত হয়ে উত্তর দিল, আমি তো বলেছিই একদিন যাওয়া যাবে। তোদেব আবার একরোখ, কালকেই যাওয়া চাই। কালকে আমার অসুবিধে আছে। কবি প্রার্থনার ভঙ্গিতে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে আবাবও বললো, সত্যিই কালকে অসুবিধে রয়েছে।

তোর আবার কিসেব অসুবিধা? কবিকে খোঁচাটা দিয়ে পল্টু এবারে সীতনাথের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমিও ওই ধরনের একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি।

সেটা আগে বলিসনি কেন? সীতানাথের ব্যারিষ্টার হয়ে অলোক কবিকে একেবারে কোণঠাসা প্রশ্ন করে পরক্ষণেই আবার গলার সুর নামিয়ে এনে বললো, তোর কেসটা বল শুনি—

বসেছিলাম পাবলিশারের দোকানে। কবি ঘটনাটা বন্ধুদেব কাছে সঠিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলো। তা হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দোকানেব কাউন্টারে উঠে এসে আমার 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইটার খোঁজ করলো। নিরাপদ বলে যে-ছেলেটি ওখানে কাজ করে সে বললো, বইটা আউট অফ প্রিন্ট। নেক্সট এডিশান না-বেরুলে আপনি পাবেন না। সে-

কথা শুনে মেয়েটা তো দারুণ মুষড়ে পড়লো। নিরাপদ তখন আমাকে দেখিয়ে মেয়েটাকে বললো, ওর কাছে যান। চেষ্টা করলে উনি আপনাকে এক কপি দিতে পারেন। মেয়েটি আমার কাছে এলো এবং বই চাইলো।

তুই কী বললি? সীতানাথ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে কবির মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো।

বললাম আগামীকাল দোকানে আসবেন, বইটা পেয়ে যাবেন।

ব্যস! আর কিছু বলিসনি? সুশীল একটু অবাক হলো।

আবাব কী বলবো?

তুই-ই যে কবি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত সেটা তো বলবি।

মেয়েটা আমাকে দোকানদার ভেবেছে। আমি ওকে আমার নাম বলতে যাবো কেন? তাছাড়া ওতো আমার না-জিজ্ঞেস করেনি। মনে হয় কালকে বই পাওয়াব পরে হয়তো জিজ্ঞেস কবতে পারে।

অলোক হেসে বললো, একেবারে হিন্দি ফিল্ম!

মেয়েটাকে দেখতে কেমন রে? পল্টু চোখের কোন দিয়ে কবিকে দেখতে লাগলো।

ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। কবি হেসে দিল। বললো, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা উপমা ইত্যাদি তাহলে ধার করতে হবে। তারপরেই কবি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। খুব নিচু সুরে একবার বললো, মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী। নয়াদিল্লিতে থাকে। মনে হয় বইটা নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ফিরে যাবে।

পল্টু আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দিতে কবি বললো, আমাকে বাদ দিয়ে বল। আমি এক্ষুনি বাড়ি ফিরবো।

চা-টা খেয়েই যা। পল্টু মোহনকে ছটা চাই দিতে বললো।

চা খেতে খেতে সুশীল বললো, কবি, কাল তুই লিখতে বসলেও আড্ডায় একবার আসিস। খুব টেনশানে থাকবো। ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো ক্রমশ দিয়ে এখন তো দিব্যি চলে যাচ্ছিস, কালকে এসে পরের অধ্যায় শুনিয়ে যাবি। সুশীলের কথাটা শুনে কবি একটু হাসলো। তারপরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। ওর বাড়িই শুধু রাখাল দাস আঢ্য রোডে। বাকি বন্ধুদের সকলের বাড়িই আফতাব মস্কো লেনে। অর্থাৎ আড্ডার জায়গা থেকে কবির বাড়ির দূরত্ব হচ্ছে তিন মিনিট। ওদের এক, দেড় মিনিটের মধ্যে।

কাঠের সিঁড়িতে পা রেখে কবি উপরে উঠতে যাবে চোখাচোখি হলো নীচের ভাড়াটে মিসেস করের সঙ্গে। ওর পুরো নামটা হলো দীপান্বিতা কর। বয়স সাঁইত্রিশ হবে। মুখশ্রী এমন কিছু সুন্দর নয় তবে ফিগারটা ভালো। সব সময়েই প্রসাধন করে ঝকঝকে পোশাকে থাকে। সারাদিনে খুব কম করেও তিনবার শাড়ি ব্লাউজ পাল্টানো চাই। সারা শরীর থেকে সারাক্ষণই সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। কাঁধ সমান ছাঁটা একমাথা ঘন চুল। পাখির ডানার মতো প্লাক করা ভ্রু। তেলতেলে মুখে হালকা লিপস্টিকের হাসি লেগেই থাকে। সিঁথিতে এক বিন্দু সিঁদুর থাকলেও কপালে থাকে যখন যে-রঙের শাড়ি ব্লাউজ সেই রঙের টিপ। স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত ড্রিঙ্ক করে বটে তবে কখনই তা শোভনীয়তার বাইরে চলে যায় না।

কবির দু'খানা বই পড়েই দীপান্বিতা দারুণ মুগ্ধ। কবির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে থাকলেও দীপান্বিতার সবচেয়ে প্রিয় লেখক হচ্ছে এখন কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপান্বিতার নিজস্ব ভাষায়, অদ্ভুত ভালো লেখে ছেলেটা। সাধারণ একটা ঘটনাকে এতো চিত্তস্পন্দী ভাবে তুলে ধরে একবার পড়া শুরু করলে শেষ না-করে পারা যায় না। আর শেষ হয়ে গেলে মনে হয় আর একবার পড়ি।

দীপান্বিতা বসেছিল তাদের ড্রইং-রুমে। এই ঘরটা উপরে উঠবার প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ির পাশেই। এবং যেহেতু বড়ো রাস্তার ঠিক ওপরেই নয়, গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে অনেকটা ভেতরে আসতে হয় তাই ড্রইং-রুমের বিশাল দরজাটা অনেক সময়েই খোলা থাকে। যেমন আজ ছিল! আর সেই

থেকে কাপে চা ঢালছিল নিজেব জন্যে। কবিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, লেখক এক কাপ চা খেয়ে যাও। কথাটা শুনে কবি হেসে ফেললো। পায়ে পায়ে ড্রইং-রুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, বৌদি আগে যেমন কবি বলে অর্থাৎ নাম ধরে ডাকতেন তেমনিই ডাকবেন। দু'দিন ধরে 'লেখক-লেখক' বলে কী সব শুরু করলেন বলুন তো?

লেখককে তো লেখকই বলবো! দীপান্বিতা সোনা ঝরা হাসলো। কবি বলি কী করে? রসিকতাটা কবিও উপভোগ করলো। দীপান্বিতা আবার বললো, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—চা খেয়ে যাও।

প্লিজ বৌদি, এতো রাতে আর চা খাবো না। তাছাড়া এইমাত্র খেয়েও এলাম। বাসুদাকে দেখছি না ফেরেননি এখনও?

ও ফিরলে কী এই সময়ে বসে বসে চা খাই? দুনিয়ার যতো মিটিং সব একদিনেই পড়েছে। কতো রাত হয় ফিরতে কে জানে—

ভোর হচ্ছে। পূব আকাশটা ক্রমশ ফর্সা হয়ে আসছে। এতো ভোরে সাধারণত কবির ঘুম ভাঙে না। আজ কিন্তু ওর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথমেই যার কথা মনে হলো তার নাম সে জানে না। শুধু হলুদ বসন্তের একটা উজ্জ্বল ছবি বারবার তার চোখের ওপর ভেসে উঠছে। কবি পাশ ফিরে শুলো। ওর ঘরের পাশেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। ডুমুর, পেয়ারা, কাঁঠাল আর কদমের মেলা সেখানে। এক লাইনে চারটে ফুলের গাছ। সৌন্দর্যের চেয়েও গন্ধটা কবির আরও বেশি ভালো লাগে। আর গন্ধটাও অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে বেড়ায়। বাগানের পরেই গঙ্গা। প্রায় পাড় ঘেঁসে এক সরলরেখায় গোটা দশেক সুপারিগাছ। বাগানের কোনে একটা গাছে বসে লুকিয়ে একটা কোকিল একটানা ডেকে চলেছে। যেন সুমধুর সংগীতের রেওয়াজ চলছে। নতুন করে কবিব ঘুম আসছে। নাম-না-জানা মেয়েটির চিন্তা তার মাথায় চেপে বসেছে বলেই কবির বারবার সেই মুখটা মনের মধ্যে এঁকে চলেছে। কী সুন্দর একটা মুখ! যেন দুর্গা প্রতিমা!! কবি কী কোনও প্রেবণা পাচ্ছে নতুন কিছু লিখবার বা ভাববার? চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কবি বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ছাদে পায়চারি করছেন চন্দ্রনাথ। একটু আগেই তাঁর ঘুম ভেঙেছে। বিছানা ছেড়ে সোজা চলে আসেন বাড়ির এই বিশাল ছাদে। সূর্যোদয় দেখেন, আসন করেন, সারা ছাদ পায়চারি করে পৌনে এক ঘন্টা, সময় কাটিয়ে দেন। এটা তাঁর বরাবরেব অভ্যেস। তিনি যখন নীচে নেমে আসেন ততোক্ষণে চা তৈরি হয়ে যায়। মহুয়াই চা বানিয়ে রাখে। সকলে তখন ডাইনিং-টেবিলে গিয়ে জড়ো হয়। অবশ্য সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার দায়িত্বটাও ওই মহুয়াকেই নিতে হয়। রবির বৌটা এই সংসারের লক্ষ্মী। আজকের দিনে এতো ভালো মেয়ে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। সংসারের প্রতিটি লোকের ওপর ওর সমান নজর। কে কী খাবে, কী পড়বে, কোথায় আতিথেয়তা করতে হবে, ধোপা বাড়িতে কোন জিনিসটা আগে যাবে ইত্যাদি সব কিছুতেই ওই মহুযা। এক কথায় পুরো সংসারটিই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সব কটি আলমারির চাবির গোছা স্নেহলতা পরম নিশ্চিন্তে চালান করে দিয়েছেন মহুযার আঁচলে।

পায়চারি করতে করতে অনেক কথা ভেবে চলেছেন চন্দ্রনাথ। সবার আগে যে-কথাটি তাঁর মাথায় এলো সেটা হলো কবির এবারে একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। এই কাজটা হলে চন্দ্রনাথ পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পাবে এটাই তাঁব কর্তব্যের শেষ অধ্যায়। দাদুভাই অর্থাৎ বুলানের বিয়ে কী তিনি দেখে যেতে পারবেন? না, সে আশা তিনি করেন না। তবে আকাঙ্ক্ষা যে হয় না তা নয়। নাতির বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকবো। মন্দ কি? হ্যাঁ এই চিন্তাটাও চন্দ্রনাথের মনের আকাশে ছোট্ট ঘুড়ির মতো ঘোরা-ফেরা করে।

আসলে তিনি সারা জীবনই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে পরিকল্পনার ছক কেটে চলেছেন। চলার অর্থে চলা নয়, এই ভাবেই তিনি এগিয়েছেনও। নিজে কৃতি ছাত্র ছিলেন। আই. সি. এস। সারা জীবন কেন্দ্রীয় সরকারের পরে রাজ্য-সরকারের বিভিন্ন উঁচুপদে চাকরি করেছেন। বছর চারেক হলো রিটায়ার করেছেন। দুই ছেলে রবি এম.এ-তে ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। সে এখন কেন্দ্রীয় সরকারের

একটি সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার। ছোট ছেলে কবি বি.কম পাশ করে কষ্ট অ্যাকাউন্টেনসীটাও সেরে নেয়। এখন ব্যাংকের জুনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট। তাছাড়া লেখক হিসেবে তো এখন ওর বাংলা-জোড়া নাম। বাংলাতে ও বরাবরই ভালো। স্কুল-কলেজে ম্যাগাজিনে লিখেছে, লিখেছে লিটল ম্যাগাজিনেও। কিন্তু তা আর এমন কী? সেই কবি যে দু'খানা মাত্র উপন্যাস লিখে এমন ভাবে আলোড়ন তুলবে সেটা আর কে ভেবেছিল? হ্যাঁ। এই অধ্যায়টা চন্দ্রনাথের হিসেবের মধ্যে ছিল না। ছোট ছেলের জন্য তিনি এখন গর্ব অনুভব করেন। দু'খানা বই-ই তিনি পড়েছেন। ছেলেটার লেখার হাতটা বড়ো চমৎকার! ও আরও অনেক, অনেক নাম করবে। মনে মনে চন্দ্রনাথ সেই আশীর্বাদই করেছেন।

দুই ছেলের মাঝে একটি মাত্র মেয়ে। উপমা। বাংলা নিয়ে পড়াশুনা করেছে। এম.এ-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল সে। বছর আটেক আগে উপমার বিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রনাথ। ওর একটি মাত্র মেয়ে। বছর তিনেক বয়স। ওর স্বামী দেবাশিস পরিবহণ দপ্তরের সচিব। ওরা থাকে বেহালায়। প্রায়ই চন্দ্রনাথকে দেখতে আসে।

সূর্যের রং এখন রূপালি। ধবধবে সাদা। কখন যে গাঢ় লাল শালুর জামাটা ছেড়ে ফেলেছে চন্দ্রনাথ টের পাননি। আস্তে আস্তে তিনি নীচে নেমে এলেন।

মহুয়া চা তৈরি করে কাপ ডিস ইত্যাদি টেবিলে সাজিয়ে প্রথমে স্নেহলতাকে ডেকে দিল। ববির ঘুম ভাঙিয়ে বললো, বুলানকে ডেকে তোলো—আজ ওর অনেক পড়া বাকি রয়েছে। আমি কবিকে ডেকে তুলছি। বলতে বলতে মহুয়া কবির ঘরে এসে উপস্থিত হলো। কবি ঘুমুচ্ছে। ওর পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে ঘুমুচ্ছে পিপিন। কবিকে একটা ডাক দিতেই আজ ওর ঘুম ভেঙে গেল। মহুয়া বললো, চা রেডি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো।

কবি মহুয়ার মুখের দিকে তাকালো। সামান্য একটু সময় নিয়ে কী যেন ভাবলো। বললো, আচ্ছা বৌদি আমাদের আলমারিতে আমার প্রথম বইয়ের কটা কপি আছে?

একখানা! ভাবনা-চিন্তার কোনও ব্যাপার নয়। মহুয়ার রেডিমেড উত্তর।

মাত্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মহুয়া সকালের সোনারোদ্দের চেয়েও ঝিকমিক করে হেসে উঠলো। তোমাকে হাজারবার বলেছি, নিজের লেখা বই খুব কম করেও বাড়িতে দু'কপি করে রাখা উচিত। সে তো তুমি শুনলে না—

বৌদি ব্যাপারটা কী জানো, আজকে এই কপিটাও বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে। তুমি এখনই আলমারি থেকে নামিয়ে রাখো নয়তো অফিসে যাবার সময়ে ভুলে যাবো।

বাড়ি শূন্য করাটা কী ঠিক হবে?

আরে আর দু'তিন সপ্তাহ পরেই তো নেক্সট এডিশান বেরিয়ে যাবে। তখন না-হয় চার-পাঁচ কপি এনে দেবো। কবি হেসে আরও যোগ করলো, আলমারি সাজিয়ে রেখো।

তা তো রাখবই। মহুয়া জোর দিয়ে বললো, কিন্তু সবেধন নীলমণি কপিটা দেবে কাকে?

সে তোমাকে পরে বলবো।

দেবে আজকে আর আমাকে বলবে পরে। এটা কী রকম হলো?

এমন কিছু গুরুতর হবে না। কবি একগাল হেসে দিল, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে শিগ্‌গীর চলো—

সরস্বতী লাইব্রেরিতে বসে রাতুল আর কবি দু'জনে গল্প করছিল। রাতুল বললো, তুই একটা হোপলেস! অতো সুন্দরী একটা মেয়ে তোর বইয়ের জন্য পাগলের মতো সারা কলকাতা তোলপাড় করে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তুই কিনা ঘুণাক্ষরেও জানালি না যে তুই-ই কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। তুই কী রে! আজ আসুক মেয়েটি। আমি সব ফাঁস করে দেবো।

না। ভরাট গলায় বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে কবি বললো, আমার নাম প্রকাশ করার কোনও সুযোগই ঘটেনি। উপযাচক হয়ে বলতে গিয়ে আমার নামটা নাই-বা হলো অবহেলিত। প্লিজ রাতুল, অমনটা করিস না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি চুপচাপ থাকিস। কেন-না আমার দৃঢ় বিশ্বাস কথা বললেই

তুই বলে ফেলবি। তাহলে কিন্তু আমি দুঃখ পাবো। জানি স্বাভাবিক কারণেই তুই এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল কর, মেয়েটা আমাকে দোকানদার বলে ভাবছে। আমার নামটাও সে জানতে চাইছে না। সেখানে আমি কী বলতে পারি, আমার নামই কবি বন্দ্যোপাধ্যায়?

তোর যা মনে হয় তুই কর! কথাটা বলে রাতুল অনেকক্ষণ কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়লো, তুই তো লেখক। বুদ্ধিজীবী! যা ভালো বুঝিস কর।

এটা তো রাগের কথা হয়ে গেল। কবি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, তুই তো একটা স্বাভাবিক নিয়মে চলবি? তোকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আপনার নামই রাতুল মুখার্জি? তুই কী তখন উত্তর দিবি, হ্যাঁ আমি এম.এ পাশ? কবির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো রাতুল। বললো, জব্বর উদাহরণ টেনেছিস। কথা দিচ্ছি আমি স্পীকটি নট থাকবো তবে কী জানিস, মেয়েটার জন্য দুঃখ হবে। বেচারা জানতেও পাবে না তার আকাঙ্ক্ষার বইখানা সে কার হাত থেকে নিচ্ছে।

এমনটাই হয়। এর নামই বাস্তব।

তোর এই বাস্তবের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার কবি। আর আমাকে বোঝাস না।

নির্দিষ্ট সময়ে টুকুন এলো। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সে দোকানের ভেতরের টেবিলে রাতুলদের সামনে এসে দাঁড়ালো। কবি ওর মুখের দিকে তাকালো। বইটা পাবার ওর গরজ ছিল। সে-কারণে আজ আসবেই—এটা কবি জানতো। কিন্তু এটাও একবার মনে হয়েছিল, আদুরে মেয়ের খেয়ালের মতো প্রথমে দিন বইটা খোঁজাখুঁজি করে না-পেয়ে দ্বিতীয় দিনে আর হয়তো এলোই না। কিন্তু না, মেয়েটি এসেছে। অর্থাৎ বইটা পাবার জন্য ওর আন্তরিকতা ছিল। ভাবতে ভালো লাগছে মেয়েটা ঝোঁকের বশে এ-পাগলামোগুলো করছে না। কবি স্বপ্নের দৃষ্টি নিয়ে বললো, বসুন—পরে নিরাপদকে ডেকে বললো, বইটা একটু প্যাকেট করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বইটার ওপরে চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে টুকুন কবির মুখের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, কতো দাম? কবি কী যেন ভাবলো। আসলে উত্তরটা কী দেওয়া যায় তা নিয়েই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, দাম যদিও কুড়িটাকা কিন্তু এটা বিক্রির জন্য নয়। ফ্রি কপি!

টুকুন বললো, তা হোক। আমাকে তো কিনতেই হতো, সুতরাং টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে। কথাটা শেষ করে সে ব্যাগ খুলে দু'খানা দশটাকার নোট টেবিলের ওপরে রেখে দিল।

নিরাপদ ততোক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাত থেকে বইয়ের প্যাকেটখানা নিয়ে টুকুন কবিকে আন্তরিকতার সঙ্গে বললো, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমি তো খুঁজে বইটা না-পেয়ে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনি অনেক কষ্ট করে বইটা আমাকে সংগ্রহ করে দিলেন—

কবি ম্লান হাসলো একটু। উত্তর দিল, ও কিছু নয়।

চলি তাহলে—নমস্কার। টুকুনের দুই ঠোঁটে সামান্য হাসি। নাকছাবিটা আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কবি সেই দিকে তাকিয়ে অন্য এক জগতে চলে গেল। স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বলে উঠলো, নমস্কার।

টুকুন দোকান ছেড়ে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর বেশ কয়েকদিন কবির সমস্ত চিন্তার মধ্যে হলুদ বসন্তের ঢেউ খেলে যেতে লাগলো। কোমর সমান ছড়ানো একঢাল কালো চুল, আয়ত গভীর দুটো চোখ। নাকে সাদা পাথরের সুন্দর একটা নাকছাবি। সারাদিনের হাজারো কাজের মধ্যেও কবির মনের আয়নার বারবার ছায়া পড়তে লাগলো একটা মুখ। দুর্গা প্রতিমার মতো সেই তেলতেলে ভরাট মুখে একটা নাকছাবি!

একটা মাস কবি প্রায় কিছুতেই লিখতে পারলো না। একটা অস্থির অসহায় অবস্থার মধ্যে তার দিন কেটেছে। মেয়েটা বলেছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে দিল্লিতে ফিরে যাবে। সে কী ফিরে গেছে নাকি এখনও কলকাতাতেই রয়েছে? রাস্তায় কতো হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাঁটতে হয়, হাজারো চোখের সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হয়। ওর সঙ্গে কী আর একবারও দেখা হতে পারে না? কবি নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে যা-হারালো তার মানসিক যন্ত্রণা যে এতো তা সে আগে কেমন করে বুঝবে? এখন মনে হয় রাতুলের কথাই ঠিক। মেয়েটিকে দুম করে নিজের নামটা আগে

থেকে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সাহিত্য নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করলেই মেয়েটি কবির জ্ঞান-বুদ্ধির একটা হদিশ পেয়ে অবশ্যই মুগ্ধ হতো। এবং সেক্ষেত্রে সে নিজেই কবির নামটা একসময় জানতে চাইতো।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এই প্রবাদ বচনটি কতখানি সত্যি কবি সেটা এখন অবশ্যই বুঝতে পারছে। এই মুহূর্তে কত সম্ভাবনার কথা মনে পড়ছে অথচ হাতের ঢিল এখন জলে। সেই সুন্দর নাকছাবিটার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে অথবা আদৌ দেখা হবে কিনা সেটা এখন পুরোপুরি ভাগ্যের ব্যাপার। এই ভাবে সময় নষ্ট করে না-লিখে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না। এটা যুক্তিহীন। মন খারাপ হলেও তাকে লেখার সৃষ্টির মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। লেখাটা তার সাধনা সাধনা ছাড়া কোনও মানুষ বড়ো হতে পারে না। কবিকে আরও বড়ো হতে হবে। আরও বড়ো হওয়া মানে আরও ভালো লিখতে হবে। সেই লেখার সুবাসে ওই নাকছাবিটা কী একবারও তার সামনে এসে দাঁড়াবে না? নিশ্চয়ই আসবে। সে-বিশ্বাস কবির আছে। সব অবসাদ মানসিক ক্লান্তি মুছে ফেলে কবি নতুন করে লেখার প্রেরণা পেল। এই একটা মাস না-লিখে সে খুব অন্যায় করেছে। আর ভুল নয়। এখন থেকে শুধু লেখা আর লেখা!

ইতি মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে গেছে। একদিন সকাল বেলা আটটা টাটটা হবে। জগৎবাণীর প্রকাশক হরিকিশোর মন্ডল গাড়ি করে এলেন কবির বাড়িতে। কবি তখন পড়ার টেবিলে। লিখছিল। দারুণ ভাবে আপ্যায়ন করলো হরিকিশোরকে। হরিকিশোর একটা সোফায় বসলেন। বাহান্ন তিপান্ন বছরের একটা ইয়াং যুবক তিনি। পরনে জিনসের ট্রাউজার্স। স্পোর্টস গেঞ্জি। কালো মোটা চশমাটা খুলে পকেট থেকে একটা ধবধবে সাদা রুমাল বের করে কাচটা ভালো করে পরিষ্কার করলেন। তারপরে রুমাল এবং চশমা দুটিকেই যথাস্থানে রেখে কবির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, কী লিখছেন এখন?

এই ছাই-পাশ যা লিখে থাকি আর কী—কবি একটু হাসলো।

প্লিজ! ও-সব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না কবিবাবু। সকল লেখকের আরম্ভটা এই ভাবেই হয়। আপনি জানেন—রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পাওয়া লেখক কমলেশ বসু কিভাবে তার প্রথম উপন্যাস নিয়ে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন? আর আজকে দেখুন, আমরা এখন তাঁর বাড়ির দরজায় মাথা কুটে মরছি। এমনটাই হয়। ঝানু ব্যবসায়ী হরিকিশোর। তিনি জানেন কখন কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, তাই বলে সব কিছু কী মনে রাখতে হয়? যেটা বাস্তব সেটা খারাপ লাগলেও মানিয়ে চলতে হবে। আমি প্রকাশক। প্রাথমিক স্তরে আমি আপনাকে অনেক কিছুই বলতে পারি বিজনেসের স্বার্থে। আজ আপনি লেখক মানে নামী লেখক। এই মুহূর্তে আপনিও আমাকে অনেক কিছু বলতে পারেন, শর্ত আরোপ করতে পারেন আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে। আমি বলতে চাইছি সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে হবে। একটু সময় নিলেন হরিকিশোর। নতুন করে হাসলেন। আমি বুঝতে পারছি আমার ওপর আপনি এখনও রেগে আছেন—

রাগারাগির আর কী আছে—তবে দুঃখ যে পাইনি তা নয়। কবি পুরানো স্মৃতি মনে করে বললো, আমি আপনাদের সবাইকে একটা কথাই বোঝাতে চেয়েছি, বলতে চেয়েছি, আপনাদের কাউকে আমার লেখাটা ছাপাতে হবে না। শুধু পড়ুন। অনুগ্রহ করে একবার শুধু পড়ুন। আপনারা কেউ পড়েননি।

তাইতো আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। আমাদের জগৎবাণী থেকে আপনার একটা উপন্যাস ছাপতে চাই। হরিকিশোর অর্থপূর্ণ হেসে বললেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে কোনও কিছু আটকাবে না। আপনি যা-চাইবেন তাই পাবেন।

টোপটায় কিন্তু কবি কাবু হলো না। হরিকিশোর যা-যা বললেন, যুক্তিতর্কের খাতিরে তা মেনে নিলেও তার ওপরেও একটা কথা থেকে যায়। উনি পুরো ছটি মাস তাকে ঘুরিয়েছেন। শেষে তো বেশ অবজ্ঞার ভঙ্গিতেই বলেছিলেন, এখন মশাই ছুটি কাটাতে সিমলা যাচ্ছি। ফিরে এলে

দেখা করবেন। ফিরে আসার পরেও কবি দেখা করেছিল। হরিকিশোর মুখের উপর না-করে দিয়েছিলেন। সেই অপমানের জ্বালাটা কবির মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। ভুলতে চাইলেও কবি ভুলতে পারছে না।

বড়ো এক প্লেট ভর্তি মিষ্টি আর এক গেলাস জল নিয়ে মহুয়া ঘরে ঢুকলো। হরিকিশোরের সামনের টেবিলে সেগুলো নামিয়ে রেখে মহুয়া বললো, এটুকু খেয়ে নিন। কবি হরিকিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার বৌদি। আর বৌদি, উনি হচ্ছেন জগৎবাণীর প্রকাশক হরিকিশোর মন্ডল। উভয়ে নমস্কার বিনিময়ের পালা শেষ হলে কবি বলে উঠলো, হরিকিশোরবাবু মিষ্টিটা খেয়ে নিন।

মিষ্টি আমি খাই না। ডাক্তারের বারণ আছে। হরিকিশোর হাসলেন। তবে বৌদি নিজে হাতে এনেছেন, আমি একটা তুলে নিচ্ছি।

কথাটা শুনে মনে মনে একটু হাসলো কবি। সত্যিই এঁরা পাকা ব্যবসায়ী। নিজের প্রায় মেয়ের বয়সী মহুয়াকেও 'বৌদি' বলে ডাকার মধ্যে কবি অন্তত সেই পরিচয়ই পেল। কবির মনে হলো, এই মুহূর্তে বুলান যদি এই ঘরে আসে আর ওকে যদি সে কাকা বলে সম্বোধন করে, হরিকিশোরও বোধহয় তাই ডাকতেন। প্রয়োজনে মানুষকে খুশি করবার আশ্চর্য সব রীতি-নীতি! আসলে বোধহয় তখন নীতিটাই ঠিক থাকে না। তাই এই সব বেযাড়া বেখাপ্পা ব্যাপারগুলো ঘটে যায়।

মহুয়া প্লেট, জলের গেলাস ইত্যাদি নিয়ে চলে যাওয়ার পর কবি হরিকিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, খুব আনন্দ পেয়েছি। তবে আপনার অনুরোধটা এইমুহূর্তে রাখতে পারছি না। আমি বেড়াতে কাশ্মীর যাচ্ছি। সেখান থেকে বরং ফিরে আসার পরে ....

আপনি কী আমাকে এড়াতে চাইছেন? একটু আহত হবার হাসি নিয়ে হরিকিশোর সোজাসুজি প্রশ্নটা করে বসলেন, আমাকে আপনি চেনেন না; আমি আবার আসবো। বলুন, কাশ্মীর থেকে কবে ফিরবেন? আমি বরং তার পরেই আপনার এখানে এসে হাজির হবো। ব্যাপারটা কী জানেন কবিবাবু, আমিও সিমলাতে যাইনি আর আপনিও কাশ্মীর যাচ্ছেন না। আপনার রাগটা এখনও পড়লো না—এটাই আমার দুঃখ।

কবি দেখলো যথেষ্ট হয়েছে। আর বাড়াবাড়ি করা ভালো নয়। সে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেবার জন্য হেসে বললো, আপনাকে আমি বই দেবো। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আপনি কী মাস চার-পাঁচ ওয়েট কবতে পারবেন? প্লিজ, এরমধ্যে আবার অন্য কিছু মনে করবেন না।

কোন কথার কী মানে হয় সেটা আমি একটু ভালোই বুঝতে পাবি কবিবাবু। হরিকিশোর এতোক্ষণে নিশ্চিন্তের হাসি হাসলেন। বললেন, বেশ, আমি অপেক্ষা করবো। আপনাকে বরং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে যাই—

না। সে-সবের দরকার নেই। আমি যখন আপনাকে দেবো বলেছি এটাই ফাইনাল। আমার কথার কোনও নড়চড় হবে না।

তাহলে আমি এখন যাই?

আসুন।

এই ঘটনার দিন দশ-বারো পরেই তাদের বাড়িতে দে ব্রাদার্সের বুদ্ধাংশু দে এসে হাজির। কবি তখন বাড়িতে ছিল না। রাত আটটা সাড়ে-আটটা হবে। মহুয়া বললো, কবি তো এখনও বাড়ি ফেরেনি। আপনি বসতে পারেন।

ভদ্রতার কোনও ত্রুটি রাখেনি মহুয়া। বুদ্ধাংশু দে'কে চা-জলখাবার তৈরি করে দিয়ে বাড়ির কাজের ছেলে ভূপালকে পাঠিয়েছে গোপালনগরের ওদের আড্ডার জায়গায়। বাড়ি না-এসে আগে যদি আড্ডায় গিয়ে থাকি! এমনটা যে করে-না তা তো নয়। সেই কারণেই ভূপালকে সেখানে পাঠানো। ভূপাল ফিরে এসে খবর দিল, ছোটদা আড্ডায় নেই।

পল্টু ওদের বলে এসেছিস তো, কবি গেলে তাড়াতাড়ি যেন ওকে ব্যড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

বলে এসেছি।

বুদ্ধাংশু দে'কে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আধঘন্টার মধ্যেই কবি চলে এলো। ষাট বছরের এই বৃদ্ধ প্রকাশকটিকে দেখে সে মোটেই খুশি হলো না। এঁর কাছে সে কম অপমানিত হয়নি। কবি সব প্রকাশকের সব খারাপ ব্যবহার ভুলে যেতে পারে কিন্তু দে ব্রাদার্সের এই বুদ্ধাংশুবাবুর সঙ্গে সে কিছুতেই সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারবে না। কী করে পারবে? মার্চ মাসে কবি পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিল। লেখাটা রেখে দিয়ে বুদ্ধাংশু বলেছিলেন, এক সপ্তাহ বাদে আপনাকে চিঠি লিখে আমার মতামত জানিয়ে দেবো। তিন সপ্তাহ কেটে যাবার পরেও কোনও চিঠি এলো না। কবি এরপরে নিজেই গিয়েছিল। বুদ্ধাংশুবাবু ঝড়ের গতিতে লেখাটা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, পড়ার সময় করে উঠতে পারিনি।

বেশ তো লেখাটা রেখেই দিন। পরে সময় করে একবার পড়ে নেবেন।

বলছি তো মশাই পড়ার সময় পাবো না। লেখাটা নিয়ে যান। ছোটখাট পাবলিশার-টাবলিশার দেখুন। নতুন লেখককে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার বিলাসিতা আমার নেই। আপনি আসতে পারেন।

বুদ্ধাংশুবাবুর একটি কথাও কবি ভোলেনি। এ-গুলো ভোলা যায় না। কবি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালো, দে ব্রাদার্সে সে-বই দেবে না। শুধু আজ নয়, যতোদিন বেঁচে থাকবে ওই প্রকাশনালয় থেকে তার কোনও বই প্রকাশ করবে না। অহেতুক কথা বাড়িয়ে তাই লাভ নেই। সোজাসুজি কথাবার্তা সেরে নেওয়াই ভালো। কবি বললো, কী ব্যাপার বলুন—

রাত নটা সওয়া-নটা পর্যন্ত একজন পাবলিশার যদি কোনও লেখকের বাড়িতে অপেক্ষা করে, তার মানে তো একটাই দাঁড়ায় কবিভাই। আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বলে বুদ্ধাংশুবাবু সহজ ভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, আপনার একটা উপন্যাস চাই। কমলেশ বসুকে আমরা যে-টাকা দিই আপনাকেও তাই দেবো।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে নামী এবং দামি লেখক কমলেশ বসু। তাঁর দক্ষিণাটাও বড়ো মাপের অর্থাৎ প্রায় আকাশ ছোঁয়া। বুদ্ধাংশুবাবু কবিকে রাজি করাতে তাই সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণটাই সামনে রাখলেন। কিন্তু তিনি কবি বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এই তরুণ লেখকটিকে তখনও চিনে উঠতে পারেননি। প্রথমত টাকার জন্য কবি লেখে না। লেখাটা তার সাধনা। তারপরে টাকা যদি আসতে থাকে আসুক। সুতরাং টাকার ওই লোভ দেখিয়ে অন্য কাউকে ভোলানো গেলেও কবিকে ওই পথে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কমলেশ বসুকে আপনারা কতো টাকা দেন, না-দেন সেটা আমার জানবার বিষয় নয়। আমাকে কতো দেবেন সেটাও আমি শুনতে চাই না। কবি দৃঢ় প্রত্যয়ে আস্তে আস্তে বললো, দে ব্রাদার্সে আমি কোনও বই দেবো না।

প্লিজ কবিবাবু। আপনি একটু ভেবে দেখুন।

এতে ভাবাভাবির কী আছে? কবি একেবারেই স্পষ্ট বক্তা। আপনাকে আমি বই দেবো না।

আমার আগের ব্যবহারটা মনে রেখে আপনি যদি বই না-দেন, ব্যাপারটা তাহলে খুবই দুঃখের হবে। বুদ্ধাংশুবাবু করুণ হেসে বললেন, আমার জায়গায় আপনি থাকলে আপনিও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারই করতেন। হয়তো ডিগ্রীর তফাত হতো কিন্তু ব্যাপারটা তো একই।

বুদ্ধাংশুবাবু! আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন। আপনি অতিথি তাই আপনার ও-কথার উত্তরটা আমার জানা থাকলেও এইখানে বসে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আপনাকে অনুরোধ করছি আমার পক্ষে বই দেওয়াটা খুবই কষ্টের হবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার যে কোথায় কতোখানি লেগেছে তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

আগের ঘটনাগুলো কী ভোলা যায় না? বুদ্ধাংশুবাবু শেষ চেষ্টা করে বললেন, আপনি আমার ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট হবেন—

তাতে কী? ও-সব সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলে কী লাভ বলুন—

আপনি তাহলে আমাকে বই দেবেন না? ভাঙা গলার ক্ষীণ প্রশ্নে বুদ্ধাংশুবাবু কবির মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেন।

শেষ মুহূর্তে যদি কবির মত পাল্টায়। কিন্তু আশ্চর্য জেদ ধরে বসে আছে কবিও। অন্য অনেক ক্ষেত্রে তার 'না' হ্যাঁ হয়েছে। মতের পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। আজ কিন্তু সে অন্য ধাতুতে তৈরি হয়ে বেশ কঠিন আর জেদী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই তাকে রাজি করায়। মা-বাবা দাদা-বৌদিও যদি বলেন সেক্ষেত্রেও উত্তরটা ওই একই থাকবে। কবি খুব আস্তে অথচ কাটা কাটা সুরে বললো, আমার যা-বলার তা তো প্রথমেই বলে দিয়েছি। বলতে পারেন এটা একটা চ্যালেঞ্জ। না, নিজেকে আমি কখনওই বড়ো লেখক বলে মনে করি না। কিন্তু বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। আর এই বড়ো হওয়ার পথে আপনার মতো একজন অত্যন্ত নামী অগ্রণী প্রকাশকের সাহায্য ছাড়াই এগোতে চাই। আপনার প্রকাশনালয় থেকে নাই-বা বেরুলো আমার বই। বেঁচে থাকতে পারি কিনা সেটা অন্তত আমাকে দেখতে দিন। এটা আমার নিজের সঙ্গেই নিজের প্রতিযোগিতা। আপনাকে বিন্দুমাত্র অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আশা কবি এরপরে আর কোনও কথা থাকতে পারে না।

আর কোনও কথা হয়ওনি। বুদ্ধাংশুবাবু নীরবে চলে গেলেন। তাঁর ষাট বছরের জীবনে এটা একটা বিরাট পরাজয়। লেখক প্রকাশককে রিফিউজ করেছে এটা সত্যিই ভাবা যায় না। শুধু ভাবা? কাউকে বলাও যাবে না। কবি বন্দ্যোপাধ্যায় নামের একজন নতুন ছোকরা লেখকের শক্তিশালী কলমের মতো মুখের কথাগুলোও যে এমন ধারালো সেটা জানা ছিল না। রাস্তায় পা দিয়ে বুদ্ধাংশুবাবু কবিদের বাড়িখানা ভালো করে একবার দেখলেন। বাড়ি নয় যেন কবিকেই দেখলেন। বিশাল মহীরুহের মতো বাড়িটা চারদিকের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সরস্বতী লাইব্রেরী থেকে কবির তৃতীয় উপন্যাস বেরুলো। বইয়ের নাম 'পবিত্র প্রাঙ্গন'। আদালতের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে এই লেখা। সাধারণ মানুষের কাছে আদালত হচ্ছে ন্যায়ের মন্দির। অথচ সেই মন্দিরে এখন আর বিন্দুমাত্র ন্যায় পাবার উপায় নেই। সত্যের নামে মিথ্যার পাহাড় জমা হচ্ছে সেখানে। বিচারের নামে চলছে দুর্নীতি, নোংরামি। আর আদালত চলে যাচ্ছে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতে।

আদালতের মুখোশ খুলে দিয়ে কবি এই উপন্যাসে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়েছে প্রতিটি পাঠকের মনে। জানা কথা, জানা ঘটনা। প্রতিটি মানুষের অভিজ্ঞতার কথা। অথচ বইটা পড়ার সময় মনে হয় কতো নতুন। কতো বিচিত্র ভাবে লেখার জাদুতে সে-সব কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে যা পাঠকের মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়।

সরস্বতী লাইব্রেরী প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় কবির 'পবিত্র-প্রাঙ্গনের' বিজ্ঞাপন দিল। তবে সবচেয়ে বড়ো করে দিল সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা স্বদেশ-এ। অর্থাৎ সকলেই জেনে গেলেন যে কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস বের হয়েছে। এইটুকুই যথেষ্ট। এখন পাঠকরা বই কিনবেন তাদের নিজেদের গরজে।

সন্ধ্যে তখন সাড়ে-ছটা পৌনে-সাতটা হবে। গোপালনগরের মোড়ের ওপরেই সাত্তারের পানের দোকান। পাঞ্জাবী রেষ্টুরেন্টের ভেতর থেকে চা খেয়ে পল্টু কবি সীতানাথ কুমার সুশীল অলোক ওরা একে একে বেরিয়ে এসে পানের দোকানে ভিড় জমালো। সীতানাথের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে সুগন্ধি জর্দা-ফর্দা দিয়ে সবাইকে নিয়ে পান খাবে। আসল ব্যাপার হলো কালকে ওর বিয়ে। আজকে তাই নানারকম ইচ্ছা-টিচ্ছা জাগছে। সবই খুশির কারণে। এই সময়ে কাউকে বাধা দিতে নেই। দিলে সে রেগে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। পানের দোকানে এসেই সীতানাথ জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে সাত্তার, তোর সবচেয়ে বেশি দামের পান কী আছে রে?

বাদশাহী পান খাও। একটা সত্তর পয়সা।

ছটা দে। আমীরি চালে সীতানাথ পানের অর্ডার দিতেই অলোক আপত্তি জানিয়ে বললো, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করে কী লাভ? কুড়ি পয়সার পান নে।

একদম ভিখিরিপনা করবি নাতো—প্রচন্ড রেগে গেল সীতানাথ। খাওয়াচ্ছি আমি, তোর এতো গায়ে লাগছে কেন?

তোর পয়সাকে নিজের পয়সা ভাবি বলে—অলোক হাসি হাসি মুখে কথাটা বলতেই সীতানাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, সেই ভাবাটা মোটেই খারাপ নয়, তবে কালকে যাকে পাবো তার ওপরেও তোর এই ভাবাভাবিব ব্যাপারটা যতো কম থাতে ততোই মঙ্গল। কথাটা শেষ করেই সীতানাথ একঝলক হেসে উঠলো।

সাত্তারের পানের দোকানে ছ' বন্ধুকে ঘিরে বেশ ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল। মূল আকর্ষণ অবশ্য পন্টুকে কেন্দ্র করে। আগামীকাল লীগের গুরুত্বপূর্ণ খেলা। মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচ। ফুটবলের চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা কে পাবে আগামীকালের ফলাফলের ওপরেই সেটা নির্ভর করছে। দুই দলেরই সমান পয়েন্ট। সুতরাং কালকের খেলা মরণপন খেলা।

পাড়ার ছোটরা অর্থাৎ যাদের বয়স মোটামুটি কুড়ির নীচে তারা বিরাট একটা মোহনবাগানের মেরুন-সবুজ চাদর মোড়ের মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত। প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা। এতো বড়ো পতাকা বা চাদর যাই বলা হোক না কেন এটাকে, কলকাতার কোথাও নেই। মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন এই পাড়াতে থাকে বলে কথা! তার একটা সম্মান নেই? ছোটদের গ্রুপের তোতন, কালু, বাবলু ওরাই ঠিক করেছিল, ক্যাপ্টেনকে অনার দিতে আমাদের পাড়ার ফ্ল্যাগটাই হবে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য। ওরা কথা রেখেছে।

ওই ফ্ল্যাগে আর পন্টুকে ঘিরেই এখন জমজমাট ভিড়। সারা কলকাতা যেন উৎসব নগরী। সব পাড়াতেই ফ্ল্যাগ ঝুলছে। কোথাও ইস্টবেঙ্গলের কোথাও মোহনবাগানের। কোথাও আবার পাশাপাশি দুটোই। লাল হলুদ আর মেরুন সবুজের রং নিযে কলকাতা যেন হোলি খেলছে।

মোড়ের মাথায় কেনাকাটি করতে করতে অথবা পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে অনেকেই পন্টুকে একঝলক দেখে নিচ্ছে। পরিচিত যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এসে একগাল হেসে পন্টুর সঙ্গে কথা বলছে। হাসির ধরন দেখলেই বোঝা যায় আসলে ওর সঙ্গে কথা বলতে পেরে তারা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে। নানা লোকের নানা ধরনের প্রশ্ন। হাজারো কথা।

—কী পন্টু, কালকের ম্যাচে জেতা চাই-ই কিন্তু—

—গতবার ইস্টবেঙ্গল আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল। এবারে তার শোধ তোলা চাই।

—কাল তোমাদের প্রথম এগারজনের টিম কী হবে?

—ভট্টাচার্যকে বোলো ওর স্টপার পজিশন ছেড়ে বারবার যেন এগিয়ে না-যায়। ইস্টবেঙ্গল যেন গোলের ফাঁক ফোকর না-পায়। খুব টেনশনে আছি। ওই সময়ে তোতন ওই ভদ্রলোকের মুখের ওপর মোক্ষম অস্ত্রটি ছুড়ে দিল, আচ্ছা গনপতিদা, এটা কীরকম ব্যাপার হলো বুঝলাম না—খেলবে পন্টুদা আর এখন থেকে টেনশনে ভুগছেন আপনি?

হরিহরবাবু পাড়ার বয়স্ক এবং বহু পুরোনো বাসিন্দা। মোহনবাগানের মেম্বার। তাঁর একখানা টিকিট তিনি ক্লাব থেকেই পেয়েছেন। অসুবিধা হয়েছে তাঁর জামাই এসেছে বাড়িতে ওই টিকিটখানাই হাতাতে। সেই কারণেই তিনি পন্টুকে এসে ধরলেন, বাবা পন্টু, একখানা টিকিট তোমাকে দিতেই হবে। নয়তো জামাইয়ের কাছে যে মুখ থাকে না—

সবই বুঝলাম মেসোমশাই—পন্টু আমতা-আমতা করে উত্তর দিল, আমার কাছে এখন আর কোনও টিকিট নেই।

ও-সব আমি শুনবো না বাবা। হরিহরবাবু স্নিগ্ধ হেসে বললেন, টেন্টে শুনলাম তুমি নাকি সত্তরখানা টিকিট নিয়ে এসেছো—

ঠিকই শুনেছেন। পন্টু তাঁকে সমর্থন করে আরও বললো, কিন্তু আমাকে তো দিতেও হয় বেশি লোককে। পাড়া অফিস আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কাকে দিতে হয় না বলুন? তাও তো সবাইকে কুলিয়ে উঠতে পারি না। যাকেই দিতে পারছি না তিনিই অসন্তুষ্ট! অথচ আমার কিছু করার নেই।

জামাইকে বড়ো মুখ করে বলেছিলাম, মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন আমাদের পাড়াতে থাকে। তা তুমি—আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন হরিহরবাবু, বাবলু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো, মেসোমশাই আপনি তখন থেকে জামাই জামাই করে চলেছেন। পাড়ার মাঠের পোকা যারা, রোদ জল-ঝড়

বৃষ্টি মাথায় করে সারা বছর খেলা দেখে তাদের অনেককেই পল্টুদা টিকিট দিতে পারেনি। জামাই পাবে কী করে? তাও বেপাড়ার।

তুই চুপ কর বাবলু। হরিহরবাবু বললেন, আমি পল্টুর সঙ্গে কথা বলছি। ব্যাপারটা যাতে বিচ্ছিরি দিকে না-গড়ায় পল্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আপনি এখন বাড়ি যান মেসোমশাই। আমি কথা দিতে পারছি না তবে চেষ্টা করবো। যদি পারি তবে কাল সকালে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো।

প্রথমে পল্টুর দিকে কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে তাকালেন হরিহরবাবু। তারপরেই বাবলুর দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে বিজয়ীর পদক্ষেপে বাড়ির পথ ধরলেন। কালু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, পল্টুদা আপনি কিছুতেই ওই জামাইটিকে টিকিট দেবেন না। হরিহরবাবুর জামাই পুরো জার্মান।

তুই কী করে জানলি? পল্টু প্রশ্নটা করেই হেসে ফেললো।

ও আমরা সব খবর রাখি। কালু মুহূর্তে গোয়েন্দা সেজে গেল। মোট কথা আপনি ওই জামাই ফামাইকে....

তোরা তো টিকিট পেয়েছিস। তোদের এতো মাথা ব্যথা কিসের? যা—পালা এখন।

এবারে আর মোড়ে দাঁড়ানো নয়, পল্টু ওরা পাঞ্জাবী রেষ্টুরেন্টে ঢুকলো। ওদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসতেই দোকানের মালিক হরভজন সিং ছুটে এলো। পরিষ্কার বাংলায় বললো, পল্টুভাই আমার টিকিটখানা আর কখন পাবো? সন্ধ্যে থেকে দিচ্ছি দেবো করে তো রাত আটটা করে দিলে। এরপরে বলবে, আর নেই—

হরভজন ভাই, তোমার রেষ্টুরেন্টের এই জায়গাটা আমরা প্রায় ক্লাব-রুম বানিয়ে ফেললাম আর তুমি পাবে না টিকিট! এটা কী হতে পাবে?

বাংলায় এই একটা জিনিস আছে ফুটবল! হরভজন হাসতে হাসতে বললো, টিকিট নিয়ে এখানে সব কিছুই হতে পারে। বাপ ছেলেকে ডজ দিচ্ছে, বড়ো ভাই ছোট ভাইকে— নেহি পল্টুভাই টিকিট না-পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

হরভজনকে একখানা টিকিট দিয়ে পল্টু ওরা এবারে সিরিয়াস আলোচনায় বসলো। কালকে খেলা প্লাস সীতানাথের বিয়ে। ব্যাপারটা খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে সব কিছুর সমাধান করা দরকার।

ছয় বন্ধুর মধ্যে সুশীল আর কুমার ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। বাকি চারজন মোহনবাগানের। ছজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ সীতানাথ শুধু মাঠে যেতে পারছে না। সে ওই সময়ে টোপর পড়ে শ্যামবাজারের শ্যামপুকুর স্ট্রিটে রওনা দেবে। বন্ধুরা কেউই ওর সঙ্গে যেতে পারছে না। পল্টু কবি কুমার সুশীল আর অলোক সরাসরি মাঠ থেকে বিয়ের আসরে গিয়ে উপস্থিত হবে। এই পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক রয়েছে। মুশকিলটা হবে খেলার ফলাফলের ওপর! মোহনবাগান যদি যেতে সুশীল কুমার শ্যামপুকুর যেতে রাজি হবে কী? অথবা ইস্টবেঙ্গল যদি জেতে তাহলে পল্টু কী ওই ভাঙা মন নিয়ে বিয়ের মতো আনন্দের অনুষ্ঠানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? অন্য কারো বিয়ে হলে আলাদা কথা ছিল। সীতানাথের বিয়ে। ওখানে না-যাওয়ার কথাটাও ভাবা যায় না!

এরপরেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সীতানাথের খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল গোপালনগর থেকেই বন্ধুরা তার সঙ্গে যাবে। কিন্তু বেছে বেছে ঠিক এই দিনটাতেই সেই জীবন মরণ খেলাটা পড়লো। যাইহোক সীতানাথের এখন যুক্তিটা হলো, একসঙ্গে যখন যাওয়া হচ্ছে না তখন বন্ধুদের সবাইকেই ওখানে থাকতে হবে। অর্থাৎ নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা চলবে না।

সমস্যা এইখানেও। যদি মোহনবাগান হারে বিমর্ষ মন নিয়ে পল্টু বড়জোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিয়ের আসরে উপস্থিত হতে পারে, হইচই করে নিশ্চয়ই সারারাত কাটিয়ে দিতে পারবে না। সে ক্যাপ্টেন। লীগ হাতছাড়া হলে সেই ব্যথা একান্ত ভাবেই তার।

বন্ধুদের মধ্যে সবরকম আলোচনাই হলো। পল্টু শুধু তারকা ফুটবল খেলোয়াড়ই নয় খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের পরিচয়ও দিল। সে সকলের সব আলোচনা শুনে বললো, প্রবলেমটা আমাকে নিয়েই হচ্ছে। তাই তো? বন্ধুদের মুখের ওপর চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে পল্টু আরও বললো, খেলা

খেলাই। খেলায় হারজিত আছে তবে সেটা মাঠের মধ্যেই। মাঠের বাইরে তার কোনও প্রতিক্রিয়া থাকা উচিত নয়। আমার টিম হারলেও সীতানাথের বিয়েতে আমরা দারুণ আনন্দ করবো। বন্ধুদের মধ্যে ও-ই প্রথম বিয়ে করতে চলেছে। এই কথাটা আমরা যেন কেউ না-ভুলি। কী? ঠিক আছে তো? পল্টু প্রাণখোলা হাসলো।

গ্রেট পল্টু! তুই সত্যিই গ্রেট। কুমার ঝলমলিয়ে উঠলো। খেলার ফলাফল চুলোয় যাক। সীতানাথের বিয়ে সবার আগে।

পল্টু খুব সতেজ হাসি নিয়ে বললো, নটা প্রায় বাজে। আমি তাহলে বাড়ি চলি—

হ্যাঁ-হ্যাঁ তুই বাড়ি চলে যা—বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠল। কেন-না সবাই জানে পল্টুর এটা বরাবরের অভ্যেস, বড়ো ম্যাচের আগে বেশি রাত করে কখনও আড্ডা দেয় না। সাড়ে-নটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় যাবেই যাবে। পল্টু শুধু খেলোয়াড় নয়—আদর্শ খেলোয়াড়।

আজকের খেলার সাক্ষী হতে ইডেনে প্রায় এক লক্ষ দর্শক এসেছেন। ক্লাব হাউসের সিঁড়ির ডান পাশ ঘেঁষে বসেছে কবি কুমার সুশীল অলোক ওরা। ওদের চারপাশে তখন মোহনবাগান আর পল্টু ছাড়া অন্য কোনও আলোচনা নেই। ভিড়ের মধ্যে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, আজ জার্মানদের ভরে দেবো। একটানা লীগ পেয়ে বাঙালরা বহুত বাড় বেড়েছে। কুমার আর সুশীল সেই মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে রইলো। ওদের দুজনের মনের অবস্থা বুঝে কবি ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো, একদম আওয়াজ দিবি না। ধৈর্য ধরে শুধু শুনে যা— খেলার মাঠে এ-সব হবেই।

ইডেনে তখন মাদল চিৎকার। ড্রেসিং রুম থেকে বল হাতে নিয়ে পল্টু সিঁড়ি বেয়ে নামছে। পেছনে পুরো টিম। মোহনবাগান জনতার তখন সে কী উল্লাস! সেই উল্লাসের ঢেউ এসে লাগলো দর্শকের মধ্যে বসে থাকা পল্টুর চার বন্ধুর বুকেও।

মোহনবাগান মাঠে নামার মিনিট দুয়েক পরেই নামলো ইস্টবেঙ্গল। উঃ! কী বিরাট আওয়াজ! সমুদ্রের গর্জন সমুদ্রে নেই—সব ইডেনে চলে এসেছে। ওই সময়ে কবিদের পেছন থেকে একটা ছেলে বললো, বাঙালরা সব কিছু ফেলে রেখে এসেছে ঠিক কথা। কিন্তু গলাখানা যা তৈরি করে এনেছে, এক একজন দেড় লক্ষ লোকের আওয়াজ ছাড়ছে—কুমার আর সুশীল বক্তাকে দেখার উদ্দেশে পেছনে ফিরতেই অলোক নিচু গলায় বললো, আজে-বাজে কথায় কান দিস না। তারপরেই জোরে জোরে বলে উঠলো, পৃথিবীর কোনও শক্তি নেই আজ মোহনবাগানকে হারায়। আমরা জিতছিই।

সাবাস দাদা সাবাস! এ-দিকটা মোহনবাগান ব্লক। তাই মোহনবাগান জনতা অলোকের কথা শুনে খুশিতে ফেটে পড়লো।

খেলা শেষ হতে আর মিনিট সাতেক বাকি আছে। দু'পক্ষই আপ্রাণ চেষ্টা করছে গোল করতে কিন্তু গোল আর হচ্ছে না। ইস্টবেঙ্গল দুটো সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি। খেলা তখনও গোলশূন্য অবস্থায়। শেষ বাঁশি বাজবে বাজবে করছে। হয়তো মিনিট দেড়েক বাকি—ঘটনা ঘটিয়ে দিল পল্টু। ইস্টবেঙ্গলের দুই স্টপারের মাঝখানে বলটা শূন্যে ভাসছে। এ-ভাবছে ও-ক্লিয়ার করবে, ও-ভাবছে এ-ক্লিয়ার করবে। দুই স্টপারের দ্বিধার সুযোগ নিয়ে পল্টু চকিতে ওই শূন্যে ভলি নিল। যেন রকেটের গতি। বল গিয়ে জালে আশ্রয় নিল। ইস্টবেঙ্গলের ইন্ডিয়া গোলকিপার নড়বার সময় পায়নি। সারা ইডেন তখন কাঁপছে। কাঁসর ঘন্টা, বাজি-পটকা আর সমর্থকদের আনন্দের চিৎকারে ইডেন মাতোয়ারা। মোহনবাগানের প্লেয়াররা ছুটে এসে পল্টুকে যে-ভাবে আদর করতে লাগলো ওর আবার হাড়গোড় না-ভেঙে যায়।

খেলা শেষ। ইডেনের সারা আকাশে মোহনবাগানের পতাকা উড়ছে। মুহুর্মুহু বোমা ফাটছে। মোহনবাগানের প্লেয়াররা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ড্রেসিংরুমের দিকে। সবার আগে পল্টু। মোহনবাগান জনতা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানালো। ওই সময় দু-জন অত্যুৎসাহী কিশোর পল্টুকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতেই নতুন করে জনতা বাঁধন-হারা আনন্দে মেতে উঠলো।

ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলেও সুশীল আর কুমার ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবে মেনে নিল। সারা জনতা আজ যাকে নিয়ে নাচছে সেই পল্টু তাদের একেবারে ছোটবেলাকার বন্ধু। এরচেয়ে বড়ো আনন্দ আর কী হতে পারে?

মোহনবাগান টেন্টের সামনের লনে কবি সুশীল কুমার আর অলোক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পল্টুর জন্য অপেক্ষা করছে। ও স্নান-টান করে এক্ষুনি আসবে। তারপর পাঁচ বন্ধু মিলে রওনা দেবে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে। সীতানাথটা একা একা বিয়ে বাড়িতে ওই একদঙ্গল মেয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই অসহায় বোধ করছে।

টেন্ট থেকে পল্টু বেরিয়ে এলো। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তারা, মেম্বাররা এবং সাংবাদিকের দল খেলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠলো। অনেকেই ঘিরে ধরলো। ক্লাবের প্রাণপুরুষ মান্নাদা পল্টুকে এতো তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কীরে পল্টু তুই চলে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ মান্নাদা।

খাওয়া-দাওয়া করে যা—মান্নাদার গলায় স্নেহের সুর।

একটু তাড়া আছে। পল্টু হেসে বললো, আমার বন্ধুর বিয়ে। এখন ছুটতে হবে শ্যামবাজার।

এক কাজ কর, মান্নাদা একটু থামলেন, তারপর নিজেই হাঁক-ডাক করে অনিলের খোঁজ করলেন। যথারীতি অনিল সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি হুকুম দিলেন, পল্টুকে শ্যামবাজার পৌঁছে দিয়ে আয়।

বিয়ে বাড়ির সিংহ দরজায় পল্টুদের গাড়িখানা এসে থামলো। না, পল্টু নামতে পারলো না। উনিশ-কুড়ি বছরের একঝাঁক কিশোরের দল গাড়িটাকে ঘিরে ধরলো। সীতানাথের ছোট শ্যালক বাপি আগে থেকেই বন্ধুদের কাছে বলে রেখেছিল, ক্যাপ্টেন মাঠ থেকেই আমাদের বাড়িতে আসছে। ওরা তাই অপেক্ষা করছিল কখন পল্টু আসে! তারপরে নিজেরাই গাড়ির দরজা খুলে ধরে পল্টুকে নামতে সাহায্য করলো। ওকে ফুলের মালা পড়িয়ে দিল। ওর গায়ে গায়ে প্রায় লেপটে রইলো। অন্তরঙ্গতার সে-এক উজ্জ্বল দৃশ্য। কিশোরের দল তাদের ভালোবাসার শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত পল্টুর সারা গায়ে মাখিয়ে দিতে চায়।

সীতানাথ এতোক্ষণ যেন ঝিমোচ্ছিল। বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ওর মুখে হাসি ফুটলো। একটানা বর্ষার পর সূর্যের প্রথম ঝিলিকের মতো ওর সেই হাসি। সীতানাথ খুশিতে উপছে পড়লো। বললো, পল্টু টিভি-তে খেলা দেখলাম। দারুণ গোল করেছিস!

পল্টু সামান্য একটু হাসলো। খুব আস্তে আস্তে বললো, জানিস, কুমার আর সুশীলই আমাকে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছে। কথাটা শুনে সীতানাথ সুশীল, কুমারের মুখের দিকে তাকাতেই ওরা বলে উঠলো, তুইই বল সীতানাথ, আমরা এতোদিন ধরে মাঠে যাচ্ছি এমন গোল ক'টা দেখেছি?

ইতিমধ্যে দুটি মেয়ে ট্রে-তে করে বিস্কুট কফি ইত্যাদি নিয়ে এসে পল্টু কবি কুমার সুশীল অলোককে দিল। ওরা কফি খেতে খেতে গল্প করছে। হাসছে। ঘর ভর্তি মানুষের মেলা। উপছে পড়া ভিড়। ফুল, সেন্ট, শাড়ি-গয়না, প্যান্ট-শার্টের বিচিত্র সমাবেশ। বড়োরা সংযত ভাবে পল্টুকে বারবার দেখছেন। এই ছেলেটাই আজকে একটা অসাধারণ গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিয়ে এলো। পল্টুকে কাছে পেয়ে ছোটদের মতো তাঁরাও আনন্দিত। কিশোরের দল অর্থাৎ বাপির বন্ধুরা পল্টুর সামনে ঝপাঝপ খাতা এগিয়ে দিল। অটোগ্রাফ দিতে হবে। পল্টু আজ দারুণ খুশি! কাউকে নিরাশ করলো না। প্রত্যেকের খাতায় সই করে দিল। মুখে বললো, শুধু সই সংগ্রহ করলেই চলবে? নিজেরা খেলা করো তো?

আমরা সকলেই খেলি। কিশোরের দল জল তরঙ্গের মতো বেজে উঠলো।

বরযাত্রীদের বসার ঘরে নতুন যে কেউ আসছে সেই একবার পল্টুকে দেখে যাচ্ছে। যেন দেবতা দর্শনের পালা চলছে। স্টার ফুটবলারের গ্ল্যামার যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে সেটা দেখে নিয়ে কবি মনে মনে লেখার বিষয়বস্তু ঠিক করে ফেললো। পল্টুকে নিয়েই সে লিখবে। এক ফুটবল খেলোয়াড়ের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার গল্প।

সীতানাথের শাশুড়ী এলেন বরযাত্রীদের বসার ঘরে। অলকনন্দার বয়স আটান্ন-উনষাট হবে। ভদ্রমহিলা বইয়ের পোকা। প্রচুর পড়াশোনা করেন। সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানও যথেষ্ট। পল্টু, কবি জামাইয়ের বন্ধু। এটা তিনি আগেই শুনেছিলেন। ওরা বরযাত্রী হয়ে আসবে এটাও জানা ছিল। তিনি তাই ওদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। পল্টুকে দেখেই চিনতে পারলেন। হ্যাঁ, টিভি-র মাধ্যমে খেলা দেখার ফলেই এই মুখ চেনা। অলকনন্দা পল্টুর মাথায় পরম স্নেহে একখানা হাত রেখে বললেন, তুমিই তো পল্টু! টিভি-তে খুব দাপিয়ে বেড়াতে দেখলুম। গোলটা অবশ্য দেখিনি। ঠাকুরদের ডাকাডাকিতে উপরে গিয়েছিলাম। তা হ্যাঁ বাবা—অলকনন্দা এবারে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার লেখক বন্ধুটি কোথায়? কবি বন্দ্যোপাধ্যায়—

বন্ধু গর্বে গর্বিত হয়ে সীতানাথ সঙ্গে সঙ্গে কবিকে দেখিয়ে দিল। উপস্থিত সকলের চোখ গিয়ে স্থির হলো কবির ওপর। 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' 'অন্তঃসত্ত্বা' 'পবিত্র প্রাঙ্গন'-এর লেখক সলজ্জ ভাবে মাথা নিচু করে বসে আছে। অলকনন্দা কবির চিবুকে, মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত রেখে বললেন, তোমার সব লেখাই পড়েছি বাবা। তুমি আরও অনেক বড়ো হবে। আরও— শুধু যা দেখবে, বুঝবে, সেই সত্যটুকুই লিখতে চেষ্টা করবে।

অলকনন্দা ভেতরে চলে গেলেন। উপস্থিত মহিলাদের বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের আগ্রহটা এবারে কবিকে নিয়ে। কবির বই তারা পড়েছে কিন্তু সেই কবি বন্দ্যোপাধ্যায় যে বয়সে এতো তরুণ, দেখতে এতো সুন্দর সেটা কারো জানা ছিল না। তারা ওকে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগল। ঘটনাটা দাঁড়ালো কাব আগে কে কতো বেশি প্রশ্ন করে কবির চোখের ওপর উপস্থিত থাকতে পারে। হাজারো প্রশ্ন-উত্তরের পালা চলার ফাঁকে কবি হঠাৎ লক্ষ্য করলো, মোম-গলা শরীর নিয়ে একটি মেয়ে সামান্য একটু দূর থেকে তাকে দেখছে। না, সে একবারও একেবারে সামনে এসেও বসেনি, একটা প্রশ্নও করেনি। নীরবে শুধু দেখছে। দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে বারোয়ারী ভাবে কথা বলতে বোধহয় তার আপত্তি। কবির চোখে মেয়েটি এখানেই যেন আলাদা হয়ে ধরা দিল।

বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান শেষ। খাওয়া-দাওয়াব পালাও শেষ হয়েছে একটু আগে। লাস্ট ব্যাচে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সীতানাথ, ওর নতুন বৌ খেতে বসেছিল। আর বসেছিল পল্টু কবি সুশীল কুমার অলোক ওরা। বাড়ির বড়োরা অবশ্য ওদেরকে এর আগেই খাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কুমার সব বন্ধুদের হয়ে উত্তর দিয়েছিল, আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না। সীতানাথকে একা ফেলে আমরা খাই কী করে?

এখানে আসার পর থেকেই যে মেয়েটি পল্টুকে একেবারে চোখে চোখে রেখেছিল সে হলো সুনন্দা। সীতানাথের শ্যালিকা। মেয়েটিকে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনিই স্মার্ট। পল্টুর চোখে সে-ও লেগে রয়েছে। নীরব চাউনির মধ্যে দিয়ে দুজনেই দুজনকে কিছুটা জেনে নিতে, চিনে নিতে চেষ্টা করার পর এখন পুরোপুরি স্বাভাবিক। দুজনেই হেসে কথা বলছে, গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে হাসি- ঠাট্টাও চলছে। পছন্দের ছবিটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে। বিয়ে বাড়িব মতো আনন্দের অনুষ্ঠানে এই জাতীয় ঘটনাগুলো খুব স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত এগিয়ে চলে। কেন-না হাতে সময় বেশি থাকে না। অল্প সুযোগের মধ্যেই ইমারত গড়ে নিতে হয়। নয়তো পরে কে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে যাবে তখন আর সেতু তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং হৃদয়ে আঁচড় পড়লে দ্রুততার অস্থিরতা আসবেই। যেমন ওদের মধ্যে এসে গেছে।

সুনন্দা এখন দারুণ ফ্রি। সে ওই অহেতুক লজ্জা-টজ্জার বড়ো একটা ধার ধারে না। সে পল্টুর পাশে খেতে বসেছে। খেতে খেতেই কথার ফুলঝুরি ছোটালো। পল্টুর চোখের দিকে গভীর ভাবে চেয়ে বলে উঠলো, আপনি বড়ো প্লেয়ার মানি কিন্তু আজকের গোলটা কিছুতেই মানতে পারছি না। গোলটা যদিও দারুণ হয়েছে—

সীতানাথের শ্যালক বাপি বলে উঠলো, পল্টুদা আমাদের সারা বাড়ি, শুধু সারা বাড়িই-বা কেন, সারা পাড়া মোহনবাগানের সমর্থক। একমাত্র ওই ছোটদিটাই ইস্টবেঙ্গল। কী করে হলো কে জানে!

তোকে আর জানতে হবে না। সুনন্দা ঝিকমিক করে হেসে পল্টুকে জিজ্ঞেস করলো, ইস্টবেঙ্গলে খেলার ইচ্ছে নেই?

মোহনবাগান আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। ছাড়তে যাবো কেন? পল্টুও হেসে হেসে উত্তর দিল। ওদের পাশেই ছিল কুমার। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, আমাদের এই ছয় বন্ধুর মধ্যে আমি আর সুশীলই শুধু ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। আমরা তো পারলাম না দেখুন আপনি যদি পারেন—উৎসাহ পেয়ে সুনন্দা বেশ আবেগ নিয়ে বললো, হ্যাঁ, আপনাকে ইস্টবেঙ্গলে খেলতেই হবে।

কুমার চাপা হেসে বললো, সুনন্দা বলছে, একটু ভেবে দেখো পল্টু—খেতে খেতে তিনজনেই চোখে চোখে হেসে উঠলো।

এখন বাসর জাগার পালা চলছে। রাত সবে সওয়া-বারোটা। হাসিঠাট্টা, গান-বাজনা নিয়ে পুরো রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। পল্টুর তো এখনই ঘুম পাচ্ছে। মাঠের ধকলের ক্লান্তি দূর করতে তাকে একটু ঘুমিয়েই নিতে হবে। যাকে বললে কাজ হবে পল্টু সেই সুনন্দাকেই বলে রেখেছে শোবার একটু ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু—

ঘুমোবেন এখন?

না-না এখন নয়। এই ধরুন দুটো-আড়াইটা নাগাদ........

আপনার একটা ব্যবস্থা করে দেবো—সুনন্দা হাসতে হাসতে বললো, কিন্তু আপনার বন্ধুদের সবাইকে জেগে থাকতে হবে।

আমরা কী পাপ করেছি? সুশীল হালকা রসিকতা করে বললো, পল্টু ঘুমোবে আর আমরা জেগে থাকবো—এই পার্থক্যটা কেন?

খেলোয়াড় আর দর্শকে যে-পার্থক্য সেটা এখানেও। নতুন করে আমি কিছু করছি না।

সেই সন্ধ্যে থেকে যে-মেয়েটি কবিকে নীরবে দেখছিল এতোক্ষণে সে সামনে এসে বসলো। কবির সঙ্গে আলাপ করলো। মোটামুটি যেটুকু জানা গেল তা হলো মেয়েটির নাম সংযুক্তা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে এম. এ পড়ছে। সাহিত্যের অনুরাগিনী। থাকে বই পাড়ার মধ্যেই। সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে। সুনন্দা বাপিদের সে মাসতুতো বোন হয়।

সংযুক্তাকে দেখে কবির মনে পড়লো সেই মেয়েটিকে। হলুদ বসন্তের ঢেউ সারা শরীরে। নাকে সাদা পাথরের নাকছাবি। একটা উজ্জ্বল মুখের ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। কবির কানে বাজছে কিছু কথা 'আমি অনেক দোকান খুঁজেছি, পাইনি। সকলেই বলছে যা ছিল বিক্রি হয়ে গেছে। নেক্সট এডিশান না-বেরুনো পর্যন্ত পাবেন না। কিন্তু আমাকে যে পেতেই হবে। বইটা না-পড়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুতে মন দিতে পারছি না। এই দোকানের একজন বললেন, আপনার কাছে ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইটা পাওয়া যেতে পারে। আপনি কী আমাকে এক কপি দিতে পারবেন?'

কবি সংযুক্তার মধ্যে দিয়ে কী সেই নাকছাবিকে কাছে পেতে চাইছে? না, তা কখনও হতে পারে না। সেই নাকছাবির আলাদা রূপ। আলাদা রং। তেলতেলে বর্ণময় মুখের ওই সৌন্দর্য যেন শিল্পীর সার্থক শিল্পকর্ম। হলুদ বসন্তের ঢেউয়ের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। সে অনন্যা! অপরূপা!!

সংযুক্তা খুব আস্তে আস্তে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথা বলে। কবির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সময় নিয়ে কী যেন ভাবলো। তারপরে ঘন গলায় বললো, আচ্ছা, মেয়েরা তো কেউ নিজেদের দোষে কেউ-বা পুরুষের শিকার হয়ে নিজেদের সম্মানটুকু ধরে রাখতে পারছে না। আপনি গভীর মমতায় যে 'অন্তঃসত্ত্বা' বইটা লিখেছেন, সেটা কী শুধুই লেখা? ওই মেয়েদের প্রতি আপনার আন্তরিকতা কতোটুকু? আমি বলতে চাইছি আজকাল বেশির ভাগ লেখকেরই লেখার মধ্যে কোন প্রাণ থাকে না। সৃষ্টি হয় না কোনও শিল্প। সে-গুলো শুধুই শব্দ। আপনার লেখা এ-সব থেকে আলাদা। স্পষ্ট প্রাণের ছোঁয়া পাই। তাই প্রতিটি চরিত্র হয়ে ওঠে আমাদের একান্তই চেনা-জানা। একেবারে জীবন্ত। সেই জীবন্ত চরিত্রগুলোকে বাস্তবে আপনি কতোটুকু ভালোবাসতে পেরেছেন?

'অন্তঃসত্ত্বা' বইটা আপনি খুব মন দিয়ে পড়েছেন বুঝলাম—কবি সংযুক্তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর ক্রমশ গভীর হয়ে অন্য এক জগতে চলে গেল। কবি বলতে লাগলো ঃ প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে সমস্যার কথা আমি তুলে ধরেছি সেটা কিন্তু একটা জাতীয় সমস্যা। দু-একটা ক্ষেত্রে কারো কারো ব্যক্তিগত চেষ্টায়, সহানুভূতিতে এর সমাধান হলেও সেটাই সব নয়। এর জন্য চাই ব্যাপক ভাবে সামাজিক আন্দোলন। ওই উপন্যাসে আমি তারই ইঙ্গিত দিয়েছি। সমাজের অবহেলিত শ্রেণীব ওপরেই যতো আইনের শাসন, অবিচার আর অত্যাচার। তাদের ওপরেই ঝুলছে অনিয়মের খড়্গ। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়, সুবিধেবাদীর দল আরও সুযোগ নিতে আমাদের সমস্ত অপকর্মের বোঝা আবও বেশি করে ওদের মাথাতেই তুলে দিই। আমি তাই এদের কথা ভুলতে পারি না। আর অত্যাচারের যে খড়্গটা ওদের ওপবে ঝুলছে সেটা নামিয়ে এনে ওদের হাতেই তুলে দেবার চেষ্টা করেছি। ভোরেব সূর্য ওঠাব মতো কবির মুখে মৃদু আবীরের আলো। আসলে সেটা অনুভূতি উপলব্ধির প্রশ্রয়। কবি ঠোঁটে হাসির বেখা টেনে বললো, আসলে কী জানেন, লেখকরা তো সমাজ সংস্কারক নয়। বরং বলতে পারেন তারা বিপ্লবী। সমাজের সমস্ত অন্যায়েব বিরুদ্ধে তাবা কলম ধবে প্রতিবাদ করবে। পথ দেখাবে। তারপবে কে কী ভূমিকা পালন করবে সেটা তাদের ব্যাপাব।

গল্প কবতে কবতে সংযুক্তা ছোট্ট একটা খাতা এগিয়ে ধবে বললো, নিন, এখানে আপনাব নামটি লিখে দিন তো!

তার মানে? প্রশ্ন তুলে কবি উজ্জ্বল হাসলো। অটোগ্রাফ চাইছেন?

বুঝতেই তো পারছেন—সংযুক্তাও হেসে দিল।

প্লিজ আপনি বরং আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন। আমারটা নয়—

নয় কেন?

আমার লজ্জা কবে। সত্যিই যদি বড়ো লেখক হতে পাবতাম তবে বোধহয এই লজ্জাটা থাকত না।

নাম করাব পরেও এতো বিনয় কিন্তু ভালো দেখায় না। সংযুক্তা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও মুখের হাসিটুকু কিন্তু জলছবির মতো লেগে রয়েছে। কবি একটু জোরেই হেসে উঠলো। তাকে এখন বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সে উত্তর দিল, নাম কবলে বিনয়ী হতে নেই। তাই না?

আপনি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। মানে ইচ্ছে করেই যেতে চাইছেন। দিন না একটা অটোগ্রাফ—

ওদের পাশাপাশি আরও অনেকেই বসেছিল। তিন-চাবটে মেয়ে একসঙ্গে হইহই কবে বলে উঠলো, আমাদেবও অটোগ্রাফ দিতে হবে। খুব বিশ্রী ভাবে সুব কেটে যাবার মতো অবস্থাটা হলো। কবি ওই মেয়েদেব দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়লো। বিয়ে বাড়িতে এক ধরনের মেয়েরা আসে শুধু মজা করতে। কিচ্ছু জানলো না, শুনল না, বুঝল না অথচ সব ব্যাপারেই হ্যাঁ-হ্যাঁ কবে যাবে। এদের নিজস্বতা বলে কিছুই থাকে না। পরের কথাব শেষাংশটুকু নিয়ে পাবে শুধু নাচানাচি করতে। কবি খুবই বিরক্ত হলো। নিবন্ন মানুষের খাবার চাই খাবার চাই আর্তনাদের সুবটা ওদের গলায় অনেক বেশি মজার হয়ে উঠেছে অটোগ্রাফ চাই, অটোগ্রাফ চাই। এরপরে কোনওরকম আলোচনা করা চলে, না আলোচনা করাব মানসিকতা থাকে?

অলোক কবির অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। ও যে ভেতরে ভেতরে এক ধবনের যন্ত্রণা অনুভব করছে সেটা ওর মুখেব দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অথচ নীরবে সংযুক্তাকে একটা সই করে দিলেই হতো। ও সাহিত্যের ছাত্রী। কবির মর্যাদা তো ওর কাছেই বেশি। এখন ঠেলাটা বুঝুক। অলোক ফিসফিস করে বললো, নে এবারে হরিলুঠের বাতাসা বিলিয়ে দে। কবি খুব করুণ ভাবে অলোকের দিকে তাকালো। তাকালো সংযুক্তার চোখের দিকে। সংযুক্তা বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, আমি অটোগ্রাফ চাই না। ওদেরকে দিতে পারেন। শেষের কথাটা অবশ্যই অভিমানের। কিন্তু তাতেই ওকে যেন আলাদা জগতের বাসিন্দা বলে মনে হলো। ও সকলের মধ্যে

মিশে যেতে চায না। প্রত্যেকেব থেকে সে আলাদা। এটাই ওব বৈশিষ্ট্য।

বাত প্রায় দুটোর কাছাকাছি। এখন গান-বাজনা চলছে। একটা অল্প বয়সী মেয়ে একেব-পর-এক আধুনিক গান গেয়ে চলেছে। গলাটা মন্দ নয। শুনতে ভালোই লাগছে। তবে সীতানাথেব বৌ বুঝি আব জেগে থাকতে পাবছে না। মনে হচ্ছে ও ঢুলছে। সীতানাথ ওর বৌকে কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা মেরে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা কবছে। তন্দ্রা কেটে যেতে সুপর্ণা সীতানাথকে চোখ চেযে একটু দেখে নিল মাত্র তারপরেই কনুইয়ের খোঁচা থেকে বাঁচাব উদ্দেশে বেশ কিছুটা সরে বসলো।

বাসব ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাইবে গিয়েছিল সুনন্দা। ফিরে এলো। পল্টুব কাছে গিয়ে বললো, চলুন, আপনার শোবার ব্যবস্থা করে এসেছি। পল্টু কৃতজ্ঞতার হাসি নিযে তাকালো। অলোক সুশীল কবি কুমারকে বললো, আমি আব পারছি না রে। খুব টাযার্ড লাগছে! বন্ধুবা কেউ হৃদযহীন নয। মাঠেব যুদ্ধে এক দেড়ঘণ্টা ঘাম ঝরানোব পব শবীবে শক্তি বলে কিছু থাকে না। নেহাত সীতানাথের বিয়ে। পল্টু তাই বাত দুটো পর্যন্ত আনন্দে মেতেছিল। ওকে এবারে বিশ্রাম দেওয়া দবকাব। সকলেই বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই একটু ঘুমিয়ে নে—

সুনন্দা পল্টুকে নিয়ে চাব-পাঁচটা ঘব পেবিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ কোণেব ছোট কিন্তু খোলামেলা একখানা ঘবে গিযে পৌঁছালো। ড্রেসিং-টেবিল, আলমাবি. পড়ার টেবিল আর সিঙ্গেল একটা খাট সেই ঘবে। ঝকঝকে বিছানা পাতা। সুনন্দা বললো, এটা আমার ঘব। শত অনুষ্ঠান, লোকেব ভিড়ে শোবাব জাযগাব অভাব হলেও আমার ঘর আমি কখনই কাউকে ছেড়ে দিই না। এই প্রথম!

আপনার সঙ্গে আমাব আলাপটাও তো এই প্রথম! পল্টুব চোখে-ঘুম মুখে কিন্তু সতেজ হাসি।

বেশ বলেছেন! সুনন্দা চোখে চোখে হাসলো।

পল্টু হঠাৎ বলে ফেললো, আমরা কী 'আপনি' থেকে তাব পরেব ধাপে নামতে পারি? সুনন্দা কথাটা শুনে খুব আনন্দ পেল। খুশিতে নেচে উঠলো চোখেব তাবা। লকেটখানা হালকা ভাবে কামড়ে ধবে চোখ দুটো বড়ো বড়ো করেই নামিয়ে নিল। অস্ফুট সুবে বললো, মানা কে কবেছে।

মাবধব খাবার সম্ভবনা নেই তো? চলন্ত ট্রেন থেকে বাইবের দৃশ্য দ্রুত সরে যাবার মত পল্টুর চোখ থেকে ঘুম চলে যাচ্ছে। ঝর্ণাধারার মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো সুনন্দা। সে পল্টুর চোখের ওপব নিজের চোখ দুটো ধবে রেখে বললো, বলেই দেখো না! তাবপবেই ধমক লাগালো, আর কথা নয। মাঠে অনেক পরিশ্রম কবেছো। এবারে একটু ঘুমাও—

সুনন্দা সত্যি বলছি এখন আর ঘুম আসছে না।

এ-কথা বললে কেউ শুনবে?

কাবো শোনার দরকারটা কী? পল্টু খুব আস্তে বললো, আমি তো তোমাকে বলেছি।

তোমাব বন্ধুদের কাছ থেকে কিভাবে সবিয়ে এনেছি তা তো জানোই। তাছাড়া সত্যি সত্যিই তোমার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। আব বাসর ঘবে আমাব ফিবে যাওয়াটাও খুব জরুবী। গোলমাল কোরো না। শুয়ে পড়ো। আমি চললাম-

এক গেলাস জল দিয়ে যাও।

সত্যিই কী তার প্রয়োজন আছে?

তোমাকে আব একবার তো দেখবো।

এখন ঘুমাও—সুনন্দা বললো, ভোর হতে ঘণ্টা দুই সমযও নেই। সেই সাত-সকালে চা নিয়ে প্রথম দেখা দেবো। সুনন্দা আর কথা বাড়ালো না। দরজাটা টেনে দিযে বাসরঘরেব দিকে পা বাড়ালো।

ওকে দেখেই অলোক কাছে ডাকলো। এই যে সুনন্দা, একবার এদিকে আসুন। সুনন্দা নিজেই বুঝতে পারলো সে অনেকটা সময় নিয়ে ফেলেছে ফিবে আসতে। ওদের কথার বাগস্বরে তাকে এই মুহূর্তে বিদ্ধ হতে হবে। সুনন্দা প্রস্তুত হয়েই কাছে গিয়ে বসলো। অফেন্স ইজ দ্য বেষ্ট ডিফেন্স। এই নীতিটাতেই বোঝা গেল সে খুব বিশ্বাসী। তাই বেশ সহজ ভাবে প্রশ্ন করলো, এতো ডাকাডাকি কিসের?

বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে এলেন। কুমাব স্বাভাবিক সুবে খোঁচাটা দিযেই বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে

সমর্থন চাইলো। অর্থাৎ ভাবখানা এই কেমন ঠিক বলিনি? সুনন্দার সঙ্গে শয়তানিতে পারা মুশকিল। সে আরও সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, কী মনে হয়?

যা মনে হয় তা কী বলা যাবে? সুশীল এবারে আক্রমণের হাল ধরার চেষ্টা করলো। বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে যা-যা করতে হয় আশা করি সে-সব সেরেই এসেছেন।

তা না-করলে বাচ্চা কখনও ঘুমায়? বলেই সুনন্দা, একঝলক হেসে আন্তরিকতার সুরে জিজ্ঞেস করল, এই আপনারা কী এখন এক কাপ করে চা খাবেন? আমার কিন্তু কোনও অসুবিধে হবে না। দশ মিনিটের ব্যাপার।

না-না আপনার খুব কষ্ট হবে। অলোক গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, পল্টুটা জানতে পারলে আবার ভীষণ রেগে যাবে।

আপনাদের লাগবে কিনা তাই বলুন? কে রাগবে সেটা আপনাদের দেখতে হবে না।

বলছেন? আপনাদের দেখতে হবে না! সুশীল একটু অবাক হবার ভান করলো।

আর বেশি জ্বালালে খুব খাবাপ হবে। হাসতে হাসতেই সুনন্দা লাষ্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিল। বললো, চা যখন খাবেন না, আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ গান-টান ধরুন।

এটা কী রকম যুক্তি হলো বুঝলাম না; কুমার সরস গলায় বললো, চা না-খেলে গান গাইতে হবে। দাঁড়ান দাঁড়ান ব্যাপারটা একটু ভালো করে ভেবে নিই।

অত্যন্ত সহজ হিসেব। কবি উত্তরটা মিলিয়ে দিল, আমরা গান গাইবো না। চা খাবো। হাসাহাসিতে সবাই মেতে উঠলেও সুনন্দা সিরিয়াসলি বললো, সত্যি একটা গান করুন না কেউ।

আমাদের কারোর গানের গলা নয়, খাবাব গলা! অলোক প্রায় কানে কানে বললো, তাব চেয়ে সীতানাথকে গিয়ে ধরুন। দারুণ গান করে।

ছোটবেলা থেকেই ওর যাকে বলে তৈরি গলা! অলোকেব কথায় সায় দিল কুমাব।

কথাটা মোটামুটি বিশ্বাস কবলো সুনন্দা। পায়ে পায়ে এগিযে গিয়ে নতুন জামাইবাবুব পাশে গিয়ে বসলো। আদুরে গলায় বললো, সীতানাথদা আপনার গান শুনবো।

আব্দার শুনে চমকে উঠলো সীতানাথ। বন্ধুদের দিকে আড়চোখে তাকালো একবার। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কোনওই কারণ নেই। ওদের মাথা থেকে ছাড়া এ-জিনিস আব কারো থেকে বেরুবে না। সীতানাথ ওকে বুঝিয়ে বললো, দেখো জীবনে ঝগড়া করা ছাড়া এ-গলা অন্য কাজে আসেনি। আমার বন্ধুরা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। 'ঠকিয়েছে' এই শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাইছি না। তবে আমাদের মধ্যে অলোক বেশ গায়। কিন্তু ওর ববীন্দ্র সঙ্গীত কী তোমরা এই আসরে পছন্দ করবে?

কেন করবো না? রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য আলাদা কোনও আসর নেই। সময় নেই। ওটা সব সময়েই হতে পারে।

বন্ধুদের কাছ থেকে সামান্য একটু দূবে বসেছিল সীতানাথ। সে ওখান থেকেই হুকুম দিল, অলোক দুটো রবীন্দ্র সঙ্গীত কর।

এ-যেন ক্যাচ দিলি, নে লোফ—অলোক বললো, এই ভাবে গান হয়?

খুব হয়। আমরা সকলেই শুনতে চাইছি। সীতানাথ নিজের বৌকে দেখিয়ে বললো, পাশেরজনও যখন শুনতে চাইছে মানে....শুনতে চাইছে—সীতানাথ হেসে ফেললো। সুপর্ণা অলোকের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে মৃদু হাসলো। কোমল গলায় বললো, আপনি গান করুন। নতুন বৌয়ের অর্ডার। এরপরে কোনও অজুহাত দেওয়া চলে না। সে চেষ্টাও অলোক করেনি। তাড়াতাড়ি হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে চারখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দিল। সুনন্দা বললো, আপনি তো ভালোই গান।

হ্যাঁ বাসর জাগতে আধো ঘুমন্ত মানুষের ঘুম তাড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভালো গানের দরকার কী বলুন। আলোক বেশ পাঁয়তারা করে উত্তরটা দিল। কিন্তু কথাটা শেষ করার আগে থেকে সে নিজেই হাসতে লাগলো।

ভোর হয়েছে কী হয়নি সুনন্দা সবাইকে চা করে দিল। এক কাপ চা নিয়ে গেল নিজের ঘরে। পল্টু তখনও ঘুমুচ্ছে। প্রথমে ভাবলো ডাকবে না। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো যাবে না। সেই উঠতেই যখন হবে তখন ডেকে দেওয়াই ভালো। সুনন্দা অনেকক্ষণ মমতামাখা চোখে পল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এক রাতের মধ্যে এই ছেলেটাকে সে অনেকখানি ভালোবেসে ফেলেছে—সারা দেশে যাকে এক ডাকে চেনে। এমন ছেলের জন্য প্রতিটি মেয়েই স্বপ্ন দেখে। সুনন্দা গর্বিতা। তবে মনে মনে ধন্যবাদটা সে সীতানাথকে দিল। সত্যি সীতানাথদার বন্ধু ভাগ্য বটে! নামী খেলোয়াড়, লেখক তার বন্ধু। সুনন্দা আপাততো এর বেশি ভাবাভাবির মধ্যে ডুবে রইলো না। চা ঠান্ডা করে কী লাভ? সে আস্তে আস্তে পল্টুর মাথায় একখানা হাত রাখলো। প্রায় কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে পাখির ডাকের মতো ছোট্ট সুর তুললো, ওঠো! এই—সুনন্দা ওর মাথাটা নাড়িয়ে দিতেই পল্টুর ঘুম ভেঙে গেল। সে ভালো করে চোখ খুলে তাকালো। সকাল শুরু হলো সুনন্দাকে দেখে। এ-যেন রোভার্স ডুরান্ড কাপ পাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। পল্টু ওর হাতটা চেপে ধরে কাছে টানলো। প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো সুনন্দা। বললো, করো কী? চা পড়ে যাবে যে—

চা আমার কাছে এখন বড়ো নয়।

তাই নাকি! সারা রাত এই সব ভাবা হয়েছে বুঝি?

শুধু ভাবা! স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে ফেললাম। সুনন্দার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে পল্টু পর পর দুটো চুমুক বসিয়ে বললো, কী স্বপ্ন দেখলাম জানো? মুম্বাই থেকে রোভার্স কাপ জিতে অনেক পুরস্কার-টুরস্কার দু'হাত ভরে নিয়ে বাড়ি পৌঁছতেই ঠাকুমা মা-বাবা ভাইবোনেরা সকলে আনন্দে হইহই করে উঠলো। আমার ঘরে ঢুকতেই তোমাকে খুব ম্লান মুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পায়ে পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে তুমি যেন অনেক কষ্ট নিয়ে বললে, ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এলে তো! আসলে তুমি গতকাল .

ও-সব কিছু নয়। একরাশ হাসি দিয়ে সুনন্দা সমস্ত ব্যাপারটাকে মাখামাখি করে বললো, একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের খেলাটাই পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। কোন ক্লাবে খেললো ওটা কোনও ব্যাপার নয়। খেলা দেখে দর্শকের আনন্দ পাওয়াটাই বড়ো কথা।

তুমি সুন্দর কথা বলেছো। পল্টু মুগ্ধ চোখে সুনন্দার দিকে তাকিয়ে গভীর সুরে বললো, আমি যতোদিন ফুটবল খেলবো, তোমার এই কথাটা কখনও ভুলবো না। খেলার মাঠে এই কথাটা আমাকে অনেক বেশি প্রেরণা দেবে। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ সুনন্দা।

সীতানাথ বাদে পাঁচ বন্ধু বিয়ে বাড়ির ভিড় থেকে একটু মুক্তি পেতে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রশস্ত রাস্তা। দু'ধারে সারি সারি বাড়ি। লনড্রী, টেলারিং শপ, ষ্টেশনারী, সেলুন, মুদি ও চায়ের বিভিন্ন দোকান। অলস ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে চলে। অলোক বললো, যাই-ই বল, যতো ভালো চা-ই খাই না কেন আমাদের গোপাল নগরের হরভজন সিংয়ের চা না-খেলে ঠিক মেজাজ আসে না।

তা ঠিক। অলোককে সমর্থন করে সুশীল বললো, আয়, সামনের চায়ের দোকানের ভেতরের চেয়ারে, বেঞ্চিতে ওই সকালেই লোকের ভিড়। রবিবারের ছুটির সকাল। কাগজ নিয়ে টানা টানি চলছে। গতকালের খেলার আলোচনা, উচ্ছ্বাস, চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ চলছে। কোন কোন প্লেয়ার কী কী ভুল করেছে, ভট্টাচার্য অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে নিজের কাছে অনেকক্ষণ বল ধরে রেখে দলের একবার বিপদ ডেকে এনেছিল, সেনগুপ্ত একবার ঠিক মতো ডিসুজার সেন্টারে মাথা ছোঁয়াতে না-পারার জন্য সিওর একটা গোল মিস হলো। অনেক দেরিতে ও বলকে তাড়া করেছে, এমনি ধরনের নানা আলোচনা। নিজেদের মধ্যেই কথা কাটাকাটি। যে, যে-কথাটা বলছে, মনে হয় সেটাই বিশেষজ্ঞের মতামত দিচ্ছে। কেউ একচুল ভুল স্বীকার করতে রাজি নয়।

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েই কবি যে-ছেলেটি চা বানাচ্ছিল তাকে বললো, চা হবে?

নিশ্চয়ই। ক'টা চাই?

পাঁচটা। মিষ্টি কম দেবেন।

একটু অপেক্ষা করুন দিচ্ছি।

দোকানের ভেতর তখন নিজেদের তর্কা-তর্কিতে ওবা নিজেরাই ব্যস্ত। পল্টুকে বোধহয় তখনও কেউ খেয়াল করেনি। বছর বাইশের একটা তরতাজা চনমনে ছেলে ভোম্বল। এই শ্যামপুকুর স্ট্রিটেই জন্মেছে। মোহনবাগান বলতে পাগল। লীগ, শিল্ডেব একটা খেলাও বাদ দেয় না। মোহনবাগানের রেকর্ড নিয়ে এই পাড়াতে ওর ওপব কেউ কথা বলে না। ভোম্বল যে কথায় হেরে যায় না তা নয় তবে কিছুতেই সেটা মানতে চায় না। তখন স্রেফ গলার জোরেই জিততে চায়।

ভোম্বল আনন্দবাজাবের প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বেখেছিল। পল্টু ভলিতে গোলটা করছে—ইডেনের দর্শক সমেত সেই সুন্দর ছবিটাই ভোম্বল দেখছিল। কবির চায়ের অর্ডার দেবার সময়ে তার একবার দৃষ্টি ওদের ওপর পড়েছিল। তারপর আবাব কাগজে দৃষ্টি দিতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। একটা ভীষণ চেনা মুখ লাগলো বলে মনে হল। পল্টুকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ভোম্বল টেবিলের ওপর কাগজ সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো। দোকানের বাইরে এসে পল্টুর পায়ের ওপর সটান দন্ডিকাটার মতো পড়ে গেল। দারুণ চিৎকার কবে বলে উঠলো, গুরু আপনার বাঁ পা'টা আমাব মাথায় রাখুন। ওই পায়েই আপনি কাল ইস্টবেঙ্গলের নেট ভপোব-ভকরে দিয়েছেন।

ব্যস! চারদিকে তখন হুলস্থূল কান্ড! সকলেই পল্টুকে একবাব স্পর্শ করতে চায়। যার যা মনে কথা আছে এইবেলা সেরে নিতে চায়। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা বেশিক্ষণ রইলো না। বোঝা গেল এই চায়ের দোকানের নেতা ওই ভোম্বলই। সে একটা হুঙ্কার ছাড়লো, এই তোবা একপাশে সবে যা তো; গুরুকে বসতে দে। পল্টুব বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো, দাদারা আসুন। ভেতরে গিয়ে বসুন। তারপরেই আর এক হুঙ্কার, এই কেষ্ট, পুবো বামায়ণ শেষ হযে গেল, তোব চা তৈরি হলো না এখনও? পাঁচটা চা মিষ্টি কম। খেয়াল আছে তো? খাবাপ হলে তোর দোকানের খাটিয়া খাঁড়া করে দেবো এটা বলে রাখলাম।

তুমি তো ভোম্বলদা রোজই আমাব খাটিয়া খাঁড়া কবছো। চা বানাতে বানাতেই কেষ্ট উত্তরটা ছুড়ে দিল।

রোজ আর আজকের ব্যাপার আলাদা। গুক থাকে গোপালনগবে। শ্যামপুকুবে একেবারে আমাদের পাড়ায়, আমাদেবই চায়ের দোকানে এসে দেখা দেবে এটা তুই স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিসনি। কথা বাড়াস না—ঠিক কবে চাটা বানা।

পল্টু কবি ওর ভেতরে গিয়ে বসলো। ছেলেরা বিস্ময়ে পল্টুকে দেখতে লাগল। মোহনবাগানেব ক্যাপ্টেন তাদের সঙ্গে বসে কথা বলছে এটা ভাবা যায়? মাসির গোঁফ গজানোব ব্যাপাব আর কি! ছেলেরা পল্টুকে চারদিক থেকে প্রশ্নের-পব-প্রশ্ন করে চলেছে। পল্টুও আজ দারুণ মেজাজে রয়েছে। সে এতোটুকু বিরক্ত না-হয়ে প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো। ওবই ফাঁকে ভোম্বল কেষ্টকে একবার আওয়াজ দিল, হ্যাঁবে কেষ্টা, তুই কী শুধু চা দিবি নাকি? তাব আগে পাঁচটা ডবল ডিমের ওমলেট দে বাবা।

ও-সব কিন্তু কিছুই খাবো না। পল্টু একটু হেসে বললো, বিয়ে বাড়িতে গতকাল অনেক খাওয়া হয়ে গেছে ভাই। এখন একটু চা হলেই চলবে। তারপরেই ও ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল, তখন থেকে তো গুরু গুরু করছো, কাল যদি হেবে যেতাম? আমাকে এইখানে পেয়ে আস্ত রাখতে?

এটা তো চিরকালের নিয়ম—ভোম্বল প্রাণখোলা হাসলো। তার কাছে কোনওরকম লুকোচুরি নেই। সে স্পষ্ট বললো, আপনি তো সবই জানেন, হারলে বাপেব নাম হয় খগেন। তবে আপনার কথা আলাদা। সুখে-দুঃখে আপনি গত ছ'বছর ধরে আমাদের ক্লাবের সঙ্গে রয়েছেন। আপনার মতো ক্লাবকে ক'জন এতো ভালোবাসে? এইবারের কথাই ধরুন না—ইস্টবেঙ্গল আপনাকে আশি হাজার দিতে চেয়েছিল। তবুও যাননি। সে যাই হোক, ভোম্বল বলতে লাগলো, সেদিন একটা খেলার

কাগজে পড়ছিলাম আপনার একমাত্র নেশা বলতে আড্ডা দেওয়া। এ-ব্যাপারে আপনার প্রাণ হচ্ছে পাঁচ বন্ধু। নামগুলো পর্যন্ত আমার মুখস্থ। অলোক ব্যানার্জী, সুশীল দে, কুমার দত্ত সীতানাথ মুখার্জী আর লেখক কবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্টু হেসে বন্ধুদের দিকে তাকালো। ভোম্বলকে বললো, এরাই আমার সেই বন্ধু। সীতানাথের বিয়েতেই তোমাদের এখানে এসেছি। এই হলো অলোক, কুমার, সুশীল আর লেখক বন্ধু কবি।

ভোম্বল খুবই চটপট কথা বলার ছেলে। তার কাছে ও-সব রাখ-ঢাক কোনও ব্যাপার নেই। পরের সম্পর্কে যেমন বলতে পারে নিজের সম্বন্ধেও তাই। ভোম্বল কবির দিকে চেয়ে একটু লজ্জিতের হাসি হেসে বললো, আপনার নাম শুনিনি বললে ভুল বলা হবে। আপনার তিনখানা বই আমাদের বাড়িতে দেড়কোটি টাকার চেকের মতো যত্নে রয়েছে। আমার বাবার আবার খাওয়া না-হলে চলে, বই না-হলে চলবে না। আপনার টপ ভক্ত এখন। কিন্তু কবিদা, আমি আপনার একটা বইও এখন পর্যন্ত পড়িনি। সময় কোথায় বলুন? মোহনবাগানের রেকর্ড রাখবো, গুরুর ছবি কেটে খাতায় পেস্ট করবো, গুরুর সম্পর্কে কোনও পত্রিকায় কী কথা লিখেছে সে-গুলো সংগ্রহ করবো না আপনার বই পড়বো? তবে আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হলো এখন একবার পড়তেই হবে। 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইটাই আগে পড়বো। তবে কী জানেন কবিদা, ওই নিপাট ভদ্রলোকের কাছে অভিযোগ-টভিযোগ করে কোনও লাভ নেই। উনি একেবারে অন্ধ। দেখলেন না গতবারে লীগের খেলায়—ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি গোলে আমাদের হারিয়ে দিল। ওটা কী পেনাল্টি ছিল?

অলোক কবি, সুশীল, কুমার, পল্টু নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে হেসে উঠলো। ভোম্বলের কথাগুলো শুনতে বেশ লাগছে। সত্যি এই খেলা নিয়ে কতো ছেলে কতো রকম ভাবে যে দিন কাটাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে? এই শ্যামপুকুরে না-এলে পল্টু ওরা কী কোনোদিন ভোম্বলের মতো এমন লাইফফুল ছেলের দেখা পেতো?

ভোম্বল কী যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কেষ্টর দিকে কটমট করে তাকালো। হ্যাঁ রে কেষ্ট! তোর যে কাশী মিত্তিরের ঘাটে যাবার সময় হয়ে এলো। আর কখন চা দিবি?

এই তো হয়ে গেছে। কেষ্ট একগাল হেসে বললো, নতুন করে বানালাম। গুরুকে কী সকালের বানানো চা দিতে পারি?

চায়ের কাপে চুমুক বসিয়ে অলোক বললো, বেশ ভালো চা হয়েছে।

আমাদের হরভজন সিংয়ের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ নয়। এই মন্তব্য সুশীলের।

কেষ্ট কিন্তু ওদের কথায় খুব একটা আনন্দ পেল না। সে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে পল্টুর দিকে। পল্টু বুঝতে পারলো ও আসলে কার কাছ থেকে কথাটা শুনতে চায়। মুখের একটা কথায় কেউ যদি খুশি হয় তাকে নিরাশ করে কী লাভ? পল্টু হেসে বললো, হ্যাঁ, চা-টা ভালোই হয়েছে। ব্যস! আয় যায় কোথায়? পল্টু কথাটা শেষ করেছে মাত্র কেষ্ট একেবারে গদ্গদ হয়ে হাত দুটো বুকের ওপর এক করে বিনয়ের অবতার সেজে বললো, তাহলে গুরু একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন, 'কেষ্টর চা খাই, তাই আমি গোল পাই।'

হাসির এটম বম ফাটল যেন। সকলে প্রাণ ভরে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। ভোম্বল বললো, এতোদিনে একটা দারুণ কথা বলেছিস কেষ্টা! খুব ভালো লাগলো। আমাদের সঙ্গে থেকে 'মানুষ' হয়ে গেছিস। ভোম্বল হাসতে হাসতে পরে পল্টুকে বললো, তবে গুরু একটা কথা আছে। সার্টিফিকেট দিন বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তার আগে কেষ্টার চালু চাটা একবার খেয়ে দেখবেন।

ও-কথা বোলো না ভোম্বলদা। কেষ্ট খুব সহজ ভাবে বললো, মোহনবাগান জিতলেও আমার দোকানে তোমরা একুশ ঘন্টা কাটাও, হারলেও ওই একুশ ঘন্টা ধরেই শ্রাদ্ধ করো। সব সময়েই উত্তেজিত থাকো। ভালো-মন্দ চা বুঝবে কি করে?

উত্তেজিত হয়ে থাকার কথাটা বলতেই ভোম্বলের একটা কথা মনে পড়ে গেল। এইবারেই লীগের একটা খেলায় বোধহয় হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে পল্টু প্রায় দাঁড়িয়েই ছিল। নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু। মনে হচ্ছে গুরুর হয়ে যেন শান্তিগোপাল খেলছেন। ওই ভদ্রলোকটি তো আবার সকলেরই

মেক-আপ নিতে ওস্তাদ। হ্যাঁ, সেদিন ভোম্বল গুরুর উদ্দেশে আওয়াজ দিয়েছিল। সেবারই প্রথম 'বাবা পল্টু বুট জার্সি খুলে ফেলো। দু'জোড়া তাস পাঠিয়ে দিচ্ছি। রামি খেলতে বসে যাও—' ভোম্বল গল্পটা করতেই পল্টু বললো, সেদিন আমার মাঠে নামার ইচ্ছে ছিল না। একশ এক জ্বর ছিল।

ওদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবারে উঠতে হবে। অনেকক্ষণ বাইরে রয়েছে। সীতানাথটা দেরি দেখে নিশ্চয়ই তাদেরকে খুব গালাগাল করছে। কবি পকেট থেকে ব্যাগটা বের করতেই ভোম্বল হা-রে-রে-রে করে উঠলো। ও কী করছেন?

চায়ের দামটা........

নেবেটা কে শুনি? কেষ্ট একেবারে কেষ্ট ঠাকুরের মতো প্রেমিক সেজে গেল।

কেন আপনি—

ভালোবাসার দাম এই ভাবে দিতে নেই। ভোম্বল বেশ দুঃখ পেল। আপনাদের গোপালনগরে গেলে হরভজন সিংয়ের চা খাইয়ে দেবেন। ব্যাগটা পকেটে ভরে নিন কবিদা। তারপরেই ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসে আরও বললো, গতকাল মাঠে যাবার আগে সকাল থেকে প্লেয়ারদের ছবি দিয়ে বিরাট বড়ো একটা বোর্ড সাজিয়েছি। সবার মাঝে সবচেয়ে বড়ো ছবিটাই গুরুর। মাঠে যাবার আগে একটা মালা চড়িয়ে গেছি, ফিরে এসে আরও দুটো মালা গুরুর ফটোতে চড়িয়েছি। দেড়শো টাকার মিষ্টি বিলিয়েছি আর আজকে কবিদা আপনি আমাদের সামান্য চা দিয়ে গুরু সেবা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছেন?

খুব অন্যায় হয়ে গেছে ভাই! কবি সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে নিল।

এইবারটা আমাদের ক্ষমা-ঘেন্না করে দাও ভোম্বল। অলোকের চোখে-মুখে চাপা হাসি।

আপনারা ভাগ্যবান, গুরুর মতো ইন্ডিয়া ফেমাস প্লেয়ার আপনাদের বন্ধু। আপনাদের সঙ্গে খায়-দায় ওঠাবসা করে। তাই ক্ষমা করে দিলাম। তবে হ্যাঁ—পড়তেন আমাদের এই পাড়ার কাবুলের পাল্লায় ঠেলাটা বুঝতেন। কাবুল আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। এই বছরে উয়াড়িতে নাম লিখিয়েছে। গোটা সাতেক ম্যাচ এই পর্যন্ত খেলেছে, এখনই আমাদেরকে চিনতে পারে না। যাইহোক, সে-সব বলে আর লাভ নেই। গুরু আপনারা তো এক্ষুনি চলে যাচ্ছেন—একটা রিকোয়েস্ট রাখবেন?

বলো!

আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধূলো দেবেন? ওই যে, ওই সবুজ রঙের বাড়িটাই আমাদের। ভোম্বলের গলাটা আবেগে প্রায় বুজে এলো। পল্টু খেলার মাঠের অভিজ্ঞতা থেকে জানে এই ধরনের ছেলেরা কতোখানি ইমোশনাল হয়! সে ভোম্বলের কাঁধে একখানা হাত রেখে বললো, তোমার বাড়িটা তো চিনে গেলাম। কথা দিচ্ছি আবার আসবো। কেষ্ট! তোমার দোকানে এসেও চা খেয়ে যাবো। এই সঙ্গে আর একটা কথাও বলে রাখছি, যখন আমার খেলা থাকবে না, সেদিনও যেন তোমাদের এমন ভালোবাসা পাই।

আপনার খেলা থাক-আর-না'ই থাক, ব্যবহারের জন্য আপনি সব সময়েই আমাদের কাছে বড়ো হয়ে থাকবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে পল্টু ওরা সীতানাথের শ্বশুর বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সুশীল বললো, আজকের সকালটা এতো সুন্দর ভাবে কাটবে ভাবতে পারিনি। ভোম্বলটাকে বেশ লাগলো তাই না রে?

ক্লাবের প্রতি এই সব ছেলেদের টানের কোনও তুলনাই হয় না। কুমার বললো, শুনলি না ভোম্বল বলছিল ক্লাব জেতার ফলে ও দেড়শো টাকার মিষ্টি বিলিয়েছে।

পল্টু শুধু বললো, এদের ভালোবাসার, আন্তরিকতার শেষ নেই।

সীতানাথের শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছেই পাঁচ বন্ধুর কানে গেল সীতানাথ ফ্যাসাদে পড়েছে। মেয়ে বৌ মাসি পিসির দল ওকে ঘেরাও করে আছে। শয্যা তুলুনির নাম করে ওরা তিনশো টাকা দাবি করেছে। সীতানাথ অতো টাকায় কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পল্টু মেয়েদের ভিড় সরিয়ে সামনে

গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, তুই কী রে! এঁরা এতোক্ষণ ধরে টাকাটা চাইছেন তুই দিতে পারছিস না?

বলুন—আপনিই বলুন। একটি মেয়ে সমর্থন পেয়ে পল্টুর দিকে তাকাতেই পল্টুও সীতানাথের দিকে চেয়ে বললো, এখানে এঁরা কতোজন হবেন? মুহূর্তে একটু গুনে নিয়ে পল্টু আবার বললো, উনিশজন। তা এক কাজ কর তুই। পুরোপুরি কুড়িটা টাকাই ওঁদের হাতে দিয়ে দে—

চালাকি পেয়েছো—সুনন্দা রেগে উঠলো। তিনশো টাকার একটা টাকাও কম নয়।

না না, একটা টাকা অন্তত কম নাও।

আবার চালাকি!

সত্যি, বিশ্বাস করো, তোমার দিদিকে বিয়ে করার জন্য সীতানাথ কতো টাকা ধার করেছে জানো?

ও-সব ধার-বাকির লিষ্ট শুনতে চাই না। বন্ধুর হয়ে ওকালতি করতে এসো না তো, বলেছি তো ওই তিনশো টাকাই দিতে হবে।

এটা কী সাঙ্ঘাতিক মেয়ে রে বাবা! সীতানাথ রিকোয়েষ্ট করে বললো, আড়াইশো টাকা নাও।

উঁহু!

পৌনে তিনশো—

আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। অতো ঘ্যানঘ্যান করবেন না তো।

ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। তিনশো টাকাই দেবো। সীতানাথ হেসে দিল, আমার নামে একটা স্ট্যাচু করে রেখো। হ্যাঁ এইখানে—এই আমি যেখানে বসে আছি ঠিক এই জায়গাতে। বলেই সে সুনন্দার হাতে তিনখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিল।

এ-যেন একটা সাদামাটা খেলা হলো। পল্টুর ভালো লাগলো না। সে বললো, কী রে সীতানাথ, এতো তাড়াতাড়ি হেরে গেলি?

এ বড়ো শক্ত ডিফেন্স রে পল্টু—তুইও পেনিট্রেট করতে পারবি না।

আবার আমাকে টানছিস কেন? তুই নিজে পারলি না তাই বল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোর সময়েও দেখবো। সীতানাথ আড়চোখে সুনন্দাকে একবার দেখে নিয়ে বললো, এই ডিফেন্সে চিড় ধরাতে স্বয়ং পেলে, পাওলো রোসিরও সাধ্যি নেই। তোর লেকচার কোথায় থাকে সেদিন দেখবো!

নতুন বৌকে নিয়ে সীতানাথ ওরা বেলা এগারটা নাগাদ গোপালনগরে এসে পৌছালো। সঙ্গে সুনন্দাও এসেছে। গাড়ির মধ্যে বসেই কুমার সুনন্দাকে বললো, ম্যাডাম সামনের এই দোতলা বাড়িটাকে অনুগ্রহ করে চিনে রাখুন। ভবিষ্যতে খুবই কাজে লাগবে।

অন্যান্য বন্ধুদের হাসাহাসির মধ্যেই সবাই গাড়ি থেকে নামলো। কেন-না পল্টুদের ওই দোতলা বাড়িটার আগেরটাই সীতানাথদের। সীতানাথের মা-মাসিরা সুপর্ণাকে বরণ করে নিতে শাঁখ, উলুধ্বনি দিতে দিতে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন। কবি এক ফাঁকে সীতানাথের কানে কানে কী যেন বললো। তারপরে অলোক ওদেরকে বললো, আমি চলি রে—

আর একটু থাকবি না?

না রে! স্নান-টান করে টানা একখানা ঘুম দিতে হবে।

বিকেলে আসছিস তো?

হ্যাঁ।

মোড়ের মাথার দোকান থেকে কবি বুলানের জন্য কেক এবং পিপিনের জন্য বিস্কুট কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। দোতলায় উঠে মা বলে বেশ জোরে একটা ডাক দিতে মহুয়া এবং স্নেহলতা দুজনেই এগিয়ে এলেন। কিন্তু ওঁদের আসার আগেই কবির গলার আওয়াজ পেয়ে ছাদ থেকে নীচে নেমে এলো পিপিন একটানা ঘেউ ঘেউ করতে করতে। দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কবির কোমরটা জড়িয়ে ধরে ও গা চাটতে লাগলো। কবি মিনিট দুয়েক ওকে চাটার সুযোগ দিয়ে বললো, আমাকে

অনেক আদর করেছিস। এবারে তোব জিভের কাজটা বন্ধ কর। কালকে আমি বন্ধুর বিয়েতে শ্যামবাজার গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারিনি। খেতে বসে তোর কথা বারবাব মনে পড়ছিল— হ্যাঁ, কবি ঠিক এমনি ভাবেই পিপিনের সঙ্গে কথা বলে। যেন মানুষের সঙ্গেই কথা বলছে। পিপিনটাও হাঁ করে ওর কথাবার্তা শোনে। কবি প্রায়ই বলে, জানো বৌদি আমার মনে হয় পিপিন একদিন দুম করে কথা বলে বসবে! ওর ভাবভঙ্গি সবই মানুষের মতো।

মহুয়া আর স্নেহলতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবির আদরের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। কেকটা মহুয়াব হাতে আর বিস্কুটটা পিপিনকে দিয়ে কবি বললো, কাল ওকে বিস্কুট দিয়েছিলে?

তোর বাবা পর্যন্ত আজকাল পিপিনেব খোঁজ খবর রাখছেন। স্নেহলতা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, পাছে কেউ ভুলে যায়, উনি বিকেল থেকেই তাড়া দিচ্ছিলেন, পিপিনকে বিস্কুট দিতে হবে কিন্তু। যে-মানুষটা দু'চোক্ষে কুকুর দেখতে পাবতেন না, তিনি এখন আদবও করেন। পশুপক্ষী বাড়িতে থাকলে ওরাও বাড়িরই একজন হয়ে যায়। এই হচ্ছে মায়া!

পিপিনের বিস্কুট খাওয়া শেষ হলে ও মহুযাব হাতে যে-কেকেব প্যাকেটটা বয়েছে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। কবি ওর গলায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, ওটা বুলানেব। ওদিক তাকিয়ে থাকলে কিচ্ছু হবে না। তুমি যা-পাবাব পেয়ে গেছো, এখন সোজা আবার ছাদে চলে যাও। পিপিন আলতো শব্দে ছোট্ট একটা ঘেউ করেই দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। কবি হেসে মহুয়াকে বললো, পিপিন কী বোঝাতে চাইলো বুঝলে কিছু?

পিপিনের ভাষা বোঝার ডক্টরেট তো তুমি। মহুযা বললো, তুমিই বলো—

ও বলতে চাইলো, একই বাড়িতে একজনের জন্য কেক আরেক জনের জন্য বিস্কুট এই পার্সিযালিটি থাকা ঠিক নয়।

তুই পারিসও বটে— স্নেহলতা হেসে ফেললেন। বললেন, সীতানাথের বৌ কেমন হলো?

সীতানাথ খুব ভালো বৌ পেয়েছে মা। ওর শ্বশুববাড়িব লোকেবাও দারুণ। আমাদেব আদব যত্নের কোনও ত্রুটিই বাখেনি।

ভালো হলেই ভালো। স্নেহলতা বললেন, আজকাল ভালো বৌ পাওয়া সেও এক লটারীর ব্যাপার।

কবি হঠাৎ স্নেহলতাকে জড়িয়ে ধরে ঠাট্টা-ফাজলামো শুরু করে দিল। যা ও মাঝেমধ্যেই করে। কবি আদুরে গলায় বললো, মা আমার বিয়ে দেবে কবে? আমি তো আব তোমার সেই ছোট ছেলেটি নেই।

কেন? মহুয়ার তির্যক চোখে কৌতুকেব ছায়া, বিয়ে বাড়িতে কিছু ঘটিয়ে এসেছ নাকি?

মেয়েটিকে তাহলে একদিন বাড়িতে নিয়ে আয়। স্নেহলতা বললেন, আমি আব কিছু চাই না। আমার মহুয়াকে সে মেনে চললেই হলো।

দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসলো সবাই। কবি প্রথমেই মহুয়াকে বললো, বৌদি আমাকে ও-সব মাছ ডালনা-কালনা কিছু দেবে না। স্রেফ ওই মুসুবির ডাল, লেবু আর একটু শুক্তো দিয়ো। তারপরেই মনে পড়ে যাওযার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, ভালো কথা সীতানাথের বিয়েতে আমরা কী দেবো? একটা ভালো শাড়ি-টাড়ি তো.....

কেনা হয়ে গেছে। স্নেহলতা বললেন, রবি আর মহুয়া গতকাল একটা সাউথ ইন্ডিয়ান কিনে এনেছে। সীতানাথের বৌয়েব গায়ের বং কেমন?

বেশ ফর্সা!

তাহলে সুন্দর মানাবে। শাড়িটার রং গাঢ় সবুজ।

খেতে খেতে কবি হঠাৎ বললো, বৌদি, আজকের কাগজটা কোথায়?

বাবার ঘরে আছে।

খাওয়ার পর ওটা দেখতে হবে। এখনও কাগজ পড়িনি। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। তাছাড়া পল্টুর সম্বন্ধে কী লিখেছে ভালো করে পড়তে হবে।

কাকা, পল্টুকাকার ছবি প্রথম পাতায়। বুলান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললো, দারুণ ভলি শটে গোল করেছে।

কবি রবির দিকে তাকালো। বললো, দাদা কাল কেমন খেলা দেখলে?

খেলেছে তো কাল পল্টু। রবি খাওয়া ছেড়ে হাত গুটিয়ে পল্টু কিভাবে গোলটা করেছে, মাঠে যাওয়া ছোট ভাইয়ের কাছেই আবার বর্ণনা দিতে বসলো। দুর্ধর্ষ গোল। রবি জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোথায় বসেছিলি?

আমরা তো ক্লাব হাউসে। তুমি?

আর বলিস কেন, ইস্টবেঙ্গল এনক্লোজারে। খেলা দেখার অর্ধেক আনন্দ ওখানেই মাটি।

তোদের এই জিনিসটা বড়ো খারাপ। চন্দ্রনাথ দুই ছেলের উদ্দেশেই বললেন, মাঠে গিয়ে চিৎকার নাচানাচি করার বয়স কী তোদের আছে যে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজস্ব ক্লাবের এনক্লোজার খুঁজিস? চন্দ্রনাথ প্রশান্ত হাসলেন, খেলা দেখে আনন্দ পেতাম আমাদের সময়ে। টিম হেরে যাবার পরেও দুই দলের খেলোয়াড়েরা পাশাপাশিই বসে হাসিঠাট্টা করছে। আসলে কী জানিস তখন খেলা দেখেই লোকে আনন্দ পেতো, এখন শুধু দলের জয়ই দেখতে চায়। সেই কারণেই আজ মাঠে এবং মাঠের বাইরে এতো গন্ডগোল, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেয়াদপি. এ-গুলো সহ্য করা যায় না।

বুলান বললো, দাদু বড়ো হলে আমি ইস্টবেঙ্গলে খেলবো।

কবি ভাইপোর দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকালো। অনেকক্ষণ ওর পেছনে লাগা হয়নি। এইবারে একটু লাগতেই হয়। কবি বললো, তুই একবার বলছিস গাভাসকর হবি, আর একবার বলছিস পল্টুকাকার মতো ফুটবল প্লেয়ার হবি। তুই কী যে হবি তা তুই-ই জানিস! তবে আমার মনে হয় তুই একজন বড়ো লুডু খেলোয়াড় হবি।

কাকা তুমি কিন্তু খুব বাজে কথা বলেছো। বুলান ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিতে মোটেই দ্বিধা করলো না।

আবার তুই ওর সঙ্গে লাগছিস? স্নেহলতা ছোট ছেলেকে ধমকে উঠলেন।

ঠিক আছে আর লাগবো না। বুলান গাভাসকরও হবে, পল্টুও হবে।

বুলান এবারে হেসে দিল। খুশি খুশি গলায় বললো, কাকা অতোটা বাড়িয়ে বোলো না— যে-কোনও একজন হতে পারলেই তো তোমার টিকিট বাধা।

খেয়ে-দেয়ে কবি দারুণ একখানা ঘুম দিল। সাড়ে চারটের সময় মহুয়া একবার চা বানিয়েছিল। কবি তখনও ঘুমে। তাই ওকে ডাকেনি। বিয়ে বাড়িতে রাত জেগেছে। একটু ঘুমোক।

কবির ঘুম ভাঙলো সওয়া-পাঁচটা নাগাদ। মহুয়া তখন ছাদে যাচ্ছিলো। কবি ডাকল, বৌদি শুনে যাও।

দাঁড়াও আগে—ছাদ থেকে জামা-কাপড় সব তুলে নিয়ে আসি।

মিনিট দশেক বাদে মহুয়া কাচা জামা-কাপড়ের পাহাড় নিয়ে তিনতলার ছাদ থেকে দোতলায় নামতেই দেখলো দুটি ছেলে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। মহুয়া জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?

কবি বন্দ্যোপাধ্যায় ...

হ্যাঁ আছে। ভেতরে আসুন। কথাটা বলেই মহুয়া কবির ঘরে মুখ বাড়িয়ে বললো, দুজন তোমাকে খুঁজতে এসেছে। কবি ইশারায় ভ্রু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, কে?

চিনি না। কোনোদিন দেখিনি। মহুয়া নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ছেলে দুটি কবির ঘরে ঢুকতেই সে বললো, বসুন। বড়ো সোফাটায় ওরা পাশাপাশি বসলো। দুজনের মধ্যে যে-বড়ো সে কবিরই সমবয়সী হবে। তার নাম রফিকুল মল্লিক। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। দোহারা গড়ন। কালোর মধ্যেও গায়ের রংটা বেশ চকচকে। ইউনিভারসাল বুক ডিপোর প্রকাশক সে। অপরজন রফিকুলের চেয়ে তিন-চার বছরের ছোটই হবে। ওর নাম বাবলু। ফর্সা ছিপছিপে গড়নের ছেলেটা সব সময়েই যেন হাসছে। বাবলু ইউনিভারসালে চাকরি করে বটে তবে সে কারও থেকে কম নয়। সমস্ত ব্যাপারটা যাতে বাবলুর নখদর্পণে থাকে সেই কারণেই রফিকুল গুরুত্বপূর্ণ

কাজে যেখানেই যায় সঙ্গে বাবলুকে নিতেই হয়।

পবিচয়েব পালা-টালা শেষ হলে রফিকুল বললো, আমবা আপনার একটা বই পেতে চাই। এই ধরুন গিয়ে দশ-এগারো ফর্মার বই হলেও চলবে। আমরা অনেক আশা নিয়েই এসেছি। তাছাড়া আপনি তো প্রায়ই সরস্বতী লাইব্রেরীতে যান। ওদের চারটে দোকানের পরেই আমাদের ইউনিভাবসাল। যাইহোক কবিবাবু, আমি আপনাকে ওখানেই ধরতে পারতাম কিন্তু প্রথম কাজ বাড়িতে বসেই কথাবার্তা বলা ভালো।

যে-কারণে আজ আমরা বাড়ি গেলাম না। বাড়িতে যেতে না-পারায় মন খারাপের কোনও চিহ্ন বাবলুর মুখে নেই। সে হাসছে।

বাড়ি যেতে পারলেন না মানে? কবি কথাটা শেষ করতেই রফিকুল বললো, আমাদের দুজনের বাড়িই হুগলীর ধীৎপুর গ্রামে। রোজ বাড়ি যাওয়া হয় না। প্রতি শনিবাব সন্ধ্যায় নয় তো রবিবার সকালে বাড়ি যাই।

এখানে থাকেন কোথায়?

মহাত্মা গান্ধী রোডে। তিনতলার চারখানা ঘব ভাড়া নিয়ে আছি। রান্নার লোক রয়েছে। তাছাড়া দেশ থেকে প্রায়ই বাবা অথবা ভাইয়েরা কেউ-না-কেউ আসছে। গতকাল খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, আজ যেতে পারবো না।

রফিকুল আর বাবলুব কথাবার্তার বেশ একটা আন্তরিকতাব টান বয়েছে যেটা কবিকে প্রথমেই মুগ্ধ কবেছে। একেবাবেই সাদাসিধে কথা। ব্যবসায়ীর মাবপ্যাঁচ নেই। কবির খুব ভালো লাগলো। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস কবলো, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন রফিকুলবাবু?

আছেন সবাই। মা-বাবা, আট ভাই, আমার স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে!

ছেলে-মেযের বয়স কতো?

ছেলেটা বড়ো। ওর বয়স ধরুন গিয়ে আট-ন আব মেয়েটার দেড়-দুই হবে।

সপ্তাহে বাড়ি গিয়ে একটা দিন তো ওদেব কাছে থাকেন, তাও এবারে যাওয়া হলো না। মন খারাপ লাগছে না?

লাগছে না আবাব! বাবলু তার অনাবিল হাসি ছড়িয়ে বললো, আপনার এখানে আসার পথেই দাদা বলছিল, কীরে বাবলু, রাতেই একবার বাড়ি যাওযাব চান্স দিবি নাকি? পাপ্পুকে আবার গত সপ্তাহে মেরে এসেছে।

মেবে এসেছেন? কেন? কবি বফিকুলেব দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

আর বলবেন না—ব্রাশ ব্রাশ করে মাথা খারাপ করে দিযেছিল। মানে টুথ ব্রাশ। যাই হোক দোকানে নিয়ে গিয়ে তো ব্রশ ট্রাশ কিনে দিলাম। আরও অনেক কিছু কেনাকাটা করলাম। সাইকেল রিক্সা করে বাড়ি ফেরার পথে সেই ব্রাশটাকেই হারিয়ে বসে আছে। তাই তখন একটু...রফিকুল ম্লান মুখে বললো, এখন খুবই খারাপ লাগছে।

শুনুন রফিকুল সাহেব, আপনি আর বাবলু আজ সোজা দেশে চলে যান। ভাঙা মন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় না। আপনারা খুশি মন নিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে আসুন। সামনের বুধবার আমি সন্ধ্যা নাগাদ আপনার দোকানে যাবো।

বাবলু রফিকুলের কানে কানে কী যেন বলতেই বফিকুল বললো, টাকা-পয়সার ব্যাপারে.......

ও-সব আলোচনা আজ থাক। ওটা আমার কাছে অতোটা জরুরী নয়; যতোটা জরুরী আপনাদের বাড়ি যাওয়া।

আমরা তাহলে এখন উঠি। রফিকুল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কবি বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে একটা ধমক লাগালো উঠি কী মশাই? আমাদের বাড়িতে প্রথম এলেন। মিষ্টি মুখ করে যান। কবি ওখানে বসেই জোরে ডেকে উঠলো, বৌদি একবার এদিকে শুনে যাও—

রফিকুল, বাবলু চলে যাবার পর কবি ভাবলো এইবার একটু সীতানাথদের বাড়ি যাওয়া দরকার।

বন্ধুরাও ওইখানেই রয়েছে। কাজ তো কিছুই করতে হবে না। তবুও সামনে থাকাটাই বড়ো কথা। কবি বাড়ি থেকে বের হতে যাবে দিদি জামাইবাবু তক্ষুনি এলো। ওদেরকে ফেলে যাওয়া যায়? প্রায় দু'সপ্তাহ বাদে উপমা এল। কবি বললো, দিদি মনে হচ্ছে তুই অনেকদিন পরে এলি। কতোদিন তোকে দেখি না।

আমিই তো আসি। উপমা অভিযোগ করে বললো, তুই তো আর দিদির বাড়ি গিয়ে তাকে একটু দেখে আসিস না।

কার সঙ্গে কথা বলছো তুমি? দেবাশিস মজা করে বললো, ও-সব ভাই-টাই ছাড়ো। কবি এখন কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদির বাড়ি যাবাব তার সময় কোথায়?

এই-এই দেবাশিসদা, ভালো হবে না কিন্তু—কবি একেবারে শিশুর মতো বলে উঠলো, দিদির সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছেন কেন? বাড়ি তো কবেছেন বেহালাব শেষ মাথায়, যাতায়াতের কী যে কষ্ট! রোজই ভাবি একবার যাবো।

তোমাদের চার চাকা রয়েছে কী জন্যে?

গাড়ি গ্যারেজে পাঠানো হয়েছে। হেভি রিপেয়ারিং হবে। কবি বললো, সেটা যাক আপনারা কী করছেন বলুন তো? পবিবহণ সমস্যা নিয়ে সারা রাজ্যের বিশেষ করে কলকাতার মানুষদের নাকের জল চোখের জল যে এক হয়ে গেছে। আপনি তো পরিবহণ দপ্তরের সচিব। সমাধানের কী কী পবিকল্পনা নিচ্ছেন? ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে দু'খানা মাত্র নতুন বাস রাস্তায় ছেড়েই পবিত্র কর্তব্য সেবে ফেলছেন.. ...এই ভাবে কী কোনও সমস্যার সমাধান হয়? টাকা নয়-ছয় হবার ড্রেনেজগুলো আগে বন্ধ করুন।

দাঁড়াও। দাঁড়াও! তোমার পরের উপন্যাস কী এ-সব নিয়েই? দেবাশিস হাসলো। পরিষ্কার বললো, এই দেশের কিছু হবে না। একটা ফাইল মুভমেন্ট কচ্ছপের গতিকেও হার মানায়। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার কী জানো? কেউ যদি আন্তরিক ভাবেও কাজ করতে চায়, কাজ করতে পারবে না। সে পবিবেশই নেই। অথচ বক্তৃতা আমরা কেউ কারো থেকে এতোটুকু কম দেবো না।

ববি ঠাট্টা করে বললো, দেবাশিস এখন দপ্তবে নেই তাই খুব সুন্দব ভাবে কথাগুলো বললো। কালকে ওর অফিসে যাও, এই ব্যবস্থাকেই ও সমর্থন কবছে।

এটা দাদা ঠিকই বলেছেন। সবই তো বুঝতে পারছেন। কী করবো বলুন?

বড়োদেব কথার মধ্যেই বুলান হঠাৎ বলে উঠলো, পিসিমণি বোনোকে আনোনি কেন?

স্নেহলতা বললেন, সত্যিই তো সৃজনীকে আনিসনি কেন?

ওকে আনবো কী, আমরা সিনেমা দেখতে এসেছিলাম ভবানীপুরে। উপমা আরও বললো, বেহালাতেই চলে যাচ্ছিলাম। তারপরে ভাবলাম, বাড়ির সামনে এসে বাড়িতে ঢুকবো না? তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না।

দিদি অতো তাড়া দিয়ো না তো আগে থেকে—মহুয়া কপট শাসন করে বললো, চা-জলখাবার তৈরি করি, খাও দাও তারপরে তো....

উপমা দেবাশিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, বুলানের ক্যাড্‌বেরী কোথায়? ওটা কী পকেটেই রেখে দেবে?

আমার কাছ থেকে ক্যাডবেরী নিয়ে তুমি বুলানকে দেবে এটাই-বা কোন ধরনের আদর? দেবাশিস খুব জোরে হেসে উঠলো। আমি নিজেই কী বুলানকে দিতে পাবি না? কথাটা বলেই সে পকেট থেকে চকলেটের প্যাকেটটা বের করে বুলানের হাতে তুলে দিল। বুলান সঙ্গে সঙ্গে চকলেটটাকে দু'ভাগ করলো। একটা ভাগ দেবাশিসেব হাতে দিয়ে বললো, পিসন, এটা বোনোকে দেবে। বুলান পিসেমশাই বলে না। ছোটবেলা থেকে ওই 'পিসন' বলেই ডেকে আসছে। আজও সেই ডাকের কোনও পরিবর্তন হলো না। সম্ভবত আর হবেও না।

মহুয়া চা-জলখাবার ইত্যাদি তৈরি করে দেবাশিস আর উপমাকে খেতে দিল। ওরা চন্দ্রনাথের ঘরে বসে খাচ্ছে। চন্দ্রনাথ তাঁর খাটে বসে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। ওদের খাওয়া

দেখছেন। এতেই তাঁর আনন্দ। কথার এক ফাঁকে বললেন, দেবাশিস তুমি আব দুটো লুচি নাও!

না-না, আমি যথেষ্টই নিয়েছি।

কী না-না? মহুয়া ওই সময়ে প্লেটে কবে আরও লুচি তবকারি নিয়ে ঘবে এসে দাঁড়ালো। বললো, রাতে ভাত খেয়ে যেতে বলেছিলাম। তা যখন শোননি এ-গুলো সবই খেতে হবে।

দেবাশিস হাসতে হাসতে বললো, বৌদি আব কোনোদিনও আসবো না কিন্তু! এখানে এলেই তুমি এতো বেশি কবে খাইয়ে ছাড়ো পর দিন পর্যন্ত কষ্ট হয।

স্নেহলতা কথাটা মেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ মহুয়া, অতো জোরাজুরি কোরো না। ও নিজে থেকে যেটুকু চায় সেটুকুই খাক।

মহুয়া পায়ে পায়ে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রনাথকে বললো, বাবা, তোমাকে একটু তরকারি দিয়ে দু'খানা লুচি দিই?

না মা, আমাকে এখন ও-সব দিলে বাতে খেতেই পারবো না। তুমি বরং আমাকে এক কাপ চা দিও—

রবি একটু উসখুস করছিল। বিকেলেব জলখাবাব খাওয়া তাদের একটু আগেই শেষ হয়েছে। একটু আগে বলতে ঘন্টাখানেক আগে হবে। এখন চোখের সামনে দিয়ে মহুয়া লুচি তরকাবিব প্লেটটা নিয়ে যাবে এটা খুবই বাজে দেখায়। ববি স্ত্রীব চোখেব দিকে বার কযেক তাকালো। মহুযা তাকাচ্ছেই না। সে উপমা দেবাশিসকে নিয়েই ব্যস্ত। ববি যখন বুঝলো, না-চাইলে কিছু হবাব নয তখনই সে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে, যেন কোনও গরজই নেই এমনি ভাবে বললো, ও-গুলো আবাব নিয়ে যাবে কেন? দিয়ে দাও আমাকে আর কবিকে—

নিজে খেতে চাইছো খাও—আবার কবিকে সঙ্গে জড়াচ্ছো কেন? বিকেলেব জলখাবাবই ইচ্ছে নেই বলে কবি খায়নি। শুধু শুধু ওব নামটা উচ্চাবণ কবে লজ্জা কাটাতে চাইছো বুঝি?

এতো বেশি কথা বলার কী আছে? রবি বেশ তৃপ্তি নিয়ে হাসলো। কবি স্নেহলতাব পাশে বসেছিল। ববি ভাইয়েব দিকে তাকিয়ে সমর্থন পেতে চাইলো, কী রে কবি তুই'ই বল?

আমি আর কী বলবো দাদা, সব তো তুমিই বলে দিলে। কবি জোরে হেসে উঠলো, তবে এটা ঠিক বৌদি, তুমি কিন্তু আজকাল বড্ড বেশি কথা বলছো।

ওই হলো বামের ভাই লক্ষণ—মহুয়া শাসনের ভঙ্গিতে বেশ কড়া ভাবে বললো, বেবোও এখন বাড়ি থেকে। যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

হ্যাঁ-হ্যাঁ সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেল। এই দিদি, দেবাশিসদা আমি একটু বেরুচ্ছি। কবি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, সেই বিকেলে যাবার কথা ছিল, এখন সাড়ে-সাতটা বেজে গেছে!

কোথায় যাবি কোথায়? উপমা রুমালে হাতটা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস কবলো।

সীতানাথদের বাড়ি যাবো। ওর তো গতকাল বিয়ে গেল।

ওমা, তাই নাকি! তোদের বন্ধুদেব মধ্যে তাহলে সীতানাথেবই প্রথম বিয়ে হলো?

হ্যাঁ। খুবই সাধারণ ভাবে কবি বললো, দ্বিতীয় বিয়েটা হবে পল্টুব। কথাটা বলেই কবি চট করে নিজেকে গুটিয়ে নিল। বাবা রয়েছেন। সামান্য ধরনের একটা আলগা কথা বলাও উচিত নয়। আগের অসংযমী মুহূর্তটাকে মুছিয়ে দিতে কবি ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলো, চলি বে দিদি। এরপর যেদিন আসবি সৃজনীকে নিয়ে অবশ্যই আসবি। দেবাশিসদা কিছু মনে করবেন না—আমি যাচ্ছি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি এসো।

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দুমদাম করে নীচে নামতেই কবি দেখলো, ড্রইংরুমে বসে দীপান্বিতা এবং বাসু কর অলস ভাবে সোফায় বসে ড্রিঙ্ক কবছেন। কবিকে দেখতে পেয়েই বাসু কর চিৎকার করে উঠলেন, হ্যালো কবি দি মোস্ট ফেমাস এন্ড পপুলার রাইটার ইন বেঙ্গল টু ডে, এসো এসো বোসো— তুমি তো আবার ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করো না। বাট হাউ ক্যান ইউ রাইট সো মাচ ফ্যানটাসটিক নভেলস? রিয়েলী কবি আই এ্যাম টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, দিস পবিত্র প্রাঙ্গন উপন্যাস উইল ব্রীং প্রাইজ ফর

ইউ! আমি তো পড়ে মুগ্ধ। আদালতের বর্তমান চেহারাটা তুমি দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলেছো। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে! তারা তোমার লেখা পড়ে খুব খুশি। গতকালই আমাদের অফিস লাইব্রেরীতে তোমার লেখা-টেখা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমিও অংশ নিয়েছিলাম। অবশ্য ওরা জানতো না যে ওদের প্রিয় লেখকেরই বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকি। শেষে আমিই বলে দিলাম। বাসু কর চুমুক দিয়ে গেলাসের মদটুকু শেষ করলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কবির পবিত্র প্রাঙ্গন ক'বার পড়েছো?

দু'বার। দীপান্বিতা কবির চোখে চোখ রেখে আলতো হাসলো।

আমি ক'বার পড়েছি সেটা বলতে পারবো না কবি। বাসু কর নির্মল হেসে বললেন, তবে গত সাতদিন ধরে এই একটা বই-ই বারবার পড়ছি। আমার যদি আশীর্বাদ করার কোনও যোগ্যতা থাকে, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি কবি।

কবি মুগ্ধ হয়ে বাসু করের দিকে তাকিয়েই ছিল। সে বললো, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে আশীর্বাদ করতে পারেন বাসুদা।

তুমি বলছো? সন্দেহের দোলা লাগিয়ে বাসু কর হাসতে থাকেন। স্ত্রীকে বললেন, দীপা, তুমি আর আমি এখন যা খাচ্ছি সেটা কবির কাছে সাঙ্ঘাতিক অপবিত্র, তুমি ওকে দু-চারটে সন্দেশ-টন্দেশ দাও।

বাসুদা! আজ কিছু খাচ্ছি না। গতকাল বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর বিয়েতে। দারুণ খাইয়েছে। খাবারের নাম শুনলেই এখন গা গোলাচ্ছে।

তাহলে একটু ড্রিঙ্ক করো। কথাটা বলেই বাসু কর প্রচন্ড জোরে হেসে উঠলেন।

আমি পালাই। কবি ঘরের বাইরে পা রেখে রাস্তার দিকে তাকালো।

কবি যখন সীতানাথদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালো তখন আটটা বেজে গেছে। বাড়ির সামনে প্যান্ডেলের নীচে গোল হয়ে বসেছিল সীতানাথ পল্টু, কুমার, সুশীল, অলোক। কবিকে রাত এই আটটার সময়ে আসতে দেখে ওরা ওকে না-চেনার ভান করে নিজেদের মধ্যে গল্প করে চললো। কবি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের কাছে বসতেই সীতানাথ জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে চান?

পল্টু বললো, চল আমরা উঠি। বন্ধুরা সব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কবি বলে উঠলো, সে-কী রে! তোদের কখনও আসতে লেট হয় না?

বন্ধুরা সবাই আবার ঝপাঝপ বসে পড়লো। সুশীল বললো, তুই দেখালি বটে। বেলা এগারটায় বাড়ি গিয়ে এই রাত আটটায় এলি—বন্ধুর বিয়েতে এমন করলে চলে? বল অলোক? সঙ্গে সঙ্গে অলোকও সানাই বাজালো, ঠিকই তো বন্ধুর বিয়েতে.....

তবে কী নিজের বিয়েতে করবো? কবি রং মশলার বাজির মতো হাসির আলো ছড়িয়ে বললো, তোদের ব্যাপারটা কী বলতো? আজ কী আমার পেছনে লাগা হবে?

অতো নির্বোধ আমরা কেউ নই। এখান থেকেই বাড়ির ভেতরে দৃষ্টি চালিয়ে সুনন্দাকে দেখতে দেখতে পল্টু আর কুমার প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো।

এ-যে দেখছি সব শেয়ালের এক রা—কবি অভিযোগ করে বললো, তোরা আগে আমার কথাটা তো শুনবি। বিকেলে ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতেই রফিকুল আর বাবলু এসে হাজির। ইউনিভারসালের পাবলিশার ওরা। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখানে আসতে যাবো, দিদি জামাইবাবু এলো ওই সময়ে। গল্প-গুজব করে বেরিয়ে আসছি নীচের দীপান্বিতা বৌদি, বাসুদা ধরলেন।

হ্যাঁ—দীপান্বিতা বৌদি ধরেছেন তাই আমাদের কথা ভুলে গেলি। সীতানাথ সব বন্ধুদের দিকে ফিরে ফিরে তাকালো। এই আমাকে দ্যাখ, ঘরে নতুন একেবারে জ্যান্ত বৌ রেখে এসে তোদের মতো আকাটদের সঙ্গে কতো আনন্দে গল্প করছি। এর নাম বন্ধুপ্রীতি। বুঝলি?

সীতানাথের ওই ছোট্ট লেকচারটা শুনে সকলেই মুখ টিপে হাসছিল। সুশীল বললো, হ্যাঁ রে সীতানাথ, কাল থেকে তো ওই বন্ধুপ্রীতিতে-টেরিফিক ভাঙ্গন ধরবে তাই না?

হ্যাঁ— কী বললি? সীতানাথ চোখ বড়ো বড়ো করে বাতাসে পাতা নড়ার চেয়েও বেশি জোরে

মাথা দুলিয়ে বললো, কক্ষনও না। তবে প্রথম দেড়টা দুটো বছর তো ছাড়-ছুড় দিতেই হবে। ওই গ্রেসটুটু সকলেই পায়।

বাঃ কী সুন্দর স্বীকারোক্তি। অলোক বললো, ঠিক এই জন্যেই সীতানাথকে ভালোলাগে। ওর কাছে ওসব ট্যাঁ ফোঁ নেই। যেটা ইয়েস সেটা ইয়েস।

সীতানাথরা চারবোন তিন ভাই। সাত ভাইবোনের মধ্যে এই সংসারে সে সকলের শেষে এসেছে। সেই সীতানাথের আজ বৌ-ভাত। সারা বাড়ি উৎসবের সাজে একেবারে তিলোত্তমা। টুনি লাইটের আলো যেন আকাশের তারা হয়ে বাড়ির গায়ে লেগে রয়েছে। গেটের মাথায় বসেছে সানাইয়েব আসর। চমৎকার সুর বাজাচ্ছে ওরা। ছাদের ফুলের টবগুলোকে নীচে নামিয়ে গেটের পাশে সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আলাদা একটা সৌন্দর্য এনেছে চারটে ঝাউগাছের টব। ওই গাছগুলো সামান্য একটু বড়ো হওয়ার দরুন ওখানেও হালকা সবুজ রংয়ের টুনি-বাল্ব দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির সামনে এখন লম্বা গাড়ির লাইন। সীতানাথের অফিসের স্টাফরা এসেছেন। ম্যানেজাব-ট্যানেজার থেকে শুরু করে বেয়ারা-টেয়ারা সব! সীতানাথেব অফিস প্রীতি দারুণ। কাউকেই বাদ দেয়নি। সে সবাইকে নিয়ে নতুন বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সামনের সারিতে ম্যানেজার, তার পি. এ লাবণ্য সরকার এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা ছিলেন, তাদের পেছনে জিলিপির প্যাঁচের মতো পাবলিক হয়ে অন্যান্য স্টাফেবা কোনওবকমে নতুন বৌয়ের উদ্দেশে নমস্কার ছুড়ে দিল। গ্লষ্টার কোম্পানির কলকাতা অফিসের হয়ে লাবণ্য সরকার সীতানাথের বৌ অর্থাৎ সুপর্ণার হাতে একটা গহনার বাক্স তুলে দিতেই ম্যানেজার বললেন, মিস সরকার আপনি এক কাজ করুন। মিসেস মুখার্জির গলায় নেকলেসটা পরিয়েই দিন। লাবণ্য সরকার তাই কবলো। সুপর্ণার গলায় দামি হারটা পবিযে দিতেই অফিসের সকলে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন কবতেই সুপর্ণা আর একবার সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

সীতানাথের বাবা এবং দাদারা অফিস স্টাফের ওপর বিশেষ নজর দিলেন। আপ্যায়নের যেন এতোটুকু ত্রুটি না হয়। এখানে এখন ম্যানেজার আর বেয়ারার মধ্যে কোনও তফাত নেই। হিসেবটা সহজ। সকলেই নিমন্ত্রিত অতিথি। কোল্ড ড্রিঙ্কস, কফি, যিনি যেটাই খেতে চাইছেন তাকে তাই দেওয়া হচ্ছে।

সীতানাথ এরমধ্যে কিছুটা ছেলেমানুষী করে ফেললো। কবিকে ডেকে লাবণ্য সরকাবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বললো, ইনিই লাবণ্য সরকাব। লাবণ্য নমস্কাব জানিয়ে একটু অবাক হয়ে বললো, ওঁর নামটা বলবেন তো?

আপনিই জিজ্ঞেস করুন না—সীতানাথের চোখে-মুখে কৌতুকের চাপা হাসি। লাবণ্যও এতটুকু দেরি করলো না। ছোট মেয়ের মতো আদুরে গলায় কবিকে বললো, সীতানাথবাবু অদ্ভুত রীতিতে আলাপ করিয়ে দিলেন। আপনার নামটাই জানা হলো না।

কবি খুব আস্তে বললো, কবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানে—লাবণ্য চকিতে সীতানাথের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাওয়া পরশ পাথরের খোঁজ পেল। তারপরেই কবির সারা মুখের ওপর টানাটানা চোখ দুটো স্থির করে ধরে রেখে বিহ্বল গলায় যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলো, মানে ঈশ্বব তোমাকে অভিযোগ কবছি, অন্তঃসত্ত্বা, পবিত্র প্রাঙ্গন........

কবি কোনও কথা না-বলে মাথাটা নিচু করে সামান্য হাসলো। লাবণ্যর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক। কবিব সঙ্গে আলাপ হওয়ার আনন্দে ভেতবে ভেতরে সে যথেষ্ট চঞ্চল হয়ে উঠলো। কবির লেখা তার দারুণ ভালোলাগে। কিন্তু এই লেখক যে এতো সুন্দর এতো তরুণ সেটা মোটেই জানা ছিল না। লাবণ্য যেন ঈশ্বর প্রেরিত কোনও পুরুষকে দেখছে। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, সীতানাথবাবু আপনাকে অবিশ্বাস কবে আমি নিজেই ঠকলাম। নয়তো কবিবাবুর সঙ্গে অনেক আগেই....

সেটা আপনি বুঝুন। সীতানাথও একগাল হেসে বললো, আপনি তো সেদিন দুম দুম করে আমার নাক-কান কেটে দিলেন, এমন ভাবে তাকিয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন যেন আমি দারুণ একটা মিথ্যে বলেছি।

এক্সট্রিমলি স্যরি! সাজানো দাঁতে লাবণ্য আরও সুন্দর করে হাসলো।

আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারি কী? কথাটা সীতানাথ যদিও হাসতে হাসতেই বললো কিন্তু ভেতরের সুরটুকু ছিল বিজয়ীর মতো দীপ্ত।

তাই করুন না—

বেশ ক্ষমা করে দিলাম।

সীতানাথের অফিসের এক বন্ধু ওকে ডেকে নিয়ে যেতেই লাবণ্য কোনওরকম লজ্জা সঙ্কোচ করলো না, কবির চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের ভঙ্গিমায় কোমল সুরে বললো, আপনার লেখা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু বিয়ে বাড়ির এই পরিবেশে সে-গুলো নিছক কথাই হয়ে থাকবে। সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাই। শুনতে চাই। আমার অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তারপরেই লাবণ্য গলার সুরটুকু এক ধাপ নীচে নামিয়ে আরও আন্তরিকতার ভঙ্গিতে বললো, আপনার কবে সময় হবে বলুন—আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে।

কোথায় থাকে আপনি?

গুরু সদয় রোডে।

লাবণ্য ওর ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কার্ড বের করে কবির হাতে দিয়ে বললো, তাহলে কবে আসছেন বলুন?

এখনই কিন্তু কথা দিতে পারছি না। কবি মৃদু হেসে বললো, আসলে আসছে সপ্তাহ খুব ব্যস্ত থাকবো। তার পরের সপ্তাহের যে-কোনও একটা দিনে চেষ্টা করবো।

না, চেষ্টা নয়, যেতেই হবে। লাবণ্য ছোট্ট মেয়ের মতো বায়না ধরলো।

সেই যাওয়ারই তো চেষ্টা করবো। কবি চোখ থেকে স্কোয়ার চশমাটা নামিয়ে রুমালে মুছতে মুছতে বললো, ইচ্ছে না-থাকলে, সেই ইচ্ছের পেছনে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা না-থাকলে তো কোনও কিছুই হতে পারে না। সব কথার মূলেই কিন্তু ওই চেষ্টাই!

লাবণ্য এতোক্ষণ কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে হাসছিল। সে-হাসি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ছিল তবে শব্দের তরঙ্গ ছিল না। সেটা ছিল নিস্তরঙ্গের চুপিসারে অভিসার। কবির শেষ কথাটা শুনে সে এবারে শব্দ করে হেসে উঠলো। লাবণ্যর মাঝারি ধরনের দাঁতগুলো সমান ভাবে সাজানো। একেবারে ঝকঝকে। তবুও সে তার মেদহীন সরু কোমর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে মুখে চাপা দিল। বললো, আপনি তো লেখেন! এতো সুন্দর করে কথাও বলতে পারেন?

কেন, যিনি রাঁধেন তিনি কী চুল বাঁধতে জানেন না?

ফাইন! লাবণ্য চোখ দুটো বুজে মাথা নাড়িয়ে বললো, আপনার সঙ্গে কথাতেও পারবো না।

ওই সময়ে সীতানাথ এসে আবার ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আগে কী কী কথাবার্তা হয়েছে সেটা তার জানা নেই কিন্তু লাবণ্যর শেষের কথাটা সে লুফে নিয়ে বললো, আমাকে তো দিব্যি এক কথায় কুপোকাত করে দিয়েছিলেন, এখন কবির সঙ্গে পারবেন না বললে কেমন করে হবে?

সীতানাথবাবু, হেরেও জেতার আনন্দ পাওয়া যায় সেটা জানেন?

কবির মুখের দিকে তাকিয়ে সীতানাথ বিশেষ এক ভঙ্গিমায় হেসে বললো, এইমাত্র তা জানলাম।

চন্দ্রনাথ, স্নেহলতা, রবি, মহুয়া আর বুলান গেটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই সীতানাথের বাবা এগিয়ে গিয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। ছুটে গেল সীতানাথও। সে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর সুরে বললো, আচ্ছা বৌদি আমার কী নিমন্ত্রণ করতে কোনও ত্রুটি হয়েছে? মহুয়া কথাটার অর্থ বুঝতে না-পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। রবি জিজ্ঞেস করলো, এ-কথা বলছিস কেন?

আপনারা ভূপালকে সঙ্গে আনেননি কেন? ভূপাল কবিদের বাড়ির কাজের ছেলে। সীতানাথ সেই ভূপালের উল্লেখ করে বললো, আমি বরং গিয়ে ওকে ডেকে আনছি।

রবি বললো, তোকে এখন ব্যস্ত হতে হবে না। উৎসবের বাড়ি ছেড়ে তুই যাবি কী রে? আমরা বরং গিয়ে ভূপালকে পাঠিয়ে দেবো।

সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে সীতানাথ ওঁদেরকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেসোমশাই-মাসিমা, দাদা-বৌদি আব বুলান। কবির বাবা-মা.........সীতানাথের কথা শেষ হলো না। সুপর্ণা ফুলের সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতেই চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি হাতটা ধরে ফেললেন। আশীর্বাদ করে বললেন, থাক মা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না। মহুয়া শাড়ির বাক্সটা স্নেহলতার হাতে দিয়ে বললো, মা তুমি দাও।

আমি কেন দেবো? স্নেহলতা প্রশান্ত হেসে বললেন, তুই'ই দে—

এতো ভিড়ের মধ্যেও এক কোণে দাঁড়িয়ে গভীর ভবে গল্প কবে চলেছে সুনন্দা আর পল্টু। কে দেখলো, কে কী মনে করলো সেদিকে ওদের কারুবই খেয়াল নেই। এতো হিসেব করে নজর বেখে আর যাই হোক মনের কথা খুলে বলা যায না। ওবা তাই বাইরেব জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের জগৎটা গড়ে তোলাব কাজে বড়বেশি ব্যস্ত হয়ে পডলো। পল্টু বললো, সুনন্দা তোমাকে খুব সুন্দব লাগছে। দারুণ সেজেছো।

সাজাব জন্যে ভালো লাগছে? সুনন্দা মনে মনে একটু আহত হলো।

না, তা নয়; এমনিতেই তুমি সুন্দরী তবে আজকে আবও ভালো লাগছে।

এই কথাটা কতোজনকে বলেছো?

তোমার কী মনে হয়? পল্টুই উল্টে ওকে প্রশ্ন কবে হাসলো। তাবপরেই একটু সিরিযাস হলো। বললো, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলছি, খেলাব জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরেছি প্রচুব। বহু মেয়েব সঙ্গে আলাপও হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তোমার চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু ভালোলাগাটা অন্য ব্যাপার সুনন্দা। তুমি যদি বলো আমি তোমাব বাবা-মার সঙ্গে কথা বলতে রাজি আছি।

এতোটা? সুনন্দাব মনের ভেতরে তখন ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। পল্টুকে পাওয়া যে-কোনও মেয়ের কাছেই স্বপ্নের ব্যাপার। সেই পল্টুকে কাছে পেতে গিয়ে ওকে হারাতে হবে না তো? এটা ঠিক, ওব নাম-যশ যেমন যে-কোনও মেয়েকে বিশিষ্ট কবে তুলতে পারে তেমনই আবাব দূবে সরে গিয়ে তাকে অনায়াসে উপহাসের পাত্রী বানিয়ে করুণা ভিক্ষাব ব্যবস্থা করতে পারে। কী-না পারে পল্টু? ওর বিরাট ব্যাপ্তির কাছে নিজেকে বড়ো অসহায টলমল মনে হয়। সুনন্দাকে বেশি ভাবনা চিন্তার সময় দিল না পল্টু। সে বললো, 'সীতানাথের বিয়ে দেখে মাথার মধ্যে...

এটা তোমার সাময়িক মোহ! সুনন্দা পল্টুকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাঁটি সোনার মতো বেছে নিতে চায়।

ও-সব মোহ-টোহ বুঝি-না, আর কবির মতো অতো গুছিয়েও কথা বলতে পারবো না, দরাজ গলায় পল্টু উত্তর দিল, জানো তো গোলের সামনে বল পেলে সময় নিয়ে আমি অযথা পায়তাড়া করতে পারি না; এই জীবনটা তাই তোমার সঙ্গেই সুখে-দুঃখে থাকতে চাই।

পরে আফসোস করবে না তো? সুনন্দার যেন সন্দেহই শেষ হতে চায় না। আসলে সে হাজাব সন্দেহের বেড়াজালে থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে চায়।

এতোদিন ধরে ট্রফি তো কম পেলাম না; তবুও কোথায় যেন একটা আফসোস থেকে যাচ্ছিলো। তোমাকে পেলে সেই....

থাক থাক অনেক শুনেছি। সুনন্দা ধমক লাগালো, কে বললো কথা বলতে পারো না? কবিদাব সঙ্গে থেকে থেকে তোমরাও এক একজন ....বাপি সামনে এসে দাঁড়াতেই সুনন্দা থেমে গেল। বাপি বললো, ছোটদি, বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন তুই কী আজ থাকবি না আমাদেব সঙ্গে যাবি?

তুমি যাবে মানে? বাপিব কথা শুনে পল্টু সুনন্দার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো, সীতানাথ খুব রাগারাগি কববে। আজ তোমার যাওয়া হবে না।

তুই তাহলে যাচ্ছিস না—সুনন্দার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য কবে বাপি হেসে বললো, আজকের দিনটা থেকেই যা, কাল বাড়ি যাস।

বাপি যেন দারুণ একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে অথবা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এতো

ভালো কথা এর আগে কেউ বলেনি। অন্তত সেই মুহূর্তে পল্টুর তাই মনে হলো। সে বাপির মাথায় হাত রেখে পরম স্নেহে নাড়া দিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ করলো।

বাপি সত্যিই বুদ্ধিমান ছেলে। যেটুকু বোঝার তা সে অনেক আগেই বুঝে গেছে। ব্যাপারটা দারুণ হয় কিন্তু। পল্টুদা তার জামাইবাবু হবে। বাপি এখন থেকেই উত্তেজনায় কাঁপছে। বন্ধুদের কাছে, মোহনবাগান গ্যালারিতে তার যে কী কদর হবে—সেই ছবিটা আঁকতে গিয়েও মনের মধ্যে রীতিমতো ঝড় বইছে। যাইহোক বাপি এটা অনুভব করলো, পল্টুদা ছোটদির সঙ্গে একা একা গল্প করতে চাইছে। সুতরাং এখানে এক সেকেন্ডের বেশি সময় দাঁড়িয়ে নিজেকে আসামী বানাতে অথবা ওদেরকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা দিতে রাজি হলো না। সে অলস পায়ে এসেছিল, ঝড়ের গতি নিয়ে চলে গেল।

বাপি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা জিজ্ঞেস করলো, কাল আমি কার সঙ্গে যাবো?

সে চিন্তা-ভাবনা তোমার নয়। পল্টু পরিষ্কার বললো, কাল আমি অফিস থেকে এসে বিকেলের দিকে আমার স্কুটারের পেছনে বসিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। সে-সব কথাবার্তা আমি সীতানাথের সঙ্গে বলে নেবো। তার আগে জরুরী একটা কথা বলে নিই। বিয়ের আগে আমাকে তুমি শুধু এই বছরটা সময় দাও। একটু চুপ করে থেকে পল্টু গভীর সুরে বললো, মোহনবাগান ক্লাবকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। সেই ক্লাবের আমি ক্যাপ্টেন। লীগ তো শেষ হয়েই এলো—শিল্ড, রোভার্স, ডুরান্ড কাপে প্রাণ দিয়ে খেলতে দাও, তারপরে মন-প্রাণ তো সারা জীবনের জন্যে তোমার কাছেই জমা থাকবে।

কেন, বিয়ের পরেও বুঝি প্রাণ ঢেলে খেলা যায় না? সুনন্দা অভিযোগ করে বললো, এখন থেকেই আমাকে দোষী সাজিয়ে রাখতে চাও?

না, সেটা ঠিক নয়। আমি আসলে কী বলতে চাইছি তুমি ঠিক ধরতে পারলে না। পল্টু মাথা নিচু করে হাসলো। শত হলেও তখন মনটা দু'দিকেই যেতে চাইবে—ওই দোনো-মনো করে কেউ কোনোদিন সঠিক ভাবে কোনও কাজ করতে পারেনি। গোলে ফাইনাল কিক নেবার আগে কেউ যদি ওই অবস্থায় পড়ে জীবনেও তার দ্বারা গোল হবে না। বল হাঁটুতে লেগে গোলকিপারের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। মনকে সব সময়েই একমুখী করতে হবে। বিয়ের পর তুমিই হবে সেই......

আমি কিন্তু স্বর্গে পৌঁছে গেছি। খিলখিল করে হেসে উঠলো সুনন্দা, আর কতো ওপরে তুলবে?

তোমাকে যে-কারণে কোনোদিনও নীচে নামাতে পারবো না।

সত্যি! কবিদার সার্থক বন্ধু তোমরাই! কথার জাল বুনতে কেউ কারো থেকে কম নও।

ঘটনাটা আসলে সেটা নয়। তোমার মতো একজন মেয়ে যদি সামনে থাকে, কথা বলার প্রেরণা সে অটোমেটিক পেয়ে যাবে। এই আমাকেই দেখো না—জীবনে একসঙ্গে এতো কথা কখনও বলিনি।

কুমার সুশীল অলোক তিনজনেই গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করে চলেছে। সারা বাড়ির ওপরে তীক্ষ্ণ নজর। আসলে কোনও কাজকর্ম নেই। পরিবেশনের দায়িত্বটাও বিজলী গ্রীলের লোকেরা কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং একটা কিছু নিয়ে তো মেতে থাকতে হবে। আর চোখ-কান সজাগ রাখলে টিভির পর্দার মতো সব ছবি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। এই লাবণ্য সরকারের কথাই ধরা যাক। মেয়েটি যেমন রূপসী তেমনি বিদুষী। সুশীলের ভাষায় 'সকালের লাল সূর্য উঠছে'। সেই আগুন চেহারা নিয়েও মেয়েটা নিজের উপর এতোটুকু আস্থা না-রেখে কবির কাছে যাকে বলে বিকিয়ে দিল। কবির দিকে তাকানোতেই যেন প্রেম নিবেদন করছে—এমনই একটা ভাব-ভঙ্গিমা। তিন গোয়েন্দা অবশ্য মনে মনে দারুণ খুশি। তাদের অহঙ্কার একটাই। আমাদের বন্ধু গ্রুপ হেলা-ফেলার নয়। সব বিখ্যাতদের নিয়ে কারবার। আছে কোনও মেয়ে নাক উঁচু করে চলে যাবে? ওই তো সুনন্দা! ড্যাম স্মার্ট। ধারে-কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। ওর গোল এরিয়ায় পল্টু এখন বল নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোরাঘুরি করছে। বাধা দেওয়ার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। এই তো সব অবস্থা।

পল্টুর ঠাকুমাকে দেখতে পেয়েই তিন গোয়েন্দা প্রধানমন্ত্রীকে দেখার দ্রুততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো। সুশীল কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুমার কাঁধে হাত রেখে ধরে ধরে নিয়ে এনে একটা চেয়ারে বসালো। ঠাকুমার বয়স একাশী চলছে। এখনও নিজেই মোটামুটি হেঁটে চলে ঘোরাফেরা করেন। বয়সের বিভিন্ন ব্যাধি তাঁকে কব্জা করতে পারেনি। উমাশশীকে সুস্থই বলা চলে। নাতির বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। অলোক বললো, ঠাকুমা, জীবনটাকে টানতে টানতে সেঞ্চুরীর দোরগোড়ায় প্রায় এসে গেছেন।—আর উনিশটা রান করতেই হবে।

না রে অলোক, উমাশশী, স্নেহের সুরে বললেন, ওই হেগে-মুতে সময় নিয়ে সেঞ্চুরীর দরকার নেই আমার। খেলার খেলা খেলে একাশীই যথেষ্ট। কেন, একাশীতে আউট হলে তোরা কী আমাকে কেওড়াতলা নিয়ে যাবি না?

ঠাকুমা, খুব খারাপ হবে বলে রাখছি। কুমার বেশ কড়া ভাবে শাসন করলো, এতো তাড়াতাড়ি মরবার নাম নেবেন না।

এতো তাড়াতাড়ি! উমাশশী ফোক্‌লা মুখে হাসির ফুল ছড়ালেন। তোরা কী আমাকে কচি খুকি দেখছিস?

সুশীল উমাশশীর সঙ্গে বেশ ঠাট্টা টাট্টা করে। পল্টুদের বাড়িতে গেলে তাঁর সঙ্গে আগে কথা না-বলে ভেতরেই ঢোকা যাবে না। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব। সুশীল বললো, ঠাকুমা আমাদের বয়সটাই তো সবাইকে কচি দেখবার। তাই কিনা আপনি বলুন?

নাতিরা আমার বেশ জোয়ান হয়ে গেছে।

ঠিক ধরেছেন ঠাকুমা—ঠিক ধরেছেন। এখন শুধু ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা—নয়তো যার যার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। সুশীল টোপ ফেললো, এই ধরুন আপনার পল্টু। পল্টুকে কী এখনই একটা বিয়ে দেওয়া উচিত নয়?

দিলেই হয়—উমাশশী সহজেই সুশীলের জালে ধরা দিলেন।

দেবেটা কে? বাড়িতে আপনারা এ-নিয়ে আলোচনা-টালোচনা করেছেন? করেননি। পল্টু বেচারা যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। দেখতে চান? ওই ওই দেখুন—

হ্যাঁ। উমাশশী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তার বড়ো নাতি পল্টু এতো লোকজনের হাঁটা চলা, ঠেলাঠেলি, হইচই-এর মধ্যেও আপন মনে খুব সুন্দর মতো দেখতে একটা মেয়ের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলে চলেছে।

শ্রীমানের কান্ড দেখলেন ঠাকুমা? কুমার কথাটা শেষ করেছে কী করেনি, দাঁতহীন মুখে উমাশশী এক বছরের শিশুর মতো হেসে উঠলেন। বললেন, বুঝেছি, তোদের বুঝি একজনও জুটলো না?

এ-কী ঠাকুমা, আপনি দেখছি কাউন্টার অ্যাটাক করছেন? এমন তো কথা ছিল না। অলোক বললো, আপনাকে আদর করে ডেকে এনে বসালাম—

তুই চুপ কর। তোকে আমি চিনি। সকলের পেছনে লেগে আনন্দ পাওয়াটাই তোর প্রধান কাজ। উমাশশী সুশীলের দিকে চেয়ে নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটা কে রে? খুব টুকটুকে তো!

আপনার পছন্দ হয়েছে ঠাকুমা?

আমার পছন্দের কী আছে—ক'দিনই-বা আছি। আমার পল্টুর পছন্দ হলেই হলো। অলোক বললো, ঠাকুমা তাহলে আজকেই বাড়ি গিয়ে আমাদের মেসোমশাইকে মানে পল্টুর বাবাকে মানে আপনার ছেলেকে বলছেন তো?

তার মানে লাগাতে বলছিস—উমাশশী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তুই মহা পাজী রে অলোক। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

সুশীল বললো, ঠাকুমা উঠলেন যে! নাত-বৌ এর সঙ্গে আলাপ করবেন না?

ওরা দুজনে গল্প করছে করুক। ওখানে এখন না-গেলেও চলবে। আর তোরাও ওদের জ্বালাতন করতে যাস না। যাই আমি—বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

সংযুক্তা অর্থাৎ সুনন্দাদের মাসতুতো বোন বড়ো একটা হইচই-এর মধ্যে থাকতে ভালোবাসে

না। ওব ব্যক্তিত্বই আলাদা। পড়াশোনা করা মেয়ে সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। কবির মনে পড়লো ও তার অটোগ্রাফ চেয়েছিল। সত্যি সত্যিই এই ব্যাপাবটাতে কবির ভীষণ আপত্তি। কিন্তু উপায় নেই। আজ ওকে দিতেই হবে। কবি মনে মনে একটা যুক্তি দাঁড় করালো। অটোগ্রাফ দেবার মতো যোগ্যতা তার থাক বা না-থাক, লজ্জা লাগুক বা না-লাগুক, সেটা বড়ো কথা নয়। সংযুক্তা আন্তরিকভাবে চেয়েছে। সুতবাং তাব একটা মূল্য রয়েছে। নযতো ওকে অপমান করা হয়। সংযুক্তার এই অটোগ্রাফ চাওযাটা অনেকের থেকে আলাদা। তাকে মর্যাদা দিতেই হবে।

কবি সুন্দর একটা কাগজে আরও সুন্দব করে লিখলো ঃ সাহিত্য মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারিণী সংযুক্তাকে, কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। কাগজটা ভাঁজ কবা ছিল। ওটা সংযুক্তাব হাতে দিতেই সে ভাঁজ খুলে যা-পড়ল তাতে সে খুব খুশি হয়েছে বললেও অনেক কম বলা হবে। সংযুক্তার চোখে-মুখে একটা আলাদা ধরনেব তৃপ্তি। তবে সে মাতামাতি করলো না। ওব প্রকাশ-ভঙ্গির সঙ্গে সাধারণ দশজনের মিলবে না। সংযুক্তা খুব আস্তে আস্তে বললো, কাউকে অটোগ্রাফ দেবেন না বলে মনে মনে বোধহয একটা প্রতিজ্ঞাই কবে বেখেছিলেন। ভেঙে ফেললেন? সংযুক্তা নিঃশব্দে হাসলো। আমি অবশ্য অনেক বড়ো এক পাওনা পেলাম।

প্রথম শ্রেণীব নামী সাপ্তাহিক স্বদেশ-এ কবির পবিত্র প্রাঙ্গনের খুব বড়ো কবে সমালোচনা বের হলো। স্বদেশ পত্রিকায ভালো সমালোচনা হওযার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। কেন-না এই পত্রিকাতে বাংলাদেশের বেশিব ভাগ বিখ্যাত সাহিত্যিকরা চাকরি কবেন। তাঁবা আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভাবে ফলে ফুলে সাজিয়ে পত্রিকাটি পাঠকদেব হাতে তুলে দেন। আড়াই লক্ষের ওপর সারকুলেসন। সুতরাং প্রচার সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় পত্রিকাটি কতোখানি জনপ্রিয়! যাই হোক, বিখ্যাত সাহিত্যিক কমলেশ বসু পবিত্র প্রাঙ্গনের সমালোচনা কবে লিখেছেন ঃ

উপন্যাসের সর্বকাল ও সর্বজন গ্রাহ্য কোনও আঙ্গিক-বীতির সূত্র উদ্ভাবিত না-হলেও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা ট্রাডিশন-সঞ্জাত ধারণাব দ্বাবাই সাধারণত পাঠক-সমাজ চালিত হন। পল্লবিত বিস্তার, বিবিধমুখ ভাবের অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ এবং চরিত্র চিত্রণ, যে-কোনও সার্থক উপন্যাসেব ক্ষেত্রে অভিপ্রেত। সেই সঙ্গে উপস্থাপন রীতিব কথাটাও মনে বাখতে হবে। আলোচ্য উপন্যাসখানি পাঠ করে এই কথা কযটি প্রথমেই মনে পড়লো। আদালতে বিচারেব নামে অবিচার চলছে। একটি মেয়ের অসহায় জীবন-যন্ত্রণার কাহিনী সেই আদালতে সঠিক ভাবে স্থান পেল না। বিচারকের রায়ে সে পেল আরও লাঞ্ছনা। অবশ্য নতুন করে সম্মান হারাবার নায়িকা কবিতার আর কিছুই ছিল না। আদালতকে কেন্দ্র করে লেখক যে-কাহিনীব অবতাবণা করেছেন সেটি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি মৌলিক, তেমনি জীবনধর্মী। কবিতা বিচার পেল না—লেখক যে-সব ঘটনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বলতে গেলে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে লেখক সে-সব চিত্র তুলে ধরেছেন। কবিতার মনেব গভীরে যে-বিষাদময় একাকিত্বের চেতনা নদী নিঃশব্দে বয়ে গিয়েছে, তরুণ ঔপন্যাসিক তার চিত্রটি আমাদের সামনে চিত্তস্পন্দী ভাবে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য শুধু চরিত্র চিত্রণে নয়, সংলাপে এবং পরিমিতিবোধে—যা বর্তমানে দুর্লভ। কথা সাহিত্যে আমরা এই তরুণ লেখককে স্বাগত জানাই।

সমালোচনা পড়ে কবি খুব আনন্দ পেল। কমলেশ বসু রিভিউ করেছেন এটাই বড়ো কথা। কবি খুব সরল ভাবে ভাবলো, কমলেশ বসুকে গিয়ে একবাব প্রণাম করে আসবে। উনি শুধু শক্তিশালী লেখক, স্বদেশের সম্পাদক বলেই নয়—বয়সে অনেক, অনেক বড়ো। কবির বাবাব বয়সী হবেন। তিনি এতো ভালো সমালোচনা করেছেন মানে কবিকেই স্বীকৃতি দিলেন। এটা অনেক বড়ো পাওয়া। কবি তাই ভাবছে কমলেশ বসুকে প্রণাম করে এলে কেমন হয়? কিন্তু না, কবি যে-ভাবে চিন্তা করলো সে-ভাবে এটার বিচার হবে না। এর কদর্য মানে দাঁড়াবে। কমলেশ বসু নিজে হয়তো করবেন না, অন্যরা করবেন। তারচেয়ে এই ভালো। কবি যেমন মোটামুটি ভাবে সব লেখকদের থেকে

দূরে দূরে রয়েছে এই ভাবে থাকলেই বোধহয় গায়ে কোনওরকম কাদা লাগবে না।

রাত তখন সাড়ে-এগারটা হবে। বাড়িব সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এক মনে লিখে চলেছে কবি। জগৎবাণীর হবিকিশোর মন্ডলকে একটা উপন্যাস দিয়েছে। ওই উপন্যাসটির নাম দিয়েছে 'বিশ্বাস'। প্রতিনিয়ত আমরা মানুষকে অবিশ্বাস করে ঠকছি। তারচেয়ে একটুখানি বিশ্বাস কবতে আপত্তি কিসের? পরম পাওয়া হয়তো এরমধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। আগামীকাল বইটা প্রেসে যাবে। কবি এখন যে উপন্যাসটা লিখছে সেটা দেবে ইউনিভারসালের রফিকুল মল্লিককে।

গত বুধবার সে ইউনিভারসালে গিয়েছিল। রফিকুল আর বাবলু দুজনেই দারুণ ভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ওদের কথাবার্তা, ব্যবহাব এতোই সহজ স্বাভাবিক মনেই হয় না দু'দিন আগে আলাপ হয়েছে। না, এটা ব্যবসা চালাবার কোনওরকম কায়দা নয়—গ্রাম দেশের খাঁটি ভালোবাসা। এই আঠাশ বছরের জীবনে কবি কম লোক দেখেনি, কম লোকের সঙ্গে আলাপ হয়নি। এদের সরলতাটাই অন্য ধরনের, যা মনকে খুবই স্পর্শ করে।

রফিকুলের সঙ্গে মিনিট দশেক কথা বলার মধ্যেই বাবলু এক প্লেট সন্দেশ এগিয়ে দিয়ে, সেই সঙ্গে তার নিষ্পাপ হাসিটিও ছড়িয়ে বলেছিল, কবিদা, অফিস থেকে এসেছেন আগে খেয়ে নিন।

তা খাবো। কবিও এদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বললো, তাই বলে এতো! তোমরাও এখান থেকে তুলে নাও। এই দ্যাখো বাবলু—তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম!

তুই'তেও আমার আপত্তি নেই। বাবলু হাসতে হাসতে বললো, কবিদা আমাকে আপনি তুই করেও বলতে পারেন। যেমন দাদা বলে। দাদা অর্থাৎ রফিকুল।

রফিকুল দুজনের কথা শুনে টেবিলের ও-পাশে বসে মিটমিট করে হাসছিল। সে বলে উঠলো, কবিবাবু, বাবলুর সঙ্গে তো বলা-কওয়ার একটা পাকা ব্যবস্থা করে নিলেন, আমি কী অপরাধ করলাম? আমাকে কেন এই আপনি-আজ্ঞের চাকাব মধ্যে বেঁধে পিষে মারবেন?

তুই-তুকারি শুরু করে দিলেই হয়! কবি কথাটা শেষ কবতেই তিনজনেব সম্মিলিত হাসিব দমকে ইউনিভাবসালেব মাঝারি ধরনেব দোকানটা জলেব ওপর ভাসমান জাহাজেব মতো কেঁপে উঠলো।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বারোটা বাজার ঘন্টা ভেসে এলো। কবি লেখা থামিয়ে কলমের মুখ বন্ধ করে আঙুলগুলো টেনে ধরলো। বারোটা বাজার ঘন্টা শুনে হঠাৎ তার মনে হলো দেশটারও বারোটা বেজে গেছে। চতুর্দিকেই অরাজকতা। প্রশাসনে দুর্নীতি, স্বজন পোষণেব ভাবে কাজেব পরিবেশ নেই। যাবতীয় কাজের দায়িত্ব শুধু জনসাধারণের। নেতাদের বক্তৃতা, জনগণ শক্তির উৎস! তারাই শুধু সৎ থাকুক। তাহলেই রাতারাতি দেশটা হুহু করে অগ্রগতির পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। সত্যি অদ্ভুত সব চিন্তাধারা!

কবির হঠাৎ নজর পড়লো সিঙ্গল সোফাটার ওপরে পিপিন চুপচাপ বসে আছে। কোনও সাড়া-শব্দ নেই তবে একদৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। কবি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওর কাছে। পিপিনের মাথায় পরম স্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, কী রে পিপিন, তুই তো দেখছি আমাকেই পাহারা দিচ্ছিস—বাড়ি পাহারা দিবি না? চারদিকে খুব চুরি হচ্ছে। যা—ঘরের বাইরে যা।

পিপিন আরও শক্ত হয়ে সোফায় আঁটোসাঁটো হয়ে বসলো। কবি ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছিল। পিপিন তার সামনের একটা পা দিয়ে, কবির ভাষায় সামনের দুটো হাত, পেছনের দুটো পা, প্রভুর হাতখানা সরিয়ে দিল। কবি বুঝলো এই মুহূর্তে পিপিন এখান থেকে উঠতে নারাজ। তাই আপত্তি জানিয়ে ছোট্ট অথচ গম্ভীর ভাবে দুটো শব্দ তুললো, ঘউ-ঘউ-উ।

তার মানে উঠবি না। কবি ওর সারা গায়ে এবার হাত বুলিয়ে দিল। অভিযোগ করে বললো, তাহলে আর সোফায় বসে আছিস কেন? তোর বিছানাতেও তো শুবি না। আমার খাটে গিয়ে শুয়ে পড় তবে। চোর টোর এলে সময় মতো আবার উঠিস।

পিপিন মোটেই অভদ্র নয়। কবি তাকে খাটে শোবার নির্দেশ দিলেও সে জায়গা বেশি নিল

না। বিছানার পায়ের দিকে এক কোণে টুক করে লাফিয়ে উঠে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। কবি একবার শুধু বললো, এই অভ্যেসটা তোর খুব বাজে হয়ে যাচ্ছে পিপিন। এটা পাল্টানো দরকার।

আসলে এটা ঠিক পিপিনেরও দোষ নয়। মাথাটা দেখিয়েছে কবিই। রাতে পিপিনকে ছেড়ে রাখা হতো। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। ঘেউ ঘেউ চিৎকারে ছোটাছুটি করে। কবির ঘরের দরজায় এসে ধাক্কা দেয়। কাঠের ভারী দরজায় পিপিনের নখের কুরকুর করে আওয়াজ ওঠে। ঘরের ভেতর থেকে কবিকে বলতে হয়, পিপিন অমন করে না। অমন করে না। দু-চারবার বলার পরে পিপিন আবার পাহারার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি ভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন। পিপিন কিছুতেই কথা শুনলো না। সমানে দরজা ধাক্কা দিয়েই চললো। শেষে যখন বুঝলো কবি দরজা খুলবে না, তখনই করুণ ভাবে কুঁই কুঁই করে কাঁদতে লাগলো। কবি তখন আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেনি। দরজা খুলে দিতেই পিপিন ওর পায়ের কাছে এসে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে আশ্চর্য এক ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পিপিনের চোখের দিকে তাকিয়ে কবি বুঝতে পেরেছিল, সারাদিন ও মানুষের মধ্যে থেকে রাতে একা একা ফাঁকা বাড়িতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পিপিন খুব অসহায় বোধ করে। কথা বলতে না-পারা একটা প্রাণকে এই ভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। সেইদিন থেকে পিপিনের যেমন খুশি তেমনি থাকে। অর্থাৎ ওর ইচ্ছেটাই বড়ো!

সেদিন লাবণ্য ফোন করলো কবিকে। রবিবারের সকাল। আগের দিন কবি অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছে। তাই একটু বেলা হয়ে গেলেও তার ঘুম ভাঙেনি। মহুয়া এসে ওকে জাগিয়ে দিল। বললো, তোমার ফোন।

এতো ভোরে?

কোথায় ভোর? মহুয়া হাসতে হাসতে বললো, সকাল এখন প্রায় নটা।

ফোনটা কার?

মহুয়া মুখ টিপে হাসলো। শুনলে আনন্দ পাবে—লাবণ্যর।

সীতানাথের বৌভাতে ওর সঙ্গে একঝলক কথা হয়েছিল মহুয়ার। সীতানাথই আলাপ করিয়ে দিয়ে লাবণ্যকে বলেছিল, কবির বৌদি! দু'মিনিটের সেই আলাপেই মহুয়া বুঝেছিল কবির ওপর মেয়েটার টান রয়েছে।

কবি ফোন ধরতেই লাবণ্য আদুরে গলায় অভিযোগ করলো, কী ব্যাপার কী আপনার? এই সপ্তাহে আসবেন বলেছিলেন এলেন না। আমি পুরো সপ্তাহটা সন্ধ্যার পর বাড়িতে বসেই কাটিয়ে দিলাম।

মায়ের আদর খেলেন বলুন!

কথা ঘোরাবেন না। প্লিজ আজকে বিকেলে চলে আসুন না—

আজকেই? দু'দিন পরে না-হয়....

আমি আপনার কোনও কথা শুনবো না। আজকে চলে আসুন কবিবাবু। প্লিজ—আমি অনেক আশা নিয়ে থাকবো কিন্তু।

আচ্ছা যাবো। হ্যাঁ-হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি।

মহুয়া কবির দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, তুমি এক্ষুনি যাবে তো?

কোথায়?

লাবণ্যদের ওখানে—

সে তো বিকেলে। তুমি কী এখনই আমাকে পাঠাতে চাও নাকি? কবি হেসে ফেললো।

মন্দ কী? অমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে সারাটা দিন কাটানো দারুণ ভাগ্যের ব্যাপার।

কার ভাগ্যের ব্যাপার মহুয়া? স্নেহলতা পানের বাটা হাতে নিয়ে ওই ঘরে এসে ঢুকলেন। মহুয়া আর কবি দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে রইলো। কবি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে

বললো, তোমাকে বড়োদের কথায় কান দিতে হবে না। ওটা আমার আর বৌদির ব্যাপাব। তবে--তোমার ভাগ্যটা দেখলাম বুঝলে মা। তোমার এই ছোট ছেলেকে দু'দিন আগেও কেউ চিনতো না। আব আজ? সারা বাংলাদেশ তাকে চেনে। ঠিক কিনা বলো মা?

হ্যাঁ রে কবি সে-কথা ঠিক। তবে কি জানিস বাবা—স্নেহলতা যেন স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নের ঘোরে অদ্ভুত এক আবেগ নিয়ে বললেন, তোর সব লেখাই তো পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে! তবুও আমার কেন জানি বারবার মনে হয় এ-লেখা তোর আসল লেখা নয়। এর চেয়েও তুই ভালো লিখতে পারিস। তোকে আবও ভালো লিখতে হবে। লেখকের মধ্যে যেন তৃপ্তি না-আসে।

কবি স্নেহলতার বুকে মাথা বেখে ছোট্ট ছেলের মতো বলে উঠলো, মা, আমি বড়ো হতে চাই। অনেক বড়ো। তুমি শুধু আমাকে সেই আশীর্বাদ করো।

গুরুসদয় রোডে লাবণ্যদেব বাড়িটা খুঁজে পেতে কবির খুব একটা অসুবিধে হলো না। মিলিটারী ব্যারাকের উল্টোদিকে পাম, ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে ঘেরা দুধ সাদা রঙের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়িটা ছোট কিন্তু জায়গা অনেক। সিংহ দরজার ফলকে বড়ো বড়ো কবে লেখা, কর্নেল এস. আর. সরকার। খুব সম্ভব উনি লাবণ্যর বাবা। নুড়ি বিছানো পথ পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই বাঁ দিকে মাঝারি আকৃতির সমান করে ছাঁটা ঘাসের সবুজ লন। এতো সবুজ যে চোখ স্নিগ্ধ হয়ে আসে। লনে বেশ কয়েকটা গার্ডেন চেয়াব খালি পড়ে আছে। একটাতে শুধু লাবণ্য বসে। ওর চারপাশের বেশ কিছুটা দূরে মাটিতে এবং টবে ফুলেব সমাবোহ। তাবও চারপাশে একতলা সমান উঁচু পাঁচিলের মাথা থেকে হেজগাছের সবুজ চাদর নেমে এসেছে সবাইকে আলিঙ্গন করতে।

কবির জন্যই লাবণ্য এখানে বসে অপেক্ষা করছিল। তখনও সূর্য ডুব দেযনি। তবে তেমন একটা তেজ নেই। লনেব ওপর গাছের দীর্ঘ ছাযা। পবিবেশটা দারুণ নিরিবিলি। কবিকে দেখেই লাবণ্য চেয়ার ছেড়ে বেশ বড়ো বড়ো পায়ে হাসি মুখে এগিয়ে এলো। কবিব চোখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় গলায় বললো, আমি খুব খুশি হয়েছি। কবি উত্তব না-দিয়ে শুধু মৃদু হাসলো।

লন এবং নুড়ি বিছানো পথ পেরিয়ে লাবণ্য কবিকে দোতলাব ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালো। আলাপ করিয়ে দিল মা-বাবাব সঙ্গে। কবি দুজনকে প্রণাম করতেই অনিমা বললেন, বেঁচে থাকো বাবা। সাত-আট দিন ধরেই শুনছিলাম তুমি আসবে। অথচ আসছিলে না। লাবণ্য রোজই বলতো আজ নিশ্চয়ই আসবে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে ফোন করে আনতে হলো।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্য। শিবরঞ্জন খুব ব্যক্তিত্ব নিয়ে হাসলেন। বললেন, আজকের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে নামী সাহিত্যিক কমলেশ বসু আমাব বন্ধু। ও আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। লাবণ্য এখন দেখাতে চায—মেয়েব দিকে স্নেহের চোখে তাকালেন শিবরঞ্জন, কবি বন্দ্যোপাধ্যায় নামেব জনপ্রিয় লেখকটিও ওব বন্ধু। লাবণ্যব তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি উঠলো, বাবা এমন করে বলবে না কিন্তু।

কথাটা কী খুব ভুল বললাম? শিবরঞ্জন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইতেই অনিমা বললেন, তোমরা বাবা মেয়ে দুজনেই বিখ্যাত আর জনপ্রিয় সাহিত্যক নিয়ে মেতে আছে, এখন দেখছি আমাকেও নিদেন পক্ষে একজন মাঝারি ধরনের সাহিত্যিকের......

মা এটা দারুণ বলেছো। লাবণ্যর মুখে রং বাহারের হাসি। সে বললো, সীতানাথবাবুর বিয়েতে না-গেলে তো কবিবাবুর সঙ্গে আলাপই হতো না। মজাটা কী হয়েছে জানো, অফিসে একদিন আমার হাতে 'অন্তঃসত্ত্বা' বইটা দেখে সীতানাথবাবু নিজে থেকেই বলেছিলেন, কবি বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু। সেদিন যে আমার কী হয়েছিল আমি জানি না। খুব রাফলি উত্তব দিয়েছিলাম। আসলে আমি কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। নয়তো—কবির দিকে তাকিয়ে লাবণ্য হাসলো।

সীতানাথ খুব দুঃখ পেয়েছিল। কবি এতোক্ষণে এই প্রথম কথা বললো, ও ওই-দিনই আমাদের কাছে এসে বলেছে।

কাজুবাদাম, বিস্কুট আর কফি এলো। লাবণ্য আগে কবিকে দিয়ে মা-বাবাকে দিল। পরে ট্রে

থেকে নিজের কাপটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক বসিয়েই কবিকে জিজ্ঞেস করলো, চিনি ঠিক আছে আপনার?

একটু বেশিই হয়ে গেছে। কবি বললো, অসুবিধে হবে না।

শিবরঞ্জন হঠাৎ বললেন, এই সপ্তাহের স্বদেশে তোমার পবিত্র প্রাঙ্গনের সমালোচনা পড়লাম। কমলেশ নিজেই রিভিউ করেছে। কেমন লাগলো তোমার?

পুরস্কার পাওয়ার জন্যই লেখকরা লেখেন না। কিন্তু সেই লেখা যখন স্বীকৃতি পায় তখন কার না ভালো লাগে? পবিত্র প্রাঙ্গন আমি কতোটা ভালো লিখতে পেরেছি সত্যি বলছি আমি জানি না। তবে কমলেশ বসু আমার বইয়ের সমালোচনা করাতে পবিত্র প্রাঙ্গন যে একটা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে এ-ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

আমি আর অনিমা এখন একটু বেরুবো। শিবরঞ্জন বললেন, কোথায় জানো? ওই কমলেশের বাড়িতেই যাবো। ওর প্রতি তোমার যে-শ্রদ্ধা দেখলাম সেটা আমি নিশ্চয়ই গিয়ে বলবো। আসলে এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে। একজন অগ্রজ সাহিত্যিকের প্রতি অপর একজন সাহিত্যিকের এই যে আন্তরিক শ্রদ্ধা এটা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। কমলেশের কাছে অনেক লেখককেই তো আসতে দেখি। প্রত্যেকেই নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে বড়ো বলে ভাবতেই পারে না। একসঙ্গে উঠছে বসছে অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রীতিমতো একটা রেষারেষি চলছে। অমুকের এটা কী একটা লেখা হয়েছে? এ-সব ছাইপাশ লিখে কী লাভ? এতো অশ্লীল লেখা উনি লিখতে পারলেন কিভাবে? যাই বলো, ব্যাপারটা তখন প্রায়ই নোংরামির পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। ওই সব আলোচনার মধ্যে গিয়ে পড়লে তো তুমি প্রায় পাগল হয়ে যাবে। তোমার এই মন নিয়ে তুমি ওখানে...

কবি বললো, আমার কোনও লেখক বন্ধু নেই। কারো সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় নেই। বলতে পারেন ওটা আমি এড়িয়েই চলি।

জানি না কতোদিন তুমি এটা বজায় রাখতে পারবে, পারলে তুমিই লাভবান হবে। আর তোমার এই ফ্রেশ মনের জন্য আমরা পাবো তরতাজা বলিষ্ঠ লেখা।

অনিমা বললেন, তোমার প্রতিটি লেখার মধ্যেই আমরা একটা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাই। সাধারণ মানুষের সঠিক জায়গায় একটা ক্ষোভ এনে জ্বালা ধরাতে পারো। সেদিক দিয়ে তোমার লেখা সার্থক।

শিবরঞ্জন বললেন, ওয়েল কবি, আমরা তাহলে উঠছি। তুমি লাবণ্যর সঙ্গে গল্প-টল্প করো। বাট ডোন্ট গো টিল উই কাম। রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টারের কিন্তু এটাই নির্দেশ। লাবণ্যকে দেখে নিয়ে শিবরঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠলেন। অনিমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে আবার একবার কবিকে বললেন, আসি তাহলে—

লাবণ্যদের ড্রইং-রুমটা কিন্তু বেশ বড়ো। মাঝখানে পুরু কার্পেটের তিন দিকে ডবল এবং সিঙ্গল সোফা। দুই দেওয়াল জুড়ে ঝকঝকে আলমারিতে ঠাসা বই। ইংরেজি এবং বাংলা। কবি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তন্ময় হয়ে বইগুলো দেখতে লাগলো। যেন বইয়ের সমুদ্র। এরমধ্যে ডুব দিয়ে থাকতেও ভালোলাগে। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল, এই বইগুলো স্রেফ ড্রইং-রুম সাজানোর রেওয়াজী উপকরণ নয়। বাড়ির মানুষের পড়ার আগ্রহ, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা এর পেছনে নাড়ির টানের মতো মিশে রয়েছে।

কমলেশ বসুর প্রায় ত্রিশ-বত্রিশটা বই রয়েছে। কবি আলমারি থেকে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। কোনও বইয়ের পাতায় লেখা রয়েছে শিবরঞ্জনকে অনেক ভালোবাসা—কমলেশ বসু। আবার অন্য একটা বইয়ে, শিবরঞ্জন সরকার—প্রিয়বরেষু। শুধু তাই নয়, একখানা বই তো কমলেশ বসু শিবরঞ্জনকে উৎসর্গই করেছেন। কবি ওর নিজের তিনখানা বইও দেখতে পেল। এটা ঠিক অন্যের বাড়িতে নিজের লেখা বই দেখতে কোন লেখকের না-ভালোলাগে? এই যে সেদিন সীতানাথের বৌভাত গেল, কবির তিনখানা বই-ই উপহার পাওয়াতে লেখককে নিয়ে তো বন্ধুরা রীতিমতো

একটা সোরগোল তুলে দিয়েছিল। তখন যে কবির কী ভালো লেগেছিল সেটা মোটেই প্রকাশের ব্যাপার নয়, শুধু অনুভবের। সেই উপলব্ধি একমাত্র লেখকের মনেই চোরা বালির মতো স্তবে স্তবে জমা হতে থাকে। এই মহাসুখেব ভাগ অন্য কাউকে দেওযা যায় না।

কবি এবাবে কমলেশ বসুর 'স্থাবব অস্থাবর' উপন্যাসখানা দেখতে লাগলো। গতবছব এই বইখানা নিয়ে সাবা বাংলাদেশ জুড়ে আলোচনা বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বহু পাঠক-পাঠিকা পরিষ্কার মতামত দিয়েছিলেন বইখানা অশ্লীল।

লাবণ্য কবির পাশে পাশেই ঘুরছিল। বাড়ির পোষা অত্যন্ত আদুবে এবং সুখী-বেড়ালেব ঝুমুর ছন্দের মতো তখন তাব ঘোরাফেবা। লাবণ্য হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস কবলো, বইটা নিয়ে গত বছর কম তর্ক-বিতর্ক চলেনি। আপনার কী মনে হয কবিবাবু? লেখাটা কী সত্যিই অশ্লীল?

আপনি তো পড়েছেন। আপনিই বলুন না?

আমি একজন সাধারণ পাঠিকা হিসাবেই পড়েছি। আমার ব্যক্তিগত মতামতটা থাক। লাবণ্য মৃদু হেসে তাব গলার বড়ো বড়ো গোল কালো পাথরেব মালাটা হাত দিয়ে একবাব ডান দিকে একবার বাঁ দিকে ঘোবাতে ঘোবাতে বললো, আপনি একজন লেখক। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে জানতে চাইছি।

কথাটা শুনে কবি হেসে ফেললো। বললো, আমাব কথা আপাততো থাক। 'অশ্লীলতা ও বাংলা সাহিত্য' নিয়ে একটা আলোচনা সভা হয়েছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা সেই আলোচনাব অংশ নিয়েছিলেন আমি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের সভায অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, "এখানে আসবার আগে আইনের বই পড়েছিলুম অবসিনিটি সম্পর্কে কেউ একমত নয। ব্যক্তির বিচারেব উপর ছেড়ে দেওযা হযেছে। অশ্লীলতাব নানা দিক আছে। জজ অনেক বই নিজে মহানন্দে পড়েন কিন্তু মেযে বকে যাবে বলে 'ব্যান' করে দেন। ভুরি ভুরি এমন ঘটনা, কিন্তু এককালে যা ছিল ভযঙ্কর, তাই এখন পেঙ্গুইন সিরিজে ছেলেমেয়েরা পড়ছে, শ্লীলতাহীন শব্দগুলো পর্যন্ত এখন মুখে মুখে—বিলেতে, ফ্রান্সে অনেক লেখককে পালিয়ে যেতে হযেছে, কিন্তু মরতে পাবলেই আব ঝঞ্ঝাট নেই। অভিযোগ উঠে গেল। অভিযুক্ত লেখা সাহিত্য হযে গেল। আজ যাদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সবাই লেখক হিসেবে স্বীকৃত। কোনও সাহিত্যকেই এক কথায় অশ্লীল বলা সম্ভব নয। আজকে বিচার কবতে বসে চাই আধুনিক মন, না-হলে আধুনিক সাহিত্য বোঝা যাবে না।"

গৌরকিশোব ঘোষ বলেছিলেন, "লেখকদেব অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্যের জন্ম। আগে অগজদের বাধো-বাধো ঠেকতো, আমরা পরিষ্কাব বলতে চাই। ধরুন স্ত্রীকে ভালোবাসেন, তারপবেও একটি মেয়ে এল; ফুসলানো নয—, হৃদযের সমস্যা একদা সত্যের মুখোমুখী হলো। একদিন ভারতীয় মেয়েদের আদর্শ ছিল সীতা-সাবিত্রী। হিন্দুকোড বিল পাশ কবার পর এখন নারীব স্বাধীনতা অনেক বড়ো। বিয়ের পরেও প্রেমেব ব্যাপাব নিত্য ঘটছে। সাহিত্যে তা আসবেই। অভিযোগ উঠলেও থামান যাবে না।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায বললেন, "ভারতেব সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগ কবে থেকে? কালিদাসকে ব্যাকবণ ভুলের অভিযোগ শুনতে হয়েছে, অশ্লীলতার অভিযোগ শুনতে হযেছিল কি-না, অভিযোগ এসেছিল কি-না আমাব জানা নেই। অভিযোগ বিদেশের প্রভাবে গত শতাব্দীতে এদেশে এসেছে। শরীবের ভাষা আছে, কখনও কখনও তা খুবই প্রবল। কেউ তা ব্যবহাব করেন, কেউ কবেন না। করলে অন্যায় কীসে?"

সমরেশ বসু তাঁব ভাষণে বলেছিলেন, "যে যুগে বাস করি, তাব চিন্তা-ভাবনা-বাথা-যন্ত্রণা, পাপ-পাপহীনতা প্রকাশ করা আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো। আমাব লেখায় এ-যুগের চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চাই। জীবনে পাপ আছে, সাহিত্যে শুধু ফোঁটা তিলকই থাকবে কেন? ধরুন এ-কালের একটি ছেলেকে তাকে যা-বলা হয়েছিল তা সব মিথ্যা পরিণত হয়েছে, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করতে পারেনি—তাকে আঁকতে গিয়ে তাব যন্ত্রণা তাব সমস্যা তাব নৈবাশ্য নিশ্চযই তুলে ধরতে হবে।

নইলে সাহিত্য নিরর্থক। সাহিত্য কিছুতেই ভণ্ডামী নয়।"

কবি এবারে লাবণ্যর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে একটু হাসলো। বললো, এরপর স্বয়ং কমলেশ বসুকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কমলেশবাবু পরিষ্কার একটা কথাই বললেন, সমরেশ বসু এইমাত্র যা বললেন, এরপরেও কোনও কথা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। তবুও যদি চেষ্টা করি সে চেষ্টা হবে হাস্যকর, নিরর্থক।

আমারও সেই একই কথা---কবি জোরে হেসে উঠলো। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মন্তব্য আপনার কাছে তুলে ধরলাম। সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে আশা করি একটা ধারণা পেয়ে গেলেন। এরপরে আমি আর নতুন করে কীই-বা বলতে পারি?

লাবণ্য এবারে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনি যে লেখেন, ছকটা কী পুরোপুরি আগে থেকে ভেবে রাখেন?

তেমন কোনও কথা নেই। মোটামুটি একটা আইডিয়া অবশ্যই থাকে সেটা হলো কী বলতে চাই-- সেই মূল বক্তব্যকে সামনে রেখেই আমি লিখে চলি। তখন অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র আপনা আপনিই এসে যায়; যেগুলো আগে কখনও ভাবিনি। এমনও দেখা গেছে লিখবার আগে যে-চরিত্রটাকে প্রধান করে তুলবো ভেবেছিলাম সে সাইড ক্যারেক্টারে চলে গেছে। প্রধান হয়ে লেখার পাতায় উঠে এসেছে আগে থেকে না-ভাবা সম্পূর্ণ অন্য একটা চরিত্র। আমার প্রথম লেখা 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' উপন্যাসে জগন্নাথের চরিত্রটা আমি ভাবিইনি-- লিখতে লিখতে এক সময় দেখি সে এসে গেছে এবং কিছুতেই আর যেতে চাইছে না।

নীচে গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। শিবরঞ্জন, অনিমা ফিরে এলেন।

লাবণ্যর সঙ্গে সাহিত্যের আলোচনায় কবি একেবারে ডুবে ছিল। ওঁরা ফিরে আসতেই সে হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিল। রাত পৌনে-ন'টা। শিবরঞ্জন ভরাট গলায় বললেন, বুঝলে কবি, তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখে কমলেশের বাড়ি যেতে সে-তো রেগেই আগুন। বললো, 'ওকে আমার বাড়ি নিয়ে এলেই পারতে। নয়তো আমাকে জানালে আমিই তোমার বাড়ি গিয়ে কবিকে নিয়ে আসতাম। আলাপ হবার এতো বড়ো সুযোগটা হেলায় হারালাম বলেই ভারী দুঃখ হচ্ছে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক। আমি কবির লেখার একজন দারুণ ভক্ত।'

অনিমা বললেন, যার তার কথা নয়---কমলেশ বসুর স্বীকারোক্তি এটা। যিনি অহেতুক কাউকে শিরোপা দিতে চান না। অনিমা কবির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন। আবারও বললেন, সত্যি উনি তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

কবি মাথা নিচু করে মৃদু হাসলো। বললো, উনি অনেক বড়ো! সবাইকেই তাই বড়ো করে দেখেন।

রাত সওয়া-এগারটা নাগাদ কবি বিছানায় গিয়েছিল। এখন সাড়ে-চারটে। সারাটা রাত একটা মুহূর্তের জন্যও দুই চোখের পাতা এক হয়নি। বারবার ভেসে উঠেছে তিনটে মুখ। লাবণ্য, সংযুক্তা আর দুরন্ত নাকছাবির অসামান্য একটা মুখ। কবি এখন কাগজের নৌকোর মতো অসহায়। মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কাটাচ্ছে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত। কষ্টের এক বাসা বুকের গভীরে লুকিয়ে থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। উদ্ধার পেতে হলে যে বলিষ্ঠ মনের প্রয়োজন আপাততো কবির তা নেই। সে সেটা অন্য কোথাও হারিয়ে বসে আছে। আসলে ঠিক তাও নয়। সুখের চাবি কোনটা কবি জানে। কিন্তু সেই সুখ তার আয়ত্তের মধ্যে নেই।

কবির সারা মন জুড়ে আছে একটা হলুদ সর্ষে ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নাকছাবি নাকে একটা নিষ্পাপ অসাধারণ মুখ। নীরবে নিভৃতে কবি সেই মুখের পূজা করে এসেছে। একান্ত ভাবে সেই মুখটাকেই পেতে চেয়েছে। অথচ তার সঙ্গে আদৌ আর দেখা হবে কি-না কবি তা জানে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে দেখা না-হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর সেই অসম্ভবের সন্ধানেই কবি বড়বেশি উতলা। স্বপ্নের নাকছাবিটা হাতের কাছে নেই কিন্তু সংযুক্তা আর লাবণ্য দুজনেই

চোখের সামনে। তাদের ভাব আছে, ভাষা আছে। কবির অনুভূতিগুলো খুবই প্রবল। সে জানে লাবণ্য বা সংযুক্তা কী চায় তার কাছে। এটা এখন একটা পরিষ্কার ছবি। সংযুক্তা দু'দিন এসে তার সঙ্গে দেখা করেছে। লাবণ্য বারবার শুধু নিমন্ত্রণ করে তাদের বাড়ি যেতে। দুজনেরই মন এক, দৃষ্টি এক, স্বপ্ন এক। চাহিদায় ওরা কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। কবির কষ্টটা সেই কারণেই বেশি। দুজনেই খুব ভালো মেয়ে অথচ তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। হারিয়ে যাওয়া সেই মন নিয়ে আর যাই হোক সংযুক্তা বা লাবণ্যর সঙ্গে ভন্ডামী করা চলে না। তাই কবি নিজেকে ওদের কাছ থেকে গুটিয়ে রাখতে চায়, ওরা আবার সে-সুযোগ না-দিয়ে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে চায়।

এই অস্থির মন নিয়ে কবি কেমন করে ঘুমাবে? উর্দু কবির লেখা সেই পরিচিত কবিতাটা তার মনে পড়ল :

"এক রোজ মিল গঁয়ে থেঁ সাব-রহ্ গুজর কঁহি
ফির দিলনে বায়ঠনে ন দিয়া উমর ভর কঁহি!"

সত্যি, অদ্ভুত কবিতাটির অর্থ! অল্প কথায় এতো সুন্দর করে মনের বিধ্বস্ত অবস্থা বোঝাতে ক'জন কবি পারেন? বাংলা মানেটা বোধহয় এই রকম দাঁড়ায়, কোথায় যেন একদিন পথেই দেখা হয়েছিল, আমার হৃদয় জীবনভর আমাকে আর কোথাও শান্তিতে বসতে দিল না।

সকালবেলা তখন সবে পৌনে-ছ'টা ছ'টা হবে, সুশীল অলোক কুমার সীতানাথ আর পল্টু কবিদের বাড়ির নীচে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এক একজন এক, এক সুরে ডাকাডাকি করছে।

কবি উঠে পড়।

আর কতো ঘুমাবি রে—

কীরে এখনও কী তোর সকাল হয়নি?

এই কবি। কবি ই-ই-ই-

সারা বাড়ির এ-কী ঘুম রে বাবা!

বন্ধুরা খুব ভালো করেই জানে বড়ো রাস্তার এখান থেকে শত ডাকাডাকি করলেও কবির কানে গিয়ে তা পৌঁছাবে না। কবির ঘর সেই গঙ্গার দিকে। রাস্তা থেকে এতোগুলো বিরাট বিরাট ঘর পেরিয়ে ওই ঘর। কবি তাদের ডাক শুনে ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াবে এতোটা আশা ওরাও করে না। ওরা যেটা চেয়েছিল তাহলো পাড়াটাকে একটু সচকিত করে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা। হলোও তাই। আশে-পাশের বাড়ির জানলা ফালনা খুলে গেল। কৌতূহলী মুখের মিছিল সেখানে।

চন্দ্রনাথ ছাদে পায়চারি করছিলেন। তিনি নীচের দিকে ঝুকে দেখলেন রাস্তার ওপরে কবির বন্ধুদের জটলা। দোতলার বারান্দায় হয়তো কেউ রয়েছে। তার সঙ্গে ওরা কথা বলছে। এতো উঁচু থেকে ওদের কথাবার্তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। চন্দ্রনাথ মনে করলেন, মাঝে মধ্যেই ওরা যেমন হইচই করে ঝড় তুলতে আসে আজও তেমনিই একটা কিছু হবে।

মহুয়া বাথরুমে ছিল। তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে এসে দেখলো রবিও সেখানে পৌঁছে গেছে। সে স্বামীর পাশে ঘেঁষে দাঁড়াতেই সুশীল নীচের থেকে আওয়াজ দিল, আপনারা কী কুম্ভকর্ণের কাছ থেকে ঘুম-টুম ধার করেছিলেন নাকি? দু'ঘন্টা ধরে সেই তখন থেকে ডাকাডাকি করছি.....

রবি হাসতে হাসতে বললো, মাত্র দু'ঘন্টা কেন, তোরা গত সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই ডাকছিল্লি।

রবিদা আমাদের তার মানে শেয়াল বললেন—অলোকের কথায় কান না-দিয়ে রবি আরও হাসলো। মহুয়ার দিকে একটু তাকিয়েই নীচের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল, তোরা এতো চিল্লাচ্ছিস কেন? ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। পল্টু কথাটা বলতেই মহুয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, মোহনবাগান লীগ পেয়েছে বুঝি?

আরে না বৌদি, ও-সব নয়। আপনারা কী এখনও কাগজ দেখেননি। পল্টু আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, কবি এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে ওর পবিত্র প্রাঙ্গনের জন্য।

কথাটা সবে শুনেছে, রবি আর মহুয়া দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় এক হাসিতে নিজেদের ভাসিয়ে দিল। বারান্দার রেলিঙের ওপর মহুয়ার হাতখানা রবি উত্তেজনায় জোরে চেপে ধরে আরও বেশি চিৎকার করে বলে উঠলো, হতভাগারা এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছিস! বাড়ি ঢুকতে পারিস না? আয়, আয় ভেতরে আয়।

সারা বাড়িতে হুলুস্থুলু কান্ড। স্নেহলতা ঘুমিয়েছিলেন। রবি গিয়ে মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে বুকের মধ্যে এতোটুকু করে জড়িয়ে ধরলো। আনন্দে তার দুই চোখে বেশ কিছুটা জল জমা হয়েছে। তার গলা বুজে আসছিল। তবুও কোনওরকমে বললো, মা কবি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে।

ওদিকে মহুয়া ছুটলো ছাদের দিকে। কবির ঘরের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি। কিন্তু কবিকে আগে ডাকলো না। দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে সে ছাদে গিয়ে চন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে মহুয়া বললো, বাবা কবি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। চন্দ্রনাথ মহুয়ার দিকে কেমন যেন এক বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন। যেন অনেকক্ষণ ধরে এই আনন্দ সংবাদটা মনের গভীরে যে-সিন্দুকটা রয়েছে সেখানে ঢুকিয়ে রাখলেন। এবার তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। হেসে বললেন, চলো মা, নীচে চলো—

চন্দ্রনাথের ঘরে তখন আনন্দের হাট বসে গেছে। খাটের ওপরে স্নেহলতা আর রবি। সোফাতে অলোক, সীতানাথ আর কুমার বসে। সোফাতে আরও জায়গা থাকা সত্ত্বেও সেখানে না-বসে একেবারে মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে পল্টু, সুশীল কবি। পল্টুর গা ঘেঁষে রয়েছে বুলান। সে জেনে গেছে তার কাকা একটা বিরাট পুরস্কার-টুরস্কার পেয়েছে। কবির কোলে চুপটি করে বসে আছে পিপিন।

চন্দ্রনাথ আর মহুয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অলোক সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললো, আসুন মেসোমশাই। বসুন—

তুমি বোসো, বোসো। আরও তো জায়গা রয়েছে—আমি বসবো'খন। চন্দ্রনাথ পুত্র গর্বে গর্বিত হয়ে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধ চোখে কবির দিকে চাইলেন। সংযম না-হারিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন, আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের তবে কবির কাছে চ্যালেঞ্জের। যে-যোগ্যতার জন্য এই পুরস্কার সেটা ওকে সারা জীবন ধরে রাখতে হবে। চন্দ্রনাথ কথাটা বলে স্নেহলতার দিকে একবার তাকিয়ে হাসলেন। ওই হাসির মধ্যে দিয়ে নীরবে যেন বলতে চাইলেন, এই খুশির খবরে আনন্দ-টানন্দ কেমন পাচ্ছো?

সুশীল মহুয়ার দিকে তাকিয়ে তাড়া দিল, এই বাড়িতে এসে এতোক্ষণেও চা পাইনি, এই প্রথম। বৌদিটা আজকাল আমাদের যাচ্ছে তাই ভাবেন। আপনিই বলুন রবিদা, আজকের দিনে এতো দেরি সহ্য হয়?

সুশীল কথাটা নেহাত বাজে বলেনি। রবি একমত হয়ে বললো, চিৎকার-চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল করতে করতে গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। এই সময়েও যদি একটু চা-টা না-পাই তবে আর......অলোক রবির কথাটা লুফে নিয়ে বললো, এই বাড়ির বড়ো বৌয়ের পরিচযটা কোথায়?

অনেক, অনেক তোষামোদের কথা হয়েছে, এবারে একটু থামো সবাই। সকলের দিকে চেয়ে একঝলক হাসলো মহুয়া। এক্ষুনি চা করে দিচ্ছি। জল বসানোই আছে—

বৌদি! শুধু চা?

শুধু চা এই বাড়িতে খেয়েছো কখনও? মহুয়ার হাসির মধ্যে কুলকুল শব্দ। ভূপালকে দোকানে পাঠিয়েছি। হাঁড়ি ভর্তি হয়ে সব আসছে।

তোরা যে এই বদনাম করছিস, না-খেয়ে-দেয়ে কবে এখান থেকে উঠেছিস? রবি মহুয়াকে সমর্থন করে কথাটা বলতেই মহুয়া সকলের সামনেই কপট রাগ দেখিয়ে শাসন করলো, থাক তোমাকে

আর আমার হয়ে কোনও কথা বলতে হবে না।

পরম খুশিতে স্নেহলতা বলে উঠলেন, রবিটাকে আর বিশ্বাস কোরো না বৌমা। ও যে কখন কার দলে থাকে আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

ফোনটা বেজে উঠতেই পল্টুর পাশ থেকে উঠে গেল বুলান। ফোনটা ধরে দু-তিনবার হ্যাঁ-হ্যাঁ করে কবির দিকে তাকালো। কাকা তোমার ফোন।

কে?

নাম বলল না, তোমাকেই চাইছে।

দেবাশিস আর উপমার সঙ্গে কথা বললো কবি। ওরা কাগজে খবরটা দেখেই মিনিট পাঁচেক দুজনে নাকি কোনও কথাই বলতে পারেনি। তারপরেই দেবাশিস এই ফোন করছে। উপমা একটা কথাই জিজ্ঞেস করলো, প্রাইজটা পেয়ে কেমন লাগছে রে কবি?

এখনও ঘোর কাটেনি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কমিটি বোধহয় ভুল করে আমার নাম মনোনীত করেছেন।

ফোন ছেড়ে কবি আবার মেঝেতে বসতেই পিপিন ওর কোলেতে আশ্রয় নিল। কবি আদুরে গলায় বললো, হ্যাঁরে পিপিন, তুই কী কিছু বুঝতে পারছিস?

স্নেহলতা বললেন, আনন্দের একটা ব্যাপার-স্যাপার ঘটেছে সেটা ও ঠিক বুঝতে পারছে। শুধু বলতে পারছে না। দেখছিস না তোর কোল ছাড়া আর কোথাও নড়ছে না। এতোটা আদর অন্য কোনওদিনও করে?

চা খেতে খেতে পল্টু বললো, সাত-সকালে উঠেছি ক্লাবে যাবো বলে। স্কুটার বের করে মোড়ের মাথায় সবে দাঁড়িয়েছি, হকাররা কাগজের পাহাড় নামাচ্ছে গাড়ি থেকে। কেউ সাইকেলে কাগজ নিয়ে ছুটছে, কেউ পায়ে। আমাদের খেলা থাকলে পরের দিন কাগজ দেখার জন্য মনটা ছটপট করে। গতকাল খেলা ছিল না। সুতরাং আজকে কাগজ দেখার ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলাম না। তবুও কী যে হলো; আনন্দবাজারটা টেনে নিলাম। আর প্রথম পাতাতেই পঞ্চম কলমের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে চোখটা আটকে গেল : 'কবি বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন।' এরপরে কখনও ক্লাবে যাওয়া যায়? পল্টু কবির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, স্কুটার বাড়িতে রেখে প্রথমেই একটা ফোন করে দিলাম ক্লাবে, আজ যেতে পারছি না। তারপরেই সীতানাথকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। ও ওর বাড়িতে সবাইকে জাগিয়ে তুলে এমন হইচই ফেলে দিল, মনে হলো যেন সীতানাথই পুরস্কারটা পেয়েছে। যাই হোক দুজনে মিলে পরে একে একে সুশীল অলোক কুমারকে ডেকে ঠিক করলাম.....

শোভাযাত্রা করে আমাদের বাড়ি এসে হাঁড়ি-কুড়ি চেঁছে-মুছে একেবারে সাফা করে যাবি এই তো? রবি বেশ বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো, তোরা কতো খেতে পারিস আমি দেখবো! আজ আমরা কেউ অফিসে যাবো না। গঙ্গার পাড়ের বাগানে একটা ফিস্ট লাগিয়ে দিই। তোরা কী বলিস?

আমরা সবাই খাওয়ার মধ্যে—বলাবলির মধ্যে নেই। সুশীলের কথায় সবাই সম্মতি দিল। স্নেহলতা আর চন্দ্রনাথ ছেলেদের কান্ড-কারখানা দেখে শুধু হাসছেন। মহুয়া ব্যাপারটা দারুণ জমেছে দেখে বলে উঠলো, তাহলে বেহালাতে একটা ফোন করে দাও।

হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবাশিস উপমা ওরাও আসুক। চন্দ্রনাথ অনেকটা যেন কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে মহুয়ার দিকে তাকালেন। মেয়েটার সব দিকেই নিখুঁত নজর। মহুয়া আবার বললো, আরও একজনকে এই মুহূর্তে না-বললেই নয়। সীতানাথের বৌকে বাদ দিলে চলে?

তুমি ঠিকই বলেছো বৌমা। স্নেহলতা বললেন, এর আগেই ওদের নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।

কবিকে একটু চিন্তার মধ্যে দেখে রবি জিজ্ঞেস করলো, কীরে তুই এতো কী ভাবছিস?

আমি বলছিলাম কী দাদা; সবই যখন হচ্ছে তখন আমার কয়েকজন পাবলিশারকে বললে.....

তা বল না—রবি বিরাট এক হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে দিয়ে বললো, আমি কী তোকে সিলিং

করে দিয়েছি নাকি যে এই ক'জনেব বেশি কাউকে নিমন্ত্রণ করা চলবে না? কাকে কাকে করতে চাস তুই বল?

সরস্বতী লাইব্রেরীর অমিত মুখার্জি, বাতুল, নিরাপদ, জগৎবাণীব হবিকিশোব মন্ডল আব ইউনিভারসালের রফিকুল, বাবলু। এদেরকে বলতেই হয়।

বেশ তো বল তুই! তবে বাগানে ফিস্ট করবো বলে যেমনটা ভেবেছিলাম তেমন করলে আর চলবে না। বাইরের অতিথিরা যখন আসছেন তখন পুরোপুরি এটা নিমন্ত্রণ হয়ে যাক। কী বলিস রে তোরা? রবি কবির বন্ধুদের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল। কুমাব বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন ববিদা। এটাকে বলা যেতে পারে, রেডিমেড নিমন্ত্রণ। মাত্র আধঘন্টার নোটিশে এতো বড়ো একটা নিমন্ত্রণ ওয়ার্ল্ডে আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। তারপবেই ছোট্ট করে রসিকতা কবলো, সীতানাথ তুই এখনও বসে?

সকলের সব কথা শুনে চন্দ্রনাথ সামান্য একটু হাসলেন। রবির দৃষ্টি এড়ালো না তা। হাসিটা যেন অন্য রকম। সে তাই জিজ্ঞেস করলো, বাবা তুমি যেন কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে? চন্দ্রনাথ এবারে খোলামেলা হাসলেন। বললেন, নীচেব বাসু আর দীপান্বিতা কী দোষ কবলো বল? আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবো। ওরা একই বাড়িতে থেকে বাদ পড়বে—এটা ভালো দেখায় না।

ওদেরও বলা হবে। রবি যেন দয়ালু এক বিচারক। কারও প্রার্থনাই সে অপূর্ণ বাখবে না।

পল্টুর পাশে বসে বুলান অনেকক্ষণ থেকেই ছুঁকছুঁক করছিল। তার আর্জিটা কখন পেশ কববে— এটা নিয়ে সে ভাবাভাবি কবছিল। দেখলো এই সুযোগ। বাবাব কাছে দাদু কাকা যে যাই বলছে, সব এক কথায় মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তারটাও এইবেলা পাশ করিয়ে নেওয়া দবকার। বুলান মহুয়ার মুখের দিকে একবার তাকালো। আসলে সে একটু সাহস পেতে চাইলো। মা রাজি হলে বাবা আর আপত্তি করবে না। বুলান উঠে গিয়ে মহুয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে কী যেন একটা ফিসফিস করে বলতেই খাটের ওপর থেকে রবি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কী বে বুলান তুইও কাউকে নিমন্ত্রণ করতে চাস নাকি?

আমি কাউকে নেমন্তন্ন করতে চাই না।

তবে?

তোমরা সবাই ছুটি নিয়ে বাড়িতে আনন্দ করবে আর আমি একা একা শুধু স্কুলে যাবো? বুলানেব বলার ভঙ্গিতে পল্টু, সুশীল ওরা দমকা বাতাসের মতো একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো। রবি ছেলের দিকে কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে বললো, কাবণটা অতি সহজ। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুই-ই স্কুলে পড়িস। চাকরি কবলে তোকেও আজ অফিসে যেতে বারণ করতাম।

একটা দিন তো! মত আদায় করার লড়াইয়ে বুলান নাছোড়বান্দা।

এমনিতে আমার আপত্তি ছিল না—রবি খুবই স্নেহেব সুরে বললো, স্কুল কামাই করে আনন্দ করা এটা কী ঠিক? তুই বল? তুই নব নালন্দায় ক্লাস ফাইভের একজন র‍্যাঙ্ক পাওয়া স্টুডেন্ট। আজকে স্কুলে না-গেলে কাল খাতায় লিখে দিতে হবে, বাড়িতে হইচই করে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল তাই স্কুলে যাওয়া হয়নি। এটা লেখা কী সম্ভব? আর মিথ্যেটাও লেখা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তুই তো এখন বড়ো হচ্ছিস। তুই ভেবে দ্যাখ—

শনিবার মোহনবাগানের লাস্ট খেলা। ওই দিন তো আমাদের ছুটি। আমি তাহলে পল্টুকাকার সঙ্গে খেলা দেখতে যাবো। বুলান তার আব্দারটা অন্য ভাবে পুষিয়ে নিতে চাইলো।

এগ্রী! পল্টু বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে তুলে ধরলো।

এবার তাহলে পড়তে চলে যা—

বুলান ঘর ছেড়ে চলে যেতেই সুশীল বললো, সত্যি রবিদা, যা ফাইন একখানা ডজ দিলেন; তাও শুধুমাত্র কথায়, মাঠে নামলে আপনি পল্টুর থেকেও বড়ো স্ট্রাইকার হতে পারতেন। বুলান

প্রায় প্রতিজ্ঞা করেই বসেছিল স্কুলে যাবে না বলে, সেই ছেলে এখন পড়তে চলে গেল—আমি তো ভাবতেই পারছি না। রবি সে-কথার উত্তর না-দিয়ে শুধু হাসতে লাগলো। বললো, আমাদের এই ভাবে বসে বসে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তোরা আমার সঙ্গে চল। হাটবাজারটা সেরে আসি। ভালো কথা মেনুটা কী হবে? তোরা কেউ বলছিস না যে?

সীতানাথ বললো, রবিদা পরিষ্কার খাওয়া-দাওয়া করুন। মুরগিব মাংস, ফ্রায়েড রাইস, চাটনী, দই, রসগোল্লা।

সকলের এটাই পছন্দ তো? রবি ভাইয়ের বন্ধুদের দিকে তাকালো।

হ্যাঁ রবিদা। সকলের সম্মিলিত সুর এক হয়ে বেজে উঠলো।

কবি তুই তাহলে সবাইকে নিমন্ত্রণের কথাটা বলে আয়। সীতানাথ, অলোক চলে যা মিষ্টি আনতে। সীতানাথের বৌ-ভাতে মিষ্টিটা দারুণ হয়েছিল। ওখানেই অর্ডার দিস। সুশীল, কুমার চলে যা মাংস আনতে। বাকি সব কাজ আমি আব পল্টু করে নিচ্ছি।

সবাই বেরিয়ে গেলে মহুয়া কবিকে কাছে ডেকে এক সময় বললো, আরও দু-কজনকে না বলাটা কী ভালো হচ্ছে? এতো আপন সুরে মহুয়া কথাটা বললো কবি প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়লো। পরে তার রেশ কাটিয়ে উঠে বললো, বৌদি তোমাকে আজ একটা সত্যি কথা বলবো। প্রায়ই ভাবতাম বলবো, কিন্তু কী বলবো? যার কথা তোমাকে শোনাতে চাই তার আর দেখা পেলাম কোথায়? তুমি তো লাবণ্য সংযুক্তাব কথা জানো। ওবা দুজনেই অত্যন্ত ভালো মেয়ে। সুন্দরীও বটে। ওদেব মধ্যে লাবণ্য যতোটা এগিয়ে আসতে চাইছে, সম্পর্ক পাতাতে চাইছে অন্য সময় হলে আমি হযতো ওর ডাকেই সাড়া দিতাম কিন্তু.... আমি পারছি না বৌদি।

কেন? এতো বাধা কিসের? মহুয়াব সারা মুখে চিন্তার ছাপ।

দিল্লি থেকে একটা মেয়ে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা এসেছিল। কবি যেন অনেক দূব থেকে ভেসে আসা গলায় বলতে থাকে, মেয়েটা আমার লেখা পছন্দ করে। 'অন্তঃসত্ত্বা' পড়ে খুব খুশি। 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইটা কিনতে সরস্বতী লাইব্রেরীতে এসেছিল। আমি তখন দোকানে বসেছিলাম। বইটা সে-সময আউট অফ প্রিন্ট ছিল। আমাকে সে বললো, যে-করেই হোক বইটা সংগ্রহ করে দিতে হবে। আপনাবাই তো প্রকাশক'। হ্যাঁ বৌদি, মেয়েটা বিন্দুমাত্র জানতে পারেনি আমিই ওই বইয়ের লেখক।

তুমিও তখন বলোনি?

না। আমাকে প্রথম থেকেই প্রকাশক কিম্বা দোকানের কোনও কর্মচারী বলে ভাবাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

তাবপর? মহুয়ার গলায় ক্রমশ বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠছে।

তাকে আমি পরের দিন বইটা দিলাম। মনে পড়ে বৌদি, তোমাকে একদিন অফিসে যাবার সময় আলমারি থেকে ওই বইটা নামিয়ে আমার সঙ্গে দিয়ে দিতে বলাতে তুমি অভিযোগ কবে বলেছিলে, এক কপি রয়েছে। এটাও নিয়ে যাবে? কী মনে পড়ে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ আমার বেশ মনে আছে।

ওই দিনের ঘটনা এটা। আমি বইটা যথা সময়ে ওর হাতে তুলে দিলাম। মেয়েটা অনেক ধন্যবাদ-টন্যবাদ, দাম-টাম মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল।

তখনও নিজের নামটা বলোনি? মহুয়ার গলায় একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো। তুমি কী?

না বৌদি, পারলাম না, বলতে পারলাম না। কবি উদাস গলায় বললো, মেয়েটার সারা মুখে একটা দেবী দেবী ভাব। সারা গায়ে যেন হলুদ মেখে এসেছে। আর নাকে সাদা পাথরের দারুণ একটা নাকছাবি। বৌদি, এই মুখটাই আমার চোখের সামনে সব সময় ঘুরে বেড়ায়। আমি অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গেই স্বাভাবিক হয়ে, স্থির হয়ে কথা বলতে পারি না।

তার নামটাও বোধহয় জিজ্ঞেস করোনি?

না।

বাঃ! তুমি যে কী করে বই লেখো আমার তো এখন দারুণ সন্দেহ হচ্ছে। দেখা পাবার বা আলাপ করবার একটা রাস্তা অন্তত লোকে খোলা রাখে, তুমি নিজের হাতেই রাস্তা খুঁড়ে রেখেছো, এগোবে কিভাবে?

প্রতীক্ষিত শনিবারটি এলো। লীগে মোহনবাগানের শেষ খেলা আজ স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে। জিততেই হবে। আর জিতলেই এই বছরের লীগ চ্যাম্পিয়নের সম্মান। সারা কলকাতায় উৎসবের আমেজ দেখে মনে হচ্ছে খেলাটা যেন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেই।

বিকেল তিনটে বাজতে-না-বাজতেই মোহনবাগান মাঠ এবং মাঠের চারপাশের এলাকা ভিড়ে ভিড়। একমুখী জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। পুলিশের শাসানি, ঘোড়সওয়ারের তাড়া, গাড়ির হর্ন ফুচকা, প্যাটিস, লজেন্স, ছোলা বাদামের বিক্রেতাদের রকমারি চিৎকার, সেই সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের বিচিত্র আওয়াজে ময়দান এলাকা যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মাঠে ঢোকার জন্য বিরাট লাইনকে মনে হচ্ছে কোনও বড়ো জংশনের রেল লাইন বুঝি এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

মোহনবাগানের গেটের সামনে পর্যাপ্ত পুলিশী ব্যবস্থা। কার্ড ছাড়া গেটের ধারে কেউ ঘেঁষতে পারছে না। ওই কার্ড হাতে নিয়েও আবার দীর্ঘ লাইন। সে-এক জমাট বাধা জটিল অবস্থা।

স্কুটারের পেছনে বুলানকে চাপিয়ে পন্টু ক্লাব গেটের কাছে আসতেই চারদিকের জনতার সে কী উচ্ছ্বাস! পুলিশরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সকলেই পন্টুর কাছাকাছি আসতে চায়। পন্টু সকলের ভালোবাসার রেণু গায়ে মেখে ভেতরে ঢুকে গেল। লনে বন্ধুদের অপেক্ষা করার কথা। এতোক্ষণে ওরা এসে গেছে কিনা কে জানে? দলটা নেহাত ছোট হবে না। কবি, সুশীল, অলোক কুমার, সীতানাথ, সীতানাথের বৌ সুপর্ণা, সুনন্দা, বাপি। লনে ঢুকবার গেটের কাছে আসতেই পন্টু দেখলো, হ্যাঁ ওরা সবাই এসে গেছে। পন্টু প্রথমেই সুনন্দার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। পরে বুলানকে ওর হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে বললো, স্কুটারটাকে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। উল্টো-পাল্টা রেজাল্ট হলে এটা পুড়তে এক সেকেন্ডেরও বেশি সময় লাগবে না। বড়ো আজব জায়গা এই মাঠ। হয় রাজা নয় ফকির। মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। হয় বীরপূজা নয় তো জুতোপেটা। সব কিছুতেই একটা চরম চরম ভাব। পন্টু শব্দ করে হেসে উঠলো। কবির মনে হলো ওটা পন্টুর যেন খুব কষ্টের হাসি।

পটকা আর বোমাবৃষ্টির মধ্যে মোহনবাগান দল মাঠে নামলো। স্পোর্টিং ইউনিয়নের ছেলেরা গা ঘামিয়ে নিচ্ছিলো। উল্লাসের সেই একই পরিচিত দৃশ্য দেখে তারা যেন নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো। কিশোর এবং তরুণ ছেলেগুলো যেন কাঁপছে। ওরা বুঝি আগেই শব পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে। একদল যুবক বেশ বড়ো একটা নৌকো বানিয়ে এনেছে। নৌকোর গায়ে খেলোয়াড়দের ছবি। চার-পাঁচটা ছেলে মালা হাতে মাঠের মধ্যে ঢুকতেই পুলিশ অফিসাররা তাদের রুলটা আকাশে তুলে তাড়া করলেন। ওদের মধ্যে ভোম্বল ছিল। একজন পুলিশ তাকে প্রায় ধরে ফেলেছেন। পন্টু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরে পরিস্থিতি সামাল দিতেই মাঠের সমস্ত দর্শক হাততালি দিয়ে ক্যাপ্টেনকে দারুণ ভাবে অভিনন্দন জানালো। পন্টুর এই ব্যবহার তারা সারা জীবন মনে রাখবে। ভোম্বল তখনও হাঁপাচ্ছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বললো, গুরু আপনাকে মালাটা পরাবো বলেই মাঠে......

তা তো বুঝলাম। কিন্তু জয়ের আগেই মালা পরাটা ঠিক কী? ওটা এখন থাক ভোম্বল। পন্টু ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের বাইরে এসে দাঁড়ালো। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা বারবার ঝলসে উঠছে। মাঠের চারদিকে তখন একটাই গুঞ্জন।

ছেলেটা কে রে?

হ্যাঁ ভাগ্য করে এসেছিল বটে—

আরে মশাই আমাদের ক্যাপ্টেনের ব্যবহারটাও দেখুন। জার্মানদের ক্যাপ্টেন হলে ওই ছেলেটাকে

বাঁচাতো এমন ভাবে? তাব আগেই পুলিশ খাল খিঁচে নিতো।

সাইড লাইনের পরে ফেনসিং-এর ধার ঘেঁষে বেঞ্চ পাতা ছিল। সেখানে কবি, সীতানাথ ওরা এক লাইনে বসে। পল্টু এগিয়ে গিয়ে ভোম্বলকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললো, ওকে তোদের মধ্যে বসিয়ে বাখ। ছাড়িস না যেন—পুলিশ অফিসারটা ওকে নজর রেখেছে।

বুলান বলে উঠলো, পল্টুকাকা গোল চাই।

পল্টু একটু হেসে উত্তর দিল, চেষ্টা করবো বাবা।

হ্যাঁ, চেষ্টা করেও গোল হচ্ছে না। ওদিকে হাফটাইম হয়ে গেল। আক্রমণের ঝড় তুলেও মোহনবাগান গোল পাচ্ছে না। স্পোর্টিং ইউনিয়নের তবতাজা ছেলেরা গোলের মুখে কপাট এঁটে দিয়েছে। যতো ভিড় ওই পেনালটি বক্সের ভেতরে। যেন সেখানে একটা মিটিং চলছে। অতো জটলার মধ্যে গোল পাওয়া যায়? খেলাটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। পল্টু সেই চেষ্টাই করছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

খেলা শেষ হওয়ার দিকে ক্রমশ ঢলে পড়ছে। মোহনবাগানেব ভাবত বিখ্যাত কোচ সাইড লাইনের ধারে সিংহের গর্জন নিয়ে ছোটাছুটি কবছেন। যে-প্লেয়াবটাই বল মিস করছে বা ঠিকমতো পাস দিতে পারছে না, তার উদ্দেশে চিৎকাব কবে কী যেন বলছেন। ওদিকে গ্যালারি তখন আশঙ্কায় নীল। সদস্য আসন থেকে আওয়াজ উঠলো, অমুককে বসিয়ে দাও। ও একটা ভুষি মাল। কিছুই খেলতে পারছে না। অথচ কোচ তাকে বসাচ্ছেন না। এই নিয়েই আবার সদস্যদেব সঙ্গে কোচেব তর্কাতর্কি চলতে লাগলো। মাঠে দু-এক টুকরো ইট পড়তে শুরু কবেছে। খেলা ভাঙতে তখন ঠিক দশ মিনিট বাকি।

মোহনবাগানের গোলকীপাব ছাড়া বাকি দশজন অপবপক্ষেব গোল এরিয়ায ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই দশ মিনিটের মধ্যে গোল চাই'ই। স্টপার, সাইড ব্যাক পর্যন্ত গোলে শট নিচ্ছে। এই যখন অবস্থা পল্টু হঠাৎ একটা চলতি বলে কোনাকুনি শট নিল। গোলকীপার এগিয়ে আসার দরুন বলটা তার নাগালেব বাইরে গিয়ে একেবারে জালেব মধ্যে। গো-ও-ল। সাবামাঠে তখন পটকাব আওয়াজ।

ভোম্বলকে কবি তার পাশে বসিয়ে বেখেছিল। সে একবাব মাঠের মধ্যে যাবাব চেষ্টা কবতেই কবি ওর হাতটা চেপে ধবে বললো, খববদার! ওদিকে যেয়ো না।

আমাকে ছেড়ে দিন কবিদা। আমি পুলিশের মার খাবো। জীবনে আনন্দের মুহূর্ত খুব বেশি একটা আসে না। ভোম্বল অনেক দুঃখ নিয়ে বললো, জানেন মাঝে এমন কয়েকটা বছর আমাদের গেছে সন্ধ্যার পরে টেন্টে আলো জ্বলতো না। যেন শ্মশান। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল লীগ নিয়ে আর ফেরত দিতো না। তখন ওদের ইন্ডিয়া কাঁপানো টিম। যেখানেই দেখা হচ্ছে সেখানেই ঝাড় খাচ্ছি।

খেলার মাঠে এই ধরনের কিছু তরুণ থাকে। এদেব জান-প্রাণ-ভালোবাসা সবই ক্লাব আব ক্লাবের খেলোয়াড়দের ঘিরে। স্টার খেলোয়াড়রা এদের মাথার মণি। ভোম্বলেব মনটাকে বুঝে নিতে সুশীলেব বেশি সময় লাগলো না। সে বললো, ভোম্বল খেলা শেষ হোক। কথা দিচ্ছি, পল্টুকে আধ ঘন্টার জন্য তোমার হাতে ছেড়ে দেবো। তুমি তোমার গুরুকে পুজো কোরো।

খেলা শেষ হতে আব দু'মিনিট বাকি। ওই দু'মিনিটে আবও দু'খানা গোল। দুটোই পল্টুব। মরশুমে এই নিয়ে সে দ্বিতীয়বার হ্যাট্রিক করলো। সাবা মাঠ তখন টগবগ করে ফুটছে। দর্শকরা মাঠে ভেঙে পড়ল বলে।

মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা শেষ বাঁশি শোনার সঙ্গে সঙ্গে টেন্টেব দিকে দৌড় লাগালো। পুলিশরাও ছুটে এলো সাহায্য করতে। নযতো একবার বাধভাঙা ওই জনতার ঢেউ গায়ে এসে পড়ে খড়কুটোর মতো কোথায় যে ভেসে যাবে তাব কোনও ঠিক ঠিকানা থাকবে না। মানুষের চাপের সেই ঘূর্ণি স্রোতে ডুবে যেতে কয়েকটা মুহূর্তমাত্র!

ভোম্বল সমেত কবিদের পুরো দলটি অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে টেন্টে গিয়ে আশ্রয় নিল। গেটে বাধা দেবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। এরা পল্টুর গেস্ট। গেটের লোকেবা সেটা প্রথম থেকেই জানে।

পল্টু শর্টস পরে খালি গায়ের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে একটা চেয়ারে বসেছিল। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা কেউ টেবিলের ওপর শুয়ে, বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প করছে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে। ভোম্বল তার গুরুর দেখা পেল, না ভগবানকে কাছে পেল সেটা ওই বলতে পারবে। পল্টুর দুই পায়ের মধ্যে গিয়ে সে আছড়ে পড়লো। ভোম্বল আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদছে। পল্টু প্রথমে তোয়ালে গিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল। কী আশ্চর্য এদের ভালোবাসা! রেকর্ড বইতে কতো কথা লেখা থাকবে অথচ ভোম্বলদের প্রাণের কথা কোনোদিনও লেখা হবে না। আর এরা আছে বলেই প্লেয়াররা স্টার হয়ে আছে। পল্টু স্নেহের একটা ধমক লাগিয়ে বললো, ভোম্বল, তোমাকে কিন্তু আমি অনেক আগেই বলে দিয়েছি যখন-তখন এমন ভাবে কারো পায়ে পড়বে না। তোমরাও কারো থেকে কম নও। তোমরা আছো বলেই আমরা বেঁচে রয়েছি।

গুরু এই মালাটা—ভোম্বল পল্টুর গলায় একটা বিরাট মোটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিতেই ফটোগ্রাফাররা ঝটপট ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

বুলান সুনন্দার হাত ধরেই সারাক্ষণ ছিল। হাতটা এবারে ছাড়িয়ে নিয়ে উপচে পড়া খুশিতে সে বললো, পল্টু কাকা তোমার সাতাশটা গোল হলো। টপ স্কোরার!

পল্টু বুলানকে জড়িয়ে ধরে পরম স্নেহে ওর কপালে একটা চুমু বসিয়ে আবেগ ভরা গলায় বললো, এই ক্লাবে আমার ফটো টাঙানো থাকবে। পাশাপাশি তোর ফটোটাও ভবিষ্যতে যেন দেখতে পাই।

কবি, সীতনাথ, সুশীল, অলোক, কুমাররা গর্বের ভঙ্গিতে বন্ধুকে ঘিরে কথা বলছিল। সুপর্ণা, সুনন্দা, চুপচাপ থাকলেও সুনন্দাকে আলাদা ভাবে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিল না। সে পল্টুর দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে হাসছিল। চোখের সেই হাসি লেগেছে দুই ঠোঁটেও। পল্টুও যার সঙ্গেই কথা বলুক না কেন, সুনন্দার দিকে বারবার তাকানো চাই৻ চার চোখের গভীর এক খেলা চলছে তখন। ফটোগ্রাফার মহাবীর ব্যাপারটা আঁচ করলেন। মাঠের খেলা শেষ। এখন হৃদয়ের খেলা! তিনি তার ক্যামেরা বাগিয়ে একেবারে রেডি হয়ে রইলেন। কখন কী সুযোগ আসে বলা যায়?

ওই সময়ে মান্নাদা এলেন। তিনি পল্টুকে বললেন, আর দেরি করিস না। বাইরে প্রচন্ড ভিড়। সামলানো যাচ্ছে না। ক্লাবের পতাকা তুলবি চল—কথাটা বলে মান্নাদা চলে যেতেই পল্টু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রজনীগন্ধার মালাটা অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তিতে সুনন্দার গলায় পরিয়ে দিতেই মহাবীরের ক্যামেরা যেন কথা বলে উঠলো। পল্টুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে পল্টু ? পল্টু কোনওরকমে শুধু বললো, প্লিজ ডোন্ট গিভ ইট টু দ্য প্রেস। প্রমিস?

মহাবীর উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বললেন, প্রমিস!

বুলানকে নিয়ে কবি বাড়ি ঢুকতেই দেখতে পেল মা-বাবা, দাদা-বৌদি সামনে দাঁড়িয়ে চারজনই হাসছেন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা সে-এক আশ্চর্য হাসি। বুলানের তর সইছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, বাবা পল্টু কাকা আজ হ্যাট্রিক করেছে।

ওটা পুরানো খবর। রবি ছেলের দিকে না-তাকিয়ে কবির দিকে চেয়ে অনেক মমতা নিয়ে হাসলো। আস্তে আস্তে ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললো, দিল্লি থেকে একটা খবর এসেছে। তুই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছিস।

দাদা এ-সব কী শুরু হলো বলো তো? আনন্দে কবির গলাটা বুজে এলো। লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞা ছাড়া কিছুই পাচ্ছিলাম না। যখন পেতে শুরু করলাম..........

টেলিগ্রামটা এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তারা জানিয়েছেন, 'আপনার 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' উপন্যাসটি এবারে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী সতেরো তারিখে উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে।'

কবি টেলিগ্রামটা পড়লো। একবার নয়, বারবার। টেলিগ্রামের লাল কাগজটার উপরে কী একটা

ছবি ফুটে উঠেছে? সাদা পাথরের নাকছাবি নাকে এক হলুদ বসন্ত পাখির ভাসা ভাসা দুটো অমাবস্যার চোখ? সেই মুখটাকে কবি যেন সামনেই দেখছে। তার সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলবে।

নির্দিষ্ট দিনে কবি সকালবেলা নয়াদিল্লি গিয়ে পৌঁছালো। পুরস্কার কমিটির দুজন মেম্বার স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। জীবনে এই প্রথম দিল্লিতে আসা। মনে মনে একটু নতুন জায়গার অনিশ্চিত পরিবেশের দ্বিধা ছিল। কিন্তু পুরস্কার কমিটির মিঃ সাহানী আর ডাঃ শর্মা সে-সব কিছুই মনে হতে দিলেন না। তাঁদের সঙ্গে গাড়ি ছিল। আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি সেরে নেবার পর তাঁরা কবিকে হোটেল জনপথের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললেন, আপনি এখন রেস্ট নিন। বিকেলে যথাসময়ে আপনাকে নিতে আসবো। আমরা আসছি তাহলে—

আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রতার নিয়ম রক্ষা করবো না। দিল্লি সফর শুরু হলো আপনাদের মতো শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে, আমি আনন্দিত।

সাহিত্যের পুরস্কার অনুষ্ঠানের উৎসব হলেও ভিড় কম হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ই বেশি। তার ওপরে রয়েছে সাহিত্যানুরাগী দর্শক ও নিমন্ত্রিত অতিথিরা। টুকুন মোটামুটি হলের সামনের দিকেই ওর বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছে। এবারে কলকাতা গিয়ে কিভাবে কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি' বইখানা সংগ্রহ করেছে সেই গল্পই করছে। এর আগে সে বহুবার ওই গল্প বলেছে বন্ধুদের কাছে। আজ আর একবার বলে সেদিনের সেই সুখের প্রদীপটাকে উসকে দিতে চাইলো। পুরস্কারপ্রাপ্ত বই নিয়ে সব দেশে সব সময়েই বিতর্কের ঝড় ওঠে। আনন্দের কথা, এবারে কিন্তু তা হয়নি। টুকুন নিজেও তার বন্ধুদের কাছে স্বীকাব করলো, এবারের বইটি সত্যিই পুরস্কার পাবার যোগ্য। সব চেয়ে আশ্চর্য, এটাই লেখকের প্রথম উপন্যাস। আর প্রথম লেখাই যে এতো পরিণত গভীর হতে পারে সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। দীপাবলী বললো, গত সপ্তাহে কলকাতার একটা দৈনিক কাগজে ছোট্ট একটা খবর ছিল। কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই উপন্যাসটি আঠাশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে লেখকের আঠাশতম জন্মদিনে। সেই উপলক্ষ্যে এবং রবীন্দ্র পুরস্কার পাবার জন্যেও প্রকাশকের তরফ থেকে লেখককে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি ছাপা হয়নি? অসীম আগ্রহে জিজ্ঞেস করলো টুকুন।

না। দীপাবলী একটু হেসে বললো, অতো আহত হচ্ছিস কেন? আর একটু বাদেই তো স্বয়ং লেখককে দেখতে পাবি। বয়সটা আবার মাত্র আঠাশ! দারুণ লাগছে ভাবতে তাই না রে? টুকুন কোনও উত্তর না-দিয়ে নীরবে একটু হাসলো। পরে অবশ্য বললো, একটা জিনিস জানা গেল। সেটা হলো লেখক বয়সে তরুণ। লেখাটা যেমন, দেখতে কেমন হবে কে জানে? টুকুন দারুণ ভাবে হেসে উঠলো। সত্যি যদি লেখককে দেখতে খারাপ হয় তাহলে খুবই কষ্ট পাবো।

তোর কষ্টের কী আছে? পুষ্পার চোখের কোণে ছলকে পড়া হাসি।

যার লেখা এতো ফ্যানটাসটিক, পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই—সে যদি বিশ্রী হয় কার-না খারাপ লাগে বল? তবে লেখকের রূপ তার লেখায়, চেহারায় নয়— এটা তো সকলেই জানে।

মাইকে তখন পুরস্কার কমিটির একজনের গলা শোনা গেল ঃ এবারে পুরস্কার প্রদান। নরসিংহদাস পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস 'ঈশ্বর তোমাকে অভিযোগ করছি'। লেখক কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এক-দু মিনিটের নীরবতা। তারপরেই কবি শান্ত পায়ে ধীরে ধীরে স্টেজের ওপরে গিয়ে দাঁড়াতেই বিদ্যুতের স্পর্শ খেলে গেল টুকুনের সারা শরীরে। সে বসেছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দীপাবলী কৌতুকের সুরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী রে টুকুন! দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? আঠাশের ধাক্কায় নাকি?

অমৃতা কাউর বললো, দারুণ হ্যান্ডসাম কিন্তু। নিজে সুন্দর তাই সব কিছু সুন্দর করে লিখতে পারে।

টুকুন বসে পড়লো। কলকাতার সরস্বতী লাইব্রেরীতে দু'দিনের ছবিগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রথমদিন কথা হয়েছিল। দ্বিতীয়দিন এই ছেলেটাই তাকে বই যোগাড় করে এনে

দিয়েছে। টাকা নিতে চাইছিল না, সে নিজেই বইয়ের দামটা জোর করে দিয়েছে। ছেলেটা তবুও বলেছিল, এটা কিন্তু বিক্রির জন্য নয়। ফ্রি কপি। টুকুন একটা কথাও ভোলেনি। তার কাছে মনে হচ্ছে এটা যেন গতকালের ঘটনা।

ইতিমধ্যে কবিকে কখন যে-চন্দনের টিপ এঁকে গলায় মালা দেওয়া হয়েছে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, টুকুন সে-হিসেব রাখেনি। সে কলকাতার চিন্তার মধ্যে ডুবেছিল। কী সুন্দর সেই সুখস্মৃতি! কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে কথা বলেছে। তার কাছ থেকে বই নিয়েছে অথচ জানে না ওই ছেলেটিই আজকের প্রতিষ্ঠিত তরুণ লেখক।

কবিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলে সে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সভাপতি, প্রধান অতিথি, উৎসব কমিটিও ও উপস্থিত সবাইকে সে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে বললো, আমি বক্তা নই। একটু-আধটু লিখতে পারি। সুতরাং আমার যা কিছু বক্তব্য সবই লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে। পুরস্কার প্রসঙ্গে কবি বললো ঃ লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই এতো বড়ো একটা পুরস্কার পেয়ে আমি আনন্দিত। এই বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারটাও ফাঁকতালে পেয়ে গেছি। আমি তাই অভিভূত। সঙ্গে বেশ কিছুটা চিন্তিত এবং শঙ্কিত। কেন-না এই সব পুরস্কার শুধুমাত্র পুরস্কারই নয়, সঙ্গে অলিখিত একটা চুক্তিপত্র লেখককে ধরিয়ে দেওয়া হয়। তোমাকে এর চেয়েও ভালো লিখতে হবে। আরও ভালো। সহজে বই বিক্রির উপযোগী রচনা নয়, চিরকালের সাহিত্যের রসে তোমার লেখা যেন উত্তীর্ণ হয়। পিছু হটলে চলবে না, থেমে থাকলে হবে না, সৎ সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ-কাজ সহজ নয়। তবে আমি লেখার নামে শপথ করে বলছি, আন্তরিক ভাবে ভালো লেখার চেষ্টা সারা জীবন করে যাবো, সাহিত্য নিয়ে কখনও কোনোদিনও ভন্ডামী করবো না। দীর্ঘ করতালিতে মুখরিত হলো হলঘর।

সভা শেষে কয়েকজন ঘিরে ধরলো কবিকে। অটোগ্রাফ সই। কেউ কেউ লেখা নিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন করলো। কেউ অভিনন্দন জানালো। অমৃতা কাউর বললো, চল আমরাও যাই।

টুকুন মনে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই যাবে। তারই তো একান্ত ভাবে কবির কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু কেমন জানি এক অভিমানে টুকুনের বুকটা ভরে উঠলো। যদিও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বন্ধুদের সঙ্গে কিন্তু রইলো সবার পেছনে। এই সব ক্ষেত্রে অটোগ্রাফ না-দিলে হাজারো কথার জাল বুনতে হয়। কবি সেটা এড়াতে চাইলো। দু-চারজন সই চাইছে তাদের দিয়ে দেওয়াই ভালো। কবি তাই অমৃতা কাউর, পুষ্পা, দীপাবলীকে অটোগ্রাফ দিয়ে মুখ তুলে সামনে তাকাতেই চোখে পড়লো টুকুনকে। হারিয়ে যাওয়া একটা সুন্দর মুখ। একটা নাকছাবি। ওর কাছে এগিয়ে গেল কবি। টুকুনের সাদা পোখরাজ পাথরের নাকছাবিটা যেন অন্ধকারে পথিককে আলো দেখাচ্ছে। নাকি 'একটি ধানের শিষের ওপর একটি শিশির বিন্দু'? কবি শিশুর মতো হেসে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক সুরে বললো, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

কার ওপর অভিমান করবে টুকুন? তার বন্ধুদের সামনেই কোনও সংকোচ নয়, জড়তা নয়, সব ভোলানো শিশুর হাসি নিয়ে এতো খোলামেলা ভাবে ক'জনে বলতে পারে, "আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।" এই সরলতা চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায় না। মনটাকেও শিশুর মতো রাখতে হয়। তবুও টুকুন বলতে ছাড়লো না, আপনিই যে কবি বন্দ্যোপাধ্যায় কেন সেদিন বলেননি? কেন? তারপরেই বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললো, কলকাতায় ওঁর বইটা পাবার যে-গল্প তোদেরকে করেছিলাম, উনিই আমাকে বইটা যোগাড় করে দিয়েছিলেন। অথচ একবারও বলেননি.....

কী আশ্চর্য! নাকছাবির ছটায় কবি তখন আনন্দে দিশেহারা। সারা মুখে সোনা ঝরা এক হাসি নিয়ে সে বললো, আপনি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি। বই চেয়েছেন, সংগ্রহ করে দিয়েছি।

তা না হয় বুঝলাম কিন্তু আপনি নিজে তো বলতে পারতেন বইটা আমারই লেখা। আপনি তো চোর-ডাকাত নন যে নামটা গোপন করে রাখবেন। আর আমার জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই ওঠে না। বইয়ের দোকানে দেখে আমি আপনাকে দোকানের একজন বলেই ভেবেছি। সেটাই স্বাভাবিক।

দোকানদারকে লোকে বইয়ের কথাই জিজ্ঞেস করে, তার নাম জানতে চায় না। আপনারই উচিত ছিল লেখক হিসাবে নামটা বলা।

আমার নাম কবি বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির মুখে সূর্যোদয়ের হাসি।

এখন আর সেটা না-বললেও চলবে—টুকুন এবারে হেসে দিল। বললো, আমার নাম টুকুন বসু।

কবি মুগ্ধ হয়ে টুকুনের নাকছাবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, আপনার মুখে এই নাকছাবিটা সুন্দর মানিয়েছে। ঠিক যেন দেবী প্রতিমা। লজ্জা নয়, দ্বিধা নয়, কবির সরল স্বীকারোক্তি, আমার পরের রচনা হবে 'টুকুনের নাকছাবি'। আপনি কী বলেন?

লজ্জায় আমার নাকছাবিটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মোহনীয় এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে টুকুন হেসে উঠলো।

কবি আস্তে আস্তে বললো, অহেতুক লজ্জা করলে জীবনে অনেক ঠকতে হয়। অনেক কিছু হারাতে হয়। একই জিনিস বারবার হারানো কী ভালো?

কক্ষনও না। টুকুন কবির চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে রইলো। ভালোলাগার অসীম লজ্জায় কবি দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার গভীর ভাবে তাকালো টুকুনের দিকে। ওর দু'চোখে তখন ভবিষ্যতের এক স্নিগ্ধ ছায়া শরতের মেঘের মতো খেলা করতে লাগলো।

রূপ নয় আগে মন



জীবনের ওপর দিয়ে একুশটি বসন্ত একে একে পার হয়ে গেল। এখনও শুনছি আমি খারাপ। অবশ্য আমি নিজেও কিছুটা বুঝি। তবে এ-কথা অনায়াসেই বলতে পারি যে—সবার কাছ থেকে যদি একটু স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা পেতাম তবে নিশ্চয়ই এতোটা খারাপ হতাম না।

সন্তানের মধ্যে যে-ছোট সে-ই পিতামাতার আদর পায় বেশি। এটা অন্তত আমার জীবনে একেবারেই খাটে না। ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। বাবা, দিদিকে তমা বলতে অজ্ঞান আর মা দাদাকে। দাদা এবং দিদিকে, বাবা-মা ভালোবাসেন, ভগবান আমাকে ফাউ হিসাবে এঁদের কাছে পাঠিয়েছেন। অথচ আমার থেকে ওরা কতো বছরেরই-বা বড়ো! দাদা চার এবং দিদি দু'বছরের। তবে এটা ঠিক যে—অন্য সব ক্ষেত্রেই ওরা আমার থেকে বড়ো। দাদা শান্তিনিকেতনে এম.এ পড়ছে আর দিদি কলকাতার একটা বিখ্যাত কলেজে বি.এ পড়ে। সে তুলনায় আমার নজির একেবারেই ম্লান। তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করে এখন চুপচাপ বসে আছি। রেজাল্ট বেরুবার পর বাবা সেদিন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। এ অন্য মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ রাগের, দুঃখেরও বটে। বলেছিলেন, থার্ড ডিভিশন আমাদের বংশে নেই তা জানিস? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা! লোকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরটা কী দেবো শুনি? বাধ্য হয়েই মাথা নীচু করতে হবে, এটা তো তোর জন্যই। আর পড়াবো না তোকে, কী হবে একটা গরুকে পড়িয়ে, আমার টাকা অতো সস্তা নয়। এই আমার শেষ কথা।

সত্যি সত্যিই ওই কথাই বাবার শেষ কথা। তারপর আর কোনোদিন পরীক্ষার বিষয়ে একটি কথাও বলেননি। বুঝতে পারলাম, বাবার মনে লেগেছে, দুঃখটা তার কী পরিমাণ! এ-কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না, কারণ বাবা বাংলা দেশের একজন নাম করা সাহিত্যিক। সুতরাং তার ছেলে হয়ে আমি.......।

সংসারে সবাইকেই সমান ভাবে ভালোবাসা যায় না। স্নেহের পার্থক্য অর্থাৎ রকম-ফের একটু না-একটু হবেই। সেটা কোনও সন্তানের প্রতি বেশি আবার কোনও সন্তানের প্রতি কম। কিন্তু এ-সবই নির্ভর করছে এক একটা কারণের ওপর। বাবার স্নেহ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ বোধহয় এই—ভবানীপুর অঞ্চলে আমাদের বাড়ি হওয়ার পর আমরা লুন্দিপুর ছেড়ে ওখানে চলে আসি। বাবা, চেতলা স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জানালেন, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে, দলে-টলে মিশবে না ইত্যাদি... । স্বীকার করতে লজ্জা করলেও সত্যি কথাই বলবো, বাবার কথা রাখতে পারিনি। অধিকন্তু সিগারেট খেয়েছি। তবে সেটা কয়েক বছর পরে।

টেস্ট এগজামিনেশন শেষ হয়েছে সবে। বাড়ির পাশের পার্কটাতে আমাদের রোজ সন্ধ্যাবেলা আসর বসে। এ-আসর সাহিত্য বা অন্য কোনও কাজের নয়—স্রেফ নির্ভেজাল আড্ডার। একদিন অশোক আমার দিকে সিগারেট প্যাকেটটি এগিয়ে দিয়ে বললো, সমী একটা তুলে নে।

—না ভাই ও জিনিসটা আমি খাবো না।

—কেন, এটা কী অখাদ্য? তুই কী এখনও এই বিংশ শতাব্দীতে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে থাকতে চাস? এ রকম নিরামিষ হলে চলবে কেন? নে নে একটা খা.

—Please অশোক, বড়ো হয়েই খাবো।

—হাসালি দেখছি, এখন কী সেই মায়ের কোলের ছোট্ট শিশুটি আছিস?

—তা অবশ্য নেই, তবে......

—নে নে পাকামো রাখ। তোদের ইয়ে দেখলে........

—ভয় করে ভাই।

—দূর বোকা কোন ব্যাপারে ভয়টা নেই তুই শুধু আমাকে সেটাই আগে বল। পরীক্ষার হলে

এক লাইন টুকতে কতো মেহনত করতে হয় জানিস? সময় যায়, হাত-পা কাঁপে, মাঝে মাঝে মাথাও ধরে এমনকি খাতা যে প্রাণ-শূন্য সেটাও সময় সময় নড়াচড়া করে, তাই বলে কী টুকলি করা বাদ যায় রে? আর ক্রেডিট্‌ তো ওইখানেই, কাজও হলো ধরাও পড়লাম না।

অশোক একেবারেই নাছোড়বান্দা; বুঝতে পারলাম, রেহাই নেই। তাই ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ দেখে-টেখে ফেলবে না তো?

—ছোঃ! তাছাড়া বড়োরা দেখলে লজ্জাটা তাদের! দেখবি সুড় সুড় করে কেমন সুন্দর মুখখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

নিঃশব্দে সিগারেট টানছি। আর মনে মনে অশোকের যেন বিপদ হয়, এই কামনা করছি। যেন ভগবান ওর বাবাকে এই মুহূর্তে এখানে এনে দেন। দেখুন একবার নিজের ছেলের অধঃপতনের বহরখানা। সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। কী ছাই কোনওই স্বাদ পেলাম না। টক ঝাল-মিষ্টি কোনওটাই নয়—এমনকি তেতো পর্যন্ত নয়। আমাদের উনুন থেকে যে-আঁচের ধোঁয়া বেরোয় তারই কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুধু মুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো যেন। হঠাৎ জোরে একটা ধাক্কা খেলাম, তোর বাবা রে সমী! লুকো, লুকো। সুজিত ফিসফিসিয়ে বললো।

একেই বলে দুর্ভাগ্য! কামনা করছিলাম অশোকের বাবার, তার পরিবর্তে এলো আমার বাবা। লুকানো-ফুকানো নেই, দিলাম ফেলে ছুড়ে।

—কী রে! বাবা দেখেছেন না কী? ভয় ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—অন্ধ হলে দেখতেন না। ধোঁয়ার রিং ছাড়ে সুজিত। অতো ঘাবড়াবার কিসসু হয়নি। নির্ঘাত চিনতে পারেননি। এই অন্ধকার তায় আবার এতো দূর থেকে! চেনাটা সহজ নয়!

সে-রাতে দুরু দুরু বুকে বাড়ি গেলাম। ভাবছি, বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাবো কেমন করে? কী ভাবছেন তিনি আমার সম্বন্ধে? ঠিক করলাম, বাবার কাছে সব খুলে বলবো। চাইবো ক্ষমা। আর কোনোদিন এমন কাজ না-করলেই হবে। সিগারেট খেয়েছি, বাবা দেখে ফেলেছেন, তাই বাড়ি গিয়ে বলে দোষ লাঘব করার চেষ্টা করলাম।

—তুমি সিগারেট খেয়েছো? এইটুকুন বয়সে! তবে খারাপ হতে বাকিটা রেখেছ কী শুনি? কতোদিন খেয়েছ? বাবা জানতে চাইলেন।

—আজ্ঞে..... ভয়ে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না।

শুধু আজকেই খেয়েছো?

আজকেই বাবা!

শুধু 'আজকেই' বললে হতো কিন্তু 'বাবা' ডাকটা জুড়ে দিয়ে বাবাকে কিছুটা অর্থাৎ যতোটা শান্ত করতে পারা যায়, আবার পরোক্ষে দয়া পেতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবাকে সেদিনও চিনতে পারিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাবা চিরদিনই কঠোর। ঠাস ঠাস করে দু'গালে দুটো চড় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আর কোনোদিন খেয়েছ কী তোমার হাড় একদিকে আর মাংস একদিকে করবো। মনে থাকে যেন!

রান্নাঘর থেকে দিদি বেরিয়ে এসে বলেছিল, একেবারেই গোল্লায় গেছিস সমী! সঙ্গে সঙ্গে আমার কান দুটিও কানমলার হাত থেকে বাদ পড়লো না।

সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলাম, কী বোকামিটাই না করেছি। আমাকে সিগারেট খেতে যে দেখেছিল সে অন্য কেউ—বাবা নন। আর আমি কী-না সত্যবাদীর মতো গোপন কথাটাও বলে ফেললাম। ফলে আমার খারাপের আর একটা দিক বাবার কাছে ধরা পড়লো। এরপর কী বাবা আমায় স্নেহ করবেন? বলবেন কী ভালো ভাবে কথা? আমি যে অনেক নীচে নেমে গেছি বাবার চোখে! বুঝলাম মানুষ এমনি করেই নিজে নিজেরই সর্বনাশ করে।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানলার পাশে বসে আছি। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। বন্ধুদের কথা, চিনুমাসির কথা, হরিমুদির কথা! ইচ্ছে হয়, এক্ষুণি চলে যাই লুন্দিপুরে। হ্যাঁ আর একজনের কথাও মনে পড়ছে। সে সীমা! ওকে আমি ভালোবাসতাম। সীমাও বাসতো

আমাকে। কতো শত প্রশ্ন উঁকী মারে মনের কোণটিতে। এখন ওকে দেখতে কেমন হয়েছে, কতো বড়োই-বা হয়েছে, চেহারা এমনিতেই বাড়ন্ত। এখন নিশ্চয়ই আরও বড়ো হয়েছে। তা সে যতো বড়োই হোক না কেন আমার থেকে সে সর্বদাই এক বছরের ছোটো থাকবে।

—এই সমী, শোন! একটা সুখবর আছে! দিদির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। চিন্তা রাজ্য থেকে বাস্তবে এলাম ফিরে। তাকিয়ে দেখলাম, বৃষ্টি একেবারেই থেমে গেছে।

—কী খবর রে দিদি?

— দাদা কাল আসছে! সঙ্গে আসবে দাদার বন্ধু, নাম গ্রেট টেলর।

—এদিকে বললি সুখবর একটা অথচ শোনালি কিন্তু দুটো। এবার সত্যি করে বলতো তোর কাছে কোনটা সু? দাদা না টেলর?

—তার মানে? দিদি ভ্রূ কুঁচকায়।

—অতি সহজ। আমি ম্লান হাসলাম।

—বড়বেশি বুঝতে শিখেছিস।

—আচ্ছা, তুই অমনি কেন রে। দু'বছরের বড়ো হয়ে তুই ... ... থাক গিয়ে। কোথায় বন্ধুর মতো ব্যবহার করবি না দিনরাত শাসন!

—মা, কালকে দাদা আর তার বন্ধু আসছে ......রান্না ঘরে গিয়ে মাকে বললাম।

—কী হয়েছে?

—মানে কালতো আমার জন্মদিন তাই বলছিলাম কী . ... .

—আচ্ছা, উনি আসুন ওঁকে বলবো'খন।

—বাবাকে বলতে যেয়ো না মা। বাবা রাজি হবেন না।

—আমি বুঝিয়ে বলবো।

যা বলেছিলাম ঠিক তাই হলো। বাবা বললেন, গরুছেলের জন্মদিন পালন করা আমার হিসেবে নেই। ও-রকম বাজে ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে এসো না। ও যদি কোনোদিন ভালো হয় তবে আমি নিজেই করবো, তোমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না!

— ছেলেটা যখন বলছে, একটা আবদারও তো থাকতে পারে ওর।

— ছেলে বলছে তবে আর কী! দেখো, আমাকে দিয়ে বেশি বকিও না।

—তাহলে তুমি ..

—আমাকে কী পাগল করে তুলতে চাও? বলছি, এ-সবের মধ্যে আমি নেই। তোমার গুণধর পুত্রের জন্মদিন তুমি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পালন কর ... . দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনলাম। মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখা হলো।

রাত্রে কার যেন স্পর্শ পেলাম। চেয়ে দেখি দিদি।

—সমী! আমি তোর জন্মদিন করবো।

—না দিদি, তা হয় না। খাবাপ ছেলের জন্মদিন পালন করলে সংসারে কোনও আদর্শই স্থায়ী হয় না। বাবা ঠিকই বলেছেন! বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেললাম। দিদি চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললো, কাঁদিস না ভাই।

সকাল ন'টার পরে দাদা ও তার বন্ধু গ্রেট টেলর এলো। রোববার। তাই সকলেই বাসায়। দাদা, মা ও বাবাকে প্রণাম করে তাঁদের সঙ্গে গ্রেটকে পরিচয় করিয়ে দিল। গ্রেট টেলর-ও পায়ে হাত দিয়েই মা ও বাবাকে প্রণাম করলো।

—আমার বোন তমা, বি.এ পড়ছে, পরিচয় করিয়ে দিল দাদা।

—নমস্কার! হাত দুটি জোড় করে টেলর বললো।

দিদিও প্রতি নমস্কার করলো তাকে।

—এই আমার ছোট ভাই সমী! স্কুল ফাইনাল পাশ করে আর পড়েনি। ভীষণ আড্ডাপ্রিয়।

ভেবেছিলাম গ্রেট টেলর "আড্ডা"কথাটি বুঝবে না কিন্তু সে বললো,—Are you a naughty boy ? No-No! just a gentleman! বলেই হাতখানি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। কাঁপা হাতটি এগিয়ে দিলাম টেলরের হাতের মধ্যে। সেখানে গিয়েই থামলো।

গ্রেট টেলরের বয়স আটাশ হবে। আবার ছাব্বিশও হতে পারে। লম্বায় ছ'ফুট প্রায়। ফর্সা রং, সোনালী চুলগুলি ব্যাকব্রাস করা। চোখের তারাদুটি ইষৎ কটা। টেলরের সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসটি আমাকে ভালোলাগায় সেটি হলো তার হাসি। ফর্সা দাঁতগুলি ঝকঝক করে। বয়সের মানুষকে হাসলে যে শিশুর মতো সুন্দর দেখায়—আমি এই প্রথম দেখলাম।

গ্রেট বাবার সঙ্গে গল্প করছে। আমরা রান্নাঘরে গেলাম। গিয়েই বললাম, দাদা! তোমার সাহেব যে দিব্যি বাংলা বলে!

—বাংলাতেই যে ও এম. এ পাশ করলো। ভীষণ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। 'টেগোর' বলতে অজ্ঞান। ওই কারণেই শান্তিনিকেতনে এসেছিল।

দিদি, খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো বাবার ঘরে। চা নিয়ে গেলেন মা। জলের গ্লাসটা নিতে দিদি আবার আসবে তাই মা আমাকেই ওটা নিতে বললেন। ঘরে ঢুকতেই টেলরের গলা শুনতে পেলাম, অধ্যাপক হবার আশা আমার ছোটবেলা থেকেই, সে-কারণ...

—Very good! বাবা আনন্দে বলে উঠলেন। জানো, কেউ যদি পড়াশুনায় ভালো হয় বা সম্মানজনক কাজ পায়—তবে সে ছেলে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক শুনতেও ভালো লাগে।

বিকেলে টেলর চলে গেল। কলেজস্কোয়ারে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। সমস্ত কাজ করে দেবার জন্য একটি ছেলেও পেয়েছে। টেলর যখন চলে যায়, তখন বাবা বাসায় ছিলেন না। সে মাকে প্রণাম করলো। বললো, আমি এবার যাচ্ছি।

—খবর দিতে পারবো না, ঘরের ছেলের মতো যখন খুশি তখনই আসবে, মা-ও বললেন তাকে।

—আচ্ছা মা! টেলর হাসলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চলি সমী, কেমন?

— টেলর আমার কাছেও বিদায় চাইলো। চলে যাবার সময় আমার কাছেও তাহলে বলে যেতে হয়। এতোদিন কেউ আমাকে এমন ভাবে বলেনি। আত্মীয় স্বজন কেউ নয়। তাই মনোবনে টেলরের ছোট্ট কথাটি যথেষ্ট খুশির দোল দিল, "চলি সমী কেমন?"

—আপনারাও কিন্তু আমার ওখানে যাবেন। সঞ্জীব বাসা চেনে। রাস্তায় পা দিয়ে গ্রেট বললো।

—যাবো। ছোট্ট করে উত্তর দিল দিদি।

দু'দিন পর টেলর এলো। আমাদের পড়ার ঘরে। দিদি কী যেন লিখছে। আমি পড়ছিলাম একটি গল্পের বই। লিও টলস্টয়ের "ওয়ার এন্ড পিস"-এর বাংলা অনুবাদ।

—কী লিখছেন আপনি? স্নিগ্ধ হেসে টেলর জিজ্ঞেস করলো দিদিকে।

—একটা প্রবন্ধ। জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল দিদি।

—And Sami! What are you doing brother?

—No-no, আমি কিছুই করছি না। শুধু পড়ছি "No এবং Yes"-এর বেশি ইংরাজিতে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য একেবারেই যে অসম্ভব তাই-বা বলি কী করে। আসল কথা সাহস পাই না। কী জানি ক'ডজন ভুল বলে বসি। এ-তো বাঙালির সাথে বলছি না, বলছি ঠিক আসল জায়গাটিতেই।

—Can you write ? হুট করে টেলর প্রশ্ন করলো।

—Yes। তবে কী জানেন, ওই ছোটো-ছোটো দু-একটা গল্প-টল্প লিখি আর কী! বাবা, দিদির মতো বড়ো বড়ো উপন্যাস লেখা আমার কল্পনার বাইরে। আর যাই হই ওঁদের মতো অতো বড়ো হতে পারবো না।

—Why not! অবাক হলো টেলর। কিন্তু মহাফাঁপরে পড়লাম আমি। এবার কী উত্তর দেবো? 'No অথবা yes' কোনওটা বলেই এবার রেহাই পাওয়া যাবে না। আড়চোখে দিদির দিকে তাকালাম।

যদি টেলরকে আমার অবস্থা একটু বুঝিয়ে বলে।।

—দিদি নীরব অর্থাৎ তাব দ্বারা হবে না। দিদির নীরবতা দেখে বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হলো আমার অক্ষমতার কথা।

—I say why not? বেশ জোবে বললো টেলব।

—আপনি সবার সাথে পরিষ্কাব বাংলা বলেন অথচ আমার বেলা কেবল ইংরেজি?

—Difficulty......... টেলর আরও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলতে দিলাম না। কেন-না ওই টুকুরই অর্থ আমি জানি। (হয়তো পরেরটুকুই জানবো না) তাই আপাতত উত্তর দিলাম—ঠিক ধরেছেন, কষ্ট হয় বুঝতে।

—বাংলাতেই বলবো। উত্তাল হেসে উঠলো টেলর।

কিন্তু যে-প্রসঙ্গ ঢাকবাব জন্য এতো খড়কাঠ পোড়ালাম আবাব সেই কথাতেই ফিবে আসতে হলো।

—তোমার দাদা, বাবা ও দিদি লেখেন, তুমি কেন পারবে না?

—আমাকে যে ওঁরা কেউ দেখিয়ে দেয় না।

নিশ্চয়ই কেউ দেখিয়ে দেবেন না। কেউ কাউকে দেখিয়ে শুনিয়ে বড়ো করতে পারে না। বিশেষ করে সাহিত্য। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখো, মনে জোর আনো। এ-গুলিই তোমাব ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলবে। একটা কথা আছে ঃ **Man is the Archetect of his own fate। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে অর্থাৎ কী না ভাগ্যের রচয়িতা নিজেই।** তবে সাফল্য লাভ কবতে হলে সাধনা চাই, প্রতিভা চাই আর চাই সেই প্রতিভাকে শিক্ষাব আলোকে আলোকীত করে পরিপূর্ণ বিকাশ করা। তোমাকে লিখতে হবে; বড়ো হতে হবে।

দিদি টেলরকে নিয়ে ওপরে গেল। আমি তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। সুন্দর জিনিসকেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু এই সৌন্দর্যেরও একটা পরিবেশ আছে। নইলে সুন্দরকেও সুন্দর দেখায় না। দিদি যদি ওব রূপ নিয়ে একা ঘবে বসে থাকতো তাহলে ওকে তেমন লাগতো না। কিন্তু সুন্দব টেলরের পাশে দিদিকে কী সুন্দরই না লাগছে। ওদেব দুজনকে এক সঙ্গে দেখে আমার এ-কথা মনে হলো। তবে দিদিকে কিছু বলাব সাহস পাই না। বললে হয়তো নিশ্চয়ই ওর ভালো লাগবে তবুও মুখে একবার ধমক দিতে কিছুতেই ছাড়বে না।

এক ঘণ্টা পর ফিবে এলো দিদি ও টেলর। আগেব থেকে ওবা যেন একটু বেশি ঘনিষ্ঠ বলে আমার মনে হলো।

—কী ভাবছো সমী? টেলরের প্রশ্ন এটি।

ভাবছি আমি কী লেখক হতে পারবো? আমার মতো তুচ্ছ......

—না-না-না ও-সব তুচ্ছ-টুচ্ছ নয়—

—আপনি নামেও গ্রেট কাজেও গ্রেট। আমি যে বিগ্রেড।

কথা শুনে হেসে দিলো টেলর। বললো, আসলে কী জানো; আমাদের মন অল্পতে মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। তুচ্ছকে আরও তুচ্ছ মনে কবি। কিন্তু সমী! তুচ্ছের মধ্যে যে উচ্চ নেই—এমন কথা কেউ না-বলতে পারে? তুচ্ছের মধ্যেই বহু মূল্যের চিহ্ন। বিরাটেব অঙ্কুরই তুচ্ছ।

দিদি, টেলরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে কথাগুলি শুনছিল আর আমি সত্যি বড়ো হবার একটা নতুন স্বাদ পেয়ে স্মিত হাসলাম। এমন ভাবে যে অপবকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেয়, তার নিজের জীবনের আশা না-জানি কতো বড়ো। কিন্তু কতো বড়ো? কতোখানি? কতোখানি বিরাট? অদম্য কৌতুহল কিছুতেই পারলাম না দমন করতে। জিজ্ঞেস করলাম,—

আপনার জীবনের ইচ্ছে কী?

—টেগোরকে ভালোবাসি,—তাঁর দেশেই মরতে ইচ্ছে হয়—

—মৃত্যুই কী শেষ?

—আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুর পরেই সব শেষ। কিন্তু সত্যিই তা নয়। শেষের

পরেও অশেষ আছে। মৃত্যুর পরেই আরম্ভ হয় নতুন জীবন। কাপড় ছিঁড়ে গেলে আমরা নূতন কাপড় পরি, পূর্বের কাপড়টিকে ছেড়ে দেই। ঠিক তেমনি আত্মাও আমাদের দেহকে রুগ্ন মনে করে ত্যাগ করে বটে কিন্তু আত্মার তো মৃত্যু হচ্ছে না।

টেলবের সঙ্গে যতো কথা বলি ততোই যেন চোখ ফুটছে। ইচ্ছে হয় অজানারে জানতে। মনে হলো আমি যেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসে পৌছালাম। এরপর টেলর আর বেশিক্ষণ থাকেনি। সন্ধ্যার পরেই চলে গেল।

জানিস দিদি! টেলর যে সাহেব এ-কথা আমি প্রায়ই ভুলে যাই।

—উনি কী তোর ছোট?—বললো দিদি।

বুঝলাম দিদির ঠিক জায়গাটিতে লেগেছে। সুতরাং রাগানো উচিত নয়। বললাম, তুই বুঝিস না দিদি। আমার অবস্থাটা একটু চিন্তা কর। এদিকে টেলরদা বলা যায় না, আবার What news Mr. টেলর বলে সম্বোধন করাও যায় না। ঠিক ওই কারণেই কোনও সম্বোধন করি না। আপনি বলেই সেরে দিই। হয়তো এতে টেলর, সরি দিদি! টেলরদা মানে উনি আমাকে বেশ খানিকটা অভদ্রই...........

—থাম তুই। একটু ভালো হতে চেষ্টা কর সমী। সবাইতো তোর রূপ জানেই এবার অন্য কারো কাছে সেটা আর জাহির না-করলি।

"অন্য কারও কাছে" যে কার কাছে তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি লাগেনি। দিদি টেলরের কথাই বলছে। বললাম,—টেলরের কাছে থাকলে আমার ভালো হতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে চলে গেলে আমার সেই Good will-টা মন থেকে কেন জানি চলে যায়।

খুব ভোরেই বাজারটা সেরে এলাম। বাজার রেখে বললাম মা! ছ'আনা পয়সা নিয়েছি।

—বলতে লজ্জা হচ্ছে না?

—সত্যি কথা বলতে লজ্জা কীসের?

আমাকে আর জ্বালাস না........

—পয়সা নিতাম, আবার তা ঢাকবার জন্যে একগাদা মিথ্যে কথা বলতাম অর্থাৎ দুটো অন্যায়েব অপরাধী হতে হতো। তার চেয়ে সত্য বলে একটি অন্যায়ের.........

দিন দিন রাজার বাঁদর হচ্ছিস।

বাবা চলে গেলেন অফিসে ন'টার আগেই আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ঢুকলাম পাড়ার 'মিনতি কাফেতে'। প্রোপ্রাইটার সাহা বয়সে আমার ঠাকুর্দা তাই নাতির মতোই আলাপ জমাবার চেষ্টা করি! প্রত্যহ মিনতি করি তবুও ঠাকুর্দার মন টলাতে পারিনি। একেই বলে বুড়ো মন! ঠাকুর্দা বাকি টাকা রাখবেন না। এমনকি একসঙ্গে দুটাকা খেলেও নয়,—পাড়ার ছেলে হিসেবে তো নয়ই। তবে ঠাকুর্দা ব্যবহার খারাপ করে না। তা করবে কেন? ব্যবসাদারদের ওটাই যে কল।

একদিন দোকানে বসে চা খাচ্ছি। বছর তেইশ-চব্বিশের এক যুবক এলো। তার মাথার চুলের সঙ্গে তেলের বহুদিন হয় ভীষণ আড়ি। উস্কোখুস্কো চুলগুলি হাওয়ার সঙ্গে তালে তালে নাচছে। যেন প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। গায়ের রং তামাটে। গলায় পাশ দিয়ে ময়লার পুরু চড় জমেছে। পরনে স্যুট অবশ্য নামে স্যুট। তা যেমনি ময়লা, তেমনি আবার হাজার ছেঁড়া! তাই স্থানে স্থানে ছোট-বড়ো আকারের তালি মারা। ময়লা নেকটাইখানা গলা ছেড়ে মাথায় উঠেছে। অর্থাৎ মাথায় বাঁধা। পায়ে ছেঁড়া বুট জুতা। Dada! will you spare two annas for me? আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

পাগল বলে যাকে ভেবেছিলাম তারই মুখ দিয়ে কী না বেরুলো ইংরেজি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে! শুনতে ভুল করিনি তো?

—কী দাদা একটা চা হবে?—আবারও প্রার্থনা।

—বসুন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে বসলাম। রামকে বললাম আর একটা চা দিতে।

—Many thanks. একটা বিড়ি হবে?

নরেন বাবুর (ঠাকুর্দা বলা যেতে পারে) কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে ওকে দিলাম।

ঝুলন্ত জ্বলন্ত দড়ির অগ্রভাগটি মুখের কাছে এনে লোকটি ধরলো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, জানেন দাদা! বিড়ি খেয়ে আরাম নেই—সিগারেটই ভালো।

কথা শুনে একবার ওর মুখের দিকে তাকালাম।

—কী? ভাবছেন এতো নবাব হলাম কবে থেকে তাই না?

—তা কেন ভাববো,—কিন্তু টাইখানা গলায় না-বেঁধে মাথায় বেঁধেছেন কেন?

—ওটা কী এখন টাইয়ের মর্যাদায় আছে দাদা! স্রেফ দড়ির কাজ করছে। আবার ওষুধও বটে।

—মানে? ঠিকমতো ধরতে পারলাম না

I mean—মাথা ধরলেই ওটা দিয়ে বাঁধি। ওষুধ কিনে তো খেতে পারবো না—আর মাথা ধরা আমার সারাটা দিন থাকে।

লোকটার কথার ধরন দেখে তাজ্জব বনে গেলাম।

রাম লোকটির হাতে চা এনে দিল। নিঃশব্দে দুটি চুমুক বসালো সে।

—আপনার নাম? এক সময়ে জিজ্ঞেস করি।

Kindly Dada ওইটাই জিজ্ঞেস করবেন না, আমি নাম গোত্রহীন। আমার কোনও পরিচয় নেই সমাজে। তবে নিজের কাছে আমার পরিচয়, আমি গ্রাজুয়েট।

—আপনি গ্রাজুয়েট! সত্যই এবার আশ্চর্য লাগে!

একটা পাগল বলছে সে গ্রাজুয়েট! বিশ্বাস হচ্ছে না তো? এই দেখুন। লোকটা তার পকেট থেকে সার্টিফিকেটগুলি একে একে বেব কবলো। বললো, আপনার দোষ নয় দাদা—আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না।

লজ্জা হলো খুব। একটা পাগলের কাছেও আমি.......

চা খাওয়া শেষ হলে লোকটি বললো, দাদা! আজ আমাকে সবাই বলে পাগল। ঠাট্টা করে, হাসে, কেউ কেউ ঢিলও ছোড়ে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কোথায় আমার দোষ? Where is my fault? হ্যাঁ! মস্ত বড়ো দোষ, আমি বংশ পরিচয় হীন, Now I am a vagabond। আমি অনাদরের পাত্র। অপমান আর লাঞ্ছনা আছে উপরি পাওনা। শিক্ষিত হলেও রেহাই নেই দাদা—যেহেতু পরিচয় নেই। আচ্ছা! সে-পরিচয়টা কী এতোই বড়ো? আমি মানুষ! এটাই যথেষ্ট নয়? আমি কী সারা জীবন এমনি ভাবে সবার উপহাসের পাত্র হয়ে থাকবো? সমাজে নাকি আবার জ্ঞানীগুণী লোক বাস করে? But I do not believe that they are wise men, হাঃ হাঃ হাঃ! বিকট হাসিতে ভেঙে পড়ে লোকটি!

আমি চমকে উঠলাম। লোকটা বলে কী? এ যে চিরন্তন জিজ্ঞাসার ঝড়। লোকটা শিক্ষিত অথচ স্থান নেই কোথাও। দুঃখ হলো ওর জন্য। আহা, ওর কী দোষ! সমাজই তো ওকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত করছে। কেড়ে নিয়েছে অধিকার। করেছে ওকে পঙ্গু। হাত-পা ভাঙলেই কী পঙ্গু হলো? আস্ত একটা জীবনকে ভেঙে দেওয়া কী পঙ্গু থেকে কোনও অংশে কম? আমার মন নাড়া দিয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো, ওকে সুস্থ জীবনে বসিয়ে দিই। ভুলিয়ে দিই ওর দুঃখ। এও জানি, বাস্তবে তা সফল করে তুলতে পারবো না। শুধু বললাম, ছোট পরিচয়ের কী দরকার। আপনার পরিচয়, আপনি স্বাধীন ভারতের নাগরিক!

—What do you mean by citizen? নাগরিকের কী অধিকার আমাকে দেওয়া হচ্ছে?

অনুতপ্ত হলাম। কার কাছে কী বলতে গেলাম?

আরেকটা বিড়ি দেবেন?

বিড়ির পরিবর্তে এবার একটা সিগারেটই দিলাম।

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না অযাচিত এই সিগারেটটাকে।

—আচ্ছা চলি দাদা! অনেক উপকার করলেন।

—কী-ই-বা করলাম।

—বলেন কী? সবার মুখঝামটা আর রক্ত-চক্ষুর তাকানো এতোদিন পেয়ে এসেছি। তার পরিবর্তে আজ আপনি চা খাওয়ালেন, বিড়ি দিলেন, সিগারেটও দিলেন। উপকার নয়!

সংসারে কতো বিচিত্র রকমের লোক দেখা যায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের এতো দিয়েও শান্তি নেই অর্থাৎ তৃপ্তি পাই না। সবার মুখের এক কথা,—আরও দাও। অথচ এই লোকটি! অল্পতে কতো খুশি। কতো সহজে এদের মন পাওয়া যায়। এদের দিয়েই তৃপ্ত হয় মন।

—তোমার গুণধর পুত্র এলেন, ঘরে পা দিতেই বাবার গলা শুনতে পেলাম। বাবার গলা শুনবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। প্রথমে বিশ্বাসও হয়নি....বিশ্বাস হলো তখন যখন বাবা সামনে এসে দাঁড়ালেন। সত্যিই আমার কপাল খারাপ। তা নইলে সব কাজেই এমনকী নিশ্চিত কাজেও এমন বিপদ হবে কেন? খেয়ে-দেয়ে সুস্থ শরীরে বাবা অফিসে গেলেন। সন্ধ্যার আগে যিনি ঘরে ফিরবেন না সেই মানুষ অফিসে যাওয়ার এক ঘন্টা পরেই ফিরে এলেন বাসায়। মন্দ কপাল ছাড়া আর কী?

আড্ডা দেওয়া চলবে না। বাবা দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছো তাই বুঝছো না কোথায় আছো! কিন্তু আমরা তো চিরদিন থাকবো না। এতো আড্ডাটা কীসের শুনি? ওরা কী তোকে খেতে দেবে? রাস্তা যদি এতো মধুরই হয় তবে সেখানেই থাকলে ভালো হয় না কী? আমি তো কোনও বাধা দিচ্ছি না—

অফিস থেকে দাদা এল। বিশ্রাম করে, খেয়ে নিয়ে সে দিদিকে জানালো, যাবি না কী টেলরের বাড়ি?

—তা আমি কী জানি? দিদি উত্তর দিল।

—দাদা, তুমি না এমন প্রশ্ন করো যে উত্তরই হয় না, আমি বললাম।

—তুই থাম। পরে দিদিকে বললো, কাল টেলর আসবে তোরা যাস। আমার সময় থাকলে আমিই নিয়ে যেতাম—

পরদিন বিকেলের পর টেলর এলো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে সে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে টেলরকে।

—বাঙালিবাবু যে! মা সম্বোধন করলেন।

—হ্যাঁ মা! এই পোশাক খুব ভালোবাসি আমি।

দিদির ঘরে গিয়ে আমি ও টেলর বসলাম। মা গেলেন চায়ের আয়োজন করতে। দিদি তখনও বেরোয়নি বাথরুম থেকে। টেলরের আসবার আগে সেই যে ঢুকেছে। বেরুবার নাম নেই। কী যে স্নান করে অতো সময় ধরে বুঝি না।

ভিজে কাপড় গায়ে লেপ্‌টে দিদি ঘরে ঢুকলো। টেলরকে দেখে ও ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলো। বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো ঘর থেকে। টেলরের দিকে তাকালাম। সে-ও বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছে।

আমি, দিদি ও টেলর তিনজনে রাস্তায় বের হলাম। টেলরের হাতের ইশারায় একটি ট্যাক্সি এসে থামলো সামনে। আমি তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম। খারাপ হই আর যাই হই সেটা কথা নয়। আসল হচ্ছে মানুষ মাত্রেই তার ইচ্ছা আছে। দিদি ও টেলরের মধ্যে যদি ভালোবাসা হয়, সত্যি আমি খুব খুশি হবো। তারই সুযোগ করে দিলাম আজ। অবশ্য নিজের দিদিকে তো চিনি। বড্ডো বেশি ওর লজ্জা। মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু টেলর। সে তো ইংরেজ। বাঙালিদের মতো তার লজ্জা হওয়া মোটেই উচিত নয়। একটু সংশয় এসে জমা হলো। কারণ একটু আগেই শুনেছি মার মুখে, টেলরকে বলেছিলেন বাঙালিবাবু। অর্থাৎ টেলরের সব কিছুই তবে বাঙালিদের মতো। তার মানে সরমটাও।

একটা কিছু দেখার আশায় পিছন ফিরে তাকালাম। আমার গুপ্ত নিচু মনের পরিচয় পেয়ে কে যেন সজোরে পিঠের উপর চাবুক মারলো। যা কল্পনায় একেছিলাম সে-দৃশ্য কোথায়? দিদি ও টেলরের মধ্যে এতোখানি পার্থক্য যে সেখানে অনায়াসেই একটি লোক বসতে পারে। আমি যেন

অনুভব করলোম, আমি ছোটো। ভয়ও হলো। টেলর বুদ্ধিমান। সে যদি আমার চালাকী ধরতে পারে? কিন্তু সত্যিই তো ওদের ধরবার জন্য এমন করিনি। বরং খুশিই হতে চেয়েছিলাম। মা ঠিকই বলেন— তোর কপালটাই খারাপ সমী—ভালো কাজ কবলেও ঠিক দেখবি তা খারাপে পরিণত হয়ে গেছে।

টেলরের বাড়ির সামনে এসে পৌছলাম। টেলর, আমাদেরকে তার ঘরে নিয়ে গেল। এক পাশে একটি খাট, মাঝে টেব্‌ল। তার চার পাশে সোফা। খাটের মাথার দিকে রয়েছে এক আলমারি ভর্তি বই।

—বসুন। পরে টেলর ডাকলো তার চাকর জিমকে।

—বলুন, একটি বছর কুড়ি বয়সের ছেলে।

—এ-যে বাঙালি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। দেখলাম ছেলেটি মুচকি হাসছে।

—ধরেছো তুমি ঠিকই সমী। আসলে ওর নাম জীবন। কেটে ছেটে সোজাটাই রাখলাম।

—ওটা যে সাহেবী নাম?

—আমি নিজে সাহেব। আর আমার কাছে যে থাকবে.......কী জানো ও-নামে ডাকলে ও নিজেও খুব খুশি।

—Sir একটা কথা বলার ছিল, জিম বলে।

—Sir কেন? আমি জিজ্ঞেস করলোম।

—ওই জানে। হ্যাঁ কী, যেন বলছিলে তুমি? টেলর বললো।

—একটি accident হয়েছে, জানালো জিম।

—কী রকম?

—আপনার দুধ সব বেড়োলে খেয়ে গেছে। খুব safely রেখেছিলাম। মারবার জন্য তাড়াও করেছিলাম কিন্তু বেড়োলটা এমনিই clever যে টুপ্ করে pavement এর উপর এক লাফ। এবার থেকে আপনার direction মতো চলবো।

জিম তার কথা শেষ করলো। হাসিতে ভেঙে পড়লাম আমি আর দিদি। বেশ লাগছিল শুনতে জিমের ইংরেজি বাংলা মেশানো কথাগুলি।

টেলর বললো, পারুক-না-পারুক প্রতিটি কথায় ওর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা চাই-ই! ইংরেজি শিখবার আগ্রহ আছে খুব। শুনে শুনেই একরকম...।

—আচ্ছা আচ্ছা। টেলর আবার বললো, এঁদেব খাওযার কী ব্যবস্থা করবে জিম?

—Sorry sir! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—

—শোনো, বাঙালি খানা করবে কিন্তু।

—জানি sir। দিদিমণির চুল দেখেই বুঝেছি, বব্ নেই। টুক করে বেরিয়ে যায় জিম ওরফে জীবন।

আমরা যখন বিদায় নেবো তখন আর একবার এলো জিম। বললো, আপনাদের তেমন welcome করতে পারলাম না, ক্ষমা করবেন।

—বাড়িতে ফিরে এসেছি। বললাম, দিদি!

—কী?

—টেলরদা কী সুন্দর তাই না-রে?

—তার মানে? চোখ পাকালো দিদি।

—টেলরদার বাড়ির সামনেই তোর কলেজ, আমি বললাম।

-বড্ডো ফাজিল হয়েছিস সমী। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। ভয়ডর বলে দেখছি কিচ্ছুই নেই!

এরপর আর ওর সঙ্গে কথা বলা চলে না। বাধ্য হলাম চুপ করতে। দিদির হয়তো আমার কথাগুলি শুনতে ভালোই—মানে মিষ্টি লাগছিল তবুও অপছন্দের ভনিতা একটু করবেই। মেয়েদের

স্বভাব যাবে কোথায়? নিজের দিদি বলে কী সত্যি কথাটাও বলবো না?

পরদিন বিকেলে 'মিনতি কাফেতে' আমাদের আড্ডা বেশ জমলো। অফিসে হাজিরার মতো সব বন্ধুই একে একে উপস্থিত হতে লাগলো।

—ও মশাই! শুনছেন আমার কথা? ভদ্রলোক, নিতান্তই অপরিচিত এক ভদ্রলোক, আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে—তাও আবার অজানা কাউকে এমন ভাবে যে কেউ সম্বোধন করতে পারে—তা আমার কল্পনার বাইরে। ভদ্রলোকের মাথায় কিছু উপকরণ আছে বলে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হলো।

—এতো চিৎকার করছেন কেন? আমি শান্ত হয়েই বললাম।

—কী বলছেন? আগের আওয়াজকেও এবার ছাড়িয়ে যায়।

—আপনার মাথা-টাথা মানে Head-এ গোলমাল নেই তো? জয় রসিকতা করে।

—কী বলছেন? আবার সেই চীৎকার!

আমি হঠাৎ কেন জানি বুঝতে পারলাম যে, লোকটি অবশ্যই কানে কম শোনেন। বোঝাটা ভুল হলো না।

—অতো জোরে কথা বলছেন কেন? আমিও লোকটির মতো চিৎকার করে বললাম। বন্ধুরা সবাই আমার এই আচমকা পরিবর্তনে বুঝি বা-একটু অবাক হলো। তাকালো আমার মুখের পানে। কথা না-বলে চোখ দিয়েই যেন বলতে চাইছে, তুই আবার আরম্ভ করলি কেন? আমিও ইশারায় ওদের জানালাম যে, ঠিক পথেই যাচ্ছি।

—আজ্ঞে, আমি কানে কম শুনি। লোকটি বললেন।

—তা আমরাও কানে কম শুনি বলে কী আপনার ধারণা হলো?

—হে হে কথাটা কী জানেন, নিজে কম শুনি বলে মনে হয়, অন্য সবাইও........

—কম শোনে। অজিত জুড়ে দিল।

—ফলে আপনেও চিৎকার করেন। শালা বয়ড়া! ছোট্ট করে ভেংচি কেটে দীপু বললো।

—কী বললেন?

—আপনারে কই নাই।

—যাক গিয়ে, কী বলতে এসেছিলেন? ভদ্রলোকের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ইতি টানতে চেষ্টা করলাম।

—এক ভদ্রমহিলাকে খুঁজতে এসেছিলাম। এই ঠিকানা হচ্ছে গিয়ে চারের-এ হরিশ মু.......

— ব্যাস, ব্যাস, 'মিস' স্বপ্না ঘোষের বাড়িতো? দীপু বললো।

—আজ্ঞে, ঠিক ধরেছেন। লোকটি হাসলেন একটু।

—বড্ডো মিস করলেন আপনে। এক্ষুনি মানে কয়েক মিনিট আগেই তিনি এই রাস্তা দিয়া.....

—চলে গেছেন বুঝি?

—এখনও সন্দেহ আছে না-কী? আপনে দেখছি মশয় বড়ো লেটে বোঝেন। এখন আমাগো সঙ্গে বক্‌বক্ না-কইরা রাস্তা দেখেন পথেতে হয়তো 'মিসকে' 'মিস' নাও করতে পারেন।

—মানে?

—এরমধ্যে আবার মানেরে-টাইন্যা আনেন ক্যান? তার মানে পাইয়াও যাইতে পারেন। আপনে মশয় বড়ো....

—লেটে বুঝি। ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। ঝড়ের গতিতে চলে গেলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী আরম্ভ হয়েছে। আগামীকাল এক সভাতে বাবা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। আর দিদি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবে। এ-সব কথা আমি দিদির মুখেই শুনলাম। শুনে মনের একদিকে বইছিলো অফুরন্ত আনন্দের পূর্ণ জোয়ার। আরেক দিকে দুঃখও হচ্ছিলো কম নয়।

আমিই কিছু হতে পারলাম না। সব থেকেও আমি যেন একা—দল ছাড়া। সে-দলে প্রবেশ লাভের জন্য যে গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক, তা আমার মোটেই নেই। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে কল্পনার রঙীন জালে মধুর স্বপ্ন এঁকে চললাম। চোখের সামনেই যেন দেখতে পেলাম, সাহিত্যিক সমীকে। শুনলামও কে যেন মাইকে ঘোষণা করলো, এবার আপনাদের সামনে যিনি উপস্থিত হচ্ছেন, তিনি আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। বাঙলা সাহিত্য-বাসরের একচ্ছত্র সম্রাট সাহিত্যিক শ্রীসমী..........পুরো নামটাও হয়তো শোনা যাবে না। কেন-না ততোক্ষণে দর্শকরা তীব্র হাততালি দিয়ে বারবার অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাহিত্যিক সমী স্টেজের উপর দাঁড়াতেই ছোট্ট একটা মেয়ে হয়তো-বা ফুলের একটা মালা নিয়ে ছুটে আসবে গলায় পরিয়ে দেবার জন্য। বক্তৃতা দেবার সময় কোথাও কোনও প্রকার শব্দ নেই। সবাই চুপ করে মন দিয়ে শুনছে। যেন ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা মায়ের কোলে ঘুমে ঢলে পড়েছে। উঃ, আর ভাবা যায় না! সত্যই যখন হতে পারবো না তখন কতোক্ষণ আর মিথ্যার জাল বোনা যায়? তাতে মনের কষ্টের সীমাকে বাড়িয়েই দেওয়া হয়। ভীষণ দুঃখ হয়। যেমন এখন হচ্ছে। মনে হয় একসময় প্রবল ইচ্ছা জাগে। পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যিক মর্যাদা না-ই-বা পেলাম, ক্ষতি নেই, অন্তত লেখক আমাকে হতেই হবে। বাবা, দাদা, দিদি—সবাই লেখক, পাঠক শুধুমাত্র আমি-ই? এবার থেকে নিশ্চয়ই লিখবো। আর লিখলে লেখক হতে পারবো না কেন? চেষ্টার অসাধ্য কী? সাধনায় আবার অসম্ভব বলে কিছু আছে নাকি? তাছাড়া লেখার রক্ত যে আমার প্রতিটি শিরায় উপশিরায়। আমি না-লিখলে, না-চেষ্টা, না-সাধনা করলে অমনি কেউ আমাকে অবশ্যই লেখক বানিয়ে দেবে না। অতোএব আমার ভাগ্যকে আমাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। টেলর সেদিন আমাকে বলেছিল 'A man is the architect of his own fate.' কথাটা যদিও বহু পুরনো তবুও টেলর যেন আমাকে সেদিন নতুন করে শুনিয়েছিল, কানে দিয়েছিল বীজমন্ত্র, আমার ভিতরকার ছোট্ট লেখক হবার বাসনা-রূপ অঙ্কুরকে মহীরূপে পরিণত হবার।

বিকেলে টেলর এলো। বাবা তাঁর নিজের পড়ার ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। আমি সে ঘরেই চুপ করে বসে আছি মুখোমুখি। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করছি টেব্‌লের উপরকার বইগুলি। বাবা বাসায় থাকলে সেদিনটা আমার মাটি হয়। একটি মুহূর্তের জন্যও বাইরে বেরুতে পারি না। যারা খারাপ, তাদের আবার আনন্দ কী। এটাই বাবার মতো। খুঁতখুঁতে মনে, বিষণ্ণ মুখে সারাটা দিন কেটে যায়। কেবল ভাবি কখন দিনটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে, বাবা অফিসে যাবেন। সত্যি কথা বলতে কী, বাবার পরিবর্তে যদি অন্য কেউ হতো—এমনকি দাদাও যদি হতো তাহলে মনে মনে এতোক্ষণ কতো যে গালাগালি দিতাম, তা শুধু একমাত্র আমিই জানি!

—আরে এসো, এসো গ্রেট, বসো। বাবা বললেন।

—আপনার লেখার কোনও অসুবিধা করলাম না তো? টেলর ভদ্রতা রক্ষা করলো।

—No, no my dear boy, now I am quite free. লেখা এইমাত্র শেষ করলাম।

—কালকে হাওড়ায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। বাবা প্রধান অতিথি হবেন। টেলরকে জানিয়ে বাবাকে খুশি করতে চাইলাম।

—আমি কিন্তু তবে আপনাদের সঙ্গে যাবো। টেগোরের জয়ন্তী উৎসব দেখবো, বলে উঠলো টেলর।

—নিশ্চয়ই যাবে। কালকে এসো, ঠিক চারটের মধ্যে। সেজন্য এক্ষুনি কিন্তু তোমাকে চলে যেতে বলছি না। বাবা প্রশান্ত হাসি হাসলেন। সে-হাসিতে টেলরও যোগ দিলো। হাসি আসছিলো আমারও। কিন্তু চেপে রাখলাম। নয়তো হাসলে পরে বাবা বলতেন, মূর্খ হয়ে বিজ্ঞের মতো হাসতে শিখলি কবে থেকে?

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে টেলর তাকাচ্ছিল দরজার দিকে। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেখতে চেয়েছিল লাল কিম্বা সবুজ রংয়ের শাড়ি পরা একটি মেয়েকে, যার নাম তমা। আমি বুঝলাম। বুঝে একটু দুঃখ হলো। কেন-না দিদি আজকে বাড়িতে নেই, কোথায় যেন গেছে।

পরদিন টেলর এলো, ঘড়ির বুকে তখন চারটি আঘাত পড়ছে। একেই বলে সময়জ্ঞান! ঝুল-

বারান্দায় যে-কটি বেতের চেয়ার ছিল তারই দুটিতে আমি ও টেলর বসলাম। একটু পরেই দিদি এলো। সেদিন যতো সুন্দর দেখাচ্ছিল দিদিকে, ততোখানি সুন্দর আর কোনোদিনও লাগেনি। আমার মনে হয়, ওর সাজসজ্জা প্রসাধন ইত্যাদি আধুনিক ফ্যাসানের নয় বলেই অতো সুন্দর লাগে! তাছাড়া রয়েছে দিদির রূপ। দিদির পরনে ধবধবে সাদা রংয়ের জর্জেটের ব্লাউজ আর জর্জেটের শাড়ি। চুল বেঁধেছে তাও সাদা ফিতায়। যেন একখন্ড শুভ্র মেঘ নেমে এসেছে আকাশের কোল ছেড়ে আমাদের ঝুল-বারান্দায়। আমি তাকালাম টেলরের দিকে। ওর চোখে কোনও চঞ্চলতা প্রকাশ পায় কি-না তা লক্ষ্য করবার জন্য। হয়তো আমার ভয়ে, ভয়ে অবশ্য ঠিক নয় আসলে লজ্জায় কেউ কারো দিকে বিশেষ তাকালো না।—অথচ তাকালেই যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই তা যদি জানতো!

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাবা এলেই আমরা রওনা হবো। একটু পরেই বাবা এলেন। আমরা চারজন পিছনের সিটে বসলাম। চালকের সামনের সিটে বসে কমিটির দুজন ভদ্রলোক। আমি ও বাবা দুজনে দু'কোণে বসলাম। মাঝে বাবার পাশে দিদি এবং আমার পাশে টেলর। গা ঘেঁষে বসা সত্ত্বেও দিদি বা টেলর কেউ তাকাচ্ছে না কারো দিকে। ওদের এ-সব দেখলে আমি অস্বস্তি বোধ করি। মন খারাপ হয়। কেন ওরা....এমন'তো হবার কথা নয়, কিন্তু কেন হলো? আমি এতোক্ষণ বুঝতে পারিনি যে-গাড়ির মধ্যেই বাবা রয়েছেন, আর বাবার চোখ দুটিও মোটেই অন্ধ নয়।

স্টেজের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের বিরাট একটি ছবি। মালা-চন্দনে অতি যত্নে তা সাজান। লোকে লোকারণ্য। একটি আসনও খালি পড়ে নেই।

—এবার আপনাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন প্রখ্যাত কবি তমা চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ মাইক চিরে কথাগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

দিদি ওর স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করলো ঃ

গিরিরাজ হিমালয়, পৃথিবীতে বিস্ময়
তুমিও তাই, সন্দেহ নাই।
পৃথিবীর কবি তুমি শ্রেষ্ঠ। রূপকার—
লেখা তোমার শাশ্বত, চিরন্তন সত্য।
তোমার লেখার স্তূপ যেন একটা পাহাড়—
আবার মহাসাগর,
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে করেছে প্রবেশ, চির উন্মুক্ত তোরণপথে
মহান সৃষ্টিতে তোমার।
আকণ্ঠকাব্যসুধা পানে, শান্ত হয় মন, কতো চিন্তা মনো-বনে
প্রকৃতি-বিশ্ব তুমি-আমি, একান্ত হয়ে যাই
কি যাদু আছে, জানি না
তোমার লেখায়।
নব-নব উন্মেষশালিনীর রসে ডুব দেয়নি কে এখনও আছে?
পাঠের পিপাসা আর জ্ঞানের সীমা
তুমি ছাড়া কে মিটাবে ক্ষুধা?
তুমি কবি দার্শনিক,
লেখক বৈজ্ঞানিক, নাট্যকার চিকিৎসক
গীতিকার প্রাবন্ধিক, সুরকার গায়ক,
আর চিত্রাঙ্কনে—
তোমার তুলনা, তুমি নিজে।

অপূর্ব হয়েছে দিদির আবৃত্তি। শ্রোতারা জানালো তাদের অভিনন্দন। টেলরও হাততালি দেবার জন্য হাত দুটি উঁচু করে একবার আমার দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই সে তার হাত দুটি নামিয়ে নিলো ধীরে ধীরে।

রাত্রে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঘুমতে যাবো এমন সময় দাদা ডাক দিল, সমী! কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটু অবাক হলাম। বাড়ির কেউই আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। দিদি অবশ্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু বলে। তাছাড়া দাদার সুরেতেও কেমন জানি একটু পার্থক্য লক্ষ্য করলাম।

—কী কথা, দাদা? জিজ্ঞেস করলাম।

—এবারে তুই কলেজে ভর্তি হয়ে রীতিমতো পড়াশোনা চালিয়ে যা। সময়টাকে শুধু শুধু নষ্ট করে কী লাভ?

—বাবা আর পড়াবেন না বলেছেন। খুব আস্তে বললাম।

—বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

— বেশ, আসছে বছরেই ভর্তি হবো।

—হ্যাঁ, ভাই! একটা কথা জানবি, লেখাপড়া না-শিখলে কেউ ডেকেও কথা বলবে না, এমন কী একান্ত প্রিয়জনরাও না।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন টেলরের বাড়িতে গেলাম। জিম অভ্যর্থনা করলো।

—কিছু News আছে না কী Sir?

—তেমন কিছু নেই। তোমার Sir কই? বাড়িতে আছেন?

—No

আরম্ভ হলো এবার ইংরেজির পালা। সাহেবের কাছে থেকে যতো না ইংরেজি শুনি তার চেয়ে বেশি শুনি তার চাকরটির কাছ থেকে।

—কখন আসবেন জানো?

—No. জিম হাসে।

টেলর এল বেশ কিছুক্ষণ পর। হাতে কয়েকটি বই।

—কলেজ থেকে ফিরলেন বুঝি? মৃদু হাসলাম।

—হ্যাঁ। তুমি কতোক্ষণ?

—যতোক্ষণ ধরে বসে আছি ততোক্ষণ.....

—আচ্ছা!— টেলর হাসলো। তুমি একটু বসো সমী, আমি জামা-কাপড়টা ছেড়ে......

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বৈকালী-আহার সেরে আমরা যখন বাড়ি থেকে বের হলাম তখন বিকাল শেষ হয়ে প্রায় সন্ধ্যার মুখে। গাছের মাথায় মাথায় দূরে কেমন জানি ছায়া নেমেছে। পাখিরা শুরু করেছে সন্ধ্যা সঙ্গীত। দুপুরের আকাশে যে-সমস্ত পাখিরা অক্লান্ত ভাবে ডানা মেলে ঘুরেছে তারাও একে একে ক্লান্ত হয়ে নেমে আসছে ধরণীর বুকে, নিজেদের ছোট্ট কুলায়।

হঠাৎ টেলর থমকে দাঁড়ালো। দেখতে পেলাম, পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে আছে, একটি ভিখারিনী তার কোলের শিশুকে আদর করছে, সে-দিকে! শতছিদ্র একটি ময়লা শাড়ি ভিখারিনীটির গায়ে জড়ানো। শিশুটি উলঙ্গ। মা আদর করছে সন্তানকে, আর শিশুটি আহ্লাদে হাসছে মিটমিট করে। নিষ্পাপ শিশুর সরল হাসি! হাসার সঙ্গে সঙ্গে সামনের নতুন ওঠা দুটি দাঁত উঁকি দিচ্ছে। দৃশ্যটি অপরূপ! কিন্তু কতোখানি যে গভীর তা আমরা একবার চিন্তা করেও দেখি না, এমনকি দেখেও দেখি না। কিন্তু একজন বিদেশি, টেগোর ভক্ত টেলর, তার চোখে সে-দৃশ্য গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। সে বুঝেছে, এটি একটি চিরন্তন দৃশ্য হলেও চির-নতুন, শ্রেষ্ঠ দৃশ্য! তাইতো টেলর কেমন মুগ্ধ নয়নে দেখছে। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে শিশু হয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হলো। ছোটোবেলায় আমিও নিশ্চয়ই ওই রকম আদর পেয়েছিলাম....

ওদের শত অভাব-অভিযোগ পুঞ্জিভূত, হয়তো দিন কাটে অর্ধাহারে অনাহারে কিন্তু তবুও সন্তান আদর করার সময় মায়েদের কেমন বুক ভরা স্নেহ ভালোবাসা! —আমি বললাম।

—হ্যাঁ সমী, তাইতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। মায়ের স্নেহ আর শিশুর হাসি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। একটা বহুমূল্যবান জিনিস হারালাম।

—কী?

—এই হাসিটি! যদি ধরে রাখতে পারতাম—

—কিন্তু ক্যামেরা কই?

—ঠিক ওই কারণেই হারালাম। চলো যাওয়া যাক—

বেড়ানো শেষ হলে টেলরকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। বাস এলো পর পর দুটি! আমি কিন্তু উঠতে পারলাম না একটিতেও। উঠবো কী করে? ভদ্রভাবে দাঁড়ানোর কথা দূরে থাক— যেখানে লোকেরা বাদুড়ঝোলার মতো জীবনটাকে হাতের মুঠোয় রেখে চড়ে সেখানে ওঠাও অসম্ভব। বাসের প্রবেশ পথ দুটি মানুষের পিঠের সাহায্যে একেবারেই বন্ধ। অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। বাড়ি যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে বাদুরঝোলা মানুষগুলিকে দেখতে লাগলাম। আমার পাশেই একজন বিধবা ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। মিথ্যে বলবো না—বিধবা বলেই আমি তার মুখ দেখবার একবারও চেষ্টা করলাম না। আমি যে-বাসে যাবো, উনিও বোধহয় সেই বাসেই যাবেন। বাসে উঠতে গিয়েই তা দেখলাম। কিন্তু বাসেতে ওঠা আর হলো কই? স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাত করে দিলাম।

পরের বাসটিতেও একই অবস্থা। আমি জানি যে ওটাতে আমি উঠতে পারবো না, তাই মিথ্যা চেষ্টা না-করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিধবা ভদ্রমহিলাকে দেখলাম, উঠবার আশায় এগিয়ে যেতে........কিন্তু তিনি তো মশা মাছি হয়ে ঢুকতে পারবেন না বা ম্যাজিকও জানেন না ভিড় বাসে উঠবার, অতোএব ফেরত এলেন যথাস্থানে। এবার আমি অন্যমনস্কের মতো মহিলার মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে কোনও অপরাধ কবিনি। বরং না-তাকালেই ভুল হতো! ভদ্রমহিলাব মুখের দিকে তাকালাম বলেই আজকের মতো সীমাকে হারাতে দিলাম না। কিন্তু ও বিধবা হলো কবে? আব বিয়েই-বা.........অসংখ্য প্রশ্ন মনের কোণটিতে এসে একে একে ভিড় করলো। কলকাতায় ও কবে এসেছে, কেন-ই-বা এসেছে? থাকেই-বা কোথায়? আত্মিয় টাত্মিয় এখানে থাকে বলে তো কোনোদিন শুনিনি! আশ্চর্য লাগছে সীমাকে দেখতে। ছেলেবেলার কতো কথা মনে পড়ে। একদিনেব ঘটনা। আমি পুকুবের পাড়ে বসে মাছ ধরছি আর মাছ ওঠার আগের মুহূর্তগুলি কাটাচ্ছি মুড়ি-গুড় খেয়ে। সীমা এলো। বললো,—এই, দেনা রে আমাকে দুটো মুড়ি।

—না! আসলে ওকে দেবাব ইচ্ছে ভীষণ।

—অমন করে 'না' বলিস না সমী! তোর মন এখন ভালো নেই তাই.......

—মন আমার খুব ভালো আছে!

—তবে না করছিস কেন?

—তুই চাইলেই তোকে দিতে হবে—এমন নিয়ম আছে না কী?

—আমি যা খাই, তোকে কোনোদিনও না-দিয়ে খেয়েছি? সীমা অভিযোগ করে।

—তা দিয়েছিস।

—তবে?

—কী তবে?

—আমি তোকে দিই, আর তুই আমাকে দিবি না?

—বেশ দেবো, তার আগে একটা কথার উত্তর দিতে হবে।

—তোর সব প্রশ্নের উত্তর এখন দেবো।

—তুই আমাকে ভালোবাসবি?

—যাঃ! ও সবতো বড়ো হলে করতে হয়।

—তুই কিচ্ছু জানিস না, ছোট হলেও কোনও দোষ নেই। ও-পাড়ার খোকন তো বকুলকে..........

—তুই কী করে জানলি?

—খোকন যে আমার বন্ধু। সে আমাকে সব বলেছে। আরও বলেছে, বকুলকে না-দিয়ে ও কিচ্ছু খায় না। বকুলও ওকে দেয়।

—তুই তো আমাকে কিছুই দিস না। সেই কখন থেকে দুটো মুড়ি চাইছি—না-দিলে কেমন করে ভালোবাসবো?

—এই নে, টোপর মেলে ধর। আমার সমস্ত মুড়ি-গুড় সীমার আঁচলের কোণে ঢেলে দিলাম।

—তুই খাবি না সমী?

—না, তুই খা।

—তবে কী করে ভালোবাসবো?

—কেন, একটু আগেই না-বললি, খোকন বকুলকে দেয়, বকুল খোকনকে দেয়! তুই, আমাকে দিলি এবার আমি তোকে দিই!

—এমন করে দেওয়া নেওয়াই হোক আর কী!

—দুজনে একসঙ্গে খাবো! সীমা হাসলো!

—সেই ভালো—

এমনি করেই সীমার সঙ্গে আমার ভালোবাসা হয়। বৎসরের চাকায় ছয়টি ঋতু একে একে পার হয়ে পৃথিবীর আয়ু তিনটি বৎসর কমিয়ে দিলো। একদিন সীমাকে ডেকে বললাম, এবার থেকে আমরা আর 'তুই' বলবো না—ভারী বিশ্রী লাগে শুনতে।

—তবে কী বলবো, আপনি? ওটাও আমার খারাপ লাগে। সীমা জানালো।

—দূর বোকা! ভালোবাসা হলে কী আপনি বলে। তোর বাবা, তোর মাকে কী বলে?

—'তুমি' বলে।

—আমার বাবাও, মাকে তুমি বলে।

—কিন্তু বাবা-মার যে বিয়ে হয়েছে!

—আমি তোকে ভালোবাসি, পরে বিয়ে করবো।

—ও! তাই বুঝি এখন থেকেই তুমি বলতে হবে? তা হবে না, যখন বিয়ে হবে তখন তুমি বলবো—

—না! এখনই—

—কিন্তু তুই বলাটাই তো সহজ।

—তাহলে আমাকে ভালোবাসতে আসিস না—

—বাবা রে বাবা, একটুতেই রাগ! 'ভালোবাসবো', 'তুমি' বলবো—এবার হয়েছে তো?

—তুমি ভীষণ ভালো সীমা! ভী-ষ-ণ.........

—কিন্তু আমাদের বিয়ে কবে হবে?

—আর একটু বড়ো হয়েনিই, তারপর। ছোটোবেলায় ভালোবাসা করলেও বিয়েটা হয় বড়ো হয়ে।

—ও! বলেই সীমা চলে গেল।

সেই সীমার বিয়ে হয়েছে, বিধবাও হয়েছে। আর ভাবতে পারছি না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি সীমা না? মন থেকে সব চিন্তা দূর করে বললাম।

—হ্যাঁ আমি সীমা, তাতে হয়েছে কী?

সুরে ঝাজ মেশানো। এ-রকম বেয়াড়া উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

—এমন ভাবে কথা বলছো কেন? কোনও অন্যায় করেছি কী?

—নিশ্চয়ই করেছো। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, একটু চিনতেও পারলে না—দেখতে কী এতোই খারাপ হয়ে গেছি?

—রাগ কোরো না, ভুলও বুঝো না। আমি সত্যই তোমাকে........

—তা, চিনবে কেন? আমি যে..........

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। রূঢ় হলেও সত্য কথাই বলেছে সীমা। আমাকে যে ও

সম্পূর্ণরূপে পাঠ করেছে।

—আসলে কি জানো, তুমি যে এখানে, এই ভাবে.......

—থামো তুমি। ধমকের সুর পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

—বেশ থামছি, কিন্তু তুমি এখানে কী করো, কবে এসেছো, থাকো কোথায়?

—স্কুল মাষ্টারি করি, এক বছর হতে চললো এসেছি, কালীঘাটে থাকি।

—তুমি কী এমন মেপে মেপে কথা বলবে আমার সঙ্গে?

—যা জিজ্ঞেস করেছো, তারই তো উত্তর দিলাম—

—শুধু নিজে থেকে কিছু বলছো না! ছোট্টো করে বললাম।—চলো, তোমাকে পৌছে দিই—

—তোমার কোনও অসুবিধা হবে না তো?

—একথাটা অন্তত আমাকে বলা তোমার....খুব কথা শিখেছো যা হোক—

—উঁহু শিখিনি—শিখতে বাধ্য হয়েছি।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে সীমাকে বললাম, আমার টিকিট আবার তুমি কাটতে গেলে কেন?

—তবে কি, আমার একারটা কাটবো? ও, তুমি হলে বুঝি তোমার একারটা কাটতে?

—না, তা বলছি না—

—কি বলছো তবে?

—বলছিলাম প্রথমদিনে না—হয় আমাকেই দুটো কাটবার অধিকার দিতে!

গলির মুখের বাড়িটায় সীমা থাকে। একখানা মাত্র ঘর। রান্না করবার জন্য একফালি জায়গা! ভাড়া পনেরো টাকা।

—এটুকু জায়গায় তোমার অসুবিধা হয় না?

—অসুবিধা আর কী—একা মানুষ!

—তোমার বাবা কেমন আছেন? অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম।

—আছেন নয়—স্বর্গে গেছেন! অতি সহজেই কথাটা বলতে পারলো সীমা।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—করো! সীমা, আমার মুখের দিকে তাকালো।

—কিছু মনে করবে নাতো?

—না।

—তোমার স্বামী মারা গেছেন কবে.......

—বিয়ের একমাস পর।

বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম! দরজা পর্যন্ত সীমা এলো! আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

—কিছু বলবে? সীমা প্রশ্ন করলো!

—হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছিলাম—

—কি কথা?

—ঠিক মনে আসছে না।

—আসছে, তুমি চেপে যাচ্ছো—

—আচ্ছা—

—হ্যাঁ বলো। সীমা আগ্রহ প্রকাশ করলো।

—আগে যে চোখে দেখতে এখন নিশ্চয়ই সে-চোখে আর আমাকে দেখো না। অনেক কমে গেছে তাই না?

—ঠিক তাই নয়—বরং বেড়েছে।

সোজা বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। কালীঘাট থেকে ভবানীপুর খুব বেশি দূর নয়। হেঁটেই অনায়াসে বাড়ি পৌছলাম।

দিদিকে কিছুই জানালাম না। জানালে নির্ঘাত বলবে—সমী, তুইও প্রেম করিস! সবাই সব করতে

পারে শুধু আমার বেলাতেই দোষ! আমি যে খারাপ! অতি সোজা হিসেব।

অনেকদিন পর টেলর এলো। মা বললেন, তুমি কিন্তু অনেকদিন পর এলে টেলর।

—আমার দোষ নয় মা। ছাত্রদের পড়াতে হলে নিজেকেই বেশি পড়তে হয়। তাই সময় পাই না।

টেলরের গলা শুনে দাদা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—এই যে Brother, এসো—

—তুমি কিন্তু ঠিক Brother-এর মতো কাজ করছো না।

—কেন? দাদা জানতে চাইলো।

—কেন-র কোনও উত্তর নেই। তবে বলতে পারি খবর না-দিলে স্বেচ্ছায় তুমি কখনও আমার বাড়িতে যাও না—This is very bad!

—সত্যি টেলর, মোটেই সময় পাই না।

—দেখো, আমি মাঝে মাঝে আসি, তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমার সময় আছে?

—আমি তা বলছি না—আমি মনে করছি, তুমি কর্তব্যপরায়ণ। তুমি........

—একে কিন্তু কথা ঘুরানো বলে। টেলর হাসলো।

—তোমরা ঘরে গিয়ে বসো—আমি খাবার নিয়ে আসছি। মা জানালেন।

ছুটির দিনে দুপুরবেলা আমরা সবাই খেতে বসেছি। পরিবেশন করছেন মা। খেতে খেতে এক সময় বাবা বললেন, পরশুদিন তমা-র জন্মদিন। আর কালকেই ওর নূতন উপন্যাসখানা বেরুচ্ছে। প্রকাশক সেদিন আমায় বলেছিলেন, বইখানি যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। আর সব কৃতিত্বটুকু আমার মায়ের। বাবা দিদিকে কোনও সময় 'তমা' কোনও সময় 'মা' বলে আদর করে ডাকেন। বাবা ওকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, তাই তো ডাকেন। এটা অন্যায় আমি তা কখনও বলি না। তবে আমি কোনোদিন বাবার মুখে আমার নামের সংক্ষেপিত আদর ভরা ডাক শুনিনি। 'সমী' বলে যখন তিনি ডাকেন, মনে হয় আমার প্রতি বিরক্তিতে তার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ।

—মা, তোর কলেজের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিস। সঞ্জু, তুমি টেলরকে বলবে।

—কয়েকদিন ধরে আমি মোটেই সময় পাচ্ছি না বাবা। বলেই দাদা আস্তে আস্তে বললো, একটা ফোন........

না-না ফোন নয়—ওটা খারাপ দেখায়, জানাতে যখন হবে, তখন সময় তোমাকে করে নিতেই হবে।

সব থেকে দুঃখ লাগলো, বাবা এবার নিজে থেকেই দিদির জন্মদিন পালনের জন্য......অথচ আমার বেলায় বাধ সেধেছিলেন। বিস্তর পার্থক্য স্নেহের। এ-পার্থক্য কোনোদিনই এক হয়ে মিশে যাবে না। আমি কিন্তু দিদিকে হিংসে করছি না। এতটুকুও না। সে-রকম শিক্ষা বাবা-মার কাছে পাইনি। আর নিজের দিদিকে হিংসে করার মতো অতোটা হিংসুক মন এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, আমি ভালো হলে বাবা নিশ্চয়ই আমার জন্মদিন পালন করতেন। দিদিকে বলার মতোই বলতেন, সমু, তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করো।

পরদিন বিকেলেই দিদির উপন্যাসখানা বেরুলো। কয়েক কপি দিদি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বাড়িতে।

কলেজ যাবার জন্য দিদি তৈরি হতে লাগলো। দাদা এসে জানালো, তমা, তুই কলেজ থেকে গ্রেটের বাড়ি যাস। নিমন্ত্রণ করে আসিস। আজ আর আমার সময় হবে না। সময়মতো আজ বাড়ি আসতে পারবো কী না তাও সন্দেহ!

—তুমি গেলেই ভালো হতো। শাড়ির কুচির অংশ দিদি কোমরে গুঁজে দিল।

—যেতে পারছি কই? তুই যাস—

দাদা চলে যেতেই দিদি পাউডারের পাফটা মুখের উপর একবার বুলিয়ে নিল। ছোট একটা

কুমকুমের টিপ পরলো দুই ভ্রুর মাঝখানে। প্রসাধন শেষ হলে সদ্য প্রকাশিত ওর লেখা এককপি উপন্যাস পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সাজিয়ে রাখলো।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমি তা দেখলাম!

—দিদি, এ-খানা আবার কাকে দিবি?

কোনও উত্তর না-দিয়ে দিদি আমার দিকে একটু তাকালো।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর না-দিয়ে অমন করে তাকাস কেন রে?

—সব উত্তরই কি তোকে দিতে হবে?

—ও! আমি চুপ করে গেলাম।

যে-উপন্যাসখানা নিয়ে এতো কথা, দিদি চলে যাবার সময় সে-খানা ওর বিছানার উপর ফেলে গেল। আমার কান্না আসছিল দিদির ব্যবহার দেখে। আমি পরিষ্কার জানতাম, বইটা টেলরকে দিতো। কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়ার জন্য আমি সেটা ওর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। দিদি আমাকে ভুল বুঝলো। কিন্তু আমার উপর রাগ করে টেলরকে দেওয়া ওর সম্ভব হলো না। এ-রাগের কী মানে? কেন দিদি বলতে পারলো না, টেলরকে দেবো। এতে কী আমি এতোটুকু অসন্তুষ্ট হতাম?

কলেজ থেকে দিদি টেলরের বাড়িতে যখন গেল তখন টেলর ঘরে নেই। জিম জানালো, Sir স্নান করছে।

—স্নান আমার শেষ হয়েছে জিম। গায়ে তোয়ালে জড়াতে জড়াতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো টেলর। দেখতে পেল দিদিকে। আপনি কখন এসেছেন? টেলর মৃদু হাসলো।

—এই মাত্র।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

—না, বসবো না, আমি এসেছিলাম আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে। আজকে আমার জন্মদিন। শেষের কথাটি খুবই আস্তে বললো দিদি।

জন্মদিনে নিমন্ত্রিত অতিথিরা চলে গেলেন, একমাত্র টেলর ছাড়া। টেলর দিদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ দিয়েছে।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা, মাকেও আমাদের সঙ্গে বসতে বলেছিলেন কিন্তু মা কিছুতেই বসলেন না। আমাদের আগে না-খাইয়ে তিনি কখনওই খান না।

—বাবা! আপনি তো কিছু দিলেন না, দিদি হাসলো।

—নিশ্চয়ই দেবো মা। একটি জিনিস তো সর্বদাই করছি, সেটি হলো আশীর্বাদ। আর একটা কী দেবো, বলোতো?

—পেন। আমি বলে উঠলাম।

—তুই কী করে জানলি? বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনার পড়ার টেব্‌লে নতুন একটা পেন দেখেছি—

—তমা! যা দেবার আমি তোকে কালকে দেবো। আজ কিনবার সময় করে উঠতে পারিনি,—দাদা বললো।

মা হেসে বললেন, লজ্জায় কী আগে থেকেই স্বীকার করে ফেললি সঞ্জু?

—তা নয় মা। কী করবো বলো। সব কাজ এখন একা আমাকেই করতে হয়। Assistants-রা আসছে না গত সপ্তাহ থেকে—

—বাবা! দিদি ডাকলো।

—কি মা?

—সমী, আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে।

—ও আবার কী দেবে! বাবা অবাক হলেন।

আমার যে প্রাণ আছে, মন আছে, এ-কথা বাবা বিশ্বাস করতে চান না। কেন যে চান না,

সে-আমি বুঝি না।

—এই দেখুন না—বলেই দিদি আমার দেওয়া একটা পৃষ্ঠা বের করে পড়তে লাগলো।

"দিদি! তুই সুন্দর হ তুই বড়ো হ। তোর নাম আরও ছড়িয়ে পড়ুক। ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। আমি উপার্জন করি না, তাই আজ শুধু কালো-কালির লেখা একটি পৃষ্ঠা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।"

দিদির পড়া শেষ হলে সবাই হাসতে লাগলো। এমনকি বাবার মুখেও একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তুই লিখেছিস?

—জানালাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। এরপর আর কোনও প্রশ্ন বাবা আমাকে করেননি।

টেলর সে-রাত্রে চলে গেল। মা বলেছিলেন থাকার জন্য। কিন্তু টেলর বললো, জিমকে জানিয়ে আসা হয়নি—সে খুব চিন্তা করবে।

রাত্রে ট্রেনের বুক-ভরা ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম চাকার শব্দ। ঝিক্‌ঝিক্-ঝিক্‌ঝিক্। গানের সুরের মতোই শোনালো সে-শব্দ। ঘুম আর এলো না। ট্রেনের ওই আকুল ডাক শুনলে কেন জানি আমার মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। কেন এমন হয়? কী জন্য, কার জন্য? এ-সব কিছুই জানি না, শুধু দুঃখ হয়। মনে হয়, আমি একা, ভীষণ একা। জগতের অপর একটি মানুষের সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই। ট্রেনের মতো আমিও একস্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াই। কী যে একটা অজানা বেদনার সুর ধ্বনিত হয় তা কী করে বোঝাবো? এ-সব কথা আমি কাউকে বলি না। না-বলার কারণ, আমার এ-কথার কোনও যুক্তি নেই, তাই কেউ আমার মতো একান্ত ভাবে অনুভব কবতে পারবে না।

বিকেলের দিকে সীমার বাড়িতে গেলাম।

—এতদিন পর আসা হলো। অভিযোগ করলো সীমা।

—মনে তোমাকে ঠিকই রেখেছি। ওকে ভুলাতে চেষ্টা কবলাম।

—শুধু মনে রাখলেই চলবে? খাওয়ার কথা মনে রেখে সারাদিন তুমি না-খেয়ে থাকতে পারবে?

—আচ্ছা! মাষ্টারি করলেই কী কথা জানতে হয় না আপনি এসে যায়!

—আসোনি কেন এতোদিন তাই বলো? রীতিমতো জেরা শুরু করলো সীমা।

—সত্যি বলছি, সময় পাইনি।

—ইস্, ভারিতো কাজের মানুষ।

—তুমিও কী আমাকে অকেজো ভাবো?

—কেন, আর কেউ ভাবে বুঝি?

—আর কেউ মানে—বাড়ির সবাই। সবার ধারণা আমার দ্বারা কিছু হবার নয়। ছোট বেলায় চোর-চোর খেলার কথা মনে আছে তো, আমি হলাম সেই এলেবেলের দলে। যার কোনও মূল্য নেই। একটু থেমে বললাম, আমি গতকালই আসতাম কিন্তু ওই দিনটা আবার দিদির জন্মদিনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই একটু ব্যস্ত ছিলাম।

—স্বাভাবিক। কেমন গম্ভীর শোনালো সীমার গলা। তমাদি কেমন আছে?

—ভালো আছে। বাবা-মা, দাদা এবং আমিও ভালো আছি।

—চুপ করো তুমি। তোমার কথাতো আমি জানতে চাইনি।

—নিশ্চয়ই চেয়েছো আর চেয়েছো বলেই আমাকে উহ্য রেখেছো—যাক গিয়ে ও-সব উহ্য-টুহ্য। তোমার জন্য কী এনেছি বলোতো?

—আমি গণকঠাকুর নই।

—নাই-বা হলে, আন্দাজ করতে দোষ কি? ঠিক লেগে যাবে।

—নাও তো লাগতে পারে।

—দেখো, আমার সঙ্গে যখন তুমি কথা বলবে, তখন স্মরণ রাখবে যে তুমি একজন শিক্ষিকা নও। ছাত্র বুঝাচ্ছো না—পরিষ্কার সহজ ভাবে বলবে। কোনওপ্রকার হেঁয়ালি করবে না—বলেই

পকেট থেকে এক ঠোঙ্গা মুড়ি বের করলাম। এই নাও—

—কী? সীমা চোখ তুলে প্রশ্ন করলো।

—এমন কিছু নয়। মুড়ি।

—বাব্বা, এখনও মনে আছে।

—আমি কোনওকিছুই ভুলি না।

—ইস্ ভারী গর্ব, দেখা যাবে—

চা মুড়ি খেয়ে উঠে পড়লাম।—এবারে চলি কেমন?

—আর একটু বসবে না—

—না, হাতে আর সময় নেই, পরে আবার আসবো।

—আচ্ছা! করুণ শোনালো ওর গলা। আরও বললো, তুমি কী তাড়াতাড়ি আসবে, এমন দেরি করে এলে কিন্তু....

—আর দেরি হবে না।

বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেদিন আর হাঁটতে ভালো লাগছিল না, তাই বাসে উঠলাম। কপালে ভালো করে একটা গুঁতো খেতেই ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি ওয়েলিংটনের মোড়। নেবে আর কী করবো, টেলরের বাসাতো সামনেই, সেখানেই যাওয়া যাক। নূতন করে আবার একটা টিকিট কাটলাম। টেলর বাসায় নেই। কলেজ থেকে ফেরেনি তখনও।

—টেলরদার আসতে কী রোজই এতো দেরি হয়?

জিমকে জিজ্ঞেস করলোম।

—না Sir, আজকেই হচ্ছে। জিম জানালো।

—আচ্ছা জিম। তোমাদের মধ্যে তো অল্প বয়সেই বিয়ে হয়। তাই না?

—হ্যাঁ Sir. জিম একটু মুচকি হাসলো।

—তা তোমার বিয়ে হয়েছে কী?

—হ্যাঁ Sir। জিম এবার লজ্জায় মাথা নিচু করলো।

—বেশ, বেশ! ভালো কথা।

—হ্যাঁ Sir, রাণী সত্যই বেশ। কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে হয় কিছু বুঝি না। ভীষণ রেগে যায়, আমাকে 'হিট' পর্যন্ত করতে ছাড়ে না.......

—সে কী! তুমি কিছু বলো না?

—কী আর বলবো Sir! তাছাড়া আমাদের মধ্যে মারধর করবার 'রুল' আছে। আর এ-সব কথা ছেড়ে দিলে, রাণী আমাকে love করে।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ Sir. প্রেম ইজ পিওর।

টেলর তখন ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে—আঃ চুপ করো জিম।

—ও অল্প দিনে এতো বেশি ইংরেজি শিখে ফেলেছে যে, আমার সঙ্গেও এখন সমানে চালিয়ে যায়, বললো টেলর।

—আমার কিন্তু বেশ লাগে ওকে, জানালাম।

—আমারও। জানালো টেলর!

টেলর জামা-কাপড় ছেড়ে আমার সামনে এসে বসলো। জিমকে বললো খাবার দিতে।

—আমি কিন্তু খেয়ে এসেছি টেলরদা!

—ভূমিকা রাখো, যা বলবো, তাই শুনবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আজ কিন্তু আপনার বাসায় আসতাম না।

—আমার অপরাধ? টেলর শান্ত হাসলো।

—অপরাধ ঘুমের। কালীঘাট থেকে বাসে উঠলাম। বাড়িতে যাবার জন্য। ঘুমের ফলে বাড়ির পরিবর্তে এখন আপনার বাড়িতে।

এমন সময় খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো জিম। আমার সামনে পরপর কয়েকটি প্লেট এগিয়ে দিল।

—সত্যি বিশ্বাস করুন টেলরদা, আমি এতো কিছুতেই খেতে পারবো না।

— টেগোরের দেশে এসে আমি এই একটা জিনিস বারবার লক্ষ্য করেছি যে, খাবার সময়ে সবারই যতো রাজ্যের ওজর আপত্তি।

—ওটাই 'কার্টসি' Sir।—জিম বললো।

—তাই না কি, তা হবে। কিন্তু সমী! আমার সঙ্গেও কী তোমার.....

—বেশ অন্য আর একদিন এসে এমন খাওয়া খাবো যে, ও-সব কার্টসি কোথায় ডুবে যাবে.....

আমার কথা শুনে টেলর হাসলো। সন্তুষ্ট হলে লোকে যেমন হাসে ঠিক তেমনি।

—জিম তুমি কিছু তুলে নাও।

—নাথিং এল্‌স। কিছু নেবো না Sir. আমার 'ফুড' ভিতরে আছে।

নিরুপায় হয়ে সমস্ত খাবারই অবশেষে আমাকে খেতে হলো। অতো খাবার আর কেউ খেতে পারলেও আমি পারি না। ছোটোবেলায় একটা ছোটখাট রাক্ষস থাকলেও তখন আমার খাওয়া খুবই কমে গেছে। আমার খাওয়া শেষ হলে টেলরের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

বাবা অফিসে চলে যেতেই আমি 'মিনতি কাফেতে' গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, চুপ করে বসে আছে সেই লোকটি।

—কখন এসেছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

—অনেকক্ষণ। আপনি আসছিলেন না তাই অপেক্ষা.......

—ও.....বসুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে—

—আপনার সঙ্গে তো দেখা হলোই, এখন আমাকে যেতে হবে।

—একটু পরে গেলেও খুব চলবে। বসুন তো। —তা আজকেও আপনার মাথাধরা আছে না কী? টাইখানা আজও যে মাথায় বাঁধা।

—আর বলবেন না, ওটা আমার চির সঙ্গী। কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না, আমিও তাই রেখেছি বেঁধে। দেখি, কেমন কবে পালায়?

—চা খাবেন তো?

আমার কথা শুনে লোকটা হঠাৎ কেমন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। ছলছল চোখে তাকালো আমার দিকে। মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো।

—কী হলো আপনার?

—কিছু না দাদা। কতোগুলি কথা মনে পড়লো এই যা—লোকের কাছে চাইতে চাইতে শিয়াল-কুকুর-বিল্লিবাচ্চা হয়ে গেছি। কাছে দাঁড়াতেই দূর দূর করে, চাওয়া তো বহু দূরে। এমনিতে আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু দাদা, অবসর সময়টাই আমাকে পাগল করে তোলে! দুঃখ হয়, নইলে......

লোকটির দু, চোখের কোলে জল ভরে উঠলো।

—কী হয়েছে বলুন তো?

—কিছু না। পরিষ্কার এড়িয়ে যাবার লক্ষণ।

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে, বলুন।

—হবে আবার কী! প্রাপ্য পাওনা পেয়েছি। গতকাল সকালে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। আর চা খাওয়াই হলো আমার কাল! পকেটে এক আনা পয়সাই সম্বল ছিল, তাই দিয়েই দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এগুতে পারলাম না বেশি দূর। একজন ভদ্রলোক দোকান থেকে ছুটে এসে আমাকে চেপে ধরলেন,

—চোর! চুরি করার আর জায়গা পাওনি। আমার, মানিব্যাগটা কোথায়?

—কাকে চোর বলছেন আপনি?

—না-না চোর হতে যাবে কেন, ধোয়া-তুলসীপাতা তুমি। বের করো মানিব্যাগ। রাগে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোকটি।

—দেখুন, লোকের পকেট থেকে মানিব্যাগই বলুন, আর যাই বলুন—এখনও চুরি করতে শিখিনি—অতোএব আমার কাছ থেকে আপনার হারানো ব্যাগ পাওয়ার আশা বৃথা।

—স্টুপিড— রাস্কেল.........

—গালাগালিতে আর যাই হোক— যে নেয়নি, তার কাছ থেকে ব্যাগ বেরুবে না—

—তবে রে, খুব কথা শেখা হয়েছে দেখছি.....

আমার চতুর্দিকে তখন ভিড় জমে গেছে। তারা সমর্থন করলো ভদ্রলোকটিকে। আর কী দাদা! চুরি করার মতো নোংরা কাজ না-করেও চুরি করার যে-শাস্তি তাই নীরবে আমাকে হজম করতে হলো। O' dear God! লোকটি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চলে গেল।

কয়েক দিন পরে লুন্দিপুরে যাবো, আমাদের গ্রামে। অনেক বছর যাই না। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।

লুন্দিপুর যাবার আগের দিন সীমার কাছে গেলাম। দরজায় তালা দেওয়া। বুঝলাম কোথাও বেরিয়েছে। পরে আসবো ভেবে আমি রাস্তায় পা বাড়ালাম। বেশি দূর এগুতে পারলাম না। মোড়ের মাথায় দেখা হলো তার সঙ্গে।

—একটা কাজে বেরিয়েছিলাম, বাসায় চলো সব বলছি।

—এইমাত্র তো এলাম।

—কিন্তু ঘরেতে তালা দেওয়া!

—যা বলার এখানেই—

—তোমার কথাই বড়ো থাকবে, আমার কথা কিছু নয়? তাছাড়া রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে রাজি নই।

বাধ্য হয়েই বাসায়। সীমা বললো, দিন দিন কী তুমি চাষা হচ্ছো?

—হঠাৎ এ-অভিযোগের কারণ?

—আবার কারণ জিজ্ঞেস করছো?

—বা-রে! একটা উপাধি দিলে অথচ কী গুণের জন্য দিলে তা জানতে ইচ্ছা করে না বুঝি?

—গুণ না ছাই!

—কিন্তু ওইরকম একটা উপাধি দেবার কারণটাতো বললে না? ও-রাস্তার ব্যাপারটা কী? আমি হাসলোম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি বলেই আবার হাসছো। দোকানদারগুলি কেমন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, লক্ষ্য করেছো কী? —ঠিক ওই কারণেই বলেছি চা—যা।

—চাষাই বলো আর ভুষাই বলো মানুষ তো ঠিকই।

—আমাকে মারো আর জেলেই দাও চোর তো ঠিকই।

—যোগ্য মাষ্টারণীই রেখেছে কর্তৃপক্ষ। ওদের তারিফ না-করে পারছি না—

—সাবধান! চোখ দিয়ে শাসন করলো সীমা।

—ওতে আমি ভয় পাই না।

—তা পাবে কেন? মার খেতে খেতে অভ্যস্ত, সামান্য চোখ পাকানোতে তোমার মতো লোকের কিছু হয় না।

—আমি যাচ্ছি, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম।

—কোথায় যাবে? চুপ করে বসে থাকো।

—আরে না-না, চা না-খেয়ে এখান থেকে আমি উঠছি না। আমি বলছি, কালকে আমি লুন্দিপুর

যাবো—

—ক'দিন থাকবে?

—ক'দিন আর, চার-পাঁচ দিন বোধহয়।

—একটা কথা বলবো, শুনবে বলো?

—শুনবো।

— তোমাকে দিয়ে যে আমার বিশ্বাস নেই। হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, সবাইকে বলে বসবে।

—না, বলবো না।

—আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছে, তা কাউকেই বলবে না।

—কেন?

—অমনিই কেন? বারণ করলাম, শুনবে। আর যদি না শোনো.......

—তবে? প্রশ্ন করলাম।

—তবে কোনোদিনও বারণ করতে যাবো না।

—আমি শুনবো না—এমন কথা কী বলেছি?

—আমি জানি, তুমি তা কোনোদিন বলবে না।

সীমার মুখ, মেঘ কেটে যাবার পর সূর্যের আলোর মতো হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠলো।

—চলি, কেমন?

—সে কী, চা খাবে না? এই যে বললে—

—লুন্দিপুর থেকে এসে খাবো।

—সীমার ওখান থেকে টেলরের বাড়ি গেলাম। লুন্দিপুর যাবার আগে ওর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। আরাম-কেদারায় আধশোয়া অবস্থায় টেলর কী যেন একটা বই পড়ছিল।

—কী বই টেলর দা?

—গীতাঞ্জলি। তারপর কি খবর বলো?

—খবরের মধ্যে একটি, আগামীকাল আমি আমাদের গ্রামে যাবো—লুন্দিপুরে। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—আসবে কবে?

—সামান্য কয়েকদিন থাকবো, আসছে সোমবারের মধ্যে আসতে চেষ্টা করবো।

—জিম! টেলর ডাকলো।

—You can say, sir! জিম আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলো!

—সমস্তটাই যে ইংরাজিতে বলে ফেললে জিম, আমি হেসে ওকে বললাম।

—এ-গুলি খুব সহজ Sir, তাই বললাম।

—সমীর জন্য খাবার নিয়ে..........

—আজ আমাকে মাফ করতে হবে টেলরদা। বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ জিম বলে উঠলো, আজকেও কি Sir 'স্লিপ' করতে করতে এলেন?

—না ভাই! আজকে awake করতে করতেই এসেছি।

তিনজনেই উত্তাল ভাবে হেসে উঠলাম আর ওই হাসির মধ্য দিয়েই আমি বিদায় নিলাম।

লুন্দিপুরে চিনুমাসির বাড়ি গিয়ে উঠলাম। এতোদিন পর আমাকে দেখে সবারই মনে আনন্দ হলো। আমার তো কান্নায় কান্নায় পূর্ণ।

—তুই অনেক দিন বাঁচবি সমী। আজ সকালেও তোর নাম করেছিলাম। সেই যে গেলি আর এই—বললো চিনুমাসি।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় আমি আর চিনু মাসির ছেলে রাতুল বেরিয়ে পড়লাম। পথে রতনের সঙ্গে দেখা।

—কী রে চিনতে পারছিস? আমি প্রশ্ন করলাম।

—তোকে চিনবো না। সেবার ফুটবল ম্যাচে, বল ছেড়ে আমার পেটেই দুম্ করে একটি লাথি বসিয়েছিলি, বললো রতন।

—হ্যাঁ ভাই, খুব অন্যায় করেছিলাম। আমি দুঃখিত।

—খুব যে ভদ্রতা শিখেছিস! আর আগে আধখানা পেয়ারা থেকেও ভাগ বসাতে ছাড়তিস না। সে-সব কী ভুলে গেলি?

—কিছুই ভুলিনি। ছেলেবেলাকার স্মৃতি! জীবনস্মৃতি! একটু থেমে বললাম, খোকনের খবর কী? তোর তো খুব বন্ধু ছিল।

— ও বেশ সুখেই আছে, বকুলকে বিয়ে করেছে।

—তাই নাকি! খুব আনন্দ হলো কথাটা শুনে।

—যাবি না-কি ওর কাছে?

—চল—অনেক দিন তো দেখিনি।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম আমাদের বাড়ির অবস্থা দেখে। চতুর্দিকে বড়ো বড়ো জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। প্রবেশ পথটুকু পর্যন্ত চেনবার কোনও উপায় নেই।

খোকনদের বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম। রতন ডাকতেই বেরিয়ে এলো খোকন।

—চিনতে পারছিস? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। যেন চিনতে পারছে না এমন ভাব খোকনের।

—বিয়ে করেছিস যে, চিনবি কেমন করে? নদীর ধারে বটগাছটার তলায় শুয়ে কার কাছে রোজ রোজ তোর বকুলের গল্প করতিস?

—সমী! তুই! আমাকে জাপটে ধরলো। কোট-প্যান্ট পরে দিব্যি সাহেব সেজেছিস কী করে চিনবো বল? হাফপ্যান্ট পরা ছাড়া তোকে যে আর অন্য কোনও বেশে......

বুকল কিন্তু আমাকে দেখেই চিনতে পারলো।

—তুমি দেখি ঠিক চিনতে পেরেছো, খোকন বললো।

—চিনবে না তো কী?

তোর মতো অকৃতজ্ঞ তো নয়, বলেই ফেললাম।

—বড়ো ভুল হয়েছে। লজ্জিত হলো খোকন।

—তোদের পুত্র-কন্যাদের দেখছি না যে—

—থাকলে তো দেখবি। বকুল লজ্জা পেয়ে চলে গেল।

—হয়নি বুঝি?

—না, তবে.........

—ও বুঝেছি........ছোটো করে হাসলাম।

মাঝরাতে শিয়ালের একটানা চিৎকারে ঘুমের ব্যাঘাত হলো। উঠে বসলাম শোয়া থেকে। কিন্তু বিরক্ত হলাম না। বিরক্ত হতাম যখন আমরা ওখানে থাকতে রোজই শিয়ালের ওই ডাক শুনতাম। বাঁশ-বাগানের ভেতরে ঝিঁঝি পোকার ঝিল্লী-রব শোনা যাচ্ছে। চাঁদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছে আকাশের বিরাট সভায়! ছোট ছোট তারাগুলি তাকে ঘিরে রয়েছে আর মিটমিট করে চোখ মেলে তাকে দেখছে। আকাশের কোল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার বাঁশ-বাগানের দিকে ছেড়ে দিলাম। পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে জল তরঙ্গের মতোই। জোনাকীরা নিজেদের খুশিমতো জ্বলছে নিভছে, আবার জ্বলছে আবার নিভছে। বেশ লাগলো দেখতে। কতোদিন রাত্তিরের এমন মোহনীয় রূপ দেখিনি। কলকাতায় এর স্বাদ কোথায়? ঘুমে চোখ দুটি ঢুলে পড়ছে। আর তাদের বাধা দেওয়া চলে না। শুয়ে পড়লাম। ঘুম নামতে খুব দেরি হলো না।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্যদেবের দেখা নেই। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে

গেছে! চারদিক অন্ধকার। ঠান্ডা বাতাস বইছে। আসন্ন বর্ষার রূপটি দেখবার জন্য জানলার পাশে সরে এলাম।

দূর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ ভেসে আসছে। যেন গান আরম্ভ হবার আগের বাজনাটুকু! হঠাৎ বৃষ্টির ছাট এসে আমার মুখাখানাকে ভিজিয়ে দিল। দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে ভরে উঠলো উঠোন, রাস্তা-ঘাট। বাড়ির পূর্বদিকে যে-শ্যাওলা জমা শীর্ণ পুকুরটি ছিল সেটা তখন বেশ পুষ্ট হয়েছে। হাঁসগুলি মনের আনন্দে প্যাঁক-প্যাঁক করে জলেতে নেমে গেল। কতকগুলি নাম-না-জানা পাখি ভীষণ ভাবে বৃষ্টির ভেজার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য জোরে ডানা চালিয়ে বাসার দিকে উড়ে চললো। মাঠের উপর গরু বাঁধা অবস্থায় ছিল। বেচারা মুক্ত হবার জন্য কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করলো, ডাক ছাড়লো কয়েকটি। কিন্তু কেউ যখন তাকে বৃষ্টিভেজার হাত থেকে রক্ষা করতে এলো না, তখন সে নিতান্ত নিরূপায় হয়েই বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অল্পবৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো। দুটি ছাগলশিশু বাড়ির পথে দৌড়াতে লাগলো। গলায় বাঁধা তাদেব ঘণ্টার টুং-টাং ধ্বনি যেন থেমে থেমে সুর তুলছিল। উঠোনের একপাশে যে-বড়ো গাছটি আছে তারই ডালে বসে একটি কাক অনবরত ডানা দিয়ে মাথা ঝাড়ছিল।

আকাশের দিকে তাকালাম। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যে আকাশ পরিষ্কার হবে তাও মনে হয় না। হঠাৎ ক্যাচর-ক্যাচর শব্দে রাস্তার দিকে তাকালাম। একটি গরুর গাড়ি বৃষ্টির জল কেটে কেটে পথ করে নিচ্ছিল। হঠাৎ একটা খাদের মধ্যে পড়ে বলদ দুটি লাফালাফি শুরু কবে দিল। গাড়োয়ান হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গাড়িটাকে তুলবাব ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি একেবারেই ধরে গেল। রোদ উঠেছে ঝলমলিয়ে। লুন্দিপুরের দিনগুলি একে একে কেটে গেল। আনন্দের দিনগুলি কেন যে এতো তাড়াতাড়ি ফুরায় বুঝি না! সেদিন রাতের ট্রেনেই রওনা হবো কলকাতা।

সন্ধ্যার সময়েই খেতে বসেছি। খেতে দিতে দিতে চিনুমাসি অনেক কথাই বললেন। মেয়েটার দুর্ভাগ্য, বুঝলি সমী!

—কার কথা বলছো?

—সীমার কথা বলছি। মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু একটি মাস ঘুরতে-না-ঘুরতেই ওর কপাল পুড়লো।

—এখন কোথায় থাকে? মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করলাম।

—তা তো জানি না। ওর বাবা-মারা যাবার পর সেই যে কোথায় চলে গেছে আর আসেনি। তবে আমার মনে হয় কলকাতাতেই গেছে—তা তুই একটু খোঁজ খবর যদি নিতে পারিস............

—তুমি পাগল হলে চিনু মাসি! কলকাতাটাকে তুমি কী মনে করো বলোতো? তোমার এই ছোট্ট লুন্দিপুর? তাছাড়া কলকাতাতেই যে সে গেছে তা তুমি কেমন করে বুঝলে?

—আমি জানি, ওখানে ছাড়া সে আর কোথায়ও যায়নি। জানিস, বিয়ের আগের দিন সীমা আমার কাছে এসেছিল!

—কেন?

—তোকে খুঁজতে।

—আমাকে!

আমার সঙ্গে যে সীমার একটা সম্পর্ক আছে সেটা জানতে দিতে চাইলাম না।

—হ্যাঁ! লুকাস না সমী! সে তোকে ভালোবাসে, আর তুইও। সেদিন কেঁদে কেঁদে আমার কাছে তোর ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা শহরে তোকে বের করার কোনও উপায়ই তুই রাখিসনি। একটি চিঠি দিয়েও না। আর একটা কথা বাবা—

—কী?

—সীমার বাবা আমার কাছে কিছু টাকা রেখে গেছে। কিন্তু মেয়েটাকে না-পেলে ওটাকা দেবোই-বা কাকে?

—কিসের টাকা চিনুমাসি?

—তা ঠিক জানি না, তবে অনেক পরে শুনেছিলাম যে, বাগ্দীপাড়ার দস্যু-ছেলে ওই গোপাল নাকি বুড়োকে টাকা দিয়ে কী-সব বলাবলি করেছে।

—ও।

কলকাতায় পৌঁছে দুটি দিন বিশ্রাম করে সন্ধ্যার দিকে সীমার ওখানে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, সীমা ঘুমাচ্ছে।

এই, ঘুমাচ্ছ না-কী! ওর গায়ে হাত দিতেই উঠে বসলো।

সন্ধ্যার সময় কেউ ঘুমায়?

—ঘুমাচ্ছিলাম না, এমনি শুয়েছিলাম।

—এটাতো মোটেই ভালো নয়। দিনদিন যে মোটা হয়ে যাবে।

—তুমি রোজ বিকেলে এসো তাহলে আর মোটা হবো না।

—এই নাও—গরম মুড়ি।

—আমি কী এখনও সেই ছোটোটি আছি নাকি যে রোজ রোজ মুড়ি খাবো।

—কেন? মুড়ি কী শুধু ছোটবাই খায়, বড়োরা খায় না? তাছাড়া মুড়িটার প্রতি তোমার লোভ বেশি তাই আনি। আব রোজ রোজ একটি জিনিস খাওয়ার কথা বলছো, সেটা ঠিক। কিন্তু কী করবো বলো? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা করতে হবে। আজ আমি পকেট একেবারে খালি করেই ওই মুড়ি....

—তাহলে আনলে কেন?

—বাঃ, তুমি খাবে সেইজন্যে।

—তোমার লাভ?

—তার মানে?

—আমি খেলে তোমার লাভটা কী শুনি?

—খুশি হই, আনন্দ পাই! এটা কী কম লাভ?

—আব এতোটা পথ হেঁটে যাবে? এমন কষ্ট করার.........

—ভুল করলে। কষ্টের মধ্য দিয়েই আনন্দটা বেশি করে অনুভব করা যায়।

—তাই বুঝি? সীমা অনাবিল হাসলো।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তা যাক। এখন ভাবছি, এবার তোমাকে নিয়ে লুন্দিপুর.............

—চুপ করোতো। বেশি কথা বলা দেখছি তোমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—উঁহু, রোগ নয় ওটা নীরোগ।

—মানে?

—মানে, রোগেই লক্ষণ রোগীর বাকশক্তি নষ্ট করা।

—ফাঁকা ঘরে যতো পারো বক্তৃতা দাও, আমি চা করে আনছি।

মিনিট দশেক পরে সীমা চা নিয়ে এলো।

মুড়ি কই? একটু হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

—সেটা আমার। জোর করে হাসি চাপলো সীমা!

—একটু যদি ভাগ না-দাও তবে আমার হবে কী করে? ছেলেবেলাকার কথা কী এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

—মোটেই ভুলিনি।

—তবে দাও।

আচ্ছা নির্লজ্জ তো তুমি। বলছি যে দেবো না, তবু দাও, দাও।

—শুধু চা খাওয়া যায় নাকি? সঙ্গে অন্য কিছুরই তো ব্যবস্থা করোনি।

—অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা করবো। শান্ত হাসলো সীমা। খুব যে বলেছিলে, 'তুমি খেলেই আমার

আনন্দ'। আসলে ওটা তোমাব উপরকার একটা মুখোশ। নিঃস্বার্থ ভাবে কাউকে কিছু দেবে না। সামান্য মুড়ি, তাও দেখো ভাগ বসাবে। দুষ্টুমী ভবা হাসি এবার সীমার ঠোঁটে।

—আচ্ছা, তুমি খাবে আমি চেয়ে থাকবো এটা কী সম্ভব? তাছাড়া সব দিলে পাবো—এটাই সাধারণ...

—সেই আশাতেই তো দাও।

—হ্যাঁ না মানে.....

—আর কথা বোলো না। চা জুড়িয়ে গেল—

নিঃশব্দে চা পান করতে লাগলাম। এই ফাঁকে সীমা বাটিতে কবে মুড়ি মেখে নিয়ে এলো। সেদিকে চেয়ে আমি হেসে ফেললাম।

—হাসলে কী হবে? অতো সহজে ভুলছি না।

—অতি সহজে ভোলাই তোমাদেব বিশেষ করে তোমার ধর্ম।

—দেখা যাক—বলেই সীমা হাসতে হাসতে আমার সামনে মুড়ির বাটিটা তুলে ধরলো।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। সাড়ে-সাতটা বাজে। অথচ ওই সময়েই ক্লাবে একটা মিটিং আছে।

—যাই এবাব—

—বোসো না!

—ক্লাবে একটা জরুবি মিটিং আছে।

—আমাব কাছে যখন আসবে তখন ও-সব মিটিং-ফিটিং শেষ কবে আসবে।

—রাগ করলে।

—রাগ আর আমাকে কবতে হবে না। তোমার কান্ডকারখানা দেখলে আপনিই ওটা এসে যায়।

কলেজ ছুটি হতেই দিদি একঝাঁক মেয়েদেব সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। পথের ও-পাশে চোখ পড়তেই দেখতে পেল বাস-স্টপে যে-লোকটি দাঁড়িয়ে সে গ্রেট টেলর। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিযে নিল দিদি। যেন টেলরকে দেখতে পায়নি এমনি একটা ভাব। দিদির বন্ধুরা যে-যার বাড়ির দিকে রওনা দিতেই ফাঁকা পেয়ে টেলর দিদির কাছে এগিয়ে এলো। দিদির মনো-বনে শত স্বাদ-আহ্লাদ, ইচ্ছা, বাসনা ইত্যাদি থাকলেও ও কিছুতেই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। দুর্বল মুহূর্তটিকে সে ছোট্ট একটা শিশু হয়ে যায়। দিদি আড়চোখে টেলরকে একবার দেখেই মাথা নিচু কবলো।

—কলেজ ছুটি হলো বুঝি? এ-ছাড়া টেলরের কিই-বা প্রশ্ন থাকতে পারে?

—হ্যাঁ। ছোট্ট করে উত্তর দিল দিদি।

—চলুন না আমার ওখানে। বিশ্রাম করে বাড়ি যাবেন—

—অনেকে দেরি হয়ে যাবে। মা চিন্তা করবেন।

বাস আসতেই টেলর বললো, এই বাসেই উঠবেন?

—হ্যাঁ! এ-বাসে উঠতে ইচ্ছা না-হলেও দিদি সে-কথা টেলরকে জানায কী করে?

—তোর এতো দেরি হলো কেন রে? দিদি ঘরে ঢুকতেই আমি প্রশ্ন করে বসলাম।

—তোর দরকার কী শুনি?

—আমি জিজ্ঞেস করলেই তো কোনও দরকার হয় না। এবার আসল দরকারী কথাটা বলে ফেল দেখি।

—আচ্ছা, তুই আমার ছোট্ট ভাই না?

—এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

—তুই কি করিস-না-করিস সেটা দেখবার জন্য আমি আছি কিন্তু আমার জন্য তো তুই.....

—থাক বাবা, তোকে আর কিছু বলতে হবে না।

—দেখা হয়েছিল, খুব আস্তে দিদি বললো।

—কার সঙ্গে?

—টেলরের সঙ্গে। বাবারে বাবা! সব কথা মুখ থেকে না-শুনলেই নয়। একটু বুঝতে শেখ।

উত্তাল হেসে উঠলাম। ঠিক বলছিস তো বুঝতে! নাকি একটু পরেই বলবি ছোট যখন সব সময় ছোটর মতোই থাক।

দিদি দাঁড়ালো না। চলে গেল ঘর ছেড়ে—

সারাটা দুপুর দিদিকে টেলরের চিন্তায় পেয়ে বসেছে। টেলরের কথাটা বারবার মনে পড়ছে, 'কলেজ ছুটি হলো বুঝি।' হুঁ, যেন জানে না, ছুটি হয়েছে কিনা। দিদি বুঝলো, কথা বলার জন্য field create করার সময় ওই রকম দুটো-একটা বলতে হয়। বাড়িতেও যেতে বলেছিল। দিদির ঠোঁটে একটু হাসির ছোঁয়া লাগলো।

—ঠোঁট টিপে অমন করে হাসি চাপছিস কেন রে? টুক করে বলে বসলাম।

—তুই তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে রে? কেন হাসছি, কেন পড়ছি, কেন.....এর সবই কী তোকে উত্তর দিতে হবে?

—রাগ কবিস না দিদি। কারো সঙ্গে কথা নেই, বার্তা নেই, হাসির কথা পর্যন্ত হয়নি, অথচ তুই হাসছিস, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো সেদিন। বইগুলি বুকের আঁচলের তলায় রাখলো দিদি। যাতে কম ভিজতে পারে অর্থাৎ কিনা বেশি না-ভেজে। নিজে বৃষ্টির জলে স্নান করতে করতে উঠলো টেলরের বাড়ি।

—ইস! একেবারেই ভিজে গেছেন দেখছি। কাপড়টা পাশের ঘরে গিয়ে ছেড়ে ফেলুন। বলেই টেলর আলনা থেকে নিজের একখানা ধুতি এগিয়ে দেয়।

—ছাড়বার দরকার নেই, গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাবে। দিদি ওর এককোল বই টেবিলের উপব রাখলো।

—তাতে অসুখ করতে পারে, ছেড়ে আসুন—টেলর দিদির চোখের দিকে তাকালো! দিদি পলকের জন্য টেলরের দিকে তাকিয়েই ওর হাত থেকে কাপড়টা তুলে নিল।

ধুতি পরে ফিরে এলো মিনিট কয়েক পরেই। এ-পোশাকে টেলরের সামনে আসতে লজ্জা হলেও কী করা যাবে আর?

—জিম। ডাকলো টেলর।

—Yes Sir. ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জিম এলো।

—ওঁকে এক কাপ দুধ দাও। গরম দেবে কিন্তু—

—O.K. Sir. জিম চলে গেল।

—একটা কথা বলবো, টেলর বললো।

—বলুন!

—দুপুরে খেয়ে যাবেন, অনুমতি চাইলো টেলর।

টেলবের বলবার ভঙ্গিটুকু ভালো লাগলে দিদির। তাই খুশির ছোঁয়া লাগলো মনে। একটু হেসে মাথা নেড়ে জানলো, সে খাবে।

টেলর জামা-কাপড় পরছে। তার কলেজ যাবার সময় হয়ে এলো। জিম খেতে ডাকলো দিদিকে।

—আপনি খাবেন না? দিদি বললো টেলরকে।

—আমি অনেক আগেই খেয়ে নিই।

ভিতরকার গ্যাস বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো শুকনো হলো দিদির মুখমণ্ডল। খাওয়ার প্রতি তার কোনও রুচিই রইলো না।

—আপনি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন, তারপরে বাড়িতে যাবেন। কলেজের দেরি হয়ে গেল। আমি যাচ্ছি।

খেয়েছে বটে দিদি কিন্তু বিশ্রাম সে করেনি। তবে মনটা সাময়িক ভেঙে পড়লেও আসার সময় এসেছে আনন্দ ভরা মন নিয়ে।

টেলরের পড়ার টেলরের একটি কোণে একটা খাতা পড়েছিল। দিদি ভেবেছিল, টেলরের লেখা-টেখা নিশ্চয়ই ওতে। হ্যাঁ টেলরেরই লেখা বটে তবে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের লেখা—যা দিদির মনকে রঙীন প্রজাপতির মতো উড়িয়ে নিয়ে চললো দূর-দূরান্তে। টেলর লিখেছে, 'তমা' তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু কী করে তা জানাই।' ওই দুটি লাইনই দিদির বুকে ঝড় তুললো অনাবিল খুশির।

দিদি ফিরলে মা বললেন, কি রে! এতো দেরি হলো যে?

—বৃষ্টির মধ্যে কী করে আসি বলোতো মা?

—বৃষ্টি থেমেছেও তো কম সময় নয়। কোথায় ছিলি এতোক্ষণ? চিন্তায় চিন্তায় আমি......

—এক বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলাম, মিনতিদের বাড়ি। ওর মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন দুপুরবেলা না-খেয়ে যাওয়াটা উচিত নয়।

—টেলরদাব বাড়িতে কী কী খেলিরে দিদি? আমি ওকে ফাঁকা পেয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম।

—তার মানে? ভ্রু কুঁচকায় দিদি।

—তুই তো ভীষণ লাজুক, তাই বলছি টেলরদার বাড়িতে পেট ভরে খেয়েছিস তো না কী.....

—টেলরেব ওখানে গিয়েছিলাম তুই জানলি কী করে? বেশ বিরক্ত হলো দিদি।

—বুঝতে শিখেছি। শান্ত হাসলাম।

—কিন্তু এতো বেশি বুঝিসনা—জেনে রাখ আমি ওঁর ওখানে যাইনি।

—বৃষ্টি ভিজতে ভিজতে গিয়ে উঠলি অথচ বলছিস....

—তুই গিয়েছিলি? দিদি, আমাকে প্রশ্ন করলো।

—না, তবে সবই আন্দাজে বলছি।

—আন্দাজগুলি দেখছি সবই তোর ঠিক ঠিক হতে শুরু করেছে।

সে ববিবারটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য। আমি স্বাধীন—কারণ বাবা বাসায় নেই। অতোএব ছুটির দিনটিতেও ভয়েব কোনও কারণ নেই আমার। আমি গেলাম 'মিনতি কাফে'-তে।

—দাদা, এরমধ্যে একবার এসেছিলাম, আপনাকে পাইনি। সেই লোকটি আমার পাশে বসতে বসতে বললো।

—হ্যাঁ মানে আমি কয়েক দিনের জন্য লুন্দিপুর আমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম তাই দেখতে পাননি। 'বয়' কে দুটো চায়ের অর্ডার দিতেই লোকটি বলে উঠলো, না দাদা আজ আর খাবো না।

—কেন?

—এই কিছুক্ষণ আগে একবার খেয়েছি।

—আমার ওপর রাগ করেছেন না কী?

—কী যে বলেন, আপনার ওপর রাগ!

—আচ্ছা—আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আসছি—

মাথাধরা কমার একটি ওষুধ নিয়ে ফিরলাম। খেয়ে ফেলুন এটা, মাথা ধরা কমে যাবে। তারপরে রামকে অর্থাৎ মিনতি কাফের 'বয়কে' বললাম এক গ্লাস জল দিতে।

—দাদা....মাথাধরা আমার চিরদিনের.....নিত্য সঙ্গী......এর জন্য আপনি শুধু শুধু....

—ভুলে খাচ্ছেন কেন—নিত্যসঙ্গীটি যদি খারাপ হয় তবে তাকে ত্যাগ করাই উচিৎ।

—উচিত অনুচিত তো কতো কিছুই আছে, সব কী মেপে চলা যায়? বলতে বলতে উঠে গেল লোকটা।

বেশ কয়েকদিন পর সীমার ওখানে গেলাম। কিন্তু সে-কথা বলছে না। শ্রাবণের আকাশের

মতো থমথম করছে তার মুখখানা।

—ব্যাপার কী?

নীরব সীমা।

— মেঘনা এমনিতে শান্ত কিন্তু আকাশে যদি একবার মেঘ দেখতে পায় তবেই হয়েছে। তা আমাকে দেখলে তোমারও হয়েছে সেই..........

—আচ্ছা! তুমি কী এমনি ভাবেই থাকবে, না স্বাভাবিক হয়ে কথা বলবে?

বুঝতে পারলাম সীমা আমাকে আরও ঘনঘন আসতে বলেছিল। তা আমি পালন করিনি। বললাম, আমাব কী ইচ্ছে হয় না তোমার কাছে আসতে কিন্তু ঠিক আসার মুহূর্তটিতে এমন এক একটা কাজ বাবা-মা, নয় দিদি বিশেষ করে দাদা দেবেন যে, সে-কাজ সারতেই আমাব কাজ সারা। যাক, কথা যখন বলবে না তখন বসে থেকে কী করবো? চলি।

আর অপেক্ষা করলাম না। বেরিয়ে এলাম। সত্যি কথা বলতে কী চলে আসার সময় সীমার কাছ থেকে একটা বাধা পাবো বলে আশা করেছিলাম।

Christmas day উপলক্ষ্যে টেলরের বাড়িতে আমাদের সবার নিমন্ত্রণ হয়েছে। বাবা ও দাদা অফিসের কাজ সেরে ওখানে যাবেন। আমি ও দিদি রওনা হলাম টেলরের বাড়ির দিকে। মা যাবেন না। সচরাচর তিনি কোথাও একটা বের হন না।

আমরা যখন টেলরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, টেলর তখন কথা বলছিল একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে। আমাদের দেখতে পেয়েই টেলর উঠে এলো।

—আসুন। এসো সমী, টেলরের মুখে অভ্যর্থনাব হাসি।

আমরা বসলে টেলর পবিচয় করিয়ে দিল, ইনি এলিজাবেথ গার্ডনার। play back singer। এবং ইনি তমা চট্টোপাধ্যায় writer। দিদি ও এলিজাবেথ নমস্কার বিনিময় করলে টেলর বললো, আর এই হচ্ছে সমী, ওঁর ছোট ভাই। এলিজাবেথ গার্ডনার আমাকে নমস্কার জানালো। আমিও অভিভূত হয়ে জানলাম তাঁকে।

পরিচয় বিনিময়ের পর এলিজাবেথ বললো, আব একটা সুখবর আছে গ্রেট, বলতো কী?

—অনেকগুলি কন্ট্রাক্ট করেছো?

—না।

—তাহলে এ-বছরে সবচেয়ে বেশি বেকর্ড করেছো।

—তাও না। এলিজাবেথ হাসলো।—আমি মা হবো।

—বলো কী? তাহলে আজকের পার্টিতে আমার খরচের অঙ্কটা তুমিই মেটাবে। ছেলে হওয়ার আনন্দ মুখর উৎসবটি না-হয় Advance আমার বাড়িতেই করলে। কী বলো? হাসিতে ঘরখানি ভবিয়ে তোলে টেলর। শ্রীমতি গার্ডনার লজ্জা পেয়েছে। করেছে মুখ নিচু। আমার মনে হলো, এলিজাবেথ গার্ডনার ইংবেজ নয়, খাঁটি বাঙালি পরিবাবেব একজন সাধারণ মেয়ে।

ক্রমে ক্রমে ঘব ভরে উঠলো লোকে। কলেজেব বাঙালি কযেকজন প্রফেসর বন্ধুও এসেছেন! নিমন্ত্রিত হয়ে যারা এসেছিলেন, তাবা চলে গেলেন—কিন্তু তখনও বাবা অথবা দাদা কেউ-ই আসেননি। এতো দেরি হচ্ছে দেখে টেলব রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। আমি ও দিদি চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে আছি। জিম আসতেই বললাম, তারপর, তোমার খবর কী জিম?

—আমার আবাব News কী Sir !

—তোমার News থাকতে পারে না কেন Brother!

—খাওয়া আর খাওয়ানো কী এক হলো Sir? আমাদের Work হচ্ছে News দেওয়া। একটু হেসে জিম বললো, আছে Sir একটা খবর। আমার Wife আমাকে যেতে লিখেছে। বলেছে, এবার থেকে সে আমাকে Honour দেবে।

—এতো সুখের কথা জিম।

—হ্যাঁ। তবে Sir-কে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে।

—Sir-কে খুব ভালোবাস, না? দিদি এবারে প্রশ্ন করলো।

—আপনি ঠিক বলেছেন। তাকে আমি যেমন Love করি তেমনি Respect করি।

—কিন্তু তোমার Wife কষ্ট পাবে? একটু হেসেই বললাম।

—জানি, একজনের আনন্দের জন্য আমরা দুজন কেন কষ্ট পাবো। Sir কী আমাকে কম ভালোবাসেন!

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে টেলর ঘরে প্রবেশ করলো। বাবা টেলরের বইয়ের আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন মুগ্ধ নয়নে, অনেকক্ষণ ধরে। বললেন, সংগ্রহ তো কম করোনি দেখছি।

—আজ্ঞে আমরা ওই একটাই হবি, টেলর হাসলো।

আমাদের খাওয়া শেষ হলো। বাড়ি যাবার পালা এবার। দাদা তখনও আসেননি।

বাস-ষ্ট্যান্ড পর্যন্ত টেলর এলো আমাদের সঙ্গে। এক সময় সে বললো বাবাকে উদ্দেশ্য করে, সঞ্জীব আজ আমার কাছেই থাকবে। কখন আসে ঠিক নেই, অতো রাতে খেয়ে তারপরে আবার বাড়ি যেতে ওর কষ্ট হবে। তাই বলছিলাম—

—বেশতো থাকবে। বাবা জানালেন।

বাস আসতেই আমরা উঠে পড়লাম। দিদি সবার শেষে উঠলো। পেছন ফিরে বাবাকে বাঁচিয়ে একবার তাকালো টেলরের দিকে। দেখলো. টেলব তাকিয়ে আছে তারই দিকে। আমার মনটা বেশ দমে গেল, দিদির সঙ্গে টেলরের কথা হয়নি দেখে।

সেদিন শনিবার। কলেজ ছুটি হতেই দিদি সোজা চলে এলো প্রেসিডেন্সি কলেজের পাদদেশে—যেখানে অসংখ্য মূল্যবান বইয়ের বাজার বসেছে লোহার বেলিং-এ ঝুলন্ত দড়ির ওপর। প্রয়োজনীয় বইখানা তুলে নিল দিদি বইয়ের সমুদ্র থেকে। এক মনে দেখতে লাগলো পাতা উল্টিয়ে—

এতো মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছেন? টেলব কলেজ ঢুকবার আগে দিদিকে দেখতে পেয়ে ওর কাছে এলো।

—কিছুটা চমকে উঠে দিদি। ও আপনি! দিদি একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। টেলরের দৃষ্টি পড়লো এবার বইয়ের ওপর। বললো, এই বইটা আমার আছে।

—তাতে কী হয়েছে? হাসি চেপে দিদি ওর চোখের দিকে চাইলো।

—আপনি ওটা নিয়ে পড়বেন।

—তারপর তো আমাকে ওটা ফেরত দিতে হবে?

—নাই-বা দিলেন। টেলর অন্যদিকে তাকালো। দিদির মুখের দিকে চাইতে পারলো না হয়তো লজ্জায়।

—আপনার ক্ষতি হবে না?

—আমি যদি ক্ষতি না-মনে করি তাহলে আপনার নিতে...

—বইটা কিন্তু আমার আজকেই চাই।

—আজকেই পাবেন। বিকেলে আসুন না—

—বিকেলে! বলেই কী যেন চিন্তা করলো দিদি। বললো, আপনার ছুটি ক'টায়?

—চারটে।

—যাবো।

কিন্তু দিদি যেতে পারলো না টেলরের বাড়িতে।

—রোজ রোজ বন্ধুদের বাড়িতে কী দরকারটা শুনি? মা বললেন।

—সব সময় কী প্রয়োজনের সময়ই যেতে হয়, বেড়োতে কেউ যায় না? অভিমানের সুর দিদির।

—কলেজ থেকে এসেছিস দেরিতে, এখন আবার বেড়োতে যেতে চাইছিস। সারা দিনটা তাহলে বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলেই পারিস।

মা'র প্রতি আমার একটু রাগ হলো। দিদি টেলরের বাড়িতে একটু যেতে চাইছে অথচ মা....অবশ্য এটা ঠিক যে, মা কেমন করে বুঝবেন দিদি টেলরের বাড়িতে যাবে। আর যদি কোনোদিন বোঝেন তবে মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়া হয়তো ঘুচে যাবে।

দিদির দেরি দেখে টেলরের ব্যাকুলতাও বাড়ছিল বেশি করে। পায়চারী করছে এ-ঘর থেকে ও-ঘর। সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন। টেলর বুঝে উঠতে পারছে না, কথা দিয়েও কেন আসতে পারছে না। তাছাড়া বইটাও তো নেবে। টেলর আগে থেকেই বইটা বের করে রেখেছে আলমারী থেকে।

সোমবার কলেজের পর দিদি গেল। টেলর তখন পড়ছিল। ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো দিদি। টেলর দাঁড়িয়ে উঠে তার দিকে পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। যেন দিদির চোখের মধ্যকার নীরব ভাষাকে গভীর ভাবে পাঠ করতে চাইলো। সব ভুলে গিয়ে দিদিও পরিপূর্ণ ভাবে দৃষ্টি তুলে ধরলো, মিশিয়ে দিলে নিজের চোখ দুটিকে টেলরের চোখের সঙ্গে। একজোড়া নিকষ কালো চোখ। যদিও কয়েকটি মুহূর্ত কিন্তু এর মূল্য? এর মূল্য বুঝতে হলে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে সবটুকু।

—শনিবার দিন এলেন না কেন? টেলরের কণ্ঠে ফুটে উঠলো, ব্যর্থতা ঠিক নয়, নিরাশার সুর। আমি সারাটা বিকেল........

—টেলরের কথাগুলি দিদির বুককে আঘাত করে চলছিল। যেতে পারেনি বলে দিদিও যে কতেটা ব্যথা পেয়েছে সে-কথা টেলর কেমন করে জানবে?

—বাড়িতে কাজ ছিল মা তাই আসতে দিলেন না। একটু থেমে পরে বললো, আমার বইটা কী হলো?

—বের করেই রেখেছি, এই নিন। টেলর তার হাতের বইটা দিদিব হাতে তুলে দিল।

—যাচ্ছি কেমন?

—বসবেন না? ক্লান্ত সুর টেলরের।

—না, ফিরতে দেরি হয় দেখে মা অভিযোগ করেন। চলে আসবার সময় দিদি হঠাৎ টেলরকে প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা! আপনি খুব কম কথা বলেন তাই না?

—কেন! অবাক হয় টেলর।

—এমনি বললাম। দিদি আর দাঁড়ায়নি, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে তাড়াতাড়ি। টেলর বিস্ময়ে দিদির চলার দিকে একবার দৃষ্টি বোলালো।

এর কয়েক দিন পরে টেলরের সঙ্গে দিদির দেখা হলো। দেখা হলো মানে দিদিই আজকাল কলেজ ফেরত ওর বাসা হয়ে বাড়িতে আসে। সব সময় তো যখন-তখন বের হতে পারে না তাই কলেজ ছুটির পরেই......

—আচ্ছা,....... টেলর থেমে গেল।

—থামলেন কেন, বলুন।

—আপনি সেদিন, আমি কম কথা বলি এ-কথা বললেন কেন?

—যা বুঝেছি।

—কেন বলুন তো? মানে আমি ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না.....

—ধরুন এমনিই বলেছিলাম।

—কারণ-বিহীন বলার মেয়ে আর কেউ হলেও আপনি নন।

—আমার প্রতি আপনার এ-বিশ্বাস কেন?

—যে-কারণে বিশ্বাসটা জন্মে। যাক গিয়ে, কই বললেন না তো কেন......

—সত্যি আমি কিছু ভেবে বলিনি। মুখে এলো তাই বললাম—

দিদির লেখা বের হলো—উপন্যাস নয়, প্রবন্ধের বই। নাম 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ'। আশ্চর্য সুন্দর হয়েছে বইখানি। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দিদিব প্রশংসা ছড়ানো।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে প্রকাশকদের পক্ষ থেকে দিদিকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হলো।

কলেজের বইপত্র গুছিয়ে রেখে দিদি রান্নাঘরে গেছে। বোধহয় খেতে। আমি এই সুযোগে ওর বইটা কলেজের বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম।

—বইয়ের মধ্যে কি রাখলি সমী? দিদি কোন সময় ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছিল জানতে পারিনি।

—কিছু মনে করিস না দিদি। তোর এই নতুন প্রবন্ধের বইটা আজকে টেলরকে দিয়ে আসবি। টেলরদা খুব খুশি হবে। আর.....

—আর কী বল?

—আমিও খুব খুশি হবো।

—সত্যি বলছিস?

—যে-সব কথা নিয়ে মিথ্যুকেরা পর্যন্ত মিথ্যে বলে না, সেখানে আমি......আর একটা কথা বলবো দিদি?

—বেশ তো বল না?

—বললে তো আবার বলবি বড়বেশি বুঝিস, আন্দাজটা বড়ো ঠিক হতে শুরু করেছে তোব!

—না না বলবো না। দিদি তৃপ্তির হাসি হাসলো।

—কিছু তো বলবি না বুঝলাম কিন্তু রাগ করতেও পারবি না—

—তাও করবো না। দিদির মুখে হাসি ঝরে পড়ছে।

—তোর সম্বর্ধনা সভায় অবশ্যই টেলরকে নিয়ে যাস—বলেই একরকম পালিয়ে গেলাম।

'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' বইখানি দিদি তুলে দিল টেলরেব হাতে।

—একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না, আমার বইয়ের আলমারীর দিকে একবার তাকান। টেলরের কথা মতো দিদি তাকালো, দেখলো কয়েক মিনিট। চোখে পড়লো আলমারীর স্বচ্ছ কাচ ভেদ করে বেরিয়ে আসা অক্ষরগুলি জ্বলজ্বল করছে ঃ 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' তমা চট্টোপাধ্যায়।

—কিনেছেন?

—হ্যাঁ। আশা করেছিলাম আপনি আমাকে এক কপি দেবেন কিন্তু...

—তাহলে আর এটা নিয়ে কী করবেন, দিন—

—কেন? টেলর সোজা তাকালো দিদির মুখে।

—একই বই দুটো রেখে কী লাভ?

—একই পেন পকেটে দুটো রেখে কী লাভ? দেখুন, লাভের কথা থাক লোকসানেরও কিছু নেই, তাছাড়া দুজনে মানে দুটো বই থাকলে ক্ষতি কী? সবচেয়ে বড়ো কথা, এ-বই আপনি আমাকে দিলেন মানে নিজে হাতে দিলেন।

—কেন? পার্শেল করে আবার কেউ দেয় নাকি?

—না, তা অবশ্য দেয় না, ওটা আমার কথার দোষ। আর একটা কথা—

—একটা একটা করে তো অনেক কথাই বললেন। এবার আমাকে একটা বলতে দিন। আসছে শুক্রবার মানে আগামীকাল আমার সঙ্গে যেতে পারবেন?

—কোথায়?

—একটা জায়গায়।

—একটা জায়গার নাম করে দশটা জায়গায় যেতে হবে নাতো? টেলর হাসলো একটু।

—আপনি হলে অবশ্য তাই করতেন। আপনার যেমন একটা কথার জায়গায় দশটা কথা......কাল আপনার কলেজ শেষ হচ্ছে ক'টায়?

—পাঁচটায়।

—ওই সময়েই কলেজেব সামনে দাঁড়াবেন. আমি আসবো।

—যদি না-আসেন? টেলরের আচমকা প্রশ্ন।

—আমি বলছি, আমি আসবো—

—আগের দিনও নিশ্চয়ই আপনি বলেছিলেন?

—তা বললেও সেদিন আসতে আমার বাধা ছিল কিন্তু কালকে সে-বাধা থাকবে না—

—তাহলে বিশ্বাস করে মানে আশা নিয়ে ঠিক পাঁচটায় দাঁড়াবো?

—হ্যাঁ। এবার আমি যাই—অনেক দেরি হয়ে গেল।

—সে কী! না-খেয়েই উঠছেন.......

—এখানে খেলে ওদিককাব বকুনিটা কে খাবে বলুন? হাসির তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দিদি বিদায় নিল—

পরদিন ঠিক পাঁচটায় দাঁড়িয়ে থাকা টেলরের সামনে এসে ক্যাচ করে ট্যাকসিটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ছোট্ট জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে দিদি বললো, আসুন। ট্যাকসিতে উঠে দিদির পাশে বসতে বসতে টেলর বললো. আপনি এসেছেন তাহলে।

—আমি আসবো না ভেবেছিলেন না কী?

—না তা ঠিক নয়। মানে কথাটা কি জানেন, বেশি আশাটা অনেক সময় খুব বেশি কবে নিরাশার অস্তিত্বটা জানিয়ে দেয়।

ট্যাকসি চলেছে। বুক ভরা নিঃশ্বাস নিয়ে ছুটছে। মধ্যে দুটি প্রাণী, টেলর ও দিদি। আজ আর সেখানে কেউ নেই—না বাবা না আমি। অতোএব আজ ওরা নিশ্চয়ই অনেকটা ব্যবধান রেখে বসবে না। অবশ্য ট্যাকসি ড্রাইভারের অবস্থান হেতু যদি ওরা সরে বসে তাহলে আর কী করা যায়? ওদের মনে রাখা উচিত. ড্রাইভার ছাড়া ট্যাকসি কখনও হাওয়ায় ছুটে চলবে না—না, ওরা আজ দুজনে সরে বসেনি। টেলর অনেকটা ঘেঁষে বসেছে দিদির পাশে। দুরন্ত হাওয়ায় দিদির কাপড়েব বুকের অংশটুকু উড়ে টেলরের সমস্ত মুখমন্ডল ঢেকে ফেলেছে। দিদি তৎক্ষণাৎ সরাতে গেছে টেলবও সরাবার জন্য হাত তুললো, ঠিক তখনই হলো ছোঁয়াছুঁয়ি। কেমন জানি লজ্জা ঘিরে ধরলো দিদিকে। তাকালো টেলরের মুখের দিকে নয়—বাইরে।

সম্বর্ধনা সভায় লোক হয়েছে মন্দ নয়। সাহিত্য জগতের স্বনামধন্য জনাকযেক কথাশিল্পী উপস্থিত হয়েছেন। তাছাড়াও আছেন সমালোচক, সাংবাদিকের বিরাট দল।

সম্বর্ধনার উত্তরে দিদি প্রকাশক এবং উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জানালো নিজের যোগ্যতার মাপ কাঠি কতো নগন্য, কতো ক্ষুদ্র। সবশেষে সে 'প্রকৃতির কবি রীবন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে কিছু সময় আলোচনা করলো ঃ—

বহুমুখী প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল এবং প্রকাশিত। তার প্রকাশিত রূপের মাঝে তাঁর প্রকৃতি পূজারী রূপটাই আমার চোখে ফুটে উঠেছে। সে-কারণেই বিশ্বকবির সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি পূজারী মনের পরিচয় সম্যকরূপে উপলব্ধি কবেই আমি এই বইখানা লিখতে সাহস পেয়েছি। কতোখানি সাফল্যলাভ করেছি সে বিচার অবশ্যই আমার নয়—পাঠকের। কেন-না আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি পাঠক মাত্রই সমালোচক।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট সুতরাং তাঁর প্রতিভার মাত্র একটি দিক আলোচনা করলেও বিরাট সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমি অতো সময় নেবো না—দু-চার কথায় সিন্ধুকে বিন্দুতে দেখাতে চেষ্টা করছি।

রবীন্দ্ররচনাবলীর অনেকাংশই প্রকৃতির অধিকারে। এ-অধিকার কবির অজান্তে দেওয়া কারণ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড়ো যোগাযোগ, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই তাঁর ভাবনা, তাঁর চিন্তাধারা। কিন্তু প্রকৃতি সকলের জন্য নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য সাধারণের চোখে পড়লেও তাদের মনের চোখে ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ ভাবে কলমের তুলিতে তা চিত্রিত করে সকলের চোখে ধরিয়ে দিয়েছেন।

এটা তাঁর শুধু কাব্য নয়—এটা প্রকৃতির সম্যক উপলব্ধি, যার ফলেই তিনি ছয় ঋতুতে প্রকৃতির ছয়টি রূপের প্রাণবন্ত বর্ণনা করতে পেরেছেন।

বৈশাখে শুরু গ্রীষ্মকাল। কবির জন্মমাস বলে বৈশাখকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। একবার বলেছেন, 'দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।' আবার বলেছেন, "হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।" আবার কখনও মহাজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এক অসীম শক্তিশালী কালবৈশাখীকে তাঁর হৃদয়ের আবিলতা উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আসে বর্ষা। নদী-নালা জলে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্যামল বনানীতে ফোটে কদমের হাসি! আকাশে চঞ্চলা মেঘ-মালা। দিনগুলি বর্ষামুখর। রবীন্দ্রনাথ বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে ওঠেন, "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে. ......

প্রকৃতিতে তখন বর্ষাধৌত শরৎ। রবীন্দ্রনাথ তখন কাশের গুচ্ছ বাঁধেন, শেফালির মালা গাঁথেন। কাননে শোনেন দোয়েলের ডাক। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন 'জল হারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী' এ-দৃশ্য তো কতোকালের! কিন্তু পুরাতনকে নূতন করে দেখানই কবির কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন 'বঙ্গে-শরৎ' কবিতায়। এক জায়গায় বলেছেন, "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর........ধান্যময়ী প্রকৃতি!

যায় শরৎ,—আসে হেমন্ত। শিশির সিক্ত ধরণী। দুপুরের রৌদ্রে প্রজাপতির খেলা। মাঠে মাঠে পাকা ধানের গন্ধ। সে-গন্ধ লুট করে নিতে বাতাস মেতে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের চোখে তা ধরা পড়ে, তিনি ভাবে হন বিভোর, বলেন—

হেমন্ত-ধানের খেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিব পথ চিনে।

হেমন্তের সিংহ-দ্বার দিয়ে প্রকৃতি আসে শীত সভায়। গাছে বৈরাগ্য, পথে পথে ঝরাপাতা। নদী-ধারা হয়ে আসে ক্ষীণতর। প্রকৃতি যেন তপস্বিনী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন নৃত্যময়ীরূপ।

"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন লাগল নাচন
আমলখীর ডালে ডালে......."এই তো কবির সৃষ্টি!

বসন্তে প্রকৃতি ষোড়শী। বনে বনে ফাগুনের আগুন। গাছে কচিপাতার হাসি। এই বাসন্তীরূপে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ। দুয়ারে দাঁড়িয়ে সে-মোহনীয় রূপ দেখতে দেখতে তিনি বলেছেন ঃ

"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে... ...

ছয় ঋতুতে প্রকৃতির রূপকে চিত্রিত করেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আরও অনেক রূপকে নিজের অনুভূতির সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। প্রকৃতির সে-রূপের টানেই তিনি দেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন, হিমালয়ে ছুটে গিয়েছেন, শুনতে গিয়েছেন সিন্ধুর কল্লোল; সেখান থেকে গিয়েছেন পদ্মার বিস্তৃত বুকে। লিখেছেন ঃ 'একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, নিস্তরঙ্গ নদীর উপর ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না, একটি ছোট ডিঙিতে একজন ছোকরা দাঁড় বেয়ে চলেছে। এমন মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে এমন মিষ্টি কখন শুনিনি।"

গান এতো মধুর শোনার একমাত্র কারণ, নিশিত রাত্রির নিস্তব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাত্মবোধ। এই একাত্তবোধের জন্যই তাঁর সাধন-জীবনের পীঠস্থান শান্তিনিকেতনকে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির স্নেহ-কোলে, বোলপুরের এক নিবিড়ো পরিবেশে......

—আপনি সত্যই গ্রেট। বাড়ি ফেরার পথে টেলর বললো।

—আর আপনি?

—আমি নামেই গ্রেট কিন্তু কাজে আপনি।

বাড়িতে এসে দিদি মায়ের গায়ে একটি অত্যন্ত দামি শাল জড়িয়ে দিল।

—এটা তোকে দিয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ মা। তোমাকে দিলাম—

—আমাকে কেন, তোর বাবাকে........

—বাবা বুঝি মেয়েদের চাদর পরবেন? দেখছো না কেমন ফুল ফোটানো!

—বেশ তো তবে তুই গায়ে দিস।

—দিদিকে মোটেই মানাবে না। বুড়ো-বুড়ো লাগবে—আমি এবারে বললাম।

সেদিন রাত্রে টেলরের নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়িতে। থাকবেও রাতে। কোনও উৎসব নয়—এমনিই তাকে বলা হয়েছে।

কলেজ থেকে এসেই দিদি কোনও রকমে স্নান-খাওয়া শেষ করলো। তারপর ঘর সাজাতে আরম্ভ করলো। আলমারী থেকে দামি বেডকভার এবং চাদর নামালো। সে-গুলি পেতে দিলো টেলর যে-ঘরে শোবে। সদ্য কাচা পর্দা, চেয়ারের ঢাকনাগুলি কোনও কিছুর নগ্নতা প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। ফুলদানির মুখেও সতেজ হাসি ফুটেছে। স্থান পেয়েছে সেখানে রজনীগন্ধার ঝাড়। জানলার পর্দাগুলি ফুরফুর করে কাঁপছে বাতাসের স্পর্শ পেয়ে। দিদিও কাঁপছে—তবে গভীর আনন্দে। ঝলমলিয়ে উঠলো খুশিতে।

—ঘর তো সাজালি, এবারে তুই সেজে নে, বললাম আমি।

—কেন?

—বাঃ আর একটু পরে টেলরদা আসবে........

—টেলরদা কী আজকেই নূতন আসছে? আর আমিই-বা সাজতে যাবো কেন?

—যে-কারণে সাজা উচিত ঠিক সে-কারণেই সাজবি।

—লজ্জা-সরম বলতেও কি তোর কিছুই নেই?

—তুই কী আমার পর?

—পর না-হলে বুঝি সব কথাই বলা যায়?

—দিদিদের বলা যায়।

—উঃ! তুই না একটা......কী যে বলবো ভেবে পাইনে।

—ভাবনার উর্দ্ধে আমি। টুক করে বলেই চলে গেলাম।

টেলর এলো। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। ব্যাকব্রাশ করা চুল। পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে হাতকাটা-গেঞ্জিটা নিঃসঙ্কোচে উঁকি দিচ্ছে।

—অদ্ভুত সুন্দর লাগছে আপনাকে টেলরদা!

—আমি নিজেই একটা ভূত, বুঝেছো সমী?

টেলরকে নিয়ে দিদির ঘরে ঢুকলাম। দিদি তখন বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুমকুমের টিপ পরছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম কবে যে টেলরের জন্য দিদি এমন ভাবে সিঁদুরের টিপ পরবে!

বাবা ও দাদা তখনও অফিস থেকে আসেননি। মা, টেলবের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে রান্নাঘরে গেলেন। আমি ও দিদি তখন টেলরের কাছে বসে। ওদের একটু মন খুলে আলাপ করবার সুযোগ করে দিতে বললোাম দিদি! আমি আসছি।

—তুমি বসো সমী। টেলর বোধহয় লজ্জা পেয়ে বললো।

—আমি এক্ষুনি আসবো টেলরদা। আপনারা ততোক্ষণ একটু গল্প করুন—

—সঞ্জু, বাবা কেউ আসেননি? অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করে গ্রেট টেলর বললো।

মনে মনে হাসলো দিদি। এ-গুলি হচ্ছে নিতান্ত কথা বলার কথা।

—না, কেউ আসেননি। তবে দাদা আজ একটু তাড়াতাড়িই আসবেন।

—সঞ্জুটা এখানে এসে কেমন কেমন হয়ে গেছে। অথচ শান্তিনিকেতনে থাকতে.......

—কেমন করতেন শান্তিনিকেতনে থাকতে?

একটু চুপ করে থেকে টেলর বললো, জানেন ওর সম্বন্ধে আজ একটা ঘটনা মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা

আর কিছু নয়—টিফিন ক্যারিয়ারে বেশ কিছু খাবার রেখে দিয়ে বাইরে গেছি। ফিরে এসে খুলতেই দেখি তাতে কিছুমাত্র খাবার পড়ে নেই। তবে একটা মাত্র জিনিস ছিল।

—কী সেটা? দিদি জানতে চাইলো।

—একটি চিঠি!

—চিঠি! দিদি অবাক হয়।

—হ্যাঁ। আর তাতে লেখা ছিল ঃ আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল তাই তোমার খাবারটুকু শেষ করলাম। কিছু মনে করো না—ইতি.......

—সে-কী! ইতি-র পরে নামও লেখা ছিল?

—হ্যাঁ। লেখা ছিল, ক্ষুধার্ত।

হাসিতে চেয়ারের ওপরে লুটিয়ে পড়লো দিদি। জিজ্ঞেস করলো, কে ক্ষুধার্তটা?

—আপনার দাদা!

আমি ঘরে আসতেই টেলর বললো, এক্ষুনি আসার নাম করে এতো দেরি করলে যে?

উত্তর আর কী দেবো! মনে মনে বললাম, দেরিতে না-এলে যে তোমাদের গল্পের ইতি টানতে হতো মাঝপথেই।

আমরা খেতে বসলাম। দিদির ওপর খেতে দেওয়ার ভার। মা শুধু বসে থেকে দেখাশুনা করছেন। কাকে কী দিতে হবে, না-হবে বলছেন।

মুহূর্তের মধ্যে থালার চারপাশে এক এক করে বাটি দল বেঁধে ভিড় করেছে।

—এটা কী মা? দিদিকে প্রশ্ন করতে পারলো না টেলর।

—ডালনা। খুব ভালো জিনিস, খেয়ে দেখো।

—এই লালগুলি?

—মা হাসলেন,—ও-গুলি হচ্ছে বিট, গাজর, আলুও আছে। খেয়ে দেখো।

আবার চাইতে হবে, বাবা হেসে বললেন। টেলর সবটুকু খেয়ে ফেলতেই মা দিদিকে বললেন, ডালনাটা আর একটু দে—

—অনেক খেয়েছি। আর নয়।

—একটু দিই। ছোট্ট করে দিদি বললো।

—খুব অল্প কিন্তু।

—টেলর পোনা মাছটা ভালো খায়। তমা ওকে আরও......দাদা জানালো।

—থাক, তোমাকে আর জানাতে হবে না। আমি যদি বলি এই লাল আর হলুদ তরকারীর ডালনা তোমার খুব প্রিয়।

বাবা বললেন, এই খাওয়ার কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্প মানে, সত্যি সত্যি ঘটনা ঃ এই তোমাদের মতোই বয়স তখন আমার। গ্রামের এক বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। আমাদের দলের মধ্যে খেতে পারতাম শুধু আমি আর দিনু। অতোএব দুজনেই বাজি ধরলাম।....... কে বেশি রসগোল্লা খেতে পারে। শুধু বেশি খেলেই চলবে না খাওয়ার পর ডন বৈঠক করতে হবে। এবং বমি করলে চলবে না। তবে বাজি বান্‌চাল হয়ে যাবে।

—সাংঘাতিক বাজি দেখছি আপনাদের। টেলর বললো।

—সে-সময় এটাই ছিল আমাদের একটা আনন্দ। তা দুজনে পাল্লা দিয়ে খাওয়া শুরু করলাম। আমি সব সময়েই দিনুর থেকে একটি বেশি এগিয়েছিলাম। অবশেষে দিনু আমাকে ধরলো অর্থাৎ দুজনেই সমান সমান। পেট ফুলে একেবারে ঢোল। খাওয়ার আর জায়গা। নেই। কিন্তু বাজিতে জিততে হবে। অতোএব লোভনীয় রসগোল্লাটা অতিকষ্টে বমি চাপতে চাপতে খেলাম। খাওয়া তো হলো এবার বাকি আছে ডন বৈঠক। বেশি না, একটি ডন দিতেই পেটের মধ্যে যা ছিল হড়হড় করে সব বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ জিতেও জিততে পারলাম না।

—এরই নাম শেষ হলেও হলো না শেষ। টেলর বললো হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়ে।

খাওয়া শেষ হলে দিদি টেলরকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়েই খেতে বসলো। মা'ও বসলেন সেই সঙ্গে।

বাবা শুয়ে পড়েছেন। দাদা ও টেলর গল্প করছে। আমি না-ঘুমিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। এখান থেকে টেলরের ঘরের সব কিছুই দেখা যাচ্ছে—

দাদা এক সময় উঠে শুতে চলে গেল। খাওয়া শেষ হতে দিদি টেলরকে জল দিতে গেল। টেলর এগিয়ে এলো ওর কাছে। এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে শূন্য গেলাসটা দিদির হাতে ফিরিয়ে দিল। দিদি তৎক্ষণাৎ চলে আসতে পারলো না—টেলর তাকিয়ে আছে ওর চোখের তারার দিকে।

—আর জল দেবো? টেলরের মতো কথা বলতে শুরু করেছে দিদি।

—না। ম্লান সুরে টেলর বললো।

খুব ভোরবেলা দিদি বেড-টি দিয়ে গেল আমাকে। দিদিকে ধন্যবাদ জানাবার কথা মনে হতেই তা মিলিয়ে গেল। কেন-না ধন্যবাদ পাবার যোগ্য দিদি নয়, টেলর। টেলরের দৌলতেই যে বেড-টি পেলাম।

চা শেষ করে টেলরের ঘরে গেলাম। দাদা ও টেলর গল্প করছে। বাবা এইমাত্র চলে গেলেন বর্দ্ধমানে। সেখানে এক সাহিত্য সভা হবে।

আজকের ছুটির দিনটা আমার খুব প্রিয়। একে ছুটি তাতে বাবা বাসায় নেই। এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছোটাছুটি অর্থাৎ চলাফেরা করতে পারবো, টেলরের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবো। বাবার ভয়ে ঘরের এক কোণে চুপটি করে বসে থাকতে হবে না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। মাঝে একবার বাইরে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে। ফিরে এসে দেখলাম, গন্ধতেলের শিশি থেকে টেলরের হাতে তেল ঢেলে দিচ্ছে দিদি। আচমকা আমাকে দেখে হাতটা একবার কেঁপে উঠলো তার! তাতেই অনেকখানি তেল ভিজিয়ে দিল মেঝের বুক।

টেলরের প্রতি দিদির এই কাজটুকু বেশ লাগলো আমার।

সীমার ওপর অভিমান করে অনেক দিন চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আর পারলাম না—কতোদিন আর থাকা যায়?

—বাবুর রাগকে সত্যই ভয় করতে হয়—প্রথমেই সীমা বললো।

—নিশ্চয়ই হয়।

—তা তো দেখতেই পেলাম। নিষ্ঠুর পাষাণ না-হলে কেউ পারে এমনি ভাবে.....ওর গলা ধরে এল কান্নায়। কতোদিন বলেছি, আমি একা একা থাকি.......

—আমার অন্যায় হয়েছে সীমা।

—থাক আর অন্যায়ের দোহাই দিতে হবে না। তুমি কী তা তো জানতেই পেলাম।

—কী জেনেছ? বলো—

—তুমি আর আগের মতো নেই। অনেক, অনেক দূরে সরে গেছো।

—দেখো সীমা! আজ আমি তোমার সঙ্গে কোনও তর্ক করব না, কিছু বোঝাতেও চেষ্টা করবো না। শুধু একটি কথা বলবো, এই যদি তুমি আমাকে বুঝে থাকো তবে সত্যি ভুল বুঝেছো।

—তবে এমন করে কষ্ট দাও কেন?

—তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি বলে।

শান্তিনিকেতন থেকে দু'দিন ঘুরে এলো টেলর। দিদি দেখা করলো একদিন ওর সঙ্গে।

বললো টেলর, আপনার জন্য সুন্দর একটা জিনিস কিনেছি। জাতে পেপার-ওয়েট। লেখাপড়া করেন। কাগজগুলিকে ধরে রাখবার জন্য এটা এনেছি।

টেলর দিদির হাতে তুলে দিতে গিয়ে বাধা পেল। কেন-না ওটা নেবার দিদির কোনও লক্ষণ

দেখা গেল না।

—আপনি নেবেন না? শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলো টেলর!

—হঠাৎ আমাকে এটা দেবার........

—কোনও কারণ-অকারণ খুঁজিনি। লিখবার সময় এটার প্রয়োজনীয়তা আছে আর আপনাকে দিতে ইচ্ছে হলো তাই কিনলাম। না-নিলে আমি আপনাকে জোর করতে পারি না। আরও শান্ত স্বরে টেলর বলল।

তবুও নিল না দিদি।

দিদি ওটা না-নেওয়াতে বেশ বোঝা গেল, টেলর লজ্জা পেয়েছে খুব।

সীমার কথা কাউকেই বলা হয়নি। বলা হয়নি মানে আমিই জানাইনি। কতোবার ভেবেছি দিদিকে বলবো কিন্তু মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারিনি। হয়তো একজনের কাছে পারি। যে-আমাকে সত্যই স্নেহ করে, ভালোবাসে—সে টেলর। ঠিক করলোম, টেলরের কাছে সব খুলে বলবো এবং সীমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবো। যা ভাবা সেই কাজ।

—আমার সঙ্গে আজ তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। সীমার বাড়িতে গিয়ে বললাম।

—কোথায়?

—জাহান্নামে।

—ওর থেকে ভালো জায়গা অবশ্য আমি আশাও কবি না।

—আশা করতে তোমাকে হবে না। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও—

—কী ব্যাপার বলো তো?

—ওইতো তোমাদের রোগ। সব কিছু না-জেনে নিয়ে এক পাও বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে......

—আমি কী তাই বললাম?

—পথ পরিষ্কার করছি। একটু গম্ভীর হতে চেষ্টা করলাম।

—কিসের পথ!

—পায়ে চলা পথ নয়,—জীবন চলার পথ।

—যতো সব হেঁয়ালিভরা কথা! শিক্ষকের চাকরি-টাকরি পেয়েছো বুঝি? সীমা হাসলো।

পথে যেতে যেতে বললাম—আজ তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো আমার এক বন্ধুর। আবার দাদাও বলতে পারো। খুব ভালো মানুষ, বুঝেছো। জাতে.....

—জাতে কী?

—কী বলোতো? আমি টুকরো হাসলাম।

—বাঃ আমি কেমন করে জানবো। তবে তোমার যখন বন্ধু তখন বাঙালি ছাড়া......

—সাহেবও হতে পারে। হ্যাঁ, গ্রেট টেলর সাহেব।

কিন্তু টেলর বাসায় নেই। জিম বললো, আজকে Sir-এর আসতে একটু দেরি হবে। কলেজে কী যেন একটা work আছে—

আমি ও সীমা চুপ করে বসে রইলাম টেলরের আশায়। ইতিমধ্যে জিম দু-কাপ চা করে আনলো। সঙ্গে খাবার।

—এ-গুলো আবার আনলে কেন জিম? শুধু চা-ই তো যথেষ্ট এ-সময়।

Stop Sir Stop! Sir যদি শুনতে পান বিকেলে এসে আপনারা তায় আবার দিদিমণি এই First এসে শুধু One cup tea খেয়ে গেছেন তবে আমাকেও Sir-এর কাছে অনেক গালাগালি eat করতে হবে।

সীমা হাসবার উপক্রম করতেই অলক্ষ্যে ওকে একটি ছোট্ট চিমটি কেটে দিলাম। অর্থাৎ নীরবেই জানাতে চাইলাম, দোহাই তোমার হেসো না, জিমের স্বভাবটা ওইরকমই।

অনেক সময় অপেক্ষা করলাম। টেলর এলো না।

—আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে বলো জিম?

—ঠিক Understand করতে পারছি না, কলেজে work আছে বলে গেছেন কিন্তু তাই বলে এতো Late?

—তবে আমরা উঠি। তুমি বরং টেলরদা এলে বোলো আমি......

—Yes Sir বলবো। জিম একগাল হাসলো।

—হাসলে কেন জিম? ওর ওই হাসি দেখে আমি ওকে জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারলাম না।

—কিছু Mind করবেন না বলুন?

—না, তুমি বলো।

—বলবো, আপনি এসেছিলেন আর এসেছিলেন আপনার Lover। শেষটুকু খুব আস্তে বললো জিম।

—আচ্ছা আচ্ছা তুমি তাই বলো, আমি হাসলাম। জিমটা সত্যই পাগল!

একদিন ছুটির বিকেলে দিদি ওর কলেজের এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। সেখান থেকে টেলরের ওখানে যাবে।

বন্ধুর বাড়ি থেকে যখন রাস্তায় পা দিয়েছে তার আগে থেকেই মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যাব অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নামতে-না-নামতেই। দিদি জোরে পা চালালো। টেলরের বাড়ির কাছে প্রায় এসে গেছে।

বৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিল দিদি অর্থাৎ ভদ্র বলে অভিহিত করলো মনে মনে। কেন-না রাস্তায় তাকে একা পেয়ে বৃষ্টি স্নান করায়নি। টেলরের বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝমঝম করে জলেব একটা ধারা নামলো।

ঠিক কুড়িটি সিঁড়ি ভেঙে দিদি টেলরের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গেল না ভিতরে। টেলর সুন্দর গলায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করছে :

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥

এমন সুন্দর কবিতাটি তায় টেলরের কণ্ঠে অপূর্ব লাগছে! এ-ভাবে চুরি করে, কাঁপা মন নিয়ে, অস্থির হয়ে শোনার কোনও মানে হয় না। দিদি ভিতরে পা দিল।

—আপনি? টেলর প্রশ্ন করলো।

—বৃষ্টিকে ভালো বলতে হবে, ভিজিয়ে দেয়নি পথে পেয়ে—

—বসুন। টেলর এগিয়ে গেল জানলার দিকে। বাইরের বৃষ্টির রূপ দেখতে লাগলো এদিক-ওদিক তাকিয়ে।

দিদির কথা শুনে জিম ঘরে এলো।

—Sir, দিদিমনির জন্য tea food, নিয়ে আসবো?

—হেসে দিল টেলর। আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিল, নিয়ে এসো।

জিম চলে গেলে দিদি টেলরকে বললো, খাবারের প্রতি আজ এতোটুকু লোভ নেই। তবে......

—বলুন—

—আপনার আবৃত্তি শুনবো।

—দেখুন, আমি ঠিক আবৃত্তি করতে পারি না—তবে টেগোরের কবিতা আবৃত্তি করতে আমার ভালো লাগে তাই করছিলাম—কিন্তু তা স্টেজে দাঁড়িয়ে বলবার মতো বা আপনাকে শোনাবার

মতো নয়। ম্লান হাসলো গ্রেট টেলর।

—ভূমিকা শেষ হয়েছে! এবার আবৃত্তি করুন।

তবু টেলর চুপ করে রইলো। দিদি জানলাব কাছে এসে দাঁড়ালো টেলরের মুখোমুখি।

—কিছুটা শুনিয়েছেন, এবারে পূর্ণ করুন। কোনও কিছুবই অর্দ্ধেক ভালো নয় এমনকি.......

কড়.......কড়. .....কড়াৎ.......আকাশের বুক চিরে মেঘে মেঘে সংঘাতের গর্জন শোনা গেল। কেঁপে উঠলো ওরা। দিদি আরও সরে এলে টেলরের বুকের কাছে। টেলর স্থির থাকতে পারলো না। এতোদিনের নীরব ভালোবাসা, বলি বলি করেও যে-কথা টেলর এতোদিন দিদিকে বলতে পারেনি সেই না-বলা কথারই বহিঃপ্রকাশ রূপে টেলর দিদিকে টেনে নিল বুকে। হাত কাঁপছে, কাঁপছে বুক। সেই বুকের স্পন্দন টেলরের বুকে কান রেখে দিদি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে। জোরে বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টিব ছাঁট এসে দুজনকে ভিজিয়ে দিলো। কিন্তু কেউ নড়লো না। টেলবের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে দিদি চায় না। পথে যে-বৃষ্টির ভয়ে দিদি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এখানে এসে উঠেছে সেই বৃষ্টিকেই তখন অভ্যর্থনা জানাতে মন চাইছে। যতো খুশি ভিজিয়ে দিক, বৃষ্টি আজ তার জীবনে ভালোবাসার দুয়ার খুলে দিযেছে। বৃষ্টি! সুন্দব বৃষ্টি!! তার স্মৃতির পাতায চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

—কই আবৃত্তি করলে না? টেলরেব বুকে মুখ লুকিয়ে দিদি বললো।

—শোনো ঃ টেলর শুরু কবলো,

সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবাব
জগতে কেহ যেন নাহি আব॥

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥
বলিতে ব্যথিবে না নিজ কান
চমকি উঠিবে না নিজ প্রাণ
সে কথা আঁখিনীবে মিশিযা যাবে ধীরে
বাদল বায়ে তাব অবসান।
সে কথা ছেয়ে দেবে দুটি প্রাণ॥
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার।
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার॥

আছেতো তারপরে আরওমাস—
উঠিবে কত কথা কত হাস।
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ—

জগৎ চলে যাবে আরও মাস॥
ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়॥

বৃষ্টি থামলে, টেলর দিদিকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলো। সে বিদায় নিল মোড়ের মাথা থেকেই। আমি তখন মিনতি কাফেতে বসে সেই লোকটির সঙ্গে গল্প করছিলাম। ভাবলাম, বাড়িতে গিয়ে দিদিকে খুব একচোট বকবো। একি অভদ্রতা! টেলরকে সেই কলেজ স্ট্রিট থেকে এই পর্যন্ত আনতে পারলো আর বাড়িতে আনবার.. .. পরক্ষণেই মতো বদলে গেল। এমনও তো হতে পারে, দিদি কাউকে কিছু জানতে দিতে চায় না। ওদের মধ্যে এমন একটা কিছু হয়েছে—যা-সুন্দর যা-ভালোলাগার, তাইতো টেলরকে বাড়িতে নিয়ে যায়নি। না যাক, দিদিকে কিছু বলবো না—ও ভীষণ লজ্জা পাবে আমার কাছে, সেটা আমি দেখতে চাই না।

দিন কয়েক পরে দিদি টেলরকে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে বললেও কথামতো সে উপস্থিত হতে পারেনি। তাই পরদিন যেতেই টেলর বললো, আশ্চর্য মেয়ে তুমি!

—আসতে পারিনি বলে? দিদি হাসবার চেষ্টা করলো। আসলে কী জানো, আমার কপালটাই খারাপ। তানা হলে কোথাকার কোন দিদিমা, যাকে আমি কোনোদিনও দেখিনি, তিনি আমাদের বাড়ি আসতে যাবেন কেন? আর এলেও আমাকেই-বা টেনে নিয়ে যাবেন কেন মায়ের মন্দিরে।

—মায়ের মন্দিরে! টেলর অবাক হয়।

—হ্যাঁ Goddess Kali ! সব অভিমান উড়িয়ে নিয়ে যাবার হাসি হাসলো দিদি।

—আমি খুব আশা নিয়ে ছিলাম তুমি আসবে—

টেলরের মন থেকে দুঃখের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিদি বললো, আচ্ছা গ্রেট—

—উঁ।

—তুমি আমাকে খুব ভালোবাস, তাই না?

—খুব ভালোবাসি বললেও খুব কম বলা হবে। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই আমি তোমাকে......

—এ-জন্যই তো বলেছি, তুমি ভীষণ চাপা। তা-না হলে আমাকে কিছু না-জানিয়ে তোমার খাতার পৃষ্ঠায় লিখতে যাবে কেন?

টেলর হাসলো। বললো, সব কিছু চাইলেই তা পাওয়া যায় না। এটা তো তুমি জানো?

—তা জানি, কিন্তু আগের পাওয়ার কথা চিন্তা না-করে একবার চেয়েই দেখতে.......

—আমি জানি তাহলে শান্তি আসতো না, আনন্দের সৃষ্টি হতো না, যা-হতো তা শুধু তোমাকে আঘাত দেওয়া।

—আমাকে এতো বড়ো করে দেখছো কেন তুমি?

—তুমি বড়ো তাই দেখছি। টেগোরের মহান বাঙলা ভাষা, আশ্চর্য অবিস্মরণীয় বীর বাঙালি জাতি আমার কাছে নমস্য, একান্ত প্রিয়। টেগরের দেশের বাঙালি মেয়ে তুমি! তুমি কী কম বড়ো! তাই তো সামান্য একজন বিদেশি হয়ে বাঙালি মেয়ের কাছে কিছু বলতে সাহস করিনি। এই জাতটাকে আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি—আবার ভয়ও করি।

বিদায় নেবার আগে দিদি বললো, আগামীকাল বিকেলে......

—আবার আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো এই তো?

—ঠিক তাই।

পরদিন বিকেলের অনেক আগে দিদি স্নান করলো। গায়ে জড়ালো আকাশী রঙের শাড়ি। ওই

রঙেরই ব্লাউজ। পাউডারের পাফটা মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়েই টেনে টেনে কাজল পরলো চোখে। আয়নায় ভালো করে দেখলো, কোথাও এঁকে বেঁকে গেছে কী-না!

—কোথায় যাবি রে দিদি? সেন্টের ঘ্রাণ নিয়ে আমি বললাম।

—এক বন্ধুর বাড়িতে, গোড়ালির ওপর থেকে কাপড়টা নীচের দিকে নামিয়ে দিতে দিতে বললো।

—তা ভালো। রোজ রোজ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া ভালো।

—ইয়ার্কি দিচ্ছিস? চোখ পাকালো দিদি।

—একে বি.এ. পড়ছিস, আর ক'দিন পর বিয়েও হয়তো একটা হয়ে যেতে পারে। তোর সঙ্গে ইয়ার্কী!

—থাম, আর ফাজলামো করতে হবে না।

—তা তোর বন্ধুটিকে একদিন নিয়ে আসিস না, আলাপ করা যাবে।

—তোর সঙ্গে তার আলাপ আছে। সযত্নে টিপ পরতে পরতে বেফাঁসে দিদি আসল কথাটা বলে ফেললো।

—আলাপ আছে আমার সঙ্গে? বলিস কী!

দিদি বুঝতে পারলো তার কথা বলায় ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বললো, না-না মিনতির সঙ্গে তোর আলাপ হবে কী করে? পরে তোর সঙ্গে একদিন পরিচয় করিয়ে দেবো।

নির্দিষ্ট স্থানটিতে দিদি এসে পৌঁছালেও টেলর তখনও আসেনি। একঘন্টা পর্যন্ত দিদি অপেক্ষা করলো। টেলর এলো না। টেলরের জন্য আর অপেক্ষা না-করে ওর বাড়ির দিকেই দিদি রওনা হলো।

—আশ্চর্য মানুষ তুমি! খাটের উপর রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে টেলরকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে দিদি বলে উঠলো।

শোয়া থেকে উঠে বসলো টেলর, তুমি আসবে আমি ঠিক........

—বিশ্বাস করতে পারোনি কেমন? বেশ তো তোমার বিচার! তোমার কী ধারণা আমি ইচ্ছে করে, শখে পড়ে কথার খেলাপ করি?

—তুমি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো—

—সিরিয়াস হবারই কথা। ঠায় একঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা মানেই যন্ত্রণা ভোগ করা। রাস্তার লোকগুলিও হয়েছে যেমন.........একটা কথা বলবো বিশ্বাস করো—

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন থাক।

—বেশ থাক! তবে আজ যেতে পারিনি বলে সত্যই আমার আফসোস হচ্ছে। চলো, এখন বেড়িয়ে আসি—

—তুমি একা যেতে পারো।

—তুমি যাবে না?

—না।

—আমার উপর রাগ করে?

দিদি কোনও উত্তর দিল না। পরে বললো, সে-অধিকার নেই।

—আছে। শুধু তোমার একার নয়—আমারও। তোমাকে আজ আমি নিয়ে যাবোই। টেলর জামা-কাপড় পরতে শুরু করে।

—মিথ্যেই পরছো।

—তার মানে তুমি যাবে না, এই তো?

—হ্যাঁ।

টেলর দিদির কাছে এগিয়ে এলো। ওর হাতখানি চেপে ধরে চোখের ওপর চোখ রেখে বললো, আরেকবার বলো তো? পারবে তুমি না-বলতে? টেলরের গলার স্বর কেমন গাঢ় শোনালো।

—চোখ সরিয়ে নাও। দিদি অন্য কথা বললো।

জিম ঘরে এলো হয়তো টেলরকে কিছু বলতে। টেলর ভূত দেখার মতো চমকে উঠে তাড়াতাড়ি দিদিকে ছেড়ে দিলো। এই দৃশ্য দেখবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না জিম। সে-ও লজ্জা পেয়েছে কম নয়। বললো, I am sorry Sir! extremely sorry! বলেই একরকম ছুটে চলে গেল জিম।

—ইস্....! দিদির মুখ দিয়ে বের হলো।

—কী হলো?

—জিমের সামনে......তাছাড়া ও যদি সমীকে......

—পাগল হলে? তেমন জিম ও নয়। বুদ্ধি বলতে ওর মধ্যেও কিছু আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে বৈকালিক আহার সারলো ওরা একটি রেস্টুরেন্টে। পরে টেলব বললো, তুমি হয়তো রাজি হবে না, তা না-হলে একটা কথা বলতাম।

—না মরেই ভূত! কি করে বুঝলে যে রাজি হবো না?

—একেবারে যে হবে না, সে-কথা তো আমি বলিনি।

—কী বলেছো তবে?

—হয়তো হবে না।

—উঃ সাঙ্ঘাতিক কথা বলতে পারো। শিখেছিলে বটে বাংলা ভাষা—

—সেজন্য আমি সব সময়েই গর্ব অনুভব করি যাক গিয়ে, যা বলছিলাম—

—কই বলো? চুপ করে গেলে কেন?

—ইচ্ছে হয় একটা ফটো তুলি। আমি আসছে সপ্তাহে আবার শান্তিনিকেতনে যাবো। তাই যাবার আগে........

ফটো তোলার প্রশ্নে না-গিয়ে দিদি বললো, কতোদিন থাকবে?

—বেশি দিন থাকবার কী উপায় আছে? এ-দিকে কলেজ, ও-দিকে তুমি—অতোএব যথা সম্ভব শীঘ্র ফিরবো।

—তোমার যথাসম্ভবটাই কতোদিন শুনি না?

—সাত-আট দিন; আবার দু-তিনও হতে পারে।

—দু'দিন কেন?

—বাঃ, মন খারাপ হলে ওর বেশি থাকবো কেমন করে?

গতকাল সীমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওকে পাইনি। তাই আজকেও যাবো বলে স্থির করলাম। গেলামও।

—কাল এসে তোমাকে পাইনি, কোথায় গিয়েছিলে?

—একটা ট্যুইশনি পেয়েছি। সপ্তাহে চারদিন। সোম, মঙ্গল, বুধ আর শনিবার।

—ও! বেশ কয়েকদিন ধরে—মানে লুন্দিপুর থেকে আসার পর থেকেই তোমাকে একটা কথা বলবো বলে ভাবছো—কিন্তু... ...

—কী কথা?

—প্রথম হচ্ছে কলকাতায় তুমি কোথায় থাকো-না-থাকো ইত্যাদি জানিয়ে চিনুমাসিকে একটি চিঠি দিতে হবে। কিন্তু আমি তা দিচ্ছিও না বা ভাবছিও না।

—কী ভাবছ তবে?

—দ্বিতীয়টা ভাবছি এবং এটাই........

—দ্বিতীয়টা কী?

—চিনুমাসির কাছে তোমার কিছু টাকা আছে না?

—কী বললে? যেন শুনতে পায়নি সীমা।

—চিনুমাসির কাছে তোমার কিছু টাকা......

—না-না ও-টাকা আমার নয়!

—বাগ্‌দীপাড়ার গুন্ডাটা নাকি তোমার বাবাকে দিয়েছিল, তোমার বাবা আবার তোমাকে দিতে চিনুমাসির কাছে রেখেছিলেন, সেই চিনুমাসি আবার পরের ধন যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার জন্য তোমাকে খুঁজবার ভার আমার ওপর চাপিয়েছেন। অথচ তুমি বলছো ও-টাকা তোমার নয়। ব্যাপার কী বলো তো? অবশ্য আপত্তি থাকলে বোলো না—আমি শুনতে চাই না।

—তুমি শুনতে চেয়োনা সমী, অন্তত আজ নয়। পরে তোমাকে একদিন সব কথা খুলে বলবো।

হাঁপাতে লাগলো সীমা। বুকটা ঘনঘন ওঠা-নামা করছে। কপালে জমেছে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। বসলো চেয়ারে!

—তুমি বিশ্রাম করো, আমি যাই, সীমাকে বললাম।

—আরেকটু বসো।

—রাত হয়েছে। বাড়ি যেতে হবে না?

—এইটুকু তো মাত্র পথ—

—পথের ভয় করছি না। ভয় হচ্ছে.......

যে-ভয় করেছিলাম ঠিক তাই হলো। বাবা ডাকলেন।

—এতো রাত অবধি কোথায় থাকা হয়? এটা কি মেস বাড়ি পেয়েছো? সেখানেও সময়-অসময় আছে।

—একটা কাজ ছিল, সেটা.......

—কাজের লোক তো তুমি চিরদিনের। বলেছি না, বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে হবে না। নাকি আড্ডা দিয়ে আমাকে ছোটলোকের মতো না-বকালে তোমার চলছে না। ঘরে বিস্তর বই রয়েছে, সে-গুলি পড়লে কি জাত যাবে না যেটুকু মূর্খ আছ তাও লোপ পাবে? বিদ্যার তো জাহাজ হয়েছো......কতো আশা ছিল........সব চুরমার হয়ে গেল.............বাবা চলে গেলেন নিজের ঘরে।

—রাত দুপুর করে বাড়ি না-এলে কি তোর ভালো লাগে না? এবারে মা বললেন। কোথায় যাস কি করিস না-করিস কিছুই তো জানাস না। এতো স্বাধীন হয়ে উঠলি কবে থেকে?

—হবে না কেন? আর একটু আদর করো, ছেলেকে মাথায় তুলে রাখো, জন্মদিন পালন করো....নিজের ঘর থেকে আবার বাবা বেরিয়ে এলেন।

মাথাটা একটু উঁচু করেছিলাম, বাবা আসতেই নিচু করলাম আবার।

—দেবো একদিন বাড়ি থেকে দূর করে। এ-সব বেয়াদপি কার সহ্য হয় শুনি?......রাগে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন আবার।

সারা রাত ঘুমুতে পারলাম না। ক্ষত-বিক্ষত, এলোমেলো মন ছুটে যেতে চাইছে—যেখানে কঠোর শাসনের মানা নেই। আমি শাসন অবশ্যই চাই, কিন্তু সে-শাসনের মাঝে একটুখানি স্নেহ-ও চাই। আমি অন্যায় করি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলে এমন কোনও মারাত্মক অন্যায় করি না যার জন্য কারও ক্ষমাটুকু পর্যন্ত পাবো না। বাবা-মার স্নেহ ভালোবাসা পেতে কি আমার ইচ্ছা করে না? অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে জানি না আর কতো দিন এ-ব্যথার বোঝা টেনে বেড়াবো। কতোদিন হলো বাবা-মার মুখ থেকে একটু ভালোলাগার কথা শুনি না।

অনেক দিন পর টেলর সেদিন বিকেলে আমাদের বাড়ি এলো।

—আমাদের বাড়িটা যেন তোমার কাছে দিন দিন অপরিচিত হয়ে উঠছে, বললেন মা।

—আমি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম মা। আজকেই ফিরলাম।

—কি আশ্চর্য! সে-কথা আগে বলবে তো। শুধু শুধু তোমাকে আমি কতো কথা শোনালাম।

—মায়েদের কথা শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। টেলর হাসলো।

দিদি চা করে টেলরকে দিল।

—তুই চা খাবি সমী?

—বেশি থাকলে এক কাপ দিস।

—তুমি আজ রাতে খেয়ে যাবে টেলর, মা বললেন।

—অন্যদিন মা, আজ নয়।

—আজ নয় কেন?

—জরুরি কাজ আছে।

—এখানে খাওয়া শেষ করেও তুমি তোমার জরুরি কাজ করতে পারবে।

—আজকের খাওয়াটা জমা থাক, আমি কাল এসে খাবো—

ঘর থেকে মা চলে যেতেই দিদি বারান্দায় এসে বারবার ঘোরাঘুরি করছে।

দিদির অবস্থার কথা চিন্তা করে বললাম, আমি আসছি টেলরদা, আপনি একটু বসুন—

—তোমার আসা মানে তো সেই......

—না, তাড়াতাড়িই আসবো, হাসবার চেষ্টা করলোাম একটু!

—খাবে না কেন? সবার কান বাঁচিয়ে দিদি খুব আস্তে টেলরকে জিজ্ঞেস করলো।

—সত্যি কাজ আছে।

—খাওয়াটা কি একটা কাজ নয়? মা তোমাকে বললেন, তাঁর কথাটা শোনা কি একটা জরুরি কাজ নয়?

—এমন করে বললে যে আমার মনের ভেতরেও এখন কাজ হতে শুরু হয়েছে।

—তার মানে খেয়ে যাবে বলছো? দিদির ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

—ইচ্ছে থাকলেও এখন কোনও উপায় নেই তমা। এখন কোনও মুখে মাকে গিয়ে বলি যে, —হ্যাঁ খাবো।

—নিজের মুখে গিয়ে বলবে।

—কি ভাববেন বলো তো?

বেশ কয়েকদিন পর দিদি একদিন বিকেলের দিকে টেলরেব বাড়ি গেল।

—Sir বাসায় নেই, কলেজ থেকে এখনও Return করেন নি।

—ও!

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? Sit down.

—কি যেন চিন্তা করছিল দিদি।

—Sit down হতে বলছি। Sir এক্ষুণি এসে পড়বেন—দিদিমণি।

—উঁ!

—আপনাকে কী এখন tea দেবো, না Sir এলে একসঙ্গে খাবেন?

—Sir এলে খাবো, দিদি জানালো। পরক্ষণেই ভাবতে লাগলো, জিমের কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা নূতন সুর বইছে। যেন কোনও বাধা নেই, কোনও লজ্জা নেই, আর Sir এলেই একসঙ্গে তার সঙ্গে চা খাওয়া উচিত; আগে নয়। ওটাই যেন নিযম। মনে মনে হাসলো দিদি। জিম জানে, তাদের দুজনের সম্বন্ধে সব কিছুই সে জানে। আর জানবে না-ই-বা কেন? যে-দৃশ্য সেদিন সে দু'চোখ ভরে দেখেছে! লজ্জার হাসি নেমে এল দিদির দু'ঠোঁট ভরে। জিমকে সেদিন ভারী ভালো লাগলো দিদির। ভালোবাসায় মন হয় উদার, প্রশস্ত, সব কিছুতেই একটা ভালো লাগা ভাব। নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসটাকে তখন তুচ্ছ মনে করতে কষ্ট হয়। দৃষ্টি প্রসারের ফলে যে-তুচ্ছ, সে-উচ্চ হয়ে চোখে ধরা দেয়। দিদিই-বা এর থেকে ব্যতিক্রম হবে কেন? সে যখন মানুষ আর সাগর পারের একজন টেগোর-ভক্ত মানুষকে মন দিয়েছে তখন......

টেলর এলো বিকেল শেষ করে। জিজ্ঞেস করলো, কখন এসেছো?

—সেই বিকেলে। বাড়ি যাই এখন—

—পাগল হলে নাকি? বাড়ি ফিববে মানে?

—তবে কি এখানে থাকবো?

দিদির মুখের দিকে একটু ম্লান হেসে মাথা নিচু করে টেলর বললো, আমি সে-কথা বলছি?

—দেখছো, দিদি আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে টেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—গোধূলি বেলায় পরম নিশ্চিন্তে কেমন ডানা মেলে পাখিরা ফিরছে বাসার দিকে। ওরা এখন কোনও কথা শুনবে না, বাড়িতে পৌঁছবেই।

—এটা কি বাড়ি নয়?

—হ্যাঁ, বাড়ি। তবে তোমার—

—আমারটাকে তোমার করেই যদি দেখতে না-পারলে, তবে তুমি কেমন করে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করবে!

—তুমি আর আমি নিয়েই বুঝি মহৎ সাহিত্য! দিদি হাসলো—প্রাণ খোলা হাসি।

চা খেতে খেতে টেলর একসময় বললো,—এতোদিন আসোনি কেন?

—পড়াশোনার চাপ পড়েছে। বুঝেছ গ্রেট টেলর—প্রাণ-মাতানো হাসি হাসলো দিদি। হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। আসলে দিদিকে দেখতেই সুন্দর।

—May I come in Sir? জিম দোর গোড়া থেকে অনুমতি চাইলো।

—কী ব্যাপার জিম? নোটিশ দিয়ে কবে থেকে আবার তুমি আসতে শুরু করলে—জিজ্ঞেস করলো টেলর।

—নোটিশটা এতোদিন use করিনি। এবার থেকে করবো। এখন একটা সিরিয়াস ভুল হয়ে গেছে sir, তাই আপনাকে বলতে এলাম।

—কি বলো তো?

—আপনি নিশ্চয়ই tea drink করেছেন?

—অর্ধেক পর্যন্ত হয়ে গেছে।

—ডাক্তারবাবু আপনাকে ওটা drink করতে no বলে দিয়েছেন।

—তাইতো! একেবারেই ভুলে গেছি জিম।

—তাহলে এখন থেকেই stop করুন। —ওই Half tea টুকু আমাকে দিন।

চাকর জিম। Sir এর প্রতি অসীম ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে টেলরের হাত থেকে একরকম কেড়েই নিল কাপটা। পরে বললো, angry করবেন না Sir। আমি আপনাকে এক্ষুণি এককাপ milk দিয়ে যাচ্ছি—Tea মনে করে drink করবেন।

—গ্রেট! জিম চলে যেতেই দিদি একটু গম্ভীর হয়ে গাঢ় ভাবে টেলরের দিকে তাকিয়ে বললো।

—বলো।

—তুমি কি আমার কাছে চিরদিনই চাপা থাকবে?

—এমন কথা বলছো কেন?

—তোমার কি হয়েছে আগে তাই বলো। ডাক্তার এসেছিল কেন তবে?

—ও.........এই ব্যাপার! টেলর হাসলো মিথ্যা তুমি ব্যস্ত হয়েছো। এমন কিছু হয়নি।

—তবু বলবে না? চোখ দিয়ে দিদি শাসন করলো।

—বলছি, বলছি; কিন্তু আমার প্রতি এতোটা ভালোবাসা এতোদিন তোমার কোথায় ছিল?

—তার মানে? ভ্রূ কুঁচকালো দিদি।

—মা—নে, এই যে রোজ রোজ তোমাদের বাসায় যেতাম, তোমার কলেজের সামনে ঠায় অপেক্ষা করতাম! দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটিকে সুড়সুড় করে.......

—সুড়সুড় করে আবার কি? দিদি বুঝলো না।

—সুড়সুড় করতো পায়ের মধ্যে, কেমন জানি-ঝিমঝিম আরম্ভ হতো আর কি.........

—ঝিঁ-ঝিঁ ধরতো বলো। তার নাম হয়েছে সুড়সুড় করতো..........দিদি হেসে ফেললো। —পরে বললো, তোমার এ-সব ভালোবাসা-বাসির ফিরিস্তি শুনতে চাই না, ডাক্তার এসেছিলেন কেন?

—উঃ এখনও মনে করে রয়েছো দেখছি।

—কেন রাখবো না।

—সত্যি কথা বলতে কি তমা, হয়নি আমার কিছুই। তবে ক'দিন ধরে পেটে—মানে লিভারে একটু ব্যথা হচ্ছে। এর আগেও অবশ্য হয়েছে.....

—এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। নিয়মিতো ডাক্তার দেখাচ্ছো তো?

—দু'দিন পরেই দেখবে কোথায় চলে গেছে ব্যথা।

এর কয়েকদিন পরেই দিদি গেল টেলরের বাসায়। সন্ধ্যার দিকে। টেলরের ঘর অন্ধকার। অর্থাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার দূর হয়ে সেখানে আলোর হাসি ফুটে ওঠেনি। জিমকে পেয়ে দিদি জিজ্ঞেস করলো, তোমার Sir কোথায়?

—Room-এ আছেন।

—ঘরে আলো জ্বালা হয়নি যে? Sir ওই অন্ধকার ঘরে কি করছেন?

—Sir এর মনে sorrow হয়েছে।

দিদি পা চালালো টেলরের ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

—গ্রেট! শান্ত সুরে ডাকলো দিদি।

—আলোটা নিভিয়ে দাও। করুণ শোনালো টেলরের গলা।

দিদি টেলরের কাছে সরে গিয়ে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, কি হয়েছে তোমার?

টেলর বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠোঁট দুটো ভীষণ ভাবে কাঁপছে। পারছে না বলতে। জলে চোখ দুটি টলটল করছে। তক্ষুনি হয়তো চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে।

দিদি বুঝলো এই মুহূর্তে টেলর কিছুই বলতে পারবে না। অতোএব তাকে তখন কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা।

টেলরের বিছানার উপর এসে শুয়ে পড়লো দিদি। ও আজ ভীষণ ক্লান্ত। সারাটা দুপুর পড়াশুনা করে বিকেলবেলা হন্যে হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে সমস্ত বই-পাড়া কি যেন একটা বই কিনবার জন্যে। না-পেয়েই এসেছে টেলরের বাড়ি। মনে আশা, যদি পাওয়া যায় টেলরের কাছে।

জানলার পাশ থেকে টেলর সবে এলো, বসলো খাটের ওপর। দিদি শোওয়া থেকে উঠে বসলো। তাকাল টেলরের মুখের দিকে। একখন্ড জমাট অন্ধকারের মধ্যে মুখোমুখি দুটি প্রাণী চুপ করে বসে আছে। কথা নেই কারো মুখে। যেন দুজনেই বোবা। নয়তো মৌনব্রত অবলম্বন করছে। দিদি জানে, টেলর আগে কথা বলবে। তাই সে কোনও কথা টেলরকে জিজ্ঞেস করলো না। শুধু ওর মুখে নিজের দৃষ্টি ফেলে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো ঘনঘন।

—তমা! অনেক দূর থেকে যেন টেলব ডাক দিল।

—বলো!

—আজ সকাল থেকে এতো বেশি.....

—থামলে কেন? বলো—ধীরে-ধীরে দিদি বললো।

—বাবার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছে। একটু থেমে টেলর আবার বললো, জানো, এই দিনই তিনি মারা গিয়েছেন.........

—দুঃখ করে কি লাভ বলো? বাবা আর ফিরে আসবেন না, তুমি মন খারাপ করলেও না। পুরানো কথাই দিদি নূতন করে টেলরকে শোনালো।

চাঁদের আলোর টুকরো তখন ঘরের মধ্যে এসেছে। আছড়ে পড়েছে ওদের গায়ে। আকাশের বুক চিরে খোদাই করা হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত তারাদের। বহু দূরের তারাগুলি থেমে থেমে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। চন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছে। তারাগুলি চোখ মেলে তাকে দেখছে, না জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঘরের দুটি প্রাণীকেও দেখছে বলা মুশকিল। একটা দমকা হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে দেয়ালের গায়ের ক্যালেন্ডারটাকে বারকয়েক এপাশ ও-পাশ নাড়াচাড়া করলো অর্থাৎ দোলা দিল।

—চলো একটু বেড়িয়ে আসি, টেলরের মনকে স্বাভাবিক করে আনবার জন্য দিদি বললো।

—আজ থাক, জানালো টেলর।

—এক্ষুনি চলে আসবো—

—অন্য একদিন তমা, টেলর অনুরোধ করলো।

—তবে আমি চলি! দিদি উঠে দাঁড়ালো।

—রাগ কবলে?

—না, রাগ করবো কেন?

—আমার মনটা আজ......

—বুঝেছি টেলর।

—আমি জানতাম, আমার মনেব সব কিছু তুমি বুঝতে পাববে। যাক কালকে আসবে?

—হয়তো না। দিদি করুণ হাসলো।

—না কেন, এসো—

—কালকে পড়তে হবে। একটুও সময় পাবো না।

—হয়তো আর সময়ও পাবে না!

—অমন কথা বলছো কেন? তোমার মন ভালো নেই, বিশ্রাম করো। আমি সময় পেলেই আসবো।

বাবা কতোগুলি কাজ কবে বাখতে বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু একেবাবেই তা করতে ভুলে গেছি। মনে পড়লো যখন বাবা ডেকে বললেন, সব কাজ কবেছিস?

—আজ্ঞে না।

—সারাটা দিন কি করেছিলি? কোন বাজকার্যটা......

—ভুলে গেছি বাবা।

—পড়াশোনার মাথা হলে নিশ্চয়ই ভুল হতো না। সেদিকটা তো শেষ করেছো! এতোক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেও এবারে বাবা রেগে গেলেন। চড়া সুরে বললেন, একটা কাজ দশবার না-বললে কি তুই কোনোদিনও করবি না? অভদ্র, ছোটলোকের মতো রাত দিন কেন আমাকে দিয়ে চিৎকার করাস। তোর মতো ছেলে দিয়ে আমি কি করবো? তোকে আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা,—কী! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আমার রাগ বাড়াস না, —চলে যা....... যেখানে খুশি। সামান্য একটা কথা শোনাবার জন্য আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম। জীবনে তো কোনোদিন শান্তি দিলি না। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিলি।

বাবা অফিসে বেরিযে যাবার আগেই আমি বাড়ি থেকে বের হতে যাচ্ছি। মা বললেন— কোথায় যাচ্ছিস?

—যাচ্ছি যাচ্ছি! কোথায় যাচ্ছি জানি না।

—তোর খাবার দিয়েছি। সামনের খাবার না-খেয়ে যেতে নেই।

—আমি খাবো না।

—রাগ করিস কার ওপর? নিজে তো অন্যায় করবি তাতে আবার........

—ভুল বুঝো না মা, আমি কারোর ওপরেই রাগ করিনি। সে-ক্ষমতাও আমার নেই।

—বাবা যা-বলেন তা শুনিস না কেন?

—তুমিও এই কথা বললে! আচ্ছা মা! বাবা কোন কথা বললে আমি শুনি না, দেখেছো কখন? কিন্তু ভুল হলে কি করবো বলো? মানুষ মাত্রই ভুল হয়।

—ভুলটা তোর অতিরিক্ত; আর মানুষ নামেরও অযোগ্য তুই! কেবল গাল ভরা কথাই শিখেছিস, শুধু বাবার কথাই শুনতে শিখিসনি।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথাই চিন্তা করলাম। একটু মাত্র ভুলের জন্য আজ কতো কথাই না শুনতে হলো! বাবার চোখে হয়তো আরও একধাপ নীচে নেমে গেলাম। এ-ভুল হওয়াটা

অপরের কাছে খুব একটা দোষণীয় না-হলেও বাবার কাছে তা বিরাট। বাবার বিচারশীল মন অন্য লোকদের থেকে একেবারেই আলাদা।

অল্প দোষই বাবার কাছে বিরাট; অঙ্কুরই বাবার কাছে মহীরুহ হয়ে দেখা দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সীমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে যাবো কিনা ভাবছি!

—দাঁড়িয়ে কেন? পিছন থেকে সীমা বললো।

—এমনি। কোথায় গিয়েছিলে?

—পাশের বাড়িতে। তোমাকে দেখে তাইতো চলে এলাম—

ঘরের ভিতর গিয়ে সীমার পাতা বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

—কি হলো! শুয়ে পড়লে যে?

—কেন, তোমাব অসুবিধা হলো না কি?

—বাঃ আমি সে-কথা বললাম বুঝি!

—জানোই তো আমি একটু কম বুঝি!

—কি হয়েছে বলোতো তোমার? সীমা প্রশ্ন করলো।

—কিছু না।

—নিশ্চয়ই কিছু।

—কিছু একটা হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে তাই না?

—ঠিক তাই।

—একটা বিয়ে ছাড়া আমি তো আর কিছু হবার কোনও উপায় দেখছি না। মনটাকে হাল্কা কবতে চেষ্টা করল্যোম।

—ইস্, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

—কেন, মেয়েব বাবা যিনি, তিনি দেবেন।

—ওই আশাতেই থাক—

—আমি আশা করি, তুমি বুঝলে কিসে?

—তোমার হাবে-ভাবে ভঙ্গিমায়........

—বলে যাও! বলে যাও!! এতো তাড়াতাড়ি থামলে কেন? জেনো, আমি যাকে আশা করছি তার কোনও, জিমের ভাষায় এবার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কোনও গার্জিয়ান নেই। যাক গিয়ে, জানো আজ সকাল বেলাতেই বাবা বকলেন। একটা অন্যায় কাজ, কাজ ঠিক নয়—কথা না-শোনা আর কি, সেই অন্যায় করেছিলাম।

—তুমি রাগ করে চলে এসেছো?

—তুমিও রাগ বলে ভুল কবছো। আচ্ছা তোমাদের ধারণাটা কি বলোতো আমার প্রতি? বাবা বকলে আমি করবো রাগ!

—এমনি বললাম। হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো সীমা।

—না-না তুমি এমনি বলোনি, ঠিকই মন থেকেই বলেছো।

—তাই যদি বলে থাকি খুব কি অন্যায় বলেছি? রাগ না-হয়ে দুঃখ হলে কি তুমি পারতে আসার পর থেকে এমন বিয়ে-টিয়ে গার্জিয়ান এই সব ছাড়া-ছাড়া কথা বলতে?

—যেটা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না, বুঝলে। মানুষ যতো খারাপই হোক-না কেন, শান্ত, সুস্থ জীবন প্রত্যেকেই কামনা করে। একে আমার জীবন বিধ্বস্ত তাতে সকলের কথা শুনে মনটাকে যদি বিধ্বস্ততর করে তুলি তবে বাঁচবো কেমন করে? তাই হাসি-ঠাট্টার দরকার আছে। অন্তত আমার জীবনে আছে। তুমি মাষ্টারনী। তোমাকেও শেষ পর্যন্ত এ-সব কথা নিচু ক্লাসের ছাত্রদের মতো একটি একটি করে বুঝিয়ে দিতে হবে? যাক গিয়ে এবারে কাজের কথা বলি—

—বলো। এবার নিয়ে তোমার কাজের কথা দু'বার শুনলাম।

—স্মরণশক্তি আছে দেখছি। একটু হাসলাম। আমি বলছিলাম.........

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে লজ্জায় তুমি.........

—সত্যি লজ্জা হচ্ছে সীমা বলতে।

—কি এমন কথা। যা তোমার মতো ছেলেকেও বাক্‌রোধ করতে পারে।

—আমি দুপুরে........

—হ্যাঁ বলো দুপুরে কি?

—দুপুরে তোমার এখানে খাবো।

—বাব্বা! এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো সীমা। আমি তো কতো কী-ই না ভেবে চলেছি। কথা বলার এমন নূতন ঢং শিখলে কবে থেকে?

—এটা ঢং নয় আমার বৈশিষ্ট্য।

—সত্যি আশ্চর্য তুমি। আমার কাছে খাবে, তাও ভূমিকা করে বলতে হবে।

—খেতে বসে বললাম, তোমার ভাত কই?

—আছে। ম্লান হাসলো সীমা।

—আছে নয়— আমার সামনে নিয়ে বসো।

—তোমার যতো সব কথা। একসঙ্গে খেতে বসি আর কি।

—অন্যায়টা কি বললাম?

—তুমি কিছুই বলোনি, খেয়ে ওঠ এখন।

—তুমি ভাত না-নিলে আমি খাবো না।

আর কোনও উত্তর করলো না। রইলো মেঝেব দিকে চেয়ে।

—কি হলো? ভাত নিলে না?

—তুমি খাও —আমি পরে রান্না কবে নেবো।

—আমি এটাই আশা করেছিলাম। এসো—দুজনেই ভাগ করে নিই।

—দুজনে কখন হয়? তুমি খেয়ে নাও—

—না-হয় পেট ভববে না! তবু আমি একা খেতে পারবো না।

—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই-না? খেতে-খেতে এক সময়ে সীমা বললো।

—কেন? কষ্টের কী?

—মাছ নেই।

—তোমার আবার বাড়াবাড়ি। মাছ না-হলে খেতে কষ্ট হবে এমন রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। কি হলো হাসছো কেন?

—এখন কথা শিখেছ তাই বলছো। অথচ এই মাছের জন্য একদিন কাঁদতে কাঁদতে চিনুমাসির বাড়ি গিয়ে সেখানে মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছিলে। মনে পড়ে?

—তুমি মনে করিয়ে দিলে তাই মনে পড়লো।

—তাই বলছিলাম........

—যাক অনেক বলেছ। আমার শৈশবকে পর্যন্ত টেনে এনেছো।

বিকেলবেলা গা ধুয়ে ঘরে এল সীমা। ভিজে কাপড়টা তার সারা শরীর লেপটে আছে। চুলের শেষ প্রান্তে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে।

—আলনা থেকে ওই কাপড়টা দাও তো,—সীমা বললো!

শুকনো কাপড় পরে ও ফিরে এল কিছুক্ষণ পরেই। মাথার চুলগুলিকে ভদ্র করতে লাগলো। চেয়ার থেকে উঠে আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

—তুমি শাড়ি পরো না কেন?

—আমাদের পরতে নেই। তুমি জানো না?

—আমি তা জানি, কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে।

—কি ছেলেমানুষি করছো?

—ছেলেমানুষি নয়—বড়ো মানুষের মতোই বলছি। সত্যি করে বলো তো এ-পোশাক তোমার ভালো লাগে? স্বাদ-আহ্লাদ কিছুই মনে জাগে না?

—উপায় কী বলো?

—উপায় আছে। তুমি.......তুমি আমাকে......তুমি শাড়ি পরবে—আমি বলছি।

—সত্যি, তুমি একটা আস্ত পাগল। সমাজ আছে না?

—সমাজ তোমাকে কোনও শান্তিটা দিচ্ছে শুনি? তোমার মন সুখ চাইছে, সুখের স্পর্শ দিতে পারছে তোমার সমাজ?

—তা পারছে না।

—তবুও তুমি কষ্ট সহ্য করবে?

—কষ্ট আর কী!

—আমার দিকে তাকিয়ে বলোতো, এ-জীবন তোমার সুখের?

—সমী! কাতরোক্তি ফুটে বেরুলো সীমার কণ্ঠ থেকে।

—সমী নয়—তোমাকে উত্তর দিতে হবে।

—আজ কি তুমি ক্ষেপেছো?

—যদি বলি হ্যাঁ।

—তবে আমার বলবার কিছু নেই।

—কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে। তুমি সুখী?

আমি ওর বাহুমুল সজোরে চেপে ধরলাম —উত্তর দাও?

—না! ছোট্ট করে সীমা বললো।

—তবে?

—কী তবে?

—তুমি সুখী হতে চাও না? পেতে চাও না আনন্দ ভরা জীবন? জীবন তোমার সবে শুরু; শুরুতেই যদি মরে যাও তবে বাঁচবে কেমন করে? গা ভাসিয়ে দাও আনন্দের বন্যায়। পৃথিবীর সমস্ত শখ আনন্দ, হাসি ভাগ করে নাও। ওইগুলিকে মিশিয়ে দাও নিজের জীবনের সঙ্গে। ত্যাগ করো তোমার এই কঠিন নিরুত্তাপ দিনগুলি।

অনর্গল বলে যেতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু অনুভব করলোম আমার জামার বুকের অংশ ভিজে গেছে জলে। সীমা কাঁদছে। কাঁদুক। আমি ওকে আজ বাঁধা দেবো না। চোখের জল ফেলে মনটা পরিষ্কার হোক। সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করবার মতো সাহস পেয়ে নিক।

রাত হলো। চুপচাপ বসে আছি। ঘরেতে আমি একা। সীমা একটু বাইরে গেছে। ফিরে আসতেই বললাম, যাই এবার।

—কোথায়?

—বাড়িতে অবশ্য যাবো না তবে তোমার এখানেও তো থাকা চলে না।

—তুমি বাড়িতেই যাবে—সীমা আদেশ করলো।

—তুমি বলছো?

—হ্যাঁ আমি বলছি।

—আমার কথা তুমি শুনেছো?

—ও, তুমি শুনবে না—

—ঠিক না।

—বেশ।

—কী বেশ?

—যা ভালো বোঝ তাই করো।

—ভালোটা আর আমি বুঝলাম কবে, চিরদিন তো খারাপটাই বুঝলাম, ওটাই করলাম।

—বাজে বকো না। তুমি বাড়িতে যাবে—বেশ একটু গম্ভীর হয়ে সীমা এবারে বললো।
চোখ তুলে তাকালাম ওর চোখের দিকে। কথা বললাম না।
—বাড়িতে যেয়ো কেমন! ছোটছেলেকে ভুলাবার মতোই শান্ত সুরে সীমা বললো।
—আচ্ছা!
—কথা দিচ্ছো কিন্তু—
—দিলাম।
সীমা হাসলো। বললো, মাথা থেকে ভূতটা নেমেছে তাহলে।
—তা নেমেছে তবে এক্ষুনি আবার উঠতেও পারে।
—দোহাই তোমার, বেশ রাত হয়েছে। দয়া করে আর ভূতটাকে মাথায় উঠিও না।

আমাদের বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়িটার মানুষগুলোও। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘর। ইচ্ছে করেই আলোটা জ্বালালাম না। বিছানার ওপর দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। চেয়ে দেখলাম, দিদি। মাথার চুল ধরে আদর করে একটু নাড়া দিয়ে বলল, খাবি চল—

—আমি খেয়েছি।
—আমার কাছে মিথ্যে বলিস না।
—বেশতো সত্যি কথাই বলছি, আমি খাবো না।
—মিথ্যে রাগ করছিস ভাই। দিদি করুণ হাসলো। জানিস আমিও খাইনি।
—তুমি খাওনি কেন? দিদিকে কেন জানি 'তুই' বলতে ইচ্ছে হলো না। হয়তো ওর কাছে হঠাৎ স্নেহ পেয়ে একটু ভালো হতে চেষ্টা করলাম।
—কী করে খাই বল? যখন এসে শুনলাম তুই চলে গেছিস তাতে আবার এতো রাত অবধি বাইরে.......
—আমি যদি না-আসতাম তুমি না-খেয়ে থাকতে?
—তোর কি মনে হয়?
—দিদি!
—বল!
—তুমি খাওনি? আবার বললাম।
—না।

জল এসে আমার চোখ দুটিকে মুহূর্তের মধ্যে ভরিয়ে দিল তাড়াতাড়ি বললাম, চল।

খাওয়া শেষ হবার একটু আগে দিদি বললো, বাবা বকলে কিম্বা রাগ করলে কি চলে যেতে আছে? এটা বুঝিস না কেন—বাবা মন থেকে কিছুই বলেন না, দুঃখ হয় তাই বলেন।

বাবা বললেন সামনে থেকে চলে যেতে। তারপরেও আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে আবার রাগ করতেই আমি চলে গেলাম—আমি তো ইচ্ছে করে যাইনি।

—তুই একেবারেই ছেলেমানুষ।
—দিদি!
—কি?
—বাবা কিছু বলেছেন?
—বলবেন আর কী। বললেন, চলে যেতে বললাম, এই কথাটা একবারেই শুনলো অথচ একটা কাজের কথা দশবারে শুনিয়েও করানো যায় না।

আবার চায়ের আসরে।

মিনতি-কাফেতে দেখা সেই লোকটির সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর ভালো?

—আমার আবার ভালো কি দাদা! তারচেয়ে জিজ্ঞেস করুন কোনওরকমে দিনগুলি কাটছে কিনা; তা কাটছে মন্দ নয়। একবেলা রুটি আর একবেলা চা'-বিস্কুট খেয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছে। জানেন দাদা সেদিন এক পকেট মার ধরা পড়েছে। বড়ো রাস্তার ওপরেই। শিক্ষিত, ভদ্রপোশাক পরিহিত এক ভদ্রলোক সেই অপকর্মের নায়ক। আচ্ছা এমন সব ভদ্রলোকেরা যদি চুরি করে তবে পকেটমারেদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়?

—কোনওই পার্থক্য নেই, বললাম।

—তবে? তবে কেন একজন সমাজের সকলরকম সুযোগ সুবিধা, সম্মান পাবে আর অপরজন....এই আমার কথাই ধরুন; আমাকে কি সমাজের লোকেরা একটু সুস্থ জীবনে বসাতে পারে না? পারে। তবুও বসাবে না। যেহেতু আমি শিক্ষিত চোর নই। হাঃ হাঃ হাঃ উত্তাল ভাবে হেসে উঠলো লোকটি। মুখরিত হলো আকাশ-বাতাস। দোকানের লোকেরা চা খেতে খেতে চমকে উঠলো। বৃদ্ধমালিক নরেন বাবু ভয়ার্ত চোখে বারকয়েক লোকটির দিকে তাকালো। কিছু বলতে সাহস পেল না। আমি ভাবলাম, লোকটা কি সত্য সত্যই পাগল হয়ে গেছে নাকি? ওকে কিছু বলতে আমিও তেমন একটা সাহস পেলান না। অনেক পরে বললাম, আপনার কি হয়েছে বলুন তো?

—কেন? অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন নাকি?

—না তা নয়—

—নিশ্চয়ই তাই। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তা স্বাভাবিকটা দেখবেন কেমন করে বলুন? ভদ্রলোকেবা যে-সমস্ত নজীর একের-পব-এক রাখছেন তাতে আমাদেরও লজ্জা লাগছে। আচ্ছা দাদা! আমি ভদ্রলোক?

—কেন না?

—আমাকে দেখে মনে হয?

—খুব।

—মন রক্ষার্থে বললেন তো? লোকটি হাসলো। আমর যা-পোশাক তাতে মাত্র একটি পরিচয়ই ফুটে ওঠে, আমি পাগল! আমি পাগল!! লোকটা আবার বিরাট এক অট্টহাসিতে সমস্ত ঘর ভরে দিল। ওর হাসিতে আরও কতো জোর আছে তা কে জানে?

—কি হয়েছে আপনার বলুন তো? একই কথা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু লোকটা আমার কথা শুনলো কিনা জানি না, দোকান ছেড়ে সে সোজা চলে গেল।

পরিপাটি করে অনেকক্ষণ ধবে দিদি ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে সাজছে।

—ব্যাপার কি বলতো দিদি? হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

—কিসের?

—এতো সাজার ঘটা! কিছু মনে করিস না, যেন বিয়ের..........

—চুপ কর সমী! চুপ কর!! আমি সত্যই কিছু মনে করবো।

—তা যাওয়া হবে কোথায়?

—বেড়াতে।

—বেড়ানোটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। মাঝে মাঝে মনের পক্ষেও ভালো হয়ে দেখা দেয়।

—তুই আজকাল বড্ড ফাজিল হয়েছিস সমী।

—আমি এমন কি বললাম বলতো যার ফলে অনায়াসেই তুই অতো বড়ো উপাধিটা আমাকে দিয়ে দিলি!

কলকাতার জনবহুল রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে দিদি দেখা করলো টেলরের সঙ্গে।

—একটু দেরি হয়ে গেল, প্রথমেই দিদি বললো।

—তবুও তো এসেছো। দিদির থেকেও বেশি হাসলো টেলর।

—বাজে কথা বলো না।

—বলবো না। কিন্তু এখন যাবে কোথায়? আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বর যাবে?

—ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

—তবে লেকে?

—ওখানে তো সবাই যায়।

—বেশ তাহলে পায়রার খোপেই চলো—

—উঃ দিন দিন তুমি যা হচ্ছো না? কথায় রাজা হচ্ছো।

—বাংলা ভাষা বলতে আমার খু-উ-ব ভালো লাগে। এ-ভাষা নিয়ে গর্ব করা চলে, এমনকি অতি মূল্যবান প্রাণটাও বিসর্জন দেওয়া যায়।

—তুমি পাবো দিতে? মুচকি হাসলো দিদি।

—নিশ্চয়ই পারি। টেগোরের ভাষার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

বিকেল শেষ করে টেলর দিদিকে নিয়ে নিজের বাসায় গেল। দিদি টেলরের আরাম-কেদারাটায় দিল শরীরটা এলিয়ে। টেলর বসলো মুখোমুখী একটা চেয়ারে।

—খুব পরিশ্রান্ত তোমাকে মনে হচ্ছে, টেলর বললো।

—তোমার পাল্লায় পড়েছি যে! হাঁটিয়ে হাঁটিয়েই আমাকে মেরে ফেলবে।

—Sir। বাইরে থেকে জিমের গলা।

—এসো।

—আপনাকে Milk আর দিদিমনিকে tea দেবো?

—এই তো এলাম জিম। একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জিম চলে যেতে দিদি বললো— তোমাকে নিয়ে সত্যি আর পারা যাবে না দেখছি।

—না পারার কি দেখলে তুমি?

—সারা রাস্তা বয়ে এই রজনীগন্ধাব গুচ্ছগুলিকে নিয়ে এলাম—আর বাড়ির সামনে এসে আমার হাত থেকে গুচ্ছগুলি নিয়ে ফেলে রাখলে বিছানার ওপর? দিদি উঠে দাঁড়ালো। হাতে নিল রজনীগন্ধার গুচ্ছ। খোঁজ নিল, ফুলদানি কই?

—মরে গেছে। রজনীগন্ধার মতোই শুভ্র হাসলো টেলব।

—মরে যায় কেন শুনি?

—বাঃ মানুষ মরতে পারে, আর সামান্য একটা কাচেব ফুলদানি মরতে পারে না?

—না, পারে না। যত্ন না-নিলে ওরা তো মরবেই।

—বেশতো, তুমি তো রোজ আসো, তুমিই যত্ন নিতো এবার থেকে।

—রোজ এলেই যে আমার দৃষ্টি তোমার ওই ফুলদানির ওপর পড়বে তার ঠিক কি?

—রোজ আসবার দরকার নেই তবে, এখানেই থাকো সে-রকম কথা বলি—

—টেলর!

—বলাটা কি আমার অন্যায় হবে? গভীর ভাবে দৃষ্টি মেলে ধরলো টেলর।

—কাকে বলবে?

—বাবা-মা'কে।

—পাগল হলে তুমি!

—বেশতো তবে সঞ্জুকে বলি।

—দাদাকেও না।

—তবে বলবোটা কাকে? সমীকে?

—ওকে বলতে পারলে তুমি বোলো। একটু পরে দিদি বললো, এখন কাউকেই বলতে হবে না—সময় আসুক। বুঝেছো—

—টেলর বলাব সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লো।

—কি বুঝেছো?

—এখন কাউকেই কিছু বলতে হবে না—সময় আসুক! বলেই টেলর হাসলো। সে-হাসিতে যোগ দিল দিদি।

সেদিন শনিবার। দোলযাত্রা উৎসব। সাতসকালে টেলর এসে হাজির আমাদের বাড়িতে।

—এতোটা পথ হেঁটে এসেছ নিশ্চয়ই, মা বললেন।

—হ্যাঁ মা। সকাল বেলাতে বাস চলাচলের ব্যবস্থা হয়নি।

দোল খেলায় মেতে উঠলো সারা শহর। আমি দোল বড়ো একটা খেলি না। চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রং খেলা উপভোগ করতে লাগলাম। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রঙের জলে স্নান করে উঠেছে। পথের বুকে আবীরের ছড়াছড়ি। লাল রঙের রাঙায়িত একটি কুকুর বারবার ছোটাছুটি করছে। সাইকেলে চড়ে ফর্সা জামা পরে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। কোথা থেকে একটি ছেলে ছুটে এসে তাকে কালো রঙ কিম্ভূতকিমাকার করে তুললো।

টেলর মা-বাবাকে আবীর দিয়ে প্রণাম করলো। দাদাকে জানালো বন্ধু-প্রীতি আর আমাকে দিল স্নেহ। দিদিকে তখনও ভালোবাসা দেয়নি। অন্তত দিলে আমার চোখে পড়তো।

দিদিকে এক সময়ে ফাঁকা পেয়ে টেলর ওকে কাছে, প্রায় বুকের কাছে টানলো। মাথাটা চেপে ধবে ওর লম্বা ঘনকালো চুলকে আবীরের গোলাপী রং করে তুললো। দিদিও ছাড়লো না টেলরকে। টেলরের পকেট থেকে দু'হাত ভরে আবীর নিয়ে মাখিয়ে দিল টেলরের সাবা মুখে। ঝুল-বারান্দাব এ-কোণ থেকে আমি পরিষ্কার সব দেখতে লাগলাম। কিন্তু সর্বনাশ হলো। আমি ছাড়া দিদি ও টেলর কেউই জানতে পারলো না, ওদের অলক্ষ্যে কি বিরাট একটা সম্পর্কের জানাজানি হয়ে গেল। বাবার ঘরে যাওয়ার সময় মার চোখে পড়লো সে-দৃশ্য। এ-দৃশ্য মা দেখবেন, হয়তো তিনি কোনোদিন মনেও আনেননি। তাই চমকে উঠলেন। নিজের চোখ দুটিকে বিশ্বাস করতে প্রথমে পারেননি। সে কারণেই পলকহীন চোখে দিদি ও টেলরকে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন।

মা, বাবার ঘরে গেলেন। আমি বুঝতে পারলাম, মা নিশ্চয়ই এই ঘটনা বাবাকে জানাবেন! তাই বাবার ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কান দুটিকে সর্বদা রাখলাম সজাগ। কিন্তু এতো আস্তে মা ও বাবা কথা বলছেন যে ফিসফিস একটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। শেষের দিকে মা'র কথার একটা টুকরা কানে গেল ঃ জাতে সায়েব,..........ব্যস ওইটুকু পর্যন্তই।

আমাদের সবারই আসন পাতা হয়েছে। তখন খেতে বসবো। মা, দিদিকে বললেন, —টেলরকে ডেকে নিয়ে আয়। বলে দিদির মুখের দিকে সহজ ভাবে নয়, এমন একটা ভঙ্গিতে তাকালেন। বেচারা দিদি! কিছুই জানে না তার আর টেলরের সম্পর্ক প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে। আমি বুঝতে পাবলাম, মানে আমার মন বলছে; টেলরের সমস্ত পরিচর্যা মা, দিদিকে দিয়ে করাতে চায়। দিদির কাজটুকুর মধ্য দিয়ে হয়তো দেখতে চায় ....ও সম্পর্কের................কতো দূর সত্য............কতোটা গড়িয়েছে............। আমি ভেবে পেলাম না এতে মা'র আপত্তির কি থাকতে পারে? হলোই-বা টেলর সায়েব? শান্তিনিকেতনের ছাত্র, কলেজের প্রফেসর, অপূর্ব বাংলা বলে, রবীন্দ্র-অন্ত প্রাণ, সর্বোপরি বাংলা দেশকেই সে নিজের দেশ বলে মনে করে। তার সঙ্গে আমাদের অমিলের প্রশ্ন কোথায়? তাছাড়া দিদি ওকে পেলে সুখী হবে। দিদির মনের দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি যদি বাবা হতাম কিম্বা মা হতাম তবে নিশ্চয়ই...........

আরও বেশি ধরা পড়তে পারে ভেবে আমি বললাম, দিদি তুই এ-দিকে সব গুছিয়ে রাখ, আমি টেলরদাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

পরদিন কলেজে যাবার সময় মা দিদিকে বললেন,—কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবি।

রোজ-রোজ আর দেরি করে ফেরা চলবে না। মনে থাকে যেন—

—রোজ তো আমি দেরি করে ফিরি না মা! মাঝে মাঝে শুধু বন্ধুদের বাড়িতে..........

—তাও যেতে পারবে না। ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চলে আসবে। মা আর দাঁড়ালেন না। দিদি বুঝতে পারলো না; মা কেন হঠাৎ এমন হয়ে উঠলেন? কিছু কি জানতে পেরেছেন? তাই-বা কেমন করে সম্ভব? বিষণ্ণ ভরা মন নিয়ে দিদি কলেজে গেল।

ক'দিন ধরেই ভাবছি দিদিকে সব খুলে বললো। কিন্তু ভেবে উঠতে পারছি না কেমন করে প্রথমে আরম্ভ করবো। ও-দিকে দিদির অবস্থা দেখে সত্যি সত্যিই আমার মনটাও দমে গেল। বেচারা ও ক'দিনে একটিবারও টেলরের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। তাই ওর মন খারাপ। তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। বারবার ঘর-বারান্দা করে। যদি টেলর একবার আসে। দিদির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হওয়াটা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় কি? উপায় অবশ্য আমি একটা ভেবেছি! দিদির সঙ্গে টেলরের তখন কোনওরকমে দেখা হওয়া সম্ভব নয়! আমি যদি সেতু হয়ে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ রচনা করি..........জানি, এতে দিদি এবং টেলর দুজনেই লজ্জা পাবে কিন্তু এ-ছাড়া করবার আর কি আছে? তাছাড়া মিথ্যা লজ্জার প্রশ্ন এখন নয়—তাহলে ওই লজ্জার খাতিরে অনেক কিছুই হয় তো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে।

সন্ধ্যার সময় বারান্দার ডেক চেয়ারে বসে আছি! দৃষ্টি আকাশের দিকে। দিদি এসে আমার পাশের আসনটিতে বসলো।

—দিদি! আস্তে ডাকলাম।

—কি রে?

—আমার কাছে তোর খুব লজ্জা, তাই-না? দে, একটা চিঠি লিখে দে, আমি টেলরদাকে দিয়ে আসি। তোর কোনও ভয় নেই। জানিসতো আমি খারাপ, বাড়ির বাইরে বেরুতে তোর মতো আমাব কোনও বাধ্য বাধকতা নেই। আর একটা কথা..............

—কী? দিদি এবার চোখ তুলে চাইলো আমার দিকে।

—তুই.........

—আমি কী বল?

—তুই আর টেলরদা দোলের দিন রং খেলছিলি মা সেদিন সব দেখছেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দিদি আমার মুখের ওপর থেকে চোখ মেঝেতে নামিয়ে ফেললো।

পরের দিন বিকেলে দেখলাম দিদির এক বন্ধু এসেছে। ওদের কলেজের এক বন্ধুর জন্মদিন। তাই ওরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবে। মা শুধু দিদিকে একটি কথা বললেন;—যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আসতে চেষ্টা করবে।

দিদির মন পড়ে আছে টেলরের ওখানে। কতোদিন দেখে না ওকে। তাই জন্মদিনের বন্ধুটির বাড়িতে যেটুকু নয় সেটুকু সময় থেকেই গেল টেলরের কাছে।

—এসেছো? কেমন করুণ চোখে টেলর তাকালো। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি আর আসবে না। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছো তাই.........

—ছিঃ টেলর, ও কথা বোলো না। দিদি টেলরের গলা জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। মুখ নিচু করে বললো, মা সব জেনেছেন। তাই পাহারা আরম্ভ হয়েছে আমার ওপর। বাড়ি আর কলেজ, কলেজ আর বাড়ি এ-ছাড়া অন্য কোথাও যাবার আমার উপায় নেই। আজ বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেরিয়েছি! সেখানে কিছু সময় কাটিয়েই এসেছি তোমার কাছে। আর তুমি বলছো...........

—আমি এ-সব কিছুই জানতাম না তমা।

—এক বার আমাদের বাড়িতেও তো যেতে পারতে?

কি লাভ বলো? যেখানে এমন পরিস্থিতি হয়েছে, আমাকেই-বা মা কি চোখে দেখবেন! আদরের পরিবর্তে কি পাবো তাতো জানোই। থাক, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো টেলর। তোমাদের বাড়িতে যাওয়া আমার বন্ধ হলো তা হলে!

চলে আসার সময় দিদি হঠাৎ বললো, টেলর!

—বলো।

—তুমি একদিন আমার জন্য একটা পেপার ওয়েট এনেছিলে!

—হ্যাঁ।

—কই সেটা?

—কি করবে?

—আমি নেবো।

করুণ হেসে টেলর বললো,—তুমি চাইবে তা কি আমি জানতাম।

—তার মানে?

—ফেলে দিয়েছি?

—কেন?

বাঃ তোমার জন্য এনেছিলাম তুমি নাওনি, ওটা দিয়ে আমি কি করবো বলো?

—সেজন্য ফেলে দিলে?

—ফেলে না-দিলে কষ্ট পেতাম তমা!

—এখন যে আমার কষ্ট হচ্ছে।

—তোমার সব কষ্ট একদিন ভুলিয়ে দেবো। দিদির চোখে চোখ রেখে টেলর মৃদু হাসলো।

হাঁটতে হাঁটতে সীমার কাছে গেলাম।

সীমা জিজ্ঞেস করলো প্রথমেই, বাবা সেদিন তোমাকে কিছু বলেছিলেন?

—বলেছিলেন।

—কি?

—তা শুনে তোমার প্রয়োজন?

—বাঃ আমারই তো...............

—এককাপ চা খাওয়াও তো আগে। পিপাসায় আমার..........

—সে তো জানিই। পিপাসা পেলেই তুমি আমার এখানে আসো!

—তাই তো নিয়ম। আমি পিপাসিত হয়ে আসবো, তুমি মেটাবে!

—ছাত্র হয়ে যাচ্ছো কিন্তু।

—কি রকম?

—মেটাবো শব্দটা ঠিক নয়, তার চেয়ে বরং নিবৃত্ত.... কি বলো?

—ঠিক। এখন যাও তো, চটপট এক কাপ..........

সেদিন শুক্রবার! বাবা অফিসে চলে যেতেই আমি গিয়ে ঢুকলাম মিনতি কাফেতে। অনেকক্ষণ পর সেই লোকটা এলো।

—দু'টো চা। 'বয়'-কে আদেশ দিলাম।

—না-দাদা খাবো না, আপত্তি করলো লোকটা।

—কেন?

—এমনি খাবো না।

—খাবেন না কেন, আমি কি অস্পৃশ্য নাকি?

—কি যে বলেন!

—যাক এখন খেতে বাধা নেই তো?

লোকটা নীরবে একটু হাসলো।

একটু পরেই 'বয়' দুটো চা দিয়ে গেল। কিন্তু আমাদের খাওয়া হলো না। চুমুক দেবার আগেই

আমাদের পাড়ার বিখ্যাত ধনী মিঃ ইউ, এন, চ্যাটার্জ্জী এলেন। মিনতি-কাফের উল্টোদিকের দর্শনীয় চারতলা বাড়িটা তাঁরই। পরনে অত্যন্ত দামি স্যুট। লোকটাকে দেখে বুঝবার কোনও উপায় নেই বয়স কতো হতে পারে। উনপঞ্চাশ একান্নো যে কোনও একটা হতে পারে। আবার এর বেশি কমও হতে পারে। মিঃ চ্যাটার্জী এসে প্রথমেই লোকটিকে যে-কথাটি বললেন, তাতে সত্যই অবাক হয়ে গেলাম আমি।

—এই! এটা ভদ্রপাড়ার রেষ্টুরেন্ট, তোদের স্থান এখানে নয়। আর কোনোদিনও ঢুকবি না। যতোসব নেষ্টি............

—তার আগে ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন, লোকটির গলার স্বর শুনে চমকে উঠলাম।

—তুই একটা পথের লোক! তোর সঙ্গে বলবো,.....যাক গিয়ে, আমি বলছি এই রেষ্টুরেন্টে আর ঢুকবি না। মনে থাকে যেন—

—Mind it, I am not your servant!

—তুই চিনিস আমি কে?

—আজ্ঞে না, আপনাকে চিনবার আমার কোনও প্রয়োজন আছে বলে অন্তত আমি মনে করি না।

—মনে করা, না-করা দেখাচ্ছি। কিন্তু শেষবারের মতো বলছি ফের যদি কোনোদিন এই দোকানে তোকে দেখেছি তবে......

—ভুল করছেন। দোকানে ঢুকী না-ঢুকী তার জন্য মালিক আছেন, আর আমি আশা করি দোকানের মালিক যিনি, তিনি নিশ্চয়ই আপনি নন। অতোএব অধিকার প্রয়োগ করতে মিথ্যে আপনি কেন এগিয়ে আসছেন?

—Shut up--চীৎকার করে ওঠেন মিঃ চ্যাটার্জ্জী। তোকে এ-পাড়ায় পর্যন্ত ঢোকা আমি বন্ধ করে দেবো।

—তার চেয়ে বলুন, আপনার বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করবেন! সেখানে আপনার ক্ষমতা থাকবে।

লোকটা অবজ্ঞার হাসি হাসলো!

মিঃ চ্যাটার্জ্জী কথায় পেরে না-উঠে বললেন, যতোসব চোর-জোচ্চোর ভবঘুরেদের আড্ডা এখানে! কথাটা আমাকেও আঘাত করলো। তবুও চুপ করে রইলাম। চুপ করে অপমানটা সহ্য করতে লাগলাম। কেন-না মুখ খুললে আমি কি যে বলবো আর কি যে বলবো না তার ঠিক নেই। একে তো আমি খারাপ। তাই.......

একটু পরে বললাম,—গরিব হলেই কেউ চোর-জোচ্চর আর ভবঘুরে হয় না। এমন ধারণাটা করলেন কি করে?

মিঃ চ্যাটার্জ্জী এবার আমাকে টানলেন। বললেন, তুমি আবার সাহিত্যেকের ছেলে! একটা ইতর জীবের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছো, বন্ধুত্ব পাতিয়েছো, লজ্জা করে না তোমার?

—না, লজ্জা করে না। তাছাড়া আমার বন্ধুটি যে ইতর জীব তা আপনি বুঝলেন কেমন করে? যেহেতু আপনার মতো একটা দামি স্যুট পরনে নেই এই তো? মনে রাখবেন, All that glitters are not gold!

—চুপ কর ছোকরা! তোর বাবাকে আমি আজই বলবো। কথায় না-পেরে মিঃ চ্যাট্যার্জ্জী হাঁপিয়ে উঠছেন।

—We ought to respect a gentleman ! কিন্তু আপনার সম্মান আপনি নিজেই হারাচ্ছেন।

—আমি এক্ষুণি পুলিশে খবর দিচ্ছি। চোরকে সহায়তা করার শাস্তিটা কী হতে পরে বুঝবে—

আর সহ্য হলো না। আমি ধাঁ করে একটি প্রচন্ড ঘুঁষি মিঃ চ্যাটার্জ্জীর মুখে আনয়াসেই বসিয়ে দিলাম। হয়তো আরও ঘুঁষি চালাতাম কিন্তু রক্ত দেখে কেমন একটু ঘাবড়ে গেলাম। দোকানে একজন কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি দোকান ছেড়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন,—Rightly served.

একটি পুলিশের ভ্যান এসে মিনতি-কাফের সামনে দাঁড়ালো। জানিনা কে খবর দিয়েছে ওদেরকে। দয়া করেছে এইটুকুই যথেষ্ট। গাড়িতে উঠবার পর লোকটি বললো,—দাদা! গলাটা ভারী শোনালো ওর।

—কী হয়েছে, অন্যায় তো কিছু করিনি। শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।

বিচারে ছ'মাসের জেল হলো আমার।

কোনো দিন গল্প-টল্প লিখিনি। অথচ আমার বাড়িতে কিনা লেখালেখির ছড়াছড়ি। টেলরের কথা মনে পড়লো : A man is the architect of his own fate. সে আমাকে লিখতে যথেষ্ট বলেছে। শেষ পর্যন্ত তার প্রেরণাই আমাকে লিখতে অনুপ্রাণিত করলো। জেলে বসে তাই লিখতে আরম্ভ করলাম। আমারই ব্যথাভরা কাহিনী। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে শুধু ব্যথার রেশ টেনে চলেছি। লিখে চলেছি, লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি,—সেই কাহিনী।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো দিদি ও টেলর। দিদির মুখখানি মলিন। টেলরেরও তাই।

—সমী! দিদি কান্নাভরা গলায় ডাকলো।

—আমি তো কোনও অন্যায় করিনি দিদি।

শুনে দিদি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। আমি ভাবতে পারিনি ওর বুকে এতো মায়া জমেছিল আমার জন্য।

—কাঁদিস না দিদি। কোনওরকমে বললাম, মা আসতে চাননি?

—চেয়েছিলেন।

—তবে?

—বাবা বারণ করে দিয়েছেন!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কাটলো। নীরবতা ভেঙে বললাম, কেমন আছেন টেলরদা?

—তুমি এখানে!—আমাদের ভালো থাকবার কথা নয় সমী!

দিদি সাইড-ব্যাগের ভেতর থেকে একটি বাক্স বের করলো। আমার হাতে দিয়ে বললো—টেলর কিনেছে তোর জন্যে!

—কি এতে?

—সন্দেশ!

—তোরা খেয়েছিস?

—ওটা তোমার জন্য কেনা হয়েছে, তুমি খাবে, টেলর জানালো।

দেখা করার সময় ফুরালো। আমি দিদিকে বললাম, মাকে আসতে বলিস।

—বলবো।

কটতে লাগলো দিন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একদিন সেই লোকটি জেলে এলো। জিজ্ঞেস করলো, দাদা! কেমন আছেন?

—বললাম, ভালোই আছি।

—কিন্তু আপনার চোখ-মুখ অন্য কথা বলে।

—বাড়ির জন্য মন কেমন করে! কোনোদিন তো কাউকে ছেড়ে থাকিনি।

—আমার কিন্তু লজ্জা লাগছে আপনার কাছে!

—কেন?

—আমার জন্যই আজ আপনার.................

—ও-কথা বলবেন না! ওর সঙ্গে লাগতো আমার ঠিকই, আপনি হলেন শুধু উপলক্ষ মাত্র।

—দাদা, কিছু মনে করবেন না তো?

—কি ব্যাপার?

—আপনাকে একটা জিনিস খেতে দেবো। লোকটির প্রীতির অদ্ভুত পরিচয় পেয়ে আমি সত্যই খুশি হলাম। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। সে কি বুঝলো জানি না তবে বললো, আমি চুরি করিনি, ভিক্ষেও করিনি! তা করলে আর আপনাকে খাইয়ে আনন্দ কোথায়? নিজেই উপায় করেছি। বাজারে গিয়ে মোট বয়ে চার আনা পয়সা পেয়েছি। তাই দিয়েই.......সত্যি অবাক লাগে লোকটিকে ভাবলে! ও মোট বয়েছে বলে আমার এতোটুকু খেদ নেই। বরং আনন্দ হয়েছে, লোকটা জানুক শ্রমে মর্যাদা আছে। তবে আমার জন্য কেন তার এই............

—কি এনেছেন?

—দুটো মিষ্টি। খাবেন তো?

—না।

—খাবেন না!

—কি করে খাই বলুন? এর থেকে আপনি যদি একটা তুলে না-নেন তবে আমি কেমন করে খাই?

—আমি তবে এক্ষুণি একটা খাচ্ছি। এবার আপনি খান।

দুজনে একসঙ্গে মিষ্টিদুটো গেলাম।

—দুজনে একসঙ্গে কিন্তু জেলভোগ করতে পারলাম না! লোকটা বললো একটু হেসে।

—তাহলে এই খাওয়াটা হতো না। বলেই হেসে ফেললাম।

পরদিন আমাদের 'সেলে' একটি ছেলে এলো। নাম সুকুমার। বয়সে আমারই সমান। আবার দু-এক বছরের বড়োও হতে পারে।

—কিছু মনে করবেন না আপনি, খুব সংযত হয়েই বললাম।

—অপরাধের মধ্যে কাকাকে একটা চড় মেরেছিলাম।

—পিছনের ঘটনা?

—সেটাই এখন বলবো ঃ সংসার বড়ো। তাতে অচল। বাধ্য হয়ে কলেজের পড়া ছেড়ে বাবা চাকুরি নিলেন। কিন্তু চাকুরির সামান্য সেই টাকায় এতো বড়ো সংসারটা চলবে কেন? তাই বাবাকে নিতে হলো চাকুরির আগে পরে প্রত্যহ দু'বেলা টিউশনি। এই অমানুষিক পরিশ্রমে বাবার দেহ ভেঙে পড়লো। কিন্তু আশ্চর্য। মন কিছুতেই ভেঙে পড়লো না। কাকাকে বড়ো হতে উৎসাহ দিতেন এবং তার পড়ার খরচা সমানে চালিয়ে যেতে লাগলেন। পাছে কাকার পড়ার ক্ষতি হয় সেজন্য বাবা নিজেই হাট-বাজার হতে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই করতেন। বাবা, মাকে বলতেন, আমি ইচ্ছামতো পড়াশোনা করতে পারিনি। কিন্তু সুজিতের তো তা নয়। ও কেন সংসারে আসবে? পড়াশোনা করবে, যতো দূর ওর ইচ্ছা। আমি তো আছিই। মা ধনীর মেয়ে হয়েও আমাদের সংসারে এসে সাধারণ গৃহস্থের মেয়ের মতো রাত দিন পরিশ্রম করেছেন।

এরপর পাঁচটি বছর কেটে গেছে। কাকা এখন সরকারি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমার মনে আছে, কাকার এই চাকরি পাওয়ার দু'মাস আগেই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হলো বাবার মারাত্মক রোগ। ভয়াবহ অসুখ। মা, তার সমস্ত গহনা বিক্রি করে দিলেন। মানুষটা চলে গেলে কি হবে এ-গুলি দিয়ে? কিন্তু বেঁচে থাকলে আবার হবে। যা হোক মা'র অক্লান্ত সেবা ও যত্নে মাস দেড়েকের মধ্যেই বাবা সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু হারিয়ে ফেললেন কাজ করার শক্তি।—সুকুমার থামলো।

—তারপর?

—তারপর কাকা একমাস সংসার চালিয়েই একদিন বাবাকে বললো.........

—কি বললো?

—বললো, বড়দা আপনি বসে না-থেকে একটা কাজ-টাজ দেখুন। আপনার ছেলে-মেয়ে বেশি

অথচ একটি পয়সাও দিচ্ছেন না—আমি আর টাকা খরচ করতে রাজি নই! অতি নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞের মতোই কাকা বললো। পিছনের দিকে একবারও তাকালো না, ভুলে গেছে, সব ভুলে গেছে এর মধ্যে।

কথাটা শুনে বাবা-মা তো বটে আমিও বিস্মিত হলাম! কাকাই নাকি বাবার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। দুঃখের চাকা ঘুরিয়ে ঠেলে দেবে অনেক দূরে, আনবে সুখ। আচ্ছা! মানুষ কি এমনিই হয়? উপকার করলেই অপকার করতে ইচ্ছে করে প্রতিদানে। অথচ এই কাকার জন্য বাবা কি-না করেছেন। কাকার ওপর অভিমান থেকে রাগ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজ তুমি টাকার মুখ দেখেছো, তাই খরচা করতে কষ্ট হচ্ছে কেমন? কিন্তু করবে না কেন? তুমি তো পরের জন্য কিছু করছো না? বাবা কি তোমার কেউ নন? টাকাকে এমন ভাবে চিনে তুমি এতোটা স্বার্থপর হয়ে উঠবে তা আমি.....

—মুখ সামলে কথা বল। তোদের রাবণের গুষ্ঠি চালানো সহজ কথা নয়।

—বাবা কিন্তু তাই চালিয়েছেন এবং তোমার থেকেও কম মাইনে পেয়ে।

—সব স্বার্থে। কতোটুকু বুঝিস তুই? তোর বাবা কি কম ঘুঘু?

—টাকা কি তোমার সহজ ভদ্রতা জ্ঞানটুকুকেও ভাসিয়ে দিয়েছে? 'তোর বাবা'!—কেন, আমার বাবা তোমার দাদা নন? 'দাদা' উচ্চারণ করতে তোমার এতো লজ্জাটা কেন শুনি? আমি রীতিমতো জেরা করলাম। আর মা? তিনি তো পরের মেয়ে। তাঁর কি প্রয়োজন ছিল তোমাকে এতো স্নেহ এতো যত্ন, এতো...........

—স্রেফ লোক দেখিয়েছেন। তোর বাবা এবং মার চক্রান্তে পড়ে আমি এখন..........কাকার কথা শেষ হতে দিলাম না, তখনই এখানে আসার ওই চড়টি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। চুপ করে গঙ্গার পারের দিককার জানলায় বসে আছি। জানলাটার পাশেই বড়ো একটা কি গাছ যেন। আমি ঠিক নাম জানি না। তার মাথায় ভিড় করেছে পাখিদের দল। কীচির-মিচির শব্দে গানের সুরের মতোই দু'কান ভরিয়ে তুলেছে।

ঢং-ঢং করে একটানা ঘণ্টাধ্বনি পুলের পাদদেশের একটি মন্দির হতে ভেসে আসছে। পুলের ওপর দিয়ে অনবরত ট্রাম-বাস ছোটাছুটি করছে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে গঙ্গার বুকে। চিকচিক করছে জল।

সীমা এলো সেদিন। প্রথমে কোনও কথাই সে বলতে পারলো না। এক দৃষ্টে শুধু তাকিয়ে রইলো ছলছল চোখে। এমন ভাবেই কাটলো কিছুক্ষণ।

—অমন করে কি দেখছো? আমিই বললাম।

—সমী!

—উঁহু, সমী নই আসামী?

—তুমি মানুষকে ভীষণ ব্যথা দিতে পারো।

—তা পারি। কি করবে বলো? আমি মানুষটাই খারাপ—

—তুমি খারাপ সে-কথা তো আমি বলিনি।

—খারাপ না-হলে কি কেউ এখানে আসে? অবশ্য আদালতের বিচারে সে-কথাই বলে।

— তোমার চিঠিতে যখন জানলাম.........সীমা আর বলতে পারলো না। দু'ফোঁটা চোখের জল তার শুভ্র গাল বেয়ে গড়িয়ে এলো। যেন পাতার ওপর থেকে শিশির বিন্দু পড়লো।

—তুমি কেঁদো না সীমা। আমার তাতে কষ্ট হয়।

—তা যদি হয় তবে হোক। তোমার মতো লোকের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নয় বলেই আমি মনে করি।

—তাই শাস্তিভোগ করছি। একটু হাসলাম।

—বাজে কথা বোলো না।

—ঝগড়া থাক, কেমন আছো?

—বোকার মতো প্রশ্ন করো না। বরং বলো, তুমি কেমন আছো?

—দেখতেই পাচ্ছো।

—বাইরেরটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ভিতরেরটা নয়।

—মনের খবর কেউ-ই রাখে না, ভিতরটা তো দেখতে চায় না কেউ।

টেলর এলো এমন সময়। একা।

—দিদি আসেনি? জিজ্ঞেস করলাম।

—ওর সঙ্গে আমার ক'দিন ধরে দেখা নেই।

—আমি যাই। ছোট্ট করে সীমা বললো।

—এখুনি যাবে?

—আবার আসবো।

সীমা চলে গেলে টেলর বললো, মেয়েটি কে?

—সীমা।

—ও। টেলর কিছু আমাকে ও-প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো না। বুদ্ধিমান টেলর। বুঝেছে সব নিশ্চয়ই। অতোএব মিথ্যা লজ্জা দিতে রাজি নয়।

সেদিনটা সত্যিই ভালো ছিল। টেলর চলে যাবার পরক্ষণেই এলো দাদা।

—কেমন আছিস? জিজ্ঞেস করলো দাদা।

—ভালো। ও-ছাড়া কি আর বলবো।

জেলে এসে আর কিছু না-হোক সবার স্নেহ-ভালোবাসা পেলাম। বাড়িতে সেটা প্রায় কোনোদিনই পাইনি। অনাদর-অবহেলাই কুড়িয়েছি কিন্তু এখানে আসার পর থেকে ও-সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠিক এই কারণেই হঠাৎ বাড়ির থেকেও জেলখানাকে আমার বেশি ভালো লাগলো।

দাদা চলে যাবার সময় ওর কাছে একটা ছোট চিঠি দিয়ে দিলাম। মা'র কাছে লিখেছি ঃ—

"মা, আমি তোমাদের মনের মতো হতে পারলাম না, সেজন্য কি তোমাদের দেখবার জন্য আমার মন কাঁদে না?"

সুকুমার এলো আমার কাছে! বললো, ওঁরা কারা এসেছিলেন?

—আমার দাদা এবং দাদার বন্ধু।

—তার আগে? একটু হাসলো সুকুমার।

—একটি মেয়ে। আমিও হাসলাম। ওই হাসির মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দিলাম, দোহাই তোমার এর বেশি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। মুখে আবার বললাম,—আসুন খাওয়া যাক। টেলর এবং দাদা যে-খাবার দিয়ে গেছে তা আমার একার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।

—বাঃ আপনার দাদা আপনাকে দিয়ে গেলেন আর আমি কি-না সে-গুলি খাবো?

—দূর মশাই! এতো পরপর ভাবেন কেন? মনে করুন না আমরা দুই ভাই, একসঙ্গে জেলে এসেছি।

একদিন সুকুমারের মা এলেন। সঙ্গে বাবাও।

মা, তোমরা আবার এলে কেন? ব্যথা ভরা মন নিয়ে সুকুমার বললো।

—তাতে কি হয়েছে বাবা। তোকে না-দেখে দিন যে আমাদের কাটতে চায় না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি সবই দেখছি, শুনছি সব কথা। আমার মা একদিনও এলেন না। সুকুমারের মা-বাবাকে দেখে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ওদের মতো আমার বাবা-মা-ও কবে আসবেন? সুকুমারের মা ওকে খাইয়ে দেবার জন্য হাতে করে খাবার তুললেন। আমি সে-দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোভে নয়,—যদি ওই রকম স্নেহ পেতাম! সুকুমার কিন্তু খাবার মুখে নিল না। মার কানে কানে কি যেন বললো। পরক্ষণেই ওর মা ডাকলেন, শোনো।

আমি কাছে গেলে তিনি বললেন, তুমি তো সুকুমারের বন্ধু।

—ভাইও বলতে পারেন।

—তবে তো ভালোই হলো। আমার অধিকার বাড়লো তোমার ওপর। এখন হাঁ করো, তোমাকে আমি খাইয়ে দেবো।

অভিভূত হলাম ওঁর স্নেহের দাবি দেখে। ক্ষণিকের মধ্যেই মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে কেমন এগিয়ে এলেন। কথার সুরটিও মধুর। যেন আমি তাঁর সত্য সত্যই ছেলে। স্নেহের শক্তি যে-এতোখানি, পরের ছেলেকেও আপন করা যায়, আমি তা এই প্রথম অনুভব করলাম।

একমাসের মধ্যে বাহান্ন পৃষ্ঠা লিখলাম। অল্প অল্প করেই লেখা ভালো। আমার তো তাড়াতাড়ির কোনও প্রশ্ন নেই। জীবনে এই প্রথম উপন্যাস লিখলে হবে কী—যতোটা সম্ভব সুন্দর করে লিখবার চেষ্টা করছি।

দিদি, বাবা ওঁরা যখন লিখতেন তখন ভাবতাম লেখা ব্যাপারটা বোধহয় সত্যই সহজ। জেলে বসে লেখার সময় আমার সে-ধারণা ভেঙে গেল।

বিকেলের ছায়া নামবার আগেই সীমা এলো। এক কোল বই। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। সামনের কয়েকটি চুল কপালে ওপর গোল হয়ে এসে পড়েছে।

—একেবারে স্কুল থেকে এসেছ বুঝি?

—দেখতেই পাচ্ছো—

—চুপ! এটা বাড়ি নয়—কয়েদখানা।

—সে জ্ঞানটুকু অন্তত তোমার থেকে আমার বেশি আছে।

—ঝগড়া করছো? হাসলাম আমি।

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ইচ্ছে হচ্ছে তাই। তোমার ওই জমাদারটির সঙ্গে তো ঝগড়া করতে যাচ্ছি না, বলেই সীমা চোখ দিয়ে ইশারায় দেখালো, তাদের দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকা জমাদারটির অবস্থানের দিকে।

—ঠিক বলেছো। আগের থেকেও বেশি হাসি টেনে আনলাম মুখে।

—জানো, সেদিন তোমার জন্য মুড়ি এনেছিলাম।

—মুড়ি!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ মুড়ি। নূতন শুনছো নাকি নামটা?

—না, তা নয়। তবে.........কই, আমাকে তো তুমি দাওনি?

—দেবো কেমন করে শুনি? তোমার ওই সায়েবের সামনে কি করে বের করি? সে তো আর বুঝবে না এই সাধারণ মুড়ির মধ্যে কতো অসাধারণ ব্যাপার মিশে আছে!

—সাহেবটি কে জান?

—বলোনি, জানবো কেমন করে?

—দিদির.......বুঝতে পেরেছো?

এরপর একদিন যিনি এলেন, তাঁরা আসা আমি সত্যিই কল্পনাও করতে পারিনি। বাবা এসেছেন আমাকে দেখতে। বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি না-তাকিয়ে পারলাম না। বোধকরি কোনোদিনও বাবার মুখের দিকে এতোক্ষণ তাকিয়ে থাকিনি আর বাবা তো নয়ই।

প্রায় মিনিট পাঁচেক বাবা ছিলেন। কিন্তু একটি কথাও বললেন না। এমনকি যাবার সময়েও না।

বাবা বাড়িতে সবার কাছে কঠিন মনের পরিচয় দিলেও নিজের কোমল মনের কাছে সে-পরিচয় পরাজিত হয়েছে। বাইরে সাময়িক কঠোরতা দেখালেও তা কখনওই উর্দ্ধে ওঠেনি। বহুদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়লো। তখন আমি খুব ছোট। একদিন শুক্রবারের হাটে চলেছেন বাবা। তাঁর সঙ্গে আমি যাবো বলে তিনি বাড়ির পিছন দুয়ার দিয়ে বের হলেন। আর ঠিক ওইখানটাতেই ছিলাম

আমি দাঁড়িয়ে।

—তুমি এখানে কি করছো?

—আমি এমনি দাঁড়িয়ে আছি বাবা।

—দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না ঘরে যাও—

—আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—না। বলেই বাবা হেঁটে চলেছেন। এগিয়ে গেলেন বেশ কিছু দূর। তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। পিছন ফিরে তাকালেন বাবা। ডাকলেন, এসো।

—না,—অভিমান আমার কম হয়নি।

—এসো—হাট থেকে তোমাকে সুন্দর খেলনা কিনে দেবো কেমন? শিগগীর এসো—

আরেকদিন সুকুমারের মা এলেন। সঙ্গে ছোট্ট একটি ছেলে।

—ভাইটু! আনন্দে গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে সুকুমারের।

—দাদা, নুমি বাড়ি যাও না কেন?

—যাবো ভাই।

—নুমি নেই, আমি কার কাছে ঘুমুবো?

—মা'র কাছে। আমি গেলে তারপর আমার কাছে ঘুমুবে।

—নুমি কবে যাবে?

—একদিন যাবো।

—না-গেলে তোমাকে আমি দাদা করবো না।

—ভাইটু তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো?

—নোমাকে।

—আর আমি বেশি ভালোবাসি কাকে?

—আমাকে। ছোট্ট খোকন গালে টোল ফেলে হাসলো।

রোজ সন্ধ্যার পরেই রাস্তার দিকের জানলাটার পাশে বসে বাইরের জগৎটাকে দু'চোখ মেলে দেখি। চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে থাকতে মন-প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। উঃ কবে যে ছাড়া পাবো? এখনও দু'মাস থাকতে হবে। এতোদিন জেলখানাকে ভালো লাগলেও তখন আর সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই না।

সেদিন দিদি, টেলর ও জিম এলো।

—Sir! জিম হেসে কাছে এগিয়ে এলো আমার।

—তুমিও এসেছো! তারপর...........

—আপনার good লাগছে এখানে?

—একটুও না।

—আচ্ছা আপনার পরিবর্তে আমি থাকলে কেমন হয়, মানে দুজনে দুজনে আমরা ফিফটি ফিফটি থাকবো? হঠাৎ প্রস্তাব দিল জিম।

হেসে দিলাম, তা হয় না! হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম দিদিকে, মা এলেন না কেন রে?

—মা আসতে চাইলে কি হবে বাবা কিছুতেই................

সেদিন বিকেলে সুকুমার ছাড়া পেয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতেই তার অভাব বেশি করে অনুভব করলোম। আনচান করে উঠলো সারা মন। আগে এমন সময় দুজনে কতো গল্প করতাম! আজ সে নেই, চলে গেছে, একা আমি। এমনিই নিয়ম। আজ যা পূর্ণ আগামীকাল তা শূন্য! এমনি করেই একা একা বাকি দিনগুলি কাটাতে হবে। সব কিছু ভুলবার জন্য উপন্যাসটি নিয়ে বসলাম।

লিখতে হবে। গ্রেট টেলর যে আমাকে লিখতে বলেছে!

একটানা লেখার ফলে শেষ করলাম আমার সর্বপ্রথম উপন্যাস। এ-লেখা এখন প্রকাশিত হোক বা না-হোক সেটা কথা নয়। প্রধান কথা, রচনা শেষে লেখকের অপরিসীম আনন্দ! আর সে-যে কি তৃপ্তির তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম তখন। অবাক লাগছে আমাব! আমিও শেষ করলাম একটা উপন্যাস!

বাড়ির সকলের অজান্তে এখানে এসেছিলাম আবার সকলের অজান্তেই আমার উপন্যাসখানা প্রকাশের ব্যবস্থা করলাম। টাকা অবশ্য পাবো না,—না পেলাম। ক্ষতি কি? উৎসর্গ করলাম টেলরের নামে। আমার এ-লেখার মূলে ওর প্রেরণা যথেষ্ট ছিল বললেও কম বলা হবে।

কিন্তু উৎসর্গের স্থানে কি লিখবো? 'গ্রেট টেলারকে'—ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে লিখলাম ঃ বাংলা ভাষা বলতে পেরে যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন, সেই টেগোর ভক্ত সাগর পারের গ্রেট টেলরকে।

একদিন সত্য-সত্যই আশা নিরাশায় দোল খেয়ে আমার জেলের আয়ু ফুরিয়ে গেল! বিকেলেই বাড়ি যেতে পারবো আমি।

—আপনি এখন bird sir! জিম বললো। ওর কথা শুনে দিদি ও টেলর খুব হাসছে।

—bird! bird মানে তো পাখি? আমি একটু অবাক হলাম।

—হ্যাঁ। Now you are free, like a bird।

—ও তাই বলো! প্রাণ খোলা হাসলাম। এমন কথা শুনলে কার-না হাসি পায়?

জেল থেকে বেরুবার পর কোথা দিয়ে যে একটি মাস কেটে গেল টের পেলাম না। অথচ এই সময়টা জেলে থাকলে কিছুতেই দিনগুলি কাটতে চাইতো না।

ছুটির দিন ভোর বেলা দিদি বায়না ধরলো মার কাছে। এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে।

—রোজই বুঝি তোব নিমন্ত্রণ থাকে? মা প্রথমেই চড়া সুরে বললেন!

—রোজতো একই বন্ধুর বাড়িতে হয় না মা! নরম সুরে দিদি জানালো!

—বন্ধুর নাম কি?

—তুমি চিনবে না মা।

—নামটা বলতে দোষ কি?

—কল্পনা, কল্পনা রায়!

—এ-নামে তোমার কোনও বন্ধুর আছে বলে কই শুনিনি তো?

—নূতন এসেছে। পড়াশোনায় খুব ভালো! ওর বাবা আশুতোষের প্রফেসর..........

—এতো কথা আমি শুনতে চাইনি। আসবে কখন?

—একটু রাত হবে, খুব আস্তে দিদি বললো!

—একেবারেই না-এলে পারো।

—বেশ, বিকেলে আসবো।

—আজকের মতো যাও—কিন্তু মনে রেখো বন্ধুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া এই শেষ।

সোজা চলে এলো টেলরের বাসায়।

—মা'র কাছে মিথ্যে কথা বলতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে, দিদি জানালো টেলরকে।

—সত্য কথা বললে যেখানে কিছু হয় না, সেখানে সত্য বলে কি লাভ বলো?

—তবুও.........এতো দিন বলিনি কিনা............খুব ধীরে ধীরে দিদি কথাগুলি বললো।

—মা'র কাছে আর মিথ্যে বোলো না! তুমি-আমি সত্য হয়ে থাকলেই যথেষ্ট। জানি, তোমার আমার দেখা-সাক্ষাৎ এতে কমে যাবে, কিন্তু কল্পনায় দেখা হবে রোজ।

দিদি হাসলো!

—তোমার মতো কাব্য করে বলতে পারলাম না বটে তবে এমন করে যদি হাসতে থাকো তাহলে কিছুই বলতে পারবো না! এমনকি গদ্য করেও না—

—আমি হাসলাম অন্য কারণে।

—Cause-টা কি শুনি?

—একি! তুমি দেখছি জিমের মতো আরম্ভ করলে?

—সে-কথা থাক, কারণ হলো?

—না-শুনলেই কি নয় কল্পনা রায়!

—কল্পনা রায় কাকে বলছো তুমি? টেলর অবাক হয়!

—তোমাকে! দিদি অনাবিল হাসে।

—কি পাগলামি করছো?

—আজ্ঞে মোটেই পাগলামী নয়। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছো? উত্তরে জানিয়ে এসেছি কল্পনা রায়ের বাড়িতে। অতোএব পাগলামী না-করে একটু চিন্তা করে দেখতো কল্পনা রায়টি কে?

রান্নাটি দিদি নিজেই করলো। জিমকে হাত দিতে দিল না কোনও কিছুতে। অর্থাৎ রান্নার ব্যাপারে।

রান্নাঘরে টেলর এলো এক সময়। দিদিকে দেখলো রন্ধনরত অবস্থায়। আগুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। ব্লাউজের পিঠের অংশ ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। হাতে হলুদের দাগ। পরনের কাপড়টি বাদ যায়নি সে-দাগ থেকে। দিদি তখন লেখিকা নয়, পাকা গিন্নি। যেন কতোদিন সংসারী!

—কষ্ট হচ্ছে তো খুব? একটু হেসে টেলর জিজ্ঞেস কবলো।

—মোটেই না।

—আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

—ও তোমার মনের ভুল। তবে রান্নার সময়ে এমন করে যদি তুমি একের-পর-এক প্রশ্ন করতে থাকো তবে সত্যই আমার খুব কষ্ট হবে।

রান্না শেষ করে দিদি টেলরকে স্নানে যেতে বললো।

—তুমি আগে স্নান করে এসো।

—আমি বাসা থেকে সেরে এসেছি। তবে বিকালে আরেকবার গা ধোবো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে টেলর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো নরম বিছানার উপর।

—সত্যি তুমি এতো ভালো রান্না করতে পারো যে..........

—আহা! এর আগে যেন তুমি কোনোদিনও আমার রান্না খাওনি—

জিমকে খেতে দিতে গেলে ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না খেতে।

—For nothing আপনি কেন কষ্ট করবেন। আমি নিজেই নেবোখ'ন।

—বড়োদের কথা শুনতে হয় জিম। আসন পাতা আছে, বোসো। আজকে আমি তোমাকে খেতে দেবো। রোজই তো নিজে হাতে গুছিয়ে নাও, আজ না-হয় একদিন দিদিমনির..........

মাথা নিচু করে একমনে খেয়ে চলেছে জিম। দিদি মাছের বাটি এগিয়ে দিতেই জিম সেটুকু থালায় ঢেলে নিল।

—আর দুটি ভাত দিই? দিদি বললো জিমকে।

—Give,—জানালো জিম।

ভাত নিয়ে এলো দিদি জিমের কাছে। কিন্তু কোথায় জিম? জিম নেই, এমনকি তার বসবার পিঁড়িখানা পর্যন্ত নেই। শুধু থালার ওপর মাছের ঝোলমাখা কিছু ভাত পড়ে আছে। টেলরের কাছে গিয়ে দিদি বললো, আশ্চর্য তো!

—কী হলো?

—জিম নেই।

—গিয়েছে কোথাও হয়তো—

—তা নয়। খেতে বসেছে, দুটি ভাত চাইলো। ভাত নিয়ে এসেই দেখি সে নেই। ওর বসবার পিঁড়িটাও নেই।

—সে কি!

—তাই তো বলছি তোমাকে।

দিদি ও টেলর দুজনে মিলে সারা বাড়ি খুঁজলো। কিন্তু কোথায় জিম!

—খেতে বসে মানুষ নেই, আবার আসন খানাও নেই এমনতো শুনিনি কোনোদিন,—চিন্তিত হয়ে টেলর বললো।

—ভীষণ ভাবিয়ে তুললো তো! রাগ করে চলে যায়নি তো? বললো দিদি।

—রাগ করবে কেন?

—আমি ওকে খেতে দিয়েছি, বোধহয় এটা ওর পছন্দ হয়নি।

—বেশতো বুঝলাম। কিন্তু আসনখানা তুলে নিয়ে যাবে কেন?

দিদি ও টেলর, সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করেও যখন কোনও কূল-কিনারা পেল না তখন অর্থাৎ প্রায় আধঘন্টা পর পিঁড়ি হাতে জিম বিষণ্ন মুখে ফিরে এলো।

—পারলাম না। পিঁড়িটা মেঝেতে রেখে দিতে দিতে জিম বললো।

—কি পারলে না? অবাক হয়ে টেলর ওকে প্রশ্ন করলো।

—Cat Sir। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জিম বলে।

—Cat Sir ! টেলর কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

—I mean বিড়াল, Sir।

—কি হয়েছে বিড়ালের? এবারে দিদি জিজ্ঞেস করলো।

—আমার থালা থেকে একফাঁকে মাছটা নিয়েই দৌড়। আমিও ওকে মারবার জন্য পিঁড়ি নিয়ে run করলাম ওর পিছু পিছু! পারলাম না Sir ওকে মারতে। কোথায় যে Vanish হয়ে গেল, সারাক্ষণ খুঁজেও বের করতে পারলাম না—

সমস্ত কাজ সেরে দিদি এলো টেলরের কাছে। টেলর তখন ঘুমে।

—এই, ঘুমাচ্ছ না-কি?

ও-পক্ষ নীরব দেখে দিদি ওর গায়ে ধাক্কা দিল, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?

—একটু তন্দ্রা এসেছে!

একটু'ই থাকো। এবারে ওঠ। আমি ক্লান্ত, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—

—পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ো। অনেক জায়গা আছে।

—মেঝেতে এর চেয়েও বেশি আছে। দিদি হাসলো।

—উঠিয়েই ছাড়বে?

—কোনও উপায় নেই!

—উপায়টা করে নিলেই পারো। তাতো করবে না? বলতে বলতে টেলর মাথার বালিশটাকে ছুড়ে দিল মেঝের উপর। যেন বালিশটার ওপরেই তার যতো রাগ। দিদি করুণ হাসলো। ঘুমে ওর চোখ দুটি জড়িয়ে আসছে। শুয়ে পড়লো। দেওয়াল ঘড়িটা ঘোষণা করলো, বিকেল হয়েছে। চারটে বাজে। একটু আগে ঘুম ভেঙেছে টেলরের। উঠে বসে। তাকায় ঘুমন্ত দিদির মুখের দিকে। পরিত্রাণে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ওর সমস্ত মুখমন্ডল কালো মেঘের মতো ছেয়ে ফেলেছে।

টেলর উঠে এলো। বসলো বিছানার ওপর, দিদির পাশটিতে। আস্তে আস্তে ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলিকে সরিয়ে দিল! তাকিয়ে রইলো পলকহীন চোখে। যেন এর আগে কোনোদিন ওকে দেখেনি। এই প্রথম দেখছে।

টেলরের ঘরে ঢুকলাম আমি। এমন আবেগময় দৃশ্য দেখতে পাবো জানলে নিশ্চয়ই আসতাম না। ভগবানকেও দোষ দিতে ইচ্ছা করে। ওদের গোপন ব্যাপারটুকু কী তিনি আমাকে দিয়েই দেখাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন?

টেলর ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

এ-সময়ে আমাকে সে কিছুতেই আশা করেনি। কিন্তু আমি আর ওখানে দাঁড়ালাম না। কি জানি! ওরা ভীষণ থেকেও না-জানি আরও কতো লজ্জা পাবে। রাস্তায় এসে ঘুরলাম এদিক-ওদিক।

বিকেলের চা খাওয়া শেষ করে দিদি বললো, আজ যে কপালে কি আছে কে জানে!

—তা' হোক আবার কবে আসবে?

—তা জানি-না। তবে শিগগীর নয়, দরজার কাছে গিয়ে দিদি বললো।

—এসো।

—দিদি দু'টো সিঁড়ি নীচে নামলো।

—টেলর ডাকলো, তমা!

—বলো।

—না, কিছু না।

—কিছু। মুখ বুজেই দিদি হাসলো।

—কি হয় না-হয় চিঠি দিয়ে আমাকে জানিও।

—জানাবো, জানাবো। চিন্তায় যেন........

সেদিন টেলরের চোখে আমি পড়েছিলাম তাই তারপর থেকে বোধহয় দিদি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। এমনকি তাকায় পর্যন্ত না। যদি-বা তাকায় তা গোপনে। ওর এই গোপনীয়তা ধরা পড়েছে আমার চোখে। আমি বুঝতে পারলাম দিদির ভাবান্তরের উৎস হচ্ছে লজ্জা। আমি দেখে ফেলেছি, সেই লজ্জা। লজ্জাই ওকে ঘিরে রেখেছে। হয়েছে লজ্জাবতী। দিদির এই লজ্জা ভাঙাতেই হবে। সহজ করে তুলতে হবে ওকে। এখন আর ওকে কিছু বলবো না। অপেক্ষায় রইলাম সময়ের।

সকালবেলা সেদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলো মিনতি কাফের বন্ধুর সঙ্গে।

—Good morning দাদা and good night !

—Good night কেন?

—রাতে আপনার সঙ্গে দেখা নাও-হতে পারে তাই ওটা Advance জানিয়ে রাখলাম। ভালো কথা, একটা চাকরি দিতে পারেন দাদা? যে-কোনও চাকরি। কতোদিন আর লোকের কথা শুনবো?

—এইতো অসুবিধায় ফেললেন।

—এমনকি টিউশনিতেও আপত্তি নেই।

—এটা সম্ভব হতে পারে।

আমার বন্ধু চন্দনের ছোট্ট বোনটিকে পড়াবার জন্য লোকটিকে ঠিক করে দিলাম! কথায় কথায় ওকে বললাম, আপনার ছাত্রীটি কিন্তু একেবারেই শিশু।

—ঠিক আছে!

—আপাততো ওরা মাসে দশ টাকা করে.......

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওতেই চলবে।

তিন দিন পড়ানোর পর চতুর্থ দিনে আমার ডাক পড়লো চন্দনদের বাসায় চন্দনের মা বললেন, সমী! কি মাষ্টার দিয়েছ?

—কেন বলুন তো?

—স্রেফ একটা পাগল। বুঝলে?

—ব্যাপার কি মাসিমা? আমি জানতে চাইলাম।

—আমাদের মিনুকে তো সে পড়াচ্ছে। মাষ্টার হয়তো জ্বর সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবে। তা মিনু তো কিছুতেই বুঝতে পারছে না জ্বরটা কি জিনিস। মাষ্টার তখন করলো কি জানো?

—কী?

—আমাদের বিছানার ওপর থেকে চাদরটাকে টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে সে রীতিমতো হি-হি করে কাঁপতে লাগলো। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে আবার ঠকঠক করে শব্দও করছে। তা উনি এসে মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি করছেন মাষ্টার মশাই?

উত্তর দিল, মিনু জ্বর বুঝতে পারছিল না, —তাই ওকে Practical Field-এ নেমে জ্বরটা দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। বলেই হেসে দিলেন মাসিমা, বললেন, এমন মাষ্টার বাপ আমি রাখতে চাই না। এরপরে মিনু মৃত্যু কি জিনিস বুঝতে না-পারলে শেষে হয়তো সে সত্য সত্যই একজনকে খুন করে বসবে। তার সব কিছুই তো আবার Practical !

কালিঘাটে গিয়েছিলাম একটা কাজে। ভাবলাম সীমার বাড়ি হয়ে যাবো। আর যেই ভাবা সেই কাজ। দরজা বন্ধ। মানে ভেতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়লাম জোরে।

—কে? ভেতর থেকে সীমা বললো!

—আমি।

—দুনিয়ার সবাই তো আমি.......দরজা খুললো সীমা। ও তুমি! মুখে ওর লাজুক হাসি। এই দুপুরবেলা!.......কি ব্যাপার!

—দুপুরবেলা এখানে আসতে নেই বুঝি?

—তা বলছি না। তোমার নিশ্চয়ই এখনও স্নান-খাওয়া হয়নি?

—নিশ্চয়ই না।

—আমার কিন্তু খাওয়া-দাওয়া Complete। বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলতে বলতে ঘরে পা দিলাম। বসলাম কোণের চেয়ারটাতে।

—একি! তুমি বসলে যে! জিজ্ঞেস করলো সীমা।

—তবে কি করতে বলো?

—বাঃ বাড়ি যাও। স্নান-খাওয়াতো কিছুই করোনি? আমারও রান্না আর কিছুই নেই। নয়তো এখানে........

—আর ভদ্রতা করতে হবে না। খাওয়ালে তো খাওয়াবে নিরেমিষ, তুমি নিজেও যেমন একটা নিরেমিষ!

—বাড়ি যাও বলছি। এ-ভাবে গল্প করতে আমার ভারী বিশ্রী লাগে।

—ভালো লাগবে কোনও ভাবে?

—দেখ, সবসময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না, একটু গম্ভীর হতে শেখো! বয়স তো দিন দিন কম হচ্ছে না।

—পুরানো কথা শুনতে আমারও ভালো লাগে না।

—বেশ তো লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বাড়ি গিয়ে স্নান—খাওয়া শেষ করো, তারপরে এসো। যতোক্ষণ খুশি তোমার গল্প করবে।

—ভালোবাসাটা হঠাৎ বেশি দেখছি বলে মনে হচ্ছে!

—অসভ্যের মতো কথা বোলো না। সীমা শাসন করলো।

বেশ রেগে গেছে সে-ও। আমি আর কথা বাড়ালাম না। চলে এলাম। বুঝলাম না, হঠাৎ সীমার এতো রাগবার কারণ কি?

এর দিন তিনেক পরেই সীমার সঙ্গে দেখা হলো। আমি মোটেই ওর বাড়ি যাইনি। কেন জানি একটা অভিমান জমা হয়েছিল মনে। ভাবলাম, পারতপক্ষে সীমার বাড়িতে যাবো না। করবো না দেখা।

বিকেলবেলা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলাম 'মিনতিকাফের' সামনে। হঠাৎ নজর পড়লো অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সীমা। ডাকলো চোখের ইশারায়।

—ডাকলে কেন? যথাসম্ভব সংক্ষেপে একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওর কাছে গিয়ে।

—অমন ভাবে কথা বলছো কেন? সীমা ভ্রূ কুঁচকে বললো।

—এরবেশি ভাব করতে পারি না বলে।

—ও.........সীমা চঞ্চল চোখের তারা দুটিকে মুহূর্তের মধ্যে বারকয়েক ঘুরিয়ে নিল আমার মুখের ওপর। বললো, তুমি হয়তো সেদিন রাগ করে চলে এসেছিলে, মনটা ভালো লাগলো না। তাই এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। অবশ্য বাড়িতে যেতাম না। কেন-না আমি জানতাম, বাইরেই তোমার দেখা পাবো।

—বেশ করেছো।

—তুমি কি মেপে মেপে কথা বলবে?

—মেপে কথা বলা তো তুমি পছন্দ করো।

—আমি কি করি না-করি সেটা প্রশ্ন নয়—

—প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে কিন্তু সেটাই।

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি,—একটু পরেই সীমা বললো।

—এসো।

—আমাকে পৌছে দেবে না?

—আজ আমার সময় নেই।

—মিথ্যে বোলো না।

—অসভ্য-খারাপ ছেলের সঙ্গে চললে লোকে তোমাকেও খারাপ বলতে পারে। এ-দিকটা কেন চিন্তা করছ না?

জানি-না সেদিন আমার কি হয়েছিল, যার জন্য সীমাকে অমন কথা শুনিয়ে দিয়েছি, হয়েছি নির্মম। আসলে যার প্রতি টানটা বেশি তার ওপরে অভিমান বেশি হয়।........তখন আমার অভিমান ভেঙেছে। কমেছে রাগ। চিন্তা করলাম অনেক কিছু। ওলট-পালট হয়েছে তারও বেশি। মনে তখন মেঘনার ঢেউ নেই,—বইছে শান্ত ঢেউ। কিন্তু মন কিছুটা ভারাক্রান্ত। অবশ্যই কমাতে হবে। রওনা হলাম সীমার বাড়ির দিকে। সঙ্গে নিলাম মুড়ি। সীমা আমাকে দেখেও চিনতে পারলো না। একটিও কথা বললো না, বসতে তো নয়ই। একমনে সে নিজের কাজ করে চলেছে। কয়েকবার ঘরে এল—কিন্তু তাকালো না। অর্থাৎ আমি যেন রাস্তার সম্পূর্ণ এক অপরিচিত লোক!

আমার উপস্থিতি সে বুঝতেই পারছে না। তার চলনে এমনই একটা ভাব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

—শোনো। সীমার ভাবান্তর এতোক্ষণ লক্ষ্য করে পরে ডাকলাম। কোনও উত্তর নেই ও-পক্ষ থেকে।

—শুনবে না?

—নিরুত্তর সীমা। কাজ করে চলেছে নিজের মনে। আমার কথা শুনবার কোনও আগ্রহই প্রকাশ করলো না সে।

—আমার কথা কি তোমার কানে যাচ্ছে?

কাকে বলছি আমি! যেন ফাঁকা ঘরে একা একা বকে চলেছি। ভারী দমে গেল মনটা। ওর কাছে গিয়ে বসলাম।

—এই নাও মুড়ি। ওর হাতের কাছে এগিয়ে ধরতেই সীমা ছুড়ে ফেলে দিল। মুড়িগুলি প্রশস্ত মেঝে পেয়ে বাতাসের সঙ্গে একটু খেলা করলো। ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরের বুকেতে। মুড়িগুলি ও-ভাবে নষ্ট হতে দেখে আমার কষ্ট হলো।

—একি করলে?

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে সীমা বললো, যা করলাম তা তো দেখলেই।

—এর ফল ভালো হবে না কিন্তু—

—আমার জীবনে আজ অবধি কিছুই ভালো হয়নি। অতোএব খারাপের ভয় তুমি আর দেখিও না।

একটু থেমে বললাম, জানোইতো আমি খারাপ, জেল ফেরত আসামী। কারো কাছে তেমন স্নেহ-ভালোবাসা পেলাম না, সবার লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই শুনে এলাম এতোদিন। নিতান্তই তোমার সঙ্গে সেদিন বাস-স্ট্যান্ডে দেখা। রচনা করতে চাইলাম অনেক কিছু। ভুলতে চাইলাম এতোদিনের পুঞ্জিভূত ব্যথা-বেদনা। ভাবলাম, বিধ্বস্ত জীবনে হয়তো এবার ফিরে আসবে শান্তি। আর কারও না-হোক অন্তত তোমার কাছ থেকে পাবো সাফল্যের সব কিছু। মন আর কেঁদে উঠবে না হতাশায়। আমার জীবনে সুখের প্রতিষ্ঠায় তুমি হবে আমার পথ প্রদর্শক। তোমার চোখে দেখতে চাইলাম....থাক অনেক বড়ো বড়ো কথা হয়ে যাচ্ছে—আসলে গলাটা আমার কেমন গাঢ় হয়ে আসছে। তাছাড়া আমার অজান্তেই কখন যে জল এসে আমার চোখ দুটিকে ভরিয়ে দিল তা টেরও পেলাম না। না-পেলাম! বললাম আমি যাচ্ছি!

—সমী! গাঢ় গলায় সীমা ডাকলো।

—থাক সীমা! অনেক তো হয়েছে।

—সব ভুলে যাও। মনে করো একটা দুঃস্বপ্ন! রাতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে গেছে।

—অসম্ভব!

—এ-পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়,—এটা তো সাধারণ, আমি ভুলতে পারলে তুমি কেন পারবে না? তুমিও তো কম বলতে ছাড়োনি আমাকে? কিন্তু সে-হিসেব-নিকেশ থাক, আমরা উজ্জ্বল হয়ে সত্যকে আশ্রয় করে থাকবো। যে-পথে চললে দুজনের শান্তি সেই পথেই হবে আমাদের যাতায়াত। কিন্তু তুমি অমন করে কাঁদতে পারবে না। ব্যথাতুর করে তুলতে পারবে না দুজনের সান্নিধ্যের চরম আবহাওয়া।

—সত্যি বলছো?

—এ-সব নিয়ে আর যাই হোক মিথ্যে চলে না। আবেগে ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। সীমা বাধা দিল না। তবে কাঁপছে।

—কাঁপছ কেন এতো?

—ভয় হচ্ছে।

—কিসের?

—সমালোচনা করবার লোকের অভাব হবে না। তুমি এখানে আসো, এতেই অনেক কথা শুনতে হয় আমাকে।

—ছেড়ে দাও তাদের কথা। আমি ওদের গ্রাহ্য করি না আর কোনোদিন করবোও না। তবে তুমি ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে চলবে না। একশ্রেণীর লোকের কাজ কারো-না-কারো বিরুদ্ধে সমালোচনা করা। তাদের সৎসাহস নেই, নেই কোনও আদর্শ। জেনো, তাদের সব কিছুই মেকি। সুতরাং আমরা যদি খাঁটি হয়ে থাকি তবে মিথ্যাকে ভয় করবো কেন?

সেদিন অনেক রাতে দাদা বাড়ি ফিরে এলো। এতো রাত সে কোনোদিনও করে না। করলেও মা'র কাছে বলে যায়। কিন্তু মা'কেও সে কিছু সেদিন বলেনি। তাই আমরা সবাই-ই চিন্তিত ছিলাম।

সাড়ে-এগারটারও পরে বাসায় ফিরলো দাদা।

—এতোদেরি হল কেন? মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমি ও দিদি দাদাকে ঘিরে ধরলাম। বাবাকে জোর করে দিদি শুইয়ে দিয়ে এসেছে। বলেছে, দাদা এলেই খবর দেবো।

—টেলরের অসুখ করেছে। প্রথমে ও কোনও গ্রাহ্য করেনি, যার ফলে এতোটা বাড়তে সুযোগ পেয়েছে। ম্লান সুরে দাদা জানালো।

দিদি আর ওখানে দাঁড়ালো না। যা শুনবার তা সে শুনেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত টেলরেব অসুখ সম্বন্ধে নানা চিন্তা করলো। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো। উঠতে পারলো না সকালে।

—কি রে কলেজে যাবি না? মা এসে ডাকলেন। দিদি উঠেই ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেললো, ইস্ সাড়ে-সাত!

—শরীর-টরীর খারাপ নয়তো। মা, দিদির কপালে হাত ছোঁয়ালেন।

—না।

পরদিন কলেজ থেকেই দিদি উদ্বিগ্ন মন নিয়ে টেলরের বাড়ি গেল। মা'র কথা তার মনে হয়েছিল কিন্তু টেলরের অসুখের কথা মনে আসছিল বারবার।

কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার চলে গেছেন। টেলরের কাছে বসে আছে একজন নার্স। দিদি গেল ঘরে। যেতেই টেলর নার্সের দিকে তাকানো মাত্র বাইবে চলে গেল নার্স।

—কি অসুখ করেছে? জিজ্ঞেস করলো দিদি।

—সেই লিভারের ব্যথা। এ-রোগ আর সারবে না। তোমাকে বলেছি না যে মাঝে মাঝেই এ-ব্যাথাটা.......

—নিশ্চয়ই তুমি বেহিসেবী মদ খেয়েছ?

—ভারতবর্ষে আসবার পর থেকে ও-জিনিস আমি খাই না।

—কষ্ট হচ্ছে খুব?

—ভীষণ।

নার্স এলো। ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। দিদি যতোক্ষণ ছিল নার্সের কাজটুকু নিজ হাতেই করলো সে। নার্সকে করতে দিল না কিছু।

ক্রমে টেলরের অবস্থা আরও দুর্ভাবনার দিকে চললো। ডাক্তার আর ঘবে রাখতে সাহস পেলেন না। ভর্তি করে দিলেন হাসপাতালে। দাদা প্রত্যহ সেখানে যায়। দেখে আসে শান্তিনিকেতনের বন্ধু গ্রেট টেলরকে। কেমন আছে-না-আছে সব খোঁজ-খবর নিয়ে এসে বাড়িতে আলোচনা করে।

আমি আর দিদি গেলাম হাসপাতালে। মা'কে বললাম, এমনি একটু বেড়োাতে যাচ্ছি। টেলরের বেডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর কলেজের কয়েকজন প্রফেসর ও ছাত্র এসেছেন ওকে দেখতে। আমাদের কারো মুখে কথা নেই। কথা বলবো কার সঙ্গে। টেলর ঘুমাচ্ছে। ভ্রূ-যুগল সর্বদা কুঁচকে রয়েছে। চোখে মুখে যেন ব্যথা লুকিয়ে আছে কতো।

পরদিনও আমরা গেলাম। দিদিই আমাকে বললো, সমী যাবি?

—চল। কিন্তু মা?

—অন্য কথা বলা যাবে। দিদি সত্যই মরিয়া হয়ে উঠেছে।

—আমরা কাল এসেছিলাম, দিদি বললো। তুমি তখন ঘুমাচ্ছিলে। টেলর কোনও কথা বললো না। করুণ চোখে শুধু দিদির দিকে আর একবার আমার দিকে তাকালো। অনেক পরে দিদির হাতটাকে নিজের হাতের মধ্যে নিল। টেলরের অবস্থা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। একি চেহারা হয়েছে ওর। এই কি সেই প্রথম দিনের গ্রেট টেলর। সেই উজ্জ্বল হাসি আর দীপ্ত চোখ! সুঠাম শরীর ভেঙে গেছে। হয়েছে অর্দ্ধেক। হাসপাতালে বেডে শোওয়া টেলর যেন আগের দিনের টেলরের ছায়ামাত্র!

—আমরা যাই এখন। নিস্তেজ সুরে দিদি বললো।

—টেলর মাথা নাড়ালো মৃদু। অর্থাৎ যেতে বারণ করছে।

—এক্ষুনি দাদা এসে পড়বেন। কালকে আসবো আবার—

—সমী! ছোট ছেলের কণ্ঠস্বরের মতোই ক্ষীণস্বর টেলরের।

—বলুন টেলরদা।

এতোক্ষণ পর কথা বলেছে তাই খুব আনন্দ হলো। অফুরন্ত আনন্দ! টেলরের শিয়রের সামনের

টুলটাতে বসলাম আমি।

—দিদির সঙ্গে তুমিও কাল এসো—

—আসবো। রোজ আসবো। যতোদিন আপনার অসুখ না-সারবে ততোদিন..........

—ক্ষীণ হাসলো টেলর।

যথা সময়ে পরদিন আমি ও দিদি গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়েই দেখা জিমের সঙ্গে। দেখেই বলে উঠলো, Night এ আমার একদম ঘুম হচ্ছে না। Sir এর এই Serious অবস্থা! Alone থাকতে ভারী কষ্ট হয়।

জিমের কথাগুলি হাসির মতো শোনালেও অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে বললো সে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল তার ছলছলে চোখ দুটিতে।

—আমি বাড়ি যাবো কবে? দিদিকে জিজ্ঞেস করলো টেলর। কণ্ঠে তার অসহায়ের সুর।

—আপনি Sir quickly well হয়ে উঠুন তবেই বাড়ি যেতে পারবেন। উত্তরে জানালো জিম।

ভালো হতে আর কতোদিন লাগবে? আমি যে আর এখানে থাকতে পারছি না।

—আর দু'টো উইক কষ্ট করে থাকুন Sir। তারপরেই বাড়িতে যাবেন—

টেলর ঘনঘন তাকাতে লাগলো দিদির দিকে। বুঝতে পারলাম, দিদিকে নিশ্চয়ই কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু পারছে না আমাদের উপস্থিতির ফলে!

একটা পরামর্শের নাম করে জিমকে নিয়ে আমি নীরবে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

—সঞ্জুকে আমি সব জানিয়েছি। থেমে থেমে টেলর বললো দিদিকে।

—দাদা কি বললেন? দিদি জিজ্ঞেস করলো আস্তে।

—ওর অমত নেই। তবে বাবা-মা'র............

—আমি জানতাম।

—সঞ্জু বললো................

—কি?

—আমি ভালো হয়ে উঠলে পর ও বাবা-মা'কে বলে সব ঠিক করবে।

দিদি একটু হাসলো শুনে।

একজন নার্স এলো। দিদির কানে কানে বললো, ওঁর সঙ্গে বেশি কথা বলা ঠিক নয়।

—কি বললো তোমাকে নার্স?

—কিছু না। তুমি আর কথা বোলো না, চুপ করে থাক।

—আমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিল তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আর কথা বলতে পারবে না এখন। আমিও বলবো না।

টেলর আর কথা বলতে পারলো না। কথা বলা কিম্বা শোনার বাইরে চলে গেছে সে। পার্থিব জগৎ ছেড়ে গেছে; সে আর ফিরে আসবে না। পরেরদিন ভোরবেলা টেলর মারা গেছে। তার পকেটে পাওয়া গেছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের ও দিদির দুটি ফটো। মর্মান্তিক এ-সংবাদ বহন করে আনলো দাদা। এই শোচনীয় সংবাদটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে দিদি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো। তাঁর জ্ঞান নেই। চোখ উল্টে গেছে। লেগেছে দাঁতে দাঁত। পা দুটি ক্রমশ গুটিয়ে আসছে। হাত রয়েছে মুঠ করা। মুখ দেখা যাচ্ছে না ওর। চুলে ঢাকা পড়েছে। দিদির এই অবস্থা দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। কাঁদলাম সারাক্ষণ! টেলর নেই! দিদি কেমন করে বেঁচে থাকবে..........আমি তো জানি টেলরকে কতো গভীর, কতো প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। টেলরকে হারানোর ব্যথা যে কোনোদিনও মুছে যাবে না। যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যহ টেলরের কথা স্মরণ করবে দিদি। কিন্তু কি পাবে? দুঃখ ব্যথা-বেদনার একটানা করুণরস বইবে ওর প্রতিটি শিরায়-উপশিরায়। মনে প্রাণ জ্বলবে চিরদিন। হাহাকার করে উঠবে তার প্রাণ-মন। তবুও পাবে না আর টেলরকে। যে যায় সে কি আর ফিরে আসে? দিদির পরবর্তী অবস্থা উপলব্ধি করেই

আমার কান্না আরও বেড়ে গেল। দুজনের জন্যই কেঁদে চলেছি। টেলর মারা গেছে—এ-কি ভাবা যায়? প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে এসেই যে আমাকে স্নেহের রসে ভিজিয়ে দিয়েছিল, বড়ো হবার লেখক হবার প্রেরণা যুগিয়েছিল, সর্বোপরি আমার মন জয় করেছিল যে-টেলর সেই টেলর আর নেই। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সে!

শ্মশানে লোক হয়েছে কম নয়। টেলরের শয্যার চারধারে তার কলেজের ছাত্র প্রফেসর দাঁড়িয়ে আছেন। দাদা আর কয়েকজন মাত্র মিলে কাজ করছে সৎকারের। দাদা মুষড়ে পড়েছে। টেলরের বিদায়ে তাঁর বুকে নির্মম আঘাত হেনেছে। তুষের আগুনের মতো ওর বুকের ভিতরটা জ্বলছে। বাইরে থেকে দাদাকে বুঝবার কোনও উপায় নাই। ওর সব কিছুই নীরবে। দাদাকে আমি চিনি।

—Sir Dead! জিম আমাকে দেখে কেঁদে উঠলো। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। দাঁতে দাঁত চেপে আমি কান্না চাপলাম।

টেলরের চিতা সাজান হয়েছে। তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো তার ওপর। একটু পরেই জ্বলে উঠলো আগুন। টেলরের একটি কথা সেই মুহূর্তে বারবার মনে পড়ছে; "টেগরের দেশে যেন আমার মৃত্যু হয়।" মনের ভিতর চাপা কান্না কাঁদছি। প্রকাশ হতে দিচ্ছি না। বুকখানি ব্যথায় ভারী হয়েছে উঠেছে। শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। এতোক্ষণ গুমরে মরেছি। ঝরঝর করে চোখের দু'কোল বেয়ে একটানা জল গড়িয়ে নামছে। চিৎকার করলাম না, সামান্য একটু শব্দও করলাম না—টেলরের শূন্যতা একান্ত ভাবে ঘিরে ধরেছে আমাকে। চারদিকে যেন ধ্বনি উঠছে, টেলর নেই। টেলর নেই! টেলব নেই!! বুকটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বুকের মাঝে পিটিয়ে চলেছে হাতুড়ী।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হলো। কিছুক্ষণ আগেও দেখছিলাম টেলরের ঠোঁটখানি। ওই ঠোঁটেই কতো হাসি ঝরে পড়েছে এতোদিন। আজ তার রেখাটিও নেই। যতোক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো, পলকহীন চোখে দেখছিলাম। কিন্তু এক সময় আগুণের লেলিহান জ্বলন্ত শিখা গ্রাস করলো টেলরের সারা মুখ। অদৃশ্য হলো ঠোঁট দুটি।

পাখিরা কুলায় ফেরার পথে সন্ধ্যা সঙ্গীত করছে। কিন্তু ওতো শুধু সঙ্গীত নয়—শান্তি কামনা করা। পাখিরা টেলরের মৃত আত্মার শান্তি কামনা করছে সর্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে।

জিম দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সমানে কেঁদে চলেছে। বেচারা জিম টেলরকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো!

--ওঠ জিম বাড়ি চলো!—ওর কাঁধে হাত রাখলাম!

—একেবারেই Home-এ যাবো Sir। কি করতে এখানে থাকবো? Sir-এর কাছে কতো দোষ করেছি কিন্তু Sir সব কিছুই এক্সকিউস্ করেছেন। শুধু বলতেন, আজকের মতো ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতে হলে খারাপ হবে। খারাপ আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। কেন-না প্রতিবারেই তিনি আমাকে আজকের মতো এক্সকিউস করতেন। আমি যাবো Sir, চলে যাবো আমার ভিলেজে। সেখানে গিয়ে বলবো, সবাই যেন জীবন name-এ না ডাকে; Sir-এর দেওয়া 'জিম' name-এ আমি পরিচিত হবো। I am going sir।

—তুমি চলে যাচ্ছো জিম? ডেকে জিজ্ঞেস করলোম।

—yes sir। আপনাদের কথা কোনোদিনও ভুলবো না। Never forget, never forget.........

বাড়িতে গেলাম। দিদির ঘরে যেতেই চমকে উঠলাম। একি চেহারা হয়েছে ওর! সামান্য একটি বেলার মধ্যেই কি বিরাট পরিবর্তন। চুল খোলা। মাথাটা বেশ বড়ো দেখাচ্ছে। চোখের কোলদুটি কেমন জানি কালো হয়ে গেছে। পরনের সাদা শাড়িখানা অত্যন্ত এলোমেলো লক্ষ্য করলাম, দিদির কানে দুল নেই, গলায় হার নেই, হাতে নেই চুড়ি। হাতে যা-আছে, তা হচ্ছে টেলরের একটি ফটো। আমাকে দেখে দিদি বিস্ফারিত চোখে তাকালো। ফটোটি জোরে চেপে ধরলো বুকের সঙ্গে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো অস্বাভাবিক ভাবে, চলে যাও, তোমরা চলে যাও, তোমরা কেউ না— তোমরা আমার কেউ না!!

পরদিনই আমার নূতন উপন্যাসখানি প্রকাশিত হলো। জীবনের প্রথম লেখা। কিন্তু অপরিসীম আনন্দের পরিবর্তে সীমাহীন দুঃখের ছায়া নেমে এলো আমার মনে। যে-লোকটি প্রেরণা দিয়ে লিখিয়েছে, সে আজ কোথায়, কতো দূরে! যাকে উৎসর্গ করলোম, সেই গ্রেট টেলরের হাতে তো বইখানি তুলে দিতে পারলাম না! আমার মধ্যে যদি কিছু ভালো থাকে তবে সেই ভালোর মূলে নেপথ্যে যে ব্যক্তিটি; সে নেপথ্যেই রয়ে গেল!

টেলর আর দিদির চিন্তায় চিন্তায় পাগল হয়ে উঠলাম। বাড়ি ফিরতে মন চায় না। কি হবে বাড়ি গিয়ে! দিদির ওই অবস্থা কতোক্ষণ দেখা যায়! আনমনে বসে থাকি গঙ্গার ধারে। আনচান করে ওঠে মন। মনে আসে টেলরের কথা! মনের সমুদ্রে বইতে থাকে দুঃখের জোয়ার। কতোদিনে ভাঁটা পড়বে তা কে জানে!

আলো এসে মিশেছে গঙ্গার জলের সঙ্গে। কুল কুল শব্দে শোনা যায়। দেহ মন আমার শিথিল। মনে নানা চিন্তার সমাবেশ। ভারাক্রান্ত সব কিছু। বেদনায় দীর্ঘশ্বাস পড়ছে বারবার। একটি স্টিমার জল কেটে কেটে চলে গেল। শেষ আওয়াজটুকু এক সময় মিলিয়ে গেল। চতুর্দিকে কেমন জানি একটা একা একা ভাব!!

যখন উঠে দাঁড়ালাম, রাত তখন গভীর। হাঁটবার শক্তি পাচ্ছি না। টলতে টলতে পথ বেয়ে চলেছি, বাড়ির পথ আর বেশি দূর নেই।

এর পর থেকে বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরতে লাগলাম যাতে দিদিব সঙ্গে দেখা না-হয়। ওর ওই বেশ যে আমার মনে ব্যথার কি ভীষণ ঝড় তোলে তা কেমন কবে বোঝাবো?

একদিন রাত করে ফিরছি। শুনলাম চাপা কান্নার করুণ আওয়াজ ভেসে আসছে। দিদি কাঁদছে। ঝুলবারান্দার সামনে এসে দেখি, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

—এতোরাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? জিজ্ঞেস কবলেন আমাকে।

—গঙ্গার ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—বটে! মদ খাওয়া ধবলে কবে থেকে? বাবা যেন রেগে ফেটে পড়লেন।

—আমি? মদ! কি বলছেন বাবা?

—পাড়ার লোকে তো তাই বলছে। আমার মান-সম্মান আর কতো জলাঞ্জলি দেবে? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে............ছিঃ ছিঃ ছিঃ..........পাড়ার মধ্য দিয়ে আমি হাঁটতে পর্যন্ত পারি না। গুন্ডা, মাতাল কি-না বলে লোকে? তোর জন্য! তোর মতো গরু-ছেলের জন্যই আমাকেও এ-সব কথা শুনতে হচ্ছে। নিজে তো মানুষ হলি না, আমাকেও এতোটুকু শান্তি দিতে পারলি না। এমন ছেলেকে দিয়ে তবে কি করবো? চাই না এমন ছেলে। তোমার যেখানে খুশি চলে যাও, শূন্য গোয়াল আমার অনেক ভালো।

—কালকেই চলে যাবো বাবা।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। বাবা যে-কথাগুলি বলেছেন, অপরের কাছ থেকে শুনলে আমি তার প্রতিবাদ করতে পারতাম। কিন্তু কি হবে প্রতিবাদ করে? খারাপ বলে যে আমি আগেই পরিচিত। কেউ তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। হায় ভগবান! আমি গুন্ডা আমি মাতাল, মদ খেয়েছি! বলুক,—এক শ্রেণীর পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখ আছে তাই বলে। দোষ করলেও তারা সমালোচনা করে, না-করলেও করে। এ-পৃথিবী আশ্চর্যে ভরা। সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। পাখিদের কীচির-মিচির শব্দে সে তন্দ্রা টুটে গেল। মনে পড়লো, আমাকে আজ চলে যেতে হবে। বাড়ির মায়া কাটিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। কষ্ট হয় শুধু দিদিটার জন্য।

দিদির ঘরে গেলাম। মাথা নিচু করে ও টেলরের ছবিখানার দিকে চেয়ে রয়েছে। ওকে আর বিরক্ত করলাম না। কতোদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করেছি। সেজন্য বাবা-মার কাছে অনেক

বকা শুনেছি, মারও খেয়েছি কম নয়। কিন্তু কতো যে ভালোবেসে, ছোট ভাইয়ের দাবি নিয়ে এ-গুলি করতাম—সে-মনের খবর কোনোদিন কেউ রাখেনি।

মাকে প্রণাম করলাম। বাবাকে প্রণাম করে বললাম, আমি যাচ্ছি বাবা!

নিশ্চযই যাবে।

—কি বলছো তুমি! মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার দিকে এগিয়ে আসতেই বাবা বলে উঠলেন, ওকে বাঁধা দেবে না। চলে যাক, দূর হয়ে যাক! সন্তান কতো আনন্দের! কিন্তু ওকে দিয়ে কি করবো আমি? পাগল না-করে ও আমায় ছাড়বে না। একদিন আমি আত্মহত্যা করবো।

চোখের জলের ভিতর দিয়ে পা চালালাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে একবার দিদির ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। সে তখনও টেলরের ছবি দেখছে এক মনে।

মিনতি কাফের সামনেই লোকটির সঙ্গে দেখা। আজ তার পরনে নূতন পোশাক। মুখে সতেজ হাসি।

--দাদা! আমার পরিচয় জানতে পেরেছি। আমার নাম, তপন জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী। বাবার নাম ইউ.এন. চ্যাটার্জ্জী। চিনতে পারলেন তাঁকে।

আমি কোনও কথা বললাম না। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না তখন আমার।

- -আপনি সেদিন যাকে ঘুঁষি মেরেছিলেন, ওই চারতলা বাড়িতে থাকেন, উনিই আমার বাবা।

— অবাক হয়ে তাকালাম ওর চোখের দিকে।

---হ্যাঁ দাদা আর My mother, she is a. .....মাটির দিকে তাকালো লোকটি।

—তাতে কি হয়েছে? তবুও তিনি মা। তিনি আপনার মা'! বলেই আর দাঁড়ালাম না। পথ'ই আমার আশ্রয়। আমাকে চলতে হবে।

টেলরের একটি কথা মনে পড়ছে।

সে একদিন বলেছিল ঃ জানো সমী! সংসারক্ষেত্র অত্যন্ত জটিল, কঠিন। মাকড়সার জাল যেমন প্যাঁচে প্যাঁচে জড়ানো ঠিক তেমনি। তুমি একটি ভালো কাজ করো, লোকে প্রথমে খারাপ দৃষ্টি নিয়ে দেখবে। দোষ না-পেলেও খুঁজে বের করবে অন্তত হিংসা-দ্বেষের ফলে। আর ঠিক এই কারণেই আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। উৎসাহ উদ্দীপনা যায় নিভে! জীবনের আনন্দের সুর-ছন্দ ইত্যাদি জটিলতর প্যাঁচের আবর্তে জড়িয়ে যায়! এইজন্যই বলা হয়েছে The world is not a bed of roses!"

সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি আজ বুঝতে পারছি টেলরের সেই দিনের কথার গূঢ় অর্থ।

প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে চেয়েছি! কিন্তু সাধ আছে সাধ্য নেই। অর্থাৎ শেষ রক্ষা করতে পারিনি। লোকে দেখছে আমার উপরটা, বাইরের চরম ব্যর্থতা! অদৃষ্টের ফেরে আমার ভালোটাও মন্দে পরিণত হয়েছে। আর আমি সবার কাছ থেকে অপযশ কুড়িয়ে পেয়েছি। দুঃখ হয় সেই কারণেই—আমার মনের খবর রাখলো না কেউ। কেউ দেখলো না আমার বাইরের আবরণের নীচে ভিতরের কোমল স্তরটাকে।

এগিয়ে চলেছি পথ বেয়ে আরও চলতে হবে। সারা জীবন চলতে হবে। পথই আমার বাড়ি, বাড়িই আমার পথ। বাড়ি আর পথকে এখন ব্যবধান করে দেখলে আমার চলবে না।

পথের দু'পাশের গাছ থেকে পাতা পড়ছে! বাতাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে ঝরাপাতাদের গান!

এক সময় বিকেল এলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। অনেক হেঁটেছি। ব্যথায় টনটন করছে পা দুটি। কিন্তু দমলাম না কিছুতেই। সামান্য পা! জীবনটাই যে আমার বিধ্বস্ত। এ-ক্ষুদ্র জীবনে দেখলাম অনেক কিছু। বুঝতে শিখলাম আরও বেশি।

বড়ো গঙ্গার কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। প্রশস্ত বুক। জলরাশি শান্ত হয়ে বইছে। নৌকা-জাহাজের সমাবেশ! দাঁড়টানার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। বেশ লাগে শুনতে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। কয়েকশো বছর আগেকার পুরোনো এক বটবৃক্ষের পাদদেশে এলিয়ে দিলাম দেহ। চোখে কি যেন এক অজানা স্বপ্ন! নোঙ্গর তোলার শব্দ হলো। এবারে হয়তো পাড়ি দেবে।

অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে এলো। সামনের ঘাটে আর কোনও পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়ছে। মায়ের কোলে শিশুরা যেমন গভীর ভাবে ঘুমায়। আমারও ঘুম নেমে আসছে চোখের পাতায়। জলের বুকে আলো জ্বলছে। আমার বেদনাগুলি যেন ছায়ামূর্তির আকারে রিক্ত-রুক্ষ-শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়োতে লাগলো।

নিজের ছবি



দু'ধারে ভুট্টা আর আখেব ক্ষেত। জোরে নিঃশ্বাস নিলে পাকা আখেব গন্ধ বুকের গভীরে গিয়ে ভালোলাগার এক প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। ছোটবেলায় ওই রকম ক্ষেতে ঢুকে লুকোচুরি আর মাতামাতির ঝাপসা ছবিটা আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন হাজারো কাজের ব্যস্ততায় এবং রাজনীতির জটিল কচকচিতে এতো বেশি সময় দিতে হয় যে সবুজ ক্ষেতের শ্যামল ছায়ায় একটা মুহূর্তও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। নয়তো সন্তান-সম্ভবা রমণীর মতো ফলনের প্রাচুর্যে গম, ভুট্টা আর আখের গাছগুলো যে-ভাবে মাথা দুলিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে সেই ছবি তো বাবুলাল প্রায় প্রতিদিনই দেখছে। কিন্তু ওই দেখা পর্যন্তই। মনেব ভেতরে গিয়ে কিছুতেই যেন নাড়া দিতে পারে না। আসলে চোখ দিয়ে দেখার সেই সময় কোথায়? অথচ আজকে বাবুলাল সব কিছু মন দিয়ে দেখছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো, অমন করে প্রসন্ন এক দৃষ্টি নিয়ে অতো কিছু অনুভবের মন অথবা ধৈর্য কোনওটাই তার নেই। উদাসী হাওয়ার এক উন্মত্ত দাপাদাপি এখন তার বুকের মধ্যে। বাবুলাল স্থির হয়ে বসে থাকতে চাইলেও ক্রমশই সে যেন অস্থির হয়ে উঠছে।

সবুজ প্রান্তবের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। বাবুলাল যেহেতু একজন মাননীয় বিধায়ক এবং জঙ্গী যুবনেতা সুতরাং ট্রেনের মধ্যেও তার একা থাকার উপায় নেই। তার চ্যালাচামুন্ডারা তাকে সেই ভাবেই ঘিরে বসে আছে যে-ভাবে চিনির ডেলার চারপাশে পিঁপড়েবা ছেঁকে থাকে। ওরা সমস্তিপুর থেকে মধুবনীতে ফিরে যাচ্ছে। সমস্তিপুরে এসেছিল পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশে যোগ দিতে। বাবুলালের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল খুব কম করেও সে যেন তার পশ্চিম মধুবনী এলাকা থেকে পাঁচ হাজার লোক নিয়ে সভাতে যোগদান করে। বাবুলাল সাত হাজার লোককে নিয়ে গিয়ে সেই সভার বিশালত্ব বাড়িয়ে পার্টিতে নিজেব দামও বাড়িযে নিয়েছে। কিন্তু প্যান্ডেল বাধার পর আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার মতোই ব্যাপারটা ঘটে গেল। সামনেই মন্ত্রিসভার যে রদবদল হতে চলেছে কানাঘুষোয় শোনা গেল পূর্ব-মধুবনীর মহেশপ্রসাদকে নাকি মন্ত্রিত্বের সম্মান দেওয়া হতে পারে। তখন থেকেই বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছে বাবুলাল।

মহেশপ্রসাদ! বছর সাতাশ-আঠাশের ওই সিধেসাপটা স্কুল মাস্টারটা রাজনীতিতে এসেছে তারও সাত বছর পরে। অথচ ওকেই আগে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে---ওপর তলায় নেতৃত্বের এই বৈষম্যমূলক আচরণ কি মেনে নেওয়া যায়? সবচেয়ে মুশকিলটা হলো, সরাসরি বিরোধিতাও করা যায় না। বাবুলাল কিছুতেই ভেবে পেল না, মহেশপ্রসাদের মধ্যে পার্টির বড়ো বড়ো নেতারা এমন কী দেখলেন? হ্যাঁ, এটা অবশ্য সে নিজেও স্বীকার করবে, ছেলেটা বেশ শান্ত এবং ভদ্র টাইপের। যথেষ্ট বিনয়ীও। আর কথাবার্তা যা বলার বেশ স্পষ্ট ভাবেই বলে। এবং খোলাখুলি। কিন্তু রাজনীতিতে ওই গুণগুলো প্রশংসার যোগ্য? এখানে কাদা ঘাঁটতে হবে। কাদা অপরের গায়ে ছিটাতে হবে। কুড়ি হাজার মিথ্যে কথার সঙ্গে ফাউ হিসেবে একটা সত্যি কথা বললেও চলে। কোনও সুস্থ নীতির তোয়াক্কা না-করে সব বানচাল করে দেবার ক্ষমতা অবশ্যই থাকা চাই। এবং হেভী ঝাড়পিট ও হাজারো হ্যাপা সামলানোর দুরন্ত সাহস, দক্ষতা যদি থাকে রাজনীতিতে সে তো রাজপুত্র! তবে হ্যাঁ, এখানে যতো অন্যায় কাজই করো না কেন---সব কিছু করতে হবে কৌশলে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ কষে। প্রতিনিয়ত মিথ্যের ওপর একটা সত্যের আলখাল্লা চাপিয়ে, নোংরার ওপর একটা সদা সর্বদা পরিচ্ছন্ন প্রলেপ বুলিয়ে রাজনীতির ফায়দা তুলতে হবে। আর এই খানেই তো মহেশপ্রসাদ একটা আস্ত উল্লুক। এখানে টিকে থাকার ওর কোনও যোগ্যতাই নেই। অমন স্বামীজি মার্কা ভাবমূর্তি নিয়ে যদি সফল হওয়া যেতো তাহলে পার্টিতে বাবুলাল এতো গুরুত্ব পাচ্ছে কি করে?

বাবুলালের কষ্টটা সেই কারণেই আরও বেশি। দলের প্রযোজনে সে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো—আর মন্ত্রি করার বেলায় মহেশপ্রসাদ! এব প্রতিবাদ যে বাবুলাল করতে পারে না তা নয়। তার বিরাট অনুগামীদের নিয়ে সে যে-কোনও মুহূর্তে নয়-ছয় করে দিতে পারে। কিন্তু তেমন কাজ শুধু বোকারাই করে। বাবুলাল তেমন গর্দভ নয়। প্রকাশ্যে ওটা বলা সম্ভব নয়, মহেশপ্রসাদকে মন্ত্রি করার প্রতিবাদে আমি এখন পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মানি না। সেই ধরনের বাড়াবাড়ি করা এই মুহূর্তে কখনওই উচিত নয়। রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা মানেই সুখের সমুদ্রে সাঁতার কাটা। এতো ক্ষমতা, এতো দাপট এবং অর্থের বিলাসিতা দেখানো তো ওই দাদাদের ছত্র ছায়ায় থেকেই। অতোএব ওঁদের চটানো ঠিক নয়। বিরোধিতা যদি করতেই হয় সেটা করতে হবে ওই মহেশপ্রসাদের বিরুদ্ধেই। এবং সেটা সম্পূর্ণ অন্য পদ্ধতিতে। কিন্তু এখন যে ঈর্ষার ব্যথাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তার উপশমটা কীভাবে হবে?

চ্যালাচামুন্ডাদের মধ্যে বামপেয়ারে বাবুলালের ডান হাত। একজন মাননীয় বিধায়কের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণ ছায়ার মতো লেগে থেকে সে-ও হাফ বিধাযক হযে গেছে। যে-কোনও ঘটনার অর্দ্ধেক শুনেই সে পুরো ব্যাপারটা চমৎকার সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলে ধরতে পারে। সেই রামপেয়ারে অনেকক্ষণ ধরেই তার গুরুকে লক্ষ্য করছিল। বাবুলালের মন খারাপের কাবণটা তার অজানা নয়। সে তাকে বলেই ফেললো, উস্তাদ ঘাবড়াও মৎ। ইতনা পড়েশন কা কোই বাত নেহি। তুমি হলে মধুবনীর জবরদস্ত যুব নেতা। তোমাকে আস্তাকুড়ে রেখে উও শালে মহেশপ্রসাদ কো মন্ত্রি কা কুর্সিমে বৈঠায়গা—ইয়ে কভি নেহি হো সেকতা। এ-সব হলো ওই রাজারামজির চাল। তোমাকে শ্রেফ একটু চাপের মধ্যে রাখতে চাইছে। ইয়ে নাটক বিলকুল বাহানা হ্যায়। পরে দেখে নিয়ো সব ফাঁকা আওয়াজ। মহেশপ্রসাদকে মন্ত্রি করাই হবে না।

নিজের এক পঙ্গপাল সমর্থকদের মুখের দিকে অলস ভঙ্গিতে একপলক তাকিয়েই বাবুলাল নতুন এক দৃষ্টি নিয়ে রামপেয়ারেকে দেখতে লাগলো। তোষামোদ করা কারো ভালো কথাও এই মুহূর্তে নিমের রসের চেযেও তেতো লাগছে। তবে রামপেয়ারে কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেনি। মহেশপ্রসাদ মন্ত্রি হবে না ছাই। ও-সব হলো কূটনৈতিক চাল। বাজাব গরম করা ফাঁকা বুলি।

সত্যিই তো এই যে নির্বাচনের আগে এবং পরে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মিটিংয়ে তারা যে ভাষণ দেয় তা তো প্রায় সবই মিথ্যে আর মিথ্যে। মিথ্যে ছাড়া কোনও ভাষণই তৈরি করা যায় না। তিরিশ হাজার বেকারকে চাকরি দেবো। সাঁইত্রিশ কোটি টাকার এক প্রকল্প বসাবো। গ্রামের সব রাস্তা পাকা করতেও পাঁচ কোটি টাকা লাগবে। শুখা মরমসুমেও যাতে মা-বোনেদেব তিন মাইল দূরের নদী থেকে পানি আনতে কষ্ট না-হয় তার জন্য অবশ্যই কুয়ো এবং চাষ-বাসের জন্য ডিপ-টিউবওয়েলও বানিয়ে দেবো। এতেও খরচ করতে হবে ন'কোটি টাকা। হ্যাঁ, ভাষণ দিতে উঠলে কিছুতেই অমন ছুটকো দু-পাঁচশ বা দু-এক হাজারের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে নেই। শ্রোতারা আজকাল কেউ একটা বোকা নেই বটে তবুও তারা এক ধরনের বোকা। কোটি কোটি টাকার লেকচার শোনার পর মনে করে, এতোটা না-করলেও কিছু তো করবেই। কিন্তু শ' বা হাজারের কাহিনী শোনালে প্রথম থেকেই ঠোঁট ওল্টাবে, ও ব্যাটাকে ভোট দিয়ে কোনও লাভ নেই। এতো ছোট হিসেব নিয়ে ও কোন স্বপ্নপুরীটা তৈরি করবে শুনি? অতোএব বক্তৃতায় বড়ো বাজেটের ছবি তুলে ধরতে হবেই। আর মজাটা তো ওইখানেই। ভোটের নৌকায় একবার বিজয়ী হয়ে উঠতে পারলেই চালাও পানসি স্ফূর্তির ফোয়ারায়। কেউ বলার নেই। একটা লোক এসেও তখন জোর গলায় অভিযোগ করে না, কি হলো দাদা—তিরিশ হাজার বেকার তো অনেক দূরের ব্যাপার তিনজন ছেলেও যে এখনও পর্যন্ত চাকরির মুখ দেখলো না। সাঁইত্রিশ কোটি টাকার প্রকল্প আর পাকা সড়ক যে কি বস্তু চোখেই দেখলাম না। এমন ধরনের সাহস দেখাবার ক্ষমতা জনগণেব নেই। জনগণ শুধু একরাশ হতাশা নিয়ে পাড়ার চায়ের দোকানে নয়তো বাসের মধ্যে নিজেদের বিক্ষুব্ধ মেজাজটাকে প্রকাশ করে। আর সামনে কোনও নেতাকে দেখলে তার চমৎকার জয়গান করে।

যাক গিয়ে সে-সব কথা। বাবুলাল কি যেন ভাবছিল? হ্যাঁ মনে পড়েছে। নেতাদের ফাঁকা

আওয়াজের ব্যাপারটা নিয়েই সে চিন্তা করছিল। মুখ্যমন্ত্রি থেকে বিধায়ক—এই একটা জায়গায় সবাই এক। গালভারী কথাব জগঝম্প বাজিয়ে প্রত্যেকেই এখানে হাততালি কুড়োবে। কিন্তু ভাষণের রংমশালের শেষে পড়ে থাকে কঙ্কালের নগ্ন কাঠামোটাই। মহেশপ্রসাদের ক্ষেত্রেও কি তাই হবে না? ব্যাপারটায় না-বোঝার মতো কিছু নেই। রাজারামজি রাজ্যেব বিত্ত মন্ত্রি। দীর্ঘ দিন ধরে তারই আশ্রয়ে থেকে বাবুলাল আজ বিধায়ক। কিন্তু এগারো মাসের মধ্যে যেখানে তিন-তিনজন মুখ্যমন্ত্রির পরিবর্তন হয় সেখানে বাবুলাল আরও একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। সামান্য একজন বিধায়ক হয়ে থাকতে মন ভরে না। পার্টির আদর্শ-ফাদর্শ সব চুলোয় গেছে। এখন গ্রুপঘেঁষা এই ডামাডোলের রাজত্বে নিদেনপক্ষে একজন রাষ্ট্র মন্ত্রিও যদি হতে না-পারে তারচেয়ে শরমের ব্যাপার এই দুনিয়াতে আর কি হতে পারে? বিশেষ করে নিজের অনুগামীদের কাছে সে খুবই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

বাবুলাল বুঝতে পেরেছিল পার্টিতে রাজারামজির ক্ষমতা একটু একটু করে কমে আসছে। নেহাত প্রবীণ নেতা তাই এখনও বিত্তমন্ত্রির আসনে রয়েছেন। তবে ওঁর কথা পার্টিতে এখন বিশেষ গুরুত্ব পায় না। উনি সম্পূর্ণ ঠুঁটো জগন্নাথ! বাবুলালের দু'চোখের ছবিটাও তাই দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছিলো। ওই নখ-দন্তহীন রাজারামকে ধরে থাকলে তাকে আগামী আবও চার বছর সবকারি অফিসের ক্লার্কের পদমর্যাদা থেকেও অনেক নীচে শুধুমাত্র ওই হাত তোলা পার্টি হয়েই বিধান সভায় চুপচাপ বসে থাকতে হবে। বিরোধীপক্ষ যদি কখনও তাদেরকে একটু ট্যান্ডাই-মান্ডাই করে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রেই মাঝেমধ্যে একটু তেড়ে গিয়ে চেল্লাচেল্লি করতে হয়। তাও বেশিক্ষণ নিজের দাপট দেখানো যায় না। স্পিকার নামের মাননীয় রেফারি মহোদয়টি হাতুড়ি নিয়ে বসেই আছেন। তা তিনি সমানে ওই হাতুড়ি পেটানোর কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কিন্তু অতো অল্পতে একজন শক্তিধর যুবনেতা হিসেবে বাবুলাল কি করে খুশি থাকে? সুতরাং রাজনৈতিক উচ্চাশায় সে প্রাকৃতিক নিয়মে শরীর থেকে কিছু অসার বস্তু যেমন ভাবে ত্যাগ করে তেমন সহজেই পরিত্যাগ করেছিল রাজারামজিকে। জগন্নাথ কৌশলের গ্রুপটার পাল্লা তখন বেশ ভারী। পার্টির মধ্যে এবং মন্ত্রিসভাতেও তাঁরই ক্ষমতা দেখানোর পালা চলছে সে-সময়ে। একবার তো সামান্য একটু বেঁকে বসে এমন এক কৌশল করলেন যে মুখ্যমন্ত্রিকেই শেষ পর্যন্ত সরে যেতে হয়েছিল। আর মজঃফরপুরের আনকোরা ছেলে আবুল বুখাতিকে হাই তুলতে তুলতে এককথায় মন্ত্রিসভায় ঢুকিয়ে দিলেন। অতোএব এতো সব ভেলকি দেখার পরেও বাবুলাল ওই ক্ষমতাশূন্য বুঢ়া রাজারামজির গ্রুপে থেকে শুধু কেশর ফুলিয়েই যাবে এতোটা ধুর সে নয়।

বাবুলাল তাই যথা সময়েই জগন্নাথ কৌশলের গ্রুপে ভিড়েছে। এখানে একই পার্টির লোক হওয়াটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা নয় দলের সংহতি, ঐক্য। আসল ব্যাপারটা হলো, পার্টির মধ্যে যে-নেতার গ্রুপটা শক্তিশালী চোখ-কান বুজে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে সেই দাদার চরণঘাটে নৌকা ভেড়াও। এবং যতোটা সম্ভব ক্ষমতার ফসল সেই নৌকায় যতো তাড়াতাড়ি পারো তুলে নাও। বাবুলালের রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির মূলমন্ত্র ওটাই।

জগন্নাথ কৌশলের স্নেহছায়ায় এসে বাবুলাল এখনও মন্ত্রি হতে পারেনি বটে তবে ক্ষমতার চূড়ান্ত ভোগ করে চলেছে। খুঁটির জোর থাকলে ভেড়ার আস্ফালন বেড়ে যায়। ফলে পেছনের শক্তিটার কথা চিন্তা করে থানা-পুলিশের অফিসাররা পর্যন্ত বাবুলালের সামনে জো-হুজুর হয়ে সব সময়েই তটস্থ। মাসখানেক আগে বাবুলালের মায়ের ধলা নামের প্রিয় সাদা ছাগলটা হারিয়ে গিয়েছিল। বুড়ির সে-কী কান্না! দুপুরে বাড়ি ফিরে বাবুলাল মায়ের সেই কান্না শুনে শুধু বলেছিল, এমন ভাবে কাঁদছো যেন আমিই মরে গেছি। একটা ছাগলের জন্য আকুল হয়ে কাঁদলে লোকে বলবেটা কি শুনি? তারপরে মাকে শান্ত করে বাবুলাল ওই মুহূর্তেই খবর পাঠিয়েছিল থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিশ্রজিকে।

মিশ্রজি তাঁর দলবল নিয়ে জিপ ছুটিয়ে এমন করুণ মুখ করে বাবুলালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন এই মধুবনীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপরাধটাই ঘটে গেছে। থানার বড়ো সাহেবকে বাড়ির উঠোনে দেখে বুড়ির কান্না তো আরও এক পর্দা উঁচুতে উঠলো। আর বাবুলাল? বিধানসভার মাননীয়

একজন সদস্য হিসেবে অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে শুধু প্রশ্ন করেছিল, আমার মায়ের কান্নাটা শুনতে পাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি বই-কী।

আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না?

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে স্যার। আমরা অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি।

তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে আমার মায়ের ধলাকে যেখান থেকে পারেন খুঁজে বের করে আনুন।

আজ্ঞে স্যার আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটিই হবে না। মিশ্রজি আরও একপ্রস্থ ব্যস্ততা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ধলার বয়স কতো? উচ্চতা? কি রকম দেখতে, ওর পবনে কি রঙের প্যান্ট-শার্ট বিধায়কের মুখটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল দেখে বুদ্ধিমান মিশ্রজি বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তিনি থেমে পড়তেই বাবুলাল আরও কঠিন গলায় উত্তর দিয়েছিল, ধলা হলো আমার মায়ের অতি আদরের সফেদ ছাগল।

আমার বুঝতে অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মিশ্রজি দ্রুত নিজেকে শুধরে নিয়ে আরও বললেন, অনুগ্রহ করে আপনার মাকে কাঁদতে বারণ করুন। আর আপনিও কোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। এক ঘন্টার মধ্যে ধলাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এক ঘন্টার আগেই মিশ্রজি যে-নিষ্ঠার সঙ্গে ছাগলটাকে খুঁজে পেয়ে বুকে আগলে নিয়ে এসেছিলেন, শোনা যায় তারই পুরস্কার স্বরূপ দিন দশেক আগে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পুলিশ-পদক পেয়েছেন। এবং মাননীয় বিধায়কের কাছে মিশ্রজীর কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা নেই।

বাবুলাল তার ক্ষমতার দাক্ষিণ্য এমন ভাবে মাঝে মধ্যে বিতবণ করে বটে কিন্তু আজকে ট্রেনের এই দুলনীতে তার চিন্তার সুতোগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে সে সত্যি সত্যিই জগন্নাথ কৌশলের গ্রুপে থেকে এক শক্তিমান এম.এল.এ হয়ে উঠেছে কিন্তু তার স্বপ্ন এখনও অপূর্ণই রয়ে গেছে। মন্ত্রি সে আজও হতে পারেনি। অথচ রাজাবামজি নাকি মহেশপ্রসাদকে মন্ত্রি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আসলে বাবুলালকে তিনি দেখাতে চাইছেন এখনও কতোখানি ক্ষমতা। এবং সমস্তিপুরে আজকের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রির ঘনিষ্ঠমহল সূত্রের খবর যা পাওয়া গেছে তাতে তেমন আভাসই ফুটে উঠেছে। মহেশপ্রসাদ মন্ত্রি হচ্ছে। ভাষণের মতো শূন্যগর্ভ যদি এটা না-হয় তাহলে ধরে নিতে হবে রাজারামজি আবার ক্ষমতার শীর্ষে পা রেখেছেন। তাহলে কি আবার গ্রুপ বদলের ছাড়পত্র নিতে হবে? সেটা অবশ্য আর সম্ভব নয়। গত ছ'মাস ধরে বাবুলাল যে-ভাবে জগন্নাথ কৌশলের গলার পৈতে হয়ে লেপটে থেকে গুরুভজনা এবং রাজারামজির বিরোধিতা করে এসেছে তাতে বিরাট কোনও অঘটন না-ঘটলে তাকে জগন্নাথ হাউসের জার্সি পরেই আপাততো থাকতে হবে। কেন-না জগন্নাথজি এখনও পার্টির অবিসংবাদিতা নেতা। বরং দেখাই যাক না, রাজারামজির হাত ধরে মহেশপ্রসাদ কতোটা ওপরে উঠতে পারে? তারপর না-হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কেন-না রাজনীতিতে চক্ষুলজ্জা আর শেষ কথা বলে কোনও শব্দ লেখা নেই।

ট্রেনের জানলা দিয়ে বাবুলাল ভুট্টা আর আখের ক্ষেত দেখতে দেখতে একটু অস্থির হয়ে উঠলো। তবে সেটা বাইরে থেকে কাউকে বুঝতে দিল না। রাজনীতি করে করে এই ব্যাপারটা সে বেশ আয়ত্বে এনেছে। প্রচন্ড রাগের মুহূর্তেও বাবুলাল চমৎকার হেসে কথা বলতে পাবে। এবং অবৈধ কোনও কাজকর্ম করার পরেও যথেষ্ট স্বাভাবিক থাকতে পাবে। না, বিবেকের দংশন-টংশন বলে কোনও ক্রিয়া তার ভেতরে কাজ করে না। যাইহোক, অপরের সর্বনাশ অতি অনায়াসে মধুর হেসে সমাধা করলেও এই মুহূর্তে বাবুলাল একটু বেশি মাত্রাতেই গম্ভীর হয়ে রয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই আখ, ভুট্টা আর বজরার ক্ষেতে চযে বেড়ানো ছিল বাবুলালের নেশা। বিশেষ করে আখের লোভে তার মুখে যেন সর্বদাই আঠা লেগে থাকতো। তখন বাবুলালের কতো আর বয়স হবে? এগারো ছাড়িয়ে বারোয় পড়েছে। সেই সময়েই একদিন তার দু'চোখের সামনে বিস্ময়ের জানলা খুলে গেল। আখ চুরি করতে গিয়ে বলিরামের ঘন বাগানে ঢুকেছিল। নিঃশব্দে এবং প্রায়

হামাগুড়ি দিয়েই। কিন্তু একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ তার কানে যেতেই সে চোখ দুটোকে অত্যন্ত সজাগ রেখে র‍্যাডারের মতো বারবার এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিল। ছবিটা তখনই আটকে গেল দৃষ্টির ফ্রেমে। বছর পনেরোর একটা কিশোরীকে প্রায় নগ্ন করে একটা লোক তার শরীরের ওপর চাষবাস শুরু করে দিয়েছে। গাছেব পাতার ফাঁক দিয়ে সেই ছবিটা দেখতে দেখতে বাবুলাল কাঁপছিল। সেই সঙ্গে এক উন্মাদনায় সে-ও ভীষণ ভাবে পুরুষ হয়ে উঠতে চাইছিল। লোকটা চলে যেতেই বাবুলাল ঘোর-লাগা চোখে এবং শরীরের কাঁপুনি নিয়ে গুটিগুটি পায়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়েছিল মাত্র। মেয়েটি সেই সময়ে তার ঘাগরার দিকে হাত বাড়াতেই বাবুলাল ওর দেহের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে আগের লোকটার মতোই আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠলো।

আখের বনের সেই ছবিটা এতোদিন পরে হঠাৎ কেন মনে পড়লো বাবুলাল জানে না। ওর চেয়েও জঘন্যতম অন্যায় সে এম.এল.এ হয়ে এই সেদিনও করেছে। কিন্তু জোর জবরদস্তি পুরুষ হওয়া কৈশোরের সেই ঘটনাটাই তার মনকে এই মুহূর্তে ছেয়ে রেখেছে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে মহেশপ্রসাদের সম্পর্ক কী? মহেশপ্রসাদেব মন্ত্রি হওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে ইক্ষু বনের ওই চিন্তার মধ্যে কি কোনও যোগসূত্র আছে? কিছু একটা বীজের টুকরো নিশ্চয়ই লুকিয়ে রযেছে। নয়তো বাবুলালের মতো জবরদস্ত যুব নেতা খামোকা ও-সব অসংলগ্ন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? একটা ঘটনার সঙ্গে কৌশলে আর একটা ঘটনাকে মিলিয়ে দেওয়াই তো রাজনীতির প্রধান খেলা। এবং এই খেলাটা যে-যতো সূক্ষ্ম ও দক্ষতাব সঙ্গে খেলতে পারে সে ততো বড়ো কূটনৈতিক চালের কুশলী খেলোয়াড়। জগন্নাথ কৌশলের গ্রুপে থেকে বাবুলাল এই সব কূটকাচালি কৌশলের কিছু কিছু তো আয়ত্ত্ব করেছেই।

ইতিমধ্যে বাবুলালকে দু'দিনের জন্য পাটনা যেতে হয়েছিল। রাজ্য সভাপতি দুবেন্দ্র সিং হঠাৎ মারা যেতেই ওই দৌড়াদৌড়ি। এক কন্ট্রাকটরের কাছে মোটা টাকা বন্ধুত্বের উপহার হিসেবে পেতে এবং গলা ভেজানোর পার্টিতে যোগ দিতে বাবুলাল যখন তাব পশ্চিম মধুবনীর বাড়ি থেকে বেরুবে বেরুবে করছিল ঠিক তখনই হাই কমান্ডোর নির্দেশে পড়িমরি করে ওই পাটনা ছুটে যাওয়া। বিরক্তিতে সমস্ত মনটাই খিঁচিয়ে গেল বাবুলালের। ধ্যাৎ তেরি বহন কা—শালে দুবেন্দ্র সিং কো মরনে কা ওয়ক্ত আউর নেহি মিলা ক্যায়া? বেআক্কেলে ওই লোকটার মৃত্যুতে বাবুলাল কিছুতেই ওই সময় পাটনা যেতো না। কিন্তু উপর মহলের নির্দেশ ছাড়াও জগন্নাথ কৌশলের এক গোপন বার্তা এসেছে, পাটনাতে অতি অবশ্যই উপস্থিত থেকো।

পাটনার পশ্চিম লোহানীপুরের পাঁচকৌড়ি শাও লেনে দুবেন্দ্র সিংযের বিরাট চারতলা বাড়ি। সেখানে যথা সময়েই পৌছে গেল বাবুলাল। বিক্ষুব্ধ মনটাকে শান্ত করতে সে মৃত মানুষটার শ্রাদ্ধ করতে লাগলো। শালে ইতনা বড়া মঞ্জিল তুমনে ক্যযসে বনায়া? ছিলে তো একটা দীন ভিখিরি আর রাজ্য সভাপতি হয়ে দু'বছরের মধ্যেই এই বাড়িটা করে ফেললে! এমনকী উপরে উঠতে কষ্ট হবে বলে লিফটিও বসালে। এখন চিতার লিফটে শুয়ে শালে তুম আউর উপ্পর উঠ যাও—

দুবেন্দ্র সিংয়ের মরদেহটা ফুলে ফুলে ঢাকা। একজন লোক তো সারাক্ষণ ফুল সরাতেই ব্যস্ত। কেন-না যাঁরা দেখতে আসছেন প্রত্যেকেই গাদাগাদা ফুলমালা নিয়েই আসছেন। সাধারণ দর্শনার্থী এবং ভি. আই. পি-দের আলাদা আলাদা প্রবেশ পথ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সেই পথ দিয়ে বাবুলাল দেবেন্দ্র সিংয়ের একেবারে কাছে পৌছে গেল। ছলছল চোখে বিরাট সাইজের একটা মালা ওঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে আপন মনেই বলে উঠলো, বেটিখোর আর চারঘন্টা পরে মরলে পারতে না? স্বর্গেও কি ঘুষের ব্যবস্থা আছে নাকি যে এতোটুকুও আর দেরি সইলো না? শালে হারামজাদা.....।

দেবেন্দ্রে সিংয়ের স্ত্রী, পুত্রকন্যারা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা খুব কান্নাকাটি করছিল। তাতো করবেই। এতো দামি একটা কামধনু গাই চলে গেলে ওটুকু কাঁদতেই হয়। তবে কে কাঁদছে, কে মরছে সেদিকে বাবুলালের অতোশত দৃষ্টি নেই। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরেও মিসেস দেবেন্দ্র সিংকে একবার সমবেদনা জানানো উচিত। সেই কাজটুকু করতে গিয়েই বাবুলাল বারবার নিজের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছিলো। না, শোকে মুহ্যমান হয়ে নয়। আসলে মিসেস সিংয়ের পাশেই বসেছিল অরুণা। মাকে সামলাতে

গিয়ে সে নিজেও বেসামাল হয়ে পড়ছিল। তার বুকের কাপড় যথাস্থানে না-থাকার ফলে বাবুলালের দুই চোখে যেন লোভের উৎসব। মুখ্যমন্ত্রির কোটায় পাটনা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া দেবেন্দ্র সিংয়ের উনিশ বছরের ওই চনমনে মেয়েটা যে-ভাবে ফুলে ফুলে কাঁদছে তাতে ওর কোমল বুকের ঢেউটাই বারবার ওঠা-নামা করছিল। আর বাবুলাল সেই সুন্দর নরম ছবিটার দিকে প্রায় বিভোর হয়েই তাকিয়েছিল। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অরুণার গায়ে কি হাতটা একবারও রাখা যায় না?

একজন পরিচিত ছোকরা পত্রকার অর্থাৎ সাংবাদিক পায়ে পায়ে বাবুলালের কাছে এগিয়ে গেল। নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলো, একজন মহান নেতা চলে গেলেন। আপনার প্রতিক্রিয়া?

দেবেন্দ্র সিংজির মৃত্যুতে দেশ হারালো তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। এটা একটা বিরাট ক্ষতি। তরল জিনিসটি না-খেয়েও বাবুলাল চমৎকার এক ভেজা-ভেজা গলায় উত্তর দিল, ওঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা পূর্ণ হবার নয়। এই ক্ষতি অপূরণীয়। গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি— নিজেকে আজ বড়ো বেশি অনাথ বলে মনে হচ্ছে। এবং গভীর এই শোকের মধ্যে এরচেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাটনা থেকে মধুবনীতে ফিরে এলো বাবুলাল আরও গম্ভীর হয়ে। কথাটা আর ফাঁকা আওয়াজ নয়। দু'সপ্তাহ বাদে মন্ত্রিসভার রদবদল হচ্ছে। এবং মহেশপ্রসাদও সত্যি সত্যিই রাষ্ট্রমন্ত্রি হচ্ছে। ওকে নাকি সমাজ-কল্যাণ দপ্তর দেওয়া হবে। তবে নতুন রাজ্য সভাপতি হয়ে জগন্নাথ কৌশল পাটনাতেই বাবুলালকে নরম সুরে একটা কথা পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, কে মন্ত্রি হলো না-হলো ও-সব নিয়ে তুই বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাস না—তোকে আমি রাষ্ট্রমন্ত্রি নয়, পূর্ণ মন্ত্রিই একদিন বানাবো।

অপরের মর্জির ওপর নির্ভর করে একদিন মন্ত্রি হওয়ার মায়ায় এই ভাবে গুমরে থাকার কোনও অর্থ হয়? নিজে হতে পারছে না—এই কষ্টটা বাবুলালের কাছে এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু ওর আগেই মহেশপ্রসাদ মন্ত্রি হবে, এই যন্ত্রণাটাই তাকে অহরহ খুঁচিয়ে চলেছে। মর্যাদার দিক দিয়ে তার সঙ্গে মহেশপ্রসাদের যে ব্যবধান তৈরি হয়ে যাবে, সেই শোকেই বাবুলাল এখন পাষাণ। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হলো, মহেশপ্রসাদ যদি পাটনা, মজঃফরপুর, বারাউনি বা বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা হতো তাহলেও মনকে একটা সান্ত্বনা দেওয়া যেতো। কিন্তু ও পূর্ব-মধুবনীর এম.এল.এ। সেখানেই বাড়ি। বাবুলালের পশ্চিম মধুবনী এলাকা থেকে যার দূরত্ব খুব বেশি নয়। অর্থাৎ মন্ত্রি হয়ে মহেশপ্রসাদ তার নাকের ওপর দিয়েই ঘুরে বেড়াবে এটা সহ্য করা যায়? মান-ইজ্জতের অবশিষ্ট বলে আর কিছুই থাকবে না। তার বিরাট অনুগামীদের মধ্যে, আরও খোলাখুলি ভাবে বললে বলতে হয়, লেঠেল বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা মাথার ভক্তটি সেও অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করে বসবে, কি হলো গুরুজি দু'দিনের ছোকরা মহেশপ্রসাদের হাতে লাড্ডু আর তোমার হাতে, ফাঁকা হাড়ি? এতোদিন ধরে তাহলে কী পার্টি করলে?

এবারে একটু অন্যরকম ভাবতে শুরু করলো বাবুলাল।

মহেশপ্রসাদকে একটা বড়োসড়ো ঝামেলার মধ্যে না-জড়ালেই নয়। সেই ঝামেলার ব্লু-প্রিন্টও এখন তার মাথার মধ্যে দারুণ ভাবে খেলে বেড়াচ্ছে। সুতরাং চুপচাপ বসে সময় নষ্ট করার এবং হা-হুতাশ করার কোনও অর্থই হয় না। কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কর্মই তো জীবন। সে কুকর্ম, অপকর্ম যাই হোক-না কেন? বাবুলালের চিন্তায় সেই ইক্ষু বনের ছায়া। এ-তল্লাটে কুখ্যাত গুন্ডা ও সমাজবিরোধী রামগরিব। ওকে একবার ডেকে পাঠানো দরকার।

তখন সন্ধ্যা। পূর্ব-মধুবনীর কাকুলিয়াধউলি এলাকায় একটি পাঠাগারের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দেশাত্ববোধক গানের পর আঠাশ বছরের দোহারা চেহারার শান্ত স্নিগ্ধ ছেলেটিকে এখনও বিদ্যার্থী অর্থাৎ পড়ুয়া বলে মনে হয়। ওর পরনে খদ্দরের কুর্তা-পাঞ্জাবি ও জহর কোট। ধবধবে সেই সাদা পোশাকে স্টেজের ওপর ওকে যেন সরোবরের মধ্যে একটা রাজহাঁস বলেই মনে হচ্ছে। এই ছেলেটিই মহেশপ্রসাদ অর্থাৎ পূর্ব-মধুবনীর এম.এল.এ।

জনশিক্ষা ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মহেশপ্রসাদ সাবলীল ভঙ্গিতে হিন্দিতে যা বললো তার বাংলা অর্থ এই রকম ঃ মানুষের মেরুদণ্ডের মতো শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি জগৎ-সভায় নিজের সম্মানিত আসন লাভ করতে পাবে না। তাই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্বজন শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে অশিক্ষা রূপ অন্ধকারকে দূর করবার মহান ব্রত গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু পথ এক নয়। তা না-হোক, তাদের উদ্দেশ্য এক। স্কুল কলেজ, শিল্প ও কলালয় শিক্ষা বিস্তারের মূল কেন্দ্র। জাতির জীবন যেন লুকিয়ে থাকে সেখানে, সেখান থেকেই প্রাণবায়ু নিয়ে বলিষ্ঠরূপে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এদের সঙ্গে লাইব্রেরী বা পাঠাগারের দায়িত্বও সমান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি এমন ওতপ্রোত ভাবে পাঠাগারের সঙ্গে জড়িত যে একটিকে বাদ দিয়ে আমরা অপরটির কথা চিন্তাও করতে পারি না। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয়, লাইব্রেরীরও আমাদের শিক্ষা গুরু। ছোটকালে ছেলেকে নিজের রুচি মতো গড়বার জন্য পিতা তাকে পরিচালিত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে এটার প্রয়োজনীয়তা একান্ত। ঠিক তেমনি সমষ্টিগত ভাবে অর্থাৎ সমাজকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে অগ্রগতির ধাপে পৌঁছে দিতে পাঠাগারের অবদান অসামান্য। এ-কথার সত্যতা সর্বকালে স্বতঃসিদ্ধ।

কোনও জিনিস গড়তে হলে একা নয়, পাঁচজনের মিলিত চেষ্টায় তা সুষ্ঠু এবং পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে। দেশ গড়ার প্রশ্নই যদি প্রথম ধরা যায় তাতেও ওই অভিমত প্রযোজ্য। দেশসেবক দেশকে ভালোবাসেন, দেশের অগ্রগতির জন্য তাঁরা পরিশ্রম করেন অক্লান্ত। সেখানে আর সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন এটা কথা নয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁরা দেশ গড়েন, শিক্ষাবিস্তারকে যাঁরা জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরাও দেশ গড়েন। এই মিলিত প্রচেষ্টায় যখন দেশ সুষ্ঠুরূপে গঠিত হয় তারপরে প্রয়োজন হয় সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতির উদ্যম হচ্ছে পাঠাগার। স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে নতুন করে আবার শিক্ষা শুরু হয় এই পাঠাগার থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অধ্যয়ন করি। সেখানে নির্দিষ্ট পুস্তক। নির্দিষ্ট শিক্ষক। শিক্ষকেরা অবশ্য তাঁদের শিক্ষার ডালি নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করেন। কিন্তু তা তো সীমিতই। কথায় আছে যাবৎ বাঁচি তাবৎ লিখি। এই মূলমন্ত্রকে জীবনের বীজমন্ত্র রূপে গ্রহণ করতে হলে সীমাহীন শিক্ষার সীমাহীন পারাবারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, সে-স্থান কোথায়? তখনই ফিরে আসতে হয় ঋষিবাক্যে। তাঁরা বলেছেন, অনুর মধ্যে ভমা অর্থাৎ ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ। বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় যে-কোনও একটা বৃহৎ পাঠাগার ক্ষুদ্র হলেও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রবৃন্দের কাছে তা অমৃত সরসী। ঠিক এই কারণেই পাঠাগারের সৃষ্টি। কিন্তু বেত হাতে নিলেই উপযুক্ত শিক্ষক হওয়া যায় না। ছাত্রকে বোঝাবার দক্ষতা থাকা চাই। পাঠাগার শিক্ষাবিস্তার করে, সুতরাং পাঠাগার স্থাপনের সঙ্গে রবিরশ্মির মতো শিক্ষারশ্মি বিস্তার হতে থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। সেজন্যই পাঠাগার পরিচালকবৃন্দের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেন-না তাঁদের সাময়িক শৈথিল্যের জন্য পাঠাগারে অরুচিকর পুস্তকের সমাবেশও হতে পারে। পাঠাগারের পক্ষে তা সত্যি ক্ষতিকারক।

মানুষের মন অনুকরণ প্রিয়। ভালো বই পড়লে তা মনের মধ্যে একটা সুন্দর প্রতিক্রিয়া হয় যা পাঠককে এনে দেয় নতুন উপলব্ধি। আবার যে-বই অরুচিকর তা পাঠকের হাতে তুলে দেয় বিষফল। আপাতমধুর প্রলোভনে তা পড়লে সে-সময়টা বৃথাই যায়। মিথ্যাই ব্যয় হয়। এ-কারণেই পাঠাগারের জন্য বই কেনার সময় বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। সেখানে অবশ্য অনেকের অনেক বিষয় মতদ্বৈধ থাকতে পারে। যেমন, অনেকে বলেন, এক এক লেখকের লেখা সব বই কিনলে অর্থাৎ কিনা পড়লে লেখককে জানা যায়। তা ঠিক। কিন্তু এমনও হতে পারে, সেই লেখকের হয়তো একখানা বই-ই শিক্ষার পরিপন্থী।

দেশজুড়ে রয়েছে শত শত, হাজার হাজার পিপাসু পাঠক-পাঠিকা। কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে যে-পানীয় দরকার তা জোগাড়ের সংস্থান তাদের নেই। এ-জন্যেই পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। সেখানে থাকবে ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, সাহিত্য বিষয়ক সব রকমের বই। এমন পাঠাগারেরই প্রয়োজন।

এককথায় ছোট একটু জায়গায় সে-পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলেও সে-ভৌগোলিক স্থানটুকু পবিত্র। আলোকিত। সে-জায়গা মহাতীর্থ। জীবিত ও মৃতলোকের মিলনভূমি!! ব্যক্তি ডুবে যায়, তাদের নশ্বরদেহ মিলিয়ে যায় ধরণীর ধুলিকণায় কিন্তু মনীষার ভাস্বরতা অবিনশ্বর, অক্ষয়। যাদের দেখি না, যারা ছিল দূরের—তারা আসে কাছে। গোটা বিশ্বের ধী-শক্তি দেশে দেশে নন্দিত সুধীজনের উজ্জ্বল প্রতিভা, অপূর্ব ফসল ফলে সুশোভিত হয়ে আনন্দ দিয়ে আলোকিত করে তাদের দেয় শিক্ষা। তাদের যা কিছু ভালো, সুন্দর, মহৎ—তাদের যা কিছু সুচিন্তা, দিব্যদৃষ্টি, গভীব উপলব্ধি সব কিছুরই সাক্ষাৎ পাই ওই পাঠাগারে। তাইতো পাঠাগাব প্রাণবায়ুর মতো জীবনে অতি প্রিয়। আমরা তার কাছে ঋণী। এ-ঋণ অপরিশোধ্য!

এই পাঠাগাব প্রতিষ্ঠা মানেই একটা সৃষ্টি। এর মুলে চাই সৃষ্টির আনন্দ আর চাই প্রেরণা। এমন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়, কতো লোক, কতো বাজামহারাজা! এমনও শোনা যায়, কোনও শিক্ষাবিদ তার আজীবন সঞ্চয় দিয়ে একটা পাঠাগার স্থাপিত কবে গেছেন। সেটা তার বিলাস নয়—বা অপরকে নিজের অর্থ প্রাচুর্যের পরিচয় দেবার জন্য ঘর সাজানো নয়, অথবা তার স্থাপিত পাঠাগারে কতো লক্ষ টাকার বই আছে সেটাই প্রচার করার উদ্দেশ্য নয়, টাকার অঙ্ক বা বইয়ের সংখ্যা সেখানে বিবেচ্য নয়। ঠিক এ-কারণেই এ-কথা উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিগত জীবনে বংশধরদের জন্য সম্পত্তির প্রয়োজন ব্যাপকতর। একটা পাঠাগারই হচ্ছে জাতীয় জীবনের সেই পরম সম্পদ। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ''এ নেশন ইজ নোন বাই দি স্টেজ।'' এ-কথার ভাবার্থ নিয়ে এটাও বলা যেতে পারে, 'এ নেশন ইজ নোন বাই দি লাইব্রেরী।'' তাই যদি হয় তবে পাঠাগারের কলেবর বৃদ্ধির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বই প্রচুর। সব দেশের সব কালের। বিদেশি মনীষীদের সৃষ্টিকে এনে তুলে ধরতে হবে আমাদের সামনে। এ-কাজ মোটেই সহজ নয়। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়—পথ হয় সরল। একার পক্ষে যা অসম্ভব—দশের সাহায্যে তা সহজ। তারপরে তো রয়েছে রাজ্য সরকার, জাতীয় সরকার। জনগণ আর সরকারের সহযোগিতায় দুনিয়া তখন কি আমাদের ঘরের দুয়ারে এসে পৌছায় না? আর, আর সে-মধুভান্ড থেকে জ্ঞান পিপাসুরা কি আনন্দে মধু আহরণ করতে পারে না?

মহেশপ্রসাদ তার স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধ হাসির পরাগ. মেখে ভাষণ শেষ করেছে এই বলে যে, এই পাঠাগার আপনাদের। একে রক্ষা করার, যত্ন নেওয়ার দায়িত্বও আপনাদের। আমি অনেককেই বইয়ের পাতা মুড়ে রাখতে দেখেছি। অনুগ্রহ করে তেমনটা করবেন না। কেন-না দুমড়ানো জাতি আর দুমড়ানো বই কারোরই পছন্দ নয়। আপনারা কি বলেন?

দীর্ঘতর তুমুল হাততালির মধ্যে মহেশপ্রসাদের ভাষণ অভিনন্দিত হলো। কয়েকজন অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়ের দল তো তাকে প্রায় ছেঁকেই ধরলো। অটোগ্রাফ দিতে হবে। মহেশপ্রসাদের আপত্তি ঠিক এখানেই। কোনওরকম ভনিতা না-করে সে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে বললো, অটোগ্রাফ দেওয়ার আমার কোনও যোগ্যতাই নেই। আমি বলতে চাইছি সেই অর্থে আমার কোনও গুণই নেই। আমি শিল্পী-সাহিত্যিক নই। নই, কবি, গায়ক অথবা খেলোয়াড়। বিশেষ কোনও প্রতিভার অধিকারী না-হয়ে এইভাবে অটোগ্রাফ দেওয়াটা কি ঠিক?

আপনি একজন মাননীয় বিধায়ক। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো, সেই হিসেবও তো সইটা দিতে পারেন।

বিধায়ক হবার জন্য কোনও প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। মহেশপ্রসাদ হাসির রেণু ছড়িয়ে উত্তর দিল, আপনারা ভোট দিয়েছেন তাই বিধানসভায় যাবার ছাড়পত্র পেয়েছি। না-দিলে যেতে পারতাম না—

তবুও আমরা যখন চাইছি—

আমাকে মজবুর করবেন না। মহেশপ্রসাদ আন্তরিক সুরে বলে উঠলো, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি সই দেওয়া আমাকে সাজে না। তারপরেই হাসতে হাসতে আবও যোগ করলো, চাকরির দরখাস্তে, ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের জন্য, স্কুল-কলেজে ভর্তির ব্যাপারে যে-যখন আমার কাছে আসছে আমি

তো সেখানে সই দিচ্ছিই। নতুন করে আবার এই অটোগ্রাফ কেন?

অটোগ্রাফ শিকারীদের হাত থেকে ছাড়া পেতে-না-পেতেই মহেশপ্রসাদকে আবার ঘিরে ধরলো সাংবাদিকের দল। নানাজনের নানা প্রশ্ন। প্রত্যেকের প্রশ্নের সাগরে ভাসতে ভাসতে মহেশপ্রসাদও যথারীতি উত্তর দিয়ে চললো।

আপনার আজকের বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছে।

ধন্যবাদ।

ভাবছি সংক্ষিপ্ত না-করে পুরোটাই ছাপিয়ে দেবে।

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সম্পাদক আপনার চাকরি খেয়ে নিতে পারেন।

আর কয়েক দিন বাদে তো আপনি মন্ত্রি হচ্ছেন। কিছু বলবেন।

ব্যাপারটা আমার জানা নেই।

আপনি হচ্ছেনই। আমাদের কাছে খবর আছে।

খবরে আড়ি পাতাই আপনাদের কাজ—সুতরাং আমার চেয়ে আপনারাই ভালো জানেন। অনুগ্রহ করে ও-ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নয়।

মাননীয় বিধায়ক বাবুলালজি অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্য সরকারের সাহায্যপুষ্ট এই পাঠাগারটি পশ্চিম মধুবনীতে হওয়ার কথা ছিল। আপনি সেখান থেকে পূর্ব মধুবনীতে ছিনিয়ে এনেছেন।

আমি ছিনতাইবাজ নই।

লাইব্রেরী কমিটির কয়েকজন সদস্য এরপরে মহেশপ্রসাদকে পাশের একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহেশপ্রসাদ যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু উদ্যোক্তারা কিছুতেই ছাড়লো না। একটু চা না-খাইয়ে মাননীয় অতিথিকে ছাড়া যায়?

মহেশপ্রসাদ যে-বাড়িতে বসেছিল সেটা ললিত নারায়ণ সিনহার। ললিত নারায়ণ দ্বারভাঙা কলেজের লাইব্রেরীয়ান। বয়স একান্ন-বাহান্ন হবে কিন্তু মাথার সব চুল একেবারে ধবধবে সাদা। ওই সাদা মাথাটিই তাঁকে বিজ্ঞ এবং শুভ্রতার এক সুউচ্চ আসনে যেন আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আসলে ভদ্রলোককে এক ঋষির মতো দেখাচ্ছে। এবং প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হতে হয়। মহেশপ্রসাদ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই ললিত নারায়ণ ওকে প্রায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মূল ব্যাপারটা হলো, ওর বক্তৃতা শুনে তিনি এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সামনে পেয়ে তাই ওই ভাবেই অনুরাগের ছটায় স্নান করিয়ে দিলেন। মুখে বললেনও সে-কথা, রাজনীতির উতর-চাপান, কশ্মাকস, স্রেফ গলা ফাটানোর চিৎকার সর্বত্র একঘেঁয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমাদের দুই কান এখন বধির। কিন্তু মহেশ, রাজনীতির সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর যে-প্রজ্ঞা এবং ব্যঞ্জনায় তোমার ভাষণ মুখরিত হলো—সত্যি বলছি বাবা খুব খুশি হয়েছি। খুব! সাধারণত হয় কি জানো? রাজনৈতিক নেতারা যে-বিষয়ের ওপরেই বক্তৃতা দিন না কেন, একে অপরকে এক হাত নেওয়ার হিসেব-নিকেশও থাকবে। সেই স্রোত থেকে সরে গিয়ে তুমি যে-প্রাণবন্ত কথাগুলো বললে তা সহজেই মন কেড়ে নেয়। তবে—ললিত নারায়ণ থেমে পড়লেন।

খাবারের রেকাবী হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো বছর বাইশের একটি সুশ্রী মেয়ে। ভরাট তেলতেলে মুখের সর্বত্রই যেন সুচারু এক লজ্জার ছাপ—যা তাকে নতমুখী করে রেখেছে। ওর দিকে একপলক তাকিয়েই মহেশপ্রসাদ আবার চোখ ফেরালো ললিত নারায়ণের দিকে। ললিত নারায়ণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমার মেয়ে সুজাতা।

নমস্কার। মহেশপ্রসাদ হাত দুটি এক করে লাজুক প্রতিমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। লাজুক প্রতিমা একঝলকে যুবক বিধায়কটিকে দেখে নিয়ে পাখির শিসের মতো সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, নমস্কার। তারপরে খাবারের রেকাবীটা ওর সামনের টেবিলে রেখে বললে, এটুকু খেয়ে নিন।

আমি একা?

আপাততো তাই। সুজাতা বিনম্র সুরে বললো, আমরা সবাই অতিথিদের আপ্যায়ণে রয়েছি। এখন তো আমাদের খাওয়া চলবে না।

এতো খেতে পারবো না, বা অর্দ্ধেকটা তুলে নিন—এমন ধরনের প্রচলিত ভদ্রতা অর্থাৎ সস্তা ভদ্রতা মহেশপ্রসাদ দেখালো না। বরং সে তৃপ্তিতে খেতে খেতে একটু আগের পেছনের পটভূমিতে চলে গেল। সুজাতা ঘরে ঢোকার আগে ললিত নারায়ণ তার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'তোমার প্রাণবন্ত কথাগুলো সহজেই মন কেড়ে নেয়। তবে—' ওই পর্যন্ত বলেই তিনি থেমে যান। পরবর্তী কথাটা ললিত নারায়ণ কি বলতে চেয়েছিলেন? সে-কথাই মহেশপ্রসাদ খুব বিনয়ের সঙ্গে বললো, 'তবে' বলে আপনি কিন্তু থেমে যান। কথাটা শেষ করেননি। আমাকে কি আপনি কিছু বলবেন?

বলার তো অনেক কিছুই ছিল—ললিত নারায়ণ হেসে ফেললেন। কিন্তু সব কথা সব সময়ে বলাটা ঠিক নয়। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আজকেই প্রথম আলাপ হয়েছে যদিও বিধায়ক হিসেবে তুমি আমাদের সকলেরই পরিচিত। তবুও একজন মাননীয় বিধায়ককে কি আমি এ-কথা বলতে পারি—

আপনার যা বলার নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

রাজনীতির এই জটিল আবর্তে তোমাকে ঠিক মানায় না। আমি, আমি বলতে চাইছি, এটা যেন তোমার উপযুক্ত জায়গা নয়। ললিত নারায়ণ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, আসলে তোমার এতো দিনের ভূমিকা দেখে, সৎ প্রচেষ্টার বিভিন্ন কাজকর্ম দেখে অনেক আগেই আমার এমন ধারণা হয়েছিল। তবে পাঠাগারের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আজকে তুমি যে-সাবলীল ভঙ্গিতে চমৎকার ভাষণ দিলে, তা তোমার মতো পরিচ্ছন্ন, সুন্দর যুবকই বলতে পারে। ভেতরে জ্ঞানের প্রদীপ থাকলেই কথাগুলো এতো মহৎ হতে পারে। এবং অস্বস্তিটা এই কারণেই যে, রাজনীতি হচ্ছে একটা লড়াইয়ের আখড়া। প্রতিনিয়ত প্যাঁচ কষাকষির পাঞ্জায় ডুবে থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা অশোভন পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে তুমি তোমার এই নিষ্পাপ মনটাকে নিয়ে কতোক্ষণ টিকে থাকবে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমার হয়তো এ-সব বলা তোমাকে উচিত হচ্ছে না কিন্তু কি জানো মহেশ, কেন জানি তোমাকে ভীষণ ভাবে বলতে ইচ্ছা হলো। তুমি কিছু মনে করলে না তো?

মনে করার কোনও প্রশ্নই নেই। মহেশপ্রসাদ খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দিল, আজকের পলিটিক্স যে খুব দ্রুত নোংরামিতে ভরে যাচ্ছে, বিরোধী পার্টির সঙ্গে যতোটা-না মনোমালিন্য আমাদের নিজের দলের একজনের সঙ্গে আরেকজনের খেয়োখেয়ি তার চেয়েও বেশি এবং সেটাও অত্যন্ত কুরুচিকর ভাবে প্রকাশ্যেই অহরহ ঘটে চলেছে। তবুও আমার যুক্তিটা হলো, আমি হয়তো সমাজের সর্বস্তরের আমূল পরিবর্তন করতে পারবো না, দুর্নীতি দূর করে এক শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলতে পারবো না, তবুও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চাই না। যতোটুকু ভালো করতে পারবো—ইচ্ছের সেই প্রদীপটাকেই জ্বালিয়ে রাখতে চাই।

ইতিমধ্যে চা নিয়ে একজন বয়স্কা মহিলা ঘরে ঢুকতেই ললিত নারায়ণ মহেশপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী। সেই সময়েই সুজাতা মায়ের দিকে চোখ ফেরালো। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, তুমি তো আমাকে ডাকলেও পারতে।

তোরা সবাই মিলে একজন বিধায়কের সঙ্গে আলাপ করবি আর আমি বুঝি বাদ? কমলিনী শান্ত হেসে মহেশপ্রসাদের দিকে তাকাতেই সে যথেষ্ট লজ্জা পেল। বললো, আপনাদের অনুগ্রহেই তো এম.এল.এ হওয়া। সুতরাং আমার কাছে আপনারই গুরুত্বপূর্ণ।

তুমিই এমনটা বললে। কমলিনী ছেলেটার বিনয় এবং প্রকাশ ভঙ্গি দেখে সত্যিই অভিভূত। এতোদিন আন্তরিক ও উদার সেই পরিচয় প্রথম দিনের আলাপের প্রথম কথাতেই চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কমলিনী আরও বললেন, জানো আগের এম.এল.এ মিশিদীন দুবে কি বলতেন? তিনি পরিষ্কারই বলতেন, ভোটের আগে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনেক হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছি। ধোবী, নাও, চামার-মেথর কাউকেই বাদ দিইনি। সব কটাকে এবার আমার পায় ধরিয়ে ছাড়বো। ভোটারদের সম্পর্কে এই হলো ওঁর শ্রদ্ধা।

মিশিদীন দুবেরাই সম্ভবত ঠিক কথা বলেন। প্রচ্ছন্ন এক কৌতুকের সুরে ললিত নারায়ণ বলে উঠলেন, সাধারণের মধ্যে একজন বিধায়ক হিসেবে মহেশপ্রসাদ কতোখানি ভি.আই.পি—তা ও নিজেই জানে না। নিজের সম্পর্কে মহেশপ্রসাদ যথেষ্ট সচেতন নয় বলেই আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মুক্ত মনে কথা বলে যাচ্ছে।

খাওয়া শেষ হতেই হাত-টাত মুছে মহেশপ্রসাদ চার কদম এগিয়ে গিয়ে কমলিনীর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। খুব আস্তে বললো, এতোক্ষণ খাচ্ছিলাম বলে আপনাকে প্রণাম করতে পারিনি। বলেই সে কমলিনীর পা দুটি স্পর্শ করলো। কমলিনী সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা এবং চিবুকে হাত রেখে স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে বলে উঠলেন, বেঁচে থেকো বাবা। দেশের ও দশের মঙ্গল করো।

আমার মাও ঠিক এই কথাটিই বলেন।

মায়েদের কথা তো একই হবে বাবা—

তবে আমার মা রাজনীতি বিষয়ে খুবই বীতশ্রদ্ধ। তাঁর ওই এক কথা, যেখানে দেশের প্রধান গুন্ডা হচ্ছে পুলিশ, দেশের আসল প্রধানমন্ত্রি শিল্পপতিরা, এবং দেশকে প্রকৃত শাসন করছে নামী-দামি সব বেওসায়ী—সেখানে তুই সামান্য একজন এম.এল.এ হয়ে দেশের কতোটুকু শুদ্ধিকরণ করতে পারবি? তবে হ্যাঁ, চেষ্টা তো করতেই হবে। দেশের সকলেই তো আর খারাপ নয়, ভালো মানুষও রয়েছেন। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে যার যতোটুকু সামর্থ সেই কর্মযজ্ঞে এগোতেই হবে। বাড়ির পুবো জমিটা জঙ্গলে ভরে থাকার চেয়ে একটা পাশ অন্তত পরিষ্কাব করা ভালো।

দারুণ বলেছেন তোমার মা।

আর বাবা কি বলেন জানেন? বাবা বলেন, "আমার ভি.আই.পি ছেলের দরকার নেই। তার চেয়ে স্কুলমাষ্টার অনেক বেশি আপন। অনেক বেশি কাছের এবং নিশ্চিন্তেরও।"

আপনি কি উত্তর দেন? প্রশ্নটি লাজুক প্রতিমার।

মহেশপ্রসাদ সুজাতার দিকে তাকালো। এতোক্ষণের মধ্যে এই প্রথম সে তাকে সবাসরি একটা প্রশ্ন করলো। এবং প্রশ্ন একটা করতে হয় করা এটা তেমন ধরনের নয়। রীতিমতো উত্তরটি শুনবার জন্যও সুজাতা সমান ভাবে আগ্রহী। ওর দুই চোখেব নম্র ঝিলিকে তারই আভাস।

মহেশপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললো, বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মতো। আমাদেব মধ্যে রাজনীতি নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হলেও বাবার ওই প্রশ্নের উত্তরে আমিও একটা কথাই বলি, ইলেকশনে বিজয়ী হবাব জন্য দিনের-পর-দিন যে-ধরনের বুথ দখল, ব্যালট ছিনতাই, জাল ভোট ইত্যাদি প্রভৃতির ছুপা কলা-কৌশল বেড়ে চলেছে তেমন প্রতিযোগিতায় আমি তো ডুবে যেতে বাধ্য। অসৎ উপায়ে নির্বাচনে জেতার সুখ বা আনন্দ পেতে চাই না। সুতরাং একদিন তো আমি হেরে যাবোই। তখন আবার ছুটে যাবো ধানতোলি হাই স্কুলে। ছাত্রদের যেমন ইতিহাস পড়াতাম তেমনই পড়াবো।

তোমার বাবা কি করেন? ললিত নারায়ণ প্রশ্নটি করেই আরও একটু যোগ করলেন, নাকি ওঁর অবসর জীবন?

না-না, বাবা এখনও রিটায়ার করেননি। বাবার এখন ছাপ্পান্ন চলছে। মহেশপ্রসাদ আলতো হেসে বললো, উনিও স্কুল শিক্ষক। পশ্চিম-মধুবনীর দয়াসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টার।

· বাবা এবং ছেলে—তোমরা দুজনে তাহলে তো একই স্কুলে..... কমলিনী ওই পর্যন্ত বলেছেন কি বলেন নি, রিলে রেসের ব্যাটন বদলের মতোই মহেশপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে কথাটার বাকি অংশ নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে উত্তর দিল, একই স্কুলে অবশ্যই শিক্ষকতা করতে পারতাম। সেই সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু......

কিন্তু?

বাবা রাজি হলেন না।

কেন?

আমি সাধারণ একজন চাকরি-প্রার্থী হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়ে বাবার স্কুলে শিক্ষকের

পদটি পেলেও ভবিষ্যতে এ-নিয়ে বাবার বিরুদ্ধেই স্বজন পোষণের অভিযোগটা একবার-না-একবার উঠতোই। নোংরা বাতাবরণের কোনওরকম সুযোগ না-দিতে বাবা তাই পরিষ্কার থাকতে চাইলেন। আমাকে শুধু বলেছিলেন, "মহেশ, একই স্কুলে একই পরিবারের দুজন থাকাটা কি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে না?" আমিও বাবার যুক্তিটাই মেনে নিয়েছিলাম।

গল্প করতে করতে ললিত নারায়ণ হঠাৎ এক সময় স্নেহের সুরে বলে উঠলেন, মহেশ, তোমাকে কি আর এক কাপ চা দেবে?

চায়ের ওপর আমি কখনও অভিমান করি না। মহেশপ্রসাদ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তবে এই মুহূর্তে আর নয়। এবারে আমি যাবো।

তোমার সঙ্গে আলাপ করে যথেষ্ট ভালো লাগলো বাবা—কমলিনী গভীর সুবে বললেন, আশা করি এই আসাটাই যেন শেষ না-হয়। জানি, তুমি ব্যস্ত মানুষ। কাজের মানুষ। তবুও দুটি বাড়ির দূরত্ব যখন খুব বেশি নয় অতোএব মাঝে মাঝেই তোমাকে আশা করবো।

নিশ্চয়ই আসবো। নিশ্চয়ই। আজকে তাহলে অনুমতি দিন—কথাটা বলেই মহেশপ্রসাদ নতুন করে আর একবার প্রণাম করতেই কমলিনী বলে উঠলেন, দীর্ঘজীবী হও বাবা। প্রত্যেকের মুখ উজ্জ্বল করো।

লাজুক প্রতিমার চোখের দিকে তাকালো মহেশপ্রসাদ। সুজাতা লুকোচুরি খেলার মতো দৃষ্টি মাটিতে নামিয়ে এনে পরক্ষণেই আবার উপরে তুলে ধরলো। আর তখনওই চোখে লাগলো রঙের ছটা। ছেলেটা কি নিষ্পাপ ভাবেই না-তাকিয়ে রয়েছে। এক একজনের দৃষ্টিতে সারা শরীর যেন পুড়ে যায়। জ্বলে যায়। নিদেনপক্ষে গা রী-রী করে। অথচ এই দৃষ্টির সামনে একটিও কথা খরচ না-করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। উপলব্ধির সেই কিনারেই সুজাতা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কি আশ্চর্য! তার শরীরের কোথাও কেউ যেন একটা স্নিগ্ধ মোমের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে—যার কোমল উত্তাপে সুজাতা নিজেই বিভোর।

মহেশপ্রসাদ খুব আস্তে বললো, আসছি তাহলে—

আবার আসবেন।

রামগরিবকে ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও ওর পাত্তা নেই। ব্যাপারটা কি হতে পারে ভেবে পেল না বাবুলাল। কথায়-কথায় দু-চারটে লাশ নামাতে পারলেও তার ডাককে উপেক্ষা করার সাহস রামগরিবের এক ফোঁটাও নেই। নিশ্চয়ই নেই। নিশ্চয়ই ও কোথাও আটকে গেছে। বাবুলাল, রামপেয়ারেকে ডেকে নতুন করে আর একবার জিজ্ঞেস করলো, রামগরিব কখন আসবে বলেছে?

তুমি উস্তাদ এরমধ্যে রামগরিবকে কোথায় পাচ্ছো? আমি তোমায় বললাম-না রামগরিবের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি! রামপেয়ারে ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিল, আমি তিন-তিনবার ওর বাড়ি গেলাম লেকিন মুলাকাত না-হুয়া। ওর মাইজি খার্‌রা জবাব দিল, 'বেটা আমার কোথায় গেছে জানি না। কখন ফিরবে তাও জানি না। চারদিন বাদেও আসতে পারে আবার চারঘন্টা পরেও ফিরতে পারে। আমাকে বিরক্ত না-করে তুমি আমাদের এই দাওয়ায় বসে ওর জন্য অপেক্ষা করতে পারো। ইয়ে কোই মাইজি কা বাত হুয়া? রামপেয়ারে একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করলো।

আসলে রাম নামের লোকগুলোকে দিয়ে একেবারে যদি কোনও কাজ হয়—সব অপদার্থ, বুরবকের দল। শিষ্যের ওপর এবারে বাবুলালই বিরক্ত হলো। এই দ্যাখনা, তুই রামপেয়ারে তিনবার গিয়ে একবারও দেখা পেলি না রামগরিবের। এরপরে দ্যাখ আমাদের বিত্তমন্ত্রি। তিনিও এক রাম—অর্থাৎ রাজারাম। হমারা পিছে এইসন বাম্বু লাগাইল কি শেষ পর্যন্ত ওঁর গ্রুপই আমাকে ছাড়তে হলো। আর রামগরীব হারামজাদা এমন কী ভি.আই.পি হয়ে উঠলো যে আমার সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তেই সেই অউলাদ এলাকা থেকেই উধাও? আমাদের বিধানসভার এক কর্মী আছে রামনরেশ। ওর প্রধান কাজই হলো কথা চালাচালি করা। আর আমার খাস বেয়ারাকে তো তুই ভালোই চিনিস। সারা জীবন আমাকে এঁটো চা খাইয়ে গেল। দু'চুমুক না-মেরের কিছুতেই আমাকে আগে দেবে না। সেই

শুয়োরের বাচ্চার আবার নামের আগেও রাম, পিছেও রাম। রাম খিলাওন রাম। তা তোদের এই রাম নামের লোকগুলোকে নিয়েই আমি পড়েছি এখন এক মহা গাড্ডায়।

ওই গাড্ডায়ও রাম। যথা সম্ভব গম্ভীর সুরে কথাটা বলে রামপেয়ারে দেওয়ালে টাঙানো প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে হাসি-খুশি মুখে দাঁড়ানো বাবুলালের ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

খুব বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাবে কথাটা বললি বলে যেন মনে হলো। বাবুলাল তার বিশ্বস্ত অনুচরের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তারপরেই তাড়া লাগালো, যা বলার স্পষ্টাস্পষ্টি বল—

তোমার যে শালীর সঙ্গে তুমি এখন গাড্ডার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছো তারও নাম রামকলি এই কথাটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

দারুণ বলেছিস কিন্তু। বাবুলাল তারিফ জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রশংসার সুরে বললো, এই জন্যই তোকে আমার এতো ভালো লাগে। সঠিক সময়ে সঠিক পয়েন্ট মতো কথা বলাটা একটা মস্তো বড়ো আর্ট। সেই আর্টকে তুই বেশ রপ্ত করেছিস!

এ-সব তো তোমাকে দেখেই শেখা। আমার ভেতরের মাল-মশলা আর কতোটুকু? রামপেয়ারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বাবুলালকে দেখতে লাগালো। আজকে ওদের দুজনেরই বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হলেও বন্ধুত্ব কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই। ওরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখনই মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বাবুলালের আসন এক নম্বরে। আর রামপেয়ারে ওর দোসর। ছায়া সঙ্গী। লেখাপড়ায় রামপেয়ারে ক্লাস নাইনের পর আর এগোতেই পারেনি। এ-ব্যাপারে ওর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, 'আমার দ্বারা আর হবে না।' বাবুলাল কিন্তু পড়াশোনায় খুব একটা আকাট গোছের কিছু ছিল না। তার ওপরে পরীক্ষার হলে রীতিমতো বই নিয়ে নকলি করতে সে ছিল মহা ধুরন্ধর। যাইহোক, সেই বাবুলাল বি. এ পাশ পর্যন্ত করেছে। কলেজে পড়ার সময়েই সে জবরদস্ত ছাত্র নেতা। রাজনীতির সঙ্গে চমৎকার ভাবে শক্তি নীতির ব্যাপারটাকে মিশিয়ে দিয়ে বাবুলাল তখন একে পিটছে, ওকে পিটছে। বিরোধীপক্ষের ছাত্রদের শাসাচ্ছে। আর এমনি করেই কখন যে গলা কাঁপিয়ে, জোরালো বক্তব্য রেখে বাজিমাত করার ভাষণটাও আয়ত্তে এনে ফেলেছে রামপেয়ারের এখন আর সেটা ঠিক মনে নেই। তবে এতোদিন তারা দুজন দুজনকে তুই-তোকারি করলেও রামপেয়ারে নিজে থেকেই সরে এসেছে, বাবুলাল যখন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গলা ভর্তি মালা পরে খোলা জিপে চড়ে সারা পশ্চিম-মধুবনী ঘুরে বেড়িয়েছে ঠিক তখন থেকেই। বাবুলালের পরনে ছিল গলা বন্ধ কোট। প্রশস্ত কপালে ছিল মঙ্গল টিপ। সারা জিপটাও ছিল ফুলে ফুলে ঢাকা। এক সময় গভীর কণ্ঠে রামপেয়ারে বলেছে, দোস্ত তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

তুই কি নেশাভাঙ্গ করেছিস নাকি? আমাকে হঠাৎ তুমি করে বলছিস যে? তুই—

না রে বাবুলাল আর সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে যতো দোস্তিই থাক-না কেন, তুই একটা জ্যান্ত এম.এল.এ। বিধানসভায় যাবি। রাজধানী পাটনা হবে তোর ঘরবাড়ি। ছুটতে হবে দিল্লিতেও। কতো বড়ো মন্ত্রিদের সঙ্গে তোকে ওঠবোস-চলাফেরা করতে হবে। এমন একটা এম.এল.এ সাহেবকে তার ইজ্জতটুকু দিতেই হবে।

সেই শুরু। বাবুলাল অবশ্য অনেক অনুরোধ করেছিস কিন্তু রামপেয়ারে আর একটা দিনের জন্যও তাকে তুই সম্বোধন করেনি। এমনকী নাম ধরেও ডাকেনি। কখনও গুরুজি, কখনও উস্তাদ আবার কখনও-বা দোস্ত বলে ডেকেছে। যেমন এই মুহূর্তে বাবুলালের দিকে বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় বলে উঠলো, আচ্ছা দোস্ত তুমি তোমার রামকলির চিন্তায় ডুবে থাকো। আমি চললাম। আর একবার রামগরিবের বাড়িতে টুঁ মেরে যাচ্ছি—সেই হারামীটাকে পাওয়া যায় কিনা দেখি! উও শালে তুমসে ভি বড়া ভি.আই.পি. বন গয়ি—চারবার বাড়ি গিয়েও দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একবার দেখা হলে গাড়মে এইসন লাথ্ মারেগা জিন্দ্গী ভর ইয়াদ রহেগা।

রামপেয়ারে চলে গিয়ে বাবুলালকে যেন ছুটি দিয়ে গেল। এই ছুটি বিলাসের। এই অবসর মুহূর্ত কল্পনার। আসলে ও রামকলির চিন্তাটা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। রামকলির মুখটা যে তার মনের আয়নায় একবারও উঁকি দেয়-না ঠিক তা নয়। কিন্তু রামকলির চিন্তাটা করবে কখন? সেদিনের

ছেলে মহেশপ্রসাদ মন্ত্রি হতে চলেছে, এই অবস্থায় রামকলি তো দূরের কথা মুম্বাইয়ের এক নম্বর হিরোইন ধীরামালিনীও যদি খুনসুটি করার জন্য বিছানায় ডাকে বাবুলালের তাকে সময় দেবার কোনও প্রশ্নই নেই। মহেশপ্রসাদ নামের নব্য বিধায়কটি তাকে অসির চেয়েও ধারালো কোনও বস্তুর ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অথচ ছেলেটা তাকে কোনোদিনও এতোটুকুও অসম্মান করেনি। দাদা ছাড়া ডাকই দেয় না। কোনও মিটিংয়েই তার সম্পর্কে কোনও আজে-বাজে মন্তব্য করে না। অথচ সেই মহেশপ্রসাদই তার সারা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই যন্ত্রণাই যে কতো গভীর সেটা কাউকে বোঝানো যায় না। দেখা হলে মহেশপ্রসাদ কি সুন্দর হেসে কথা বলে! অথচ সে পারে না। ছেলেটা সব ব্যাপারেই যেন বিজয়ী হতেই এসেছে।

চুলোয় যাক মহেশপ্রসাদ। বাবুলাল সত্যিই আর মাথায় আঁটাতে পারছে না। রাতদিন ওর চিন্তা করতে করতে ওকে স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেছে। এ-কথা কাউকে বলা যায়? সে এখন রীতিমতো মহেশাতঙ্ক রোগে ভুগছে। প্রায় বিনা কারণে ছোট ছেলেটাকে একপ্রস্থ ঠেঙ্গিয়েছে সেই সাত-সকালেই। আসলে মেজাজটা সারাক্ষণই এক খিট খিটে হয়ে রয়েছে।

মানসিক এই চাপ থেকে একটু মুক্ত হাওয়া অবশ্যই নেওয়া দরকার। মুক্ত হাওয়া বলতে মেয়েদের শরীরের সমস্ত ঘ্রাণ নেওয়াই বাবুলালের এক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ। তবে এখন না-হয় বাবুলালের সামনে একটা চাপ-টাপের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেটা যখন থাকে-না তখনও তো সে কোমল দেহের ঘ্রাণ নিতেই ব্যস্ত থাকে। আসলে বাবুলালের দৃষ্টি বরাবরই অপরের দিকে। ইক্ষুবনের প্রথম স্বাদের অভ্যেসটা সে এখনও পুরোপুরি বজায় রেখেছে।

রামকলির দিদির সঙ্গে বাবুলালের বিয়ে হয়েছে বছর ষোলো আগে। এই ষোলো বছরের মধ্যে চার-চারটে পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার পর সেই মহিলা অর্থাৎ কুসুমকলি তার দেহের সৌন্দর্যের অবশিষ্ট বলে আর কিছুই রাখেনি। শরীরও এখন কাঠ-কাঠ। বাবুলালের মতো একটা উন্মত্ত তান্ডবকে যোঝার শক্তি তার নেই। সেটা নিশ্চয়ই কুসুমকলির অপরাধ নয়। আসল কথাটা হলো, যোঝার শক্তি থাকলেও বাবুলাল তার স্বভাব পাল্টাতো না। বাইরের টানে মন যার সারাক্ষণই উসখুস করে নিজের স্ত্রীর কাছে সে কেমন করে বিশ্বস্ত থাকে? এটা স্বভাব। এবং অন্যায় খেলা। আর এই খেলাতেই বাবুলাল বিশেষ পারঙ্গম। বুকে এম.এল.এ-র তকমা আঁটা। ভয় কাকে? আর তার সঙ্গে ভয়ে লড়তেই-বা যাচ্ছে কে?

এই রামকলির ব্যাপারটাই দেখা যাক না কেন। বাবুলালের যখন বিয়ে হয় সে ছিল বছর তিনেকের এক টুকরো ইজের পরা নিতান্তই ছোট্ট মেয়ে। নাকে পোঁটলা, কানে পুঁজ সর্বস্ব ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটাকে দেখলে ঘৃণা হতো বাবুলালের। সময়ের ঋতুগুলো হুহু করে এগিয়ে গিয়ে বছরগুলোকেও প্রবলবেগে টেনে নিয়ে চললো। রামকলির দেহে লাগলো যৌবনের ঢেউ। পায়ের গোছা, ভরাট বুক, সরু কোমর এবং চলতে ফিরতে নিতম্বের গভীর টানে বাবুলাল দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো। সে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে রামকলিকে পুজো করতে করতে পৌঁছে গেল ইক্ষু বনে।

বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। রামকলি একা। বাড়ির অন্যান্যরা গিয়েছিল ঠেলা ভর্তি করে কাদি কাদি কলার পাহাড় নিয়ে ছট পুজোর পূণ্য সঞ্চয়ে মোকামা ঘাটের গঙ্গার পারে। বারাউনীতে একটা মিটিং সেরে বাবুলাল যখন শ্বশুর বাড়িতে পৌছালো বেলা তখন পৌনে-দুটো। বাড়ির সবাই গঙ্গায় গেছে শুনে বাবুলাল মনে মনে বললো, গঙ্গা মা যেন ওদের সবাইকে টেনে নেয়। কেউ যেন আর ফিরে না-আসে। তারপরেই রামকলির দুরন্ত শরীরে ওপর চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে বললো, আর কারো থাকার প্রয়োজন কী? তুমি তো আছো?

আপ তো বাতো বানানে কা রাজা হ্যায় লেকিন ইয়ে তো বতাইয়ে খানাউনা কুছ হুয়া? মিটিং-টিটিং তো অনেক করলেন কিছু খাওয়া হয়েছে কিনা আগে তাই বলুন। রামকলি ঝঙ্কার তুললো।

আজ অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করছে। কোই দুসরা খানা।

ইসকা মতলব?

আজকে তোমাকেই খাবো। বাবুলাল ওর চোখে চোখ রেখে স্থির গলায় বললো, আপন করে নেওয়ার মুহূর্তে মেয়েদের গায়ে জামা-কাপড় থাকাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ও-সব কাঁচুলি-শাড়ি খুলে ফেলো—

হায় রাম! রামকলি আঁতকে উঠেছিল।

এতে লজ্জার কিছু নেই রামকলি। আমি তোমাকে ভীষণ ভাবে চাই। আমি তোমাকে ভীষণ ভাবে চাই। ভীষণ ভাবে—তারপরে আর বিশেষ বাক্য-টাক্য ব্যয় করেনি বাবুলাল। ইক্ষুবনের মেয়েটার ওপর যে-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি ভাবেই রামকলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওর সরু ভাঁজ তোলা পেটের নীচে নাভিকুন্ডে মুখ রেখে একটানে সায়া ও শাড়ির জটিল ভাঁজগুলোকে খুলে ফেলে আবিষ্কার করলো এক অনাঘ্রাত সবুজ এবং কোমল অঞ্চল। সেই দারুচিনি অঞ্চলের দখল নিলো বাবুলাল।

দখলীকৃত সেই শরীরটার মালিক বাবুলাল আজও। পশ্চিম-মধুবনীর উড়নি অঞ্চলের তিনকূলে কেউ নেই এমনই একটি গরিব ঘরের ছেলের সঙ্গে রামকলির বিয়ে দিয়েছে বাবুলাল নিজেব স্বার্থেই। তবে হ্যাঁ, গুছিয়ে দিয়েছে ওদের সংসার। রামকলি এবং বদ্রিনাথের ঘরে এখন অভাব-অনটনের কোনও ছোঁয়া নেই। বাবুলাল ব্যাঙ্ক লোন পাইয়ে দিয়ে বদ্রিনাথকে একটা ট্যুরিস্ট কোচের বিলাসবহুল বাস কিনতে পুরোপুরিই সাহায্য করেছে। বদ্রিনাথ এখন নিজেই সেই লাক্সারী বাস চালায়। এবং সম্যক ভাবে যেটা বোঝার বুঝে গেছে। যতোদিন রামকলির যৌবন থাকবে, এম.এল.এ ভায়রার এই করুণা থেকে সে কখনও বঞ্চিত হবে না। বাবুলালের সঙ্গে রামকলির সম্পর্কটা সে জানে। না, বোকার মতো বিবোধিতা সে কোনোদিনই করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। কেন-না নৃশংস ভাবে মরতে তার বুকটা বারবার কেঁপে ওঠে।

পশ্চিম-মধুবনীতে বাবুলাল মুকুটহীন সম্রাট। রাজনৈতিক প্রতাপ প্রতিপত্তিতে সে এখন হিমালয়ের চূড়োয়। কিন্তু মহেশপ্রসাদের কাছে সে হেরে যাচ্ছে—এই দুশ্চিন্তা এবং অপমান বোধে বাবুলাল যেন পুড়ে যাচ্ছে। হঠাৎই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এতো চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আর পারা যায় না। একটু ফ্রেশ হয়ে নেওয়া দরকার। বাবুলাল হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো। বেলা পৌনে বারোটা বাজে। জিপটা নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। রামকলির সুগভীর নাভিকুন্ডটি তাকে অদ্ভুত এক ইশারায় টানছে।

দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে চোখের কৃত্রিম লেন্স তৈরির কেন্দ্রের আজ উদ্বোধন। উদ্বোধন করতে আসছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রি দৌলত ভান্ডারী। প্রদীপ জ্বালিয়ে, নারিয়েল ফাটিয়ে অতঃপর ফিতে কেটে তিনি প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠিক তিন মিনিট ভাষণ দিলেন। দ্বারভাঙ্গার এম.এল.এ মতীন সিং এবং পশ্চিম-মধুবনী ও পূর্ব-মধুবনীর এম.এল.এ বাবুলাল, মহেশপ্রসাদের সঙ্গে মঞ্চে বসে দু'মিনিট একান্তে কথা বলা পরেই তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন মজঃফরপুরে যাবার উদ্দেশে। সেখানে একটা সেমিনারে যোগ দিয়ে আবার রওনা দিতে হবে পাটনায়। যাইহোক, যাবার শেষ মুহূর্তেও স্বাস্থ্যমন্ত্রি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে শুধুমাত্র মহেশপ্রসাদের সঙ্গেই একান্তে কিছুক্ষণ কথা বললেন।

ঘটনাটা নজর এড়াবার মতো নয়। বরং আরও বেশি করেই চোখে লেগে থাকে। সেই কারণেই বাবুলালের কপালে চিন্তার রেখা। সে কিছুতেই ভেবে পায় না, মহেশপ্রসাদকে এতো গুরুত্ব দেবার কী আছে? আরে বাবা সবে তো দু'দিন হলো পার্টিতে এসেছিস। এখনও আড়মোড়াই ভাঙলো না, কূটনীতি-রণনীতির ব্যাপারে জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও জন্মালো না, অথচ পার্টির উপরতলার সব নেতারাই ওকে বড়বেশি প্রশ্রয়, সম্মান দিয়ে চলেছেন। এটা অনুচিত। কেন-না মহেশপ্রসাদের মতো

দু'দিনের ছোকরাদের হাতে যদি এমনি ভাবে মূল ক্ষমতাটা চলে যায় আর পুরনোরা যদি তাদের প্রাপ্য পুরস্কারটুকুও না-পায় তাহলে সব কিছু লন্ডভন্ড হতে বাধ্য। শৃঙ্খলা বলে কিছুই থাকবে না।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রি দৌলত ভান্ডারী সামান্য সময়ের জন্য এসে চলে গেলেও মেডিক্যাল কলেজের অনুষ্ঠান তো আর শেষ হয়ে গেল না। অতোএব উদ্বোধনী ব্যাপার-স্যাপারের পর শুরু হলো আমন্ত্রিত অতিথিদের ভাষণ। দ্বারভাঙ্গার মতীন সিং-এর বক্তৃতার পর ভাষণ দেওয়ার জন্য মহেশপ্রসাদকে অনুরোধ করা হলো। সেই মুহূর্তেই একটা ধাক্কা খেলো বাবুলাল। এ-সব কী ভৌতিক ব্যাপার শুরু হলো? তার আগে মহেশপ্রসাদ বক্তৃতা দেয় কী হিসেবে? এই ধরনের উল্টো-পাল্টা কাজের যুক্তিগুলোর পেছনের যুক্তিটাই-বা কী? বাবুলাল আড়চোখে শুধু উৎসব কমিটির ব্যাজ পরা শীর্ষস্থানীয় লোকগুলোকে নীরবে দেখতে লাগলো। আর মনে মনে তাদের বৌ-মেয়েদের অনায়াসেই নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খিস্তির মেসিনগান চালিয়ে ক্রুদ্ধ এক আক্রোশে গজরাতে থাকে।

মহেশপ্রসাদ তার ভাষণে বললো. এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশ্বাস বলুন আর আস্থাই বলুন কিছুই না-থাকার ফলে আমাদের এই রাজ্যের মানুষ মাদ্রাজ, দিল্লি, মুম্বাই চলে যাচ্ছেন। অথচ রাজ্য সরকার এই খাতে হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন এই আশায় যে প্রতিটা মানুষের যেন সুচিকিৎসা হয়। কিন্তু সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের সব হাসপাতালে সব বিভাগের জন্য আধুনিক যন্ত্রসম্ভার আনা কি সম্ভব? সেটা সম্ভব নয়। সেইজন্যই আমরা হাত গুটিয়েও বসে থাকতে চাই না। তাই যে-কোনও একটা হাসপাতালে এক একটা রোগের জন্য বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র এনে তাকে সাজিয়ে তুলতে চাই। এই দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজিতে সরকারি উদ্যোগে কৃত্রিম চোখের লেন্স তৈরি হবে। দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সর্বাধুনিক মাইক্রোপ্রসেসার ও লেসার যন্ত্র বসিয়ে যে-কোনও চোখের অস্ত্রোপচার খুব কম সময়েই করা যাবে। আমবা এখানকার ইনস্টিটিউট আব নিউবোলজিতে খুব তাড়াতাড়িই একটি এমন স্ক্যানার কিনছি যা-দিয়ে পুবো শবীরের ছবি নেওয়া যায়। ই.এন.টি-র সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যাপারেও রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু শুধু টাকা খরচ করে যন্ত্র বসালেই হবে না—ডাক্তারসহ হাসপাতালের সব শ্রেণীর কর্মীকেই সেবার মনোভাব নিয়ে, আদর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় যত্ন নিলে, সঠিক সময়ে অস্ত্রপচারের ব্যবস্থা নিলে সর্বপরি সুষ্ঠু একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারলে মানুষের আস্থা এই সরকারি হাসপাতালগুলোর ওপব থাকবেই থাকবে। আর তখন এই রাজ্যেব মানুষ নিশ্চয়ই মুম্বাই, দিল্লি, ছুটবেন-না, ছুটবেন-না ভেলোরও। এই আশাটুকু নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বাবুলাল তার ভাষণে চিকিৎসা বিজ্ঞানেব সূক্ষ্মতার মধ্যে ঢোকাব চেষ্টাই করলো না। সেই কাজে যে সে সফল হতো তেমনটা বলা যায় না। তাই বাবুলাল তার নির্দিষ্ট একটা ছক ধরেই বললোঃ দুষ্টুলোকেরা কেন জানি-না একটা কথা সুকৌশলেই প্রচার করে বেড়ান যে, এই রাজ্যের শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নিজেদেব মধ্যেই কাবো সঙ্গে কারো মিল নেই। বিশেষ করে তিন গোষ্ঠীর তিন যুব নেতা মতীন সিং, মহেশপ্রসাদ আর আমার মধ্যে নাকি অহি-নকুল সম্পর্ক। অল বোগাস! আরে ভাই ম্যয় পুছতা হুঁ ইয়ে বাতো কা কলাই কিসলিয়ে? কার স্বার্থে এমন সব মনগড়া কথা বলা হচ্ছে? এটা সম্পূর্ণই অপপ্রচার। বিরোধী দল পায়ের নীচে জমিন না-পেয়ে আমাদের দলে ভাঙন ধরাবার উদ্দেশেই এই মিথ্যা প্রচারের চক্রান্ত অনবরত করে চলেছে। আর ভাবতেও অবাক লাগে সবাই না-হলেও বেশ কিছু পত্রকার-সাংবাদিকরা এটাকে তাঁদের কাগজে দিনের-পর-দিন প্রশয় দিয়ে চলেছেন। ফলাও করে লিখছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা সাংবাদিকদের লেখনি বন্ধ করে দিতে চাই না। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাও উচিত নয়। সেই সঙ্গে এটুকুও আশা করবো তাঁরা সৎ-সাংবাদিকতা করবেন। মিথ্যে গল্প বানিয়ে রংমশাল জ্বালাবেন না। আজ কৃত্রিম চোখের লেন্স তৈরির মহতী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কাগজের অনেক সাংবাদিকই তো এসেছেন তাঁরা দেখে গেলেন গ্রুপবাজীর সঙ্কীর্ণ রাজনীতিতে

আমরা ভেসে বেড়াই না—আমাদের দল এক। আমাদের নেতা একা। আর আমরা লড়াই করি কিছু পাওয়াব জন্য নয়---আদর্শের জন্য। আর যারা আমাদের ছিদ্র খুঁজে বের করার জন্য আদ্রাক-পানি খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা একই মঞ্চে আমাকে, মতীনকে এবং মহেশপ্রসাদকে দেখে নিশ্চয়ই জ্বলে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য আমার সমবেদনা রইলো এবং যে-কোনও বড়ো কাজে, মানুষের কল্যাণের জন্যে আমরা নিজেদের ছোটখাট ত্রুটি দূর করে, দূরে সরিয়ে রেখে সবাই যে এক হয়ে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, সে-প্রমাণও দেওয়া গেল। আমাদের ঐক্য সংহতি আগেও যা-ছিল এখনও তাইই আছে। আর আছে বলেই সব কাজ ফেলে আমি, মতীন আর মহেশপ্রসাদ তিনজনেই ছুটে এসেছি এখানে! আশা করবো পত্রকাররা আগামীকালের কাগজে গঠনমূলক ভাবে এটাও লিখবেন।

বাবুলালের ভাষণ শুনে উপস্থিত সাংবাদিকের দল নিজেদের মধ্যে মুখ টেপা-টেপি করে হাসতে লাগলেন। একজন তো বলেই ফেললেন, বাবুলালজি কো ইয়ে ভাষণ কা তামাশা বড়িয়া শানদার হ্যায়। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, আহিস্তা ভাই আহিস্তা। কোই শুন লেগা তো?

তো ক্যায়া হুঁয়া? আরে ভাই আভি দেখো না, খুদ বাবুলালজিই এখন আমাদের ডেকে গোপন সুরে মতীন সিং আর মহেশপ্রসাদজির কেমন শ্রাদ্ধ করবেন।

আলাদা ডেকে নিয়ে বাবুলালজি আজ যদি ওঁদের শ্রাদ্ধশান্তি করেন সত্যি সত্যিই কালকের কাগজে তাহলে সব ফাঁস করে দেবো। সদ্য সাংবাদিকতায় আসা এক নতুন পত্রকার যৌবনের উন্মাদনায় কথাটা বলতেই রাণাপ্রতাপের সিনিয়র রিপোর্টার ভার্মাজি ওর দিকে কৃপার দৃষ্টিতে একবার তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, লিখ্‌নেসে ক্যায়া হোগা ভাই? কোই ফারাক নেহি পড়তা—বাবুলালজি পরিষ্কার বলবেন, আমি ও-কথা বলিনি। এবং সেটাও আপনাকেই লিখতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজের অনুষ্ঠান শেষে মহেশপ্রসাদ যখন বেরিয়ে আসছিল ওর সামনে এসে দাঁড়ালো সুজাতা। স্নিগ্ধ দুই চোখে কাজল মেঘের ছায়া। ছায়া ভরা সেই নম্রতায় কাঁপা কাঁপা দৃষ্টি নিয়ে সে মহেশপ্রসাদের দিকে তাকালো। সুজাতার এক এক কানে দুটো করে সাদা পাথরের টাব। একটা বড়ো, অপরটি ছোট। দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। চারটে দুলের মাঝখানে মুখটা যেন ভাসছে। মহেশ প্রসাদ আস্তে বললো, আপ? ইহা?

আমাকে তো এখানে রোজই আসতে হয়।

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মহেশপ্রসাদ অসহায় ভাবে একঝলক হেসে বললো, আরও ভেঙে না-বললে আমার মাথায় ঢুকবে না।

আমি এখানে ডাক্তারি পড়ছি। ফাইনাল ইয়ার।

এবারে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শান্ত এক হাসির কিরণ ছড়িয়ে মহেশপ্রসাদ বললো, দেশ একজন নতুন ডাক্তার পেতে চলেছে। তবে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখবো কিনা ভাবছি।

বলুন না—

কথাটা শুনে আপনার তো ভালো নাও-লাগতে পারে।

সেটাই-বা আগে থেকে বুঝলেন কী করে? সুজাতা ঝকঝকে দাঁতের সারিতে হাসির রেণু মেখে ছোট্ট গলায় বললো, বলেই দেখুন না—

ডাক্তার হয়ে বেরোবার পর প্রায় প্রত্যেকেই শহরেই থাকতে চায়। গ্রামেও যে হাসপাতাল আছে এবং সেখানে গিয়েও যে মুমূর্ষু মানুষের সেবা করাটা অত্যন্ত জরুরি এটা তারা ভুলে যায়।

আপনার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আমার ধ্যান-ধারণা মিলে যাচ্ছে। আপাততো এটুকু বলতে পারি।

সেটুকুই যথেষ্ট। মহেশপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললো, কিন্তু আপনি যে ডাক্তরী পড়ছেন সে-কথা তো সেদিন বলেননি!

আমি নিজে থেকে বলবো? সুজাতা চাপা হেসে দৃষ্টি নিচু করে নিলো।

তা কেন? দীর্ঘ সময় নিয়ে আমরা তো সেদিন অনেক আলোচনাই করলাম। কথা প্রসঙ্গে ও কী আপনার ব্যাপারটা জানানো যেতো না?

ডাক্তারী পাস করে গ্রামে যাওয়াটা যতো জরুরি, একটি মেয়ের ওই বিষয় নিয়ে পড়ার খবরটা ফলাও করে বলাটা ততো জরুরি নয়। আপনি কী বলেন?

সব দিন সকলের সমান যায় না। আজ আপনার দিন। মহেশপ্রসাদ মৃদু হেসে উত্তর দিল, তবে হেরেও এক ধরনের সুখ পাওয়া যায়। যেটা এখন আমি পাচ্ছি।

শুধু নির্বাচনে হেরেই সুখ পাওয়া যায় না। সুজাতা কপট এক গাম্ভীর্য নিতে গিয়েও পারলো না। কিন্তু ভেতরের হাসিটাও বাইরে ছড়িয়ে দিল না। পাতলা ঠোঁট দুটো টিপে চোখের মণি উপরে তুলে অদ্ভুত এক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে মহেশপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললো, ওই হারে দারুণ কষ্ট তাই না?

কী করে বলবো? আমি কী হেরেছি কখনও? মহেশপ্রসাদ ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলো। সুজতার মনে হলো, পৃথিবীর যাবতীয় আবীলতা, মলিনতা যেন ওই নিষ্পাপ হাসির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

তখন চারদিকে সন্ধ্যা নামছে। শীতের বেলাটা যেন গা দেখিয়েই পালিয়ে গেল। অথচ এখনও শীত তেমন পড়েইনি। অন্যান্য বছরে এই সময়ের মধ্যে উত্তর বিহারের সর্বত্রই ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসে যায়। আর এবারে যেন শীতের আকাল পড়েছে। প্রশ্নটা অবশ্য শীত বেশি কমের নয়। দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। মেডিক্যাল কলেজের অনুষ্ঠান চত্বর থেকে সরে এসে মহেশপ্রসাদ আর সুজাতা এখন দ্বারভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। সমস্তিপুর থেকে এক্ষুনি যে-ট্রেনটা আসবে সেই গাড়িতেই ওরা মধুবনীতে ফিরে যাবে।

হঠাৎ ঘোষণা করা হলো, ট্রেন পঁয়ত্রিশ মিনিট লেট রান করছে। এটা নতুন কিছু নয়। প্রতিদিনের ব্যাপার। এখন সঠিক সময়ে চলাটাই মহা বিস্ময়ের। সুজাতা হাত-ঘড়ির ওপর একবার চোখ দুটি বোলাতেই মহেশপ্রসাদ হতাশার সুরে বললো, সত্যি এই ভাবে মানুষের কতো সময় যে অপচয় হয়! অথচ এই দিকটা নিয়ে আমাদের তেমন কোনও চিন্তা-ভাবনাই নেই। দেশটা যেন একটা কচ্ছপের পিঠে চড়ে এগোচ্ছে। অসহ্য!

একদিনেই এই? সুজাতা হালকা সুরে নির্দোষ ঠাট্টা করলো। আমাকে তিরিশ দিনই এই অসহ্য মুহূর্তটুকু সহ্য করতে হচ্ছে। আমাদের নিত্য যাত্রীদের অবশ্য এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ কি জানেন না এই ট্রেনে আজকে একজন এম.এল.এ যাচ্ছেন?

এম.এল.এ! মহেশপ্রসাদ নিস্পৃহ সুরে বললো, মাননীয় রেলমন্ত্রির হাজারো অনুরোধেও যেখানে কোনও কাজ হচ্ছে না, অরাজকতা, নিয়ম-নিষ্ঠার বিশৃঙ্খলা সেখানে কোন পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। রেলমন্ত্রি যেদিন যেখানে ভিজিট করেন সেই সব দিনে একেবারে ঘড়ির কাটা মিলিয়ে ট্রেন চলাচল করে। তার পরের দিনই আবার যে-কে সেই। আমার প্রশ্নটাও ঠিক সেখানেই। একটা দিন যদি সময় ধরে সব কিছু চলতে পারে দ্বিতীয় দিনে তাহলে চলতে অসুবিধেটা কোথায়?

মহেশপ্রসাদ সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেললো। খুব আস্তে আস্তে বললো, আমার অবশ্য এ-সব আলোচনা মানে এমন ধরনের আলোচনা করাটা উচিত নয়। কিন্তু শাসকশ্রেণীর একজন এম.এল.এ-র আড়ালে সবার আগে আমি একজন সাধারণ মানুষ।

পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মহেশপ্রসাদ আর সুজাতা প্ল্যাটফরমের সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে একটা লোক চা বানাচ্ছিল। ঠান্ডা চা-কে বারবার ফুটিয়ে গরম করা জনতা-কলসীর পদার্থ নয় দেখে সুজাতার খেতে ইচ্ছে হলো। ছোট্ট গলায় বললো, চা খাবেন?

আপত্তি নেই।

বিস্কুট?

তাতেও আপত্তি নেই। মহেশপ্রসাদ প্রশান্ত হেসে বললো, কিন্তু পয়সাটা আমিই দেবো।

কেন? সুজাতার দুই ভ্রূ আরও উপরে উঠলো। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, আমি বুঝি দিতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারেন।

তাহলে?

আজকে প্রথম দিন তো মহেশপ্রসাদ পুরো কথাটা বলতেই পারলো না। সে মাথা নিচু করে নীরবে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দৃষ্টি তুলতেই সুজাতার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মেয়েটা তার দিকে এতোক্ষণ তাকিয়েই ছিল। মহেশপ্রসাদ আবার চোখ নামিয়ে নিল। ব্যাপারটা আসলে এমন কিছুই নয়। মহেশপ্রসাদ দিব্যি সহজ ভাবে কথা বলে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ কি যে হলো! 'প্রথম দিন তো' বলাব পরেই যাবতীয় লজ্জা, জড়তা, দ্বিধা সব কিছু একই সঙ্গে ছুটে এসে তাকে যেন বাক্‌রুদ্ধ করে দিল। বিধানসভার এক বলিষ্ঠ যুব বিধায়কের এমন লাজুক অবস্থা দেখে সুজাতার মনে হলো, এই ছেলেটার কবি, সাহিত্যিক অথবা শিল্পী হওয়া উচিত ছিল। এতো পরিশীলিত মন নিয়ে হই-হট্টগোলের হাটে থাকছে কী করে? কি চমৎকার কণ্ঠেই-না বললো, আজকে প্রথম দিন তো...। সুজাতাও যেন তৃতীয় কেউ কানে শুনতে না-পায় এমন সুরে বললো, সে-কথা তো আমিও বলতে পারি।

যা খুশি বলুন। আমি আর কোনও প্রতিবাদ করবো না।

এই বাধ্য ছেলেটি প্রথম থেকে হওয়া যেতো না?

তা যেতো—কিন্তু অবাধ্য ছেলেরা যে শাসনের বেড়া ভাঙতেই চায়। কারণ তারা জানে, একজোড়া সজাগ দৃষ্টির সম্মোহনে তারা সর্বদাই আটকা থাকে।

চা খেতে খেতে সুজাতা একসময় বলেই ফেললো, আমি আপনার মোট তিনটে ভাষণ শুনেছি। তার প্রথমটা ছিল, নির্বাচনী জনসভার জোরালো বক্তৃতা। সত্যি বলতে কি আমার তেমন একটা ভালো লাগেনি। বিরোধীপক্ষের ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিয়ে বাজ্যের কোনও উন্নতি হবে না। দেশকে একমাত্র আপনারাই গড়ে তুলতে পারেন—সেই সংহতি একমাত্র আপনাদেরই। এই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। তত্ত্ব এবং তথ্যের বিন্যাসে হাজারো বার শোনা ওই সব ভাষণে হাঁপ ধরে যায়। কিন্তু আমাদেব কাকুলিয়াধউলির সাধারণ পাঠাগারের উদ্বোধনী দিনে আপনার ভাষণ এবং আজকে মেডিক্যাল কলেজে যা বললেন—খুব ভালো হয়েছে বললেও খুবই কম বলা হবে।

তাই বুঝি?

অন্তত আমার তো তাই-ই মনে হয়েছে। সুজাতা আর এক পদক্ষেপ এগিয়ে বললো, নির্বাচনী বক্তৃতায় ইচ্ছে এবং রুচির বিরুদ্ধে গিয়েও অহেতুক আক্রমণ করে কথার হুল ফোটাতেই হয়। সেটাই রেওয়াজ। কিন্তু আজকের মতো অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গেলে প্রয়োজন পান্ডিত্য এবং গভীরতার। স্বীকার করতেই হবে সে-দুটি আপনার ভেতরে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সামান্য একটু থেমে সুজাতা বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো কিছু মনে করবেন না তো?

অপমানজনক কিছু বলবেন না যখন মনে করার কী আছে?

অপমানজনক না-হলেও অস্বস্তিতে তো পড়তে পারেন—

অনুগ্রহ করে আপনি সেই চেষ্টাটাই করুন না—

মহেশপ্রসাদ চায়ের শূণ্য ভাড়টা নির্দিষ্ট একটা ড্রামের মধ্যে ফেলে দিয়ে সুজাতার দিকে তাকালো। সুচারু এক হাসি ছড়িয়ে বললো, কী হলো বলে ফেলুন—

আপনি অতো তাড়া দেবেন না—ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। সুজাতা আস্তে বললো, আসলে কয়েক দিন ধরেই কাগজে লেখালেখি হচ্ছে তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনার মন্ত্রি হওয়ার কতো দূর?

হয়তো বিশ্বাস করবেন না, ও-ব্যাপারে আমি কিছু জানিই না। তবে কাগজে দেখেছি। পড়ে যাচ্ছি এই পর্যন্ত আপনাকে বলতে পারি। মন্ত্রি হওয়ার জন্য আমার অতিরিক্ত কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল কিছুই নেই।

তবুও যদি হন?

হলে হবো—মহেশপ্রসাদ হেসে ফেললো। বললো, তাহলেও প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ভাড়ের চা খেতে এবং সেটা আপনারই সঙ্গে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

দারুণ বলেছেন। সুজাতা ঝকঝকে দাঁতের সাবি মেলে চমৎকার এক ভঙ্গিমায় হাসতে লাগলো। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে গলায় সরু সোনার হারটা জড়াতে জড়াতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহেশপ্রসাদের চোখে দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তবে ওই দৃশ্যটা দেখে মন্ত্রির আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে লোকে পাঁচরকম কথা বলতে পারে।

তা পারে। লোগো কা কাম হ্যায় কহনা।

সেক্ষেত্রে দুর্নামের ভয় নেই?

কীসের ভয়? কীসের দুর্নাম? বরং আমি অতি মাত্রায় খুশি।

কেন?

আমার সৌভাগ্য দেখে বদনশীব হিংসুকরা তো নিন্দে করবেই। মহেশপ্রসাদ স্নিগ্ধ এক দৃষ্টি নিয়ে সুজাতার দেবদারু ঘন পালকে ঘেরা গভীব দুই চোখের দিকে তাকালো। মায়াবী দৃষ্টির সেই পাইন বনের দিকে নিঃসঙ্কোচে দৃষ্টি ধরে রাখতে গিয়ে আরও বেশি লজ্জায় পড়ে সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তবে কথাটা বলেই ফেললো, সুজাতা সিনহাব মতো অলৌকিক এক মৃন্ময়ীব পাশে আমাকে দেখলে লোকেরা তো নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে জ্বালা জুড়োতে দু-চার কথা শোনাবেই। কিছু করার নেই—

তাই বুঝি? ঝুরঝুর করে পুরোনো দেওয়ালের বালি খসে পড়ার মতো লজ্জার অতিরিক্ত পালকগুলো হঠাৎ যেন এক দমকা হাওয়ায় ভেসে কোথায় যে হারিয়ে গেল সুজাতা টেরই পেল না। সঙ্কোচের যাবতীয় ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছে সুজাতাকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তুললো। বাড়তি লজ্জার মেদটুকু ঝরে যেতে সে এখন তাই ঝরঝরে। তবে সংযমের শাসনে নিজেকে ধরে রেখে সুজাতা বললো, কিন্তু লোককে বলবার সুযোগ দেওয়াটাও তো ঠিক নয়। একজন মন্ত্রির আচরণ হবে......।

দাঁড়ান—দাঁড়ান। মহেশপ্রসাদ মাঝপথেই সুজাতাকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললো, মন্ত্রি হয়ে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে চা খাবো না—শপথ অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই এমন কোনও বাক্য পাঠ করানো হয় না। এবং ওটা কোনও গর্হিত আচরণের মধ্যে পড়ে বলেও আমার জানা নেই। আপনি কী বলেন?

সুজাতা হাসতে হাসতে বললো, আমি কিছুই বলতে চাই না। বিপদে পড়লে আপনাকেই সামলাতে হবে।

এই ধরনের বিপদে কখনও পড়িনি। সুজাতার চোখে চোখ রেখে মহেশপ্রসাদ নিষ্পাপ হেসে বললো, তবে আপনি পাশে থাকলে এবং সাহস দিলে কোনও বিপদকেই বিপদ বলে মনে হবে না।

এতো দূর সাহস?

সে-কথার কোনও উত্তর দিল না মহেশপ্রসাদ। ট্রেনটা প্ল্যাটফরমে ঢুকছে দেখে চাপা হেসে বললো, উনি এসে গেছেন—

না-এসে আর উপায় কী? চল্লিশ মিনিট দেরি তো করেই ফেলেছে—

দেরির ফলে ট্রেন যে শুধু বিরক্তিই বাড়ায় তা নয়। মাঝে মাঝে সাহসী এবং উদ্যমীও করে তোলে তাই না?

সুজাতা মসৃণ হেসে মাথা নিচু করে নিল। ছোট্ট সুরে শুধু বললো, জানি না—

এখন রাত পৌনে-আটটা। বাবুলাল ওর বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রোজকার মতোই আড্ডা দিচ্ছে। এরমধ্যে নানা শ্রেণীর মানুষ আসছে। আবদার, দরবার, প্রার্থনা আর অভিযোগের নানা কথা শুনে তাদেরকে কিছু কিছু নির্দেশ ও সুরাহার আশ্বাসও দিতে হয়। জনগণের সঙ্গে এই সম্পর্কটুকু টনিকের মতো কাজ দেয়। বাবুলাল নিজের কানে শুনেছে, সাধারণ মানুষরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, ''সারা দেশ জুড়েই সঙ্কট। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই। লক-আউট, ক্লোজার আর লে-অফের তুফানে শিল্পের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। কেউই জুতসই একটা কিছু করে উঠতে পারেছ না। সেখানে বাবুলালজি তো ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোনেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানও করে দেন। তাঁর একার করার ক্ষমতা আর কতোটুকু? তবুও বাবুলালজি আমাদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।''

সাধারণ কিছু মানুষের ওই বিশ্বাস নিয়েই বাবুলাল পশ্চিম-মধুবনীর রাজাসাহেব। রাজাসাহেব এখানে থাকলে প্রতিদিন প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথ শোনে। দৃষ্টান্ত রাখার জন্য দু-একজনের উপকারও করে দেয়। এবং তাতেই জয়-জয়কার। ফাঁকি বাজির এই শিল্পটুকু আয়ত্ত করতে না-পারলে সমস্ত কাঠামোটাই বৃথা।

ইতিমধ্যে অফিস ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন গোলকপতি। বছর পঞ্চান্ন বয়স হবে। শীর্ণ দেহ। পরনে আধময়লা ধুতি ও শার্ট। তার ওপরে নস্যি রঙের ময়লা একটা চাদর। এর আগেও তিনি দু'দিন এখানে এসেছেন কিন্তু বাবুলালের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে রামপেয়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। রামপেয়ারেই আজ ওঁকে আসতে বলে দিয়েছিল।

গোলকপতি নমস্কার করে করুণ মুখে চেয়ে আছেন দেখে বাবুলাল ওঁকে বসতে বলে রামপেয়ারের দিকে তাকালো। যার অর্থ, এই ঘাটের মরাটার আর্জি কী?

রামপেয়ারের কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই গোলকপতি বাবুলালের দর্শন পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং বেশ খানিকটা উৎসাহের সঙ্গে বলে বসলেন, অনেক আশা নিয়ে স্যার আপনার কাছে এসেছি। আমার একটা উপকার আপনাকে করতেই হবে।

বাবুলাল ওর রিভলবিং চেয়ারে বসে গোলকপতি নামের শীর্ণ মানুষটার কথা শুনে মনে মনে একটু হাসলো। ওঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলো, তোমার বৌ এবং মেয়ের পাশে শুয়ে পেট বড়ো করে দেওয়া ছাড়া আমি আর কোনও উপকারই করতো পারবো না। তবে তোমার যা একখানা চেহারার ছিরি—তোমার বউ-মেয়েও কতো আর সুন্দরী হবে? সবাই নিশ্চয়ই ওই হাড় জিরজিরে চেহারার কঙ্কালময়ী। নাহে গোলকপতি গান্ডুরাম, তোমার শালে কোনও উপকারেই আমি লাগতে পারছি না। বাবুলাল শান্ত হেসে বললো, বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?

আমার স্যার ন'টি সন্তান।

ক'টা?

ন'টা। পাঁচ ছেলে, চার মেয়ে। ওদের কারও.......

বাবুলাল বিস্ফারিত চোখে তার সঙ্গী-সাথীদের দিকে একপলক তাকিয়েই গোলকপতিকে আপাতমস্তক দেখতে লাগলো। শীর্ণ দেহের ক্ষমতার পরিমাপ করতে করতে নিজের ভেতরেই খিঁচিয়ে উঠলো, ওই ন'টি সন্তান উৎপাদন করার সময় কী আমার অনুমতি নিয়েছিলে? উল্লুক কাঁহাকা—এখন খেতে দিতে না-পেরে ছুটে এসেছো আমার কাছে। এই সমস্ত হারামী লোকদের এতোটুকু মায়া দেখাতে নেই। লোকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে খায়। গান্ডুরাম তুমিও তোমার মেয়ে-বৌকে ভাড়া দাও। আমাকে বিরক্ত করতে আসা কীসের জন্য? বাবুলালের ইচ্ছে হচ্ছিলো, উঠে গিয়ে লোকটার পাছায় এমন একটা লাথি বসায় যে ওই একটাতেই যেন চির জীবনের জন্য কোমর ভেঙে ল্যাংড়ে

ল্যাংড়ে চলে।

মনের চিন্তার ছাপ বাবুলালের মুখে কখনওই পড়ে না। তার সমস্ত মুখখানা নির্মল আকাশের মতো পরিষ্কার। ঝকঝকে। বাবুলাল বরং একটু ব্যথিত সুরে জিজ্ঞেস করলো, মেয়েদের কারো বিয়ে দিতে পারেননি, ছেলেরা কেউ চাকরি পায়নি তাই না?

ঠিক ধরেছেন স্যার, ঠিক ধরেছেন। আপনি অন্তত একটা ছেলেকে অনুগ্রহ করে যেখানে হোক কাজে ঢুকিয়ে দিন।

শালে এখন মরা কান্না কাঁদতে এসেছো। যেখানে হোক একটা ছেলেকে ঢুকিয়ে দিন। নিজে তো সারাজীবন ঢোকাঢুকির মধ্যেই কাটিয়ে দিলে—তখন মনে ছিল না যারা আসছে তারা খাবে কী? এই লোকগুলোই মহা ডেঞ্জারাস। বাবুলালের স্পষ্ট মনে আছে বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিম-মধুবনীর প্রত্যন্ত কয়েকটা গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার হয়ে প্রচার করতে গিয়েছিল। ছোট পরিবার এবং নাশবন্দীর ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে। গ্রামের সব লোক যেন এক কাট্টা হয়ে তেড়ে এসেছিল। কিন্তু ও-সবে ভয় পাবার লোক বাবুলাল নয়। উপর মহলের প্রশ্রয়ে সে নিষ্পেষণের এমন রোলার চালিয়েছিল যে-যাকে পাচ্ছে তাকেই খোজা বানিয়ে ছাড়ছিল। ইস, এই গোলক গাড্ডুটাকে যদি তখন পাওয়া যেতো। উল্লুকটার একেবারে নির্মূল করে ছেড়ে দিতো।

বাবুলাল দুঃখের সঙ্গে বললো, বুঝতে পারছি আপনি খুবই অসুবিধের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছেন তো চাকরির বাজার ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। তারপর লেখাপড়াও বিশেষ করেনি। কোথায় যে আপনার ছেলেকে ঢোকাবো কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। তবুও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। চেষ্টা-চরিত্র করতেই হবে। দেখি কোথায় কতোদূর কী করতে পারি! আপনি আজ বাড়ি চলে যান। মাস দুয়েক পর রামপেয়ারের কাছে এসে একবার খোঁজ-খবর নেবেন।

গোলকপতি নমস্কার জানিয়ে ঘরের বাইয়ের পা রাখতেই বাবুলাল কঠিন দৃষ্টিতে রামপেয়ারের দিকে তাকালো। চাপা সুরে জিজ্ঞেস করলো, সন্তান উৎপাদনের এই যন্ত্রটিকে কোথা থেকে আবিষ্কার করলি রে? আচ্ছা তোর আক্কেলখানা কী বলতো—এই ধরনের নোংরা লোককে পর্যন্ত তুই আমার এনে হাজির করাচ্ছিস?

গুরু, ওই লিকলিকে চেহারার দীন ভিখারি লোকটা যে এতো করিতকর্মা সেটা আমি কী করে জানবো বলো? দু'দিন ধরে বহুত ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে দেখে...

আমার কাছে ভিড়িয়ে দিলি—বাবুলাল এবারে হেসে ফেললো। শালে বলে কিনা ন'টি ছেলে-মেয়ে? এই ধরনের লোকরাই দেশের শত্রু। মজুত খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার দিকে আমাদের যতোই সচেতন দৃষ্টি থাক-না কেন, এই সব নয়-দশ সন্তানদের জনকদের জন্যই সারা দেশের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। সহস্র ক্ষুধার্ত হয়ে অপগণ্ডের দল ছুটে আসছে দ্রুত বেগে। সরকার বাহাদুর কী করতে পারে বলতে পারিস? হাজারো সমস্যার মধ্যেও জনস্ফীতির ব্যাপারটা তো আমরা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। মানুষ যদি এখনও সচেতন না-হয়...বুরবকটা বলে কিনা ন'টি সন্তানের পিতা। না, আমার মাথা থেকে ওই কথাটা আজ কিছুতেই নামবে না। আমার চারটে ছেলে তাতেই আমি লজ্জায় অস্থির। ওই বেয়াকুফটার সেটুকুও নেই।

এবারে যে-মহিলাটি ঘরে ঢুকলো তার বয়স বছর আটত্রিশের মতো হবে। হাতে এবং দুই গালে উল্কির নক্সা। সিঁথিতে মেটে সিঁদুরের হোলির উৎসব। হাতে রুপোর মোটা বালা। গলাতেও কারুকাজ করা রূপোর পুরু হার। একটু চাপা ধরনের নাকে নাকছাবিটাও চমৎকার মানিয়েছে। পরনে সাধারণ একটা ফুল ফুল ছাপা শাড়ি। কমলা রঙের ব্লাউজ। মহিলাটিকে সুন্দরী বলা চলে না। তবে শ্যামলা শরীরে এখনও যৌবনের প্রাচুর্য। ভরাট বুক এবং ছন্দময় মাজার দিকে দ্রুত চোখটা বুলিয়ে নিয়ে বাবুলাল—পশ্চিম-মধুবনীর জনগণের প্রতিনিধি বাবুলাল বসার নির্দেশ দিয়ে বিনীত সুরে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী ব্যাপার বলুন?

আটত্রিশ বছরের মহিলাটির নাম ভামতী। বাবুলালের কাছে সে ছুটে এসেছে অত্যন্ত নিরুপায়

হয়েই। অশ্রুসজল চোখ ভামতী মাননীয় বিধায়ককে যে-কাহিনীটা বললো তা মোটামুটি এই রকমঃ দিন পাঁচেক হলো তার মেয়ে পনেরো বছরের চম্পা নিখোঁজ। প্রতিদিনের মতোই স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু ছুটির পর বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ভামতীর দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। তারপর স্কুল, পাড়া সম্ভাব্য সব জায়গা খোঁজাখুঁজি করেও চম্পাকে পাওয়া গেল না। ওর বন্ধুরা অবশ্য বলেছে, চম্পা তো বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছিলো। বাড়ির কাছাকাছি থেকেই ওকে নিশ্চয়ই কেউ জোর-জুলুম করে তুলে নিয়ে যায়। তারপর সেই দিন সন্ধ্যাতেই ভামতী আর চম্পার বাবুয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে থানায় ছুটে যায়। মিশ্রজি সাহেব সেই থেকে এই পাঁচদিন ধরে ওই একই কথা বলে যাচ্ছেন, "দেখছি। চেষ্টা করে যাচ্ছি।" কিন্তু আমি যে আর পারছি না...বাবুলালজি, আপনার গোড় পড়ি—আমার চম্পাকে ফিরিয়ে আনুন। আপনি মিশ্রজি সাহেবকে একবার বলে দিন। আপনি শুধু একবার দয়া করে...ভামতী অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

কাঁদবেন না। বাবুলাল অনুনয়ের সুরে বললো, আমাকে ব্যাপারটা আরও একটু জেনে নিতে দিন। চম্পার কী ছেলে বন্ধু-টন্ধু আছে?

না। আমার মেয়ে সেই ধরনের নয়।

ভামতীর কথাটা শুনে বাবুলাল ওর ঢলঢলে মুখের দিকে তাকালো। কেঁদে কেঁদে চোখের কোল দুটো ফুলে গেছে। আর তাতেই ভামতীকে আরও একপ্রস্থ সুন্দর লাগছে। বাবুলাল নিজের মনেই হাসলো একটু। সব মায়েদেরই নিজের মেয়ে সম্পর্কে ওই এক ধারণা। তাদের মেয়েই একমাত্র সতী। ছেলেদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মেলামেশা করে না। ছেলেদের মুখের দিকেও তাকায় না। অথচ কুমারী মেয়েরাই পেট হালকা করতে নার্সিং-হোমে অহরহ ছুটে যাচ্ছে। যাক গিয়ে সে-সব কথা। ভামতী নামের মহিলাটিকে অতোশত বলে কোনও লাভ নেই। মেযে তার প্রেম করুক-না-করুক সেটা অন্য প্রশ্ন। একটা মেয়ে নিখোঁজ হলে মা-বাবার কষ্ট তো হবেই। বাবুলালের মনে পড়লো ধলার কথা। ওই ছাগলটার জন্যই তার মায়ের কান্না থামতে চাইছিল না। আর এ তো নিজের সন্তান। বাবুলাল জিজ্ঞেস করলো, থানা থেকে এই পাঁচ দিনের মধ্যে আপনাদের বাড়িতে কেউ গিয়েছিল?

একজনও নয়। বরং আমি আর চম্পার বাবুয়াই দিনের মধ্যে দু-তিনবার করে থানায় ছুটে যাচ্ছি। মিশ্রজি গম্ভীর মুখে করে শুধু বলে যাচ্ছেন, কোনও খবর নেই। আসলে—পুলিশের বিপক্ষে বলাটা মাননীয় একজন বিধায়কের সামনে কতোটা সমীচীন হবে সেটা ভেবেই ভামতী থমকে গেল।

বাবুলাল নরম দৃষ্টিতে ভামতীকে দেখছিল। প্রশ্রয় দেবার সুরে সে এবারে থেমে যথার্থই দরদ দেখিয়ে বললো, অনুগ্রহ করে কিছু লুকোবেন না। আপনার মনের ভেতরে যা-আছে আপনি খোলাখুলি ভাবে আমাকে জানাতে পারেন। ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই।

আসলে পুলিশের কোনও রকম তোড়জোড় উৎসাহ, উদ্যোগই নেই। ভামতী করুণ সুরে জানালো, আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে পুলিশের প্রাণে একটুও আঁচড় পড়ে না। ওরা আমাদের কথাই শুনতে চায় না—দুঃখের শরীক হবে কেমন করে?

সাধারণ, অসাধারণ বলে কোনও কথা নয়—যে-কোনও মানুষের পাশেই দাঁড়াতে পুলিশ বাধ্য। বাবুলাল হঠাৎ নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে একবার চোখ ফেরালো। হতাশার কণ্ঠে বলে উঠলো, তবে এটা ঘটনা পুলিশ সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না। তাদের অভিযোগ কানেই তোলে না। থানাগুলো যেন ওদের জমিদারী।

উভয়পক্ষের কথাবার্তা এতোক্ষণ খুব মন দিয়েই শুনছিল রামপেয়ারে। কোন জায়গায় কখন কী বলতে হবে তা সে ভালোই জানে। ভামতীকে এক পলক দেখে নিয়েই রামপেয়ারে তার বাল্যের সাথীর দিকে তাকালো। গুরুবন্দনার ভঙ্গিতে বললো, তোমার একটুখানি কড়কানি না-খেলে মিশ্রজির পেট ভরে না। এক ডোজ দাওয়াই দাও, দেখবে যথা সময়ে চম্পাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। পুলিশের চেয়ে বড়ো মস্তান এই দুনিয়ায় আর কে আছে? দিন দুপুরে একটা মেয়েকে লোপাট

করা হলো পুলিশ জানে না বলতে চাও? ব্যাটারা গতর নাড়াতে চায় না।

থানায় একটা ফোন কর তো—আসলে বাবুলাল নিজেই সেটা কবতে পারতো। কেন-না ফোনটা তার টেবিলের ওপরেই এবং নাগালের মধ্যেও। কিন্তু ওটাই বাবুলালেব বিলাসিতা। অথবা আভিজাত্য। ডায়ালটা পারত পক্ষে নিজের হাতে করে না। রামপেয়ারে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেই রিসিভারটি বাবুলালের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে চাপা সুরে বললো, মিশ্রজিই ধরেছেন।

বাবুলাল তার গলায় মেসিনগান চালাবার আগে ভামতীর চোখের দিকে তাকালো। মহিলাটি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে চলেছে। সেই দিকে অর্থাৎ কান্নার ঝরণার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবুলাল ফোনের মধ্যেই গর্জে উঠলো, মিশ্রজি আপনি ওই চেয়ারে বসে কী করছেন বলুন তো? আমার এলাকা থেকে একটা স্কুল-ছাত্রীকে একদল লোক অপহরণ কবে নিয়ে গেল আর সেই তামাশা দেখার পরেও পাঁচ-পাঁচটা দিন ধরে আপনি চুপচাপ বসে আছেন? আশ্চর্য! এ-কী দোকানের বয়ামে রাখা মোয়া না বিস্কুট হাত ঢুকিয়ে যে-কেউ এসে নিয়ে চলে গেল? এমন জঙ্গলের রাজত্ব চললে আপনাদের রেখে তাহলে কী লাভ—আর আমরাই-বা জন-প্রতিনিধি সেজে বসে আছি কী করতে? শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যখন নিয়েছেন আশা করি সেটুকু ভালোভাবে পালনের চেষ্টাটাও করবেন। আমার এলাকার মেয়ে নিখোঁজ মানে আমার বাড়িরই মেয়ে নিখোঁজ। এই কথাটা মাথায় রেখে আপনার যা-করার করুন। আর যদি চম্পাকে খুঁজে বেব করতে না-পারেন দয়া করে সেটাও বলে দিন। সারা রাজ্য জুড়ে আমি আমার ছেলেদের লাগিযে দিই। আমাব মনে হয় আপনাদেব কাজটা ওরাই নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে বাবুলাল তখনও মিশ্রজির উদ্দেশে গজরাতে লাগলো। এই সব দায়িত্বপূর্ণ লোকগুলোকেও ধাক্কা দিয়ে কাজ করাতে হয়। কিন্তু এ-ভাবে কতো আর এগোনো সম্ভব? জনগণ তো কথায় কথায় সবকারের শ্রাদ্ধ করছে—এখন সরকার কী থানার অফিসারকে বলে দিয়েছে চম্পাকে খুঁজে বের করার কোনও প্রয়োজন নেই? এতো বছর পরেও যদি কেউ দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ এবং সচেতন না-হয় সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বাবুলাল ভামতীকে যতোটা সম্ভব শান্ত গলায বললো, এখন আপনি বাড়ি চলে যান। কোনওবকম চিন্তা করবেন না। আমার এলাকা থেকে মেয়ে পাচার হয়ে যাবে আর আমি বসে বসে তামাক খাবো, তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। থানার প্রধানটিকে কি বললাম তা তো আপনি নিজেব কানেই শুনলেন—এইবার মিশ্রজির দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যাবে। আশা করি আপনি আপনার মেয়েকে খুব শীগগিবই পেয়ে যাবেন।

চোখের জল ফেলে কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানিয়ে ভামতী চলে যাবার পরেও বাবুলাল বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। উপস্থিত ছেলেদের মুখগুলো দেখতে দেখতে এক সময় বলে উঠলো, দেশ জুড়েই এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ওটা কোনও চমকে ওঠার ঘটনা নয়। আসল ব্যাপারটা হলো হঠাৎ আমারই এলাকা থেকে এমনটা ঘটলো কেন? এর পেছনে কোনও চক্রান্তই নেই? এটা ঠিক এতো নোংরা কাজে মহেশপ্রসাদ নামবে না। তবুও রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সবাই সবার শত্রু—তোরা কি বলিস?

তুমি বিল্লিকে বাইসন বলে ভাবতে শুরু করলে দেখছি। ওর মাথায় অতো মারপ্যাঁচ নেই। রামপেয়ারে যথেষ্ট আস্থা নিয়ে উত্তর দিল, এ-সব ঝঞ্ঝাটের নাটক করতে গেলে অনেক হিম্মতের দরকার যা মহেশপ্রসাদের আদৌ নেই। আমি বলতে চাইছি, তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য ওর এতো সাহস জীবনেও হবে না।

গুরু তোমাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসাবে ওই মহেশপ্রসাদ? এতোটা ভেবে কিন্তু ওকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিলে। যাদব, বাবুলালকে আরও বেশি খুশি করতে বলেই ফেললো, উত্ত শালে কাল কা যোগী তো তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই কথা বলতে পারে না!

সব ঠিক। আসলে কি জানিস, রাজনীতিতে কাউকে ছোট করে দেখতে নেই। সম্ভব-অসম্ভব সব দিকই খতিয়ে দেখতে হয়। হঠাৎ বাবুলাল রামপেয়ারের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো। একটা

হুঙ্কার ছেড়ে বললো, তোর ব্যাপারটা কী আমাকে বলবি? পাঁচ-ছ দিন ধরে রামগরিবকেই আমার সামনে আনতে পারলি না?

চেষ্টার কী বাকি আছে কিছু? প্রতিদিন দু'বার করে ওর বাড়িতে যাচ্ছি। কিন্তু ও যদি বাড়িতেই না-থাকে আমি ধরে আনবো কাকে?

তোরা ঠিক বুঝতে পারছিস না—অত্যন্ত অসহায় এক কণ্ঠে বাবুলাল বলে উঠলো, এই মুহূর্তে রামগরিবকে যে আমার কী ভীষণ দরকার সেটা যদি তোরা ....

আমরা অবশ্যই অনুভব করতে পারছি কিন্তু বাড়ি-ছাড়া একটা ছেলেকে কোন মন্ত্রে তোমার কাছে এনে হাজির করবো বলো? তুমি আমাকে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে মরতে বলো একশোবার তাতে রাজি আছি কিন্তু ওই ......

মূল ব্যাপারটা কি জানিস রামপেয়ারে—মহেশপ্রসাদের মন্ত্রি হওয়া আটকাতে ওর এলাকাতেই বড়ো-সড়ো একটা কেলো-কেচ্ছা না-করলেই নয়। আর এই ধরনের কাজ করতে ওই একজনই পারে। রামগরিব।

কিন্তু গুরুজি ভিখু, রঘুবীর, ঢুন্ডু

তোর মুন্ডু! যাদবের মুখের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো বাবুলাল। ক্ষোভে এবং হতাশায় বললো, তুই একটা উল্লুক। পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলতেই জানিস না। তখন থেকে শুনছিস কী তাহলে? সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। করানোও উচিত নয়। বললাম না, যে-পরিকল্পনাটা নিয়েছি সেটা বাস্তবে হুবহু মিলিয়ে দিতে পারে একমাত্র রামগরিব।

বাড়ির ভেতর থেকে কাজের কিশোর ছেলেটি বাবুলাল এবং তার চ্যালাচামুন্ডাদের জন্য চা নিয়ে এলো। সেই সঙ্গে নিমকিন, ছোলা ভাজা আর পাপ্পড়। যাদব আর উপেন্দ্র প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো, কুসুম ভাবিজি কা জবাব নেহি। সঠিক সময়ে সঠিক খাবারটা পাঠাতে ওর জুড়ি নেই।

কুসুমের এতো জয়গান কেন—তোরা কী ওর বাপেরটা খাচ্ছিস? বাবুলাল হাসতে হাসতে বললো, ধ্বংস করছিস তো আমার!

ইয়ে বাত তো বিলকুল ঠিক হ্যায় দাদা। উপেন্দ্র মুচমুচ করে পাপ্পড় খেতে খেতে উত্তর দিল, ধ্বংস করছি তোমারটাই কিন্তু আমাদের পেট পূজার দিকে ভাবিজির সজাগ দৃষ্টি। ইসি লিয়েই ভাবিজি কা কোই জবাব নেহি। সমঝানু—

সমঝ্ গয়ে। বাবুলাল নিচু সুরে মজা করলো, তুই কী রাতেও খেয়ে যাবি?

সে তো প্রায়ই খাচ্ছি। এটা কী নতুন করে বলার?

ওই হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই অফিস ঘরে পা রাখলেন বিনোদ ঝা। উত্তর বিহারের একজন নামী শিল্পপতি। ওঁকে দেখেই বাবুলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললো, আপনি আবার এই রাতে কষ্ট করে এলেন কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন। তবে আপনার আসার ফলে আমার গরিবখানা ধন্য হলো।

উনষাট বছরের মানুষটা হাসলেন। মুখে কিছু বললেন না। নীরবে ঘরের উপস্থিত মুখগুলোর ওপর দ্রুত দৃষ্টিটাকে বুলিয়ে নিয়ে ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় বললেন, ডাকাডাকি বা ভায়া কথাবার্তা না-চালিয়ে আমি নিজেই ছুটে এসেছি বিশেষ এক কাজে। তোমার লোকেরা বরং চা-টা খেতে থাক—ভেতরের অ্যান্টিরুমে চলো, জরুরি একটা কথা আছে।

অফিস ঘরের লাগোয়া ছোট অথচ ঝকঝকে আরও একখানা ঘর রয়েছে। দামি সোফা-টেবিলে সাজানো সেটাই বাবুলালের অ্যান্টিরুম। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় কোনও কথাবার্তা থাকলে সেটা এখানে বসেই সেরে নেয়। বিনোদ ঝা একটা আরামদায়ক সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে যা-বললেন তা হলো, মধুবনী শহরে ওর একটা হাট আছে। প্রতি বুধবার সেখানে বারোশোর মতো দোকানদার তাদের রেডিমেড পোশাকের জমজমাট ব্যবসা চালায়। গত সাত বছর ধরে ওদের

ভাড়ার একটা টাকাও বাড়ানো যায়নি। কাউকে তোলাও সম্ভব হয়নি। অথচ হাটের ওই বিরাট জায়গা জুড়ে পাকা বাড়ি বানাতে পারলে প্রচুর লাভ। অতোএব ওই বারোশো দোকানদারকে তুলতে হলে হাটে আগুন লাগানোটা অত্যন্ত জরুরি। এবং সেই সর্বনাশা কাজটা করতে হবে গোপনে ও বিশ্বস্ত লোকদের দিয়েই। সেই কারণেই ছুটে আসা। বিনোদ ঝা মাপা হেসে আরও বললেন, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কীভাবে চলতে পারি বলো?

আপনি তো জানেন, এম.এল.এ হওয়ার পর থেকে এই ধরনের কাজে নিজেকে জড়াতে আমি বিশেষ আগ্রহী নই। সেটা উচিতও নয়। আমার এই ভাবমূর্তিটা নষ্ট না-করে আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন? বাবুলাল হাসির কুয়াশার মধ্যে থেকে অস্ফুট স্বরে বললো, আজকাল পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে—সব ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে রাখাটা ঠিক নয়।

সেটা তুমি ঠিকই বলেছো। বিনোদ ঝা আরও ঘন হয়ে বসে পরিষ্কার বলে ফেললেন, যা-করার সব আমার লোকেরাই করবে। ব্যাপারটা হলো, তোমাকে না-জানিয়ে তো কিছু করতে পারি না। শেষে তুমিই বলবে, ঘটনাটা ঘটাবার আগে আমাকে একবার বলারও প্রয়োজন মনে করলেন না? সেই কারণেই আমি নিজে ছুটে এসেছি তোমার কাছে।

বাবুলাল এম.এল.এ সুলভ ভারিক্কি চালের কথাবার্তার বাতাবরণ যেটুকু না-করলেই নয়, সেটুকু গাম্ভীর্য না-দেখালেই নয়, সেটুকু দেখিয়ে এবারে হেসে ফেললো। হেসে দিল বিনোদ ঝার শেষের কথাগুলো শুনে। সে তাই বললো, আপনি আমাকে জানালেন ঠিক আছে—কিন্তু আমি ব্যাপারটা জানি না। শুনিনি। ঠিক আছে?

হাঁ-হাঁ ম্যয় পুরি বাত সমঝে গয়ে—বিনোদ ঝা প্রাণ খুলে হাসলেন। বাঁ চোখটা সামান্য একটু টিপে বললেন, তবে চারদিক থেকে প্রশাসনিক চাপ-টাপ যা আসবে সেটা অন্তত একটু সামলে দিয়ো।

আর একটা কাজও করবো। বাবুলাল সামান্য জোরে হেসে উঠতেই বিনোদ ঝা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, কী করবে বলো তো?

ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ নিয়ে মিটিং-মিছিল করবো। তাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই চিৎকার এবং সেই সঙ্গে আপনার মুন্ডুপাতও যথেষ্ট পরিমাণে করবো।

সেটুকু না-করলে তো পুরো ব্যাপারটাই জোলো হয়ে যাবে। বিনোদ ঝা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। বললেন, ওই আস্ফালনটা তো তোমাদের বাঁচার রাস্তা। করবে বৈকি, নিশ্চয়ই করবে। একটু লাফ-ঝাঁপ না-করলে কেউ আবার নেতা বলেই মানতে চায় না। তোমাদের হয়েছে সত্যিই এক বিপদ। সব দিক ব্যালেন্স করে এই চলাটাই হলো সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। কী করে যে তোমরা সব সামলাও—বলতে বলতে বিনোদ ঝা উঠে দাঁড়ালেন। মোলায়েম সুরে বললেন, চলি বাবুলাল, কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবুলাল বিছানায় শুয়ে পড়ার আধ ঘন্টার পরেও যখন কুসুমকলি ঘরে এলো না তখনই সে একটু উসখুস করে উঠলো। অন্যান্য দিন অবশ্য বাবুলাল এই সময়ের মধ্যে দিব্যি নাক-ডাকা শুরু করে দেয়। কিন্তু আজ কেন জানি মনটা বেশ হালকা-হালকা, খুশি-খুশি লাগছে। দোল যখন ভেতরে লেগেছে তখন কুসুমকলিকেও একটু দুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেই কারণেই বাবুলাল অধৈর্য হয়ে বারবার দরজার দিকে তাকিয়ে শেষে ডাকাডাকিই শুরু করে দিল, এ চিন্টু কা মা শুনতি হো—

কুসুমকলি ঘরে ঢুকে দরজা-টরজা বন্ধ করে দিয়ে ওর মরদটার দিকে স্থির নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো। শেষে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, এতো ডাকাডাকি কীসের? তোমার তো এতোক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

প্রত্যেকদিন কী একই নিয়মে চলতে হবে? আজ তোমাকে একটু আদর-টাদর করবো।

হঠাৎ?

হঠাৎ মানে—বাবুলাল চমৎকার চাপা-হেসে উত্তর দিল, চার-চারটে ছেলের বাপ আমি। এরা কী সব হঠাৎ করে হয়েছে? কথাটা শেষ করে সে আর বেশি সময় নিল না। কুসুমকলিকে বিছানায় টেনে নিয়ে নিজের বুকের কাছে রেখে কম্বল চাপা দিতেই ও বলে উঠলো, দম বন্ধ হয়ে যাবে যে!

দম বন্ধ হবে না। নিঃশ্বাসটা এখন আরও ঘন ঘন পড়বে।

আজকে বুঝি রামকলির কাছে যাওনি!

তোমার কী মনে হয়?

আমার আর মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে—কুসুমকলি বিষণ্ণ এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে ম্লান সুরে বললো, এখন তুমি আমাকে সারা দিনে কতোটুকুই-বা মনে রাখো? আমার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে, মাঝে মধ্যে যেদিন একটু-আধটু খোঁজ-খবর করো আমি তাতেই কৃতার্থ। কারণ আমার তো আর কোথাও যাবার উপায় নেই। দু'মুঠো খেতে দিচ্ছো এটাই যথেষ্ট। আর...

আর কী?

সমাজে তোমার স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে মর্যাদা পাচ্ছি এটাই-বা কম কীসের!

কুসুম আজকে তুমি অনেক ভারী ভারী কথা বলছো। এ-সব আমার ভালো লাগে না। একটু সহজ হও। একটু আনন্দ করো। বাবুলাল কুসুমকলির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ওর শরীরে হাত বোলাতে এক সময় একটু আফসোসের সুরেই বলে ফেললো, সত্যি তোমার শরীর থেকে এখন খুব একটা আর উত্তাপ পাওয়া যায় না। চেহারাটা তোমার খুবই ভেঙে গেছে।

সেই জন্যই কী তোমার নজর বাইরের দিকে?

না, তা নয়। বাবুলালের অকপট স্বীকারক্তি, ওটা আমার নেশা, ধর্ম, স্বভাব যা-খুশি বলতে পারো। তোমার চেহরা টলটলে টানটান থাকলেও আমার দৃষ্টি এই চার দেওয়ালে আটকে থাকতো না। সে-সব অন্য প্রশ্ন। সেজন্য কী তোমার স্বাস্থ্যটা ভেঙে-চুরে গেলেও নজরে পড়বে না? নাকি দুঃখ করে আমি একটা কথাও বলতে পারবো না।

শিশুব টুঁ মারার মতোই বাবুলাল কুসুমকলির বুকে আধিপত্য বিস্তার করতে করতে সাম্রাজ্য জয়ের নেশায় মেতে উঠলো। ডান হাতটা এবারে নামিয়ে আনলো, কুসুমকলির পেটে। পেট থেকে নাভিকুন্ডে। এখানে এসেই বাবুলাল একটু হোচট খেলো। তুলতুলে সুগভীর একটা নাভির সুদৃশ্য কুঁয়ো তার চোখের সামনে মুহূর্তে একটা ছবি হয়ে ধরা দিল। কোথায় রামকলি আর কোথায় ওর দিদি কুসুমকলি! কুসুমের নাভির কোনও গভীরতাই নেই চিমসে পেটের সঙ্গে আরও চিমসে হয়ে কোনওরকমে একটা অস্তিত্ব শুধু বোঝা যাচ্ছে। এখানে হাজারবার হাত বোলালেও শরীরে বিন্দুমত্র কাঁপন ধরে না। তবুও কুসুম তার স্ত্রী। ওকে তো অস্বীকার করা যায় না। তারচেয়েও বড়ো কথা, কুসুম লক্ষ্মী মেয়ে। স্বামীর সব অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং মাঝেমধ্যে ওর ভেঙে পড়া শরীরকেও মর্যাদা দিতে হয়। রাজনীতি বাবুলালকে একটা জিনিস শিখিয়েছে, কাউকেই খুব বেশি বঞ্চিত করে চূড়ান্ত ক্ষোভের মধ্যে রাখতে নেই।

বাবুলাল নতুন করে কুসুমকলিকে আদর করতে করতে বললো, এবার থেকে শরীরের যত্ন নিয়ো। খাওয়া-দাওয়ার তো অভাব নেই। তাহলে কেন শ্রী ফিরবে না? তুমি কিন্তু সত্যি সত্যি এরপর থেকে দেহচর্চা করবে—

এই বুড়ো বয়সে? তার আর কী দরকার?

দরকার আছে।

তোমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

আমাকে অতোটা স্বার্থপর ভেবো না। আমি এখন শুধু তোমার, তোমার কথাই ভাবছি।

ভেবে আর কী লাভ? কুসুমকলি উদাস সুরে হেসে হেসে বললো, এই দেহটাকে তুমি যতো-না ভালোবেসেছো তারচেয়ে অনেক বেশি অত্যাচার করেছো। বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না-দিয়ে পরপর নিয়ে

এলে চিন্টু, লগন, কানহাইয়া আর ভরতকে। শরীরের আর কী থাকবে বলো? এরপর আবার যখন নেশাভাঙ্গ করে আসো তখন তো রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে দাও। সকলে যে-সব সহ্য করতে পারে না। আর

আবার আর? বলো শুনি—

এর সঙ্গে বুঝি মনের কষ্টটা লুকিয়ে নেই? কুসুমকলি নিরীহ সুরেই বললো, আমাকে ভুলতে বসেছো ঠিক আছে। কিন্তু ছেলেদের খোঁজ-খবর কতোটুকু রাখো? ওদের ভবিষ্যৎটা দেখবে না? আমার তো মনে হয় ভরতটা কোন ক্লাসে পড়ে সেটাও তুমি ঠিক জানো না।

কেন, ওদের তো সবার জন্যই মাষ্টার-টাষ্টার রেখে দিয়েছি!

তাহলেই তোমার কর্তব্য শেষ? বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে স্বামীকে দেখতে দেখতে কুসুমকলির ভেতরটা যেন হাহাকার করে উঠলো। গম বজরার ক্ষেতে ঝোড়ো বাতাস যে-ভাবে দাপাদাপি করে বেড়ায় সেই রকমেরই এক তান্ডব এখন তার বুক জুড়ে। মানুষটাকে এ-সব কথা বলা বৃথা। তবুও দীর্ঘদিন পর নিরুচ্চার ভঙ্গিতে সে অনেক কথাই বলে ফেললো। কুসুমকলি ওর আগের প্রশ্নেই আবার ফিরে গেল। তীব্র অভিযোগের সুরে বলার ক্ষমতা এবং স্পর্দ্ধা তার নেই। সুতরাং ঠান্ডা গলাতেই জিজ্ঞেস করলো, ভরত কোন ক্লাসে পড়ে বললে না তো?

থ্রি-ফোর হবে!

আমি জানতাম তুমি পারবে না।

একটু আনন্দ করার মুহূর্তে তোমার এমন কঠিন ইন্টারভিউর মুখোমুখি হতে হবে—এটা কী করে জানবো বলো? বাবুলাল বিস্তৃত এক হাসির ঢেউ ভেঙে বললো, পরীক্ষায় তো ফেল করলাম, শেষ কাজটুকু করতে দেবে?

কুসুমকলি শূন্য এক দৃষ্টিতে বাবুলালের চোখে চোখ রেখে খুব নিস্তেজ সুরে উত্তর দিল, তোমরা কখনওই ফেল করো না। এবং কোনও কাজে কারো অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। তোমরা সব সময়েই পাস।

পূর্ব-মধুবনীর হলুদ তালাও হলো হরিজন মহল্লা। ওখানকার বাসিন্দা ভজনরামের মেয়ের আজ বিয়ে। কথায় কথায় খুশির একমুহূর্তে ভজনরাম যখন ওর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বলে ফেললেন যে, একজন মাননীয় বিধায়ক মহেশপ্রসাদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাদের বাড়িতে আসবেন তখন উপস্থিত একজন বেশ অবাক হয়েই বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিস্ময়ে ঘোর-লাগা মানুষটির নাম নরোত্তম। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের বাসিন্দা। ভজনরামের ঘনিষ্ঠ কুটুম। সেই কারণেই অতো দূর থেকে ছুটে আসা। সে যাই হোক মধ্য বয়সী নরোত্তম কিন্তু পরিষ্কার বলে ফেললো, ভজনচাচা তুমি কী সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করো এম.এল.এ সাহেব আমাদের এই বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হবেন?

না-হওয়ার কী আছে? ভজনরাম ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, ওই সন্দেহটা কেন এবং কীসের জন্য দানা বাধছে? তিনি তাই ফ্যালফ্যাল করে উত্তরপ্রদেশের আত্মীয়টির দিকে চেয়েই রইলেন।

ভোট পাওয়ার সময় ছাড়া নেতারা আর কখনও আমাদের বাড়িতে পা রাখেন না। নরোত্তম এবারে আরও খোলাখুলি বললো, আমরা হলাম হরিজন—অন্য সময়ে আমাদের কাছে এলে ওদের জাত চলে যাবে! আর এ-কথা কে অস্বীকার করবে, জাত-পাত নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব, সমস্যা, সঙ্কীর্ণতা আমাদের এই উত্তরপ্রদেশ আর বিহারেই সবচেয়ে বেশি?

নরোত্তম তুমি যা যা বললে প্রতিটি কথাই ঠিক। কিন্তু মহেশপ্রসাদ অন্য মানুষ। নও জোয়ান ছোকরা। জাত-পাতের বীজটা ওঁর সারা শরীরে কোথাও শিকড় ফেলতে পারেনি। তুমি ওঁকে চেনো না—

তা হবে। তবে দু-একজন নজীর রাখার জন্য উদার সাজার খেলায় মাতলেও দূরত্বটা কী মন

থেকে মুছে ফেলতে পারে? উচ্চবর্ণেরা আমাদের ছায়া মাড়ালেও আর একবার স্নান করে নেয়। নরোত্তম আক্ষেপের সুরে আরও বললো, দেশ এক, আমরা এক—এ-সব হলো নেতাদের ভাষণ। যা-নিয়ে তাঁরা পরে নিজেদের মধ্যেই খুব হাসাহাসি করেন। একজন নেতাকেও দেখাতে পারবে, যিনি তোমাকে ভেতরের ঘরের আসনে বসাবেন? নিজেদের সুন্দর কাপে চা খাওয়াবেন?

আছেন একজন। মহেশপ্রসাদ।

উনি তাহলে সৃষ্টি ছাড়া মানুষ! নরোত্তম এবারে হেসে ফেললো। সামান্য কী একটু ভেবে নিয়ে পরে আবার বললো, এতো বড়ো একটা দেশে ব্যতিক্রম হিসেবে দু-একজন তো থাকতেই পারেন—তবে সেই সংখ্যাটা সারা দেশে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

রাত যখন দশটার কাছাকাছি হতে চললো তখনোই ভজনরাম একটু অন্য রকম ভাবতে শুরু করলেন। আসলে তিনি কিছুই ভাবতেন না কিন্তু নরোত্তমই তাঁকে ভাবার কিছু সূত্র দিয়ে দিয়েছে। যদিও তিনি জানেন, মহেশপ্রসাদের আজ দু-দুটো মিটিং আছে। তাও কাছাকাছি অঞ্চলে নয়। একটা মজঃফরপুর এবং অপরটি পুশাতে। সুতরাং সেখান থেকে মিটিং সেরে বিয়ে-বাড়িতে রাত হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু অভিমানের সময় মন বড়ো দুর্বল হয়ে যায়। মহেশপ্রসাদের ওপর প্রগাঢ় এক শ্রদ্ধা ভালোবাসায় আপ্লুত থাকার ফলে এবং নরোত্তমের ক্রমাগত বিপরীত ছবিটা আঁকার কারণেই ভজনরাম অদ্ভুত এক অভিমানে গুম হয়ে রইলেন। আর দশটা পনেরো নাগাদ মহেশপ্রসাদ যখন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো বিয়ে-বাড়িতে ভজন রামের চোখ দুটো তখন কী এক প্রাপ্তির টানে চিকচিক করে উঠলো। বুজে আসা গলায় কোনওরকমে বললেন, আপ আয়ে হ্যায়?

আপ ক্যায়া সমঝা নেহি আউঙ্গা—মহেশপ্রসাদ ঝকঝকে এক হাসি ছড়িয়ে বললো, আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, না এসে পারি? মজঃফরপুর আর পুশায় মিটিং দুটো না-থাকলে তো সেই সন্ধ্যার সময়েই চলে আসতে পারতাম। এখন আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, আগে চলুন আপনার মেয়ে-জামাইয়ের কাছে যাই। আর দু'জায়গায় ভাষণ দিয়ে খিদেটাও বেশ পেয়েছে—মনে হচ্ছে আপনাদের সব খাবার-দাবার আমি একাই শেষ করে দেবো। কথাটা বলেই মহেশপ্রসাদ ভোজন বিলাসী এক বালকের মতো নিষ্পাপ হেসে ভজনরামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর উত্তরপ্রদেশের সরকারি দপ্তরের পিওন নরোত্তম শুধু মহেশপ্রসাদকে দেখতে দেখতে ঘুরে ফিরে একটা কথা নিয়েই মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, ওই ছেলেটা যেন সত্যিই ভুল করে রাজনীতির সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

নিমন্ত্রণ খেয়ে মহেশপ্রসাদ যখন নিজেদের বাড়িতে ফিরলো রাত তখন এগারটা কুড়ি-পঁচিশ হবে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো অতো রাতেও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সেই বিকেল থেকে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন।

মহেশ প্রসাদের বাড়িটা পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের। ওপরে টালির ছাদ। সামনের এক ফালি বারান্দা পেরিয়ে প্রথম যে-ঘরটা সেটা বসার এবং মহেশের শোবার ঘরও বটে। ঘরের বাঁ দিকে একটা সিঙ্গল চকি অর্থাৎ চারপাই। লেখাপড়া করার জন্য একটা টেবিল। টেবিল জুড়ে রাজ্যের বইপত্র, খাতা, ডায়েরী, কলম ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আর এক পাশে বেতের গোটা তিনেক চেয়ার এবং দুটো টায়ারের মোড়া। ঘরের মধ্যে পা রেখেই মহেশপ্রসাদ দেখতে পেল বাবা সারদাপ্রসাদ অপরিচিত এক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছেন। সে প্রথমে বাবার বন্ধুই ভেবেছিল। কিন্তু সারদাপ্রসাদ যখন বললেন, ইনি তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য বিকেল পাঁচটা থেকেই বসে আছেন তখন একটু অবাক না-হয়ে পারেনি। তার ওপরে আবার মানুষটাকে এর আগে কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না। মহেশপ্রসাদ একটা চেয়ারে বসে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বলুন তো?

বৃদ্ধের নাম ত্রিলোকধারি। সংক্ষেপে তিনি যা-বললেন তা এই রকম ঃ তাঁদের বাড়ি পূর্ব-মধুবনীর একবারে ভেতরের এক মহল্লা রামনগরে। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাঁর বড়ো ছেলেটা

মারা গেছে তেরো বছর হতে চললো। সেই ছেলেরই মেয়ে হলো পার্বতী। ত্রিলোকধারি তাঁর নাতনির বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করেই ফেলেছেন। কিন্তু ছেলের বাবা গঙ্গাধরকে তিন হাজার টাকা পণ না-দিলেই নয়। এখন ত্রিলোকধারির বক্তব্য হলো, নগদ ওই তিন হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এবং না-দিতে পারলে পলকা বাসনের মতোই তাঁর আদরের নাতনির সম্বন্ধটা ভেঙে যাবে। এই অবস্থায় ছুটে আসার কারণ হলো, গঙ্গাধর মহেশপ্রসাদকেই নেতা হিসেবে একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সুতরাং মহেশপ্রসাদ যদি অনুগ্রহ করে গঙ্গাধরকে বুঝিয়ে পিতৃহারা মেয়েটির একটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে তিনি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সব শোনার পর মহেশপ্রসাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো। বিকেল থেকে এই বৃদ্ধ মানুষটা তারই অপেক্ষায় থেকেছেন এতো রাত পর্যন্ত—এই একটা ঘটনাই তাঁর ভেতরের সমস্ত দুর্ভাবনা, অস্থিরতা প্রকট ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। ত্রিলোকধারি যে মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে এবং হতাশার মধ্যে ডুবে রয়েছেন সেটা অনুভব করেই মহেশপ্রসাদ একবার ওঁর মুখের দিকে তাকালো। তারা যতোই লেকচার ভাষণ আর আইন-কানুনের শাসন দেখিয়ে মানুষকে বোঝাক না কেন, পণ প্রথা যেন নির্মূল হবার নয়। সামাজিক এই ব্যাধিটা এখন ওপরে ওপরে দেখা না-গেলেও ফল্গুধারার মতো ঠিকই বয়ে চলেছে। অথচ ওই অন্যায় খেলাটা সত্যিই বন্ধ হওয়া দরকার। এটা এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। সব লোকেই এটা বোঝে কিন্তু কেউই পাওয়ার লোভটা ছাড়তে রাজি নয়। সেই কারণেই একটু গোপন গোপন ভাব বজায় রেখেও পণ নিতে সকলেই আগ্রহী এবং দর কষাকষিতে সঙ্কোচের বিন্দুমাত্র কোনও চিহ্ন নেই। ওটা যেন পণপ্রথার একটা জমজমাট শেয়ার মার্কেট! লজ্জাশূন্য সেই চাহিদা পুরোপুরি বন্ধ করতে না-পারলেও দু-একটা ক্ষেত্রে আন্তরিক ভূমিকা নিয়ে, দৃঢ় এক পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যার জটটা খোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। মহেশপ্রসাদ অত্যন্ত শান্ত এবং নিচু গলায় বললো, অনুগ্রহ করে আপনি পরশু দিন একবার রাতের দিকে আসুন। ইতিমধ্যে গঙ্গাধরজির সঙ্গে সন্তর্পণে কিছু কথাবার্তা সেরে নিই—পণ ছাড়াই বিয়েটা যাতে হয় তার জন্য আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

মহেশপ্রসাদ ত্রিলোকধারিকে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। ত্রিলোকধারি অবশ্য ওর হাত দুটো ধরে আপ্লুত কণ্ঠে বলেছিলেন, থাক থাক বাবা তোমাকে আর কষ্ট করে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। তার উত্তরে মহেশপ্রসাদ সামান্য হেসে বলেছে, আপনারও তো কম কষ্ট হলো না। চলুন আর একটু পথ আপনাকে এগিয়ে দিই।

ঘরের মধ্যে তখন সারদাপ্রসাদ আর পদ্মাবতী নিজেদের ভেতরে একটা আলাপ-আলোচনা করছিলেন বটে কিন্তু সেটা যে নিছক ব্যক্তিগত ছিল না, তা বোঝা গেল মহেশপ্রসাদ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। পদ্মাবতী কোনওরকম ভূমিকা না-করে বলেই ফেললেন, মহেশ, তুই বাবা আর কিছু করতে পারিস-না-পারিস আমি তোকে কিছু বলতে যাবো না। কিন্তু এই বৃদ্ধ মানুষটার জন্য যা-হোক কিছু কর। সামান্য এক টুকরো জমি ছিল। সেটা বিক্রি করেই ত্রিলোকধারিজি তাঁর নাতনির বিয়ে দিচ্ছেন। তাতেও অবশ্য সবটা কুলোচ্ছে না। তার ওপর ওই নগদ তিন হাজার টাকার পণ কীভাবে দেবেন? বুড়ো মানুষটা একটা অসহায় শিশুর মতো তোর বাবা আর আমার কাছে বসে সারাক্ষণ কাঁদলেন। কী যে খারাপ লাগছে না—একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মানেই যেন দেউলিয়া হওয়া। আর এই যে তোরা পার্টি করছিস...

মায়ের শেষ কথাটা শুনে অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে মহেশপ্রসাদ নীরবে একটু হাসলো। পদ্মাবতী অমন ভাবেই অভিযোগ করেন। সামাজিক কোনও সমস্যা দেখা দিলে মায়ের শেষ কথাটা হলো, এই যে তোরা পার্টি করছিস, সরকার চালাচ্ছিস তাতে সাধারণ গরিব মানুষের কী উপকারটা হচ্ছে? মহেশপ্রসাদ পদ্মাবতীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। খুব আস্তে এক সময় বললো, আচ্ছা মা, পণ নেওয়ার ব্যাপারে তো সরকার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেয় না। বরং ওই প্রথা বিলোপের জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছে—তাহলে এটাকে জিইয়ে রাখছেন কারা? আসলে আমরা কেউই আমাদের স্বার্থের

যে-গন্ডি তার বাইরে এক পা'ও রাখতে রাজি নই। আমরা নিজেদেরটা চমৎকার ভাবে বুঝে নিই অথচ অপরকে উদার এবং মহান সাজার পরামর্শ দিই। কাজে এবং কর্মে এই যে ফারাক—এটা বেড়েই চলেছে। যার ফলে সামাজিক এই শোষণ, নিপীড়নের ক্ষতগুলো এখন অনেক বেশি দগদগে। সাধারণ মানুষ একটু বিবেক নিয়ে এগিয়ে এলেই দেখবে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এই দ্যাখো না—মহেশপ্রসাদ হঠাৎ থেমে পড়তেই পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিলেন, এই দ্যাখো না কী?

বছর তিনেক আগে মহিলা প্রগতি সমিতির মিটিংয়ে 'পণ দেবো না, পণ নেবো না' অঙ্গীকারে তুমিই প্রথম সই করলে। তোমার দেখাদেখি আরও অটজন মহিলা সই করলেন। ভালো কথা। কিন্তু এটা কী হুজুগে মাতার খেলা? লোকের সামনে বাহবা কুড়োবার ব্যাপার? তুমি কী জানো ওই আটজন মহিলাই তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে পণ যেমন দিয়েছেন তেমনি নিয়েছেনও প্রচুর পরিমানে। তাহলে ওই মিটিং, ওই সইয়ের মূল্য কী রইলো মা? আন্তরিকতা না-থাকলে চটকদারি পথে গেলে এমনই হবে। সেইজন্যই বলছি মা, সব মানুষেরর মধ্যে সবার আগে চাই একটু বিবেক। এই যে তুমি—তুমি পারবে তোমার ছেলের বিয়ের সময় পণ নিতে? পারবে না। কেন পারবে না মা? তোমার এই বুকের মধ্যে দারুণ একটা মন বাস করে। সেই মন তো কোনও সরকারি চেষ্টায় বা আদেশে তৈরি হয় না। নিজেই নিজেরটাকে গড়ে নিতে হয়।

খালি ভাষণ আর ভাষণ! পদ্মাবতী ছেলের মাথার চুলগুলোকে পরম স্নেহে নাড়িয়ে দিয়ে ঠাট্টা করলেন, বাড়িটা তোর ময়দান নয়। আমি অতো শুনতেও চাই না। ওই বুড়ো মানুষটার চোখে যেন আর জল না-দেখি—

আপ্রাণ চেষ্টা করবো মা।

বেঁচে থাক বাবা! দুঃখী মানুষের দুঃখ সর্বদা দূর করিস!

তোর মা ঠিকই বলেছে মহেশ। ত্রিলোকধারিজির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটা আসলে আমাদের চোখে বিষাদের ছবি হয়ে আটকে আছে। সারদাপ্রসাদ ধ্যান গম্ভীর গলায় বললেন, অবিশ্রান্ত কান্নার ছবিটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। সব কিছু কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। আসলে—আসলে কী জানিস, কোনও মানুষকে এমন ভেঙে পড়ে কাঁদতে আমি আগে কখনও দেখিনি।

কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি গঙ্গাধরজির কাছে যাবো। এনিয়ে তোমরা কোনও চিন্তা কোরো না বাবা—উনি রাজি হলে ভালো কথা, না-হলেও চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই। আমার সঙ্গে যে-সমস্ত ছেলেরা মেলামেশা করে তারা এখনও কেউ অতোটা হৃদয় শূন্য হয়ে যায়নি! সারদাপ্রসাদের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে মহেশপ্রসাদ হঠাৎ বলে উঠলো, আচ্ছা মা—

কী রে?

যদিও তোমার বিবেচনাকে উসকে দেবার কোনও প্রয়োজনই নেই তবুও সাধারণ এক কৌতূহলেই জিজ্ঞেস করছি, ত্রিলোকধারিজি এতোক্ষণ ছিলেন কিছু খেতে

হ্যাঁ রে হ্যাঁ—অদ্ভুত এক শান্ত গলায় পদ্মাবতী বলে উঠলেন, তোর বাবা দশটায় খেতে বসেন। তা ওই বৃদ্ধ মানুষটার সামনে থেকে ওঁকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি খেতে দিতে পারি? তাই দুজনকেই একই সঙ্গে খেতে দিয়েছি। কিন্তু ত্রিলোকধারিজি কী সহজে বসতে চান? থেমে থেমে ওই একটা কথাই শুধু বলে যাচ্ছেন, "এখন খাবো কী মা? আমার গলা দিয়ে কী খাবার নামবে"? তারপর বলতে গেলে ধমক-ধামক দিয়েই খেতে বসাতে হয়েছে।

সারদাপ্রসাদ প্রথমে স্ত্রী এবং পরে ছেলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে হাসলেন। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, রাত এখন কতো জানো? একটা বেজে সাত মিনিট হয়েছে। তোমরা কী আজকে না-ঘুমোবার সিদ্ধান্ত নিলে?

এতো রাত হয়েছে আগে বলবে তো—মহেশপ্রসাদ বেতের চেয়ারটা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

এক নিঃশ্বাসে বললো, মা আমি শুয়ে পড়লাম। মশারীটা টানিয়ে দিয়ে গুঁজে দিয়ো। ভোরবেলা ঘুম না-ভাঙলেও ডেকে দিয়ো—গঙ্গাধরজির কাছে যেতে হবে সেটা মাথায় রেখো কিন্তু। আর কী—আর কী যেন—ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। কৈলাশ নামে বছর বারোর একটা ছেলে আসবে। ওকে পঁচিশটা টাকা দেবে। পড়াশোনার ফাঁকে লজেন্স বিক্রি করে একটু দাঁড়াতে চায়। ছেলেটার মধ্যে অদ্ভুত একটা জেদ-তেজ আছে। দেখা যাক। এবারে কিন্তু শীতটা বাড়ছে তাই না মা? এই মাসের টাকা পেলে আর একটা কম্বল কেনা যায় কিনা দেখি!

বিছানায় শুয়ে মহেশপ্রসাদ চিন্তা করলো, অনেক দিন দিদির কাছে যাওয়া হয়নি। যদিও কাটিহারে প্রতি মাসে সে তিনশ করে টাকা দিদির নামে অবশ্যই পাঠিয়ে দেয় কিন্তু তাতেই কী সব কর্তব্য হয়ে যায়? ওদের দেখার জন্য বুঝি মন উতলা হয় না? বিশেষ করে তার যমজ ভাগ্নে লব আর কুশ যদিও এখন ক্লাস টেন-এ পড়ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা তার কাছে সেই ছোটটিই রয়ে গেছে। ভাগ্নে দুটোও একেবারে মামা অন্ত প্রাণ। মোটামুটি দু'মাস অন্তর মহেশপ্রসাদ কাটিহার যায়। এবারেই নিয়ম মতো যাওয়া হলো না। সময় গড়িয়েছে তিন মাস। দিদি তাই দুঃখ করে চিঠি লিখেছে, "তোর পাঠানো টাকাগুলো সময় মতোই পাচ্ছি শুধু তোকেই আর কাছে পাচ্ছি না।"

দিদির জন্যে অসীম এক দুঃখে বুকটা ভরে গেল। ছোটবেলায় দিদি তার এই ছোট ভাইটিকে বুক দিয়ে আগলে রাখতো। স্নান-খাইয়ে স্কুল পাঠানো, হাজারো ঝড়-ঝাপটা সামলে স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখা এবং প্রতিটি ব্যাপারে যত্ন নিতে দিদির ছিল এক অফুরন্ত মমতা। নিজের দিদি বলে নয়—এমন মেয়ে সত্যিই হয় না! কী চমৎকার ধৈর্য আর সংযম নিয়ে শত অভাবের মধ্যেও টলটলে এক হাসি নিয়ে সারাক্ষণ বাড়ির কাজকর্ম করতো! অথচ...অথচ সেই দিদির মুখে এখন হাসি প্রায় নেই বললেই চলে। দিদির স্বামী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন বছর চারেক হতে চললো। অবিনাশদা একটা সুগার-মিলে চাকরি করতেন বটে কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনওরকম সাহায্য করেনি। এবং একই সঙ্গে সামান্যতম আর্থিক দায়িত্বের বোঝা টানতে আগ্রহী ছিল না অবিনাশদার ভাইয়েরাও—যাদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে চাকরিটা পর্যন্ত করে দিয়েছেন। সেই অন্ধকার দিনে দিদি, অবিশানশদা আর দুই ভাগ্নের পাশে একান্ত হয়ে থেকে মহেশপ্রসাদ নিরুচ্চার ভঙ্গিতে বলেছিল, আমি তো আছি। এতো চিন্তার কী আছে?

দুঃখের দিনগুলো এবারে শেষ হবে। মধ্যে সামান্য আর কয়েকটা বছর। লব এবং কুশ লেখাপড়ায় দুজনেই ভালো। পাস-টাস করে বেরিয়ে একটা চাকরি পাওয়ার পর আজকের মতো হতাশা ও অবসাদের ছবিটা দিদি নিশ্চয়ই আঁকবে না। দিদির দুমড়ানো মনটা একটু সতেজ ও সজীব হলেই মহেশপ্রসাদের শান্তি। তার এই প্রচেষ্টা তো সেই হাসিটি দেখবার জন্যেই। দিদি সন্তুষ্ট হয়ে তার মাথায় পরম স্নেহে একখানা হাত রাখলেই মহেশপ্রসাদ সংসারের আরও যে-কোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু—কিন্তু সেই দিদিকেই সে প্রায় তিনমাস ধরে দেখে না। আসছে সপ্তাহের শেষে পাটনা যাবার আগে মহেশপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করলো, কাটিহারে একবার যেতেই হবে। নয়তো প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর মধ্যে প্রাণের গন্ধটা দিদি নাও পেতে পারে। ওর বুকে অভিমানটা জমতে দেওয়া ঠিক নয়।

শীতের সকাল হলেও গ্রামের মানুষরা কাজের টানে জেগে গেছে অনেক আগেই। শুরু হয়েছে প্রতি দিনের জীবনযাত্রার একই ছবি। প্রকৃতির কোলে তখনও এক নির্জনতার আলপনা আঁকা। যদিও গাছের ফাঁক-ফোকর থেকে পাখিরা তাদের সুমধুর গলায় সঙ্গীতের রেওয়াজ করে চলেছে! মাঠের ওপর কুয়াশার আবরণ—যেন বিশাল একটা সাদা চাদর কেউ টানিয়ে দিয়েছে। সাইকেল চালাতে চালাতে মহেশপ্রসাদ চারপাশেই চোখ বোলাচ্ছিল। ক্ষেতের কাজে লাঙ্গল-বলদ নিয়ে চাষীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। জেলেরা যথারীতি জাল ফেলেছে পুকুরে। মাছ কী উঠবে-না-উঠবে তারা

জানে না—তবে ভাগ্যের সঙ্গে সমানে লড়াই করে যাচ্ছে। ভাগ্যকে জয় করতে কে-না চায়? খেজুর গাছের মাথা থেকে রসের হাঁড়ি নামছে। সেখানে ছোটখাটো একটা জটলা। মেয়ে বউরা বাসন-কোসন নিয়ে পুকুর পাড়ে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে কথার ফুলঝুরি সেখানে। সবজির পাহাড় সাজিয়ে সারিবদ্ধ গরুর গাড়িগুলো টুংটাং ধ্বনির শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছে। পথ চলতি মানুষরা সাইকেল আরোহীটিকে প্রাতঃপ্রণাম জানালো। মহেশপ্রসাদ হেসে তাদেরকে প্রতি নমস্কার জানিয়ে এগোতে থাকে। একজন তো ওকে কিছুতেই ছাড়বে না। তার আকাঙ্ক্ষা এক গেলাস খেজুরের রস খেতেই হবে। অগত্যা মহেশপ্রসাদকে অনুরোধটা রাখতেই হলো।

ওই সাত সকালেই মহেশপ্রসাদকে নিজের বাড়ির উঠোনে দেখে গঙ্গাধরের চোখে-মুখে খুশির ছটা। এতো সৌভাগ্য তিনি যেন ভাবতেই পারছেন না। মাটির উঁচু বারান্দায় মহেশপ্রসাদকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে গঙ্গাধর তো বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে দেবতা দর্শন করাচ্ছেন। নিজের ঘরওয়ালিকে বললেন, বেশি দুধ দিয়ে চমৎকার করে বড়ো গেলাসের চা করো দেখি।

সাধারণ খোঁজ-খবর এবং কথাবার্তার পর মহেশপ্রসাদ স্পষ্ট এবং সোজাসুজিই বললো, গঙ্গাধরজি, এতো সকালে আপনার কাছে এসেছি কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। অনুরোধটা আমার। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই আপনার ওপর নির্ভর করছে।

আপ তো ইস গাঁও কা দেওতা হ্যায় আপ কো বাত কৌন নেহি মানে গা?

ব্যাপারটা তা নয়। মহেশপ্রসাদ তার স্বভাবসুলভ স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, আপনার ছেলের সঙ্গে তো ত্রিলোকধারিজির নাতনির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ত্রিলোকধারিজির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। উনি গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এমনই যে উনি কোনও ক্রমেই আর তিন হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। ত্রিলোকধারিজি তাই লজ্জায় আপনার মুখোমুখিই হতে পারছেন না। এই অবস্থায় কী করা যেতে পারে সেই পরামর্শের জন্যে তাই এই ভোরে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি। তবে ত্রিলোকধারিজি সত্যিই অপারগ। যেটুকু জমি ছিল তা বিক্রি করেই নাতনির বিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাতেও কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। এখন উপায়টা কী হবে বলুন?

সব কথা শোনার পর গঙ্গাধর সামান্য একটু হাসলেন। সেই হাসিতে যে একটুও লজ্জা ছিল না তা নয়। তবে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে সত্যি কথাটাই বলে ফেললেন, হ্যাঁ ছেলের বিয়ে দিতে কন্যাপক্ষের কাছে আমি নগদ পণ তিন হাজার টাকাই চেয়েছিলাম। আসলে নিজেদের খরচটা যতোটা সম্ভব বাঁচানো যায় সেই উদ্দেশ্যেই আমরা নগদ পণের দাবিটা করি। তবে ত্রিলোকধারিজি যখন আপনার বিশেষ পরিচিত মানুষ—সেই হিসেবে আমার কাছেও আপনি একটা আশা নিয়েই এসেছেন তাই না? গঙ্গাধর পরিষ্কারই বললেন, আপনি যেখানে আমাদের মাঝখানে রয়েছেন সেখানে পণ নেওয়ার আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে এটাও ঠিক, অনুগ্রহ করে আমাকে মহানুভব ভাববেন না—আপনি না-এলে এই টাকাটা আমি নিতামই।

ভবিষ্যতে

না, ভবিষ্যতেও এনিয়ে কোনও অশান্তি হবে না। গঙ্গাধর শান্ত হেসে বললেন, আপনি আমদের সকলের জন্য, গ্রামের উন্নতির জন্য এতো করেছেন, আপনার একটা উপকারে আমিও এগিয়ে এলাম—এই তৃপ্তিটুকুই আমার কাছে অনেক। তবে অনুরোধ একটাই, মিটিং মিছিল, ভাষণ যেখানে যাই থাকুক-না কেন, আপনি কিন্তু সেদিন বরপক্ষের কর্তা হয়ে বিয়ে বাড়িতে যাবেন!

নিশ্চয়ই যাবো। মহেশপ্রসাদ গঙ্গাধরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে আরও একবার বললো, নিশ্চয়ই যাবো।

এখন দুপুর।

জিপ ছুটিয়ে দ্বারভাঙ্গা থেকে পশ্চিম-মধুবনীতে ফিরছিল রামপেয়ারে। একাই। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ দেখে গাড়ি থামাতেই হলো। রামপেয়ারে রেল লাইনের দু'দিকেই চোখ বোলালো। কিন্তু

ট্রেনের কোনও সাড়াশব্দ নেই। কতোক্ষণ এভাবে আটকে থাকতে হবে কে জানে?

রামপেয়ারে একটু উসখুস করতে করতে ঘন্টি ঘরের দিকে তাকিয়ে গলা ছাড়লো, আবে অ্যাই ধনিকলাল, মর গয়ে ক্যায়া? শালে কাঁহা হ্যায় তুমহরা ট্রেন—সমস্তিপুর থেকে ছেড়েছে কিনা সন্দেহ, আর ঘন্টা দুই আগে থেকেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে ঢং ঢং শুরু করে দিলি? একি শালা গরুর গলার ঘন্টা চললেই বাজতে থাকবে!

ধনিকলাল একটা সেলাম জানিয়ে হাসতে হাসতে শুধু বললো, জি সরকার, আউর তিন মিনিট। গাড্ডি আ রহা হ্যায়।

রামপেয়ারে রাস্তার ওপরে চোখ রেখে চলমান জনস্রোত দেখতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল একটা হলুদ শাড়ির ওপর। মেয়েটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেহাতি শরীরে সদ্য যৌবনের পসরা। আঁটো-সাটো সেই প্রতিমাকে দেখতে দেখতে রামপেয়ারের খেয়াল হলো, ওর পাশে যে-দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটাই গোলকপতি। নাহ্, গোলকপতি নামের মহাশয়টিকে আর ম্যাদামারা গান্ডুরাম ইত্যাদি বলা যাবে না। তার সম্মানের পাসপোর্ট তার ওই জওয়ানি মেয়েটিই।

জিপে বসেই রামপেয়ারে নরম গলায় সুতো ছাড়লো, গোলকপতিজি, যাবেন কোথায়?

গোলকপতি নামের মানুষটা ওই ডাক শুনে খুশি হলেন। দু'পা এগিয়ে এসে একগাল হেসে উত্তর দিলেন, বাড়িতেই ফিরবো।

উঠে পড়ুন গাড়িতে।

সঙ্গে আমার মেয়ে রয়েছে—

মেয়েকে ফেলে আপনাকে কী একা গাড়িতে উঠতে বলেছি? রামপেয়ারে হেসে বললো, নিশ্চয়ই দুজনে উঠবেন।

গোলকপতি মেয়েকে নিয়ে জিপের পেছনে বসতে যাচ্ছিলেন। রামপেয়ারে আরও নরম সুরে আহ্বান জানালো, সামনে আসুন।

ইতিমধ্যে হুড়মুড় করে একটা ট্রেন চারপাশ কাঁপিয়ে চলে যেতেই লেভেল ক্রসিংয়ের নিষেধাজ্ঞার দরজাটা খুলে গেল। ধনিকলাল কপালে হাত ঠেকিয়ে মাননীয় বিধায়কের আরও মাননীয় দক্ষিণ হস্তটিকে নমস্কার জানিয়ে হাসির পায়রা ওড়ালো, যাঁইয়ে সরকার।

জিপ তখন একটু গতি নিয়েছে। এদিকটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। রাস্তার দু'পাশে একটু ঢাল হয়েই সমতল বিস্তৃত জমিতে টমেটোর চাষ। সূর্য ওঠার লাল টকটকে রং নিয়ে টমেটোগুলো সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। দূরে তালগাছের সারি। মাঝে মধ্যে খাপরার চালের দু-একটা ঘর-বাড়ি।

রামপেয়ারের জিপে গোলকপতি। ব্যাপারটা বেশ গর্বের। গর্বের সেই দৃষ্টি নিয়েই গোলকপতি মেয়ের দিকে তাকালেন। ভাবখানা, বাড়িতে তো এক কাপ চা চাইলে ঠায় দু'ঘন্টা বসিয়ে রাখিস আর বাইরে আমার সম্মানটা দ্যাখ। গোলকপতি মেয়েকে ইশারায় প্রণাম করার ইঙ্গিতটুকু করে জিপের চালকের উদ্দেশে বললেন, রামপেয়ারেজি, এ-আমার মেয়ে পঞ্চমা।

পঞ্চমা হাত জোড় করে বললো, নমস্তে।

নমস্তে। পাশে বসা পঞ্চমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই রামপেয়ারে মনে মনে বলে উঠলো, তোমার শরীরের লকারে যৌবনের রত্নগুলো তো বেশ গুছিয়েই রেখেছো। যাকে-তাকে আবার বিলিয়ে দিয়ো না। ন্যায্য দামে বিকিয়ো।

পঞ্চমাকে যদি একটা চাকরি...গোলকপতি নিস্তেজ সুরে বলে উঠলেন, বাবুলালজি অবশ্য মাস দুই বাদে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমার অবস্থা তো আপনি সবই জানেন। একদিন খেলে দু'দিন উপোস দিচ্ছি। এই ভাবে আর পারছি না।

তুমি কতো দূর পড়াশোনা করেছো? ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া রামপেয়ারে বিধায়কের ডান হাত হয়ে বিজ্ঞের মতো এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলো যেন এই দুনিয়াটা শুধু লেখাপড়া জানা লোকেদেরই জন্য

চার কেলাস পড়েছি।

উদ্দাম দেহের ঝলকানিতে তুমি অবশ্য এম.এ পাস। কিন্তু ও-সব কথা তো ওই বুড়ো শকুনটার সামনে বলা চলে না। শত হলেও পঞ্চমার বাবা। রামপেয়ারে গম্ভীর মুখ করে বললো, আসলে যুগটাই এখন পড়ালিখা আদমীদের। আমাদের বাবুলালজি নিজে বি.এ পাশ। লেখাপড়া দারুণ ভালোবাসেন। ফলে ওই সব বি.এ., এম.এ ছেলে-ছোকরাদের ছাড়া অন্য কাউকে খুব একটা চাকরিই দিতে চান না। যাক গিয়ে সে-সব কথা, দেখি বাবুলালজিকে তোমার কথা বলে। যদি কোথাও একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন।

আপনি দয়া করে আমার এই...

না-না, দয়া-টয়ার প্রশ্ন নয়—পঞ্চমাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে রামপেয়ারে বলে উঠলো, আমি তো তোমাকে বললামই, আসলে বাবুলালজিই সব। আর...রামপেয়ারে বেশ কঠিন মুখ করে গোলকপতির দিকে একবার তাকালো। পর মুহূর্তেই রাস্তার ওপর চোখ রেখে আরও গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, তবে আপনার ওই ছেলের চাকরি হওয়া বেশ মুশকিলের ব্যাপার কিন্তু। ওই ছোকরা পিপে পিপে চুল্লু খায়। শুধু ও কেন, আপনার সব ছেলেরাই গলা ভেজাতে বহুত ভালোবাসে। অসুবিধেটা কোথায় জানেন, বাবুলালজি আবার এ-সব বেলেল্লাপনা বিলকুল পছন্দ করে না। যুবশক্তির অপচয় দেখলে তাঁর মাথা ভীষণ গরম হয়ে যায়।

এই জন্যই তো পঞ্চমার জন্য...গোলকপতি অসহায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অনুনয়ের সুরে আবার বললেন, আপনি যদি দেখেন—

দেখবো। নিশ্চয়ই দেখবো। রামপেয়ারে বেশ একটা নির্মল হাসি ছড়িয়ে আর একবার পঞ্চমার শরীরে চোখ বোলালো। তারপরেই ছোট্ট গলায় বলে ফেললো, এই দুনিয়াটাই তো দেখাদেখির। বাবুলালজি তোমাকে দেখবে, তুমি দেখবে বাবুলালজিকে এটাই তো নিয়ম।

ভোটের সময় তো আমরা বাবুলালজিকে দেখিই। গোলকপতি অত্যন্ত সরল ভাবে বলে উঠলেন, ওই মানুষটা ছাড়া ভোটটা দেবো আর কাকে?

রামপেয়ারের জিপ ছুটে চলেছে বাবুলালের বাড়ির দিকে। একটু আগে সরাইখানার মোড়ে ওদেরকে নামিয়ে দিয়েছে। জিপ থেকে নেমে গলিতে ঢোকার মুহূর্তেও পঞ্চমা আরও একবার নমস্তে জানিয়েছে। রামপেয়ারের ভাবনা-চিন্তা অন্যরকম। বারবার ও-সব নমস্তে-টমস্তের প্রয়োজন কী? তার হিসেবও সোজাসুজি। তোমার বেশ ভালো একখানা গতর আছে। সেই গতরের জেল্লাও আছে। লড়াইতে তৃপ্তি পেতে হলে এমনটাই চাই। তুমি শরীর দেবে, আমরা চাকরি দেবো। এরমধ্যে ওই বুজরুকি দেখানো ফালতু প্রণাম-ট্রনামের কোনও স্থান নেই।

আপন মনেই হেসে উঠলো রামপেয়ারে। গোলকপতি নামের ওই উল্লুকটা একটা বেদো ঢ্যামনা। ও-শালার কোনও রসকষ নেই। একেবারেই গাড়োল। এতো মাথা মোটা লোকগুলোকে নিয়ে চলাই মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। এই বাজারে একটা চাকরি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ সেই কঠিন কাজটাই দারুণ সহজ হয়ে যাবে সায়ার-দড়িটা একটু হালকা দিলেই। রামপেয়ারে বেশ ভদ্রভাবে পঞ্চমাকে সে সব বোঝাতে শুধু বাবুলালজিকে একটু দেখভালের উল্লেখ করেছে। আর ওই গাড়ুশ্বর গোলকপতি বলে কিনা, আমরা তো বাবুলালজিকেই ভোট দিই। শালা একটা আস্ত বেয়াকুফ। কোন কথার কী মানে হয় সেটাই বোঝে না। অথচ মেয়েকে নিয়ে পথে নেমেছে। সম্ভবত কেউ মেরে গেলেও ওই ঠুলি পড়া লোকটা কিছুই বুঝতে পারবে না।

দুপুরের খাওয়া সারছিল বাবুলাল। চাপাটি, ভাজাভুজি, ডাল, দু'রকমের সবজি, পাপ্পড়, দই, তিন-চার রকমের মিঠাই। অর্থাৎ টেবিলটা বেশ সাজানোই। বাবুলাল বেশ চিন্তিত মুখেই ফেলে ছড়িয়ে খেতে খেতে এক সময় বলে উঠলো, কুসুম ও-সব মিঠাই-ফেঠাই সরিয়ে নাও। আজ আমার

খিদে নেই।

কুসুম কথার বাতাবরনের মধ্যে ঢুকলো না। মিঠাইয়ের প্লেটগুলো নিঃশব্দে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

দোস্ত, দোস্ত—বলে চিৎকার করে দুমদাম সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠে রামপেয়ারে একেবারে বাবুলালের খাওয়ার টেবিলে পৌছে গেল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঝপ করে বসে পড়লো। কিছু একটা বলতে যাবার মুখেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কুসুম বড়ো ঘরে যাবার পথে রামপেয়ারের মুখের দিকে তির্যক ভাবে একঝলক তাকালো মাত্র।

কুসুমকে আজ বেশ গম্ভীর গম্ভীর দেখাচ্ছে। গুরুর সঙ্গে মারকাটারি চেল্লাচেল্লি কিছু হয়েছে নাকি? হয়তো ও-সব কিছুই নয়। কুসুম তো সারাক্ষণই ওই এক মুখ করে থাকে। কিন্তু তাকে তো সন্তুষ্ট করতে হবে। রামপেয়ারে হাসি মুখে বললো, নমস্তে ভাবিজি।

নমস্তে। কুসুম দাঁড়ালো না। বড়ো ঘরের দিকে পা বাড়ালো। তবে ওরই মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী খাবে না খেয়ে এসেছো?

আমি সকাল থেকে কোনও দানাপানিই মুখে দিইনি।

তবে আর কি—এখন বাবুলালের ভাঁড়ার ঘর সাফ করে দাও।

বাবুলাল হুঙ্কার ছেড়ে বললো, পেয়ারে আজ তোকে আমি গুলি করে মারবো। যা—আলমারী থেকে আমার রিভলভারটা নিয়ে আয়। তোরা একটা ছেলেকে এখনও পর্যন্ত আমার সামনেই আনতে পারলি না—আমি যে কী পড়েশন, কী ঝামেলার মধ্যে রয়েছি তা কী তুই একবারও বুঝতে পারছিস না? আমি তাহলে কার ওপরে বিশ্বাস করে থাকবো? আর মহেশপ্রসাদ মন্ত্রি হলে আমি তো মরবোই কিন্তু তুই বাঁচবি? রিভলভারটা নিয়ে আয়।

ইতিমধ্যে কুসুম চাপাটি, সবজি, মিঠাইয়ের থালি সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই থালায় হাত না-লাগিয়ে রামপেয়ারে নিতান্তই এক বাধ্য বালকের মতো উঠে গিয়ে মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই রিভলভারটা নিয়ে ফিরে এলো। খাওয়ার টেবিলের ওপর সেটা রেখে দিয়ে স্থির গলায় বললো, নাও মেরে ফেলো।

আগে খেয়ে নে—

কী লাভ ও-সব ভালো মন্দ খেয়ে? খেয়েই তো মরতে হবে—নাও, নাও তাড়াতাড়ি গুলি করে মেরে ফেলো। আমার আবার বাড়ি ফেরার তাড়া আছে।

গুলি খেয়ে বাড়ি ফিরবি বলিস কী রে? বাবুলাল প্রিয় বন্ধুর কাঁধে বাঁ হাতটা রেখে দারুণ মজায় হেসে উঠলো। উত্তাল ভঙ্গিতে হেসে সারা ঘরখানাকে ভরিয়ে দিল রামপেয়ারেও।

হাসির ঝড় থামলে বাবুলাল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুরে বললো, পেয়ারে, এই যে আমি হাসছি, খাচ্ছি, ও-সব স্ফূর্তির কাজকর্মও করছি কিন্তু বিশ্বাস কর, কোনও কিছুতেই মনটাকে ঠিক গুছিয়ে বসাতে পারছি না। সব কিছুই কেমন বিস্বাদ, এলোমেলো লাগছে। তারপরেই সে গর্জে উঠলো, ওই উজবুকটাকে পেলে আমি ওর খাটিয়া খাড়া করে দেবো। শালে উসি বহিন কো—

দোস্ত, আমি নিজে দু'বেলা রামগরিবের বাড়িতে যাচ্ছি। কিন্তু ওই হারামীর বাচ্চাটাকে না-পেলে কী করবো? ওর একটা ভাই থাকলে সে ব্যাটাকে দুরমুজ করে দিতাম। বোন বা দিদি থাকলে তার তলপেটে ব্যথা তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু রামগরিবের বুড়ি মাকে নিয়ে কী করবো? রামপেয়ারে আরও সহজ করে বললো, ছেলের ব্যাপারে আমার মনে হয়, ও-বুড়ি সত্যিই কিছু জানে না। আমাকে তাই এখন দেখলেই কেমন যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে। রামের বাণ সহ্য হয় কিন্তু হনুমানের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয় না। অথচ তোমার জন্য আমাকে ফুটো-ফাটা লোকদেরও লাল চোখ দেখতে হচ্ছে।

তুই ওই বুড়ির পাশে শুয়ে পড় একদিন।

ফালতু কথা ছাড়ো তো—

ফালতু কথা না রে। বাবুলাল হাসতে হাসতে বললো, দেখবি, বুড়ির খিঁচুনি-টিচুনি সব বন্ধ হয়ে গেছে। আর রামগরিব কোথায় গেছে সেটাও কেমন গল্‌গল্‌ করে

গুরু তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে।

বলে ফ্যাল।

রামপেয়াবে আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু সুরে বললো, এখানে নয়। ভাবিজি চলে আসতে পারে।

তোর ভাবিজি এখন এ-তল্লাটে নেই। জরুরি কথাটা কী বল?

গুরু, এতো রাজনীতি করে এতো লোক চড়িয়েও আমরা আসল সময়ে সঠিক লোকটাকেই চিনতে পারলাম না। রামপেয়ারে ফিসফিস করে বললো, গোলকপতিকে আমাদের বেশ সমীহ করা উচিত।

গোলকপতি ধজারামটা আবার কে?

আরে সেদিন ছেলের চাকরির জন্য তোমার কাছে এক ন'সন্তানের খাইজ্বালা বুড়ো এসেছিল না—

ওহ সেই হাড় জিরজিরে লিঙ্গদেবটি!

ওকে আর হেলাফেলা কোরো না ওস্তাদ—গোলকপতিজি বস্তুত কিম্‌তি চিজ আছে। রামপেয়ারে এবারে আসল কথাটা বলে ফেললো, পঞ্চমা নামে ওর একটা দুর্দান্ত মেয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় এখনও কেউ ঠোকরাতে পারেনি। সারা শরীরে থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ উঠছে। যদি তুমি পঞ্চমার সতীত্বের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়ে জলকেলি করতে চাও ওকে একটা চাকরি দিতেই হবে।

বয়স কতো? বাবুলাল গোল গোল চোখে তাকায়।

ঠিকুজী-কোষ্ঠী দেখিনি। তবে আঠারোর ওপারে একটা দিনও নয়। আর শরীরের মাপজোক মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

বলিস কী রে? বাবুলাল চাপা গলায় বললো, আমারই মহল্লায় এমন একজন দেবীয়া আর আমিই জানতাম না। নাকি তোরা কাজকর্ম সেরে নিয়ম রক্ষা করতে এলি, বাবুলালটাকে তো একবার জানানো দরকার।

রামকসম দোস্ত। দুই কানের লতি ধরে রামপেয়ারে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আর যাইহোক রামপেয়ারে বেইমান-গদ্দার নয়। পঞ্চমাকে আজকেই প্রথম দেখলাম। আর প্রথম দর্শনের পরেই সেই বিজলীময়ী ছিল আমারই পাশে। ওর কোমরের কষি আলগা করতে আমার লাগতো স্রিফ দো মিনিট গুরু। লেকিন—রামপেয়ারে আগে গুরু সেবা না-করে...

জানি পেয়ারে জানি।

তুমি জানো?

জানি বলেই তো তোর স্থান আমার বাড়ির অন্দরমহলে। আর আমার এই হৃদয়ে—নিজের প্রশস্ত বুকে আঙুলের টোকা দিয়ে বাবুলাল বলে উঠলো, কিন্তু পেয়ারে তুই যা সেই ফিল্মীর মালমশলার গরম বিবরণ দিলি, তাতে মেয়েটাকে জবরদস্ত কিছু করতে চাই না। ও-সব সুন্দরীদের একটু না-খেলিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দেওয়া খুব বাজে ব্যাপার। বাগে না-এলে অবশ্য সেটাই করতে হবে! কিন্তু তুই কী যেন বললি—ওর একটা চাকরির দরকার। সেটা দেওয়া যাবে। তবে—বাবুলাল থেমে পড়লো।

তবে কী?

সবার আগে পেয়ারে তুই ওই শুয়ারের বাচ্চা রামগরিবটাকে আমার সামনে এনে দে। আমার নিদ্‌, খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় উঠেছে।

দোস্ত, আমিও তো শান্তিতে বসে নেই। রামপেয়ারে বেশ জোর দিয়ে বললো, যে-চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছি তাতে এটুকু বলতে পারি ওই ছুঁচোটা মধুবনী, দ্বারভাঙ্গা, পুশা, মজঃফরপুর, সমস্তিপুরের

এই গন্ডির মধ্যেই নেই। পুলিশ ছাড়া রামগরিবের খবর আমার আগে কেউ পেতে পারে না দোস্ত। ওই হারামীটার জন্য তুমি নিদ্ হারাম করো না। আমি তো আছিই।

রাজগীর, গয়া, বুদ্ধগয়া, বক্তিয়ারপুর প্রভৃতি স্থানে তিনদিনের সফরে লাক্সারি বাস নিয়ে আজ রাত দশটার মধ্যেই রওনা হওয়ার কথা। সেই মতো রামকলির হাতে গড়া নরম চাপাটি, সবজি, আচার আর অড়রহ্ ডালের যুষ খেয়ে বদ্রিনাথ ঠিক সময়েই উড়নির মোড়ে এসে হাজির হলো। তবে মনটা আজ একটু খিঁচিয়েই আছে। এমনিতে তো রামকলির ভোগদখল ওই বাবুলাল নামের শুয়ারের বাচ্চাটা নিয়েই বসে আছে। সামান্য একটু ট্যা-ফো করলে তাকে যে-কোনও মুহূর্তেই এই দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দিতে পারে। বিধায়ক সাহেবের সে-ক্ষমতা অবশ্যই আছে। তাকে স্পর্শ করার স্পর্দ্ধা বদ্রিনাথের নেই। সে তাই আপন মনে মাঝে মাঝেই বাবুলালকে খিস্তিখেউর করে। এবং সামনাসামনি যথারীতি রামভক্ত হনুমানের মতো বিনয় ও কৃতজ্ঞতা দেখাতে হয় তাই দেখায়। আসলে আজ তার রাগের কারণ আছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বদ্রিনাথ রামকলিকে নিয়ে একটু শুয়েছিল। দশটার মধ্যে উড়নির মোড়ে পৌঁছাতে হবে। হাতে তখনও এক ঘন্টার মতো সময়। তিনদিন বাড়িতে থাকবে না—বদ্রিনাথ তাই রামকলির শরীরের ঘ্রাণ নিতে ব্যস্ত ছিল। এই শরীরটার সর্বাঙ্গেই বাবুলালের স্পর্শ রয়েছে। বস্তুত তার চেয়েও ওই পশুটারই অধিকারের দাপটটা অনেক বেশি। তবুও রামকলির ওপর এক বিন্দুও রাগ বা অভিমান নেই বদ্রিনাথের। নেই এক টুকরো ঘৃণাও। আসলে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাবুলাল নামের ক্ষমতাধর অমানুষটার শিকার। সুতরাং রামকলিকে আদর করার সময় বদ্রিনাথ সব সময়েই সতেজ এবং টানটান থাকে। কোনওরকমের ঘুণ পোকাই তাকে কুরে কুরে খায় না। সে যখন আজ রামকলির সঙ্গে গভীর মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত ঠিক তখনই দরজায় ধাক্কা পড়লো। জিপ থামার শব্দ শুনেই বদ্রিনাথ মিইয়ে গেছিল। নিশ্চয়ই করিতকর্মা জননেতাটি এসেছেন। দরজায় সজোরে ধাক্কা উঠতেই বুঝতে পারলো, এতো সাহস বাবুলাল ছাড়া আর কারও নেই।

ঘরে ঢুকে বিধায়ক সাহেবের সে-কী রাগ! এই সন্ধ্যা রাতেই দরজায় খিল দিয়েছো? তোমার না রাজগীর, গয়া, যাওয়ার কথা—

হ্যাঁ, রাত দশটায় রওনা দিতে হবে।

দশটার আর বাকি কী? তাছাড়া, এখান থেকে উড়নি মোড়ে যেতেও তো দশ মিনিট লাগবে? সময় সম্পর্কে কেউ সচেতন নয় বলেই সারা দেশটার এই হাল। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নজন মানুষ তোমার আশায় বসে থাকবে আর তুমি খিল এঁটে কুৎসিত কাজে মেতে আছো। সময়কে দাম দিতো শেখো—সময়ই তোমাকে রাজা বানিয়ে দেবে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে। যাও—যাও, আর দেরি কোরো না।

উড়নির মোড়ে বদ্রিনাথ যথা সময়েই পৌঁছালো বটে কিন্তু চাপা এক অপমানে তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে। সে শুধু তার বৌকে একটু আদর করতে চেয়েছিল। আর পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেই স্বাধীনতাটুকুও আজ তার নেই। এরচেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। সে তো এমনিতেই নিরীহ এবং বাবুলালের সমস্ত অধিকারই মেনে নিয়েছে। তাহলে তার ন্যায্য দাবিটুকু এ-ভাবে নস্যাৎ করে দেওয়ার কী যুক্তি থাকতে পারে? রামকলির শরীরটা তাঁর চোখের ওপর ভাসছে। সমর্পণের ভঙ্গিতে সে নিজেকে তুলে ধরেছিল। আকাঙ্ক্ষার শিখরে ছিল বদ্রিনাথও। কোথা থেকে যে যমদূতের মতো বড়ো ভায়রাটি এসে উপস্থিত হলো—দিল সব কিছু ভেঙে চুরমার করে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে বদ্রিনাথ একবার ভাবলো, অশান্ত অতৃপ্ত মন নিয়ে বাস চালানোটা ঠিক হবে না। উজাগীর নামে তার আরও একজন ড্রাইভার আছে। দায়িত্বটা ওকে দিয়ে সে আবার

বাড়ি ফিরে যাবে কিনা সেটাই ভাবছিল। কিন্তু পঞ্চান্নজনের যাত্রী দলের যিনি নেতা সেই সোমেশ্বর চৌপাল এসে বললেন, বদ্রিনাথভাই এ-দিকে যে একটু বিপদ হয়ে গেল—

বিপদটা কীসের?

আমাদের মেম্বারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এসে পৌঁছায়নি। কাউকে ছেড়ে যাবার প্রশ্নই নেই। নিশ্চয়ই কোথাও আটকা পড়েছে। তা ওদের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের সামনে যে আর কোনও রাস্তা নেই। অন্তত আরও কিছুটা সময় পর্যন্ত তো...

সে তো দেখাই উচিত। সোমেশ্বর চৌপালদের বিপদের কথাটা শুনে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো বদ্রিনাথ। সে উদার কণ্ঠে বললো, আরও দেড়, দু'ঘন্টা একটু দেখুন না—কিন্তু তার বেশি হলে মুশকিল। ও-দিকে আবার সময় নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

না-না এরমধ্যে সবাই এসে যাবে! তুমি বাঁচালে ভাই—

সোমেশ্বর চৌপালা অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, অন্যান্য ট্যুরের সময় আমরা দেখেছি বাসের মালিক বা ড্রাইভার আধঘন্টা সময়ও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না। সব সময়েই যেন হাতে স্টীয়ারিং নিয়ে শাসাচ্ছে। এবার থেকে তোমার গাড়ি ছাড়া আমরা অন্য কারো গাড়িতে যাবো না।

সেটা আপনাদের ইচ্ছে। বদ্রিনাথ হাসতে হাসতে বললো, আমি তাহলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসছি। আর এরমধ্যে যদি সকলে এসে পড়েন তাহলে...

সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের একজন গিয়ে তোমাকে ডেকে আনবে। তুমি এসো—

যতোটা উত্তাপ এবং আবেগ নিয়ে বদ্রিনাথ বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিল—বাড়ির কাছাকাছি এসে ততোটাই নিরাশ হয়ে শূন্য এক দৃষ্টিতে বাবুলালের জিপটাকে দেখতে লাগলো। এম.এল.এ সাহেব এখনও যাননি। না, সে ওই জিপ দেখেই পালিয়ে যাবে না। বাড়িতে ঢোকার তার অবাধ ইচ্ছাটুকুর ওপর নিশ্চয়ই কেউ করাত চালাতে পাবে না। আসলে সব কিছু হজম করার পরেও মাঝে মাঝে কেমন বিদ্রোহ করতে মন চায়! অথচ প্রতিপক্ষের শক্তির কথা চিন্তা করে বিবর্ণ হয়ে যেতে হয়। মেনে নেওয়াটাই জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাছাড়া উপায়ই-বা কী? কিন্তু আজকে সে এখান থেকে ফিরে যাবে না। বদ্রিনাথ জানে রামকলি এখন ক্লান্ত। ওর অবসন্ন দেহের সঙ্গে নতুন করে কোনও সন্ধি করাটা ঠিক নয়। তবুও সে ওই বাবুলালের সামনেই যথাসম্ভব অনুরাগের রং ছড়াবে। বাবুলালকে বুঝিয়ে দেবে সে যা করে তা অন্যায় ভাবে করে। চুরি করে অবৈধ ভাবে করে। কিন্তু বদ্রিনাথের রয়েছে নিবিড় এক স্বাধীনতা।

বারান্দায় উঠে বদ্রিনাথ একটু থমকে দাঁড়ালো। শোবার ঘরের দরজাটা পরিপাটি করে ভেজানো। ভেতর থেকে বন্ধ কিনা দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। সে সতর্ক ভাবে একটু ঠেলা দিয়ে বুঝলো, ভেতর থেকে খিল দেওয়া! অর্থাৎ আখ পিষে রস বের করার মতোই বাবুলাল এখন ওর উদ্ধত জাঁতাকলে রামকলিকে নিঙড়ে স্ফূর্তির ফেনায় ডুবে আছে। বদ্রিনাথ দরজায় ধাক্কা দিল।

কে? ভেতর থেকে বাবুলাল যেন বাঘের গলায় ডাক ছাড়লো।

দাদা আমি বদ্রিনাথ।

আবার ফিরে এলে কেন?

. আজ্ঞে বাস ছাড়তে এখনও ঘন্টা দুয়েক দেরি হবে। তাই বাড়ি চলে এলাম। ওইটুকু উচ্চারণ করতেও বদ্রিনাথের গলা কেঁপে উঠলো।

কিন্তু আমি যে দরজা খুলে দেবার মতো অবস্থায় নেই। লজ্জা অথবা অপরাধের বিন্দুমাত্র সুর পর্যন্ত বাবুলালের গলায় নেই। লোকটা যেন একটা পাষন্ড। নির্ভীক কণ্ঠে বলে ফেললো, আমি এখন পুজোয় বসে গেছি।

পুজো সারতে আপনার কতোক্ষণ লাগবে? মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই বদ্রিনাথ ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার ভেতর থেকে কথাটা কে বলছে তা সে নিজেই জানে না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ বলেছে। মানে কোনও বিদ্রোহী স্বত্বা। কিন্তু সেই বিক্ষুব্ধ মনটা কী জানে না এর পরিণতি

কোথায়? নিষ্ঠুর ভাবে মরতে তার ভীষণ ভয় হয়। বদ্রিনাথ প্রচন্ড এক আতঙ্কে সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট বিনয়ের সুরেই বললো, দরজা খোলার দরকার নেই দাদা—আমি বরং আপনার জিপে গিয়ে বসছি।

তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে—আমার জিপে বসে অপেক্ষা না-করে তুমি বরং তোমার লাক্সারি বাসে গিয়েই চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি আজ এখানেই থাকবো।

বিধায়ক মহাশয়ের কী চমৎকার যুক্তি! এরচেয়ে সহজ সমাধান আর কী হতে পারে? এমনি করেই কী উনি সব কিছু শাসন করবেন—বদ্রিনাথ আর ভাবতে পারে না। তাকে লাক্সারি বাসের মধ্যে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে বাবুলালজি এখন দুরন্ত এক গাড়িতে চেপে আছে—যেখান থেকে আজ সারা রাতেও তার নামার ইচ্ছেটুকু বিন্দুমাত্রও নেই। ক্ষমতার উৎস কতো গভীর হলে এমনি করেই দুনিয়াটাকে কুক্ষিগত করা যায়, এমন সহজেই দাপিয়ে বেড়ানো যায়—এম.এল.এ সাহেব চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

কাটিহারে দিদির বাড়িতে দু'দিন কাটিয়ে মহেশপ্রসাদ যখন মধুবনী স্টেশনে নামলো তখন সন্ধ্যা সাড়ে-পাঁচটা পৌনে-ছটা হবে। প্রথমে সে ভেবে রেখেছিল, পাটনা যাবার আগে কাটিহার থেকে একবার ঘুরে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায়। জরুরি এক নির্দেশ পেয়ে মহেশপ্রসাদকে আগেই রাজ্যের রাজধানীতে ছুটতে হয়। সেখানকার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সে বাড়ি না-ফিরে সোজা চলে যায় কাটিহারে। দিদি জানকী এবং জামাইবাবু অবিনাশদার সঙ্গে পারিবারিক কথাবার্তা, মা, বাবার স্বাস্থ্য, লব-কুশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনার পর জানকী হঠাৎ বলে উঠলেন, কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ?

আমার ভবিষ্যৎ আবার কী?

তুই বিয়ে কববি না—তুই কতোদিন আর এ-ভাবে আমাদের টানবি?

দিদি এ-সব ছাড়া কী তোমার অন্য কোনও কথা নেই? মহেশপ্রসাদ স্মিত হেসে আলোচনার ওই অধ্যায়টা চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে। ছেলেমানুষের মতো নিষ্পাপ ভঙ্গিতে মজা করে বললো, তুমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলে না, খুউব সম্ভবত আসছে সপ্তাহের শেষেই মন্ত্রির শপথ নিতে হবে।

লব বলে উঠলো, মামা তুমি মন্ত্রি হবে?

পাটনা গিয়ে তো এবারে তাই শুনলাম। অবশ্য না-হলেও আমার কোনও আফসোস বা হতাশা থাকবে না।

মামা, তুমি তো তাহলে গাড়ি পাবে—কুশ ঝকঝকে হাসি ছড়িয়ে বলেই ফেললো, আমরা কিন্তু তখন তোমার গাড়িতে খুব ঘুরে বেড়াবো?

নিয়মের মধ্যে যতোটুকু ঘোরা যায় সেটুকু ঘুরো—মহেশপ্রসাদ কৌতুকের ঝিলিক তুলে উত্তর দিল, কিন্তু অভ্যেস খারাপ কোরো না। যখন আবার আমার মন্ত্রিত্ব থাকবে-না সেই সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মতো সদিচ্ছাটুকু অন্তত থাকা চাই।

তখন তোমার সাইকেল চেপে ঘুরবো। কথাটা লবই বললো। কিন্তু সেই বলার সুরটুকু এতো প্রাঞ্জল এবং উপলব্ধিটুকু এতো অর্থবহ যে কথাটা শুনে মহেশপ্রসাদ অত্যন্ত মুগ্ধ হলো।

মধুবনী স্টেশনে নেমেও মহেশপ্রসাদ তার ভাগ্নের ওই সাধারণ কথাটার মধ্যেও অসাধারণ যে-মনোভাবটা মিশেছিল সেটা নিয়েই ভাবছিল। দিদির ছেলে দুটো চমৎকার হয়েছে। ওদের অবলম্বন এবং স্বপ্ন বলতে তো ওরাই। মহেশপ্রসাদ এবারে নিজের মনেই সামান্য একটু হাসলো। সে বিয়ে করছে না—এতেও দিদির কষ্ট। দিদি সেজন্য নিজেকেই দায়ী মনে করছেন। মহেশপ্রসাদ অবশ্য চলে আসার সময়েও বুঝিয়ে এসেছে, তোমার ওই চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলো। সামান্য যেটুকু করছি এটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ এমন কিছু বেশি করছি না। এবং এ-দিকটা সামলাতেই

বিয়ে করছি না, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। উত্তরে জানকী শুধু বলেছিলেন, তুই আর আমাকে কিছু বোঝাস না—আমি সব বুঝি।

এবারে তাহলে সত্যি সত্যিই একটা বিয়ে করে তোমাকে অন্তত এটুকু বোঝাতে পারবে যে কোনওটাই কারো প্রতিবন্ধক নয়।

কথাটা শুনে জানকী খুব খুশি হয়েছিলেন। ভাইয়ের মাথায় সস্নেহে ডান হাতটা বুলিয়ে বলেছিলেন, তোরা এতো মানুষের দায়িত্ব নিস, না-হয় আর একটি মেয়েরও দায়ভার গ্রহণ করলি—যার সঙ্গে অভাবে-অভিযোগে সুখে-দুঃখে একট বাড়ির ছায়ায় জীবনটা কাটিয়ে দিবি।

স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশা-স্ট্যান্ডটা যেখানে, সেখানে পৌঁছাতেই মহেশপ্রসাদের সঙ্গে সুজাতার চোখাচোখি হয়ে গেল। সুজাতা লাইনের প্রথম রিকশার ওপরেই বসেছিল এবং সেটি তখন ছাড়ার মুখে। একপলকের নিঃশব্দের এক প্রহর কেটে যেতেই সুজাতা ও-পাশে সরে বসে নিচু গলায় ডাকলো, উঠে আসুন।

সাইকেল রিকশাটা এগিয়ে চলেছে কাকুলিয়াধউলির পথে। আকাশটা আজ সারা দিনই মেঘলা ছিল। এমনিতেই শীত পড়েছে। রিকশা চলার সঙ্গে সঙ্গে সেই শীতটা যেন আরও এক মাত্রা বেড়ে গেল। গায়ের চাদরটা টেনে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে আসছেন?

দু'দিন পাটনা এবং কাটিহারে দিদির বাড়িতেও দুটো দিন কাটিয়ে এই বাড়ি ফিরছি।

আমি ভেবেছিলাম আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো। অনেক দিন যান না—কিন্তু এই মুহূর্তে আগে নিজের বাড়িতেই যাওয়া উচিত।

আপনার কথা আলাদা—এই বিবেচনাটুকু ক'জন দেখায়।

আমার কথা আলাদা কেন? সুজাতার দুই ঠোঁটে চাপা হাসির তরঙ্গ।

নিজের প্রশংসা শুনতে চাইছেন?

একটু না-হয় শুনলামই...।

নিজের স্বার্থের কথা না-ভেবে যিনি আগে অপরের কথা ভাবেন সুস্থ চিন্তার দিক থেকে তিনি নিশ্চয়ই অনন্যা। আপনি কী বলেন?

আপনার এই চমৎকার ব্যাখ্যার পর আমার আর কিছু বলার নেই। আমি এখন ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি—চাদরটা মুখের ওপর চাপা দিয়ে সুজাতা হাসতে লাগলো।

আচ্ছা, আপনি তো...কী যেন বলতে গিয়ে মহেশপ্রসাদ হঠাৎ থেমে গেল। সে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো।

কথাটা শেষ করবেন না?

হ্যাঁ—বলছিলাম কি—আপনি তো এই বছরেই ডাক্তার হয়ে বেরুচ্ছেন। তারপরের পরিকল্পনা?

অন্তত দুটো বছর গ্রামের হাসপাতালে গিয়ে কাজ করা। পরে নিজেই একটা চেম্বার খুলে বসবো আমাদের কাকুলিয়াধউলিতেই। যেটাকে পুরোপুরি জনতার দাবাখানা বলা যেতে পারে।

স্টেশন রোডের কোলাহল ছাড়িয়ে সাইকেল রিকশাটা এবারে ময়ূর নগর পালিকার মধ্যে দিয়ে কাকুলিয়াধউলির পথ ধরলো। মহেশপ্রসাদ অবশ্য নেমে যাবে ধোবি তালাও-এর মোড়ে। আর মাত্র সাত-আট মিনিটের পথ। সাইকেল-রিকশাটা এবারে দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনেই লেভেল-ক্রসিং। ট্রেন যাবে তাই গেট বন্ধ। সাইকেল-আরোহীরা অবশ্য গেটের ফাঁক দিয়ে গলে রেললাইন পার হয়ে চলে যাচ্ছে। কারো মধ্যেই ধৈর্য বলে যেন কিছুই নেই।

আশেপাশে তখন জমে থাকা গাড়ির মেলা। সুজাতা সামনে এবং পেছনেও একবার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। সে এতোক্ষণ ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসেছিল। এবারে পা পাল্টে নিলো। আর ওই পাল্টাতে গিয়েই তার পাটা পাশে বসা মানুষটার গায়ে লাগতে চকিতে সে হাতটা বাড়াতেই মহেশপ্রসাদ ওর হাতটা ধরে ফেললো। খুব আস্তে বললো, এমন কিছু ব্যথা লাগেনি যে আপনাকে শুশ্রূষা করতে হবে—

ব্যথা না-লাগলেও নম্র তো হতেই হয়।

আপনি তো এমনিতেই যথেষ্ট নম্র এবং কোমল—নতুন করে কিছু প্রমাণ করার আছে কী?

আমি কী আমি জানি না—কিন্তু এটুকু জানি মেয়েদের উদ্ধত উগ্র হতে নেই। অন্তত সেটুকুর পরিচয় রাখা উচিত। তারপরেই সুজাতা ঝিরঝিরে এক শীতল হাসির বাতাস বইয়ে দিল। ছোট্ট সুরে বললো, হাতটা এবারে ছাড়ুন—

যথেষ্ট লজ্জা পেলেও সেই লজ্জাকে জয় করতে চাইলো মহেশপ্রসাদ। সে সুজাতার চোখে চোখ রেখে নিচু গলায় এক সময় বলে উঠলো, আপনার কী খুব অসুবিধে হচ্ছিলো?

না। গভীর কণ্ঠস্বর নিয়ে সুজাতার ছোট্ট উত্তর।

তাহলে?

ব্যাপারটা কী দশজনকে দেখাবার? সুজাতার পাতলা দুই ঠোঁট থেকে যেন স্নিগ্ধ হাসির মোম গলে পড়লো। সে এবারে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দূরের রেল লাইনের দিকে তাকালো। একটা মালগাড়ি গড়িমসি করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

গেট খুলে যেতেই কার আগে কে যাবে তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। যানবাহনের সেই জটলার মধ্যেও অত্যন্ত নির্লিপ্ত থেকে মহেশপ্রসাদ যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে এমনই আস্তে বললো, আমরা কিন্তু এখনও আপনি-আজ্ঞের দেওয়ালটা ভাঙতেই পারলাম না। আসলে আমরা দুজনেই বেশ ভীরু।

সলজ্জ হাসিটুকু লুকিয়ে রাখার জন্য সুজাতা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর মুখটা এখন বাঁ হাতের বাহুমূলের খাঁজে আশ্রয় নিয়েছে। সামান্য কয়েকটা মুহূর্ত পার করে সে অস্ফুট স্বরে বললো, আপনার ইচ্ছে হলে তুমি করে বলতে পারেন।

আমার ইচ্ছে! আপনার নয়? তাহলে থাক—

সঙ্গে সঙ্গে মহেশপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালো সুজাতা। এই মুহূর্তে তার কী বলার আছে তা সে ভেবেই পেল না। আসলে লজ্জার বেড়া ভাঙতে সামান্য একটু সাহস সঞ্চয়ের দ্বন্দ্বেই তার ভেতরের সব কিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সুজাতা শুধু বললো, আপনার কী রাগ!

রাগ? আমার মধ্যে? মহেশপ্রসাদ নির্মল এক হাঁসির মেঘ উড়িয়ে বললো, তেমন কিছু আমার মধ্যে দেখতে পেলেন বুঝি?

ওই যে বললেন তাহলে থাক।

আপনার আপত্তি থাকলে থাক বলবো না?

আমার আপত্তি আছে বলেছি একবারও—সুজাতার মুখটা বেশ থমথমে! যে-কোনও মুহূর্তে শ্রাবণের ধারা নামতে পারে। সে বেশ করুণ গলায় উত্তর দিল, আমি বলতে চেয়েছি আগে তো আপনিই ওই দেওয়ালটা ভাঙবেন। নয়তো আমি কীভাবে পার হবো?

সুজাতা তোমাকে আর একটুও পর মনে হচ্ছে না। মহেশপ্রসাদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই সুজাতা পরিষ্কারই বলে ফেললো, আর আমার ওই ব্যাপারটা মনে হয়েছে লাইব্রেরী উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তোমার ভাষণ শুনবার পর থেকেই।

ধোবিতালাও-এর চার রাস্তার মোড়ে এসে সাইকেল রিকশা থেকে নেমে পড়লো মহেশপ্রসাদ। সুজাতা এবারে সোজা বেরিয়ে যাবে। আর ডান দিকের রাস্তা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়াবে মহেশপ্রসাদ। হেঁটে গেলে মিনিট দশেক লাগবে। রিকশাতে ওই পথটুকুর জন্য দু'টাকা নিয়ে নেবে। সুজাতার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিয়ে সে হাঁটাই শুরু করে দিল।

হাঁটতে হাঁটতেই মহেশপ্রসাদ যেন আর একবার সুজাতার সঙ্গে আপন মনে কথা বলে উঠলো। রিকশা ছাড়ার মুহূর্তে সুজাতা জিজ্ঞেস করেছিল, কালকে কী করছো?

আপাততো কোনও পোগ্রাম নেই—তবে আগামীকাল সকালেই বোঝা যাবে দিনটা অলস কাটবে না দৌড়ঝাঁপের মধ্যে থাকতে হবে।

অলস এবং দৌড়ঝাঁপ যাই হোক না কেন, কালকে একবার আমাদের বাড়িতে এসো। এসো কিন্তু—

কখন?

এই ধরো বিকেল চারটের পর থেকে যে-কোনও সময়ে এলেই হবে।

সুজাতা, আমার তো এখন থেকেই তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। মহেশপ্রসাদ আন্তরিক সুরে বললো, আমি নিশ্চয়ই যাবো। তবে বুঝতেই তো পারছো নানা কাজে যদি কোথাও আটকে গিয়ে যেতে না-পারি তাহলে কিন্তু...।

তাহলে ভীষণ কষ্ট পাবো। এই কথাটা কিন্তু আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম।

অর্থাৎ জরুরি তলব—যেতেই হবে!

ঠিক তাই। সুজাতার সারা মুখে খুশির ছটা। জরুরি তলব।

মহেশপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললো, এক জরুরি তলবে পাটনা দৌড়তে হয়—এবার থেকে আরও একটা জায়গা বাড়লো। কাকুলিয়াধউলির ডাককে উপেক্ষা করার সাহস আমার নেই।

কাজে তার পরিচয় পেতে চাই।

যথা সময়েই পাবে।

ধোবিতালাওর মোড় থেকে হাঁটতে হাঁটতে মহেশপ্রসাদ যখন বাতিকলের মুখটার কাছে এসে দাঁড়ালো ওখানে তখন বেশ একটা জটলা। ওই ভিড়ের মধ্যে মহেশপ্রসাদের বন্ধুরাও রয়েছে। রমেশ, মোতিলাল, দীপক, কুন্দন ওরা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, কী অদ্ভুত লোক ওই বাবুলালজি! উনি আবার মাননীয় বিধায়ক! জনদরদী নেতা!!

মহেশপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে সেটাই আগে বল না?

কী আর বলবো বল? রমেশ হতাশার সুরে বলে উঠলো, ধনিকলালজির ছেলেটা দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। আমরা সবাই ক্লাব ঘরেই ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে দেখি ছেলেটার কপালটা বেশ খানিকটা কেটে হা হয়ে গেছে। এবং কোনও জ্ঞানও ছিল না। ওই অবস্থায় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছাবার জন্য আমরা যখন গাড়ির খোঁজে ব্যস্ত তখনই দেখি জিপ চালিয়ে বাবুলালজি এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছেন। তা হাসপাতালে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাতেই পশ্চিম-মধুবনীর মাননীয় বিধায়কটি কী উত্তর দিলেন শুনবি? উনি স্পষ্টই বললেন, এটা আমার এলাকা নয়।

একজন বিধানসভার সদস্যর মুখে এই উত্তরটা ভাবতে পারিস? দীপক ক্ষোভের সঙ্গে বললো, একটা ছেলের কপাল ফেটে গেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—এরমধ্যে এলাকার হিসেবটা ওঠে কীভাবে? মুমূর্ষু একজন কিশোরের পাশে দাঁড়ানোটা কী এলাকাভিত্তিক? বিবেকটা কিছু নয়?

বুঝলাম। মহেশপ্রসাদ এবারে একটু গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলো, ছেলেটা আছে কেমন?

চারটে স্টিচ করতে হয়েছে। এখন ভালো আছে। এইমাত্র আমরা হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

চল, আমি একবার ছেলেটাকে দেখে আসি।

রমেশ, মোতিলাল, দীপক, কুন্দন—চারজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, চল।

লুভাইয়াকে দেখে এবং সান্ত্বনা, আশ্বাস দিয়ে মহেশপ্রসাদ যখন তার চার বন্ধুকে নিয়ে ধনিকলালজির বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো তখনও ওদের আলোচনার বিষয়টি বাবুলালকে কেন্দ্র করেই। তবে সেটা অন্য অর্থে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে। মোতিলাল যেমন বলেই ফেললো, আমরা শুধু শুধুই কিন্তু বাবুলালজিকে দোষারোপ করছি। আসলে এটা সুস্থ চিন্তা-ভাবনা থেকেই করি। কিন্তু তার কী কোনও প্রয়োজন আছে? সারা দেশ যেখানে পঙ্গু অধিকাংশ লোকই যেখানে অসুস্থ সেখানে বাবুলালজিরাই সুস্থ এবং সবল।

দেশ ফেশ তো অনেক দূরের ব্যাপার—নিজের এলাকার ছেলে নয় বলে লুভাইয়াকে গাড়ি

করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মানবিকতাটুকু পর্যন্ত যিনি দেখালেন না, আমরা তাঁকেই জননেতা বলে শ্রদ্ধার আসনে বসাই। তাকেই ভোট পুজো করি। দীপক খুবই শান্ত গলায় বলতে লাগলো, এখন ওই মানুষটা বুঝে গেছেন, এতো অন্যায় করা সত্ত্বেও লোকে তাকেই সমীহ করে। অতোএব মেরুদন্ড ভাঙা লোকগুলোর ওপর দিয়ে বাবুলালজিরা স্টীমরোলার চালাবেনই।

অনেষ্টির এখন কী দাম আছে বল? রমেশ সোজসুজি মহেশপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বললো, বাবুলাল একটা গুন্ডা। ফলাও দু'নম্বরী কারবারের প্রধান হোতা। সধবা, বিধবা, কুমারী, ছোট, বড়ো, মাঝারি কোনও মেয়েই তার কাছে সম্মান না-খুইয়ে ফিরে আসেনি— আর সেই জঘন্য লোকটাই কিনা যুবনেতা। তোদের পার্টি কিনা তাকেই ভোটের সময় টিকিট দিচ্ছে! তোদের বড়ো বড়ো নেতারা ওই ঘৃণ্য মানুষটাকেই আরও ক্ষমতা দিচ্ছে। ভাবা যায় এ-সব?

কুন্দন এতোক্ষণ তার আবাল্যের বন্ধুকে নীরবে দেখছিল। সে সাধারণত চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে। কিন্তু মুখ একবার খুললে সহজে বন্ধ করানো যায় না। তায় আবার মহেশপ্রসাদ নিজেই ওকে একটু ঠাট্টার খোঁচা দিয়ে বললো, তুই কিছু বল?

আমি বললে সামলাতে পারবি? এই যে তুই—তুই ভালো করেই জানিস তোদের অধিকাংশ বড়ো নেতা, ছোট নেতা, তস্য নেতা, তস্যর তস্য নেতা সকলেরই দু'নম্বর উপায়ে বাস-ট্যাক্সি, বাড়ি, জমি ইত্যাদি সবই হয়ে গেছে। আর তুই? ভাঙা একটা সাইকেলে ট্যাং-ট্যাং করে ঘুরে বেড়াস, টালির খাপরার চালের নীচে বাস করিস। ব্যাঙ্কে একটা নয়া পয়সাও নেই। একেবারে আস্ত একটা দীন ভিখিরি—সারাক্ষণ শুধু জাতীয় ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নীতিবোধ, আদর্শের একতারা বাজিয়ে গেলি। কিন্তু এতে লাভটা কী হলো আমাকে বলতে পারিস? দেখবি তুই-ই একদিন বিপন্নবোধ করবি। আর আমরা? তোর ছোটবেলার বন্ধুরা চারপাশের এতো প্রলোভনের হাতছানি এড়িয়ে গাড়োলের মতো তোর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হই। আমরা এখনও মূর্খের মতো বিশ্বাস করি, তুই একদিন সারা দেশকেই পরিশুদ্ধ করে তুলবি।

আজকে তোরা সবাই বেশ চটে আছিস। মহেশপ্রসাদ উদার হেসে বললো, আসলে অন্যায়কে কেউই মেনে নিতে পারে না—তাই এই সমালোচনা! এখন দেখতে হবে, এই ধরনের অন্যায় কাজগুলো আমরাও যেন কেউ না-করি।

সেদিন রাত আটটা নাগাদ মিশ্রজি হঠাৎ বাবুলালকে ফোন করে গদগদ সুরে বিজয়ীর বার্তা শোনালেন। বললেন, স্যার একটা খবর আছে।

হ্যাঁ বলুন। খবরটা কী?

চম্পা নামে যে-কিশোরী স্কুল ছাত্রীটি নিঁখোজ হয়েছিল তাকে পাওয়া গেছে।

পেলেন কোথায়?

বক্তিয়ারপুরে স্যার। আপনার নির্দেশ পেয়ে আমরা কী চুপচাপ থাকতে পারি? আমি তো সারা রাজ্যেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যাইহোক সময় মতোই স্যার পুলিশ যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। নয়তো আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই মেয়েটাকে নেপালে পাচার করে দেওয়া হতো।

উস্তাদটি কে?

রামগরিব স্যার।

কী বললেন, রামগরিব?

হ্যাঁ স্যার।

শুয়োরের বাচ্চাটাকে আমি এই কয়েক-দিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। মিশ্রজি, আপনি একটা কাজ করবেন—

হ্যাঁ স্যার বলুন—

ওকে আচ্ছা করে একটু পালিশ মেরামত ইত্যাদি করবেন বুঝেছেন? তারপরে আমার ফোন পেলে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেবেন।

অনুগ্রহ কী বলছেন স্যার? আপনার কথা রাখা মানে আপনার সম্মানের দিকটাও তো আমাদেরই দেখা উচিত।

আপনার মতো কর্তব্যপরায়ণ অফিসারই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অথচ দুর্নীতি নোংরামিতে দেশটা এখন ঝাঁঝরা। তেমন সৎ এবং সাহসী অফিসার উঠে আসছে কোথায়? যাক গিয়ে, চম্পার মা-বাবাকে নিয়ে আমি তাহলে থানায় আসছি।

হ্যাঁ স্যার আসুন।

বাবুলালের মুখে সব কথা শোনার পর রামপেয়ারে যথেষ্ট বিরক্তি নিয়েই বলে উঠলো, এই জন্যেই গর্দভটাকে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

গর্দভ ও নয়—তুই। বাবুলাল হাসতে হাসতেই বললো, রামগরিব চম্পাকে নেপালে পাচার করে দিতে পারলে না-হলেও মোটা একটা টাকা পেতো। কিন্তু যা-পায়নি তা নিয়ে আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। তবে একটা জিনিস ও ঠিকই পেয়েছে।

কী পেয়েছে উস্তাদ?

সত্যিই তুই একটা গর্দভ। তুই কী মনে করিস রামগরিব চম্পাকে ছেড়ে দিয়েছে? ওকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করেনি? ছেড়ে দে ও-সব—তুই আমার জিপটা নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে যা। ওই ভামতী আর ওর মরদটাকে নিয়ে আয়। তোর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বলবি, চম্পাকে পাওয়া গেছে। বাড়তি আর একটা শব্দও নয়।

অ্যান্টি চেম্বারের আরামদায়ক চেয়ারটাতে বসে বাবুলাল দোল খাচ্ছিলো। ওর চোখের সামনে তখন ভামতীব আঁটোসাটো চেহারাটা ভাসছে। ওকে সুন্দরীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবুও ওর সারা অঙ্গে এক বন্য সৌন্দর্য মিশে রয়েছে। বাবুলালের চোখে রং ধরেছিল প্রথম দিনেই। সেই রং এখন ছড়িয়ে দিতে হবে ভামতীর সারা শরীরেও। আর একটু পরেই ও এসে যাচ্ছে। মেয়েকে ফিরে পাচ্ছে খুব বেশি আপত্তি থাকার কথা নয়। তার আপত্তি থাকলেও বাবুলাল সেটাকে মানাতেও জানে।

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই বাবুলাল উন্মুখ হয়ে সেদিকে চোখ ফেরালো। ভামতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েকে ফিরে পাবার উদ্বেল আনন্দে তার সারা দেহে খুশির বাতাস লেগেছে। ওর দুই চোখে তারই ঝিলিক। ঠোঁটেও লেগে রয়েছে হাসির কণা। ওর চোখে চোখ রেখে বাবুলাল প্রায় নিঃশব্দেই ডাকলো, ভেতরে এসো।

ভামতী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলে বাবুলাল ওর রিভলবিং-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পরম এক আত্মীয়ের মতো ভামতীর কাঁধে নিজের হাত দুটো রেখে গভীর সুরে বললো, আমার এলাকা থেকে নিষ্পাপ একটা মেয়ে হারিয়ে যাবে—এটা তোমাদের থেকে আমার বুকেও কম লাগেনি। আমার কাছে পরের মেয়ে আর নিজের মেয়ে বলে কোনও পার্থক্য নেই। সেই কারণেই চম্পার খবরে মুষড়ে ছিলাম আমিও। কিন্তু নির্জীব হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাটাই সমাধানের পথ নয়। উদ্যোগ না-থাকলে কোনও ফলই পাওয়া যায় না। মিশ্রজিকে ডেকে শুধু একটা কথাই বলেছিলাম, চম্পা আমার মেয়ে, এই কথাটা মনে রেখে এরপরে যা-করার করুন। কথাগুলো বলতে বলতে বাবুলাল আস্তে আস্তে ভামতীকে কাছে টানছিল। একেবারে বুকের কাছে। বাবুলালের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া লাগছে তার চোখে-মুখেও। ভামতী বুঝতে পারছিল মেয়েকে ফিরে পাওয়ার খেসারতটুকু তাকে দিতেই হবে। প্রতাপশালী মানুষটাকে ফিরিয়ে দিলে এর ফল হবে আরও খারাপ। এরা যে সর্বনাশ না-করে কারো উপকার করতে পারে না।

বাবুলালের মুখটা নেমে এলো ভামতীর ঠোঁটের ওপর। পূর্ণ গ্রহণের মতো তখনকার ছবিটা। ভামতী কোনও কথা বলতে পারছে না। কেন-না ওর ঠোঁট দুটোকে বাবুলাল তার মুখের ভেতরে নিয়ে আঁটোসাঁটো ওই দেহের ওপরে যথেচ্ছ ভাবে যেন সাঁতার কেটে চলেছে। ভামতী কোনওরকমে

একবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চাপা সুরে বলে উঠলো, আমার স্বামী এসেছে। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে। রামপেয়ারে ওকে এই ঘরে ঢুকতে দেয়নি—বলেছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত কারো এই ঘরে ঢোকা নিষেধ। আপনি ওকে ডাকুন।

তোমার কথা শুনবো না এটা কখনও হয়? আমি নিজে তাকে ডেকে নিয়ে আসছি। কথাটা বলেই বাবুলাল নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো বন্য সৌন্দর্যের ঘ্রাণ নিতে। সেই ঝড়কে রোখার ক্ষমতা ভামতীর ছিল না। সে বাকরুদ্ধ হয়ে নিজের শরীরটাই শুধু ছেড়ে দিয়েছিল।

মিশ্রজির মুখোমুখি তখন তিনজনে বসে। বাবুলাল, ভামতী, এবং ওর স্বামী হীরালাল। থানায় আসার পর থেকে ভামতী একটা জিনিস লক্ষ্য করছে—মিশ্রজি সাহেবের হাত-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেও যাকে বিন্দুমাত্র নড়ানো যায়নি, সেই মানুষটাই কিনা এখন তাদের আপ্যায়ণে খাতিরে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাবুলালের প্রতি তার যেমন এক ধরনের ঘৃণা হচ্ছে ঠিক তেমনই মনটাও ভরে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতায়। ওই জঘন্য চরিত্রের মানুষটাই না-থাকলে তার চম্পাকে এ-জীবনে আর কাছে পেতো না।

ইতিমধ্যে চম্পা ঘরের মধ্যে ঢুকতে-না-ঢুকতে ভামতী প্রায় দৌড়ে গিয়েই মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। ছুটে গেল হীরালালও। মা-বাবা এবং মেয়ে তিনজনে জড়াজড়ি করে বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর অবশেষে শান্ত হলো। তবে সুখের সেই কান্না কী সহজে থামতে চায়। কথা বলার মধ্যেও অবিশ্রান্ত ভাবে চোখের জল পড়েই চলেছে। একসময় মেয়ে আর বৌকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল হীরালাল। তবে যাবার আগে দেবতাকে যে-ভাবে পুজো প্রণাম করে তেমন ভঙ্গিতেই হাত জোড় করে দীর্ঘ নমস্কার সেরে সমস্ত কৃতজ্ঞতা ঝরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আপনারা না-থাকলে আমার মেয়েকে ফিরে পেতাম না। আপনাদের দুজনের কাছে সারা জীবনের জন্য ঋণী রইলাম।

এখন প্রায় মধ্য রাত। বাবুলাল তার দুই শিষ্য রামপেয়ারের ও যাদবকে নিয়ে অ্যান্টি চেম্বরে বসে আলোচনা করে চলেছে। হাতে আর বেশি সময় নেই। মহেশপ্রসাদকে একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলতে না-পারলে ওর মন্ত্রি হওয়াটা আটকানো যাবে না। আর সেই জন্যই তার রামগরিবকে বড়বেশি প্রয়োজন। রামগরিবই পারে পরিকল্পনা মতো সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিতে। ওকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মিশ্রজিকে বলা হয়েছে। মিশ্রজি ছেড়েও দিয়েছেন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে। রামগরিব যে এখনও কেন আসছে-না সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। একবাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে বাবুলাল বলেও ফেললো, ছাড়া পেয়ে রামগরিব আবার চম্পার পেছনে ছুটলো নাকি?

একবারের বেশি দু'বার আমি কোনও মেয়ের প্রসাদ খাই না। তাই চম্পার পেছনে ছুটবার আপাততো আমার কোনও গরজ নেই—কথাটা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে বছর তেইশ-চব্বিশের যে-ছেলেটি এসে দাঁড়ালো তারই নাম রামগরিব। সাধারণত গুন্ডা, সমাজ-বিরোধীদের মুখে যেমন দু-চারটে কাটাছেঁড়ার দাগ-টাগ থাকে ওর মুখে সে-সব কিছুই নেই। এক মাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। নাকটা বেশ খাড়াই। রংটাও ফর্সাই বলা চলে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের দোহারা গড়নের রামগরিবকে দেখলে ভয়ঙ্কর হিংস্র একজন গুন্ডা বলে মনেই হয় না। অথচ ওর মতো নিষ্ঠুর আর দুটি নেই। পরনে গাঢ় নীল রঙের জিনসের প্যান্ট। খয়েরি রঙের পুলওভার সোয়েটারের ফাঁক দিয়ে লাল শার্টের কলারটা খরগোশের কানের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে।

তুই চম্পাকে.........বাবুলাল কথাটাকে শেষ করতেই পারলো না। একটা চেয়ারে ধপ করে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে রামগরিব উত্তর দিল, পবিত্র কাজটা প্রথম দিনেই সেরে নিয়েছি। আর পুলিশ আধ ঘণ্টা পরে পৌছালে আমার পকেটে হাজার পাঁচেক টাকাও চলে আসতো। ওই দানটা মিসফায়ার হয়ে গেল। কী করা যাবে—খেলাতে হারজিৎ আছেই। ও-নিয়ে আমরা ভাবি না। তবে গুরু তোমার মিশ্রজি এবারে আমাকে একটু কড়কেছে। বক্তিয়ারপুরের পুলিশ আমাকে ধরবে কী

—আমাকে দেখে তো ঠকঠক করে কাঁপছে। অথচ নিজের পাড়ায় এসে কিনা ওই মিশ্রজির ঝাড় খেতে হলো। নেহাত সময় মতো তোমার ফোনটা গিয়েছিল তাই অল্পের ওপর দিয়ে গেছে—তুমি গুরু আর জন্মে আমার বাপ ছিলে মাইরি। নইলে কোন্ শালে এমন বারবার বাঁচায়? তারপর সামান্য একটু থেমে সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিয়ে রামগরিব বলে উঠলো, ব্যাপার কী উস্তাদ এই মাঝরাতেই জরুরি পরোয়ানা?

ডেকে পাঠিয়েছি তো অনেক আগেই, এতোক্ষণ ছিলি কোথায়?

বেশ কয়েকদিন মাকে দেখিনি। ভাবলাম আবার কোনও মহৎ কর্মে জড়িয়ে পড়বো তার আগে বুড়িটাকে একবার দেখে আসি। তা ডেকেছো কেন সেটাই তো বললে না?

কী জন্য তোকে ডাকি?

বড়োলোকেরা কুত্তা পোষে আর তোমরা নেতারা আমাদের মতো গুন্ডা পোষো। আর ডাকাকাকি তো ওই সব কর্ম করতে—ধর্ষণ করো, গায়েব করো নয়তো অমুক নেতার ছেলেদের একটু মেরামত করতে পিস্তল, রিভলভার আব বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। বুথ দখল, জালি ভোটের ব্যাপারটা তো বিশেষ একটা সময়ে। এবারের কর্মটি কী? রামগরিব চাপা একটু হাসলো।

ব্যাপারটা হলো, মহেশপ্রসাদের মন্ত্রি হওয়া আটকাতে ওর এলাকায় একটা ঝামেলা বাধাতে হবে। ধর্ষণ-টর্ষণেব মতো একটা বদনামের কলঙ্ক টীকা ওর কপালে একবার মাখাতে পারলে মহেশপ্রসাদ সারাক্ষণই এক চাপের মধ্যে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে থাকবে।

উস্তাদ এই সব ঘটনা তৈরি করাটাকে তুমি কী যেন বলো?

পলিটিক্যাল রিক্রিয়েশন।

আর আমার 'রিকশনটা' হলো ওই ধরনের মজা নেওয়ার পর তাকে একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। নয়তো কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাছাড়া তুমি তো মহেশপ্রসাদের মহল্লায় এই কান্ডটা ঘটিয়ে ওকে বেইজ্জত করতে চাইছো। সেখানে খুনটা আরও জরুরি। খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে এলাকার মানুষ দেখবে থানা ঘেরাও না-করে জন-প্রতিনিধি মহেশপ্রসাদকেই অপদার্থ মনে করছে। যদিও ব্যাপারটা অতো সোজা হবে না। কেন-না মহেশপ্রসাদের কাজকর্ম আবার আমাদের মতো 'পবিত্র' নয়। ছোকবাকে সকলেই ভালোবেসে। তবুও খুন ধর্ষণেব মতো জব্বর মারকাটারি একটা ব্যাপার ঘটলে চটজলদি একটা চিৎকার-চেঁচামেচি ওর বিপক্ষে হবেই। আর তখন যদি দু-চারটে পোস্টার সেঁটে মহেশপ্রসাদকে আসামী বানিয়ে তুলতে পারো তবে তো গুরুজি তোমারই জয়-জয়কাব। এবং ওই এক ঢিলেই পূর্ব-মধুবনীর জনতার দিল কেড়ে নেবে যখন শান্তির দূত হয়ে ওই লাডলী মেয়েটার শবদেহে কান্ধা মেরে থমথমে গলায় আওয়াজ তুলবে, রাম নাম সত্ হ্যায়।

তুই তো দেখছি একজন নেতার চেয়েও অনেক বেশি ভাবনা-চিন্তা করিস।

তা তো একটু করতেই হয় উস্তাদ। রামগরিব গর্বের হাসি হেসে বললো, এই দ্যাখো না, তুমি এখন পাওয়ারে রয়েছো। তোমার কথা শুনে আমি দিব্যি একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে চলে যাবো। টাকা-পয়সা কী দেবে-না-দেবে ছোটলোকের মতো দর কষাকষি করবোই না। পাওয়ারে থাকার জন্যে তোমাকে সেই ইজ্জতটুকু দিতেই হয়। অউর ইয়ে তো সভি কো মালুম, ইজ্জতদার আদমি ওহি হোতা হ্যায় যিস কা জেব মে পাওয়ার হ্যায়।

রামগরিব! বাবুলালের ছোট্ট ওই ডাকটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো। আসলে রামগরিবের মুখে বারবার ওই 'পাওয়ার' কথাটা তার কানে অন্য রকম শুনতে লাগলো।

বলো উস্তাদ।

আমি যখন পাওয়ারে থাকবো না.....তখন....তখন যদি ক্ষমতায় থাকা কেউ তোকে আমাকে মেরে ফেলতে বলে?

উস্তাদ একটা সত্যি কথা বলবো, আমরা হলাম গিয়ে তোমাদের পাপোষ। রামগরিব হাসতে হাসতে স্পষ্টই উচ্চারণ করলো, তবে অবশ্যই ক্ষমতায় থাকা মানুষদের। তাদের নির্দেশ অমান্য

করে তাকে ছোট করার ব্যাপারটা আমরা ঠিক পারি না। আমাদের সেই মেরুদন্ডই নেই। কেন-না বুক ফুলিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানোর বিনিময়ে ওটুকু যে করতেই হয়। আমরা গুন্ডা হতে পারি তবে বেইমান নই। কিন্তু উস্তাদ তোমরা লিডাররা বহুত বেইমান আছো। বহুত জালি।

রামগরিবের চোখের আয়নার নিজের অসহায় ছবিটা দেখতে দেখতে বাবুলাল কী একটু শিউরে উঠলো? তবে ওকে সেটা বুঝতে দিল না। এই মুহূর্তে ফোন না-করলেই নয়—এমনই এক ব্যস্ততায় ওই মাঝরাতেই রিসিভারটি তুলে নিয়ে কোনওরকমে বললো, যা-যা, তুই এখন পালা। তোকে কিচ্ছু করতে হবে না।

আসলে বাবুলাল রামগরিবের কাছ থেকে নিজেই পালাতে চাইছে। গুন্ডাটাকে কেমন যেন একটা গনগনে আগুনের পিন্ড বলে মনে হচ্ছে। এবং বাবুলাল যে-কোনও মুহূর্তে পুড়ে যেতে পারে। রামগরিবের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাটা এখন তাই খুব জরুরি। মনের ভয় কাটাতে এবং আস্থা ফিরিয়ে আনতেও বাবুলাল আর একবার বলে উঠলো, এখন যা, ডাকলে আবার আসিস।

বাবুলাল জানে, সে আর কখনও রামগরিবকে ডাকবে না।

———

দময়ন্তী উথাইয়া



মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরের কোল ঘেঁষে চলে গেছে গোদাবরী নদী। শহর ছাড়িয়ে গোদাবরীর তীরেই সুন্দর একটি গ্রাম। একলাহারী। তিন দিকে পাহাড়ের মধ্যখানে পড়ে একলাহারী গ্রামটা যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। গ্রামের পাকা রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে সরকারি বাস। দু'ধারে ধান ক্ষেত, ভুট্টা আর আখের চাষ। সবার উপরে আছে আঙ্গুর। আঙ্গুরের চাষ এদিকে খুবই বেশি। মাচার উপরে আঙ্গুরের লতাগুলো সকালের কাঁচাসোনা রোদ পেয়ে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। একলাহারী গ্রামে গিয়ে বাস দাঁড়ালো একেবারে থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের মেন গেটের সামনে। চওড়া রাস্তা। দু'ধারে নানা ধরনের দোকান। কাপড় জামা-প্যান্ট, লন্ড্রী, সেলুন, রেস্টুরেন্ট, স্টেশনারী থেকে আরম্ভ করে কাঁচা সবজি ফলের দোকান পর্যন্ত। এই এলাকাটাকে এখানের লোকেরা বাজার বলে। পাওয়ার স্টেশনের মেন গেটের সামনে এই বাজার ঘুরেই বাস আবার নাসিক শহরে ফিরে যায়। যাই হোক, বাস থামতেই যাত্রীরা একে একে তাদের মালপত্র নিয়ে নামতে লাগলো। একটি ছেলে তখনও নামেনি। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। গায়ের রংটা শ্যামবর্ণ। সুন্দর স্বাস্থ্য। সেই ছেলেটির বাসের কোণের একটি আসনে বসে তখনও ঘুমোচ্ছে।

বাসের কনডাক্টর এগিয়ে বললো, সাব, ইহা পর উত্‌রিয়ে। বাস আর যাবে না। এখানেই নামুন। ছেলেটার ঘুম ভাঙলো। বিহুল দৃষ্টিতে বাসের জানলা দিয়ে চারদিকে একবার চোখ বোলালো। কনডাক্টরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অলস কণ্ঠে বললো, বাস আর যাবে না?

না।

এই জায়গাটার নাম কি?

একলাহারী।

ছেলেটি বাস থেকে নামলো। কিন্তু হাঁটতে পারছে না। হাঁটবার শক্তি নেই। জ্বরে সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে। সামনেই একটা চায়ের দোকান। কোনওরকমে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই মাটিতে পড়ে গেল। দোকান থেকে চার-পাঁচজন লোক ছুটে এলো। ছেলেটিকে ধরাধরি করে একটা বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিল। চারদিক থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো, কেয়া বাত? ছোক্‌রাকো কেয়া হুঁয়া? একজন বলে উঠলো, আরে ব্বাপ্ বহুত বুখার ইনকো। দোকানের মালিক গোবিন্দনাথ উথাইয়া। বয়েস বাষট্টি-তেষট্টি হবে। লম্বা-চওড়া চেহারা। সারা মুখে দুধ-সাদা দাড়ি। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি। মহীশূরের লোক! যৌবনে এই নাসিক শহরে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন মরাঠি মেয়েকে। সে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের উপর হতে চললো। স্ত্রী ভাগ্যে কিছু জমি-জায়গা পেয়ে সেই থেকে গোবিন্দনাথ এই একলাহারী গ্রামেই বাস করছেন। তখন এই থার্মাল পাওয়ার স্টেশন হয়নি। এমন জমজমাট বাজারও ছিল না। এখন গ্রামের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে, তখন ও-সব কিছুই ছিল না। না চলতো সরকারি বাস, না ছিল এতো মানুষজন। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের কোলে অন্ধকারের মধ্যে একলাহারী গ্রামে আট-দশটা ঘর লুকিয়ে থাকতো। তখনকার মানুষ এই গোবিন্দনাথ। একলাহারী গ্রামে তিনি খুবই মানি লোক। কেউ বিপদে-আপদে পড়লে পরামর্শের জন্য ছুটবে গোবিন্দনাথের কাছে। জমির সীমানা নিয়ে গন্ডগোল, পারিবারিক কলহ মীমাংসার জন্য গোবিন্দনাথের উপস্থিতি চাই-ই চাই। গ্রামের যে-কোনও ধরনের উন্নতির জন্য এক বিরাট পুরুষ। শুধু তাই নয়, আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারেও ওই গোবিন্দনাথই ভরসা যদিও তার সামর্থ খুবই কম। কতোবার কতো লোকে তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেছে কিন্তু গ্রাম্য সাধারণ মানুষ গোবিন্দনাথের এক উত্তর, এই তো বেশ আছি। কেন আবার ও-সব গহনা পরাতে

চাও? তোমাদের মধ্যে মিলেমিশে রয়েছি। এতেই আমার আনন্দ। সত্যিই তাই। তিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশেই সারা একলাহারী শ্রদ্ধার পাত্র। অবশ্য তাঁর এই সম্মান শুধুমাত্র মেলামেশা দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণেই নয়, তাঁর ছেলে-মেয়েরাও তাঁর সুনাম বাড়িয়েছে। তিন ছেলে রঙ্গনাথ, বিরজু, চিক্কুয়া। তিনজনেই গ্রাজুয়েট। গ্রাজুয়েট হয়ে তারা চাকরির ধারে-কাছে ঘেঁষেনি, নিজেদের জমিতে আখ, ভুট্টা আর পেঁয়াজ আঙ্গুরের চাষ-বাস নিয়েই মেতে আছে। এক মেয়ে দময়ন্তী। সকলের ছোট। কিন্তু তার নজর সবার উপরে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে সে এম.এ. পড়ছে। এ-তার বাহ্য পরিচয়। দময়ন্তী একজন কৃতি সাঁতারু। উনিশ বছরের সুঠাম দেহের দময়ন্তী উথাইয়া এই বছরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারের সব কটি বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই সুনাম বাড়ায়নি, পরিচিত করিয়ে দিয়েছে একলাহারী গ্রামকে, আর দময়ন্তী উথাইয়াকে লোকে চেনে গোবিন্দনাথ উথাইয়ার মেয়ে হিসেবে। সুতরাং এই একলাহারী গ্রামে তাই গোবিন্দনাথের প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই বেশি। সেই গোবিন্দনাথ এগিয়ে এলেন। ছেলেটির কপালে হাত রাখলেন। মনে হলো তিনি যেন ভুল করে আগুনে হাত দিয়েছিলেন। ছেলেটির সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কোনও হুঁশ নেই। গোবিন্দনাথ উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজনের উদ্দেশে বললেন, রঘুবীর তোমরা এই ছেলেটিকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও। আমি ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আখ খাচ্ছিল দময়ন্তী। ওর মা যশোমতী আর ভাবী অর্থাৎ রঙ্গনাথের বৌ সরযূ, গম-বজরা ইত্যাদি কুলোতে ঝাড়াঝাড়ি করে পরিষ্কার করছিল। গল্প করছিল হাসি-ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে। গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়ের দল দময়ন্তীদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে খেলাধুলা করে। তারা অনেক সময় নিজেদের খেলা ভুলে দময়ন্তীর দর্শন পেলে তাকেই অবাক হয়ে দেখে। যেন দময়ন্তীকে এর আগে কখনও দেখেনি। এই প্রথম দেখছে। দময়ন্তীর এখন নতুন রূপ। নতুন রং। সারা ভারতের প্রতিযোগীদের হারিয়ে চার-চারটে সোনার মেডেল এনেছে এই একলাহারী গ্রামে। ছোটদের কাছে, শুধু ছোটদের কাছেই-বা কেন, ছোট-বড়ো সকলের কাজেই দময়ন্তী এখন রূপকথার রানি। কাগজে দময়ন্তীর ছবি উঠেছে, জীবনী লেখা হয়েছে, একলাহারী গ্রামের ছোট বাচ্চাও জানে। সেই দময়ন্তী তাদের সামনে। ছোটরা জুল জুল করে দেখবে না কেন? বছর দশেকের একটি ছেলে খৈয়াম। সামনের দুটি দাঁত নেই। তবুও সমানে ওই ফোকলা দাঁতেই একটা শক্ত আখের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। টুক করে দময়ন্তীকে বলে বসলো, দিদি, মুঝে এক সোনা দোগে? তোমার তো চারটে সোনার মেডেল। একটা আমাকে দাও!

দময়ন্তী হাসতে হাসতে উত্তর দিল, যাঃ যাঃ, মু হাত ধোকে আ? শীতের মধ্যে কষ্ট করে জলে নামলাম আমি, কোথায় তোরা আমাকে আর একটা দিবি, তা নয় উল্টে আমার কাছেই চাইছিস? ম্যায় কেয়া করু! খৈয়াম বললো, মা যে আমাকে সব সময় কথা শোনায় ঃ দময়ন্তী দিদির মতো বড়ো হবি। সোনা আনবি। একটু থেমে আক্ষেপের সুরে খৈয়াম আরও যোগ করলো, বড়ো হতে তো এখনও অনেক দেরি। ম্যায় কাঁহা সে সোনা লাউ? কোথায় সোনা পাবো বলো? খৈয়ামকে কাছে ডেকে আদর করে বললো, দেখ্, ইয়ে কোই ক্ষেত কা আঙ্গুর নেহি। তুই চাইলেই তোকে এক মুঠো দিয়ে দিলাম। সবাইকে হারিয়ে সোনার মেডেল জয় করে নিয়ে আসতে হয়। কেউ কাউকে এটা এমনি দিয়ে দেয় না। বুঝলি? আভি ভাগ্ হিঁয়াসে!

যশোমতী এক ফাঁকে ঘরের ভিতর চলে যেতেই সরযূ তার স্বভাবসুলভ চপলতায় ননদকে ঠাট্টা করলো, বাচ্চাটা সোনার মেডেল চেয়েছে তাকে না-হয় বাহানা করে তাড়িয়ে দিতে পারলে, আগর কোঈ লেড়কা তুমহারা দিল মাঙ্গনে কে লিয়ে আতে তো ক্যায়া উসকো ভি.....কথাটা শেষ না-করলেও আসল অর্থটুকু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে সরযূ হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই আবার বললো, কী দময়ন্তীজি সেই রাজপুত্রকেও কী এমনি ভাবে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে? ঠাট্টা রসিকতাতে দময়ন্তীও কম যায় না। দুষ্টুমী ভরা চাপা হাসিতে তার লাবণ্যময় মুখখানি ভরিয়ে তুলে টেনে সুর দিয়ে বললো, আজ্ঞে না মশাই উতনা বুরবক্ ম্যয় নেহি হু। অমন বোকার মতো কাজ করতাম না। দময়ন্তী নিজের গলার হারখানা দেখিয়ে বললো, এমনি ভাবে সেই রাজপুত্রকে বুকের সঙ্গে

লাগিয়ে রাখতাম। তারপরেই কপট রাগে ধমকে উঠলো, যা শুনতে চেয়েছিলে তাই শুনে এবার শান্তি পেয়েছো তো? এবারে হাতের কাজটুকু সারবে নাকি এখনও আমার সেই কাল্পনিক রাজপুত্রের মাথা চিবোবে? কথাটা শেষ করেই এ-পাশ ফিরতেই দময়ন্তীর চোখে পড়লো, তাদের দোকানের কর্মচারী রঘুবীর কয়েকজন লোকের সাহায্যে একটা ছেলেকে ধরাধরি করে তাদের বাড়ির দিকেই নিয়ে আসছে। খুব আস্তে দময়ন্তী বললো, ভাবী দেখোতো? ইতিমধ্যে যশোমতী ঘর থেকে বেরিয়ে আবার উঠোনে এসেছেন। রঘুবীরের দলও ততোক্ষণে এসে পড়েছে। বাড়ির সামনের ক্রীড়ারত সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও চারপাশে দিয়ে ঘিরে ধরেছে অসুস্থ ছেলেটাকে দেখতে। যশোমতী জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ওর?

জানি না।

রঘুবীরের ছোট ছোট উত্তর। ছেলেটার ভীষণ জ্বর। জ্ঞান নেই। বাবুজি বললেন, বাড়ি পৌঁছে দিতে।

তা তিনি কোথায় গেলেন?

ডাক্তারবাবুকে ডাকতে।

বারান্দার দিকের একখানা ঘরেতে চৌকির ওপর ছেলেটাকে শুইয়ে রাখা হলো। রঘুবীরের দল তাদের কর্তব্য সেরে দোকানে ফিরে গেল। যশোমতী বেহুঁশ ছেলেটার কপালে হাত রেখে জ্বরের উত্তাপ বোঝার চেষ্টা করলেন। পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেক জ্বর। তুমি এক কাজ করো, জল-পটি নিয়ে এসো। যেমন নির্দেশ তেমনই কাজ। সরযূ সঙ্গে সঙ্গে এক বাটি জল আর বেশ কিছুটা ফর্সা কাপড়ের টুকরো এনে মায়ের সামনে রেখে দিল। যশোমতী কাপড়ের টুকরো জলে ভিজিয়ে ছেলেটার কপালে লাগিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তুলে জলে ভিজিয়ে আবার লাগিয়ে দেন। এমনি করে মিনিট পনেরো কাটলো। জ্বর কমবার কোনও লক্ষণ নেই। যশোমতী মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। একটা কড়া ধমক লাগিয়ে বললেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? তাড়াতাড়ি একটা মগ আর এক বালতি জল নিয়ে আয়! মায়ের বকুনি খেয়ে দময়ন্তী তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্দেশ মতো বালতি-মগ ইত্যাদি নিয়ে ফিরে এলো খানিকবাদেই। যশোমতী বললেন, মগে করে আস্তে আস্তে জল ঢাল মাথায়। দময়ন্তী তাই করলো। যশোমতী হাত দিয়ে ছেলেটার মাথা ভালো করে ধুয়ে দিতে লাগলেন।

ডাঃ দীঘেকে নিয়ে গোবিন্দনাথ বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। শুধু একলাহারী গ্রামেরই নয়, সারা নাসিকের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার এই দীঘে। ছেলেটাকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন। প্রেসারটাও দেখে নিলেন। সব কিছু বুঝে নিয়ে তারপরে ওষুধ দিলেন। দিনে চারবার খাওয়াতে হবে। চার ঘণ্টা পরপর। আর একটা ট্যাবলেট দিয়ে বললেন, এটা এখুনি খাইয়ে দেবেন। আস্তে আস্তে জ্বর ছেড়ে যাবে। জ্ঞান ফিরে আসবে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। মাথায় এখন আর জল ঢালতে হবে না। তবে দুপুরে আর একবার জল দিতে পারেন।

কী খেতে দেবো ডাক্তারবাবু? যশোমতী জিজ্ঞেস করলেন।

খেতে কোনও বাধা নেই। ডাল, রুটি, সবজি সব খাবে।

বুখার বেড়ে যাবে না তো? যশোমতী উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আরে না! ডাঃ দীঘে অমায়িক হেসে বললেন, যা খুশি তাই খেতে দেবেন। আপনার কোনও চিন্তা নেই, জ্বর বাড়বে না।

ডাঃ দীঘে চলে গেলেন। যাবার সময় আর একবার আশ্বস্ত করে গেলেন যশোমতীকে, ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই জ্বর কমে যাবে। কিন্তু যদি না-কমে তাহলে যেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়। তবে স্থির বিশ্বাসে এও বললেন, জ্বর না-কমার কোনও কারণই নেই। নিশ্চয়ই কমে যাবে।

গোবিন্দনাথ এবারে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দড়ির খাটিয়াতে বসলেন। দময়ন্তীকে বললেন, এক গ্লাস জল দে তো মা। দময়ন্তীর পরেই দরজার কাছাকাছি সরযূ দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, আমি জল এনে দিচ্ছি বাবা। সরযূ জল এনে দিলে সেই জল খেয়ে গোবিন্দনাথ মাথার দুধ সাদা

পাগড়িটা খুলে কোলের উপর রেখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। যশোমতী জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটিকে ওই অবস্থায় কোথায় পেলে? গোবিন্দনাথ, যশোমতীকে সম্ভাব্য পরিচয় দিলেন এবারে। সকালের বাসে এসেছে ছেলেটা। বাস থেকে নেমে কোনওরকমে আমাদের দোকানের সামনে এসেই হুড়মুড় করে গাছ পড়ার মতোই মাটিতে পড়ে গেল। গায়ে হাত দিতেই দেখি এই জ্বর। কী নাম, কোথা থেকে এসেছে, কী পরিচয়, কিছুই জানি না। অবশ্য ও-গুলি জানার আমাদের এখন কোনও প্রয়োজনও নেই। ছেলেটা ভালো হয়ে উঠুক, সেটাই চাই।

তিনভাই রঙ্গনাথ, বিরজু ও চিক্কুরা দুপুরে বাড়ি ফিরলো ক্ষেত থেকে। দময়ন্তীর ক্লাস না-থাকলে মাঝে-মধ্যে সে বড়ো ভাইদের খাবার নিয়ে ক্ষেতে চলে যায়। ভাইদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজেও কিছুক্ষণ ক্ষেতে কাজ করে। দময়ন্তী অবশ্য ধান, ভুট্টা, বজরা ইত্যাদির ক্ষেতে খুব বেশি একটা যায় না। তার সখ্যতা সবচেয়ে বেশি আঙ্গুর ক্ষেতের সঙ্গেই। কাজ করে আর গুচ্ছো থেকে আঙ্গুর ছিঁড়ে সোজা মুখের মধ্যে সে-গুলিকে চালান করে দিয়ে তার সুমিষ্ট রসের স্বাদ গ্রহণ করে। তারপরে এক সময় খাবারের শূন্য বাসনগুলি একটা কাপড়ে বেঁধে বাড়ি ফিরে আসে। আজকেও ভাইদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু এদিককার এই কান্ডের জন্য সে যেতে পারেনি। সেই কারণেই তিন ভাই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও বেশি অপেক্ষা করেও যখন দেখলো দময়ন্তী এলো না, তখনই বাড়ির পথ ধরলো।

বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই দময়ন্তীর সঙ্গেই প্রথম দেখা হলো ভাইদের। রঙ্গনাথ জিজ্ঞেস করলো, তোর আক্কেলখানা কী রকম বলতো? বিরজু টিপ্পনী কাটলো, আমরা যে খাওয়া-দাওয়া না-করে সারাদিন ক্ষেতের কাজ করতে পারি, একটুও খিদে লাগে না—এটা তুই কী করে জানলি রে? অসহায়ের দৃষ্টি নিয়ে দময়ন্তী একবার বড়ো ভাই রঙ্গনাথের মুখের দিকে একবার মেজ ভাই বিরজুর মুখের দিকে তাকাতে-না-তাকাতেই চিক্কুয়া বলে উঠলো, এবারে আমার মুখের দিকে তাকা। তোর......

ভাইয়া!

চিক্কুয়াকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে করুণ ভাবে কী যেন বলবার চেষ্টা করতেই দময়ন্তীকেও একই ভাবে থামিয়ে দিয়ে চিক্কুয়া বিরজুর চেয়েও বেশি টিপ্পনী কেটে বললো, একটা অজুহাত দেখিয়ে তোকে আর ডাঙ্গায় সাঁতার কাটতে হবে না।

দময়ন্তীর তখন কেঁদে ফেলবার মতো অবস্থা। কেউই যখন তার কথা শুনতে চাইছে না, বুঝতে চাইছে না তখন একমাত্র কেঁদে ফেলা ছাড়া তার কিছুই আর করণীয় নেই। রঙ্গনাথ ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য কোমল দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকালো। দময়ন্তীর মাথায় সস্নেহে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো, খাবার নিয়ে যাসনি কেন? আমরা বসে থেকে অপেক্ষা করে করে.....

পুছো মত্ ভাইয়া! এতোক্ষণে দময়ন্তী ডাঙ্গা ছেড়ে যেন জলে নামলো। বলবার সুযোগ পেতেই সে গড়গড় করে বলে গেল, পিতাজি কোথা থেকে একটা বীমার লেড়কাকে ঘরে নিয়ে এসেছে। উসি কি সেবামে ফাঁস গিয়া। ওই ছেলেটার সেবা করতেই তোমাদের কাছে যেতে পারিনি। যাবার কথা একবার বলতেই পিতাজির ধমক। জীবনে অনেকবার খাবার সময় আসবে। অসুস্থ মানুষের সেবা করা কোনও অধর্মের কাজ নয় যে তার আগে খাবারটা নিয়ে যাওয়াই বড়ো কাজ হবে!

পিতাজি কী বাত ঠিক হ্যায়। চিক্কুয়া বললো, কিন্তু ছেলেটা কে, কোথা থেকে এসেছে, চোর গুন্ডা কি-না অথবা জেল পালানো আসামী কি-না এ-সব তো জানা দরকার। হুট করে বাইরের সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে ঘরে এনে শেষ পর্যন্ত আমাদের না বিপদে পড়তে হয়। পাশের ঘরেই ছিলেন গোবিন্দনাথ। তিনি ছোট ছেলের কথা শুনে ওদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিন ছেলের মুখের দিকেই একে একে তাকালেন। তারপরে চিক্কুয়ার উদ্দেশে বললেন, তুমারা কহনা ভি ঠিক হ্যায় বেটে। কিন্তু একটা অসুস্থ মানুষের আগে পরিচয় জেনে তার সেবা করবে, না-সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলে পরে তার পরিচয় নেবে। কোনটা করবে তোমরাই বলো? তারচেয়েও বড়ো কথা, ছেলেটার কোনও হুঁশ নেই। সেই অবস্থায় ওর পরিচয় জানবো কেমন করে? হো সেকতা উও লেড়কা গুন্ডা হ্যায়। কিন্তু ছেলেটা যখন অসুস্থ সে তখন আর তোমার কাছে গুন্ডা

নয়, একজন রোগী। অসহায় মানুষ। ওর তখন সেবার প্রয়োজন। গোবিন্দনাথের কথার যুক্তি-যুক্ততা তিন ভাইই মেনে নিল। না-মেনে উপায় কী? বাবা তো কোনও অহেতুক, অসংলগ্ন কথা বলেননি। প্রতিটি কথা যুক্তিপূর্ণ। তিনজনেই অসুস্থ ছেলেটিকে দেখতে বারান্দার কোণের দিকের ঘরে ঢুকলো। যশোমতী ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর সরযূ ওর মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছে। রঙ্গনাথ জিজ্ঞেস করলো মাকে, আভি ক্যায়সা হ্যায়। যশোমতী বড়ো ছেলের দিকে তাকালেন। বললেন, জ্বর কমে যাচ্ছে কিন্তু এখনও জ্ঞান ফিরছে না কেন? কোই হুঁশ নেহি।

জ্বর একেবারে কমে গেলেই হুঁস আসবে। বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল বিরজু। ও-নিয়ে অতোশত ভেবো না। কোই ডাক্তার আয়া থা?

হ্যাঁ। দময়ন্তী উত্তর দিল, ডাঃ দীঘে। দাওয়াই দিয়ে গেছেন।

তব ডর নেহি। ভয়ের কিছু নেই। আমাদের এখন খেতে দিতে পারো। উও লেড়কা দীঘে সাহেবের ওষুধ খেয়েছে। জরুর ভালো হয়ে যাবে।

তুমারা মুমে ঘি-সক্কর বেটে, যশোমতী বলে উঠলেন, ছেলেটা যেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠে। তারপরেই পুত্রবধূর উদ্দেশে বললেন, বহু তুমি এখন ওঠো। ছেলেদের খেতে দাও। দময়ন্তী তুই কী কাজ করছিস? আয়, ওর মাথায় জল ঢেলে দিবি আয়।

সরযূ, শ্বশুর, স্বামী আর দুই দেওরকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। এক্ষুনি ওদেরকে খেতে দিতে হবে। গোবিন্দনাথ অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে দোকানে চলে যাবেন কিন্তু রঙ্গনাথ, বিরজু আর চিক্কুয়া খেয়েই ছুটবে ক্ষেতে। সেখানে অনেক কাজ।

দময়ন্তীর মনে হলো সকাল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে মায়ের অনেক ধকল গেছে। বৌদি, বাবা-দাদাদের খেতে দিতে গেছে। এই ফাঁকে মায়ের স্নানটা যদি হয়ে যায় তাহলে মাকেও খেতে দেওয়া যেতে পারে। নয়তো এই ভাবে মা যদি আটকে থাকে তবে অনেক বেলা পর্যন্ত না-খেয়ে থাকতে হবে। দময়ন্তী তাই বললো, মা, আমার তো স্নান হযে গেছে, তুমি এই ফাঁকে স্নান করে এসো। ওর মাথায় আমিই জল দিচ্ছি। সুতরাং স্নানটা সেরে নেওয়া যাক। যশোমতী ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময়ে একবার শুধু বললেন, আর দু-চার মগ জল ঢালিস তারপরে মাথাটা ভালো করে মুছে নিস। একটুও চুলের গোড়ায় যেন জল বসে না-থাকে। এক দাগ দাওয়াইও খাইয়ে দিবি।

ছেলেটির মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে দময়ন্তীর শরীরটা একটু কেঁপে উঠলো। অসুস্থ, হুঁশ নেই সবই ঠিক কথা কিন্তু একটা জোয়ান ছেলে তো বটেই। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি শক্ত সমর্থ ছেলের এতো কাছাকাছি দময়ন্তী এর আগে কোনোদিনও আসেনি। শুধু কাছে আসাই নয়, এ-যেন পূর্ণ অধিকার নিয়ে ছেলেটার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়াও বটে। তাছাড়া আর কী? একতাল মাটি যেমন শিল্পীর হাতে পড়ে সৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে, এই ছেলেটিরও ঠিক সেই অবস্থা। এখন এই মুহূর্তে ওর কোনও কিছু করার ক্ষমতা নেই। ছেলেটা সম্পূর্ণ ভাবে দময়ন্তীর দখলে। নিজস্ব অধিকারে। মায়ের কথা মনে রেখে দময়ন্তী বেশ ভালো করে ওর মাথা মুছিয়ে দিল। কানের পাশে, গলার পাশে জল লেগেছিল। তাও মুছিয়ে দিল। কপালের উপর ঝুঁকে পড়া চুলগুলি আলতো করে সরিয়ে দিল দময়ন্তী। গলায়, বুকে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করলো। না জ্বর নেই। বুকের জামাটার দুটি বোতাম খোলা। সে-বোতাম দুটি দময়ন্তী লাগিয়ে দিল। ঘুমন্ত ছেলেটা যেন একটা রাজ্য। আর দময়ন্তী সেই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর গালে হাত রেখেছে। তাকে কেউ কিছু বলবার নেই। কেউ দময়ন্তীকে বাঁধা দেবার নেই। এ-যেন একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে যা খুশি তাই খেলা। একটা অদ্ভুত চিন্তা দময়ন্তীকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকে সে কী যেন দেখতে লাগলো। উন্নত নাকটির দু'পাশের চোখ দুটি ঘুমিয়ে আছে। টানা দুটি ভ্রু। মুখের গড়নটা বেশ সুন্দর। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা পাথর কালো চুল যেন ছেলেটাকে আশ্চর্য এক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। নিজের অজান্তে কখন যে দময়ন্তী একসময় ওর মাথার চুলগুলির মধ্যে হাত বুলিয়ে দিল তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ এক সময় লজ্জা পেতেই নিজের হাতখানা সরিয়ে নিল। এ-যেন ধরা পড়ার লজ্জা। দময়ন্তী কী তবে ছেলেটাকে একটু একটু করে ভালোবাসতে

শুরু করেছে? হঠাৎ মনে পড়লো তার এই কল্পনার রাজ্যে ডুবে থাকার দরুণ ছেলেটাকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াতেই ভুলে গেছে সে। কাউকে ভালো লাগলে মানুষ এমনি করে বুঝি সব কিছু ভুলে যায়। দময়ন্তী সহজ-স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলো। কল্পনার বিলাসিতায় এমনি ভাবে জড়িয়ে পড়লে চলবে না। কতর্ব্যটুকু তো করতে হবে। মা এসে যদি দেখেন, এখনও ওকে ওষুধ খাওয়ানো হয়নি তাহলে হাজারো বকুনি তার কপালে লেখা আছে। দময়ন্তী ওষুধের শিশিটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটির মুখটা একটু ফাঁক করে ওষুধটা ঢেলে দিল। ছেলেটা এবারে একটু নড়ে চড়ে উঠলো। ওষুধের একঝলক ঠোঁটের বাইরে পড়ে গিয়েছিল, দময়ন্তী নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে তা মুছিয়ে দিল। ছেলেটি এ-পাশ ফিরলো। তার একখানা হাত এসে দময়ন্তীর কোলে গিয়ে আশ্রয় নিল। সত্যি বলতে কী, দময়ন্তীর এতোটুকু ইচ্ছে নেই ওর হাতখানা সরিয়ে রাখতে। কিন্তু উপায় কী? এই অবস্থায় কেউ এসে দেখলে সে লজ্জা তো দময়ন্তীরই। ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ। ওর না-হয় জ্ঞান নেই, তুমি বাপু কোন আক্কেলে ওর হাতখানা কোলে নিয়ে দিব্যি বসে আছো? এ-কথা অনেকেই ভাবতে পারে। দময়ন্তী গভীর মমতায় ছেলেটির হাতখানা সরিয়ে রাখলো। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। হাতখানা আবার দময়ন্তীর কোলে এসে পড়লো। বারবার সরিয়ে দিতে দময়ন্তীর মন উঠছিল না। তার সহজ হিসেব। সে তো প্রেমের খেলায় মেতে উঠে কোনওরকম অশোভন আচরণ করছে না। তার আচার-ব্যবহারেও এমন কিছু গোপনীয়তা মিশে নেই যাতে অন্যের কাছে দৃষ্টিকটু লাগতে পারে। তাহলে সে কেন এতো কুণ্ঠিত হচ্ছে? মনকে কক্ষনও দুর্বল করতে নেই। একবার ওটা প্রশ্রয় পেলে নিজের প্রতি বিশ্বাসটা অনেক সময়েই হারিয়ে যায়। দময়ন্তী সুস্থ চিন্তা করলো। অসুস্থ ছেলেটা যদি এলোমেলো ভাবে হাতখানা তার কোলেই রাখে সে-অপরাধ না দময়ন্তীর, না ছেলেটির। সুতরাং এক্ষেত্রে অহেতুক লজ্জার কী থাকতে পারে? দময়ন্তী এবারে তাই সরিয়ে দিল না। সে শুধু নিষ্পলক চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। নিজের মনেই ভাবনার জাল বুনে চলে। কী নাম হতে পারে ছেলেটার? কোথায় থাকে, ওর দেশ-শহরই-বা কোনটা? ছেলেটিকে দেখে আর যাই হোক তাদের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় বলে মনে হচ্ছে না। ওর পরনে দামি ট্রাউজার, শার্ট, হাতেও অত্যন্ত দামি একটি ঘড়ি। হয়তো কোনও ধনী ঘরের ছেলে। বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে পথে বেরিয়ে পড়েছে। অথচ পথের কষ্ট সহ্য করতে পারেনি তাই এই অসুখ। সম্ভাব্য এই যুক্তিটা দাঁড় করিয়ে দময়ন্তী মনের মধ্যে একটা পরম নিশ্চিন্তের স্পর্শ পেল। চিক্কুয়া ভাইয়ার কথা যেন পুরোপুরি মিথ্যে হয়। আর যাই হোক ছেলেটা যেন চোর-গুন্ডা না-হয়! চোর-গুন্ডারা কী এমন সুন্দর হয়? তারা কী শিশুর মতো নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ঘুমাতে পারে? কক্ষনও পারে না। ঘুমন্ত মানুষকে কোনও মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। দময়ন্তীর প্রার্থনা, জেগে ওঠার পরেও যেন ছেলেটির পরিচয়ে পবিত্রতা বজায় থাকে। হঠাৎ দময়ন্তীর মনটা একটা ধাক্কা খেল। একটু আগেই সে ভাবছিল, চোর-ডাকাতরা কী এমন সুন্দর হয়? কয়েক মাস আগের কথা। ইউনিভারসিটি থেকে বাসে করে ওরা চার-পাঁচ বন্ধু ফিরছিল। বাসটা নাসিক রোডে আসবার আগেই হঠাৎ হইচই, গন্ডগোল। কী ব্যাপার? অতো চেঁচামেচি কীসের? পরে জানা গেল, একটা পকেটমার ধরা পড়েছে। যাকে বলে একেবারে হাতে-নাতে ধরা। বাসের ভেতরকার বেশ ক'জন যুবক, মাঝ বয়েসী লোক ওই পকেটমার ছেলেটিকে বাস থেকে নামিয়ে পুলিশ-স্টেশনে নিয়ে গেল। দময়ন্তী ওরা বাস থেকেই ছেলেটিকে দেখলো। সুন্দর, ঝকঝকে চেহারা। যেমন পোশাক, তেমনিই স্মার্ট। কে বলবে সে পকেটমার? এমন চেহারা নিয়ে কখনও......দময়ন্তী নতুন করে ভাবলো এবারে, আসলে সুন্দর চেহারার জন্য এই ধরনের কাজে ওদের বাড়তি একটা সুবিধে থাকে। হঠাৎ করে কেউ সন্দেহ করতে পারে না আর সেই সুযোগ নিয়ে ওরা যা খুশি তাই করে বেড়ায়। হে ভগবান, হে গণপতি বাবা, দময়ন্তী মনে মনে করুণ প্রার্থনা জানালো, ছেলেটির মাথায় যেন কোনও কলঙ্কের বোঝা না-থাকে।

দময়ন্তী আর বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় পেল না। ছেলেটা আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। দীর্ঘ রাত্রি অবসানের পর ফুলের দল পাপড়ি ছড়িয়ে প্রথম যেমন সূর্যকে দেখে, ছেলেটি তেমন ভাবে তাকালো দময়ন্তীর দিকে। তাকিয়ে আছে গভীর ভাবে। দময়ন্তী লজ্জায় নিজেকে রাঙা করে

তুললো না। চোখ না-সরিয়ে ছেলেটির দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দিল। ছেলেটি দময়ন্তীর চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘরের চারদিকে বোবা দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল। আবার তাকালো দময়ন্তীর চোখের দিকে। ম্লান কণ্ঠে বললো, আমি এখন কোথায়?

আমাদের বাড়িতে।

আপনি কে?

আমি? দময়ন্তী কী যেন একটু ভাবলো। শেষে বললো, আমি দময়ন্তী উথাইয়া। এই বাড়ির মেয়ে।

আমি এখানে? মানে আপনারা আমাকে কেমন করে এখানে নিয়ে এলেন?

গোবিন্দনাথ এবং তাঁর ছেলেদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারা এই ঘরের দিকেই আসছিলেন। ছেলেটির শেষের কথাগুলি গোবিন্দনাথের কানে পৌঁছেছিল। তিনি ঘরে ঢুকে ছেলেটির দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালেন। সামান্য একটু হেসে বললেন, আভি হোঁশ আ গিয়া বেটে। আচ্ছাই হুয়া। তুমি সকালবেলা নাসিকের বাস থেকে এই একলাহারী গ্রামে নেমেছো! আমার দোকানের সামনে আসতে-না-আসতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাও। গায়ে প্রচন্ড জ্বর ছিল। তাই তোমাকে আমার এই বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। গোবিন্দনাথের কথাগুলো সে খুব মন দিয়ে শুনলো। কী যেন ভাবলো। তা. এই মুহূর্তে আর কোনও ভাবনা নয়। ছেলেটি অসহায় ভাবে ঘরের উপস্থিত সকলের মুখের ওপর চোখ দুটিকে বুলিয়ে নিল। গোবিন্দনাথ বললেন, এরা আমার ছেলে। রঙ্গনাথ, বিরজু আর চিক্কুয়া। ছেলেটি মাথা নাড়ালো অর্থাৎ সে বুঝেছে। তারপরে খুব নিচু সুরে বললো, আমার না ভীষণ খিদে পেয়েছে। আপনারা আমাকে কিছু খেতে দেবেন?

হ্যাঁ বেটে। জরুর খেতে দেবো। গোবিন্দনাথ মেয়েকে এক বাটি আঙ্গুরের রস আনতে বললেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এক বাটি আঙ্গুরের রস গোবিন্দনাথের সামনে তুলে ধরলো দময়ন্তী।

লিজিয়ে পিতাজি।

ক্যায়া ম্যয় পিউ? আমাকে দিচ্ছিস কেন? গোবিন্দনাথ সস্নেহে মেয়েকে একটি ধমক লাগালেন, ছেলেটাকে দে—

ছেলেটার দিকে এগিয়ে ধরতেই সে দময়ন্তীর হাত থেকে আঙ্গুরের বাটিটা নিয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে শেষ করলো। শূন্য বাটিটা যথাস্থানে ফেরত দিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। গোবিন্দনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শুয়ে পড়লে কেন? রুটি-সবজি খাবে না?

না। পরে খাবো।

এই যে বললে, তোমার ভীষণ খিদে পেয়েছে?

এখন আমার শুধু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। শুধু ঘুমোতে।

ঠিক হ্যায় বেটে, তুমি নিদ যাও।

দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। সরযূ রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। যশোমতী একটা মোটা নক্শা কাটা কাঁথা সেলাই করছেন। কোলের উপর পড়ার বই রেখে দময়ন্তী জানলা দিয়ে গোদাবরী নদীর দিকে তাকিয়েছিল। যশোমতী সেলাই করতে করতে বললেন, হ্যাঁ রে দময়ন্তী, দাওয়াই আর এক দাগ ওকে খাইয়ে আয়। সময় তো হয়ে গেল। ডাঃ দীঘে বলেছেন, ঘড়ি ধরে সব কিছু করতে। আর শোন, গিয়ে যদি দেখিস ঘুম ভেঙে গেছে তবে আমাকে ডাকবি।

দময়ন্তী ঘরে ঢুকে দেখলো, ছেলেটার ঘুম ভাঙেনি। সে তাই সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে এসে জানালো, নিদ্ নেহি টুটি। এখনও ঘুমাচ্ছে।

ঠিক আছে। দাওয়াইটা খাইয়ে দে তাহলে।

দময়ন্তীর পক্ষে ওষুধটা খাওয়ানো এবারে একটু অসুবিধেই হয়ে উঠেছে। বালিশের কোণে ছেলেটির মুখটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ভালো করে বালিশের উপর না-তুলে দিলে ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। এতো বড়ো একটা ছেলেকে ঠিক ভাবে রাখা কী সহজ কাজ? জল থেকে সোনা তোলা মেয়ে সে। তার কাছে এ-কাজটুকু কিছুই নয়। সঙ্কোচ যেটুকু তা হলো একটি পুরুষকে স্পর্শের

লজ্জা। সেই লজ্জায় কেমন যেন এক আবেগ মিশে রয়েছে। এক অনাস্বাদিত আবেগের শিহরণ। দময়ন্তী তার বাঁ হাতখানা ছেলেটির ঘাড়ের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে উঁচু করে অনেকটা প্রায় নিজের বুকের কাছাকাছি তুলে ধরলো। ধানের ক্ষেতে বাতাস লাগার শিহরণ। দময়ন্তীর হৃদয়ে কী উত্তাপ লেগেছে? বেতস পাতার মতো সে কাঁপছে। তবুও মনে হয় সে যেন হারিয়ে ফেলেছে তার সব লজ্জা সরম। ছেলেটার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ মেলে চাইলো। দময়ন্তী কৈফিয়ত দেবার সুরে যেন নিজের দোষ ঢাকতে কাঁপা সুরে বললো, দাওয়াই পিনা হ্যায়। মুখ হাঁ করুন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ কথা শুনলো। বাধ্য ছেলের মতো সে মুখ হাঁ করলো। দময়ন্তী ওষুধের শিশিটা ঝাঁকাতে গিয়ে নিজের শরীরের কাঁপন যেন আরও বেড়ে গেল। শক্ত সমর্থ একজন জোয়ান লেড়কা প্রায় তার কোলের মধ্যে। কাঁপা হাতে দময়ন্তী ছেলেটির মুখে যতোটা-না ওষুধ ঢাললো তার চেয়ে বেশি ফেলে দিল মুখের বাইরে। ছেলেটি অত্যন্ত শান্ত গলায় এবারে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী জ্বর আসছে? আপনি ভীষণ কাঁপছেন। দময়ন্তীকে চুপচাপ থাকতে দেখে ছেলেটি আবার বললো, আপনার বোধহয় শরীর ভালো নেই।

আমি ঠিক আছি। আমার জ্বর আসছে না। কথাটা বলেই দময়ন্তী ওকে আস্তে আস্তে বালিশের উপর শুইয়ে দিল। কোনওরকম লজ্জা বা ভণিতা করলো না। শাড়ির আঁচল দিয়ে ওষুধটুকু মুছিয়ে দিতে দিতে একসময় জিজ্ঞেস করলো, আপকা নাম কেয়া? অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন। ছেলেটির কিন্তু মনে হলো এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন আর হতে পাবে না। সে যেন বেশ বিপদে পড়েছে বলে মনে হলো। কী করে ছেলেটা তার আসল নাম বলবে? তার যে অনেক বাঁধা। অনেক অসুবিধে। কিন্তু....দময়ন্তী নামের এই মেয়েটি তার মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলের জন্য যে সেবা-যত্ন করেছে তার কোনও তুলনাই হয় না। সেক্ষেত্রে মেয়েটিকে প্রথম কথাটাই মিথ্যে বলে কী করে? দেরি দেখে দময়ন্তী একবার খোঁচা দিল, নাম বললে জ্বর বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে নাকি? নাম বলছেন না যে—

দময়ন্তীর মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকালো ছেলেটি। কী যেন বলতে গিয়েও সে বলতে পারছে না। আসলে সে এই মুহূর্তে অনেক কথাই বলতে চায় কিন্তু এটা বুঝতে পারছে এখন কোনও কিছু বলাই ঠিক হবে না। ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠলো। তার মনের অবস্থাটা দময়ন্তীর বুঝবার কথা নয়। প্রশ্ন করে উত্তর না-পাওয়াতে তার বেশ লাগলো। নিজের প্রতি আস্থাটাও হারিয়ে ফেললো। সে দময়ন্তী উথাইয়া। এম. এ পড়ার কথা বাদই দিল, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে চারটে সোনা কুড়ানো মেয়ে সে। ভারতবর্ষের প্রতিটি খবরের কাগজে তার কথা খেলার পৃষ্ঠায় বড়ো করে লেখা হয়েছে। ছবি ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ইউনিভারসিটি চত্বরে, রাস্তা-ঘাটে বেশ ভিড় হয়ে যায়, অনেক ছেলে নিজেদের গর্বিত মনে করে, সেই দময়ন্তীকে এই ছেলেটি উত্তর পর্যন্ত দিল না। গ্রাহ্যই করলো না। দময়ন্তী অহঙ্কারী নয় কিন্তু সে সচেতন। তার এতো নাম-যশ অতোএব তার কথার উত্তর দিতে হবে এমন ভাবনা সে ছেড়ে দিল। কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতায় কী বলে? একটি মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না-দেওয়াটা শোভনীয়তার কোন পর্যায়ে পড়ে? যেখানে নাকি ছেলেটির জন্য তাদের সারা বাড়ি কর্তব্যের ত্রুটি রাখেনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছেলেকে এমন সেবা-যত্ন ক'জনে করে? নেহাত বাবার মতো খুব সজ্জন, ভদ্র একজন মানুষের চোখে পড়েছিল নয়তো অজ্ঞান হয়ে ওই রাস্তাতেই পড়ে থাকতে হতো। দময়ন্তীর চিন্তা আবার অন্য স্রোতে বইতে থাকে। ছিঃ ছিঃ এ-সব সে কী ভাবছে? অসুস্থ মানুষের সেবা করাই তো মানুষের ধর্ম। তারা এমন কিছুই বেশি করেনি। যেটুকু করেছে তা অবশ্যই করনীয়। নাম জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি উত্তর দেয়নি। এইটুকু তো তার অপরাধ? এর জন্য তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না-করালেও চলবে। নিশ্চয়ই ওর অন্য অসুবিধে রয়েছে নয়তো নাম বলাটা কোনও কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া ছেলেটি তো নিজে থেকেই তার সঙ্গে কথা বলেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জ্বর আসছে কি-না, এতো কাঁপছে কেন? শরীর ভালো তো? পরম শুভানুধ্যায়ীর মতো সব কথা। দময়ন্তীর তো এখানেই বোঝা উচিত, ছেলেটি কথা বলতে চায়। কথা বলে। শুধু নিজের নাম

বলতেই তার আপত্তি। কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে সেজন্য দময়ন্তীর শুধু শুধু মন খারাপ করার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু কেন জানি একটু অভিমান হলো তার। কেন এই অভিমান, তার অধিকারই-বা কতোটুকু সে-সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না-গিয়েও দময়ন্তীর বুকটা ভারী হয়ে উঠলো। কারণ সে একজন মেয়ে। ছেলেটির চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটিও। দময়ন্তী নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পেল। মমতা মেশানো অথচ আদেশের সুরে বললো, আপনার নাম বলুন—তারপরেই নিচু সুরে কোমল গলায় আবার বললো, আমি জানতে চাইছি। ছেলেটি কিছুক্ষণ দময়ন্তীর কথা দুটি নিয়ে নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলো। দময়ন্তীর দুই চোখে সে যেন বিশ্বাসের পরম ছায়া দেখতে পেল যেখানে তার হয়তো আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। ছেলেটি খুব আস্তে অথচ স্পষ্ট করে নিজের নাম বললো, সঞ্জয় চৌধুরী।

দময়ন্তীর দুই ঠোঁটে হাসির ছোঁয়া। সে বিজয়িনী কিন্তু খুশিতে উত্তাল হলো না। যেন এটাই স্বাভাবিক, ছেলেটি তার নাম বলবে, এটা যেন দময়ন্তীর জানাই ছিল। সুতরাং অতিরিক্ত কিছু পাবার আনন্দে সে ভরপুর না-হয়ে সংযমের প্রকাশ দেখালো। একটু আগের তার দুরন্ত মনটা এখন অনেক শান্ত। দময়ন্তী প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে ঘরের সব কিছুকেই সুন্দর দেখতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো, কাঁহা কা রহেনাওয়ালা। বাড়ি কোথায়?

কলকাতা! সঞ্জয় কথা বলছে যেন বিষ পান করছে।

বাঙালি? দময়ন্তীর ছোট্ট প্রশ্ন।

হ্যাঁ! একটু চুপ করে থেকে সঞ্জয় আবার বললো, ব্যস, এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। জিজ্ঞেস করলে......সঞ্জয় থামলো।

জিজ্ঞেস করলে কী? আর উত্তর দেবেন না এই তো—

হ্যাঁ! দময়ন্তীর কাজল কালো দীঘল চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সঞ্জয় বললো, এ-গুলিও মিথ্যে বলতাম। কিন্তু পারলাম না বলতে।

কেন? কৌতুকের সুরে দময়ন্তী প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল!

আপনার সঙ্গে মিথ্যে দিয়েই প্রথম কথা শুরু হোক, এটা চাইনি বলে। তবে দোহাই আপনার, যা জিজ্ঞেস করেছেন ওর বাইরে আর একটি প্রশ্নও আমাকে করবেন না। আমাকে ভুলে থাকতে দিন। সব কিছু ভুলে থাকতে দিন। আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। নিজের মনের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করে চলেছি। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করবেন না। আমার শুধু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। একটানা ঘুমোতে। অনেকদিন বাদে একটু শান্তিতে ঘুম আসছে। একটু শান্তিতে......সঞ্জয় আবার বোধহয় ঘুমোবে। চোখের পাতা দুটি বুজে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। দময়ন্তীর সেই মুহূর্তে মনে হলো সঞ্জয় যেন ভীষণ দুঃখী। ভীষণ! কিন্তু কী ওর দুঃখ? দময়ন্তীর সেই দুঃখ বেদনার সন্ধান খুঁজে পেতেই হবে। অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সঞ্জয় রাজি নয়। কিন্তু কেন? উত্তর না-দিতে চেয়ে সে কিছু গোপন করতে চাইছে। কাকে ঢাকতে চাইছে সঞ্জয়? নিজেকে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দময়ন্তীকে জানতেই হবে। অন্য কিছু নয়, শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে সঞ্জয়ের মন থেকে সমস্ত বেদনার শেষ বিন্দুটুকুও মুছে দেবে এই তার আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষেত থেকে সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলো রঙ্গনাথ বিরজু, চিক্কুয়া। মুখ-হাত ধুয়ে তারা রান্নাঘরের দাওয়ায় গোল হয়ে বসলো। সরযূ ওদের জন্য চা তৈরি করছে। দময়ন্তী তিন দাদাকে বেতের ডালায় করে তিন ডালা মুড়ি দিল। লঙ্কা-পেঁয়াজ আদা আর সরষের তেলে মাখা মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিরজু জিজ্ঞেস করলো, লেড়কা কোই বাত্ চিত কিয়া? দময়ন্তী ঘাড় নেড়ে জানালো, বলেছে।

কেয়া বোলা? চিক্কুয়ার প্রশ্ন।

বাঙালি হ্যায়। নাম সঞ্জয় চৌধুরী। কলকাতায় থাকে।

ইহা কিউ আয়া, কী কারণে আমাদের এই একলাহারী গ্রামে এসেছে এতোটা পথ পার হয়ে, সে-সম্বন্ধে কিছু বললো? রঙ্গনাথ প্রশ্ন তুলে ছোটবোনের দিকে চেয়ে রইলো।

না। সে-সব কিছুই বললো না।

তুই জিজ্ঞেস করেছিলি?

হ্যাঁ।

তবুও বললো না?

বলেছে, আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না। ওর বেশি আর কিছু বলবো না।

ওকে দু'বেলা পুজো করতে হবে, এ-সব বলে-টলেনি তো? চিকুয়া অন্য দিকে তাকিয়ে মুড়ি খেতে খেতে বললো।

ইস কা মতলব? এটা আবার কী কথা?

আরে বাবা এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলি না? চিকুয়া ঠাট্টার সুরে বললো, চাকরি-বাকরি না-করে কোনও বাড়িতে যদি সাধুবাবা সেজে গুরুজি হয়ে বসতে পারে তবে আর কে কষ্ট করে বল?

ও-সব ঠাট্টা রাখো। দময়ন্তী বললো, তুমি যা ভাবছো মোটেই তা নয়। গুরুজি-টুরুজি হওয়ার কোনও ব্যাপার নয়। দময়ন্তীর ইচ্ছা হচ্ছিলো বলে, ছেলেটির গভীর মনে আসলে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে, যেটা সে বলতে চাইছে না অথচ ওর চোখ-মুখের নিরুত্তাপ ভাব কথা বলার ধরনেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে এ-সব কথা তো সে দাদাদের সঙ্গে খোলাখুলি বলতে পারে না। তার কী মনে হয়েছে সঞ্জয় সম্পর্কে এইটুকু সময়ের মধ্যে তার ধারণা, একান্ত ভাবে তারই। বড়ো তিন দাদার সঙ্গে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে কী করে? বিশেষ করে নিজে থেকে?

সরযূ তিনজনকে তিন বাটি চা দিল। নিজেও এক বাটি নিয়ে স্বামী দেওরদের মধ্যে বসলো। দময়ন্তী চা খায় না। সে চুপচাপ বসে রইলো। রঙ্গনাথ চায়ের বাটিতে ছোট্ট একটা চুমুক বসিয়ে বললো, ছেলেটা কিছু লুকোতে চাইছে। তার কী গোপনীয়তা থাকতে পারে?

গোপনীয়তা রয়েছে বলেই তো সব কিছু গোপন করতে চাইছে। বিরজু গম্ভীর হয়ে বললো, তোমাকে খুলে বলবে এটা আশা করো কী করে? কোথায় কলকাতা শহর আর কোথায় মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরের এই একলাহারী গ্রাম! পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এখানে আসবে বলেই ছেলেটা এখানে আসেনি। এইভাবে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতেই এইখানে এসে পড়েছে।

হো সেকতা, এই পর্যন্ত বলেই সরযূ থেমে পড়লো। রঙ্গনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালো। বললো, থামলে কেন? তোমার কী মনে হয়? স্বামীর ভরসা পেয়ে সরযূ আবার বললো, আমার মনে হয়, ছেলেটার বাবা-মা জোর করে ওর বিয়ে দিচ্ছিলেন। লেড়কি পসন্দ্ হয়নি। অথচ শাদী করতেই হবে। তাই উও লেড়কা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।

আচ্ছা সরযূ! তোমার এতো বুদ্ধি নিয়েও তুমি কী করে বিয়ের আগে টিচারের চাকরিটা বজায় রাখতে পারলে, না আমি সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

প্রথমে ধরতে পারেনি সরযূ। পরে খোঁচাটুকু হজম করে বললো, চাকরিটা আমার ঠিকই ছিল বিয়ের জন্যই আমি.......

তোমার বিয়ের কথা থাক, চিকুয়া হাসতে হাসতে বললো, ছেলেটির ব্যাপারে তোমার মতামতটা শেষ করো। সরযূ স্বামীর দিকে তাকাতেই রঙ্গনাথ বলে উঠলো, তুমি আর কী বলবে? তোমার মতামত তো শুনলামই।

তোমাদের চিন্তাধারা কেবল বিয়ে আর বিয়ে! আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ছেলেটা বিবাহিত। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে.....

খুব বুদ্ধি তোর। রান্নাঘর থেকে যশোমতী বড়ো ছেলের উদ্দেশে বললেন, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কেউ কী বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে? তাও এতো দূরে?

নাঃ, আসলে আমিও ঠিকমতো ভাবতে পারছি না বুঝলে মা। বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলে সরযূই আমাকে অন্যমনস্ক করে দিল।

নাচ না-জানে অঙ্গন ট্যারা। এই সুযোগে সরযূও আগের খোঁচাটুকুর পালটা দিয়ে বললো, তুমি এম. এ-টা পড়লে না কেন? এতো বুদ্ধি নিয়ে দারুণ রেজাল্ট করতে কিন্তু। রঙ্গনাথ স্ত্রীর কথায় মুচকি হাসলো একটু। তারপরে খুবই আস্তে বললো, সরযু, স্পোরর্টিংলী নিলাম কিন্তু।

তোমরা যাই বলো দাদা, চিক্কুয়া স্থির বিশ্বাসে বললো, ওই সঞ্জয় নামের ছেলেটা নিশ্চয়ই কলকাতাতে কোনও উলটো-পালটা কাজ করে এসেছে। তাই গা ঢাকা দিতে উপস্থিত হয়েছে আমাদের এখানে।

উলটো-পালটা বলতে? বিরজু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে।

অনেক কিছু হতে পারে। এই ধরো গিয়ে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি কতো কী? জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করো তোমরা। বিরাট ধরনের একটা অন্যায় না-করলে কেউ এ-ভাবে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ায় না। সেটা খুন খারাপি ছাড়া দ্বিতীয় আর কী হতে পারে বলো?

সবার অলক্ষ্যে দময়ন্তী একবার চিক্কুয়া ভাইয়ার দিকে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকালো। চিক্কুয়া ভাইয়া যেন বড়বেশি নিষ্ঠুরের মতো কথাবার্তা বলছে। সঞ্জয়কে ওই রকম ভাবতে দময়ন্তীর মন চাইলো না। সে ওই কথার প্রতিবাদ করতে চাইলো। কিন্তু সেটা করলে কতোখানি তার পক্ষে শোভনীয় হবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে দময়ন্তী আর অগ্রসর হলো না। একবার ভাবলো এটা তো নিতান্তই একটা আলোচনা। সুতরাং সে-ও এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবুও দময়ন্তী কিছুই না-বলে চুপচাপ সকলের কথা শুনে যেতে লাগলো।

কিন্তু ছেলেটাকে দেখে অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত-ভদ্র বলে মনে হয়। বিরজু চিক্কুয়ার আরও জোরালো যুক্তি শুনতে চায়। উত্তরও পেল সঙ্গে সঙ্গে। চিক্কুয়া বললো, ভাইসাব, চেহারা দেখে কী লোকের বিচার হয়? কে কী কাজ করতে পারে, না-পারে চেহারায় তার কিছুই লেখা থাকে না। লোক চিনতে আমাদের মুশকিল হয় তো ওই কারণেই। তারপরেই চিক্কুয়া একগাল হেসে বোনের দিকে চেয়ে বললো, এই আমাদের দময়ন্তী বহিনকেই দেখো না, জলে নামলেই একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। কোনও প্রতিযোগীই তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না অথচ এখন দেখো, কেমন সহজ-সরল শান্ত মেয়ে। জলের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক আছে বলে মনেই হয় না। সে যাই হোক, রঙ্গনাথ, বললো, এখন প্রশ্ন হলো সঞ্জয় যদি নিজে থেকে তার সম্পর্কে কিছু না-বলে তাহলে আমাদের জানবার কোনও উপায়ই নেই। অন্ধকারে এমন ভাবে হাতড়ে আজে বাজে মনগড়া হিসেব করে কোন লাভ নেই। কেন-না আমরা যা ভাবছি সঞ্জয় হয়তো তা নয় আবার আমরা যা ভাবতেও পারছি না সঞ্জয় সেই শ্রেণীরও কিছু হতে পারে। এখন আমরা যা আলোচনা করবো সবই অনুমান সাপেক্ষ। সুতরাং ও-নিয়ে অহেতুক কিছু ভেবে সমস্যার সুরাহা হবে না। ভালো-মন্দ যা হবে ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। তবে সরযূ যদি বের করতে পারে সঞ্জয় সত্যি সত্যিই বিয়ের ব্যাপারে বাড়ি থেকে চলে এসেছে তাহলে না-হয় আমরা চেষ্টা-চরিত্র করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি। কথাটা শেষ করে রঙ্গনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নির্মল হাসলো। ওই হাসিতে সরযূ ভুললো না। টিপ্পনীটা গায়ে না-মেখেও উত্তর দিল, ব্যঙ্গ করছো করো তবে তোমাদের অনুমানের উপরেও আমার এতোটুকু আস্থা নেই। চিক্কুয়া তো ছেলেটাকে চোর-ডাকু-খুনী পর্যন্ত বানিয়ে ছাড়লো।

আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, রঙ্গনাথ দময়ন্তীর দিকে চেয়ে বললো, আমরা সকলেই আমাদের অনুমানের সেতু তৈরি করে অনেক কিছু বলেছি, বানিয়েছি। দময়ন্তীর মতামতটা শোনা হয়নি। ওরটাও শোনা প্রয়োজন। তুই কী বলিস দময়ন্তী?

তুই যেন এটাকে আবার জলের মতো 'ইজ্জি' ভাবিস না। বিরজু হাসতে হাসতে বোনের উদ্দেশে বললো, বেশ ভেবে-চিন্তে কিন্তু বলিস।

দময়ন্তী প্রথমে কিছু বলবে না বলে ভেবেছিল। কিন্তু দেখলো, এই সুযোগ, দাদারা যখন নিজে থেকেই তাকে কিছু বলবার জন্য আদেশ দিয়েছে তখন চুপচাপ থাকার কোনও অর্থ হয় না। তাছাড়া বলবে নাই-বা কেন? তারও তো নিজস্ব একটা চিন্তা থাকতে পারে, মত থাকতে পারে। সেটা অবশ্য অন্য সকলের সঙ্গে মিলবে এমন নাও হতে পারে। সেটা আলাদা প্রশ্ন। দময়ন্তী পরিষ্কার

বললো, আমার মনে হয় ওর মনে ভীষণ দুঃখ। মস্ত বড়ো একটা আঘাত পেয়েছে। যাদের কাছ থেকে পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই ওর আপন লোক। সেই কারণে সব কিছু ভোলার জন্য এমনি ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কথাটা সব চেয়ে মনে ধরলো সরযুর। যেন দময়ন্তী যা বলেছে তা সবই ঠিক। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। সে এবারে টিপ্পনী কাটলো ছোট দেওরের উদ্দেশে, কী হলো ডাকু বিশারদ কিছু বলার আছে?

নেহি ভাবী। চিক্কুয়া প্রাণ খোলা হাসি হাসলো। বললো, বড়ো ভাইয়া তো বলেই দিয়েছে অনুমানের উপর নির্ভর করে আলাপ-আলোচনা চলতে পারে কিন্তু যেটা সত্যি সেটা প্রকাশ হবে না। সেটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।

দোকান থেকে গোবিন্দনাথ বাড়ি ফিরে এলেন। ছেলেটার ব্যাপারে মাথায় সারাক্ষণই একটা দুশ্চিন্তা ছিল। বাড়ি এসে দেখলেন, ছেলেটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সরযূকে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরের পর আর ঘুম ভাঙেনিও?

বিকেলের দিকে একবার জেগেছিল, তারপর থেকেই আবার ঘুমোচ্ছে।

কথাবার্তা কিছু বলেছে?

হ্যাঁ। সরযূ গোবিন্দনাথকে যেটুকু জানাবার সবই জানালো। সব শুনে ভাবনায় পড়লেন গোবিন্দনাথ। নাম-ধাম না-হয় বলেছে। কিন্তু সেটাই সব নয়। আর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে না কেন? সেটাই ভাববার বিষয়। বেশ কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন গোবিন্দনাথ। তারপরে বললেন, তবে ছেলেটা যখন কিছু বলতে চাইছে না তখন তোমরা ওকে বিরক্ত কোরো না। মনের সঙ্গে কতোক্ষণ আর লুকোচুরি খেলবে? ওকে বলতেই হবে। তোমরা শুধু ওকে কোনওরকম প্রশ্ন করে চাপ-টাপ দিয়ো না। সঞ্জয় নিজে থেকে একদিন সব বলবে। সবই বলবে। ছেলেটাকে তোমরা অন্তত একটুখানি শান্তিতে থাকতে দাও। ওর মনের সঙ্গেই এখন ওর লড়াই শুরু হবে—

সেদিন রাত্রে ঘুমোতে পারলো না দময়ন্তী। দু'চোখের পাতা ঘুমের জন্য একটুও ছটফট করেনি। তার সারা মন জুড়ে শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। অসংখ্য ঢেউয়ের মতো একের-পর-এক চিন্তা এসে তার মনের সমুদ্রে আছড়ে পড়ছে। দময়ন্তী রাত প্রায় ভোর করে দিল শুধু সঞ্জয়ের চিন্তা করে। পুবের আকাশটা ক্রমশ ফর্সা হয়ে আসছে। নাম জানা ও অজানা হরেকরকমের পাখিদের ডাকাডাকিতে সারা একলাহারী গ্রাম যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। ওদের প্রভাত-বন্দনা শুনতে শুনতে দময়ন্তী বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে চলে এলো। গোদাবরী নদীর ওপারের মাথায় অনেক দূর থেকে টকটকে লাল সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে। দময়ন্তী সেই সূর্যের দিকে মুগ্ধ হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। এই পৃথিবীর যাবতীয় খারাপ ওই আগুনে পুড়ে ভোরের মতো কেন স্নিগ্ধ হয়-না দময়ন্তী সেটাই চিন্তা করলো। লাল সূর্যের আগুন রূপ দেখে দময়ন্তী বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় মিশে যাচ্ছিলো হঠাৎ আবার নতুন করে সঞ্জয়ের কথা মাথায় ঢুকলো। ছেলেটাকে জানলো না চিনলো না, তবুও মন পড়ে আছে ওকে কেন্দ্র করেই। দময়ন্তীর হৃদয়ের উত্তাপ এখনও নেভেনি। স্পর্শের স্বাদ তার সারা গায়ে। মুহূর্তের জন্য হলেও সঞ্জয় প্রায় তার কোলের মধ্যে ছিল। উত্তাপের সেই নিবিড় স্মৃতি দময়ন্তী কিছুতেই ভুলতে পারছে না। নানা ভাবে চিন্তা করে উপভোগ করছে বারবার। প্রথমে স্পর্শের স্বাদের জন্যই কী সঞ্জয়কে ভালো লেগেছে? দময়ন্তী তার কোনও ব্যাখা করতে পারবে না। সঞ্জয়কে শুধু কাছের মানুষ মনে হয়। মনের মানুষ। এর নাম যদি ভালোবাসা হয়, তবে তাই। দময়ন্তী সঞ্জয়কে ভলোবেসেছে।

বেশ বেলায় ঘুম ভাঙলো সঞ্জয়ের। প্রতিদিনের মতো গোবিন্দনাথ তাঁর দোকানে চলে গেছেন। তিন ভাই গরুর গাড়ি নিয়ে ক্ষেতে চলে গেছে সেই সাত সকালেই। যশোমতী এতোক্ষণ বাড়িতেই ছিলেন। একটু আগে গণপতির মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছেন। সরযূ আর দময়ন্তী রান্নার কাজে ব্যস্ত। যশোমতী মন্দিরে যাওয়ার আগে বারবার বলে গেছেন দুজনের উদ্দেশেই বেলা দশটা বাজতে চললো, ছেলেটা তো এখনও ঘুম থেকেই উঠলো না। যখন উঠবে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধুইয়ে, গা, হাত-পা ভালো করে মুছিয়ে দিয়ে রুটি, ডাল সবজি খেতে দেওয়া হয় যেন।

রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝেই বারান্দার কোণের ঘরে এসে দেখে যাচ্ছিলো দময়ন্তী সঞ্জয়ের ঘুম ভেঙেছে কি-না। এইবারে এসে দেখলো ঘুম ভেঙেছে তবে চুপচাপ এ-পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। দময়ন্তী ঘরে ঢুকতেই সঞ্জয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। দময়ন্তী চোখ সরিয়ে নিল না। দরজার একটা পাল্লায় পিঠ লাগিয়ে কোমরটা ভেঙে আশ্চর্য এক ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলো। সঞ্জয় ক্লান্ত সুরে খুব আস্তে বললো, কাল আমার মনে ছিল, আজ আবার ভুলে গেছি, কী নাম যেন এই জায়গাটার?

একলাহারী।

আপনার নামটাও মনে আসছে না। কী যেন....কী যে.....দময়ন্তী নিজের নামটা বলতে গিয়েও থেমে পড়লো। না-বলে দেখাই যাক না, ওর মনে পড়ে কিনা। এতো ভারাক্রান্ত কীসে ওর মন যে গতকালের বলা নামটাও এরই মধ্যে ভুলে গেল? দময়ন্তী চুপ করে থেকে ওকে ভাববার সুযোগ দিল।

কী নাম যেন আপনার? বলুন না—

দময়ন্তী।

হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সঞ্জয় ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো, দময়ন্তী উথাইয়া। তাই না?

হ্যাঁ। দময়ন্তী সামান্য একটু হাসলো। পরে বললো, এই তো মনে আছে।

আগে আমার সব মনে থাকতো। কোনও কিছুই ভুলতাম না। কিন্তু এখন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। একটা জিনিসকে ভুলতে সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। অথচ যা ভুলতে চাইছি তা পারছি না। সব সময় শুধু আমার......আমার মনে হয়.....দময়ন্তীর চোখে চোখ রেখে সঞ্জয় আস্তে আস্তে থেমে গেল।

কী মনে হয় আপনার?

না, কিছু নয়।

এই সুযোগে কিছু কথা হয়তো বের করে নেওয়া যেতো কিন্তু দময়ন্তীর মন তাতে সায় দিল না। সঞ্জয়কে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না-করে, চাপ দিয়ে কথা আদায় করার কোনওরকম প্রশ্ন নয়, সঞ্জয় নিজে থেকেই একদিন বলবে। সে-বিশ্বাস দময়ন্তীর আছে। এই বিশ্বাস তো ভালোবাসারই নামান্তর। দময়ন্তীর ভালোবাসা পেলে সঞ্জয় কতোক্ষণ নিজেকে গুটিয়ে রাখবে? অন্ধকারের বিবর থেকে বেরিয়ে আসবেই।

দময়ন্তী ভালো করে সঞ্জয়ের মাথা ধুইয়ে দিল। ভিজে চুলগুলি মুছিয়ে দিল পরম যত্নে। শার্ট খুলে ভিজে গামছা দিয়ে বুক, পিঠ, হাত ইত্যাদি পরিষ্কার করে তারপরে জামাটা আবার পরিয়ে দিল। এক ফাঁকে প্রায় ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে চিরুনিটা নিয়ে এসে সঞ্জয়ের মাথা আঁচড়িয়ে দিতে দিতে বললো, অনেকদিন তেল জল পড়েনি। জট পাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন, গোদাবরীতে গিয়ে ডুবিয়ে ভালো করে স্নান করবেন।

সঞ্জয় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল দময়ন্তীর মুখের দিকেই। দময়ন্তী সেটা খেয়াল করেনি। চোখাচোখি হতেই দেখলো, জলে টলমল করছে সঞ্জয়ের চোখ দুটি। আসলে সঞ্জয় নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। পারছে না। তাই বিন্দু বিন্দু করে জল জমা হচ্ছিল দুই চোখে। দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ করে দময়ন্তীদের কাছ থেকে এতো স্নেহ-ভালোবাসা, আদর যত্ন পেয়ে ভেতরকার বুভুক্ষু মনটা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতেই বুক ঠেলে বারবার কান্না আসছিল। মায়ের কথা বড্ড বেশি করে মনে পড়ছিল। দময়ন্তী গভীর মমতায় ওর মাথায় নিজের ডান হাতখানি বুলিয়ে দিতেই বর্ষার বাঁধ ভাঙলো। দময়ন্তীকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ওর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে একটা ছোট্ট শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো সঞ্জয়। কান্নাভেজা গলায় বললো, আজ নয়, আমি তোমাকে সব বলবো দময়ন্তী। আমাকে শুধু একটু সময় দাও। একটু সময়। তোমাকে যেদিন আমি সব বলতে পারবো সেদিন আমি এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবো।

এখন একটু শান্তিতে ঘুমাতে দাও।

মোটেই না। দময়ন্তী মৃদু হেসে বললো, কিছুতেই এখন আর ঘুমোতে দেবো না। খাবার আনছি। সেটা খেয়ে তারপরে যতো পারো ঘুমিয়ো। কথাটা বলেই দময়ন্তী কেমন যেন একটা লজ্জা অনুভব করলো। লজ্জা কাটাতে তাড়াতাড়ি পা চালালো রান্না ঘরের দিকে। খাবারটা নিয়ে সে কিন্তু ফিরে এলো না। সরযূকে বললো, ভাবি, খাবারের থালি নিয়ে তুমি যাও।

কেন? আপনার কী হলো আবার? সরযূ ননদকে ঠাট্টা করলো।

পায়ে ঝি ঝি ধরেছে। দময়ন্তী অনাবিল হাসলো।

খাবারের থালা হাতে সরযূকে দেখে সঞ্জয় সরল মনে বললো, দময়ন্তী এলো না?

সরযূ প্রশ্নটা শুনে হাসলো একটু। থালাটা সঞ্জয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো, তুমি খেতে থাকো, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সরযূ আর দাঁড়ালো না। রান্নাঘরে গিয়েই দময়ন্তীকে নিয়ে পড়লো।

এই যে ঝি ঝি পোকা, পায়ে ঝি ঝি ধরেছে তাই না?

কেন? কী হলো? দময়ন্তী একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো।

দময়ন্তীকে পসন্দ্। সরযূ মুখ টিপে হাসলো। বললো, শীগ্‌গির যাও—

এই কথা বললো? বিস্ময়ে ভেঙে পড়লো দময়ন্তী।

প্রায় তাই। জিজ্ঞেস করলো, দময়ন্তী এলো না? সরযূ অর্থপূর্ণ হাসলো। সব কিছু উড়িয়ে দেবার হাসি নিয়ে দময়ন্তী বললো, যদি সত্যিই বলে থাকে, তবে বলবো একটা পাগল ছেলে। আর তুমি যদি আমার পেছনে লাগতে চাও সেটা আলাদা প্রশ্ন।

দেখতে দেখতে পাঁচ-ছ'টি দিন কেটে গেছে। উথাইয়া পরিবারের সকলের সেবা-যত্নে সঞ্জয় একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো। বিশেষ করে যশোমতী, দময়ন্তী আর সরযূ যা করেছে তার তুলনা হয় না। গোবিন্দনাথ নিজে হাতে করে কিছু করেননি বটে, তার প্রয়োজনও ছিল না কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। কতো তাড়াতাড়ি ছেলেটা ভালো হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তা ছিল ওই একটাই। সেই কারণেই সঞ্জয় ক্রমশ ভালো হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ডাঃ দীঘেকে ইতিমধ্যে আর একদিন ডেকে এনেছিলেন বাড়িতে। ডাঃ দীঘে গোবিন্দনাথকে খুব শ্রদ্ধা করেন। অসময়ে তার চেম্বারে গোবিন্দনাথকে দেখে বলে উঠেছিলেন, কী ব্যাপার গোবিন্দনাথজি, আপনি আবার ছুটে এসেছেন, ছেলেটার খবর ভালো তো?

ইয়ে কোই বাত হুয়া ডাক্তারসাব? আপনার ওষুধ খেয়েছে আর মরীজ (রোগী) ভালো হয়ে উঠবে না! লেড়কা বিলকুল আচ্ছা হ্যায়। তবুও আপনি আর একবার দেখে আসবেন চলুন। তারপরেই গোবিন্দনাথ গলার সুর নিচু করে বলেছেন, আসলে কী জানেন ডাক্তারসাব, ছেলেটা ওর নাম আর কলকাতায় থাকে এইটুকু পর্যন্ত বলেছে। বাকি আর কিছু বলতে চাইছে না। এখানে কেন এসেছে, কী বৃত্তান্ত, কিছু না। সারাক্ষণ শুধু চুপচাপ থাকে। গুম হয়ে বসে কী যেন ভাবে। কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ-না বলে কাটিয়ে দেয়। তাই বলছিলাম আপনি আর একবার ওকে দেখুন।

গোবিন্দনাথের কথা রাখতে ডাঃ দীঘে সঞ্জয়কে দ্বিতীয়বার দেখেছেন। নতুন করে দেখার তো কিছুই ছিল না। জ্বর একেবারেই নেই। সুস্থ ছেলে। ভেতরের কথা কিছু বলে কিনা সেটাই যাচাই করতে আসা। বত্রিশ বছর ধরে এই নাসিকে প্র্যাকটিস করেছেন ডাঃ দীঘে। তারও বয়েস হতে চললো ষাটের ওপর। অনেক রকমের রোগী দেখেছেন। চিকিৎসা করেছেন। গোবিন্দনাথের কথা থেকে তার মনে হয়েছে এই ছেলেটির এখন মনের চিকিৎসা করার প্রয়োজন। কিন্তু কোন রোগীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সেটা ডাঃ দীঘে খুবই ভালো জানেন। তাঁর চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান কথা হলো রোগীকে প্রথমেই একেবারে আপন করে নাও। ডাঃ দীঘে সেই ভাবেই এগোলেন সঞ্জয় চকির ওপর স্থির হয়ে বসে ছিল। সারা মুখে চিন্তার ছায়া। ওর পাশে বসতে বসতে ডাঃ দীঘে বললেন, ক্যায়সা হো বেটে?

ভালো।

বহুত খুব। তা তোমার নাম তো সঞ্জয় তাই না?

আপনি জানলেন কেমন করে? সঞ্জয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডাঃ দীঘেকে দেখতে থাকে। ডাঃ দীঘে একগাল হেসে বললেন, তোমার নাম যে সঞ্জয় তা তো তুমি নিজেই বলেছো। আমি কিন্তু তোমার নাম-টাম নিয়ে অতোশত ভাবি না। নামে কী আসে যায় বলো? মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজের মধ্যে। এতো বড়ো দুনিয়ায় কতো কাজ করার আছে আর তুমি একজন ইয়ংম্যান হয়ে চুপচাপ ঘরে বসে আছো? কাজ করো। কাজ আর কাজ! মানুষের সঙ্গে মিশে যাও, নিজেকে মেলে ধরো, দেখবে তুমি অনেক বেশি শান্তি পাবে। আমার মনে হয় সেই শান্তিই হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছ। শুধু জানবে.....ডাঃ দীঘে তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না।

প্রথমে চাপা স্বরে পরে শব্দ করে কান্নায় ভেঙে পড়লো সঞ্জয়। ডাঃ দীঘে এবং উথাইয়া পরিবারের সকলে দেখলেন, সুস্থ-সবল একটি জোয়ান ছেলে কিভাবে পড়ে পড়ে শিশুর মতো কাঁদছে। আর ওই কান্নার ফলে সারা বাড়ির আবহাওয়াটাই কেমন যেন পালটে গেল। এতোগুলি মানুষ ঘরের মধ্যে কিন্তু কারোর মুখেই কোনও কথা নেই। একটা কথা বলতেও প্রত্যেকেরই দারুণ কার্পণ্য। এ ওর মুখ চাওয়া-চাউযি করছে। ডাঃ দীঘে গোবিন্দনাথকে একান্তে উঠোনে ডেকে নিয়ে বললেন, এই কান্নার পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। গোবিন্দনাথজি, সেটা আপনিও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমাব মনে হয় ওকে এই ভাবে জিজ্ঞেস করে কিছু লাভ নেই। ওকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে থাকতে দিন। মনের দ্বিধা সংশয় কেটে যাক, ওর ইতিহাস ও নিজেই বলবে। একটু সময লাগবে এই যা---আর আপনি সেই কটা দিন সঞ্জয়কে আপনার বাড়িতে রাখবেন কি-না সেটা অবশ্য.....

ডাক্তার সাব! মেরা ঘরমে সঞ্জয রহেগা এ কোই বড়া বাত নেহি। আমি চাই ছেলেটি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। তাছাড়া ওকে এখন আমার কাছে না-রেখেও উপায় নেই। আপনাকে একটা কথা আগে বলিনি, আমাব স্ত্রী যশোমতীকে এরমধ্যে একদিন সঞ্জয বলেছে, আমাব আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। আত্মহত্যার কথা প্রায়ই ভাবি।

কী--সাঙ্ঘাতিক কথা!

জী ডাক্তার সাব। গোবিন্দনাথ বললেন, এই অবস্থায় আমার বাড়ি থেকে চলে গিয়ে ও যদি তেমন কিছু করে বসে সে বদনশীব তো আমারই!

গোবিন্দনাথ এ-নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। বললেন, তোমাদের মতামতটা আমার জানাব প্রয়োজন। সঞ্জয় সুস্থ হয়ে উঠেছে ঠিক কথা। কিন্তু এব ভেতরে একটা চাপা যুদ্ধ চলছে। যে-কোনও মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে পাবে। আমবা কী ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে দিতে পারি না... . গোবিন্দনাথ থামলেন। বড়ো ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলো রঙ্গনাথ?

আমরা আর কী বলবো? তুমি যা'. ...

আমরা নয়। গোবিন্দনাথ রঙ্গনাথকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার মতামতটাই দাও।

তুমি এই ভাবে আলাদা করে প্রত্যেকের মত কেন নিতে চাইছো তা আমি বুঝতে পারছি না বাবা। নিতান্তই যদি আমাব উত্তর শুনতে চাও তবে বলবো তুমি কখনও অন্যায করোনি, অন্যায় ভাবোনি। সুতরাং তুমি যা বলবে তাই হবে।

তাতে তোমার নিজস্ব চিন্তাটা রইলো কোথায়? গোবিন্দনাথ সামান্য হেসে বললেন, তুমি পুরোপুরি নির্ভরশীল। অপরের বিবেচনার উপর নিজেকে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ো না।

কথাটা ওই ভাবে বলিনি বাবা। রঙ্গনাথও সামান্য একটু হেসে উত্তর দিল, আমাদের শিক্ষা, চিন্তা-ভাবনা সবই তো তোমার আলোতেই আলোকিত। তোমার চেয়ে বেশি কী আর ভাববো। আমি বলতে চেয়েছি তোমার সঠিক চিন্তাটাই আমরা মেনে নেবো। আমরা কে কবে তোমার উপর কথা বলেছি?

রঙ্গনাথ! গোবিন্দনাথ ভরাট গলায় বললেন, বুঝতে পারছি তর্কে তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠবো না। কেন-না তোমরা আমাকে এতো বেশি ভালোবাসো, শ্রদ্ধা করো আমার আর কিছু বলার নেই। গোবিন্দনাথ অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন, তোমাদের মতো সন্তান জনম জনম আমি যেন পাই। ওই সময়ে বিরজু বলে উঠলো, দাদা খুব সুন্দর বলেছে। আমারও তাই মত বাবা।

একটু গম্ভীর থেকে চুপচাপ বসেছিল চিক্কুয়া। যদিও সকলেরই কথা সে শুনছিল কিন্তু নিজের মনে মেঝের উপরে আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই দাগ কাটছিল। গোবিন্দনাথ ছোট ছেলের দিকে তাকালেন। চিক্কুয়া মাথা নিচু করেছিল। গোবিন্দনাথ বললেন, কী রে চিক্কুয়া, তুই কিছু বলছিস না যে? বাবার কথা কানে যেতেই চিক্কুয়া আঁক কাটা বন্ধ করলো। মেঝে থেকে মাথা তুলে গোবিন্দনাথের মুখের দিকে তাকালো। বললো, দাদা যা-যা বলেছে সে ব্যাপারে আমার কোনও দ্বিমত নেই। তবে এর সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সে-গুলি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করার আছে। আমি বলতে চাইছি, তোমরা ভালোমানুষ বলেই ব্যাপারটা যতো সহজ ভাবছো যদি তার উল্টোটা হয়? আমি সেই উল্টো দিকগুলি নিয়েই ভাবছি।

কী ভাবছিস তুই?

আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, অন্ধকার জগতের কোনও একটা কাজ না-করে সঞ্জয় কলকাতা থেকে এতো দূরে গা ঢাকা দিতে এমনি এমনি আসেনি। একটু সময় নিয়ে চিক্কুয়া আবার বললো, অবশ্য এ-সবই আমার অনুমান। অনুমানের উপর নির্ভর করে কখনও কাউকে দোষী ভাবা ঠিক নয় এটা আমি বুঝি। এখন প্রথম প্রশ্ন হলো সত্যি সত্যিই ও যদি দোষী হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহলে সারা একলাহারী গ্রামে তোমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? তাছাড়া এমনি ভাবে অচেনা একটি ছেলেকে তুমি কতোদিন তোমার বাড়িতে রাখবে? আর সেটা কতোখানি শোভনীয় হবে? লোকে পাঁচকথা বলতে পারে তাতে তোমার সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। আমি এই সব দিকের কথাই ভাবছি।

লোগো কো কহনা উও তো রহেগাই বেটে কিন্তু লোকের কথায় কান দিলে কেউ কখনও ভালো কাজ করতে পারে না। প্রথমে আমি তোর কথাটাই তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি, গোবিন্দনাথ বলতে আরম্ভ করলেন, সঞ্জয় কলকাতার একটা অন্যায় কাজ করে এসেছে। কী করে এসেছে, না-করে এসেছে সেটা জেনে কিন্তু আমরা ওকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিইনি। আমরা ওকে আশ্রয় দিয়েছি একজন অসুস্থ মানুষ হিসেবে। এই অসুস্থ মানুষটির সেবা করতে করতে যখন জানতে পারলাম ওর মনে বিরাট এক শূন্যতা, ভারসাম্যহীন, প্রতিনিয়ত যে আত্মহত্যার কথা ভাবে, তাকে বাড়ি থেকে বের না-করে দিয়ে যদি বেশ কিছুদিন এখানে রেখে শরীরের দিক দিয়েই শুধু নয় মনের দিক দিয়েও সুস্থ-স্বাভাবিক করে তোলা যায় সেটা কী অন্যায়? ধ্বংস তো মানুষ সর্বদাই করতে পারে, প্রতিষ্ঠিত করাটাই বড়ো কথা চিক্কুয়া। আর শোভনীয়তার কথা বলছিস? চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে তুই কোনও ভালো কাজ করতে গেলেই লোকে তোকে পিছিয়ে দেবার জন্য ওই সব শোভনীয় অশোভনীয় প্রশ্নের ঝামেলা তুলে বানচাল করে দেবে। মানুষের জন্য মানুষের সামান্যতম কিছু কর্তব্য আছে, আমরা সেটা করতে চাই না বলেই চারিদিকে গেল গেল রব তুলি। ওতে আমার সম্মান যাবে না চিক্কুয়া। আর যদি যায়ও তার জন্য আমি কিছু মনে করবো না। আমি আমার সম্মান হারিয়ে একটি ছেলেকে যদি বাঁচাতে পারি সেই আনন্দ আমার সারা জীবনের সম্মানের থেকেও অনেক অনেক বেশি।

যশোমতী অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন। স্বামীর কথাগুলি শুনতে শুনতে মনের ভেতরে এমন ভাবে দাগ কাটছিল যে বোবা বিস্ময়ে থমকে ছিলেন। গোবিন্দনাথের কথা শেষ হতেই তিনি চিক্কুয়াকে প্রশ্ন করলেন, সঞ্জয় থাকবে আমাদের বাড়িতে আর নিন্দে করবে গ্রামের লোক? তারচেয়ে এক কাজ করলেই হয়, গ্রামের অন্য কারো বাড়িতে ও থাকুক আমরা নিন্দে করবো না। যশোমতীর কথায় সবাই উত্তাল হেসে উঠলো। সরযূ বললো, মা তুমি যা বলেছো না, খুব সুন্দর।

ঠিকই বলেছো বহুরানি, গোবিন্দনাথ সরযূকে সমর্থন করে বললেন, রঙ্গনাথের মা বেশ বলেছে

কিন্তু। ব্যাপারটা ঘটলো তখনই। উথাইয়া পরিবারের সকলে যখন বাইরের খোলামেলা উঠোনে বসে এই সব আলোচনা করছিলেন, সঞ্জয় তখন বারান্দার কোণের দিকে ঘরে চুপচাপ শুয়েছিল। সে প্রতিটি কথা যদিও শুনতে পায়নি কিন্তু টুকরো টুকরো দু-একটি কথা যা কানে এসেছে তাতেই পরিষ্কার বোঝা গেছে আলোচনাটা তাকে কেন্দ্র করেই এবং তার এখানে থাকার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে। সঞ্জয় মনে করলো, এখানে তারও একটা ভূমিকা রয়েছে। চুপ করে ঘরের কোণে এই ভাবে পড়ে না-থেকে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তার বক্তব্যটাও তুলে ধরা উচিত। তাহলেই বরং পুরো ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠবে।

সঞ্জয় ঘর ছেড়ে বারান্দায় বের হতেই উঠোনের মানুষগুলি তাদের কথা হারিয়ে ফেললেন। আসলে সঞ্জয়কে তারা কেউ এই মুহূর্তে আশা করেননি। তারা ভেবেছিলেন, সঞ্জয় ঘুমোচ্ছে! সেই সঞ্জয় তাদের কথার মাঝখানে, কয়েক পা দূরেই দাঁড়িয়ে। গোবিন্দনাথ খুব আন্তরিক ভাবে ডাকলেন, এসো সঞ্জয়। আমরা একটা আলোচনা করছিলাম।

জানি। সঞ্জয় উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে যশোমতীর মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকালো। খুব শান্ত গলায় বললো, মাতাজি আপনাদের আলোচনার মধ্যে এসে পড়েছি, মনে কিছু করবেন না।

নেহি বেটে নেহি। কিছু মনে করলাম না। যশোমতীর গলা আবেগে প্রায় বুজে এলো। তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে!

আপনি আমাকে এই ক'দিনে যে-সেবা-যত্ন করেছেন, স্নেহ-আদর করেছেন মায়ের থেকে কম কী? আমার নিজেরও একটা মা রয়েছে। সঞ্জয় উদাস সুরে বলতে থাকে, আমাকে খুবই ভালোবাসেন। সেই মাকে ছেড়ে আমি আজ আড়াই মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনাকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

বেটে, পথে পথে এই ভাবে ঘুরে কেন কষ্ট করছো? মায়ের কাছে ফিরে যাও—যশোমতীর কথাটা শোনামাত্র সঞ্জয়ের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। সকলেরই তা নজরে পড়লো। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সঞ্জয় বললো, মাতাজি সেটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। আমি নিজেও জানি না আগামীকাল আমার ভাগ্যে কী লেখা রয়েছে। আপনাদের সকলের কাছে শুধু একটা প্রার্থনা করবো—সঞ্জয় থেমে পড়লো।

হাঁ হাঁ কহো বেটে। যশোমতী যেন প্রাণ ঢেলে জানতে চাইলেন।

গোবিন্দনাথ, রঙ্গনাথ, বিরজু, চিক্কুয়া, সরযূ ও দময়ন্তী সকলেই গভীর আগ্রহে সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সকলেই ভাবতে লাগলো এইবার বুঝি সে তার বিষণ্ণতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। শোনাবে নতুন কোনও কথা। সঞ্জয় কিন্তু অন্য কথা বললো। সে বললো, আমাকে দু-তিনটে মাস আপনাদের এখানে থাকতে দেবেন? আমি, আমি একটা দারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে আছি। আপনাদের সকলের আশা-আকাঙ্খা আছে, ভবিষ্যৎ আছে আমার আপাততো কিছুই নেই। তবুও তবুও আমাকে এমনি ভাবেই চলতে হবে। কিন্তু এখন আমার ভীষণ ভাবে বাঁচতে ইচ্ছা করছে। আপনারা আমাকে দু-তিন মাসের জন্য একটুখানি আশ্রয় দিন। মানসিক দিক থেকে একটু শান্তি পেতে আমার এই প্রার্থনা। এখানকার নদী, পাহাড়ে ঘেরা গ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা, সবুজ ক্ষেত আর পাখির ডাকের মধ্যে একটা শান্তি লুকিয়ে রয়েছে। আমি তাই এখানে কিছুদিন থাকতে চাই। আমি আপনাদের প্রত্যেককে কথা দিচ্ছি, আমার জন্য এ-বাড়ির কোনও ক্ষতি হবে না। আমি আপনাদের ক্ষতি করবো না।

ঠিক হ্যায় বেটে, তোমার যতোদিন ইচ্ছে তুমি এখানে থাকো— গোবিন্দনাথের কথাটা শেষ হতে-না-হতেই যশোমতী বললেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার নিজেরই একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তুমি কী আর আমাদের করবে বাবা?

পরদিন ভোরবেলা রঙ্গনাথ বিরজু আর চিক্কুয়া যখন গরুর গাড়ি নিয়ে ক্ষেতের কাজে যাবার

জন্য তৈরি হচ্ছিলো সঞ্জয়ও তখন ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ক'দিনে সে যতোটুকু বুঝেছে তাতে রঙ্গনাথ আর বিরজু ভাইকে তার খানিকটা সাধাসিধেই মনে হয়েছে। চিক্কুয়া ভাইয়া বোধহয় একটু অন্য টাইপের। সব কিছুর মধ্যেই সে যুক্তি তর্ক খোঁজে। সহজে ভাবাবেগে আপ্লুত হয় না। খুবই বাস্তব চিন্তা করে। সঞ্জয় বড়ো দুই ভাইকে ছেড়ে দিয়ে চিক্কুয়াকেই ধরলো। বললো, চিক্কুয়া ভাইয়া আমাকে আজ ক্ষেতে নিয়ে যাবে? আমি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে একসাথে কাজ করবো।

তুমি আমাদের বাড়ির অতিথি। তুমি কেন কাজে যাবে?

আমি তোমাদেরই একজন। কাজ চাই। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই।

কথাটা মন্দ বলোনি। চিক্কুয়া দার্শনিকের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মিত হেসে বললো, তোমার ক্ষেত্রে সেটাই বিশেষ করে প্রয়োজন। ঠিক আছে, যেতে যখন চাইছো চলো। তবে কাজ-টাজ তোমাকে করতে হবে না। ভালো লাগলে সে পরে দেখা যাবে।

তিনটে গরুর গাড়িতে চারজন রওনা দিল ক্ষেতের দিকে। এক সার দিয়ে তিনটে গাড়ি গড়াতে গড়াতে চলেছে, লাল মাটির উঁচু-নিচু পথ বেয়ে পাহাড়েব কোল ঘেঁষে। গরুর গলার ঘন্টার টুং-টাং ধ্বনি একটানা গানের সুরের মতো বাজছে। সঞ্জয় চিক্কুয়ার গাড়িতে ছিল। সে দু'চোখ ভরে চারদিকে দেখতে দেখতে চললো। মাথার উপরে চাঁদোয়ার মতো নীল আকাশ। একঝাঁক টিয়া পাখি ট্যা-ট্যা করে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোদাববী নদীটা এদিকটায় বেশি চওড়া হয়ে ছুটে চলেছে। জলেব মধ্যে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই! ওই সাত সকাল থেকেই ধোবীরা কাপড় কাচতে শুরু করে দিয়েছে। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই সবুজ ছবির সমারোহ। সারা নাসিক জেলা জুড়ে এখন পেঁয়াজ-গন্না অর্থাৎ আখের চাষ হচ্ছে। আঙ্গুর আর ভুট্টা তো রয়েছেই। যেন সবুজেব মেলা বসেছে।

চিক্কুয়া ওরা নিজেদের জমিতে গিয়ে পৌঁছালো।

তিন বিঘা ক্ষেতি জমি। প্রতিদিন আট-দশজন মজুর ক্ষেতে কাজ করে। একটা বাগান শুধু আঙ্গুরের। কিন্তু আসল যেটা সেটা হলো আখ আর পেঁয়াজের চাষ। আখ আর পেঁয়াজের ফলনের দায়িত্ব চিক্কুয়ার। সারাটা বছরই সে এই দুটি জিনিসের চাষ করে। শুধু তাই নয় সারা নাসিক জেলা ক্ষেতকারী সংগঠনের সে একজন প্রথম সারির নেতা।

রঙ্গনাথ, বিরজু আর চিক্কুয়া প্রতিদিনের মতো আজও ক্ষেত মজুরের দলকে ভাগ ভাগ করে দিল। কে কোথায় কোন ক্ষেতে কাজ করবে, কী কাজ করবে ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিয়ে নিজেরাও কাজে লেগে গেল। আখ আর পেঁয়াজের ক্ষেতে গেল চিক্কুয়া, আঙ্গুরের বাগানে বিরজু আর রঙ্গনাথ গেল ভুট্টার ক্ষেতে।

চার ঘন্টা ধরে ঘুরে ঘুরে সব দেখলো সঞ্জয়। তিন-ভাইয়ের কেউই ওকে কাজে হাত দিতে দেয়নি। রঙ্গনাথ বললো, প্রথম দিন এসেছো, শুধু দেখে যাও। পরে কোনোদিন ইচ্ছে হলে কাজ কোরো। বিরজু আর চিক্কুয়ারও একই মত। আগে দেখো। দেখে শেখো। তারপরে কাজ করবে।

এখন দুপুর। চারদিকে বোদের তেজ কেন-না সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপরে। একটা বড়ো পিপল গাছের ছায়ার নীচে ছোট ধরনের একটা কুঁড়ে ঘর। আসলে এটা বিশ্রামের শান্ত নীড়। পাশেই গভীর কুঁয়ো। দড়িতে ছোট একটা বালতি বাঁধা ছিল। সঞ্জয় কুঁয়ো থেকে জল টেনে তুললো। ঘাড়ে, মুখে জল ছিটিয়ে, বেশ খানিকটা খেয়ে চারদিক খোলা কুঁড়ে ঘরেব মাঝখানে একটা দড়ির খাটিয়াতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। কী আরাম? সঞ্জয়ের মনে হলো পৃথিবীতে এরচেয়ে বেশি সুখের মানুষের আর দরকার কী? মানুষ যে কেন অল্পেতে সন্তুষ্ট হয় না, সঞ্জয় এই সুখটুকু নিয়ে সারা জীবন সুখী হতে পারে।

দুপুরের খাবার নিয়ে দময়ন্তীকে এদিকে আসতে দেখে সঞ্জয় খাটিয়ার ওপর উঠে বসলো। খড়ের ছাউনীর নিচে এসে দময়ন্তী খাবারের ঝোলাটা মেঝেতে রেখে ওব দিকে একবার তাকালো। সঞ্জয় তাকিয়ে ছিল এক দৃষ্টিতে। যেন এই প্রথম দময়ন্তীকে দেখছে। আজকের দময়ন্তী তার কাছে নতুন।

আসলে জ্বরের ঘোরে অসুস্থ থাকা অবস্থায় বন্ধ ঘরের মধ্যে হাজারো দুশ্চিন্তার বেড়া জালে যে দময়ন্তীকে সঞ্জয় দেখেছে, সুস্থ অবস্থায় দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই দময়ন্তী অনেক বেশি সজীব। অনেক বেশি আপন এবং প্রেরণাময় বলে মনে হলো। দময়ন্তীকে দেখতে দেখতে সঞ্জয় হঠাৎ বলে উঠলো, আমি কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি।

সঞ্জয়ের কথা শুনে দময়ন্তী উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো! তার সেই দৃষ্টির মধ্যে পেয়ে হারানোর শূন্যতা। কে বলবে এই ছেলেটিই দু'দিন আগে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে কেঁদেছিল? তার সরু কোমরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে 'তুমি' সম্বোধন করে কথা বলেছিল? হ্যাঁ ছেলেটা তখন অসুস্থ ছিল। 'আপনি' না 'তুমি' কী বলেছে তা ওর নিজেরই এখন মনে নেই। কিন্তু দময়ন্তীর তো খেয়াল আছে। সে-ও একবার 'তুমি' সম্বোধন করে কথা বলেছিল। ছেলেটা বলেছিল, আমাকে শান্তিতে একটু ঘুমাতে দাও। উত্তরে দময়ন্তী বলেছিল, এখন আর ঘুমোতে দেবো না। খাবার আনছি। সেটা খেয়ে তারপরে যতো পারো ঘুমিয়ো, ওই অধ্যায়ের পরেও ছেলেটা অর্থাৎ সঞ্জয় তাকে আপনি করে কথা বললো। কোথায় যেন দময়ন্তীকে দেখেছে। খুব আস্তে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ করে কেটে কেটে উত্তর দিল দময়ন্তী—আমাদের বাড়িতে গত আট-নয় দিন ধরে দেখেছেন।

না-না, আমি সে-দেখার কথা বলছি না। সঞ্জয় অসহায় দৃষ্টিতে দময়ন্তীকে একবার দেখে নিজের চোখ দুটি বন্ধ করে মিনিটখানেক কী যেন ভাবলো। খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড়ের মাথায় তাকালো। অস্থির ভাবে পায়চারি করলো বার কয়েক। দু'হাতে মাথা চেপে আবার খাটিয়ার উপরে বসে পড়লো। মনের মধ্যে তোলপাড় করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা সূত্রকে। সঞ্জয়েব ভ্রূ দুটি কোঁচকানো ছিল। টান হলো এবারে। দুই ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা। চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল। বললো, মাস খানেক আগে কাগজে আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল? কথাটা শোনামাত্র দময়ন্তী খুশিতে ভেঙে পড়লো। কিন্তু সেটা ভেতরে, বাইরে তাব আশ্চর্য নির্লিপ্ত ভাব। চট করে কোনও উত্তর দিল না। সঞ্জয় খবর রাখে মনে হচ্ছে। ছবি ছাপার কথা যখন বলেছে পুরো ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই মনে পড়বে। ও একটু ভাবুক! ভাববার সময় দিলে সবই তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আসলে দময়ন্তী যেটা ভাবছে, সঞ্জয় নিজেই বলেছে গত আড়াই মাস ধরে সে এমনি অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দময়ন্তী মাস দেড়েক হলো। সুতরাং ওই বিক্ষিপ্ত হতাশাগ্রস্ত মন নিয়েই সঞ্জয় কোথাও কাগজ পড়তে পড়তে দময়ন্তীর চ্যাম্পিয়ন হবার খবরটাও পড়েছিল। সেটাই ধীরে ধীরে মনে পড়ছে। দময়ন্তীকে চুপচাপ থাকতে দেখে সঞ্জয় এবারে একটু তাড়া দিল। কী হলো? বলুন না কাগজে কখনও আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল?

হয়েছিল। দময়ন্তীর সংক্ষিপ্ত উত্তর। সঞ্জয়ের দুই চোখে আলোর ঝিলিক। অদ্ভুত সরল হেসে দময়ন্তীর চোখে চোখ রেখে বললো, আপনি এই গোদাবরী নদীটা সাঁতরে পারাপার হতে পারবেন?

আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠলো দময়ন্তী। দারুণ বলেছে সঞ্জয়। কী সুন্দর একটি কথায় দময়ন্তীর কৃতিত্বের কাহিনী তুলে ধরলো। সঞ্জয় কিছুই ভোলেনি তাহলে। দময়ন্তী এতোক্ষণে হাসলো। সেই হাসিতে প্রাণের ছোঁয়া। বললো, পারাপার হতে পারি। কটা সোনার মেডেল দেবেন?

তা গোটা চারেক তো বটেই। কথাটা শেষ করেই শব্দ করে হেসে উঠলো সঞ্জয়। প্রাণ খোলা কী সুন্দর হাসি। দময়ন্তীর মনে হলো এই আট-ন দিনের মধ্যে, শুধু তাই-বা কেন, গত আড়াই মাসের মধ্যে সঞ্জয় বোধহয় এই প্রথম এমন আবেগ মিশিয়ে হাসলো।

দময়ন্তী আর সঞ্জয় যখন হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল নিঃশব্দে তখন বছর আটেকের একটি ছেলে কুঁড়ে ঘরটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। দময়ন্তীর সেই দিকে চোখ পড়তেই সস্নেহে ডাকল, ইক্‌রে আ। ছেলেটি কাছে আসতেই দময়ন্তী আবার বললো, ক্যায়া, জীবন ঝালা?

নক্কো। ছেলেটি মাথা নাড়াতেই দময়ন্তী ঝোলার মধ্যে থেকে খাবার বের করে দু'খানা বজরার রুটি আর কিছুটা সবজি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললো, পালা এখন এখান থেকে। ভাগ্ যা— ছেলেটা চলে যেতেই দময়ন্তী ওর পরিচয় দিল, আমাদের ক্ষেতের চৌকিদারের ছেলে তিরশা। আমি

এলে এই খাবারটুকু প্রায় ওর বাঁধা।

তা না-হয় বুঝলাম। সঞ্জয় সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইকরে আ' কথার সুরেতে বুঝতে পেরেছি কাছে ডাকছেন। কিন্তু 'জীবন ঝালা' ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওটার অর্থ?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি-না সেটা-ই জিজ্ঞেস করলাম।

ক্ষেত থেকে তিন ভাই ফিরে এলো বিশ্রাম ঘরে।

কুঁয়ো থেকে জল তুলে হাত-পা ধুয়ে ওরা মেঝের খড়ের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে পড়লো। বিরজু বললো, দময়ন্তী জলদি খেতে দে। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

পরিশ্রম আর খিদে এ তো আমাদের সারা জীবনের সঙ্গী। রঙ্গনাথ হতাশার সুরে বললো, সত্যি এতো খাটছি, রাতদিন পরিশ্রম করছি কিন্তু দারিদ্র আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না।

এইবার দেখো না দাদা—চিক্কুয়ার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো। কঠিন সুরেই বললো, সরকারকে এবারে আমরা সহজে ছাড়বো না। আখ আর পেঁয়াজের ভালো দাম না-পেলে আমাদের ক্ষেতকারী সংগঠনের আন্দোলনের ঢেউ সারা নাসিকে ছড়িয়ে দেবো। কিন্তু কী ভাবে কী করা যায়, কী করে এগোব এ-সব ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনার আছে। চিক্কুয়ার সারা মুখে চিন্তার ছাপ। অনেকটা যেন হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু হঠাৎ কীসের স্পর্শে যেন সঞ্জয়ের সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে যেন তার হারানো অনেক কিছু ফিরে পেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চিক্কুয়াকে দেখতে লাগলো। সঞ্জয়ের সেই দৃষ্টিতে মিশেছিল একরাশ শ্রদ্ধা।

সঞ্জয়ের মুখের এই পরিবর্তন আর কারো চোখে ধরা না-পড়লেও দময়ন্তীর কাছে সে চিহ্নিত হয়ে গেল। পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এম.এ. পড়া মেয়ে দময়ন্তী সঞ্জয়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একান্তে চিক্কুয়া ভাইয়াকে এ-কথাটা জানাতে হবে। এই ক'দিন যে সঞ্জয় এতো বিমর্ষ ছিল তার মুখে আলোর রেখা। কেন? দময়ন্তীর মনে হলো এই প্রশ্নের ভেতরেই হয়তো সঞ্জয়ের কলকাতা ছাড়াব কাহিনী লুকিয়ে আছে। দমযন্তীর একটা সন্দেহ হলো। সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করে খুব সাবধানে ব্যাপারটা নিয়ে এগুতে হবে। দময়ন্তীর অনুমান যদি ঠিক হয় তবে সঞ্জয় মোটামুটি ভাবে ধরা দেবে। তার আগে অবশ্য বিশ্বাসের একটা সেতু নিশ্চয়ই তৈরি করে নিতে হবে। সেই বিশ্বাস, নিরাপত্তা সঞ্জয় উথাইয়া পরিবারে পাবে।

পরদিন দময়ন্তী ইউনিভারসিটিতে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো। সকাল তখন নটা সওয়া-নটা হবে। সঞ্জয় তার ঘরে বসে গভীর মন দিয়ে একটা বই পড়ছিল। দমযন্তীর স্নান-খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। মোটা করে একটা বিনুনী বেঁধে হালকা করে কাজল পড়লো দুই চোখে। বড়ো একটা কালো টিপ পড়লো কপালে। সাদা ব্লাউজ আব সাদা তাঁতের শাড়িতে দময়ন্তীকে খুব শান্ত আর খুব স্নিগ্ধ লাগছে। মা, বৌদিকে বলে, বই খাতা নিয়ে দময়ন্তী যখন সঞ্জয়ের ঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো, সঞ্জয় তখনও এক মনে পড়ে চলেছে। পড়তে থাকলে সে পড়ার মধ্যেই ডুবে যায়। অন্য দিকে খেয়াল থাকে না। দময়ন্তী তা লক্ষ্য করেছে। সঞ্জয় যেদিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সেদিন ওর কাছে একটা সাইড ব্যাগ ছিল। ওই ব্যাগে দু-একটা জামা-প্যান্ট থাকলেও বই-ই ছিল বেশি। সঞ্জয় সে-গুলিই পড়ে।

নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দময়ন্তী বাজারের বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো। নিজেদের চায়ের দোকানে চোখ পড়তেই দেখলো, বাবা তাঁর তিন-চারজন বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। দময়ন্তী টিকিট কেটে বাসে উঠতে যাবার মুখে শুনতে পেল, কে যেন চাপা স্বরে ডাকলো, দময়ন্তীজি।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল চিক্কুয়া একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ভাইয়া তুমি!

ক্ষেতকারী সংগঠনের প্রধান অফিস নাসিক রোডে। কিন্তু জেলার অনেক জায়গাতেই এর শাখা অফিস রয়েছে। একলাহারী গ্রামের এই বাজার এলাকাতেও ওর ছোট একটা শাখা আছে। এটার সম্পাদক চিক্কুয়া। সে বিশেষ একটা কাজে এই অফিসে এসেছিল। এখন আবার ক্ষেতে ফিরে যাবে।

চিক্কুয়া তাই বললো, সংগঠনের অফিসে এসে ছিলাম। তা তোর ক্লাস কটায়?

সাড়ে দশটায়।

ফিরবি কখন?

তিনটে, সাড়ে-তিনটের মধ্যে ফিরবো। তার পরেই দময়ন্তী ব্যস্ত হয়ে বললো, ভাইয়া তোমাকে গতকাল একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম সুযোগই পেলাম না। ইউনিভারসিটি থেকে ফিরে এসে আমি ক্ষেতে যাবো। তখনই তোমাকে জানাবো।

তুই আবাব কষ্ট করে ক্ষেতে আসবি কেন? বাড়িতে বলা যাবে না?

না।

আচ্ছা আসিস। তোদের বাস ছাড়তে এখনও দেরি আছে। আমি চলি—

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সঞ্জয় যশোমতী আর সরযূকে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। গ্রামের পাকা রাস্তা শেষ। মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চললো সঞ্জয়। বাঁ হাতে একটা আখের ক্ষেত। দুজন চাষী কাজ করছে সেখানে। সঞ্জয় ঢুকে পড়লো আখ ক্ষেতে। দুজনের মধ্যে যে বয়স্ক সে সঞ্জয়কে দেখে জিজ্ঞেস করলো, হমারা ক্ষেতি দেখনে কে লিয়ে আযে? সঞ্জয় একটু অবাক হলো। বললো, আমাকে আপনি চেনেন নাকি?

না, তা চিনি না। তবে গতকাল আপনাকে চিক্কুয়ার গরুর গাড়িতে দেখেছি।

হ্যাঁ। কাল আমি ওদের জমিতে গিয়েছিলাম। সারাদিন ছিলাম সেখানে। আজ আপনাদেরটা দেখতে এলাম। সঞ্জয় একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী নাম আপনার?

পূরণচাঁদ। আর এ আমার ছেলে সুরজ।

সুরজ একদৃষ্টিতে সঞ্জয়কে দেখছিল। বাবা পূরণচাঁদ হঠাৎ তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াতে সে খুশি হলো, না ক্ষুণ্ণ হলো কিছুই বোঝা গেল না। তবে তার হাতে একটা কাস্তে ছিল। সেটা তুলে ধরেই দু'হাত জড়ো করে নমস্কার জানালো। সঞ্জয়ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতি নমস্কার করলো। বললো, আমরা দুজনেই প্রায় সমবয়েসী। সুতরাং বন্ধুত্বে আপত্তি নেই তো?

তা নেই। সঞ্জয়ের হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিয়ে সুরজ বললো, আমি তোমাকেই লক্ষ্য করছিলাম।

কেন? ভেতরে ভেতরে সঞ্জয় শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে সুরজ পূরণচাঁদের দিকে তাকিয়ে বললো, বাবা, এই মুখটা একটু চেনা চেনা লাগছে না? ছেলের কথাতে পূরণচাঁদ নতুন দৃষ্টি নিয়ে সঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সঞ্জয়ের মানসিক অবস্থা তখন বলার নয়। দাঁতে দাঁত চেপে থাকার মতো ব্যাপার। পূরণচাঁদ করুণ সুরে বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছ বেটে। এর মুখটা অনেকটা তারাচাঁদের মতো। প্রথমে আমি খেয়াল করিনি, ধীরে ধীরে এখন......পূরণচাঁদ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ডুবন্ত অবস্থা থেকে ডাঙ্গায় উঠলো যেন সঞ্জয়। মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে জানতে চাইলো, তারাচাঁদ কে?

আমার কাকা। সুরজ বললো, আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ো ছিল। কিন্তু আমরা দুজনে বন্ধুর মতো ছিলাম। আমাকে ভালোওবাসতো খুব। গত বছরে মারা গেছে। একটু সময় চুপ করে থেকে সুরজ আবার বললো, তা তোমার নামটাই তো বললে না। কী নাম তোমার?

নাম আমার নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু তুমি আমাকে মানে আমি তোমার কাছে তোমার কাকা হয়েই থাকতে চাই।

বেশ বলেছো। সুরজ একগাল হেসে বললো, বেশ আজ থেকে তুমি আমার কাকা সাহেব।

ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করলো সঞ্জয়। কথায় কথায় জেনে নিল এখানকার কৃষকদের অবস্থা কেমন। তারা কতোটা সংগঠিত, আগে কেমন আন্দোলন করেছিল বা আগামী দিনের আন্দোলন সম্পর্কে তারা কিছু ভাবছে কিনা। জেনে নিল এখানকার জোতদার-জমিদারদের কথা। তাদের শোষণের কাঠামোটা কী ধরনের। নিজের মনে মনে সামান্য হাসলো সঞ্জয়। সারা দেশের একই ছবি।

ইউনিভারসিটি থেকে ফিরে এসেই দময়ন্তী ছুটলো ক্ষেতের দিকে। আসলে সে চিক্কুয়ার কাছে

ব্যাপারটা না-বলা পর্যন্ত শান্ত হতে পারছিল না। কারণ তার মন বলছে রহস্যটা রয়েছে এরমধ্যেই।

দময়ন্তীকে দেখে চিক্কুয়া একগাল হেসে দিল। বললো, তোর ব্যাপার কী বলতো? সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু বলবি বলে মনে হচ্ছে। কালকে বাড়িতে বলতে না-পেরে এখন আবার ছুটে এসেছিস। কী বলবি বল?

গতকাল দুপুরে খামারের ঘরে আমি আর সঞ্জয় ছিলাম। দময়ন্তী প্রথম থেকে চিত্রটা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে চাইলো। চিক্কুয়া তাড়া লাগিয়ে বললো, হ্যাঁ। তা কী হয়েছে?

তারপরে তোমরা এলে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলে। বিরজু ভাইয়া বললো ভীষণ খিদে পেয়েছে। রঙ্গনাথ ভাইয়া উত্তর দিল, খিদে আমাদের সারা জীবনের সঙ্গী। মনে আছে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ। তারপরে আমি বললাম, সরকারকে এবারে আমরা সহজে ছাড়বো না। আখ-পেঁয়াজের ভালো দাম না-পেলে ক্ষেতকারী আন্দোলনের ঢেউ সারা নাসিকে.....

ব্যাস! ব্যাস!! চিক্কুয়া ভাইয়া এবারে আমাকে বলতে দাও। দময়ন্তী খুব শান্ত গলায় বললো, এই ক'দিন যে সঞ্জয় সারাক্ষণ একটা হতাশা, মনমরা, গোপনভাব নিয়ে থাকতো তোমার ওই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সারা মুখ হঠাৎ একঝলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আমি বলতে চাইছি ও নিশ্চয়ই কোনও আন্দোলনের বন্ধু। তুমি যে ওকে চোর-ডাকু বলেছিলে সঞ্জয় তা নয়। দময়ন্তীর মাথায় গভীর স্নেহে একটা হাত রেখে চিক্কুয়া বললো, তোব খুব লেগেছে তাই না? আরে বাবা আমি তো ওকে সত্যি সত্যি চোর-ডাকু বলিনি। সন্দেহের কথাটাই বলেছি। এখন যেমন আবাব মনে হচ্ছে ও হয়তো কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী। কলকাতা থাকা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই পালিয়ে এসেছে গা ঢাকা দেবার জন্য।

কিন্তু এখন আমরা কী করতে পারি?

কী করতে পারি মানে? চিক্কুয়া বোনের মুখের দিকে তাকালো।

মানে ওকে কোনওরকম প্রশ্ন-টশ্ন না-করে চুপচাপ এমনি ভাবেই চলতে দেবো নাকি...দময়ন্তীকে মাঝ পথেই থামিয়ে চিক্কুয়া বললো, না। সঞ্জয়কে আমরা ওই ভাবে ব্যস্ত করে তুলবো না। আমরা শুধু ওকে দেখে যাবো। ওই দেখার মধ্য দিয়েই ও ক্রমশ নিজেকে তুলে ধরবে। কেন-না প্রকৃত মানুষ কখনও এই ভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।

একলাহারী নির্বাচন কেন্দ্র বরাবরই বিরোধী দলের দখলে। শাসক গোষ্ঠীর দল ঠিক করেছে সামনের ইলেকশনে এমন একজন মানুষকে দাঁড় করাতে যিনি পার্টি হিসেবে নয় ব্যক্তি হিসেবেই অনায়াসে জয়লাভ করতে পারেন। আর সেই মানুষটা হচ্ছেন গোবিন্দনাথ উথাইয়া। গত দুটি ইলেকশান থেকেই অবশ্য তারা গোবিন্দনাথের সমর্থন চেয়েছে। কিন্তু গোবিন্দনাথের এক উত্তর, ও-সব রাজনীতির আমি কিছু বুঝি না। ওর ভেতরে তাই যেতেও চাই না। এইবারেও সেই সব কিছু বলেও তিনি পার পেলেন না। পার্টির নাসিক জেলার সম্পাদক গোবিন্দনাথকে অনুরোধের পর অনুরোধ করে বললেন, আপনি শুধু এইবারটির জন্য সম্মতি দিন। হাইকম্যান্ড আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে মনোনয়ন দেবে না। গোবিন্দনাথ তবুও রাজি হতে পারলেন না। তিনি সম্পাদককে জানিয়ে দিলেন, আপনি বরং তিন-চারদিন বাদে একবার আসুন। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দিন।

সেইদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোবিন্দনাথ বাড়ির সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সামনের ইলেকশানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তিনি প্রত্যেকেরই মতামত চাইলেন। আলোচনার প্রথমে সঞ্জয় আসেনি। গোবিন্দনাথই ওকে ডেকে এনেছেন। বলেছেন, বেটে তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন। তোমার মতামতটাও আমার কাছে অনেক।

যশোমতী, রঙ্গনাথ, বিরজু, চিক্কুয়া, সরযূ এবং দময়ন্তী প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করে মতামত রাখলো। ওরা যখন বক্তব্য রাখছিল সঞ্জয়কে তখন অত্যন্ত উদাসীন দেখাচ্ছিল। আসলে সে প্রত্যেকের কথাগুলো খুব একটা মন দিয়ে শুনছিল না। চিক্কুয়া

এবং দময়ন্তী সেটা লক্ষ্য করেছে। চিক্কুয়া ওর দিকে তাকিয়ে বললো। সঞ্জয়, এ-ব্যাপারে তোমার মতামত কী? গোবিন্দনাথও উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ বেটে তুমিও কিছু বলো। সঞ্জয় প্রথমে চিক্কুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই গোবিন্দনাথের দিকে চাইলো। সামান্য একটু সময় নিয়ে সে ধীরে ধীরে বললো, ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষ এই একলাহারীতে থাকেন। শাসন ব্যবস্থাব এই কাঠামোর মধ্যে আপনি কী মনে করেন তাঁদের কোনওরকম উপকার করতে পারবেন? দুটো নলকূপ বসিয়ে, কিছুটা রাস্তা তৈরি করে, দুজনকে চাকরি পাইয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আপনার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ধনীদের আরও ধনী হওয়া এবং গরিবের আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ার ধারাটার কী আপনি কোনও পরিবর্তন করতে পারবেন? শোষণের কাঠামোটা আপনি যদি ভাঙতে না-পারেন তাহলে শুধু শুধু.....সঞ্জয় চোখের কোণ দিয়ে গোবিন্দনাথকে একবার দেখে নিয়ে ম্লান একটু হেসে বললো, আমার মতামত ছেড়ে দিন। আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

তুমি ঠিকই বলেছো সঞ্জয়। এই দেশেতে ভালো কিছুই করা যাবে না। গোবিন্দনাথ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললেন, সেই কারণেই একবার ইচ্ছে হয় একটু চেষ্টা করে দেখতে মানুষের উপকারে কতোটুকু আসতে পারি।

নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন গোবিন্দনাথ। শাসক গোষ্ঠীর নেতারা স্বভাবতই দারুণ খুশি এই প্রথম তাদের প্রার্থী এই কেন্দ্রে বিজয়ী হলেন। যদিও এটা তারা পরিষ্কার বুঝেছেন যে এই জয় তাদের দলের নয়, এই জয় গোবিন্দনাথেরই। তবুও তাদের আনন্দ করার কারণ আছে বই কী! কেউ কেউ এমন দাবিও করলেন গোবিন্দনাথকে অবশ্যই মন্ত্রী করতে হবে।

সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে গোবিন্দনাথের বাড়িতে। প্রত্যেকেই মিষ্টি, ফুল, মালা ইত্যাদি দিয়ে গোবিন্দনাথকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। বিরোধী পক্ষের যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন হেরে গিয়ে তারাও এক ধরনের আনন্দ অনুভব করলেন। এ যেন তাদের পরাজয় নয়। যোগ্যের কাছে ম্লান হওয়াটাই তো নিয়ম। সুতরাং তারাও গোবিন্দনাথজিকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। গোবিন্দনাথ সকলকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, আরে ভাই, তোমরা তখন থেকে 'গোবিন্দনাথ কী জয়' 'গোবিন্দনাথ জিন্দবাদ' আওয়াজ তুলছো। ইয়ে চীজ মেরা বিলকুল পসন্দ নেহি। তোমরা আমাকে ভোট দিলে। জয় তোমাদেরই এই জয় একলাহারী গ্রামের। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করে বললো, গোবিন্দনাথজি তুমি তো মন্ত্রী হচ্ছো। আমরা যেন তোমার কাছে আসতে পারি।

জরুর! স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন গোবিন্দনাথ, মন্ত্রী-টন্ত্রী বুঝি না ও-সব লোভ-টোভ আমার নেই। কিন্তু যদি বুঝি আমি ক্রমশ তোমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, তাহলে এ-সব ছেড়ে দিয়ে আমিই তোমাদের কাছে ফিরে আসবো।

বাইরের লোকজন একে একে সবাই চলে গেলে বাড়ি ফাঁকা হলো। এখন শুধু বাড়ির মানুষ ক'জন। সঞ্জয় ইচ্ছে করেই সারা সকালটা বাইরে বাইরে কাটালো। এইমাত্র বাড়ি ফিরলো। যশোমতী ওর হাতে মিষ্টি তুলে দিয়ে বললেন, বেটে, তুমি কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? বাড়িতে কতো মানুষ এলো, কতো আনন্দ......

আমি জানি মাতাজি। সঞ্জয়ের অবিশ্বাস্য নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর শুনে গোবিন্দনাথ দাওয়া থেকে পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, বেটে তুমি আনন্দ পাওনি?

এটা আমার কোনও আনন্দ-নিরানন্দের ব্যাপার নয়। আমি শুধু ভাবছি আপনার দয়ায় আপনার বাড়িতে যে আশ্রয় পেয়েছি.....

নেহি বেটে নেহি। দয়া মৎ কহো উত্তমেরা ফর্জ থা। গোবিন্দনাথ করুণ সুরে বললেন, আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি। সঞ্জয় স্থির ভাবে গোবিন্দনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। খুব আস্তে আস্তে অথচ স্পষ্ট ভাবে বললো, আপনি এখন বিধায়ক। হয়তো দু'দিন বাদে মন্ত্রীও হবেন। আপনার

এই নতুন ভূমিকায় আমি যদি এখানে থাকি আপনিই বিপদে পড়বেন।

কিউ বেটে? অ্যায়সা কেয়া বাত হ্যায়?

আপনি বিপদে পড়েন বা আপনার অসুবিধে হোক এটা আমি চাই না। তাই সময় থাকতে আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। এই গ্রামেই হয়তো থাকবো তবে এই বাড়িতে নয়।

তোমার কথা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না সঞ্জয়। গোবিন্দনাথ বললেন, শুধু এটুকু পারছি আমি, আমার পরিবার কোনও বিপদে যাতে জড়িয়ে না-পড়ে সেদিকে তোমার খেয়াল রয়েছে। আমার এই সরকারি তক্‌মাই কী তোমার চলে যাবার পেছনে কাজ করছে? তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চাও না এটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট সঞ্জয়। তবে এ-ভাবে তোমাকে চলে যেতে দেবো না। আমি বিপদে পড়ি-না-পড়ি সেটা আমার ব্যাপার। তারজন্য তোমাকে কখনও দায়ী করব না। যাও—সস্নেহে হাসলেন গোবিন্দনাথ। তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো। সবাই একসঙ্গে বসে খাবো।

এই বাড়িতে সঞ্জয়ের সবচেয়ে দূরত্বের সম্পর্ক ছিল চিক্কুয়ার। এখন ব্যাপারটা পুরোপুরি উল্টো। দুজনেই অত্যন্ত কাছের মানুষ। ব্যাপারটা কিন্তু রাতারাতি ঘটে যায়নি। আসলে সঞ্জয় প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার পর ক্ষেতকারী সংগঠনের অফিসে গিয়ে বসতো। উপস্থিত কৃষকদের সঙ্গে শুধুমাত্র আড্ডার খাতিরেই গল্প-গুজব করতো তা নয় আন্তরিক ভাবে তাদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো। হাজারো প্রশ্ন করে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতো। সমাধানের উপায় হিসেবে তারা কী ভাবছে অর্থাৎ কি-না তাদের চিন্তা-ভাবনা মানসিকতা কেমন একটি একটি করে প্রশ্নের মাধ্যমে সঞ্জয় ওদের প্রকৃত ভাবে চিনবার চেষ্টা করতো। মাঝে মাঝে সঞ্জয় নিজেও তার সুচিন্তিত মতামত দিতো। সেটা অবশ্য জোর করে চাপিয়ে দিয়ে নয়, কথা প্রসঙ্গে যেটুকু না-বললে নয় সেটুকুই বলা। ফলে হয়েছে কী এই এলাকার কৃষকরা যারা সংগঠনের অফিসে আসে তাদেব কাছে সঞ্জয় একটু একটু করে আপন হয়ে উঠেছে। আরও বেশি আপন করে দিয়েছে, পরিচিতি বাড়িয়ে দিয়েছে সুরজ। একমাত্র সেই সঞ্জয়কে কাকাসাহেব বলে ডাকতো। তার দেখাদেখি এখন সকলেই সঞ্জয়কে ওই নামেই ডাকে। এমনকী চিক্কুয়াও। কৃষকদেব উন্নতির জন্যে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এমনি এক গভীর আলোচনা সভায় চিক্কুয়া হঠাৎ বলে বসলো, কাকাসাহেব তুমি এ-ব্যাপারে কী ভাবছো? সঞ্জয় প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। সামান্য একটু হেসে বললো, তোমারও কাকাসাহেব? উত্তাল হেসে উঠলো চিক্কুয়া। কৌতুকের সুরে বললো, আমার বাবারও! গতকালই পিতাজি বলছিলেন প্রথম মাসেব মাইনে পেয়ে কাকে কী দেবেন। তখনই কথাটা শুনেছিলাম। পিতাজি বললেন, কাকাসাহেবকে দুটো পাঞ্জাবি বানিয়ে দেবো।

সেদিন সন্ধ্যার অনেক পবে সংগঠনের অফিসে যেতেই সঞ্জয়কে প্রায় ধমকে উঠলো চিক্কুয়া।

বাত কেয়া হ্যায় কাকাসাহেব? এতো দেরি করে এলে যে? আমরা তোমার একটা পরামর্শ নেওয়ার জন্য সেই তখন থেকে অপেক্ষা করছি।

এই একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে চিক্কুয়ার মধ্যে। যে-কোনও আলাপ আলোচনায় সঞ্জয় কাছে না-থাকলে নিজেকে বড়ো অসহায় এবং ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আগের মতো গঠনমূলক কোনও চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। সব সময়েই মনে হয় তার চিন্তাধাবাব চেয়ে সঞ্জয়ের চিন্তা-ভাবনা অনেক উঁচুতে। সুতরাং ওকে সর্বদা কাছে পাওয়া দরকার। আসলে এতোদিন সঞ্জয় সম্পর্কে চিক্কুয়ার কোনও ধারণাই ছিল না। মনে হতো স্রেফ শান্ত নিরুত্তাপ একটি ছেলে এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখন বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছে সঞ্জয় নিতান্ত সাদামাটা ছেলে নয়। কৃষকদের সমস্যা, তাদের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি ইত্যাদি ব্যাপারে তার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং পড়াশোনা রয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বললে মনের মধ্যে যদি কিছু হতাশা থাকে ক্রমশ তা কেটে যায়। খুব সুন্দর ভাবে একটা লড়াই-এর মনোভাব গড়ে তোলে। সঞ্জয় যতোক্ষণ যতো কথাই বলুক তার মূল কথা হলো, লড়াই ছাড়া বাঁচার কোনও রাস্তা নেই। আর গভীর ভাবে বলা যায় সঞ্জয় যখন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে কখনও মনে হয় না যে উড়ে আসা

কোনও অতিথি। মনে হয় তাদেরই মতো একজন বঞ্চিত কৃষক।

আমাকে ধমকে আমারই পরামর্শ চাইছো? মুখে সামান্য হাসি নিয়ে উপস্থিত সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে সঞ্জয়ের দৃষ্টি স্থির হলো চিক্কুয়ার মুখের ওপর। চিক্কুয়া বললো, সিরিয়াস বাত হ্যায় কাকাসাহেব। উও শালে পরাশরজি হ্যায় না, আমাদের নাসিকের দেওলালীর জোতদার, সরকার বাহাদুর ক্ষেতমজুরদের যে সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিয়েছে শালে ও ভি নেহি দেতা। কী করি বলো তো?

পরাশরজি কেয়া আপনা হাতসে চাষ-বাস করেগা? বিলকুল নেহি। সঞ্জয় খুব শান্ত গলায় বললো, ওর জমিতে তোমরা কেউ চাষ করবে না। বাইরে থেকে ক্ষেত মজুর আনিয়ে যাতে কাজ করাতে না-পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেখবে পরাশরজি তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। কেন-না চাষ না-করালে ওই বিরাট লোকসান ও কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। একটু চুপ করে থেকে সঞ্জয় প্রচ্ছন্ন এক খোঁচা দিয়ে বললো, সরকার নির্দ্ধারিত দিন-মুজুরী পেলেই তোমরা সন্তুষ্ট তো? সঞ্জয় কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওই খোঁচাটুকু দিয়েছে চিক্কুয়া ব্যাপারটা তো বুঝতে পেরেছেই, উপস্থিত কৃষকরাও মূল অর্থটা বুঝতে পেরে প্রায় সকলেই বলে উঠলো, ওতেও আমরা সন্তুষ্ট নই। কিন্তু উপায় কী। সঞ্জয়ের সারা মুখে প্রশান্ত এক হাসির মেলা।

গোবিন্দনাথ মন্ত্রী হয়েছেন। তাকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হয়েছে। তিনি হয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। তাকে এখন মুম্বাই থাকতে হয়। যদিও নাসিক থেকে মুম্বাই-এর দূরত্ব খুব বেশি নয় তবুও মন্ত্রী হওয়ার জন্য সেখানেই থাকতে হয়।

মন্ত্রী হয়ে প্রথম বাড়ি ফিরছেন গোবিন্দনাথ। নাসিক রোড স্টেশনে জনতার ভিড়। ট্রেন থেকে নামতেই জনতা গোবিন্দনাথের নামে জয়ধ্বনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানালেন গোবিন্দনাথ। বললেন, এটা ঠিক নয়। 'দেশ মাতা কী জয়' যদি বলতে তারও না-হয় মানে বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমার নামে জয়ধ্বনি কেন? আমি তোমাদেরই একজন। বিশেষ কিছু হয়ে তোমাদের থেকে আলাদা হতে চাই না। ও-সব জয়ধ্বনি-টয়ধ্বনি দেওয়া চলবে না। এরপরে জনতা আর বিশেষ আওয়াজ তোলেনি। নিঃশব্দে শুধু গোবিন্দনাথের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকতেই হইহই পড়ে গেল। তখন গাছের মাথায় শেষ বিকেলের ছায়া। অনেকক্ষণ আগে সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়েছে। কিন্তু আবীরের রং তখনও পশ্চিম আকাশকে মাখিয়ে রেখেছে। উঠোনে যশোমতী, সরযূ আর দয়মন্তী ডাল, বজরা ইত্যাদি ঝাড়াই-বাছাই-এর কাজ করছিল। যশোমতী স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে দিলেন। মিটমিট করে হাসছে সরযূ আর দয়মন্তী। গোবিন্দনাথ ঠাট্টার সুরে স্ত্রীকে বললেন, আরে ভাই মিনিস্টার আয়ে। উনকোণ স্বাগত তো করো। গভীর আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন এক ধরনের লজ্জা পেলেন যশোমতী। কী করবেন ভেবে পেলেন না। ছোট্ট মেয়ের মতো লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি গোবিন্দনাথকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসলেন।

আরে ভাই ইত্না কৌন মাঙ্গা? গোবিন্দনাথ প্রাণ খোলা হাসলেন। বললেন, ফুড মিনিস্টার কো আভিতক কোঈ ফুড না মিলা।

যশোমতী খাবার দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেই গোবিন্দনাথ সস্নেহে বললেন, তুমি কী ঠাট্টাও বোঝো না? ছেলেরা তো এখনও আসেনি ক্ষেত থেকে। ওরা আসুক। একসঙ্গে খাবো। গোবিন্দনাথের কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি। পিতাজি আয়ে হ্যায়, পিতাজি আয়ে হ্যায় বলতে বলতে রঙ্গনাথ, বিরজু এবং চিক্কুয়া সারা উঠোন মাতিয়ে দিল। রঙ্গনাথ খুশি ভরা গলায় বললো, আমরা জানতাম তুমি কালকে আসবে। একদিন আগে এসে আমাদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছো।

বেটে, বাত ইয়ে হ্যায় গোবিন্দনাথ তার তিন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মল হেসে বললেন, এই ক'দিনেই আমার মনে হচ্ছিলো অনেকদিন তোমাদেরকে দেখি না। মনটা তাই বাড়ির জন্য কেমন করে উঠলো। একদিন আগেই চলে এলাম।

তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমাদেরও খুব খারাপ লাগছিল পিতাজি। ম্লান হেসে বিরজু বললো, যদিও মুম্বাই চার-পাঁচ ঘন্টার পথ মাত্র তবুও বাড়িতেই যদি তোমাকে না-পেলাম চার ঘন্টার দূরত্বও যা, চারশো ঘন্টার দূরত্বও তাই।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ালো সঞ্জয়। সে জলগাঁও গিয়েছিল একটা কৃষক সভায় বক্তৃতা দিতে। দু'দিন সেখানে ছিল। এইমাত্র বাড়ি ফিরতেই গোবিন্দনাথের মুখোমুখি। গোবিন্দনাথ পরম স্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো কাকাসাহেব?

ভালো। সঞ্জয় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই গোবিন্দনাথ বলে উঠলেন, আবার প্রণাম কেন?

আপনি গুরুজন। আপনাকে সব সময়েই প্রণাম করতে পারি।

উও তো ঠিক হ্যায়। গোবিন্দনাথের দুই চোখে খুশির ঝিলিক। আসলে তিনি সঞ্জয়ের এই বিনয়ী ব্যবহারে খুবই আনন্দ পেয়েছেন। তবে এই সূত্র ধরে আসরে নামলেন যশোমতী। বললেন, এই সব হলো সহবত শিক্ষা। তোমার ছেলেদের মাথায় যা আসেনি কাকাসাহেবের মাথায় তা চমৎকার খেলে। এই জন্যই তো কাকাসাহেবের এখন এতো নাম! তুমি তো মন্ত্রী হয়ে মুম্বাইতে পড়ে আছো, ওর এখানে স্নান-খাওয়ারও সময় নেই। তোমার চেয়েও কাকাসাহেব ব্যস্ত মানুষ। দু'দন্ড বাড়িতে স্থির হয়ে বসতে পাবে না। আজ ঔরঙ্গাবাদ মিটিং, কাল ওয়দিতে। পরশু ধুলে, চল্লিশগাঁও। পুনের এক প্রান্ত থেকে আকোলার আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মিটিং করে বেড়াচ্ছে কৃষক, ক্ষেত মজুরদের সংঘবদ্ধ করতে। সব লোকে যাকে মানে, ভালোবাসে, সেই কাকাসাহেবও তোমাকে প্রণাম করলো অথচ তোমাব.......

মাতাজি! সঞ্জয় যশোমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বললো, এমন করে বলবেন না মাতাজি। আমি এমন কিছু করিনি যাতে শুধু শুধু আপনি রঙ্গনাথ ভাইয়াদের........

চিক্কুয়া বুদ্ধিমান ছেলে। তাদের বাবাকে তারা প্রণাম করেনি অথচ কাকাসাহেব কবেছে। এই ব্যাপারটা মায়ের মনে যখন লেগেছে তখন সেটা মিটিয়ে ফেলতে বাধা কীসের? আসলে এটা তাদের কারো খেয়াল হয়নি। নয়তো গোবিন্দনাথকে ভক্তি-শ্রদ্ধা তারা অন্য কারো চেয়ে কম করে না। যাইহোক, চিক্কুয়া অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বলে উঠলো, আরে ভাই, আভিতক খাড়া রহোগে ক্যয়া? পিতাজি কো প্রণাম করনা হ্যায় ইয়া নেহি? কথাটা শেষ হতেই তিন ভাই গোবিন্দনাথের পা দুটি নিজেদের বুকের মধ্যে এতোটুকু করে জড়িয়ে ধরলো। ছেলেদের কান্ডকারখানা দেখে গোবিন্দনাথ অভিভূত। যশোমতী আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, কাকাসাহেব শুধু কৃষকদের এক করে আন্দোলন করতেই শেখাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গড়ার কাজেও নেমে পড়েছে।

রাত তখন সওয়া-আটটা, সাড়ে-আটটা হবে। উঠোনের মাঝখানে একটা চারপাইতে গোবিন্দনাথ বসে আছেন। চারপাশে গ্রামের কিছু মানুষ এসে ভিড় করেছে। পার্টির দু-একজন লোক রয়েছে। একলাহারীর পুরোনো মানুষ রামবিলাস। গোবিন্দনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে বললো, গোবিন্দনাথ তুমি এখন মন্ত্রী! তোমাকেই বিচার করে দিতে হবে। আমার মেজ ছেলেটা রোজ চুল্লু খাবে আর বাড়িতে এসে ওর বৌকে মারধোর করবে। বৌটা খুব ভালো। ওর কান্না যে আর সহ্য করতে পারি না। তুমি ওকে একটু শিক্ষা-টিক্ষা দাও নয়তো বৌটা হয়তো একদিন আত্মহত্যা করে বসবে।

তোমার মেজ ছেলের নাম মঙ্গল না?

হ্যাঁ।

তা এতো অমঙ্গলের কাজ করছে কেন? তাছাড়া সরকার তো বৌকে পেটানোর জন্য কাউকে বীরচক্র উপাধি দেবে বলে ঘোষণা করেননি। তুমি এক কাজ করো, কাল সকালে মঙ্গলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। জীবনে আর বৌয়ের গায়ে হাত দেবে না, সেই ব্যবস্থা করে দেবো।

পরাশরম নামে রঙ্গনাথের বয়েসী একটা ছেলে অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল। সে কী যেন বলতে চায় গোবিন্দনাথকে। কিন্তু বলাটা ঠিক হবে কিনা সেটা নিয়েই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল। গোবিন্দনাথ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন বটে তবে পরাশরমের অস্থির ভাবটুকু তার নজর

এড়ালো না। কুবিল্লার বড়ো ছেলে পরাশরম। গোবিন্দনাথ জন্মাতে দেখেছেন। তার বড়ো ছেলে রঙ্গনাথের বন্ধু। সাদাসিধে ধরনের বেশ ভালো ছেলে। গোবিন্দনাথ জিজ্ঞেস করলেন, পরাশরম, তুমি কী কিছু বলবে আমাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অস্থির ভাবটুকু কেটে গেল। পরাশবম কৃতজ্ঞতার হাসি নিয়ে বললো, গজাননকে আমি একশো টাকা দিয়েছিলাম মাস তিনেক আগে। ওর বৌয়ের বাচ্চা হবার সময়ে খুব বিপদে পড়েছিল। বলেছিল, সামনের চাষে পেঁয়াজটা ক্ষেত থেকে তুলেই আমাকে শোধ করে দেবে। এখন টাকাটা তো দিচ্ছেই না উল্টে ধমকাচ্ছে। বলছে প্রতি মাসে এক টাকা করে আগামী একশো মাসে ওই একশো টাকা শোধ করবে।

গজাননকে সঙ্গে করে কালকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

যদি না-আসতে চায়? পরাশরম সন্দেহ প্রকাশ করলো।

আমার কথা বলো। গোবিন্দনাথ প্রত্যয় নিয়ে বললেন, গজানন নিশ্চয়ই আসবে।

রাংখালে ও মোহানন দুজনেই বয়েস পঞ্চাশের উপবে। গোবিন্দনাথের অত্যন্ত পরিচিত মানুষ ওরা। ওদের জমির সীমানা নিয়ে বিবোধ। দুজনেই দুজনের নামে নালিশ করেছে গোবিন্দনাথের কাছে। ওদেব কথাবার্তা শুনে গোবিন্দনাথ হাসলেন। বললেন, এই বুড়ো বয়সেও যদি তোমরা সীমানা নিয়ে ঝগড়া করো তবে আর আমার বলার কী আছে? এই রোগটা বড়ো ছোঁয়াচে। নিজেরাই মিটমাট করে নাও। কাল বিকেলের মধ্যে এসে আমাকে শুধু জানিয়ে যাবে তোমাদের বিরোধ মিটে গেছে। কী? মনে থাকবে তো।

জি হাঁ। জি হাঁ!! রাংখাল ও মোহানন দুজনেই মাথা নাড়তে নাড়তে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

গোবিন্দনাথের পাশে চুপচাপ এতোক্ষণ বসেছিলেন যশোমতী। যদিও এখানে বসাব ইচ্ছে তার ছিল না। বাড়ির কাজে ভেতরেই ছিলেন। দময়ন্তী আব সরযূই তাড়া লাগিয়েছে। বলেছে, তোমার তো এখানে কোনও কাজ নেই মা। তুমি যাও। পিতাজির কাছে গিয়ে বোসো। ওটাই তোমার কাজ। সেই থেকে যশোমতী স্বামীর পাশে। গোবিন্দনাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে দিলেন। বললেন, মন্ত্রীর কাজকর্ম কেমন বুঝছো? যশোমতী কোনও উত্তর না-দিয়ে নীরবে শুধু হাসতে থাকেন।

রাত তখন এগারোটা। বেশ কিছুক্ষণ আগে রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে। বাড়ির সকলেই আবার উঠোনে এসে বসেছে। বাইরে দারুণ জ্যোৎস্না। চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলোর একটা নীলাভ দ্যুতি। দূরের তিন দিকে ঘেরা পাহাড়কে মনে হচ্ছে একলাহারী গ্রামের বাউন্ডারী ওয়াল। গোদাবরী নদীর ওপরে একটা সাদা চাদর কে যেন বিছিয়ে রেখেছে।

অনেকদিন ধরেই কথাটা ভাবছিল সঞ্জয়। কৃষকদের নিয়ে সে বিরাট আন্দোলনের পথে নামতে চলেছে। সে-পথে অনেক বাধা বিপত্তি। তা থাক। সঞ্জয় ও-সবকে ভয় করে না। সে চিন্তা করছে সরকারের হাতিয়ার ওই পুলিশ-বাহিনী তার ওপর ঝাঁপাবার আগেই তাকে সব কিছু বলে নিতে হবে। বিশেষ করে এই উথাইয়া পরিবারের প্রতিটি মানুষকে। আজকে সেই সুযোগ। সঞ্জয়ের মনে হলো একদিন-না-একদিন সবাই তার পরিচয় জানতে পারবে। সেই জানা হবে অসম্পূর্ণ। সঞ্জয়ের উচিত নিজে থেকে সব কিছু বলা। সব ঘটনা জানানো।

সঞ্জয় উঠোনের এক কোণে চুপ করে বসেছিল। সে ধীর পায়ে উঠে এসে গোবিন্দনাথের কাছে এসে বসলো। তার এই কাছে এসে বসাটা নিতান্ত বিনা কারণে নয় সেটা উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলো। গোবিন্দনাথ সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকালেন। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখলেন ছেলেটির সারা মুখে অজানা অনেক কথা লেখা রয়েছে। গোবিন্দনাথ খুব আস্তে শান্ত গলায় বললেন, কাকাসাহেব তুমি কিছু বলবে? সঞ্জয় সোজাসুজি গোবিন্দনাথের চোখের দিকে তাকালো। তারপরে কী ভেবে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিচু করে রইলো। যশোমতী, সরযূ, দময়ন্তী, রঙ্গনাথ, বিরজু আর চিক্কুয়া সকলেই সঞ্জয়ের সেই দৃষ্টি নত মুখের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে শেষে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়

করলো। রাতের নির্জন পরিবেশ। গ্রামের কোথাও একটা কুকুরও সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে সামান্য একটু চিৎকারও করলো না। প্রকৃতি সেই মুহূর্তে এতো বেশি শান্ত প্রত্যেকেই কী হয় কী হয় একটা ভাব নিয়ে সঞ্জয়কে দেখতে লাগলো। অনেক অভিজ্ঞ মানুষ গোবিন্দনাথ তিনি কোমল গলায় বললেন, কাকাসাহেব তুমি কী তোমার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও? চকিতে মাটি থেকে মুখ তুললো সঞ্জয়। আস্তে আস্তে বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম আমার পরিচয়টা এবারে আপনাদের জানানো উচিত। পরে হয়তো আর সময় পাবো না। তাই নিজের কথা নিজের মুখেই বলতে চাই।

সেদিন রাত্রে নিজের কথা সত্যিই বলেছিল সঞ্জয়। আধ ঘন্টা সময় নিয়ে সে যা বলেছিল তা সংক্ষেপে মোটামুটি এই রকম কলকাতার এক বনেদি পরিবারের ছেলে সঞ্জয়। বাড়িতে মা, বাবা, দুই দাদা, দুই বৌদি এবং তিন জন ভাইপো, ভাইঝি নিয়ে তাদের অত্যন্ত সুখী সংসার। লেখাপড়ায় সঞ্জয় দারুণ ছেলে। যাদবপুর ইউনিভারসিটি থেকে বাংলা নিয়ে এম. এ. পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বি. এ. পড়ার সময় থেকেই বিশেষ এক দলের আদর্শ তাকে উজ্জীবিত করে এবং ক্রমশ সে সেই দলের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেয়। এই সমাজ ব্যবস্থার ওপর তার তখন ভীষণ রাগ। সব কিছুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য তার সংগ্রামী মন প্রতিনিয়ত পথ খুঁজে ফিরছে। অথচ কোথাও কোনও আন্দোলন নেই। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে আন্দোলনের কথা বলে সঞ্জয়ের সে-গুলোকে মেকি বলে মনে হতে লাগলো।

শহর ছেড়ে সঞ্জয় গ্রামে গিয়ে পৌঁছালো। মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর। চিরদিনের বঞ্চিত, শোষিত কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাস কাটালো সেই সব ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে। তাদেরকে চেতনা এনে দিল।

আসল ঘটনা ঘটলো এক ফসল কাটার মরশুমে। সঞ্জয়ের নেতৃত্বে কৃষকরা ফসল কাটছিল। জোতদারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো তখনই। ধানের ক্ষেত দাঙ্গার রূপ নিল। কৃষকদের সে-লড়াই ছিল বাঁচার লড়াই। ঘরে অনাহারে থাকা মানুষগুলির জন্য লড়াই। সেই বাঁচার যুদ্ধে জোতদার নিহত হলো তারই গুন্ডা-বাহিনীর হাতে। আর খুনের দায়টা এসে পড়লো সঞ্জয়ের নামে।

সেই থেকে সঞ্জয় পলাতক।

এই দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রহসনে সঞ্জয় সহজেই দোষী সাব্যস্ত হবে। তাই ধরা দিয়ে কী লাভ? গোপীবল্লভপুরের প্রতিটি কৃষক তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। সঞ্জয় থাকেনি। কারণ এখানে থাকলে সে ধরা পরবেই। আর ধরা পড়ে কী লাভ? তারচেয়ে যে-ক'দিন পাবে আরও বেশি করে কাজ করতে চায়। 'বেটার কাজের' জন্য যে-আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেই আদর্শকেই মুক্তির পথ ভেবে এগিয়ে যেতে সঞ্জয় তাই এই মহারাষ্ট্রে এসেও দরিদ্র নিপীড়িত কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা তো একই। কোথাও উনিশ-বিশ হতে পারে কিন্তু মূল সমস্যা দারিদ্রের অন্ধকার। তার কোনও পরিবর্তন নেই।

সঞ্জয় তার কাহিনী শেষ করে দময়ন্তীর চোখের দিকে তাকালো। তার অসুখের সময় এই মেয়েটা অনেক সেবা করেছে। তাছাড়া সঞ্জয় কে, কোথা থেকে এসেছে, কীই-বা পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আলোচনা তার কানে গিয়ে যে পৌঁছাতো না তা নয়। কোমল মন নিয়ে দময়ন্তী তাকে একটু ছায়া দেবার চেষ্টা করতো। কৃতজ্ঞতার সেই স্পর্শ নিয়ে সঞ্জয় তাকালো দময়ন্তীর চোখের দিকে। দময়ন্তীর চোখ দুটি আনন্দের উজ্জ্বলতায় চিকচিক করে উঠলো। ঠোঁটে সামান্য যে-হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তার চেয়েও অনেক বেশি হাসি ওই দুই ঠোঁটের ফাঁকে লুকিয়ে রয়েছে। দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে তাকালো চিক্কুয়ার দিকে। দুই ভাই-বোনে নীরব চাউনিতে সব কথা বলা হয়ে গেল। গোবিন্দনাথ স্থির হয়ে বসেছিলেন। প্রশান্ত দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ওর মাথায় নিজের হাতখানা রেখে বললেন, নিজের জীবনটা তো উৎসর্গ করলে বেটে

এই পোড়া দেশে বিপ্লব আনতে পারবে কী? গোবিন্দনাথেব ওই কথায় সঞ্জয় অভিভূত হয়ে পড়লো। তারপরেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ কবলো, মুক্তির পথ তো খুঁজে বের করতেই হবে। সেই চেষ্টাই তো করছি।

নাসিক সিটির কৃষিপণ্যের বাজারের অফিসে একটা আলোচনা সেরে সঞ্জয় রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। তিন বাস্তার মোড়। সামনেই সেন্ট্রাল বাস আড্ডা। দূরপাল্লা এবং শহরের চারদিকে যাবার বাস এখান থেকেই ছাড়ে। বেলা তখন সাড়ে-দশটা এগারোটা হবে। ফুটপাথের দু'ধারে হাজারো রকমের দোকান তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। জিনিসপত্র কেনাকাটায় পুরো অঞ্চলটা তখন জমজমাট। পথচলা মানুষ আর সাইকেল আবোহীর ভিড়ে এক-পা এক-পা হাঁটতে হয়। তার ওপর বিভিন্ন স্কুলের ইউনিফর্ম পবা ছেলে-মেয়েদের ভিড় তো রয়েছেই। সঞ্জয়ের সঙ্গে কৃষি সমিতির সম্পাদক সাগর ছিল। আব ছিল জনাচাবেক লোক। সাগর সঞ্জয়ের চেয়ে বয়সে বছর চার-পাঁচেক বড়োই হবে। সে বললো, কাকাসাহেব পরিবর্তন কী আসবে? আমরা কী ক্রয় ক্ষমতার নীচেই পড়ে থাকবো?

এখনও যদি গ্রামে সামন্ততন্ত্র থাকে তাহলে কোনও মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে না। এই দেখুন না, পাঁচ-পাঁচটা যোজনার পর এখনও শতকবা ঊনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমাব নীচে। কেন? সারা দেশে বেকার সমস্যা বাড়ছে, জিনিসপত্রেব দাম হুহু করে বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক যোজনাব শেষে এটা কেন হচ্ছে ভেবে দেখতে হবে। দেশের গ্রামের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই বলেই আজ পেঁয়াজ-আলু পর্যন্ত বিদেশে রফতানি হচ্ছে। রফতানির প্রয়োজন আছে, কিন্তু দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না-বাড়িয়ে রফতানি ভিত্তিক অর্থনীতি বেশিদিন চলতে পারে বলে আমি মনে কবি না।

পথ চলতে চলতে দলেব একজন সাগরের কানের কাছে মুখটা নিয়ে কী যেন বলতেই সাগর বললো, কাকাসাহেব আসছে সপ্তাহের প্রোগ্রামেব কথা মনে আছে তো?

চল্লিশগাঁও-এর মিটিং তো?

হ্যাঁ।

নিশ্চযই মনে আছে। চিক্কুযা তো আমাকে অনেক আগেই বলে রেখেছে? তাছাড়া চিক্কুয়াও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। সঞ্জয় হাসলো। ভুল হওয়াব কোনও ব্যাপার নেই। তারপরেই তাড়া লাগালো, আপনাদেব আব আসতে হবে না। আপনারা অফিসে যান।

ধীব পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সঞ্জয় সেন্ট্রাল বাস আড্ডার সামনে এসে দাঁড়ালো। সামান্য একটু দূরে ও-পাশের ফুটপাথে দুটি মেয়ের সঙ্গে বই-খাতা কোলে নিয়ে দময়ন্তী গল্প করছিল। সঞ্জয়কে দেখতে পেয়ে মেয়ে দুটিকে অপেক্ষা করতে বলে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওব দিকে।

কাকাসাহেব। দময়ন্তী সোনাঝরা হাসলো।

আপনারও কাকাসাহেব? সঞ্জয়ও হাসতে হাসতে পাল্টা প্রশ্ন করলো।

নয় কেন? প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করে বসলো দময়ন্তী।

না, মানে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ালো আপনার বাবা-মা'র কাকাসাহেব, দাদা ভাবির কাকাসাহেব আর আপনারও........

· সঞ্জয়ের কথা শুনে উত্তাল হেসে উঠলো দময়ন্তী। হঠাৎ খেয়াল হলো এটা বাড়ি নয। শহরের প্রাণকেন্দ্রের উন্মুক্ত রাস্তা। এই ভাবে হাসাটা আর যাই হোক নিশ্চয়ই শোভনীয় নয়। দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। বললো, এখন কী বাড়ি ফিরবেন না অন্য কোথাও.....

আমি বাড়িই ফিরবো।

তাহলে একসঙ্গেই ফেরা যাবে। দময়ন্তী ও-পাশের ফুটপাথের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো, আমার দুজন বন্ধু রয়েছে। ওরা আমাকে খাওয়াবার জন্য রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছিলো। তারপরেই দময়ন্তীর ছোট্ট মেয়ের মতো বায়না, আপনিও চলুন।

সে কী? বন্ধুরা নিমন্ত্রণ করেছে আপনাকে। সেখানে.......

আর আমি করছি আপনাকে। দময়ন্তী সঞ্জয়ের চোখের ওপব নিজের চোখ দুটি ধরে রাখলো। সঞ্জয়ও তাকিয়ে রইলো। অহেতুক লজ্জা পেয়ে দময়ন্তী চোখ না-সরিয়ে একটু আদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললো, চলুন।

বন্ধুদের কাছে গিয়ে দময়ন্তী প্রথমেই সঞ্জয়ের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিল। দোহারা চেহারার সাধারণ একটি শ্যামলা মেয়েকে দেখিয়ে দময়ন্তী বললো, ঊষা পন্ডিত। দারুণ সুন্দরী অপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, করুণা কার্লেকাব। নাসিক জেলার পুলিশ সুপারের মেয়ে। আর ইনি সঞ্জয় চৌধুরী। তবে কাকাসাহেব নামেই বেশি পরিচিত। কৃষক নেতা। মেয়ে দুটি নমস্কার জানাতেই সঞ্জয়ও হাত দুটি এক করে প্রতি নমস্কার জানিয়ে কোনওরকমে বললো, নেতা-টেতা আমি নই। খুবই সাধারণ একজন কর্মী। ভেতরে ভেতরে সঞ্জয় একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলো। করুণা কার্লেকার পুলিশ সুপারের মেয়ে। আলাপটা না-হওয়াই বোধহয় ভালো ছিল। যাই হোক পবিস্থিতিকে মেনে নিয়ে সহজ হবার ভঙ্গিতে সে বললো, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।

আমরাও। ঊষা এবং করুণা একই সঙ্গে বলে উঠলো। দময়ন্তী কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো। করুণা ওকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে আহ্বান জানালো, আসুন একটু চা খাওয়া যাক।

নামেই চা খাবার নিমন্ত্রণ। আসলে রেস্টুরেন্টে ঢুকে করুণা বয়কে ডেকে খাবারের যে-অর্ডার দিল তা রীতিমতো বিরাট ব্যাপার। সঞ্জয় বাধা দিতে গিয়ে নিজেই বাধা পেল। ধনুকের মতো ভ্রূ দুটিকে নাচিয়ে তেলতেলে মুখে করুণা সঞ্জযের মুখেব দিকে তাকিয়ে বইলো। পরে বললো, রেস্টুরেন্টে আমরা প্রায়ই খাই সেটা কিছু নয়। তবে আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আলাদা মর্যাদা। দময়ন্তী মাথা নিচু করে নিল। ঊষা নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। সঞ্জয় অসহায় ভাবে ঊষা, করুণা এবং দময়ন্তীব দিকে চেয়ে আসল অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেই করুণা গোলাপী ঠোঁটে হেসে উঠলো। বললো, জয়পুরে জাতীয় সাঁতাব শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। মহারাষ্ট্রের হয়ে জলে নামবে দময়ন্তী এই প্রথম।

ঊষা মনে করিয়ে দিল, এটা ইন্টার ইউনিভারসিটি নয়, ইন্টারস্টেট। বিরাট সম্মান। কিঁউ দময়ন্তীজি?

খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দময়ন্তী একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো। স্ট্যান্ড না-করলে কীসের সম্মান? যদিও রাজ্য দলে এই প্রথম নির্বাচিত হলাম কিন্তু সেটাই তো সব নয়।

আপনি জলে নামবেন আর স্ট্যান্ড করবে অন্য মেয়ে এ-জিনিস হতে পারে না। সঞ্জয় মৃদু হেসে ঊষা এবং করুণার দিকে চেয়ে বললো, আপনাবা কী বলেন?

আপনি যা বলেছেন এক কথায় ফাইন! সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে করুণা দুরন্ত হেসে বলে উঠলো, এতো অল্প কথায় কী সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন দময়ন্তী অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য। রিয়েলি বিউটি!

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ঊষা আর করুণা সঞ্জয়ের সঙ্গে আবার দেখা হবে, তখন আরও বেশি করে আলাপ করা যাবে ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা বারবার বলতে লাগলো। করুণাই মুখর বেশি। সে আরও বললো, কাকাসাহেব আপনি শুধু দময়ন্তীর বন্ধুই নন, আমাদেরও।

নিশ্চয়ই। সঞ্জয় সংক্ষেপে সৌজন্য প্রকাশ করলো।

নাসিক সিটি থেকে একলাহারী গ্রামে এক বাসে যাওয়া যায় না। নাসিক রোডে নেমে বাস চেঞ্জ করতে হবে। সঞ্জয় আর দময়ন্তী বাস থেকে নাসিক রোডের স্টপেজে নামতেই একটা দু'সিটের অটো স্কুটার সামনে এগিয়ে এলো। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, যানা হ্যায় সাব?

সঞ্জয় কিছু বলার আগেই দময়ন্তী অটো স্কুটারে উঠে বসলো। সঞ্জয় তখনও উঠছে না দেখে দময়ন্তী কপট রাগের ভান করে বললো, আপনি কী হেঁটে বাড়ি ফিরবেন?

সে-রকম অবশ্য আমার কোনও ইচ্ছে নেই। তবে অহেতুক বিলাসিতা করারও খুব একটা শখ

নেই।

দময়ন্তী শেষ চেষ্টা করে বললো, আহা, একটা দিন তো? তারপরেই চোখের ইশারায় ড্রাইভারকে দেখিয়ে নীরবে বলতে চাইলো, দোহাই আপনার, ওর সামনে আর কথা বাড়াবেন না। উঠে আসুন—

সঞ্জয় স্কুটারে উঠে দময়ন্তীর পাশে বসলো বটে তবে খুব আস্তে আস্তে বললো, একটা দিন বলেই এই নকল জীবনে আমার বিশ্বাস নেই।

আসলে আপনি বড়বেশি নীতি আঁকড়ে থাকেন।

মানুষের জীবনে নীতিটাই তো সব।

দময়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে মেলে ধরলো। চাপা গলায় বললো, আমার আর স্কুটারে যাওয়ার বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই। খুব শিক্ষা হয়েছে।

অটো স্কুটারটা তখন নাসিক, পুনা রোডের ব্রীজটা পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে একলাহারী গ্রামে যাবার পথ ধরেছে। ব্রীজের নীচ দিয়ে একটা ট্রেন ছুটে চলেছে নাগপুরের দিকে। ট্রেনের দুরন্ত শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই সঞ্জয় সামান্য হেসে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে বললো। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য কী জানেন, কাউকেই সত্যি কথাটা বলা যাবে না। বললেই সে চটে যাবে।

আমি মোটেও চটিনি। দময়ন্তী গম্ভীর সুরে বললো। ওর ওই অটুট গাম্ভীর্য দেখে সঞ্জয় কৌতুক মেশানো গলায় বললো, আপনি যে চটেননি তা তো আপনার গলার স্বরেই বুঝতে পারছি। রেগে গেলে কেউ এতো হাসিখুশি থাকে? সঞ্জয়ের ওই কথায় হাসি সামলাবার বৃথা চেষ্টা না-করে দময়ন্তী তার স্বর্গীয় হাসিকে ছড়িয়ে দিল। সেই মুহূর্তে ওকে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে হলো। সঞ্জয় সেই কথাই বললো, হাসি হচ্ছে শুভ্রতার চিহ্ন! মনকে সঙ্কীর্ণ করলেই এটা হারিয়ে যায়। তারপরেই হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। সঞ্জয় গলা নিচু করে বললো, দময়ন্তীজি আপনি আজ কিন্তু একটা ভুল করেছেন।

আমি! কী?

করুণা কার্লেকারের বাবা পুলিশ সুপার। আলাপটা না-করিয়ে দিলেই পারতেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে সঞ্জয় আরও যোগ করলো, আমি অবশ্য ও-সবে ভয় পাই না। চিন্তা হচ্ছে কলকাতার পরিচয়টা টানাটানি করে কেউ যেন খুঁচিয়ে না-বের করে! আমার এখানে অনেক কাজ। কাজগুলি তো করে যেতে হবে।

তারপর? দময়ন্তী উদাস সুরে জিজ্ঞেস করলো, তারপর হয়তো একদিন নিরাপদ বুঝে আবার কলকাতা চলে যাবেন—

ফেরার কথাটা আমি এখনও চিন্তা করিনি।

আমি করেছি। দময়ন্তীর ওই ছোট্ট কথা দুটো যেন অনেক দূর থেকে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এলো। তাকে ওই মুহূর্তে খুবই ম্লান দেখালো। সঞ্জয় দময়ন্তীর চোখের দিকে তাকালো। ধরা পড়ার ভয়ে দময়ন্তী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামনে নেবার জন্য গাঢ় সবুজ ঘন ক্ষেতের দিকে চোখ রেখে বললো, কৃষকের সন্তান তো এই ক্ষেত তাই না? সঞ্জয় সে-কথার কোনও উত্তর দিল না। তার মনে হলো দময়ন্তী সামান্য একটু কথার মধ্য দিয়ে তাকে অনেক কথার মধ্যে জড়িয়ে রাখলো।

সঞ্জয়কে এখন আর উথাইয়া পরিবারের মানুষ ছাড়া ভাবাই যায় না। একেবারে বাড়ির ছেলে হয়ে গেছে। সরযূ এবং যশোমতী ওর জন্য প্রাণ ঢেলে যা করেন তার তুলনা হয় না। সঞ্জয়ের চোখে তাই ওঁরা দুজন বৌদি ও মা ছাড়া আর কিছুই নয়। সঞ্জয়ের ডাকের মধ্যেও তাই প্রাণের স্পর্শ। এতোদিন সে ভাবিজি ও মাতাজি বলে ডাকতো বটে কিন্তু সেই সম্বোধন নিতান্তই ডাকতে হয় তাই ডাকা। মনের মধ্যে এখন আর সেই পর পর ভাবটা নেই। সম্বোধনে দূরত্বটাও কমে এসেছে। সঞ্জয় 'তুমি' করে কথা বলে আর সরযূ যশোমতী তো রীতিমতো 'তুই' করে বলেন। এটা অবশ্য হয়েছে সঞ্জয়ের জন্যেই। কথায় কথায় হঠাৎ সে একদিন বলেছিল, আচ্ছা, মাতাজি,

ভাবিজি তোমরা আমাকে এতো স্নেহ করো, ভালোবাসো তবুও দেখো চিক্কুয়াদের থেকে আমাকে ঠিক আলাদা করে রাখো। পরিষ্কার বুঝিয়ে দাও যে আমি বাইরের মানুষ। অবশ্য ব্যাপারটা তো তাই-ই।

কেন বেটে তুমি এ-রকম বলছো? যশোমতী উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যিই তো? তোমার ওপর আবার কী এমন অন্যায় করলাম যে আমাদেরকে একেবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছো। সরযূ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

এবারে ঘোষণা করার পালা সঞ্জয়ের। সে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, তোমরা দুজনে বিরজু ভাইয়া আর চিক্কুয়াকে তুই তুকারী করবে অথচ আমার বেলা...

ও! এই কথা!! সরযূ এবং যশোমতী একসঙ্গে দুজনে হেসে উঠলেন। যশোমতী বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আর ভুল হবে না।

আর একটা কথা মাতাজি—

বলো।

আর যে কেউ বলুক তুমি অন্তত আমাকে কাকাসাহেব বলে ডেকো না। তোমার ওই 'বেটে' ডাকের মধ্যেই আমি অনেক বেশি শান্তি পাই। আনন্দ পাই।

চল্লিশগাঁও, জলগাঁও-তে চার দিন থেকে ওখানকার কৃষকদের নিয়ে একের-পর-এক ঘরোয়া মিটিং করলো সঞ্জয়। সঙ্গে ছিল চিক্কুয়া, সাগর এবং ক্ষেতমজুর সংগঠনের অন্যান্য নেতারা। এই ধরনের মিটিংয়ের ফলে কৃষকদের মধ্যে একটা দারুণ সাড়া পড়ে গেছে। আন্দোলন করে কী পাওয়া যাবে আর কী পাওয়া যাবে না এই মুহূর্তে সেটাই বড়ো কথা নয়। আসল কথা হলো নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে হতাশার ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। তাদের একটাই কথা, সরকারের কাছ থেকে কৃষিজাত দ্রব্যের লাভজনক দাম পাওয়া। এর জন্য তারা আন্দোলনের শেষ ধাপে পর্যন্ত যেতে রাজি আছে। চাষীদের এই মনোবলই সঞ্জয়কে খুবই আনন্দ দিয়েছে।

চারদিন পর বাড়ি ফিরলো সঞ্জয় আর চিক্কুয়া। তখন দুপুর। যশোমতী, সরযূ আর দময়ন্তীকে নিয়ে সবে খাওয়া শেষ করেছেন। হাতও ধোয়া হয়নি। খাওয়ার পর এঁটো হাতেই বসে বসে গল্প করছিলেন। সরযূর বাচ্চা হবে। শেষ মাস চলছে। যশোমতী তাই খুব খুশি। ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক তার ঘর আলো করে একটা শিশু তো ঠিকই আসবে। সারা উঠোনে একটা শিশু যদি দুষ্টুমি করে ঘুরে না-বেড়ায় সেই বাড়িকে কী সুন্দর লাগে? সেই সব কল্পনায় আঁকা ছবির কথাই যশোমতী বারবার বলছিলেন। দময়ন্তী চাপা হাসছিল। তবে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো সরযূ। সে দুই হাঁটুর মধ্যে নিজের মুখখানা প্রায় লুকিয়ে রেখেছে। সরযূর ওই লজ্জার ভাবটুকু বেশ উপভোগ করলেন যশোমতী। বললেন, বহু, দিনকাল পাল্টেছে। এখন তো মানুষের লজ্জা-টজ্জা অনেক কমে গেছে। তবে হ্যাঁ সেটা ছিল আমাদের সময়ে। স্মৃতির ঝাঁপি খুললেন যশোমতী। বড়োকর্তার সে কী লজ্জা! বড়োকর্তা অর্থাৎ গোবিন্দনাথ। সরযূ আর দময়ন্তী দুজনেই মায়ের দিকে তাকালো। যশোমতী হাসতে হাসতে বললেন, তখন আমার রঙ্গনাথ হয়েছে। ওইটুকুন দুধের শিশু। কী রং আর কী স্বাস্থ্য! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার মা-বাবা তো সারাক্ষণ রঙ্গনাথকে ঘিরে থাকেন। বড়োকর্তার বড়ো দুঃখ, দিনের বেলায় লজ্জায় ছেলেকে শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে আদর করতে পারেন না। একদিন হয়েছে কী, মা-বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমি রান্নাঘরে। বড়োকর্তা তো ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করছেন। মনের সুখে গলাও ছেড়েছেন। তখন বেলা নটা-দশটা হবে। মা-বাবা তো ফিরে এলেন। একেবারে বড়োকর্তার মুখোমুখি। মা'র কোলে ছেলেকে গুঁজে দিয়ে বড়োকর্তা মুখ ঢেকে সেই যে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন দুপুরে খেতে পর্যন্ত এলেন না। সেই ফেরা ফিরলেন রাত দশটায়। যশোমতী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। কতোদিন আগের কথা। মনে হয় এই তো সেদিন।

সঞ্জয় আর চিক্কুয়াকে ভর দুপুরে ফিরতে দেখে যশোমতী প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তোরা

খেয়ে এসেছিস?

চিক্কুয়া উত্তর দিল, কোথায় আর খেলাম!

সঞ্জয় বললো, মাতাজি কথা বলতে পারছি না এতো খিদে পেয়েছে।

সরযূ সঙ্গে সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিলো। ওকে বাধা দিলেন যশোমতী। বললেন, বহু, তুমি কোনওরকম তাড়াহুড়ো কোরো না। তোমাকে কোনও কাজ করতে হবে না। তুমি এখন বিশ্রাম নেবে। তারপরই দয়মন্তীর দিকে চেয়ে বললেন, শীগ্‌গির উনুন ধরিয়ে দুটো ভাত-সবজি বানিয়ে দে। তার আগে এক বাটি চিড়ে আর গুড় দিয়ে যা। খেতে থাকুক—

ও-সব কিছু লাগবে না। সঞ্জয় বললো, ভাত হোক একবারেই খাবো।

এই যে বললি ভীষণ খিদে পেয়েছে! আক্ষেপের সুরে যশোমতী বললেন, খিদের আর দোষ কী বল? রাতদিন মিটিং আর চিৎকার করবি তাও যদি সময় মতো দুটো খেতিস। যশোমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসলো সঞ্জয়। উদাস সুরে বললো, সময় মতো খাওয়া-দাওয়া করার জীবন তো আমাদের নয় মাতাজি। সঞ্জয় কথাটা বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মাটি থেকে মুখ তুলে খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, কলকাতায় তখন এক অসহ্য অবস্থা। কোথাও একটা খুন হলে, পুলিশের ভ্যানের ওপর একটা পটকা পড়লে এমনকী পাড়াতে সামান্য একটু রাজনৈতিক গন্ডগোল হলেও সব দোষ গিয়ে পড়তো বিশেষ একটা আদর্শ নিয়ে চলতো যে-দল, সেই দলের ছেলেদের ওপর। বিনা কারণে কতো শত ছেলেকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে তার কোনও হিসেব নেই। সারাদিন বাড়ির বাইরে বাইরে কাটিয়ে রাতে ফিরে সবে খেতে বসেছি, এক গ্রাস ভাতও মুখে তুলতে পারিনি। সি. আর. পি. আর পুলিশের দল এসে বাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খাবারের থালাটা তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মা বলতেন, সঞ্জু, অনেক তো খেয়েছিস এবারে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যা—সে এক অস্থির দিন গেছে মাতাজি। খাবার পেতাম কিন্তু খাবার সময় আর সুযোগ পেতাম না। সে-সময়টা আমরা গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। চাষীরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। তাদের দু'মুঠো খাবার থেকেও এক মুঠো আমাদের মুখে তুলে দিয়েছে। এদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে হবে। নিশ্চয়ই।

এখন সকাল। চারদিকে সোনাঝরা রোদের ঝিকিমিকি। সরযূ চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। তার পক্ষে এখন আরও কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। বাড়ির কাজকম করছেন যশোমতী। দময়ন্তী একটা স্যুটকেসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। আর একটু সময় পরেই সে রওনা দেবে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য জয়পুরের উদ্দেশে। এখন সে যাবে মুম্বাই। ওখানে গোবিন্দনাথের সঙ্গে দেখা করে দলের সঙ্গে যোগ দেবে। মুম্বাই থেকে রাত্রে জয়পুরের ট্রেন ধরবে।

বিরাট একটা ফুলের মালা নিয়ে প্ল্যাটফরমে এসে হাজির হলো করুণা কার্লেকার। ঝকঝকে পোশাকের বাহারে আর সুমিষ্ট প্রসাধনীর গন্ধে নাসিক রোড স্টেশনটা যেন ভরে উঠলো। করুণা সাদা জিন্সের ফুলপ্যান্ট পরেছে। গায়ে লেমন ইয়োলো আর অরেঞ্জ কালারের ফুল গেঞ্জি। একরাশ স্যাম্পু করা চুলগুলোকে পেছনের দিকে টান টান করে একটা দুধ সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা। চোখে বড়ো গগ্‌লস।

সঞ্জয়কে দেখতে পেয়েই যেন বেশি আনন্দ পেল করুণা। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে ওকে গুডমর্নিং জানালো। সঞ্জয় সৌজন্যের খাতিরে সামান্য হাসলো মাত্র। করুণা জিগ্যেস করলো।

কতোক্ষণ এসেছেন?

মিনিট পঁয়ত্রিশ হবে। সঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ফুলের মালাটা নিয়ে করুণা দময়ন্তীর কাছে এগিয়ে গেল। শুভেচ্ছা জানিয়ে ওর গলায় পরাতে যেতেই বাধা পেল। কিছুতেই সেই মালা পরবে না দময়ন্তী। একরাশ লজ্জা নিয়ে বললো, আমাকে

মজবুর করিস না। আমি কোনও রেজাল্টই দেখাতে পারলাম না। শুধু শুধু মালা নিয়ে পরে উপহাসের পাত্র হতে চাই না।

এটাই আমার আগাম শুভেচ্ছা।

প্লিজ করুণা! জোর করিস না। কথা দিচ্ছি, জয়পুরে যদি কিছু করতে পারি ফিবে এসে সবার আগে তোর হাত থেকেই মালা নেবো। অবশ্য তখন যদি তুই দিতে চাস।

বাহানা রাখ! করুণা একটু ক্ষুণ্ণ হলো। তবে দময়ন্তীর অসহায় অবস্থাটা চিন্তা করে পরক্ষণেই সে স্বাভাবিক হলো। সূর্যোদয়ের হাসি হেসে বললো, ঠিক আছে। তাই হবে।

দময়ন্তীকে তুলে দিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছাড়লো। যতোক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল সঞ্জয় দাঁড়িয়ে রইলো। ট্রেনটা চোখের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যেতেই সঞ্জয় দেখতে পেল করুণা তারই পাশে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো, কাকাসাহেব এখন আপনার কী প্রোগাম?

বাড়িতে ফিরে একটু পড়াশোনা করা।

তার মানে গুড বয় হওয়া।

ব্যাপারটা তা নয়। সঞ্জয় বিনীতভাবে বললো, পড়াশোনা না-করলে সব কিছু জানবো কেমন করে?

কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনের বাইরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা জাফরানী রঙের অ্যামবাসাডার ওদের সামনে এগিয়ে আসতেই করুণা বললো, কাকাসাহেব গাড়িতে উঠুন। আপনাকে পৌঁছে দেবো।

সঞ্জয় একটু ইতস্তত করে করুণার মুখের দিকে তাকালো। বললো, পুলিশ সুপারের গাড়িতে একজন কৃষক আন্দোলনের কর্মীর যাতায়াতটা নিশ্চয়ই ভালো দেখাবে না। আপনি কী বলেন?

দ্যাটস কারেক্ট!

করুণা ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে পা মেলালো। কিছুটা খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাব সঙ্গে হাঁটতে খারাপ দেখাবে না তো?

সঞ্জয় এবারে হেসে দিল। বললো, আপনি কিন্তু ভীষণ রেগে গেছেন।

তা একটু রেগেছি বই কী!

আসলে কী জানেন, আমরা এতো বেশি নকল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। কিন্তু ভেবে দেখুন যেটা সত্যি যা বাস্তব তা স্পষ্ট করে বলতে আপত্তি কীসের? অথচ আপনি অসন্তুষ্ট হলেন।

নাসিক রোড ধরে সোজা হাঁটতে লাগলো দুজনে। করুণা সঞ্জযেব মুখের দিকে এবারে তাকালো। মুখখানা ভালো করে দেখে নিয়ে নিচু সুরে বললো, স্টেশনে আপনাকে দেখে ভেবে রেখেছিলাম যে, দময়ন্তীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো। যেখানে গাড়িতেই আপত্তি জানালেন বাড়িতে যেতে বলার আর সাহস নেই।

সাহস এবং দুঃসাহসের প্রশ্ন নয় করুণাজি! সঞ্জয় কী যেন একটু চিন্তা করলো। এই মুহূর্তে অনেক কথাই ওকে বলা যেতে পারে। কিন্তু করুণারা হচ্ছে সুখের পাখি। জীবনের কথা ওদের মনে দাগ কাটতে পারে না। সঞ্জয় তাই গভীরে না-গিয়ে খুব সহজ ভাবে বললো, আমার কিছু বাঁধা-নিষেধ আছে। সব জায়গায় সব সময় যেতে পারি না।

কোনও সময়েই আপনি আমাদের বাড়ি যেতে পারবেন না।

এই সহজ কথাটা এতো সহজে বুঝেছেন বলে ধন্যবাদ। আমার কথায় কেউ আঘাত পাক এটা আমি কক্ষনও চাই না। কিন্তু আমি অসহায় করুণাজি!

হাঁটতে হাঁটতে ওরা তিন রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছালো। সরকারি বাস, অটো, স্কুটার আর

ট্যাক্সির চলমান প্রদর্শনী। এর, ওর পাশ কাটিয়ে যে-ভাবে সাইকেল ছুটছে যখন-তখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। রাস্তার দু'পাশে জমজমাট দোকান পসার। সবজি এবং ফলের বাজার। দোকানের চালা থেকে দড়িতে কলা, আঙ্গুর ঝুলছে। রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে গন্না অর্থাৎ আখ পেষাই-এর মেশিন। লোকে ভিড় করে সরবত খাচ্ছে।

প্রতিদিনের ছবি দেখতে দেখতে করুণা বললো, একটু চা তো খাবেন। নাকি তাতেও আপত্তি?

তা খাবো। সঞ্জয় করুণার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, সবার আগে আপনি আপনার রাগটা একটু কমান। কথাটা বলেই সঞ্জয় সামান্য হাসলো।

আপনি আমার শুধু রাগটাই দেখলেন?

না, মানে আসলে আপনি রাগতেই ভালোবাসেন।

এটা কিন্তু বেশ বলেছেন। সঞ্জয়ের কথা শুনে এবারে আর রাগ করতে পারলো না করুণা। বরং ব্যাপারটা সহজ ভাবে মেনে নিয়ে কৌতুকের সুরে আরও বললো, কথার চাষ করতে পারেন বটে।

সামনেই একটা চায়েব দোকান পড়লো। ফুটপাথের স্টল। অতো সাজগোজের ব্যাপারটা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লোকে চা খাচ্ছে। সঞ্জয় ওখানে চা খাবার কথা বলতেই করুণা আবার প্রায় রেগে গেল। মুখে প্রকাশও করলো কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে।

আপনি একটা যাচ্ছেতাইই! নাকি ইচ্ছে করে আমাকে রাগাবাব জন্য বেছে বেছে এমন সব রাস্তার দোকান খুঁজছেন। ওই দোকানে কেউ চা খায়?

ভারতবর্ষের শতকরা আশিভাগ মানুষ ওই সব দোকানেই চা খায়।

আপনি হয়তো নন তবে আমি তো তাদেরই একজন।

প্লিজ। এরমধ্যে আবার রাজনীতি আনবেন না। আপনাদের সঙ্গে কথা বলার ওই এক বিপদ।

বিটকো সিনেমার উল্টো দিকে সামনের অনেকটা জায়গা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে হোটেল রাজ। এখন চারদিকে রোদের মেলা। বিস্তৃত জায়গাটা তাই ফাঁকা। সূর্য ডোবার পর সন্ধ্যার আমেজ নামলেই রাশি রাশি চেয়ার টেবিলে ওটা ভরে যায়। সার্ব্বজনীন চায়ের আসর বসে। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন নেই। করুণা সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকলো।

সঞ্জয় প্রথমেই জানালো যে চা ছাড়া সে অন্য আর কিছুই খাবে না। সেই মতো কোণের দিকে দুটো চেয়ারে বসে, করুণা বয়কে শুধু চা আনতেই বললো। তারপরে সঞ্জয়কে নিয়ে পড়লো। খুবই খোলামেলা কথাবার্তা করুণার।

দময়ন্তীর কাছে শুনেছি, আপনি বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ইউনিভারসিটির ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। তা নিজে হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান হয়ে নিজের কেরিয়ারটা কেন নষ্ট করছেন এইসব কৃষক আন্দোলন-টান্দোলনে মেতে থেকে?

কথাগুলি শুনে সঞ্জয় প্রথমে একটু হোঁচট খেলো। অন্য কেউ বললে হয়তো রেগেও যেতো। যেহেতু করুণা বলেছে সুতরাং রাগ করাটা বোকামি। করুণার মতো সুখী সুখী মোম গলা চেহারার মেয়েরা এর চেয়ে বেশি কী চিন্তা-ভাবনা করবে? ওদের জগৎ তো প্রসাধন, পার্টি, সিনেমা আর হই-হুল্লোড়।

করুণা কিন্তু ওই খানেই থেমে রইলো না। সঞ্জয়কে চুপ করে থাকতে দেখে কথা বলার উৎসাহটা তার আরও বেশি বেড়ে গেল। খুব কোমল গলায় বললো, আপনি সহজেই একটা ভালো চাকরি পেতে পারেন।

সহজে ভালো চাকরি! এই দেশে? সারা দেশে কতো বেকার সেটা জানেন কী?

ও-সব হিসেব আপনার কাছে রাখুন। আপনি চাকরি করবেন? অফিসার গ্রেডের চাকরি। একটা সুখী নিশ্চিন্ত জীবন।

করুণাজি আপনি যেটা সুখের ভাবছেন আমার কাছে সেটা বিরাট অসুখের ব্যাপার।

ছেলেমানুষি করবেন না। একটু ভেবে দেখুন—

আজ আমি যেখানে এসেছি তা অনেক ভেবেই। এ-গুলো আমার শখ নয়। জীবন! জীবন নিয়ে প্লিজ টানাটানি করবেন না। সঞ্জয় একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

আপনাকে তো আগেই বলেছি কথাব চাষ করে বেখেছেন। তারপরেই আক্ষেপের সুরে করুণা বললো, নিজের ভালোটা বুঝবেন না?

সেটা বোঝার জন্য দেশে অনেক নেতা আছেন। সঞ্জয়ের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। যেন কঠিনের আবরণে ঘেরা এক পাথরের মূর্তি। হাসিখুশি চঞ্চলমতী করুণাও নিজেকে গুটিযে নিল। কেমন যেন ভয় পেল সে। সঞ্জয়ের এই মূর্তির সঙ্গে আগে তার পরিচয় ছিল না।

এখন শরৎকাল। নীল আকাশের কোলে খন্ড খন্ড মেঘের মেলা। হাওয়ার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে কোন দূর দেশে ভেসে যাচ্ছে কে জানে! গোদাবরী নদীর দুই পারে দুধ সাদা কাশ ফুলের মাথা দোলানোর প্রতিযোগিতা।

সরযূর ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে সে কোণের দিকের ছোট ঘরখানাতে আশ্রয় নিয়েছে। যশোমতীর আনন্দ দেখে কে! নতুন অতিথিকে পড়শিরা যারাই দেখতে আসছে যশোমতী তাদেরকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। একঝলক হাসি নিয়ে শুধু বলছেন, আমাব ছেলে রঙ্গনাথ। এই মুলগা (বাচ্চা) সেই রঙ্গনাথের ছেলে। নাতি কথাটা আগে কখনও বলছেন না।

সবচেয়ে মজা হচ্ছে রঙ্গনাথকে নিয়ে। সে মুখে খুব বেশি একটা কথাবার্তা বলছে না। তবে সারাক্ষণ তার মুখে একটা সলজ্জ হাসি মিশে রয়েছে। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, চাষ-বাস নিয়ে কথা বললে রঙ্গনাথ হাসছে, তাকে খেতে ডাকলেও সে হাসছে, আগামী দিনেব আন্দোলন সম্পর্কে সে কিছু চিন্তা করছে কিনা জিজ্ঞেস করলেও রঙ্গনাথ মিটমিট করে হাসছে।

এ-সম্পর্কে বিরজু কৌতুকের সুরে একটা দারুণ কথা বলেছে। যশোমতী, সরযূ, চিক্কুয়া আর রঙ্গনাথের সামনেই বলেছে, 'দাদার এখন হাসির দশা চলছে'। কথা শোনার পরেও রঙ্গনাথের মুখে সেই হাসি।

মুম্বাই থেকে গোবিন্দনাথ এলেন। এবারে বাড়িতে তিনি বেশ কয়েকদিন থাকবেন। কোণের ঘরে পা দিয়েই সরযূকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো বহু?

ভালো আছি বাবা। সরযূ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

থাক, থাক বহু, কতো আর প্রণাম করবে। গোবিন্দনাথ প্রাণ ভরে হাসলেন।

সরযূর কোলের মধ্যে শুয়ে চার দিনের বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল। পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গোবিন্দনাথ আনন্দে বলে উঠলেন, চাঁদটা কতো নীচে নেমে এসেছে। একেবারে আমাদের বাড়ির মধ্যে।

মন্ত্রী হয়ে তুমি আজকাল বেশ ভালো ভালো কথা বলতে শিখেছো।

যশোমতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন। সেই ঠাট্টার মধ্যে যে একরাশ আনন্দ আর গর্ব মিশেছিল সেটুকু উপলব্ধি করে গোবিন্দনাথ তৃপ্তির হাসি হাসলেন। যশোমতী অভিযোগ করে বললেন, তুমি ওকে আশীর্বাদ করলে না?

আশীর্বাদ? কথাটা উচ্চারণ করে গোবিন্দনাথ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকালেন। হাসতে হাসতে বললেন, ও যেন মন্ত্রী হয়। বড়ো সুখের চাকরি। রাজার চাকরি। কী বলো কাকাসাহেব? যে-দেশের ষাট ভাগ মানুষ অনাহারে দিন কাটায় সে-দেশের মন্ত্রীদের দেখে তো বোঝার এতোটুকু উপায় নেই। কী দারুণ জাঁকজমক জীবন! এর চেয়ে বড়ো আশীর্বাদ আর কী করতে পারি! কথাটা শেষ করেই গোবিন্দনাথ অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগলেন।

তাঁর ওই হাসিটা সঞ্জয়ের কানে নতুন এক অর্থ হয়ে ধরা দিল। হাসতে হাসতে বললেও গোবিন্দনাথের কথা মধ্যে ক্ষোভ মিশে ছিল। সঞ্জয় আগে থেকেই জানতো ওঁর মতো নিরীহ পুরোপুরি ভদ্রলোকের পক্ষে মন্ত্রিত্ব করা সম্ভব নয়। কেন-না এই দেশে মন্ত্রী হতে গেলে আর কোনও যোগ্যতা থাক বা না-থাক, রাজনীতির মার-প্যাঁচটা দারুণ ভাবে জানতে হয়। সেটা গোবিন্দনাথ বিন্দুমাত্র জানেন না। অবস্থা অনুযায়ী এক-এক জায়গায় এক-এক ধরনের মিথ্যে ভাষণ দিতে হয় নীতির সঙ্গে যার কোনওরকম সামঞ্জস্য থাকে না। গোবিন্দনাথ চার রকম কথা বলতে পারেন না। মন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে তাঁর তো অসুবিধে হবেই। সঞ্জয় গোবিন্দনাথকে একটু নাড়া দেবার জন্য বললো, আপনিও জাঁকজমক ভাবে থাকুন না।

সঞ্জয়ের কথাটা লুফে নিলেন গোবিন্দনাথ। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে কাকাসাহেব তুমি তো মজা করে বললে? জানো, মুম্বাইয়ের তাবড় তাবড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরাও আমাকে এই কথাই বলেছে। একজন তো একান্তে বলেই ফেলেছে, স্যার কেন ওই নাসিকের একলাহারী গ্রামে পড়ে রয়েছেন, আমরা রয়েছি কী জন্যে? আপনি ববং মেরিণ-ড্রাইভের ফ্ল্যাটে অথবা মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে চলে আসুন। দয়া করে সেই ব্যবস্থাটুকু করার সুযোগ অন্তত দিন। উত্তরে ওদেরকে শুধু বলেছি, আমি সাধারণ এক চাষী। আমাকে সাধারণ ভাবেই থাকতে দিন। তারপরেই কৌতুকের সুরে প্রশ্নটা সঞ্জয়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন গোবিন্দনাথ। আমাব আড়ালে এখন ওরা কী বলছে জানো? নযা ফুড মিনিস্টাব বিলকুল বুদ্ধু আদমী। এ-ব্যাটা মন্ত্রীর আদব-কায়দাই জানে না।

কথাগুলো বলার পর গোবিন্দনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন, আসলে এই মুহূর্তে দুটো ঘটনা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আমার খুবই খাবাপ লাগছে কাকাসাহেব। আমার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকা গিয়ে দু'সপ্তাহ কাটিযে এলো। ব্যাপাবটা এই পর্যন্ত হলে কোনও কথা ছিল না। সরকারি টাকায সে তাব পরিবারের ছ'জনকে নিযে গিয়েছিল। আমার আপত্তি ছিল সেখানেই। মুখ্যমন্ত্রী সব জেনেও এটাকে নিয়ে হইচই করতে বারণ করে দিলেন। ইংলিশে আমাকে বললেন অ্যাডজাস্ট করে নিতে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছে। স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না-পারলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে কী লাভ? শোভা বাড়ানোর জন্য তো আমি মন্ত্রী হতে চাইনি। ব্যাপারটা হলো পশ্চিম বাংলাব খাদ্যমন্ত্রী সেখানকার বেশন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কিছু চাল পাঠাতে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। আমার যখন চাল মজুত রয়েছে তো ভাই কেন পাঠাবো না? আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিলাম, নিশ্চয়ই চাল পাবেন। এখন মুশকিল হলো আমার কথা আমি রাখতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, কেন্দ্রকে না-জানিয়ে আমি নাকি এমন ভাবে পশ্চিম বাংলায় চাল পাঠাতে পারি না। গোবিন্দনাথ অসহায়ের সুরে বললেন, এতো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কী করে কাজ করবো বলো?

মহারাষ্ট্রের প্রতিটি কাগজে দময়ন্তীর ছবি ছাপা হলো। মরাঠা সংবাদের প্রথম পাতায় তারই কথা। জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার একশো এবং চারশো মিটারে সে শুধু প্রথমই হয়নি, সময়েব দিক দিযেও রেকর্ড করেছে। বিজয়িনী দময়ন্তীর কথা লিখতে গিয়ে সাংবাদিক এটুকুও জানিয়ে দিলেন, তিনি মহারাষ্ট্রের খাদ্যমন্ত্রী গোবিন্দনাথ উথাইয়ার একমাত্র কন্যা।

চিক্কুয়া, বিরজু আর রঙ্গনাথ তো বীতিমতো হইচই বাধিয়ে দিল। তাদের বোন এতোবড়ো একটা কৃতিত্বের অধিকারিণী এ-কথা ভাবতেই দারুণ লাগছে। প্রতিটি কাগজে তাদের বোনের ছবি, প্রশংসা, এ-কি কম কথা?

রঙ্গনাথ ঠাট্টার সুরে বললো, বাবার নামটা সাংবাদিকটি ঠিক ঢুকিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্রী তো তাই! দময়ন্তী যে আমাদের তিনজনের বোন এ-কথা কোথাও কেউ লেখেননি। দময়ন্তী তার তিন দাদা রঙ্গনাথ, বিরজু এবং চিক্কুয়ার কাছে ছোট বেলায় সাঁতার শিখেছে এমন ধরনের একটা কথাও তো লেখা যেতে পারতো।

মেয়েটাকে সেদিন আমি খুব বকেছিলাম। আফসোসের সুরে বিরজু বললো, আর কক্ষনও বকবো না।

দময়ন্তী প্রায়ই ক্ষেতে আমাদের খাবার নিয়ে যায়। এরপর কী ওকে দিয়ে এই ধরনের কাজ করানোটা ঠিক হবে? চিক্কুয়ার সরস প্রশ্ন।

সকলের সব কথা শুনে যশোমতী চাপা হাসলেন। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই বললেন, সোনা পাক, রুপো পাক, আর কাঁসা-পেতলই পাক ও তো আমাদের সেই দময়ন্তীই থাকছে।

হ্যাঁ। এই একটা কথার মতো কথা বলেছো মা। দারুণ বলেছো! রঙ্গনাথের কথা শুনে যশোমতী বড়ো ছেলের মুখেব দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিশুর মতো হাসির ফোযারা ছুটিয়ে বললেন, আমি এর চেয়েও দারুণ দারুণ কথা বলতে পারি। তার পরেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

সবই তো হলো কিন্তু দাদু ভাইয়ের খবরটা যে দময়ন্তীকে এখনও জানানো হলো না। এটা কী ঠিক হচ্ছে? দময়ন্তী দুঃখ পেতে পারে।

দু'দিন পরেই তো দময়ন্তী এসে যাচ্ছে। বিরজু বললো, ওকে আমরা একেবারে অবাক করে দেবো।

হ্যাঁ। চিক্কুয়া টিপ্পনী কেটে বললো, পারো তো এই দু'দিনের মধ্যে পিসি ডাকটাও শিখিয়ে দাও। দময়ন্তী আরও বেশি অবাক হবে।

গুড় গুড় করে হুঁকোর তামাক টানছিলেন গোবিন্দনাথ। স্ত্রী এবং ছেলেদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনছিলেন। চিক্কুয়ার কথায় হাসি চাপতে গিয়ে কাশির মাত্রা বাড়িয়ে তুললেন। মনে মনে শুধু বললেন, ফাজিল ছেলে!

জয়পুর থেকে মুম্বাই হয়ে দময়ন্তী আজ ফিরছে। গতকালই বিকেলে চিক্কুয়া ওরা টেলিগ্রাম পেয়েছে। বিজয়িনী আসবে সন্ধ্যা সাতটা-কুড়ির ট্রেনে। রঙ্গনাথ, বিরজু, চিক্কুযা তিন ভাইই স্টেশনে গেছে। তবে প্ল্যাটফরমে জনতার ভিড় দেখে ওদের আশঙ্কা হলো দময়ন্তীর কাছে পৌঁছাতে পারলে হয়! জনতার হাতে ফুলের তোড়া, মালা আর প্রশংসায় ভরা কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলো, দময়ন্তী আজ শুধু তাদেরই বোন নয়—সে মহারাষ্ট্রের গর্ব। ভারতের গর্ব।

করুণা সহ ইউনিভারসিটির মেয়েরা, সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা, নাসিকের গর্বিত জনসাধারণ দময়ন্তীকে ফুলের মালা পরিয়ে বিপুল ভাবে সংবর্ধনা জানালো। উত্তরে দময়ন্তী মিষ্টি করে হাসলো। অনেকের সঙ্গে কথা বললো। কেউ কেউ অটোগ্রাফ চাইলো। সই দিতে সঙ্কোচ হচ্ছিলো তবুও দময়ন্তী তা দিল। তিন দাদাকে একসঙ্গে হুড়মুড় করে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ হাসলো প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েই মেডেল দেখালো। সবই হলো তবুও কোথায় যেন একটা শূন্যতা অনুভব করলো দময়ন্তী। সেই শূন্যতার নাম সঞ্জয়। খুব আশা করেছিল দময়ন্তী দাদাদের সঙ্গে নিশ্চিত সঞ্জয়কেও দেখতে পাবে। কেন সে এলো না সেটাই বুঝতে পারলো না। অথচ এতো আনন্দের মধ্যে ওকেই বড়বেশি মনে পড়েছে। এই যে দময়ন্তী এতো অভিনন্দন পাচ্ছে আসলে এ-সবের প্রতি তার কিন্তু কোনও মোহই নেই। এই মুহূর্তে সঞ্জয়ের উপস্থিতিটাই তার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে লাগলো। গানের সুরের মতো সঞ্জয়ের একটা কথা তার দুই কানে রিম ঝিম করে বাজছে, "আপনি জলে নামবেন আর স্ট্যান্ড করবে অন্য মেয়ে এ-জিনিস হতে পারে না।"

বাড়িতে ফিরে যশোমতী আর গোবিন্দনাথের গলায় মেডেল দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠলো দময়ন্তী। আর ঠিক তখনই একটি কচি কান্না তার কানে যেতেই স্থির হয়ে চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা ধরা পড়লো। প্রত্যেকেই এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছে।

ভাবিজি? আনন্দে চিৎকার করে উঠলো দময়ন্তী। মুহূর্ত আর দেরি না-করে ছুট লাগালো কোণের ঘরের দিকে।

রাত কতো কে জানে! দময়ন্তীব ঘরে ঘড়ি নেই। রাত একটা হতে পারে আবাব তিনটেও হতে পারে। দময়ন্তী শুধু বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছে। স্টেশনে ভেবেছিল সঞ্জয় বাড়িতেই রয়েছে। কিন্তু বাড়ি এসে জানতে পারলো সে দু'দিন ধরে পুনেতে তাব মিটিং নিয়ে ব্যস্ত। আগামীকাল ফেরার কথা। দময়ন্তী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। মেডেল দুটো হাতে নিয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। মেডেলের মধ্যে কী সঞ্জয়ের মুখ আঁকা?

পরদিন বিকেল নাগাদ সঞ্জয় বাড়ি ফিরলো। দাওয়ায় বসে ছিল দময়ন্তী। দূর থেকে ওকে আসতে দেখে একবার ভাবলো উঠে গিয়ে মেডেল দুটো ওর ঘরে রেখে আসে। পরক্ষণেই ভাবলো, না, তা করবে না। নিজে হাতে দেখাবে। দময়ন্তী দাওয়া থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সঞ্জয় উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে তার ঘরে ঢুকেছে কী ঢোকেনি দময়ন্তী পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল। সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে একটিও কথা খরচ না-করে নীরবে ওকে দেখতে লাগলো। মেডেল দুটো এগিয়ে দিতেই সঞ্জয় গভীর আগ্রহে হাত বাড়িয়ে সে-দুটি নিয়ে মমতা মেশানো চোখে দেখতে থাকে। সঞ্জয়ের দুই ঠোঁটে তখন মৃদু হাসির রেখা। কী যেন বলতে যাবে সে, লজ্জা পেযে দময়ন্তী ততোক্ষণে উধাও।

আজ বাড়িতে ছোটখাটো একটা উৎসব। নতুন শিশুর বয়েস দশ দিন পূর্ণ হলো। কিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে। চিক্কুয়ারা তিন ভাই-ই আজ ক্ষেতে যায়নি। গোবিন্দনাথ তো রয়েছেনই। যশোমতী আগে থেকেই সঞ্জয়কে বলে রেখেছেন ওই দিন তুই কিন্তু কোথাও মিটিং করতে যেতে পারবি না। সরযূও এক কথা, আমার ছেলের মঙ্গল অনুষ্ঠান। তোমার বাড়িতে থাকা চাই-ই।

সঞ্জয় হেসেছে। ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হযেছে। উথাইয়া পরিবারের সঙ্গে সে যে-ভাবে ক্রমশ গভীর ভাবে মিশে যাচ্ছে তাতে সম্পর্কের বাঁধন অটুট-ই হচ্ছে। অথচ পরে হয়তো এ-নিয়ে অনেক কষ্ট পেতে হতে পারে। গত দু'দিন ধরেই সঞ্জয় খুব বেশি করে ভাবছে এ-ভাবে জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হচ্ছে না। আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতো তার জীবন যখন নিশ্চিত ছকের মধ্যে নয় তখন পরিণতিটা নিশ্চয়ই সুখকর ছবির আমেজ নিয়ে ভরে উঠবে না।

ঘন্টাখানেক ধরে পূজারী পন্ডিত পূজা-আর্চা করলেন। সারা উঠোনে, ঘরের ভেতরের কোণায় কোণায় ধূপের গন্ধ। গ্রামের বয়স্কা মহিলারা সুর করে শিশুর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছেন। একটা ঝুলা অর্থাৎ দোলনায় শিশুটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। যশোমতী দুটো আস্ত-নারকেল রাখলেন সেখানে।

বড়ো হয়ে শিশু কী হবে—এমন ধরনের আলাপ আলোচনা চলছিল। অনেকেই অনেক কিছু বলেছে। সঞ্জয় ঠিক খেয়াল করেনি। তবে দময়ন্তীর কথাটা কানে যেতেই সে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো, না। সঞ্জয়ের ভরাট গলার ওই 'না' শুনে সকলেই ওর মুখের দিকে তাকালো।

আসলে দময়ন্তী এমন কিছু খারাপ বলেনি। স্বাভাবিক ভাবেই সে বলেছিল, আমার ভাইপো যেন আমার চেয়েও অনেক বড়ো সাঁতারু হয়।

ঠিক তখনই সঞ্জয় বলে উঠলো, না। বঞ্চিত মানুষদের মুক্তির জন্য ও লড়াই করবে। যাদের শুধুমাত্র দুটি চোখই আছে অথচ দেখতে পায় না, তাদেরকে পথ দেখাবে।

শিশুর নামকরণ হবে। নিয়ম মতো গোবিন্দনাথেরই নাম রাখার কথা। কিন্তু তিনি যশোমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে সঞ্জয়কে একটা দারুণ সম্মান দিলেন। গোবিন্দনাথ বললেন, কাকাসাহেব ওর নাম রাখবে।

আমি! সঞ্জয় যথেষ্ট লজ্জিত .হয়ে পড়লো। আপনি এবং মাতাজি থাকতে আমার পক্ষে....

আমরা সবাই চাই তুমিই ওর নাম দেবে।

সঞ্জয় একে একে রঙ্গনাথ, বিরজু আর চিক্কুয়র দিকে চাইলো। তারা একগাল হাসলো। গোবিন্দনাথকে সমর্থন করে তারা প্রত্যেকেই যা বললো তার মূল কথা, অ্যায়সা ক্যায়া বাত হ্যায়? পিতাজি যখন বলেছেন তোমাকেই নাম দিতে হবে।

সঞ্জয় সরযূকে দেখলো। ঘোমটার ফাঁকে তার চোখ দুটি খুশিতে চিকচিক করছে। নীরবে মাথাটা

হেলিয়ে সম্মতি দিল। এই জিনিসটাই সঞ্জয় বুঝতে চাইছিল। যতোই সে এখানে আপন হয়ে উঠুক আসলে তো সম্পূর্ণই একজন বাইরের মানুষ। নাম করণের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সে যেটা করতে চলেছে বাড়ির প্রতিটি মানুষ সেটাকে কতোখানি হৃদয়ের সঙ্গে নেবে তা জানার প্রয়োজন আছে। গোবিন্দনাথ বা যশোমতীর কথা আলাদা, শিশুর বাবা-মা হিসেবে সরযূ ও রঙ্গনাথেরও তো একটা মতামত রয়েছে। তারাও যখন চাইছে সুতরাং ভালো দেখে একটা নাম দেওয়া যেতে পারে।

নাম ভাবতে ভাবতে সঞ্জয়ের সঙ্গে দময়ন্তীর একবার চোখাচোখি হতেই দময়ন্তী খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির রেশটুকু সংযত করে নিয়ে বললো, মুন্ডিয়া, ধনিয়ার মতো আবার নাম-টাম দেবেন না। বিচ্ছিরি লাগে।

যদি কালুয়া দিই? সঞ্জয় মৃদু হাসলো।

হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। ওটা যে আসল নাম নয় এটা সকলেই জানে। হাসির কারণ সঞ্জয়কে রসিকতার মধ্যে ফিরে পেয়ে। এমনিতে ওকে তো গম্ভীর আর চিন্তাশীল দেখায়।

সঞ্জয় নতুন শিশুর নাম দিল প্রত্যয়। প্রত্যয় উথাইয়া। প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করলো এটা একটা অদ্ভুত সুন্দর নাম! দ্বিতীয় আর কোনও নামের চিন্তা কেউ করলো না। শুধু যশোমতী নামের অর্থটুকু বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করলেন, এমনিতে নামটা শুনতে খুবই ভালো লাগছে কিন্তু এর মানে কী? আমি তো তোদের মতো লেখাপড়া......

যশোমতীকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে সঞ্জয় খুব আস্তে আস্তে বললো, মাতাজি প্রত্যয়ের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। আমাদেব এই ছোট্ট প্রত্যয় একদিন অনেক বড়ো হবে। তাব ওপর থাকবে মানুষেব অগাধ বিশ্বাস। আব সেই উপলব্ধি নিয়ে বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে প্রত্যয সব সময়েই দৃঢ় প্রত্যযে এগিয়ে যাবে।

সঞ্জয়ের বলার ধরনে গোবিন্দনাথ এবং যশোমতী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। যশোমতী তো বলেই ফেললেন, নামের এতো সুন্দর মানে হয়।

শরৎকাল প্রায় শেষ হতে চলেছে। সামনেই মরাঠিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব গণপতি অর্থাৎ গণেশ পূজা। এই গণেশ পূজার পরেই সারা রাজ্যের কৃষকদের কৃষিপণ্যের লাভজনক দামেব দাবিব আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

আগামীকাল গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে। আকোলা, পুনে, ঔরঙ্গবাদ, চল্লিশগাঁও, ধুলে, জলগাঁও, ওয়াদি, নাগপুর, কল্যাণ, মীরাজ, এবং আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্ষেতকাবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা আসবে। মিটিংটা হবে সংগঠনের সভাপতি ধীরাজ শর্মার নাসিক থেকে আঠাশ-ত্রিশ কিলোমিটার দূরে তুম্বকেশ্বরের গ্রামের বাড়িতে।

ছায়া ঘেরা শীতল একেবারে দেহাতি গ্রাম এই তুম্বকেশ্বর। সামনেই মাথা উঁচু করে নাগা সন্ন্যাসীর মতো ধ্যান-গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুম্বকেশ্বর পাহাড়। গোদাবরী নদীর উৎস নাকি এখান থেকেই। পাহাড়ের মাথায় মন্দির রয়েছে। কিছু মানুষ আসে বটে নয়তো গ্রামটা খুবই নিরিবিলি। নির্জনতার প্রতিচ্ছবি।

উথাইয়া পরিবার থেকে এই মিটিংয়ে এসেছে রঙ্গনাথ, বিরজু, চিক্কুয়া। এসেছে দময়ন্তীও। তার অবশ্য আসার কথা নয়। কিন্তু কেউ যদি নিজে থেকে উৎসাহ দেখিয়ে অংশ গ্রহণ করতে চায় তাকে নিশ্চয়ই অভ্যর্থনা জানানো হবে। তারপরে সে যদি আবার দেশ জোড়া নামের মানুষ হয়। সুতরাং দময়ন্তীকে পেয়ে সকলেই খুশি।

আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ ধীরাজ শর্মা তো খুবই আনন্দ পেলেন দময়ন্তীকে দেখে। বলেও ফেললেন সে কথা, কৃষক পরিবারে তোমার মতো শিক্ষিতা মেয়েরা যদি এ-ভাবে এগিয়ে আসে এর চেয়ে খুশির আর কী হতে পারে? তারপরেই তিনি রসিকতা করে বললেন, বিভিন্ন জায়গায় কাকাসাহেবের ভাষণ শুনে দু-চারজন মেয়েকে দেখেছি তারা যতো না কাজে উৎসাহী তার চেয়েও অনেক বেশি

উৎসাহী ওকে বিয়ে করতে।

কথা শুনে লজ্জায় ভেঙে পড়লো দময়ন্তী। পাবে তো মাটিব সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। ধীরাজ শর্মা পরম স্নেহে দময়ন্তীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এতো সরমের কী আছে বিটিয়া? ঠাট্টা ঠাট্টাই! আমি শুধু বলতে চাই শখ করে কেউ যেন আমাদের মধ্যে না-আসে। তোমার কথা তো আলাদা।

ধীরাজ শর্মার ওই 'শখ কবে' কথাটায় দময়ন্তী একটা নাড়া খেলো। কথাটা কী আংশিক সত্য নয়? তুম্বকেশ্বরের এই মিটিংয়ে সঞ্জয় ভাষণ দেবে। ক্ষেতকারী সংগঠনের সে সভাপতি নয়, সম্পাদক নয় এমনকী কার্যকরী সমিতির সদস্যও নয়। তবুও সঞ্জয় অর্থাৎ কাকাসাহেবই এই এক বছরের মধ্যে সব কিছু হয়ে উঠেছে। সংগঠনের সব কর্মীদের মুখেই এক কথা কাকাসাহেব দারুণ বলে!

টুকরো টুকরো এ-সব কথা দময়ন্তীর কানে গেছে। তা থেকেই এই আকাঙ্খা। কেমন ভাষণ দেয় সঞ্জয় শুনতে হবে। সেই কাবণেই এখানে আসা। যাব সঙ্গে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কোনও সম্পর্ক আপাততো নেই। এই মুহূর্তে দময়ন্তীর নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগলো। সে কী ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ করতে চলেছে?

রাতের অন্ধকারে হেড-লাইট জ্বেলে সরকারি শেষ বাসটা ছুটে চলেছে নাসিক রোডের দিকে। পেছনেব লম্বা টানা সিটটাতে পাশাপাশি পাঁচজন বসে। সঞ্জয়, দময়ন্তী, রঙ্গনাথ, চিক্কুযা আর বিরজু। তুম্বকেশ্বরের মিটিং শেষে আগের বাসগুলোতে অনেকেই যে-যার বাড়ি ফিরে গেছে। ওরা ফিরছে এই শেষ বাসটায়। যারা আরও দূর দূর থেকে এসেছে তারা রওনা হবে আগামীকাল সকালে।

বাসটা এক জায়গায় থামলো। একজন নামলো, উঠলো তিনজন। তারপরেই আবার ছুট। হুহু কবে বাতাস খেলছে। সঞ্জয় সেই বাতাস আর কোণের সিট পেয়ে ক্লান্তিতে খুব সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুমন্ত মুখটা চোখের কোণ দিযে দেখে নিয়ে দময়ন্তী ভাবতে বসলো, হ্যাঁ কিছু কথা বলতে পারে বটে সঞ্জয়। যেমন তার জ্ঞান তেমনি মানুষের মনের একেবারে ভেতরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা। অথচ কতো কঠিন কঠিন কথা কতো সহজে কতো সুন্দর ভাবে তুলে ধরলো। কখনওই মনে হয়নি যে বক্তৃতা দিচ্ছে। যেন পাঁচজন মানুষের সঙ্গে খুব সাধারণ ভাবে কথা বলছে। কথা বলার ধরনটাও আবেদনপূর্ণ।

সঞ্জয়ের বক্তৃতাটা নিজের মনের মধ্যে নিয়ে নাড়াচাড়া কবতে লাগলো দময়ন্তী। সঞ্জয় যা-যা বলেছে মোটামুটি ভাবে সেটাকে সাজাতে থাকে ঃ ভারতবর্ষ একটা অনুন্নত দেশ। দ্রুত শিল্প বিকাশের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তা ভারতীয় শিল্পপতিদের নেই। সুতরাং শিল্পের বিকাশের খাতিরে কৃষিপণ্যের মূল্য সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হয়। ফলে কৃষকরা ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকে। এবং কৃষি উৎপাদনের ওই উদবৃত্ত টাকা ব্যবসায়ীরা হস্তগত করে শিল্প বিকাশের মূলধন জোগায়। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাজেটগুলি গৃহীত হয়। এই যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেশে চলছে তা যাতে কৃষকরা সম্যক বুঝতে না-পারে তাব জন্য শিক্ষার বিস্তাব খুবই শ্লথ গতিতে চলে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের বিভিন্ন ভাবে নানা ধরনের কৃষক সমিতিতে বিভক্ত করে রাখা হয। উৎপাদনের মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের বিচার না-করে অমৌলিক কতোগুলি দাবিদাওয়া উপস্থিত করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করা হয়। সুতরাং কৃষকরা কিভাবে বঞ্চিত শোষিত হচ্ছে সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। আপাততো প্রথম কাজটি হলো সরকারের কাছ থেকে কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম পাওয়া। তা না-হলে কৃষকদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। আর একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে, এই ব্যাপক আন্দোলন করতে গিয়ে সরকারের কাছ থেকে আমাদের ওপর নেমে আসবে অত্যাচারের বন্যা। হয়তো পুলিশের গুলি অনায়াসে আমাদের ছিনিয়ে নেবে মা, বাবা, ভাই, বোন এবং স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগ্রামী মনোবল হারালে চলবে না। কেন-না অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন আর নেই। সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরাও পাল্টা মার দিতে পারি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি না-পাল্টালে আন্দোলন হবে দুর্বার। সেখানে কারো রেহাই

নেই। গণেশ পূজার পর থেকে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করবো। আপনারা তৈরি থাকুন। একটা কথা জানবেন আর্থিক দিক দিয়ে আমরা তো মরেই আছি। একটা মরা জাতকে সরকারি প্রশাসন কতো আর মারবে? কিন্তু সরকার বাহাদুরকে যদি আমরা স্তব্ধ করে দিতে পারি, সেটা হবে একটা বিরাট জয়। ঐতিহাসিক জয়। আমরা সেই বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

রাতে ঘুম এলো না দময়ন্তীর। নিজের বিছানায় শুয়ে আছে স্রেফ চোখ দুটি খুলে। অন্ধকার ঘর। মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আসলে সঞ্জয়ের বক্তৃতাটা তার মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। মনে হচ্ছে জাতীয় সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন, পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. পড়া সে শুধু সাধারণ একজন মেয়েই নয়, এই আন্দোলনে তারও কিছু করার আছে। তার ভূমিকাও বিরাট হতে পারে। সেই ভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করতে ইচ্ছে হচ্ছে দময়ন্তীর। তুম্বকেশ্বরের পাহাড়ের মাথায় উঠে সঞ্জয় দময়ন্তীকে সেই মন্ত্রণাই দিয়েছে।

পাহাড়ে উঠেছিল সকালে। দময়ন্তী আর সঞ্জয়। গল্প করতে করতে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে ছিল প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে। মন্দির, গো-মুখের জলের ধারা ইত্যাদি দেখার পর ওরা পাশাপাশি একটা বড়ো পাথরের চাঁইয়ের ওপরে বসেছিল। খানিকটা বিশ্রাম নেবার পর নীচের দিকে তাকিয়ে সঞ্জয় বলেছিল, উপরে উঠলে নীচের মানুষদের খুব ছোট দেখায়।

খিলখিল করে হেসে দময়ন্তী উত্তর দিল, এটা তো পুরোনো কথা। সবাই জানে।

আমি সেটা বলতে চাইনি। সমতলে থেকেও তো আমরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের ছোট করে দেখি। আসলে কী জানেন, আমরা বেশির ভাগ মানুষই স্বার্থপর। যে-কোনও একটা বাহানা করে যুক্তির আড়ালে নিজের নিজের সুবিধেটুকু পুরোপুরি পেতে চাই। দেশ এগোবে কী? দেশের নেতারা তো দেশকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরা মুখে বিপ্লবের কথা বলে হাততালি কুড়োয় আসলে বিপ্লবকে এরা ভয় পায়। তারই প্রতিযোগিতা এখন সব পার্টির মধ্যে, কে কার আগে কতো তাড়াতাড়ি বিপ্লবকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দময়ন্তীজি এইসব ভন্ডামীকে রুখতে হলে এগিয়ে আসতেই হবে। সেখানে আপনারও সমান দায়িত্ব।

এইবারে একটু একটু করে দময়ন্তীর দু'চোখের পাতায় ভর করে ঘুম আসছে। এতোক্ষণের অশান্ত মনটা এখন পুরোপুরি শান্ত। দময়ন্তী যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। বিশ্বাসের, আদর্শের সেই সিঁড়িতে পা রেখে সে উপরে উঠতে লাগলো। আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ওখানে নতুন এক আলো নিয়ে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। দময়ন্তী ঘুমিয়ে পড়ে। পুব আকাশে মুক্তির আলো। পাখিরা প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে। ভোর হতে আর দেরি নেই।

সরযূ আবার যথারীতি বাড়ির কাজে নেমে পড়েছে। আগের চেয়ে অবশ্য কাজের চাপ এখন বেশি। সেটা প্রত্যয়ের জন্য। ওকে সামাল দিতেই সারাক্ষণ একজনের প্রয়োজন। সেটা যশোমতীই করছেন। প্রত্যয়কে এক ঘন্টা ধরে মিঠে রোদে তেল মাখানো, গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে ভিজে কাঁথা পাল্টানো, পায়খানার কাঁথা ধুয়ে দেওয়া, নতুন কাঁথা সেলাই করা সবই তাঁর কাজের মধ্যে। প্রত্যয় মাঝে মধ্যে কেঁদে উঠলে সরযূ শুধু ওকে বুকের দুধটুকু দিয়ে মায়ের কর্তব্য করছে। এর বেশি তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

প্রত্যয় অপরের কোলে থাকলেই দময়ন্তীর আদর করাটা বেড়ে যায়। নিজে কোলে নিয়ে আদর করতে কেমন যেন ভয় করে। গা শিরশির করে। এই বুঝি বাচ্চার কোথাও লেগে যাবে। প্রত্যয় রঙ্গনাথের কোলে ছিল। জিভ টাগরায় ঠেকিয়ে নানা রকম শব্দ তুলে দময়ন্তী ওর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যস্ত। শিশুর তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মিটমিট করে একবার চোখ মেলে তাকাচ্ছে কিছুক্ষণ পর আবার বন্ধ করছে।

ঘরে বসে বই পড়ছিল সঞ্জয়। বারান্দায় এসে দেখলো উঠোনের আম গাছের ছায়ায় বসে যশোমতী কাঁথা সেলাই করছেন। দড়ির চারপাইতে পাশাপাশি বসে দময়ন্তী আর রঙ্গনাথ। রঙ্গনাথের কোলে শুয়ে প্রত্যয় হাত-পা ছুঁড়ছে।

পায়ে পায়ে রঙ্গনাথের কাছে এগিয়ে গিয়ে সঞ্জয় করুণ হেসে বললো, বড়োভাই জানি না আর কতোদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবো। তবে যেখানেই যাই আমার বইগুলি এখানে থাকবে। বড়ো হয়ে প্রত্যয় এই বইগুলি পড়ে আরও বড়ো হবে। ওকে তখন আমার কথা বোলো। ওর সঞ্জয়কাকু যে-বই কখনও হাত ছাড়া করেনি.....সঞ্জয় উজ্জ্বল চোখ মেলে প্রত্যয়ের দিকে তাকালো। অনেক দূরে থেকে আস্তে আস্তে আসা শব্দের মতো বিড়বিড় করে বললো, এই বইয়ের মর্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে।

গণেশ পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই উৎসব চলবে দশদিন ধরে। আজ তার চতুর্থ দিন। সারা মহারাষ্ট্রে খুশির বান ডেকেছে। এই আনন্দ উৎসবে শত্রু-মিত্র সবাইকে এক করে দেয়। নাসিক রোডের টাঁকশালের সর্বজনীন গণেশ পূজাটা এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পূজা। একদিকে মন্ডপ অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল। পূজার দশ দিনের প্রত্যেক দিনই একটা-না-একটা অনুষ্ঠান আছে। তিনদিন সিনেমা, তিনদিন নাটক, দু'দিন যাত্রা, একদিন বড়ো বড়ো গানের শিল্পীদের নিয়ে জলসা, একদিন লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। ঠাসা প্রোগ্রাম।

একদিন সন্ধ্যার পর দময়ন্তীর সঙ্গে সঞ্জয় বেরুলো ঠাকুর দেখতে। তার অবশ্য বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না কিন্তু যশোমতীই বললেন, তুই তো একদিনও ঠাকুর দেখতে বের হলি না সঞ্জয়। আর কবে দেখবি? যা বেটে, গণপতি দেবকে প্রণাম করে আয়। তোব সব আকাঙ্ক্ষা গণপতিজি পূর্ণ কববেন।

ঠাকুর-দেবে তোমার খুব বিশ্বাস তাই না মাতাজি?

গরিব মানুষদের ভগবান ছাড়া আর কে আছে? বিশ্বাস তো রাখতেই হয়। যশোমতীর সোজাসুজি কথা।

দময়ন্তীরা যখন পূজা প্যান্ডেলে গিয়ে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা আরতি চলছে। চারদিকে ধূপের সুন্দর গন্ধ। সেই সঙ্গে গানের সুরের মতো একটানা টুংটাং ঘন্টার ধ্বনি। নতুন, নতুন ঝলমলে জামা-কাপড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষের মেলা। দময়ন্তী খুবই ভক্তি ভরে বুকের ওপরে হাত দুটি এক করে প্রণাম করলো। সঞ্জযের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলো একটু।

তাবপরেই বললো, গণপতিজিকে প্রণাম করলেন না?

করতেই হবে? সঞ্জয় হেসে দিল।

না—দময়ন্তী ধমকের সুরে বলে উঠলো, আপনার ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে গণপতিজিই উল্টে আপনাকে প্রণাম করবেন।

তাহলে আপনি কেন শুধু শুধু গণপতিজিকে প্রণাম করতে গেলেন? উনিই যখন আমাকে.......

দেখুন—চোখ পাকালো দময়ন্তী। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করাটা ঠিক নয়।

কী হয়? সঞ্জয়ের দুই চোখে কৌতূহলের ছাপ।

সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

না, আমি জানি না।

আপনি সব জানেন। নিন, প্রণাম করুন—

সঞ্জয় প্রণাম করলো। প্রায় দেড়-দু'মিনিট চোখ বন্ধ করে কপালে দুটো হাত তুলে নমস্কার করে দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু করতে হবে?

আপনি কী আমাকে সন্তুষ্ট করছেন নাকি? কথাটা বলেই দময়ন্তী ওকে টেনে নিয়ে গেল একেবারে আরতির সামনে। পুরোহিতের কাছ থেকে চরণামৃত নিল। পঞ্চপ্রদীপের আলোর শিখায় হাত রেখে মাথায় বোলালো। দময়ন্তী যা-যা করলো, সঞ্জয়কেও তাই করতে হলো।

ইতিমধ্যে কিছু ছেলেমেয়ের দল দময়ন্তীকে ঘিরে ধরলো। জাতীয় সাঁতারে সদ্য রেকর্ড করা মেয়ে সে। তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দে ওরা হইচই বাঁধিয়ে দিল। সকলেই দময়ন্তীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। কার আগে কে কথা বলবে তারও একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা রয়েছে।

বছর তেরো-চোদ্দর একটা মেয়ে বললো. দময়ন্তী দিদি তুমি এখানে কতোক্ষণ থাকবে?

প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হলো দময়ন্তী। ছেলেমেয়ের দল তাকে যে-ভাবে ছেঁকে ধরেছে. যে-ভাবে সাঁতারের খুঁটিনাটি নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে তাব মধ্যে হঠাৎ ওই ধরনের প্রশ্নে সে একটা ধাক্কা খেলো। কোনওরকমে বললো. কেন বলো তো?

আমি বলছিলাম কী—মেয়েটি একটা ঢোক গিলে বললো, আমাদের বাড়ি এই সামনেই। এক ছুটে যাবো আর খাতা-কলম নিয়ে আসবো। তুমি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে?

মেয়েটির চোখে-মুখে এক. ধরনের ব্যাকুলতা আর শিশুসুলভ হাব-ভাব দেখে দময়ন্তী হেসে দিল। অটোগ্রাফ দিতে যদিও তার আপত্তি কিন্তু কিশোরী মেয়েটিকে নিরাশ করতেও মায়া হলো। বললো, আমি অপেক্ষা করছি। তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এসো।

দময়ন্তী শুধু ওই কিশোরীকেই অটোগ্রাফ দিল না, দিতে হলো আরও চার-পাঁচজনকে। ওখান থেকে ছাড়া পেতেই সে সঞ্জয়কে নিয়ে একটু নির্জনতা পাবার জন্য অন্য দিকে সরে গেল।

সঞ্জয় সোজাসুজি বললো. মহারাষ্ট্রে এই জিনিসটা দেখে আমাব খুব ভালো লাগলো।

কোন জিনিসটা?

এই যে আপনাকে ওরা ওদের ভালোবাসা জানালো। এখানে একজন কবাড়ি খেলোয়াড় বা একজন সাঁতারুরও অনেক সম্মান। অথচ কলকাতায়! ওখানে শুধু ফুটবল খেলোয়াড়বা ছাড়া আর কেউ তেমন কদব পায না।

ওদের কথাবার্তাব মধ্যেই মাইকে ঘোষণা হলো, অনুগ্রহ করে শুনবেন আজকের অনুষ্ঠান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। আরম্ভ হবে বাত ঠিক আটটায। আগামীকালেব অনুষ্ঠান বিজয তেণ্ডুলকারের নাটক 'ঘাসিরাম কোতোয়াল'।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা গুঞ্জন। নাটকটি যে যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং সাড়া জাগানো সেটা উপস্থিত মানুষগুলোর মুখের অভিব্যক্তিতেই প্রকাশ পেল। সঞ্জয় দময়ন্তীব প্রায় কানে কানে বললো, 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' দেখতে হবে।

আপনি যেন এই নাটকটা সম্পর্কে কিছু জানেন বলে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ। কলকাতায বসেই এটার খবর পেয়েছি। দেখার সুযোগ ছিল না। কালকে দেখতে হবে। তারপরেই একটা হাই তোলার ভঙ্গি করে সঞ্জয় বললো, এবারে বাড়ি চলুন—

সে কী! সিনেমা দেখবেন না?

সাধারণ একটা হিন্দি ছবি দেখে সময় নষ্ট করে কী লাভ?

দময়ন্তী সঞ্জয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীবে ধীরে বলে উঠলো, আসলে সিনেমা-টিনেমা আপনি বেশি দেখেন না।

সেটা ঠিক। সঞ্জয় একটু ভাবতে ভাবতে বললো, আমি আমার জীবনে গোটা ষোলো-সতেরোখানা ছবি দেখেছি। দুটো ছবি ছাড়া আর কারো কথা মনে নেই।

কী কী সেই দুটো?

পথের পাঁচালী আর নিশান্ত। দুটো ছবিই আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে। এ-সব সাধারণ ছবি তাই দেখতে ইচ্ছে করে না।

আপনি অসাধারণ তাই সাধারণ ছবি দেখেন না।

না। কথাটা ও-ভাবে বলা ঠিক নয়। আপনাকে ভেবে দেখতে হবে—কথা বলতে বলতে সঞ্জয় হঠাৎ থেমে পড়লো। করুণা কার্লেকারকে চোখে পড়তেই বুঝলো সে এদিকেই আসছে। সঞ্জয় নিচু সুরে এক নিঃশ্বাসে বললো, করুণাজি আসছে। চা খাবার নিমন্ত্রণ করলে আবার যেন কোনও হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকবেন না। সঞ্জয়ের কথার অর্থটুকু ধরতে না-পেরে দময়ন্তী ওর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

করুণা হুড়মুড়িয়ে এসে প্রায় ঝড় তুললো। একাই একটানা বলে চললো, আরে দময়ন্তী! তোকে এখন দেখতে পাবো ভাবতেই পারিনি। ভারী আনন্দ লাগছে। সঞ্জয়জিও রয়েছেন দেখছি। তা সিনেমার তো এখনও অনেক দেরি আছে। এতো ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা যায়? চল দময়ন্তী একটু চা খেয়ে আসি। সঞ্জয়জি আসুন—

দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ের চোখের দিকে চাইলো। সেই চোখে যা লেখা রয়েছে তা কী সে নীরবে পড়তে পারছে? খানিক আগেই সঞ্জয়ের সাবধান করে দেওয়ার সঙ্গে করুণার এই নিমন্ত্রণের মধ্যে কোথায় যেন একটা খেলা লুকিয়ে রয়েছে। সেটা কী অন্যায় খেলা? দময়ন্তী বোকা মেয়ে নয়। ভেতরের রহস্যটা বুঝতে তার কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না। করুণা সঞ্জয়কে পছন্দ করছে। ওর কাছাকাছি থাকতে চায়। সেই সুযোগ গল্পের মধ্যে দিয়ে চায়ের আসর ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? সেই কারণেই করুণা ওই নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু সঞ্জয় ওর সম্পর্কে এতোটা সতর্ক হলো কেমন করে? সে আগে থেকে কেমন করে বুঝতে পারলো করুণা চায়ের কথা তুলবে? তবে কী করুণা এর আগেও চা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে? দময়ন্তী যেন একটু ভয় পেল। নিজের কাছেই সে নিজে একেবারে খোলাখুলি প্রকাশিত হয়ে পড়লো। সে ছাড়া অন্য কোনও মেয়ে সঞ্জয়ের কাছে আসতে পারবে না। সঞ্জয়কে আপন ভাবতে পারবে না। যা ভাবার তা শুধু দময়ন্তী একা ভাববে। কোনও করুণাই তার সেই ভাবনার জগতে ছায়া ফেলতে পারবে না।

দময়ন্তী অদ্ভুত স্নিগ্ধ চোখে করুণার চোখের দিকে তাকালো। বসন্তের সেই সুর তোলা পাখির মতো কণ্ঠস্বর নিয়ে বললো, এখন আর চা নয়। আমরা এক্ষুনি বাড়ি ফিরছিলাম রে করুণা।

সিনেমা না-দেখেই?

সাধারণ একটা হিন্দি ছবি দেখে সময় নষ্ট করে কী লাভ বল—

তোর আজকাল সময়ের খুব অভাব বলে মনে হচ্ছে?

বুঝতেই পারছিস। দময়ন্তী খুব শান্ত ভাবে হাসলো।

লাভ-লোকসানের হিসেবটাও ভালোই করছিস।

করতেই হয়। দময়ন্তীর সারা মুখে কোমল হাসি। বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রেখে আদর করার ভঙ্গিতে বললো, কিছু মনে করিস না করুণা। তোর সঙ্গে থাকতে পারলে আমিও তো আনন্দ পেতাম। কিন্তু আজ কোনও উপায় নেই। বাড়ি ফিরতেই হবে। বরং কালকে আয়। সবাই মিলে একসঙ্গে নাটক দেখা যাবে। দময়ন্তী হঠাৎ মায়ের স্নেহ নিয়ে করুণার গাল টিপে দিয়ে বললো, আর রাগ করে না। চলি আমরা—

একলাহারীতে ফিরবার পথে দময়ন্তী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, আপনি কী করে জানলেন করুণা চা খাবার কথা বলবে?

প্রশ্নটা শুনে সামান্য হাসলো। দময়ন্তী মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ওর দুই চোখের তারায় কৌতুকের ঝিলিক। সঞ্জয় হাসতে হাসতেই বললো, দেখুন, এমনিতে তো চা খাবার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। যে-কোনও সময়ে যে-কেউ খেতে পারে। তবে করুণাজির এই চায়ের নিমন্ত্রণ করার মধ্যে যতো না চায়ের তৃষ্ণা তার চেয়ে অনেক বেশি একান্তে কিছুক্ষণ গল্পের মধ্যে ডুবে থাকা। সেই কারণেই ওই নিমন্ত্রণটা ঘন ঘন পাওয়া যায়। আপনি যেদিন জয়পুরে রওনা হলেন ওই দিনও করুণাজি চায়ের আসর বসাতে হোটেল রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনিতে ব্যাপারটা কিছুই নয়। এ-ভাবে একজনকে চিহ্নিত করা যায় না। তবুও কেন জানি আমার মনে হয়েছে করুণাজি আজকেও চায়ের কথা তুলবেন। এবারে আপনিই মিলিয়ে নিন।

এ-সব মিলিয়ে নিতে আমার তেমন আগ্রহ নেই। দময়ন্তী গম্ভীর সুরে বললো, আন্দোলনের ব্যাপারে আপনি যে পরপর ছক কেটেছেন কী কী করা উচিত এবং কী কী হতে পারে সেটা অবশ্যই মিলাতে বসবো।

সেটা কী আস্থা রাখতে না অবিশ্বাস করে?

সঞ্জয়ের কথা শুনে দময়ন্তী বুঝি-বা একটু উদাস হলো। নিজেকে শুনিয়েই যেন বললো, আমি হয়তো নিজেকেও অবিশ্বাস করতে পারি আপনাকে নয়।

গণপতি পূজা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সারা মহারাষ্ট্রে ক্ষেতকারী সংগঠনের কৃষিপণ্যের দাম বাড়াবার আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো। কৃষকদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সরকার যতো নীরব থাকেন দিনের-পর-দিন তাদের আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। ইদানীং সত্যিকারের সংগ্রাম আর কটা হয়েছে! সঞ্জয়ের মতে এই লড়াই হবে বেঁচে থাকার জন্যই, আর বেঁচে থাকতে কে না চায়?

ক্ষেতকারী সংগঠনের নেতৃত্বে আখ এবং পেঁয়াজ চাষীরা তাদের উৎপাদনের যে-দাম চাইছে সরকার সেটা মানতে নারাজ। তারা দাবি করেছে পেঁয়াজের দাম প্রতি কুইন্ট্যাল একশো টাকা আর আখের দাম কুইন্ট্যাল প্রতি তিনশো টাকা। মুদ্রাস্ফীতির ফলে গ্রামবাসীদের অবস্থা শোচনীয়। কৃষকদের অবস্থা আরও করুণ। সুতরাং এই দাম না-পেলে তারা লড়াইয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতেও রাজি। এতে যা হয় হবে।

সংগঠনের সভাপতি ধীরাজ শর্মা, সম্পাদক মিরাজকার এবং সঞ্জয় এই তিনজনে এখন খুবই ব্যস্ত। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বারবাব বসছে, কাকে কখন কোথায় কী কী নির্দেশ পাঠাতে হবে সেদিকেও খেয়াল রাখছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আন্দোলনের ধারা, আন্দোলনের চরিত্র কখন কেমন করে পাল্টাচ্ছে সরকার কিছু বুঝে উঠতেই পারছে না। সঞ্জয় পরিষ্কার ভাবে আন্দোলনকারীদের সামনে বলেছে, তারা যেন গেরিলা কায়দা গ্রহণ করেন এবং আগে থেকে কাউকে কিছু না-জানিয়েই আন্দোলন শুরু করে দেবেন।

আন্দোলনের এই দিনগুলিতে দময়ন্তী সঞ্জয়ের খুবই কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। ওকে দিয়েই সঞ্জয় যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কাজের নির্দেশ আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়। নীরবে সুন্দর ভাবে দময়ন্তী এই কাজগুলি করে চলেছে। সঞ্জয় শত কাজের মধ্যেও দময়ন্তীর এই নতুন ভূমিকা দেখে অবাক হয়। সঙ্গে সঙ্গে একঝলক আনন্দ এসে তার সারা মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয়। জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা হারিয়ে যায় দময়ন্তীর কাজের প্রলেপে। এ এক পরম পাওয়া। সঞ্জয় কী এমন একজনকেই তার পথে পেতে চেয়েছিল?

দময়ন্তী চুপচাপ কাজের ফাঁকে ফাঁকে টুক করে দু-একটা প্রশ্নও করে বসছে। সেদিন তো তাকে একটা মারাত্মক প্রশ্ন করেছে।

দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছিল সঞ্জয় বিকেল চারটের কাছাকাছি। সারা দিন কাজের চাপে খাওয়ার সময়ই পায়নি। সে-চিন্তাও তার ছিল না। দময়ন্তী তাড়া দিয়ে বলেছে, আর খাবেন কখন? পাঁচটার মধ্যে আবার মিরাজকারের বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। পরে সময় করে উঠতে পারবেন না। এই বেলা দুটো খেয়ে নিন।

খাবার সময়তেই দময়ন্তী হঠাৎ প্রশ্ন করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া কিভাবে আপনি কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তন আনতে পারেন অথবা আদৌ কোনও পরিবর্তন আনতে পারবেন কী?

খেতে খেতে সঞ্জয় একটু থেমেছে মাত্র। খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করার দরকার হলো না। দময়ন্তীর চোখে চোখ রেখে বললো, দারিদ্র্যনাশের জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার কোনও দরকার নেই। দারিদ্র্যনাশের নামে ক্ষমতা দখলই আসল লক্ষ্য। দারিদ্র সমস্যার মৌল প্রকৃতি সম্পর্কে ঠিক ঠিক অবহিত হতে পারলে আমাদের আর ক্ষমতা হাতে পাওয়ার প্রয়োজন হবে না। মানুষকে গরিবি হালে রাখার জন্যই ক্ষমতা হাতে নেওয়া হয়।

নাসিক জেলার কৃষকরা 'রেল রোকো' আন্দোলন নেমে পড়লো। গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেসকে বত্রিশ ঘণ্টারও ওপর নাসিক রোড স্টেশনে আটকে রাখলো। রেল লাইনের ওপর বসে কৃষকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো চিক্কুয়া, সুরজ আর বিরজু।

সরকার অবশ্য বলছেন রেল চলাচল স্বাভাবিক! আন্দোলন দমিয়ে দিতে এই ধরনের প্রচার রাখতেই হয়। আসল ঘটনা হলো কৃষকদের এই বিক্ষোভের দরুণ ওই সময়ের হাওড়া স্টেশন থেকে পূর্ব রেলের তিন আপ মুম্বে মেল এবং সাতষট্টি আপ মুম্বে-জনতা এক্সপ্রেস ট্রেন দুটোই বাতিল করা হয়েছে। মুম্বাই থেকেও চার ডাউন হাওড়া মেল ছাড়া হয়নি। যাই হোক এরপরে সরকার প্রচুর পরিমাণে পুলিশ আনাতেই আন্দোলনকারীরা গা ঢাকা দিল। পুলিশ পরে ওখান থেকে সরে গেলে আবার সেই আগের ছবি। কৃষকদের বসবার আসন রেল লাইনের ওপর।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল আন্দোলনকারীরা রাস্তা রোকো অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার হাজার গরুর গাড়ি জড়ো করে সড়কপথে শক্ত অবরোধ গড়ে তুলে সব যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সরকারি-সূত্রে অভিযোগ করে বলা হলো, আন্দোলনকারীরা বহু জায়গায় রেলে কেবল এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের খুঁটি উপড়ে ফেলে দিয়েছে। রেল এবং সড়ক পরিবহনে যে-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে ইতিমধ্যে ওধার কাছে একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়।

ও-দিকে সড়ক অবরোধ যতো বাড়তে থাকে পুলিশের উপস্থিতিও সেই পরিমাণে পাল্লা দিতে থাকে। পুলিশ সেদিন মুম্বাই-আগ্রা সড়ক থেকে অবরোধ হটিয়ে দেয়। পুলিশ পাহারায় **আটকে** থাকা তিনশো ট্রাক গন্তব্যস্থলে রওনা দিতে পেরেছে। তবে নানা জায়গায় অবরোধ হটিয়ে দিলেও নাসিক পুনে সড়কে কোনও যানবাহন চলতে পারেনি। পুলিশ এ-পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হয়েছে, চিক্কুয়া বিরজুও।

ধীরাজ শর্মা, মিরাজকারের সঙ্গে জরুরী একটা আলোচনায় বসলো সঞ্জয়। ছায়ার মতো সঙ্গী ছিল দময়ন্তী। সঞ্জয় খুবই খোলামেলা আলোচনা করলো। বললো, এরপরে একটা নতুন ডাক দিতে হবে। জেলার এম. পি. এম, এল. এ অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগে বাধ্য করাতে হবে। সেটা করতে হবে তাদেরকে ঘেরাও করে।

ঘেরাও, পদত্যাগের এই ঘোষণায় মহারাষ্ট্র সরকার বেশ উদ্বিগ্ন। যে-পরিস্থিতি সামনে এগিয়ে আসছে তার মোকাবিলা করতে সরকার তার নিরাপত্তার জন্য সেই মতো ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তেরোশো-র বেশি এস. আর. পি হাইওয়ে এবং রেলপথের তিন কিলোমিটার পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আন্দোলন নাসিক থেকে ধূলে জেলাতেও ছড়িয়ে পড়লো। ছড়িয়ে পড়লো আকোলায়, পুনে, নাগপুরে, মানমাদে, ঔরঙ্গবাদে। ধূলেতে বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, কোনওরকম হিংসাত্মক ও অন্যায় ঘটনার নীরব দর্শক হয়ে সরকার বসে থাকবে না।

এই ধরনের হুঁশিয়ারি শুনে সঞ্জয় খুবই অবাক হয়। কী করে মন্ত্রীরা এ-সব কথা বলেন? নিজেদের চরিত্র কী তারা ভুলে যান? নৃশসং ভাবে সাধারণ মানুষদের শোষণ করার পরেও তাদের পুলিশ বাহিনীর গুলি যে-ভাবে নিরীহ প্রাণগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়, বিনা বিচারে আটক রাখে, থানার মধ্যে হাজারো অন্যায় ঘটনা ঘটায়, এর পরেও সরকার ওই বড়ো বড়ো কথা কোন মুখে বলেন? তাদের এই সামান্য আন্দোলনের মধ্যেই সরকার হিংসাত্মক কাজের গন্ধ পেয়েছেন আর সরকারের হিংসাত্মক কাজে কতো হাজার হাজার মায়ের বুক যে খালি হয়েছে সে-গুলি কি পবিত্র কর্মের মধ্যে পড়ে? বোধহয় তাই। নয় তো হুঁশিয়ারি এই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসে?

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে আরও বলেছেন, আন্দোলনকারীরা যা করছে কোনও সরকারই তা বরদাস্ত করতে পারেন না। আমাদেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ফিশ প্লেট সরিয়ে রাখায় হাওড়া মুম্বাই-জনতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আজ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে যাচ্ছিলো।

খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। হাম্মিট এবং লাসাগাঁওয়ের মধ্যে এক স্থানে অন্তর্ঘাতীরা ওই দুষ্কর্মটি করে রেখেছিল। টহলদার পুলিশরা তা দেখতে পাওয়ায় ফ্ল্যাগ নেড়ে ট্রেনটি থামায়। আমরা কী ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে এ-সব দেখতেই থাকবে?

ক্ষেতকারী সংগঠনের আন্দোলনকারীরা ঘন ঘন তাদের আন্দোলনের কৌশল পাল্টে সরকারকে খুবই ব্যস্ত করে তুলেছে। এবারে ডাক দেওয়া হয়েছে 'কাজ রোকো' । জেলা কালেকটবেটের সামনে কাজ রোকো আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন ধীরাজশর্মা এবং মীরাজকার।

ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিসট্রেট এই মাসের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হাজতে আটকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ধীরাজ শর্মা এবং মিরাজকারকে নাসিক রোড সেনট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনার পর সরকার ভাবলেন আন্দোলন এবারে নেতৃত্বের অভাবে দমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো। আন্দোলন বরং একটা দুরারোগ্য ব্যধির মতো চারিদিকে বাসা বাধতে লাগলো।

প্রথমে বিভিন্ন জেলায় বনধ ডাকা হলো। কয়েকটি জেলায় আবাব ইচ্ছে করেই তা ডাকা হলো না। সেখানে অন্য কৌশল নেওয়া হলো। অবরোধ আর অবরোধ। সবচেয়ে বড়ো অবরোধ গড়ে তোলা হয়েছে পুনের সত্তর কিলোমিটার পূর্বে শিরপুরে পুনে-আহমেদনগর সড়কে। পুলিশ সেখানে চারশো-র মতো কৃষককে গ্রেফতার করেছে।

ও-দিকে এই মাসের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত ধীবাজ শর্মা ও মিরাজকারকে হাজতে আটকে রাখার কথা ছিল, নাসিকের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিসট্রেট সেটা আরও চারদিন বাড়িয়ে দেন। আজকে দুপুরেই তাঁদেরকে ম্যাজিসট্রেটের আদালতে হাজির করানো হয! পুলিশ অবশ্য তাঁদেবকে আরও পনেরো দিন আটক রাখার জন্য আদালতে আবেদন জানায়। ওদের যুক্তি হলো, জেলায় শুধু নয় সারা মহারাষ্ট্রে শান্তির জন্য ওই দুজনকে আটক রাখা দবকার।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? ধীরাজ শর্মা আর মিরাজকার তো হাজতে? তাহলে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে আন্দোলনটা চালাচ্ছে কে? আন্দোলনের গতিই-বা এতো তীব্র হচ্ছে কী করে? সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সরকারের এতো দুচিন্তা আর ব্যস্ততার মধ্যে এর আগে কাটাতে হয়নি। সরকারের স্পাইং মেশিন কাজে লেগে গেল।

নাসিক জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যেব মুখ্যমন্ত্রী মুম্বাই-এ শীর্ষস্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসলেন। চার-পাঁচজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন গোবিন্দনাথ উথাইয়াও। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দনাথকে নাসিক যেতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, ওটা আপনার জেলা। আপনার এলাকা। সুতরাং পরিস্থিতি বুঝে আপনি আপনার মতামত আমাদেরকে সব সময়ে জানাবেন। আশা করি আন্দোলনকারীদের আপনি বোঝাতে পারবেন।

গোবিন্দনাথ নাসিকে পৌছেই শাসক দলের জেলা কমিটির একটি বৈঠক ডাকলেন। কমিটির সদস্যরা উপস্থিত হলেন। মিটিং-এ ছুটে এলেন জেলার এম. এল-এ এবং দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রীও। গোবিন্দনাথ সেই সভায় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আলোচনাতেই গেলেন না। এখানে আসার আগে মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার বলেছেন, নাসিকের আন্দোলনে এ-পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। গোবিন্দনাথ সেই আলোচনাও করলেন না। তিনি শোনালেন, প্রাণের কথা। তার নিজস্ব কথা। গোবিন্দনাথ তার ধীর এবং শান্ত গলায় উপস্থিত সদস্যদের কাছে খোলামেলা বক্তব্য তুলে ধরলেন। বললেন, আমি দু'দিনের জন্য মন্ত্রী হয়েছি বটে আসলে আমি তো একজন সাধারণ চাষী ছাড়া আর কিছুই নই। আমার পরিচয়ের প্রথম এবং শেষ কথা ওটাই। চাষীদের অভাব, অভিযোগ, আর কতোশত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটায় সেটা আমি যেমন জানি আপনারাও জানেন। ওদের একবিন্দু সুখের জন্য আমরা কেউই তেমন কিছু করিনি। আজ যদি কৃষকরা একটু জেগে থাকে আমরা কী ওদের দাবির প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখাতে পারি না?

গোবিন্দনাথকে আর বেশি কথা বলতে হলো না। সামান্য ওই দু-চারটে কথাতে জেলা কমিটির সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করলেন। বৈঠকে ঠিক হলো কৃষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি তারা শুধু সমর্থন করেই চুপ করে থাকবেন না, আগামী দু-চারদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলবেন।

কিন্তু সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। গত কয়েকদিন ধরেই ক্ষেতকারী সংগঠনের এক বিশেষ ডাকে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে চলেছে। রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা একেবারে পঙ্গু। পুলিশ পাহারায় দু-একটা বাস চলাচল করছে নামমাত্র। ছাত্ররা ক্লাস বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সমর্থনে স্লোগান দিচ্ছে। আর সরকারকে ব্যস্ততার মধ্যে পাগল করে তোলার জন্য সারা নাসিক জুড়ে ছিল অবরোধের অশান্ত ঢেউ। রাজ্যেব বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন সাতশো থেকে আটশো কৃষক গ্রেফতার হচ্ছে। নাসিক সেন্ট্রাল জেলে আর জায়গা নেই। ধৃত কৃষকদের তাই নাসিকের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ক্ষেতকারী সংগঠন এখন চারধার দিয়ে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছে। বিভিন্ন হাইওয়েতে অবরোধ, কালেকটরের সামনে কাজ রোকো, হাজার হাজার কৃষকের মিছিলে রেলের চাকা স্তব্ধ। কুন্দোবাড়ি ও নিফাদ স্টেশনের মধ্যে হাওড়াগামী গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস ঠায় দাঁড়িয়ে।

অন্যদিকে আর এক চিত্র। স্কুল-কলেজের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সমর্থনে ঔরঙ্গবাদে মারাঠাওয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাও ক্লাস বযকট কবে। আকোলায় পাঞ্জাব বাও কৃষি বিদ্যাপীঠেব ছাত্ররা একদিনের জন্য আকোলো বনধ ডেকেছে। অমরাবতী, ওয়ার্দ্ধা এবং নাগপুরের পানজাব রাও কৃষি বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরাও আন্দোলনে নেমে পড়েছে।

বাজ্য জুড়ে দুর্বাব এই আন্দোলনের মধ্যে নাসিক থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে কোঙ্কন গাবন গ্রামের কাছে হাইওয়েতে কৃষকদের মিছিলেব ওপরে পুলিশ গুলি চালিয়ে তিনটি প্রাণকে ছুটি দিয়ে দিল।

এই ঘটনাই গোবিন্দনাথকে ব্যথিত করে তুললো। খুবই আঘাত পেলেন তিনি। শান্ত গোবিন্দনাথ অশান্ত হয়ে উঠলেন। কাকাসাহেব অর্থাৎ সঞ্জয় মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলতো। তিনি তেমন গুরুত্ব দিতেন না কথাটায়। এখন মনে হচ্ছে ছেলেটার অনেক চিন্তা-ভাবনা। অনেক পড়াশোনা। আর আজে-বাজে কথাও খুব একটা বলে না। কিন্তু ওকেও তো পুলিশ..........গোবিন্দনাথের চিন্তা থেমে যায়। সারা বুকটা কেঁপে ওঠে। কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করলেন। সঞ্জয়ের জন্য মনটা হাহাকার করে উঠতেই ওর একটা কথা মনে পড়লো। গোবিন্দনাথকে সঞ্জয় একবার বলেছিল "গরিব মানুষকে শোষণ করেই সরকার দেশ চালায়। সেই দেশের মন্ত্রী হওয়া একটা অলঙ্কারে ব্যাপার। আপনিও শেষ পর্যন্ত তাই হলেন।"

সঞ্জয়ের কথাটাই ঠিক। গোবিন্দনাথ ঠিক করলেন মন্ত্রিত্বের এই অলঙ্কার তিনি খুলে ফেলবেন। পদত্যাগ করা ছাড়া তাঁর কাছে দ্বিতীয় আর কোনও রাস্তা নেই। কোনওরকম চমক সৃষ্টির ব্যাপার নয়, তিনজন কৃষককে গুলি করে হত্যা করাটা গোবিন্দনাথ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এই সরকাবে এরপরে তিনি থাকেন কেমন করে? সঞ্জয়ের সঙ্গে কখন দেখা হবে কে জানে। ছেলেটাকে তিনি তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে একটু হালকা হতে চান।

গত কয়েকদিন ধরেই সঞ্জয় বাড়িতে থাকতো না। আজকেই এসেছে। বাইরে তখন বেশ রাত। দময়ন্তীকে কাজের ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দিয়েই ভোরবেলা বেরিয়ে পড়বে। যে-তিনজন কৃষক মারা গেছে পুলিশ প্রথমে তাদের মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনদের হাতে কিছুতেই দিতে চাইছিল না। কিন্তু জোরদার দাবির কাছে উত্তাল কৃষকদের ঠেকাতে পুলিশ শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। দময়ন্তীকে সঞ্জয় সে-কথাই বললো, আগামীকাল বিশাল এক মিছিল করে ওই তিনজনের মরদেহ পঞ্চবটি বনের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হবে। সেই মিছিল হবে মৌন কিন্তু সরকারের প্রতি থাকবে প্রচন্ড এক ধিক্কার।

সেই কারণে নিষ্প্রাণ দেহ তিনটি স্পর্শ করে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে—কথা বলতে বলতে সঞ্জয়ের চোখ মুখের কোমলতা হারিয়ে যায়। মনে হয় সে যেন অন্য এক জগতের মানুষ। দময়ন্তী শুধু পলকহীন চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবে, কী আশ্চর্য শক্তি লুকিয়ে আছে এই সঞ্জয়ের মধ্যে?

ভোরবেলা সঞ্জয় বেরিয়ে পড়তে পারলো না। তার আগে থেকেই পুলিশ এসে সারা বাড়ি ঘিরে রাখলো। সে কি একটা দুটো পুলিশ! মনে হয় কয়েকশো পুলিশের মেলা বসে গেছে। মাথার ওপরে রয়েছে পুলিশ সুপার কার্লেকার। সমস্ত ব্যাপারটা তিনিই পরিচালনা করছেন।

ঘরের দরজা খুলে দাওয়ায় নামলো দময়ন্তী ঘুম জড়ানো চোখে। কিন্তু বাড়ির উঠোনে এতো পুলিশ দেখেই তার ঘুমটুম একেবারে ছুটে গেল। দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মা, বাবা, রঙ্গনাথ ভাইয়া আর ভাবিজিকে ডেকে তুললো। সঞ্জয় তখন বিছানায়। বাইরে ফিসফাস শব্দে সবে তার ঘুম ভেঙেছে। কী যেন একটা হতে চলেছে—এটা মনে হতেই সঞ্জয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। ঘরের বাইরে এসে দাওয়াতে পা রাখতেই সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে পুলিশ সুপার কার্লেকার। বাড়ির চারপাশে পুলিশ আর পুলিশ। পালাবার সব পথ বন্ধ।

কার্লেকার এক দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি জানেন সঞ্জয়ের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। এও জানেন, এই মুহূর্তে সে তা ব্যবহার করবে না। করার উপায় নেই। কার্লেকাব মিটমিট করে হাসছেন।

গোবিন্দনাথ উঠোনে নেমে এলেন। কার্লেকার পুলিশী কায়দায় স্যালুট করতেই তিনি ম্লান হেসে বললেন, ও-সবের আর দরকার নেই। আমি মন্ত্রী নই, একজন সাধারণ মানুষ। তারপরেই গম্ভীর গলায় বললেন, একটা ছেলেকে গ্রেফতার করতে এতো পুলিশ! এই বীরত্ব নিয়ে আবার বড়াই করেন? গোবিন্দনাথ করুণ দৃষ্টিতে সঞ্জয়কে দেখতে লাগলেন।

কার্লেকার এবং তার পুলিশ বাহিনী সঞ্জয়ের কাছে এগিয়ে আসতেই ভেতর থেকে একটা দমকা কান্নায় ভেঙে পড়লো দময়ন্তী। সঞ্জয়কে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কেঁদেই চলেছে। প্রত্যয়কে কোলে নিয়ে সরযূ ছলছল চোখে একবার সঞ্জয়কে দেখছে একবার স্বামীর দিকে তাকাচ্ছে। রঙ্গনাথ খুব মনমরা হয়ে পড়েছে। এমনিতেই ব্যাপারটা খারাপ লাগছে, আরও খারাপ লাগছে এই ভেবে যে সঞ্জয় শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলো তাদেরই বাড়ি থেকে। গোবিন্দনাথ আর যশোমতী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ছেলেটার জন্য ভেতরে ভেতরে তাঁরা এতো কাঁদছেন বাইরে থেকে সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। দুজনেই বড়বেশি গম্ভীর হয়ে পরিস্থিতি সামলে দেবার চেষ্টা করছেন। কথা বললেই যে-কোনও মুর্হূতে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তাই গম্ভীব থাকাই ভালো। গোবিন্দনাথ এবং যশোমতীকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন দুটো পাথরের মূর্তি।

দময়ন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শ্রাবণের আকাশ-ভাঙা বর্ষা তার দুই চোখে। আসলে সঞ্জয়ের প্রতি এক নিরুচ্চার ভালোবাসা যেটা এতোদিন অর্ন্তমুখী ছিল সেটা এখন কিছুতেই আর ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

সঞ্জয় ভেতরে ভেতরে একটু দুর্বল হয়ে যে পড়ছে না তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে দুর্বলতা দেখালে কেমন করে চলবে? এমন পরিস্থিতিতে শক্ত হতেই হবে। সঞ্জয় গভীর মমতায় দময়ন্তীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ভরাট গলায় আস্তে আস্তে বললো, জল থেকে চার-পাঁচটা সোনা তোলা মেয়ে তুমি, তুমিই জলে ভাসছ! এটা ঠিক নয় দময়ন্তী। আমার জন্য কান্নাটা ঠিক নয়। যে-তিনজন মারা গেছে তাদের কথা ভাবো। আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, শুরু হয়েছে। একটু চুপ করলো সঞ্জয়। দময়ন্তী আঁচলে চোখের জল মুছে কাঁপা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে সঞ্জয় স্বাভাবিক সুরেই আবার বললো, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জানি ওরা আমার ওপর অনেক অত্যাচার করবে। কিন্তু তাতে কী? আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে? একজন মানুষকে মেরে ফেলা সহজ, তার আদর্শ,

নীতি সেটা থেকেই যায়। দময়ন্তী, আমি থাকবো না, তাতে কী আসে যায়, তুমি তো রয়েছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি!

সঞ্জয়কে গ্রেফতার করেও কার্লেকার তার বাহিনী নিয়ে ভ্যান গাড়ির কাছাকাছি যেতে পারলেন না। ওই সকালেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে কাকাসাহেবকে ধবতে পুলিশ গ্রামে এসেছে। ব্যস! ওই একটা কথা কানে গেছে শুধু, যে যেমন কাজ করছিল সব ফেলে দিয়ে গোবিন্দনাথের বাড়িতে এসে ভিড় করলো! শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এসেছে তারাও। আসলে সারা একলাহারী গ্রামটাই জেগে গেছে।

কার্লেকার চারদিকে একবার চোখ বোলালেন। তিন-চার হাজার মানুষের জটলা তাদেরকে ঘিরে আছে। শিশুরা এবং মেয়েরা একেবারে সামনের দিকে রয়েছে। চট করে কী যে করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। আসলে তিনি ভাবতেই পারেননি গ্রামের মানুষরা বাধা দিতে এমন ভাবে এগিয়ে আসবে। যাই হোক এ-ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের হিম্মত বাড়াতে কার্লেকার রাজি নন। তিনি তার দাপট দেখালেন, আপনারা সরে দাঁড়ান। আমাদের যেতে দিন।

হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো, নেহি—

ভিড়ের মধ্যে থেকে কার্লেকারের সামনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন নয়নচাঁদ। উনআশি বছরের বৃদ্ধ। সূরজেব দাদু। পূরণ চাঁদের বাবা। একলাহারী গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক লোক। কার্লেকারেব পদমর্যাদার ধার ধারলেন না তিনি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, কাকাসাহেবকে ছেড়ে দিতে হবে। বৃদ্ধের কঠিন মনোভাব দেখে সঞ্জয় উজ্জ্বল চোখে তাঁর দিকে চাইলো। সূরজের বাড়ি গিয়ে কতোদিন ওঁর সঙ্গে গল্প করেছে। নয়নচাঁদের ভেতরে এতো তেজ আগে ভাবা যায়নি।

আপনাদেব কাকাসাহেব অর্থাৎ সঞ্জয় চৌধুরী একজন খুনী। পুলিশ সুপার কার্লেকার অভিযোগ কবে বললেন, একজন খুনী কলকাতা থেকে পালিয়ে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে, এখানকার মানুষকে খেপিয়ে তুলবে, শান্ত মহারাষ্ট্রকে অশান্ত করে তুলবে আর আমরা সেটা চুপচাপ বসে দেখবো? আপনারাই কি মহারাষ্ট্রের ক্ষতি চান? শেষের কথাগুলো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বললেন। কিন্তু তিনি ঠিক যা চেয়েছিলেন, অবস্থার সেই পরিবর্তন বিন্দুমাত্র হলো না।

বাংলা আর মহারাষ্ট্র বলে আলাদা কিছু নেই। কৃষকদের সমস্যা এক। সেখানে সামান্য ক্ষতি-টতি না, প্রয়োজন হলে ধ্বংসেও আপত্তি নেই। উনআশি বছরের বৃদ্ধ নয়নচাঁদ একটা রাগী যুবকের মতো ফুঁসছেন। কার্লেকার বোঝাতে থাকেন, একজন খুনীকে আমরা কী করে ছেড়ে দিই বলুন—

ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন নয়নচাঁদ। কার্লেকারকে তিনি হিসেবের মধ্যে আনলেন না। কেটে কেটে বললেন, আরে ভাই পুলিশ কী কিস্‌সা মৎ শুনাও। ওদের এই একটা ভীষণ বাজে ব্যাপার, কাউকে যদি একবার ধরতে পারে তক্ষুনি তার নামে চারটে বলাৎকার, তিনটে ডাকাতি আর আটটা-দশটা খুনের মামলা সাজিয়ে দেওয়া হয়। ঈয়ে সব বাহানা ছোড়ো। নয়নচাঁদ যেন ফেটে পড়লেন। আভি লোগ কোঈ বুদ্ধু নেহি হ্যায়?

নয়নচাঁদ নামে উনআশি বছরের বুড়োটার কথা-বার্তা শুনে অপমানিত হলেও কার্লেকার যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিলেন! সঞ্জয়কে ধরা গেছে সুতরাং খুচরো ঝামেলার দিকে এই মুহূর্তে মন না-দিলেও চলবে। সারা গ্রামের মানুষ এক হয়ে আছে এই দিকটাও ভাবতে হচ্ছে। কার্লেকার চিৎকার করে বললেন, আমি এই শেষবারের মতো বলছি আমাদের যেতে দিন। নয়তো এর ফল খুবই খারাপ হবে।

একলাহারী গ্রামের মানুষদের কণ্ঠ গর্জে উঠলো। হোক খারাপ। কাকাসাহেবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে দেবো না।

কার্লেকার এবং নয়নচাঁদের সামনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দময়ন্তী। এই দময়ন্তী আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা। চোখের কোথাও একবিন্দু জল নেই। আছে শুধু আগুন। টানা চোখ দুটি ধিকধিক

করে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। সারা মুখে একটা কঠিন জেদ ছায়ার মতো লেগে রয়েছে। যেন আর কখনও সহজে ভেঙে পড়বে না। সেই মন নিয়েই নয়নচাঁদকে বললো, দাদাজি রাস্তা ছেড়ে দাও। সঞ্জয়কে নিয়ে ওরা চলে যাক।

বেটি, এটা কী তুমি বলছো?

আমিই বলছি দাদাজি। দময়ন্তী গভীর একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললো, দেখছো না, আমরা সকলেই তো এক একজন সঞ্জয়। কজনকে সুপার সাহেব আটকে রাখবেন?

সঞ্জয়কে ভ্যানে তুলে নিয়ে কার্লেকার নাসিক রোডের পথ ধরলেন। আগে পরে পুলিশের আরও গোটা চার-পাঁচ গাড়ি। সামান্য কিছুটা এগিয়ে একটা বাঁক নেওয়ার সঞ্জয় গাড়ির ছোট্ট জানলায় চোখ রাখলো। পেছনে পড়ে আছে একলাহারী গ্রাম। দময়ন্তী জনতাকে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

অশ্বক্ষুরের শব্দ



জি টি এক্সপ্রেসটা অশোককে যখন বল্লারশা স্টেশনে নামিয়ে দিল তখন প্রায় মাঝরাত। অথচ পৌঁছানোর সময় ছিল বিকেল পাঁচটা। ট্রেনটা নয়াদিল্লি থেকেই ছেড়েছে অনেক দেরিতে। সেইজন্য ড্রাইভারের কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। সে তাব গাড়িটাকে বরং আরও ধীরে-সুস্থে চালিয়ে প্রমাণ দিল, যে দেরিতে দৌড়াচ্ছে তাকে নিয়ে অতো ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং বিকেল পাঁচটার জায়গায় রাত পৌনে-একটায় বল্লারশা স্টেশনে পৌঁছতে তার কোনওরকম সঙ্কোচ থাকার কথা নয়। কষ্ট যাদের সেই যাত্রীরা ঠেলা সামলাক। এই রাত দুপুরে কে কোথায় উঠবে সেটা তাদের ব্যাপার ড্রাইভার মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করেই গার্ডের নির্দেশ পেয়ে বল্লারশাকে বিদায় জানাতে বড়বেশি সচেতন হয়ে উঠলো। অশোক একবার শুধু ভাবলো, এই ব্যস্ততাটুকু প্রথম থেকে হলে কী এমন ক্ষতি হতো?

মাঝরাত বলে কেউ কিন্তু প্ল্যাটফরমে বসে রইলো না। যে কুড়ি-বাইশজন মানুষ ট্রেন থেকে নেমেছে তারা প্রত্যেকেই ট্যাক্সি, অটো, স্কুটার, টাঙ্গা, ইত্যাদি ধবে প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই স্টেশনকে নিঃশব্দেব নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেবা উধাও হয়ে গেল। অশোক কিন্তু স্টেশনের বাইবে যাবার চেষ্টা করলো না। ভোর হোক, তারপর দেখা যাবে। সে প্ল্যাটফরমেব চারদিকে একবার চোখ বোলালো। বেঞ্চিতে এবং মেঝেতেও ভিখিরি শ্রেণীব কিছু মানুষ শুয়ে রয়েছে। এমন নিশ্চিন্তে অশোক যদি ঘুমাতে পারতো! সে সতৃষ্ণ নয়নে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে দেখতে লাগলো। দুটো কুকুর অতো রাতেও ব্যস্ত ছিল খাবারের সন্ধানে। জিভ চাটতে চাটতে দুজনে এসে দিব্যি মানুষগুলোর মধ্যে গিয়ে নিজেদের জন্য শোবার জায়গা করে নিল। বইয়ের স্টলটা খোলা রয়েছে। ও-পাশে একজন মধ্যবয়সী মহিলা আঁচল বিছিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্সের দুজন পুলিশ ঠিক ওইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে গল্প করছে। ওদের চোখে-মুখে এক চাপা খুশির ঝিলিক।

অশোক এবারে একটা সিগারেট ধরালো। পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে ওর হোল্ডঅল এবং স্যুটকেসটা। দু-একটা বেঞ্চ খালি থাকা সত্ত্বেও অশোক প্ল্যাটফরমের মেঝেতেই হোল্ডঅল বিছিয়ে স্যুটকেসটা মাথায় দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। ইচ্ছে করলেই সে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারতো, কিন্তু মন চলে যাচ্ছে পেছনে। ওর যখন বছর বারো বয়স তখন তো এই বল্লারশা স্টেশনের প্ল্যাটফরমেই শুয়ে একদিন সমস্ত রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের কথা কি অশোক এতো সহজে ভুলতে পারে? কোনও কথাই সে বিন্দুমাত্র ভোলেনি। পাথরে দাগ কাটার মতো সব কিছু তার মনের স্লেটে খোদাই হয়ে রয়েছে। এই শহরেই সে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানকার আকাশ বাতাস তার খুবই পরিচিত। বারো বছর বয়স পর্যন্ত অশোক তো এই বল্লারপুরেই কাটিয়েছে। কিন্তু তারপর? তার পরের কাহিনী এখান থেকে পালিয়ে নিজেকে গড়ে তোলা। সে আর এক ইতিহাস। আপনারা অবশ্য আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবেন। তার আগে আসুন অশোকের সঙ্গে আপনাদের সামান্য একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। ও যখন প্ল্যাটফরমের মেঝেতে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে এই সুযোগে ওর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে।

কোনওরকম ভণিতা না-করে প্রথমেই আপনাদের পরিষ্কার ভাবে একটা কথা জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা হলো, ওর নাম কিন্তু অশোক লাহিড়ি নয়—আসল নাম সন্দীপ পার্থসারথি। বারো বছরের সন্দীপ সেদিন সমস্ত রাত বল্লারশা স্টেশনে কাটিয়ে ভোরবেলা নয়াদিল্লিগামী একটা ট্রেনে উঠে পড়েছিল সেদিন ওর জীবনটাই পাল্টে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে নিজের আসল নামটাও। তার মানে দাঁড়ালো বারো বছর বয়স পর্যন্ত যে-বালকটির নাম ছিল সন্দীপ পার্থসারথি, তারই নাম এখন অশোক লাহিড়ি। নয়াদিল্লির মডার্ন হাই স্কুল, মৌলানা আজাদ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের

শেষ পরীক্ষার সার্টিফিকেটে অশোক লাহিড়িব নামটাই জ্বল-জ্বল করছে। দুটো নাম, কিন্তু মানুষটা তো একজনই। অশোককে যদি জিজ্ঞাসা কবা হয়, কোন নামটাকে তোমার বেশি পছন্দ? সে নিশ্চয়ই তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে ভরাট গলায় শুধু একটা কথাই বলবে, সন্দীপ পার্থসাবথি ইজ ডেড।

প্ল্যাটফবমে অশোক ঘুমুচ্ছে। এইমাত্র ও একবার পাশ ফিরে শুলো। না, ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণ নেই। তবে গ্যারান্টি দিয়ে কিছু বলাও যায় না। আর একটু বাদেই হয়তো হোল্ডঅলের ওপর উঠে বসে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং পরিচয় পর্বটা সেরে নেওয়া যাক।

অশোকের বয়স এখন উনত্রিশ বছর ছয় মাস। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির মতো হাইট হবে। বাড়তি মেদ ওর শরীরকে বিন্দুমাত্র ভারী করে রাখেনি। টানা নাক এবং টানটান সতেজ দেহকে ঘিরে রয়েছে এক আশ্চর্য রকমের ব্যক্তিত্ব। ওর চমৎকার গায়ের রং যতো না টানে তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ করে সমান করে ছাঁটা একমুখ দাড়ি। একজন মানুষকে দাড়ি এতো সৌন্দর্য দিতে পারে অশোককে না-দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। ওর মুখের দিকে তাকালে গ্রীক ভাস্কর্যের কথাই মনে পড়ে। আপনারা অবশ্য এখনও ওর গলার স্বর শুনবার সুযোগ পাননি। যখন পাবেন এটুকু শুধু বলতে পারি আপনারা নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন। কেন-না গলাব গভীরতা এবং সেই সঙ্গে স্বর নিক্ষেপের মিষ্টতা একই সঙ্গে জাদু হয়ে খুব বেশি লোকের কণ্ঠে এক বিশেষ ঐশ্বর্য হয়ে থাকে না।

আপনারা কি ওর বাবা-মা'র কথা জানতে চাইছেন? অথবা অশোক যখন সন্দীপ পার্থসারথি ছিল তখনকার কথা? সন্দীপ থেকে অশোক লাহিড়িই-বা হলো কেমন কবে? প্লিজ আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। একে একে সব কথাই আপনাদের জানাবো কিন্তু কোনটা আগে এবং কোনটা পরে সেটা সাজাবার স্বাধীনতাটুকু অন্তত আমাকে দিন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, কোথাও এতোটুকু ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবো না।

নয়াদিল্লির ফ্রানসিস ইন্ডিয়ার যদি কোনও অফিসার বা কর্মী এইমুহূর্তে অশোককে প্ল্যাটফরমের মেঝেতে ভিখিরি শ্রেণীর কিছু লোকের সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে, তাহলে তারা যেমন অবাক হবে, তার চেয়েও অনেক বেশি অবাক হবে বল্লারপুর পেপার মিলের ম্যানেজমেন্টের লোকেরা। কৃতি এই ছেলেটির এমন আচরণের কোনও হদিশই তারা খুঁজে পাবে না। সম্ভাব্য কোনও যুক্তিকে দাঁড় করিয়েও বিন্দুমাত্র যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, তখন ওই দিকে সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আসুন, অশোকের সম্পর্কে আপনাদের আরও একটু অবহিত করি।

ওর বারো বছর বয়স থেকে আজকের এই উনত্রিশ বছর ছয় মাস অর্থাৎ সতেরো বছর ছয় মাস সে একটানা নয়া দিল্লিতেই কাটিয়েছে। ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর ওই ফ্রানসিস ইন্ডিয়াতে ঢুকেছিল। সেও প্রায় চার বছর হতে চলেছে। ওই কোম্পানিতে ওর মাসিক বেতন ছিল পুরো বত্রিশশো টাকা। এখন আপনাদের সর্বাগ্রে যেটা জানাবার কথা তা হলো, অশোক ফ্রানসিস ইণ্ডিয়ার ওই আকর্ষণীয় চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। সতেরো বছর ছয় মাস পরে ফিরে এসেছে সে তার নিজের শহর বল্লারপুরে। এখানেই সে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল এবং এখানকার বাতাসই বুক ভরে গ্রহণ করেছিল বেঁচে থাকার জন্য। এই শহরের সবচেয়ে নামী এবং দামি কোম্পানি বল্লারপুর পেপার মিলের অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটির চাকরি নিয়ে অশোক এখন এই মুহূর্তে রেলওয়ে স্টেশনের মেঝেতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এই কোম্পানিতে অশোকের বেতন হবে সাতাশশো টাকার মতো। কী বললেন? কথাটা আপনারা বিশ্বাস করছেন না? ভাবছেন, যে-ছেলেটি ফ্রানসিস ইন্ডিয়াতে বত্রিশশো টাকা বেতন পেতো, সে কেন প্রতি মাসে পাঁচশো টাকার ক্ষতি স্বীকার করে সাতাশশোতে ঢুকবে? আপনাদের যুক্তিটা মানছি। লোকে চাকরি ছেড়ে অন্যত্র যায় বেশি বেতনের জন্য। কিন্তু পাঁচশো টাকা কম পাবার জন্য চাকরি ছাড়ার ঘটনা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। সুযোগ সুবিধে বেশি পাবার জন্য মাইনের দু-এক টাকার ফারাক থাকতে পারে সেজন্য পাঁচশো টাকার ব্যবধানটা একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। অথবা আপনারা এটাও ভাবতে পারেন ছেলেটা পাগল নয়তো? সেই গ্যারান্টি আমি আপনাদের দিচ্ছি, অশোক পরিপূর্ণ সুস্থ। তাহলে ব্যাপারটা

কী দাঁড়াচ্ছে? ছেলেটার কি কোনও উচ্চাশা নেই? এমন খামখেয়ালি ভাবে চললে সে হয়তো এই চাকরিটা ছেড়ে হাজার টাকা বেতনেও অন্য কোনও সংস্থায় যেতে পারে। ঘটনা কিন্তু তা নয়। অশোকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই বল্লারপুব পেপার মিলে ঢোকা। পোস্ট এবং মাইনে এ-সব ব্যাপার নিয়ে তার কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। সুতরাং পাঁচশো টাকা কেন হাজার টাকা কম হলেও অশোক এখানে আসতো। বল্লারপুরে ফিরে আসার জন্যই সে এই সতেরো বছর ছয় মাস অপেক্ষা করেছে। সুযোগ অবশ্য অনেক দিন ধরেই খুঁজছিল, এইবারে সে সফল হলো।

শুধুমাত্র বল্লারপুর পেপার মিলে ঢোকাটাই অশোকের একমাত্র উদ্দেশ্য কেন ? প্লিজ এই প্রশ্নটা এই মুহূর্তে আপনারা আমাকে করবেন না। আমি তো আপনাদের আগেই জানিয়েছি, অনুগ্রহ করে 'কিন্তু' 'কেন' এসব প্রশ্ন রাখবেন না। সব কিছু নিঁখুত ভাবে তুলে ধরার জন্য আমি আপনাদের কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং কোথাও এতোটুকু ফাঁক-ফোকর থাকবে না। আপনারা শুধু একটু ধৈর্য ধরুন। ব্যাপাবটা তো আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবেন।

হোল্ডঅলের ওপর উঠে অশোক প্রথমেই একটা সিগাবেট ধরালো। ইতিমধ্যে সকাল হয়ে গেছে। যারা তার আশেপাশে শুয়েছিল তাবা এখন উধাও! সামনের প্ল্যাটফরমেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রেনটাকে দেখে অশোকের কি কোনও কথা মনে পড়ছে? মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। তবে এই মুহূর্তের চিন্তা, বল্লারপুর পেপার মিলে যাওয়া। অশোক হোল্ডঅলটা বেঁধে কাঁধে ফেলে ডান হাতে স্যুটকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই একটা চায়ের ভাঁড় এসে তার গায়ে পডলো। ট্রেনের জানলার পাশে বসে যে-ছেলেটি এতোক্ষণ চা খাচ্ছিলো, কাজটা তারই। একজন তরুণ অপর এক তরুণের গায়ে চায়ের ভাঁড় ফেলেছে। হোক না অনিচ্ছাকৃত, ব্যাপারটা যে অনেক দূর গড়াবে, উপস্থিত অনেকেই হাতাহাতির একটা ছবি পর্যন্ত এঁকে ফেললো। তাদেব কিন্তু নিরাশ হতে হলো। অশোক ট্রেনের জানলায় বসা ছেলেটির দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধুমাত্র ইশারায় যে-কথাটি বলতে চাইলো তার অর্থ, একটু দেখে ফেলুন। তারপরেই সে স্টেশনের বাইরে যাবাব জন্য পা বাড়ালো।

অটো স্কুটারে যেতে যেতে অশোক পথের দু'পাশে চোখ রাখলো। সতেরো বছর ছয় মাস আগে যেমনটা দেখেছিল দোকান-পসারগুলো মোটামুটি তেমনই রয়েছে। খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। হ্যাঁ এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, বল্লারপুব শহর ছাড়ার সময় অশোকের বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। অর্থাৎ নিতান্তই এক সাদাসিধে বাচ্চা ছেলে। ওইটুকু ছেলের পক্ষে কতো আর মনে রাখা সম্ভব? তাছাড়া সময়ের মরচে পড়ে স্মৃতিশক্তিটা নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। এ-ব্যাপারে আপনাদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, এমনিতেই আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের থেকে অশোকের মেধা এবং স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, তার ওপরে ওই শিশু বয়সে যে-বিপর্যয় নেমে এসেছিল ওর জীবনে তা কেমন করে ভুলে থাকা সম্ভব? পরিস্থিতিই ওকে একেবারে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ঘটনাও মনের কোণে সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। সুতবাং দশ-বারো বছর বয়সের একটা ঘটনাও অশোকের স্মৃতির বাইরে চলে যায়নি। সব কিছু এতো স্পষ্ট মনে আছে, বারবারই সন্দেহ হয়, সতেরো বছর ছয় মাস আগের ব্যাপার নয়—এই তো সেদিনের কথা।

বল্লারপুরের রাস্তাঘাট সমতল নয়। চড়াই-উতরাই পথে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সাইকেল আরোহীদের। নতুন সাইকেল চালানো শেখার পর বন্ধুদের সঙ্গে অশোক এই পথে অনেকবারই এসেছিল। এমনিতেই বল্লারপুর শহরটা খুব বড়ো নয়। সুতরাং সাইকেল নিয়ে সব রাস্তাতেই তারা মোটামুটি ঘুরেছে। পথের যেখানে যেখানে বেশি চড়াই অশোক টুক করে নেমে সাইকেলকে ঠেলতে ঠেলতে ওপরের দিকে উঠেছে। আসলে অটো স্কুটারে যেতে যেতে ছোটবেলার সাইকেল চালানোর কথা অশোকের মনে পড়লো পথের ধারের বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে। সামনেই অনেকটা চড়াই পথ। ছেলেটা কিছুটা এগোবার পরই সাইকেল থেকে নেমে ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য বড়বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাঁ দিকের ছোট একটা টিলার ওপর অসংখ্য ঝোপড়ি। ওটার পাশ দিয়ে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে টার্ন নিতেই একটা বাজার চোখে পড়লো। যদিও বেশ কয়েকটা বিল্ডিং রয়েছে তবে বেশির ভাগই দোকান হলো কাঠের দেওয়াল এবং মাথায় খোলার চালার ছাউনি। ডাক্তারখানা,

চায়ের দোকান, জামা কাপড়ের দোকান, সেলুন, লন্ডী কী নেই সেখানে? আর এক পাশে রয়েছে চাল, ডাল, মশলা এবং মাছ, মাংস, সবজির দোকান। বল্লারপুরের বাজার বলতে এটাকেই বোঝায়। এখান থেকে দু'পা এগিয়ে বাঁ দিকের বিশাল ফটকটা পার হলেই বল্লারপুর পেপার মিলের এলাকা শুরু বলা যেতে পারে।

এখন সকাল সাড়ে-সাতটার মতো হবে। অটো স্কুটারটা অশোককে গেস্ট হাউসের সামনে নামিয়ে দিয়ে একটু আগেই চলে গেছে। একটু আগে বলতে মিনিট ছ-সাত হবে। ওই সময় থেকে অশোক গেস্ট হাউসের গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে। সে কিন্তু গেস্ট হাউসের মনোরম লন এবং চমৎকার ছবির মতো দোতলা বাড়িটা দেখতে মোটেই আগ্রহী নয়। অশোক এক উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সামনের রাস্তাটার দিকে। গেস্ট হাউসের মুখোমুখি এই রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গিয়ে ফিফটিনথ অ্যাভিনিউর সঙ্গে মিশেছে। সেখানে রয়েছে পাশাপাশি দুটো কৃষ্ণচূড়া। এতোদিনে গাছ দুটো নিশ্চয়ই অনেক বড়ো হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার ওই চারা দুটো পুঁতেছিল অশোক। তাদের কোয়ার্টারের সামনে ওই গাছ লাগাতে সেদিন কী আনন্দই না পেয়েছিল। জল-কাদা মাখানো ছোট্ট হাত দুটো নিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে যেতে তার আগেই মা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। অশোকের কাছে সবচেয়ে শান্তির জায়গা ছিল সেটা। মা গভীর হেসে বলেছিলেন, সন্দীপ বেটে, দেখি কার আগে কে তাড়াতাড়ি বড়ো হতে পারে? এই গাছ না তুই?

গাছরা তো লম্বায় বড়ো হবেই। ছোট্ট সন্দীপ হেসে উত্তর দিয়েছিল, আমি হবো লেখাপড়ায় বড়ো। তুমি দেখো মা.........

না, মা তার কিছুই দেখে যেতে পারেননি। ফিফটিনথ অ্যাভিনিউর বল্লারপুর পেপার মিলের ওই কোয়ার্টারেই মা মারা যান। অশোক যতোদিন বেঁচে থাকবে একটা দিন, একটা মুহূর্তের জন্যও সে তার মাকে ভুলে থাকতে পারবে না। সময়ের পলিমাটি জমে যতোই সেই ঘটনাকে অতীতের গভীর এক গহ্বরে শুইয়ে রাখুক না কেন অশোকের কাছে তার মায়ের প্রতিটা ছবি, প্রতিটা মুহূর্তের ছবি গভীর ভাবে আঁকা রয়েছে। মায়ের মৃত্যুর কথা চিন্তা করলে তার ভীষণ কষ্ট হয়। ব্যথায় বেদনায় অশোক নীল হয়ে যায়, কিন্তু এই দুঃখটাই আবার তাকে মেরুদন্ড সোজা রেখে দাঁড়াতে শেখায়। কী এক প্রতিজ্ঞায় ওকে অবিচল অটল রাখে।

বারো বছর বয়সে অশোক যে-রাস্তা দিয়ে হাঁটতো উনত্রিশ বছর ছয় মাস বয়সে সেই রাস্তা দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে পেপার মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালো। এই কোম্পানিতে চাকরির জন্য নয়াদিল্লিতে তারা মোট দশজন ইন্টারভিউ দিয়েছিল। ও. এস. ডি অর্থাৎ অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে অশোককে বাছাই করে কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের দুটো মিল রয়েছে। একটা মহারাষ্ট্রের বল্লারপুরে এবং অপরটা হরিয়ানার জগাধারীতে। আপনি কোনটাতে জয়েন করতে চান? অশোক খুব আস্তে প্রায় নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিয়েছিল, বল্লারপুরে?

সেই বল্লারপুর পেপার মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর একটা সুসজ্জিত ঘরে কোম্পানির সেক্রেটারির সামনে অশোক এখন চুপচাপ বসে। প্রাথমিক কথাবার্তা যা হবার মোটামুটি হয়ে গেছে। মহেশরাম বেশ কয়েকটা জরুরি চিঠিতে দ্রুত সই করে চলেছেন। ওর মধ্যেই ফোনে দু-চারজনের সঙ্গে কথাও সেরে নিলেন। তারপরে অশোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্লিজ আপনি চেয়ারম্যানের পি. এ-র ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। চেয়ারম্যান আজ যদিও ব্যস্ত রয়েছেন তবুও আপনাকে একবার ডাকতে পারেন।

চেয়ারম্যানের ঘরের ঠিক মুখোমুখি মাঝারি সাইজের কাচের ঘরখানাই তাঁর পি. এ অর্থাৎ শাওনা সিং-এর। পঁচিশ বছরের এই পাঞ্জাবী মেয়েটি সৌন্দর্যের যাবতীয় উপাদানগুলো একাই চুরি করে নিজের শরীরে বসন্তের ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না এমন রূপ। অশোক কিন্তু ওর ঘরের সামনে গিয়ে মুখের দিকে তাকালো-কি-তাকালো না, ছোট্ট গলায় শুধু বললো, আমার নাম অশোক লাহিড়ি।

ও আপনিই......শাওনা বিমান বালিকাদের মতো মিষ্টি হেসে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো, বসুন।

অশোক বসার পর আধ মিনিট সময় কাটতে-না-কাটতেই শাওনা আবার বললো, চেয়ারম্যান আজ খুব বিজি। যা ঠাসা প্রোগ্রাম, সময় করে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। অথচ আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

আমি অপেক্ষা করবো। কাটছাঁট করা অশোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, শাওনা সিং অশোকের মুখের দিকে তাকাতেই দেখলো ছেলেটা মেঝের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছে। সে তাই জিজ্ঞেস করলো, মিঃ লাহিড়ি শুনছেন?

হ্যাঁ বলুন। অশোক যেন ঘুমোচ্ছিল। লজ্জা পেয়ে শাওনাব চোখের দিকে তাকাতেই সে একটু হেসে বললো, যেটা বলছিলাম আপনাকে, ম্যানেজমেন্ট স্টাফ হয়ে যিনি প্রথম আসেন চেয়ারম্যান দু'মিনিটের জন্য হলেও তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করেন। এটা আমাদের চেয়ারম্যান মিঃ জি. এম. পার্থসারথিব একটা বিশেষ সৌজন্য বোধ বলতে পারেন।

জি. এম. পার্থসারথি! নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অশোক একটা ধাক্কা খেলো নাকি? না, কোনওবকম উত্তেজিত সে হলো না। বরং নির্বিকার হয়ে চুপচাপ বসে রইলো। অথচ এই মানুষটারই মুখোমুখি হওয়ার জন্য অশোক এতোদিন ধরে একটা জেদের স্বপ্ন দেখে এসেছে।

অশোকের আসল নাম যে সন্দীপ পার্থসারথি সে-কথা তো আপনাদের আগেই জানিয়ে রেখেছি। এবারে যেটা জানাবো সেটা শুনলে আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। তার পরের কাহিনী শুনলে আবও বেশি অবাক হবেন। তবে ওই পর্যন্ত আপাততো যাবো না। এখন যেটা প্রকাশ করছি তা হলো, বল্লারপুর পেপাব মিলের চেয়াবম্যান মিঃ জি. এম. পার্থসারথিই সন্দীপ অর্থাৎ অশোকের বাবা।

'বাবা' কথাটাব কোনওই গুরুত্ব নেই অশোকের জীবনে। সম্পর্কে বাবা হওয়া সত্ত্বেও জি. এম. পার্থসারথি অশোকের কাছে একটা অভিশাপ এবং অমানবিক এক নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই লোকটাকে সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। শুধু কি ঘৃণা? মানুষটাকে মুছে ফেলতে পারলেই বোধহয় সবচেয়ে শান্তি পাওয়া যাবে। অথচ আর একটু সময় পরেই হয়তো ওই জি. এম. অর্থাৎ গোপীমোহন পার্থসারথিব সামনে গিয়ে অশোককে নিশ্চুপ এক শান্ত ছেলের মতোই সৌজন্য বিনিময় করতে হবে। তা হোক। অশোকের সবচেয়ে যেটা সুবিধে সে তার বাবাকে চিনতে পারবে কিন্তু বাবা তার সন্তানকে চিনতে পাববে না। সেটাই স্বাভাবিক। বারো বছরের ছোটখাটো বেশ রোগা ধরনের সেদিনের সন্দীপ আজ প্রায় তিরিশ বছরের পরিপূর্ণ এক যুবক। শারীরিক পবিবর্তনের সুযোগ যেহেতু অশোক বেশি পেয়েছে এবং মাঝখানে অদর্শনের সতেরোটা বছরের দেওয়াল উঠে গেছে, নিজের ছেলেকেও চেনার কাজটা অতো সহজ নয়। অশোক তো সেটাই চায়। কিন্তু গোপীমোহন পার্থসারথি যদি চিনতে পারে? না, এতো তাড়াতাড়ি অশোক ধরা পড়তে চায় না। এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কী যেন মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অশোক কোমরে হাতখানা রেখে একটা আগ্নেয়াস্ত্রের উপস্থিতি টের পেতে চাইলো! হ্যাঁ জিনিসটা ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। তবে আর চিন্তা কী? গোপীমোহন পার্থসারথি তাকে যদি চিনেও ফেলে আফসোস করার কিছু নেই। সঠিক সময়ে অশোকের লুকিয়ে রাখা রিভলবারটা নিশ্চয়ই গর্জে উঠবে।

মিঃ লাহিড়ি, চেয়ারম্যান আপনাকে ডাকছেন। পাখির আওয়াজের মতো শাওনার গলা অশোকের কানে পৌছলো না। কী করে পৌছবে? সে তার মায়ের মৃত্যুর দৃশ্যটা দেখছে। কী অসহায় এবং নিষ্ঠুর সেই মৃত্যু। আতঙ্কে মায়ের দৃষ্টিটা কেমন যেন বোবা হয়ে আসছিল। ওই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মা তাকে অসীম মমতায় বলেছিলেন, সন্দীপ বেটে ভাগ যাও হিঁয়াসে—

মিঃ লাহিড়ি—শাওনার গলা একটু ওপরের দিকে উঠতেই অশোক দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপের বাইরে বেরিয়ে এলো। মেয়েটা বোধহয় তাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছে। অথচ সে মাত্র দু'হাত দূরে বসেও কতো দূরে চলে গিয়েছিল। অশোক জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কিছু বলছেন?

আপনি চেয়ারম্যানের ঘরে যেতে পারেন। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

গোপীমোহন পার্থসারথির ঘবে ঢুকে অশোক নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে হাত দুটো জড়ো করে নমস্কার জানালো। চাকরির প্রথম দিনে এই ভদ্রতাটুকু চেয়ারম্যানের সঙ্গে করতেই হয়। সেজন্য কি অশোকের বুক থেকে বিদ্বেষের সব বাষ্প শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে? সেটা তো ক্রমশই জমা হচ্ছে। সম্পর্কে বাবা হওয়া এই মানুষটার প্রতি অশোকের যে কী আক্রোশ সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে এখানে তাকে এখন বেশ অভিনয় করেই যেতে হবে।

গোপীমোহন অশোকের নমস্কার গ্রহণ করে ওকে সামনের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। চেয়াবম্যান এই মুহূর্তে অশোককে দেখছেন না। ওর সম্পর্কের ফাইলটার ওপর তিনি দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। পড়া শেষ হলে তিনি এবাবে পবিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে অশোকের মুখের দিকে তাকালেন। বছর তিরিশের ঝকঝকে আভিজাত্য ভরা চেহারার এক যুবক। শখ করে দাড়ি রেখেছে। তবে ওই দাড়িতে ছেলেটাকে কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে। শান্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে অশোকও। ওর দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টির মিলে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পর গোপীমোহনের কপালে কয়েকটা ভাঁজ জমা হলো। ওই চোখ দুটো তিনি আগে যেন কোথায় দেখেছেন। অনেকটা মিল রয়েছে...মিল রয়েছে সন্দীপের সঙ্গে। গোপীমোহন অশোককে ছেড়ে আবাব ফাইলটার ওপর চোখ বাখলেন। বললেন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি আপনার সব পড়াশোনাই তো নয়াদিল্লিতে, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওয়েল মিঃ লাহিড়ি—গোপীমোহন নয়াদিল্লি থেকে আসা ওর সম্পর্কের ফাইলটার ওপর চোখ রেখেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ফ্রানসিস ইন্ডিযাতে বত্রিশশো টাকা স্যালারি পেতেন। এখানে পাবেন সাতাশশো। প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা 'লস' হবে। তাছাড়া আর একটা প্রশ্নও—

বলুন। অশোকের গলা উদ্বেগহীন। তবে ভেতরে ভেতবে সে একটু চিন্তিত হয়ে উঠছে। ওর চোখ-মুখ দেখে অবশ্য সে-সব বোঝার কোনও উপায় নেই।

আপনার মা-বাবা নিশ্চযই নয়াদিল্লিতে থাকেন?

হঠাৎ এ প্রশ্ন? অশোকের ভ্রু কুঁচকে উঠলো।

প্রশ্নটা এই কারণে করছি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ইউনিটে যোগদান করতে চান? জগাধারী না বল্লারপুরে? নয়াদিল্লির খুব কাছে জগাধারী। আমি বলতে চাইছি বাড়ির কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েও আপনি এতো দূরে আসতে চাইলেন কেন? এইসব ব্যাপারগুলো আমার কাছে একটু যুক্তিহীন বলে মনে হয়েছে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। অশোক ওর গাম্ভীর্যপূর্ণ ভরাট গলায় উত্তর দিল, পারিবারিক কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে আমার বাবা-মা'র কিছু নীতিব পার্থক্য দিন দিনই বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছিলো। এ-সব এড়াতেই পাঁচশো টাকার ব্যবধানই বলুন আর বাড়ির কাছে থাকাব সুযোগই বলুন কোনওটাই আমাকে টানছিল না।

এর অর্থ স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়ে এলেন।

তা বলতে পারেন।

বাই দি বাই মিঃ লাহিড়ি, আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করবো—কপালের ভাঁজ দীর্ঘতর করে গোপীমোহন পার্থসারথি জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম আপনি গেস্ট হাউসে থাকতে আগ্রহী। সেটা আপনি থাকতেই পারেন, কিন্তু ও. এস. ডি. হিসেবে আপনি যে বিরাট কোয়ার্টার পেতে পারেন সেই সুযোগটা নিচ্ছেন না কেন?

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা ক্ষেত্রে না-হয় নাই নিলাম। অশোকের উত্তর শুনে গোপীমোহন আর কথা বাড়ালেন না। ছেলেটা কি একটু রুক্ষ? কেমন যেন কাটা কাটা কথা অথচ দোষ ধরার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। গোপীমোহন ওকে বিদায় জানিয়ে দুশ্চিন্তার গহ্বরে ঢুকে যেতে লাগলেন।

লাঞ্চে সাধারণত সাড়ে-বারোটা থেকে পৌনে-একটার মধ্যে বাংলোয় ফেরেন গোপীমোহন। আজ ফিরলেন দুটোয়। ওঁর স্ত্রী সুষমা ইতিমধ্যে দু-দু'বার ফোন করেছিলেন স্বামীকে। দু'বারই গোপীমোহন একটাই উত্তর দিয়েছেন, কখন ফিরবো জানি না। তুমি আজ আমার জন্য অপেক্ষা করো না। খেয়ে

নিয়ো। সুষমা অবশ্য খাননি। চেয়ারম্যানের কাজ কর্মের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরও মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কিন্তু লাঞ্চে কখন বাড়ি ফিরবেন সেই সময়টাও বলতে পারছেন না। কী এমন গুরুতর ব্যাপাব হতে পারে? কোনওদিন যে দেরি হয় না তা তো নয়। সেক্ষেত্রে গোপীমোহন নিজেই ফোন করে জানিয়ে দেন। আজকে সেটাও করেননি। সুষমাকে দু'বার খোঁজ-খবর নিতে হয়েছে। আর উত্তরটাও খুব একটা সন্তোষজনক ভাবে পাননি। একা একা সুষমা কখনও খেয়েছেন? তাহলে গোপীমোহন ওই কথাটা কীভাবে বলতে পারলেন? নিশ্চয়ই আজ ওর কিছু হয়েছে? কিন্তু কী হতে পারে?

গোপীমোহন বাড়ি ফিরে এলে সুষমা হইচই করে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি জানেন, কিছু হয়ে থাকলে গোপীমোহন নিজেই সব তাঁকে বলবেন। এ-সব ক্ষেত্রে আগেই নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করাটা ঠিক নয়। সুষমা শুধু জিজ্ঞেস করলেন, খাবার বাড়বো?

তুমি খেয়েছো? গোপীমোহন উল্টে জিজ্ঞেস করলেন।

না। সুষমার শান্ত উত্তরটা শুনে গোপীমোহন হইহই করে উঠলেন, কী আশ্চর্য। তোমাকে তো খেয়ে নিতেই বলেছিলাম।

বললেই কি খেয়ে নেওয়া যায়? সুষমা আরও স্নিগ্ধ গলায় বললেন, কোম্পানির কাজে বাইরে থাকলে আলাদা কথা, বল্লারপুরে রয়েছো অথচ তোমাব আগে আমি খেয়ে নিয়েছি এই সতেরো বছবের মধ্যে কখনও হয়েছে?

'সতেরো বছর' কথাটা উচ্চারণ করতেই গোপীমোহনের আবার যেন কী মনে পড়ে গেল। ছাড়া ছাড়া সুরে বলতে লাগলেন, জানো সুষমা খিদেটা আমার ঠিকই আছে তবে খাবার ইচ্ছেটাই আজ নেই।

এমনটা হবার কাবণ?

অশোক লাহিড়ি।

অশোক লাহিড়ি? সে কে?

এক বাঙালি ছোকরা। আমাদের পেপার মিলে ও. এস. ডি হয়ে আজকেই এলো। গোপীমোহন আস্তে আস্তে সুষমাব দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রায় ফিসফিস করে বললেন, ছেলেটার চোখ দুটো অনেকটা সন্দীপেব মতো।

কার মতো বললে? সুষমা দারুণ ভাবে চমকে উঠলেন।

সন্দীপের মতো। একটু চুপ করে থেকে গোপীমোহন কী যেন ভাবতে লাগলেন। সুষমার দুই কাঁধে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে এক ভয়ার্ত সুরে যেন নিজেকেই শোনালেন, অশোক সন্দীপ নয় তো?

তা কী করে হবে? তুমিই তো বললে ওর নাম অশোক লাহিড়ি। বাঙালি।

তা ঠিক। সুষমার সমর্থন পেয়ে গোপীমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন আসলে কী হয়েছে জানো, ছেলেটার চোখ দুটো সন্দীপের মতো হওয়াতে আমার চিন্তা-ভাবনা সব কিছু ওলোট-পালোট হতে শুরু করেছে। নয়তো আমি তো জানতেই পেরেছি ওরা নয়াদিল্লির বাসিন্দা। অশোক ওখানকারই স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা করেছে। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার ওর মা-বাবা রয়েছেন ওখানে। কিন্তু সুষমা—

বলো। এমনও তো হতে পারে ছেলেটা আমাকে পুরোপুরি মিথ্যে বলেছে?

এটা তোমার মনের ভুল। সুষমা স্বামীর মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য কোমল গলায় বললেন, অশোকের চোখ দুটো অনেকটা সন্দীপের মতো। শুধুমাত্র ছোট্ট এই ব্যাপারটার মধ্যে তুমি এতো কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন? জোর করে যদি কষ্ট পেতে চাও তাহলে কী-ই-বা বলতে পারি। তুমি তো শুধু চোখের কথা বললে, হুবহু একই রকম দেখতে দুজন মানুষও তো দেখা যায়। সেক্ষেত্রে তো তুমি পাগল হয়ে যেতে। সুষমা একটু থামলেন। স্বামীর মনে সাহস আনবার জন্য আবার বললেন, যা নয় তাই ভেবে যদি তুমি অস্থির হয়ে পড়ো সেটা কি ঠিক? অশোক বাঙালি—এই

একটা ব্যাপারেই তো তুমি পরম নিশ্চিন্ত হতে পারো।

আমি সব মানছি সুষমা। কিন্তু—

আবার কিন্তু কী? অশোক যে সন্দীপ আমি সে-কথা বলছি না। গোপীমোহন ক্লান্তির সুরে বললেন, কিন্তু ছেলেটার সিদ্ধান্তগুলো বড়ো অদ্ভুত। কেমন যেন খাপছাড়া গোছের। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিহীন মনে হতে পারে তবে আমার ধারণা এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই অশোকের অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। ওর কোনও ব্যাপারটাই আমি ঠিক মিলিয়ে নিতে পারছি না।

যেমন? গভীর আগ্রহ নিয়ে সুষমা জানতে চাইলেন।

ও নয়াদিল্লির ছেলে। বাড়ির কাছে জগাধারীতে না-গিয়ে অশোক বাবা-মাকে ছেড়ে এতো দূরে বল্লারপুরকে বেছে নিল কেন? এখানে আসাব আগে ও নয়াদিল্লিতে একটা সংস্থায় চাকরি করতো। সেখানে অশোক এখানকার চেয়ে পাঁচশো টাকা বেশি পেতো। আর্থিক লুজার হয়েও ও এই কোম্পানিতে এতো আগ্রহী কেন? এটাকে কি তুমি স্বাভাবিক ঘটনা বলবে? তাছাড়া চাকরিতে ঢুকেই সে অফিসারই বলো আর ওয়ার্কারই বলো কোয়ার্টার পাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ অশোককে ও. এস. ডি 'র বিরাট কোয়ার্টার দেওয়া সত্ত্বেও সে গেস্ট হাউসের ছোট্ট একখানা ঘরেই থাকতে চায়। এ-সব প্রশ্ন আমি অবশ্য ওর কাছে তুলেছিলাম—

কী উত্তর দিল?

বাবা-মা'র সঙ্গে ওর কিছু নীতির পার্থক্য থাকার ফলেই অশোক নিজেকে এই ভাবে গুটিয়ে নিয়েছে। তাও না-হয় মানলাম সুষমা, কিন্তু কোয়ার্টারটা তার ডেজিগনেশন অনুযায়ী প্রাপ্য। সেটা না-নেওয়ার কী যুক্তি থাকতে পারে? আমার একটাই সন্দেহ হয়—

অশোকই সন্দীপ তাই না? ঠাট্টা করে সুষমা স্বামীর জড়তা কাটাতে স্নিগ্ধ একঝলক হাসির ফোয়ারা ছড়ালেন।

আমি কি তাই বলেছি? এতোক্ষণে একটু মৃদু হাসলেন গোপীমোহন। বললেন, আমার সন্দেহের কথা যেটা বলছিলাম, মনে হয় অশোক একটু পালিয়ে বা লুকিয়ে থাকতে চাইছে। অর্থাৎ একা একা থাকাটাই পছন্দ করছে যেটা গেস্ট হাউসে থাকলে সে পুরোপুরিই পাবে। অথচ একজন ইয়াং ছেলের পক্ষে চারপাশের কোয়ার্টারের লোকজনের মধ্যে বেশ একটা আনন্দ হইচই করে থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

সকলে তো সমান হয় না। সুষমা যুক্তির দরজা খুলে দিলেন। একজন অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, আর একজন হয়তো নিজেকে প্রকাশ করতেই চায় না। এক একটা মানুষের আবেগ ওপর থেকেই বোঝা যায়। আবার একজনের আবেগ অনুভব করতে হলে তার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মিশে তবেই গভীর ভাবে চেনা যায়। এ-সব পার্থক্য তো হতেই পারে। সেজন্য অহেতুক চিন্তা করে দুর্বল হয়ে যেয়ো না।

দুর্বল আমি হচ্ছি না সুষমা। গোপীমোহন আবার কথাটা নতুন করে বললেন, ছেলেটার কাজকর্মের মধ্যে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার-স্যাপার তো থাকবে? অশোক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। তার কাছে নিশ্চয়ই আমি পাগলের ব্যবহার আশা করবো না। ব্যাপারটা তুমি তলিয়ে দেখছো না—ও. এস. ডি'র সাজানো গোছানো বড়ো কোয়ার্টারটা সে কেন নিচ্ছে না? তর্কের খাতিরে না-হয় মেনে নিলাম অশোকের সঙ্গে ওর বাবা-মা'র একটা মতের অমিল রয়েছে। সেজন্য কী তাঁরা একবারও ছেলের কর্মস্থলে আসবেন না? সেক্ষেত্রে কোথায় উঠবেন ওঁরা? এর পরিষ্কার অর্থ একটাই, অশোক চায় না ওর বাবা-মা এখানে আসুক। যার জন্য সে গেস্ট হাউসের ছোট্ট ঘরখানাকেই বেছে নিয়েছে।

ও. এস. ডি'র কোয়ার্টার নিয়েও তো অশোক ওর বাবা-মাকে নাও আনতে পারে?

তা পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে লোকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, এতো বড়ো কোয়ার্টার পড়ে আছে অথচ আপনার বাবা-মাকে একবারও নিয়ে এলেন না—আসলে অশোক কাউকেই কোনওরকমের সুযোগ দিতে চায় না।

চিন্তা-ভাবনার একটা সীমা আছে। সুষমা এবারে গোপীমোহনকে সামান্য একটু তিরস্কার করলেন, তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছো। কোম্পানিতে ঢোকা নতুন একটা ছেলের সম্পর্কে এতো কিছু ভেবে তুমি কেন নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করছো? কোম্পানীতে তুমি ওব কাজের হিসেব নেবে। সেখানে যদি কোনও গন্ডগোল দেখো তাহলে না-হয় তোমার এই ব্যস্ততার একটা মানে পাওয়া যেতো—তবে এখন তুমি যা আরম্ভ করেছো এটাকে জোর করে কষ্ট পাওয়া বলে। তারপরেই সুষমা সামান্য একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, বেলা আড়াইটা বাজতে চললো আর কখন খাবে?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, খেতে দাও। খাবার ব্যাপারটা গোপীমোহনের মাথাতেই ছিল না। স্ত্রীর কথায় মনে পড়লো ওটা এই মুহূর্তে মিটিয়ে নেওয়া দরকার। অল্প হেসে শুধু বললেন, মধ্যে থেকে তোমাকেও এতোক্ষণ না-খাইয়ে রাখলাম।

তুমি রাখোনি। সুষমা প্রশান্ত হাসলেন, তুমি তো আমাকে খেয়ে নিতেই বলেছিলে।

তুমি তো সে-কথাটা শোননি।

সেইজন্যই বুঝি আমাকে কথা শোনাচ্ছো—সুষমা স্বামীব চোখের দিকে গভীর এক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতেই গোপীমোহন বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য। তুমি দেখছি—

আর একটাও কথা নয়। সুষমা এবাবে একটা ধমক লাগালেন, আমি কিন্তু বেলা তিনটেব সময় দুপুরেব খাওয়া খেতে মোটে পছন্দ করি না।

বিকেল পাঁচটায় অফিস ছুটির পর অশোক ফিরে এলো গেস্ট হাউসে ওর নিজস্ব ঘরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বেয়াবা এসে দরজা ঠেলে মুখ বাড়ালো, সাব, চাযে ইয়া কফি?

আভি কুছ নেহি চাহিয়ে।

আধে ঘণ্টা বাদ দুঁ?

দে সকতে।

বেয়ারা চলে গেলে অশোক বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। একবাব ভেবেছিল স্নানটা সেরে নেবে। কিন্তু অজস্র চিন্তাব এক ভূত তাকে যেন তাড়া করে চলেছে। সামান্য একটু বিশ্রামের অবসব পেলেই অশোক শুনতে পায় অশ্বক্ষুরেব শব্দ। সেই দামামা বাজানো শব্দটা ওঠে তার বুকের ভেতর থেকে। মায়ের মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই এক দঙ্গল তেজী ঘোড়া লোহার জুতো পরে অশোকের বুকের ওপর দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে যায়। তার মাঝখানটা তখন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। অসহ্য সেই যন্ত্রণায় অশোকের একটাই প্রতিজ্ঞা, সম্পর্কে বাবা হলেও ওই গোপীমোহন পার্থসারথি নামের লোকটাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। না, বল্লারপুব পেপার মিলের ওই চেয়ারম্যান লোকটার প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা নেই। বাবা বলে সূক্ষ্ম এক টানও সে অনুভব করতে পারে না। গোপীমোহন পার্থসারথির নাম শুনলে একরাশ ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই তার ভেতর থেকে জেগে ওঠে না। যেটা জেগে ওঠে তা হলো মাতৃঋণ। মায়ের ঋণ অবশ্য শোধ করা যায় না। তবে ওই বারো বছর বয়স পর্যন্ত অশোক মায়ের যে স্নেহ, মমতা আর ভালোবাসার রেণু গায়ে মেখেছে, সেই শরীরটাকে তো মায়ের জন্যই উৎসর্গ করতে পারে। গোপীমোহন পার্থসারথিকে পৃথিবীর নিঃশ্বাস নিতে না-দেওয়ার অর্থই হলো অশোকের ফাঁসি। তার জন্য অশোক এক বিন্দুও চিন্তিত নয়। তার মা-ই যখন বেঁচে রইলো না, তারও বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা নেই। যাবার আগে শুধু প্রতিজ্ঞাটা পালন করতে হবে। মায়ের আত্মা তাতে শান্তি পাবে কিনা অশোক জানে না, তবে সে নিজে যে শান্তি পাবে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বুকের ভেতরে একরাশ বলবান ঘোড়ার নিষ্ঠুর দাপাদাপি চরমে উঠতেই অশোকের হঠাৎ মনে হলো, এটা তো নয়াদিল্লি নয়, বল্লারপুর গেস্ট হাউসের মুখোমুখি রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগোলেই ফিফটিনথ অ্যাভিনিউ। দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে যে-কোয়ার্টারটা রয়েছে সেই বাড়িতে অশোকের বারোটা বছর কেটেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা তার মা থাকতেন সেই বাড়িতে। আর সবচেয়ে বিষাদের কথা তার মা অর্থাৎ মহাশ্বেতা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন সেখানেই। অশোক বিছানার ওপর উঠে বসলো। আপনা থেকেই তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। গোপীমোহন পার্থসারথি এখন

ওর হাতের মধ্যে। যেকোনও দিন ইচ্ছে করলেই দু-তিনটে গুলির বিনিময়ে ওই মানুষটার হৃদপিন্ডকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। আরও আক্রোশ মেটাবার জন্য সাতান্ন বছরের ওই সুখী শরীরটাকে বুলেটের আলপনা এঁকে একেবারে ঝাঁঝরা করেও দিতে পারে। কিন্তু একটু ধৈর্য তাকে ধরতে হবে। তার বাবা অর্থাৎ গোপীমোহন প্রায় খোলাখুলিই প্রেম করতো সুষমা নামের এক মহিলার সঙ্গে। তার মা মহাশ্বেতা ছিলেন খুবই শান্ত এবং নীরব ধরনের। চোখের ওপর নিজের সর্বনাশ হচ্ছে জেনেও কোনও প্রতিবাদ করতে পারতেন না। শুধু কষ্ট পেতেন আর কাঁদতেন। মাঝে মাঝে শুধু স্বামীকে করুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, আমার সঙ্গে তুমি এমন ব্যবহার করছো কেন? স্ত্রী, পুত্র থাকা সত্ত্বেও এমন ভাবে একজন মেয়ের সঙ্গে মেশাটা কি ঠিক? গোপীমোহন আরও বেশি সুষমার সঙ্গে মিশতেন।

অশোকের এখন জানার বিষয় একটাই। ওই অশ্রদ্ধেয় লোকটা সেই সুষমা নামের মহিলাকেই বিয়ে করেছেন কিনা এবং সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মা মহাশ্বেতার মৃত্যুর কতোদিন পরে? অশোকের ধারণা গোপীমোহন যে-জঘন্য কাজ করেছে সুষমাকে পাবার জন্য তাতে সন্দেহ হয় মহাশ্বেতার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ওই ব্যাপারটা সেরে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অশোকের ক্রোধটা আরও বাড়বে। বাড়বে তার নিষ্ঠুরতাও। গোপীমোহনকে সহজে মারবে না। তিল তিল করে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে। বল্লারপুর পেপার মিলের চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই তখন তাঁর স্ত্রী মহাশ্বেতার মৃত্যু যন্ত্রণাটা একবার অন্তত উপলব্ধি করতে পারবেন। আর তখন ফাঁসিতে যেতে অশোকের কোনও দুঃখ থাকবে না। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে সুখী জীবনেব ছবি কোনোদিনও আঁকেনি, তেমন মানসিকতাও তার গড়ে ওঠেনি। বিক্ষিপ্ত মানসিকতা এবং অস্থির চিত্ততার মধ্যেই সে বড়ো হয়েছে শুধুমাত্র একটি লোকের জীবন নিতে।

দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ফিফটিনথ অ্যাভিনিউর কোয়ার্টারটা অশোককে যেন কানেব কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে ডাকছে। সেখানে চলে গেলে এক্ষুণি বুঝি তার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। মহাশ্বেতা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে গভীর সুরে বললেন, সন্দীপ বেটে, এতোদিন বাদে তুই এলি। স্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরি হলেই মা অস্থির হয়ে উঠতেন; কিছুতেই ঘরের মধ্যে তখন থাকতে পারতেন না। বাইরের লনে এসে মেহেন্দি গাছের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতেন। অশোককে দেখতে পেয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতেন, সন্দীপ বেটে, তুই এতো দেরি করিস কেন? আমার বুঝি চিন্তা হয় না। সারাক্ষণ মায়ের চিন্তা-ভাবনা শুধু তাঁর সন্দীপ বেটের জন্য। আসলে গোপীমোহনের কাছ থেকে যতো দূরে সরে যাচ্ছিলেন অশোককে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে ততোই বাঁচতে চাইছিলেন। মহাশ্বেতা অবশ্য বাঁচতে পারেননি। তার জন্য একমাত্র দায়ী ওই গোপীমোহন পার্থসারথি।

স্নান না-করে এবং চা বা কফি ইত্যাদি না-খেয়েই অশোক গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লো। আকাশে তখনও আলোব ছড়াছড়ি। তবে রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই চলে। অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে ফিফটিনথ অ্যাভিনিউর দিকে পা বাড়ালো! মিনিট চারেকের তো পথ। মুহূর্তেই কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটো একটা স্মৃতির অ্যালবাম হয়ে অশোকের চোখে ধরা পড়লো। এই সতেরো বছরে গাছ দুটো কী বিশাল হয়েছে! আর শুধুই কি বিশাল? বাচ্চাদের মতো টুকটুকে লাল জামা পরে যেন একরাশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে বাতাসের সঙ্গে সমান ভাবে মাথা দুলিয়ে। অশোক গাছ দুটোকে শুধুমাত্র পুঁতেছিল। কিন্তু তার গোড়ায় মাটি খুঁচিয়ে দেওয়া, নিয়মিত জল ঢেলে পরিচর্চার ব্যাপারটা মা-ই করতেন। মহাশ্বেতা কতোদিন হেসে বলতেন, সন্দীপ বেটে তুম মেরা কাম আউর বড়া দিয়া!

অশোকের চোখ দুটো জলে প্রায় ভরে আসছে। নিজেকে সে দারুণ ভাবে সংযত করে নিল। মা কখনও শুধু সন্দীপ বলে ডাকতেন না। তাঁর মুখে 'সন্দীপ বেটে' ছাড়া অন্য কিছু শোনা যেতো না। আর কী স্নেহ মিশিয়ে মধুর স্বরেই না ডাকতেন! অশোক যেন এখনও মায়ের সেই ডাকটা শুনতে পাচ্ছে।

অজস্র ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটোর পাশে কোয়ার্টারটাকে এখান থেকে ফ্রেমে বাঁধানো একটা

ছবির মতো দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অশোক। শৈশবের কতো ছবি যে একসঙ্গে একরাশ জলোচ্ছ্বাসের মতো তার চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে অশোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মৃতির বর্ষণে ভিজতে লাগলো। বেগুনী রংটা মহাশ্বেতা দারুণ পছন্দ করতেন। তাঁর বেশির ভাগ শাড়ি ব্লাউজই ছিল ওই রঙের। অশোকের মনে হলো বেগুনী রঙের সেই শাড়ি পরে মা ঘর থেকে এই বুঝি লনে এসে দাঁড়াবেন। হয়তো সেই মধুর স্বরে ডেকে বলবেন, সন্দীপ বেটে, তুম আ গয়ে!

অশোকজি!

যে কোয়ার্টারটাব দিকে সতৃষ্ণ নয়নে অশোক তাকিয়েছিল, সেখান থেকেই শাওনা সিং আহ্বান জানালো, আইয়ে অশোকজি। রাস্তা থেকে অশোক এতোক্ষণ ওদের দেখতে পায়নি। আসলে লনের চারপাশে বুক সমান উঁচু মেহেদি গাছেব চমৎকার বেড়ার ও-পাশে বেতের চেয়ারে ওরা বসেছিল। শাওনা সিং অশোককে দেখতে পেয়ে চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই অশোক একটু সচেতন হয়ে উঠলো। সে যে এই বিশেষ কোয়ার্টারটাকেই দেখতে এসেছে এটা অন্তত শাওনাকে বুঝতে দেওয়া ঠিক নয়। গোপীমোহন পার্থসারথি যদি জানতে পারে তার এই আগ্রহ, সেক্ষেত্রে ধরা পড়ার সম্ভাবনা না-থাকলেও হাজারো কৈফিয়তের সামনে যে পড়তে হবে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অশোক তেমন সুযোগ দিতে রাজি নয়। এদিকে আসার ব্যাখ্যাটা অন্যরকম ভাবে ঘুরিয়ে বলতে হবে। অশোক ওর গমগমে অথচ মাধুর্যপূর্ণ গলায় বললো, এটা আপনার কোয়ার্টার বুঝি?

জি হাঁ। শাওনা শান্ত একটু হেসে উত্তর দিল, আপনি কি রাস্তার ওপব দাঁড়িয়েই কথা বলবেন? ভেতবে আসবেন না?

লনে চার-পাঁচটা বেতের চেয়ার ছড়িযে ছিটিযে ছিল। সেখানে একজন ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা আরাম করে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলেন। শাওনা অশোককে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি অশোক লাহিড়ি। আমাদের পেপার মিলে ও. এস. ডি হয়ে আজকেই এসেছেন। তার পরেই শাওনা অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললো, আমার বাবা-মা।

অশোক প্রথমে শাওনার মা অমৃতা কাউরকে এবং পরে জগজিৎ সিংকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি হেসে বললেন, মুঝে ইতনা ন চাহিয়ে! হাত জোড় করে নমস্কার করলেই যথেষ্ট।

বাঙালি লেড়কা হ্যায় তুম? অমৃতা কাউর অশোকের মুখের দিকে চেয়ে ওই প্রশ্নটা রাখতেই অশোক ছোট্ট উত্তর দিল, জি হাঁ।

তোমার প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝেছি। অমৃতা কাউর মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, বয়স্কদের সম্মান জানানোর এই আন্তরিকতা বাঙালি ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোনও জাতের মধ্যে নেই।

এটা কিন্তু তুমি দারুণ ঠিক কথা বলেছো। জগজিৎ সিং স্ত্রীকে সমর্থন করতেই অমৃতা কাউর অশোকের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, আমি কোন সময়ে ঠিক বলি না বলতে পারো?

মেনে নিচ্ছি, মেনে নিচ্ছি। দু'হাত তুলে জগজিৎ সিং স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলেন, আসল ব্যাপারটা কী জানো, আমার ডিপার্টমেন্টে দুজন বাঙালি ছেলে রয়েছে। আমাকে ওরা এতো ভক্তি শ্রদ্ধা করে যে পথে দেখা হলেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা চাই। এতো বারণ করি কে শোনে কার কথা!

আপনার কোন ডিপার্টমেন্ট? অশোকের ওই প্রশ্নের উত্তরটা জগজিৎ সিংই দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ওঁকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই শাওনা সগর্বে উত্তর দিল, বাবা পাওয়ার প্ল্যান্টের সুপারিনটেনডেন্ট? কথাটা বলেই শাওনা মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। অমৃতা কাউরও খুব হাসলেন। অশোক বুঝে উঠতে পারলো না এতে হাসির কী হয়েছে? জগজিৎ সিং এবারে অশোককেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন, মা এবং মেয়ের এতো হাসির কারণটা তুমি জানো? এই দ্যাখো, তোমাকে কিন্তু তুমি করে বলে ফেললাম—

তাতে কী হয়েছে? অশোক ব্যাপারটা মেনে নিতেই জগজিৎ সিং আবার বললেন, যে-কথাটা

বলছিলাম—মা-মেয়ের হাসির কারণটা হলো আমার পেছনে লাগা। আসল ব্যাপারটা তোমার জানা নেই। সেটা আগে একটু বলে নেওয়া দরকার। বর্তমানে যিনি চেয়ারম্যান অর্থাৎ জি. এম. পার্থসারথিও একসময় পেপার মিলের পাওয়ার প্ল্যান্টের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। শুধুই তাই-ই নয়—এই কোয়ার্টারেও ছিলেন। আমাদের দুজনের মধ্যে আপাততো এই মিল থাকার দরুন মা এবং মেয়ে প্রায়ই আমাকে নিয়ে মজা করে, তুমি কবে চেয়ারম্যান হচ্ছো? অতো হাসাহাসির ইঙ্গিতটা বুঝলে এবারে—কথাটা শেষ করে জগজিৎ সিং নিজেই এবারে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দারুণ ভাবে হেসে উঠলেন।

অশোক একবার ভাবলো জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কতোদিন হলো এই কোয়ার্টারে আছেন? কিন্তু ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে গুটিয়ে নিল। ওই উত্তরটা তার এমন কিছু জরুরি নয় যে জিজ্ঞাসা করতেই হবে। মধ্যে থেকেই তাব জানার আগ্রহটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কী দরকার? ছোট্ট ছোট্ট এই ভুলের জনাই তো মানুষ ধরা পড়ে। অশোক ধরা পড়তে চায় একেবারে শেষ সময়ে। যখন তার কাজও শেষ হয়ে যাবে। তার আগে ওকে একটু সাবধানে চলতেই হবে। অশোক এবারে একটু ঘুরিয়ে বললো, এব আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

কোন সংস্থার কথা বলছো? জগজিৎ সিং অল্প হেসে উত্তর দিলেন, গত কুড়ি বছর ধরে আমি এই পেপার মিলেই রয়েছি। তবে আগে ছিলাম জগাধারীতে। বল্লারপুরে এসেছি, বছর তেরো হতে চললো। প্রথমে ছিলাম নাইনটিনথ অ্যাভিনিউর কোয়ার্টারে। প্রমোশন পেয়ে বছর দশেক হলো এই কোয়ার্টারে আছি। একটু সময় নিয়ে তিনি আবার বললেন, আমার স্ত্রী অবশ্য এই কোয়ার্টাবে প্রথমে আসতে রাজি হননি। আমারও যে খুব একটা ইচ্ছে ছিল তা নয়।

কেন?

ব্যাপারটা কী জানো—আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যানের প্রথমা স্ত্রী এই কোযার্টাবেই আগুনে পুড়ে মারা যান। নানাজনে অবশ্য নানা কথা বলেন। বেশির ভাগ মানুষ যেটা বলেছেন তা হলো, রান্না করতে গিয়ে স্টোভের আগুনে শাড়িটা ধরে যাওয়ার দরুনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিছু মানুষ আবার অন্য কথা বলেছেন, ওসব শাড়িতে আগুন ধরাটরা নয়—মহাশ্বেতা দেবী শ্রেফ আত্মহত্যা করেছেন।

জগজিৎ সিং-এর কথাগুলো শুনতে শুনতে অশোক আবার বুকের মধ্যে ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেল। সর্বগ্রাসী বন্যায় নদীর পাড় ভাঙার মতোই তার বুকটাও ভেঙে যাচ্ছে। এইমাত্র সে যে কথাগুলো শুনলো তাতে স্বভাবতই কিছু কিছু ধাবণা তার মনের মধ্যেও ফ্রিজেব বরফের মতো জমা হতে লাগলো। জগজিৎ সিং উল্লেখ করেছেন, 'চেয়ারম্যানের প্রথমা স্ত্রী'। এর অর্থ চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই দ্বিতীয়া স্ত্রী ঘরে এনেছেন। এ গেল একটা দিক। দ্বিতীয়টা আরও অর্থবহ। এখানকার মানুষ দু'রকম ভেবেছেন মহাশ্বেতার মৃত্যু সম্পর্কে। একদল জেনেছেন রান্না করতে গিযে শাড়িতে আগুন লেগে যায়। অপর একদল বলেছেন, উনি আত্মহত্যা করেছেন।

আসলে দুটোর কোনওটাই নয়। অশোকেব কপালের দু'পাশটায় যে-শান্ত শিরাগুলো এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। ওই ভদ্রলোক বিশিষ্ট চেয়ারম্যানটি তাহলে এটাই রটনা করেছেন, মহাশ্বেতার কাপড়ে আগুন লেগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কী চমৎকার সাজানো ব্যাপার! কতো সহজেই না গোপীমোহন পার্থসারথি ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। একটি লোকও তাকে সন্দেহ করলো না। শুধু কয়েকজন একটু অন্যরকম আঁচ পেয়ে অন্য কথা বলেছেন, এটা আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রান্না করতে গিয়ে মৃত্যু অথবা আত্মহত্যা কোনওটাতেই গোপীমোহন পার্থসারথিকে দোষী সাজানো যাচ্ছে না। সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে ওই ঘৃণ্য মানুষটা এখন কোম্পানির চেয়ারম্যান হয়ে রাজার সম্মান ভোগ করছে। অথচ একমাত্র অশোক জানে কীভাবে তার মা-র মৃত্যু হয়েছে। সেই একমাত্র সাক্ষী সেই ঘটনার। সেই আগুনে অশোককেও হয়তো পুড়ে মরতে হতো—মহাশ্বেতা নিজের কথা না-ভেবে অসীম মমতায় বলেছিলেন সন্দীপ বেটে, ভাগ যাও হিঁয়াসে। মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়েও মা তাঁর সন্তানের জীবনের কথা ভেবেছিলেন। মা ছাড়া পৃথিবীতে এটা আর কে করতে পারেন?

অশোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই অমৃতা কাউর বিস্ময়েব সঙ্গে বললেন, উঠলে কেন? ঠান্ডাপানি কুছ তো খাও।

আজ থাক। অশোকের ভেতবে যে-ঝড় চলছে সেটা সে কাউকে বুঝতে দিল না। নির্লিপ্ত সুরে ছোট্ট করে শুধু বললো, পরে একদিন খাওয়া যাবে।

তাই কি কখনও হয়? জগজিৎ সিং গভীর এক স্নেহের সুরে বললেন, প্রথম দিন তুমি আমাদের বাড়িতে এসে খালি মুখে চলে যাবে এটা হয় না।

আপ মানতে নেহি কিঁউ? শাওনা একটা কথাই বললো, শীগ্‌গির বসে পড়ুন।

অশোক তিনজনের মুখের দিকেই একে একে তাকালো। তারপরে আস্তে অথচ প্রতিটা কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করলো, একসঙ্গে আপনাদের তিনজনকেই অনুরোধ করতে হবে এতোখানি প্রয়োজনীয় করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারিনি। শুধু শুধু আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অশোক সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখলো তাতে একটাও সিগারেট নেই। ধারে-কাছে কোনও দোকানও নেই। কিনতে হলে যেতে হবে শপ সেন্টারে। গেস্ট হাউস থেকে সেটা মিনিট ছয়েব পথ। সিগারেট যখন নেই, অশোককে তখন যেতেই হবে। দীর্ঘ সতেরো বছর বাদে সে তার পরিচিত পথ ধরেই এগোতে লাগলো। ছোটবেলায় তার কয়েকজন বিশেষ বন্ধু ছিল। সোমাইয়া, বিক্রম এবং দীপক। ওদের সঙ্গে দেখা হলে ওরা হয়তো কেউ তাকে চিনতে পারবে না, শুধু স্মৃতিটাই মনে রেখেছে। কিন্তু অশোক? সে কিন্তু ঠিক চিনে নিতে পারবে। তবে অসুবিধে একটাই, এই মুহূর্তে চেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এই বল্লারপুরে অশোককে একা একাই থাকতে হবে নিজেরই স্বার্থে। এখানে অতীতকে ভুলে থাকাটাই অশোকের একমাত্র কাজ। সুতবাং শৈশবের সেই প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেও অশোককে অপরিচিতের ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া ওরা যে এখানেই রয়েছে ভার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে ওদের কোয়ার্টারগুলো অশোকের জানা আছে।

আস্তে আস্তে অশোক শপ সেন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে এলাকা এটা। এক লাইনে পরপর দোকানের সারি। মজার ব্যাপার হলো, একই জিনিসের দুটো দোকান নেই। অর্থাৎ একটা মুদি দোকান, একটা মিষ্টির, একজন ভূজিওয়ালার হরেক রকমের চানাচুরের দোকান, একটা লণ্ড্রী, একটা সেলুন, একটা সবজির দোকান, একটা স্টেনলেস স্টিলের বাসনের দোকান, একটা জামা-কাপড়ের, একটা পান-সিগারেট কোল্ড ড্রিঙ্কসের এবং প্রসাধনী স্টেশনারী দোকানের সাজ-সজ্জাতে এলাকাটা সত্যিই বাজার বাজার বলে মনে হয় না। অথচ ভিড় প্রায় লেগেই আছে সুসজ্জিত পুরুষ এবং মহিলাদের দল কেনাকাটায় ব্যস্ত।

অশোক দু'প্যাকেট সিগারেট এবং একটা দেশলাই কিনে দোকানদারকে পয়সা দেবার সময় দেখলো তিনটি ঝকঝকে চেহারার ছেলে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে একজন পানওয়ালার উদ্দেশে বললো, হরিভাই, তিনঠো, গোল্ড স্পট দিজিয়ে তিন ভিখারিকে লিয়ে। বাকি দুজন নির্মল হেসে উত্তর দিল, আরে ভাই তুম তো আপনকো ভি ভিখারি বানা দিয়া। অব হামারা কোই দুখ নেহি। হরিভাই, গোল্ড স্পট জেরা জলদি।

যে ছেলেটা প্রথমে গোল্ড স্পট চেয়েছিল, অশোক ওর মুখের দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে একবার তাকালো। ভেতরে ভেতরে সে অবশ্য একটা পরিচিত মুখের সন্ধান করে চলেছে। অশোকের গভীর দৃষ্টির আয়নায় যার ছবি ফুটে উঠলো সে হলো কৈশোরের অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু বিক্রম। না, অশোক ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেবে না যদিও বন্ধুকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সংযম হারালে কি তার চলে? অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীর পায়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলো, মালুম হোতো নয়া আয়া। অর্থাৎ বিক্রম তাকে চিনতে পারেনি।

বল্লারপুরে অশোকের দিন কুড়ি কেটে গেল। অফিসের কাজকর্ম বুঝে নিয়ে সে চমৎকার ভাবে সেটা পালন করে চলেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা তার টেবিলে কাজ কখনও জমা থাকে না। এ-ছাড়া দু-চারটে প্রবলেম যা তার কাছে এসেছে তারও সমাধান করেছে উপস্থিত বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি

আর ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে। তবে অফিসের অনেকের দৃষ্টিতে ছেলেটা ভীষণ যান্ত্রিক। উনত্রিশ-তিরিশ বছরের একজন ইয়াং হ্যান্ডসাম যদি এতো কাজের মধ্যেই ডুবে থাকবে তাহলে রঙিন এই পৃথিবীটাকে দেখবে কখন? এই অভিযোগটা অবশ্য মেয়েদের মধ্যে বেশি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ চোদ্দ- পনেরোজন মহিলা আছে। তার মধ্যে দুজন মাত্র বিবাহিতা। সুতরাং বাকি সুন্দরী মেয়েরা তাদের একজন নতুন সহকর্মী অর্থাৎ অশোক লাহিড়ি সম্পর্কে আগ্রহী হতেই পারে। কিন্তু ও. এস. ডি সাহেব যেন মাথা এবং চোখ নিচুতে রেখে কাজ করতেই ভালোবাসে। তাছাড়া প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি একটা কথাও বলবে না। কোনওরকম আবেগ বা উচ্ছ্বাস তার মধ্যে দেখা যায়নি যাতে মনে হতে পারে ছেলেটা হাসিখুশি। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে ও এতো কম কথা বলে যে অফিস সংক্রান্ত দু-চারটে কথাবার্তা বলার পর মনে হয়, সামনে বিরাট মরুভূমি। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ থাকে না। তবে শাওনা সিং-এর ব্যাপারটা আলাদা। ও চেয়ারম্যানের পি. এ. অর্থাৎ সিনিয়র অফিসার। সুতরাং অফিসের কাজকর্মের ব্যাপারে ও. এস. ডি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। সেক্ষেত্রেও অশোক যে মুগ্ধ হয়ে থাকে সেটা মনে করার কারণ নেই। ছেলেটা সত্যিই একটু অন্য ধরনের।

অশোক সম্পর্কে অফিসের মেয়েদের আলোচনাগুলো যে শাওনার কানে যায়নি ঠিক তা নয়। তবে নিজে ওই ধরনের সস্তা মশগুলে নিজেকে জড়াতে চায়নি। অফিসার বলে নয়—অফিসার তো আরও তিন-চারজন মেয়ে রয়েছে, আসলে স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়ে সত্যিকারেরই মেয়েলি মহল জমাতে শাওনার রুচিতে বাধে। তবে ওরা বোধহয় একটা কথা ঠিক বলে, 'শাওনাকে দেখেও যে এতো ধীর-স্থির এবং অচঞ্চল থাকতে পারে তার কাছে সম্মান হারানোব ভয় থাকে না।'

অফিসার্স ক্লাবের পাশের নির্জন রাস্তা অর্থাৎ সেভেনথ অ্যাভিনিউ ধরে অশোক অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কী যেন ভাবছিল। আসলে এই মুহূর্তে সে একটি লোকের দেখা পেতে চাইছিল। চুনীলাল জয়াকর। তাদের বাড়িতে কাজ কবতো। শৈশবে অশোকের হাজারো বায়না মায়ের পরই যাকে মেটাতে হতো সে হলো ওই চুনীলাল। অশোক চুনীচাচা বলে ডাকতো। মা ধমক দিয়েও স্নেহের সুরে বলতেন, আবার নাম ধরে চাচা ডাকা কেন? চাচাজি বললেই তো হয়। হ্যাঁ, তারপর থেকেই অশোক শুধু চাচাজি বলেই ডাকতো।

গোপীমোহন পার্থসারথি যখন তার স্ত্রী মহাশ্বেতাকে মারধর করতো তখন ছোট্ট অশোক আর চুনীলাল দুজনে মিলে ওই উন্মাদ মানুষটাকে থামাবার চেষ্টা করতো। তারপরে একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। অশোকের মতো চুনীলালও মহাশ্বেতাকে মা বলে ডাকতো। সেই মায়ের করুণ অবস্থা দেখে কখন যেন ওই অসম বয়সী দুটো মানুষ এক হয়ে যেত।

চুনীলাল মানুষটা খুব নরম প্রকৃতির ছিল। মহাশ্বেতাকে দারুণ শ্রদ্ধা করতো। একদিন তো গোপীমোহনের মুখের ওপর বলেই দিয়েছিল, মায়ের কান্না আর আমার সহ্য হয় না। তুমি আমাকে বিদায় দিতে পারো। সেদিন থেকে চাচাজিকে অনেক, অনেক বেশি আপন মনে হয়েছিল অশোকের।

চাচাজির বয়স হবে এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। ওর বাড়িতে ছোটবেলায় অশোক অনেকবারই গিয়েছে। বল্লারপুর থেকে মাইল চারেক দূরে কোন্ডকুঁয়া গ্রামে ওর বাড়ি। চুনীলাল যদি বেঁচে থাকে ওর কাছ থেকে তবে অনেক খবরই পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা একান্তই জরুরী। চুনীলাল যেহেতু গোপীমোহনকে পছন্দ করতো না, অনায়াসে অশোক সেখান ওর চাচাজির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। অশোকের বারবার মনে হয় চাচাজির কাছে গেলে তার মায়ের একখানা ছবি অন্তত পাওয়া যাবে। উঃ কতোদিন যে মাকে দেখে না! চাচাজি মহাশ্বেতাকে প্রায়ই বলতো, 'মা তোমার একখানা ফটো আমাকে দিয়ো। তোমার পূজা করলে মানুষের অনেক পাপ ধুয়ে মুছে যাবে।'

পেছন থেকে একটা গাড়ির হর্ন যে কানে আসছিল না তা নয়। তবে সেই শব্দটাকে অশোক কোনও গুরুত্ব দিচ্ছিলো না। প্রথমত সেভেনথ অ্যাভিনিউর রাস্তা শুধু নির্জন নয়, বেশ চওড়াও।

তিনটে গাড়ি পাশাপাশি অতি অনায়াসে ছুটে যেতে পারে। সুতরাং একটা মাত্র লোককে নিরাপদ দূরত্বে সরাবার জন্য অতো ঘন ঘন হর্ন দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, রাস্তার ধার ঘেঁষেই সে হাঁটছিল। তাছাড়া শব্দটা শোনা সত্ত্বেও চুনীলালের চিন্তায় অশোক অনেকটা আচ্ছন্নের মতো ছিল।

গাড়িটা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অশোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তাতেও বোধহয় ওর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভেতর থেকে শাওনা মুখ বাড়ালো, অশোকজি। নিজের নামটা শুনে মুখ ফেরালো অশোক। ও, আপনি!

কী এতো ভাবেন বলুন তো? নেহাত পেপার মিলের বাউন্ডারীর মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন—বাইরের রাস্তা হলে—

বাইরের রাস্তা হলেও আমাকে কেউ চাপা দিতো না।

কেন?

যেহেতু আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটি না।

যুক্তিটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল শাওনা। কেন-না অশোক তখনও রাস্তার ধার ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। অফিসের কয়েকজন সিনিয়র অফিসার অশোককে বিন্দুমাত্র ছোট না-করার উদ্দেশ্য নিয়েও যে-কথাটা বলেছে তা হলো, ছেলেটা কেমন যেন ক্ষ্যাপাটে। দু-একজন বলেছে, অসম্ভব মুডি। অশোকের পুরুষোচিত স্মার্ট চেহারার ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ কণ্ঠস্বরে প্রভাবিত না-হয়েও শাওনা ওই কথার প্রতিবাদ করবে। অশোক মোটেই ক্ষ্যাপাটে বা মুডিও নয়। সকলের চলা-ফেরা, কথা বলার ধরন-ধাবণ তো সমান হতে পারে না। তবুও মোটামুটি সকলেই একটা বৃত্তের মধ্যেই থাকতে চায়। দু-একজন তো সেই বৃত্তের বাইরে ছিটকে যেতেই পারে। তাহলেই সে ক্ষ্যাপাটে হয়ে যাবে এটা বলা ঠিক নয়। মূল ব্যাপারটা হলো আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের সহজ স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা থেকে অশোকের মানসিক উপাদানগুলির গভীরতা অনেক বেশি। যে কারণে অন্যেরা যখন নিজেদের প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অশোক তখন অবিচল, আত্মমগ্ন এক পাহাড়। শাওনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, এখন চলেছেন কোথায়?

কোথাও না। এমনিই একটু হাঁটছিলাম।

একা একা এমন ভাবে বেড়াতে আপনার ভালো লাগে?

একা বেড়ানোরও একটা আনন্দ আছে। অশোক প্রত্যয়ের সুরে বললো, নিজেকে সমালোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। শাওনা কেমন যেন মোহিত হয়ে বলতে লাগলো, যে কারণে আমরা নিজেদের ত্রুটিগুলো বড়ো করে দেখতে পাই না। অপরে দোষ করেছে—এটা ভাবতেই অভ্যস্ত। আমাদের গ্রন্থসাহেবে সন্ত কবি ফরিদ লিখেছেন—

অশোক ওকে থামিয়ে দিয়ে ভবাট গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনি গুরু গ্রন্থসাহেব পড়েন?

কেন পড়বো না? স্নিগ্ধ হেসে শাওনা উত্তর দিল, প্রত্যেকদিনই পড়ি। হঠাৎ আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করলেন যে?

যেহেতু আপনাকে দেখে মনে হয়নি আপনি গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন।

দেখে কি কাউকে কিছু বোঝা যায়?

বড়ো কঠিন প্রশ্ন করেছেন। অশোক আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে শাওনা বললো, আপনি তো এমনিই একটু ঘুরছিলেন, আরও একটু বেশি করেই না-হয় ঘুরে আসবেন চলুন—শাওনা চালকের আসনে বসেছিল। এবারে বাঁ পাশে সামান্য ঝুঁকে গাড়ির দরজাটা খুলে দিল।

কোথায়? অশোকের ওই 'কোথায়' প্রশ্নটা শুনে শাওনা হঠাৎ একটু দমে গেল। এটা তো ঠিক সে সত্যিই অসাধারণ সুন্দরী। অথচ তার মতো একটি মেয়ের আন্তরিক আহ্বানকে কতো সহজেই না অশোক প্রশ্নের সমস্যা তুলে সরিয়ে দিতে পারে। ওর মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই আর সেই

কারণেই ওই 'কোথায়' প্রশ্নটা বড়ো করে তুলে ধরেছে। শাওনার এই আহ্বানটুকু পাবার জন্য যেখানে অন্য ছেলেরা উন্মুখ হয়ে থাকে, সেখানে সে নিজেই বিমুখ হয়ে রয়েছে। অশোক আর পাঁচজনের থেকে আলাদা—এটা মেনে নিয়েও শাওনার একবার মনে হলো, ছেলেটা কি তাকে উপেক্ষা করছে? অশোককে তার ভালো লেগেছে এবং সেই কারণেই ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে চাইছে। এর মধ্যে হীনমন্যতার কোনও ব্যাপার নেই। সেখানে অশোক এমন ভাবে আপাতদৃষ্টিতে একটু রুক্ষ হয়ে থাকে যে ওকে ভুল বোঝার একটা সুযোগ হয়ে ওঠে। তবে শাওনা নিশ্চয়ই ওই পথে যাবে না। এটুকু সে বোঝে, ঠিক কাউকে উপেক্ষা করার জন্য ওই ধবনেব মুখোশ পরে থাকার ওর দরকার হয় না। ছেলেটা আসলে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চায়। শাওনার এই অনুমানটা হওয়ার পেছনে কারণ রয়েছে। প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চললো অশোক এখানে এসেছে। অথচ একটা দিনের জন্যেও সে অফিসার্স ক্লাবে যায়নি। অডিটোরিয়ামে শনিবার এবং ববিবার সিনেমা দেখানো হয়। অশোক যথারীতি সেখানেও অনুপস্থিত। এ-গুলোকে কী বলা যাবে? উপেক্ষা? ও-সব উপেক্ষা-টুপেক্ষা নয়, অশোক নিজেকে আড়ালে বাখতেই ভালোবাসে। একটু একটু করে ভাঙতে হবে সেই আড়ালে থাকার মানসিকতাকে।

শাওনা সুগভীর এক দৃষ্টি নিয়ে অশোকের চোখের দিকে তাকালো। বললো, কোথায় জিজ্ঞেস করছেন যে। জায়গার নাম না-জেনে বুঝি যাবেন না?

জায়গার নাম জেনেও তো না যেতে পারি।

সে স্বাধীনতা আপনার সব সময়েই থাকবে, তবে একজনের অনুরোধ না-রাখার অভদ্রতাটুকু আপনি করবেন কিনা সেটা আপনার ব্যাপার।

অনুরোধটা যদি অন্যায় হয় সেখানেও কি ভদ্রতার প্রশ্নটা থাকবে?

ওই সময়ে সেভেনথ অ্যাভিনিউ ধরে ও-পাশ থেকে দুটি মেয়ে পায়ে হেঁটে এদিকেই আসছিল। সামনে এলে দেখা গেল ওরা আব কেউ নয় অফিসেরই মেয়ে। জয়া খাদিলকার আর রজনী পাহাড়িয়া। ওদের সঙ্গে শাওনার যে-বন্ধুত্ব নেই ঠিক তা নয় তবে অফিস জায়গাটা এমনই এখানে কেউ কাউকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ভেতরে ভেতবে একটা চাপা ঈর্ষার প্রতিযোগিতা সব সময়েই কাজ করে। শাওনা ভেবেছিল সেই প্রথমে জয়া খাদিলকার এবং রজনী পাহাড়িয়ার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু ওদের সে খুব ভালো করেই চেনে। শাওনার দুর্বলতা ভেবে ওরা মনের সুখে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করবে। সেটা অবশ্য এমনিতেও করতে পারে। শাওনা ঠিক করলো কিছুতেই সে জয়া আব রজনীব সঙ্গে প্রথমে কথা বলবে না। ভাবটা এমন দেখাবে অশোকের সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত।

হ্যালো শাওনা। গাড়ির সামনে এসে জয়া একবাশ ফেনার মতো হাসি ছড়িয়ে দিল।

হ্যালো—ছোট্ট একটা শব্দের মধ্যেই শাওনার সৌজন্য দেখা গেল।

কাঁহা যা রহে হ্যায় আপ? রজনী জিজ্ঞাসা করার জন্যই যেন জিজ্ঞাসা করলো।

চাঁদা।

হামলোগ চলে? ঠোঁট টিপে হেসে জয়া প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

ম্যয়নে কব মানা কিয়া!

নেহি বাবা আভি নেহি যাউঙ্গা। এখন আমরা ক্লাবে যাচ্ছি—কথাটা শেষ করেই জয়া রজনীকে নিয়ে ওদেরকে পেছনে ফেলে ধীর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর? শাওনা কি এখনও সেই একই অনুরোধ বারবার করে যাবে? এবারে কিন্তু সত্যিই তার রুচিতে বাধছে। শাওনা যেন একটা ছেলের কাছে অসহায় আর খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষ যদি পৃথিবীর দিকে পিঠ দিয়ে থাকতে চায়, তার মুখ ফেরানোর জন্য কতো আর চেষ্টা করা যায়? ও ওর অন্তর্মুখী মন নিয়ে যে-ভাবে চলতে চায় চলুক।

কখন ফিরবেন, অশোকের ওই প্রশ্নটা শুনে শাওনা একটু ক্ষুণ্ণ হলো। ওই ধরনের প্রশ্নের কী যুক্তি থাকতে পারে? অশোকের এমন কোনও রাজকার্য পড়ে নেই সময় মতো না-ফিরলে বিশেষ

একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অফিসের কাজের পর তো হয় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছো নয়তো গেস্ট হাউসে পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছো। এই তো তোমার ভূমিকা। সেখানে কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন এতো কৈফিয়ত দিয়ে একটা মানুষকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানোয় সুখ নেই। যাই হোক অশোকের ওই প্রশ্নটার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। শাওনা বললো, একমাত্র অফিসে যাওয়ার সময় ছাড়া আমি সময়ের হিসেব করি না।

সময়ের হিসেব করে না-চললে কেউ বড়ো হতে পারে না।

যেমন আপনি বড়ো হতে চান—খোঁচাটা দেবো না দেবো না করেও শাওনা না-বলে থাকতে পারলো না।

আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি তো মরতে চাই! কথাটা বলেই অশোক গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো। শাওনার পাশে বসেই বললো, চাঁদা না কোথায় যাবেন বললেন চলুন। কিন্তু আমি না— শাওনা ওর মুখের দিকে তাকাতেই অশোক খুব সহজ গলায় বললো, আমার মানিব্যাগটা আনতে ভুলে গেছি। যদি কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হয়—

একটা পয়সাও দেবো না। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে শাওনা চমৎকার ভাবে হেসে উঠলো।

চাঁদা অর্থাৎ চন্দ্রপুরই এখানকার সবচেয়ে বড়ো শহর। বল্লারপুর থেকে মাত্র এগারো কিলোমিটার দূর। আঠারো থেকে কুড়িটা সিনেমা হলের জমজমাট এলাকার চেয়েও চন্দ্রপুর মূলত ব্যবসায়ীদের স্বর্গ। বিশেষ করে চাল, ডাল, গম, মশলা এবং কাঁচা সবজির। উন্নতমানের ওই সব জিনিসগুলোর জন্য নাগপুর, বোম্বাই পর্যন্ত চন্দ্রপুরের উপর ভরসা করে থাকে। শাওনার আজকে চাঁদা যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো মাসের বাজারটা করা। মা লিস্ট করে দিয়েছেন, ঘি, তেল, চাল, গম ইত্যাদি কতোটা কী আনতে হবে। প্রতি মাসের এই কাজটা শাওনার। বাবাকে যতোটা সম্ভব সে বিশ্রাম দিতে চায়। যাই হোক, চন্দ্রপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যটা জানাতেই অশোক বললো, পেপার মিলের শপ সেন্টারেই তো এ-সব পাওয়া যায়।

তা যায়।

তবে ওখান থেকে কেনেন না কেন?

শপ সেন্টারটা হলো জরুরি অবস্থার জন্য। যে-কোনও জিনিসের একটা করে মাত্র দোকান। শাওনা রাস্তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেও এক ফাঁকে অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, পছন্দের জিনিস কিনতে হলে আপনাকে চাঁদাতে আসতেই হবে। এখানকার প্রায় প্রত্যেকেই তাই করে।

চাঁদা শহরে ঢুকবার অনেক আগেই কারুকার্য করা এক বিশাল ঐতিহাসিক গেটের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে শাওনা পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশে বললো, এটা হলো বুন্দরাজার দুর্গ। আসলে এই দুর্গের মধ্যেই হচ্ছে চন্দ্রপুর শহরটা।

মায়ের সঙ্গে কম দিন অশোক এখানে আসেনি। যদিও সে-সব ছোটবেলাকার কথা। কিন্তু অশোকের স্মৃতিটা বড়ো প্রখর এবং উজ্জ্বল। আইসক্রিম খেতে খুব ভালোবাসতো ও। মায়ের সঙ্গে এলেই নির্দিষ্ট একটা দোকানের আইসক্রিম তার খাওয়া চাই-ই চাই। যাই হোক এই শহরটা তো তারও শহর। কিন্তু সে-কথা এখন শাওনাকে বলা যাবে না। পরিচয় না-থাকার মতোই অশোক উত্তর দিল, তাই বুঝি! ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে ও একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বুন্দরাজার দুর্গের দেওয়াল টেওয়াল দেখবার চেষ্টা করলো।

চিমনভাই যমুনাপ্রসাদের বিরাট দোকানে ঢুকে শাওনা মাসের লিস্টটা এগিয়ে দিতেই মালিক ওদের বসবার জন্য আপ্যায়ন করে বললো, কী খাবেন বলুন? চায়, কফি আউর ঠান্ডা পানি?

কিছু না। ছোট্ট উত্তরটা দিয়ে শাওনা নিজের হাতঘড়ির ওপর চোখ দুটোকে একবার বুলিয়ে নিয়ে বললো, আজ মেরা কাম জারা জলদি হোনা চাহিয়ে।

আধে ঘন্টে মে হো যায়েগা।

আমি তাহলে একটু ঘুরে আসছি। কুছ মার্কেটিং করনা হ্যায়।

শখ সে যাইয়ে আপ। আপকা সামান বিলকুল তৈয়ার রহেগা।

চিমনভাই যমুনাপ্রসাদের দোকান থেকে বেরিয়ে শাওনা গাড়ি নিল না। অশোককে সঙ্গে নিয়ে সামনের রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো। তিন-চারটে কাপড়ের শো-রুমে ঢুকে অবশেষে একটা দোকান থেকে মায়ের জন্য দু'খানা শাড়ি পছন্দ করলো। নিজের জন্য কিনলো এক জোড়া চটি আর বাবার জন্য ট্যোবাকো। শাওনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনার সিগারেট লাগবে না?

না, আছে।

লজ্জায় নিতে চাইছেন না? শাওনা মৃদু হাসলো।

তা কেন!

তাহলে নিতে আপত্তি কিসেব? শাওনার দুই চোখে খুশির ঝিলিক। সে দোকানদারকে পাঁচ প্যাকেট সিগারেটের অর্ডার দিতেই অশোক আপত্তি জানালো, অতো কী হবে? এক প্যাকেটই যথেষ্ট।

অতো কোথায় দেখছেন? শাওনা শান্ত গলায় বললো, পাঁচ প্যাকেট সিগারেট তো আপনার দুটো দিনের ব্যাপার।

আপনি কি সারা মাসেরটা দিতে চাইছেন?

নেবেন আপনি? শাওনা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হেসে উঠলো। তারপরেই উদাস গলায় বললো, আপনি মানুষটা বড়ো অদ্ভুত!

কী রকম? অশোক এবারে শাওনার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইলো, আমাকে কি খুব অসামাজিক বলে মনে হয়?

তেমনটা আমি বলতে চাই না। তবে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট অশোকের হাতে তুলে দিয়ে শাওনা ধীরগতিতে হাঁটা শুরু করলো। হাঁটতে হাঁটতেই এক সময় আবাব বললো, আমাদের অতো সুন্দর একটা অফিসার্স ক্লাব রয়েছে অথচ আপনি একটা মুহূর্তের জন্যও সেখানে যাননি। সপ্তাহে দু'দিন সিনেমা দেখানো হয়। আপনি অনুপস্থিত সেখানেও। অফিসের বাইরে কারো সঙ্গেই বিশেষ মেলামেশা করেন না। আমাদের বাড়িতে সেই প্রথম দিনের পর তো আর এলেনই না। অথচ মা-বাবা প্রায়ই বলেন, ছেলেটা খালি মুখে চলে গেল, আর তো এলো না। আর আমার কথা কী বলবো—আমি তো জোর করে আপনার সঙ্গে মিশছি।

এমনটা ভাববেন না। অশোক উদাত্ত গলায় ওই ছোট্ট কথাটা বলেই চুপ করে গেল।

তবে কী ভাববো? আপনি সকলের সঙ্গে মিশবার জন্য বিশেষ আগ্রহী?

না, তা নয়। তবে আমার সঙ্গে মিশলে কারো ভালো হয় না। অপরের দুর্ভাগ্যকে আমি কেন ডেকে আনবো বলুন? আমি তাই নিজের মতো করে থাকতে চাই।

শাওনা কোনও উত্তর না-দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। আসলে ও ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু ভেবে চলেছে। ভাবনার প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে করা যাবে কিনা সেটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। আর যাই হোক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে শাওনার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। অশোক যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে। কোনও কথায় আঘাত পেলে এই মুহূর্তে হয়তো তার মুখের ওপর কিছু বলবে না, নিঃশব্দে নিজেই সরে যাবে। শাওনা নিশ্চয়ই ওকে হারাতে চায় না। অশোক একটু আগেই বলেছে, 'আমার সঙ্গে মিশলে কারো ভালো হয় না।' এটা নিয়েই ওকে হাজারটা প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু তার চেয়েও যে-কথাটা ওকে সবার আগে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপনি নিজের ভালোই তো এখনও বুঝতে পারলেন না। নয়াদিল্লির ফ্রানসিস ইন্ডিয়াতে বত্রিশশো টাকার চাকরি ছেড়ে এখানে সাতাশশোতে কী করে জয়েন করলেন? এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কি কোনও মানুষ মেনে নিতে পারে? অথচ আপনি সেটাই করেছেন।

ও-সব নিয়ে ভাবাভাবি করা চলে কিন্তু একটিও প্রশ্ন করা চলে না। শাওনা করলোও না। শুধু বললো, চলুন কোথাও বসে একটু কিছু খেয়ে নিই।

প্লিজ আমি কিন্তু কিছুই খাবো না।

আপনার ক্ষিদে পায়নি?

খাওয়ার ইচ্ছেটা তেমন নেই। একটু থেমে অশোক এবারে বললো, আপনি খেয়ে নিন না—

বাড়ি গিয়েই খাবো।

চিমনভাই যমুনাপ্রসাদের দোকানে যাওয়ামাত্র ওরা মাসের বাজারটা গাড়ির ক্যারিয়ারে তুলে দিল। টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে শাওনা যখন চালকের আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল তখন ওকে অপরিচিত জগতের এক বাসিন্দা বলেই অশোকের মনে হলো। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কৈশোরের স্মৃতি বড়ো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়ে সূক্ষ্ম কয়েকটা আঁচড়ও যেন বিশাল ছবি হয়ে ওঠে। সেই আইসক্রিমের দোকানটা সামনেই পড়বে। মা একটা কিনে দিয়ে দোকানদারকে যতোক্ষণে পয়সা মিটিয়ে দিতে ব্যস্ত থাকতেন, ততোক্ষণে অশোকের খাওয়া শেষ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার নতুন বায়না, মা আরেকটা দাও। মহাশ্বেতা সেই বায়না মেটাতেন ঠিকই কিন্তু মুখে বলতেন সন্দীপ বেটে, আইসক্রিম ইতনা খানা ঠিক নেহি।

অশোক যেন জানে না—এমন ভঙ্গিমায় বলে উঠলো, এখানে আইসক্রিমের কোনও দোকান নেই?

কেন থাকবে না—ওই তো সামনেই। শাওনা সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দোকানের সামনে গাড়িটাকে পার্ক করলো। ছোট্ট অথচ খুব আন্তরিক ভাবে জিজ্ঞেস করলো, খাবেন?

চলুন—

দোকানে ঢুকে শাওনা দুটো আইসক্রিমের অর্ডার দিয়েছিল। অশোক কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাতে তাকাতে একটু অন্যরকম হয়ে উঠলো। ওর মুখটা হঠাৎ এতো করুণ আর অসহায় হয়ে উঠলো যে ভেতরের ব্যাপারটা না-বুঝলেও বাইরের এই পরিবর্তনটুকু শাওনাব দৃষ্টি এড়ালো না। ও অশোকের মুখের ওপর নিজের চোখ দুটো রেখে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

অশোক ক্রমশ আচ্ছন্নের এক শিথিল বেলাভূমিতে ডুবে যাচ্ছিলো। সে যেন অতি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তার মায়ের সেই কোমল কণ্ঠস্বব, 'সন্দীপ বেটে, আইসক্রিম ইতনা খানা ঠিক নেহি।' অশোক আর্ত শিশুর মতো শাওনার চোখের দিকে তাকালো। অস্ফুট স্বরে বললো, চলুন, আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে না। কথাটা বলে অশোক একমুহূর্ত ওখানে দাঁড়ালো না। দোকান থেকে প্রায় ছুটে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

শাওনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর পেছন পেছন ফিরে এলো। গাড়িতে বসেই ও স্টার্ট দিল না। অশোকের দিকে তাকালো। ছেলেটা তখনও মাথা নিচু করে একটা পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে রয়েছে। ওর ভেতরে নিশ্চয়ই একটা তোলপাড় চলছে কিন্তু সেটা কী কারণে তা জানা শাওনার পক্ষে কেমন করে সম্ভব? অতিরিক্ত প্রশ্নের বেড়াজালে কাউকে অস্বস্তিতে ফেলাটাও ঠিক নয়। সে যখন নিজে থেকে কিছু বলছে না তখন একটা মানুষকে শুধু শুধু বিব্রত করা কেন? শাওনা পরম মমতায় বাঁ হাতখানা অশোকের পিঠে রেখে একান্ত প্রিয়জনের উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী শরীর খারাপ লাগছে?

হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠলো।

সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকুন। মাথা নিচু করে রয়েছেন কেন? তাছাড়া—শাওনা থেমে গেল। কী যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললো, তার আগে একজন ডাক্তারের কাছে চলুন।

না-না, আমি ঠিক আছি।

গাড়ি তখন বৃন্দরাজার গেট পার হয়ে বল্লারপুরের দিকে ছুটে চলেছে। দুজনের কেউই এতোক্ষণ খুব বেশি একটা কথা বলেনি। অশোক সেই সময়ে একটা সিগারেট ধরাতেই শাওনা যে-কথাটা বলবো বলবো করছিল সেটা বলেই ফেললো, এতো সিগারেট খাওয়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?

অশোক ব্যাপারটা যে বুঝলো না তা নয়। শাওনা একটু মার্জিত ভাষায় স্বাস্থ্যের উল্লেখ-টুল্লেখ করেছে। আসলে ওর বলার উদ্দেশ্য হলো এই সিগারেট থেকেই নানা ধরনের রোগ-ভোগ শুরু হয়। যাই হোক শাওনা যেটা বলতে পারলো না সেটা অশোকই বলে ফেললো, কী হবে? ক্যান্সার?

আমি বুঝি সে-কথা বললাম?

আমার হোক সেটা হয়তো বলতে চাননি—তবে বেশি সিগারেট খেলে ওই রোগটা হওয়ার আশঙ্কাটুকু প্রকাশ করেছেন তাই না। নিঃসঙ্কোচে অশোক বলতে লাগলো, ক্যান্সারে যারা মারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই সিগারেট স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। ওটা কোনও ব্যাপার নয়, তবে মরতে আমার ভয় নেই। শেষ শয্যার জন্য একদিন তো জমি নিতেই হবে।

বাচ্চাবাচ্চা ছেলেরা যখন ত্রিকালদর্শী বুড়োর মতো দার্শনিক ঢংয়ে কথাবার্তা বলে আমার তখন খুব বিচ্ছিরি লাগে।

আমাকে আপনি কি এতোটাই বাচ্চা ভাবছেন? অশোক শাওনার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। গাড়ি চালাবার জন্য ওকে সামনে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। এখন আর দিনের আলোর শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নেই। চারদিকের রীতিমতো জমাট অন্ধকারের মধ্যে ওকে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে হেডলাইট জ্বালিয়ে কিছু গাড়ির ছোটাছুটি এবং নিজের গাড়ির আলোতেই পথ চিনে এগোতে হচ্ছে। সতর্কতা সবার প্রথমে। সুতরাং শাওনা অশোকের মুখের দিকে না-তাকিয়েও বুঝতে পারছে ও তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। সে শুধু জিজ্ঞেস করলো, আমি কী খুব একটা ভুল বলেছি?

দূর থেকে পেপার মিলের এলাকাটা চোখে পড়লো। আলোর ঝলকানিতে মনে হয় ওটা বুঝি আলোরই শহর। ফ্লুরেনসিভ আলোর দ্যুতিতে কোয়ার্টারগুলোকে চমৎকার দেখাচ্ছে। রাস্তা থেকে ওই এলাকাটা বেশ কিছুটা উঁচুতে অবস্থানের জন্য আরও ছবির মতো লাগছে। মনে হয় বল্লারপুরটা যেন একটা শৈল শহর। দীঘল দীঘল গাছের সারিগুলো ওই শৈল শহরকে অনেক বেশি সৌন্দর্য দেবার জন্য পরস্পর পরস্পবের গা ঘেঁষে ঘন হয়ে রয়েছে।

পেপার মিলের ছয় নম্বর গেট দিয়ে কলোনীর ভেতরে ঢোকাব পরেই অশোক বললো, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।

আমাদের বাড়ি যাবেন না?

আজ থাক।

শাওনা আর বেশি জোরাজুরি করলো না। শুধু বললো, গেস্ট হাউসে ফিরবেন তো? তাহলে এখানে কেন নামবেন? চলুন, আপনাকে গেস্ট হাউসের সামনেই নামিয়ে দিয়ে আসি।

গাড়ি থেকে নেমে অশোক যখন দু'পা এগিয়ে গেছে শাওনা আত্মভোলা ওই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই একটু হেসে উঠলো। মিহি গলায় একবার বললো, অশোকজি গুডনাইট।

পেছন থেকে ভেসে আসা কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালো অশোক। সামনে ফিরে গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু নিচু হয়ে শাওনার মুখের ওপর চোখ রেখে মৃদু সুরে উত্তর দিল, গুড নাইট। তারপরেই মুহূর্ত দেরি না-করে গেস্ট হাউসের দিকে পা বাড়ালো।

নিজের ঘরে ঢুকে অশোক বিছানার ওপর শুয়ে প্রথমেই যে-কথাটা ভাবলো তা হলো আজকের দিনটা তার নষ্ট হলো। কেন-না চুনীলাল জয়াকরের সঙ্গে দেখা করাটাই তার অত্যন্ত জরুরি ছিল। অথচ সেটাই আজ হলো না। আগামীকাল অফিস থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ ছুটির পর সে গেস্ট হাউসে ফিরবে না। সোজা চলে যাবে কোন্ডকুঁয়া গ্রামে।

চুনীলাল জয়াকর অর্থাৎ চাচাজি বেঁচে আছে কি নেই—অশোক যখন এই চিন্তাতেই নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে ঠিক তখন ওকে নিয়েও আলাপ-আলোচনায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন চেয়ারম্যান গোপীমোহন পার্থসারথি। অফিস থেকে নিজের বাংলোয় ফিরে এসেছেন প্রায় ঘন্টাখানেক হতে চললো। সামান্য কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে ঝরঝরে হয়ে, ঢিলে-ঢোলা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে এইবারে তিনি আসল বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সময়ে তিনি একটু ড্রিঙ্ক করেন। তবে একা নন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী সুষমা তাঁকে পুরোপুরি সঙ্গ দেন। ওই মুহূর্তে তাঁরা নিজেদের মধ্যে একান্ত আলোচনায় মেতে ওঠেন।

চমৎকার কারুকার্যপূর্ণ স্বচ্ছ রঙিন গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক বসিয়ে গোপীমোহন সুষমার দিকে তাকালেন। ওঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চললো, কিন্তু কারো সেটা বুঝবার উপায় নেই। সুষমাকে দেখলে চল্লিশের বেশি মনেই হয় না। সুষমার বাবা বি. ডি. গোপীনাথ এই কোম্পানির চেয়ারম্যান

ছিলেন। সেই সময়ে আজকের চেয়ারম্যান গোপীমোহন পার্থসারথি ছিলেন পেপারমিলের পাওয়ার প্ল্যান্টের সুপারিনটেনডেন্ট। একটা পার্টিতে গোপীমোহন সুষমাকে প্রথম দেখেন। প্রথম আলাপ থেকেই জন্ম নেয় একরাশ উচ্ছ্বাস আর আবেগ নিয়ে রহস্যের এপার থেকে ওপারের আরও গভীর রহস্যের সন্ধানে যাবার আকুল আমন্ত্রণ! না, সেই দিনগুলোতে গোপীমোহন পার্থসারথি একবারের জন্যেও তাঁর স্ত্রী মহাশ্বেতা এবং পুত্র সন্দীপের কথা চিন্তা করেননি। সুষমা তখন তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

সেই সুষমাই এখন তাঁর স্ত্রী হয়ে পাশে বসে ড্রিঙ্ক করছেন। মদ খাওয়াটা সুষমার কাছে নতুন কোনও ব্যাপার নয়। বিয়ের আগে থেকেই তিনি অভ্যস্ত। তবে কখনওই সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে অশোভনীয়তার পর্যায়ে চলে যান না। সেদিক দিয়ে তাঁর একটা হিসেব আছে।

টেবিলের ওপব গেলাসটা রেখে সুষমা হাত-পা ছড়িয়ে অত্যন্ত শিথিলভাবে আরামকেদারাটাব মধ্যে নিজেকে মেলে দিলেন। গোপীমোহন বললেন, তুমি যাই বলো সুষমা, এ-গুলোকে পাগলের কর্মকান্ড ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

তোমাব কাছে যেটা পাগলের কর্মকান্ড আরেকজনের কাছে সেটাই হয়তো সুস্থতার লক্ষণ।

তা কী করে হয়? বেসিক যে-ব্যাপার-স্যাপারগুলো রয়েছে তার বাইবে তুমি যাও কী করে? আমরা সবাই স্নান করে ভাত-রুটি খাই এখন খাওয়া-দাওয়াব পর তুমি স্নান করাটাকে স্বাভাবিক ব্যাপাব বলবে? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গোপীমোহন একটু থেমেই আবার বললেন, একটা মানুষের জীবনে বিশেষ করে একজন ইয়াংম্যানের পক্ষে সারাদিনের অফিসের পর ক্লাবে গিয়ে কি একটু রিক্রিয়েশনের প্রয়োজন হয় না? অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি অশোক লাহিড়ি নামের ছেলেটা ও-সবের ধার দিয়েও যায় না। তুমি জানো, এই তিন সপ্তাহের মধ্যে ও একটা দিনের জন্যেও ক্লাবে যায়নি। অডিটোবিয়ামে আসেনি একটা সিনেমা দেখতেও। কতো বলবো তোমাকে? আমাদের মিনিবাস এবং গাড়ি বিভিন্ন অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে অফিসে পৌঁছে দেয় এবং নিয়ে আসে। তুমি জানো অশোক সে-গুলোও ব্যবহার করে না। সকাল এবং বিকেলের কথা ছেড়ে দাও, লাঞ্চের সময় দুপুরের ওই কড়া রোদের মধ্যেও সে হেঁটে যাতায়াত করে। গেস্ট হাউস থেকে অফিস মাত্র আট মিনিটের পথ সুতরাং গাড়ির প্রয়োজন নেই—এটা কি একটা যুক্তি হলো? সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো তুমি কোম্পানির ও. এস. ডি। তোমার না-থাক, কোম্পানিব তো একটা সম্মান রয়েছে আর এই কাজগুলোকে যে তুমি কী করে সুস্থতার লক্ষণ বলছো সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

কে একজন ছেলে গাড়ি করে অফিস যায় না, ক্লাবে গিয়ে ক্যারামবোর্ডের ঘুঁটিগুলোকে দৌড়াদৌড়ি করায় না, সিনেমা দেখে না, তা নিয়ে এতো ভাবছো কেন? এ-সব কি একজন চেয়ারম্যানেব চিন্তা? ছোট্ট একটা চুমুক বসিয়ে গেলাসটাকে আবার টেবিলের ওপর রেখে সুষমা স্বামীকে সরাসরি আক্রমণ করলেন।

চেয়ারম্যানের চিন্তা নয়। একজন মানুষ হিসেবে অপর একজন মানুষের কাজের মধ্যে স্বাভাবিকতার লক্ষণ রয়েছে কী নেই সেটা দেখবো না?

সেজন্য কী ওর পার্সোনাল ব্যাপারেও তুমি মাথা গলাবে?

সুষমা তুমি একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী মহিলা হয়েও কেমন করে এ-কথা বলছো সেটাও আমি বুঝতে পারছি না। প্রায় হতাশার সুরেই গোপীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন, এরপর অশোক একদিন খালি গায়ে অফিসে এসে বলবে এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। তুমি তো এটাই বলতে চাইছো?

সত্যি তুমিও ভারী ছেলেমানুষ হয়ে উঠছো। সুষমা এবারে স্বামীর কথায় খোলামেলা এক হাসি ছড়িয়ে বললেন, অশোকের ব্যাপারে দিনদিন তোমার বোধহয় একটা এলার্জি জন্মে যাচ্ছে, নয়তো বাচ্চাদের মতো ঠিক এই ধরনের একটা উপমা তুমি টানতে না। গেলাসে পরপর দুটো চুমুক দিয়ে সুষমা বললেন, ভালো কথা, ছেলেটা অফিসের কাজকর্ম কেমন করছে?

ত্রুটিহীন।

তাহলে?

চিন্তাটা তো সেই কারণেই সুষমা—গোপীমোহন পার্থসারথি বললেন, অফিসের ওই গুরুদায়িত্বের কাজকর্ম অশোক লাহিড়ি যে কী চমৎকার দক্ষতায় করছে সে তুমি না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রবলেম অসাধারণ তৎপরতায় সে সলভ করে দিচ্ছে। আমার প্রশ্নটা ঠিক এইখানেই সুষমা, এতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা নিয়ে অশোক অফিসে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে অথচ কোম্পানির বাইরে তার কাজকর্মগুলো যথেষ্ট সমালোচনার ব্যাপার। আমি শুনেছি সে নাকি একা একা ঘুরে বেড়ায়। কেন? পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করো, বন্ধুত্ব করো! একই লোকের বিপরীত দুই মেরুতে থাকাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

সে যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব না-চায়, তুমি কি ওকে নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে জোর করে বন্ধুত্ব করাবে? আমার মনে হয় তুমি একটা অসম্ভবের পেছনে ছুটতে চাইছো। যে-যার মতো থাকতে চায় থাকুক না—

ওয়েল সুষমা, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। গেলাসের শেষটুকু একচুমুকে শেষ করে গোপীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কী আর একটু দেবে?

দিতাম। তবে আজকে আর দেবো না।

আমার এই সাজার কারণ?

যেহেতু তুমি এই চমৎকার সময়টা তোমার অফিসের কে এক অশোক লাহিড়ির আলোচনাতে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করেছো। আমি আজ কি পেলাম?

এই কথা! সাতান্ন বছরের তরুণ গোপীমোহন পার্থসারথি আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সামান্য ঝুঁকে সুষমাকে টেনে নিলেন নিজের বুকের কাছে। ওঁর মাথায়, কানের নীচে, গলায় এবং সবার শেষে ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁটখানা রেখে মিনিট তিনেক সময় মৌনতার মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। পরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কী পাওনি সুষমা?

পেয়েছি। অনেক পেয়েছি। আদর খেতে খেতে উনপঞ্চাশ বছরের সুষমার শরীরে ফাগুনের আভা লাগলো। তিনি আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, তোমার কাছে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তুমি আমাকে যথেষ্ট দিয়েছো।

তুমিও আমাকে কম দাওনি। সুষমার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে গোপীমোহন বললেন, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!

পরদিন অফিসে যেতেই শাওনা মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করলো। দু-একজন ওর দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ এক হাসি ছড়িয়েও চলে গেল। পরে একটু একটু করে আকারে ইঙ্গিতে তার কানেও পৌঁছে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। গতকাল বিকেলে অশোককে গাড়িতে তুলে নেওয়ার ঘটনাটাকেই বেশ কিছুটা আকর্ষণীয় চেহারায় রূপ দিয়ে জয়া খাদিলকার এবং রঞ্জনী পাহাড়িয়া মেয়ে মহলে সেটার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

শাওনা সিং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কোন ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত আর কোনটার নয় সেটা একটু ভালোই বোঝে। অফিসে এমন রটনা হয়েই থাকে। প্রতিবাদ করার জন্য দৌড়তে নেই। সামান্য একটু মুচকি হেসে সরে যাও। এ-সব নোংরা ছড়াবার জন্য নোংরামি করবার জন্য একশ্রেণীর মানুষ থাকবেই। তোমাকে একটু সজাগ থাকতে হবে। কেন-না ওরা এতোই দুর্বল যে তোমার সামনে কখনও গলা উঁচু করে কিছু বলবে না। তোমার নৈতিক জয় তো সেখানেই। সেই বিশ্বাসেই উদ্বুদ্ধ হলো শাওনা। পেছন থেকে কেউ যদি চিৎকার করে তাকে থামাবার দায়িত্ব তার নয়। ওটা যার যার স্বভাব।

শাওনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীনা ঘাই। নীনা নিজেও সিনিয়র অফিসার। সেই ওকে কাছে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, ক্যায়া কিয়া তুমনে? অশোকজি নাকি তোর গাড়িতে উঠবে না আর তুই তাকে তুলবিই। ইতনা মেহনত কা জরুরত কীস লিয়ে? লাভ টাভ চল রহে হ্যায়

ক্যয়া? প্রশ্রয় দেবার সুরেই নীনা হাসলো, লেড়কা বিলকুল এক নম্বরকা।

আমাকে জিজ্ঞাসা করার নাম করে তুই বলতে বাকিটা কী বাখলি? শাওনা হাসির আলো ছড়িয়ে বললো, অশোকজি একনম্বর ইয়া দো নম্বর ম্যয়নে পুছা কভি তুমকো?

আমাকে কেন কথা শোনাচ্ছিস? নীনা গলাটাকে আরও নীচে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললো, জয়া খাদিলকার আর রজনী পাহাড়িয়া এসে জানালো, শাওনা সিং অশোকজিকে কব্জা করবেই। গাড়ি-টাড়ি চড়াচ্ছে খুব। তবে মুশকিল হলো ছেলেটা সুন্দরী শাওনার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

শাওনা কিন্তু এতোটুকু রাগলো না। সূক্ষ্ম এতো হতাশা থেকে ওরা যদি এমন ধরনের কথা বলেই থাকে সেখানে করুণা ছাড়া আর কী হতে পারে? 'ছেলেটা সুন্দরী শাওনার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।' এটা বলার মধ্যে ওদের কোন মানসিকতা কাজ করছে সেটা তো অস্পষ্ট নয়। এটুকু কাল্পনিক আনন্দ যদি জয়া খাদিলকার আর রজনী পাহাড়িযা বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে এক মিথ্যে সুখ পেতে চায় সেখানে ওদের জন্য কষ্ট হওয়ারই কথা। শাওনা কেন ছোট হবে? সে ওদের এ-নিয়ে একটা কথাও বলবে না। বরং আগের মতোই জয়া আর রজনীর সঙ্গে মিশবে। এরপরেও হিংসার ক্ষত নিয়ে সহজ সম্পর্ককে দূষিত করার জন্য ওরা অন্যরকম খেলার মেতে উঠতে চায় তাতে ওদেরই কুরুচিপূর্ণ মনের নগ্ন ছবিটাই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। শাওনার কোথাও কিছুমাত্র হারাবার কোনও ব্যাপার নেই। সুতরাং সে কেন মধ্যে থেকে অহেতুক উত্তেজিত হয়ে উঠবে? শাওনার মানসিক স্তর সম্পূর্ণ অন্যরকম। চাপের মুখেও সহজ, শান্ত এবং স্বাভাবিক থাকাটাই বড়ো কথা। সেই সঙ্গে কিছুটা উদারতাও। শাওনার মধ্যে ওই গুণগুলো একটু বেশি পরিমাণেই রয়েছে। প্রত্যেকদিন গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ করে সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে ওঠাই শুধু নয়, এই পৃথিবীর সামান্য মলিনতাও শাওনাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

চেয়ারম্যান সেদিনই হঠাৎ লাঞ্চের পর অশোককে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। যথানিয়মে ডাকটা পি. এ শাওনা সিং-এর মাধ্যমেই গিয়েছিল। অশোকের টেবিলে তখন বিভিন্ন ফাইল এবং বেশ কিছু জরুরি চিঠিপত্র খোলামেলা অবস্থায় সামনে ছড়িয়ে ছিল। সে খুব মন দিয়ে এতোক্ষণ পড়ছিল। ফোন পেয়ে সে-গুলোকে একটু গুছিয়ে নিয়ে চেয়ারম্যানের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

গোপীমোহন পার্থসারথি তাঁর ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে কিছু কাগজপত্রের ওপর চোখ দুটোকে স্থির করে ধরে রেখেছিলেন। প্রায় মুখোমুখি ডানপাশের একটা চেয়ারে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিল শাওনা। অশোক ঘরে ঢুকতেই গোপীমোহন একবার চোখ তুলে বললেন, বসুন।

কোনওদিকে না-তাকিয়ে অশোক মাথা নিচু করে সম্ভবত মিনিট দেড়েক সময় মৌনতার প্রহর গুনতে-না-গুনতেই চেয়ারম্যান গোপীমোহন পার্থসারথি আরও যেন গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন, আপনাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দেবার জন্য ডেকেছি। ব্যাপারটা যদিও জানাজানি হয়ে যাবে, কেন-না জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু-একজনের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতেই হবে তবুও জিনিসটা যতো গোপন রাখতে পারেন সেদিকটাও দেখবেন।

আসল ব্যাপারটা তখনও ভাঙছেন না-দেখে অশোক কোনওরকম প্রশ্ন তুললো না। সে এক দৃষ্টিতে শুধু গোপীমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে যখন ডাকা হয়েছে তখন সে নিশ্চিত যে ঘটনাটা জানতে পারবেই। ওই লোকটার সঙ্গে যতো কম কথা বলা যায় ততোই ভালো। গোপীমোহন পার্থসারথি হঠাৎ টেবিলের ওপর সামান্য ঝুঁকে গলা নিচু করে বললেন, আপনি এখানে আসার সপ্তাহখানেক আগের ঘটনা এটা। সাধারণত এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উৎকৃষ্ট মানের পেপার তৈরি হয়। তবে সুপার ফাইন কোয়ালিটির পেপার তৈরি হয় জগাধারীতে। ওটাকে আমরা সুপ্রীম ওয়ান বলি। ওই সুপ্রীম ওয়ান পেপারটা আমি এই বল্লারপুরেও তৈরি করার নির্দেশ দিই। সেই অনুযায়ী মেসিন এবং ওই ধরনের পেপার তৈরি জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রও এসে যায়। অথচ মন্ডা পাকানো সেই জলের ধারা স্টীমে শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে যে-কাগজটা তৈরি হয়ে বেরুলো সেটাকে কখনওই সুপ্রীম ওয়ান বলা চলে না। কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকার পর গোপীমোহন আবার বললেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে আমাকে যে-রিপোর্ট দেওয়া হলো তাতে আমি মোটে সন্তুষ্ট

হতে পারলাম না। আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধলো। জগাধারী থেকে কিছু এক্সপার্ট আনিয়ে এবং শিফট ইঞ্জিনীয়ার থাকা সত্ত্বেও বিক্রম পরাশর নামে বাড়তি অপর একজন শিফট ইঞ্জিনীয়ারকে ওখানে রেখে স্কিমটা আবার চালু করি। এবং মজার ব্যাপারটা হলো, এবাবে আর কোনওরকম ভুল-টুল হলো না। ঠিক ঠিক কাগজ অর্থাৎ সুপ্রীম ওয়ানই তৈরি হলো। আপনাকে ডাকার উদ্দেশ্য হলো আগের বারে ওই কোয়ালিটির কাগজ তৈরি হয়নি কেন? এটা একটু গোপনে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। আপনি যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেটা যেন কখনওই জেরা করার ভঙ্গি মায় না-হয়। খুব সন্তর্পণে যেন কথা প্রসঙ্গেই কথার বিনিময় হচ্ছে এমন ভাবে আপনাকে—

ওটা আমার ব্যাপার। অশোক প্রত্যয়ের সুরে শুধু বললো, আপনি কতো দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেতে চাইছেন?

এক মাসের মধ্যে দিতে পারলেই ভালো হয়। গোপীমোহন পার্থসারথি আরও একটু যোগ করলেন, আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে আপনি আমাদের শিফট ইঞ্জিনীয়ার বিক্রম পরাশরের সাহায্য পেতে পারেন। সুতরাং ওর সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখবেন।

অশোক চেয়ারম্যানের ঘর থেকে চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পরেই শাওনাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নিজের আসনের দিকে না-গিয়ে সে সোজা অশোকের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আর ঠিক তখনই যার মুখোমুখি হলো সে মেয়েটি আব কেউ নয় স্বয়ং জয়া খাদিলকাব। ও একটা ফাইল নিয়ে এদিকেই আসছিল। জয়া একগাল হাসলো। ওর চোখে চোখ রেখে ইঙ্গিতপূর্ণ অথচ দারুণ মোলায়েম হাসি হেসে শাওনা কোমল সুরে বললো, এই একটু অশোকজির ঘবে ঢুকছি।

ব্যাপারটা মন্দিরে ঢোকার মতোই পবিত্র কাজ তাই না? জয়াও সমান হেসে উত্তর দিল, বেশি করে পূণ্য সঞ্চয় করে নাও—

কী করবো বলো—শুভ্রতা এবং নম্রতার উজ্জ্বল হাসি শাওনার দুই ঠোটে। খানিকটা বিনয়েব সঙ্গেই বললো, আমি যে একটু বেশিই সুযোগ পাচ্ছি।

সেই সঙ্গে তার সদব্যবহারও!

তা বলতে পারো।

ওই ধরনের হালকা মেজাজের গল্প আরও কিছুক্ষণ করার ইচ্ছে ছিল জয়া খাদিলকারের। কিন্তু শাওনার সে-উপায় নেই। ভদ্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সে বললো, এবারে আমাকে ছেড়ে দাও ভাই। দেরি হচ্ছে দেখে সাহেব রাগ করতে পারেন। কথাটা শেষ করেই শাওনা অশোকের ঘরের দরজা ঠেলে মুখ বাড়ালো, আসছি।

আসুন। অশোক জিজ্ঞেস করলো, আরও কিছু জানাবার আছে? ওই প্রশ্নটা করার কারণ চেয়ারম্যানের ঘর ছেড়ে চলে আসার সময় অশোককে বিশেষ করে বলা হয়েছিল, 'আপনার কোনও বিষয়ে জানবার প্রয়োজন হলে মিস শাওনা সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সব কিছু জেনে নিতে পারেন।' এখন তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে তার প্রয়োজনের আগেই শাওনা সিং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘরে এসে উপস্থিত। এমনিতে শাওনা সিং তার ঘরে আসতেই পারে কিন্তু চেয়ারম্যানের ঘরে মিটিংয়ের পরমুহূর্তেই তার কাছে আসার একটাই অর্থ, চেয়ারম্যানের নিশ্চয়ই আরও কিছু নির্দেশ আছে।

শাওনার ব্যঞ্জনাময় দুই চোখে নীলাঞ্জন ছায়া। ওয়াটারপ্রুফ ল্যাস মাস্‌করা ওর আঁখিপল্লবকে ঘন করে রয়েছে। গভীর কাজলের ছোঁয়ায় ওকে শিশিরের মতো ভেজা এবং নরম দেখাচ্ছে। ওই দৃষ্টিতেই শাওনা অশোকের দিকে তাকিয়ে থেকে অপরূপ এক হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে বসতে বলবেন না?

এতে বলাবলির কী আছে? আপনার ঘরে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকবো না?

তাহলেও মেয়েদের তো একটু সম্মান দেখাতেই হয়। শাওনার শান্ত হাসিতে অশোক একটু বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আপনি অনুগ্রহ করে বসুন।

সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর শাওনা গলাটাকে বেশ কিছুটা নামিয়ে এনে বললো, এবারে আসল

কথায় আসা যাক। চেয়ারম্যানের ওই স্কিমটাকে এগোতে না-দেবার জন্য ওঁর বিপক্ষে একটা চক্র রয়েছে। চেয়ারম্যান কিছু ভালো করুন—এটা তাঁরা চান না। আর ওই বিপক্ষ গ্রুপের প্রধান হচ্ছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ মনীষ পুরি এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার মিঃ ভানুদেব হান্ডা। চেয়ারম্যানের সঙ্কোচ হচ্ছিলো আপনাকে নিজের মুখে এ-সব বলতে। তাই আমাকেই আসতে হলো।

কোনও প্রমাণ আছে কী?

তা কী করে থাকবে? শাওনা একই রকম সুরে বলতে লাগলো, ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার নিশ্চয়ই এতোটা বোকা কাজ করবেন না। এটা শুধু অনুভব করা যায় যে ওঁদের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। সেই সূত্রগুলো তো আপনাকেই বের করতে হবে। আপনার তদন্তে যাতে সুবিধে হয় আমি তাই এই নামগুলো জানিয়ে রাখলাম। শাওনা চুপ করে আছে দেখে, অশোক জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু বললেন?

অফিসের কথা আপাততো আর নয়। শাওনা একটু ইতস্তত করে বললো, মা বলছিলেন—

বলুন।

কাল আপনাকে নিয়ে চাঁদায় বাজার করতে গিয়েছিলাম, অথচ বাড়িতে না-নিয়ে পথেই বিদায় দিয়েছি জেনে মা ভীষণ রাগারাগি করছিলেন। তাছাড়া প্রথমদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনি কিছুই মুখে দেননি—মা-র একটা সংস্কারে ওই ব্যাপারটাও খুবই নাড়া দিয়েছে। আপনিও এরমধ্যে আর আমাদের বাড়িত গেলেন না। সুতরাং বিকেলে গিয়ে মায়ের হাতের তৈরি সিমুয়েব পায়েস এবং পুডিং খেতেই হবে।

কিন্তু—অশোকের সারা মুখে চিন্তার ছায়া। আজ নয় কাল নয় করে সে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই চাচাজির খোঁজটা নেওয়া হচ্ছে না। অথচ কোন্ডকুঁয়া গ্রাম এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূর। চুনীলাল জয়াকরের সঙ্গে তাকে একবার দেখা করতেই হবে। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কী লাভ?

অনুরোধটা কিন্তু আমার নয়। অশোকের যাওয়াটাকে নিশ্চিত করতে শাওনা নরম গলায় বললো, মা খুব আশা করে থাকবেন। তারপরেই এক প্রচ্ছন্ন অভিমানেব সুবে আরও জানালো আমার কথায় যে আপনি যাবেন না আমি তা জানি।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অশোক ভেতরের এক যন্ত্রণায় জর্জবিত হয়েও কিছুই বলতে পারলো না। আসলে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে এসেছে সে-কাজে সফল তাকে হতেই হবে। আর সফল হলে আইনের চোখে অশোকের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। তার জন্য সে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। মাযের জন্য এই জীবনটা তাকে উৎসর্গ করতেই হবে এবং অশোকও নিজেকে মানসিক দিক দিয়ে সে-ভাবেই তৈরি করেছে। জীবনের অন্য যে-রূপ রস এবং গন্ধ তা তার কাছে বর্ণহীন, মূল্যহীন। সে-সবের ওপর অশোকের কোনও আকর্ষণই নেই। নয়তো শাওনা সিং-এর মতো চমৎকার সৌন্দর্যময়ীর সঙ্গে তার জীবনটা অনন্য এক রূপ পেতে পারতো। শুধু শুধু দু'দিনের জন্য মেলামেশা করে একটা মেয়ের কোমল মনকে ক্ষতবিক্ষত করার ছেলেমানুষি তার মতো একজন সচেতন ছেলেকে কিছুতেই মানায় না। অশোকের সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে, কাউকে তো মুখ ফুটে কিছু বলা যাচ্ছে না। অথচ প্রত্যেকেই তাকে অভদ্রই ভেবে চলেছে। বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে অশোকের সেই কারণে আপত্তি, যাওয়ার আগে কিছু মানুষকে কাঁদানোর অধিকার তার নিশ্চয় নেই। কেউ যদি তাকে ভুল বোঝে কি করা যাবে! অশোক একটু দ্বিধার সঙ্গে বললো, আজকে বিকেলেই আমার একটা বিশেষ কাজ রয়েছে। সেখানে যেতেই হবে।

কখন ফিরবেন?

আজকে তো আমাদের দুটোয় ছুটি— অশোক কয়েক সেকেন্ড চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিল, ফিরতে ফিরতে সাতটা, সাড়ে-সাতটা হবে।

তখনই না-হয় যাবেন।

আপনারা তো ক্লাবে সিনেমা দেখতে যাবেন?

না-হয় আজকে যাবো না। শাওনার স্থির সিদ্ধান্ত শুনে অশোকেরই খারাপ লাগছে। ওদের বাড়িতে যাতে না-যাওয়া হয় তার জন্য অনেক রকমের বাধা বা অসুবিধের প্রাচীব তুলেও সে কোনও সমস্যাই তৈরি করতে পারলো না। শাওনা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আর একবার জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সাতটা, সাড়ে-সাতটার মধ্যে আসছেন তো?

অশোককে বলতেই হলো, আসবো।

শাওনা চলে যাওয়ার পর অশোককে নতুন করে আবার সব কিছু ভেবে দেখতে হচ্ছে। এই মেয়েটি অক্টোপাশের মতো তাকে একটু একটু করে নিজের দিকে টানতে চাইছে। ব্যাপারটা অশোক বোঝে। কিন্তু সাড়া দেওয়াটা তার পক্ষে খুবই কঠিন। শাওনায় মতো শিশিরে ভেজা নরম মেয়েটাকে কষ্ট দিতে তারও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুর সময়ে অশোকের মায়ের কষ্টটা আরও অনেক বেশি হয়েছিল। সেখানেই সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার ব্যক্তিগত সুখী গৃহকোণের কল্পনার রঙিন ছবি কোথাও আঁকা নেই। অশোকের দু'চোখে সেই স্বপ্নও কখনও নামেনি। শাওনার কোমল চাউনি মনকে স্নিগ্ধ করে ঠিক কথা, কিন্তু এতোদিনের প্রতিজ্ঞাকে কিছুতেই টলাতে পারে না। এরপরে ওর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে অশোককে আরও রুক্ষ হতে হবে। যে-কঠিন এবং কর্তব্যের পথে তাকে যেতে হবে সেখানে আর যাই হোক ভালোবাসার কোনও স্থান নেই।

অশোকের ঘরে এইমাত্র যে-ছেলেটি এসে একটা চেয়ার দখল করে বসলো তার নাম বিক্রম পরাশর। ওই শিফট ইঞ্জিনীয়ারের নেতৃত্বেই এখানে সুপ্রীম ওয়ান পেপারটা তৈরি হয়েছে। শপ সেন্টাবের পান-সিগাবেটের দোকানে অপর দুটি ছেলের সঙ্গে অশোক ওকেও দেখেছিল। এই ছেলেটিই তার ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অশোক ওর নাকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। ওদের যখন এগারো বছরের মতো বয়স তখনকার ঘটনা। ওরা সব বন্ধুরা মিলে কাবাডি খেলছিল। বিক্রমকে জাপটে ধরতেই ও ওর কোর্টে যাবার জন্য মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন ওকে নিয়ে যে-টানাটানি চলেছিল সে-সময়েই মাটিতে কোথাও কাচের একটা টুকরোয় ওর নাকের ওপর সরু সুতোর মতো বেশ খানিকটা কেটে যায়। প্রচুর রক্ত পড়ছিল, ক্ষতও একদিন শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু দাগটা আর যায়নি। সেই দাগের দিকে চেয়ে অশোক বেশ উদাস হয়ে পড়লো তবে বিক্রমকে কিছুতেই বুঝতে দিল না। এই মুহূর্তে ওকে যদি নিজের পরিচয়টা দেওয়া যায় ব্যাপারটা তাহলে এক বিস্ফোরণের সমান হয়ে উঠবে। সেটা ভেবে অশোক বেশ শিহরিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তেমনটা তো করা যাবে না। অতোএব সংযমের রেশ নিজেকে ধরে রাখতেই হলো।

চেয়ারম্যানের ঘর থেকে নিজের ঘরে এসে অশোক প্রথমেই বিক্রমকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কোম্পানির স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই তদন্তে সে আন্তরিক ভাবেই একটা ভূমিকা নিতে চেয়েছিল। যে-কারণে ওকে সঙ্গে সঙ্গেই ডেকেছে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এই তদন্ত করার সামান্যতম ইচ্ছেও অশোকের নেই। চেয়ারম্যান শাওনাকে যে-সূত্র দিয়ে তার ঘরে পাঠিয়েছেন তাতেই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওপরে কোম্পানির স্বার্থের নামাবলীটা জড়ানো থাকলেও এটা মূলত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ব্যাপার। সেখানে চেয়ারম্যান ডুবুক বা ভেসে থাকুক তাতে তার কী এসে যায়? সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারটা হলো অশোক এখানে এসেছে প্রতিশোধ নিতে এবং সেটা চেয়ারম্যান অর্থাৎ গোপীমোহন পার্থসারথিকে শেষ করতেই, সেখানে তাঁকে বাঁচানোর দায়িত্ব সে কেমন করে নেয়? তদন্ত অশোক করবে তবে সে তদন্তটা হবে কোম্পানির হিসেবের বাইরে। এ তার নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে চেয়ারম্যানের মৃত বীভৎস দেহটা ছাড়া অশোক অন্য কিছু কল্পনা করতে পারলো না।

বিক্রম পরাশর ও. এস. ডি-র চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ অশোক কী যেন ভাবতে ভাবতে একসময় বললো, আচ্ছা, প্রত্যেকদিন এখানে কতো টন করে কাগজ তৈরি হয়?

অশোক প্রশ্নটা করলো বটে, কিন্তু উত্তরটা শোনার জন্য ওর কোনওরকম আগ্রহ বিক্রম দেখতে

পেল না। তাছাড়া মনে মনে সে একটু অসন্তুষ্টও হলো। আচ্ছা ক্ষ্যাপাটে ছেলের পাল্লায় পড়েছে তো। প্রোডাকশান সেন্টার থেকে তাকে ডাকিয়ে এনে ওটা কী একটা প্রশ্ন হলো? এখানকার একটা কুলি-মজুরও যেটা জানে সেটা তাকে জিজ্ঞেস করার মধ্যে কী ধরনের ব্যাপার-স্যাপার থাকতে পারে বিক্রম ওর বুদ্ধি দিয়েও বুঝে উঠতে পারলো না। তবে এটা সে বুঝলো, ঠিক ওই প্রশ্নটা করার জন্য অশোক লাহিড়ি তাকে ডাকেনি। আসল প্রশ্নটা নিশ্চয়ই কোথায়ও লিকেজ হয়ে বেরিয়ে গেছে। সেটাকেই এখন জোড়াতালি দেবার চেষ্টা চলছে। যাই হোক উত্তরটা দিয়ে সামান্য একটু সময় নিল বিক্রম। তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু বলবেন?

না, আপনি আসুন—অশোক অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে বিক্রমকে বিদায় দিল বটে কিন্তু অফিসের কাজে নিজেকে আর উৎসাহী করে তুলতে পারলো না। আসল কাজটা দু-একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলা চাই। অফিসের দায়িত্ব-টায়িত্বের ব্যাপারে তার আর কোনও মাথা ব্যথা রইলো না। এই মুহূর্তে এ-সবকে তার ভূতের বেগার বলেই মনে হচ্ছে।

কোন্ডকুঁয়া গ্রামে পৌঁছে অশোক কিন্তু চুনীলাল জয়াকরের সেই খোলার চাল আর মাটির দেওয়ালের বাড়িটা খুঁজে পেল না। আশেপাশে এতো বাড়ি হয়ে গেছে এবং আগের সরু সরু কাঁচা পথের যে পরিমাণে উন্নতি হয়েছে তাতে সমগ্র এলাকাটাকেই চিনতে কষ্ট হচ্ছে। চুনীলালের বাড়িব পেছনেই একটা বড়ো বাঁশবাগান ছিল। অশোক সেই বাঁশবাগানটাকেই দেখতে পেল না। সর্বজনীন একটা পাতকুঁয়া ছিল। সেটাই-বা গেল কোথায়?

অশোক যখন বুঝালো কাউকে জিজ্ঞাসা না-করে সে চাচাজির বাড়ি খুঁজে পাবে না, তখন আর সময় নষ্ট করলো না। সামনেই একটা গম ভাঙানোর দোকান। ছোকরা মতো একটা ছেলে গম পেষাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল। অশোক ওকেই জিজ্ঞেস করলো, আরে ভাই, চুনীলাল জয়াকর কা মকান বাতা সেকতে হো?

কিউ নেহি। গম পেষাই কতোটা মিহি হচ্ছে-না-হচ্ছে হাত দিয়ে ডলে পরীক্ষা করতে করতে ছোকরাটা উত্তব দিল, উও মেরা দাদাজি হ্যায়। বলেই সে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে নিচু গলায় প্রশ্ন করলো, বাত ক্যয়া হ্যায় জি?

আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লেকিন দাদাজি তো মর চুকা। তিন সাল হো গিয়া—অশোকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কী?

অশোক লাহিড়ি।

না, এই নামে তো দাদাজির কাছে কারো আসবার কথা নয়।

ছেলেটার ওই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অশোকের সারা দেহে তীব্র ঝাঁকুনির একটা স্রোত বয়ে গেল। বছর উনিশের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটার চোখে চোখ রেখে অশোক জানতে চাইলো, কার আসার কথা ছিল?

দেখুন, এ-ভাবে জিজ্ঞেস করলে তো আমাকে মুশকিলে ফেলা হবে। একটু সময় নিয়ে ছেলেটা বলতে লাগলো, দাদাজির কাছে আমরা বাড়ির সবাই এতো বছর ধরে একটি নামই শুনে এসেছি। দাদাজির খুব বিশ্বাস ছিল ওই নামের ছেলেটা একদিন-না-একদিন তাঁর কাছে দু'দণ্ডের জন্য এলেও আসবে। কিন্তু তাঁর সেই অপেক্ষা করা বৃথা হলো। মারা যাবার সময় দাদাজি আমাদের হাতে একটা ফটো দিয়ে বলেছিলেন, নির্দিষ্ট নামের ছেলেটি যদি কখনও আসে তবে যেন তারই হাতে ওই ফটোটা দেওয়া হয়। আমরা সেই ফটোটা খুবই যত্ন করে রেখে দিয়েছি তবে নির্দিষ্ট মানুষটা এখনও আসেনি। ছেলেটা একটানা কথা বলার পর একারে একটু থামলো। নিরীহ গলায় পরে বললো, আমরা আগে থেকে কেন তার নাম বলতে যাবো? আসল মানুষটা নিজেই তার নাম বলবে।

অশোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথাগুলো শুনছিল। সে আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। ওর কানের কাছে মুখ দিয়ে চাপা গলায় বললো, আমার নাম সন্দীপ পার্থসারথি।

আমি জানতাম এমনটাই হবে। ছেলেটা মৃদু হাসলো এবারে। প্রথমে আমাকে বোধহয় ভরসা

করতে পারেননি তাই যাহোক একটা নাম বলে দিলেন? আমার দিকটাও একবার চিন্তা করুন। দাদাজি যে-দায়িত্ব আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন সেটা যদি ভুল হাতে গিয়ে পৌছোয় আমরা তাহলে ওঁর আশীর্বাদ আর কখনোই পাবো না।

মায়ের ছবিটা বুকে চেপে অশোক প্রায় টলতে টলতে গেস্ট হাউসের নিজস্ব ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে পড়লো। সে যে কোন্ডকুঁয়া থেকে এই চার মাইল পথ কীভাবে এসেছে তা সে নিজেও বলতে পারবে না। মাথার মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তবে তার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে বুকে। সমস্ত বুকখানা জুড়ে আবার আরম্ভ হয়েছে একঝাঁক ঘোড়ার নিষ্ঠুর দাপাদাপি।

অশোকের ভেতরটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সে আর সহ্য করতে পারছে না। মায়ের ফটোটার দিকে তাকিয়ে অশোক ছোট্ট একটা শিশুর মতো কেঁদে উঠলো। ঠান্ডা মাথায় তার মাকে মেরে ফেলেছে ওই গোপীমোহন পার্থসারথি। আর ওই মানুষটা এখনও পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ উপভোগ করে চলেছে। যার বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই সেই-ই কিনা সমাজের বিশিষ্ট এক সম্মানীয় হয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে। ওই মাথাটাকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে দেওয়া যায় না?

রাত যখন প্রায় আটটার মতো অমৃতা কাউর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হতাশ হয়ে বললেন, না, অশোক বোধহয় আজ আর এলো না। ঢাকা বারান্দায় একটা বেতের সোফায় বসে শাওনা রাস্তার দিকেই তাকিয়েছিল। বারবারই সে আশা করছিল এই বুঝি অশোকজি আসছে, কিন্তু সময় গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও ভেঙে পড়ছিল।

শাওনা কিছুতেই ভেবে পেল না, আসবো বলেও অশোক কেন ওর কথা রাখলো না? এটা তো ও তাকে পরিষ্কার অপমানই করলো। কী দরকার ছিল এটা করার? শাওনা খুবই কোমল মেয়ে। অল্প আঘাতেই কাচের মতো গুঁড়িয়ে যায়। মাকে লুকিয়ে সে এবারে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেললো। সূক্ষ্ম এই অবহেলাগুলো মনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলতে পাবে। শাওনা তো এই মুহূর্তে মায়ের দিকে তাকাতেই পারছে না। হঠাৎ ওঁর খেয়াল হলো অশোক কোথায় যেন যাবে বলেছিল এবং ফিরতে ওর সাতটা, সাড়ে-সাতটা হয়ে যাবে। ও ফিরেছে কিনা শাওনার একবার সন্দেহ হলো। শুধু শুধু ঘরে বসে মন খারাপ করে কি লাভ? অশোকের জন্যই ওরা আজ সিনেমা দেখতে যাবে না—এটা জানার পরও সে না-এসে পারে না। কিন্তু গন্ডগোলটা কোথায় শাওনা সেই হিসেবটাই মেলাতে পারছে না। এটা তো পরিষ্কার যে অশোক ও-সব ধান ভাঙতে শিবের গীত পছন্দ করে না। সোজাসুজি কথা বলতেই সে অভ্যস্ত। সুতরাং আসার ইচ্ছে না-থাকলে মুখের ওপর সেটা বলার জন্য তার কোনওরকম ছলনার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অহেতুক ওকে দোষী সাব্যস্ত না-করে ব্যাপারটা একটু যাচাই করেই দেখা যাক না!

শাওনা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আজ বিকেল থেকেই ওর মনটা হালকা ছিল। যেন খুশির একটা চিরস্থায়ী মেলা ওর বুকেতেই বাসা বেঁধেছে। বিকেলে গা ধুয়ে চমৎকার একটা সিলক তানচই পরেছে। বারগনডি লালে জমি এবং বহুবর্ণের জামেওয়ার ডবল আঁচলে ওর ব্যক্তিত্ব, আভিজাত্যকে যেন সেতুবন্ধন করিয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ হরিণ ছন্দে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সাদাসিধে শাওনার হৃদয়-উচ্ছ্বাস করুণাধারায় জমা হচ্ছিলো। আসল কাজটাও সেরে নিয়েছিল। অন্যান্য দিনের চেয়েও আজকে অনেক বেশি সময় ধরে শাওনা পবিত্র গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ করেছে। আর সব কিছুর শেষে নিষ্পাপ হৃদয়ে শুধু একজনের অপেক্ষায় ছিল। আটটা বেজে গেছে। আর কতো অপেক্ষায় থাকা যায়? তবে এর শেষটাও দেখা দরকার। শাওনা নিস্তেজ গলায় মাকে বললো, আমি একটু আসছি।

কোথায় চললি? অমৃতা কাউর জেনেও একবার জিজ্ঞেস করলেন।

গেস্ট হাউসে অশোকজির খোঁজটা নিয়ে আসি। শাওনা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শীতল স্পর্শের মতো

ঠান্ডা গলায় বললো, ওর এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। সেখান থেকে ফিরেছে কিনা দেখে আসি। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ মা—অশোকজি যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে এই অপমানটা আমাদের করে থাকে সে তাহলে তার ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকুক। ওর জগতে ঢুকবার আর কখনও চেষ্টা করবো না।

গেস্ট হাউসের ষোলো নম্বর ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। শাওনা সামান্য ঠেলে ভেতরে পা রাখতে-না-রাখতেই চমকে উঠলো। বিছানার ওপর অশোক শুয়ে আছে বটে, কিন্তু জুতো মোজা পরা অবস্থাতেই একটা পা নিচু খাট থেকে মাটিতে ঝুলে পড়েছে। অপর পা'টাও অনেকটা ঝুলছে। অর্থাৎ যে-কোনও সময়েই ও নীচে পড়ে যেতে পারে। মাথার যে-চুলগুলো সর্বদা পরিপাটি একটা সিঁথিতে সৌন্দর্য ছড়িয়ে রাখতো সে-গুলো আজ ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার রূপ নিয়ে চূড়ান্ত এলোমেলো হয়ে রয়েছে। সহজেই বোঝা যায় এটা কোনও সুস্থ একজন মানুষের বিশ্রাম নেওয়া নয়। অশোকের চোখ দুটো যদিও বোজা অবস্থায় রয়েছে কিন্তু ভুরু দুটো বেশ কুঁচকে আছে। সারা মুখটা যেন যন্ত্রণাময় এক চাপা ব্যথার প্রতিচ্ছবি।

শাওনার প্রথমেই যেটা মনে হলো, মানুষটা খাট থেকে এক্ষুণি পড়ে যাবে। ওকে ওপাশে সরিয়ে দেওয়া দরকার। দু'বার ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, শাওনা নিরাপত্তার খাতিরে অশোককে ঠেলে সরিয়ে দেবার সময়েই টের পেল ছেলেটার গা বেশ গরম। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা তা হলো ওপাশে ফিরিয়ে দেবার সময়েও ওর হাত থেকে কিন্তু ফটোটা পড়ে যায়নি। বরং মনে হলো অশোক যেন ওটাকে একটু বেশি জোরেই আঁকড়ে ধরে আছে। ছবিটাকে টেনে বার করতে গিয়েই শাওনা সেটা টের পেল। আর ঠিক তখনই অশোক ওর চোখ দুটো মেলে ধরলো। শাওনাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। তবে ও কঠিন এক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েই রয়েছে।

শাওনা কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। সে-ও ওর চোখে চোখ রেখে চেয়েই রইলো। অশোকের দুই চোখে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ক্রোধের আগুন। প্রচন্ড জ্বরে মানুষ যে-ভাবে প্রলাপ বকে অশোক ফটোর দিকে চেয়ে তেমন ভাবেই বলে উঠলো, আমার মা, এটা আমার মা! আমার মাকে ওই লোকটা শেষ করে দিয়েছে। ওই গোপীমোহন পার্থসারথি। ওকে আমি খুন করবো। নিশ্চয়ই করবো। আমার নাম সন্দীপ পার্থসারথি, এই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্যই আমি বেঁচে আছি। নয়তো আমিও তো শেষ হয়েই যাচ্ছিলাম—বিকারের মতো এক ঘোরের মধ্যে কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ এক অপরিসীম কান্নায় অশোক আবার তলিয়ে গিয়ে চেতনা হারিয়ে ফেললো।

শাওনা দ্রুত একটা টেলিফোন করলো তাদের ডাক্তারকে। তারপর অশোকের জুতো, মোজা ইত্যাদি খুলে ওকে মোটামুটি একটু ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে একটা পাতলা চাদর ওর বুক পর্যন্ত টেনে দিল। ততোক্ষণে ওর সারা মুখেও দুশ্চিন্তার এক বিরাট ছায়া নেমেছে। কিন্তু শাওনা তার বিচক্ষণতা দিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে জানে।

ডাক্তার কুলকার্নী আসার সঙ্গে সঙ্গে শাওনা ছোট্ট গলায় শুধু একটা কথাই বললো, হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে ভুল বকছে। রাতটা যাতে ঘুমোয় অনুগ্রহ করে সেই ব্যবস্থা করুন।

খুব ভোরবেলা শাওনা যখন ষোলো নম্বর ঘরে ঢুকলো অশোক তখন শ্রান্ত ক্লান্ত নির্জন দ্বীপের এক বাসিন্দা হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে খাটের ওপরেই বসেছিল। শাওনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ফটোটা তাড়াতাড়ি বালিশের নীচে লুকিয়ে রেখে দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করলো, এতো ভোরে আপনি?

আসতে নেই বুঝি? শাওনাই ওকে পাল্টা প্রশ্ন করলো। তবে এটুকু বুঝলো গতকাল রাতের ঘটনাগুলো খুব সম্ভব ওর মনে নেই। থাকলে ওই ধরনের প্রশ্ন এবং ফটোটাকে অমন ভাবে নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখতো না। শাওনা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে স্থির একটু হাসলো তারপরেই নিচু গলায় জানতে চাইলো, এখন কেমন আছেন সন্দীপজি?

সন্দীপ! অশোক বিছানা ছেড়ে সোজা টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সন্দীপ পার্থসারথি! শাওনা নিষ্পাপ হেসে বললো, তাই তো!

আপনি জানলেন কী করে? অশোক শাওনার দুই বাহুমূল চেপে ধরে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠলো, এটা তো এখানকার কারো জানার কথা নয়।

জানার কথা নয় কিন্তু জেনেছি।

আর কী জানেন? অশোকের তীব্র ঝাঁকুনিতে শাওনা ওর বুকের ওপর প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়লো। ওকে সঙ্গে সঙ্গে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, উত্তর দিন। আর কী কী জানেন?

আপনি গোপীমোহন পার্থসারথিকে খুন করবার জন্যই এখানে এসেছেন। শাওনা স্থির দৃষ্টিতে অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সাপের মাথায় ধুলো পড়লে যা হয় আর কী! অশোকের হাত দুটো শিথিল হয়ে এলো। দৃষ্টির সেই তীব্রতাও আর নেই। অসহায় একটা শিশুর চাউনি নিয়ে অশোক শাওনাকে দেখতে লাগলো। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র! তারপরেই অশোক একটা কান্ড করে বসলো। শাওনাকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে ও নিজে মেঝেতে বসে আস্তে আস্তে ওর শুভ্র ও মসৃণ পা দুটোর ওপর নিজের মুখখানা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো, আমার সম্পর্কে এতো কিছু আপনাকে কে বললো?

আপনিই বলেছেন। শাওনা অনুচ্চকণ্ঠে বললো, গতকাল রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত আমি এখানেই ছিলাম। আপনি যখন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর পারছিলেন না, তখন ওই কথাগুলো আপনার মুখ থেকেই বেরিয়েছে।

আর কেউ শোনেনি তো?

আমি ছাড়া কেউ নয়। শাওনা লজ্জিত হয়ে বললো, পা দুটো ছাড়ুন।

না। অশোক শিশুর সারল্য নিয়ে শাওনার দিকে চেয়েই রইলো। ধীরে ধীরে ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠে ঝাপসা হয়ে যেতেই নিস্তেজ সুরে যেন প্রাণভিক্ষা চাইলো, আপনি কাউকে বলবেন না তো?

না। শাওনা স্পষ্ট উচ্চারণ করলো।

আপনাকে আমি কতোখানি বিশ্বাস করতে পারি? অশোকের গলায় আকুল প্রার্থনা।

যতোটা আপনি নিজেকে করেন।

শাওনা জানে অশোকের বুকের মধ্যে অনেক কথা জমা হয়ে আছে। ও আর পারছে না। হালকা হবার জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয় চাইছে। সুতরাং ওই বিশ্বাসটুকু ওকে দিতেই হয়। শুধু দেওয়াই নয়—সেই সঙ্গে মর্যাদা রক্ষা করারও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। শাওনা যখন একবার না বলেছে তখন কাউকেই কিছু জানাবে না। কিন্তু গোপীমোহন পার্থসারথিকে শেষ করে দিলে অশোক নিজেও তো শেষ হয়ে যাবে। শাওনা তাহলে বাঁচবে কি নিয়ে? ওই জায়গা থেকে ওকে ফেরাতেই হবে।

শাওনা যখন ওকে ফেরাবার চিন্তা করছে, অশোক তখন বলতে শুরু করেছে এক নতুন কাহিনী। সন্দীপ পার্থসারথি নামের ছিপছিপে গড়নের লাজুক ছেলেটা যখন বেশির ভাগ সময় তার মায়ের আদর খেতেই ব্যস্ত থাকতো তখন থেকে এ-কাহিনীর আবরণটুকু সরিয়ে দেওয়া যাক।

স্কুলের বাৎসরিক স্পোর্টসে দৌড়ে প্রথম হয়ে একটা মেডেল পেতেই সন্দীপ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। ওই মেডেল হাতেই আবার একটা দৌড়! মাকে গিয়ে যতোক্ষণে না-দেখাতে পারছে ততোক্ষণ যেন কোনও কিছুতেই শান্তি নেই। সন্দীপের যাবতীয় আদর-আব্দার, দাবি এবং অভিযোগ সবেরই কেন্দ্রবিন্দু হলো তার মা। আধ মাইল দূর থেকেই সম্ভবত সে মা-মা বলে চিৎকার করতে করতে বাড়িতে ঢুকলো।

সন্দীপের গলা মহাশ্বেতা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কাজ ফেলে এগিয়ে আসতেই ছেলের দু'হাতের বন্ধনে বিরাট ভাবে ধরা পড়লেন। সন্দীপ বললো, মা এই দেখো তোমার জন্য আমি কি এনেছি—কথাটা বলেই সে লাল ফিতে দেওয়া মেডেলটা মহাশ্বেতার গলায় পরিয়ে দিল।

দৌড়ে তুই এটা পেয়েছিস! মহাশ্বেতার গলা খুশিতে বুজেই গেল প্রায়।

আমি নয় মা—এটা তুমি পেয়েছো।

তোর বাবা এলে একবার দেখাস—মহাশ্বেতা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্দীপ বেশ জোরের সঙ্গে একটামাত্র কথা বললো, না।

বয়সে নিতান্তই এক কিশোর হলেও সন্দীপের বুদ্ধির গভীরতা তার বয়সের আর পাঁচজন সাধারণ ছেলেদের থেকে যেমন বেশি, তেমনই বেশি তার মান-অপমানের জ্ঞানও। আরও ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে তার বাবা জি. এম. পার্থসারথি সুষমা আন্টির সঙ্গে খুব মেলামেশা করেন। আর সুষমা আন্টির তো এ-বাড়িতে প্রায় রাণীর সম্মান। সন্দীপ তখন বুঝতো না। কিন্তু এখন এই সাড়ে-এগার বছর বয়সে বাবার আচরণে সে অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে। সেই কারণে বেড়েছে তার ক্ষুব্ধতাও। গতকালের ব্যাপারটার জন্য সন্দীপ মোটেই দায়ী ছিল না। অথচ তাকে বেশ নিষ্ঠুরের মতোই মারা হলো।

মহাশ্বেতা রান্নাঘরে চা, জলখাবার বানাচ্ছিলেন। এই জিনিসটাও সন্দীপের একেবারেই পছন্দ হতো না। সুষমা আন্টি বাড়িতে এলে তার সেবার জন্য মাকেই পরিশ্রম করতে হতো। ঠিক মতো যত্ন না-হওয়ার জন্য মহাশ্বেতাকে দু'দিন কম কথা শুনতে হয়নি। যাই হোক, চিরকালের শান্ত স্বভাবের মহাশ্বেতাকে মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হতো। স্বামীকে শাসন করা দূরে থাক, ঠিক মতো একটা প্রতিবাদও করতে পারতেন না। এই মেনে নেওয়াটাই বোধহয় মায়ের সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না, পাড় থেকে ক্রমশ সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যাচ্ছিলেন। মহাশ্বেতা যেটা বুঝতেন না, সন্দীপ সেটা বুঝতো। সে তাই রান্নাঘরে গিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। ওই সুষমা আন্টির জন্য তুমি এতো খাবার-দাবার কেন বানাবে? বাবাব ভয়ে?

নেহি বেটে! মহাশ্বেতা মিষ্টি করে হেসে বললেন, আমরাও তো খাবো।

ওই খাবার তুমিই খেয়ো।

রাগে রান্নাঘর ছেড়ে শোবার ঘরে আসতেই যে-দৃশ্যটা সন্দীপের চোখে পড়লো তাতেই ওর মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। সুষমা আন্টি তার মায়ের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন আর গোপীমোহন তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর জানাচ্ছিলেন। সিংহের বিক্রমে সন্দীপ সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সুষমা আন্টির হাত ধরে প্রায় টেনেই বিছানা থেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আমার মায়ের বিছানায় তুমি কক্ষনও শোবে না। সুষমা আন্টি কি অভিনয় করতে পারেন! ছোট্ট মেয়ের মতো কি দারুণ ভাবেই না কেঁদে উঠেছিলেন! কাঁদতে কাঁদতেই গভীর সুরে নালিশ জানালেন, তোমার সামনে এমন ভাবে অপমানিত হবো এটা আমার .... সুষমা আন্টিকে আর বেশি কিছু বলতে হয়নি। গোপীমোহন পার্থসারথি তাঁর বিক্রম দেখালেন ছেলের ওপর। কী মারটাই না মারলেন। যেন রাস্তার একটা ছেলেকে মারছেন! বাবাকে তখন খুব কুৎসিত দেখাচ্ছিল। সন্দীপের মনে চিরস্থায়ী একটা ঘৃণার শেকড় বোধহয় ওর অজান্তেই বিস্তারলাভের জন্য উর্বর জমির সন্ধান পেয়ে গেছে।

রাতে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েও সন্দীপ অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। গোপীমোহন এখন আর স্ত্রীর সঙ্গে শোওয়া বিশেষ পছন্দ করেন না! সুতরাং তিনি আলাদা একটা ঘরেই ঘুমোতেন। মা আর ছেলের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের এই ঘরটা তখন হয়ে উঠতো ক্ষোভ আর সান্ত্বনার মিলনভূমি।

মহাশ্বেতা ছেলের আঘাতের জায়গাগুলোতে পরম স্নেহে কোমল হাতখানা বুলিয়ে দিতে দিতে নিজেই এক সময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অসীম এক দুঃখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সন্দীপ বেটে, খুব কষ্ট পেয়েছিস তো! তোকে যে এতোবার বলি কখনও কিছু বলতে যাস না। কী হবে বলে? শুধু শুধু এই মারটা খেলি তো?

মা—সন্দীপ যেন অনেক দূর থেকে ডেকে উঠলো।

বল বেটে।

চলো আমরা চলে যাই। বাবা আমাদের দুজনের কাউকেই আর ভালোবাসে না। কী হবে এখানে থেকে?

ছোটবেলায় কিন্তু তোকে খুব ভালোবাসতেন তোর বাবা।

সে-সব আমার মনে নেই। এখন যেটা পাচ্ছি সেটাই কষ্টের। চলো না মা—

সন্দীপ বেটে, আমার যদি কোথাও যাবার জায়গা থাকতো—মহাশ্বেতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই এমন পড়ে পড়ে মার খেতাম না। সব কিছু মেনে নে বেটে, তাহলেই দেখবি আর কোনও কষ্ট নেই।

সত্যিই কি তোমার কোনও কষ্ট নেই মা? তুমি এমন করে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কি পাচ্ছো?

তবুও তো উনি আমারই স্বামী!

তোমার স্বামী! মহাশ্বেতার বুকে মুখ লুকিয়ে ওর বেশি আর একটা কথাও সন্দীপ বললো না। হতাশা আর অন্ধকারের মধ্যে তার মা যদি ওইটুকু নিয়েই সান্ত্বনা পেতে চায় তাই পাক।

মহাশ্বেতা ছেলের গালে দুটো চুমো খেয়ে বললেন, আমার কথাটা শোন বেটে, তোর বাবাকে আজ মেডেলটা দেখাস। উনি হয়তো খুশি হবেন।

কালকের ওই মার খাবার পরেও বাবাকে খুশি রাখবার জন্য আমাকেই আগে ছুটে যেতে হবে কেন মা? সন্দীপ শান্ত অথচ দীপ্ত এক প্রত্যয়ের সুরে বলতে লাগলো, আমার সারা গা-হাত-পা এতো ব্যথা ছিল যে একবার ঠিক করেছিলাম স্পোর্টসে দৌড়াবো না। কিন্তু মা, কোথা থেকে একটা জেদ এসে আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। মার খেয়ে আমি পড়ে থাকবো না। এই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাকে জিততেই হবে। নয়তো সারাটা জীবন আমাকে পেছনেই থাকতে হবে। এর পরেও তুমি মেডেলটা দেখাতে বলবে?

ওই কথার পর মহাশ্বেতা ছেলেকে আর কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু ভাবলেন, এইটুকু বয়সে সন্দীপের যে আত্মসম্মানবোধ রয়েছে সেটুকু বোধহয় তার নিজেরও নেই।

দিন চারেক পরেই সন্দীপ আবার অমানুষিক মার খেলো তার বাবার কাছে। স্কুল ছুটির পর বন্ধুরা মিলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাইল দুয়েক দূরের একটা চমৎকার লেক দেখতে। বিপত্তিটা হয়েছিল সেখানে গিয়েই । গোপীমোহনও সুষমাকে নিয়ে হাজির ছিলেন। ছেলেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা হলো, ওকে নিশ্চয়ই ওর মা পাঠিয়েছে। কিন্তু এই প্রচন্ড দুঃসাহসটা ওদের হলো কেমন করে? সুষমার কাছে বারবার এমন ছোট হতে হতে তাঁর সম্মান যে তলানিতে গিয়ে পৌঁছে যাবে।

লেকের স্থির জলে যে নৌকোটা ভাসছিল গোপীমোহন সুষমাকে নিয়ে ওখানেই ছিলেন। জলের ছায়ায় নিজেদের অন্তরঙ্গ ছবিটা দেখতে দেখতেই পাড়ে দাঁড়ানো এক দঙ্গল ছেলেদেব মধ্যে নিজের ছেলের ওপরেও তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে আটকে গেল।

সুষমা জিজ্ঞেস করলেন, সন্দীপ আমাদের পিছু ধাওয়া করছে কেন?

গোপীমোহনকে স্বীকার করতেই হলো, আর যাতে না-করে বাড়ি ফিরে সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো।

সুষমাকে যে-কথা দিয়েছিলেন গোপীমোহন, বাড়ি ফিবে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করলেন। সন্দীপ পড়তে বসেছিল। ডাকাডাকির কোনও ব্যাপার নেই। গোপীমোহন দুমদাম শব্দে সেখানে পৌঁছে একজন পকেটমার ধরা পড়লে তাকে যে-ভাবে মারা হয় ঠিক তেমন ভাবেই মারতে শুরু করলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় সন্দীপের আর্তনাদে ছুটে এলেন মহাশ্বেতা, চুনীলাল জয়াকর। চুনীলাল এ-বাড়ির কাজের মানুষ হলেও সাহেবের মুখের ওপর প্রতিবাদ করার একটু সাহস তার আছে। সে সন্দীপকে সেই শিশু বয়স থেকে লালন-পালন করে এসেছে, সুতরাং ওর প্রতি তার মায়া-দয়া কারো চেয়ে কম থাকার কথা নয়।

পড়ার ঘরে পৌঁছে চুনীলাল দেখলো সাহেবের মার খেয়ে সন্দীপের মুখটা রক্তে ভরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গোপীমোহনকে একটা কথাই জিজ্ঞেস করলো, সাব আপ ক্যায়া কর রহে হ্যায়? বাবা মর যায়ে গা।

যানে দো। অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো কথাটা ছুড়ে দিতেই গোপীমোহনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে

তাকালেন মহাশ্বেতা। ক্রোধ, অভিযোগ এবং অভিমান তাঁর বুকে কম জমা নেই। কিন্তু তিনি কখনওই ঠিক জ্বলে উঠতে পারেন না। তাঁর ওপর যে-নির্যাতন মানসিক এবং শারীরিক ভাবে চলছে সেটা তো তিনি প্রায় মেনেই নিয়েছেন কিন্তু তাঁর সন্দীপের ওপর এমন বন্য আক্রমণ কেন? ওইটুকু ছেলে কি এতো অত্যাচার সহ্য করতে পারে? সন্দীপ মার খায় আর মহাশ্বেতার বুকখানা হাহাকার করে ওঠে। এবারে তিনি একটু জোরের সঙ্গেই জানতে চাইলেন, সন্দীপকে এ-ভাবে মারছো কেন? অন্যায় করবে তুমি আর মারে খাবে ওই শিশুটা?

মহাশ্বেতা! গোপীমোহন গর্জে উঠলেন।

আমি সব সহ্য করবো কিন্তু আমার সন্দীপের গায়ে অন্যায় ভাবে হাত তোলা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

কী করবে তুমি? গোপীমোহন ছুটে গিয়ে মহাশ্বেতার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরে বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিলেন। আমার অবাধ্য হলে আমি কাউকে ক্ষমা করি না।

কে চায় তোমার ক্ষমা! মহাশ্বেতা আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা গলায় বললেন, দাও না শেষ করে—এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

তোমার জন্য সেটাই অপেক্ষা করছে। সেটাই—গোপীমোহন কি যেন চিন্তা করতে করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সপ্তাহ দুয়েক মোটামুটি ঠান্ডা থাকার পর গোপীমোহন হঠাৎ একদিন মহাশ্বেতাকে নিজের ঘরে ডাকলেন। কিন্তু তাঁকে যা বলা হলো তা শুনবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। মহাশ্বেতা তো অসহায় দৃষ্টি নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়েই রইলেন। সেই বোবা দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে গোপীমোহন আবার বললেন, তুমি শুধু এখানে একটা সই করে দাও। তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি তোমাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণই দেবো।

ক্ষতিপূরণ! মহাশ্বেতা শান্ত সুরে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কথাগুলো বড়ো জটিল। এখানে সই করলে আমি কি আমার স্বামীকে পাবো, সন্দীপ বেটে তার বাবাকে? তাহলে তুমি ক্ষতিপূরণটা কীভাবে করবে?

মহাশ্বেতা! গোপীমোহন চাপা গলায় তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করলেন।

আমি তোমাকে হারাতে পারবো না। মহাশ্বেতা পরিষ্কার এবং স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন, তুমি আমাকে আরও মারো, আরও অত্যাচার করো কিন্তু সুষমাকে তুমি—

সুষমাকেই আমি বিয়ে করতে চাই।

না। ওই মেয়েটার জন্য আমি নিজেকে বলিদান দিতে পারবো না। তাছাড়া সন্দীপ বেটের কাছে তোমার কী আদর্শ রইলো? এ-কাজ তুমি করতে পারবে না, কক্ষনও না।

আমি সুষমাকে কথা দিয়েছি।

স্ত্রী-পুত্র থাকতে তুমি অন্য একটা মেয়েকে কথা দাও কী করে? মহাশ্বেতা একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। এতোদিন যা করছিলে তাতে কি মন ভরছে না? নিজের সুখের জন্য তুমি আমাদের এই ভাবে ভাসিয়ে দিতে পারো না।

আমার কথাটা তোমাকে মানতেই হবে মহাশ্বেতা।

কিছুতেই না। মহাশ্বেতা ঝরঝর করে কেঁদেই ফেললেন। গোপীমোহনের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না ভেজা গলাতেই বললেন, আমার চোখের ওপর তুমি সুষমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছো। তাও সহ্য করেছি। কিন্তু যেটা পারবো না তা নিয়ে চাপ দিয়ো না।

আমি যা ভাবি সেটা করেও থাকি।

আমি বাধা দেবো।

শক্তি যদি থাকে দিয়ো—গোপীমোহন উত্তর দিলেন, সে-সুযোগ বোধহয় তুমি পাবে না।

আসলে গোপীমোহন তখন সুষমার প্রেমে বদ্ধ এক উন্মাদ। মেলামেশাটা অনেক বছর ধরেই চলছিল কিন্তু এখন আর তিনি এ-ভাবে সন্তুষ্ট থাকতে চাইছিলেন না। তিনি চাইছিলেন সুষমাকে

বিয়ে করতে। এই ক্ষ্যাপামির জন্যই গত ছ'মাস ধরে তিনি একটু একটু করে সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিলেন। এখন যেমন কথায় কথায় ছেলে এবং স্ত্রীর গায়ে হাত তুলছে- এটা কিন্তু আগে ছিল না। সন্দীপ এবং মহাশ্বেতাকে মানসিক চাপের মধ্যে রাখতে রাখতে গোপীমোহনের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। এরপর? গত কয়েকমাস ধরেই তিনি মহাশ্বেতার সঙ্গে এক বিছানায় থাকছেন না। মূল ব্যাপারটা হলো মহাশ্বেতাকে প্রায় সহ্যই করতে পারছেন না। ওর উপস্থিতি, চলা-ফেরা, বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকা সব মিলিয়ে ওকে তখন একটা ডাইনি ছাড়া গোপীমোহন অন্য কিছু ভাবতে পারছিলেন না। ডাইনিকে মানুষ কি করে যেন? পিটিয়ে মারে নয়তো আগুনে পুড়িয়ে দেয়। গোপীমোহনকেও হয়তো তাই করতে হবে, কেন-না তাঁর কথা মতো চলতে মহাশ্বেতা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। গোপীমোহন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না—মহাশ্বেতা আপাততো তাঁর কাছ থেকে তো কিছুই পাচ্ছে না, প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, কর্তব্য কিচ্ছু না। তবুও সে কি নিয়ে এই বাড়িতে পড়ে থাকতে চাইছে? শুধুই কি বাইরের জগতকে দেখাবার জন্য যে আমার একটা স্বামী আছে? এই অসার ব্যাপারটাকে নিয়েই মহাশ্বেতা ভীষণ জেদাজেদি করছে। অথচ সুষমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে এ-বাড়িতে আনতেই হবে। মেয়েটার রূপের আগুনের কাছে মহাশ্বেতার এখন পুড়ে মরা উচিত।

দু'দিন ধরে স্কুল যায়নি সন্দীপ। জ্বর-জ্বর ভাব। সারাটা দিন সে আজ প্রায় শুয়েই কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই তন্দ্রাটুকু কেটে গেল একটা চাপা গোঙানির আওয়াজে। সন্দীপ শুয়ে শুয়েই আওয়াজটা শুনছে অথচ ধারে-কাছে কাউকেই চোখে পড়লো না। পড়বেই-বা কী করে? এই সময় মা রান্নাঘরে থাকেন আর চুনীলাল অর্থাৎ চাচাজি তো তার ওষুধ আনতে সেই বিকেলে বেরিয়েছে! চাচাজি কি এখনও ফেরেনি? আর ওই চাপা আওয়াজটাই-বা কিসের?

বিছানার ওপর উঠে বসলো সন্দীপ। শব্দটা লক্ষ্য করে রান্নাঘরের দিকে যেতেই তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। বিস্ফারিত চোখে সন্দীপ যা দেখলো তাতে তার চেতনা হারাবারই কথা, কিন্তু সে আরও বেশি সজাগ হয়ে উঠলো। গোপীমোহন ততোক্ষণে মহাশ্বেতার হাত-পা বেঁধে ফেলেছেন। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছেন এমন ভাবে যাতে একটুও চিৎকার করতে না পারে। মহাশ্বেতার সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে গোপীমোহন যে-মুহূর্তে আগুন লাগাতে যাবেন দুর্বল শরীর নিয়েও সন্দীপ বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্বার এক বাধার প্রাচীর গড়ে তুলে বলে উঠলো, সুষমা আন্টির জন্য মাকে তুমি এমন ভাবে মেরো না, আমার মাকে তুমি মেরো না।

গোপীমোহন তখন অন্ধ। তিনি একটা জিনিসই বুঝেছেন, মহাশ্বেতা না-মরলে সুষমাকে আপন করে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ওতে সরতেই হবে। গোপীমোহন ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। সন্দীপ বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো, তুমি যা চাও তাই হবে। মাকে শুধু ছেড়ে দাও।

গোপীমোহন যে-জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন সেখান থেকে ফিরে আসার কথা তিনি চিন্তা করতেও পারেন না। মহাশ্বেতাকে তো নয়ই এমনকি একমাত্র সন্তান সন্দীপকেও ওই মুহূর্তে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হলো। আসলে গোপীমোহনের সমস্ত মন জুড়ে শুধু সুষমা আর সুষমা। সুষমার জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন!

পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে গোপীমোহন সজোরে একটা লাথি মারলেন ছেলের পেটে। যন্ত্রণায় সন্দীপ পেটে হাত চেপে বসে পড়তেই গোপীমোহন দেশলাইয়ের কাঠিটা ধরিয়ে নিলেন। মহাশ্বেতার গায়ে সেটা স্পর্শ করবার আগেই আবার বাধা। নিজের ব্যথা উপেক্ষা করে সন্দীপ আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর। দেশলাইয়ের কাঠিটা গোপীমোহনের ডান হাতে ধরা ছিল। সন্দীপ সেই ডান হাতটা সজোরে কামড়ে ধরলো।

আক্রোশে ফেটে পড়লেন এবারে গোপীমোহন। এই ছেলেটাকেও তিনি আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। মা ও ছেলের গতি একই হোক। গোপীমোহন ছোট্ট সন্দীপের মুখে

এমন জোরে একটা ঘুঁষি মারলেন যেন শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করলেন। মুহূর্তে ওর মুখটা রক্তে ভরে উঠলো। সন্দীপের পক্ষে ওই আঘাত সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেই গোপীমোহন যেন বিরাট এক সুযোগ পেলেন তিনি আর মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে এক হৃদয়হীন মানুষের পরিচয় দিয়ে মহাশ্বেতার শরীরে আগুনের আলপনা এঁকে দিলেন।

মহাশ্বেতা তখন জীবন্ত জ্বলছেন। দাউ দাউ করে আগুনের সেই উত্তপ্ত শিখা ওঁকে সম্পূর্ণ ভাবে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। সন্দীপ ওখানে বসেই চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, মা মাগো।

গোপীমোহন নিষ্ঠুরতার আরেক মূর্তি ধরলেন। ছেলেটার এই চিৎকার চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং সেটা এখনই। গোপীমোহন কেরোসিনের বোতলটা নিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আগুনের শিখার যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকলেও মহাশ্বেতা তখনও তাঁর চেতনা হারাননি। শরীর ধবে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের বাঁধা কাপড়টা সম্ভবত বেশ খানিকটা আলগা হয়ে গেছে। গোপীমোহন কেরোসিন তেলের বোতল নিয়ে সন্দীপের কাছে যেতেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মহাশ্বেতার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। তিনি তাঁর যন্ত্রণা ভুলে কোনওরকমে একটা কথাই বলতে পেরেছিলেন, 'সন্দীপ বেটে ভাগ যাও হিঁয়াসে।'

যার মা আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে সেই ছেলে পালিয়ে যায় কি করে? মাকে আর বাঁচানো সম্ভব নয় জেনেও সন্দীপ তাই এক পা নড়লো না। সর্বগ্রাসী আগুনে মহাশ্বেতা পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর গলা দিয়ে এখন যন্ত্রণার সামান্যতম গোঙানির আওয়াজটুকুও আর বের হচ্ছে না। আগুনের কী শক্তি! কতো সহজে একটা কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিল।

সমস্ত রান্নাঘরটা জুড়ে তখন আগুন আর আগুন। সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে সন্দীপের দুই চোখেও আগুন জ্বলে উঠলো। তীব্র এক ঘৃণা নিয়ে সে বললো, দাও আমার গায়েও কেরোসিন ঢেলে দাও।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য গোপীমোহন তখন এক জড় পদার্থ। এই ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা। তাছাড়া অপরাধের সাক্ষী রাখতে নেই। গোপীমোহন এখন নিরুপায়। কিন্তু অসুবিধেটা হয়েছে বাধাটাধা পেলে একটা জোর জুলুম করা যায়। সন্দীপ যেখানে নিজেই এগিয়ে এসেছে। তাঁর চোখে চোখ রেখে বলছে, আমাকেও ছুড়ে দাও ওই আগুনের মধ্যে।

অদ্ভুত এক ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো গোপীমোহন নিজের সন্তানের গায়ে কেরোসিন ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ কাজটুকু করার সুযোগ পেলেন না। চুনীলালকে আসতে দেখেই তিনি ওকে ছেড়ে দিয়ে হাহাকার করে উঠলেন, চুনীলাল, আগুন। জল ঢাল, শীগ্গির জল আন। তোর মার কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। ব্যস্ত হয়ে গোপীমোহন নিজেই উদ্যোগী হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের পড়শীরাও ছুটে এলেন। সকলের চেষ্টায় আগুন নিভলো বটে তবে মহাশ্বেতার তখন প্রাণ ছিল না। কালো কালিতে ঝলসানো মায়ের মুখটা দেখে সন্দীপ একটুও কাঁদবার সুযোগ পেল না। তার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

দশজনের সামনে গোপীমোহনকে কাঁদতেই হলো। তিনি জানেন মহাশ্বেতার দেহে প্রাণ নেই তবুও হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওর মধ্যেই কয়েকজন জিজ্ঞেস করলেন, আগুন ধরলো কীভাবে?

চা বানাবার জন্য স্টোভ ধরিয়েছিল। গোপীমোহন যতোদূর সম্ভব করুণ গলায় বলতে লাগলেন, সেটা থেকেই কীভাবে আগুন কাপড়ে লেগে যায়। সিন্থেটিক শাড়িতে এতো তাড়াতাড়ি আগুন ছড়িয়ে পড়লো আমি কিছুতেই ওকে বার করে আনতে পারলাম না। গোপীমোহন এবারে অসহায় দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

রাত তখন সাড়ে-এগারোটার মতো হবে। সন্দীপের জ্ঞান ফিরে আসতে সে চোখ মেলে তাকতেই দেখতে পেল চুনীলাল জয়াকার তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সন্দীপ ডুকরে কেঁদে উঠলো, চাচাজি!

বোল্ বেটে।

আমার মা কোথায় চাচাজি?

তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বেটে। চুনীলালের বুকটা ভেঙে যাচ্ছিলো। সে এবারে একটু হাল্কা হওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। সন্দীপের মাথায় পরম স্নেহে হাতটা বুলিয়ে দিয়ে বললো, আমি বাড়িতে থাকলে হয়তো কিছু একটা করতে পারতাম। শপ সেন্টারে তোমার ওষুধটা পেলেও হতো—আমাকে যেতে হয়েছে সেই বল্লারপুর বাজারে। সেখানে না-পেয়ে আবার ছুটেছি স্টেশনের বড়ো দোকানটায়। তাতেই তো এতো দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে মাকে মৃত অবস্থায় দেখবো তা কে ভেবেছিল। কেন যে মা ওসব 'সিন্থিক' শাড়ি পরে স্টোভের কাছে গিয়েছিল! আমি এসে না-হয় সাহেবেব জন্য চা বানিয়ে দিতাম।

সন্দীপ বোবা দৃষ্টিতে চুনীলালের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। চাচাজিটা আজ কেমন যেন উল্টো-পাল্টা কথা বলছে। 'সিন্থিক' শাড়ি, সাহেবের জন্য চা বানানো, স্টোভের কাছে যাওয়া—চাচাজি কী বলছে তা ও-ই জানে। সন্দীপ ঘরের দেওযালেব দিকে তাকালো। বাবার সঙ্গে মায়ের একটা ফটো সেখানে টাঙানো রয়েছে। বাবা! ওই মানুষটাকে নিজের বাবা ভাবতে এখন সন্দীপের দারুণ কষ্ট হচ্ছে। সে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। এই মুহূর্তে কোনও কিছুই আর ভালো লাগছে না। শুধু ঘুমোতে ইচ্ছা করছে। সমস্ত শবীর জুড়ে এখন অবসাদের ঢেউ। সন্দীপ যেন এক ক্লান্তির বিশাল মরুভূমিতে শুয়ে রয়েছে।

বাইবে কিছু পায়ের শব্দ এবং চাপা কথাবার্তা শোনা যেতেই চুনীলাল উঠে দাঁড়ালো। অস্ফুট স্বরে বললো, সাহেব ফিরলেন বোধহয়। দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

চাচাজি! ক্লান্ত অবসন্ন সন্দীপ মুহূর্তে যেন সজাগ হয়ে উঠলো। চাপা গলায় বললো, আমি যাই চাচাজি।

কাঁহা বেটে?

জানি না। কিন্তু এখানে থাকলে বাবা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে পালাতে হবে চাচাজি। আমি বড়ো হয়ে তোমার কাছে একদিন ফিরে আসবো। নিশ্চয়ই আসবো। আর একটা কথা চাচাজি মায়ের একখানা ফটো তোমার কাছে আছে। ওটাকে যত্ন করে রেখো। আমি যদি চাই আমাকে কখনও না করো না। মুহূর্ত আর অপেক্ষা করেনি সন্দীপ। পেছনের ছোট্ট দেওয়াল টপকে অন্ধকারের মধ্যে অনিশ্চিত আর এক অন্ধকারকেই সে বরণ করে নিল।

বারো বছরের সন্দীপ এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারলো এই বল্লারপুর শহরে তার আর পাওয়ার কিছু নেই। যার মা নেই তার কেউ নেই। সুতরাং পালাতে হবে এখান থেকে। শুধু কয়েকটা বছরের জন্য। একটু বড়ো হয়ে সে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে এই শহরে। তার মাকে যে-মানুষটা হাত-পা-মুখ বেঁধে অসহায় করে নিষ্ঠুরের মতো আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে সেটা মানুষটাকে ঠিক ওই ভাবেই মারবার জন্য সন্দীপকে ফিরে আসতেই হবে। অবশ্য ওই হৃদয়হীন লোকটা যদি ততোদিন এখানে থাকে। যাবেই-বা কোথায়? যেখানেই যাক না কেন সন্দীপ তো একদিন-না-একদিন ওই পাপী মানুষটার মুখোমুখি হবেই। এখন শুধু একরাশ ঘৃণা নিয়ে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা যাক।

বল্লারপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পৌঁছে সন্দীপ দেখলো, ভিখিরি শ্রেণীর কিছু মানুষ, তারই মতো বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। সন্দীপ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিল না। দুর্বলতায় তার চোখে ঘুম নেমে আসতেই সে ওই শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে গিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো।

ভোর-রাতে সন্দীপের যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলো সামনেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। গার্ডসাহেব প্রথমে হুইসিল বাজিয়ে পরে সবুজ পতাকা নেড়ে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিতেই সন্দীপ শোওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সামনের কম্পার্টমেন্টে তখন একঝাঁক কিশোর নিজেদের আনন্দে নিজেরাই মেতে রয়েছে। ট্রেনটা কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে ইত্যাদি জানার কোনও ব্যাপার নেই। সন্দীপ ওই কম্পার্টমেন্টে উঠে এক কোণে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তেই দু-একটা ছেলে এগিয়ে গেল ওর কাছে।

কিঁউ ভাই তুম শো রহে হো?

বহুত নিদ আতে হ্যায়। সন্দীপ খুব আস্তে আস্তে বললো, মুঝে শোনে দো ভাই।

ঠিক হ্যায় ভাই তুম শো যাও। কিন্তু দিল্লি পৌছাবার পরেও যেন বোলো না এখনও আমার ঘুম পাচ্ছে।

না, ঘুমের কথা সন্দীপ আর বলেনি। বরং দিল্লি পৌছবার পথে সে চোখ-কান সজাগ রেখেছে। একসঙ্গে এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জনের মতো এক দঙ্গল ছেলে কী জন্যে নয়াদিল্লি চলেছে সেটা আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। চেহারা বা পোশাকে কাউকেই খুব একটা উজ্জ্বল বলে মনে হলো না। বরং বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ এবং দীনতাই চোখে পড়লো।

একটু একটু করে সন্দীপের কাছে পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ছেলেগুলো মোটামুটি সকলেই অনাথ। মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, কোচিন, ব্যাঙ্গালোর, শাহাবাদ, তান্দুর, প্রভৃতি জায়গা থেকে এদের সংগ্রহ করে নয়াদিল্লির একটা মিশনারি আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফাদার জাতীয় দুজন লোকও সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরাই ওদের দেখাশোনা করছেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজের অবহেলিত এই শিশুরা যেন হারিয়ে না-গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু কাজ করতে পারে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে নিজেদের দাবি যেন নিজেরাই আদায় করে নেয়।

নয়াদিল্লির রিং রোডের ওপর একটি এলাকায় লরেন্স সাহেবের হোলি চাইল্ডকে আশ্রম না-বলে মন্দির বলাই ঠিক হবে। বিভিন্ন বয়সের শ'পাঁচেক বাচ্চাদের কলতানে হোলি চাইল্ড সব সময়েই মুখরিত। লরেন্স সাহেব এবং তাঁর সহযোগীরা প্রতিটি শিশুর ওপর এক অসীম মমতা নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের কাজ করে চলেছেন। কোন ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালো, কে খেলাধুলোয়, কে ভালো ছবি আঁকছে, কার-বা ঝোঁকটা গানের ওপরই বেশি ইত্যাদি লরেন্স সাহেবের নখদর্পণে। সেই মতোই তিনি শিশুদের বিকাশের পথ খোলা রেখেছেন। ওদের চারিত্রিক এবং মানসিক গঠনের দায়িত্ব নিশ্চয়ই লরেন্স সাহেবের, কিন্তু শিশুরা কে কোন লাইনে যাবে সেটা তাদের পছন্দের ব্যাপার। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া লরেন্স সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়।

এই মুহূর্তে লরেন্স সাহেব তাঁর অফিস ঘরে বসে প্রয়োজনীয় কিছু কাগজত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছেন। শুভ্র এক মুখ দাড়ি এবং শ্বেতবসনে বাষট্টি বছরের বৃদ্ধকেও অনেক তরুণ দেখাচ্ছে। আসলে তিনি ওই তরুণ বয়সেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এবং এসেই দেখে-শুনে তাঁর যেটা মনে হয়েছে তা হলো অনেক অনাথ অবহেলিত শিশু বাস করে এখানে। এদের জন্য কিছু একটা করার প্রেরণা তিনি তখনই অনুভব করেছিলেন। সেই থেকে তিনি এই ভারতবর্ষে রয়েছেন। নিজের দেশ সুইডেনে আর কখনও ফিরে যাননি।

বছর ছাব্বিশের একটা ছেলে ঘরে ঢুকতেই লরেন্স সাহেব কাগজ থেকে চোখ তুলে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর এব্রাহিম?

তিরিশটা ছেলেকে আনবার কথা ছিল। আমরা তাদের এনেছিও। এব্রাহিম নামের যুবকটি উত্তর দিল, কিন্তু আরও একটি ছেলে বেশি এসেছে যাকে আমরা আদৌ সংগ্রহ করিনি। সে কি করে অন্যান্য বাচ্চাদের ভিড়ে ঢুকে গেল ঠিক বুঝতে পারছি না!

এসেছে যখন সে নিশ্চয়ই আমাদের এখানে থাকতে চায়। লরেন্স সাহেব শুভ্র হেসে বললেন, যাও ছেলেটিকে পাঠিয়ে দাও।

ফাদার! লরেন্স সাহেবকে সবাই ওই নামেই ডাকে। এব্রাহিমও ডাকলো!

বলো। লরেন্স সাহেব আবার মুখ তুলে চাইলেন।

একটা অসুবিধে হয়েছে ফাদার, আপনাকে সেটাও জানিয়ে রাখি। এব্রাহিম বিনীত সুরে বললো, ছেলেটির নাম, কোথায় থাকে, বাবা-মা আছেন কিনা ইত্যাদি আমরা হাজারবার জিজ্ঞাসা করেও ওর কাছ থেকে একটি শব্দও বার করতে পারিনি। নিরুপায় হয়েই আমরা—

বেশ তো, ছেলেটিকে আমার কাছে পাঠিয়েই দাও না। শুভ্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে লরেন্স সাহেব স্নিগ্ধ হেসে বললেন, এখানে যখন একবার এসে পড়েছে বার করে তো দেওয়া যাবে না।

বারো বছরের সন্দীপ পার্থসারথি লরেন্স সাহেবের ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, সামান্য একটু দ্বিধা নিয়ে সে ওঁর মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়েই রইলো। ওই সুন্দর মানুষটা কি তাকে ফিরিয়ে দেবেন?

এসো। লরেন্স সাহেব প্রশান্ত গলায় নিজেব কাছে ডাকলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সন্দীপ এক অসহায় দৃষ্টি নিয়ে লরেন্স সাহেবকে দেখতে লাগলো। নিঃশব্দে কেটে গেল এক মিনিটের মতো সময়। লরেন্স সাহেব স্বর্গীয় এক সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোমার? যথারীতি কোনও উত্তর না-পেয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু এবারেও কোনও কথা বার করতে পারলেন না। তবে অসীম ধৈর্য লরেন্স সাহেবের। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, সামান্যতম রাগও প্রকাশ করলেন না। বরং একঝলক হাসির সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে বললেন, বোবারা কথা বলতে পারে না। তুমি কোনটা প্রমাণ করতে চাও?

আমার নাম সন্দীপ পার্থসারথি।

চমৎকার নাম তোমার। এতোক্ষণ তাহলে বোবার অভিনয় করছিলে কেন?

এবারে করবো।

তার মানে? বিস্ময়ের সুরে লরেন্স সাহেব জিজ্ঞাসা করতেই সন্দীপ পরিষ্কার যে-কথাটা জানালো তার মানে দাঁড়ালো, সে তার ওই নামটুকুই বলেছে। ওর বাইরে আব একটা কথারও উত্তর দেবে না। সুতরাং তাকে পরবর্তী প্রশ্ন ইত্যাদি করা বৃথা! এতে যদি তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। ফুটপাতে থাকতে নিশ্চয়ই তাকে কেউ বাধা দেবে না।

লরেন্স সাহেব ওর কথা শুনে হেসে ফেললেন। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্যরকম ভাবনার সুযোগ দিল। ছেলেটির চেহারা এবং ওর কথাবার্তায় বেশ মার্জিত ভাব রয়েছে। আর যাইহোক, ও অনাথ বা রাস্তায় ঘোরা শিশু নয়। তবে কি বাড়ি পালানো ছেলে? হতে পারে। সেক্ষেত্রে ছেলেটি যে প্রচন্ড এক মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মা-বাবার নাম, কোথায় বাড়ি ইত্যাদি কিছুই বলতে না-চাওয়ার অর্থই হলো ও-গুলোকে সে অস্বীকার করতে চায়। লরেন্স সাহেব ওর মন বুঝে কোনওরকম জোরাজুরি করলেন না। শুধু বললেন, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানতেও চাই না। ·

আমি কি এখানে থাকতে পারবো?

নিশ্চয়ই পারবে। লরেন্স সাহেবের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। তিনি খুবই আস্তে জানতে চাইলেন, তোমার ধারণা হলো কি করে যে তোমাকে থাকতে দেবো না?

আপনি হয়তো আশা করছেন আমি একদিন-না-একদিন সব খুলে বলবো। সন্দীপ বেশ জোরের সঙ্গে বললো, আমি কিন্তু কোনওদিনই সেটা বলবো না। তবে এটুকু বলতে পারি কোনও পাপ করে আমি আপনার কাছে আসিনি।

পাপ করলে এতো জোর থাকে না সন্দীপ। লরেন্স সাহেব অবিচল কণ্ঠে বললেন, তোমার ইচ্ছে না-হলে তুমি আমাকে কোনও দিনও জানিও না। ওটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। এবারে নিশ্চিন্ত হলে তো? যাও, প্রার্থনার সময় হয়ে এলো—

হোলি চাইল্ড-এ সন্দীপের চারটে দিন প্রায় নীরবেই কাটলো। কোনওরকম অসুবিধেয় সে কাউকেই ফেললো না তবুও ওকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ একটু অসুবিধেয়ই পড়লো। এই চারটে দিন সন্দীপ ছবি আঁকার ক্লাসে গিয়ে শুধু একটা ছবিই আঁকলো। আগুন আর আগুন। দাউ দাউ করে সেই আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা মানুষের ছবি। অসহায় হয়ে সে পুড়ছে।

এটা কি এঁকেছো তুমি? লরেন্স সাহেব কপালে বেশ কয়েকটা চিন্তার গভীর ভাঁজ নিয়ে নতুন এক দৃষ্টিতে সন্দীপকে জরিপ করতে লাগলেন। ওর ভেতরটা কি তিনি একটু একটু করে পাঠ করতে পারছেন? সেই কারণেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি হয়েছে সন্দীপ?

একটা ছবি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। লরেন্স সাহেব একটু জোর দিয়েই জানতে চাইলেন, একই ছবি চার

দিন ধরে আঁকছো কেন?

সারা জীবন ধরে আমি এই একটা ছবিই আঁকবো।

হোলি চাইল্ড-এর পরিবেশ যতো ভালোই হোক লরেন্স সাহেব স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলেন, সন্দীপকে বাড়ির ঘরোয়া পরিবেশে রাখাটাই হবে তাঁর প্রথম কাজ। এখানে এতো শিশুর ভিড়েও সে সম্পূর্ণ একাকী। সন্দীপের শূন্য মনে যে-আগুন জ্বলছে তারই প্রতিফলন ওই ছবি। এই অবস্থায় হোলি চাইল্ডে ওকে রাখাটা ঠিক হবে না। কোনও ফ্যামিলির মধ্যে রেখে বরং ওর মনের ক্ষুব্ধতাকে প্রশমিত করা দরকার। লরেন্স সাহেবের চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

এমনিতে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি লরেন্স সাহেবের হোলি চাইল্ড থেকে শিশুদের নিয়ে গিয়ে সন্তানের মতোই মানুষ করেছেন সেটা আলাদা ব্যাপার। সন্দীপকে নিশ্চয়ই তেমন একটা ফ্যামিলিতে রাখার জন্য লরেন্স সাহেব চিন্তা-ভাবনা করছেন না। তিনি চাইছেন এমন একটা বাড়ি, যে-বাড়ির মা-বাবাকে ঘিরে কিছু শিশুও রয়েছে। মা-বাবা এবং শিশুদের মাঝখানে থেকে সন্দীপ নিঃসঙ্গতার বেড়াজালে থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ বর্হিমুখী হয়ে উঠবে। এই ব্যবস্থাটা করতে না-পারলেই সন্দীপকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করে ফেলবে এমন এক নির্জনতা সেখান থেকে ওকে ফেরাবার আর কোনও পথই খোলা থাকবে না।

একটা নাম অবশ্য লরেন্স সাহেবের মনে এলো। বিজয়নাথ লাহিড়ি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। বছর চল্লিশের সুদর্শন সেই অধ্যাপকের সঙ্গে লরেন্স সাহেবের অনেক দিনের হৃদ্যতা। ওঁর স্ত্রী গৌরীর সঙ্গেও তাঁর আলাপ আছে। চমৎকার মহিলা। এতো ধৈর্য এবং শাসনের সঙ্গে স্নেহ দিয়ে তাঁদের যমজ সন্তান দশ বছরের অলোক আর অভীককে গড়ে তুলেছেন, তিনিই পারবেন সন্দীপকেও গ্রহণ করতে।

বিজয়নাথ এবং গৌরী অলোক, অভীককে নিয়ে মাঝে মাঝেই এই চাইল্ড-এ বেড়াতে আসেন। আসলে ওঁরা এখানে এসে স্বর্গীয় এক আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। নিজেদের দুটো মাত্র ছেলেকে নিয়ে তাঁরা কি হিমশিমই না খাচ্ছেন অথচ শ'য়ে শ'য়ে ছেলেদের নিয়ে লরেন্স সাহেব এক অসাধারণ ধৈর্যের প্রতীক হয়ে কতো সহজেই না ওদের যত্ন করে মানুষ তৈরির সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। এই তপস্যার তাপসকে দেখতে, তাঁর কাজের ধারাকে অনুসরণ করতে তাই বিজয়নাথ এবং গৌরীকে আসতেই হয়।

লরেন্স সাহেবের ফোন পেয়ে বিজয়নাথ সেদিন বিকেলেই সপরিবারে হোলি চাইল্ড-এ উপস্থিত হলেন।

ছেলেরা তখন এক একটা দল হয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলায় মেতে উঠেছে। অলোক এবং অভীক গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে গেল ওইদিকে। লরেন্স সাহেব শিশুর সারল্য নিয়ে হেসে বিজয়নাথ এবং গৌরীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন একটা রাধাচূড়া গাছের নীচে। আকাশে টুকরো টুকরো হালকা মেঘের ছায়া। রোদের নরম আলোটা সারা শরীরকে ঘিরে চমৎকার এক উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। এখান থেকে সরে গিয়ে অফিস ঘরে যাবার জন্য কারোরই তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। রাধাচূড়া ফুলের ছায়া মেখে বিজয়নাথ সামান্য হেসে বললেন, ফাদার এই দশ বছরে আমি এবং গৌরীই আপনার এখানে ছুটে এসেছি, আজ আপনি আমাদের ডাকলেন। নিজেদের অত্যন্ত—

চিরকাল আপনি একই রকম বিনয় প্রকাশ করলেন, প্রফেসর। লরেন্স সাহেব একটু মজার সুরে বললেন, এবারে আমাকে কিছু কৃতজ্ঞতা জনানো সুযোগ দিন। আমার একটা উপকার করতে হবে আপনাদের।

আপনার উপকার মানে তো দেশের উপকার। গৌরী হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন, তেমন কাজে লাগতে পারলে আমরাও খুশি হবো।

সন্দীপ পার্থসারথি নামের বারো বছরের ছেলেটি সম্পর্কে লরেন্স সাহেব মোটামুটি সবই জানালেন। ছেলেটির ক্ষত বাইরে নয়—ভেতরে। আগুনের ছবি আঁকতে আঁকতে সে এখানে অন্যরকম হয়ে

যেতে পারে। এখন ওর দরকার ঘরোয়া চিকিৎসা। একটা বাড়িতে রেখেই ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আপনাদের ডেকেছি ঠিক সেই কারণেই। একদিকে আপনারা অন্যদিকে অলোক আর অভীক। সংসারে আমাদের সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলো প্রতি মুহূর্তে সন্দীপের কাছে ধরা পড়তে পড়তেও ও নিজেই একদিন ধরা পড়বে। আমি তাই চাইছি আপনারা যদি—

ফাদার! গৌরী আবেগের সঙ্গে বললেন, আপনি হাজার হাজার ছেলেকে মানুষ করছেন, আমরা কি একজনের দায়িত্বও নিতে পারবো না?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ফাদার। বিজয়নাথ সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা-ভাবনা করে অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, আমার অলোক, অভীকের থেকে ওকে আমি কখনওই ছোট করে দেখবো না।

গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, সন্দীপ কোথায় ফাদার?

সবাই যখন খেলা করছে ও নিশ্চয়ই সেটা করছে না। লরেন্স সাহেব আঙুল তুলে বললেন, ওই দেখুন সন্দীপ একা একা চুপচাপ বসে রয়েছে। এই চারদিন ধরে ওকে কিছুতেই খেলাতে পারলাম না।

লরেন্স সাহেব বিজয়নাথ এবং গৌরীকে নিয়ে আস্তে আস্তে সন্দীপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘাসের ওপর সন্দীপ যেমন বসেছিল ওঁদের একপলক দেখে নিয়ে তেমন ভাবেই বসে রইলো। বোধহয় কয়েকটা মুহূর্ত! সন্দীপ হঠাৎ গৌরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। এটা ঠিক, ওঁকে দেখতে অনেকটা তার মায়ের মতো। বিশেষ করে নাক আর কপালটা তো ওই মায়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সন্দীপ আর একবার তাকালো। উনি ওর মা নন তবুও সন্দীপের একবার ইচ্ছে হলো মা বলে ডাকতে। আসলে এই ছ'দিন ধরে মা বলে ডাকতে না-পেরে ও এক ধরনের শূন্যতা বোধের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ওই হতাশার মধ্যেই মহাশ্বেতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। গৌরী তাই মা না-হয়েও মা।

গৌরী এটুকু বুঝতে পারছিলেন ছেলেটার ভেতরে কিছু একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। যে-কারণে সে এতো উদাস থেকেও বারবার তাঁকে লক্ষ্য করে চলেছে। গৌরী একটু ভরসা পেলেন। ওর মাথায় কোমল হাতখানা বুলিয়ে দিয়ে আরও কোমল গলায় ডাকলেন, সন্দীপ! তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? আমাদের বাড়িতে?

হ্যাঁ, 'মা'ও ঠিক এমন সুরেই কথা বলতেন। ঠিক ওই ভাবেই উচ্চারণ করতে 'সন্দীপ'। তবে শুধু নাম ধরে মহাশ্বেতা কখনও ডাকতেন না। তিনি বলতেন, সন্দীপ বেটে। ওই ডাকটা যে কী চমৎকার শোনাতো মা-র গলায় সেটা কাউকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। এই মহিলাও যদি সন্দীপ বেটে বলে ডাকেন তাহলে কেমন শোনাবে? সন্দীপ একটাও কথা বললো না। একটুও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। বড়ো বড়ো নিষ্পাপ দুটো চোখ গৌরীর দিকে তুলে ধরে নীরবে মাথাটা একটু কাৎ করে তার সম্মতি জানালো। অর্থাৎ সে যাবে।

বিজয়নাথের মেহরউলির বাড়িতে সন্দীপের দুটো সপ্তাহ প্রায় নিশ্চুপেই কাটলো। আসলে ওই বয়সেও সে নিজেকে হাসি-আনন্দের মধ্যে উজাড় করে কখনওই মেলে ধরতে পারেনি। সব সময়েই নীরব এবং নেপথ্যে থাকার প্রবণতাই ওর মধ্যে খুব বেশি করে কাজ করছে। নয়তো অলোক আর অভীক তো ওকে নিয়ে কম টানাটানি করে না। গৌরী ছেলেদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে সন্দীপকে দাদা বলে ডাকতে। অলোক এবং অভীককে এখন প্রায় থামানোই দায় হয়ে উঠেছে। কারণে অকারণে দাদা দাদা করে সারা বাড়ি মাথায় করে নিয়েছে। সন্দীপ যে ওদের ডাকে সাড়া দেয় না, এড়িয়ে চলে ঠিক তা নয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় সে এক চাপা অবসন্নতায় ভুগছে। নয়তো বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময়েও সে অতো ধীর-স্থির এবং শান্ত থাকে কী করে? ওরা যেখানে হেসে গড়িয়ে পড়ছে সেখানেও সন্দীপ আশ্চর্য রকমের নিরুত্তাপের এক গহ্বরে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। অথচ গৌরী এবং বিজয়নাথ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নজর রেখে চলেছেন একটি মাত্র আশা নিয়ে এই বুঝি সন্দীপ তার কৈশোরের সহজ স্বাভাবিকতা নিয়ে বিষাদের খোলস ছেড়ে

বেরিয়ে আসবে। লরেন্স সাহেব একটা কথা বারবার বলেছেন, ওকে খুব বেশি চাপাচাপি করবেন না। নিজে থেকে যেটুকু বলবে তার বেশি প্রশ্ন করে সন্দীপকে বিব্রত করাটা বোধহয় ঠিক হবে না! বিজয়নাথ লাহিড়ি এবং তাঁর স্ত্রী গৌরী লাহিড়ি সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। তাঁদের আপাততো একটাই দুঃখ, সন্দীপকে একটা মুহূর্তের জন্যেও তাঁরা হাসতে দেখলেন না। দু'সপ্তাহ হয়ে গেল ছেলেটা কি আর কখনওই ওই জিনিসটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে না? অথচ অলোক আর অভীকের খেলার সময় সে চমৎকার সঙ্গ দেয়। ওদের প্রায় দাদার মতোই আগলে রাখে।

ইতিমধ্যে সন্দীপ আরও তিন দিন আগুনের ছবি এঁকেছে। প্রথম দুটো দিন গৌরী কিছু বলেননি। কিন্তু তৃতীয় দিনে একবার ছবি এবং আরেকবার সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ভেতরটা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। গৌরী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিয়ে এক সজীব গলায় আবেদন রেখেছিলেন, সন্দীপ, এই ছবিটা আর কখনও এঁকো না কেমন!

ওই কথা বলার পর থেকে কাজ হয়েছে। সন্দীপ আপাততো আর আগুনের ছবি আঁকছে না। তবে ওর জড়তাও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অফুরন্ত হাসি-খুশির উচ্ছল-উজ্জ্বল যে-ছেলেটিকে গৌরী এবং বিজয়নাথ ভরপুর হয়ে দেখতে চাইছেন ঠিক সেই জায়গাটাতেই একটা বিরাট শূন্যতা থেকে যাচ্ছে।

অলোক এবং অভীকের প্রত্যেকদিন স্কুলে যাওয়া দেখতে দেখতে সন্দীপ হঠাৎ একদিন মুখ খুললো, আমিও স্কুলে যাবো। আমাকে ভর্তি করিয়ে দাও।

গৌরী আর বিজয়নাথ তো এটাই চাইছিলেন। নয়তো তারা তো আগেই ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কিছুটা সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে ওর পরিবর্তনের ব্যাপারটা লক্ষ্য করার প্রয়োজন ছিল। বিজয়নাথ অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে সন্দীপকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, নিশ্চয়ই ভর্তি হবে।

আজকেই।

বেশ তো তাই হবে। বিজয়নাথ হেসে আবার গৌরীর চোখের দিকে তাকালেন। বছরের প্রায় মাঝে ভর্তি করানোটা একটা মুস্কিলের ব্যাপার। তবে সবার আগে জানা দরকার সন্দীপ এর আগে স্কুলে পড়াশোনা করেছে কিনা। করলে কোন ক্লাসে? নাকি আদৌ পড়াশোনাই করেনি। এ-সব জানার পর তো ভর্তি ব্যাপারটা আসছে। সেদিক দিয়ে বিজয়নাথের খুব একটা অসুবিধে হবে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পড়াশোনা করতে।

হ্যাঁ।

কোন ক্লাসে?

সেভেন। খুব ছোট্ট অথচ কাটা কাটা উত্তর সন্দীপের।

কোন স্কুলে পড়তে? বিজয়নাথের ওই প্রশ্নে সন্দীপ এবারে একটু সজাগ হয়ে উঠলো। সে পরিষ্কার বললো, বলবো না।

কিন্তু সন্দীপ তুমি যদি—গৌরী ওই পর্যন্ত বলতেই সন্দীপ বড়ো বড়ো চোখ করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। নিরুত্তাপ গলায় বললো স্কুলে ভর্তির সময় সন্দীপ নামটা রাখাও চলবে না। তোমরা আমাকে অন্য একটা নাম দাও।

অশোক! গৌরী অতো-শতো ভাবাভাবির সময় না-দিয়ে প্রথমেই যেটা মনে এলো সেটাই বললেন। এই নামটা তোমার পছন্দ?

হ্যাঁ।

তাহলে অশোক পার্থসারথি—গৌরী তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই সন্দীপ বাধা দিয়ে বলে উঠলো না, পার্থসারথিটাও বাদ যাবে।

কি হবে তাহলে? বিজয়নাথ প্রশ্নটা করে সন্দীপের চোখ মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আজ থেকে আমি অশোক লাহিড়ি। কথাটা বলেই সন্দীপ গৌরী এবং বিজয়নাথের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট আর একটা প্রশ্ন করলো, তোমাদের আপত্তি আছে?

আমরা খুব খুশি হয়েছি বললেও খুবই কম বলা হবে। গৌরী হয়তো আরও কিছু বলতেন। কিন্তু তার আগেই বিজয়নাথ সন্দীপের একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়ে ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে স্মিত হেসে বললেন, আপত্তি কেন থাকবে? তোমাকে অস্বীকার করার জন্য তো গ্রহণ করিনি। আজ থেকে তুমি, আমি, গৌরী, অলোক আর অভীক—কেউ কারো থেকে আলাদা নই।

আট মাস আগে নয়াদিল্লির মডার্ন হাই স্কুলে অশোক লাহিড়ি নামে বারো বছরের যে-ছেলেটিকে বিজয়নাথ লাহিড়ি বেশ কিছুটা দৌড়ঝাঁপ করেই ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন, সে কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় সত্যিই এক অবিশ্বাস্য কান্ড ঘটিয়ে দিল। ক্লাস সেভেন থেকে এইট-এ উঠলো অশোক প্রথম হয়ে। বিজয়নাথ এবং গৌরী তো সারা বাড়িতে হইচই বাধিয়ে দিলেন। এতো পরে ভর্তি হয়েও যে-ছেলে সবাইকে টপকে যেতে পারে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দুজনেই আনন্দের অফুরন্ত রেণু গায়ে মেখে এক মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলেন। এবার থেকে বিজয়নাথ নিজে পড়াবেন অশোককে। ছেলেটা যতোদূর এগোতে চায়, সামনে বাড়তে পারে—ওর জন্য পথ খোলাই রয়েছে।

গৌরী আর বিজয়নাথের হতাশা একটা জায়গাতেই। অশোককে তাঁরা সানন্দে মেনে নিয়েছেন এবং অশোকও নিজেকে এখন আর বাইরের একজন বলে ভাবতে পারে না। অথচ এই আটমাসে একটা মুহূর্তের জন্যে অশোকের দুই ঠোঁটে সামান্য এক টুকরো হাসির রেখাও দেখা গেল না। এই ব্যাপারটাই দুজনকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। নিজের নামের পরিবর্তন, কোথা থেকে আসছে ইত্যাদি না-বলার মধ্যে ওর কিশোর মনে যে-বিরাট দুঃখ জমা হয়ে আছে এটা গৌরী এবং বিজয়নাথের পক্ষে না-বোঝার কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু অতীত নিয়ে অশোক যখন কিছুই বলতে ইচ্ছুক নয়, বিজয়নাথ এবং গৌরীরও ওটা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তাঁরা শুধু অশোক বুক ভরে নিঃশ্বাস নিক, প্রাণ ভরে হাসুক এটাই চাইছেন। আর একটা জিনিসও চাইছেন। এটার অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা নেই, শুধুই আকাঙ্ক্ষা। বিজয়নাথ লাহিড়ি, গৌরী লাহিড়ি দুজনেই কান পেতে রয়েছেন অলোক আর অভীকের মতো অশোকও সেই মধুর সম্ভাষণে তাঁদেরকে আপ্লুত করে দিক।

সেই আকাঙ্ক্ষাটা পূরণ হলো, তবে একজনের ক্ষেত্রে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রথম হওয়ার জন্য অশোক যে-মেডেলটা পেল সেটা হাতে নিয়ে ও বেশ উদভ্রান্তের মতো দেখতে লাগলো। নিজেকে ধরে রাখার তবুও যাহোক একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু গৌরীর কাছে গিয়ে আর পারলো না। মেডেলটা ওঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে অশোক কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে চোখ দুটো জলে ভরে উঠছে। তারপরেই অশোক গৌরীর বুকে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো, মা, মা!

আমি তো তোর মা-ই বাবা! জল গৌরীর দুই চোখেও।

এই দাদা কাঁদছিস কেন? অলোক আর অভীকের অভিযোগের একই সুর। বিজয়নাথ শুধু অশোকের মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে ভেবে চলেছেন, ওর অতীতটা কি ও একবারও খুলে বলবে না? তিনি বুঝেও বুঝে উঠতে পারছেন না, কান্না কেন? কীসের জন্য এই কান্না?

লরেন্স সাহেবের হোলি চাইল্ড-এ সপরিবারে গিয়ে বিজয়নাথ আজ পুরো বিকেলটাই কাটিয়ে দিলেন। ছেলে তিনজন একটু দূরে সরে যেতেই তিনি মূলত অশোককে কেন্দ্র করেই আগামী দিন সম্পর্কে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করলেন। এক সময় তো হেসেই বলে ফেললেন, জানেন ফাদার, গৌরীর কিন্তু একটা প্রমোশন হয়েছে।

কী রকম? লরেন্স সাহেবের দুই চোখে স্নেহের ছায়া। তিনি গৌরীর দিকে চেয়ে বললেন, অশোক নিশ্চয়ই আপনাকেই বেশি আঁকড়ে ধরেছে।

ঠিক তাই ফাদার। খুশির গলায় গৌরী বললেন, গতকাল থেকে ও আমাকে মা বলে ডাকছে। মোমের মতো ও একটু একটু করে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপরেই অশোক সম্পূর্ণ এক

নতুন মানুষ হয়ে উঠবে। আপনাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে করতে আরও সতেরটা বছর কেটে গেল। কিন্তু গৌরীকে ওই 'মা' ডাকা ছাড়া অশোক আর কোনও দুর্বলতা আজ পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। বিজয়নাথ এবং গৌরীর কাছে ওর অতীতটা এখনও অস্পষ্টই রয়ে গেল। অবশ্য ও-সব নিয়ে ওঁদের বিন্দুমাত্র কোনও চিন্তা-ভাবনাও নেই। অশোক তো এখন পুরোপুরি তাদেরই ছেলে। তবে সতেরো বছর আগে যে-আফসোসটা ছিল সেটা কিন্তু আজও রয়েছে। বিজয়নাথকে অশোক একদিনও 'বাবা' বলে ডাকেনি। যদিও তিনি সমস্ত কর্তব্যই করেছেন এবং অলোক আর অভীকের থেকে ওকে এতোটুকু কম করে কোনওদিনই দেখেননি। তবুও বিজয়নাথের ওটা কোনও দুঃখ নয়। আসল ব্যাপারটা হলো এই সুদীর্ঘ সতেরো বছরের মধ্যেও অশোককে হাসতে দেখা গেল না। একটা ছেলে যে কি বিরাট ক্ষুব্ধতা এবং আক্রোশ অথবা অন্য কোনও ধরনের এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে থাকতে পারে যার ফলে সে হাসিকে তার জীবন থেকে নির্বাসনে পাঠাতেও প্রস্তুত, সেটা অশোককে না-দেখলে সত্যিই বোঝার উপায় নেই।

এম. এস. সি-তে চমৎকার রেজাল্ট করার পর বিজয়নাথ ভেবেছিলেন অশোক বুঝি আরেকবার মোমের মতো গলে পড়বে। কিন্তু তেমনটি হয়নি। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও অশোক বাড়িতে ঢুকেছিল অনেকটা উদাসীন হয়ে। এমনকি ফ্রানসিস ইন্ডিয়াতে লোভনীয় চাকরীটা পেয়েও সে আশ্চর্য রকমের শান্ত। হাসি ওকে স্পর্শই করতে পারছিল না। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েও অশোক ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। গৌরীর হাতে সমস্ত টাকাটা তুলে দিয়ে ছোট্ট করে শুধু বলেছিল মা এটা রাখো।

অশোকের বিষাদ ভাবটা কাটাবার জন্য বিজয়নাথ এবং গৌরী ঠিক করলেন ওর বিয়ে দেবেন। ওঁরা দু-একটি মেয়েও দেখে এসেছেন। অলোক আর অভীকের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেবার পর অশোক নিজেই বাধা দিল। বিরাট ভাবে হইচই করে বারণ-টারণ করা নয়। সামান্য একটু উত্তেজনাও তার কথায় প্রকাশ পেল না। অশোক শুধু ওর ভরাট এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ গলায় একটা কথাই বললো, তোমরা কিন্তু আমার বিয়ের চেষ্টা করো না। ওই একটা কথাই যে কি বিরাট তা গৌরী এবং বিজয়নাথ ভালো করেই জানেন। সুতরাং তাঁরা আর ওকে কোনওরকম বিরক্ত করেননি।

তবে এতো বছর বাদে গৌরী, বিজয়নাথ এবারেই প্রথম বেশ অসন্তুষ্ট হলেন অশোকের ওপর। মুষড়ে পড়েছে অলোক এবং অভীকও। মেহেরউলির সারা বাড়িটাই যেন ঝিমুচ্ছে। অথচ অশোকের কিছু করার নেই। বল্লারপুর পেপার মিলের চাকরিটা সে কিছুতেই হারাতে পারবে না। পাঁচশো টাকা কম বেতনেও সে ওখানে যাচ্ছে তো জীবনের একটা ব্রত পালন করার উদ্দেশ্যেই। বিজয়নাথ যদিও নিজেকে ধরে রেখেছেন তবে গৌরী খুবই কান্নাকাটি করছেন। তিনি তো বলেই ফেললেন, এই চাকরি থেকে কী বল্লারপুরের চাকরিটা ভালো হলো? মোটেই নয়। তাহলে তুই আমাদেরকে ছেড়ে সেখানে যাবি কী করতে?

কি করতে? সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি অশোক দিতেই পারতো তাহলে তুষের আগুনের মতো ওর বুকখানা জ্বলছে কেন? বারো বছর বয়স থেকে এই উনত্রিশ, সাড়ে-উনত্রিশ বছর পর্যন্ত ওই আগুনটা তাকে নিঃশব্দে অথচ নিষ্ঠুর ভাবে কুরে কুরে খেয়েছে। অশোক এই যন্ত্রণা সহ্য করেছে তো সেই বল্লারপুরে ফিরে যাবার জন্যই। বিজয়নাথ, গৌরী কষ্ট পাবেন কিন্তু কি করা যাবে?

তুই আরেকবার ভেবে দেখ বাবা। গৌরী প্রায় মিনতির সুরে আবেদন রাখতেই অশোক এবারে বলিষ্ঠ গলায় উত্তর দিল, তোমরা আমাকে বাধা দিয়ো না, কেন-না তোমাদের কথা আমি রাখতে পারবো না।

এতো বড়ো কথা তুই বলতে পারলি? কী আছে বল্লারপুরে?

জানি না, কিছু জানি না। তোমরা শুধু আমাকে যেতে দাও।

অশোক এবারে খুবই আস্তে আস্তে বললো, তোমাদের কষ্ট দিয়ে দুঃখ দিয়ে আমি যেতে চাই না। তোমরা আমাকে অনুমতি দাও।

শাওনা নিষ্পলক চোখে অশোকের দিকে চেয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। সেই গাম্ভীর্য পুরোপুরি বজায় রেখেই অনেকটা আক্রমণের সুরে জিজ্ঞাসা করলো; এই অনুমতি নিয়ে এসেছেন গোপীমোহনকে শেষ করে দুনিয়া সুদ্ধ লোককে কষ্ট দেবেন বলে? এমন কাজ আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না। কিছুতেই না। আমি-আমি....

গোপীমোহন পার্থসারথিকে সতর্ক করে দেবেন?

সে-কথা আমি বলিনি।

দেখুন, কেউ যদি ঠিক করে থাকে একজনকে মারবে—দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই তাকে রক্ষা করে। অশোক অত্যন্ত কঠিন সুরে বললো, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন। গোপীমোহনকে জানিয়ে দিয়ে শুধু শুধু বিশ্বাসঘাতকের আখ্যাটুকু কেন নেবেন?

অশোকজি, আপনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। শাওনা এবারে আর উত্তেজিত হলো না। অনুনয়ের সুরে বললো, শত হলেও গোপীমোহন পার্থসারথি আপনার বাবা। এতো বড়ো কলঙ্কের বোঝাটা আপনি কেন নেবেন? ওই মানুষটার অন্যায় এবং পাপকে আমি বিন্দুমাত্র সমর্থন করছি না, কিন্তু আপনাকে এটুকু অনুরোধ তো নিশ্চয়ই করতে পারি, নিজের হাতে এমন করে আইন তুলে নেবেন না। শাওনা একটু থেমে আরও ভেঙে বললো, আপনার ভবিষ্যৎ কি হবে চিন্তা করেছেন? আইন আপনাকে ছেড়ে দেবে?

আমার ভবিষ্যৎ? সেটা তো সতেরো বছর ধরে ঠিক করেই রেখেছি। গোপীমোহনকে খুন করলে আমার ফাঁসি হবে এই তো? মরতে আমি ভয় পাই না।

অশোকজি, আপনার কষ্ট আমি বুঝি। শাওনা আরও কোমল গলায় বললো, গোপীমোহন পার্থসারথিকে শাস্তি দিতে গিয়ে আপনি নিজে কেন শাস্তি নেবেন? আমি বুঝতে পারছি আপনার মাকে যে-ভাবে মারা হয়েছে এবং ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হয়ে সেই বীভৎসতা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এটা সহজে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। গোপীমোহন পার্থসারথি নিজে মেরে সমস্ত ঘটনাটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে সাজিয়ে চমৎকার ভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন। তাঁর গায়ে একটা আঁচড়ও পড়লো না। বরং সুষমা দেবীকে কিছু দিনের মধ্যে বিয়ে করে তাঁর আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করলেন। যে-কোনও সুস্থ মানুষও এ-সব জেনে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেদিক দিয়ে আপনাকে আমি বিন্দুমাত্র দোষারোপ করতে পারি না। আমি হলেও হয়তো এমনটাই করতাম। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, আপনি যে আর একজনকে মা বলে ডেকেছেন সেই গৌরীদেবীর কি হবে? ভাইয়ের মতো বুকে আগলে যাদের স্নেহ দিয়েছেন সেই অলোক, অভীকের মানসিক অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? আর বিজয়নাথ? যিনি বাবার চেয়েও সম্ভবত বেশি কর্তব্য করেছেন তাঁকে আপনি এই আঘাতটা দেবেন কোন যুক্তিতে? আপনি নিজেই তো বুঝতে পারছেন গোপীমোহনকে হত্যা করলে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে এক চরম শাস্তি। আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এই ভাবে একটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন কেন? তাঁরা যে সতেরো বছর ধরে আপনাকে মানুষ করেছেন তার প্রতিদান বুঝি এমন করে দিতে হয়? আপনি যদি একা হতেন এতো কথা আমি কিছুতেই বলতাম না। আপনি এখন আর একা নন অশোকজি। আপনি একা নন...শাওনার গলাটা কান্নার মতো ভিজে উঠতেই সে নিজেকে যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করলো।

শাওনাজি, এখন আর আমাকে এ-সব বলে কোনও লাভ নেই। অশোকের গুরুগম্ভীর গলাটা যেন আরও গমগম করে উঠলো।

এর অর্থ আপনি অন্য কারো কথা চিন্তা করবেন না?

সেই সময় আমি পেলাম কোথায়? এই জীবনটা তো একটা মাত্র চিন্তাতেই কেটে গেল। সেটা আমাকে পূরণ করতে দিন।

কক্ষনও না। একটা কথা আপনাকে বারবার বলেও বোঝাতে পারছি না—

বোঝাতে পারবেনও না। অশোক যেন ওর শেষ কথাটাই শুনিয়ে দিল।

একটা কথা বলবো আপনাকে—শাওনা যথেষ্ট আবেগ নিয়ে অশোকের চোখের দিকে চেয়ে

বললো, একটু ধৈর্য এবং একটু মন দিয়েই সেটা শুনতে হবে কিন্তু—

বলুন।

আমাদের গুরু গ্রন্থসাহেবে সন্ত কবি ফরিদের লেখা দুটো লাইন আছে। এই মুহূর্তে যেটা বার বার মনে পড়ছে। সেই লাইন দুটোর অর্থ হলো 'তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে, তবে তুমি তার প্রত্যাঘাত করো না। আঘাতকারীর পায়ে চুমু খেয়ে তুমি তোমার নিজের কাজে চলে যাও।'

আপনি এখন আপনার নিজের কাজে চলে যেতে পারেন।

প্লিজ এ-ভাবে আপনি কথা বলবেন না। শাওনার সবচেয়ে বড়ো গুণ ও কখনওই ওর মেজাজ হারায় না। এক্ষেত্রেও কোনওরকম রাগ বা অভিমান দেখালো না। বরং কমনীয়তার একঝলক পরশ বুলিয়ে আরও আবেদনের ভঙ্গিতে বললো, আপনার বুকের মধ্যে অস্থির অশান্ত এক ক্রোধের লাভা জমা হয়ে আছে। আমি তার আঁচ ঠিকই পাচ্ছি অশোকজি, কিন্তু জেনে-শুনে আপনাকে নিশ্চয়ই খুনীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি না। আপনি বরং এখানকার এস. পি-র সঙ্গে একবার দেখা করুন।

আপনার উপদেশের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ চাই না। আমি চাই আপনি আমার কথাটা শুনুন।

কেন শুনবো? গোপীমোহন পার্থসারথিকে বাঁচাবার জন্য? অশোকের মুখখানা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলো। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বেশ জোরেই বললো, আমার মাকে যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তখন ওই লোকটাকে কেউ নীতি কথা শোনায়নি, এস. পি সাহেবকে ডেকে ধরিয়ে দেবার কথাও কেউ বলেনি। আমি তখন নেহাতই এক বাচ্চা—অশোক চোয়াল শক্ত করে শাওনাকে দেখতে লাগলো আমার ব্যাপারটা আমাকে বুঝে নিতে দিন।

সতেরো বছর বাদে বন্ধ দুয়ারটা খুলে দেবার ফলে অশোক হাল্কা তো হলোই না বরং রাগে কাঁপতে লাগলো। ওর ওই পুঞ্জীভূত আক্রোশের মুখে দুর্বার গতির যে-কোনও শক্তিও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বাধ্য। অশোকের থমথমে সারা মুখটাই যেন একটা আগ্নেয়গিরি। শাওনা আড়চোখে ওকে দেখবার চেষ্টা করতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। অশোক বললো, আপনি একটু আগেই আঘাতকারীর পায়ে চুমু-টুমু খেয়ে চলে যাবার কথা বলছিলেন—আপনাদের গুরু গ্রন্থসাহেবকে বা সন্ত কবি ফরিদকে আমি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা করছি না। কিন্তু ওই উপদেশটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমার ক্ষেত্রে আর একজন মহাপুরুষের বাণীই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন : 'সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ হইতেছে অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোষ করা। মানুষের পক্ষে বড়ো পুণ্য হইতেছে, যতোই মূল্য দিতে হোক না কেন অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা।'

তিনি নিশ্চয় খুন করার কথা বলেননি।

এ-ছাড়া আমার অন্য কোনও পথ নেই। আমি তো বলেইছি হঠাৎ অশোক বুকে হাত চেপে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর শুয়ে পড়তেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শাওনা। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো? কষ্ট হচ্ছে?

ডাক্তারকে ডাকার জন্য শাওনা ফোনের কাছে যেতেই অশোক নিস্তেজ গলায় বললো, কাউকে ডাকাডাকির প্রয়োজন নেই। এই ব্যথা তো আজকের নয়, আপনি-আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কিছু? আমার বুকের মধ্যে হাজার হাজার ঘোড়ার দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গতিতে ওরা ছোটাছুটি করছে। এই চাপ সহ্য করতে একটু কষ্ট তো হবেই।

মিনিট পাঁচেক সময় দুজনের কেউই কোনওরকম শব্দ তুললো না। যেন মৌন থেকে নীরবতা পালনের প্রতিযোগিতা চলছে। খাটের পাশের একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে শাওনা। অলস ভঙ্গিমায় শুয়ে থেকে অশোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আমি ভেবে পাই না, মানুষ মরতে এতো ভয় পায় কেন বলুন তো?

জীবনের প্রতি ভালোবাসা থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

যে অর্থে জীবন, সেই জীবনটাই যার নেই সে কি করবে?

সে ভালোবাসার প্রার্থনা জানাবে।

তার মানে বিয়ে, সন্তান, সুখী একটা গৃহকোণ এই সব?

তা কেন? শাওনা ওর আয়ত চোখ দুটো অশোকের মুখের ওপর একপলক ঘুরিয়ে নিয়ে খুব আস্তে, কিন্তু গভীর সুরে বললো, মানুষের প্রতি মমতা, বিশ্বাস আর সহানুভূতির ওপর আস্থা রাখতে গেলে ভালোবাসার জন্য প্রার্থনা করতেই হবে। ভালোবাসাই মানুষকে মহান করে তোলে।

কথাগুলো শাওনা বলছিল বটে কিন্তু ওর মন ডুবে আছে অন্য একটা দুশ্চিন্তায়। একটু আগেই অশোক বুকে হাত চেপে শুয়ে পড়েছিল। ঘোড়ার দাপাদাপি ইত্যাদি প্রভৃতি ও যে-ভাবেই বলুক না কেন আসলে সত্যি অশোক যে বুকের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছে সেটা ওর শুয়ে পড়া দেখেই বোঝা যায়। ওই ব্যথা নাকি আজকের নয়। তাহলে চিকিৎসা করাচ্ছে না কেন? নাকি ওটাও এক ধরনের বিলাসিতা? ছেলেটি প্রচন্ড জেদি এবং খামখেয়ালীপনায় সবার শীর্ষে থাকতেই পছন্দ করে। কারো ভালো কথাও শুনতে চায় না। সেক্ষেত্রে ওকে কিছু বলতে যাওয়াটাও অপমানের। অথচ না-বলেও চুপচাপ থাকা যায় না। বিপদকে শিয়রে রেখে কেউ নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। সে-কথাই শাওনা জিজ্ঞেস করলো, আপনার এই বুকেব ব্যথাটার জন্য ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন? শব্দ-টব্দ বলে কি লাভ? নিযমিত চিকিৎসা করান।

কী হবে? অশোক খুব ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে উল্টে শাওনাকেই প্রশ্ন করে বসলো।

আপনি জানেন না কী হবে? শাওনা এবারে একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা কবে বললো, ভালো হয়ে যাবেন।

বল্লারপুরের জলবায়ুটা সত্যিই ভালো মনে হয় এবাবে আমি সুস্থ হয়ে যাবো। অদ্ভুত এক কাটা কাটা সুরে কথাটা বলেই অশোকের হঠাৎ মনে হলো শাওনাকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া দরকার। সত্যি একজন ভালো ডাক্তারের খোঁজ-খবর নিয়ে ব্যাপারটা যে সিরিয়াসলি এগোচ্ছে এটা বোঝানোর প্রয়োজন আছে। অবশ্য ও-সব নিয়ে অশোকের নিজের কোনও মাথাব্যথা নেই। সে এখানে তার কাজ হাসিল করতে এসেছে। কারো মন রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই আসেনি, তবে শাওনাজি বড়ো বেশি কথার অবতারণা করে নিজে জড়িয়ে তাকেও জড়াতে চাইছে। সেদিক থেকে দূরে থাকাটাই নিরাপদ। অশোকের পথ যখন আলাদা, একজনকে মিথ্যে আশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়াটাও ঠিক নয়। বিশেষ পছন্দের একজনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বললে তাব প্রতিক্রিয়া অন্যবকম হতে বাধ্য। অশোক বুঝতে পারছে শাওনাজি তাকে যে দৃষ্টি নিয়ে দেখছে তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, তার অটল প্রতিজ্ঞায় এতোটুকুও চিড় ধরবে না—কিন্তু ওই নরম মৃদুভাষী মেয়েটা ভেঙে পড়বে। সুতরাং ওকে একটু আঘাত দিয়ে শক্ত জমিব রাস্তাটা চিনিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। অশোক বললো, আপনি কিন্তু অনেকক্ষণ এসেছেন।

তাতে কী? শাওনা মৃদু হাসলো, যদি তাড়িয়ে দিতে চান সেটা অন্য প্রশ্ন। তবে কেউ বাড়িতে এলে তার সঙ্গে কথা বলার রীতি বুঝি এই?

রীতি-নীতি আমি একটু কমই বুঝি। অশোক রুক্ষ গলায় উত্তর দিল, আসলে এতোটা সময় ধরে আমি এর আগে কখনও কথা বলিনি। আমি তাই ক্লান্ত।

শাওনার চিন্তাটা প্রথম থেকেই অন্যরকম ছিল। গোপীমোহন পার্থসারথিকে খুন করার মতলবটা সে অশোকের মাথা থেকে ছাড়াবেই। প্রতিশোধ নেবার জন্য অনেক রাস্তা রয়েছে। অশোককে সে কিছুতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। ওর একগুঁয়েমির ওই সর্বনাশের পথে শাওনা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ওকে একটু একটু করে নিস্তেজের শেষ ধাপে নামিয়ে এক শান্ত মানুষ গড়ে তুলবে। এতো কথার জাল বুনে চলেছে তো ওই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। ওকে আগলে রেখেছে চিন্তার ভূতটা যাতে আবার মাথায় চেপে না-বসে, কিন্তু অশোক যদি এমন ধরনের কথাবার্তা বলে তাহলে তো তার উপস্থিতিটাই আরও করুণ হয়ে উঠবে। তবে বাচ্চা মেয়ের অভিমান নিয়ে সে নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না। অশোককে একা রেখে আজে-বাজে ভাবনার সুযোগ না-দিয়ে ওর সঙ্গেই কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে আরও বেশি ব্যস্ত রাখতে হবে। এতো সহজে

শাওনা হার মানতে চায় না। সে ঠিক করেছে কয়েকটা দিন একটু বেশি সময় নিয়েই অশোকের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এতো ও যদি অপমান করতে চায় করতে পারে। শাওনা এক ফোঁটাও গায়ে মাখবে না। সে বললো, যদি ক্লান্তবোধ করেন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

আপনি কী করবেন?

আমি জেগে থাকবো। শাওনা তির্যক হেসে বললো, আপনার ঘুম দেখে আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বো না।

বাইরের কারো সামনে আমি ঘুমোতে পারি না। আমার অস্বস্তি লাগে। অশোক কী যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দিল, তাছাড়া আমি এখন একা থাকতে চাই।

কেন?

সেটাও আপনাকে বলতে হবে? অশোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে আপনি হয়তো এগিয়ে এসেছেন কিন্তু বাড়াবাড়িটা আমি পছন্দ করি না।

আপনি তো অনেক কিছুই পছন্দ করেন না।

ঠিক তাই। অশোক আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, এমনকি কারো বন্ধুত্বও!

এ-ভাবে আপনি আমাকে সরাতে পারবেন না। শাওনা হেসে ফেললো, অহেতুক রাগ না-দেখিয়ে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলুন—তাতে হয়তো কাজ হলেও হতে পারে।

আপনার হাতে-পায়ে ধরছি। আপনি আসুন—

আচ্ছা, আপনার কি ক্ষতি করেছি বলুন তো? শাওনা কিন্তু এবারে একটু অবাকই হলো। সে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো, ছেলেটা আজ দারুণ ভেঙে পড়েছে। যাকে যা খুশি বলে দিতে পারে। কিন্তু কতো আর নিজের গায়ে না-নিয়ে পারা যায়? একতরফা ভাবে সেই শুধু উদারতা দেখাবে আর একজন মনের সুখে তার সুযোগ নিয়ে আক্রমণের ঢেউ তুলবে এটা কতোক্ষণ চলতে পারে? শাওনা বিমর্ষভঙ্গিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকের জানলার কাছে গিয়ে বাইরের আকাশটা দেখতে লাগলো।

অশোক বিছানায় বসেই শাওনাকে লক্ষ্য করলো। এই মুহূর্তে তার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে। জানলা দিয়ে কী দেখছে সেটা ও-ই জানে। তবে শাওনা তাকে একটা প্রশ্ন করেছে, 'আপনার কি ক্ষতি করেছি বলুন তো?' সেটা ও কেমন করে বুঝবে? শাওনা সময় চুরি করে তাকে এখন এই বেলা সওয়া-দশটা পর্যন্ত আটকে রেখেছে।

অশোক আর দেরি করতে চাইছিল না। সে মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে, শাওনা যখন ব্যাপারটা জেনে গেছে এবং যদিও তাকে বিশ্বাস করা যায়—তবুও গোপীমোহন পার্থসারথিকে শেষ করার খেলাটা আজই মিটিয়ে ফেলবে। সময়কে আর বয়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। শাওনা সিং একটু বেশি মাত্রায় নরমপন্থী এবং ধর্মভীরু প্রকৃতির মেয়ে। হয়তো গোপীমোহনকে সতর্ক করে দিলেও দিতে পারে। সুতরাং অশোককে যা করার আজকেই করতে হবে। কিন্তু শাওনা যদি এখন তার ঘর ছেড়েই না-যায় সে কি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে? রূঢ় কথায় তো কোনও কাজই হলো না। এবারে একটু অন্য পথ নেওয়া যাক। অশোক শান্ত গলায় বললো, আপনি আমার কোনও ক্ষতিই করেননি।

তাহলে এই ব্যবহারটা কেন করছেন? অভিমানে পূর্ণ হয়ে উঠলো শাওনা। সে বেশ আহত সুরেই বললো, কোনও প্রয়োজন ছিল না। আপনি ইচ্ছে করেই এমনটা করলেন।

অশোক যেন ধরা পড়ে গেল। শাওনা তাকে খুব ভালোই ধরতে পেরেছে। অতোএব সহজ স্বীকারোক্তিতে দোষ মেনে নেওয়াই ভালো। অশোক লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য হলো, আমার অবস্থাটা তো আপনি বুঝতেই পারছেন, সব ক্ষেত্রে এতো বিচক্ষণতা দেখানো কি আমার পক্ষে সম্ভব? দোষ-গুণ নিয়ে আমিও তো একজন মানুষই। আমার অর্ন্যায়টা আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমার চোখে দেখবেন?

অবাক হয়ে শাওনা অশোকের কথাগুলো শুনছিল আর ওর চোখে চোখ রেখে একটা কথাই ভাবছিল, এই ছেলেটাই কি একটু আগে জেদ এবং তেজের শীর্ষবিন্দুতে বিচরণ করছিল? ব্যাপারটার এতো দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মনের মধ্যে জটিল এক দ্বিধা আসাটা স্বাভাবিক। তবুও শাওনার

বিশ্বাস হলো, অশোক নিজেকে শুদ্ধ করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ক্ষমার কোনও প্রশ্ন নেই। চমৎকার হাসি ছড়িয়ে শাওনা বললো, আপনি অনুতপ্ত হয়েছেন এটাই যথেষ্ট।

সত্যিই আমি দুঃখিত।

এতোবার বলতে হবে না—তবে কথা একটা আপনাকে রাখতে হবে। ছোট্ট মেয়ের মতো বায়না ধরলো শাওনা, আজকে দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন।

অসুবিধের কী আছে—খেতে পারি। অশোককে মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা আজ তাকে কিছুতেই ছাড়বে না এবং যতোক্ষণ পারবে ঠিক এই ভাবেই আগলে রাখার চেষ্টা করে যাবে। এরমধ্যেই গোপীমোহনের অন্তিম সময়টুকু বার করে নিতে না-পারলে পরে সারা জীবনের জন্য অশোককে আফসোস করতে হবে। সুতরাং শাওনা এখন যা বলবে তাতেই রাজি হয়ে মোটামুটি সহযোগিতার পথ ধরে চলাটাই উচিত। দুপুরের খাওয়ার নিশ্চয়তা পেলে ও নিশ্চয়ই এখানে আর সময় কাটাবে না। অন্তত একটু আগে বাড়িতে যাবেই।

গতকাল সিমুইয়ের পায়েস আর পুডিং আমরা কেউই খাইনি।

খুব খারাপ লাগছে আমার। তবে—অশোক কোনওরকম ভণিতা করলো না। বললো, একজন না-থাকলে খাওয়াটা এই ভাবে বর্জন করাও ঠিক নয়। কারও জন্যেই কোনও কিছু আটকে থাকে না। আপনারা খেয়ে নিলে পারতেন।

আজকে খাবো। শাওনা কাঁচা সোনা রোদের মতো ঝিকমিকিয়ে হেসে খুব নরম গলায় বললো, আমি তাহলে বাড়ি যাচ্ছি। কখন আসছেন আপনি?

একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান-টান করেই যাবো। এতো বড়ো মিথ্যে কথাটা কি শাওনার চোখের দিকে চেয়ে বলা যায়? অশোক অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো বটে তবে নিজেরই খুব খারাপ লাগছে। অথচ এ-ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।

শাওনা চলে যেতেই অশোক বালিশের তলা থেকে মহাশ্বেতার ফটোখানা বের করে পলকহীন চোখে দেখতে লাগলো। এখনও ওর সঙ্গে মনে হয়, মা বুঝি পাশের ঘরেই রয়েছেন। এক্ষুনি এই ঘরে এসে তাড়া দেবেন, সন্দীপ বেটে আভিতক নাহানে নেহি গয়ে? যা বাবা স্নানটা চটপট সেরে আয়।

অশোকের মুখটা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠলো। গতকাল কোন্ডকুঁয়া গ্রামে গিয়ে সে মায়ের এই ছবিটা এনেছে চাচাজির স্ত্রী সুরোতিয়ার কাছ থেকে। কথা প্রসঙ্গে সেই বৃদ্ধা মহিলা যা জানিয়েছেন তার সারমর্ম হলো : মহাশ্বেতার মৃত্যুর পর চুনীলাল জয়াকর খুবই মুষড়ে পড়ে। সন্দীপ যে কোথায় হারিয়ে গেল সেটা চিন্তা করেও সে ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগলো। কিন্তু পার্থসারথি সাহেব যখন স্ত্রীর শোক অনায়াসে ভুলে কিছু দিনের মধ্যে সুষমাকে বিয়ে করলেন, চুনীলাল ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারেনি। সাহেবের বাড়ি ছেড়ে সেই যে সে বেরিয়ে এসেছে আর কখনও ভুলেও যায়নি। তারপর থেকে চুনীলালের একটাই বক্তব্য ছিল, সন্দীপ আসবে। ওর মায়ের ফটোখানা নেবার জন্য ও নিশ্চয়ই একদিন আমার কাছে আসবে। সেই আসা তুমি এলে বটে কিন্তু ও তো আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। স্বামীর শোকে সুরোতিয়া নতুন করে চোখের জল ফেললেন।

হাত দুটো মুঠো করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ালো অশোক। শুধু নির্দয় নয়, কতোখানি নির্লজ্জ হলে সাত দিনের মধ্যে গোপীমোহন সুষমাকে বিয়ে করে মহাশ্বেতাকে মুছে ফেলতে চাইছিলেন—এরপরেও ওঁকে ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার মাকে ঠিক যেভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল অশোকও ঠিক তেমন ভাবেই গোপীমোহন পার্থসারথিকে পুড়িয়ে মারবে। তবে তার সঙ্গে সারাক্ষণই একটা রিভলবার থাকে। ওটারও দু-একটার শব্দ শোনা যেতে পারে।

অশোক ডান হাতটা তুলে ধরে আস্তে আস্তে নাকের ওপর চেপে ধরলো। তার সারা গায়ে কেরোসিনের গন্ধটা কি এখনও রয়েছে? গোপীমোহন পার্থসারথি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সন্তানকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন—এটা ভাবা যায়, না কেউ বিশ্বাস করবে? অবশ্য কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর অশোক আর দাঁড়িয়ে

নেই। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিও তার কোনওরকম আস্থা নেই। অন্য ব্যাপার হলে যদিও বা আনুগত্য দেখাতো, কিন্তু ঘটনাটা যেখানে তার মাকে নিয়ে—প্রতিহিংসার যে-ক্ষত তার বুকে এতো বছর ধরে বাসা বেঁধে আছে সেটাকে ভেঙে ফেলা কখনওই সম্ভব নয়।

গেস্ট হাউসের ষোলো নম্বর ঘর ছেড়ে অশোক রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। শপ সেন্টারের দিকে একবার যেতে হবে। ওর পকেটে চ্যাপ্টা ধরনের একটা বোতল আছে। ওটা ভর্তি করে মিট্টি কা তেল অর্থাৎ কেরোসিন তেল নিতে যেন ভুল হয়ে না-যায়। অদৃশ্য এক জায়গায় হাত রেখে অশোক-র আগ্নেয়াস্ত্রের উপস্থিতিটা আর একবার অনুভব করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

তেল-টেল কিনে অশোক যখন ফিরে আসছে হরি ভাইয়ের পানের দোকানের সামনে বিক্রম যথারীতি তার তিন-চারজন বন্ধুকে নিয়ে জটলা করছে। অশোককে দেখে সে বলে উঠলো, গুড মর্নিং অশোকজি!

গুড মর্নিং।

ক্যায়সা হ্যায় আপ?

আচ্ছে হ্যায় ভাই।

এক পান তো খাকে যাইয়ে—বিক্রম রবিবারের ছুটির আমেজে টপ মুডেই রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। অশোক কোনোদিন পান-টান খায়নি। অনায়াসেই সে কাটাতে পারতো, নয়তো বলতে পারতো পান নয়—একটা সিগারেট খেতে পারি। কিন্তু ও-সব কিছুই সে বললো না। বন্ধুর ইচ্ছেটা শেষ বেলায় পূর্ণ করতে দোষ কী? ও না-জানুক, অশোক তো জানে বিক্রম তার কতো কাছের বন্ধু ছিল।

বল্লারপুর পেপারমিলের চেয়ারম্যানের বাংলোর গেটে যে দারোয়ানটি পাহারায় রয়েছে সে অশোকের মুখের দিকে তাকাতেই ও গম্ভীর গলায় বললো, আমি পেপারমিলের ও. এস. ডি। সাহেবের সঙ্গে দরকার আছে। দারোয়ান ও-কথা শুনে আর বাধা দিল না। বরং ও. এস. ডি সাহেবকে একটা সেলাম জানিয়ে সে তার কর্তব্য সারলো। কংক্রিট শ্ল্যাপের সামান্য চড়াই পথ পেরিয়ে অশোক বারান্দায় উঠে ভেতরের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে দেখলো, চারদিক বেশ শুনশান। কাউকেই নজরে পড়লো না। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে সে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। বিশাল ঘর। চেয়ারম্যানের ড্রয়িংরুম ওটা। এক কোণে একজন মধ্যবয়স্কা কাজের মহিলা বোধহয় মেঝে পরিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, অশোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?

সাহেব আছেন?

হ্যাঁ। উনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন।

মেমসাহেব?

স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছেন।

আমি পেপার মিল থেকে আসছি। স্বচ্ছন্দ গলায় অশোক বললো সাহেব আমাকে আসতে বলেছিলেন।

আপনি ভেতরে চলে যান। ওখানে ভজনলাল আছে। ওকে বললেই সাহেবের দেখা পেয়ে যাবেন।

অশোক কোনও ভজনলালেরই দেখা পেল না। ওটা অবশ্য ওর কাছে কোনও জরুরি ব্যাপার নয়। গোপীমোহন পার্থসারথি যে-ঘরে শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন অশোক দ্রুতগতিতে সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ছিটকিনির শব্দে গোপীমোহন এ-পাশে ফিরতেই অশোকের হাতে রিভলবার দেখে চমকে উঠলেন। ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কে, কে তুমি?

আপনার মৃত্যুর পর মুখাগ্নির কাজটা যাকে করতে হবে—কথাটা শেষ করেই অশোক গোপীমোহনের তলপেটে পরপর দুটো গুলি করতেই উনি দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়লেন। কাতর গলায় বললেন, তুমি আমাকে এ-ভাবে মেরো না......

না। এ-ভাবে সত্যিই মারবো না। অশোকের চোয়াল দুটো পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তার দুই চোখে। কোনওরকম মায়া-দয়া দেখানোর প্রশ্নই নেই। তার মায়ের আত্মাটা বোধহয় এইবারে একটু শান্তি পাবে। অশোক প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত

হয়ে পড়লো। আলনায় যেন শাড়ির প্রদর্শনী। ওর থেকেই একটা টেনে নিয়ে অশোক বেশ ভালো করেই গোপীমোহন পার্থসারথির দুটো হাত এবং পা বেঁধে দিল। ওই মানুষটা যাতে কোনওরকম বাধার সৃষ্টি করতে না-পারে সেই কারণেই গুলি দুটো চালাতে হলো স্রেফ অকেজো করে দেবার জন্যই। দাঁতে দাঁত চেপে অশোক প্যান্টের পকেট থেকে কেরোসিনের বোতলটা বের করে বললো আপনি যেমন ভাবে আমার মাকে মেরে আনন্দ পেয়েছিলেন, আমিও তার বাইরে যেতে চাই না। বন্দি মানুষটার সারা গায়ে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে অশোক যেন স্নান করিয়ে দিল। বেশি সময় নেওয়া একেবারেই উচিত নয়। দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালাতেই গোপীমোহন পার্থসারথি রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, সন্দীপ, ছেলে হয়ে তুমি এ-কাজ করো না। আমাকে বাঁচতে দাও......সন্দীপ..... গোপীমোহন হাউহাউ করে কাঁদছেন। আমি তোমার পায়ে ধরছি.....আমি তোমার......

সতেরো বছর ছয় মাস আগে আমার মা-ও এমন ভাবে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন বাঁচার জন্য। আপনি শুনেছিলেন? আমাকেও তো মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।

সন্দীপ বেটে!

থাক। আপনার মুখে ওই নামটা মানায় না। আপনাকে যেটা মানায় আমি তেমনটাই করবো। অশোক আর মুহূর্ত দেরি করলো না। গোপীমোহন পার্থসারথির শরীরে আগুনের আলপনা এঁকে দিল। এতো স্বাভাবিক থেকে ও এই কাজটা করলো যেন সন্ধ্যা প্রদীপ ধরালো।

সারা শরীরে আগুন ছড়িয়ে পড়তেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন গোপীমোহন। সুষমা বাঁচাও বাঁচাও! আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম সুষমা......

ইতিমধ্যে দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে, গুলির আওয়াজ শুনে বাড়ির কাজের লোকেরা আগেই ছুটে এসেছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সুষমা। কিন্তু ওই বিশাল বন্ধ দরজা তাঁরা খুলবেন কিভাবে? তাই সবাই মিলে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়েই চলেছেন। সুষমা অধৈর্য হয়ে বললেন, ভজনলাল তোরা কি করছিস আমি বুঝতে পারছি না। দরজাটা ভেঙে ফেল।

আগুনের লেলিহান শিখায় মানুষটা পুড়তে পুড়তে তখনও বাঁচার জন্য সমানে কেঁদে চলেছে। এক দৃষ্টিতে অশোক সেই দিকে তাকিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সতেরো বছর ছয় মাস আগে এমন ধরনের একটা ছবি দেখতে দেখতে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। অথচ আজ প্রায় একই দৃশ্যটা দেখে তার দুই চোখে কে যেন শান্তির জল ছিটিয়ে দিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আরব্ধ কাজটুকু করতে পেরে অশোক এক উত্তাল খুশিতে হেসে উঠলো। উঃ কতোদিন সে হাসেনি! হাসতে পারেনি। ওই মানুষটা তার সমস্ত হাসি শুষে নিয়েছিল। আজ অশোকের মুক্তির দিন। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি!

আগুনের তাপ লাগছে অশোকের গায়ে। এই ঘরে আর থাকা যাবে না। গোপীমোহন পার্থসারথির গলাও বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। তবুও ওঁকে ছাড়া হবে না। এই ঘরেই ওই মানুষটাকে পুড়ে মরতে হবে। অশোক দরজার খিল এবং ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে আবার হ্যাজবোল্টটা টেনে বন্ধ করে দিতেই সুষমা গর্জন করে উঠলেন, তুমি কে? অশোক লাহিড়ি?

সন্দীপ পার্থসারথি। অশোক সুষমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল, আশা করি চিনতে অসুবিধা হওয়ার কোনও কারণ নেই।

গোপীমোহনকে তুমি কী করেছো? সুষমা চিৎকার করে উঠতেই অশোক সামান্য হেসে উঠলো। কাছাকাছি ভিড় করেছিল কাজের মধ্যবয়স্কা সেই মহিলা, গেটের দারোয়ান, খাস বেয়ারা ভজনলাল এবং খুব সম্ভবত রান্না-টান্না করার আরও একজন মহিলা। কিন্তু কেউই এগিয়ে এসে অশোককে ধরার ব্যাপারে সাহস দেখাতে পারলো না। যেহেতু ওর হাতে একটা রিভলবার রয়েছে। এবং যে-কোনও মুহূর্তে গুলি যে চালাতে পারে সে-প্রমাণ একটু আগেই ও দিয়েছে।

আর কাউকে গুলি করার কোনও প্রয়োজন নেই অশোকের। প্রয়োজন নেই পালিয়ে যাবারও। সে শুধু আরও কিছুটা সময় নিতে চায়। এই সময়টুকুর মধ্যে জি. এম. পার্থসারথি যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। লোকে বলবে, ছেলে হয়ে তুমি শেষ পর্যন্ত বাবাকে মারলে? অশোক ও-কথারও উত্তর দেবার কোনও প্রয়োজনই মনে করবে না। কেউ যদি পীড়াপীড়ি করে এটুকুই

বলা যাবে, তেমনটা কখনওই মনে হয়নি। তার কাজ শেষ। সে তাই বেশ হালকা হয়েই সুষমার চিৎকার করা ওই প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেললো। উপস্থিত সবাইকে দেখতে দেখতে এক সময় বলে উঠলো, আমার সঙ্গে অতো উঁচু গলায় কথা বলবেন না। চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে কথা বলুন।

তোমার ভয়ে?

না, লজ্জায়।

কথার চালাকি করো না। গোপীমোহনকে কি করেছো উত্তর দাও?

আর একটু পরেই জানতে পারবেন। রুক্ষ গলায় অশোক কথাটা ছুড়ে দিতেই যা বুঝবার বুঝে নিলেন সুষমা। তিনি এবারে কেঁদে ফেললেন। তুমি ওঁকে মেরে ফেলেছো?

ঠিক আমি মারিনি। নির্লিপ্ত সুরে অশোক উত্তর দিল, কিভাবে একজনকে মারতে হয় উনিই আমাকে সেটা শিখিয়েছিলেন—আমি শুধু সেই পথটা নিয়েছি।

আমাকে একবার ভেতরে যেতে দাও। এ-ভাবে দরজা আগলে থেকো না।

সময় হলেই আমি সরে যাবো।

এমন সময় দু-তিনজন প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত হতেই অশোকের হাতে রিভলবার দেখে চুপসে গেল। ওরা কাছাকাছিই থাকে। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে সুষমাকে জানালো, আমরা রাস্তা থেকে দেখেই ছুটে এলাম। আপনাদের এই ঘরটা তো আগুনে জ্বলছে। যে-কোনও মুহূর্তে সারা বাড়ি ধরে যেতে পারে!

গোপীমোহনকে তুমি আগুনের মধ্যে রেখে এলে? বিস্ফারিত চোখে সুষমা এগিয়ে আসতেই অশোক রিভলবার উঁচিয়ে গুরু গম্ভীর গলায় বললো, আপনারা কেউ এগিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন না। যদি সেটা করেন আমি তাহলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো। আপনারা বরং একটা কাজ করতে পারেন—অশোক দ্বিধাহীন সুরে আরও বললো, আমার পালাবার কোনও প্রশ্নই নেই। আপনারা পুলিশে খবর দিন। ওরা এলে আমি আত্মসমর্পণ করবো।

মিনিট পনেরোর মধ্যে চেয়ারম্যানের বাংলোর প্রাঙ্গণ মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়ে উত্তাল এক জনসমুদ্রের আকার ধারণ করলো। বল্লারপুর পেপার মিলের কোয়ার্টাসের সব লোক খবর পাওয়ামাত্র যে যেমন ভাবে ছিল তেমন ভাবেই ছুটে এসেছে। ইতিমধ্যে আগুন নেভানো হয়েছে কিন্তু গোপীমোহন পার্থসারথিকে বাঁচানো যায়নি। তাঁকে মৃত অবস্থাতেই পাওয়া গেছে। আপাততো পুলিশ অশোককে ঘিরে রয়েছে। সে তার রিভলবারটা প্রথমেই ওদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এবং হাত দুটো বাঁধার সময়েও কোনওরকম বাধা-টাধা দেয়নি। বরং নিজেই পুলিশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে ওরা যে এমন শান্তশিষ্ট ভদ্র আসামী পায়নি—সেটাও নিজেদের মধ্যে একবার আলাপ-আলোচনা করে নিলো। কিন্তু এটা যে ছেলেটা কী করলো, তাই-ই বুঝে উঠতে পারছে না। পুলিশের বড়োকর্তারা এখন সুষমা এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। কথা বলার মতো সুষমার মানসিক অবস্থা নয় জেনেও কর্তব্যের খাতিরেই পুলিশকে নানা ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হচ্ছে।

চারদিকে তখন শুধু গুঞ্জন আর গুঞ্জন। অশোক যে আসলে সন্দীপ পার্থসারথি এবং বল্লারপুর পেপার মিলের চেয়ারম্যান গোপীমোহন পার্থসারথির ছেলে, এই খবরটা সকলের মুখে মুখে ঘুরছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিক্রম তো অশোককে নতুন এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। অশোক অর্থাৎ সন্দীপ সকলের কাছে আসামী হতে পারে তার কাছে নয়। ছোটবেলার স্মৃতিটা খুব দ্রুত চোখের সামনে দিয়ে ঢেউ খেলে গেল। উপস্থিত হাজার হাজার জনতা, পুলিশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বিক্রম অনায়াসে ভুলে গিয়ে পায়ে পায়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এক চাপা আনন্দ সেই সঙ্গে এক ঝাঁক উদ্বেগ নিয়ে বিক্রম হঠাৎ ডাকলো, সন্দীপ! মেরে ইয়ার!

অশোক এক বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েই রইলো। কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো, একটা খুনীর সঙ্গে অতো কথা বলার কি আছে? ওকে বরং দু'ঘা বসিয়ে দাও। আর একজন

বললো, ওকেও আগুনে পুড়িয়ে মারো। বিক্রম কিন্তু কোনও কথা গায়ে মাখলো না। আগের মতোই দূরন্ত এক আবেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, পহেচানা নেহি মুঝে? আমি বিক্রম।

অশোক চোখের কোণ দিয়ে নীরবে চিনতে পারার স্বীকৃতিটুকু জানিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগলো। আসল কথা হলো পুলিশের ব্যাপার তো, বিপদে ফেলতে ওদের জুড়ি নেই। জানা শোনা থাকার জন্য এরপরে হয়তো বিক্রমকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করবে। শেষ সময়ে শুধু শুধু ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ?

পুলিশের ভ্যানে যখন অশোককে তোলা হচ্ছিলো সেই সময়ে উৎকণ্ঠার পাহাড় মাথায় নিয়ে আরও একজন ছুটে এলো। উপস্থিত জনতাকে সে প্রায় পাগলের মতো দু'হাতে ঠেলে সরাতে সরাতে একেবারে অশোকের মুখোমুখি হয়েই কেমন যেন স্থির হয়ে গেল। অশোকের দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। শাড়ির প্রান্তটা তার চোখে পড়তে আস্তে আস্তে মুখটাকে উপরের দিকে তুলে ধরতেই চোখাচোখি হলো শাওনার সঙ্গে। শ্রাবণের মেঘমেদুর জলভরা আকাশের মতোই ও তাকিয়ে রয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ওই চোখে বৃষ্টি নামতে পারে। পুলিশ কিন্তু কোনওরকম বাধা দিল না। অর্থাৎ এক্ষুণি ভ্যানে উঠতে হবে জাতীয় বিন্দুমাত্র তাড়া লাগালো না! অভিজ্ঞ অফিসারটি জানেন, সূত্র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাদের কাজ তো শুধু গুটিয়ে নেওয়া।

তবে শাওনা কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা কিছুই বললো না। বিষণ্ণ চোখ দুটো দিয়ে শুধু অশোককে দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতেই এক সময় বলে উঠলো, মিথ্যেবাদী! ছোট্ট ওই কথাটা ছাড়া শাওনার মুখ দিয়ে দ্বিতীয় আর কোনও শব্দ বেরোলো না। বেরুবে কি করে? অশোক খেতে আসবে বলে শাওনা এতোক্ষণ ধরে শুধু অপেক্ষাই করেছে। অথচ সত্যিই তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। যেহেতু অশোককে ফেলে খেয়ে নেওয়া যায় না সে-ও তাই না-খেয়েই ওর আশায় বসেছিল। বিশ্বাস ছিল, বলেছে যখন নিশ্চয়ই আসবে। ওরই মধ্যে হঠাৎ রাস্তায় লোকজনের ছোটাছুটি আর কথাবার্তা কানে যেতেই বুঝলো যেটুকু সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। দুপুরে খেতে যাবার আশ্বাস দিয়ে অশোক যে তাকে অন্য পথে সরিয়ে নিয়ে যাবে এটা শাওনা ভাবতেই পারেনি। ওই মানুষটাকে এরপরেও মিথ্যেবাদী না-বলে কী বলা যাবে? পুলিশের ভ্যানটা যখন অশোককে নিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায় উঠলো শাওনা তখনই আঁচলে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো, মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী!!

আয়নার মধ্যে আয়না



আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে মাদ্রাজ সেন্ট্রালে ট্রেনটা ঢুকবে। বিছানাপত্র বাঁধা বা টুকিটাকি জিনিস গুছানোর পালা শুরু হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে অনেকে আবার নিজেদেরকেও সাজিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র অমিতাভই উপরের বাঙ্কে এখনও শুয়ে রয়েছে। ওর মধ্যে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। কেমন যেন নির্বিকার এবং অত্যন্ত উদাসীন হয়ে সে সিগারেট খেয়ে চলেছে। অমিতাভর বয়স পঁচিশ। মেদহীন পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হাইটের চেহারার মধ্যে বিরাট কিছু সৌন্দর্য না-থাকলেও শান্ত একটা ব্যক্তিত্ব তাকে সব সময়েই ঘিরে রয়েছে। গত বছর এম. কম. পাশ করার পর থেকে একটা বছর সে শুধু চাকরি খুঁজেছে। যথারীতি পায়নি। এখন অবশ্য সে একটা চাকরি নিয়েই এর্নাকুলাম যাচ্ছে।

নিচের সিট থেকে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বেশ আন্তরিকতার সুরে অমিতাভর উদ্দেশে বললেন, কী হলো, আপনি নামবেন না? সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিন।

অমিতাভ সামান্য হেসে বললো, আমার অল্প জিনিস। স্যুটকেস আর হোল্ডঅল। স্টেশনে ট্রেন ঢোকার পরেও ওটা গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের নাম সুন্দরম। উনি ভুবনেশ্বর থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন। তখনই অমিতাভর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি ছোকরা কফি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই সুন্দরম নিজে একটা কাপ হাত বাড়িয়ে নিলেন। আর একটা কাপ অমিতাভর দিকে তুলে ধরে বললেন, ধরুন।

ট্রেনে এক একজন মানুষ আছেন যিনি উঠেই সকলের সঙ্গে আলাপ বা বন্ধুত্ব করবেন—যেন কতো দিনের চেনা! শুধু তাই নয়, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ অগ্রণী ভূমিকা নেন। সুন্দরম গতকাল থেকে অমিতাভকে একটা পয়সাও খরচ করতে দেননি। প্রত্যেকবারেই হইচই করে নিজে মিটিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণে অভিতাভ যথেষ্ট লজ্জিত ছিল। এখন কফির কাপটা না-নিয়ে প্রথমে সে মানিব্যাগটা খুলতেই ধমক খেল। সুন্দরম বললেন, আপনাকে টাকা বের করতে বলা হয়নি। কফির কাপটা অনুগ্রহ করে ধরুন। গরম কাপ আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না।

আমাকে একবার অন্তত দিতে দিন।

সে হবে'খন।

আর সুযোগ কোথায়?

আপনি একটুও আশাবাদী নন, সুন্দরম খুব শান্ত হেসে বললেন, এটাই আমাদের শেষ দেখা, এটা ধরে নিচ্ছেন কেন? সেদিন না-হয় আপনিই এই ভাবে গরম কাপ ধরে রাখবেন। পয়সা দেবার জন্য আমি তখন সমানে তর্ক করে যাবো।

অমিতাভ আরও বেশি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সুন্দরমের হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে বললো, সে-সময়ও বোধহয় আপনি আমাকে সুযোগ দেবেন না।

কথাটা শুনে সুন্দরম হাসতে লাগলেন। অমিতাভ যে খুব একটা ভুল বলেনি, এই হাসি দিয়ে তিনি যেন সেটাই সমর্থন করলেন। কফির কাপে ছোট ছোট দুটো চুমুক বসিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, মাদ্রাজে নেমে আপনি কোথায় যাবেন বলেছিলেন যেন?

এর্নাকুলাম।

এইবারে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সুন্দরম যেখানে বসে আছেন সেই আসনের জানলা ঘেঁষে

একটি মেয়ে বসে আছে। বাইশ-তেইশ হবে। কোমর ছাড়ানো একমাথা ঠাসা ঢেউ খেলানো কালো চুলের প্রদর্শনী যেন। ওই চুলগুলোই তাকে বোধহয় শ্রীময়ী করে তুলেছে। গায়ের রং শ্যামলা কিন্তু তার সুঠাম দেহ এবং লাবণ্যময় মুখের গড়নের জন্য ওই রংটং দিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, মেয়েটি হাওড়া থেকেই উঠেছিল। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে সে নির্লিপ্ত ছিল। সারাক্ষণ একটা মোটা ইংরেজি বই পড়ে কাটিয়ে দিল। না, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মেয়েটি একটি বারের জন্যেও অমিতাভর দিকে তাকায়নি। এই বয়সে এতোটা উদাসীন হতে পারা কীসের লক্ষণ অমিতাভ সেটা বলতে পারবে না। তাকে দেখতে যদি খুব বিচ্ছিরি হতো তাহলেও না-হয় একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। মেয়েটা তাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা যা হোক একটা কিছু করছে। কিন্তু সেই যে একটা বইয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, কাছাকাছি বসে থাকা একটা ছেলের দিকে বিন্দুমাত্র তাকানোরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি—সে মেয়ে কী দিয়ে গড়া সেটা ঈশ্বরই বলতে পারবেন। অমিতাভ বেশ কয়েকবারই ওকে দেখেছে। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই ভেবেছে এই বুঝি বই থেকে মুখ তুলে তাকাবে। কিন্তু একবারও চোখাচোখি হলো না। তারপর থেকে অমিতাভ নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সুন্দরী মেয়ে বলেই ওর দিকে তাকাতে হবে? তা কেন? সেই মেয়েটিই 'এর্নাকুলাম' কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মুখের দিকে কাজল কালো গভীর চোখ নিয়ে তাকাতেই অমিতাভ দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

সুন্দরমের কফি খাওয়া শেষ হতেই বুকপকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে একটা কাগজের টুকরোয় কী যেন লিখলেন। তারপর সেটা অমিতাভর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সস্নেহে বললেন, চাকরি করতে এই প্রথম কলকাতার বাইরে বেরিয়েছেন। তাও এতো দূরে! কখন কী অসুবিধায় পড়েন বলা যায় না। অবশ্য বিপদে না-পড়াই ভালো। এই ঠিকানাটা রেখে দিন। যদি প্রয়োজন হয় কোচিনে গিয়ে মিঃ জেমস গনসালভেসের সঙ্গে দেখা করবেন।

কাগজের টুকরোটা নিতে-না-নিতেই সুন্দরম আবার সিগারেটের প্যাকেট খুলে অমিতাভর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ধরুন। অমিতাভ এবারে একটু দ্বিধায় পড়লো। আসলে ভদ্রলোকের সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। ট্রেনের দেখা এবং ট্রেনের আলাপে বয়সের কোনও সীমারেখা নেই। সকলেই সকলের সামনে সিগারেট খায়। অমিতাভ গতকাল থেকে নিজেও তাই করেছে। আজ সকালে মানে একটু আগেও ওঁর সামনে সিগারেট খেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিতাভর ধারণা অন্যরকম। সুন্দরমের বয়স সাতান্ন-আটান্ন হবে। অর্থাৎ প্রায় তার বাবার বয়সী মানুষটা। আলাপটা আন্তরিক পর্যায়ে না-পৌঁছালে অবশ্য এতো কথা অমিতাভ ভাবতো না। মিঃ সুন্দরম গভীর মমতা নিয়ে যে-ভাবে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা করছেন, তার সম্পর্কে ভাবছেন এর পরেও অমিতাভ আর যাই হোক, ওঁর সামনে সিগারেট খেতে পারবে না। সে ছোট্ট সুরে বললো, না, থাক।

থাকবে কেন? কী হলো কী আপনার? সুন্দরম ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। গতকাল থেকে যে-ছেলেটা তার সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে, হঠাৎ সে যদি আর খেতে না-চায় তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়? সুন্দরম হাসতে হাসতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোনও অন্যায় হয়েছে কী?

অন্যায়টা তো আমারই হয়েছে।

আপনার হয়েছে! কী রকম?

আপনার সামনে সিগারেট খাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। কোনওরকম ভণিতা, আবার বেশি রকম সম্মান দেখাবার প্রতিযোগিতাও নয়—অমিতাভ সহজ কথাটাই সোজাসুজি বললো, আপনার চেয়ে বয়সে আমি অনেক, অনেক ছোট!

অমিতাভর স্বীকারোক্তিতে সুন্দরম যে খুশি হলেন না তো নয়। আরও আবেগ নিয়ে তিনি এবারে জোরে হেসে উঠলেন, তবে তো পুরো অন্যায়টা আমারই। অল্প বয়সী একটা ছেলেকে সিগারেট খেতে শেখাচ্ছি। কথাটা শেষ করেই তিনি কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। একটু সময় নিয়ে পরে আস্তে আস্তে বললেন, বছর কুড়ি আগে আমার ছেলেটা মারা যায়। ওর তখন বছর চার-

পাঁচ বছর বয়স। বেঁচে থাকলে এখন আপনার......সুন্দরম কথাটা পুরো শেষ না-করেই থেমে পড়লেন।

অমিতাভ শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার আর কোনও ছেলে-মেয়ে নেই?

না। ওই একটিই ছেলে ছিল। করুণ হেসে সুন্দরম বললেন, আপনাকে দেখে কেন যে আমার বিজয়ের কথা মনে হলো বুঝতে পারছি না। ওকে তো ভুলেই রয়েছি। তবু যে কেন ভেসে ওঠে....

মাদ্রাজ সেন্ট্রালের চার নম্বর প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই কুলীদের সম্মিলিত চিৎকার এবং ব্যস্ততায় স্টেশন চত্বর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। যাত্রীরা ততোক্ষণে একে একে ট্রেন থেকে নামতে শুরু করে দিয়েছে। যে-যার জিনিসপত্রের হিসেব রাখছে। কুলীরা মাল নামাচ্ছে এবং কেউ কেউ ইতিমধ্যে মাথায় পর্বতের বোঝা চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে যাবার জন্য রওনাও দিয়েছে। কোমর ছড়ানো কালো চুলের সেই সুঠাম মেয়েটি অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিমায় কুলীর মাথায় দুটো স্যুটকেস চাপিয়ে একরাশ আভিজাত্য ছড়িয়ে চলে গেল। হোল্ডঅল আর স্যুটকেস নিয়ে অমিতাভ তখন প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে। সে সুন্দরমের জন্য অপেক্ষা করছে। উনি তখনও ট্রেন থেকে নামতে পারেননি। কয়েকজনের পেছনে পড়ে গিয়েছেন। অবশ্য তাড়াহুড়োর কোনও ব্যাপার নেই। ধীরে-সুস্থে নামলেই হলো।

প্রায় সবার শেষেই নামলেন সুন্দরম। অমিতাভর সামনে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বাড়ির কাছে এলে কেউ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। দেখলেন না আগে নামবার জন্য সকলে কেমন গুঁতোগুঁতি করছিল। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আমি কি অমন যুদ্ধ করতে পারি?

কথাটা শুনলো অমিতাভ। তারপর সামান্য হেসে বললো, আপনাকে একটা কথা বলবো?

নিশ্চয়ই বলবেন।

যদিও আবার দেখা হবে—আশাটা তেমনই রাখা উচিত, কী বলেন?

নিশ্চয়ই। সুন্দরম শিশুর মতো হাসলেন।

এই বিদায় মুহূর্তে আপনি আমাকে 'আপনি' করে নাই-বা বললেন। 'তুমি' করে বললে আমি খুব খুশি হবো।

সত্যি বলছো? সুন্দরম অমিতাভর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অতীতকে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, আচ্ছা অমিতাভ, তোমার কোচিন এক্সপ্রেস তো ছাড়বে সেই সন্ধ্যা সাতটা দশে। সারাটা দিন তুমি কী করবে?

ঘুরে ঘুরে শহর দেখবো।

সে দেখার সময় পাবে। তার আগে আমার বাড়িতে স্নান-খাওয়াটা সেরে নিতে পারো। তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে খাওয়ার একটা সুযোগ পাই।

কী উত্তর দেবে অমিতাভ? যেন তার স্নান-খাওয়াটা বড়ো কথা নয়—সুন্দরমই একসঙ্গে খাবার সুযোগ চাইছেন। মানুষকে অহেতুক দয়া না-দেখিয়ে কী চমৎকার সৌজন্য প্রকাশ করলেন সুন্দরম। কাউকে ছোট করলেন না। নিজেকেও বড়ো করে তুলে ধরলেন না। মানুষটা সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ট্রেনের ক্ষণিকের আলাপেও যে এমন ভাবে কাছে টেনে নেওয়া যায় সুন্দরমকে না-দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। বয়স্ক মানুষ হয়েও শিশুর মতো কতো সহজ-সরল। আজকাল আবার কেউ বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখালে লোকে অন্যরকম সন্দেহ করে। অথচ তার কাছ থেকে সুন্দরমের কিছুই পাওয়ার নেই। ওঁর এই স্নেহ এবং ভালোবাসা নেহাতই প্রাণের টানে। ক্ষীণ একটা ব্যাপার যেটা লুকিয়ে রয়েছে—ওঁর ছেলেটা বেঁচে থাকলে এতোদিনে তারই বয়সী হতো। হায়রে পিতৃহৃদয়! যে যতো কঠোর এবং কঠিনই হোক না কেন, এই জায়গাতে সে ততো বেশি দুর্বল। সুন্দরমের মানসিকতাটুকু সহজেই বোঝা যায়। অমিতাভ ওর ক্ষত স্থানে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে বললো, আলাপ হবার পর থেকে আপনার কথার অবাধ্য হয়েছি কখনও?

সুন্দরম এবং অমিতাভ প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছিল হন্তদন্ত হয়ে দুজন লোক এগিয়ে এসেই সুন্দরমকে লম্বা সেলাম ঠুকে মুখেও বললো, নমস্তে সাব।

নমস্তে। সুন্দরম এর পর তামিল ভাষায় ওদেরকে যা বললেন সেটা অবশ্য অমিতাভর বুঝবার ব্যাপার নয়। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় দেখলো, ওই লোক দুটো তার স্যুটকেস আর হোল্ডঅলটা তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে যাবার পথে পা বাড়িয়েছে। সুন্দরম অমিতাভর দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, এসো অমিতাভ।

মাদ্রাজ সেন্ট্রালের বাইরে সুন্দরমের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। দুজনে উঠে বসতেই ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। মাউন্ট রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর সুন্দরম হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কোচিনের কোন কোম্পানিতে তুমি জয়েন করছো?

রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানিতে। সামান্য একটু সময় চুপ করে থেকে অমিতাভ সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, আমাকে কিন্তু নামতে বলা হয়েছে এর্নাকুলামে।

কোচিন আর এর্নাকুলামে কোনও পার্থক্য নেই। সুন্দরম ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন, আসলে স্টেশনের নাম এর্নাকুলাম। শহরের নাম কোচিন।

ছবির মতো একটা দোতলা বাড়ির পোর্টিকোর নীচে এসে গাড়ি থামতেই ড্রাইভারেরও আগে ছুটে এসে একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে দিল। সুন্দরম নেমে অমিতাভকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত কাজের লোকদের নমস্কার কুড়োতে কুড়োতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বিশাল এবং সুসজ্জিত ড্রইংরুমে অমিতাভকে বসিয়ে সরোজা সরোজা বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন অবশ্য মিনিট দুয়েক বাদেই। সঙ্গে সরোজা নামের একান্ন-বাহান্ন বছরের এক মহিলা। সুন্দরম পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার স্ত্রী। পরে সরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর অমিতাভর কথা তো এইমাত্র তোমাকে বললামই।

একটা সোফায় বসেছিল অমিতাভ। পরিচয়ের পালা শেষ হলে সে উঠে দাঁড়ালো। মায়েদের কোনও আলাদা জাত নেই। পৃথিবীর সব মা-ই এক। অমিতাভ আস্তে আস্তে সরোজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সরোজের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। স্বপ্নের এক ছবি এঁকে তিনি কোমল গলায় বললেন, মনেই হচ্ছে না তুমি এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে। তোমাকে আমি এমনিতেই আশীর্বাদ করছি বাবা! তারপরেই স্নেহের সুরে আদেশ, হাত-মুখ ধোয়া নয়, একবারে স্নান করেই এসো। এতোটা জারনি করে এসেছো, শরীরটা ভালো লাগবে।

ড্রইংরুম পার হয়ে একটা বেডরুমের মধ্যে দিয়ে বাথরুমে ঢুকবার মুখে অমিতাভর চোখ দুটো হঠাৎ আটকে গেল। বছর পাঁচেক বয়সের একটা শিশুর দুষ্টু হাসি নিয়ে অসাধারণ সেই ছবিটা যেন সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। ডাবল বেডের পায়ের দিকের প্রায় দেওয়াল জোড়া জীবন্ত ছবিটা দেখে অমিতাভর প্রথমেই মনে হলো, এই খাটে বসে সুন্দরম এবং সরোজা যেন প্রত্যেকদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। কী মধুর সেই হাসিটা ছেলেটার! যেন সবাইকে হাসতে শেখাচ্ছে।

অমিতাভ বাথরুমে ঢুকে গেলে সরোজা বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। তাঁর ভেতরটা বুঝি হাহাকার করে উঠলো। তবুও নিজেকে চমৎকার ভাবে ধরে রেখে শূন্য গলায় বললেন, সময়ের সঙ্গে শোকের আঘাতটা সামলে উঠেছি ঠিক কথা, কিন্তু বিজয়কে ভুলতে পারছি কই? এতো বছর হয়ে গেল......সরোজা আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ঘরের মধ্যে তখন অখন্ড এক নীরবতা। মিনিট দুই সময় ওই মৌনতার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গলায় সরোজা আবার বললেন, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো? অমিতাভর চোখ দুটো ঠিক আমাদের বিজয়ের মতো।

ট্রেনে ওকে দেখে সেটা আমার মনে হয়েছে সরোজা।

সেইজন্যই অমিতাভকে বাড়িতে নিয়ে এলে? কিন্তু কী লাভ? সরোজা করুণ সুরে বললেন, ও তো মুহূর্তের জন্য এলো আর আমাদের ভেতরের মনটা অশান্ত থাকবে বেশ কয়েকদিন। যেটাকে চাপা দিয়ে রাখতে হবে তা নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি কেন?

ভাবলাম বিজয়ই বুঝি ফিরে এসেছে।

তোমার চিন্তা আর আমার চিন্তা-ভাবনা কি আলাদা? সুন্দরম প্রশান্ত হেসে বললেন, আমরা দুজনে যা করছি তা ওই এক চিন্তা থেকেই। শুধু শুধু মন খারাপ করতে নেই। অমিতাভ মুহূর্তের জন্য এলেও ওই সময়টুকুই আমরা আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলতে পারি।

মিনিট দশেক আগে অমিতাভর স্নান হয়েছে। ইতিমধ্যে সুন্দরমও স্নান-টান সেরে নিলেন। এখন সকাল আটটা দশ-পনেরো হবে। সময়টা ভাদ্রের শেষাশেষি। চারদিকে ঝকঝকে রোদের ছড়াছড়ি। নীল আকাশটা যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে ওই দূরে টাঙানো রয়েছে। অমিতাভ ওরা ভেতরের প্রশস্ত ব্যালকনীতে বেতের সোফায় বসে গল্প করছিল। ওরা বলতে অমিতাভ আর সুন্দরম। দুজন লোকের হাতে খাবারের পাহাড় চাপিয়ে সরোজা সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজেকে সব রকমের বিমর্ষতার ঊর্ধ্বে তুলে সহজ ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, এবারে গল্প বন্ধ করো। সুন্দরমও স্ত্রীর সঙ্গে একটু কৌতুক করলেন। বললেন, আমরা খাওয়ার গল্প নিশ্চয় করতে পারি?

তাও হবে না। সরোজা হাসির আড়ালে গম্ভীর সুরে আদেশ দিলেন।

আমাদের এখন একটাই কাজ। অমিতাভ সরোজাকে খুশি করে বললো, খাবারের এই পাহাড়টাকে মুহূর্তে শেষ করতে হবে।

চমৎকার বলেছো। সরোজার সারা মুখে তৃপ্তির হাসি। আমি ভাবছিলাম অমিতাভ বোধহয় বড্ড লাজুক। একটাও কথা বলবে না।

সত্যি অমিতাভ কথাটা কিন্তু দারুণ বলেছে। সুন্দরম হাসি ছড়িয়ে বললেন, যদিও আমি খুব একটা খেতে পারি না তবুও অমিতাভর অনারে দেখা যাক— পাহাড়টাকে কতোটা কুপোকাৎ করতে পারি।

পাহাড়ই বটে। সকালের জলখাবারের আয়োজন যে এতো বিরাট হবে অমিতাভর জানা ছিল না। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা বড়ো সাইজের একরাশ মশলা ধোসা। সঙ্গে স্যুপ জাতীয় সম্বর। বাটার টোস্ট। একটা সুদৃশ্য ডিশে গোটা আটেক ডিম। তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো পর্যন্ত ছড়ানো। ডজন দেড়েক কলা। আর একটা বড়ো টুকরিতে তো আপেলের ছড়াছড়ি।

সরোজা ডিশে করে সব কিছু সাজিয়ে দিয়েও বললেন, অমিতাভ, লজ্জার কোনও ব্যাপার নেই কিন্তু—যা লাগবে এখান থেকে তুলে নেবে।

অমিতাভ বললো, আমি বিন্দুমাত্র লজ্জা করবো না।

এইটাই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা।

আমিও লজ্জা করবো না। সুন্দরম হাসতে লাগলেন।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল। সরোজা কিছু কিছু প্রশ্ন করে অমিতাভব সম্পর্কে জেনে নিলেন। যেমন, ওদের বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছেন, প্রথম চাকরি করতে বেরিয়ে কেমন লাগছে? অবশ্য চাকরির জায়গাতেই এখন পর্যন্ত পৌঁছানো গেল না—ওখানে গিয়ে আবার আর এক জীবন। সে যাই হোক, সব জায়গাতেই নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে— সে-ব্যাপারেও পরামর্শ দিলেন।

ব্যালকনীর সামনের গ্রীলের ওপর এই সময় একটা কাক এসে বসলো। খাবার টেবিলের এতো কাছাকাছি ওই কুৎসিত পাখিটা ভাবা যায় না। তাছাড়া কখন কোন ফাঁকে মুখ দিয়ে কী তুলে নিয়ে যাবে কে জানে! অমিতাভ কাকটাকে তাড়াবার জন্য হাত তুলতেই সরোজা ওকে বাধা দিলেন। না-না, তাড়িও না। ও বোবা। অর্থাৎ বোবা কাককে তাড়ানো চলবে না। অমিতাভ মনে মনে একটু হাসলো এবং পরে লক্ষ্য করলো সরোজা বাটার টোস্টের পুরো দুটো পিস আলাদা একটা প্লেটে কোণের দিকে মেঝেতে রেখে দিতেই কাকটা সেখানে পৌঁছে পরম নিশ্চিন্তে খেতে লাগলো। কলকাতার কাকরা খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সময় ব্যস্ত হয়ে যেমন ঘন ঘন তাকায়, এই কাকটা তেমন কিছুই করলো না। কোনোদিকে না-তাকিয়ে একমনে বাটার টোস্ট দুটো শেষ করে সরোজার দিকে তাকালো। কাকটার জন্য বোধহয় আলাদা একটা কাপও রয়েছে। সরোজা ভেতর থেকে সেই কাপটা

এনে তাতে জল ভরে ওর কাছে রাখতেই গলা উঁচু করে চার-পাঁচ ঢোক খেয়েই কাকটা বিদায় নিল।

কাকটা কী রোজ আসে?

হ্যাঁ।

এটাই যে বোবা কাক বোঝেন কী করে? অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে সরোজা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই সুন্দরম বলে উঠলেন, ঘটনাটা কী জানো অমিতাভ, ওই বোবা কাকটার সঙ্গে একদিন আরও তিনটে কাক এসেছিল। সরোজা কিন্তু ওকে চিনে নিতে এতোটুকু ভুল করেনি। আমি অবাক হয়ে ওকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই সরোজার ওই এক উত্তর, মা কেমন করে তার যমজ সন্তান দুটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে?

বেলা তখন দুটো। টেবিলে ঢাকা দেওয়া অবস্থায় খাবার সাজানো রয়েছে। অমিতাভ ফিরে এলেই একসঙ্গে সবাই খেতে বসবে। ও মাদ্রাজ শহর ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে। সুন্দরম তাঁর ড্রাইভার বাসুদেবনকে এই কাজের ভারটুকু দিয়ে বলেছেন, এই প্রথম মাদ্রাজে এসেছে অমিতাভ। ফাঁকিটাকি দিস না। বেরুবার সময় অমিতাভ সুন্দরম এবং সরোজা দুজনকেই বারবার বলে গেছে, প্লিজ, আপনারা কিন্তু আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আমার ফিরতে যদি দেরি হয়—আপনারা দুপুরের খাওয়া সেরে নেবেন।

তাই কী কখনও হয়? নাই-বা হলো অমিতাভ নিজের ছেলে। ছেলের মতো তো বটেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওকে ছেলে বলে ভাবতে মনটা তো খানিকটা শান্তি পাচ্ছে। এইটুকুই-বা কম কীসের? সেই অমিতাভকে ফেলে ওঁরা দুজনে কী খেয়ে নিতে পারেন? তাছাড়া এতোদিন এই বাড়িতে রমন নামের লোকটাই রান্না করে এসেছে। দীর্ঘদিন বাদে সরোজা আজ নিজে রান্না করেছেন। অমিতাভ যতোই অনুরোধ করে যাক— কোনও অবস্থাতেই ওকে ফেলে খাওয়া চলে না।

ঘড়িতে যখন তিনটে বাজতে সাত মিনিট বাকি অমিতাভ ফিরলো। এবং যে-মুহূর্তে জানতে পারলো ওঁদের দুজনের খাওয়া হয়নি তখন লজ্জা পাওয়া ছাড়া তার আর করণীয় কিছুই ছিল না। একবার শুধু বললো, আপনাদের এতো করে বলে গেলাম তবুও

তবুও খাইনি। সুন্দরম বললেন, যেহেতু তোমার সঙ্গে খাবো।

আমরা নিশ্চয়ই খেয়ে নিতাম। সরোজা অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। শেষে বললেন, আসল কথাটা কী জানো? আমরা কেউই ক্ষিদেটাই অনুভব করতে পারলাম না।

খেতে বসে সুন্দরম জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে বলো অমিতাভ, বাসুদেবন তোমাকে কী কী দেখালো?

খুব সিনসিয়ার বাসুদেবন। চলুন স্যার আপনাকে আর একটা জিনিস দেখাই, দাঁড়ান স্যার ওটা বাদ পড়ে যাচ্ছে—এমনি করে করে পুরো মাদ্রাজ শহরটাই সে আমাকে ঘুরিয়ে দেখালো।

অমিতাভ এক এক করে বলতে শুরু করলো, প্রথমে দেখলাম সী বীচ্, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ইউনিভার্সিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস, মেরিন ড্রাইভ, কর্পোরেশন বিল্ডিং, লাইব্রেরি, মোর মার্কেট, নেহরু স্টেডিয়াম, চায়না মার্কেট, পোর্ট, স্টেট ইনফরমেশন অফিস, সেন্ট্রাল জেল, কস্তুরবা হাসপাতাল, বেসিন ব্রীজ পাওয়ার হাউস, চিড়িয়াখানা, অ্যাকোরিয়াম, আরও কতো কী। যখন বাড়ি ফিরছি সেই সময়েও হঠাৎ বাসুদেবনের আক্ষেপ শোনা গেল, স্যার আরও দুটো কেন বাদ থাকে?

তোমার আর দুটো কী কী?

মেরিনা বীচ আর আন্নাদুরাই-এর স্ট্যাচু।

ওই দুটো হলে তোমার মাদ্রাজ শহর কমপ্লিট হবে?

বাসুদেবনের সরল হাসি, হ্যাঁ স্যার।

তাহলে চলো।

খেতে খেতে অমিতাভ দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। সরোজা এই ফাঁকে ওর ডিশে আরও খানিকটা কড়াইশুঁটি ও কারিপাতার সবজি তুলে দিলেন। অমিতাভ একবার শুধু বলেছিল,

জিনিসটা দারুণ হয়েছে। মায়েদের কাছে ভালো বলার এই একটাই সাজা। আরও খেতে হবে। পেট ভরে গেলেও ওজর-আপত্তি খুব একটা টেঁকে না। অমিতাভ ওই ব্যাপারটা নিয়ে তাই কিছুই বললো না। অর্থাৎ নীরবে মেনেই নিল। তারপর আবার আগের কথায় ফিরে গেল। আসলে এই তিনটের সময় দুপুরের ভাত খেতে বসাটা তাকে খুবই লজ্জা দিচ্ছিলো। অমিতাভ বললো, বাসুদেবন মাদ্রাজ শহরের একটা জিনিসও চোখের আড়ালে রাখতে চাইছিল না, আর আমিও তার সঙ্গে সমানে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেছি। ঘড়ির কাঁটাও তাই জোর কদমে এগিয়ে গেছে। একটা দিনের জন্য এসে আপনাদের খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম।

কথাটা খুব মন দিয়ে শুনলেন সরোজা। অল্প একটু হাসলেন কি হাসলেন না। বললেন, কষ্টের ব্যাপারটা তো আমাদের। ওটা যদি আমরা না-পাই তোমার মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তুমি যে আমাদের মন খারাপ করে দিলে। কষ্ট তো এই মুহূর্তে পেলাম।

অমিতাভর উজ্জ্বল মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল। সে রীতিমতো নার্ভাস হয়ে গেল। খাওয়া বন্ধ করে সে সরোজার দিকে কিছুক্ষণ অসহায় হয়ে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাদের কি কোনওবকম আঘাত দিয়েছি?

ওই যে তুমি বললে, 'একটা দিনের জন্যে এসে—'

হ্যাঁ, বলেছি, কিন্তু অমিতাভ তখনও বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। আসলে সে ধরতেই পারছে না ওই কথাটার মধ্যে তার গলদটা কোথায়?

সরোজা বিষণ্ণ গলায় বললেন, তুমি কি ধরেই নিয়েছো এই একটা দিনের জন্যই আমাদেব বাড়িতে এসেছো? আর কখনও এখানে আসবে না?

ব্যাপারটা এতোক্ষণে বোঝা গেল। বেলা তিনটের সময় খেতে বসার জন্য অমিতাভ যতো না লজ্জা পেয়েছিল, তার চেয়েও হাজারো গুণ বেশি লজ্জায় পড়লো এখন। সে অনুতপ্ত হয়ে নিচু সুরে বললো, ওটা বলা আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

ভুল স্বীকার করছো?

অমিতাভ উত্তর না-দিয়ে এবারে হাসতে লাগলো। সরোজাও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন, এই বাড়ির মানুষ দুটোকে শান্তি দিতে তুমি মাঝে মাঝে এসো। তার বেশি কিছু চাই না। অমিতাভ শুধু ভাবলো, কতো মানুষের কতো রকমের চাহিদা। চাহিদার অবশ্য পার্থক্য রয়েছে। তবে সে-সবের অধিকাংশই নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করার তাগিদে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার প্রচেষ্টা। অথচ এই মহিলার চাহিদাটুকু অনায়াসেই চোখে জল এনে দেয়। এতো আন্তরিক আবেদন মনকে সহজেই উতলা করে স্নেহের বৃষ্টিও ছড়িয়ে দেয়। অমিতাভ বললো, আমি নিশ্চয়ই আপনার কথা রাখবো।

এখন সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে-ছটা। আর দেরি করার উপায় নেই। সাতটা দশে কোচিন এক্সপ্রেস ছাড়বে। মিনিট কুড়ি সময় মাদ্রাজ স্টেশনে পৌঁছতে লাগবে। বাকি কুড়ি মিনিট সময় তো হাতে রাখতেই হয়। আসলে দুপুরের ওই খাওয়া-দাওয়ার পর অমিতাভ নিটোল একটা ঘুম দিয়েছে। সময় মতো উঠতেই পারতো না। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজারও খুব মায়া লাগছিল। কিন্তু না-ডেকে উপায়ই-বা কী? ঘুম ভাঙানোর মতো বাজে কাজটা তাই সরোজাকেই করতে হলো।

বিকালে খাবারের আয়োজনও কম ছিল না। কিন্তু অমিতাভর বিন্দুমাত্র ক্ষিদে ছিল না। সুতরাং খাবার প্রশ্নই নেই। সরোজার অনুরোধে সে শুধু এক কাপ কফি খেল। এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিল। নীচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাসুদেবন। সরোজা এবং সুন্দরম পোর্টিকোর কাছে গিয়ে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়লেন। সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কয়েকটা মুহূর্ত মিশে যাওয়ার পর সুন্দরম নিজেকে আবিষ্কার করে বললেন, গাড়িতে ওঠো অমিতাভ।

আপনি যাবেন না? অমিতাভর হিসেবের মধ্যে এটা ছিল না। যিনি তার জন্য এতো কিছু করলেন, সন্তান স্নেহ দিলেন, তিনি যে বিদায় জানাতে স্টেশনেও যাবেন এটাই স্বাভাবিক। অথচ

উনি তাকেই শুধু গাড়িতে উঠতে বলছেন। সারাদিনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে এই ব্যাপারটা মানানসই হয়ে উঠতে পারলো না বলেই অমিতাভ মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো। সত্যি বলতে কী, সে বেশ ভেঙেই পড়লো। এবং এমনটা হওয়ার ফলে সম্ভাব্য কারণগুলোর জন্য সে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলো।

প্রিয়জনদের আমি কখনও সী-অফ করতে যাই না। সুন্দরম অমিতাভর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য একটু হেসে অন্য এক গলায় বললেন, রেকর্ডটা ভাঙতে গিয়ে ভেসে যেতেও তো পারি। সেটার প্রয়োজন কী বলো?

অমিতাভ পলকহীন চোখে সুন্দরমের মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। সময় আর বিশেষ নেই দেখে কোনওরকম কথার মধ্যে গেল না। সুন্দরমের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সরোজাকেও প্রণাম করলো। বললো, আসছি তাহলে।

এসো। সরোজার ঠোঁট দুটো কী কাঁপছে? নাকি নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন? অমিতাভ জানতে চাইলো, আমায় কিছু বলবেন না?

সে তো আগেই বলে দিয়েছি। মাঝে মাঝে এসো।

সুন্দরম বললেন, নাও অমিতাভ—আর দেরি কোরো না। উঠে পড়ো। অমিতাভ গাড়িতে উঠে বসতেই বাসুদেবন মুহূর্তে অদৃশ্য হবার খেলাটা ভালোই দেখালো।

স্টেশনে পৌঁছেও বাসদেবন সৌজন্য দেখাতে পিছিয়ে রইলো না। সেলাম জানিয়ে বললো, আবার স্যার আপনার মাদ্রাজে ফিরে আসার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকবো। আর হ্যাঁ—রাতের জন্য এই খাবারটা মা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা নিন স্যার। অমিতাভ দেখলো বাসুদেবনের হাতে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টীলের একটা মাঝারি সাইজের টিফিন ক্যারিয়ার। অপরিসীম এক কৃতজ্ঞতায় অমিতাভর গলাটা বুজে এলো। সে কোনও কথা বলতে পারলো না। হাতটা শুধু বাড়িয়ে দিল।

কোচিন এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে অমিতাভ শুধু অবাক নয়, বিস্ময়ে প্রায় মুবাই হয়ে গেল। যদিও কথা বলার কোনও প্রশ্নই ছিল না। হাওড়া স্টেশন থেকে যে-মেয়েটি সারাক্ষণ বইয়ের পৃষ্ঠায় মুখ গুঁজে মাদ্রাজ পর্যন্ত এসেছিল সেই মেয়েটিই কোণের আসন নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। হাওড়া থেকে মাদ্রাজের পথে সে তুঁতে রংয়ের শাড়ি ব্লাউজ পরেছিল। এখন কিন্তু অন্য পোশাক। এই মুহূর্তে তার পরনে হালকা চকলেট কালারের চোস্ত এবং ওই কালারেরই কামিজ। ভরাট বুকের ওপর স্বচ্ছ একটা ওড়না। চুলের সেই বিশাল ঢলকে সামলাতে কাঁধের কাছে চকলেট কালারের একটা ফিতে দিয়ে যদিও গিঁট বাঁধা কিন্তু তারপরেই তার সারা পিঠ এবং কোমর ছাপিয়ে যথারীতি দুরন্ত ঢেউ। সরু ভ্রূদুটির ঠিক মাঝখানে বেশ বড়ো রকমের একটা খয়েরি টিপ। ডাগর ডাগর চোখ দুটো যেন কাজলকালো এক স্বপ্নের দ্বীপ। পাতলা দুই ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের আলগা বাহার। আগের দিন নাকছাবি ছিল না। অমিতাভর স্মরণশক্তি এতো কম নয়। আজ সে লক্ষ্য করলো ওর ডান নাকে সাদা পাথরের নাকছাবি। মেয়েরা তো সাধারণত বাঁ দিকেই ওটা পরে। এটাই হয়তো ওর বিশেষত্ব। দুই কানে খয়েরি পাথরের দুটো বড়ো টাব এবং তিন ভাঁজের সুন্দর গলায় খয়েরি সুতোর মোটা হারে মেয়েটিকে সৌন্দর্যের অলৌকিক এক দেবী বলে মনে হচ্ছে।

অবাক হওয়ার পালাটা একটু থিতিয়ে আসতেই অমিতাভর মনে হলো মেয়েটা যে মাদ্রাজ পর্যন্তই আসবে এমন তো কোনও কথা হতে পারে না। সে এই ট্রেনে যেতেই পারে। এমনকি কোচিন পর্যন্তও সে যেতে পারে। অমিতাভ সে-সব নিয়ে মাথা ঘামালো না। মোনালিসার সৌন্দর্য নিয়ে মেয়েটি সব কিছুকেই কেমন অবলীলায় যেন উপেক্ষা করে চলেছে। অমিতাভর লাগছে ঠিক এই জায়গাতেই। ট্রেনে ওঠার সময় মোনালিসা তাকে দেখেও যেন দেখলো না। এতোটা অচেনার ভান করাটা কি ঠিক? অমিতাভর মনে হলো এটা স্রেফ ইচ্ছা করে। স্বাভাবিক ভাবেই তো প্রশ্ন করা যেতো, কথা বলা যেতো। অবশ্য এটা ঠিক, সে যে কোচিন যাচ্ছে—সুন্দরমের সঙ্গে আলোচনার

সময় মোনালিসা তা আগেই জেনে গেছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করার কোনও ব্যাপারই থাকতে পারে না। মোনালিসা কি প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন মেপে মেপে চলে? অমিতাভ কিছুটা হতাশ হলো। অন্য কিছু নয়—দীর্ঘ এতোটা পথ চুপচাপ না-থেকে গল্প করে গেলে নিশ্চয়ই সেটা সময় কাটানোর পক্ষে খারাপ হতো না। সহজ ভাবেই একটা প্রশ্ন উঁকি দিল, মোনালিসা স্বাভাবিক তো? না, অমিতাভ এতোটা ভোঁতা নয়। তার সঙ্গে কথা বললেই ও স্বাভাবিক এবং না-বললেই অস্বাভাবিক এমন মোটা চিন্তাধারা তার নয়। এটা ভাবছে সে পারিপার্শ্বিক ছবিটা দেখেই। তার কথা আলাদা—মোনালিসা তো অন্য যাত্রী বা যাত্রিণীদের সঙ্গেও একটু আলাপ করতে পারতো? ষাট-বাষট্টি ঘন্টার জারনিটা আর যাই হোক, বোবা হয়ে থাকার প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই নয়। নাকি এটা এক ধরনের অহঙ্কার? সবাইকে ছোট ভাবা এবং ছোট দেখার উন্নাসিকতা। ওর এতো দম্ভের উৎসটা কী? আবার এও তো হতে পারে, অমিতাভ যা ভাবছে মোনালিসা আদতেই তা নয়। সে শুধু আশ্চর্য রকমের শান্ত এবং লাজুক। যেচে কারো সঙ্গে কথাই বলতে পারে না।

কোচিন এক্সপ্রেস সঠিক সময়েই ছাড়লো। অমিতাভ প্রথমেই একটা সিগারেট ধরালো। ওর মুখোমুখিই রয়েছে মোনালিসা। সুতরাং সিগারেটের ধোঁয়ার ব্যাপারটা যাতে ওকে বিরক্ত না-করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হলো। একটা অল্পবয়সী ছেলে কফি বিক্রি করছিল। সে অমিতাভর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কফি সাব?

নেহি।

আচ্ছা হ্যায় সাব। বড়ীয়া কফি।

অমিতাভর খুব একটা ইচ্ছে করছিল না খেতে। ভালোমন্দের প্রশ্নটা তো পরের ব্যাপার। কিন্তু ছোট ছেলেটার অনুরোধ রাখতেই হলো। সেই সময়েই অমিতাভর মনে হলো, আচ্ছা মোনালিসাকে বললে কেমন হয়? এতোক্ষণ কোনও কথা হয়নি ঠিক কথা। কিন্তু কথা বলাই চলবে না—এমন নিষেধাজ্ঞাও নেই। 'আপনি কি কফি খাবেন' বলাটা অনায়াসেই করা যেতে পারে। বিশেষ করে হাওড়া থেকে এতোটা পথ একসঙ্গে আসার পর যে-কোনও মানুষই এটুকু ভদ্রতা দেখাতে পারে। কথাটা বলতে গিয়েও অমিতাভ পারলো না। আত্মমর্যাদার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বটা ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। মোনালিসা নিশ্চয়ই বাড়তি কথা বলা পছন্দ করে না। সে কেন সহজ হতে যাবে? অমিতাভ একা একাই কফি খেতে লাগলো। ছেলেটা এবারে মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করলো, মেমসাব, কফি দুঁ? মোনালিসা জানলার বাইরে তাকিয়েছিল। সে ছেলেটার মুখের দিকেও তাকালো না। গালের ওপর মাছি তাড়াবার ভঙ্গিমায় সে শুধু বাঁ হাতটা একটু নাড়িয়ে দিল। ছেলেটা আচ্ছা কফি বা বড়ীয়া কফি ইত্যাদি বলার আর সাহসটুকু পর্যন্ত পেল না। অমিতাভ নিজের বিবেচনাকে একটু বেশি পরিমাণেই ধন্যবাদ জানালো। ভাগ্যিস মোনালিসাকে কফি খাওয়ার কথা বলেনি।

কোয়েম্বাটোরে এসে কোচিন এক্সপ্রেসটা থামতেই বিচিত্র সব আওয়াজে মনে হতে পারে, স্টেশনটা বুঝি 'গো এজ ইউ লাইকে' নাম দিয়েছে। ট্রেনটা এখানে মিনিট দশেক দাঁড়াবে। অমিতাভর সিগারেট কেনার প্রয়োজন ছিল। সেটা অবশ্য সিটে বসেই পেতে পারে, তবু সে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে নামলো। এদিক-ওদিক একটু পায়চারিও করে নিল। রেলওয়ে স্টল থেকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনলো এবং অবশ্যই একটা দেশলাই। ওই একটা ব্যাপারে অমিতাভ ভীষণ সজাগ। যারা দেশলাই কেনে না তাদেরকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অতো দামের সিগারেট খাওয়া চাই অথচ কুড়ি-পঁচিশ পয়সার একটা দেশলাই কিনতেই যতো রাজ্যের কৃপণতা! আসলে ওটা সুবিধাবাদী মনোভাব।

অমিতাভ ট্রেনে এসে বসলো। মোনালিসা একটা কলাপাতার মোড়কে দইভাত জাতীয় কি যেন খাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছে। অমিতাভর কিন্তু তেমন একটা খিদে নেই। অথচ সরোজা এক টিফিন ক্যারিয়ার খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠলো। সুন্দরম এবং সরোজার সঙ্গে আলাপ হওয়া এবং তাঁদের স্নেহের ছায়ায় প্রায় সারাটা

দিন কাটানো কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। কতো স্বল্প আলাপে কি বিরাট গভীরে মিশে যাওয়া-ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য! অথচ এটা সত্যের খুবই উজ্জ্বল ছবিটা অমিতাভ সারা জীবন নিজের মনের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে।

মোনালিসার খাওয়া শেষ। জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে কলাপাতাটা ফেলে জল টল খেয়ে হাত-মুখ মুছে নিল। সাইড ব্যাগটা খুলে কি যেন খুঁজলো। তারপর পাশের মোটা মতো একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে মালয়লম ভাষায় কয়েকটা কথা বলেই ট্রেনের সরু প্যাসেজ দিয়ে কম্পার্টমেন্টের শেষ মাথার দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এলো মিনিট তিনেক পরেই। কোয়েম্বাটোর ছেড়ে ট্রেনটা তখন স্পীড নিতে শুরু করেছে। মোনালিসা আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় মন দিল।

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার পাশেই ততোধিক বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। খুব সম্ভব ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। নতুন জায়গায় যাওয়ার স্বাভাবিক কৌতূহলে অমিতাভ প্রতিটা স্টেশনের নামগুলো পড়বার জন্য বারবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল। কোনওটা পড়তে পারছে, কোনওটা আবার পারছে না। ট্রেন বেশ ভালো গতি নিয়েই ছুটে চলেছে। একপলকে পড়ে নিতে তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেটা লক্ষ্য করে অমিতাভকে ইংরাজিতে এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাবেন?

এর্নাকুলাম, মানে কোচিন। অমিতাভও একই ভাষায় উত্তর দিল।

সে তো অনেক দেরি। বৃদ্ধ হাসলেন। আপনি কাল ভোরে অর্থাৎ পৌনে নটা-নটা নাগাদ সেখানে পৌঁছবেন।

আপনি কতো দূর যাবেন?

আমরা অ্যালোবাই নেমে যাবো। আপনার থেকে ঘন্টা দুয়েক আগেই নামবো। বৃদ্ধ একটু চুপচাপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আসছেন কোথা থেকে?

কলকাতা।

আপনি কি বাঙালি?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

আপনাকে দেখে কেন জানি আমার সে-কথাই মনে হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম। ছোটরা যেমন ডুব-সাঁতার কাটতে গিয়ে মাঝে মাঝেই মাথা তোলে, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর থেমে থেমে এক একটা প্রশ্ন করে চলেছেন। আপনি নিশ্চয়ই কোচিনে এই প্রথম যাচ্ছেন?

আপনি ঠিক ধরেছেন।

বেড়াতে যাচ্ছেন না চাকরিতে?

আমি ওখানে চাকরি পেয়েই যাচ্ছি।

মিনিট দুয়েক মৌন থাকার পর ভদ্রলোক আবার মুখ খুললেন। কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন? প্রশ্নটা শুনে অমিতাভ সামান্য একটু হাসলো। বললো, নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন? আমি সাদার্ন অ্যাভিনিউতে থাকি। আপনি কলকাতায় গেছেন কোথায়?

আমি যাইনি। তবে আমার এক ভাই কলকাতায় থাকে। নেহেরু কলোনীতে। আপনি চেনেন নেহেরু কলোনী?

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললো, সারা ভারতবর্ষটাই তো নেহরু কলোনী। আপনি ঠিক কোন জায়গাটার কথা বলছেন?

টালিগঞ্জের নেহরু কলোনী। আপনি গিয়েছেন ওদিকে?

গিয়েছি। ছোট্ট ওই উত্তরটা দিয়ে অমিতাভ ভাবতে বসলো, বৃদ্ধ হলে কী একটু বেশি কথা বলার প্রবণতা থাকে? এর আগেও সে তিন-চারজন বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করেছিল। তাঁরা সমানে কথা চালিয়ে গিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কী, তাঁরা প্রায় থামতেই চান না। এটা কি নিঃসঙ্গতা থেকে আসে? এটা ঠিক, বুড়ো মানুষদের সঙ্গে কেউ বড়োবেশি একটা কথা বলতেই চায় না। তাঁদেরকে এড়িয়ে চলাই হয়। সেই কারণেই হয়তো কথা বলার সুযোগ পেলে তাঁরা এতো

মুখর হয়ে ওঠেন।

এখন মোটামুটি সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু দুজন ছাড়া। নীচে বিছানায় মোনালিসা যদিও শুয়ে রয়েছে সে কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। বই পড়ছে। অমিতাভ শুয়ে সিগারেট খেয়ে চলেছে। তার বিন্দুমাত্র ঘুম আসছে না। মোনালিসার বই পড়ার আগ্রহ দেখে এটা স্বীকার করে নিতেই হলো যে ওটা ছাড়া সময় কাটানোর বড়ো ওষুধ আর নেই। ওর কাছে বেশ কয়েকটা বই রয়েছে। অমিতাভ একবার ভাবলো, চাইলে কেমন হয়? দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হাওড়া থেকেও তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। এমনকি ভালো করে একবার তাকিয়েও দেখেনি—এই ব্যাপারটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বই চাওয়ার উৎসাহটা অমিতাভ মুহূর্তে হারিয়ে ফেললো। ওই মেয়ের কাছে সে কিছুতেই আগে এগিয়ে যেতে পারবে না। ওর এতো অহঙ্কার থাকলে তারই-বা থাকবে না কেন? এই একটা ব্যাপারে অমিতাভ আর পাঁচজন ছেলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একজন সুন্দরী ঝকঝকে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে কার-না ভালো লাগে? সেজন্য অতি সহজ উপায়ে গায়ে পড়ে আলাপ করাটা তার রুচিতে বাধে। রুদ্র তার সহপাঠী ছিল। একসঙ্গেই এম কম. পাশ করেছে। সে তো প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে শ্যামলীর পেছনে পড়েছিল। লজ্জা লাগতো অমিতাভর। বন্ধুকে এর জন্য সে নেহাত কম শাসায়নি। তুই কি রে? মেয়েটা তোর দিকে ফিরেও তাকায় না। খুব সম্ভবত সে তোর কাণ্ডকারখানা দেখে ঘৃণাই করে। আর তুই কিনা হিমালয়ের চূড়ায় বসে থাকা সেই মেয়ের কাছেই ধর্না দিচ্ছিস? আত্মসম্মান না-থাকলে আত্মহত্যা কর, বুঝলি—

আমি বুঝেছি। তুই কিছুই বুঝিসনি। রুদ্র হেসে উত্তর দিয়েছিল। তোর মতো ভ্যানতাড়া টাইপের ছেলেদের মুখ মেয়েরা দেখতেও চায় না। যতোই সোবার ঢঙে কথা বলো আর রুচি-টুচির পরিচয় দাও না কেন—ওরা এই পেছনে লেগে থাকার ব্যাপারটাই পছন্দ করে। বরফ একবার গলতে শুরু করলে চালাও পানসি গোয়া টু বেলঘরিয়া। মিলেমিশে তখন সব কিছু একাকার।

ব্যাপারটা সত্যিই তাই হয়েছিল। অমিতাভ যখন ভাবতে শুরু করেছিল রুদ্রটা যে কোনোদিন মার খেতে পারে তখনই একদিন সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো ওদের সম্পর্কটা গাঢ় হওয়ার দিকেই গড়াচ্ছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখছে, কফি হাউস থেকে বেরুচ্ছে, মুহূর্তমাত্র সময় পেলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে এবং তাকে দেখে ওরা দুজনেই যথারীতি হাসাহাসি করছে। পরে অবশ্য রুদ্র একদিন বলেছিল, তুই কিন্তু বাচ্চাই রয়ে গেলি অমিতাভ। মেয়েদের প্রাথমিক এই অবজ্ঞার ভাব দেখে তুই ভড়কে গিয়েছিলি। শ্যামলী বুঝি এই আমাকে পেটাতে আসছে। এখন কে কাকে পেটাচ্ছে বুঝতে পারছিস তো? বাড়িতে পর্যন্ত টিকতে দিচ্ছে না। শুতে যাবার আগে রাত এগারোটার সময়েও একবার ফোন করবে। তাই বলছিলাম, তোর রুচি নিয়ে তুই থাক বাবা-তোর কথা শুনলে শ্যামলীর সঙ্গে এ-জীবনেও আলাপ হতো না।

নতুন করে ভাবতে লাগলো অমিতাভ। এটাও কি মেয়েদের এক ধরনের ভণিতা? খুব সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সবচেয়ে ভালো উপায়? প্রথমে গম্ভীর থাকো, পরে কথার বৃষ্টি ঝরিয়ে দাও। শুরুতে ভাও বাড়াও, শেষে দাঁও মারো। না, ও-সব থেকে অমিতাভ কোনওরকম শিক্ষাই নেবে না। যে কথা বলতে অনিচ্ছুক—তার সঙ্গে কোনও কথা নয়। সে অতো উদাসীন হতে পারে তার প্রতি আগ্রহ থাকাটাও যুক্তি নয়। সুতরাং মোনালিসার কাছ থেকে বই চাওয়ার ইচ্ছেটাকে বাতিল করে দিয়ে অমিতাভ ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

ভোরবেলা যখন ওর ঘুম ভাঙলো ট্রেনটা তখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অমিতাভ মুখ বাড়িয়ে দেখলো অ্যালোবাই। এই স্টেশনে তো বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার নামার কথা। অমিতাভ দেখলো ওঁরা ওঁদের আসনে নেই। অর্থাৎ নেমে গেছেন। সেখানে অন্য দুজন যাত্রী বসে আছে। অমিতাভ মুখ-টুখ ধুয়ে এলো। গতকাল রাতে খাওয়ার পরেও টিফিন ক্যারিয়ারে গোটা চারেক ইডলি রাখা ছিল। অমিতাভ একটাতে সামান্য একটু কামড় বসিয়ে দেখলো নষ্ট হয়েছে কিনা। সে-

গুলো ভালো থাকাতে চটপট খেয়ে নিল। তারপরে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্ল্যাটফরম থেকে কফির গেলাসটা নিয়ে ছেলেটাকে পয়সা মিটিযে দিল। এই লাইনে অমিতাভ একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, চা প্রায় পাওয়াই যায় না। কফি আর কফি। এখানকার মানুষরা নিশ্চয়ই কফিভক্ত। সে এতোক্ষণ খেয়াল করেনি। মোনালিসার হাতেও একটা পিকনিক গেলাস। ছোট ছোট চুমুক বসিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে কফি খাচ্ছে।

অবশেষে এর্নাকুলাম। নটা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকি। ট্রেনটা গজরাতে গজরাতে একসময় শান্ত হয়ে একেবারেই থেমে পড়লো। আর তারপরেই শুরু হলো প্ল্যাটফরমে নামার ব্যস্ততা। ঠিক এইখানেই কেউ কাউকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। এই সময়েই মানুষ বড়োবেশি উতলা হয়ে ওঠে। সবাই সবার আগে নামতে চায়। ধীরে-সুস্থে প্ল্যাটফরমে যখন অমিতাভ নামলো, মোনালিসাও নামছে। তার আয়ত চোখ দুটো এখন রোদ-চশমায় ঢাকা। মাছ যেমন জলে অনায়াসে খেলা করে মোনালিসাও তেমনি স্বচ্ছন্দ গতিতে কোনোদিকে না-তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। ওর চলার ছন্দে কোনওরকম জড়তা না-থাকায় অমিতাভর ধারণা হলো ও নিশ্চয়ই এখানকারই মেয়ে।

অমিতাভ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে দেখলো মোনালিসা দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও কিছু কিছু যাত্রী। বিভিন্ন গাড়ির ড্রাইভাররা যাত্রীদের ঘিরে থেকে জানতে চাইছে কে কোথায় যাবে? কেউ কেউ চলেও যাচ্ছে। অমিতাভ দু'চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো স্টেশনের বাইবের এলাকাটা। যেদিকেই তাকাও শুধু নারকেল গাছ আর নারকেল গাছ। চারদিকে যেন সবুজের ছড়াছড়ি। আপনা থেকেই চোখ দুটো ক্রমশ স্নিগ্ধ হয়ে আসে। অমিতাভর মনে হলো গোটা কেরলই বুঝি সবুজ রঙের আবিবে স্নান করে উঠছে। সবুজ সুন্দরী।

ইতিমধ্যে একটা অ্যামবাসাডার এসে মোনালিসার সামনে দাঁড়ালো। চালকের আসনে একজন বছর পঞ্চান্নর ভদ্রলোক। ব্যাক-ব্রাশ করা একমাথা সাদা-কালো চুল। কপাল থেকে নেমে আসা টানা নাকের ওপর সোনালী ফ্রেমের চশমা। প্রশস্ত কপালে সাদা ছাই অথবা বিভূতি জাতীয় কী একটা টিপ। পরনে সাদা ঝকঝকে হাফ-শার্ট। লুঙ্গি না ফুলপ্যান্ট সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোকের সৌম্য চেহারা দেখে অমিতাভর মনে হলো উনি খুব সম্ভব ওর বাবা। মোনালিসা ওঁকে দেখে মৃদু একটু হাসলো। কিন্তু কি মোহনীয় সেই হাসি! হাসলে মানুষকে এতো সুন্দর দেখায়! অমিতাভ ভাবলো এই কি সেই মোনালিসার হাসি!

ভদ্রলোক ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যেতেই অমিতাভর মোনালিসা-জ্বর ছাড়লো। ইমোশনাল ব্যাপারটা চুকে গেছে। তাকে এখন প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানির কলকাতা অফিস থেকে তাকে বলা হয়েছে ত্রিপুনীথুরা অঞ্চলের হোটেল বালসাম্মাতে উঠতে। সুতরাং অমিতাভর এখন প্রথম কাজই হলো ওই হোটেলটি বের করা। সে ট্যাক্সি এবং অটো স্কুটারের দিকে চোখ বোলাতেই দু-একজন চালক আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলো। কিউ সাব, যানা কিধার হ্যায়?

ত্রিপুনীথুরা।

তো আইয়ে, মেরা গাড্ডীপে—ত্রিপুনীথুরা কাঁহা যানা হ্যায়?

হোটেল বালসাম্মা।

চলিয়ে।

ত্রিপুনীথুরা চৌরাস্তার মুখেই হোটেল বালসাম্মা। দোতলা। সব মিলিয়ে চল্লিশটার মতো ঘর আছে। ওটা যে একটা বিরাট হোটেল ঠিক তা নয়। তবে মাঝারিয়ানার মধ্যে মোটামুটি ভালোই বলতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চার রাস্তার জমজমাট এলাকায় হয়েও হোটেলটার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এমন নির্জন এবং শান্ত পরিবেশ ভেতরে না-এলে বোঝাই যায় না। হোটেলের

চারধাবে নারকেল কুঞ্জের ছায়া আর পান্থপাদপ গাছের সারি যেন হাতছানি দিয়ে ইশারায় কাছে ডাকে। মনে হয় বালসাম্মা হোটেল নয়—নির্জন বনভূমি।

অমিতাভ হোটেলের পঁচিশ নম্বর ঘরখানা পেল। রাস্তার দিকে দক্ষিণমুখি ঘর এটা। বারান্দায় দাঁড়ালে কেরল স্টেট ট্রান্সপোর্টেব বাস, ট্যাক্সি, স্কুটার এবং সাইকেলের চলন্ত ছবির সঙ্গে চোখে পড়ে হাজারো মানুষের মিছিল। এতো ব্যস্ত এলাকা হয়েও আশ্চর্য রকমের শীতল। পুরো ব্যাপারটা অমিতাভব ভালোই লাগছে। কানের গোড়ায অজস্র চিৎকার আর হই-হট্টগোল কে আর পছন্দ করে? অথচ এই ত্রিপুনীথুরাতে সেটাই বেশি করে হওয়ার কথা। হাট-বাজার, ছোট, মাঝারি এবং বড়ো বড়ো সব দোকান, হোটেল বেস্টুরেন্টের ভিড়। সেলুন, লন্ড্রী, বিভিন্ন নামী-দামি মিলের শো-রুম, কি নেই এখানে? দূরপাল্লার কিছু কিছু বাস পর্যন্ত এই ত্রিপুনীথুবা থেকে ছাড়ে। অথচ জোয়ার এবং ভাঁটার মাঝখানের সময়টুকুর মতোই নিশ্চুপ গতিতে সবকিছু এগিয়ে চলেছে। তবে যানবাহনেব হর্নেব আওয়াজে এলাকাটা মাঝে মাঝে যা একটু সচকিত হয়ে ওঠে। চাব রাস্তার মাঝখানে দুজন ট্রাফিক পুলিশ অবশ্য সারাক্ষণই গাড়ির ওই ভিড়কে নিজেদেব কন্ট্রোলে বেখে বিন্দুমাত্র জট পাকাতে দিচ্ছে না। অমিতাভ ভাবলো, আহা, এদেবকে একবার কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে হয় না! কলকাতা তাহলে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারতো!

হোটেলের ঘরখানা ছোটর মধ্যে বেশ ছিমছাম, গুছানো। সিঙ্গল খাট। পুরু ফোমের নরম বিছানা। সবুজ নেটের মশাবি। সব মিলিয়ে অমিতাভর এক্ষুণি একবার ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। ঘরের এক কোণে একটা স্টীলের আলমারি। আর একপাশে টেবিলও বয়েছে। পুরো ঘরখানা কচি কলাপাতা রঙের হওয়াতে এই রাজ্যের সবুজ বনানীর সঙ্গে বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে! ঘরটা পঁচিশ নম্বর বলে অমিতাভ মনে মনে একটু হাসলো। তাব বয়সটাও পঁচিশ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও পেয়েছে ওই একই তারিখে। মোনালিসার বয়সটাও খুব সম্ভবত পঁচিশই। তাকে বোধহয় পঁচিশেই পেয়েছে। যাই হোক, ব্যাপাবটাকে সবদিক দিয়ে শুভ বলে মনে হচ্ছে। এখন দেখা যাক কতোদূর কি হয়? কেন-না অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নেবার সময় খুব সঙ্গত কাবণেই দু-একটা প্রশ্ন মনে হয়েছে। অমিতাভ অবশ্য কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। তার চাকরির প্রয়োজন ছিল, সে সেটাই গ্রহণ করেছে।

একটা বছর ধরে সে শুধু চাকরির পেছনে ছুটেছে, ঘুরেছে। বহু অ্যাপ্লিকেশন করেছে, বহু ইন্টারভ্যু দিয়েছে কিন্তু কোথাও কিছু হয়নি। প্রতিটা পরীক্ষায় তার মার্কস মোটামুটি ভালোই। দু-একটা জায়গায় যে খারাপ হয়নি তা নয়—তবে ইন্টাবভ্যুগুলো ও ভালোই দিয়েছে। কিন্তু কি এক রহস্যময় কারণে ওই একটা বছরেও অমিতাভর চাকরি হয়নি। জানাশোনা সবাইকে বলা ছিল। কেউ কেউ চেষ্টা করেছে, কয়েকটা খোঁজ দিয়েছে কিন্তু সবই বৃথা।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন রাখালকাকা তাকে খবর পাঠালেন। 'অমিতাভ, শীগ্‌গির চলে আয় আমাদের অফিসে। আমাদের বড়োসাহেব আজ কোচিন থেকে এখানে আসছেন। দেখি কি করতে পারি।'

রাখালকাকা অমিতাভর নিজের কেউ নন। কোনওরকম আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই। বয়স এই সাতান্নর মতো। পাড়ার ছোট-বড়ো সবাই ওঁকে রাখালকাকা বলেই ডাকে। এমনও দেখা গেছে বাবা এবং ছেলে দুজনই তাঁকে একই সম্বোধন করে। রাখালকাকা মাঝে মাঝে শুধু একগাল হেসে বলেন, যা বাব্বা, তোর বাপের কাকা, তোরও কাকা! আমার ছেলেমেয়ে নেই, তাই বাঁচোয়া। নইলে ওরাও বোধহয় আমাকে তাইই ডাকতো। যাই হোক, রাখালকাকা চাকরি করেন বিখ্যাত রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানির কলকাতা শাখায়। সিনিয়র ক্লার্ক। কোম্পানির সারা ভারত জুড়ে কাজ।

রাখালকাকার অফিসে গিয়ে অমিতাভ মোটামুটি যা জানতে পারলো তা হলো এই রকম ঃ তাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ নামবিয়ার যদিও কোচিনেই থাকেন কিন্তু অফিসের কাজে মাঝে মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন শহরে যেখানে যেখানে তাঁদের অফিস রয়েছে সেখানে আসেন। এর আগের বার যখন উনি কলকাতায় এসেছিলেন রাখালকাকা তাঁকে অনুরোধ করে রেখেছিলেন। উনি বলেছিলেন, পরের বার এসে দেখবো। মাস দেড়েক পর মিঃ নামবিয়ার আজ আবার আসছেন। ক'দিন এখানে থাকবেন-না-থাকবেন কিছু বলা যায় না। রাখালকাকা তাই ফার্স্ট আওয়ারে খবর পেয়েই অমিতাভকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সেদিন ঘন্টা তিনেক অপেক্ষা করার পরেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্থাৎ এম. ডি. মিঃ নামবিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তবে উনি হাজারো কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও রাখালকাকাকে পি-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, আগামীকাল বেলা এগারোটার সময় তিনি দেখা করবেন।

সেই অনুযায়ী রাখালকাকা অমিতাভকে সঙ্গে নিয়ে পরদিন দশটা থেকেই অফিসে এসে বসে রইলেন। না, সময়ের একটুও-এদিক ওদিক হয়নি। মিঃ নামবিয়ার ঠিক এগারোটার সময়েই ওদেরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। রাখালকাকা তোতাপাখি পড়ানোর মতো আগেই একটা কথা অমিতাভকে শিখিয়ে রেখেছিলেন, আর যাই করো সাহেবি কায়দায় নমস্কার-টমস্কার কোরো না। বাঙালির ছেলে, স্রেফ বাংলা মতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটি সেরো। কী বুঝলে?

মিঃ নামবিয়ারের পায়ে গড়াগড়ি খেতে হবে আর কী?

আমি কি তোমাকে তাই বললাম? রাখালকাকা অসন্তুষ্ট হলেন। যে-সাহেবের এককথায় চাকরি হতে পারে—তাঁকে এটুকু সৌজন্য দেখাতেই হয়। তাছাড়া উনি বাংলায় এসেছেন। বাংলার রীতি অনুযায়ী—রাখালকাকা গজরাতে গজরাতে বললেন, আমি চাই না বড়ো সাহেব তোমাকে অভদ্র বা মুডি ছোকরা ভাবেন। তারপরেই গোপন খবর ফাঁস করার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে আরও বললেন, একটা কথা জানবে, অফিসের মধ্যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে মুখে অনেকেই আপত্তি করেন বটে কিন্তু মনে মনে ভীষণ খুশি হন। এই একটা জায়গায় সকলেই দুর্বল।

রাখালকাকার অনুমান একেবারে নির্ভুল। অমিতাভ ঘরে ঢুকে মিঃ নামবিয়ারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি মৃদু হেসে বললেন, অফিসে এ-সব ব্যাপার চলে না। তাছাড়া আজকাল তো এটা প্রায় উঠেই গেছে।

আপনি স্যার ঠিকই বলেছেন। রাখালকাকা সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থ হাসি হেসে বললেন, তবে অমিতাভদের ফ্যামিলিতে এখনও পুরনো মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে ধরে আছে। ওর বাবাকে দেখেছি স্যার, মাত্র দু'বছরের বড়ো মানুষকেও উনি পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। বলতেন, যাঁর যা প্রাপ্য সম্মান তাঁকে তা দিতেই হবে। খুব পন্ডিত মানুষ ছিলেন। উনি মারা যেতেই ওদের সংসারটা রাখালকাকা খুব আবেগ নিয়ে বলতে লাগলেন, গত বছর এম. কম. পাশ করে অমিতাভ এখনও বেকার স্যার। ওর জন্যই আপনার কাছে অনুরোধ করেছিলাম। এখন আপনি স্যার ওকে একটা কিছু করে না দিলে—এই এক বছর ধরে তো কম চেষ্টা হলো না। যেখানেই গেছে, শুধু না আর না।

মিঃ নামবিয়ার খুব মন দিয়েই রাখালকাকার কথাগুলো শুনলেন। বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, ব্যাপারটা তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়—চাকরির এই সমস্যাটা গোটা ভারতবর্ষের। তুমি কি জানো ঠিক এই মুহূর্তে সারা দেশে ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি কোম্পানি বন্ধ হয়ে আছে। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা দু'কোটিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় কারুরই কিছু একটা করার সুযোগ থাকে না।

স্যার, সেই আশাতেই তো আপনার কাছে আসা।

আমি কি তোমাকে কোনও কথা দিয়েছিলাম? মিঃ নামবিয়ার মনে করতে চেষ্টা করলেন।

রাখালকাকা সত্যি কথাটাই বললেন, আগের বারে যখন স্যার আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম

আপনি বলেছিলেন, 'পরের বার এসে দেখবো।'

মিঃ নামবিয়ারকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। অমিতাভ স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর কপালের ভাঁজ যে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি কোথায় যে ওকে ঢোকাবেন বুঝতে পারছেন না। ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা চিন্তা করে চলেছেন, কেন-না অনেকক্ষণ ধরে উনি চুপচাপ রয়েছেন। হঠাৎ একসময় মিঃ নামবিয়ার অমিতাভকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোচিনে যাবে?

রাখালকাকা অমিতাভকে বলেছিলেন, সাহেবের এককথায় কলকাতা অফিসেই তোর একটা গতি হয়ে যেতে পারে। সেই মতো অমিতাভর ধারণা ছিল চাকরি যদি হয় কলকাতাতেই হবে। এখন শুনতে হলো কোচিনে যেতে হবে। অমিতাভর প্রয়োজন একটা চাকরির। সেটা ভারতবর্ষের যে-কোনও প্রান্তে হোক না কেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। প্রশ্নটা হলো, কলকাতার একটা ছেলেকে কলকাতার অফিসে না-রেখে কোচিনে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কতোখানি? অবশ্য এটা ঠিক, ওটা মিঃ নামবিয়ারের চিন্তার ব্যাপার। অমিতাভ পরিষ্কার উত্তর দিল, আপনি যেখানে পাঠাবেন আমি সেখানেই যাবো।

চমৎকার! মিঃ নামবিয়ার উত্তর শুনে খুশি হলেন। কী যেন ভাবতে ভাবতে পরে বললেন, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে কোয়ার্টার দেওয়া যাবে না। তোমাকে হোটেলে থাকতে হবে। অবশ্য বিলটা কোম্পানিই দেবে। আরও একটা কথা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুমি আজকেই পেয়ে যাবে। দুটো দিন কলকাতা অফিসে রেখে আমরা তোমাকে কোচিনে ট্রান্সফার করবো।

মাত্র দুটো দিনের জন্য কলকাতা অফিস কেন? রাখলে তো পুরোপুরি রাখা যায়। এখানে দু'দিন অফিস করার পর কোচিনে ট্রান্সফার। তাহলে প্রথম থেকেই-বা কোচিনে নয় কেন? অনেকগুলো প্রশ্ন মনে এলেও অমিতাভ ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল। না, কোনওরকম প্রশ্ন সে মিঃ নামবিয়ারকে করবে না। তবে স্পষ্টই বোঝা যায়, ভেতরে নিশ্চয়ই অন্যরকম কোনও ব্যাপার রয়েছে। নয়তো তার মতো সামান্য জুনিয়ার ক্লার্ককে কোম্পানির খরচায় হোটেলে রাখা হবে কেন? সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, দু'দিন কলকাতায় অফিস করার পর কোচিন যাত্রার মধ্যে রহস্যজনক কিছু না থেকেই পারে না। অমিতাভ বুঝতে পারছে কিন্তু মিঃ নামবিয়ারের মুখের ওপর প্রশ্নের একটা মালা ঝুলিয়ে দিল না। দেখাই যাক না কী হয়!

হোটেল বালসাম্মায় পঁচিশ নম্বর ঘরে সারাটা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোলো অমিতাভ। না-ঘুমিয়ে করবেই-বা কী? একে তো এই দীর্ঘ জারনির ক্লান্তিতে ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক। তারপরে অফিস খোলা থাকলেও না-হয় যাবার প্রশ্ন ছিল। আজ রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিন। সুতরাং ঘুমের আদর্শ দিন ছাড়া অমিতাভ অন্য কিছুই ভাবতে পারলো না।

ঘুম ভাঙলো সেই সন্ধ্যার পর। ঘুম ভাঙার পর মনে হলো এমন ঘুম সে বহুদিন ঘুমোয়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছুটির দিনের জনস্রোত দেখলো কিছুক্ষণ। একটা জিনিস স্বীকার করলো অমিতাভ, কেরলের মেয়েদের স্বাস্থ্য সত্যিই চমৎকার। প্রতিটা মেয়ের চেহারাতেই একটা বাঁধুনি রয়েছে। মনে হয় না কেউ কোনওরকম অসুখে ভুগছে। সারাক্ষণই হাসিখুশি। আর মাথার চুল তো একটা দেখবার জিনিস।

হাত-মুখ ধুয়ে কফি ইত্যাদি খেয়ে অমিতাভ প্যান্ট-শার্ট পরে নিল। নীচে নেমে একবার রাস্তার জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যাবে। আর কিছু না হোক, এক প্যাকেট সিগারেট তো কিনতে হবে। অমিতাভ এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত অলস পায়ে ঘুরে বেড়ালো। কোন দোকানে কোন জিনিসটা পাওয়া

যায়—চোখ বুলিয়ে সেটাই শুধু একটু দেখে নেওয়া। পথ চলতে চলতে কান দুটোকে সজাগ রাখলো অমিতাভ। মালয়লম ভাষার বন্যায় সে যে-কোনও মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে। এক বর্ণ বুঝতে পারছে না। একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বছর দশেকের একটা ভিখিরি জাতীয় ছেলে অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে ভদ্রলোক মুখ খুললেন, 'শব্দম উন্ডাক্কা ইরিকিয়া। নিঙ্গেল পোগু।' কথাটার মানে কী? অমিতাভ কলকাতার প্রচলিত ফরমুলায় বাংলা মানেটা করলো এইরকম ঃ হবে না, ভাগ। এখন থেকেই ভিক্ষে করছিস—কাজ করবি আমাদের বাড়িতে? সে-বেলায় না।

আরও কিছুটা এগিয়ে গেল অমিতাভ। দারুণ ঝকঝকে আর একটা বড়ো স্টেশনারী দোকান। শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত। স্বভাবতই বেশ ভিড় সেখানে। অমিতাভর হঠাৎ নজরে পড়লো ওই ভিড়ের একপাশে মোনালিসা দাঁড়িয়ে। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে নিচু সুরে কী যেন বলাবলি করছে। ভদ্রমহিলা শুধু মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানিয়ে চলেছেন। মোনালিসার মুখের গড়নের সঙ্গে ওঁর বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। উনি ওর মা-ও হতে পারেন। ভদ্রমহিলার বয়স উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ হবে। একটু ভারীর দিকে চেহারা। সিঁথিতে সিঁদুর ছড়ানো। কপালেও একটা সিঁদুরের টিপ। হাতে শাখাও রয়েছে। অমিতাভর মনে হলো একেবারে বাঙালি চেহারা। সে কিন্তু আর একটা কথা ভেবেও খুশি হলো। কেনাকাটা করতে যখন বেরিয়েছে মোনালিসা নিশ্চয়ই খুব একটা দূরে থাকে না। কাছাকাছি কোথাও হবে, সেই কারণে মাকেও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। ভাবটা এই, চলো একটু ঘুরে আসি। অমিতাভর একবার ইচ্ছা হলো, কেনাকাটা করতে ওই দোকানের মধ্যে ঢুকলে কেমন হয়? খুবই ছেলেমানুষি ইচ্ছা। কিন্তু ওই মোনালিসার কাছে ও-সব ইচ্ছা-টিচ্ছার কোনও মূল্য নেই। সে খুব বাজে ধারণা করবে। আর অমিতাভ হয়ে উঠবে এক অতি সাধারণ এবং সহজ ছেলে। তেমনটা ভাবতে দিয়ে নিজেকে অতো ছোট করতে পারবে না। ব্যাপারটা যদি আচমকা ঘটতো সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু পরিস্থিতিকে তৈরি করে এই ভাবে কাজে লাগানোকে অবশ্যই সাজানো সাজানো মনে হয়। অমিতাভ ঠিক করলো কিছুতেই সে দোকানের মধ্যে গিয়ে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। কেন করবে? অতো বাড়াবাড়ি রকমের নিস্পৃহতা যার তারই সামনে গিয়ে পরিচিতের মতো হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়াবে? অমিতাভ জায়গাটা থেকে একটু সরে দাঁড়ালো। নয়তো বেরুবার মুখে মেয়েটা ভাবতে পারে সে ওর পিছু নিয়েছে। মোনালিসাকে এতোটা সুখী এবং গর্বিত হতে দিতে অমিতাভ রাজি নয়। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলো, চাকরি পাচ্ছিলো না ঠিক কথা—কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোচিনে এই এতো দূরে তাকে আসতে হবে তা কি কখনও ভেবেছিল? হাজার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও এই ব্যাপারটা ছিল না। অথচ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর জমজমাট আড্ডা ছেড়ে সে এই মুহূর্তে কোচিনের ত্রিপুনীথুরার চৌরাস্তার মোড়ে। একা একা গভীর ভাবে ভাবলে একটু অবাকই লাগে। বিস্ময়ের ঘোরটা কিছুতেই যেতে চায় না। অমিতাভর হঠাৎ নজরে পড়লো মোনালিসা তার মাকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ডান দিকের পথটা ধরে যাচ্ছে। মোনালিসার হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। অমিতাভ স্পষ্ট লক্ষ্য করলো প্রায় উপচে পড়া কেনাকাটার সামগ্রী থেকে কী একটা ছোট্ট প্যাকেট রাস্তায় পড়ে গেল। না মোনালিসা, না মোনালিসার মা কেউই খেয়াল করলেন না। যেমন হাঁটছিলেন তেমনই এগিয়ে চললেন। অমিতাভর খারাপ লাগছিল। শখের জিনিস হয়তো ওটা। বাড়ি গিয়ে তো খুঁজেও পাবে না। তবু সে আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা রইলো। প্যাকেটটা কুড়িয়ে মোনালিসার হাতে তুলে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু সে মনে মনে ভীষণ ভাবে চাইছিলো কেউ একজন ওটা কুড়িয়ে ওর হাতে তুলে দিক। আকাঙ্ক্ষার কথা কি অপরে শুনতে পায়? হয়তো তাই। একটা লোক ওটা কুড়িয়ে মোনালিসার হাতে দিতেই অমিতাভর জ্বর ছাড়লো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে অমিতাভ শুয়ে পড়লো বটে কিন্তু ঘুম যেন আসতে চায় না।

আসলে দুপুরে যা একখানা ঘুম দিয়েছে তার জের এখন টানতে হবে। রাতের খাওয়াটাও একটু ভারী হয়েছে। ডাল, ভাত, দু'রকমের মাছ। পমফ্রেট আর চেম্মিন অর্থাৎ চিংড়ি। এতো বড়ো বড়ো চিংড়িমাছ অমিতাভ তার জীবনে কখনও খায়নি। কলকাতায় এর অর্ধেক সাইজের মাথা ছাড়া যেটা পাওয়া যায় তার দামও সত্তর থেকে আশি টাকা কেজি। গত বছর ভাইফোঁটার দিনে খেয়েছিল।

চিংড়িমাছের কারিটা অমিতাভ খেয়েছে বটে কিন্তু কী কষ্টে যে খেয়েছে তা শুধু সে-ই জানে। এখানকার সব রান্নাই নারকেল তেল দিয়ে। সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধে হয়নি। নারকেল তেলের রান্না বরং ভালোই লেগেছে। অমিতাভর কষ্টটা অন্য কারণে। তার বড়দা সুমন এবং মেজদা রজত চিংড়িমাছটা দারুণ ভালোবাসে । যার ফলে প্রতি বছর ভাইফোঁটায় ছোড়দি-মাংস-টাংস না-করে চিংড়িমাছের মালাইকারি করবেই। মাংস যদি করেও তাহলেও চিংড়িমাছের একটা আইটেম থাকবেই। সেই বড়দা আর মেজদাকে ছেড়ে একা একা এই মহামূল্যের মাছ খেতে কষ্ট না-হয়ে পারে? বাড়ির সবাইকে ছেড়ে কেমন যেন এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করার ফলে অমিতাভ যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল। হোটেলের মালয়লমী ছোকরা গঙ্গাধরম ইংরেজি এবং হিন্দি মিশিয়ে বলেছিল স্যার আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না। নিশ্চয়ই বাড়ির কথা ভাবছেন? চমকে গঙ্গাধরমের মুখের দিকে তাকিয়েছিল অমিতাভ। কতো আর ওর বয়স হবে? বড়জোর কুড়ি। অথচ চমৎকার সাইকোলজি বোঝে তো! অমিতাভ হেসে উত্তর দিয়েছে, তা একটু ভাবছি।

যখনকার যা কাজ স্যার। গঙ্গাধরমের পরিষ্কার কথা, এখন খাবার সময়। মন খারাপ করবেন না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমিতাভ সেই মন খারাপই করে চলেছে। আসলে রাতের নির্জনতায় বাড়ির আপন মানুষগুলো যেন অনেক কাছে চলে আসে। সারাদিনের কোলাহল আর ব্যস্ততার শেষে তাদের কথাই মনকে বড়োবেশি উতলা করে তোলে। ঘুম আসবে কী, দুপুরে না-ঘুমালেও অমিতাভ এই মুহূর্তে আরামে ঘুমাতে পারতো না। মনও ঠিক এক জায়গায় বসে নেই। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে ভাইঝি টুলটুলি আর ভাইপো বাপ্পার কথাও ভাবলো। বড়ো বৌদি দীপ্তি এবং মেজ বৌদি কমলার স্নেহমাখা ভালোবাসার অ্যালবাম সাজাতে সাজাতে বড়দা মেজদাও এক ফাঁকে চলে এসেছে। ছোড়দি, জামাইবাবু আর ভাগ্নে রতনের ছবিটাও চোখের ওপর পেন্ডুলামের মতো দুলছে। সকলের কথা ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে বুঝি ঘুম আসছে এবার। সামনে কোথায় যেন গীর্জা রয়েছে। সেখানকার বড়ো ঘড়িটা শব্দ তুলে সময়কে চিহ্নিত করে চলেছে আপন গতিতে। বাড়ির পর বন্ধুদের কথা মনে করতেই চিন্তাগুলো ক্রমশ এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে আসার সময় সঞ্জীবের সঙ্গে দেখাই হলো না। রাতুলের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল শুক্রবার দিন। অথচ বৃহস্পতিবারই তাকে রওনা দিতে হলো। রাতুল হয়তো টিকিট কেটে দাঁড়িয়েই ছিল। ক্লাবে শুধু শুধু সেদিন নিখিলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো। ওর ওই এক দোষ। ক্যারামবোর্ড থেকে কিছুতেই সরানো যাবে না। অথচ বহু প্লেয়ার তখন অপেক্ষা করছে। ও সেটা বুঝতেই চায় না। অনেক দিন হজম করার পর অমিতাভ সেদিন বলেছিল, তুই এক কাজ কর, ক্যারামবোর্ডটা বাড়ি নিয়ে যা। কেউ তোকে বিরক্ত করবে না। ব্যস! তারপরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল চিৎকার চেঁচামেচি। নিখিলের একটাই প্রশ্ন, তুই আমাকে ও-কথা বলার কে? ও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নিখিলকে প্রায় সামলানোই যাচ্ছিলো না। কে কে যেন ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। দিব্যেন্দু, অপু, শঙ্কর, অমিতাভ আর মনে করতে পারছে না। ও এখন পুরোপুরি ঘুমের সমুদ্রে ডুব দিয়েছে।

পরদিন সকাল আটটায় যখন অমিতাভ হোটেল থেকে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন একটা কান্ডই হলো। হোটেলের সেই ছোকরা ছেলেটা অর্থাৎ গঙ্গাধরম হাসতে হাসতে হাতে একটা নারকেল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। কোনওরকম কথাবার্তা না-বলে প্রথমেই সে ঘরের চৌকাঠের ওপর সেটা ভেঙে অমিতাভর মুখের দিকে তাকালো। আচমকা এই ব্যাপারটায় অবাক হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলো, কী হলো এটা?

স্যার, আপনার চাকরির আজ প্রথম দিন। নারকেল ভাঙাটা খুব শুভ ব্যাপার। সেই কারণেই—

তুমি মানো এ-সব? অমিতাভ হাসতে লাগলো।

মানা-না-মানার থেকেও বড়ো জিনিস হলো এটা একটা রেওয়াজ। কেন স্যার? আপনি বুঝি মানেন না? গঙ্গাধরমের উৎসাহটা প্রায় নিভেই গেল। ভালো করতে গিয়ে ব্যাপারটা বোধহয় উল্টো হলো। স্যার অসন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই। সেইজন্যই ওই জিজ্ঞাসা। গঙ্গাধরম লজ্জিত সুরে আবাব বললো, আপনি রাগ করলেন স্যার?

রাগের প্রশ্নই নেই। অমিতাভ শুধু ভাবছিল একটা দিনের আলাপ এই গঙ্গাধরমের সঙ্গে। গতকাল সন্ধ্যার পর এবং রাতের খাওয়ার শেষে ওই ছেলেটির হাতে বেশ কিছুটা অলস সময় থাকার ফলে অমিতাভ সবাইকে ছেড়ে কেন জানি না ওর সঙ্গেই অনেক কথা বলেছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যেই গঙ্গাধরম তার বাড়ির সবার কথা অমিতাভকে শুনিয়ে দিয়েছে। যেমন সে বি.এ পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষার মাস চারেক আগে বাবা মারা যান। ওরা তিন ভাই দু'বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে ও হচ্ছে তৃতীয়। বাড়িতে আরও মানুষ আছে। ওর দুই কাকার এক ছেলে এক মেয়ে। সবাই একসঙ্গে রয়েছে। আলাদা হবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। গঙ্গাধরমের মাকে সবাই ভগবানের চেয়েও বেশি মানে। উত্তরে অমিতাভও নিজের কথা বলেছিল কিছু কিছু। তার কোচিনে আসার কারণটা তো প্রথমেই জানানো হয়েছিল। গঙ্গাধরম নারকেল ভাঙলো তো সেইজন্যই। অমিতাভ সেটাই ভাবছিল। কতো সহজে ও আপন করে নিতে পারলো। তাব শুভকামনা গঙ্গাধরম যেটুকু করলো সেটাই তো যথেষ্ট। অমিতাভ ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, আমি কেন রাগ কববো— তুমি তো কোনও অন্যায়ই করলে না। বরং যা করলে বাড়ির প্রিয় মানুষগুলোও এটাই করে।

ত্রিপুনীথুরা থেকে কেরালা স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে উঠে বসলো অমিতাভ। সে যাবে আম্বালামেডু। ওখানে রমন ফার্টিলাইজারের অফিস—ফ্যাক্টরি। পাশেই ওদের কোম্পানির হেড অফিস। টিকিট কাটার সময় অমিতাভ কনডাকটরকে বারবার বলে রাখলো, সে এখানে নতুন। কিছুই চেনে না। তাকে যেন আম্বালামেডুতে নামিয়ে দেওয়া হয়। কনডাকটর তাকে আশ্বাস দিতেই সে বাসের জানলা দিয়ে চোখ দুটিকে বাইরে মেলে দিল। রাস্তার দু'পাশে পাকাবাড়ির সঙ্গে মাথায় খোলার চাল নিয়ে অজস্র মাটির বাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাটির দেওয়ালগুলো কী চমৎকার মসৃণ! যেন এইমাত্র কেউ লেপে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা জমি। বিরাট বিরাট পুকুর। পুকুরের চারপাশে এবং প্রতিটি বাড়ির আশেপাশে এলোপাথাড়ি নারকেল গাছ। বেশ কিছু দূর এগোবার পর দু'পাশে শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। মাঠগুলো যেন সবুজ রঙের বেনারসী পরে নতুন বৌয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে মাথা দুলিয়ে চলেছে। দূরে ফাঁকা ফাঁকা বাড়িগুলো নারকেল গাছের ছাতা মাথায় দিয়ে নিজেদের যেন লুকিয়ে রেখেছে। মাঝারি হাইটের একটা টিলায় বাঁক নিয়ে বাসটা বেশ কিছুটা নীচের দিকে নামতে লাগলো। পথের দু'পাশে আবার জমজমাট ঘর-বাড়ি, দোকান-পসার। লোকজনের ভিড়ে এলাকাটা যেন সবসময়েই চঞ্চল হয়ে রয়েছে। কনডাক্টর চিৎকার করে উঠলো, আম্বালামেডু রমন ফার্টিলাইজার স্টপেজ।

বাস থেকে নেমে অমিতাভ চারপাশের ওপর একবার চোখ দুটোকে বুলিয়ে নিল। যে-ফুটপাথে নেমেছে সেখান থেকেই পীচ-ঢালা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। আর একটা রাস্তা বাঁ দিক দিয়ে রমন ফার্টিলাইজারের দিকে চলে গেছে। পথের দু'পাশে ইউক্যালিপটাসের সাজানো বনরাজি। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর ডান দিকে একটা ড্যাম। রাস্তাটা আবার বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে। বাস সেইদিকে ঘুরতেই রমন ফার্টিলাইজারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটা চোখে পড়লো অমিতাভর। এই বিল্ডিংটার পরেই ওদের কোম্পানির ফ্যাক্টরির বাউন্ডারি শুরু।

অমিতাভ তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর তিনতলার প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চিফ পার্সোনাল

অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণকে স্লিপ পাঠিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে তিনি ডাকতে পারেন। মনের মধ্যে চাপা উদ্বেগ নিয়ে অমিতাভ বাইরেটা দেখছিল। বিল্ডিংটাব ফ্লোরগুলো খুব উঁচু উঁচু। এই তিনতলাটাই যেমন সাধারণ পাঁচতলা বাড়ির সমান উঁচু। এখান থেকে কোচিন শহরটাকে মনে হচ্ছে নারকেল গাছে ঘেরা একটা দ্বীপ। এখানকার ঘরবাড়ি, আকাশ সব কিছু ঢাকা পড়েছে ওই দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের ছায়ায়। নদী-নালা-খাল-বিলও কম নয়। জল আব গাছ যেন কোচিনের প্রাণ। সবুজের স্নিগ্ধতায় চোখ দুটো যখন জুড়িয়ে যাচ্ছে, বেয়ারা এসে অমিতাভকে খবর দিল, সাহেব ডাকছেন আপনাকে।

মিঃ রামাকৃষ্ণাণ কাগজপত্র যা দেখার দেখে এবং অমিতাভর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে বিভাগীয় প্রধানকে ডেকে বললেন, ইনি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়ব ক্লার্ক। কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছেন। একে যেখানে দেবেন তার ব্যবস্থা করুন।

বিভাগীয় প্রধান ভদ্রলোকটির সঙ্গে অমিতাভ দোতলার একটা প্রশস্ত ঘরে ঢুকতেই উনি একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে ইংরেজিতে যা বললেন তা হলো এই—আপনি এখানে বসুন। কাজকর্ম পেতে পেতে দু-চার দিন লাগবে। তবে আপনি এই এস্টাবলিস্ট-সেকশনে এসেই বসবেন। তারপরেই ভদ্রলোক আরও ফিসফিস কবে অমিতাভর প্রায় কানে কানেই বললেন, প্রথম কয়েকটা দিন একটু চুপচাপ থাকবেন। মানে কাবো সঙ্গে খুব একটা কথা-টথা বলবেন না। পবে দেখবেন সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের তড়িৎগতিতে চলে যাওয়াব পর অমিতাভব কেমন সন্দেহ জাগলো। ব্যাপারটা কী? বিভাগীয় প্রধান ভদ্রলোকটিব নাম সে জানে না। এই মুহূর্তে তার কোনও দরকারও নেই। কিন্তু উনি যা বলে গেলেন সেটা অমিতাভব কাছে খুবই সাঙ্ঘাতিক বলে মনে হলো। 'চুপচাপ থাকবেন। কাবো সঙ্গে কথা বলবেন না। পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে'—এ-সবের মানে কী?

এস্টাবলিস্টমেন্ট সেকশনের এই প্রশস্ত ঘরে জনা তিবিশের মতো লোক যার যাব টেবিলে বসে কাজ কবছিল। বিভাগীয় প্রধান ঘর ছেড়ে চলে যাওয়াব মিনিট দশেক পরেই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে অমিতাভকে ঘিবে ধরলো। ওদের চোখে-মুখে যথেষ্ট উত্তেজনার ছাপ। তারা প্রায় সবাই মালয়লম ভাষায় অমিতাভকে অনর্গল প্রশ্ন কবতে লাগলো। দু-একজনের হাতেব মুঠিও পাকানো।

এমন একটা ব্যাপারের জন্য অমিতাভ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তার চাকরি পাওয়ার মধ্যে ভেতরে ভেতরে যে একটা অন্য স্রোত বইছিল সেটা সে কলকাতা বসেই টের পেয়েছে। তবে পুরো ছবিটা তার কাছে পরিষ্কার না-থাকার দরুন মোটামুটি অনুমান করেছিল সে বুঝি কোনও দ্বন্দ্বের শিকার হতে চলেছে। ঘটনাটাও সেদিকেই গড়াচ্ছে। কিন্তু শেষ না-দেখে অমিতাভ এতো সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তাহলে তো প্রথম থেকেই সে কোচিনে আসতে আপত্তি করতো। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা যে-কোনও পরিস্থিতিতেই মেরুদন্ড সোজা রেখে চলতে পারে। অমিতাভ ওদের মালায়লম ভাষার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না-পারলেও ওরা যে তার ওপরে চড়াও হয়েছে—এটা বুঝতে অসুবিধাব কোনও কারণ নেই। অমিতাভ একপলকে ওদের মুখগুলো দেখে নিয়ে খুব শান্ত গলায় বললো, আমি দুঃখিত, আপনাদের ভাষাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এরপর মিনিট দুয়েক যেন বরফের ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। এতোগুলো মানুষের কারো মুখেই কোনও কথা নেই। সকলেই যেন একই সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে। স্বাভাবিকতা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তখন ইংরেজিতে, কেউ কেউ হিন্দিতেও প্রশ্নের বর্ষণ শুরু করে দিল।

আপনি তাহলে এখানে এসেছেন কেন? প্রশ্নকর্তাকে দেখে নিয়ে অমিতাভ আগাগোড়া মেজাজ ঠান্ডা রেখে উত্তর দিল, যে-কারণে আপনিও এসেছেন।

এটা আমার দেশ।

আমার তাহলে কোনটা? অমিতাভ উল্টে প্রশ্ন রাখলো। সেটা ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞাসা করুন।

আর একজন চিৎকার করে উঠলো, আপনাকে আমরা চাকরি করতে দেবো না। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অবৈধ। আপনি উঠে পড়ুন। দু-চারজন অমিতাভকে চেয়ার থেকে ওঠাবার চেষ্টা করতেই কেউ হয়তো এই ফাঁকে ওকে একটু ধাক্কাও দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ফুঁসলে উঠলো, আমি চোর নই। আমার গায়ে কেউ হাত তুলবেন না। আমি তো আপনাদের সঙ্গে ......অমিতাভ থেমে পড়লো। ওই সময়ে ঘরের মধ্যে যে-উপস্থিত হলো তাকে হাজার রকম কল্পনার মধ্যেও অমিতাভ কখনও ভাবতে পারেনি। সত্যিই জলে যেন শিলা ভাসছে। খুবই গাম্ভীর্য নিয়ে মোনালিসা তখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উপস্থিত জনতা তখন মালায়লম ভাষায় কী যে ওকে বোঝাচ্ছে ওরাই জানে। মোনালিসা শুধু মাথাটা মৃদু ভাবে নাড়িয়ে যাচ্ছে।

মিনিট দশেক ধৈর্য ধরে শোনার পর মোনালিসা ওদের কী যেন একটা নির্দেশ দিল। তারপর অমিতাভকে একপলক দেখে নিয়ে বললো, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। চারপাশে ততোক্ষণে আরও ভিড় জমে গেছে। মোনালিসার কথা শুনে প্রত্যেকেই জয়ধ্বনি দেবার ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলো, তান্নে তিরু তান্নে তিরু আওয়ার ডিম্যান্ড তান্নে তিরু।

অমিতাভর কাছে মোনালিসার ভূমিকাটা তখনও পরিষ্কার নয়। সে কে, কী কারণে ওর সঙ্গে যেতে বলছে এবং যাবেটাই-বা কোথায়—এই ব্যাপারগুলো একটাও স্বচ্ছ নয়। তাছাড়া সবাই অমন জয়ধ্বনি-বা দিল কেন? ওই কথাটারই-বা মানে কী—তান্নে তিরু তান্নে তিরু আওয়ার ডিম্যান্ড তান্নে তিরু? কোনও কিছু না-বুঝে হুট করে মোনালিসার সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে যাওয়াটা কী ঠিক? মাথামুণ্ডু কিছুই তো জানা যাচ্ছে না। চারদিকেই যেন অন্ধকারের জমাট দেওয়াল। অমিতাভ মোনালিসার মুখের দিকে তাকালো। খুব সংযত হয়ে স্বাভাবিক গলায় বললো, আমি তো আপনাকে চিনি না।

শোনো ওর কথা! বিক্ষোভে ফেটে পড়লো জনতার ঢেউ। ছেলেটার স্পর্ধা দেখো—পদ্মিনী উষাকে বলছে কিনা চিনি না।

ওকে একটু চিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাক।

ব্যাটা ম্যানেজমেন্টের দালাল। এখানে এসেছো আমাদের লড়াই ভাঙতে—আবার বলছো পদ্মিনী উষাকে চিনি না। তোমার এই বলাটাই প্রমাণ করছে তুমি ওকে বেশ ভালো ভাবেই চেনো।

ওর সঙ্গে এতো কথা বলার কী আছে? যে-আন্দোলন ভাঙতে এসেছে তার হাত দুটোও ভেঙে দাও।

সত্যিই ওকে অনেক বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে। এতো ভালো ব্যবহার করার যোগ্য ও নয়। ওকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর বাইরে বার করে দাও।

ছেলেটা নিশ্চয় সব কিছু জেনে শুনেই এসেছে। অতো দূর থেকে এখানে এসে যে এতো গর্জন করতে পারে, সমুদ্র তাকে খুবই ভালোবাসে। ওকে আরব সাগরে ছুড়ে দাও।

এখানে করণীয় কিছু নেই। পুরো এলাকাটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। অমিতাভ নির্লিপ্ত ভাবে ওদের মন্তব্যগুলো শুনে যাচ্ছিলো। এতো মানুষের চিৎকার, চেঁচামেচি এবং উত্তেজনার মধ্যে তার কথা কেউ শুনবে না। সেই মানসিকতা এই মুহূর্তে কারো নেই। সুতরাং বোঝাতে যাবার চেষ্টা করা বৃথা। বরং ওরা ভাবতে পারে সে তার দোষ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে। এতে ফল আরও খারাপ হতে পারে। তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো। কিন্তু ক্ষিপ্ত মুখগুলোকে দেখতে দেখতে অমিতাভ ক্রমশ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। এরা যে-কোনও মুহূর্তে কিছু একটা করে বসতে পারে। করুক। তাকে মেরে ফেলে দিক ওরা। অমিতাভ জ্ঞানত কোনও অন্যায় করেনি। সে কেন মাথা নিচু করবে? নতুন করে সে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করলো।

সব জায়গাতেই কিছু কিছু অতিবিপ্লবী থাকে। কাউকে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। বেঁধে আনতে বললে মেরে আনে। এদের বুদ্ধি যতো না কাজ করে, অহেতুক আস্ফালনের দাপটটা তার চেয়েও বেশি দেখাতে চেষ্টা করে। গন্ডগোলগুলো একটা পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে দ্রুত মোড় নিয়ে জটিল আকার ধারণ করে এই সব কারণেই।

হঠাৎ দুটি ছেলে ক্ষিপ্ত বাঘের মতো অমিতাভর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই হই-হট্টগোলের মধ্যে খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পদ্মিনী বুঝতেই পারেনি এমন একটা ব্যাপার হতে পারে। উত্তেজিত মানুষগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু হঠাৎ ওরা এটা কী করে বসলো? একটিমাত্র ছেলেকে হাতের কাছে পেয়ে বিশাল জনতা যা খুশি করবে এটা ঠিক নয়। পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে পদ্মিনী তার ভরাট গলায় বেশ জোরেই বলে উঠলো, ওকে ছেড়ে দিন। এ-সব আপনারা কী শুরু করলেন?

যারা অমিতাভর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা খুব নিরুৎসাহ হয়ে সরে দাঁড়ালো। পুরো চত্বরটা তখন আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা। অমিতাভর খুব যে একটা লেগেছে তা নয় তবে সে বেশ মুষড়ে পড়েছে। এই ভাবে তার গায়ে কেউ হাত তুলবে—অনেক রকমের সম্ভাবনার মধ্যেও এই ছবিটা সে কোনোদিনও আঁকেনি। মোনালিসা, না-না, মোনালিসা নয়—ওর নাম তো জানাই গেছে। পদ্মিনী উষা। সেই পদ্মিনী এবারে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম ভাষা এবং সুরে বলতে লাগলো ঃ আপনারা এইমাত্র যা করলেন তা আমাদের সবাইকে লজ্জা দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যে অসংযমী আচরণ এবং শৃঙ্খলা হারালেন এর চেয়ে আর কী আমরা হারাতে পারি? আমি জানি আমাদের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে কিন্তু সেই বিক্ষোভটা কি একজন নিরাপরাধ মানুষের ওপর ফলাতে হবে? এই বিক্ষোভকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগাতে হবে—সেটা নিশ্চয়ই চাকরি করতে আসা একটি ছেলের চেয়ারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। আমাদের লড়াইটা ওঁর সঙ্গে নয়। আমবা বোঝাপড়া করবো ম্যানেজমেন্ট কতোটা শক্তি ধরে আমবা যাচাই করবো সেটা—কিন্তু আমাদেরই মতো সাধারণ একজনের সঙ্গে শক্তি ক্ষয় কবাটা ম্যানেজমেন্টকে নিশ্চয়ই হাসাবার সুযোগ করে দেবে। আমি জানি এই রকম পরিস্থিতিতে কেউ কেউ ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেন বটে কিন্তু পাবেন না। এটা খারাপ। তাহলে আমবা নিজেদেরকে চেতনা সম্পন্ন মানুষ বলে মনে কবি কেন? আপনারা সবাই ঠান্ডা মাথায় একবাব চিন্তা কবে দেখুন তো—যে-ভাবে আমবা ওর ওপর চড়াও হয়েছিলাম তাতে যে-কোনও মুহূর্তে একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে যেতে পাবতো। আর তাতে লাভ হতো কার? ম্যানেজমেন্ট এই ঘটনার ওপর নতুন রং চড়িয়ে সে তার কাজ গুছিযে নিতো এবং আমাদের মাথার ওপর পাঁচ মণের একটা বোঝা চাপিয়ে দিতো—যাতে আমরা আর কখনও মাথা সোজা করে না-দাঁড়াতে পারি। এই ভুলগুলো যতো করবো কর্তৃপক্ষও ঠিক ততোখানি সুন্দর করে হাততালি বাজাবে। আপনারা যদি ম্যানেজমেন্টের এই চালাকিগুলো ধরতে না-পারেন তাহলে সেটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। কেরালায় আমাদেব এই ইউনিটে কী আন্দোলন হচ্ছে-না-হচ্ছে কলকাতা থেকে আসা এই ভদ্রলোকের জানার কথা নয়। ম্যানেজমেন্ট শয়তানিটা কোথায় করেছে সেটা আগে আমাদের দেখা দরকার। আর আন্দোলন তো আমাদের হাতিয়ার। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমাদের রণকৌশল কী হবে—তা আমরা এক্সিকিউটিভ মিটিং ডেকে ঠিক করবো। আর একটা কথা আমরা প্রায়ই বলি, আমরা অন্যায় করি না। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করি না। কিন্তু একটু আগে যেটা হলো সেটা তাহলে কী? এটা আপনারা স্বীকার করছেন কী আমাদের অন্যায় হয়েছে? গুন্ডাগর্দি যদি কারো করতে ইচ্ছা হয় তার জায়গা আলাদা। সঠিক আন্দোলনকে হঠকারিতা করে কেউ এ-ভাবে পেছন থেকে টেনে ধরবেন না। এতে ক্ষতি আমাদেরই। আশা করি আপনারা এর গুরুত্ব অনুভব করে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলবেন। আমরা এখন ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবো। ওঁর কাছ থেকে যেটুকু জানার জেনে নিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম তৈরি করবো। আপনারা

এখন যে যার কাজে চলে যেতে পারেন। কেরালার মানুষ সম্পর্কে বাইরের কেউ বাজে ধারণা নিক—এটা আমি চাই না।

মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। সকলের ওপর যে পদ্মিনীর প্রচন্ড কর্তৃত্ব এবং দাপট সেটা ওর ভাষণ শুনতে শুনতেই অমিতাভর বারবার মনে হয়েছে। তার কথা সে নিজে যেটা বলতে পারিনি—পদ্মিনী সেই দিকটাও কভার করেছে। কী চমৎকার ভাষা এবং বুদ্ধির খেলায় সে উত্তেজিত জনতাকে বাধ্য ছেলের মতো কাজেব জায়গায় পাঠিয়ে দিল। অমিতাভ এজন্য হাজার বার ওর তারিফ করবে। যেটা সত্যি সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। কিন্তু ওর পরিচয়টা কী? যে-মেয়েকে ট্রেনের সারাটা পথে নিতান্তই শান্ত এক বই-পড়ুয়া বলে মনে হয়েছিল, সে যে প্রয়োজনে আগ্নেয়গিরি হতে পারে—সেটা তো অমিতাভ নিজের চোখেই দেখলো।

ভিড়টা ফাঁকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনী অমিতাভব মুখের দিকে একঝলক তাকালো। খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার কোথাও লাগেনি তো?

তেমন কিছু নয়। কনুইটা একটু ব্যথা করছে।

আমার নাম পদ্মিনী উষা। সারা ভারত রমন ফার্টিলাইজাব কোম্পানির এমপ্লয়িজ ইউনিয়নেব জেনারেল সেক্রেটারি। এঁরাও প্রত্যেকেই এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার। ওখানে যে-নয়জন বিভিন্ন বয়সের লোক দাঁড়িয়েছিলেন—পদ্মিনী নিজেব এবং ওঁদের পবিচয দিয়ে আবও বললো, আশা করি আপনি ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

অমিতাভ একটি মাত্র কথা খরচ কবলো, চলুন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ওরা ডান দিকের চওড়া রাস্তাটা ধবে মিনিট সাতেক হাঁটার পর সামনেই একটা মাঝারি একতলা বাড়ি চোখে পড়লো। বাড়ির গায়ে বড়ো একটা সাইনবোর্ড। মালয়লম এবং ইংরাজিতে লেখা রয়েছে কোম্পানিজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। চমৎকার ফুলের বাগান পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দেখা গেল বেশ বড়ো একটা হলঘর। পুরো ঘবটা জুড়ে ফরাস পাতা। একপাশে গোটা চারেক স্টীলের আলমারি। কুশন দেওয়া একটা চেয়ার। চেয়ারের সামনে সেক্রেটাবিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপর বেশ কিছু কাগজপত্রের ফাইল, পেপার ওয়েট, কলমদানি এবং ফোন। টেবিলের এ-পাশেও গোটা কুড়ি চেয়ার এবং কয়েকটা ঝকঝকে বেঞ্চ। দেওযালে লেনিনের ফুল সাইজের একটা ছবি।

অমিতাভকে বসতে বলে পদ্মিনী টেবিলের ও-পাশে গিয়ে কুশন দেওয়া চেয়ারটাতে বসতে-না-বসতেই গোটা তিনেক ফোন করলো প্রায় ঝড়ের গতিতে। যাদের যাদের ফোন করলো—মনে হলো যেন জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিল। মিনিট পাঁচেক সময় গড়াতে-না-গড়াতেই দফায় দফায় সব মিলিয়ে আরও একুশজন এলেন। একজন এসে পদ্মিনীর হাতে টাইপ করা দুটো পৃষ্ঠা দিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই বেরিয়ে গেল। টাইপ করা পৃষ্ঠার ওপর পদ্মিনী যখন চোখ বোলাচ্ছিল তখন ঘবে ঢুকলেন একজন ডাক্তার। ওঁর গলায় একটা স্টেথিস্কোপ মালার মতো ঝুলছিল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে পদ্মিনীর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার পদ্মিনীজি?

অমিতাভকে দেখিয়ে পদ্মিনী বললো, ওঁর হাতটা ব্যথা-ব্যথা করছে। ওঁকে একটু দেখুন তো—

কোন হাতটা?

ছোট্ট এই ব্যাপারটার মধ্যেও পদ্মিনীর সজাগ দৃষ্টি এবং আন্তরিকতার কথা ভাবতে ভাবতে অমিতাভও উত্তর দিল, ডান হাতটা। ব্যথাটা কুনইয়ের কাছেই।

ডাক্তার অমিতাভর কনুইটা ভালো করে দেখে-টেখে নিয়ে একটু টেপাটেপিও করলেন। কী, লাগছে? তারপর নিজেই আবার বললেন, কিচ্ছু হয়নি। জায়গাটা একটু ফুলে গেছে এই যা—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দুটো অ্যান্টাসিড আর একটা পেনকিলার খেয়ে নেবেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পদ্মিনী সকলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, আমরা একত্রিশজন এখানে উপস্থিত আছি। বাকি দুজন কমিটি মেম্বার ছুটিতে। তো আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি। পদ্মিনী সেই টাইপ-করা কাগজটার ওপর আর একবার চোখ বোলাতে বোলাতে অমিতাভকে পরিষ্কার একটা কথা জানিয়ে দিল, আমাদের প্রয়োজনে আমরা আপনাকে হয়তো অনেক অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারি। উত্তর দেওয়া-না-দেওয়াটা আপনার ওপর। তবে নিশ্চয়ই আপনি কোনওরকম বিতর্কে যাবেন না বলেই আশা করি। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাকে সহজ করবার জন্যই আমাদের এই আলোচনা। সেদিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু না-বললেই নয় সেটা অন্তত বলবেন। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে পদ্মিনী নরম গলায় বললো, আমরা জেনে গেছি আপনার নাম অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি এম. কম. পাশ করেছেন। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা যদি খোলাখুলি এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের সামনে বলেন তবে আমরা আলোচনায় ভালো ভাবে অংশ নিতে পারবো।

দেখুন, এই কোম্পানির কলকাতা অফিসে আমার এক কাকা কাজ করেন।

কী নাম? পদ্মিনীর ছোট্ট প্রশ্ন।

রাখাল ভট্টাচার্য। সিনিয়র ক্লার্ক। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মিনী যে-ছেলেটি কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিল তাকে নির্দেশ দিল নামটা লিখে নাও। হ্যাঁ, তারপর বলুন—

এম. কম. পাশ করার পরেও একটা বছর ধরে বেকার ছিলাম। কোথাও কিছু জুটছিল না। রাখালকাকাকেও বলা ছিল। উনি নামবিয়ার সাহেবকে দেড় মাস আগে একবার আমার কথা বলেছিলেন। মিঃ নামবিয়ার তখন বলেছিলেন পরের বার এসে দেখবেন। এবারে কলকাতা অফিসে নামবিয়ার সাহেব আসতে রাখালকাকা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং যথারীতি একটা চাকরি দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। একটু সময় নিয়ে অমিতাভ ফের বলতে লাগলো, মিঃ নামবিয়ার প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কোচিনে যেতে আমি রাজি কিনা? তখনই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। এতো বড়ো কলকাতা অফিসে আমার একটা জায়গা হলো না? কিন্তু চাকরি না-পাওয়ার হতাশায় আমি তখন ভুগছিলাম। তাই কোচিন বা চীন কোনওটাই আমার কাছে কোনও দূরত্বই নয়।

আপনি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছেন পঁচিশে আগস্ট, তাই না?

হ্যাঁ।

এখানে আসতে তিনটে দিন লেগেছে। গতকাল একটা ছুটির দিন অর্থাৎ সানডে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো দিন লেট করে আপনি এখানে এসেছেন। ওই দুটো দিন কি করেছেন জানতে পারি কি?

কলকাতা অফিসে ডিউটি করেছি। অমিতাভর সোজা উত্তর। মিঃ নামবিয়ার আমাকে জানিয়ে দিলেন, দু'দিন কলকাতায় অফিস করে তুমি কোচিনে গিয়ে যোগ দেবে। এও বলেছেন, ইট ইজ এ কেস অফ সিম্পলি ট্রান্সফার। ব্যাপারটা আমার কাছে তখন খুবই অবাক লাগছিল। দুটো দিন চাকরি করার পর ট্রান্সফার ঘটনাটা কী?

এটাই তো মিঃ নামবিয়ারের চালাকি। উনি ইউনিয়নকে ধোঁকা দিতে চাইলেন। দেখাতে চাইলেন আপনার এটা সত্যি সত্যি ট্রান্সফার কেস। নো কোশ্চেন অফ এনি নিউ রিক্রুটমেন্ট। অথচ মূলতঃ এটা ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমাদের নিয়মে আছে দু'বছর একটানা এক জায়গায় থাকার পরেই কাউকে ট্রান্সফার করা যেতে পারে—তার আগে নয়। এখানে তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? এবারে আসল কথায় আসা যাক। এখানকার আন্দোলনের ছবিটা আপনার কাছে পরিষ্কার নয়। আপনি যে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন তার নেপথ্যের কাহিনীটুকু আপনার জানা দরকার। ঘটনাটা হলো— পদ্মিনী উষা সহজ ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলো, ভারতবর্ষের সব কোম্পানিগুলোতেই একাধিক ইউনিয়নে ইউনিয়নে যখন রেষারেষিতে ব্যস্ত তখন আমাদেরটাই বোধহয় প্রথম যেখানে একটা মাত্র ইউনিয়ন। সব ক্যাটাগরির শ্রমিক-কর্মচারী আমাদের এই ইউনিয়নের মেম্বার। আমরা বছর দুই আগে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলাম। সাব-স্টাফদের মধ্যে কেউ যদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট

করে তবে তাকে জুনিয়ার ক্লার্কে প্রমোশন দিতে হবে। রাজনের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গত দু'মাস ধরে এখানে একটা আন্দোলন করে চলেছি। ম্যানেজমেন্ট কিছুতেই ওকে প্রমোশন দিচ্ছে না। এগ্রিমেন্টও মানতে চাইছে না। ম্যানেজমেন্টের এটা বিশেষ ধরনের একটা জেদ। মাঝে মাঝে ইউনিয়নের শক্তিটা যাচাই করে দেখার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারে না। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা যেখানে আন্দোলন করে চলেছি রাজনকে জুনিয়ার ক্লার্কে প্রমোশন দিতে হবে—সেই জায়গায় কী-না আপনাকেই এখানে ম্যানেজমেন্ট সুকৌশলে ঠেলে দিল। এই অবস্থায় আপনাকে আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি? আমরা জানি, আপনারও চাকরির প্রয়োজন আর আপনি আমাদের শত্রুও নন—যদিও আপনি এই মুহূর্তে আমাদেরই সেটা ভাবছেন কিন্তু আমরা নিরুপায়। নীতি থেকে সবে আসতে পারবো না। ম্যানেজমেন্টের এই খেয়ালখুশি সেদিনই মেনে নেবো যেদিন আমাদের ইউনিয়নের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আশা করি আপনি আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। এই পর্যন্ত বলে পদ্মিনী কাকে যেন একটা ফোন করলো। ফোন শেষ করেই অমিতাভকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা, কলকাতায় কি আপনার মেডিকেল টেস্ট হয়েছিল?

না।

তবেই বুঝুন—মেডিকেল টেস্ট না-হলে কারো অ্যাপয়েন্টমেন্টই বৈধ নয়। এক্ষেত্রে সেটাও মানেনি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন তো, ম্যানেজমেন্ট যদি সত্যি সত্যিই আপনাকে চাকরি দিতে উৎসাহী হতো তাহলে এর একটা মানে বুঝি—আমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে নেমে আপনাকে সাটল কক হিসেবে ব্যবহার করছে। আগে আমরা রাজনের ব্যাপারটা নিয়ে সামলে উঠি, তারপরে অন্য কথা। প্রতি বছরই এগ্রিমেন্টের সময় নিয়মবিরুদ্ধ যা খুশি তাই চাপিয়ে দেয়। এ-জিনিসের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের সংগ্রাম বা আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আমাদের দেশে ম্যানেজমেন্টের হাতে হাজারো আইনকানুন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ওই একটা ছাড়া বাঁচার দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। আর যাই হোক, আমরা তো পলায়মান চোরের দর্প শুধু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না।

পদ্মিনী উষা টেবিলের কাগজপত্র একটু নড়াচাড়া করে এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বারদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার অমিতাভর দিকে দৃষ্টি ফেরালো। নতুন করে বলতে লাগলো, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা একটা খুবই সামান্য ব্যাপার। আপনাকে অনায়াসেই কলকাতায় রেখে দিতে পারতো। কিন্তু রাখলো না কেন? আমাদের আসল আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই জিনিসটা করা। ম্যানেজমেন্ট যদি জোর করে ইউনিয়নকে লড়াইতে নামিয়ে দেয় আমরা নিশ্চয়ই তামাশা দেখার জন্য ড্রইংরুমের সুখের মুহূর্ত কাটাবো না। ওরাও যে কাচের ঘরে বাস করছে এটা যেন ভুলে না যায়। তারপরেই নিচু সুরে অমিতাভকে প্রশ্ন করলো, আপনাকে থাকার জন্য কোয়ার্টার দিয়েছে?

আমি তো কোনও কোয়ার্টার পাইনি।

কলকাতা থেকে আসার সময় আপনাকে সে-সম্বন্ধে কিছু বলেনি? প্রৌঢ় মতো একজন কমিটি মেম্বার বললেন, আপনি তাহলে গতকাল থেকে রয়েছেন কোথায়?

মিঃ নামবিয়ার আমাকে হোটেল বালসাম্মাতে উঠতে বলেছিলেন।

আপনি কি তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন হোটেল কেন? অমিতাভরই বয়সী একজন কমিটি মেম্বার বললো, ওটা তো পাকাপাকি বন্দোবস্ত হতে পারে না।

আপনারা আমাকে যা-যা প্রশ্ন করছেন—অমিতাভ কয়েকজনের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বললো, এ-গুলো তো আমারও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আপনাদের আগেই জানিয়েছি, চাকরি না-পেয়ে আমি হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। তাই কোনও প্রশ্নই মিঃ নামবিয়ারকে

করিনি। উনি শুধু আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'কোয়ার্টার পেতে একটু দেরি হতে পারে। তবে সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি হোটেল বালসাম্মাতে গিয়ে উঠবে। খরচ কোম্পানিই করবে।'

দেয়ার আর সো মেনি আন্ডারকাবেন্টস ওভার দেয়ার। পদ্মিনী মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, মিঃ নামবিয়ারের উদ্দেশে একটাই অথচ তিনি হাজারটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সব কিছুকে একটা জট পাকানো উলের বল তৈরি করে আমাদের দিকে ছুড়ে দিয়েছেন। এটা অবশ্য আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। গিঁট খোলার কাজে আমরা এখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে ঘরের চৌকাঠের সামনে এসে চারজন তেজী ছোকরা দাঁড়াতেই পদ্মিনী তার আসনে বসেই কোমল আহ্বান জানালো, ভেতরে আসুন। খালি বেঞ্চের দিকে চোখ বেখে ইঙ্গিত করলো বসুন—

টগবগে ছোকরা চারজন বসতে বসতেই অমিতাভকে একবার চোখ বুলিয়ে চেটে নিল। অমিতাভ কিন্তু ওদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। হ্যাঁ, ওই চারজন ছেলেই তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেটা মনে রেখেই সে ওদেরকে না-চেনার ভান করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলো।

পদ্মিনী ওই চারজন ছেলেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এতো বছর ইউনিয়ন করার পর আমাদের চেতনা বোধহয় আর বাড়ছে না। নয়তো শত্রু চিনতে আমরা এই ভুলটা করলাম? অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ। নয়তো এম. কম. পাশ করে জুনিয়ার ক্লার্কের চাকরি নিয়ে এতো দূরে ছুটে আসবেন কেন? ম্যানেজমেন্ট সব কিছু জেনে-শুনে ওঁকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আর আমাদের এখানে একটা আন্দোলন চলছে—সেটা ওঁর জানার কথা নয়। আমবা অবিবেচকের মতো ওঁকেই আক্রমণ করে বসে রইলাম। এমন ভুল রাস্তায় গেলে ম্যানেজমেন্ট সারা জীবনের জন্য আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ওঁদের হাত দুটোকে আমরা এই ভাবে শক্ত কববো কেন? যেটা ঘটেছে আপনারা নিশ্চয়ই সেটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন। আশা করি কেরালার মানুষের প্রতি কেউ শ্রদ্ধা হারাক—এটা আমবা কেউই চাই না। ভুল অবশ্যই হতে পারে, সেটা স্বীকার করার বলিষ্ঠতাও থাকা দরকার।

চমৎকার বক্তা পদ্মিণী উষা। অমিতাভর অন্তত তাই মনে হলো। প্রভাব বিস্তার করতে তার বক্তৃতা ওষুধের মতোই দ্রুত কাজ করে। সবচেয়ে বড়ো জিনিস, যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিটা কথা মনের বেশ গভীরে গিয়ে একটা স্থায়ী বাসার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ জটিল কোনও তত্ত্বের বিন্দুমাত্র প্রয়োগ নেই। পাণ্ডিত্য দেখাবার মনোভাবটা আশ্চর্য রকমের সংযমী। কলকাতায় অমিতাভ অনেক নেতাদের বক্তৃতা-টক্তৃতা শুনেছে। হাতড়ে বেড়াবার মতো সব লেকচার। মনকে নাড়া দেওয়া দূরের কথা, মানেই বোঝা যায় না—শুধু বোঝা যায় বক্তৃতাটা বড়োবেশি কৃত্রিম। পদ্মিনী উষা সেদিক দিয়ে দাগ কাটতে পারে। সেটা বোঝাও গেল।

রাগী চারজন যুবকের শরীরে এখন আর বোধহয় রাগ-টাগ নেই। ওরা আগের মতো ফুঁসছে না। দৃষ্টিও শান্ত! ঝরনার জলে হাত-পা ধুয়ে ওরা হিংস্রতার ময়লাকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। চারজন ছেলেই বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে তাদের কী করতে হবে। পদ্মিনী উষা যা বলার যথেষ্ট বলেছে। এবার সে অপেক্ষা করে আছে তাদের বিবেকের ওপর। চারটি ছেলেই উঠে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অমিতাভর কাছে। ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, উই আর সো স্যরি, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আন্ডার দিস সিচ্যুয়েশন ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। আই নেভার মাইন্ড। অমিতাভ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ হাসি বিলিয়ে দিল ওই চারজনকে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই পদ্মিনী উষা আবার বলতে লাগলো, ওয়েল মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের বিবেচনায় যেটুকু আপনার পাওয়া উচিত সেটুকু নিশ্চয়ই পাবেন, বাট মর‍্যালি

ইট ইজ নট পসিবল টু টেক ইউ ইন প্লেস অফ রাজন। সো উই মাস্ট অপোজ ইট।

আই হ্যাভ নাথিং টু সে ইন দিস রেসপেক্ট।

এবাবে আমরা আমাদের কমিটি মিটিংটা সেরে নেবো। আপনি এখন আসুন।

ইউনিয়নের অফিস থেকে বেরিয়ে অমিতাভ সোজা পা চালালো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দিকে। এবারে সে জানে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে! বিভাগীয় প্রধান বা চিফ পার্সোনাল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণ কেউই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কেন-না, তার ভবিষ্যৎ এখানে রীতিমতো অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এ-সবের সঠিক নির্দেশ দিতে ওই একটি লোকই আছেন—মিঃ নামবিয়ার। সঠিক নির্দেশ বলতে—উনি তো তাকে গোলকধাঁধার মধ্যে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছেন। অমিতাভর বক্তব্য হলো, এই মুহূর্তে সে কী করবে সেই কথাটা তো ওঁকেই বলতে হবে। এক বছর বাদে চাকরি পেয়ে অমিতাভ যখন নিঃশ্বাস ফেলে একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, সেই মুহূর্তেই যদি আলগা মাটিতে পা পড়ে তাহলে ডুবে যেতে কতোক্ষণ!

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি. এ হচ্ছে তোশিবা জেকব। ভদ্রমহিলার বয়স এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। আকর্ষণীয় ছিমছাম চেহারা। সারা দেহের কোথাও একফোঁটা মেদ নেই। সরু কোমরের নীচে বেশ কায়দা করে শাড়িটা এমন ভাবে জড়ানো, সুগভীর নাভিকুন্ডটি স্পষ্ট শুধু চোখেই পড়ে না শরীরের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। তোশিবা জেকবের চোখ-নাকও বেশ কাটাকাটা। চোখের ওপরের পাতায় সবুজের আভা। এবং ভ্রূ দুটো ইচ্ছে মতো সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়েছে। ঠোঁট দুটো সামান্য একটু মোটা। সবসময়েই মনে হয় মুখের মধ্যে টফি বা এক কোয়া কমলা এ-জাতীয় কিছু একটা রেখে দিয়েছে। পরনের ব্লাউজটাতে খুব বেশি কাপড় ব্যবহার করেনি। ফলে খাজুরাহোর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। গায়ের রংটা বেশ চাপা অর্থাৎ কালোই বলতে হবে। কিন্তু তার মনোরম ছবিটায় একবিন্দুও কালি পড়েনি। তবে তোশিবা জেকব বিবাহিতা কী অবিবাহিতা সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই।

সুতরাং মিস জেকব না মিসেস জেকব বলে সম্বোধন করবে—অমিতাভ সেই সন্দেহের মধ্যে না-গিয়ে পরিষ্কার একটা কথাই বললো, আমি একবার নামবিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তোশিবা জেকব মুখ তুলে চাইলো। চমৎকার চেহারার ঝকঝকে বছর পঁচিশের একটা ছেলে। চোখে-মুখে একটু অস্থিরতার ভাব তবে কথা বলার ধরনে বেশ আদেশ দেবার সুর রয়েছে। অন্য সময় হলে তোশিবা জেকব পত্রপাঠ বিদায় করে দিত নতুবা ঠায় ঘন্টা দুই বসিয়ে রাখতো। এক্ষেত্রে সে কিছুই করলো না। অমিতাভর কথা শুনে সে বরং একটু উৎসাহই পেল। মনে হচ্ছে ছেলেটাই যেন তার 'বস'। তোশিবা নিখুঁত উচ্চারণ এবং মনকাড়া ভঙ্গিমায় ইংরেজিতে যা বললো তার বাংলা মানেটা দাঁড়ালো এই রকম, এমন ভাবে হুট করে এসে দেখা করতে চাইলেই কি দেখা হওয়া সম্ভব? আপনার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে সাহেবের সঙ্গে আগে থেকে কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না। সেক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। ভেতরে জরুরি মিটিং চলছে। এই অবস্থায় আমি তাঁর বিরক্তির কারণ হতে রাজি নই।

প্লিজ সাহেবকে গিয়ে শুধু বলুন কলকাতার অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবেন।

আপনিই মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়! তোশিবা জেকব মিষ্টি করে হাসলো। আপনার নামটা আগে বলবেন তো। হ্যাঁ, সাহেব আপনার কথা আমাকে বলে রেখেছেন। আপনি এলে যেন পাঠিয়ে দিই।

অমিতাভ চট করে ভেবে নিল এই নামবিয়ার মানুষটা একজন চলমান শিল্পী। ভবিষ্যতের ছবিগুলো খুব ভালোই আঁকতে পারেন। সেই সঙ্গে মিশেছে নিখুঁত কল্পনাশক্তি। কোন ঘটনার পর কী ঘটবে এবং অমিতাভ যে তাঁকে আশ্রয় করবে এটা যেন ছকবাঁধা ব্যাপার। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি

তাঁর পি. এ তোশিবা জেকবকে আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। নয়তো তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভদ্রমহিলা এম. ডি'র ঘরে ঢুকে যাবে কেন?

এক মিনিট বাদে তোশিবা জেকব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব 'মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে বললো, আপনি ভেতরে যেতে পারেন।

অমিতাভর ইচ্ছে হচ্ছিলো একবার বলে, সাহেবের জরুরি মিটিং কি এরমধ্যেই শেষ হয়ে গেল? কিন্তু সে-সব বলার মতো মানসিকতা ওই সময়ে তার ছিল না। মানুষকে বোধহয় চিরদিনই উল্টো কাজটাই করতে হয়। তোশিবা জেকবকে সে কোনও কথা তো শোনালোই না, বরং ভদ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে এম. ডি'র ঘরে ঢুকে গেল।

এম. ডি'র ঘরখানা যেন একটা রাজপ্রাসাদ। পুরু এবং কোমল বাদামী রঙের কার্পেটে সারা ঘরটা আগাগোড়া বিছিয়ে দিয়ে পায়ের শব্দকে সংযত করা হয়েছে। ডিসটেম্পার করা মসৃণ বাদামী দেওয়াল। দেওয়ালে চমৎকার দুটো ছবি টাঙানো। সাদা বরফে ঢাকা একটা পাহাড় রোদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চিকচিক করছে। তার মাথার ওপরে খোলা নীল আকাশ। আর একটা ছবি হলো, লক্ষ লক্ষ নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে বিস্তৃত সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। জলের মধ্যে থেকে লাল সূর্য উঠছে। আর ওই লাল আলোর ছটায় সারা ঘরটাই বুঝি আলোকিত হয়ে উঠেছে। একপাশের পুরো দেওয়াল জুড়েই জানলা। পেলমেটের মাথা থেকে ভারী এবং মনোরম কাজ করা এক বিশাল পর্দা ঝুলছে। ঘরের দু'পাশে ঝকঝকে প্লাইউডের খোপ খোপ করা। মোট তিনটে বেশ বড়ো আকারের জয়পুরী ফুলদানি। সেখান থেকে ফুলের যে-গন্ধ উঠছে বাতাস তা নিয়েই নিজের খেলায় মেতে উঠেছে। বুক-সমান হাইটের মেহগনি পালিশের বুক-সেলফ। সেখানে বই সাজানো। এম. ডি অত্যন্ত আরামদায়ক একটা রিভলবিং চেয়ারের গহ্বরে বসে আছেন। সামনে কালো কাচের বিশাল টেবিল। বিভিন্ন রংয়ের তিনটে টেলিফোন এই মুহূর্তে শিশুর মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। টেবিলের ওপর কতো রকমের যে কলম এবং কোন কলমটা কী কাজে লাগে সেটা একমাত্র এম. ডি-ই বলতে পারবেন। টেবিলের এ-পাশে আরও গোটা দশেক দামি দামি চেয়ার। তিনজন ভদ্রলোক বসে আছেন। অমিতাভ অবশ্য একজনকে চিনতে পারলো। চিফ পার্সোনেল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণাণ গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবছেন। ঠান্ডা ঘরের একঝলক শীতল বাতাসে অমিতাভর শরীরটা জুড়িয়ে গেল বটে কিন্তু মনটা? সে বেশ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মিঃ রামাকৃষ্ণাণকে বাদ দিলে বাকি দুজনের মধ্যে টাক মাথা চেহারার ভদ্রলোকটির নাম মিঃ পিল্লাই। উনি আই. আর. এম অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার। অপরজন কোম্পানির সেক্রেটারি মিঃ ফিলিপস।

একটা জিনিস অমিতাভর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মিঃ নামবিয়ার যতো বড়ো ম্যানেজিং ডিরেক্টরই হোন না কেন, এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি পদ্মিনী উষাকে বিশেষ সমীহ করেন। ঘরে ঢুকতেই তাকে যে-ভাবে জিজ্ঞেস করছেন, 'পদ্মিনী উষা তোমাকে এতোক্ষণ ধরে কী বোঝালো', তাতেই সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। তার মানে তিনি খবরাখবরও রাখছিলেন। আবার নিজেদেরকে তৈরি রাখার জন্য মিঃ রামাকৃষ্ণণ, মিঃ পিল্লাই এবং মিঃ ফিলিপসের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবেন—সে-ব্যাপারে আলোচনাটাও সেরে নিচ্ছিলেন। ঝামেলার জোয়ারে অমিতাভই শুধু ডুবতে বসেছে। নতুন করে কিছু বলার মতো উৎসাহ ওর ছিল না। থাকার কথাও নয়। সে তাই অনেকটা দায়সারা গোছের উত্তর দিল, আপনি তো সব জানেন।

হ্যাঁ, সেকশনের মধ্যে যা হয়েছে সেটার খবর পেয়েছি। ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে গিয়ে পদ্মিনী তোমাকে কী বললো?

বললো, রাজনের জায়গায় আমাকে নেওয়াটা ইউনিয়ন বরদাস্ত করবে না।

আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি? মিঃ নামবিয়ার এক দৃষ্টিতে অমিতাভকে দেখতে লাগলেন।

ও যা সাঙ্ঘাতিক মেয়ে—অন্নপ্রাশনের সময় কী দিয়ে ভাত খেয়েছিল সেখান থেকে শুরু না-করে ছাড়বে? মিঃ পিল্লাই মোক্ষম অভিমতটি দিয়ে হাসতে হাসতেই আবার বললেন, কলকাতায় কীভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন সে-ব্যাপারে কিছু জানতে চায়নি?

অমিতাভ নিষ্প্রাণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ, জানতে চেয়েছিল।

আপনি সব বলে দিলেন? মিঃ ফিলিপস প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

লুকোচুরির তো কিছু ছিল না। অমিতাভ ঘুরিয়ে বললো, নামবিয়ার সাহেব আমাকে চাকরি দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কী অন্যায়?

সেটা ঠিক আছে। মিঃ নামবিয়ার অমিতাভকে আশ্বস্ত করে সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, তোমাকে তো পদ্মিনী বেশ ভালোই প্রোটেকশন দিয়েছে, তাই না?

প্রোটেকশনের কি আছে? অমিতাভ সোজাসুজি বললো, আমি এমন কোনও অন্যায় করিনি যার ফলে আমার ওপর হামলা হওয়া উচিত—পদ্মিনী উষা সেটাই বললেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও জানিয়ে দিলেন, আমার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওঁরা মানবেন না। কয়েক সেকেন্ড সময় দিয়ে অমিতাভ ইচ্ছে করেই চুপ করে রইলো। মিঃ নামবিয়ার, মিঃ রামাকৃষ্ণাণ, মিঃ পিল্লাই, মিঃ ফিলিপসের মুখগুলো একে একে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফের মিঃ নামবিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে রইলো। খুব আস্তে অথচ প্রতিটা কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করলো অমিতাভ, স্যার, আমাকে কি এখান থেকে চলে যেতে হবে?

এ-কথা আসছে কেন? মিঃ নামবিয়ার কথাটা শুনে বেশ রেগে গেলেন। রাগটা যদিও অমিতাভর ওপর নয়। কিন্তু যাদেরকে উনি প্রতিপক্ষ ভাবছেন তাদের কেউই এখানে উপস্থিত নেই।

ওরা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

তুমি সিওর?

রাজনকে নেওয়ার ব্যাপারে ওদের দারুণ একতাবদ্ধ বলে মনে হলো।

সে-সব চিন্তা-ভাবনা আমার। ভিখিরি তাড়াবার ভঙ্গিমায় ব্যাপারটা এককথায় যেন মিটিয়ে দিলেন মিঃ নামবিয়ার। পরে বললেন, তোমার চলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি রোজ অফিসে আসবে তবে আপাততো কোনও সেকশনে গিয়ে বসবে না। মিসেস জেকবের ঘরেই সময়টা কাটিয়ে দেবে। এই মুহূর্তে তোমাকে কোনও কাজকর্ম করতে হবে না আর হোটেল বালসাম্মাতে যেমন আছো তেমনই থাকবে। বাকি ব্যাপারটা আমাদের।

নামবিয়ার সাহেব যা-যা বললেন, কথাগুলো সবই অমিতাভর পক্ষে। কিন্তু সত্যিই কী পক্ষে? হিসেবে প্রতিটি কথাই মারাত্মক। তার মতো অতি সামান্য একজন জুনিয়ার ক্লার্কের জন্য ম্যানেজমেন্ট এতো কিছু চিন্তা-ভাবনা করছে কেন? এতো সুযোগ সুবিধাই-বা দিচ্ছে কেন? বিশেষ কোনও গোপন উদ্দেশ্য না-থাকলে কোনও কোম্পানির কোনও ম্যানেজমেন্ট এতোটা উদার হয় না। ঘটনাটা তো খুবই পরিষ্কার। অমিতাভকে ফুটবল হতে হবে। ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন উভয় পক্ষই তাকে অপরের গোলে ঢোকাবার এক চ্যালেঞ্জের খেলায় মেতে উঠবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে চিনতেও পারবে না। ইউনিয়ন নিশ্চয়ই ঠেলে ফেলে দেবে না। অমিতাভ তাই খোলাখুলিই বললো, স্যার, আমি কী চিহ্নিত হয়ে পড়ছি না?

কীসের?

ম্যানেজমেন্টের লোক হিসেবে।

তা কেন? নামবিয়ার সাহেব ছেলে ভোলানোর মতো অমিতাভকে বোঝাতে লাগলেন, তুমি কিন্তু আগে আগেই ভাবছো। ব্যাপারটা কী তাই? তোমাকে আমরা সুদূর কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের দায়িত্ব নিশ্চয়ই এড়িয়ে যেতে পারি না। তুমি এতো ভয় পাচ্ছো

কেন? মাই বয়, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এ বেড অফ রোজেস—সমুদ্রের চেয়েও বেশি ঝড়ঝাপটা তো এই সংসারেই। এখানে নিপুণ ভাবে সাঁতার কাটতে হবে। হাঁপিয়ে পড়লে বড়োজোর ভেসে থাকবে কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় একমাত্র ভীরুরা। জীবনযুদ্ধে কাওয়ার্ডদের কোনও স্থান নেই। মিঃ নামবিয়ার আর একধাপ পাশে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন, টেক মাই লাভ এণ্ড উইশ ইউ অল দ্য সাকসেস ইন ফিউচার। আমরা তোমার সঙ্গে আছি এবং থাকবো।

এম. ডি-র ঘর থেকে বেরিয়ে অমিতাভ প্যাসেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। তাকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। প্যাসেজের দু'পাশে বড়ো বড়ো অফিসাবদের কাচের ঘর। নামবিয়ার সাহেবের উল্টোদিকের ঘরখানাই তোশিবা জেকবের। আপাততো ওখানেই অমিতাভকে বসতে বলা হয়েছে। পবিস্থিতি শান্ত হলে পরে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। অমিতাভ কিন্তু ওই ঘরের দিকে গেল না। সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই অবশ্য বাধা পেল। একজন বেয়ার এসে খবর দিল, আপনাকে জেকব মেমসাব ডাকছেন।

অমিতাভ তোশিবা জেকবের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আপনি এখন অন্য কোথাও যাবেন না। আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাকুন। সাহেব সেই রকমই বলে দিলেন।

অমিতাভ যে একটু বিরক্ত হলো না তা নয়। চাকরি করতে এসে কি স্বাধীনতাও হারাতে হবে? এখন থেকেই পায়ে বেড়ি পরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আর সেই চাকরির স্বাদও তো পাওয়া গেল না যে কারণে এ-গুলোকে মুখ বুজে সহ্য করা যেতে পারে! সুতরাং অমিতাভ তার বিরক্তিটা অন্য ভাবে প্রকাশ করলো, আমার কি ক্ষিদে পায় না?

আমি কি সে-কথা কখনও বলেছি? তোশিবা জেকব মধুর হাসলো। আপনি নিশ্চয়ই খাবেন। তবে এই মুহূর্তে নীচে যেতে মানা করছি। পদ্মিনী ঊষা তার দলবল নিয়ে আসছে। কখন কি হয় বুঝতেই তো পারছেন। সাহেব আপনার জন্য খুবই চিন্তিত। সেই চিন্তার কিছুটা তো আমাকেও নিতে হয়।

হ্যাঁ, আপনি সাহেবের পি. এ এটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অমিতাভ করুণ হেসে বললো, আমার নিজের নামটাও এর পরে আমি মনে করতে পারবো না। যে-সব ব্যাপার-স্যাপার এখানে চলছে আমি বোধহয় এসে ভুলই করেছি।

এটা কেন বলছেন? তোশিবা জেকব অমিতাভর হতাশার ভাবটুকু কাটিয়ে দিতে সহানুভূতির সঙ্গে বললো, এতো অল্পতে ভেঙে পড়লে চলে? না-হয় কলকাতাতেই ফিরে যাবেন—তাই বলে কখনও গোমড়া মুখ করবেন না। আপনার বিমর্ষ ভাবটা দেখলে পদ্মিনী ঊষা নিজেকে বিজয়ী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। আপনার সঙ্গে সাহেবের সম্মানটাও জড়িত এটা ভুলে যাবেন না। যেন গোপন খবর দিচ্ছেন এমনই নিচু সুরে তোশিবা জেকব ফিসফিস করে বললো, পদ্মিনী ঊষা এক্ষুণি সাহেবের সঙ্গে মিটিং করতে আসবে। যেন কিছুই হয়নি, আপনি এমনই একটা ভাব দেখাবেন কিন্তু। বুঝলেন?

যোগ্য সাহেবের যোগ্য পি.এ। অমিতাভ ভাবতে লাগলো তার মনের দিকে তাকাবার কারো ফুরসত নেই। যে-যার দিকটা বাঁচাতেই ব্যস্ত। সে এখানে চাকরি করতে নয়, যেন দু-পক্ষের মর্যাদার লড়াই দেখতে এসেছে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে।

পদ্মিনী ঊষা তার পাঁচজন কমিটি মেম্বারকে নিয়ে তোশিবার ঘরে উপস্থিত হতেই সে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বললো, আসুন, আসুন পদ্মিনীজি, বসুন।

পদ্মিনী মিষ্টি করে হাসলো, বসবার সময় কোথায় দিচ্ছেন আপনারা? ঘাড়ের পাশে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলছেন, এখনও ঘুমোতে গেলেন না? ঘুমটা আসবে কোথা থেকে—যাক গিয়ে ও-

সব কথা, আমবা এসেছি, সাহেবকে খবরটা দিন।

আপনাদের তো সাড়ে-এগারোটা টাইম দেওয়া হয়েছে। এখনও মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। সময় হলেই ভেতরে চলে যাবেন।

হ্যাঁ, কাটায় কাটায সাড়ে এগারোটা বাজতেই পদ্মিনী পাঁচজনকে নিয়ে এম. ডি-র ঘরে ঢুকে পড়লো। নামবিয়ার সাহেব প্রত্যেককে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিযে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। যেন কিছুই হয়নি—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বললেন, তাবপবে বলুন পদ্মিনীজি—কী খবর?

খবর তো স্যার আপনার কাছে। ভদ্রতায় কেউ কারো থেকে কম যায না। তবে পদ্মিনী আব কথা বাড়ালো না? ও-পক্ষ কেমন ভাবে এগিযে আসে সেটা আগে দেখা দরকার।

নামবিয়ার সাহেব হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজ করতে দিচ্ছেন না কেন?

আপনি কেন বাজনকে প্রমোশন দিচ্ছেন না? রাজন বি. কম পাশও করেছে। আমাদের সঙ্গে যে-এগ্রিমেন্ট রয়েছে তাতে ওই পোস্টটা তো ওবই পাবার কথা। আপনাবা কেন ওকে বঞ্চিত করছেন?

দেখুন, আগের এগ্রিমেন্টটা যখন হয় তখন আমরা এটা ঠিকই বলেছিলাম—ইন্ডাস্ট্রিযাল বিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, তার মানে কি এই যে সব সাব-স্টাফ যে-মুহূর্তে গ্রাজুযেট হবে তখনই তাকে জুনিয়ার ক্লার্কের প্রমোশন দিতে হবে? আমাদের উদ্দেশ্য হলো, প্রভিসনটা রাখা রইলো। তবে স্যুইটিবিলিটির প্রশ্নটা সবার আগে।

আপনারা এখন যে চমৎকার ব্যাখ্যাটা করলেন—এমন ব্যাখ্যা ইচ্ছে করে কাউকে গাড়ি চাপা দেওয়ার পরও অনায়াসেই করতে পারেন। পদ্মিনী অসাধারণ ঠান্ডা মাথায় বলতে লাগলো, সবচেয়ে অসুবিধাটা কোথায় জানেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য যতোটা সম্ভব খোলা হাতটাই এগিয়ে দিই, আপনারা এগিয়ে আসেন আপনাদের নকল হাতটা নিয়ে। গন্ডগোলটা বাধে সেই কারণেই। আপনাবা যদি প্রতিটা বিষয়েব ওপব এমন নতুন-নতুন ব্যাখ্যা জুড়ে দেন এবং শুধু তাই-ই নয়, একই কথাব তেরো রকম মানে করে সুবিধে মতো কাজে লাগান তবে আমাদেরও অন্য পন্থা ভাবতে হবে। আপনি আমার হাত বাঁধতে এলে আমি নিশ্চয়ই এ-কথা বলতে পারি না, আপনি আবার কষ্ট করে এখানে এলেন কেন? আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

মিস উষা, আমরা কিন্তু একবারও বলিনি সাব স্টাফ থেকে জুনিয়ার ক্লার্ক হবে না।

না, তা বলেননি। তবে স্যুইটিবিলিটির প্রশ্নটা জুড়ে দিয়েছেন, যেটা আগে ছিল না।

পদ্মিনীজি, আসছে সপ্তাহে মুম্বাইতে বোর্ড মিটিং রয়েছে। আমি ববং সেখানে এই পয়েন্ট-এর ফয়সলা করে আসবো। মিঃ নামবিয়ার পদ্মিনী উষার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলেন। এই কটা দিন আপনারা অপেক্ষা করুন।

ফয়সলা তো আপনাদের ফেভারে যাবে।

আপনাদের ফেভারেও যেতে পারে।

তাহলে সেটা বোর্ড মিটিং-এর টেবিলে না-তুলে আপনি তো এখানে বসেও তা করতে পারেন।

তেমনটা করতে পারি না। নামবিয়ার সাহেব হাসতে লাগলেন।

সময় নষ্ট করবেন, এই তো? অবশ্য উত্তেজনাকে চেপে রাখতে এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু চিরস্থায়ী বঞ্চনার যে-পাহাড় গড়ে তুলেছেন তাতে সমাধানের রাস্তা ওটা নয়। পদ্মিনী বলিষ্ঠ ভাবে বললো, আমরা জানি এটা আপনারই হাতে, সুতরাং কাল হরণের খেলা অনুগ্রহ কবে করবেন না।

আপনার এই জানাটা ঠিক নয়। আমি যা খুশি তাই করতে পারি না। ইচ্ছাকৃত একটা অসহায় ভাব ফাটিয়ে তুলে মিঃ নামবিয়ার বললেন, আমাকেও কৈফিয়ত দিতে হয়।

নামবিয়ার সাহেবের কপালের স্পষ্ট রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হলো। পদ্মিনীর কাছে ও-গুলো

রেখা নয়, লেখা। যেটা সে অনায়াসেই পড়ে নিতে পারে। এটা ঠিক, উপরওয়ালাদের শয়তানি ধরতে তার মতো জুড়ি নেই। মিঃ নামবিয়ারের চালকে বানচাল করতে পদ্মিনী উষা অত্যন্ত হালকা চালে বললো, বেশ, আপনি যখন চাইছেন নিন। তবে একটা কথা, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ আপনারা যাঁকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন তিনি কিন্তু এই ক'দিন অফিস করতে পারবেন না।

সেটা কী করে হয়? মিঃ নামবিয়ারের কপালের ভাঁজ মোটা হলো।

এটাই হবে। পদ্মিনী এবারে শঙ্খিনীর মতো ফুঁসে উঠলো। আপনি যখন আমাদের ন্যায্য দাবিই মানছেন না, আমরা কেন তবে আপনার এই ব্যাকডোর দিয়ে লোক ঢোকানোকে সমর্থন করবো?

এটা বলবেন না। মিঃ পিল্লাই তীব্র ভাবে মাথা নাড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন, ব্যাক-ডোরের প্রশ্নই ওঠে না।

তবে কি এটা ফ্রন্ট-ডোরের ব্যাপার বলে মেনে নেবো? পদ্মিনীর ডান পাশে বসেছিল ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক তরুণ সদস্য। ওর নাম শশীকান্ত। শশীকান্তই নির্ভীক ভাবে ওই প্রশ্নটা ম্যানেজমেন্টর টেবিলে ছুড়ে দিল।

অফ কোর্স। মিঃ নামবিয়ার আরও ভেঙে বললেন, ওটা কোনও ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্টই নয়। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না, অযথা আপনারা কেন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে প্রেস্টিজ ইস্যু করে তুলছেন?

সেই প্রশ্ন তো আমাদেরও। পদ্মিনী এবারে সোজাসুজি কথাটা জানিয়ে দিল, আমরা অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেনে নিচ্ছি। আপনারাও রাজনকে প্রমোশন দিন। মীমাংসার জন্য এর চেয়ে সহজ ফরমূলা আর কী হতে পারে?

সেটা সম্ভব নয়। মিঃ নামবিয়ারের পরিষ্কার উত্তর।

এটা সম্ভব নয়, সেটা কী করে হয়—এই ধরনের কথা যদি বলেন তাহলে যেটা হওয়া উচিত সেটাই হোক।

কী? পদ্মিনী মুখের ওপর থেকে মিঃ নামবিয়ার চোখ সরালেন না।

কথায় কথায় কাজ বন্ধ করাটা আমরাও পছন্দ করি না। আমরা তেমনটা করবো না, যদিও আপনারা বাধ্য করাবেন ওই পথেই যেতে। পদ্মিনী ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে ম্যানেজমেন্টের সব কটা মুখ এক ফাঁকে দেখে নিল এবং আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় বসে বললো, একটু আগেই আমি বলেছিলাম, 'অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কটা দিন অফিস করতে পারবেন না।' কথাটার একটু সংশোধন করে নিচ্ছি। রাজনকে প্রমোশন না-দিলে মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই কোচিনে আর অফিস করতে পারবেন না। এটা ইউনিয়নের শেষ সিদ্ধান্ত। কথাগুলো বলে পদ্মিনী আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলো না। তার পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নামবিয়ারের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ হুসেন। গত কুড়ি বছর ধরে পার্লামেন্টের সদস্য। দিল্লিতে থাকলেও যেহেতু তিনি কেরালার মানুষ এবং কোচিনেই তাঁর বাড়ি, সুতরাং এখানে তাঁকে আসতেই হয়। এই মুহূর্তে হুসেন সাহেবও কোচিনে রয়েছেন। তাঁকে ঘটনাটা জানানো দরকার।

পদ্মিনী উষা তার দলবল নিয়ে হুসেন সাহেবের বাড়ি যেতেই উনি অপত্য স্নেহের একরাশ রেণু ছড়িয়ে বললেন, কি খবর পদ্মিনীজি, আপনারা ভালো তো? হুসেন সাহেবের এই একটা বৈশিষ্ট্য। নিজের ছেলেমেয়ের বয়সী কাউকেও 'তুমি' করে বলতে পারেন না। শুধু পদ্মিনী কেন, অনেকেই অনেক বারই তাঁকে ওই সম্বোধনের সংশোধন করতে অনুরোধ করেছে কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। এখন প্রত্যেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ভালো থাকলে আপনার কাছে আসবো কেন? পদ্মিনী সামান্য একটু হাসলো।

সেটাও তো একটা কথা। অভিজ্ঞ হুসেন সাহেব জানতে চাইলেন, আবার নতুন কি হলো? আপনাদের নামবিয়ার সাহেব নিশ্চয়ই নতুন কোনও প্যাঁচ কষেছে।

পদ্মিনী পুরো ব্যাপারটা নিখুঁত ভাবে জানিয়ে একটি মাত্র প্রশ্ন রাখলো, এবারে আমরা কী করবো?

আপনারা যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে—হুসেন সাহেব কি যেন একটু চিন্তা করলেন। পরে শশীকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, কি নাম যেন বললেন ছেলেটার?

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, আপনারা এটা খেয়াল রাখবেন ওর গায়ে যেন হাত-টাত না পড়ে। ওটা খুব বাজে ব্যাপার। কেন-না ম্যানেজমেন্ট ওকে দিয়ে আপনাদের খেলাচ্ছেন। ছেলেটি কিন্তু কখনওই ম্যানেজমেন্ট নয়। আরও একটা কথা, ছেলেটিকে এরিয়ার মধ্যে ঢুকতে দেবেন না বলে যেটা ভেবে রেখেছেন সেটাও ঠিক নয়। ওকে ঢুকতে দেবেন। তবে কোনওরকম কাজকর্ম করতে দেবেন না। ম্যানেজমেন্ট এই ব্যবস্থা বেশিদিন মেনে নিতে পারে না—আপনাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দেখবেন ওদের তখন বিরাট মাথাব্যথা।

রাত তখন দশটার কাছাকাছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে অমিতাভ হোটেলের টানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সারাদিনে খুব একটা সিগারেট খেতে পারেনি। খাবে কখন? যে-ভাবে দিনটা কাটলো সেই মন খারাপের জন্য মেজাজটাই তার হারিয়ে গিয়েছিল। এখন সে আরাম করে একটা সিগাবেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলো, ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? কি প্রয়োজন ছিল তাকে নিয়ে এই টানা-হ্যাঁচড়ার? এটা ঠিক নামবিয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য মহৎ হলে তাকে অনায়াসেই কলকাতা অফিসে রাখা যেতো। সেটা যে তিনি কেন করেননি এখন তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইউনিয়নের সঙ্গে উনি টেক্কা দিতে চাইছেন, দিন। বিশাল ভারতবর্ষের ছোট-বড়ো বহু কোম্পানির ম্যানেজমেন্টই সেই আকাঙ্ক্ষায় মশগুল থাকেন। কিন্তু সেটা কী তাকে বধ করে? আজকের দিনটায় অমিতাভ ভীষণ ভাবে ভাবছে সে বুঝি এক বধ্যভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। কি দরকার ছিল এতো দূরে চলে আসার? দীপ্তি এবং কমলা অর্থাৎ দুই বৌদিই কতোবার করে যে বারণ করেছিল তার কোনও লেখাজোকা নেই। না-পেয়ে শেষে দুইজন অন্য সুর ধরেছিল, তুমি বেকার। দাদাদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছো। সেই কারণে আমরা তোমাকে প্রচন্ড গঞ্জনা দিয়ে চলেছি—এটাই প্রমাণ করতে চাও তো? লক্ষ্মী ভাইটি, কি হবে কোচিনে গিয়ে? কটা টাকা তুমি বাড়িতে পাঠাতে পারবে? ও-টাকা তুমি দুটো টুইশানি করলেই পেয়ে যাবে।

না। বৌদিদের দাদাদের কোনও কথাই অমিতাভ শোনেনি। আসলে একটা বছর ধরে বেকার থেকে থেকে সে যা হোক একটা মুক্তি চাইছিল। সেই মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে সে এখন বিষাক্ত এক আবহাওয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। বাড়িতে ফিরে যাওয়াটাও কেমন যেন লজ্জার ব্যাপার। নিজের বাড়িটা আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকবে। লজ্জাটা বেড়ে যাবে পাড়ার মধ্যে। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যারা তার চাকরি পাওয়াতে নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছিল। আর সে নিজে যাকে লজ্জার এক অতল সাগরে ডুবে যেতে দেখবে তিনি রাখালকাকা।

অমিতাভ নিজেকে নতুন ভাবে তৈরি করার জন্য গা থেকে সমস্ত অবসাদের চাদরটা ছুড়ে ফেলে দিল। এখানেই সে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। দেখাই যাক না কী হয়! শেষ পর্যন্ত তার কলকাতা যাওয়া তো কেউ আটকাতে পারবে না। ভবিষ্যতে কী হবে-না-হবে—আগাম চিন্তা-ভাবনার সমস্যায় নিজেকে তলিয়ে যেতে না-দিয়ে হালকা মনে একটু খোলামেলা থাকাই ভালো। অমিতাভ আর একটা সিগারেট ধরালো।

একটু পরেই গঙ্গাধরম এলো। একগাল হাসি হেসে সে জিজ্ঞেস করলো, কি স্যার ঘুমাননি?

এতো তাড়াতাড়ি তো কখনও ঘুমাইনি। অমিতাভ হেসে উত্তর দিল, কলকাতায় বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে গল্প করে বাড়িতেই ফিরতাম সাড়ে-দশটায়। খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে রাত সেই বারোটা।

কেন স্যার এতো রাত হতো কেন? গঙ্গাধরমের সরল জিজ্ঞাসা।

খাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে কম করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট গল্প না-করলে পরের দিন থেকে আমার খাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। একবার মায়ের সঙ্গে গল্প না-করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ফলটা কি হয়েছিল জানো? নেক্সট দিন খেতে গিয়ে দেখি আমার খাবারটা মায়ের ঘরে চালান হয়ে গেছে। মা খুব গম্ভীর মুখ করে বলেছিলেন, তুই তো সময় পাস না—তাই খেতে খেতে যেটুকু সময় পাওয়া যায় কথা বলার!

আপনার মা স্যার আপনাকে খুব ভালোবাসেন, তাই না?

খুউব। মা তো এখানে মানে এতো দূরে আসতে দিতেই চাইছিলেন না। অথচ এখানে এসে কী যে ঝামেলায় পড়লাম!

আপনি তো রমন ফার্টিলাইজারে জয়েন করেছেন, তাই না স্যার? আমার ঠিক খেয়াল ছিল না আপনাকে বলতে, ওখানে আমার খুড়তুতো ভাই রাজনও আছে। গঙ্গাধরমের কথাটা শেষ হতেই অমিতাভ সন্তপর্ণে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, রাজন?

হ্যাঁ, স্যার। ও এবারেই বি. কম. পাশ করেছে। ইউনিয়ন ওর জন্য খুব লড়ছে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কিছুতেই রাজনকে সাবস্টাফ থেকে জুনিয়ার ক্লার্কের প্রমোশন দিতে চাইছে না। অথচ ওদের ওরকম একটা এগ্রিমেন্ট রয়েছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গঙ্গাধরম বললো, তবে স্যার আপনাকে এটাও জানিয়ে রাখছি ওই পদ্মিনী উষা ম্যানেজমেন্টকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

পদ্মিনী উষার বুঝি দারুণ ক্ষমতা?

আমরা স্যার অতোশত বুঝি না। শুধু জানি সারা কোচিনে উনি খুব পপুলার। শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন যেখানে পদ্মিনী উষাও সেখানে। এতো আন্তরিক এবং সাচ্চা নীতিতে বিশ্বাসী, ভাবা যায় না! এবারের ইলেকশানে শুনছি পার্টি থেকে পদ্মিনীজিকে নমিনেশন দেবে। তবে মজার ব্যাপারটা কী জানেন স্যার, পদ্মিনী উষা প্রথমে যে-কোম্পানিতে চাকরি করতেন সেই সংস্থার টপ ম্যানই হচ্ছেন ওঁর বাবা। শ'খানেক লোক কাজ করে সেখানে অথচ ইউনিয়নের নামগন্ধ নেই। এমনটা কিন্তু কোচিনের কোথাও পাবেন না। তিরিশজন লোক যেখানে কাজ করে সেখানেও মোটামুটি শক্তিশালী একটা সংগঠন আছে। ব্যাপারটা পদ্মিনী উষাকে ভাবিয়ে তুললো এবং ভাবনার ফসল ফলালেন রাতারাতি একটা ইউনিয়ন গড়ে তুলে।

পদ্মিনী উষা সেই কোম্পানি ছাড়লেন কেন?

ওই যে বললাম, সাচ্চা নীতিতে বিশ্বাসী তিনি।

কী রকম?

পদ্মিনীজি থাকলে দাবি-দাওয়া কিছুই আদায় হবে না। এটা তো ঠিক, বাবার বিপক্ষে কতো আর লড়াই চালানো যায়? বাড়ি ফিরে এসে সেই বাবার সঙ্গেই এক টেবিলে খেতে হচ্ছে। মন দুর্বল হতে বাধ্য। সৈনিক তৈরি করে দিয়ে উনি তাই নিজেই সরে দাঁড়ালেন। একটা কথা মনে রাখবেন, রমন ফার্টিলাইজারেব এই চাকরিটা কিন্তু পদ্মিনী উষা তখনও পাননি। এই ব্যাপারটা কোচিনের মানুষের মনে বেশ গেঁথে আছে।

অমিতাভ গঙ্গাধরমের কথাগুলো শুনছিল ঠিকই, তবে নিজেও নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। ছেলেটা কতো সহজে তাকে এতো কথা জানালো অথচ নিজের সম্পর্কে ওকে আসল ছবিটা না-দেওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হবে। অমিতাভ চাপাচাপি করতে চাইলো না। কোনোদিন যেটা করেনি নতুন করে কি আর পারবে? প্রথমে সে বললো, আচ্ছা গঙ্গাধরম, 'তুমি' করে বলছি বলে রাগ করছো না তো?

না-না স্যার, কি যে আপনি বলেন? তাছাড়া আপনি আমার থেকে পাঁচ-ছ'বছরের বড়ো। বলতে

পারেন।

তুমি জানো কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে।

তা তো জানি না স্যার।

আমিও জানতাম না। তবে এখন বুঝতে পারছি রাজনের প্রমোশন আটকাতেই আমাকে ব্যবহার করছে। আমি হয়তো শীগ্‌গিরই তোমাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠবো।

আপনি কেন ও আশঙ্কা করছেন স্যার? আপনার তো কোনও দোষ নেই। ম্যানেজমেন্টের গড়বড়িটা পদ্মিনী ঊষা নিজেই ধরতে পারবেন। ওঁকে ফাঁকি দিয়ে কোম্পানির মাথাওয়ালারা একটা ব্যাপারও সারতে পারছেন বলে এখনও শোনা যায়নি।

আচ্ছা গঙ্গাধরম—

বলুন স্যার।

'তান্নে তিরু তান্নে তিরু চার্টার ডিম্যান্ড তান্নে তিরু'—এই কথাটার মানে কি?

আজকে অফিসে শুনেছেন বোধহয়! গঙ্গাধরম হাসতে লাগলো। পরে বললো, 'চার্টার ডিম্যান্ড', এটার মানে তো বুঝতেই পারছেন। পুরো কথাটা হলো, তাড়াতাড়ি দাও, তাড়াতাড়ি দাও, তাড়াতাড়ি দাবি-দাওয়াগুলো মিটিয়ে দাও। গঙ্গাধরম এবারে আরও যোগ করলো, আর একটু গন্ডগোল বাড়লেই দেখবেন নামবিয়ার সাহেব পুলিশ ফোর্স ইত্যাদি এনে হাজির করবেন। তখন স্লোগান উঠবে, 'অভাগা সঙ্ঘল চোদিচ্চল সিকিউরিটি আনো নামবিয়ার সারে।' অর্থাৎ কিনা ন্যায্য দাবি-দাওয়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই অথচ নামবিয়ার মহাশয়টি ঠিক পুলিশ এনে হাজির করেছে। এরপরেই যে-কথাটা নিশ্চিত ভাবে উঠবেই উঠবে সেটা হলো, 'মুট্টিকেটিকম রাবারেপিকম কেট্টিকেটিকম নামবিয়ার সারে।'

মানে?

ওর মানে হলো, নামবিয়ার মহাশয়ের মাথাটা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে রবারের মুকুট পরিয়ে ছেড়ে দাও।

অমিতাভ হাসতে হাসতে বললো, মালয়লম ভাষাটা তো দেখছি তোমার কাছেই শিখে নিতে পারি।

খুব একটা অসুবিধে নেই স্যার। একটু সংস্কৃত জানলে আমাদের ভাষাটা মোটেই কঠিন নয়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো গঙ্গাধরম?

আপনি এতো সঙ্কোচ করছেন কেন স্যার? অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

রাজনের প্রমোশনটা ম্যানেজমেন্ট কেন দিচ্ছে না? যেখানে এগ্রিমেন্ট রয়েছে সেখানে না-করার কী যুক্তি? তোমার তো ভাই—জানো কিছু?

শুধু ভাই না স্যার, আমরা দুজন বন্ধুও। সপ্তাহে দু'দিন আমি বাড়ি যাই। রাজন আর আমি একসঙ্গে ঘুমাই। নিজের ভাই বলে বলছি না স্যার—গঙ্গাধরম আবেগ নিয়ে বললো, ওর আত্মসম্মান জ্ঞানটা অনেকের থেকেই প্রখর। আর দারুণ স্পষ্টবাদী। অবশ্য ও ভুগছে এই কারণেই। ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। চিঠি-চাপাটি আর ফাইলপত্র নিয়ে নামবিয়ার সাহেবের ঘরে দৌড়ঝাঁপ করাই ছিল রাজনের কাজ। সাহেবরা সাধারণত যা করে থাকেন, নামবিয়ার সাহেবও ঠিক তাই-ই করলেন। একদিন বললেন, রাজন, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও তো। আদেশ করাটা যে ভুল জায়গায় হয়েছিল সেটা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাই পকেট থেকে টাকা বের করে ওর দি'ক এগিয়ে ধরতেই রাজন অপমানে ছিটকে পড়লো। গম্ভীর গলায় একটি কথাই বলেছিল, ওটা আমার কাজ নয় স্যার। নামবিয়ার সাহেব অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, সারা ভারতবর্ষের তোষামোদের ছবিটার কথা। বাবু স্টাফরা যেখানে সাহেবদের বাড়ির কাজটাও নিজেদের কাঁধে তুলে নেয় সেখানে কিনা সামান্য একজন সাব-স্টাফের মুখে এতো বড়ো স্পর্ধার কথা! এ তো রীতিমতো বিপ্লব! নামবিয়ার সাহেব বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ মানুষ। রাজনকে আর একটা কথাও বলেননি। নীরবে যেটা করলেন সেটা তো স্যার এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে। রাজনের প্রমোশনের চিঠিতে সই করা আর নিজের হাতটা কেটে ফেলা একই ব্যাপার। অপমানের

জ্বালার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। একটু সময় চুপ করে থেকে গঙ্গাধরম বললো, আপনার মতো স্যার রাজনও নামবিয়ার সাহেবের শিকার।

এই ঘটনা পদ্মিনী উষা জানেন?

নামবিয়ার সাহেবের স্ত্রী পর্যন্ত জানেন। গঙ্গাধরমের মুখে ঝকঝকে হাসি।

কী রকম?

একটা জিনিস দেখবেন স্যার, কোনও অনুষ্ঠানে সভাতে বড়ো বড়ো মন্ত্রী বা নেতারা যখন আসেন, গরিব বাচ্চাদের সামনে পেলে ওদের ওই নোংরা গালেও হাত বুলিয়ে আদর করেন। এটা একটা রাজনৈতিক বিলাস। এই কায়দাটা মিসেস নামবিয়ারও শিখেছেন বা জানেন। সেবার রমন ফার্টিলাইজারের একটা অনুষ্ঠানে উনি প্রতিটি সাব-স্টাফের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলেছেন। কিন্তু রাজনের দিকে মুখভার করেছিলেন। আমি যখন রাজনকে এ-নিয়ে ঠাট্টা করি ও তখন হেসে হেসে উত্তর দেয়, মিসেস নামবিয়ার ভীষণ কৃপণ। হাসতে জানেন না।

অমিতাভ অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বললো, তুমি কিন্তু চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারো। তেমন ভাবে বোধহয় লিখতে পারো না, তাই না?

কেন স্যার, এ-কথা বলছেন কেন? গঙ্গাধরম হাসির মধ্যেই ডুবে রইলো।

তুমি বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করলে কিভাবে সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।

কী করা যাবে! আমি তো স্যার পাশ করতেই চেয়েছিলাম। গঙ্গাধরম খুব সহজ ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, আমি আর রাজন একই সঙ্গে পরীক্ষা দিই। পড়াশুনাতেও দুজনে সমান। তবে ওই যে বললাম, অপমানের জ্বালার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। ওই জেদটাই ওর ভেতরে কাজ করছিল। এবারে স্যার আমাকেও একটা কিছু করতে হয়। কেন-না বি. এ. ফেল আর পাশের মধ্যে পার্থক্যটা বিরাট। সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানেন স্যার— কেরালার মানুষ অশিক্ষিত হয়ে থাকাটাকে ক্রাইম মনে করে। এখানে কাজের মধ্যে কোনও ছোট-বড়ো নেই, তবে মূর্খকে সবাই অবজ্ঞা করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সারা দেশের মধ্যে এখন কেরালাতেই শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি। অহমিকা নয়। স্নিগ্ধ এক গর্বের আলোতে গঙ্গাধরমের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই অমিতাভ প্রথম যে-কথাটা ভাবলো, সেটা হলো, কাল সকাল সকাল না-উঠলেও চলবে। নামবিযার সাহেব তাকে অফিস করার কথা প্রথমে বললেও শেষে মুহূর্তে কি ভেবে যেন নির্দেশ দিলেন, মঙ্গল এবং বুধ এই দুটো দিন তুমি অফিসে এসো না। বৃহস্পতিবার থেকে যথারীতি আবার আসবে। টেনসনটা একটু কাটিয়ে নেওয়া ভালো।

কি ভালো হবে আর হবে না ও-নিয়ে অমিতাভর এখন আর মাথাব্যথা নেই। যা খুশি হোক, তবুও একটা কিছু ফয়সালা হয়ে যাক। সে দুটো দিন ছুটি পাচ্ছে এটাই যথেষ্ট। হঠাৎ জেমস গনসালভেসের নামটা অমিতাভর মনে পড়লো। মিঃ সুন্দরম বলে দিয়েছিলেন, কোনও অসুবিধে হলে জেমস গনসালভেসের সঙ্গে দেখা কোরো।

পরদিন বেলা পৌনে-এগারোটা নাগাদ অমিতাভ ভেনডুরথী রোডে সরোজা ট্রান্সপোর্টের অফিসে পৌঁছে গেল। এই অফিসের টপ ম্যানই হচ্ছেন মিঃ জেমস গনসালভেস। স্লিপ পাঠিয়ে তিন মিনিটও সময় গুনতে হলো না। তার আগেই উনি ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুকেই অমিতাভ দেখতে পেল মানুষটা একমনে ফাইলের ওপর কি যেন নোট লিখে চলেছেন। জেমস গনসালভেস কেরালিয়ান ক্রিশ্চিয়ান। বেশ গোলগাল চেহরা। গায়ের রং কালো বললে খুব কমই বলা হবে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো ওই কালোর মধ্যেই তাঁকে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সাদা হাফ শার্ট এবং মেরুন রংয়ের টাইয়ে তাঁকে আরও স্মার্ট লাগছে। বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশও হতে পারে, কিংবা পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশও হতে পারে। চেহারায় তরুণ। শুধু মাথার চুলে সাদা আভাস।

লেখাটা শেষ করে ফেললেন জেমস গনসালভেস দু'মিনিটের মধ্যেই। তারপরে মুখ তুলেই অমিতাভকে একটা ধমকই লাগালেন, আশ্চর্য মানুষ তো মশাই আপনি! এতোক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন! এই চেয়ারগুলো রয়েছে কী করতে? পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে নিজের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, ফাঁকা থাকলেও, এইটাতেই শুধু বসবেন না—বাদবাকি সব আসন আপনাদেরই। কথার শেষে আবার একঝলক হাসি। বোঝা গেল জেমস গনসালভেস হাসতে ভালোবাসেন এবং চমৎকার ইংরেজি জানেন। আপনার সম্পর্কে সুন্দরম সাহেব ফোনে আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন।

সব বলতে?

এই ধরুন আপনার নাম, কোয়ালিফিকেশন, কলকাতা থেকে আসছেন, কোচিনের রমন ফার্টিলাইজারে জয়েন করেছেন এই সব আর কি! হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, ওঁরা দুজনেই আপনাকে ছেলের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম করে দেখেন না। য়ু আর লাকি এনাফ। আয়্যাম অলসো। আমার কথা এখন থাক—আপনার কথা বলুন, এনি প্রবলেম?

অমিতাভ একটু ইতস্তত করছিল। কীভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া প্রথম আলাপেই নিজের অসুবিধার কথা তুলে অপরকে বিব্রত করাটা ঠিক নয়। সে বেশ বিনয়ের সঙ্গে বললো, দুটো দিন যাক স্যার। পরে একদিন এসে আপনাকে জানিয়ে যাবো। আজকে আপনার সঙ্গে এমনিই আলাপ করতে এলাম স্যার—

ও-সব স্যার-ফ্যার ছাড়ুন তো। জেমস গনসালভেস প্রায় গর্জে উঠলেন, য়ু আর বেঙ্গলী পিপল। আমি জানি আপনারা বড়োদের দাদা-টাদা ওই জাতীয় কিছু একটা বলেন। সুতরাং আমাকেও দাদা বলেই ডাকবেন। তবে এখানে মানে বেঙ্গলের আউট সাইডে 'দাদা'র মানেটা কি জানেন তো? চেয়ারে হেলান দিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো দুলতে দুলতে দমকে দমকে হাসতে লাগলেন জেমস গনসালভেস। স্রেফ মাস্তান, বুঝেছেন—

তা তো বুঝলাম কিন্তু আপনি কি আমার সঙ্গে আপনি আপনি করেই কথা বলবেন?

দশ মিনিট এখনও কাটেনি ভাই—হাসির তুফান এক্সপ্রেস চালিয়ে জেমস গনসালভেস বললেন, আমার চেয়ে বয়সে ছোট তো বটেই; আমার সমান বয়সী কাউকেও দশ মিনিট কথা বলার পর আপনি করে সম্বোধন করেছি বলে তুমি কোনও রেকর্ড পাবে না। ও-সব আপনি-ফাপনি আমার আসেই না। ইংরেজিতে ওটা নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই কিন্তু হিন্দি বাংলাতেই বড়োবেশি হোঁচট খেতে হয়।

অমিতাভ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদা—

তার কথাটা সে শেষ করতেই পারলো না। তার আগেই গনসালভেস লাফিয়ে উঠলেন, এই অমিতাভ, ডাইরেক্ট দাদা ডাকটা শুনে নিজেকে সত্যিই মাস্তান মনে হচ্ছে। ওটা চলবে না এই দেশে। দুধের মধ্যে একটু জল মেশাতেই হবে।

দুধের মধ্যে জল?

তাই বৈকি! জেমস গনসালভেস মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। এই ব্যাপারটাও তোমাদের কলকাতায় হেভি চালু। নামের সঙ্গে শুধু একটা দা জুড়ে দেওয়া। সবদিক বজায় রাখতে এই সিস্টেমটা কিন্তু মন্দ নয়। নাম ধরে ডাকাও হলো আবার সম্মান জানানো হলো। সো আই লাইক টু প্রেফার জেমসদা—জেমস গনসালভেস অট্টহাসির ড্রাম বাজালেন। হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে?

আপনার চেয়ে বয়সে বড়ো—এমন মানুষকেও কি দশ মিনিট পরে 'তুমি' করে সম্বোধন করেছেন?

করেছি কি, ওটা তো আমার অভ্যেস। নিজেকে শুধু সংযত করে রাখি। তবে দু'বার মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি। সে কী গালাগাল আমাকে! মশাই, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি। জিভের মধ্যে কি 'তুমি' করে বলার যন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন? দু'বারের ঘটনাই তোমাদের ওই কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায়?

কাঁচরাপাড়ার জেসিলীন রোডে। ওখানে আমার বোন থাকে। বছরে একবার সেখানে আমাকে

যেতেই হয়। সেটা হলো পঁচিশে ডিসেম্বর। সে যাক গিয়ে—জেমস গনসালভেস হইহই করে উঠলেন, আমি কিন্তু দিন দিন খুব অভদ্র হয়ে উঠেছি। তোমাকে এখন পর্যন্ত এক কাপ কফিও খাওয়ালাম না। বলেই টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বোতামে হাত রাখলেন।

দরজার ফাঁকে একটা মুখ উঁকি দিতেই জেমস চিৎকার করে উঠলেন, তোদের বুদ্ধিগুলো কী সব আমারই মতো? আমার বোনের দেশের ছেলেটা সেই কতোক্ষণ ধরে বসে আছে! এক কাপ কফি দিতেও কি তোদের হাতে নোটিশ ধরাতে হবে? তাড়াবো? সব কটাকে তাড়াবো। আমাকেও তাড়াবো।

যার উদ্দেশে বলা সে কিন্তু বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলো না। অর্থাৎ জেমস সাহেবের কথাবার্তার সঙ্গে যে বিশেষ পরিচিত সেটা বোঝা গেল ওর নির্লিপ্ত মুখখানা দেখে। সব কথা শুনলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। মাঝখানে অথবা শেষে উত্তর দেবার কোনও প্রশ্ন নেই।

ইতিমধ্যে একটা মেয়ে এসে জেমস গনসালভেসের টেবিলে চারখানা টাইপ করা চিঠি মেলে ধরতেই তিনি খসখস করে চারটে সই করে দিলেন। চিঠিগুলো নিয়ে চলে যাবার সময় মেয়েটি বললো, আমি একটু বেরুবো। ঘন্টা দেড়েক বাদেই ফিরে আসবো।

সিনেমায় যাবে?

না স্যার, কক্ষনও না।

শ্রীকলাতে যে ইংরেজি ছবিটা এসেছে ওটাও ঘন্টা দেড়েকেব বই কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। চাপা হেসে জেমস বললেন, যাও যাও, আর ভিড় বাড়িয়ো না। যেখানে যাবে বলে ঠিক করেছো চলে যাও।

মেয়েটি চলে যাবার পরেই জেমস গনসালভেস অমিতাভর মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তাবপরেই আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন, তোমাব প্রবলেমটা আমাকে খুলে বলো তো! কোনও অসুবিধে আছে?

না-না অসুবিধের কি?

তাহলে বলো।

একজন এসে এক ফাঁকে কফি দিয়ে গিয়েছিল। কফির কাপে চুমুক বসিয়ে অমিতাভকে একটু চিন্তা করতে হলো কোন কোন ঘটনা বলবে এবং কোনটা না-বললেও চলবে। শেষে ঠিক করলো পুরোটা বললেই-বা দোষের কি? একটু সময় লাগবে এই যা—তাহলেও বলার মধ্যে কোনও ফাঁক রাখা উচিত নয়। অমিতাভ রমন ফার্টিলাইজারের ছবিটা চমৎকার ভাবে এঁকে দিল।

সব কথা শোনার পর জেমস গনসালভেসের মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে এলো, কঠিন পরিস্থিতি।

সত্যিই পরিস্থিতি কঠিন।

অ্যায়াম টেলিং য়ু ভেরি ফ্রাঙ্কলি অমিতাভ, য়ু কান্ট স্টে ওভার হিয়ার। ম্যানেজমেন্ট যতোই শক্তিশালী হোক না কেন, পদ্মিনী উষার সংগঠনের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি নয়। মেয়েটার বড়ো গুণ কি জানো? লড়াই করার মানসিকতা। নিজে অনেস্ট এবং সিনসিয়ার বলেই নীতি থেকে কখনও এক পাও সরে আসেনি। রাজনের প্রমোশন না-হলে তোমাকে ও কিছুতেই মেনে নেবে না। ওর যা চরিত্র নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ওকে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই-এ নামতেই হবে। মধ্যে থেকে পড়ে পড়ে মার খাবে তুমি।

আমাকে কি করতে বলেন?

রেজিগনেশন লেটারটি মিঃ নামবিয়ারের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে আসতে বলি। অথবা মজা দেখতে। যেটা তোমার খুশি। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলে না তো?

জেমসদা, একটু বুঝিয়ে বলুন। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে অমিতাভ তাকিয়েই রইলো।

আরে বাবা, সরোজা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির চাকরি তো তোমার বাধা। আর রমন ফার্টিলাইজারের

থেকে স্যালারিও খুব একটা খারাপ পাবে না।

মানুষ বিপদে পড়লে খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় বটে কিন্তু তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে কারোরই কোনওরকম আশা থাকে না। তবে প্রথম থেকেই যদি কেউ শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াবার সুযোগ পায় তার মতো ভাগ্যবান আর ক'জন? জমাটবাধা ঘন অন্ধকারের দেওয়াল ভেঙে এই আলোকে সবাই দেখতে পায় না। অমিতাভ আপ্লুত কণ্ঠে শুধু ডাকলো, জেমসদা।

নো জেমসদা। জেমস গনসালভেস পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এটা তোমার জেমসদার কোম্পানি নয়। নয় তার বাবারও। আমি তোমার কিছুই করছি না। যা করার সুন্দরম সাহেবই করবেন।

সুন্দরম সাহেব!

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই সরোজা ট্রান্সপোর্টের মালিক তো তিনিই। তিনি এবং সরোজা দেবী তোমাকে ছেলের মতো দেখছেন—তুমি কেন অন্য সংস্থায় গিয়ে গুঁতোগুঁতির মধ্যে থাকবে? ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ, কোচিন এবং ত্রিবান্দ্রমে চার-চারটে অফিস আমাদের, যেখানে খুশি তুমি সেখানেই বসতে পারো। চাই কি সুন্দরম সাহেবের বাড়িতে বসেও এই চারটে অফিসকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারো। জেমস গনসালভেস উদাত্ত গলায় হাসতে হাসতে আরও যোগ করলেন, চারটে-পাঁচটা দিন যেতে দাও। আমি এদিকের কাজগুলো একটু সামলে-সুমলে উঠি তারপরে সুন্দরম সাহেবের নির্দেশ নিয়ে সেই মতো ব্যবস্থা করবো। তুমি শুধু একটা কাজ করবে। রেজিগনেশন লেটারটা যেদিন নিখুঁত নিশানায় নাকের ওপর ছুড়তে যাবে সেদিন আমাদের ট্রান্সপোর্টের বিরাট সাদা রঙের বুইক গাড়িটা নিয়ে যাবে। এনি মোর প্রবলেম? জেমস গনসালভেস এবারে আর উত্তাল হাসি নয়—শিশুর মতো মিষ্টি করে হাসতে লাগলেন।

হোটেল বালসাম্মায় ফিরে এসে অমিতাভ টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। মাথায় রোদ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এবং বাস জারনি ইত্যাদি করে ক্লান্ত লাগাটাই স্বাভাবিক। অথচ কী আশ্চর্য! এই মুহূর্তে সে ও-সব কিছুই অনুভব করলো না। বরং নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। কোচিনে এসে এতোটা নিশ্চিত হওয়া এই প্রথম।

একটা ব্যাপার কিন্তু বেশ ভাববার বিষয়। অমিতাভ মিঃ সুন্দরমের কথাই ভাবছে। কী চমৎকার শান্ত এবং ধীর-স্থির মানুষ। তাঁর যে এতো বড়ো একটা কোম্পানি রয়েছে সে-কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানাননি। অথচ কি নরম ভাবে বলেছেন, 'তুমি যদি কোনও অসুবিধা বোধ করো জেমস গনসালভেসের সঙ্গে দেখা কোরো।' অর্থাৎ নিজেকে আড়াল করে, প্রচারের বাইরে রেখে জেমসকেই মর্যাদা দিয়েছেন। এটা সবাই পারে না। এর সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও সহজেই উঠতে পারে। অমিতাভ কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। মিঃ সুন্দরমও ভুবনেশ্বর থেকে ওই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই সফর করেছেন। তিনি যেখানে এয়ার কন্ডিশন কোচে জারনি করতে পারেন সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী কেন? পয়সা বাঁচানোর প্রশ্নও ওঠে না। আসলে মানুষটার প্রকৃতিই হয়তো ভিন্ন। বিলাসিতা করার ক্ষমতা আছে বলেই সেই বিলাসিতার মধ্যে ডুবে যেতে হবে এমনটা ঠিক নয়। তিনি তাই সহজ জীবনযাত্রাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আর বাড়াবাড়ির ব্যাপারটাকে সযত্নে এড়িয়ে প্রয়োজন মতো নিজেকে তৈরি করেছেন।

এখানে এসে বাড়িতে এখনও চিঠি লেখা হয়নি। আর দেরি করা উচিত নয়। মা এবং বৌদিরা বারবার বলে দিয়েছিলেন, গিয়েই পৌঁছনোর সংবাদ দিবি। আমরা খুব চিন্তায় থাকবো। সেই চিন্তাটা অবশ্যই দূর করা দরকার। অমিতাভ উঠে বসলো। যতো শুয়ে থাকবে আরাম বোধটা ততোই পেয়ে বসে। এই করে শেষ পর্যন্ত হয়তো চিঠিটাই লেখা হয়ে উঠবে না। অমিতাভ টেবিলে বসে গেল এবং আধঘন্টার মধ্যে দু'খানা চিঠি শেষ করে নিজেকে ভারমুক্ত বলে মনে হলো। না, অমিতাভ এখানকার গন্ডগোলের একটুও আঁচ দেয়নি। দেওয়াটা উচিত নয় বলেই দেয়নি। শুধু শুধু চিন্তায়

ফেলে কী লাভ? মা বড়ো অল্পতেই অস্থির হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে অমিতাভর যদি কোনও ব্যাপার হয়। তাছাড়া সুরাহা তো একটা হয়েই গেছে। রমন ফার্টিলাইজারে চাকরির নিরাপত্তা না-হলে সরোজা ট্রান্সপোর্টে হবে। সুতরাং আপাততো জটিল ওই অধ্যায়টা নিয়ে চিঠিতে আর জট-না-পাকানোই ভালো। সে লিখলো, আমি ঠিক মতো কোচিনে এসে পৌঁছেছি। পথে কোনও অসুবিধে হয়নি। অফিসেও জয়েন করেছি। তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি।

বাড়িকে নিশ্চিত করার জন্য এর চেয়ে বড়ো চিঠির আর কি দরকার?

বুধবার দিন বেলা তিনটে নাগাদ গঙ্গাধরম হঠাৎ অমিতাভর ঘরে এসে জানতে চাইলো, স্যারের প্রোগ্রাম কী?

সকাল থেকে যা চলছে খাওয়া আর ঘুম। কিন্তু তুমি চললে কোথায়? অমিতাভ জিজ্ঞেস করে।

বাড়ি স্যার। গঙ্গাধরম একগাল হেসে বললো, আগামীকাল আবার এমন সময়ে এখানে এসে যাবো।

এসো তাহলে—অমিতাভ ওকে বিদায় জানালো।

গঙ্গাধরম কিন্তু নড়লো না। সলজ্জ ভাব নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতে লাগলো। কি যেন একটা বলার ইচ্ছে রয়েছে অথচ মুখও খুলছে না। বায়না করে দাবির জিনিসটা পাওয়ার পর বাচ্চা ছেলেরা দুষ্টুমি ভরা চোখ নিয়ে যে ভাবে হাসে, গঙ্গাধরমেরও তখন সেই অবস্থা। অমিতাভ শান্ত হেসে বললো, তুমি কিছু বলবে?

ওই জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁড়িয়ে থাকলেই বলা হবে?

বলছিলাম কি—ত্রিপুনীথুরা থেকে সরকারি বাসে আমাদের বাড়ি মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ। আপনি যাবেন স্যার? গঙ্গাধরমের চোখে-মুখে একটা আকাঙ্ক্ষার জলছবি। ছবিটাকে নষ্ট হতে দেওয়া যায়না। কেন-না এটা কোনও নিয়মমাফিক ব্যাপার নয়—এর পেছনে রয়েছে আন্তরিক একটা টান। অনেক আশা নিয়ে যে ছুটে এসেছে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়াও একটা পবিত্র কাজ। অমিতাভ ছোট্ট করে বললো, চলো।

সরকারি ছ'নম্বর বাসটা ওদের যেখানে নামিয়ে দিল সেই জায়গাটার নাম ব্রহ্মপুরম। পাকাবাড়ি নেই বললেই চলে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খোলার চালের অথবা শনের বাড়ি। লাল মাটির দেওয়াল। বাস রাস্তা ধরে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গিয়েই বাঁ দিকের লাল সুরকির পথে নেমে পড়লো ওরা। ডান পাশে পরপর পুকুর। চমৎকার টলটলে জল। বেশ কয়েকটা হাঁস ডানা ঝাপটে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট উলঙ্গ কয়েকটা শিশু কঞ্চি হাতে ওদের মারবেই। শেষ পর্যন্ত সব কটা হাঁস নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য জলে নেমেও বেশ কিছুটা ভেতরে চলে গেল। শিশুরা পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে দাঁত বের করে বলতে লাগলো, পো কারুতর। পো কারুতর।

কথাটা শুনে অমিতাভ গঙ্গাধরমের মুখের দিকে তাকাতেই সে উত্তর দিল, ওরা স্যার হাঁসগুলোকে চলে যেতে বারণ করছে। 'পো কারুতর' মানে চলে যেয়ো না।

সাঁওতাল মেয়েরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাচতে নাচতে এক সময় যেমন মাঝখানে এসে জড়ো হয়, ঠিক তেমনি ভাবে গায়ে গা লাগিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা ঘর একে অন্যকে ধরে রেখেছে। সামনে সবুজ ক্ষেত। আর এক পাশে ফাঁকা জলাজমি। দূরে দেখা যাচ্ছে আর একটা গ্রাম। গঙ্গাধরম মেঠো পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ অমিতাভকে বললো, কাজুর বনটাকে দেখুন স্যার। আর এটা হলো তেজপাতা গাছ। সুপারি গাছগুলোকে বেয়ে লতানো যে-গাছের সারি দেখছেন ও-গুলো হলো গোলমরিচ। এই দেখুন ছোট্ট ছোট্ট থোকায় থোকায় গোলমরিচগুলো ঝুলছে। এখন সবুজ লাগছে। গাছ থেকে ছিঁড়ে রোদে শুকোবার পর সব কালো হয়ে যাবে। তেজপাতাও তাই।

কাজুবাদামের বনের শেষেই আর একটা গ্রাম। এটা দক্ষিণ ব্রহ্মপুরম। এখানেই গঙ্গাধরমদের বাড়ি। অমিতাভ হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালো। বাস থেকে নেমে পুরো কুড়ি মিনিটের পথ হেঁটে এসেছে। অথচ মনেই হয়নি দূরত্বটা এতো!

গঙ্গাধরমদের বাড়িটা এক-কথায় চমৎকার। মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের চারপাশে চারখানা টানা খোলার চালের ঘর। উঁচু দাওয়া। মাটির দেওয়ালগুলোকে সিমেন্টের মতোই মনে হয়। নিশ্চয়ই দু'বেলা কেউ লেপামোছা করে। বাড়ির চারপাশে কম করেও গোটা চল্লিশেক দীর্ঘ দীর্ঘ নারকেল গাছ।

অমিতাভকে দেখে চারটে ঘর থেকেই স্রোতের মতো বিভিন্ন বয়সের নর-নারী উঠোনে নেমে এলো। অহেতুক লজ্জা এদের নেই। আছে সারল্য আর আতিথেয়তা। গঙ্গাধরমের মা, দুই কাকা এবং দুই কাকিমা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ষোলো থেকে চব্বিশের মধ্যে ছটি মেয়ে। মেয়েদের প্রত্যেকেরই পরনে লুঙ্গি আর ব্লাউজ। মা এবং কাকিমাদেরও তাই। গঙ্গাধরম সবার সঙ্গে অমিতাভর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, আমার দুই দাদার ফিরতে ফিরতে রাত সেই সাড়ে আটটা-নটা হয়ে যাবে। তবে রাজন ছটার মধ্যেই চলে আসবে।

উঠোনে একটা বড়ো চৌকির ওপর অমিতাভ বসেছিল। ওর চারপাশে ভিড় করেছিল মানুষরা। অতিথিকে সামনে পেয়ে কেউই অখুশি নয়। বছর বাইশ এবং চব্বিশের দুটি মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্ধুর মতো ঠেলাঠেলি করছিল নিজেদের মধ্যে। যার বয়স চব্বিশ সে রাজনের দিদি। ল' পড়ছে। ওর নাম করিম্মা। অমিতাভ এখানে এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, কেরালার মানুষদের দেখে বোঝার উপায় নেই কে কতোটা শিক্ষিত—এদের চালচলন অর্থাৎ জীবনযাত্রা এতোই সহজ এবং সাধারণ। সে যখন শুনলো করিম্মা ল' পড়ছে তখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। করিম্মা কিন্তু ইংরেজি বা হিন্দির ধারে কাছে গেল না। পরিষ্কার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করলো, 'নিঙ্গেলে ওডে ভিডে এবিডে আগন্নু।' এক বর্ণ বুঝতে না-পেরে অমিতাভ অসহায়ের হাসি নিয়ে খাঁটি বাংলায় বললো, আমি যদি আমার ভাষায় কথা বলি আপনি বুঝতে পারবেন? কেউ কারো ভাষা না-বুঝতে পেরে সহজ হাসিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আপন করে টেনে নিল। গঙ্গাধরম অমিতাভর কানে কানে ফিসফিস করের জানিয়ে দিল, আমার দিদি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার বাড়ি কোথায়? অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে করিম্মার দিকে চেয়ে আর একবার হাসি ছড়িয়ে উত্তর দিল, ক্যালকাটা।

গঙ্গাধরমের মা এবং কাকারা কলকাতা সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন-টশ্ন করছিলেন। গ্রামের একেবারে সরল মানুষ। শহর কলকাতার ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই। সেই কারণেই অনায়াসেই জিজ্ঞেস করতে পারলেন, কোচিনের থেকে বড়ো না ছোট? সেখানেও কী এতো মানুষ? বোঝাতে গেলে অনেক পরিশ্রম। অমিতাভ শুধু জানালো, কলকাতার মাটিব নিচ দিযেও ট্রেন চলে। শুনে তো বয়স্ক মানুষ তিনজন হইহই করে উঠলেন। দক্ষিণ ব্রহ্মপুরম থেকে যাঁরা কোচিনে তো দূরের কথা, ত্রিপুনীথুরাতেও ন'মাসে ছ'মাসে একদিন আসেন তাঁদের কাছে ওই খবরটা অবশ্যই মহা বিস্ময়ের।

গঙ্গাধরমের দুই কাকিমা অমিতাভর জন্য খাবার নিয়ে এলেন। এক থালা উপ্পম। বাটিতে করে ডাল জাতীয় সম্বর এবং তেঁতুলের চাটনি। অমিতাভ উপ্পম এর আগে খায়নি। এবারেই প্রথম খেল। খেতে কিন্তু খারাপ লাগলো না। আসলে ওটা তাল আর চালগুঁড়ো দিয়ে তৈরি এক ধরনের পিঠে।। সঙ্গে নারকেল মেশানো। আর একটা থালায় দুটো বিশাল কলা।

অমিতাভ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, এতো খাওয়া কি সম্ভব?

দুই কাকিমা উত্তর দিলেন, এটুকু না-খেলে আমরা কষ্ট পাবো। আমাদেরও তো একটা তৃপ্তি রয়েছে। এই সময়ে গঙ্গাধরমের মা ওর কানে কানে কি যেন বলতেই গঙ্গাধরম বেশ কিছুটা সোজা

এগিয়ে গিয়ে একটা নারকেল গাছের গোড়ায় উপস্থিত হলো। তারপরেই অবিকল একটা কাঠবিড়ালীর মতো তরতরিয়ে বেয়ে একেবারে গাছের মাথায়। এবং মুহূর্তে দুটো ডাব পেড়ে আবার অমিতাভর সামনে। ব্যাপারটা চিন্তা করতে অমিতাভর একটু সময় লাগলো। নারকেল গাছটা না-হলেও সত্তর-পঁচাত্তর ফুট উঁচু।

গঙ্গাধরমের এক কাকা বললেন, ওর খাওয়া হোক, তারপরে ডাব দুটো কেটে দিস। আর এক কাকা কাউকে কোনও অর্ডার না-দিয়ে নিজেই একটা দা এনে গঙ্গাধরমের হাতে তুলে দিলেন। এঁদের ছোট ছোট কাজের মধ্যে, সূক্ষ্ম আন্তরিকতার টানটা মনকেও নাড়া দেয়। কে বলবে অমিতাভ আজ এই বাড়িতে প্রথম এসেছে? একজন অপরিচিতকে আপন করে নিতে এঁদের ব্যবহার অপর পক্ষকে সহজেই আপ্লুত করে। তবুও অমিতাভ বললো, এর পরেও ডাব খেতে হবে? এবারে করিস্মা উত্তর দিল, নয় কেন?

যেহেতু আমার খাওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে আমি খুবই সজাগ।

স্যার, ডাব দুটো আপনাকে খেতেই হবে। গঙ্গাধরম বেশ অনুনয় করেই বললো, কোচিনে ডাবের ইতিহাসটা বোধহয় আপনি জানেন না। শুধু কোচিন কেন—পুরো কেরালা রাজ্যেই একই নিয়ম। এখানে সব জিনিস খাবার সুযোগ পাবেন একমাত্র এই ডাব ছাড়া। মেডিকেল স্টোর্স ছাড়া কোথাও ডাব পাবেন না এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থাকলেই আপনি ওটা কিনতে পারবেন।

কারণ?

কেরলার কুটির শিল্প তো বলতে গেলে নারকেলের ছোবড়া থেকেই। দড়ি, পাপোষ, কার্পেট, ব্যাগ, মূর্তি, কী নয়! ডাব পেড়ে তাই ওটাকে নষ্ট করা হয় না।

নষ্ট যখন করেছো, দ্বিতীয়বার আমি ওটাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। অমিতাভ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সরল হেসে বললো, সবার আগে ডাব দুটোকেই খাই, কী বলো?

ডাব নয়—অমিতাভ যেন শরবত খেলো। অনেকটা জল আর কী চমৎকার মিষ্টি! সারা শরীরটা এমনিতেই জুড়িয়ে গেল। আহা, কলকাতায় কেন এমন ডাব পাওয়া যায় না! বন্ধুদের গিয়ে বলতে হবে, শীগ্‌গির ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন জোগাড় করে শুধুমাত্র ডাব খেতে কোচিনে রওনা দে। বাড়ি ফেরার সময় দু-চারটে গাছ নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু লাগাবে কোথায়? টবে? কলকাতায় মাথা গোঁজার পর শখ-শৌখিনতার প্রশ্নটা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। যার আছে তার কথা অবশ্য আলাদা।

রাজন উঠোনে পা দিয়ে অমিতাভকে দেখতে পেয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম রাজন। অমিতাভ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো। হয়তো নিজের পরিচয়টা দেবার কথাই তার মাথায় ছিল কিন্তু তার আগেই রাজন বললো, আমি আপনাকে চিনি স্যার। কথাটা রাজন খুবই স্বাভাবিক সুরে বলেছে। তবুও অমিতাভর ভেতরটা খচখচ করতে লাগলো। এই চেনার কথাটা বলা কি অন্য অর্থে? হয়তো নয়। আসলে নীতিগত ভাবে অমিতাভই দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাজনের জায়গায় সে চাকরি করতে এসেছে—ব্যাপারটা তো এই রকমই দাঁড়াচ্ছে। রাজনকে একপলকে দেখে নিল আর একবার। ওকে নিয়েই রমন ফার্টিলাইজারে তোলপাড় হচ্ছে। পদ্মিনী উষা কিছুতেই ছেলেটাকে বঞ্চিত হতে দেবে না। সংগঠনের পুরো ওইক্য নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই রাজনকে কি অমিতাভ সোমবার দিন দেখেছিল? বোধহয় না। অতো মানুষের ভিড়ে তাকে নজরে না-পড়লেও তার নামটা শোনা থেকে সে কিন্তু একবারও বধির হয়নি।

অমিতাভ ভাবছিল রাজন কি জিজ্ঞেস করবে কেন সে এই দুদিন অফিসে যায়নি? সে-রকম কোনও প্রশ্নই ও তুললো না। পরিষ্কার মনে হলো, অফিসের ব্যাপারটা ও ভুলে থাকতেই চায়। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছো, সুতরাং তুমি এখন অতিথি—এই মনোভাবটাই ওর ভেতরে কাজ করছে। রাজন গঙ্গাধরমের দিকে মুখ ফেরালো। স্যারকে কখন নিয়ে এসেছিস?

এই ঘণ্টাখানেক হবে।

আমাকে আগে বলবি তো, তাহলে একসঙ্গেই আসতাম।

স্যারের আসার ঠিক ছিল না। চুপচাপ শুয়েছিলেন। হঠাৎ রাজি করিয়ে ধরে নিয়ে এসেছি।

ভালোবাসায় ভাঁটা নেই। অতিথি শত হলেও পর, এটা ওরা বুঝতেই দিতে চায় না। গঙ্গাধরমের কাছ থেকে যেটুকু জানার জেনে রাজন বেশ উৎসাহ নিয়েই বললো, স্যার, একবার যখন এসেই পড়েছেন আজকের দিনটা থেকে যান।

সারা বাড়িকে ব্যস্ত করে লাভ আছে কিছু? অমিতাভ তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধের হাসি হাসলো।

আমরা ব্যস্ত হবো এটাই-বা ভাবছেন কেন? স্পেশাল কিছুই হবে না। কারিপাতাব ডাল ভাত যা আমরা খাবো আপনিও তাই খাবেন। রাজন হেসে ফেললো, বরং বলুন আপনারই কষ্ট হবে।

দারুণ বলেছিস তো রাজন! গঙ্গাধরম জুড়ি বাধতেই অমিতাভ দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়েই চাপা হাসলো। ছোট্ট করে বললো, উল্টো চাপ! তারপরেই ঘনিষ্ঠ সুরে জানালো, কথা দিলাম অন্য একদিন এসে থাকবো। কিন্তু ভাই আজকে নয়। হোটেলের কাউকে বলে আসিনি। ওরা চিন্তা করবে। তাছাড়া আমাকে আরও কিছু চিঠি লিখতে হবে।

দুই ভাই যখন অমিতাভকে রেখে দিতে ব্যস্ত এবং অমিতাভ যথারীতি থাকতে চাইছে না তখন গঙ্গাধরমের মা নিজের মাতৃভাষায় সাদাসিধে একটা মন্তব্য করলেন, 'নিঙ্গেল নাল্লা মানুষণ আল্লিও।' সবাই হো হো করে হেসে উঠতেই অমিতাভ চোখের তারা ঘুরিয়ে জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি? এতো হাসি কীসের?

মা বলছেন আপনি ভালো মানুষ নন।

তাই নাকি? অমিতাভ আবেগ ভরে হাসতে লাগলো। আমি আজ না-থেকেও প্রমাণ করে দেবো আমি খুবই ভালো মানুষ।

অমিতাভকে বাস-স্টপেজ পর্যন্ত পৌছে দিতে রাজন এবং গঙ্গাধরম দুজনেই ওর সঙ্গ নিল। বাড়ির মানুষরা আবার ওকে ঘিরে ধরে বারবার যে-কথাটা বলতে লাগলো তা হলো, আর যেন নিমন্ত্রণ করে আনতে না-হয়। আবার এসো। অমিতাভ প্রথম বারে একটা ভুল করেছিল। ফেরার সময় সেটার সংশোধন করে নিল। গঙ্গাধরমের মা, দুই কাকা এবং কাকিমাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নিজেকে এই বাড়িরই একজন বলে মনে করিয়ে দিল।

বাস থেকে নেমে যে-রাস্তায় ওরা এসেছিল এবারে অন্য রাস্তা ধরলো। কাজুবাদামের বনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ ব্রহ্মপুরমের মধ্যে দিয়ে যে-রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে সোজা পশ্চিমের দিকে চলে গেছে,

ওরা সেই পথেই পা বাড়ালো। গল্প করতে করতে ওরা কখন যে বাস-স্টপেজ পৌছে গেল, খুব একটা টের পাওয়া গেল না। অথচ সময় সেই একই লাগলো প্রায়। উনিশ মিনিট।

আমরা কি এই স্টপেজে নেমেছিলাম? চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে অমিতাভর মনে হলো এটা নতুন জায়গা। এখানে বেশ কয়েকটা দোকান গায়ে গা লাগিয়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে। খদ্দেরদের ভিড়ও কম নয়। দু-চারটে পাকাবাড়িও মাথা উঁচু করে রয়েছে। রাস্তায় লোকের যাতায়াতের সঙ্গে সাইকেল আরোহীর চলমান ছবিটা যেন মালায় সুতো গেঁথে চলেছে।

না, স্যার। গঙ্গাধরম উত্তর দিল, এখান থেকে আরও দুটো স্টপেজ পর ওই স্টপেজটা। আমরা আসার সময় গ্রামের সামনে দিয়ে এসেছিলাম। এটা পেছন দিকের রাস্তা। গঙ্গাধরম আর কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, রাজন ওকে থামিয়ে দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ সুরে হঠাৎ বললো, স্যার, দূরের ওই দোতলা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ।

ওই বাড়িটা যোশেফ দিনকরণ। আপনি ওকে চেনেন স্যার?

যোশেফ দি-ন-ক-র-ণ! অমিতাভ মনে করতে গিয়েই একঝলকে বল-পায়ে দুরন্ত এক খেলোয়াড়ের ছবি ভেসে উঠলো। সে এবারে বেশ আগ্রহ নিয়ে বললো, আমাদের কলকাতার এক বড়ো ক্লাবে যে-ছেলেটা ফুটবল খেলে?

হ্যাঁ, স্যার।

আমি কেন, সারা ভারতবর্ষই তো ওকে চেনে!

আপনি ঠিকই বলেছেন। রাজনের চোখে-মুখে গর্বের ঘন ছায়া। চার বছর আগেও স্যার ওখানে একটা কুঁড়েঘর ছিল। আর আজকের ছবিটা তো নিজের চোখেই দেখতে পারছেন। আমার বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয়।

তবে? অমিতাভ রাজনের মুখের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলো।

ছোটবেলায় যোশেফ দিনকরণ পড়াশোনা করার সুযোগই পায়নি। একবেলাতেই যার পেট ভরে খাওয়া জুটতো না লেখাপড়া শেখাটা তার কাছে চিন্তারও বাইরে ছিল। ক্লাস ফোরে ওঠার পর তাই চিরতরেই ওটা বন্ধ হয়ে গেল শুধুমাত্র অভাব আর দারিদ্র্যের জন্য। অথচ আগ্রহ ছিল। সেই দিনকরণের এখন অভাব বলে কিছু নেই। দারিদ্র্য শব্দটা তাব জীবনের অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন। কলকাতায় ফুটবল খেলে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে। এটাও কিন্তু স্যার আসল খবর নয়। রাজনের সারা মুখে স্বর্গের হাসি লেগে রয়েছে।

তাহলে? অমিতাভর বিস্ময় বাড়ছিল।

ওর বাড়ির একতলায় বিরাট একটা হলঘর আছে। ওই ঘরটা কী জানেন? টেক্সট বুক লাইব্রেরি। এলাকার দুঃস্থ গরিব ছেলে-মেয়েরা এসে ওখানে পড়াশোনা করে। সিলেবাস অনুযায়ী দিনকরণ প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক কিনে দেয় ওই ছেলে-মেয়েদেরই দেওয়া বুকলিষ্ট দেখে। ক্লাস ওয়ান থেকে এম. এ ক্লাসের বই পর্যন্ত পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার স্যার। দিনকরণ তো সারা বছরই ফুটবল খেলে বেড়ায়। মাঝে মধ্যে দু-চার দিনের জন্য বাড়ি আসে। ও কি বলে জানেন? 'বাড়িতে ঢোকার মুখে যখন দেখি এতোগুলো ছেলে-মেয়ের দল গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে তখন ভাবি শুধু ওরা নয়—ওদের সঙ্গে আমিও পড়ছি।

বাসের পুরো রাস্তাটা অমিতাভ শুধু দিনকরণের কথাই ভাবতে ভাবতে এলো। ইনকাম তো অনেকেই করে কিন্তু এমন মহান ইনকাম ক'জনে করে? সাতাশ বছরের ওই খেলোয়াড়টির পায়ে শ্রদ্ধায় মাথা রাখতে ইচ্ছে করছিল। অমিতাভ কলকাতায় গিয়ে ওর সঙ্গে অতি অবশ্যই আলাপ করবে। বলবে, আমি তোমার বাড়ি দেখে এসেছি। না-না, বাড়ি নয়—পাঠমন্দির! হঠাৎ কনডাকটরের আওয়াজটা ওর কানে গেল। ত্রিপুনীথুরা—ত্রিপুনীথুরা। বাসটায় মোটামুটি ভিড় ছিল। অমিতাভ বসেছিল মাঝখানে। আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে যতোদূর সম্ভব দাঁড়ানো যাত্রীদের কম ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়েছে। নেমে দু'পা এগোতেই একেবারে মুখোমুখি হলো পদ্মিনীর। ওর সঙ্গে আগের দিনের দেখা সেই ভদ্রমহিলা। অমিতাভ কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। ওকে অস্বীকার করে এড়িয়ে যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু ব্যাপার। আবার নিজের থেকে এগিয়ে কথা বলাটাও অন্য অর্থ বহন করবে। বিশেষ করে তাকে কেন্দ্র করেই যখন জলটা ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে।

পদ্মিনী অমিতাভকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই দু'দিন ও অফিসে আসেনি। পদ্মিনী নিশ্চিত ম্যানেজমেন্টই ওকে আসতে দেয়নি। ওদের হাজারো চালাকির মধ্যে এই গরহাজির থাকার ব্যাপারটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। মিঃ নামবিয়ার পরে প্রমাণ করবে, শ্রমিক কর্মচারীরা মারধর করার হুমকি দিয়েছে। অমিতাভ তাই এই দু'দিন আসেনি। আবার এটাও বলতে পারেন, ইউনিয়নই তো ওকে সাইটে ঢুকতে দিতে আপত্তি জানিয়েছে। আমরা সংঘাত এড়িয়ে গেছি। অর্থাৎ অবস্থা যেদিকেই গড়াক না কেন, ওরা ফয়দা তোলার চেষ্টা করবেন।

হ্যাঁ,. পদ্মিনী এটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, 'রাজনের মীমাংসা না-হলে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অফিসে ঢুকতে দেবো না।' তা ম্যানেজমেন্ট কি তার সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে? এই কথাটা বাধ্য ছেলের মতো শুনলো, অন্যগুলো নয় কেন? তার মানে এটাই প্রমাণ করছে এই ব্যাপারটা নিয়ে ওরা অনেকদূর খেলবে। পদ্মিনী এতো সহজে ওদেরকে এগিয়ে যাবার

জন্য কার্পেট বিছিয়ে দিতে পারবে না।

এই না-আসার ব্যাপার নিয়ে পদ্মিনী আর একটা কথাও ভেবেছিল। অমিতাভর তো অসুখ-বিসুখও করতে পারে। নতুন আবহাওয়ায় এসে সেটা হতেই পারে। সেই কারণেও না-আসতে পারে। তেমনটা হলে অবশ্য আলাদা প্রশ্ন। আসলে পদ্মিনীকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয় ম্যানেজমেন্টের প্রতিটা কাজের ওপর। আপাত দৃষ্টিতে যেটাকে খুবই স্বাভাবিক এবং শান্ত ব্যাপার বলে মনে হয়, পরবর্তী সময় সেটাই হয়তো ধারালো হয়ে ওঠে। সুতরাং চারদিক দেখে-শুনে টিপে টিপে পা ফেলা উচিত। পদ্মিনী সৌজন্য প্রকাশ করলো, আপনার খবর কী?

আমার খবর তো আমি নিজেই জানি না।

কি রকম?

মিঃ নামবিয়ার জানালেন দু'দিন অফিসে আসবে না—গেলাম না। কাল থেকে আবার যেতে বলেছেন, যাবো।

পদ্মিনী অমিতাভর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। ছেলেটা সত্যিই সরল। যে-কথাগুলো তাকে বলার নয়, কতো অনায়াসেই তা বলে ফেললো। অমিতাভ ইচ্ছে করলেই চেপে যেতে পারতো কিন্তু সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। ঠিক ঠিক যেটা ঘটেছে সেটা বলতেই তার আগ্রহ। পদ্মিনী এবারে অন্যরকম একটু ভাবলো। অমিতাভ তাকে বলবে নাই-বা কেন? সে তো ম্যানেজমেন্টের পেটোয়া লোক নয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মেলালে সে এ-সব কথা বলতোই না। তাছাড়া নিজেকে সন্দেহের যথেষ্ট ঊর্ধ্বে রেখে ইউনিয়ন অফিসে তো অমিতাভ সব কথাই খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে। সেদিক দিয়েও সহযোগিতাই করেছে। অফিস আর ইউনিয়নের কথা ভাবতে গিয়ে পদ্মিনীর হঠাৎ খেয়াল হলো তার সঙ্গে তার মা রয়েছেন। এবং অমিতাভর সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা তাবই কর্তব্য।

পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতেই অনসূয়া স্নেহের সুরে বললেন, পথের মধ্যেই প্রণাম করলে মিষ্টিমুখ করাবো কি করে? পরিষ্কার বাংলা কথা। অনসূয়া যেন নিজের মাতৃভাষাতেই বললেন। অমিতাভ তাই বেশ অবাক হয়েই ওঁর মুখের দিকে তাকালো। ব্যাপারটা ভাবতে ওর ভালোই লাগছে। কোচিনের একজন ভদ্রমহিলা বাঙালির মতোই বাংলা বলছেন। অমিতাভ তাই বলেই ফেললো, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন!

মা এবং মেয়ে দু'জনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসলেন। তবে অনুসূয়ার হাসির গভীরতাটাই বেশি। অমিতাভর কথা শুনে তিনি যেন বেশ মজা পেয়েছেন। শেষে বলেই ফেললেন, আসলে আমি তো বাঙালিই। ওর বাবাকে বিয়ের পর এখন পুরোপুরি কেরালিয়ান হয়ে গেছি বলতে পারো। তাই বলে নিজের ভাষাটা কি ভোলা যায়?

আপনি বাংলা বলতে পারেন? অমিতাভ ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ পদ্মিনীকে প্রশ্ন করে বসলো।

বুঝতে পারি। পদ্মিনী মৃদু হেসে উত্তর দিল, তেমন বলতে পারি না।

পারা উচিত ছিল। অতি অনায়াসে আদেশ দেবাব ভঙ্গিতে কথাটা বলার পর অমিতাভ যখন বুঝতে পারলো এতোটা জোর দিয়ে তার বলাটা ঠিক হয়নি তখনই সে আবার নরম হলো, অবশ্য কোন ভাষাটা শিখবেন-না-শিখবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

আগের ধমকটা তো ভালো ছিল। পদ্মিনীর কৌতূহলী প্রশ্ন, সংশোধন করলেন কেন?

আমি না আপনাকে খুব সাধারণ একজন মনে করেছিলাম।

এখন কি অন্য কিছু ভাবছেন?

আমারই ধমক খাওয়ার সময় হয়েছে। আপনাকে উচিত অনুচিত শেখাচ্ছি।

ওই জিনিসটা সকলেরই শেখার আছে। অনসূয়া হাসতে হাসতে বললেন, এই দেখো না রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ কথা বলা কি আমাদের উচিত হয়েছে? তোমাকে অনেক আগেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তারপরেই মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট মন্তব্য করলেন, এই কাজটা তোরই ছিল।

অনসূয়ার কথা শুনে অমিতাভ পদ্মিনীর চোখের দিকে তাকালো। পদ্মিনী তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। মাকে একবার দেখে নিয়ে আড়চোখ ওর দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই একঝলকের চোখাচোখি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল সে। এর পরেও আর কতোক্ষণ চুপচাপ থাকা যায়? অমিতাভকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে ওর বিরোধিতা করা যাবে না এমন দুর্বল মেয়ে পদ্মিনী নয়। ওটা অফিসের ব্যাপার। সেখানে নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া বাড়িটা নিশ্চয়ই সমাধানের কেন্দ্র নয়। যখনকার যে ভূমিকা—মানুষকে তো সেই ভাবেই চলতে হবে। সব যুক্তিই তো পদ্মিনী একে একে দাঁড় করালো তবুও যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মা তাকে খুব মুশকিলেই ফেলে দিলেন। ওই অবস্থা থেকে অমিতাভই ওকে উদ্ধার করলো। সে অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বললো, আজ থাক। অন্য একদিন যাবো।

আজ যখন যেতে চাইছো না তখন অন্যদিনও আর যাবে না!

তা কেন? অমিতাভ সামান্য হাসলো।

সেটা তো আজও হতে পাবে? তারপরেই মেয়ের দিকে আর এক প্রস্থ চোখ বুলিয়ে বললেন, তুই হঠাৎ ভদ্রতায় এতো কৃপণ হয়ে উঠলি কেন? ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অমিতাভ তো তোরই কলীগ।

পদ্মিনী আজ পর্যন্ত মায়ের কাছে কোনও ব্যাপার লুকিয়ে রাখেনি। বন্ধুর মতো সব কথাই তাঁকে বলা চাই। অফিসের তুচ্ছ একটা ঘটনাও তাই অনসূয়ার অজানা নয়। 'কি রে, আজ তোর অফিসের খবর কি?' মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে পদ্মিনী এতোদিন পুরো রিপোর্টই দিয়ে এসেছে। দেওয়ার কারণ রয়েছে। সে বাড়িতে থাকুক বা না-থাকুক—সংগঠনের কাজে অনেক সময় অনেকেই বাড়িতে এসে জানিয়ে যান, এই খবরটা পদ্মিনীজিকে দিয়ে দেবেন। সেই কারণেই মাকে সড়গড় রাখতেই হয়। পুরো ব্যাপারটা জানা থাকলে তিনিও যাতে কিছু কিছু উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু এইবারই প্রথম সে অমিতাভর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গেছে। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে পদ্মিনী হয়তো সঠিক উত্তরও দিতে পারবে না। সে যাই হোক, এই মুহূর্তে তার একটাই চিন্তা, মাকে জানিয়ে রাখলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে তাকে পড়তে হতো না। কিন্তু ওটা তো আফসোসের কথা। ম্যানেজমেন্টের জটিল জটিল চালকে সে ভেস্তে দেয়, এখন নিজেই ভেস্তে গেল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, পদ্মিনী কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। একটা অস্থিরতা ওকে ঘিরেই রয়েছে। চোখে-মুখেও তারই ছাপ।

ওঁর হয়তো অসুবিধে রয়েছে। অমিতাভ পদ্মিনীকে আর একবার বাঁচাবার চেষ্টা করলো।

ওর আবার কিসের অসুবিধে? অনসূয়া অবাক হলেন। তাছাড়া তুমি আমাদের বাড়ি যাবে। সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে? অনসূয়া আক্ষেপ করে বললেন, আমার মাথাটা অতো পরিষ্কার নয় যে তোমাদের বিষয়টা জলের মতো বুঝতে পারবো। পদ্মিনী যেতে বলছে না—তুমিও খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছো না।

না-না, পদ্মিনীজির না-বলার কি আছে? অমিতাভ খুব আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, বিশ্বাস করুন আসলে অসুবিধেটা আমারই। আমি অনেক দূর থেকে এইমাত্র ফিরলাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান করে এখন শুধু ঘুমাতে ইচ্ছা করছে।

পরে একদিন যাবে তো?

নিশ্চয়ই।

এসো কিন্তু—

আসবো। অমিতাভ নতুন করে আর একবার প্রণাম করতেই অনসূয়া বললেন, বারবার প্রণাম করতে হবে না। তুমি বড়ো হও। চাকরিতে উন্নতি করো—তোমাকে আমি এমনিতেই আশীর্বাদ করছি।

হোটেল বালসাম্মাতে ফিরে এসে অমিতাভ স্নান-টান করে সত্যি সত্যিই বিছানায় দেহটা ছেড়ে দিল। সারা দিনের এতো ঘটনার মধ্যে তার মাথায় ওই একটা জিনিসই ঘুরছে, দিনকরণের পাঠমন্দির। লেখাপড়াকে এমন ভাবে ভালোবাসতে আর কেউ পেরেছে বলে অমিতাভর জানা নেই। এই সঙ্গে রাজনকেও চমৎকার লাগলো। ওই ছেলেটা তো পরিষ্কার জানে, তার প্রমোশন বন্ধ করতেই ম্যানেজমেন্ট সুদূর কলকাতা থেকে অমিতাভকে এখানে নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও কী সুন্দর বন্ধুর মতো ব্যবহার করলো! অমিতাভর বিন্দুমাত্র দোষ নেই। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ও-সব যুক্তি-টুক্তির ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না। টোটাল ব্যাপারটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও রাজন কি অপরিসীম সংযমের পরিচয়ই না-দিল! এটা ঠিক এর পেছনে পদ্মিনী উষার ভূমিকা রয়েছে। তাহলেও রাজনের উদারতাকে ছোট করে দেখা যায় না।

পরদিন অফিসে গিয়ে অমিতাভ অন্য কোথাও ঢুকলো না। বড়ো সাহেব অর্থাৎ মিঃ নামবিয়ার, পার্সোনেল অফিসার মিঃ রামাকৃষ্ণান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই এবং কোম্পানির সেক্রেটারি মিঃ ফিলিপস কারো সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলো না। সে সোজা তোশিবা জেকবের ঘরে ঢুকে কোণের দিকে একটা চেয়ার দেখে চুপচাপ বসে রইলো।

গুড মর্নিং। ফোলা ফোলা ঠোঁটে আদুরে গলায় মিসেস জেকব ছোট্ট সম্ভাষণ করতেই অমিতাভও প্রতি উত্তর দিল কিন্তু তার মাথায় অন্যরকম ভাবনা এলো। তার মতো একজন বিতর্কিত জুনিয়াব ক্লার্ককে এতোটা প্রাধান্য দেওয়ার কি আছে? এ-সবও কি মিঃ নামবিয়ারের নির্দেশে? স্বাভাবিক নিয়মে সে এখানে এলে ম্যানেজিং ডিরেকটরের পি. এ মিসেস জেকব তাকে এই ধবনের খাতিরই করতো না। কর্তৃপক্ষের কোন অজানা উদ্দেশ্যের ছককাটা ঘরের গহ্বরে সে ঢুকছে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

ব্যাপারটা বোঝা গেল একটু পরেই। মিসেস জেকব আগের মতোই আদুরে গলায় বললো, প্রথম দিন আপনি যেখানে বসেছিলেন ওই চেয়ারে গিয়েই বসবেন। আপনাকে আজ ফাইলপত্র দেওয়া হবে। কিছু কাজকর্মও করবেন।

করতেই হবে? ভুরু দুটো আর টানটান রইলো না অমিতাভর।

সাহেব তেমন নির্দেশই দিয়েছেন।

পারলাম না। অমিতাভ ছোট্ট দুটো কথায় তার সমস্ত বিরক্তি প্রকাশ করলো।

সেটা সাহেবকে গিয়ে বলুন। তোশিবা জেকব আগে যেমন ভাবে হেসে হেসে কথা বলছিল এবারেও ঠিক সেই হাসিটিই বজায় রাখলো। তবে এমন স্পষ্ট ভাবে 'না' শুনে তার আশ্চর্যই লাগলো।

এম. ডি-র ঘর থেকে ঘুরে এসে তোশিবা জেকব নিজের আসনে বসতে বসতে বললো, সাহেব আপনাকে ডাকছেন। নিঃশব্দের প্রহর কাটলো কিছুক্ষণ। সম্ভবত কী কী উত্তর দেবে অমিতাভ সেটাই একবার ভেবে নিল। পরে নীরবে এক দৃষ্টিতে তোশিবাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এম. ডি-র ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

আসবো স্যার?

এসো অমিতাভ। নামবিয়ার সাহেব একটুও উত্তেজিত নন। বরং আরও বেশি নরম গলায় বললেন বোসো—

অমিতাভ সামনের একটা চেয়ারে বসতেই তিনি শান্ত দৃষ্টিতে ওকে বোধহয় জরীপ করতে লাগলেন। ওর এই বিদ্রোহের পেছনে পদ্মিনী উষার কোনওরকম উস্কানি রয়েছে কিনা সেটাও একবার বোঝা দরকার। উদার এক ভঙ্গিতে মিঃ নামবিয়ার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হলো কি?

কিছুই না স্যার।

তাহলে নিজের সিটে যেতে চাইছো না কেন?

আপনি তো জানেন ওখানে গেলেই বিশ্রী একটা সিনক্রিয়েট হবে। অমিতাভ ভেতরে ভেতরে

ফুঁসতে লাগলো। কী কৌশলেই না তাকে প্রশ্ন করা হলো, নিজের সিটে যেতে চাইছো না কেন? এর অর্থই হলো এখন থেকেই তার মাথায় অভিযোগের বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া। অথচ নামবিয়ার সাহেব খুব ভালো করেই জানেন, ওখানে যাওয়াটা কি অমিতাভর ইচ্ছায়? উনি আগে কাজের পরিবেশটা তৈরি করে দিন। তখন না-যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ যা ব্যাপার-স্যাপার চলছে, অমিতাভ দু'দিকেই ফেঁসে যাবে। তবুও সে সংযত থেকে বললো, ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে?

তুমি এতো ভয় পাচ্ছো কেন? নামবিয়ার সাহেব অভয় দিয়ে বললেন, আমি তো রয়েছি। তাছাড়া তুমি তোমার সিটে যাবে, ওরা কি করবে?

'ওরা কি করবে' সেটা মিঃ নামবিয়াব বেশ ভালো করেই জানেন। কিন্তু সে-কথা বলে ওঁকে বিব্রত করা যাবে না। ওঁর নিশ্চয়ই আজ বোধহয় কোনও মতলব আছে। সে থাক। নতুন করে অমিতাভর আর কিছুই হারাবার নেই। কাজেই সে কথার কচকচির মধ্যে ঢুকতে চাইলো না। অমিতাভ জানে যে-চেয়ারে গিয়ে সে বসবে ওটা তার আসন নয়—বধ্যভূমি। মানসিক সেই প্রস্তুতি নিয়েই অমিতাভ আস্তে আস্তে এম. ডি-র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জানা ব্যাপারটাই ঘটলো। অমিতাভ সেকশানে ঢুকে চেয়ারে বসতে-না-বসতেই যে-যার আসন ছেড়ে ওকে এসে ঘিরে ধরলো। শশীকান্ত নামের সেই ছেলেটি নিজেই পাশের সেকশানে ছুটলো পদ্মিনীকে খবর দিতে। পদ্মিনী যখন এলো ওর পেছনে তখন আরও শ'চারেক লোকের মিছিল। মালযলম ভাষায় ওরা নিজেদের মধ্যে খুবই উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছে। অমিতাভ এটুকু বুঝতে পারছে ওই কথাগুলো ম্যানেজমেন্টের বিপক্ষেই বলা হচ্ছে। কেন-না তার গায়ে কেউ একটু আঁচড়ও বসায়নি এবং সামান্য একটা বাজে কথাও নয়।

দেখতে দেখতে ওই জায়গাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনেটা মানুষের মাথায় মাথায় ভরে গেল। নিভৃত এক নির্দেশে অফিসের সব কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে জড়ো হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সেকশানের ওই বিশাল জনতা অমিতাভকে সঙ্গে করে নীচে নেমে গেলেন। তিনতলা অফিসের প্রতিটা ঘর তখন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। বিল্ডিং-এর সামনেটা সেই সময় জনসমুদ্র।

রাজন অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল। দূর থেকে আসতে আসতেই ওই জনসমাবেশটা তার চোখের ফ্রেমে আটকে গেল। গন্ডগোলটা বিরাট আকার নিতে চলেছে মনে করে সে একটু তাড়াতাড়িই পা চালালো। কাছাকাছি এসে যখন জানতে পারলো জনতা অমিতাভকেই ঘিরে রয়েছে, স্বাভাবিক কারণেই সে তখন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। অতো লোককে সামলানো সহজ নয়। উত্তেজনার বশে কে কখন কি করে বসে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সব চেয়ে বড়ো কথা, অমিতাভকে কেন ঘিরে রাখা হবে? উনি কি চোর যে এ-ভাবে ওঁকে অপমান করা হবে? রাজনের নিশ্চিত ধারণা পদ্মিনীজি ধারে-কাছে নেই। তিনি আসল লোকগুলোকে ছেড়ে দিয়ে ঝুটমুট অমিতাভকে নিয়ে এই ধরনের ছেলেমানুষি করবেন না। নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা করতে করতে রাজন ভিড় ঠেলে একটু একটু করে এগোতে লাগলো।

অমিতাভ কার্যত বন্দি হয়েই ছিল। আজকের এই ব্যাপারটায় তার খুবই খারাপ লাগছে। মিঃ নামবিয়ার এই কাজটা ইচ্ছে করেই করলেন। নিজে ঠান্ডা ঘরে বসে জনতার রোষের মুখে তাকে ঠেলে দিয়ে নতুন আবার কি প্ল্যান করছেন তিনিই জানেন। অমিতাভর আরও খারাপ লাগছে, শুধু খারাপ নয়—অসহায় বোধ করছে অনেকক্ষণ ধরে পদ্মিনীকে দেখতে পাচ্ছে না বলে। সে সামনে থাকলে নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় কাটাতে হয় না। জনতা যখন অফিসের দোতলা থেকে তাকে নিয়ে নীচে নেমে এলো, 'এখানে নয়, নীচে চলুন' বলতে বলতে, সেই সময়েও পদ্মিনী ওখানে ছিল না। অতো ভিড়ের মধ্যে সবদিক খেয়াল রাখা সম্ভব ছিল না। শশীকান্ত পদ্মিনীকে ডাকতে গিয়েছিল। পদ্মিনীও ছুটে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। অমিতাভর সঙ্গে একবার চোখাচোখিও হলো। ভিড় তখন জমজমাট। চিৎকার চেঁচামেচি চারদিকে। তারপর থেকেই অমিতাভ আর ওকে দেখেনি। খুব সম্ভব পদ্মিনী শশীকান্ত এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে সাহেবদের কাচের ঘরের দিকে

পা বাড়িয়ে থাকতে পারে।

রাজনকে সামনে দেখে অমিতাভ নতুন করে নিঃশ্বাস নিল। যদিও তার সারা মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া তবুও সে যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। রাজনের কানের কাছে মুখ এনে অমিতাভ ধীর গলাতেই বললো, অনেকক্ষণ ধরে পদ্মিনীজিকে দেখছি না। অনুগ্রহ করে আপনি একবার ওঁর খোঁজ করবেন?

অনুগ্রহ করার প্রশ্ন উঠছে কেন স্যার? রাজন বেশ দুঃখ নিয়েই বললো, আপনার এই কথাটা তো আমার এমনিতেই শোনা উচিত।

মরুভূমিতে এক গেলাস জল পাওয়ার মতো মানসিকতা তখন অমিতাভর। সে কৃতজ্ঞতার চোখে রাজনের দিকে চেয়ে বললো, ওই কথার ওপর আমার আর কিছু বলার নেই। আপনি ওঁকে একবার ডেকে দিন।

পদ্মিনী বেশ কিছু লোককে নিয়ে গিয়েছিল তোশিবা জেকবের ঘরে। তার প্রথম কথাটাই ছিল, মিঃ নামবিয়ারের সঙ্গে আমরা এক্ষুণি একটা আলোচনায় বসতে চাই।

তা কি করে সম্ভব? এম. ডি-র পি. এ হিসেবে তোশিবা জেকব নিজেকেও বোধহয় আধা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভাবে। হয়তো তার ট্রেনিংটা ওই ভাবেই হয়েছে। সে সহজ সুরে বলতে লাগলো, সাহেবের আজকের যা প্রোগ্রাম তাতে পাঁচ মিনিট সময়ও বের করা খুবই কঠিন। আমি বরং আপনাদের কথাটা সাহেবকে জানিয়ে রাখি। উনি যেদিন সময় দেবেন সেই মতো আমিও জানিয়ে দেবো।

যেদিন সময় দেবেন মানে? পদ্মিনী ভুরু কুঁচকে তাকালো।

অন্তত আজকে কোনও উপায় নেই।

তাহলে জোর করেই ওঁর ঘরে ঢুকতে হবে—কী বলেন?

কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তোশিবা আলতো হেসে বললো, আমার নির্দেশের ওপর নিশ্চয়ই আপনার কিছু করা-না-করা নির্ভর করে না। আমার ওপর যেমন আদেশ ছিল—

ও-সব আদেশ-টাদেশ ছাড়ুন। শশীকান্ত একটু উগ্র হলো। আপনি এতো পাঁয়তারা কবছেন কেন? আপনার কাজ হলো ওঁকে গিয়ে খবরটা দেওয়া। এখন সেটাই করুন।

মিঃ শশীকান্ত, আপনি আর একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন।

এই অবস্থায় এর চেয়ে ভদ্রভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং আরও নীচের দিকে নামতে পারি।

কী বলতে চাইছেন আপনি? আপনারা যা খুশি তাই বলে যাবেন, আমাকেও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? আমিও তো চাকরি করতে এসেছি।

পেছন থেকে কে যেন একজন আওয়াজ দিল, আপনি সাহেবের শেখানো বুলির ড্রাম বাজাতে এসেছেন।

তোশিবা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, সেটা করারও ক্ষমতা থাকা দরকার।

পদ্মিনী বুঝতে পারছে জেকব সুকৌশলে তাদেরকে উত্তেজিত করার আন্তরিক চেষ্টায় আছে। নয়তো এতো উঁচু গলায় কথা বলার সাহস এর আগে আর কখনও হয়নি; খুঁটিতে সুতো বেঁধে রেখেই সে এই কাজে নেমেছে। পদ্মিনী তাই সবাইকে শান্ত হবার ইঙ্গিত দিয়ে তোশিবাকে বললো, আপনি মিছিমিছি অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। কাজের কথায় আসুন—পদ্মিনী এবারে প্রায় আদেশ দেবার সুরেই বললো, আপনি এম. ডি-র ঘরে যান। গিয়ে বলুন ইউনিয়ন মিটিংয়ে বসতে চাইছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক মিনিটের মতো সময় নিয়ে তোশিবা কি যেন একটু ভাবলো। তারপরে আসছি বলে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। বললো, সাহেব আপনাদের আধঘন্টা পরে ডাকবেন।

পদ্মিনী যখন তোশিবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল রাজন ওকে দেখতে পেয়েই জোর পায়ে ছুটে গেল। সে হাঁপাচ্ছিল। বললো, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম!

কি ব্যাপার?

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে খুঁজছিলেন।

উনি কোথায়?

ওঁকে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে সবাই ঘিরে রয়েছেন।

কী আশ্চর্য! অমিতাভ ওখানে গেলেন কি করে? পদ্মিনী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে শশীকান্তব দিকে চেয়ে বললো, ওঁরা তো দোতলার ঘরে ছিলেন। 'আমরা আসছি' বলে তোশিবা জেকবের ঘরের দিকে তখন চলে গেলাম। এরপরে কারা ওঁকে নীচে নিয়ে গেলেন? এটা একটা আন্দোলন। কারো খেয়াল-খুশি মতো মনগড়া কাজের জায়গা এটা নয়। যাঁরা ওঁকে নিয়ে গেছেন তাঁরা কি এর বিপজ্জনক দিকটা একবারও ভেবে দেখেছেন?

পদ্মিনী সময় নষ্ট করছিল না। হাঁটতে হাঁটতে বলেই যাচ্ছিলো, এই ধরনের ভুলের জন্যই ম্যানেজমেন্ট ওৎ পেতে থাকে এবং পুরোপুরি এর ফসল তুলে নেয়। আজ যদি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের.....পদ্মিনী কথাটা বলতে বলতেই মাঝপথে থেমে গেল। আমরা অবশ্য তেমনটা কেউই চাই না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের লাভ এতেই। সবার আগে এই জিনিসটা বোঝা দরকার। আমরা নিজেদের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বলে মনে করি। এই কি তার নমুনা?

শেষেব দিকে পদ্মিনী ঝড়ের গতিতে পা চালিয়ে ওই জনতার অরণ্যে পৌঁছাতেই সবাই ওকে রাস্তা করে দিল। আর একটু এগিয়েই সে অমিতাভকে দেখতে পেল। ছেলেটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। এমন ফ্যাকাশে মুখ পদ্মিনী এর আগে দেখেনি। এতোগুলো মানুষের ঘিরে থাকাটাই তো একটা মানসিক অত্যাচার। হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর সামনে অফিসের সমস্ত কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়ে জমায়েত হবেন এইটুকুই নির্দেশ ছিল। উৎসাহের আর একধাপ এগিয়ে অমিতাভকে এখানে টেনে আনার কাজটা কে করলো? ঠিক এই মুহূর্তে সেটা খতিয়ে দেখার সময় এবং সুযোগ কোনওটাই নেই। তাদের সামনে এখন সমস্যার পাহাড়। ওটাকে না-ভেঙে আগেই শাখা-প্রশাখা ধরনের কোনও ডালে গিয়ে আসল কান্ডে পৌঁছানোর পথ থেকে সে সরে আসতে চাইলো না। ওই ব্যাপারটা আপাততো তোলা থাক।

পদ্মিনী একেবারে কাছে এসে অমিতাভর চোখেব দিকে তাকালো। ছেলেটার দুই চোখে আতঙ্কের গভীর ছায়া। এতোক্ষণ না-জানি কী অপরিসীম আশঙ্কা নিয়ে সে সময় কাটিয়েছে। পদ্মিনীর খুব খারাপ লাগছিল! সে তখন ভুগছে এক অপরাধবোধে। সেই লজ্জাতেই অমিতাভর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। বিষণ্ণ গলায় বললো, আপনি কিছু বলবেন?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালো অমিতাভ। কিন্তু চারপাশের বিপুল সমাবেশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পদ্মিনী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, এখন থাক। ইউনিয়ন অফিসে গিয়েই বলবেন। তার আগে মিনিট পাঁচেক একটু অপেক্ষা করুন।

অমিতাভর সঙ্গে কথা শেষ করেই পদ্মিনী সামান্য উঁচু মতো একটা ছোট্ট ডায়াসে উঠে কর্মচারীদের উদ্দেশে বলা শুরু করলো ঃ ম্যানেজমেন্টের অসহযোগিতার দরুন আমরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছি এবং এটাও ঠিক করেছি রাজনের ব্যাপারে সম্মানজনক নিষ্পত্তি না-হলে এই আন্দোলন চলবে। কর্তৃপক্ষ একের-পর-এক বাহানা করে সময় নিয়ে চলেছে। যেমন বলছে আগামী সপ্তাহে মুম্বাইয়ে বোর্ড মিটিং-এ রাজনের কথা তুলবে। তুলবে—ফয়সলা করে আনবেই এমন কথা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলছে না। অথচ বিষয়টা মুম্বাইয়ে টেনে নিয়ে যাবার মতো এমন কিছু সিরিয়াস নয়। এটা মিঃ নামবিয়ার চোখ বুঝে এখানেই করে দিতে পারেন। সেই তিনিও এখন আমাদের মুম্বাই দেখাচ্ছেন। এরপরে বলবেন সামনেই 'ওনম' উৎসব। তিন-চার দিন তো এমনিতেই অফিস ছুটি থাকবে। সুতরাং আরও সময় নিয়ে এক অবহেলার খেলা খেলবেন আমাদের সঙ্গে। বারবার এই জিনিস চলতে

পারে না। আর আধ ঘন্টা বাদে আমবা কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে আলোচনায় বসছি। আমরা সেখানে একটা কথাই পরিষ্কার করে বলবো, আমরা কোনও অন্যায় আব্দার করিনি। সেই সঙ্গে আমাদেরও শান্তি এবং শৃঙ্খলার নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমাদের তো আছেই একমাত্র শৃঙ্খলা। এটুকু বজায় রাখতেই হবে।

এরপরে পদ্মিনী যে-কথাটা বললো—সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একমাত্র সে-ই বলতে পারে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে পদ্মিনী স্পষ্ট গলায় বলতে লাগলো ঃ অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ম্যানেজমেন্ট আড়ালে অন্য রকম খেলায় ব্যস্ত। আমরা তাই ওঁকে কাজে যোগ দিতে নিশ্চয়ই বাধা দেবো। কিন্তু তারমানে এই নয় যে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ঘিরে বসে থাকবো। যাঁরা ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁরা ঠিক কাজ কবেননি। আমাদের কোনও গোপন ব্যাপার নেই। আমাদের ভুল-ত্রুটি আমরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করি, এটা আমাদের ভুল হয়েছে।

ছোট্ট ডায়াস থেকে নেমেই পদ্মিনী শশীকান্তর কানে কানে কী যেন বললো। শশীকান্ত আবার আরও কয়েকজনের কানে রিলে করে দিল। মুহূর্তে দেখা গেল ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটির তেত্রিশজন মেম্বার তাদের অফিসেব দিকে চলেছে। সবার আগে অবশ্যই পদ্মিনী উষা এবং অমিতাভ।

অমিতাভ আগেই ঠিক করে রেখেছিল মিঃ নামবিয়ার আজ তাকে যে-ভাবে কাজের জায়গায় গিয়ে বসতে বাধ্য করিয়েছেন, সেটা ইউনিয়নকে জানিয়ে দেবে। না জানিয়ে বেখে উপায় কী? যে-কোনও মুহূর্তে অমিতাভ বিপদে পড়তে পারে। অথচ মনের দিক দিয়ে সে তো পরিষ্কাব থাকতেই চাইছে। মিঃ নামবিযার চাকরি দিয়েছেন বলে অমিতাভ কোনওরকম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো না। বরং উল্টোই ভাবছে। এতোগুলো মানুষের বিক্ষোভের সামনে তিনি তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং আজ যাতে বিরাট একটা গন্ডগোল বাধে তিনি তেমনটাই চাইছেন। সেই কারণে আগে থেকে পুলিশকে ফোন করে জানিয়েও রেখেছেন।

পদ্মিনী উষা এবং কমিটি মেম্বারদের সব কথা বলে অমিতাভ ইউনিয়ন অফিসের বাইরে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিল। এবারে বিদায় নিতে হবে। আগামীকাল এক সময়ে এসে রেজিগনেশন লেটারটা মিঃ নামবিয়ারের হাতে ধরিয়ে দেবে। তার আগে জেমস গনসালভেসের সঙ্গে আজকেই দেখা করতে হবে। সেটা তো এক্ষুণিও হতে পাবে! এখানে তার আর দরকার কীসের? অমিতাভ সাহেবদের কাউকেই কিছু বলাব প্রয়োজন মনে করলো না। আড়াই হাজার কর্মচারীদের স্থিরচিত্রকে ডান দিকে রেখে সে সোজা আম্বালামেড়ুর মোড়ের দিকে নিঃশঙ্কচিত্তে পা বাড়ালো।

আম্বালামেড়ু থেকে কোন বাসটা সিটিতে যায় সেটা আগে জানা দরকার। অমিতাভ একজনকে জিজ্ঞেস করতেই যেটুকু জানতে পাবলো তা হলো, ডাইবেক্ট সেই বাস পেতে দেরি হবে। তার চেয়ে যে-কোনও বাসে ত্রিপুনীথুরা গিয়ে সেখান থেকে আবাব বাস পাল্টালে অনেক আগে পৌছানো যাবে। অমিতাভ সেই মতোই একটা বাসে উঠে বসলো।

ত্রিপুনীথুরা জংশনে নেমে অমিতাভ সিটির বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে হোটেল বালসাম্মার দিকে তাকালো। আর তখনই হঠাৎ তার মনে হলো আগামীকাল রেজিগনেশন লেটার সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ নামবিয়ারও তার হাতে হোটেলের যাবতীয় খরচের বিল-টিলও ধরিয়ে দেবেন। শিকার হাত থেকে বেরিয়ে যাবার আফসোসে এটা তিনি করবেনই। জেমসদাকে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার।

সরোজা ট্রান্সপোর্টের অফিসে পৌছে অমিতাভ শুনলো একটু আগেই জেমস গনসালভেস বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন ঘন্টাখানেক বাদে। বাইরের সিটিং রুমে দু-চারজন লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল। অমিতাভ সেখানে গিয়েই বসলো। মানসিক চাপ এবং অবসাদে তার বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ লড়াই করে সে আর জেগে থাকতে পারলো না। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে অমিতাভ একসময়

ঘুমিয়েই পড়লো।

জেমস গনসালভেস সঠিক সময়েই অফিসে ফিবে এলেন। নিজের ঘরে ঢুকতে যাবার মুখে বাইরের সিটিং-রুমে চোখ পড়তেই দেখলেন অমিতাভ কেমন যেন এক অসহায় ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে রয়েছে। জেমস এক ধরনের মমতা অনুভব করলেন। সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে খুব আস্তে ডাকলেন, অমিতাভ!

দীর্ঘ রাত্রির শেষে ফুলের দল যেমন ভাবে চোখ মেলে অমিতাভ তেমন ভাবেই তাকালো। জেমস গনসালভেসকে সামনে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো। অস্ফুট স্বরে শুধু বললো, আপনি কখন এলেন?

এইমাত্র। তুমি?

অমিতাভ ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিযে উত্তর দিল, ঘন্টাখানেক হবে।

তা এখানে বসে ঘুমাচ্ছিলে কেন? তুমি তো আমার ঘরে ঢুকতে পারতে—জেমস গনসালভেস অমিতাভর মুখখানা লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎ বললেন, তোমার অফিসের খবর কী?

ওই জন্যই তো আসা। অমিতাভ ম্লান হেসে বললো, সে অনেক খবর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও—তার আগে বলো তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিছু? জেমস গনসালভেস ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অমিতাভ চুপ করে থাকতেই তিনি যা বোঝার বুঝে নিলেন। তারপরেই হুঙ্কার ছাড়লেন, চলো—আগে খেয়ে আসা যাক।

অফিসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে জেমস গনসালভেস অমিতাভকে সঙ্গে করে আবার বেরিয়ে পড়লেন। এবারে আর ড্রাইভার নিলেন না। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছেন। পাশে অমিতাভ খুব মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছে দেখে একসময় বললেন, পৃথিবীতে এই একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না, সেটা হলো গোমড়া মুখে থাকা। তোমার অফিসে যাই হয়ে থাক তা নিশ্চয়ই সব হারানো ব্যাপার নয়। এতো ভেঙে পড়ার কী আছে?

জেমসদা, আপনি যদি সব......

সব শুনবো আমি। আমার প্রশ্ন হলো তুমি কেন মন খারাপ করে কষ্ট পাবে? কিছু কিছু ব্যাপারকে অবজ্ঞা করতে শেখো

জেমস কথা বলছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল রাস্তার ওপরে। এখানে একটা মিশনারী স্কুল রয়েছে। বাচ্চারা রাস্তা পারাপার হতে পারে। আর একটা টার্ন নিয়ে গাড়ি মসৃণ রাজপথে পড়তেই জেমস স্পীড তুললেন। ডান দিকে রাস্তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সুভাষচন্দ্র বোস পার্ক। বাঁ দিকে আরব সাগরের নীল জলরাশি সাদা ফেনার ফণা তুলে সূর্যের দিকে তাকিযে আপন মনে নেচে চলেছে। পার্কের শেষ মাথায় কোচিনের সবচেয়ে নামী হোটেল সী লর্ড।

জেমস গনসালভেস দুপুরের খাওয়া আগেই সেরে নিয়েছিলেন। সুতরাং একটা ডিশের অর্ডার দিলেন। দারুণ ঝকঝকে এবং শান্ত পরিবেশে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। জেমস আরব সাগরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তিনি শুধু এক কাপ কফি নিলেন। অমিতাভ খুব সঙ্কোচে খাচ্ছিলো। অন্তত ওকে দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছে। জেমস হাসতে হাসতে বললেন, তুমি কিন্তু বড়ো লাজুক অমিতাভ। চুরি করে ধরা পড়া ছাড়া এতো লজ্জা থাকা ঠিক নয়। আমার সঙ্গে যখন মিশবে ওই জিনিসটাকে পুরোপুরি কবর দিয়ে আসবে। ও কে? জেমস গনসালভেস হেসেই চলেছেন। তারপরেই বললেন, খেতে খেতে তোমার অফিসের খবরটা শোনা যাক—কী ঘটেছে আজ সেখানে? নো দায়সারা। ডিটেলসে বলো—

অফিসে আজ সকালে পা রাখার পর থেকে যা-যা হয়েছে অমিতাভ প্রতিটা ঘটনা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরলো। এমনকী সে যে আগামীকালই রিজাইন দেবে সেটাও জানিয়ে দিল! মিঃ নামবিয়ার হোটেলের বিল ধরিয়ে দিতে পারেন সেই আশঙ্কার কথাটাও বাদ দিল না।

সব শুনে-টুনে জেমস গনসালভেস প্রশান্ত হেসে জিজ্ঞেস করলেন, মেনু কার্ডের ওপর তুমি আর একবার চোখ বোলাও। আর কী কী খাবে বলো?

অনেক খেয়েছি জেমসদা। একটুও লজ্জা করিনি।

সত্যি বলছো?

বিশ্বাস করুন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করে আমি ঠকতে রাজি আছি কিন্তু অবিশ্বাস করে নয়। কথাটা বলতে বলতে গনসালভেস কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। একটু সময় নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপরেই স্নিগ্ধ হেসে বলতে লাগলেন, আমি তখন তোমার বয়সী। বি. কম., এল. এল. বি. পাশ করেই একটা সংস্থায় চাকরি পেয়ে গেলাম। সেখানে অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারটা আমি দেখাশোনা করতাম। হ্যাঁ, আমার সেই মালিককে আমি বিশ্বাস করতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি চট করে কাউকে অবিশ্বাস করতে পারতাম না। কোনও একটা ব্যাপারে তাঁর পছন্দ মতো কাজ না-করাতে তিনি আমাকে চুরির দায়ে জড়ালেন। অমিতাভ, সেটা দু-তিন হাজারের অভিযোগ ছিল না। আমি নাকি তাঁর কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছি। এই এখন যেমন তুমি কথায় কথায় মন খারাপ করো আমিও তখন তোমার মতোই ছেলেমানুষ ছিলাম। তাই ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়তে একটুও সময় লাগলো না। এখন যেমন আমার সামনেই আরব সাগর সেই সময় ধারে-কাছেও কোনও জল-টল ছিল না। ছিল রেল লাইন। আমি সেখানেই মাথা পেতে দিয়ে বাঁচতে চাইলাম। বাঁচতে কিন্তু পারলাম না। জলে কুমীর, বনে বাঘ আর ডাঙায় মানুষ এই তিনের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে যাবতীয় অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস নিয়ে যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি, ঠিক তখনই একজন মানুষ এসেই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। সুন্দরম সাহেব রেলের চাকার হাত থেকে আমার মাথাটা বাঁচিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'ঈশ্বব এইজন্য নিশ্চয়ই আমাদের সৃষ্টি করেননি।' তারপরই প্রবল ঘৃণা এবং অসীম মমতায় একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, কাওয়ার্ড। সেই থেকে আবার মানুষেব ওপর বিশ্বাস রাখতে শিখলাম। জেমস গনসালভেস অমলিন হেসে বললেন, এই এখন যেমন তোমায় বিশ্বাস করলাম, তুমি একটুও লজ্জা করে খাওনি। কী বলো?

ফেরার পথে অমিতাভ আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। এতোক্ষণ যে-ভাবে গুম হয়েছিল সেটা আস্তে আস্তে কেটে গেছে। সে জিজ্ঞেস করলো, জেমসদা, আপনার তাহলে আপত্তি নেই তো?

কীসের ভাই?

রিজাইন দেওয়ার....

আরে না-না! আমি বরং উৎসাহ পাচ্ছি তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারবো বলে। তবে— জেমস গনসালভেস হঠাৎ থমকে পড়লেন।

তবে কী?

আমার কাছে প্রথম হচ্ছেন জেসাস ক্রাইস্ট, দ্বিতীয় আমার বাবা-মা এবং তারপরেই সুন্দরম সাহেব। আমার মনে হয় সুন্দরম সাহেবকেই আমি বোধহয় এখন সবচেয়ে বেশি চিনি এবং জানি। তুমি আমার কাছে থাকবে এই দখলটাকে ছাড়তে চাইবেন না। আজকে রাতেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেবো। উনি কী বলবেন তা অবশ্য আমি জানি। সুন্দরম সাহেব খুশির গলায় বলবেন, অমিতাভকে এক্ষুণি মাদ্রাজে পাঠিয়ে দাও। অনেক দিন ধরেই এখানকার অফিসের জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি জেমস গনসালভেস হাসির জয়রথ ছুটিয়ে বললেন, এক যদি তুমি মাঝে মাঝেই আমাকে জরুরি কাজের জন্য মাদ্রাজে কল করো, দেখা-সাক্ষাৎটা তাহলে ঠিকই থাকবে।

ওই কথার কী উত্তর দেবে অমিতাভ? সে শুধু জেমসের ব্যবহারে মুগ্ধই হলো না, সেই সঙ্গে আপ্লুতও হলো। গভীর সুরে অমিতাভ একটা কথাই বলতে পারলো, জেমসদা, আপনি মানুষকে

বড়ো ভালোবাসতে পারেন। কথাটা শুনতে মন্দ লাগলো না। খুব সাধারণ কথা কিন্তু জেমস গনসালভেসের কানে মধুর ছন্দে তা রিনরিন করে বেজে চলেছে। বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ রাখলেন জেমস। ডান হাতটা দিয়ে আবেগে বুকে পবিত্র ক্রুশ এঁকে উত্তর দিলেন, জেসাস ক্রাইস্ট তো আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

অফিসে পৌঁছে জেমস গনসালভেস প্রয়োজনীব যে-কাজগুলো বাকি ছিল তাতে মন দিলেন। অমিতাভ একবার শুধু বলেছিল, জেমসদা, আমি তাহলে চলি? 'না-না, যাবে না' বলে জেমস আবার নিজের পড়ে থাকা কাজে ডুব দিলেন। টেবিলে গোটা তিনেক ফাইল এবং বেশ কিছু চিঠিপত্র জমে ছিল। সে-গুলোর যথাযথ ব্যবস্থা করতে জেমস গনসালভেস ঘন্টা দেড়েকের মতো সময় নিলেন। তারপরেই হাত দুটো মাথার ওপর তুলে এক করে একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, কালকে আমি অফিসে আসবো বটে তবে বেশিক্ষণ থাকবো না। লাঞ্চের অনেক আগেই চলে যাবো। তুমি এক কাজ করবে—আমার বাড়ি তো নিশ্চয়ই জানো না!

আজ্ঞে না।

চেনাটা অবশ্য এমন কিছু কঠিন নয়। অমিতাভর হাতে ছোট্ট একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে জেমস বললেন, নেহেরু স্টেডিয়াম ধরে সোজা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে চমৎকার একটা সিনেমা হল দেখতে পাবে। ওটা কবিতা। কবিতার পাশের রাস্তায় ঢুকে ঠিক দু'মিনিটের মাথায় ডান দিকে চোখ রাখবে। সাদা রংয়েব ছোট্ট একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের নাবকেল গাছটাতে দু-দুটো ঘুড়ি জব্বর ভাবে আটকে বযেছে দেখবে—অন্তত আসাব সময়েও আমি সে-দুটোকে দেখে এসেছি। ইতিমধ্যে কেউ যদি পেড়ে না-থাকে তাহলে তুমিও তার দর্শন পাবে।

অমিতাভ কথাগুলো শুনেছিল আর নিশ্চুপে হাসছিল। সবার আগে প্রথম যে-কথাটা তার মনে হলো, জেমসদার মতো এমন বয়স্ক ছেলেমানুষ এই পৃথিবীতে আর ক'জন আছে? জেমস গনসালভেস কিন্তু ওকে বেশি ভাবা-ভাবির মধ্যে রাখলেন না। তিনি যেমন বলছিলেন তেমনই বলতে লাগলেন, বাড়িটা তাহলে চিনলে! আগামীকাল দুপুরে ওখানে অতি অবশ্যই পৌঁছানো চাই। আমরা তোমার জন্য না-খেয়ে অপেক্ষা করবো।

কিন্তু......

হ্যাঁ, তার আগে ওই পবিত্র কর্মটি সেরে ফেলবে। রিজাইন দিয়ে অন্য কোথাও আর অপেক্ষা করবে না। সোজা আমার বাড়ি—মনে থাকবে?

থাকবে। অমিতাভ নীরবে হাসতে লাগলো।

তাহলে এখন উঠতে পারো। আমাকে আরও কিছুটা কাজ করতে দাও। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যাওয়াতে জেমস আবার হইহই করে উঠলেন, আর হ্যাঁ—আসল কথাটাই তো বলা হলো না, মিঃ নামবিয়ার যা একখানা ছুঁচো, হোটেলের বিল-টিলের প্রশ্ন তুলবেনই। তুমি কিন্তু কোনওরকম প্রতিবাদের মধ্যে যাবে না। ওঁকে ক্ষমা করবে। আইনের পথে অবশ্য যাওয়া যায় তবে বিদায়কালে উদার থাকাই ভালো। বিনীত ভাবে তোমাকে কতো দিতে হবে সেই অ্যামাউন্টটা শুধু জিজ্ঞেস করবে। এনি মোর প্রবলেম?

পুরো প্রবলেম তো আপনি সলভ করেই দিলেন।

আমি কিছুই করিনি। জেমসের সারা মুখে সূর্যকিরণের হাসি। জেসাস ক্রাইস্ট আমাদের মধ্যে দিয়ে করান! কথাটা তিনি শেষ করেছেন কী করেননি—তারপরেই আবার চিৎকার করে চেয়ারে দোল খেতে বললেন, আরে ওই ব্যাপারটা তো প্রায় ভুলেই গেছিলাম। সাদা বুইকটা তোমার হোটেলে কাল পাঠিয়ে দেবো তো?

প্লিজ জেমসদা, আপনি কিন্তু এবারে প্রবলেম বাড়াবেন বলে মনে হচ্ছে!

দারুণ বলেছো কিন্তু। গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন জেমস। দিস ইজ দ্য সুইট ক্যারেকটারেসটিক অব বেঙ্গলী পিপল্। মাথা নাড়িয়ে জেমস গনসালভেস সমানে তারিফ জানাতে লাগলেন।

পরদিন সকালে একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলো অমিতাভ। অন্যান্য দিন সেখানে সকাল আটটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে যেতো আজ সেখানে উঠলোই আটটায়। স্নান-টান সেরে একেবারে তৈরি হয়ে নিয়ে সে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো। গঙ্গাধরম সুপ্রভাত জানিয়ে পরিচ্ছন্ন হেসে জিজ্ঞেস করলো, আজকে কী খাবেন স্যার?

যা দেবে।

তবে মহীশূর মসলা ধোসা খান।

তাই দাও। তবে দুপুরে খাবার কোনও আয়োজন রেখো না। আমার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রয়েছে।

অমিতাভ যখন মহীশূর মসলা ধোসাকে প্রায় শেষ করে এনেছে সেই সময় গঙ্গাধরম আর একবার ওর টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হলো। আপন সুরে বললো, এই খাবারটা আমার মা চমৎকার তৈরি করেন। মা ভেবেছিলেন আপনি সেদিন আমাদের ওখানে থাকবেন। আপনি চলে আসার পর তাই বারবার দুঃখ করছিলেন, থাকবে না-জানলে ছেলেটাকে আমি আজকেই ওটা বানিয়ে দিতাম। গঙ্গাধরম আরও নিচু গলায় বললো, সেই কারণেই স্যার আজকে হঠাৎ ইচ্ছে হলো আপনাকে মহীশূর মসলা ধোসা খাওয়াতে। আবার করে সুযোগ পাবো-না পাবো তা কে বলতে পারে বলুন?

অমিতাভ চমকে ওর মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। যদিও লুকানোর কোনও ব্যাপার নেই তবুও সে এই মুহূর্তে কিছু ভাঙলো না। শুধু বললো, তুমি খুব একটা ভুল বলোনি গঙ্গাধরম। এমনটা হতেই পারে।

অফিসে পৌঁছে অমিতাভর মনে হলো সে বুঝি গতকালের দিনটাতেই ফিরে গেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে মানুষের সেই একই জমায়েতের ছবি। তবে গতকালের চেয়ে আজকের দৃশ্যটা অন্যরকম। কর্মচারীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে। নিজেদের মধ্যে কেউ কথাবার্তা বলছেন না। প্রত্যেকেই মাটিতে বসে আছেন বেশ ঘন হয়ে। এক নজরে মনে হওয়া স্বাভাবিক এটা বুঝি কোনও মৌন সমাবেশ! নাকি মৌন প্রতিবাদ? অমিতাভ বিল্ডিং-এর সিংহ-দরজা দিয়ে এগিয়ে গেল। ওকে কেউ বাধা দিল না। ওর দিকে আগুনের হলকা নিয়ে কেউ ফিরেও তাকালো না।

অমিতাভ যখন মিঃ নামবিয়ারের ঘরে ঢুকতে যাবে সেই মুহূর্তে তোশিবা জেকব নাভিকুণ্ডে ঢেউ তুলে তার ঘর থেকে ছুটে এলো। ছুটে না-এসে বরং আছড়ে পড়লো বলাই ভালো। সে তখন রীতিমতো অসন্তুষ্ট। বিরক্তিতে দুই ভুরু ধনুকের মতো কপালের ওপর উঠে গেছে। তোশিবা জেকব সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো, আপনি করছিলেন কী?

কী করছিলাম? অমিতাভ উল্টে ওকেই প্রশ্ন করলো।

এই ভাবে এম. ডি-র ঘরে ঢোকাটা শোভনীয় নয়। আমার কাছে আপনার একবার আসা উচিত ছিল।

ছাড়পত্র নিতে?

সেটা আপনি যা খুশি মানে করতে পারেন। তবে এটা তো ঠিক, পারমিশন না-নিয়ে আপনি ওঁর ঘরে ঢুকতে পারেন না!

আমি অনেক কিছুই পারি মিসেস জেকব—সেটা আবার আপনিও জানেন না। তোশিবাকে বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যে রেখে অমিতাভ ঝকঝকে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

মিঃ নামবিয়ার মিটিং করছিলেন। ঘরে তখন রামাকৃষ্ণাণ, পিল্লাই এবং ফিলিপস। প্রত্যেকের চোখে-মুখেই একটা চাপা দুশ্চিন্তার ছাপ। গোপন শলা-পরামর্শ থামিয়ে দিয়ে ওঁরা চারজনই খুব বিরক্ত হয়ে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিঃ নামবিয়ার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অমিতাভ ওর রিজাইন লেটারটা টেবিলের ওপর এগিয়ে দিল।

হ্যাঁ, মিঃ নামবিয়ার প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। আসলে অমিতাভ চাকরিতে রইলো কী গেল তাতে

ওঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্য। অমিতাভকে রাখার জন্য ওদের বিরাট একটা ইন্টারেস্ট রয়েছে। সেই কারণেই মিঃ নামবিয়ার বললেন, তুমি এটা ঠিক করলে না।

আমি নিঃসন্দেহে ঠিক কাজই করেছি। অমিতাভর গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর।

তুমি অকৃতজ্ঞ! রাগে-অপমানে মিঃ নামবিয়ার কাঁপছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি ছেলেটা রিজাইন করে তাঁকে এই ভাবে পথে বসিয়েও আবার অমন করে কথা শোনাবে! তবে তাঁর বোধহয় আরও কঠিন কথা শোনার বাকি ছিল। অমিতাভ সকলের মুখের দিকে একে একে তাকিয়ে পরে ব্যঙ্গের সুরে উত্তর দিল, অকৃতজ্ঞরা আমাকে তেমনটা ভাবতেই পারেন।

চারজনই ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন। দুঃসাহসের কোন পর্যায়ে গেলে মানুষ ওই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারে তাঁরা সেটাই নিজেদের মনে পরখ করে নিচ্ছিলেন। এর পেছনেও কী পদ্মিনী উষার কোনও শক্তি নেই? মেয়েটা নিশ্চয়ই কোনও বৃহৎ উদ্দেশে অমিতাভকে দিয়ে এই চালটা দিয়েছে। মিঃ নামবিয়ার হাজারো প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না অমিতাভ কেন পদ্মিনীর ফাঁদে পা দিল? আর এক বছর ধরে বেকার থাকা ছেলেটা মুখের ওপর কতো অনায়াসেই-না ওই সাংঘাতিক কথাটা বলে ফেললো! কষ্টটা বেশি হচ্ছে অন্য কারণে। এই ধরনের বেয়াদপ ছেলের গালে যে-ওজনের একটা চড় মারা উচিত মিঃ নামবিয়ার তেমনটা করতে পারেছেন না-বলে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, আমাকে অকৃতজ্ঞ বলছো ঠিক আছে। কিন্তু সামান্য একজন কর্মচারীকে হোটেলে রাজকীয় ভাবে থাকার যে সুযোগ-সুবিধা কোম্পানি দিয়েছে তার মুখে ওই শব্দটা বড়োই বেমানান।

হোটেলে থাকাটা কি আমার নিজের ইচ্ছেয়? অমিতাভ একটু চড়া মেজাজে উঠবার মুখেই জেমসদার কথাগুলো মনে পড়ে গেল। কোনওরকম তর্কে নিজেকে জড়াবে না এবং বিদায়কালে উদাব থাকাই ভালো। অমিতাভ চমৎকার ভাবে বিদ্রোহের রাশটুকুর ওপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে মিঃ নামবিয়ারকে করুণা দেখালো, আপনি যে আপনার কথা রাখবেন না তা আমি জানতাম। সুতরাং বোকা লোকেরাই শুধু আপনার ওপর ভরসা করে থাকবে। কথাটা শেষ করে অমিতাভ আর এক সেকেন্ড দাঁড়ালো না। ঠিক যে-ভাবে ঢুকেছিলে তার চেয়েও ঝড়ের গতি নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অফিস ছেড়ে বেরুবার মুখে অমিতাভ বারবার চারদিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু যে-আশা নিয়ে চোখ দুটো খুঁজছিল তাদের কাউকেই নজরে এলো না। পদ্মিনী উষা, শশীকান্ত অথবা রাজন কেউ নেই। কমিটির অন্যান্য মেম্বারদেরও দেখা গেল না। অমিতাভ শেষবারের মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর ওপর চোখের ছায়া রেখে আস্তে আস্তে আম্বালামেড়ুর বাস স্টপেজের দিকে পা বাড়ালো।

এখন বেলা পৌনে-বারোটা। রাস্তার চারপাশে গনগনে রোদের খেলা। তবে হাঁটতে তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না। কোচিনের সবুজ ছায়া মাথায় যেন ছাতা ধরে আছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই একঝলক শীতল বাতাস এসে শরীরকে জুড়িয়ে দিচ্ছিলো। অমিতাভ একটা সিগারেট ধরালো। কবিতা সিনেমা হলটা এখন তার চোখের সামনে। তার মানে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরতে হবে।

এই হলো জেমসদা। এই ভাবেও নিজের বাড়ি চিনিয়ে দেওয়া যায়। অমিতাভ একপলক সাদা বাড়িটায় চোখ বুলিয়ে নারকেল গাছের মাথায় আটকানো ঘুড়ি দু'খানার দিকেই তাকিয়ে রইলো। অর্থাৎ এটাই আসল ব্যাপার। সুতরাং অনেকক্ষণ ধরে দেখা আছে।

পেছন থেকে গাড়ির হর্নের আওয়াজ কানে যেতে অমিতাভ সরে দাঁড়ালো। একজন সুন্দরী

মহিলাকে পাশে নিয়ে একটি ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল। সে মালায়লম ভাষায় মুখ-টুখ বিকৃত করে কী যেন বলতে বলতে চলে গেল। অমিতাভ এতোটুকু রাগ করলো না। দোষ তো তার নিজেরই। মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুড়ি দেখছে। ড্রাইভার গালাগাল করবে না তো কী? কিন্তু খিস্তিটা কী হতে পারে? বিশ্বের সব ড্রাইভারদের ভাষা এক এবং পাশে যতো সুন্দরী মহিলাই থাকুক না কেন মুখ থেকে অতি সহজে যেটা বেরিয়ে আসে তা হলো, শুয়োরের বাচ্চা! ওটাকে আবার হিন্দিতে বলা চাই, শুয়ার কী বাচ্চে। কলকাতার বাঙালি ড্রাইভাররা ওতেই নাকি বেশি জোর পায়। এই ছেলেটিও মালয়লম ভাষায় না-বলে হিন্দিতে বললে পারতো। অনুমানের ওপর নির্ভর না-করে অমিতাভ তাহলে বুঝতে পারতো সঠিক তাকে কোন কথাটা বলা হলো।

জেমস গনসালভেস বাড়িতেই ছিলেন। অমিতাভকে দেখে তিনিই হইহই করে উঠলেন। এবং সেই ব্যাপারটা এতো জোরে হয়েছিল যে ভেতর থেকে একজন বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মহিলা হঠাৎ কী হলো ভেবে প্রায় দৌড়েই এলেন। ছুটে এলো বছর চোদ্দ এবং বছর আটেকের দুটি মেয়েও। জেমস অমিতাভর সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই যে হাসিখুশি মহিলাটিকে দেখছো ইনি অবশ্যই আমার স্ত্রী। দেখতে যেমন পুতুল পুতুল, নামও তাই-ই। অমিতাভ হাত জোড় করে নমস্কার করলো। জেমসদা যেমনই কালো তাঁর স্ত্রী ততোটাই ফর্সা। সেই কারণেই তিনি ওই রসিকতা করলেন। আর এই দুটো হলো—জেমস মেয়েদের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে হাসলেন, আমার দুই গার্জেন। তারপরেই তিনি মেয়েদেরকে সস্নেহে নির্দেশ দিলেন, আঙ্কেলকে নমস্কার করো। মেয়ে দুটো অবশ্য তার আগেই ভদ্রতার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুতুল কফি, কেক এবং কাজুবাদামের প্লেট সাজিয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে উপস্থিত হলো। জেমস এবং অমিতাভ গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। পুতুল একমুখ হাসি নিয়ে অমিতাভকে বললো, এটুকু খেয়ে নিন ভাই।

এক্ষুণিই তো ভাত খাবো। কী দরকার ছিল এ-সবের?

দরকার আছে। মৃদু হেসে পুতুল স্বামীর দিকে একপলক তাকিয়েই অমিতাভর মুখের ওপর সস্নেহ এক দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—একটা উনপঞ্চাশের আগে কোনওরকমেই ভাত পাওয়া যাবে না। তখন কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে বলতে পারবেন না—

হ্যাঁ, একটা আটচল্লিশে খেতে চাইলেও হবে না। জেমস পুতুলের কথার সমর্থন জানিয়ে জোরকদমে হাসতে লাগলেন।

এ-সব আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের ব্যাপারটা কী বলুন তো? অমিতাভর হাসিটা সম্পূর্ণ না-বোঝার।

ব্যাপারটা কী ওকে বলা যাবে? জেমস পুতুলকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার তো মনে হয় না বলাই ভালো। রহস্যের হাসি নিয়ে পুতুল উত্তর দিল, অন্তত খাওয়ার আগে তো নয়ই।

পুতুল যখন বলেছে, আর বলা যাবে না। শেষ বিধান দিলেন জেমস। আমার সেই সাহস নেই অমিতাভ।

আপনাদের কাউকেই কিছু বলতে হবে না এখন। আমিও এতো বাধা-নিষেধের মধ্যে শুনতে চাই না। অমিতাভ ছোট্ট ছেলের সরলতা নিয়ে কাজুবাদামের প্লেটটা টেনে নিল। একটা উনপঞ্চাশের আগে ভাত যখন পাবো না তখন এগুলোর ওপরেই ভরসা করা যাক।

পুতুল ড্রইংরুম ছেড়ে চলে গেল রান্নার তদারকি করতে। কফি, কাজু এবং কেক খেতে খেতে অমিতাভ জেমসদার কাছ থেকে যেটুকু জানতে পারলো তা হলো এই ঃ উনি গতকাল রাতেই সুন্দরম সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। সুন্দরম সাহেব পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন অমিতাভ যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব মাদ্রাজে গিয়ে যেন পৌঁছায়। মাদ্রাজ অফিসেই সে বসবে। সরোজা ট্রান্সপোর্টের

সরোজারও এটাই ইচ্ছে। আর হ্যাঁ, সুন্দরম সাহেব খোলাখুলি অন্য যে-কথাটা জানাতে ভোলেননি তা হলো, অমিতাভকে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের ডেজিগনেশন দেওয়া হবে। মাসিক দক্ষিণা সাতাশশো পনেরো টাকা। উজাড় করে দেবার ইচ্ছে থাকলেও সুন্দরম সাহেবকে অফিসের নিয়ম-কানুন মেনে চলতেই হবে। এই কষ্টটুকু যেন অমিতাভ মেনে নেয়।

গভীর কৃতজ্ঞতায় অমিতাভর চোখে জল আসছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। যা পেয়েছে এর মূল্য তার কাছে অপরিসীম। কোথা থেকে কোথায় তাকে সুন্দরম সাহেব তুলে দিলেন অথচ কী বিনয়েই না জানালেন, এটুকু কষ্ট যেন সে মানিয়ে নেয়।

গল্পে গল্পে সময় বাড়ছিল। ঘড়ি দেখার প্রয়োজন ছিল না। তাই ওই বস্তুটির ওপর কেউ নজর দেয়নি। কেউ বলতে অমিতাভ এবং জেমস। ইতিমধ্যে মেয়ে দুজন এসে জেমসকে আদর করে ঘিরে ধরলো। অমিতাভকে বললো, আঙ্কল, ভেতরে চলো। এখন বাবার জন্মদিন পালন করবো।

অমিতাভ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জেমস গনসালভেসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খুবই আস্তে বললো, জেমসদা, আমাকে তো এটা আগেই জানাতে পারতেন! আমার অবশ্য আগেই একবার সন্দেহ হয়েছিল আপনার পরনে নতুন লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি দেখে কিন্তু ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত জন্মদিনে গড়াবে এটা বুঝতে পারিনি।

কাঁটায় কাঁটায় একটা উনপঞ্চাশে পুতুল দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামীর জন্মদিনের মুহূর্তটাকে মুখরিত করে তুললো। জেমস একটা শিশুর মতো মোমবাতিগুলোকে ফুঁ দিয়ে একে একে নিভিয়ে দিয়ে মহানন্দে কেক কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাচ্চাদের বললেন, জোরে হাততালি দাও। মেয়েরা বাবার কথা শুনলো। জেমস আড়চোখে একবার অমিতাভর দিকে তাকালেন। ছোট্ট সুরে অভিযোগ করলেন, তুমি হাততালি দিচ্ছো না কেন? বড়ো হয়ে গেছো বুঝি? বলেই উচ্চগ্রামে হাসতে লাগলেন। বিব্রত অমিতাভ জোরে জোরে হাততালি দিয়ে ত্রুটি শুধরে নিল।

খেতে বসে একটা অভিনব ব্যাপার দেখে অমিতাভ কৌতুক অনুভব করলো। মাছ, মাংস, ভাজা এবং সব্জির বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও জেমসদার ডিশের কাছে এক প্লেট স্পেশাল করলাভাজা ও ডিমের কারি। ওই দুটো জিনিস নিয়ে অমিতাভ একটু নাড়া দিতেই পুতুল হেসে ফেললো, বলা যাবে না।

কেন বলা যাবে না? জেমস মুখ খুললেন, যতোই খাবার-দাবাব থাক না কেন—করলাভাজা আর ডিম না-দেখলে আমি সারা বাড়ি মাথায় করে চিৎকার করবো। ওই ব্যাপারে আমার কাছে কারো ক্ষমা নেই। জেমস এবারে হাসতে লাগলেন, কেরালার মানুষ বলেই যে করলাভাজা ভালোবাসি এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে ডিম আর করলা আমার প্রাণ!

তাহলে শুনবেন ওঁর কথা? পুতুল অমিতাভর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই স্বামীর মুখখানা লক্ষ্য করলো। আমাদের রান্নার জন্য যে-মেয়েটি আগে ছিল সে ভুল করে একদিন করলাভাজা দেয়নি। আপনার জেমসদার সে কী রাগ! মেয়েটাকে বিদায় করে তবে ওঁকে ঠান্ডা করতে হলো। আর একটা ব্যাপার শুনবেন? করলাভাজা খেয়ে একজনের দিন মজুরি আঠারো টাকা থেকে বাড়িয়ে কুড়ি টাকা করে দিয়েছিল। মুখে অবশ্য বলেছিল ছেলেটা খুব কাজের। এখন আপনিই বলুন এই মানুষের সামনে এমন এক শুভদিনে করলাভাজা এবং ডিম না-রেখে উপায় আছে? শেষে আমাকে বাপের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসুক আর কি—পুতুল খুশির হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে তুললো।

সন্ধ্যা সওয়া-ছটা নাগাদ অমিতাভ হোটেল বালসাম্মাতে ফিরে আসতেই গঙ্গাধরম ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো। আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন স্যার? যদিও দুপুরে খাবেন না বলে গেছেন কিন্তু

এতোটা সময় পর্যন্ত—

কি হয়েছে কী?

পদ্মিনী ঊষা দু'বার আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলেন এখানে। একবার তো শশীকান্তভাই এবং রাজন নিজেরাই এসেছিল।

কিছু বলে গেছেন ওঁরা?

না। শুধু জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি কখন ফিরতে পারেন? বলেছি—আপনি সেটা আমাদের জানিয়ে যাননি। কাজেই বলা সম্ভব নয়।

মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে অমিতাভ স্নানে ঢুকলো। যদিও সকালে একবার স্নান করেছে কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তি দূর করার জন্য আর একবার স্নানটা খুবই জরুরি। এটা ঠিক কলকাতার মতো ভ্যাপসা গরম এখানে নেই এবং রাতেও একটা চাদর গায়ে জড়াতে হয়—তবুও সন্ধ্যার এই স্নানটা শরীরকে বেশ ঝরঝরে করে দেয়।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরে অমিতাভ চুল আঁচড়িয়ে নিল। বাড়িতে একটা চিঠি লিখবে কিনা ভাবছিল। তার অবশ্য দরকার নেই কাল পরশুর মধ্যেই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে মাদ্রাজে চলে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছেই বাড়িতে চিঠি দেবে। হ্যাঁ, আর একটা চিঠিও লিখতে হবে। সেটা রাখালকাকাকে। মিঃ নামবিয়ারকে ধরে চাকরিটা তো তিনিই করে দিয়েছিলেন। জীবনে সামান্য একটু উপকারও যিনি করেছেন অমিতাভ তাঁদেরকে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না।

অমিতাভ হাতে এখন কোনও কাজ নেই। সিগারেটের প্যাকেটও ভর্তি, সুতরাং বাইরে যাবার প্রশ্ন নেই। সে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। মালয়লম ভাষায় ছাপা, তাই পড়ার চেষ্টা করা বৃথা। সে ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

ভেতরে আসবো? দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পদ্মিনী ঊষা পারমিশন চাইলো।

অমিতাভ প্রথমে শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বারের ডাকে সে দরজার দিকে তাকিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পদ্মিনীর কাছে। এই মেয়েটির সঙ্গে সে কলকাতা থেকে এই কোচিন পর্যন্ত এসেছে অথচ একটাও কথা হয়নি। সেদিন ওর ওপর অদৃশ্য এক অভিমান জমা হয়েছিল। আজ কিন্তু সহজেই সে-কথা ভুলে গেল অমিতাভ। যাবার সময়ে দুঃখ রেখে কি লাভ?

ভেতরে আসতে বলবেন না? পদ্মিনী খুব নিচু গলায় জানতে চাইলো।

নিশ্চয়ই আসবেন। অমিতাভর উচ্ছ্বাস এবং আবেগ কোনওটাই নেই। আছে নিদারুণ এক ভদ্রতা।

ঘরের মধ্যে তখন নিঃশব্দের প্রহর। নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দকেও সমুদ্রের গর্জন বলে মনে হয়। অমিতাভ মাথা নিচু করে বিছানার ওপরে বসে আছে। পদ্মিনী মুখোমুখি একটা চেয়ারে। দুজনেই হয়তো ভাবছে অপর পক্ষ আগে কথা বলুক। তবে অমিতাভ নিঃসন্দেহ এই মুহূর্তে আগে বলার দায়িত্বটা পদ্মিনীই নেবে। সে চোখ তুলে তাকাতেই দেখলো পদ্মিনী ঊষা ওরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অমিতাভ দৃষ্টি সরিয়ে নিল না।

আপনি রিজাইন দিতে গেলেন কেন? অমিতাভ চুপ করে রয়েছে দেখে পদ্মিনী সামান্য একটু অধৈর্যের সুরে বলে উঠলো, আপনাকে তাড়ানো কি আমাদের উদ্দেশ্য ছিল? সেই ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারছেন তখন এই ভাবে চাকরি হারানোর কি অর্থ? জিনিসটা যা চলছিল তাতে আপনার খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ফেসটা তো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরাই করছিলাম। আপনি যাতে অসুবিধায় না-পড়েন ইউনিয়ন কি সেটা দেখেনি? অন্য কে কী ভাবছে জানি না—আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ইউনিয়নের প্রতি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা নিয়ে যাচ্ছেন না!

যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়ে যাচ্ছি।

তাহলে এই কাজটা করলেন কেন? আমরা আপনার এমন বিরোধী নই যে এই ব্যাপারে আমাদের খুশির কোনও কারণ থাকতে পারে। আমরা চাইছিলাম আপনাকে সামনে রেখে রাজনের ব্যাপারটার

ফয়সলা করে নিতে। রাজনের কেসটা সলভ হবেই। মধ্যে থেকে আপনাকেই আমরা হারালাম। আপনি থাকলে ইউনিয়নের মেম্বার তো হতেনই!

নিশ্চয়ই। অমিতাভ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, সংগঠন ছাড়া একা একা কি বাঁচা যায়? তারপরেই সে অন্য এক সুরে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, আসলে আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মিঃ নামবিয়ারের ওপর বীতশ্রদ্ধও বলতে পারেন। আমি যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ওঁরা আমাকে প্রাণহীন কাকতাড়ুয়ার মতো ব্যবহার করছেন সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশে, তখন আমার যে প্রাণ রয়েছে, প্রতিবাদ রয়েছে সেটা বোঝানো বড়োবেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রিজাইন দিয়েছি অন্যায় করিনি বলে। আপনাদের কারো মনেও যদি কোনওরকম সন্দেহ থেকে থাকে আমি হাত মিলিয়ে এখানে এসেছি—সেটাও দূর হলো। একটু সময় চুপ করে থেকে অমিতাভ বললো, তবে আমি একটা চাকরিও পেয়ে গেছি।

কোথায়? এই প্রশ্নটা করা অহেতুক কৌতূহল এবং অশোভনীয় হতে পারে ভেবে পদ্মিনী কোনওরকম জিজ্ঞাসা না-করে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো। পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে অমিতাভও ওর সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে সুন্দরম সাহেব, জেমস গনসালভেস এবং সরোজা ট্রান্সপোর্টের কথা একে একে বলে যেতে লাগলো। মাদ্রাজ অফিসে নিজের ডেজিগনেশন এবং স্যালারির কথাও বাদ দিল না।

কবে যাচ্ছেন?

আগামীকাল বিকেলের ট্রেনে যাবো বলে ঠিক করেছি।

পদ্মিনী এবং অমিতাভ দুজনেই এর পরে কোনওরকম কথারই সূত্র ধরতে পারলো না। ফলে নিস্তব্ধতার পাথরটা দুজনকে আলাদা করে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। অমিতাভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কফি দিতে বলি?

না, থাক।

এক কাপ কফি খেতে এতো আপত্তি কিসের? বেল টিপে গঙ্গাধরমকে ডেকে অমিতাভ দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে নিচু সুরে আর একটা কথাও বললো, কিছু খাবারও এনো! শেষের কথাটা পদ্মিনীর কান এড়ালো না। সে তাই সোজাসুজিই বললো, আমার জন্য কিন্তু শুধু কফি।

গঙ্গাধরম চলে যাওয়ার পর আবার সেই নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা হতে হলো ওদের। শূন্যতা বুঝি দুজনকে এক মহাশূন্যে পৌঁছে দেবে। এই ভাবে কতোক্ষণ ভেসে থাকা যায়? অমিতাভ আস্তে আস্তে বললো, রাজনের ব্যাপারটা আশা করি এবারে মিটে যাবে।

ওটা ছিল ম্যানেজমেন্টের খামখেয়ালিপনা। মিটবে না মানে? পদ্মিনী একটু ভেবে নিয়ে পরে আরও বললো, তবে আপনি রিজাইন না-দিলেও ওটা কোনও সমস্যা ছিল না। ওঁরা সুষ্ঠু ভাবে কোনও জিনিসের মীমাংসা চান না। জল ঘোলা করবেনই। এই দেখুন না—সব কর্মচারীদের নিয়ে পরপর দু'দিন চাপ সৃষ্টি করতেই আঘাত সামলাবার জন্য ওঁরা প্রথমেই পুলিশ-টুলিশ ডেকে এনে আমাদের আটজনকে অ্যারেস্ট করালেন। কিন্তু হলোটা কি? থানা তো দূরের কথা—গেটের বাইরে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলো না। এ-সব ওঁরা করবেনই। যাই হোক, ম্যানেজমেন্ট শেষে আলোচনায় ডাকলেন। কথায় কথায় যখন বললাম গত দু'বছরের ব্যালান্সশীট এবং এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যে কোম্পানি যে—অ্যাডভ্যান্স ট্যাক্স দিয়েছে তার অ্যামাউন্টটা কতো সেটা জানান। শুধু তাই নয়, ওই অ্যাডভ্যান্স ট্যাক্সের যে-টাকাটা কোম্পানি পরে ফেরত পায় সেই অঙ্কটাই-বা রহস্যজনক ভাবে কোথায় উধাও হয় সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার মিঃ পিল্লাই থতমত খেয়ে একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ-সব প্রশ্ন এই আলোচনায় কি করে আসে? শেষ পর্যন্ত নীট রেজাল্ট দাঁড়ালো ওঁরা আর আমাদের মুম্বাইয়ের বোর্ড মিটিং দেখাচ্ছেন না। রাজনের কেসটা আগামী সোমবারের মধ্যে মিটে যাবে বলে আশা করা যায়। ওই সময়েই জানতে পারলাম কোম্পানি ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন। যেটা আমরা কেউই চাইনি। শেষের কথাটা বলতে বলতে

পদ্মিনী আবার অমিতাভর চোখের দিকে তাকালো।

আমি তো বেটার চান্স পেয়েই যাচ্ছি। অমিতাভ একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

সেটা ঠিক। তবুও আমরা বুঝি একটু অপরাধী থেকে গেলাম।

এটা কেন ভাবছেন? আপনাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে তো আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং আপনাদের ভূমিকার প্রশংসাই করবো।

গঙ্গাধরম কফি দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট ছোট্ট দুটো চুমুক বসিয়ে পদ্মিনী যেন এবারে একটু সিরিয়াস হলো। সে তার গাম্ভীর্যের ভেলায় বসে আসল কথা শুরু করলো, আপনার ব্যাপারটা জানার পরেই ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং বসে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। প্রথমত আপনি ইউনিয়নের মেম্বার নন, দ্বিতীয়ত রিজাইন দিয়ে যে কেউই চলে যেতে পারে তাতে বাধা-নিষেধের কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু আপনার কেসটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। জরুরি মিটিংটা সেই কারণেই। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে উইথড্র করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হবে।

এই অনুরোধের জন্য আপনাদের সংগঠনের সমস্ত এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার আর ফেরার উপায় নেই। মাদ্রাজের ব্যাপারটা তো রয়েছেই তাছাড়া—অমিতাভ আস্তে আস্তে মিঃ নামবিয়ারের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটির পুরো ছবিটা তুলে ধরে আবেদনের সুরে জিজ্ঞেস করলো, এর পরে কি এখানে থাকা সম্ভব?

পদ্মিনী কোনও উত্তর দিতে পারলো না। তবে কি যেন ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো অমিতাভর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনও অধিকার নেই। এরপর অন্য প্রসঙ্গের কথা টেনে আলোচনার অর্থই হলো জোর করে কাছে থাকার চেষ্টা। পদ্মিনী নিস্তেজ গলায় বললো, আমি তাহলে উঠি!

যাবেন? অমিতাভ আন্তরিকতা দেখিয়ে বললো, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা ত্রিপুনীথুরার মোড়ে এসে দাঁড়ালো। অমিতাভ আর পদ্মিনী পাশাপাশি অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো। অমিতাভ এক সময় জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় কে আছে আপনার?

প্রশ্নটা শুনে চোখ তুলে অমিতাভকে দেখে নিল পদ্মিনী। এখন মনে হচ্ছে, কলকাতা থেকে এতোটা পথ দুজনে একসঙ্গে আসা সত্ত্বেও একটাও কথা হয়নি—এটা আর যাই হোক, সহযাত্রীসুলভ মনোভাব কিছুতেই নয়। কিন্তু দোষটা কার? অমিতাভর না তার নিজের? পদ্মিনী কোমল গলায় উত্তর দিল, ওখানে আমার দাদা রয়েছেন।

কোথায় বলুন তো?

সাউথে লেক কালীবাড়ি আছে না—তার ঠিক আগেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে।

অমিতাভ সামান্য হেসে বললো, আমাদের বাড়ি থেকে তো তাহলে পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ।

তাই! পদ্মিনীর দুই ঠোঁটে হাসির ক্ষীণ এক রেখা।

কথা বলতে বলতে ওরা চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পদ্মিনীকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলো, এখানে দাঁড়ালেন যে?

এই তো আমাদের বাড়ি!

ও। অমিতাভ দেখলো ত্রিপুনীথুরা থেকে এখানে আসতে তাদের সময় লাগলো মাত্র চার মিনিট। পদ্মিনীদের বাড়ি যে কাছাকাছি হবে সেটা সে ধারণা করেছিল ওকে এবং ওর মাকে ত্রিপুনীথুরাতে কেনাকাটা করতে দেখে। যাই হোক, অমিতাভ এবারে বিদায় চাইলো, আসছি আমি—

না-বললে বুঝি বাড়িতে ঢুকবেন না?

পদ্মিনীর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ ভাবতে লাগলো, ট্রেনে ওকে দেখেছিল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মহিলা হিসেবে; অফিসে সংগঠনের জবরদস্ত বুদ্ধিদীপ্ত সেক্রেটারি আর এই মুহূর্তে সে পুরোপুরিই একজন মেয়ে। এবং এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো পরিচয়। কিন্তু মানুষের লোভ

জিনিসটা সাঙ্ঘাতিক। অল্প পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় সামনে না-জানি আরও কতো রত্নভান্ডার লুকিয়ে আছে! অমিতাভকে এক ছেলেমানুষি খেলায় পেয়ে বসলো। পদ্মিনীদের বাড়িতে যাবার আকাঙ্ক্ষাকে সে আড়াল করে রেখে নিচু সুরে বললো, আপনার অসুবিধে হতে পারে! কী দরকার!

আবারও সেই এককথা! পদ্মিনী একটু ফণা তুললো। সেদিন তাহলে মাকে কথা দিয়েছিলেন কেন, নিশ্চয়ই আসবো?

আমি আমার কথা রাখাটাকে পবিত্র কাজ বলেই মনে করি। কালকে যাবার আগে একবার নিশ্চয়ই আসবো। চুরি করে ধরা পড়ে যাওয়া শিশুর হাসি নিয়ে অমিতাভ অন্যদিকে মুখ লুকালো।

আমার কথায় যেতে আপত্তি, তাই না? পদ্মিনী এখন দারুণ শান্ত। কোনওরকম উচ্ছ্বাস বা আবেগ তার কথায় প্রকাশ পেল না। যেটা পেল তা হলো সূক্ষ্ম এক অভিমান।

অনসূয়া ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো গেটের কাছে পদ্মিনী এবং অমিতাভ দাঁড়িয়ে। ওরা ওখানে কি করছে? বাড়িতে ঢুকছে না কেন? প্রশ্নগুলো আঁকে তাড়া করে একেবারে গেটের কাছে নিয়ে গেল। অনসূয়া স্নেহের সুরে ডাক দিলেন, ভেতরে আসবে না? পদ্মিনী বড়ো বড়ো চোখ করে অমিতাভর দিকে তাকালো! অমিতাভ প্রথমে অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে পরে পদ্মিনীর ঘন পালকে ঘেরা চোখ দুটোর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিরুচ্চার এক অধ্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে গভীর সুরে বললো, সেই জন্যই তো এলাম!

দারুণ ভাবে সাজানো ড্রইংরুমে বসে ওরা গল্প করছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ভূমিকা থেকে শুরু করে কলকাতার সব ভালোর মধ্যে টিউমারের মতো যানবাহন সমস্যা ও ট্রাফিক জ্যামে গোলকধাঁধা সহ্যের বাইরে— এ-আলোচনাও বাদ গেল না। পদ্মিনী হাসতে হাসতে বললো, আমার মা বাঙালি বলে বলছি না— সত্যিই বাঙালিদের অসীম ধৈর্য এবং রসবোধ। কলকাতার উপচে পড়া ভিড় বাসে আমি বেশ কয়েকবার উঠেছি। অতো কষ্ট করে বাসের মধ্যে মানুষগুলো মাথার ঘাম ফেলতে ফেলতেও কি চমৎকার নানা ধরনের গল্প করে চলেছেন। কেউ হয়তো পুরো গল্পটা শোনেননি। সেই স্টপেজ থেকেই উঠেছেন। অথচ দারুণ একটা টিপ্পনী কেটে বাসের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিলেন। ওই দমবন্ধ হওয়া কষ্টের মধ্যেও এমনি ভাবে আনন্দ পাওয়া সত্যিই ভাবা যায় না!

ওই সময়ে ঘরে যিনি ঢুকলেন অমিতাভর কাছে মুখটা পরিচিত মনে হলো। হ্যাঁ, ভদ্রলোককে এর্নাকুলাম স্টেশনে দেখেছিল। পদ্মিনীকে আনতে গাড়ি নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন। পদ্মিনী পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বাবা। অমিতাভর সম্পর্কেও সে দু-চার কথা তুলে ধরলো। রমন কোম্পানি থেকে রিজাইন দেওয়ার বিষয়টাও বাদ গেল না। অমিতাভ প্রণাম করতেই জগন্নাথ উষা সামান্য একটু হাসলেন। মেয়ের দিকে একপলক তাকিয়েই অমিতাভকে সমান হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কাজে যোগ দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছাড়লে কি ব্যাপার? ইউনিয়নের মেম্বার-টেম্বার হওনি বুঝি?

অমিতাভ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই পদ্মিনী তার বাবাকে শাসন করলো, তুমি এমনটা বলতে পারো না। ইউনিয়ন কাউকেই মেম্বার হবার জন্য চাপ দেয় না।

তা দেয় না। তবে মা, তুমি যা একখানা ইউনিয়ন আমার কোম্পানিতে তৈরি করে এসেছো আমি দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। জগন্নাথ উষা মেয়ের মাথায় স্নেহ মাখানো হাতখানা বুলিয়ে বললেন, আমার ওখানে দেখেছিলাম তো আজ সকালে যে-ছেলেটি কাজে যোগ দিল বিকেলের মধ্যেই ইউনিয়নের মেম্বার হয়ে দেওয়ালে পোস্টার মারছে।

পদ্মিনী মুখ খোলার আগেই অনসূয়া স্বামী এবং মেয়ে দুজনকেই অর্ডার দিলেন, অমিতাভ আজ আমাদের বিশেষ অতিথি। ও নিশ্চয়ই এ-সব কচকচি শুনতে আসেনি—তোমরা অন্য গল্প করো।

ক্রমশ দিয়ে ব্যাপারটা এখানেই শেষ করা যাক, কি বলিস পদ্মিনী? জগন্নাথ উষা মেয়ের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে খেদের সুরে বললেন, আসলে কি জানিস মা, ইউনিয়ন নেতাদেরও একটা বিবেচনা বোধ থাকা দরকার। ওরা দাবি জানিয়েছে সর্বনিম্ন বেতন দেড় হাজার টাকা করতে

হবে। আমার এই ছোট কোম্পানিতে কি সেটা সম্ভব? দেশের বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানি যা দিতে পারে না —

আবার আরম্ভ করলে তো? অনসূয়ার একটি ধমকেই জগন্নাথ শান্ত হলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাবা তাহলে আমাদের কেরালা ছেড়ে চলে যাচ্ছো? কথার এই জোড়াতালিতে ঘরের চারজন মানুষই প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখেব দিকে চেয়ে স্বর্গীয় এক হাসিতে নিজেদেরকেই অমলিন করে তুললেন।

এখন রাত প্রায় দুটো। অমিতাভর আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। কলকাতা থেকে এখানে এসে প্রথম দিন ঘুম হয়নি বাড়ির কথা চিন্তা করে। আজ সম্ভবত কোচিনে তার শেষ দিন। এখানকার পরিচিত মানুষদের কথা ভেবে অমিতাভর দু'চোখ থেকে ঘুম সরে গেছে অনেক দূরে। জেমসদার মতো সহৃদয় মানুষ কি সব সময়ে মেলে? আর পদ্মিনী? ওর দুই ভরাট চোখে নিরুচ্চার অভিব্যক্তি যা সহজেই মনকে উদার এবং উদাস করে দেয়। বিশেষ করে আজকে ওর ব্যবহার যেন সেই মনকে বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি থেকে অমিতাভ রাত পৌনে-ন'টা নাগাদ উঠবার চেষ্টা করতেই পদ্মিনী প্রথমে তার চোখে চোখ রাখলো। পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে মায়ের কানে মুখ রেখে কী যেন বলতেই অনসূয়া অবাক হলেন। উঠবে কী? এই রাতে না-খেয়ে কেউ ফিরে যায়? ওই একটি ধমকে অমিতাভ ঠান্ডা হয়ে যেতেই পদ্মিনীর চোখের তারায় রংমশালের আলো। তবে সে খুব চাপা। অহেতুক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পদ্মিনী কখনওই নিজেকে প্রকাশ করে না। ব্যাপারটা মিটে যেতেই সে স্বাভাবিক ছন্দে মায়ের সঙ্গে হাত লাগাতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো এই দৃশ্যটা অমিতাভর দুই চোখে আটকে রয়েছে। এই ছবি থেকেই অমিতাভ চমৎকার এক নির্যাস পেয়ে ঘুম থেকে ক্রমশ পিছু হটতে লাগলো। এমন রাতে না-ঘুমোলেই-বা কি এসে যায়? জেগে থাকলেও যে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না সেটা এই প্রথম অনুভব করা গেল।

কাল সকালের ফার্স্ট আওয়ারে প্রথম কাজটাই হবে হোটেলের বিল-টিল মিটিয়ে দেওয়া। ও-সব কাজ শেষের দিকে রাখতে নেই। হ্যাঁ, টাকা-পয়সা সব জেমসদাই দিয়েছেন। অমিতাভর সঙ্কোচ দেখে জেমস গনসালভেস বড়ো মপের একটা ধমক দিয়ে শর্তও জুড়ে দিয়েছিলেন, তোমার এতো লজ্জা পাবার কী আছে? তুমি কী ভিক্ষে নিচ্ছো নাকি? এটা হলো লোন। তবে হ্যাঁ—আগামী পনেরো বছরের মধ্যে এই লোনটা শোধ করতেই হবে।

পরদিন দুপুরে রমন ফার্টিলাইজার কোম্পানির কর্মচারীদের মিছিল বার হলো। গঙ্গাধরম বললো, স্যার, আজকে আপনি বিকেলের ট্রেনে চলে যাবেন কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের বিকেল ছ'টায় নেহরু স্টেডিয়ামে বিজয় উৎসব।

কিন্তু গঙ্গাধরম—অমিতাভ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মিছিলে এতো মহিলা, শিশু, এমনকী বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা পর্যন্ত রয়েছেন। এঁরাও কি কোম্পানিতে কাজ করেন?

আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, ওঁরা কাজ করেন না। গঙ্গাধরম সৌজন্য দেখিয়ে অল্প হেসে বললো, ওঁদের ছেলে, স্বামী, কারুর-বা বাবা কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই চাকরি করেন। অতোএব যতোটা সম্ভব সেই বাড়ির সকলেই বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে আনন্দ পেতে চায়—এটা এখানকার একটা রীতিও বলতে পারেন।

অমিতাভর ট্রেন বিকেল পাঁচটা দশে। কিন্তু মিছিলের জৌলুস দেখে সে চারটের আগেই বেরিয়ে পড়লো। পথে যদি কোথাও আটকে যায়—সুতরাং হাতে সময় নিয়ে বের হওয়াই ভালো। গঙ্গাধরম পায়ে পায়ে অমিতাভর সঙ্গে লেগে রয়েছে। সে নিজে ট্যাক্সি ডেকে এনে জিনিসগুলো তুলে দিল। অমিতাভ কোনও কিছু ফেলে যাচ্ছে কী না সে-চিন্তা তারই যেন বেশি। অতোএব দৌড়-ঝাঁপ সবই গঙ্গাধরমের।

আমি তাহলে আসি গঙ্গাধরম?

আসুন স্যার। ছলছল চোখে ছেলেটা তাকিয়েই রয়েছে।

তোমার মাকে বোলো পরে একদিন এসে তোমাদের বাড়িতে ঠিক থাকবো। আমি ওঁকে কথা দিয়েছিলাম, সেটা ভুলিনি। আর তখন অনেক তৃপ্তি নিয়ে তাঁর হাতের মহীশূর মসলা ধোসা খাবো।

আপনার কথা মাকে নিশ্চয়ই বলবো স্যার।

এর্নাকুলাম স্টেশনের উদ্দেশে অমিতাভ রওনা হয়ে যাবার পরেও আচ্ছন্নের মতো ওখানে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গাধরম। কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সেই হিসেব নিজেও রাখেনি। হঠাৎ পদ্মিনীর গলা শুনতে পেল, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেছেন?

হ্যাঁ,

কখন গেলেন?

তা তো জানি না—শুধু জানি স্যার চলে গেছেন।

মুহূর্ত আর অপেক্ষা করলো না পদ্মিনী। আম্বালামেডু থেকে যে-ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল ওই ট্যাক্সিতেই আবার রওনা দিল। বেশ কিছুটা ভালো ভাবে এগিয়েও ছিল কিন্তু এনমপুরমের মুখটাতে এসে সব কিছু অচল হয়ে গেল। বাস ট্যাক্সি, ভ্যান, ট্রাক, অটো, স্কুটার যাবতীয় গাড়ির ড্রাইভাররা স্টার্ট বন্ধ করে রাখলো। তিন রাস্তার জংশনে তখন মিছিল পৌঁছেছে। স্বতস্ফূর্ত ভাবে তারা তখন ঘনঘন নাড়া দিচ্ছে, এই বিরাট জয়ের উল্লাসে। এটা কোনও দেখানো ব্যাপার নয়। ভেতরের টান, সুতরাং এ-জিনিস চলবেই। কিন্তু পদ্মিনী স্টেশনে পৌঁছাবে কী করে? সেখানে দেখা করে ফের ওকে সময় মতো ফিরতে হবে মিটিংয়ে। সেটাও জরুরি। তবে স্টেশনে সময় মতো উপস্থিত হতে না-পারলে অমিতাভ কী একবারও অন্তত তার ভদ্রতা বা সৌজন্যের ব্যাপারেও একটু সন্দেহ প্রকাশ করবে না? তাছাড়া বিদায় মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়ানোও এক ধরনের শান্তি। অস্বীকার করে কী লাভ, সেই শান্তি পদ্মিনী পেতে চায়। কিন্তু মানুষে মানুষে কোচিন আজ মুখরিত। কল্লোলিনী কোচিনের মেজাজই এই মুহূর্তে অন্যরকম। এখন শুধু মানুষই এগিয়ে যাবে—যানবাহন সব পেছনে পড়ে থাক।

অস্থির মন নিয়ে পদ্মিনী ট্যাক্সির মধ্যে বসে শুধু ঘামতে লাগেলো। এগিয়ে যাবার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। কিন্তু আশ্চর্য ঠান্ডা তার মেজাজ। মিছিলের মানুষগুলোর ওপর অসীম মমতায় চোখ রেখে সে নিজেও ওদের জয়কে অনুভব করলো। সেই অনুভূতিটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তেই পদ্মিনী আবিষ্কার করলো অমিতাভর ব্যাপারটাও তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। গতকাল রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পদ্মিনী ওকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসে খুব আস্তে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের যেমন দুর্গাপূজা আমাদেরও তেমনি ওনম উৎসব। ওই সময়ে একবার আসতে পারবেন?

কোনও উত্তর না-দিয়ে অমিতাভ শুধু নীরবে পদ্মিনীকে দেখছিল। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট সুরে জানতে চাইলো, ওনম উৎসব কবে?

আসছে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার থেকে শুরু। শেষ হবে রবিবার। পদ্মিনী তার ঘন পালকে ঘেরা মায়াময় চোখ দুটো দিয়ে যেন অমিতাভকে অনেক কাছে টেনে নিল, অন্তত দু'দিনের জন্যেও যদি আসতে—

আমি তো এখানে থাকতেই চেয়েছিলাম। সেটা যখন হলো না তখন নতুন কাজে যোগ দিয়ে আবার এখানে আসার জন্যেই এতো তাড়াতাড়ি ছুটির কথা বলা কী সম্ভব? আপনি আমার ইচ্ছেটাই শুধু বাড়িয়ে দিলেন।

তবুও একবার চেষ্টা করে দেখুন—

যে-চেষ্টার ফল নেই আমি তেমনটা করি না। অমিতাভ সামান্য হেসে বললো, রমন কোম্পানিতে থাকবার জন্য তো তবে আপনার কাছেই চেষ্টা করতে পারতাম। আমি জানি ওই ধরনের অন্যায় আপনি কোনোদিনও করতে পারবেন না। যাই হোক, ওনম উৎসবে আসতে না-পারলেও পরে নিশ্চয়ই আসবো।

পদ্মিনী যখন স্টেশনে পৌঁছালো ঘড়িতে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাদ্রাজ এক্সপ্রেস চলে গেছে। আত্মীয় স্বজনদের যারা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল তারাও ফেরার মুখে। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে পদ্মিনী এক দুরন্ত অস্থিরতা নিয়ে প্রায় ছুটেই প্ল্যাটফরমে যখন ঢুকলো চারদিক তখন ফাঁকা। দু-একজন কুলি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অন্য দিকে সরে গেল। বুকস্টলের ছেলেটা ঝাড়ন দিয়ে ধুলোর হাত থেকে বই এবং পত্রিকাগুলোকে বাঁচাতে ব্যস্ত। চার চাকার খাবারের গাড়ির লোকটা পয়সা গুনছে কতো টাকার বিক্রিবাটা হলো সেটা বুঝে নিতে। এছাড়া এর্নাকুলাম স্টেশনের প্ল্যাটফরমগুলো যেন এক রুক্ষ শূন্য প্রান্তরের ওপর কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অমিতাভর কথাটা তার দুই কানে এখন বেজে চলেছে, 'আমি জানি ওই ধরনের অন্যায় আপনি কোনোদিনও করতে পারবেন না।'

বিষণ্ণতার বিহ্বলতার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে পদ্মিনী তখন একা। ক্লান্ত এবং অসহায় দৃষ্টি নিয়ে সে সোজা তাকিয়ে রইলো। প্ল্যাটফরমগুলোর ঢালু হয়ে যাওয়া শেষ প্রান্তরেরও বেশ কিছুটা দূরে দিন-চারটে শকুন কী যেন একটা খুবলে খুবলে খাচ্ছে। শূন্য স্টেশন নয়—চারপাশে চোখ বুলিয়ে পদ্মিনী যেন নিজের নিঃস্ব ভেতরটাকেই দেখতে পেল।

শ্রাবণের মাঝামাঝি



আশ্বিনের শেষাশেষি। মাথার ওপর আকাশটা যেন গাঢ় নীল রঙের চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা খন্ড খন্ড মেঘগুলো আপন খেয়ালে ভেসে চলেছে নিঃশব্দে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সবুজের মেলা। দূরে বিস্তৃত এক টিলার ওপর সুদীর্ঘ সবুজের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে চমৎকার সব রঙের বাড়িগুলো এখান থেকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এই জায়গাটার নাম বেলগাঁও।

কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের সীমানা শহর। মহারাষ্ট্রের শেষ এবং কর্ণাটকের শুরু সুতরাং **দুটো** রাজ্যের কাছেই বেলগাঁও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। আসলে বেলগাঁও-এর অবস্থান কর্ণাটকের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রের মানুষ এটাকে মেনে নিতে পারছে না। কেন-না সংখ্যায় তারাই এখানে বেশি। সেই কারণে সীমানা নিয়ে একটু-আধটু যে বিরোধ হয় না, তা নয়। তবে সেটা অন্য প্রশ্ন।

একঝাঁক যাত্রীদের বেলগাঁও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামিয়ে দিয়ে গোয়া এক্সপ্রেসটা এই মাত্র চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কে কার আগে বাইরে যাবে তারই প্রতিযোগিতা। কৃষ্ণেন্দু সেই ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে না-দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

কৃষ্ণেন্দুর বয়স ছাব্বিশ-এর মতো হবে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের সঙ্গে মানানসই স্বাস্থ্য। রংটা শ্যামবর্ণই বলা যায়। সামান্য একটু বড়ো বাদামী ধরনের চুলগুলো কপাল ও কাঁধের বেশ কিছুটা অংশকে চুম্বন করে রয়েছে। জলপ্রপাতের ঢল নামার মতোই কপাল থেকে নাকটা সোজা নেমে এসেছে ঠোঁটের ওপর। সারা মুখে বুদ্ধির ছাপ থাকলেও চোখ দুটো যেন শিশুর দুষ্টুমিতে ভরা। ফর্সা হলে কৃষ্ণেন্দুকে অতি অনায়াসেই বিদেশি বলে মনে হতো, আসলে বাঙালি। কৃষ্ণেন্দু বসু।

কৃষ্ণেন্দুরা মুম্বাইয়েব বাসিন্দা। ওর বাবা অক্ষয় বসু কলকাতা ছেড়ে সেই শৈশবে মুম্বাই পৌঁছে আর কখনও পেছনের দিকে তাকাননি। শিবাজী পার্কে উনি যে-বাড়ি বানিয়েছেন, সেই বাড়ির বয়সই চল্লিশ হতে চললো। এখানেই জন্মেছে তাঁর চার ছেলে এবং দুই মেয়ে।

চার ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে কৃষ্ণেন্দুর স্থান চতুর্থ। বড়ো ভাই অশোকের বয়স প্রায় উনচল্লিশ। সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাবার ঠিকাদারি সংস্থাটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বিয়ে করেছে সিন্ধি মেয়ে। ওর স্ত্রীর নাম জয়িতা। ওদের দুই ছেলে কৌশিক আর রাহুল।

মেজদা দীপঙ্কর বত্রিশ বছরের ঝকঝকে এক তরুণ। সে-ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে ওয়েস্টার্ন অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে। অশোক অনেক দিনই বলেছে, তুই কেন বাইরে চাকরি করবি? নিজেদের ফার্ম থাকতে অপরের কাছে বাধা থাকার প্রয়োজনটা কী? দীপঙ্কর হাসতে হাসতে একটা উত্তরই দেয়, চাকরি করতে যেদিন ভালো লাগবে না সেদিন তো এখানে ফিরে আসবোই। যাবো আর কোথায়? দীপঙ্করের বিয়ে হয়েছে মরাঠি মেয়ে নীনার সঙ্গে। ওদের একটা মাত্র মেয়ে ঝুপসী।

দিদি সংহিতা মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করে সায়নের একটা কলেজে অধ্যাপনা .করছে। বছর চারেক আগে ওর বিয়ে হয়েছে। দিদির স্বামী অভিষেকদা চমৎকার মানুষ। ওরাও তাদের মতো প্রবাসী বাঙালি। অভিষেকদার নিজের একটা অডিট ফার্ম আছে। মাহিম অঞ্চলে তাদের নিজস্ব বাড়ি। ওদের একটা ছেলে, উৎসব।

এই তিনজনের পরেই কৃষ্ণেন্দু। ওর কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে। যেটা বলা হয়নি তা হলো, বছর দুই আগে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করে সে বাইকুলার একটা হাসপাতালে কাজ করছিল। মাস দেড়েক আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটা বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ে। বেলগাঁও-এর এক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি তাদের সংস্থার জন্য একজন ডাক্তার চাইছে। ঠিকানা দিয়েছে মুম্বাই অফিসের। কৃষ্ণেন্দু একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছিল এবং ডাক পেয়ে যথারীতি ইন্টারভিউও দিয়ে এসেছিল।

বাড়িতে অবশ্য ব্যাপারটা তখনও জানায়নি। জানাজানি হলো তিন দিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাওয়ার পর।

বাড়িতে তখন রীতিমতো হইচই ব্যাপার। লেটারটা এসেছিল দুপুরের ডাকে। এবং সেটা পড়েছিল অক্ষয়বাবুর হাতেই। স্ত্রী মন্দিরাকে ছাড়া তিনি আর কাউকেই কিছু জানালেন না। শুধু জামাই অর্থাৎ অভিষককে একটা টেলিফোন করে দিলেন, সংহিতা এবং উৎসব-কে নিয়ে রাত্রে একবাব এসো। সবাই মিলে একসঙ্গে একটু খাওয়া-দাওয়া করবো এই আর কি! তারপরেই কী মনে করে বড়ো ছেলে অশোককে একটা ফোন করলেন ওর অফিসে। শুধু বললেন, আজকে আর বাইরে কোথাও কোনও প্রোগ্রাম রাখিস না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসিস। মেজ ছেলে দীপঙ্করের অফিসেও ফোন করে সেই একই কথা বললেন। কৃষ্ণেন্দু তো হাসপাতাল থেকে রাত আটটার পরে বাড়িতে চলে আসছেই। বাকি থাকছে দিবাকর। তাঁর পঞ্চম সন্তান। গত বছর বি.কম. পাশ কবে চাকবি পেয়েছে একটা নামী কাপড়ের মিলে খেলোয়াড় হিসাবে। ওকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে না। ওদের আজ অফিস লীগের খেলা আছে। সুতরাং আশা করা যায় খেলা শেষে দিবাকর বিকেল বা সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরছে। অতোএব বাইরে আর কেউই থাকছে না। তাঁর ষষ্ঠ বা শেষ সন্তান কুড়ি বছরের কোমল মেয়ে সোহিনী। সে বি.এ পড়ছে এবং ওর কলেজ সকালে। অর্থাৎ সোহিনী আর দুই পুত্রবধূ জয়িতা ও নীনাকে বাড়িতে সারাক্ষণই পাওয়া যাচ্ছে। সকলের উপস্থিতিতে অক্ষয়বাবু তার অভিযোগ জানাবেন। জানতে চাইবেন, কেন কৃষ্ণেন্দু বাড়ির সবাইকে ছেড়ে বেলগাঁওতে চাকরি করতে যাবে? সবচেয়ে বড়ো কথা ও তো এখানে ডাক্তারের সম্মানীয় একটা চাকরি করছেই। বেকার তো নয়। তাহলে শুধু শুধু এই মুম্বাই ছাড়ার প্রশ্নটা কেন?

বিশাল ড্রইং-রুমে তখন জমজমাট ভিড়। প্রত্যেকেই এসে গেছে এবং সকলেই সোফা ডিভানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কী এবং কোন দিকে গড়াবে কিছুই আন্দাজ করতে না-পেরে সকলেই কেমন যেন এক ধরনের বোবা সেজে রয়েছে। আসলে সমস্যাটা জানা থাকলে তো নিজেদের মধ্যে একটু কথার বাতাবরণ করে নেবে। ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। অক্ষয় সোজাসুজি তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে। তারপর স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বলো।

মন্দিরা বললেন, না-না তুমিই বলো।

অশোক মা এবং বাবাকে নীরবে লক্ষ্য করছিল। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল অক্ষয়কে। ছেলে-মেয়েরা সবাই বাবাকে বাবু বলে ডাকে। অশোক আসন্ন পরিস্থিতিটা কী হতে পারে সেই চিন্তায় একটু গম্ভীর হয়ে বললো, বাবু তুমি বলো!

আমার আর কী বলার আছে? সব কথা বলবে তো কৃষ্ণেন্দু।

কৃষ্ণেন্দু! দীপঙ্কর সোজা হয়ে বসলো। অশোক, জয়িতা, নীনা, সংহিতা, অভিষেক, দিবাকর এবং সোহিনীর চোখের জালে কৃষ্ণেন্দু তখন বন্দি। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। অপার বিস্ময় নিয়ে বাবার মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলো।

অক্ষয় প্রতিটা কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, আমাদের সবাইকে বোধহয় কৃষ্ণেন্দুর আর ভালো লাগছে না। নতুন চাকরি নিয়ে তাই ও বেলগাঁও চলে যাচ্ছে। আজকে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপারটা হলো, কৃষ্ণেন্দু আমাদের কাউকেই কিছু জানায়নি। তার মানে ও ঠিক করেই নিয়েছে—

বাবু! শুধু শুধু তুমি কষ্ট পাচ্ছো! কৃষ্ণেন্দু এতোক্ষণে সাঁতার কাটার সুযোগ পেয়ে বললো, আমি কি তোমাদের জানাতাম না? আসলে হাসপাতালের বাঁধাধরা ডিউটির মধ্যে কোনওরকম প্রেরণা পাচ্ছিলাম না। সেদিক দিয়ে ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির চাকরিতে বেশ নতুনত্ব আছে। সেই কারণে ওখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। চাকরি হবেই—এমন নিশ্চয়তা ছিল না বলেই তোমাদেরকেও জানাইনি।

সেইজন্য তুই আমাদের ছেড়ে বেলগাঁও যাবি? মন্দিরা অনেকটা দুঃখ নিয়ে বললেন, অতো

দূরে চাকরি করার দরকারটা কী?

দাঁড়াও মা দাঁড়াও—কৃষ্ণেন্দু একরাশ হাসি ছড়িয়ে মন্দিরাকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী আর এমন দূর বলো তো? মুম্বাই থেকে বেলগাঁও একটা রাতের জার্নি।

একটা রাত বা চোদ্দটা রাতের প্রশ্ন নয়—মন্দিরা এমন এক অভিমান নিয়ে বলতে লাগলেন যে প্রথমেই তাঁর গলাটা প্রায় ধরে এলো। সামান্য একটু সময় চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে পরে আবার বললেন, তুই যখন বাড়িতেই থাকতে পারবি না, তোকে যখন আমরা কাছেই পাবো না—তখন বেলজিয়াম আর বেলগাঁও-এর দূরত্ব আমার কাছে একই সমান।

মা-বাবার মানসিক কষ্টটা ছেলে-মেয়েরা সকলেই বুঝতে পারছিল। অথচ কৃষ্ণেন্দুকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। ও একটাই ভুল করেছে, বেলগাঁও-এর চাকরিটা হোক বা না-হোক বাবুকে অন্তত একবার বলা উচিত ছিল। তাছাড়া এটাও ওর অজানা নয়, সবাইকে ছেড়ে বাইরে চাকরি করতে যাওয়াটা মা-বাবুর কারোরই খুব একটা পছন্দ নয়। যে-কারণে দীপঙ্করকেও চাকরির প্রথম জীবনে ভূপালের একটা সরকারি শিল্প-সংস্থায় যোগ দিতে দেওয়া হয়নি।

সংহিতা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিল। আসলে ও মা আর বাবুর যন্ত্রণাটা নিজের থেকে আলাদা বলে ভাবতেই পারছিল না। ওঁদের যখন এই একটাই ইচ্ছে, চাকরির জন্য কেউ দূরে যেয়ো না—এটা যে কতোখানি অসীম মমতার প্রতিচ্ছবি সংহিতা সেটা বোঝে। সে কৃষ্ণেন্দুর দিকে গম্ভীর গলায় বললো, তুই তো বেকার নোস যে তোকে এক বিরাট হতাশায় বেলগাঁওতে যেতেই হবে। কী প্রয়োজন যাওয়ার?

দিদি তুমি ঠিকই বলেছো। জয়িতা আর নীনা প্রচন্ড ভাবে সংহিতাকে সমর্থন জানাতেই ছোট বোন সোহিনী শান্ত গলায় বললো, সবাই যখন বারণ করছে যাস না সেজদা। ভাইবোনেরা প্রত্যেকে প্রত্যেককেই তুই করে কথা বলে। সোহিনী আরও বললো, শেষে ট্রেন লেট বা ওই জাতীয় কিছু গন্ডোগোলের জন্য সময় মতো আসতে পারবি না—আমাদের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানটাই—

আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—অশোক এবারে সরাসরি কৃষ্ণেন্দুকেই জিজ্ঞেস করলো, মুম্বাইয়ের বাইরে যাবার তোর হঠাৎ শখ হলো কেন? বাবু তো বলেছেনই, আমি আর দীপঙ্করও তোকে হাজার বার বলেছি এই শিবাজী পার্ক এলাকাতেই দারুণ একটা চেম্বার সাজিয়ে দিই। তুই এখানেই প্র্যাকটিস কর।

তোরা কিন্তু একটা ভুল করছিস মেজদা। কৃষ্ণেন্দু এবারে একটু সিরিয়াস হলো। বললো, এখানে থাকতে চাইছি না মানে? আমি কি তোদের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছি? যদি আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হতো তাহলে কি তোরা আমাকে বাইরে যেতে দিতিস না?

যদি, ইত্যাদি ধরে কোনও আলোচনা চলতে পারে না কৃষ্ণেন্দু। অক্ষয় বিমর্ষ সুরে বললেন, তাহলে আমার মানসিক অবস্থা, ধ্যান-ধারণাগুলোও নিশ্চয়ই পাল্টাতো। আমিও সহজেই সব কিছু মেনে নিতাম। আসল কথাটা কি জানিস? একটু সময় নিয়ে অক্ষয় এক উদাস গলায় শুরু করলেন, আমি লেখাপড়া করার সুযোগ পাইনি। কিছুই শিখিনি। আমাকে প্রায় মুর্খই বলা—

বাবু এ-সব কথা আসছে কেন? কৃষ্ণেন্দুর মুখটা বেশ ছোট হয়ে গেল।

আরে না-না। তোদের আঘাত করার জন্য বলছি না। অক্ষয় একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলতে লাগলেন, আমি বলতে চাইছি ছোটবেলায় আমার মা-বাবার এমন সামর্থ ছিল না যে দু'বেলা আমাকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারেন। সেই কারণেই শুধু মাত্র পেট ভরে খেতে পাবার জন্য আমাদের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে আমাকে তাঁরা এই মুম্বাইতে পাঠিয়েছিলেন। চলে আসার দিন আমার মা-বাবার কান্নার কথা আমি এ-জীবনেও ভুলতে পারবো না। আসলে তাঁরা আমাকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে নিজেদেরকে শেষ করেছিলেন। জীবনের সেই সময়টা থেকেই আমি প্রচুর পরিশ্রম করেছি। প্রচুর উপার্জনও করেছি। প্রথম থেকেই আমার চিন্তাটা ছিল এতো টাকা করবো, ভবিষ্যতে যেন সন্তানদের ছেড়ে কখনও থাকতে না-হয়। সবাই মিলে

এক জায়গায় থাকবো। একই সঙ্গে থাকবো।

তুমি যা-যা বললে প্রত্যেকটা কথাই আমরা বুঝতে পেরেছি। তোমার এই মনটা পেয়েই তো আমরা বড়ো হয়েছি বাবু। দিবাকর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললো, আমরা কোনও কাজে মুম্বাইয়ের যে-কোনও প্রান্তেই আটকে থাকি না কেন—বাড়ি ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু সেজদার এই ব্যাপারটা আলাদা। তুমি এতোদিন দাওনি সেটা অন্য প্রশ্ন। তবে বাবু, চাকরির ক্ষেত্রে তোমাকে একটা ছাড় দেবার জন্য নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার অনুরোধ করতে পারি। কেন-না এটা ঠিক, ব্যাকিং ছাড়া ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পাওয়ার একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর সেজদার ওই কথাটাও ঠিক, দশ-বারো ঘন্টা তো জার্নি বেলগাঁওকে মুম্বাইয়ের উঠোন বলা যেতে পারে।

নতুন করে কী যেন ভাবতে লাগলেন অক্ষয়। অভিষেকের দিকে তাকালেন। ও শুধু চুপ করে সকলের কথা শুনেই যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। মোটামুটি সবারই একটা মতামত পাওয়া গেল। ওরটাই বাকি। অক্ষয় তাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু বলবে না অভিষেক? আমাদের কারো মধ্যে কোনও গোপনীয়তা নেই। খোলাখুলি তুমি তোমার মতামত দিতে পারো।

অভিষেক সামান্য একটু হেসে সবার মুখগুলোকে একবার দেখে নিলো। ওই হাসিটা সারাক্ষণ ধরে রেখেই উত্তর দিলো, দেখুন বাবু, আপনার এবং মা'র মন খারাপের ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কষ্টটা তেমনই কিন্তু কৃষ্ণেন্দুরও। বাড়ির প্রিয়জনদের ছেড়ে ও ওখানে মহা আনন্দে থাকবে তেমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তবুও এই সব কষ্ট-দুঃখকে মানিয়ে নিয়েই মানুষ চাকরির জন্য দূর থেকে আরও দূরে চলে যায়। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু আলাদা। কৃষ্ণেন্দুর আপাত দৃষ্টিতে বাইরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওর বয়সটা নতুন। ও একজন ডাক্তার। সুতরাং বিভিন্ন সংস্থায়, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। তারপর সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই একদিন প্র্যাকটিস শুরু করে দেবে। এই কটা বছর যেখানে মন চায় করুক না সেই চাকরি। তারপরে একদিন দেখবেন, কৃষ্ণেন্দু নিজের থেকেই বলছে, ধুর বেলগাঁও আর ভালো লাগছে না। চলে এলুম।

এর পরের ঘটনাটা খুবই সংক্ষিপ্ত। বড়ো ছিল শুধু হৃদয়ের ব্যাপার-স্যাপারগুলো। মহালছমী এক্সপ্রেসে কৃষ্ণেন্দুকে তুলে দিতে বাড়ি সুদ্ধ মানুষ ভিড় করেছিল ভি. টি স্টেশনে। একটা মাত্র রাতের জন্য বৌদিরা যে-খাবার সঙ্গে দিয়েছে টিফিন ক্যারিয়ারের সাইজ দেখে কৃষ্ণেন্দু অনুমান করলো, ছ-সাতজনকে অতি অবশ্যই সেটা বিলিয়ে দিতে হবে। মন্দিরা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে পরে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই ট্রেনটাই সোজা বেলগাঁও যাবে তো?

না। কৃষ্ণেন্দু মা'কে আদর করতে করতে বললো, এটা যাবে কোলাপুর। আমাকে মিরাজ জংশনে নেমে ওখান থেকে গোয়া এক্সপ্রেস ধরতে হবে।

সেটা কখন?

ভোরবেলা।

দেখিস ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়িস না যেন—মন্দিরা আশঙ্কা প্রকাশ করতেই কৃষ্ণেন্দু শুধু বললো, তুমি ভেবো না মা। তারপরেই সেই কান্ডটা ঘটলো। কৃষ্ণেন্দু মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই ওকে বুকের সঙ্গে এতোটুকু করে জড়িয়ে ধরেই মন্দিরার সে-কী কান্না! আর সত্যি সত্যিই ওই জিনিসটা বড়ো ছোঁয়াচে। মায়ের ওই কান্না দেখে জয়িতা, নীনা, সংহিতা, সোহিনী সবাই এক সঙ্গে কান্না জুড়ে দিল। বাচ্চারা অর্থাৎ কৌশিক, রাহুল, ঝুপসী, উৎসব ওরা দেখছে ওদের মায়েরা কান্নাকাটি করছে। সুতরাং ওরাও কাঁদতে লাগলো।

কৃষ্ণেন্দু পায়ে পায়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেল। প্রণাম করতেই অক্ষয় নিজেকে অসম্ভব এক দৃঢ়তায় ধরে রাখলেন। ছেলের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে ছোট্ট সুরে শুধু বললেন, সাবধানে থাকিস বাবা। তারপরেই মহালছমী এক্সপ্রেসটা এক সময় চলতে শুরু করে দিল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণেন্দু ঝাপসা চোখে একে একে দেখতে লাগলো বড়দা, অভিষেকদা, মেজদা.....না আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চোখে এতো জল থাকলে পরিষ্কার করে কি কিছু দেখা যায়?

বেলগাঁও স্টেশনের প্ল্যাটফরমটা এখন বেশ ফাঁকা। দু-একজন যাত্রী ছাড়া বাকি সকলেই বেরিয়ে গেছে। কৃষ্ণেন্দুর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছে ওর বেডিং আর স্যুটকেসটা। একটা কুলি নেওয়াই ভালো। কৃষ্ণেন্দুর কী খেয়াল হলো, নিজেকে একটু কষ্ট দেবার জন্য বড়বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে বেডিং এবং স্যুটকেসটা দু'হাতে তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালো। ওখানে তখন কোনও ট্যাক্সি ছিল না। শুধু টাঙ্গা, সাইকেল রিকশা আর অটো-স্কুটার। এখান থেকে ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির দূরত্বটা কৃষ্ণেন্দুর জানার কথা নয়। সুতরাং কীসে গেলে সুবিধে হবে তা নিয়েই সে ভাবছিল। কিন্তু তার আগেই একঝাঁক অটো স্কুটারওয়ালা কৃষ্ণেন্দুকে ঘেরাও করলো। কীধার জানা সাব?

কাকতি। কৃষ্ণেন্দু কথাটা শেষ করেছে কী করেনি ওই আট-দশজনের মধ্যে থেকে একজন স্কুটারওয়ালা বাজপাখির তৎপরতাকে হার মানিয়ে চোখের পাতা পড়ার আগেই ওর হাত থেকে বেডিং, স্যুটকেসটা কেড়ে নিয়ে নিজের অটোতে রেখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে বললো, চলিয়ে সাব। ত্রিশ রুপাইয়া দেনা—

কৃষ্ণেন্দু একটু ভয়ে ভয়ে গিয়ে অটো স্কুটারে বসলো। কারণ সে ভেবেছিল সওয়ারী কে আগে নেবে—এই নিয়ে ওদের মধ্যে এক্ষুণি হয়তো একটা হাতাহাতি হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। ওরা নিজেদের মধ্যে বরং হাসাহাসি করলো। কেউ কেউ অন্য সওয়ারী ধরতে ছুটলো। একজন টিপ্পনী কাটার সুরে হাসতে হাসতে কৃষ্ণেন্দুর স্কুটার-চালককে বললো, তেরা নম্বর লাগ গিয়া। আভি ফুট হিয়াসে।

অটো স্কুটার ছুটে চলেছে শহরের প্রধান রাস্তা বাঙ্গালোব পুনে রোড ধরে। পেছনে ফেলে এসেছে ক্যান্টনমেন্ট এবং ক্যাম্প। সামনেই চার রাস্তার জমজমাট এ-মোড়। মানুষ আর যানবাহনের চাপে গোটা এলাকা ভিড়ে জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এখন বেলা সাড়ে-দশটা। সুতরাং স্কুল-কলেজ, অফিস, ব্যবসা, কোর্ট-কাছারি সবই মেতে উঠেছে এক সঙ্গে। সামনেই চমৎকার একটা বিল্ডিং চোখে পড়লো। ওটা সুপার বাজার আপনা বাজার। পাশেই হোটেল নটরাজ। বাঁ পাশের ফুটপাথে একটা সুদৃশ্য সিনেমা হল। নাম শ্রীকৃষ্ণা। অটো স্কুটারটা বেশ কিছুটা এগিয়ে যাবার পর চোখে পড়লো লিঙ্গরাজ কলেজ এবং ভনিতা বিদ্যালয়। সেন্ট পলস স্কুল, পলিটেকনিক এবং সিভিল হাসপাতালকে বাঁ দিকে রেখে অটো স্কুটার এবারে তরতর করে এগিয়ে চললো। স্কুটার চালক এক সময় জিজ্ঞেস করলো, কাকতি কাঁহা যানা সাব? ওক অ্যালুমিনিয়ামমে?

জি হাঁ। কৃষ্ণেন্দু ছোট্ট উত্তরটা দিয়েই পরে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপকো ক্যায়সা মালুম?

নঈ আদমী বেডিং বিস্তারা লেকর কাকতি যানা হ্যায় তো ওহিপেই যাতা হ্যায়। ইয়ে কোঈ খাস্ বাত নেহি।

ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে কৃষ্ণেন্দুকে নামিয়ে দিয়ে তিরিশ টাকা নিয়ে স্কুটার-চালক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাবার সময়েও সে চমৎকার ভদ্রতা দেখালো, আচ্ছা সাব চলতে হ্যায়। ফির মুলাকাৎ হোগা।

কৃষ্ণেন্দু ওর জিনিসপত্র নিয়ে বিল্ডিং-এর প্রধান ফটকে আসতে ঝকঝকে সাদা পোশাকে একজন দারোয়ান এগিয়ে এলো। সাহায্য করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, বলুন স্যার, আপনার জন্য কী করতে পারি?

মিঃ এল. কে ওকের সঙ্গে আমি একবার দেখা করবো।

বড়া সাব। উচ্চারণের সঙ্গে দারোয়ানের সারা চোখে-মুখে একটা সম্ভ্রমের, শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠলো। বললো, লিফটের পাশে এনকোয়ারিতে যে-মেমসাব বসে আছেন তাঁর কাছে যান। তিনিই দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। কৃষ্ণেন্দু নিজের জিনিসপত্রের দিকে একবার তাকাতেই সে আবার বললো, কোঈ ফিকির মৎ কিজিয়ে সাব, সামান কো এহিপে রহেনে দিজিয়ে।

এনকোয়ারিতে যে-মেয়েটি বসে আছে সে কোন দেশিয় বলা কঠিন। কৃষ্ণেন্দু সেটা বোঝার চেষ্টাও করলো না। সে শুধু তার এখানে আসার কারণটুকু জানালো। মেয়েটি কাকে যেন ফোন

করলো। ফোন শেষে কৃষ্ণেন্দুকে বললো, আপনি ওই লিফট দিয়ে থার্ড ফ্লোরে চলে যান। বড়ো সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ এল. কে. ওকের ঘরে ঢুকতেই তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন কৃষ্ণেন্দুজি। বসুন—বলেই তিনি একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণেন্দু করমর্দন করে একটা চেয়ারে বসলো। তাকালো ওক সাহেবের মুখের দিকে। মরাঠি এই ভদ্রলোকের বয়স বাহান্ন-তিপ্পান্ন হবে। টকটকে ফর্সা গায়ের রং। কপালটা বেশ চওড়া। জোড়া ভুরু। টানা নাকের ওপর পুরু লেন্সের চশমা। চোখের মণি দুটো হালকা নীল রঙের। এবং মাথার সমস্ত চুলে শ্বেত-বস্ত্রের এক আচ্ছাদন যেন। ভদ্রলোকের প্রতিটি কথা হাসি আর মমতা দিয়ে জড়ানো।

ওক সাহেব বললেন, কৃষ্ণেন্দুজি যদিও আপনি মোটামুটি কাছাকাছি এরিয়া থেকেই আসছেন তবুও একটা নাইটের জার্নি তো—আমাদেব সংস্থায় আসার জন্য আপনাকে ট্রেনে নিশ্চয় কিছু কষ্ট পেতে হয়েছে—

না-না, আমার কোনও কষ্ট হয়নি। শিশুর মতো সরল স্বীকারোক্তি কৃষ্ণেন্দুর। আপনারা ফার্স্ট ক্লাসের ফেয়ার দিয়েছেন। আমি তো তাতেই এসেছি। কষ্ট হবে কেন?

কৃষ্ণেন্দুর এই ধরনের সহজ এবং খোলামেলা কথা শুনে ওক সাহেব হেসে ফেললেন। তবে খুশিও হলেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন, ছোটা মেমসাব কো বোলাও।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটা মেয়ে। সুন্দর গঠন এবং তার চেয়েও সুন্দর ওর মুখশ্রী। হলুদ হলুদ কাঁচা সোনা গায়ের রং। কাঁধ পর্যন্ত চুল। মেরুন কালারের স্লিভলেস্ ব্লাউজের সঙ্গে ওই কালারেরই শাড়ি। মেরুন টিপটা বেশ বড়ো আকারের। ন্যাচারাল কালারের লিপ্স্টিকের ছোঁয়া দুই ঠোঁটে। দুই চোখে কাজলের গভীর ছায়া ঘেরা সত্ত্বেও চোখের মণি দুটো ঈষৎ নীল রঙের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। মেয়েটির চোখের দিকে একঝলক তাকিয়েই কৃষ্ণেন্দু ওক সাহেবের দিকে তাকালো। আশ্চর্য! প্রায় একই রকমের চোখ দুজনের। নেপথ্য কোনও শিল্পীর খুব সম্ভবত ওটাই একমাত্র নিখুঁত কাজ। দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণেন্দুর এই মিল খোঁজার চেষ্টাটুকু মেয়েটির দৃষ্টি এড়ালো না। সে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ওক সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মরাঠি ভাষায় বললো, এতো বিরক্ত করো না—ডেকেছো কেন?

জন্ম থেকে এই ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু মুম্বাইতেই মানুষ। মরাঠিদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এবং ভাষার মধ্যে সে প্রায় ডুবেই রয়েছে। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দির মতো সে অনর্গল মরাঠি ভাষায় কথা বলতে পারে, লিখতে পারে এবং খুঁটিনাটি সব কিছু বুঝতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও বুঝতে পারলো, মেয়েটি এই মুহূর্তে বেশ বিরক্ত। তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ওপর এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে যে, সে কে?

ডেকেছি তো প্রয়োজনেই। ওক সাহেব যেন সমস্ত তাপ-উত্তাপের উর্দ্ধে। অনাবিল এক হাসি নিয়ে বললেন, আগে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন কৃষ্ণেন্দু বসু। আমাদের ইন্ডাসট্রিয়াল ফ্যামিলিতে ডাক্তার হয়ে নতুন এলেন। আর ইনি অর্পিত্রমা ওক। আমাদের এই অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির ইন্ডাসট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার। ওক সাহেব হাসতে হাসতে আরও যোগ করলেন, কোম্পানির এই পরিচয় ছাড়াও অর্পিত্রমার সঙ্গে আমার আর একটা......

খুব সম্ভব উনি আপনার মেয়ে।

ঠিক বলেছো তুমি। কথাটা বলেই ওক সাহেব কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, এই দ্যাখো, আমি আবার তোমাকে তুমি করে বলে ফেললাম। কী যে ভুল হয় আমার!

আবারও ভুল! অর্পিত্রমার টিপ্পনী।

কী রকম?

অপির্ত্রমা শুধরে দিল, তোমাকে তুমি নয়—

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ওক সাহেব প্রাণ ভরে হাসলেন। হাসির শেষে বললেন, আপনাকে তুমি

করে বললাম।

যেটা শুনতে ভালো লাগে আপনি সেটাই বলেছেন। আপনি কোনও ভুল বলেননি। আমারও তেমন কিছু মনে হয়নি। কথাটি শেষ করেই কৃষ্ণেন্দু মৃদু হাসির মধ্যে দিয়ে ওক সাহেবকে সমর্থন জানিয়ে বুঝিয়ে দিলে, এরপর থেকে তিনি অনায়াসেই 'তুমি' করে কথা বলতে পারেন। যেটা শুনতে তার নিজেরও ভালো লাগবে। তারপরেই কৃষ্ণেন্দু অর্পিত্রিমার দিকে তাকালো। অর্পিত্রিমা তার বাবাকে যে ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে সেটা যে মোটেও ভুল নয় কৃষ্ণেন্দুর দৃষ্টিতে সেই রকমই এক ইশারা।

অর্পিত্রিমা অন্য ধাতুতে গড়া। এ-সব ছোটখাটো কথায় সে নিজেকে জড়াতে চাইলো না। তার কোন কথাটা ঠিক হয়েছে অথবা কোন কথাটা ঠিক হয়নি ইত্যাদি কৃষ্ণেন্দু বসু নামের মুম্বাই থেকে আগত এক যুবক এসে ঠিক করে দেবে তা তো হতে পারে না। তাছাড়া অর্পিত্রিমা এ-সবের ঊর্ধ্বে। সে তাড়াতাড়ি এই অধ্যয়টা মিটিয়ে ফেলতে চায়। ওক সাহেবকে সে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে এখন কী করতে হবে বলো?

সেটা তো আমার থেকে তুমিই ভালো জানো। ওক সাহেব এতোক্ষণে এই প্রথম একটু গম্ভীর হলেন। কেটে কেটে বলতে লাগলেন, কৃষ্ণেন্দুর কোয়ার্টার, কোথায় বসবে, কখন ডিউটি ইত্যাদি জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তো তোমারই।

হ্যাঁ, অর্পিত্রিমা সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। সেদিক দিয়ে সে কোনও ত্রুটি রাখেনি। কৃষ্ণেন্দুকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে কোম্পানির বিশাল এলাকার একপাশে। ওখানেই ওদের দাবাখানা। ডিসপেনসারির কর্মীদের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর আলাপও করিয়ে দিল। বললো, এই হলো আপনার কাজের জায়গা। সাধারণত সপ্তাহে চার দিন আপনি এখানে এসে বসবেন এবং কর্মীদের অ্যাক্সিডেন্ট বা অসুস্থ হয়ে পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে দেখা-শোনা কববেন। কোম্পানির এরিয়ার পেছনেই একটা গ্রাম আছে কানবর্গী। ওখানে আমাদের লোকাল শ্রমিক কর্মচারীদের একটা মোটা অংশ বাস করে। ওদের ফ্যামিলিদের চিকিৎসার জন্য ওখানে একটা ইউনিট আছে। আপনাকে সেখানেও দু'দিন বসতে হবে। রবিবার দিনটা পুরোপুরি আপনার ছুটি। তবে এই দুই জায়গার যেখানেই বসুন-না কেন, ডিউটি সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা থেকে একটা এই এক ঘন্টা লাঞ্চ। একটা থেকে আবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আপনার কাজ। কোয়ার্টার থেকে কোম্পানি বা কানবর্গী এবং সেখান থেকে কোয়ার্টার মোট এই চারবার যাতায়াত এবং ছুটির দিনে শহরে যাবার জন্য আপনি কোম্পানির গাড়ি পাবেন। কাজের ব্যাপারে কোনওরকম অসুবিধে যদি ফিল করেন আমাকে জানাতে পারেন। চলুন—এবারে আপনার কোয়ার্টারটা দেখে নেবেন।

কৃষ্ণেন্দু অর্পিত্রিমার মুখের দিকে একবার তাকালো মাত্র। তারপরে নির্লিপ্ত সুরে ছোট্ট একটা শব্দ তুললো, চলুন। আসলে কৃষ্ণেন্দু অর্পিত্রিমার মধ্যে একজন মানুষকে, মানুষের স্বাভাবিক মনকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু এই অর্পিত্রিমা এতো সুন্দরী হয়েও সর্বোপরি একজন মেয়ে হয়েও এতো বড়ো একটা কোম্পানি চালাবার আড়ালে কেমন যেন সব কিছু হারিয়ে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, গুরুত্বপূর্ণ পদে বসলেই কি মানুষকে এমন প্রাণশূন্য নিয়ম রক্ষার কথাবার্তা বলতে হয়? ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয়। নাকি ইচ্ছে করেই এমনটা দেখাচ্ছে? নয়তো অর্পিত্রিমা কৃষ্ণেন্দুকে যা-যা জানালো সেই কথাগুলো কতো অনায়াসে, সহজ ভাবে গল্প করতে করতেই বলা যেতে পারতো, কিন্তু তা হলো কোথায়? ছাঁটকাট করে সেন্সর করা কথাগুলো যেন আদেশের মোড়কে জড়ানো। রস নেই, রূপ নেই, প্রতিটি কথা যেন এক উপরিওয়ালার নির্দেশ।

ফ্যাক্টরি থেকে কোয়ার্টার গাড়িতে সাত মিনিটের মতো লাগলো। পুরু করে পিচ ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। পথের দু'পাশে ইউক্যালিপটাস আর পাইনের দীঘল সারি। দোতলা এবং একতলার কোয়ার্টারগুলো ছবির মতো ব্যালকনি আর রঙের বাহার নিয়ে চমৎকার ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এ-গুলো অফিসার্স কোয়ার্টার। পথে যেতে যেতে কৃষ্ণেন্দুর চোখে পড়লো, ছোটদের খেলার পার্ক, স্কুল, পোস্ট অফিস, মার্কেটিং সেন্টার এবং সাজানো গুছানো একটা হাসপাতাল।

ফ্যাক্টরি এবং কোয়ার্টার-এর সুবিশাল অঞ্চলের ব্যাকগ্রাউন্ডে মাঝারি উচ্চতায় পাহাড়ের রেঞ্জ দূরে নীল আকাশের গায়ে গিয়ে আটকে রয়েছে। এই পাহাড়টা পাথুরে নয়—অনেক রকম সবুজের বাটিক প্রিন্টের ছাপ তার সারা অঙ্গে। এক মিনিট তাকিয়ে থাকলেই চোখটা সহজেই শীতল হয়ে জুড়িয়ে আসে।

কোয়ার্টার ঘুরিয়ে দেখাবার পর অর্পিত্রমা বললো, এই হলো আপনার থাকবার জায়গা। ইচ্ছে করলে লোক রেখে রান্না করে খেতে পারেন নতুবা অফিসার্স মেস রয়েছে। সেখানেও খেতে পারেন। আপনার যেটা খুশি! আজকে আর ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে না। আগামীকাল সকালেই যাবেন। গাড়ি আসবে আটটা বাজার মিনিট দশেক আগেই। আর একটা কথা, নতুন ডাক্তার যিনিই আসুন-না কেন আমাদের এই ইন্ডাসট্রিয়াল ফ্যামিলিতে তাঁকে প্রথম তিনটে বছর ফ্যাক্টরি কম্পাউন্ডের ডিসপেনসারিতেই কাটাতে হবে। পরে আমরা তাকে কোম্পানির এই হাসপাতালে নিয়ে আসি। আপনার ক্ষেত্রেও তাই হবে।

কৃষ্ণেন্দুর একবার ইচ্ছে হলো বলে, দম দেওয়া কথাগুলো প্লিজ আর বলবেন না। তার চেয়ে বরং আপনি এবারে আসুন। আমি আমার মুম্বাইতে রেখে আসা মা-বাবু, দুই দাদা, দুই বৌদি, ছোট ভাই, বোন, দিদি, জামাইবাবু এবং ভাগ্নে, ভাইপো-ভাইঝিদের কথা, বন্ধুদের কথা ভেবে কিছুটা সময় অন্তত সুখের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে থাকি। চন্ডী, মিলান্দ ঠিকই বলে ফ্যাক্টরিতে কাজ করলে মানুষ মেসিন হয়ে যায়।

সেই কারণে কথা-বার্তাগুলো একেবারে যন্ত্রচালিত। সর্বদাই মনে হয় বোতাম টিপে কেউ বুঝি তাকে দিয়ে কিছু বলাচ্ছে। অথচ চমৎকার মানুষ ওই ওক সাহেব। ওই মহিলারই তো বাবা। উনি অতো উঁচুতে থেকেও কতো সাধারণ মানুষ। কী সুন্দর ওঁর কথা। কী উজ্জ্বল সেই হাসি। মনেই হয় না ওক সাহেব এতো বড়ো একটা কোম্পানির মালিক। কৃষ্ণেন্দুর মতো একজন অল্প বয়সী ছেলেকেও তিনি অমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, ট্রেনে কষ্ট হয়েছে কিনা সে-কথাও জিজ্ঞেস করেন। মানুষ তো তার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই অপরের কাছে আপন হয়ে ওঠে। কৃষ্ণেন্দুর হঠাৎ মনে পড়লো, ওক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে সকালবেলা সেই দারোয়ানের 'বড়া সাব' উচ্চারণের মধ্যে যে-শ্রদ্ধা জেগেছিল, সেই শ্রদ্ধা এমনি নয়—ওক সাহেবের মহত্ত্বই তাঁকে মহৎ করে অনেক উপরে তুলে ধরেছে।

দিন কুড়ি বেশ ভালোই কেটে গেল। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে কৃষ্ণেন্দু চার দিন মুম্বাইতে বাড়ির সবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। তিনখানা চিঠি লিখেছে। হ্যাঁ, এটা মায়ের নির্দেশ। সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠি পাঠাতেই হবে। কৃষ্ণেন্দু সেই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। অফিসার্স মেসের খাওয়া-দাওয়া ভালোই। মাকে সে-কথা জানিয়ে নিশ্চিন্ত করা হয়েছে।

নিজের কাজ করতেও কৃষ্ণেন্দুর খারাপ লাগছে না। ফ্যাক্টরিতে যে-চার দিন বসে আহত বা অসুস্থ হয়ে যে-সব শ্রমিকরা আসে পেশাদার মনোভাব নিয়ে সে কখনও তাদেরকে দেখে না। দায়সারা ব্যাপারটার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু পরিচিত নয়। সেবার প্রেরণা নিয়েই সে ওদের প্রত্যেকের শুশ্রূষা করে। অনেকটা সময় নিয়ে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাদের বাড়ির কথা, সন্তানদের কথা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা অত্যন্ত আপনজনের মতোই জিজ্ঞেস করে। এর ফলে চিকিৎসার পুরো ব্যাপারটাই গল্পের মধ্যে দিয়ে খুব সহজে এগিয়ে চলে। এতে কৃষ্ণেন্দুর যতো-না সুবিধে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি রোগীদের কাছে তাদেরই একজন হয়ে ওঠে। যার ফলে সারা ফ্যাক্টরিতে কৃষ্ণজি ডাক্তারের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এখানকার মানুষ অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষই কৃষ্ণেন্দু নামটার সঠিক উচ্চারণ করার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজি নয়। মেড ইজি'র সংস্করণে কৃষ্ণজি করে নিয়েছে।

এই প্রশংসা ছড়িয়েছে কানবর্গী গ্রামেও। সেখানকার মানুষরাও একান্ত ভাবে অনুভব করতে পারছে কৃষ্ণজি ডাক্তার তাদের পরিবারেরই একজন। সেই কারণে এই কুড়ি দিনের মধ্যেই দেখা গেছে রোগ ছাড়াও গ্রামের ওই মানুষরা তাদের বাড়ির সমস্যার কথাও অকপটে কৃষ্ণজি ডাক্তারের কাছে তুলে ধরেছে। কৃষ্ণেন্দুকে সেই সব সমস্যারও সমাধান করে দিতে হয় বই-কী! ফলে হয়েছে

কী, ইনভলমেন্ট বেড়ে যাওয়ার দরুন কবে কোথায় ডিউটি কৃষ্ণেন্দুরও ব্যাপারটা প্রায়ই গুলিয়ে যায়। ফ্যাক্টরির মানুষ এবং কানবর্গী গ্রামে তাদের পরিবারের লোকগুলো মিলে-মিশে একটা ছবি হয়েই কৃষ্ণেন্দুর চোখে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ আলাদা করে তখন আর কোনও কিছুকেই সে চিহ্নিত করতে পারে না। প্রত্যেক দিনই মনে হয় আজ ফ্যাক্টরিতে যাবার ডিউটি। প্রত্যেক দিনই মনে হয় আজই তো কানবর্গী যাবার দিন।

কৃষ্ণেন্দু নতুন করে আর একবার ভেবে নিল, সোম, মঙ্গল ফ্যাক্টরিতে। বুধবার কানবর্গী। বৃহস্পতি, শুক্র আবার ফ্যাক্টরি এবং শনিবার কানবর্গী মেডিকেল সেন্টারে। আজ হচ্ছে মঙ্গলবার। সেই হিসেবে ফ্যাক্টরিতে বসার দিন। ডিসপেনসারিতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওর চেয়ারে বোধহয় মিনিট পাঁচেক বসেছে। একজন বেয়ারা এসে জানালো, ছোটা মেমসাব আপকো বোলায়া। কী যেন ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এখন কোনও রোগী নেই। রোগীদের আসার সময় সকাল সাড়ে-ন'টা থেকে। ইতিমধ্যে কেউ যদি আহত হয়ে আসে সেটা আলাদা ব্যাপার। কেন-না আহত হবার তো কোনও সময়ক্ষণ বাধা থাকে না। কম্পাউন্ডার বিঠলভাইকে বলে কৃষ্ণেন্দু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দিকে পা বাড়ালো। এই কুড়ি দিনের মধ্যে অর্পিত্রমার সঙ্গে তার একবারও দেখা হয়নি। ডিউটিতে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেন ডেকেছে ঠিক ভেবে পেলো না। যাই হোক দরজা ঠেলে ওর ঘরের ভেতরে মুখ বাড়াতেই অর্পিত্রমা বেশ গম্ভীর হয়ে বললো, আসুন।

কৃষ্ণেন্দু ভেতরে ঢুকলে অর্পিত্রমা কেমন যেন এক রুক্ষ দৃষ্টিতে একঝলক দেখে নিয়ে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে পড়লো। তবে তার আগে ছোট্ট এক আওয়াজ তুললো, বসুন। কৃষ্ণেন্দু বসলো এবং যেহেতু অর্পিত্রমা আর কোনওরকম কথা না-বলে নীরবে কী সব কাগজের ওপর দ্রুত চোখ দুটোকে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—সে জানলার ফাঁক দিয়ে পেছনের পাহাড়টাকে দেখতে লাগলো।

মিনিট চারেক সময় প্রায় এমনি ভাবেই কেটে গেল। তারপরেই অর্পিত্রমা ওর নীল চোখ দুটো তুলে ধরলো কৃষ্ণেন্দুর দিকে। কোনওরকম ভণিতা-টণিতা নয়। অত্যন্ত স্পষ্ট করে সে সোজাসুজিই বললো, আপনার আগে যিনি ডাক্তার ছিলেন তাঁর সময়ে শ্রমিকদের মেডিক্যাল বাবদ আমাদের খরচ হতো প্রতি পনেরো দিনের বিল হিসেবে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। আর আপনি যে হারে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রেসক্রিপশন করে চলেছেন ইতিমধ্যেই ওষুধ কিনতে আমাদের খরচ হয়ে গেছে চল্লিশ হাজারের ওপর।

নির্লিপ্ত এক ঠান্ডা দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দু অর্পিত্রমার চোখের দিকে তাকালো। ওর ওই কথা শুনে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে কৃষ্ণেন্দুর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না। কিন্তু অর্পিত্রমা কতো দূর পর্যন্ত যেতে পারে সে-ও একবার দেখতে চায়। কৃষ্ণেন্দু শীতল গলায় শুধু বললো, ওই ডাক্তারকেই তাহলে ফেরত নিয়ে আসুন।

আমি তেমনটা ভাবছি না। অর্পিত্রমা মুখে নিরীহ ধরনের ওই কথাটা বললো বটে, তবে ভেতরে ভেতরে সে প্রচন্ড রেগে গেল। ছেলেটার দুঃসাহস কম নয়। আসলে তার মুখের ওপর কেউ কোনোদিন অমন ভাবে উত্তর দেয়নি। অর্পিত্রমা নিজেকে ধরে রেখে ভেতরের ফুসলে ওঠা রাগকে সংযত করে বললো, একটু অন্যরকম ভাবছি।

আপনার ভাবনা-চিন্তা আপনারই থাক। আমাকে কী করতে হবে বলুন?

সোজা হিসেব। অর্পিত্রমা দুই কাঁধ ছড়িয়ে উত্তর দিল, দামি ওষুধের প্রেসক্রিপশন করবেন না।

আমি কী করবো-না-করবো সেটা কি আপনি ঠিক করে দেবেন? একটু রুক্ষ সুরেই কৃষ্ণেন্দু বললো, রোগী দেখে তার সুস্থ হওয়ার জন্য যে-যে ওষুধ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করবো তাই-ই দেবো। কারো নির্দেশের ওপর সেটা ঠিক হবে না। বেড়াল মারার কাজটা প্রথম রাতেই সেরে ফেলা ভালো। কৃষ্ণেন্দু এবারে ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইলো, আপনারা কি আমাকে রোগীর সেবা করার জন্য এনেছেন, না মেডিক্যালের খরচ কমাবার জন্য এনেছেন—আগে এই প্রশ্নটার

মীমাংসা হওয়া দরকার।

এতোক্ষণ কৃষ্ণেন্দুর দাপট সহ্য করে গেছে অর্পিত্রমা। আসলে ও দেখতে চাইছিল এবং জানতেও চাইছিল এই ছেলেটার ভেতরে কতোটা বারুদ ঠাসা আছে। সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে সে নয়, কিন্তু তার সহ্যের তো একটা সীমা আছে। এই কোম্পানিতে তার একটা ডেজিগনেশন আছে, ইন্ডাসট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজার। কিন্তু সেটা তো বাইরের একটা খোলস মাত্র। আসলে সেই তো মালিক। সেই তাকেই ছেলেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না এটা ভাবা যায়? এমন কঠিন অবস্থায় অর্পিত্রমা কোনোদিন পড়বে জীবনেও ভাবেনি। সামান্য পনেরো হাজার টাকার বেতনের একজন ডাক্তার নিজেকে কী ভাবে? এক মুহূর্তে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে যথেষ্ট উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে অর্পিত্রমা উত্তর দিল, দুটোর জন্যই আপনাকে এনেছি।

খুব ভুল লোককে তাহলে বেছে নিয়েছেন।

শ্রমিক কর্মীদের মেডিক্যাল বিল আমরাই বহন করি। সেক্ষেত্রে খরচটা যাতে একটু কম হয় সেটা কি আপনি দেখবেন না?

না।

না কেন?

যেহেতু আপনাদের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখাটা আমার কাজ নয়। তার জন্য আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট রয়েছে।

কৃষ্ণেন্দুজি, কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবেন না। অর্পিত্রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের ও-পাশের ছেলেটাকে দেখতে দেখতে কঠিন সুরে বললো, আমি যা-জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দিন। আমাদের খরচা যাতে কম হয় সেই দায়িত্বের মধ্যে কি আপনি পড়েন না?

কক্ষনও না। আমি রোগীদের সুচিকিৎসা করে ভালো করে তুলবো। এর জন্য যতো দামি ওষুধের প্রয়োজন হবে প্রেসক্রিপশনে সেটা লেখাই আমার কর্তব্য। খরচ কমাবার জন্য আমি নিশ্চয়ই কম দামের আজে-বাজে ওষুধের নাম লিখতে পারি না। কেন-না আমার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা।

সেটা কি আমাকে মেরে?

আপনার সঙ্গে কথা বলা এখন অর্থহীন। আপনি কোনও কিছুই বুঝতে চাইছেন না।

সেটা আপনিই চাইছেন না। অর্পিত্রমা এবারে সামান্য একটু গলা উঁচু করে বললো, প্রথম থেকে আমি যে-কথাটা আপনাকে বোঝাতে চাইছি তা হলো একটু অ্যাডজাস্ট করে চলুন। লাগামছাড়া খরচটাকে একটু কমিয়ে আনুন। আপনাকে রোগী মেরে ফেলতে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে ব্যয়টা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। উইনোমিনোজ, ডেক্সোরেঞ্জ, আর বি টোন এমন কী কমপ্ল্যানের মতো দামি ফুডকেও আপনি প্রেসক্রাইব করেছেন।

পেশেন্টের যেটা প্রয়োজন তার বাইরে আমি অন্য কিছুই দেখি না।

দেখতে হবে। অর্পিত্রমার গলায় রীতিমতো আদেশের সুর।

কৃষ্ণেন্দু বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে পাল্টা জবাব ছুড়ে দিল, আপনি কিন্তু আমার ব্যাপারে—

নাক গলাচ্ছি। কৃষ্ণেন্দুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অর্পিত্রমা নিজের অহঙ্কার দেখালো। ঔদ্ধত্যের আরও পরিচয় দিয়ে বললো, চাকরিটা আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে করছি না। মেডিক্যাল বিলের খরচার বহর দেখে আমি হিমশিম খাচ্ছি সেটা আপনাকে বলতে পারবো না? এটা তো আপনারই হাতে—

এই কথা আপনাকে বারবার বলতে হবে না। কৃষ্ণেন্দু আর তর্কে যেতে চাইলো না। অপমানে ওর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিলো।

আফশোস তো সেটাই! একই বিষয় আপনাকে এতোক্ষণ ধরে বোঝাতে হচ্ছে। আপনি রোগীদের অতো দামি ওষুধ না-দিয়ে সাধারণ মানের ট্যাবলেট, মিক্সশ্চার ইত্যাদি দিতে রাজি হলেই ব্যাপারটা

অনেক সহজ হয়ে উঠতো।

এই শ্রমিক-কর্মীদের দিয়েই তো আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করছেন।

তাতে কী?

ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কয়েক হাজার টাকা যদি বেশি খরচা হয়ই..

এ-সব সস্তা ডায়লগ আর বলবেন না। পুরোনো হয়ে গেছে। অর্পিত্রমা দারুণ এক তাচ্ছিল্যের গলায় বললো, ডাক্তার না-হয়ে আপনার শ্রমিক নেতাই হওয়া উচিত ছিল।

অর্পিত্রমার খোঁচাটুকু কৃষ্ণেন্দু নীরবেই হজম করলো। ওর যা-মানসিকতা এবং ভেতরের ছবিটার পরিচয় পেলো তাতে আর যাই হোক নতুন করে কোনও আলোচনা চলতে পারে না। কৃষ্ণেন্দুর সেই ইচ্ছেও নেই। সে শুধু বললো, আপনি যদি একজন ডাক্তার হতেন তাহলে আপনার সঙ্গে কথা বলা যেতো, কিন্তু আপনি তো তা নন। আপনি বোঝেন শুধু ব্যবসা আর মুনাফা। এর বাইরে পৃথিবীর আর কিছু আপনি বোঝেন না। জানেন না, জানার সেই চেষ্টাটুকুও করেন না। তাই একজন মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা, সুস্থ করে তোলাটা আপনাব কাছে কোনও আনন্দের নয়, সুখের নয়। কোম্পানির কতো খরচ হলো সেই হিসেবটাই আপনার কাছে সবার আগে। দৃষ্টিভঙ্গিব যেখানে এতো তফাত সেখানে আপনাকে বোঝানো মানে উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটা। কৃষ্ণেন্দু কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত আর দাঁড়ালো না। অর্পিত্রমাব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা লিফটেব দিকে পা বাড়ালো।

কৃষ্ণেন্দু প্রথমে ভেবেছিল রেজিগনেশন লেটারটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ওক সাহেবকে দিয়ে এসে এই অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিকে বিদায় জানাবে। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বশে খামখেয়ালি কোনও কাজ করা উচিত নয়। অবশ্য রেজিগনেশন সে দেবেই, ওটা কোনও ব্যাপার নয়। বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকলে এর পরেও কেউ থাকবে এটা আশা কবা যায় না। কৃষ্ণেন্দুর চিন্তা-ভাবনা অন্যরকম। সে যখন আজ ডিউটিতে যোগ দিয়েছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখেই কাজ করবে। বাকি কাজটা সারবে ওই সময়ের পরে। ওক সাহেব তো প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা সওয়া-সাতটা পর্যন্ত থাকেনই।

ডিসপেনসারি থেকে বিকেল ঠিক পাঁচটায় কৃষ্ণেন্দু যখন উঠে পড়েছে সেই সময়েই নীরজ কান্নন এলেন। থাকেন কানবর্গীতে। অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির একজন দক্ষ শ্রমিক। গত পঁচিশ বছর ধরে এখানেই চাকরি করছেন। এখন ওঁর বয়স পঞ্চাশ একান্ন হবে। দু'সপ্তাহ ধরেই কৃষ্ণেন্দুর কাছে আসছেন। ওঁর গলা আর বুকের মাঝখানটা নাকি জ্বলে যাচ্ছে। সারাক্ষণই মনে হয় গলার কাছে কী যেন একটা চাপা ব্যথা সমস্ত বুকখানাকে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। খুবই অস্বস্তিতে রয়েছেন নীরজ কান্নন।

কৃষ্ণেন্দু ওর চেয়ারে আবার বসে পড়লো। নীরজ কান্ননকে দেখে সে মনে মনেই একটু হাসলো। ওঁকে ফিরিয়ে দিয়ে লাভ নেই। সম্ভবত বেলগাঁওতে এটাই তার শেষ রোগী দেখা। আর মাত্র আধ ঘন্টা বাদেই সে চাকরি ছেড়ে দেবে অথচ গভীর মমতায় জিজ্ঞেস করলো, এখন কেমন আছেন কান্ননজি?

আচ্ছে হ্যায় ডাগদার সাব। য্যাদা তকলিফ তো নেহি, স্রিফ.....

স্রিফ?

কোই চিজ খানে কা বাদ.....

ফের গড়বড় শুরু হয়ে যায় এই তো—কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে বললো, বুকের সেই চাপ ব্যথাটা যখন কমেছে তখন ভয়ের আর কোনও কারণ নেই। ওটাই আমাকে খুব বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ডাগদার সাব আজ কি নতুন কোনও দাওয়াই দেবেন।

দাওয়াই? কৃষ্ণেন্দু শব্দ করে হেসে উঠলো। কোম্পানির আর কতো খরচ বাড়াবো? এখন থেকে

স্রেফ হাওয়া খেয়ে থাকুন।

কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে নীরজ কান্ননও খুব হাসতে লাগলেন।

এখন সন্ধ্যা পৌনে-সাতটা হবে। কৃষ্ণেন্দু ওর কোয়ার্টারের প্রশস্ত ব্যালকনিতে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে। সাদা রঙের অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির ঠিক মাথায় শ্লেট কালারের সীমাহীন আকাশটা যেন চুম্বন করতে নিচের দিকে নেমে আসছে। ফ্যাক্টরি এবং আকাশের মাঝখানের অংশটুকু ভরাট করে রেখেছে নিঃশব্দ সৌন্দর্যের এক পাহাড়। সব মিলিয়ে পুরো ছবিটা দেখবার মতো। কৃষ্ণেন্দু পলকহীন চোখে সেই সৌন্দর্যের সাগরেই ডুব দিয়েছে। ঘন্টাখানেক আগে সে যে তার রেজিগনেশন লেটারটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর বিরাট লেটার বাক্সে ফেলে দিয়ে এসেছে—তাকে দেখলে সেটা বোঝার উপায় নেই। কোয়ার্টারে এসে হাত-মুখ ধুয়ে দিব্যি মেসে গিয়ে চা-জলখাবার খেয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে যে-ছেলেটি তার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে গ্র্যাজুয়েট ট্রেনী সেই ভাস্কররাওকেও কিছু জানায়নি। পুরো জিনিসটা যেন খুবই সাধারণ-পর্যায়ের ব্যাপার। আগে থেকে হইচই করে কোনও মাদল উৎসবের অনুষ্ঠান এটা নয়—চলে যাবার আগের মুহূর্তে একবার বলে গেলেই হবে। অর্থাৎ ঘটনাটা যে তার ওপরে বিন্দুমাত্র কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, দৈনন্দিন জীবনের মতোই এটাও একটা সাধারণ ব্যাপার, কৃষ্ণেন্দু সেই রকমই ভাবতে চায়। এবং দেখাতেও চায়।

ছাব্বিশ বছরের ছোট্ট জীবনে মুম্বাইয়ের বাইরে কৃষ্ণেন্দু এই প্রথম। সুতরাং অন্য কোনও জায়গার আবহাওয়া সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। এখন অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায় বেলগাঁওয়ের আবহাওয়া অতি চমৎকার। না-শীত, না-গরমের এক মনোরম তাপমাত্রা শরীরকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে রাজি নয়। বরং বাড়তি এক আমেজ সারা দেহকে শীতল বাতাসের স্পর্শে জুড়িয়ে দেয়। ব্যালকনিতে এই সময়টুকু বসার মধ্যেই কৃষ্ণেন্দুর সারা দিনের ক্লান্ত শরীরটা নতুন করে যেন ভোরের মুখ দেখলো।

আজকে বিকেলের ডাকেই মায়ের একটা চিঠি এসেছে। মা লিখেছেন, কৃষ্ণেন্দু মনে হচ্ছে তোকে কুড়ি বছর ধরে দেখিনি। এই ভাবে কষ্ট দেওয়ার অর্থ কী বুঝতে পারছি না। কয়েকটা দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে যা বাবা। মেসের খাওয়া-দাওয়া ভালো লিখেছিস—ভালোটা কী রকম? মাছ-মাংস ইত্যাদি নিয়মিত হয় তো? মাছ ক'টুকরো করে দেয়? বাড়িতে যে-ভাবে চেয়ে খেতিস তেমন করে ওখানে চাওয়া যায় কী-না সে সম্পর্কে কিছুই লিখিস্নি। সকাল, দুপুরে, বিকেল এবং রাতের খাওয়ার মাঝখানে যদি তোর কোনও কিছু খাবার ইচ্ছে হয় সেক্ষেত্রেই-বা কী করিস? মেস থেকে যদি না-দেয় তবে ঘরে বেশি করে কাজু বাদাম, বিস্কুট ইত্যাদি রাখিস। আগের চিঠিতেও লিখেছিলাম, দুধ রাখবি সে-কথার কোনও উত্তর দিসনি, দিন দিন তুই এতো অবাধ্য হচ্ছিস কেন? দুধ রাখলি কিনা অতি অবশ্যই জানাবি। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুই যে পুডিং খেতে এতো ভালোবাসিস ওটার কী ব্যবস্থা হচ্ছে ওখানে? মেসে যদি না-করে ওদেরকে বলবি করে দিতে। মোট কথা রোগা হয়ে আমার কাছে ফিরে আসা চলবে না। শরীরের ওপর যত্ন নিস। সাবধান মতো থাকিস। কারো সঙ্গে ঝগড়া করবি না আর সবার সঙ্গেই বন্ধুর মতো মিশবি। আমার স্নেহাশিস নিয়ে পত্রপাঠ উত্তর দিস।

এই হলো মা! সব মায়েদের মনটাই বুঝি একই ছাঁচে গড়া। ভাস্কররাও এখানে এসেছে চাকরি করতে বাঙ্গালোর থেকে। ও-ও প্রতি সপ্তাহে ওর মায়ের চিঠি পায় হুবহু এই একই ধরনের। কৃষ্ণেন্দু আর ভাস্কররাও দুজনেই হাসতে হাসতে একই কথা বলে, আমাদের বাড়ির চিঠিগুলো আমরা পাল্টা-পাল্টি করেও পড়ে নিতে পারি। তফাত যখন কিছুই নেই.....

মায়েদের স্নেহের টানে কখন ভাঁটা আসে না। নির্জন সন্ধ্যায় ব্যালকনিতে বসে বাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণেন্দুর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠলো। আসলে তাদের ছ'ভাই বোনের

মধ্যে কেউই কখনও মুম্বাইয়ের বাইরে যায়নি। মা-বাবুকে ছেড়ে থাকার প্রশ্নও ওঠেনি। এতো বছর একসঙ্গে এক জায়গায় থাকার পর হঠাৎ এই দূরত্ব কৃষ্ণেন্দুকে প্রায় সাহারা মরুভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো। সবাইকে ছেড়ে থাকার কষ্টটা এমন হবে তা সে আগে কেমন করে অনুভব করবে? তবে সান্ত্বনা এই আগামীকাল সন্ধ্যার ট্রেনেই কৃষ্ণেন্দু আবার তার বাড়ির পথে পা বাড়াবে। মা তাঁর চিঠির উত্তর খুব তাড়াতাড়ি চেয়েছেন। কৃষ্ণেন্দু নিজেই তার চেয়েও আগে সশরীরে উপস্থিত হবে।

দরজার বাইরের বেলটা এই সময় বেজে উঠতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কৃষ্ণেন্দু। ভাস্কররাও প্রায়ই আড্ডা দিতে তার ঘরে আসে। নিশ্চয়ই ও এসেছে। কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলো, ওক সাহেবের খাস বেয়ারা শ্রীধর।

বাত ক্যায়া হ্যায়? কৃষ্ণেন্দু স্বাভাবিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলো।

বড়া সাব আপকো আভি আভি বুলায়া। তেইশ বছরের কান্নাড়ী ছোকরা শ্রীধর সামান্য একটু সময় চুপ করে কৃষ্ণেন্দুর মুখখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরে আবার বললো, আগর আপ নেহি যায়েগা তো বড়া সাব খুদ হি আপকো পাস—

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তুমি যাও, আমি আসছি।

শ্রীধর চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণেন্দু থমকে কী যেন একটু ভাবতে লাগলো। ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিতে চলেছে। শ্রীধরের কথাতেই একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে তা হলো, ডাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণেন্দু যে নাও যেতে পারে সেটা আর কেউ না-বুঝুক—ওক সাহেব বুঝেছেন। তাঁর চিন্তার দ্বিতীয় প্রস্তাবও তাই একই সঙ্গে পাঠিয়েছেন, কৃষ্ণেন্দু না-গেলে তিনি নিজেই আসবেন।

কৃষ্ণেন্দু অভদ্র নয়। একজন মানুষের আর কিছুও যদি না-থাকে বয়সের সম্মানটুকু তো নিশ্চয়ই রয়েছে। এক্ষেত্রে ওক সাহেবকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই হয়। তিনি কেন অর্ধেকেরও কম বয়সী একটা ছেলের কাছে ছুটে আসবেন? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ঘটনায় কৃষ্ণেন্দুকে বিজয়ী মনে হলেও শোভনীয়তার দিক থেকে তেমন করাটা ঠিক নয়। নতুন করে শার্ট-প্যান্ট পরে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর দিকে পা বাড়ালো কৃষ্ণেন্দু।

ওক সাহেব তাঁর ঘরে একাই ছিলেন। মনে মনে কৃষ্ণেন্দুও এটাই চাইছিল। শ্রীধরকে তার কোয়ার্টারে এই ভাবে পাঠিয়ে ডেকে আনার অর্থই হলো রেজিগনেশন লেটার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা। স্বভাবতই এই বৈঠকে অর্পিত্রমার থাকার কথা। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে সে এই আলোচনায় যোগ দিতেও পারে। কৃষ্ণেন্দুর আপত্তি ঠিক এইখানেই। সে আসার পথেই ভেবে রেখেছিল অর্পিত্রমা উপস্থিত থাকলে কোনওরকম আলাপ আলোচনায় অংশ নেবে না। তাতে যদি ওক সাহেব তাকে অভদ্র ভাবেন তো কিছুই করার নেই। সুখের কথা অর্পিত্রমা সেই ঘরে নেই।

ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল. কে. ওক এমনিতে ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সেই কারণে তিনি কখনওই তাঁর বিচক্ষণতা হারিয়ে কোনও কাজকেই জটিল করে তোলেন না। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপস্থিত বুদ্ধির সমন্বয়ে তিনি এর আগেও বহুবার কঠিন পরিস্থিতির সামাল দিয়েছেন।

আসলে তিনি জানেন, ঠিক কখন কার সঙ্গে কীভাবে বাতাবরণ করতে হয়। ওই চাবিকাঠিটাই বোধহয় তার সহজাত ঠান্ডা মেজাজকে আরও নিয়ন্ত্রণে রেখে ধৈর্যের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ করে দেয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

মিঃ এল.কে. ওক কৃষ্ণেন্দুকে চেয়ারে বসতে বলা সত্ত্বেও সে অন্যমনস্ক ভাবে কী যেন ভাবছিল। ওক সাহেব মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে? অনেক কথা আছে। বোসো—

নিঃশব্দে মুখোমুখি চেয়ারটাতে বসে কৃষ্ণেন্দু অন্য একটা আশঙ্কা করছিল। ওর বারবারই মনে হচ্ছিলো অর্পিত্রমা ওক নামের সেই একগুঁয়ে, জেদী মেয়েটা নিশ্চয়ই এই ঘরে আসবে। আর আবার এক পশলা তর্কের বৃষ্টি, কথা-কাটাকাটি যেটা সে সুস্থ থাকার কারণেই এড়াতে চায়। নয়তো বাকবিতন্ডার সিঁড়ি দিয়ে নামা একবার শুরু করলে অনেক নিচে নামতে হবে। যাবার সময় আবহাওয়া

উত্তপ্ত করার কোনও প্রয়োজন নেই। বিদায় নেওয়াটা ঠিক বিদায় বেলার সঙ্গে মানানসই হওয়াই ভালো। যাই হোক, সহজ কথাটা কৃষ্ণেন্দু এতোদিন সহজ ভাবেই বলে এসেছে। এবারেও প্রথমেই সেই কথাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, আপনি আমাকে ডেকেছেন আমি এসেছি। আলোচনা যা-হবে তা কিন্তু আমাদের এই দুজনের মধ্যে। তৃতীয় কেউ......

তৃতীয় কাউকে দেখতে পাচ্ছো কি? অর্পিত্রমার ওপর যে কৃষ্ণেন্দুর মোটেই আস্থা নেই—তা ওর ওই একটি মাত্র কথা 'তৃতীয় কেউ' বলার মধ্যেই যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। ওক সাহেব সেটা বুঝে নিয়েই চমৎকার ভঙ্গিতে বললেন, আমরা দুজনে আলোচনা কববো বলেই তো এই সময়টাকে বেছে নিয়েছি। নয়তো ঘন্টা খানেক আগেই তোমাকে ডাকতে পারতাম। তা কী ব্যাপার বল তো কৃষ্ণেন্দু, ইস্তফা তুমি দিতেই পারো, কিন্তু সেটা কি আমার কাছে না-এসে চিঠির বাক্সে ফেলে? হ্যাঁ, অর্পিত্রমার সঙ্গে তোমার মতের পার্থক্য হতেই পারে সেজন্য আমি নিশ্চযই দায়ী নই। অর্পিত্রমা আমার মেয়ে সেটা অবশ্যই বাড়িতে, অফিসে ও-সবের কোনও স্থান নেই। তোমার কি একবার আমার কাছে আসা উচিত ছিল না? ওক সাহেব একটু কৌতুকের সুরে বললেন, নাকি মেয়ে এবং বাবাকে একই সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায়...

ও-কথা বলবেন না স্যার! কৃষ্ণেন্দু হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লো। আসলে এতো ধীর-স্থির নমনীয় এক স্নিগ্ধ গলায় মিঃ এল.কে. ওক সম্পূর্ণ যুক্তির ওপর নির্ভব কবে প্রতিটা কথা বলছিলেন যে উত্তরে কৃষ্ণেন্দুর প্রায় কিছুই বলার ছিল না। সবচেয়ে বড়ো কথা উনি কোনও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেননি। যেন নিজেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে গভীর সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার পেতে পরামর্শেব কাজটুকু সেরে নিচ্ছেন।

ওক সাহেব একটা চুরুট ধরিয়ে বোতাম টিপলেন। শ্রীধব সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলে তিনি ছোট্ট করে বললেন, দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দাও। তারপরেই ওক সাহেব পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুব চোখের দিকে তাকালেন, কী যেন পড়ে নেওয়ার চেষ্টা কবে বললেন, এটা ঠিক অর্পিত্রমা ভুল করেছে। কাকে কী ওষুধ দেবে, কম দামি ওষুধ না বেশি দামের ওষুধ ইত্যাদি ওর বা আমাব দেখার বিষয় নয়। সে-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবেই তোমার। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু—তুমি হঠাৎ রিজাইন করতে গেলে কেন?

আমি সব সহ্য করতে পারি একমাত্র অপমান ছাড়া। অর্পিত্রমাজি যে-ভাবে শুরু কবেছিলেন......

আমি সব জানি। ওক সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে গুরুত্ব দিয়ে বললেন, ওয়েল মাই বয়, তুমি যদি এতে অপমানিত বোধ করো সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। তবে তোমাকে একটা কথা বলবো, এতো সহজে এবং এতো তাড়াতাড়ি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনায় আঘাত পেয়ে এই ভাবে দূরে সরে যেয়ো না। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সেন্টিমেন্টকে বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধ কবো এবং জয়ী হও। রিজাইনের অর্থ অন্য সব ক্ষেত্রে ঠিক থাকলেও এক্ষেত্রে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? পলায়ন মনোবৃত্তি। তুমি যদি চাকরি না-করো সেটা আলাদা—চাকরি করলে ভারতবর্ষের প্রতিটা কোম্পানিতেই অর্পিত্রমা ওকের মতো ম্যানেজমেন্ট পাবে। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, ক'জায়গা থেকে তুমি পালাবে? ক'বার এইভাবে রিজাইন করবে? যুদ্ধ করতে শেখো কৃষ্ণেন্দু। সেই যুদ্ধ মানে এই নয় কাউকে আঘাত কর—সেই যুদ্ধ হবে নীতি এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। রোগীদের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তুমিই সব। এখানে আমার বা অর্পিত্রমার কোনও ভূমিকা নেই। এই ক্ষেত্রে তুমিই টপ। তাহলে মন খারাপ করে শুধু শুধু কেন চলে যাবে? তোমার যথার্থ ভূমিকা পালন করার এই তো সুযোগ। ঝগড়া, তর্ক, কথা কাটাকাটি যাইই হোক না কেন, ডাক্তার হিসেবে তুমি যেটা ভালো বুঝবে ঠিক তাই করবে। এখানে রিজাইন করার প্রশ্ন কেন কৃষ্ণেন্দু? ওটা তুমি উইথড্র করো—

শ্রীধর ইতিমধ্যে কফি দিয়ে গিয়েছিল। কফিতে চুমুক বসিয়ে ওক সাহেব লাইটার জ্বেলে নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরালেন। সেই মুহূর্তে কৃষ্ণেন্দু একটা প্রশ্ন রাখলো, আবার যদি অর্পিত্রমাজি

এই রকম......

আবার নিশ্চয়ই তুমি রেজিগনেশন লেটারটা নিচের বাক্সে ফেলবে না। একরাশ নিষ্পাপ কৌতুক ছড়িয়ে ওক সাহেব বললেন, দেখো কৃষ্ণেন্দু তোমাকে একটা কথা সোজাসুজি বলি, ওই শ্রীধর থেকে আমি পর্যন্ত আমরা সবাই হলাম একটা পরিবারের মতো। দেড় হাজার মানুষের এই এতো বড়ো ইন্ডাসট্রিয়াল ফ্যামিলিতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকেরই মনোমালিন্য একটু হতেই পারে। এর অর্থ এই নয় যে, সেই ফ্যামিলি ছেড়েই চলে যেতে হবে। আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই তো একটা সম্মানজনক মীমাংসার শিখরে পৌঁছাতে হবে। এটাকে আর কখনও অস্বীকার করো না। তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা এই সঙ্গে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, এই ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির থেকে তুমি যে-মুহূর্তে অন্য সংস্থায় ভালো সুযোগ-সুবিধে পাবে তখন চলে যেতে কোনওরকম দ্বিধা কববে না। কারো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। ওক সাহেব শিশুর মতো হাসি নিয়ে আরও যোগ করলেন, আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মরক্ষার মানসিকতা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলবে—এই ভাবে আর কখনও পালাবার চেষ্টা করো না। অনেকক্ষণ তোমাকে আটকে রাখলাম, এবারে এসো—আর হ্যাঁ, তোমার রেজিগনেশন লেটারটাকে ছিঁড়ে ফেলবে, তুমি না আমি?

কৃষ্ণেন্দু হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু চলে যাবার কোনওরকম আগ্রহ দেখালো না। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওক সাহেব সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

না।

কোনওরকম দ্বিধা করে না কৃষ্ণেন্দু।

তবুও বলতে পারলো না কৃষ্ণেন্দু। ওক সাহেবের মুখখানা এই মুহূর্তে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওঁকে আরও চিন্তার মধ্যে না-ফেলাই ভালো। কৃষ্ণেন্দু আসলে বলতে চেয়েছিল, মেডিক্যালের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে অর্পিত্রমা ওক আমার সঙ্গে যেন কথাবার্তা না বলে। ওই মহিলার যে প্রচন্ড রাগ এবং জেদ-তেজের নমুনা সে দেখেছে, এবং প্রতিটা কথার সঙ্গে বিষ মেশানো যে-ছুরিটা মানুষের সম্মানকে টুকবো টুকবো করে দেয়—তার সঙ্গে আজ না-হলেও কাল আবার লাগবে। সুতরাং এখন থেকেই একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কৃষ্ণেন্দু কিন্তু সে-সব কিছুই বললো না। শুধু বললো, আমার যদি কখনও কোনও প্রয়োজন হয় আপনার কাছে আসতে পারবো?

নিশ্চয়ই।

আর একটা কথা বলছিলাম—

বলো।

তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসবো। আপনি যদি—

সে তুমি আসতেই পারো। ছুটিগুলো তো দেওয়াই হয় সেই কারণে। ওক সাহেব প্রশান্ত গলায় বললেন, তোমার আর কিছু বলার নেই তো?

না স্যার।

তাহলে এবার ওঠা যাক। চলো—

বেলগাঁও শহরের আভিজাত্যপূর্ণ এলাকা অনেকগুলো থাকলেও তিলকধারি অঞ্চলটা সবার ওপরে। সমতলভূমি থেকে সামান্য উঁচু একটা বিস্তৃত টিলার ওপর তিলকবারির প্রতিটা বাড়ি সত্যিই ছবির মতো। আর সমস্ত টিলাটাকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘিরে রেখেছে ঝাউ, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস আর পাইনের গভীর ছায়া। তিলকবারির মনোরম বাড়িটার নাম 'গুজরানা'। গুজরানার কারুকার্যপূর্ণ ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো আরাম কেদারায় বসে আছেন শুভলক্ষ্মী আর অর্পিত্রমা। ফ্যাক্টরি থেকে ফিরতে স্বামীর দেরি হওয়ার কারণটুকু মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করতেই অর্পিত্রমা ঘটনাটা পুরোপুরি তুলে ধরেছিল মায়ের কাছে। সব শেষে একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, বাবা ওই কৃষ্ণেন্দুজির সঙ্গে

নাকি মিটমাট করে আসবেন।

শুভলক্ষ্মীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ফর্সা এবং গোলগাল ধরনের সুশ্রী চেহারা। গলার কালো রঙের মঙ্গলসূত্রটা তাঁর সেই ফর্সা রংকে যেন আরও বেশি মেলে ধরেছে। এমনিতে স্বামীর মতোই ঠান্ডা মানুষ তবে মেয়ের দাপটে এখন অতিরিক্ত নিরীহ হয়ে গেছেন। নিজের মেয়ে বলে অস্বীকার করে তো লাভ নেই....অর্পিত্রমা ছোটবেলা থেকেই ভীষণ জেদী। এতো রাগ ও শরীরের কোথায় যে লুকিয়ে রাখে ওই জানে। শাসন-টাসন তো নেহাত কম হয়নি, কিন্তু যে কে সেই। শুভলক্ষ্মী অনেক বুঝিয়েছেন, অর্পিত্রমা এখন মা'কেই বুঝতে চায় না। প্রতিটা ক্ষেত্রে ওর কথাটাই হবে শেষ কথা। বাবাব কথা যে একেবারেই শোনে না ঠিক তা নয়। তবে সেটা কালে-ভদ্রে। ডায়েরিতে স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে লিখে রাখার মতোই ব্যাপার। আসলে অর্পিত্রমা নিজের খেয়াল খুশি মতোই চলতে চায় এবং অন্য সবাইকেও তার মতেব সঙ্গে চলতে বাধ্য করে।

মেয়ের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছেন শুভলক্ষ্মী তাতেই বুঝতে পারছেন, কৃষ্ণেন্দু নামের ছেলেটি 'জো হুজুর' টাইপের নয়। প্রযোজনে সে জ্বলে উঠতেও পারে। অর্পিত্রমাকে যে সে ছেড়ে কথা বলেনি....তা তো ওর বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে সমানে গজরানো দেখেই টের পাওয়া গেছে। অর্পিত্রমাব সারাক্ষণ ওই এক কথা, কৃষ্ণেন্দু নামের এক ডাক্তার এসে আমার কাছ থেকে স্যালারি নিয়ে আবার আমাকেই কথা শোনাবে? এ-জিনিস চলতে পারে না।

ব্যালকনিতে বসে বসে সারাক্ষণ মেয়ের এই সব কথাই নিঃশব্দে শুনে গেছেন শুভলক্ষ্মী। কাব ন্যায় কার অন্যায় ইত্যাদি বিষযে একটি কথাও বলেননি। এতোক্ষণ গজগজ করে অর্পিত্রমাও যেন ক্লান্ত। ফলে পাশাপাশি বসে থাকা সত্ত্বেও মা এবং মেয়ে দুজনে যেন দুই মেরুতে বসবাস করছেন। সময় সম্পর্কে কারোরই খুব একটা ধারণা ছিল না। তবে বাত এখন ন'টা সওয়া-ন'টা হবে। শুভলক্ষ্মী তাঁর আসন ছেড়ে সবে উঠতে যাবেন এমন সময়ে গুজরানার সিংহ দবজা দিয়ে স্বামীর গাডিটাকে ঢুকতে দেখা গেল।

ড্রইংরুম পার হয়ে মিঃ এল.কে. ওক নিজেদের শোবার ঘরের দিকে পা দুটোকে যেন টানতে টানতেই নিয়ে গেলেন। ওঁর পেছন পেছন গিয়ে উপস্থিত হলেন শুভলক্ষ্মী। স্বামীর কোট খুলে দিতে সাহায্য করলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে লাগায়ো বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ ওক। পাজামা ও পাঞ্জাবি পবে হালকা হয়ে তিনি অত্যন্ত আরামদায়ক একটা সোফার গহ্বরে প্রায় ডুবে গেলেন। শুভলক্ষ্মী কাজুর সরবত নিয়ে ঘরে আসতেই মিঃ ওক একটু সোজা হয়ে বসলেন এবং স্ত্রীর হাত থেকে সুদৃশ্য কাচের গেলাসটি নিয়ে মুহূর্তে ওটা শূন্যে নামিয়ে এনে যথাস্থানে ফের দিয়ে একটা চুরুট ধরালেন। ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো অর্পিত্রমা। চোখের কোণ দিয়ে বাবাকে একবার দেখে নিলো। অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি গম্ভীর লাগছে।

মিঃ ওক ঠিক করেই রেখেছিলেন আজ তিনি বাড়ি ফিরে একটু গম্ভীর হয়েই থাকবেন। এ-সম্বন্ধে কোনও ভুল নেই, অর্পিত্রমা বাড়াবাড়িটা একটু বেশিই করেছে। সুতরাং ওর ভুলের গুরুত্বটা ও নিজেই যাতে বুঝতে পারে। মিঃ ওক মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছেন, অনেক শিখিয়েছেন কিন্তু ব্যাপারটা ওই একই। দু-চারদিন কিছুটা ভালো থাকে তারপরে আবার যে কে সেই।

কী কথা হলো তোমাদের? অর্পিত্রমা বেশ শান্ত গলাতেই জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি স্যারেন্ডার করে এলে?

হ্যাঁ। মিঃ ওক স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে আপন মনে চুরুট টানতে লাগলেন।

ওকে আমি তাড়িয়েই ছাড়বো। আহত শঙ্খিনী যেন ফুঁসলে উঠলো। আমি ভেবে পাই না কৃষ্ণেন্দু বসুকে তোমার এই ভাবে তোয়াজ করার কী হলো? আমার মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকছে না।

ঢুকবেও না।

বাবা, তুমি ছোট্ট ছোট্ট করে এমন কাটা কাটা কথা বলো না। অর্পিত্রমা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই বাবার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কৃষ্ণেন্দুজির মাথায় প্রশ্রয়ের এই রাজমুকুট তুমি কোন যুক্তিতে পরিয়ে এলে? আমাকে ও কম কথা শুনিয়েছে? তা সত্ত্বেও

তুমি—অর্পিত্রমার সারা মুখখানা কাঠিন্যের মেঘে ছেয়ে গেল। সে স্পষ্ট বললো, ওর রেজিগনেশন দেওয়ার ইচ্ছে আমি সারা জীবনেব মতো মিটিয়ে দিতাম। চাকরি করতে এসে যার এতো সাহস থাকে—

আমার পয়েন্টও ঠিক এটাই। মিঃ ওক খোলাখুলিই মেয়েকে বললেন, সেই সাহসটা নিশ্চিত ভাবেই সত্যের কাছাকাছি থাকে। তার আগে অর্পিত্রমা তোমাকে একটা কথা বলে নিই, এটা আমাদের বাড়ি। এখানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণেন্দু নেই। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখার প্রয়োজনটা সবার আগে। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, কৃষ্ণেন্দুজি সত্যিকারেব একজন ভালো ডাক্তারই নয়—ভালো ছেলেও। এই কুড়ি-একুশ দিনে ওর জনপ্রিয়তা একবারও লক্ষ্য করেছো? এই সেই একটা জায়গা, ভেতরে ফাঁকা থাকলে বাইবের এমন ভালোবাসা কখনও পাওযা যায় না। ছেলেটা সাচ্চা না ঝুঠা আমি তো এই একটা ব্যাপারেই যাচাই করে নিতে পারি। দিন কুড়ির মাথায় এই ছেলেই যদি রিজাইন করে চলে যায় কোম্পানির সুনামের ক্ষেত্রে সেটা হতো এক প্রচন্ড আঘাত। আর যাই হোক, ফ্যাক্টরিটাকে তো আমি আমার গোঁসাঘর বানাতে পারি না। সূক্ষ্ম এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো যদি আমাদের না-থাকে তাহলে গড়ার চেয়ে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে যাওয়া হবে—সেটা নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়। এখানে কৃষ্ণেন্দুজিকে রাজমুকুট পরাবাব প্রশ্ন নেই। আমি কোম্পানির মালিক হলেও একজন মানুষ। ভুল-ত্রুটি আমারও হতে পারে। সেটা অপবের ঘাড়ে চাপিযে না-দিয়ে স্পোর্টিংলি মেনে নেওয়াই ভালো। এতে কেউ ছোট হয়ে যায় না। তোমার আতঙ্ক তুমি হেরে যাচ্ছো—

ঠিক তাই। অর্পিত্রমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। আমাকে তুমি—

আমি নিশ্চিত তোমাকে ছোট করে আসিনি। যেটা সত্যি তা শুধু স্বীকার কবে এসেছি। শুভলক্ষ্মীব মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ ওক বললেন, তুমিই বলো—যে-কারণেই হোক পরপর কয়েকজন যদি এমনি করে রিজাইন করতে থাকে এই কোম্পানির ওপর কারো আস্থা থাকবে? এটা যে একটা সুখী পরিবার—মুখের এই কথাগুলো মন থেকে কেউ বিশ্বাস করবে? এর চেয়েও বড়ো ব্যাপাব হলো অর্পিত্রমা ঠিক যে-বিষয়টার ওপর কৃষ্ণেন্দুকে বলতে গিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ভাবেই শ্রমিক-কর্মীদের বিপক্ষে যেতো। ওরা বিক্ষোভ দেখাবার, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার বিরাট একটা সুযোগ পেতো। সহজ পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলার বিলাসিতা অন্তত এই মুহূর্তে আমার নেই। ভেবে দেখো তো, কৃষ্ণেন্দু যদি একবার ফ্যাক্টরির দেড় হাজার মানুষকে বলে, আমি তোমাদের চিকিৎসা করতে চাই, তোমাদের সারিয়ে তুলতে চাই, সেই কারণেই প্রয়োজন মতো তোমাদের ওষুধ দিই। কিন্তু এই ম্যানেজমেন্ট আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে লেবারদের কখনও বেশি দামের ওষুধ ইত্যাদি দেবে না। সেই সময়ের উত্তাল পরিস্থিতিটা একবার চিন্তা করতে পারছো? অর্পিত্রমা, তোমার কথাতেই বলি, স্যারেন্ডার আমি এমনি করি না। পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে যারা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে না অসহায় অবস্থার শিকার তারাই হয়। অনেক মমতা দিয়ে গড়া ওক অ্যালুমিনিয়ামকে আমি পুতুলের খেলাঘর বলে কিছুতেই ভাবতে পারি না। আর একটা জিনিস দেখো, কতো অল্পতেই তুমি তোমার ধৈর্য হারিয়ে ফেলো—প্রথম পনেরো দিনে মেডিক্যাল বিলের খরচ তোমার হিসেবে বেশি হয়েছে। খুব ঠিক কথা। কিন্তু এটাকেই তুমি ফিক্সড ধরে নিচ্ছো কেন? আরও তো কমে যেতে পারে। মানুষের রোগভোগ কি প্রতি মাসে একই রকম থাকে? কখনও বাড়বে, কখনও কমবে—এর জন্য কৃষ্ণেন্দুকে ডেকে পাঠিয়ে ওই ভাবে চার্জ করা এটা ঠিক নয় অর্পিত্রমা। প্রতিটা মানুষেরই একটা মিনিমাম সম্মান আছে। সেখানে আঘাত লাগলে সে তোমাকে ছাড়বে কেন? আমি মেনে নিচ্ছি কৃষ্ণেন্দুও তোমাকে কম কথা শোনায়নি। সে তো তোমাকে তার আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে গেছে। তুমি কেন অধিকারের সীমানা না-জেনে তার কব্জায় চলে গেছো? সেই কারণেই কৃষ্ণেন্দু তোমাকে ওই কথাটা বলতে পেরেছে, 'ইন্ডাসট্রিয়াল রিলেশন ম্যানেজারের চেয়ারে না-বসে আপনি ডাক্তারের চেয়ারে বসে ইচ্ছে মতো খরচ কমান।' একটা কথা কী জানো মা, মিঃ ওক হিরণ্ময় স্পর্শ বুলিয়ে বললেন, তোমাকে আমি মোটেই ছোট করে আসিনি। তবে তোমার হয়ে ওকালতিও করিনি। কৃষ্ণেন্দু যদি আমাকে একটা মাত্র কথা বলতো, 'নিজের মেয়েকে মানুষ করার ক্ষমতা নেই—তার হয়ে

ঝগড়া করার ক্ষমতা আছে তাহলে আমি মাটির সঙ্গে মিশে যেতাম। সেই কারণে সব দিক বিবেচনা করেই—

এতে কি কৃষ্ণেন্দুজির সাহসটা আবও বেড়ে গেল না?

তা কেন হবে? ওর পরিমিতি বোধ যথেষ্টই রয়েছে।

তুমি দেখো, এর পর আমাকে ও কোনও মূল্যই দেবে না। অর্পিত্রমা একঝলক গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করে বললো, আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না।

এটা তোমার অহেতুক সন্দেহ। মিঃ ওক খুবই আস্তে অথচ প্রত্যয়ের শীর্ষবিন্দুতে পৌছে বললেন, কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে তো কথা বলে দেখলাম ও তেমন ছেলে নয়। অন্য পাঁচজনের থেকে ও নিশ্চিত ভাবেই আলাদা। আমি একটা জিনিস বুঝি, যার বাড়ির অবস্থা যতো ভালোই হোক না কেন—এক কথায় যে এই ভাবে চাকরি ছাড়তে পারে তার ভেতরের তেজটা শুধুমাত্র দেশলাই কাঠির ওই অল্প বারুদ দিয়ে তৈরি হতে পারে না।

এতোক্ষণ আলোচনার পর হঠাৎ যেন এক বনভূমির নির্জনতা গুজরানার এই ঘরে নেমে এলো। মিঃ ওক, শুভলক্ষ্মী এবং অর্পিত্রমা প্রত্যেকেই যেন নিজেদের হৃদয়ের শব্দ শুনতে লাগলেন। এমন শূন্যতা বুঝি নতুন করে ভরাট করার জন্যেই। মিঃ ওক কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শুভলক্ষ্মী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নিয়ে বললেন, দশটা পঁচিশ। তোমবা খাবে না?

হ্যাঁ, খেতে দিতে বলো। মিঃ ওক হাসতে হাসতে বললেন, সময় মানুষকে বড়ো ধোঁকা দিতে পারে তাই না? এতো রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর কৃষ্ণেন্দু তার ঘরে বসে ভাস্কররাও-এর সঙ্গে গল্প করছিল। রূপকথার গল্প শোনার মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভাস্কররাও বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কৃষ্ণেন্দু তোর কথা শুনে সত্যিই আমি নতুন করে এক প্রেরণা পেলাম। একটু সময় নিয়ে চুপ করে থেকে সে আবার বললো, আসল ব্যাপাবটা কী জানিস, বাঙ্গালোর থেকে এখানে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই অর্পিত্রমাজির সঙ্গে আমারও একবার লেগেছিল। আমাকে একটা বাজে কথা বলেছিল। বেশ অপমানিত বোধ করেছিলাম অথচ যেটা করার ইচ্ছে ছিল তা করতে পারিনি। আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো নয় সে-কথা তো তোকে জানিয়েছি। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে আমিই সবার বড়ো। মা-বাবা এবং ঠাকুমা আছেন। বাবা পঙ্গু হয়ে সারা বছর বিছানাতেই থাকেন। বুঝতেই পারছিস এই আটজনের দায়িত্ব আমার একার ওপর। সুতরাং ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির কনফারমেশন লেটারটা বাঁচার এবং বাঁচাবার জন্য আমাকে পেতেই হবে। কৃষ্ণেন্দু, আমি সেদিন প্রয়োজনেও জ্বলে উঠতে পারিনি। সেই জ্বালাটা অহরহ আমার বুকের ভেতরে ছাই চাপা হয়ে রয়েছে। কিন্তু করার কিছু নেই। আমার মা-বাবা, ঠাকুমা, ভাই-বোনদের ভরণপোষণের কাছে আমার ব্যক্তিগত মান-সম্মানের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু তুই যে অর্পিত্রমাজিকে কিছু বলতে পেরেছিস, সঠিক ভাবে সঠিক জায়গাতেই ওকে আঘাত করতে পেরেছিস—আমার মনে হচ্ছে তোর থেকেও বেশি সুখী আমিই হতে পেরেছি। ভাস্কররাও-এর চোখ দুটো জলে চিকচিক করে উঠলো। সেই সঙ্গে গলাটাও ধরে এলো।

কৃষ্ণেন্দু বললো, তুই বড্ড ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষের প্রশ্ন নয় রে—অপমানের যে-কাঁটাটা এতো দিন আমার গলায় বিঁধে ছিল তুই সেটাকে অনায়াসেই বার করে দিলি। কৃতজ্ঞতার আনন্দে চোখে জল আসাই তো স্বাভাবিক।

সে তো হলো, রাত এখন ক'টা বাজে জানিস? কৃষ্ণেন্দু বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বললো, একটা বেজে এগারো মিনিট হয়েছে। তুই ঘুমুতে-টুমুতে যাবি না গল্প করেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দিবি?

আমার ঘুম আসছে না। ভাস্কররাওয়ের পরিষ্কার উত্তর।

আমারও আসছে না। তবে এতো বড়ো রাতটা শুধু ছেলেতে ছেলেতে গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যায় নাকি? ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস ভরে নেবার মতোই একঝলক সুস্থ হাসির জলতরঙ্গ বাজিয়ে কৃষ্ণেন্দু বললো, ঠিক বলছি কী না বল?

আচ্ছা কৃষ্ণেন্দু—

বল।

ধর এই অর্পিত্রমাজির সঙ্গেই তোর যদি একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে?

ধুস্।

হতেও তো পারে? যে-মেয়েরা অপরকেই নত করতে অভ্যস্ত তারা কিন্তু তোর মতো ছেলেকেই পছন্দ করে নিজেরা নত হওয়ার জন্য।

ওই পাহাড়ের গোড়ায় যে ভাটিখানা রয়েছে, আমার ঘরে আসার আগে তুই কি সেখান থেকে ঘুরে এসেছিস নাকি রে? নেশা চড়েছে মনে হচ্ছে। আরও দু'বোতল ঠার্রা খেয়ে আয় যা—

আমি ফাজলামো করছি না। বল না সত্যি সত্যিই এমনটা যদি হয়?

ওক অ্যালুমিনিয়ামের পুরো সাম্রাজ্য দিলেও নয়—কৃষ্ণেন্দু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, আমাকে যে অপমান করে তার কাছে আমি জীবনে হাসতে শিখিনি। আর আত্মমর্যাদাহীন মানুষকে আমি কখনও—

কৃষ্ণেন্দু তুই কি আমাকে ঘৃণা করিস?

এ-কথা আসছে কেন?

তোর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি নিশ্চয়ই আত্মমর্যাদাহীন মানুষ। যে-পড়ে পড়ে শুধু মার খায়, কোনও প্রতিবাদ করতে পাবে না। ভাস্কররাও হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। এ-কান্না ব্যথা এবং বঞ্চনার। শেকল পরানো হাতে বজ্রমুঠি তোলার নিষ্ফল যন্ত্রণা। অর্পিত্রমা ওক চূড়ান্ত অপমান করে বলেছিল, 'থাকতে হয় থাকুন, নয়তো দরজা খোলা রয়েছে চলে যেতে পারেন।' ভাস্কররাও খোলা দরজা দিয়ে আজও চলে যেতে পারেনি।

আজকে কৃষ্ণেন্দুর ডিউটি কানবর্গী গ্রামের মেডিক্যাল সেন্টারে। ফ্যাক্টরির ডান পাশ দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তাটা সামান্য উঁচু-নিচু হয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গ্রামের দিকে চলে গেছে। পিচের রাস্তা যেমন রয়েছে অজস্র মাটির রাস্তাও শাখা-প্রশাখার মতো পুরো কানবর্গীকে আঁকড়ে ধরে আছে। এক পাশে পাহাড় এবং আর এক পাশে ন্যাশনাল হাইওয়ের মাঝখানে বেশ বড়ো আকারের গ্রাম এই কানবর্গী। শহর এখান থেকে পাঁচ-ছ কিলোমিটার এবং পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ আসা সত্ত্বেও কানবর্গীতে গ্রামের গন্ধ পাওয়া যায়। দীঘল দীঘল গাছের ঘন ছায়া, পাদপাদপের মনোরম সারি, চতুর্দিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খন্ড খন্ড সবুজ ক্ষেত, টলটলে জলের অসংখ্য পুকুর এবং বেশ কিছু পাকা বাড়ির সগর্ব ঘোষণা থাকলেও খোলার চালের রং করা মাটির ঘরগুলোই দু'চোখে স্নিগ্ধ প্রলেপের মায়াময় কাজল পরিয়ে দেয়।

কানবর্গী গ্রামে মোটামুটি সাতশোর মতো পরিবার আছে। এরমধ্যে পাঁচশো ঘর মারাঠি এবং বাকি দুশো ঘর কান্নাড়ীদের। বেলগাঁও নিয়ে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের সীমানা-বিরোধটা এই গ্রামে মাঝে মাঝে আয়নার মতো ফুটে ওঠে। দু'হাত এগিয়ে কার আগে কে জমিতে বেড়া দিতে পারে ছোট্ট এই সীমানা নিয়েও দু'পক্ষে লেগে যায় সংঘর্ষ। জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মারাঠিতে-মারাঠিতে অথবা কান্নাড়ীদের নিজেদের মধ্যে লেগেছে বলে এখনও পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু শোনেনি। আশঙ্কা তার সেই কারণেই বেশি। একটা জাতের ওপর আর একটা জাতের এই আক্রোশ যে-কোনও সময়ে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

কৃষ্ণেন্দু এখন কানবর্গীতে প্রায় সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সবার ওপরে রয়েছে ডাক্তার হিসেবে তার সুনামের আসন। সেই কারণে কী মারাঠী, কী কান্নাড়ী সকলেরই নিজস্ব বা পারিবারিক অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কৃষ্ণেন্দুকে মন দিয়ে শুনতেই হয়। ওদের

প্রত্যেকের সঙ্গে গভীর থেকে গভীরে মিশে গিয়ে নানা রকম পরামর্শ ইত্যাদি করে শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত তাকেই দিতে হয়। অথচ ওই একটা ব্যাপারে কেউই নিজের নিজের জায়গা থেকে এক পা-ও সরে আসে না। নিজেকে তখন খুব অসহায় মনে হয় কৃষ্ণেন্দুর। সংঘর্ষে আহত মানুষগুলোর সেবা করা ছাড়া তখন আর তার কিছুই করার থাকে না। অথচ অন্য সময়ে মারাঠি এবং কান্নাড়ীদের মধ্যে যে-আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ঠিক তাও নয়। এ-এক অদ্ভুত জটিল এবং সারল্যময় জীবনযাত্রা কানবর্গী গ্রামের।

ফ্যাক্টরির মালপত্র আসা-যাওয়ার জন্য যে-রেললাইন কানবর্গী গ্রামের একটু ভেতরে ঢুকে সোজা ডান দিক ঘেঁষে বেলগাঁও স্টেশনের দিকে চলে গেছে, কোম্পানির জিপ থেকে কৃষ্ণেন্দু ওই কোলে ঢুকে যাওয়া জায়গাতেই অন্যান্য দিনের মতো আজও নেমে পড়লো। সামনেই ক্ষেত। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে বংশীলাল জোয়ারি লাগাতে ব্যস্ত। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুকে দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে উঠলো, হেই কৃষ্ণজি, তবিয়ত বিলকুল ঠিক নেহি হোতা। কী দাওয়াই দিচ্ছো যে ভালো হচ্ছি না?

আরও বেশি করে ঠার্‌রা খাও, কাজু ফেনির মদ খাও—ভালো হয়ে যাবে।

হেই কৃষ্ণজি, আপনাকে ছুঁয়ে বলছি, কাজু ফেনির খাওয়ার পয়সাই নেই।

ঠার্‌রা তো খাচ্ছো? কৃষ্ণেন্দু অসন্তুষ্ট হয়ে গম্ভীর গলায় বললো, তোমাকে সারিয়ে তোলার সাধ্য আমার নেই। আমার কথা শুনবে না অথচ রোগ সেরে যাবে তা তো হতে পারে না।।

গণপতির দিব্যি আমি আজ থেকেই মদ খাওয়া ছেড়ে দিলাম। বংশীলাল গলায় হাত রেখে করুণ সুরে বললো, তবে কৃষ্ণজি আপনি যদি বলেন আজকের দিনটা খেয়ে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিতে—আমি তাতেও রাজি।

কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হয়ে বললো, তুমি জাহান্নামে যাও—

নেহি কৃষ্ণজি নেহি—ইয়ে বংশীলাল বোল রহে হ্যায় নেহি পিউঙ্গা, নেহি পিউঙ্গা।

মেডিক্যাল সেন্টারে নিজের ঘরে বসে একটানা তিন ঘন্টা রোগী দেখার পর কৃষ্ণেন্দু সবে একটু হাত-পা ছড়াবার সুযোগ পেয়েছে, ঠিক তখনই বছর বাইশ-তেইশের একটা মেয়ে ন-দশ বছরের দুটো বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। দুজনেই স্কুলের ছাত্র। নিজেদের মধ্যে খেলতে গিয়ে মারামারি এবং তার ফলে মাথা ফাটিয়ে কৃষ্ণজি ডাক্তারের কাছে ছুটে আসা। আধ ঘন্টা ধরে বাচ্চা দুটোর সেবা-পরিচর্যা করার পর কৃষ্ণেন্দু যখন একটু সময় পেলো তখনই নজর পড়লো ওদের যে-এনেছে তার ওপর। মেয়েটির স্বাস্থ্যে প্রদীপ জ্বালানো নিস্তেজ অথচ কমনীয় এক শ্রী ফুটে উঠেছে। ওর পরনে দুধ-সাদা রঙের শাড়ি এবং ব্লাউজ। মোটা একটা বিনুনী কোমরের নিখুঁত সরু ভাঁজের থেকেও প্রায় এক হাত নীচে থমকে দাঁড়িয়ে বিশেষ এক সৌন্দর্যের ছবি এঁকে রেখেছে। মাজিল শ্যামলা গায়ের রং। বেশ কাটা কাটা নাক এবং চোখ। প্রসাধন বলতে ওই চোখ দুটো যেন কাজলের সমুদ্রে ভাসছে। তেলতেলে সমস্ত মুখখানায় কোজাগরি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাই একটু আবছা হয়ে তেইশ বছরের মেয়েটিকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে রেখেছে। মেয়েদের এমন শান্ত রূপ কৃষ্ণেন্দু অন্তত এর আগে দেখেনি। মুম্বাইতে সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য অবশ্যই ধার করা। আর বেলগাঁওয়ের কানবর্গী গ্রামের এই মেয়েটির কিছু নিজস্বতাই ওকে মোমের আলোর স্নিগ্ধতা দিয়ে ঘিরে ধরেছে।

বাচ্চা দুজন কে হয় আপনার? কাগজে কী যেন লিখতে লিখতে কৃষ্ণেন্দু তেইশ বছরকে জিজ্ঞেস করলো।

ওরা আমার ছাত্র। আমি এই স্কুলের টিচার।

কৃষ্ণেন্দু এবারে একটু অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে একপলক তাকালো। আসলে গ্রামের এই স্কুলটি মেডিক্যাল সেন্টারের ঠিক উল্টোদিকেই। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের চোখে পড়লেও একে সে এর আগে কখনও দেখেনি। অবশ্য সবাইকেই যে চোখে পড়বে এমন কোনও কথা নেই। কৃষ্ণেন্দু যখন তার কাজ ফেলে স্কুলের দিকেই চেয়ে থাকে না, মেয়েটি তখন এখানে দিদিমণি হয়ে

থাকতেই পারে। তবুও সে একবার জিজ্ঞেস করলো, কতো দিন আছেন এই স্কুলে?

আজকেই আমার প্রথম দিন। পাখির মতো হালকা গলায় মেয়েটির মাপা উত্তর।

নিজেদের মাথা ফাটিয়ে বিদ্যার্থীরা প্রথম দিনে আপনাকে ভালোই অভ্যর্থনা জানিয়েছে বলুন?

মেয়েটি কোনও উত্তর না-দিয়ে সলজ্জ হাসিতে দৃষ্টিটাকে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বাচ্চা দুটোর মুখের দিকে ছড়িয়ে দিল।

এখন পড়ন্ত বিকেল। লাল আলোর ম্লান বলটা সবুজ পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে লুকিয়ে পড়তে ব্যস্ত। পশ্চিম আকাশটা মেতেছে হোলির উৎসবে। মেডিক্যাল সেন্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণেন্দু একবার ভাবলো, চিরাচরিত এই ছবিটা তো প্রত্যেক দিনের। অথচ আজকের মতো এমন করে দু'চোখ মেলে এর আগে দেখা হয়নি কেন? সেন্টারের দুজন কর্মী দরজা-জানলা বন্ধ করে তালা ইত্যাদি লাগিয়ে কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল। এই সময় কৃষ্ণেন্দু কোয়ার্টারে ফেরার জন্য কোম্পানির জিপ ব্যবহার করে না। প্রথম কয়েক দিন জিপ নিয়ে দেখেছে বড়ো আটকে থাকতে হয়। পাঁচজনের সঙ্গে গল্প-গুজব না-করে সে সহজে ছাড়া পায় না। সুতরাং অতোটা সময় নিয়ে কোম্পানির জিপ গাড়িকে নিজের কাছে না-রাখাই ভালো। অর্পিত্রমা হয়তো ফুঁসলে ওঠার সুযোগ পেয়ে যাবে, শুধু মাত্র আপনার জন্য ড্রাইভারকে দু'ঘন্টা ওভার-টাইমের পয়সা বেশি দিতে হয়। কৃষ্ণেন্দু কোনওরকম ক্ষেত্র তৈরি করে দিতেই রাজি নয়। মেডিক্যাল সেন্টারের বারান্দা ছেড়ে সে গ্রামের পথে পা বাড়ালো।

স্কুল ছাড়িয়ে একটা খেলার মাঠ। গ্রামের সব শিশুরাই বোধহয় এই মুহূর্তে সেখানে কলতানের হাট বসিয়ে দিয়েছে। কে যে কোন খেলাটা খেলছে বোঝাই যাচ্ছে না। ওরা ব্যস্ত নিজেদের নিয়েই। জগৎটা শুধু তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কৃষ্ণেন্দু মাঠের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল, হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা শিশু দুটোও দস্যিপনায় কম যাচ্ছে না। কৃষ্ণেন্দু ওদের বারবার বলে দিয়েছিল, আজ থেকে তিন দিন খেলাধুলো বন্ধ। মনে থাকে যেন। ওরা যে কেউই সেই কথাটা মনে রাখেনি সেটা বোঝা গেল। কৃষ্ণেন্দু ডাক দিতেই ওরা দুজন থমকে দাঁড়ালো। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র! তারপরেই বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে এক দৌড়।

সামনেই একটা চায়ের দোকান। বাঁশের মাচার বেঞ্চিতে তিন-চারজন লোক বসে বসে চা খাচ্ছিলো। কৃষ্ণেন্দুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নমস্তে জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কৃষ্ণেন্দু অল্প হেসে বললো, আপনারা উঠলেন কেন? বসুন-বসুন।

দোকানদার মারকুন্ডে বললো, ডাগদার সাব, তেতো ওষুধটা ছেলেটা কিছুতেই মুখে দিতে চায় না। আপনি মারতে বলেছেন, বহুত পিটাই ভি করেছি। তবুও খেতে চাইছে না।

কী আশ্চর্য! কৃষ্ণেন্দু প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসলো। আমি আবার আপনাকে কখন বাচ্চাটাকে মারতে বললাম? আমি শুধু বলেছিলাম, খেতে-টেতে না-চাইলে ভূতের ভয়-টয় দেখাবেন না। ওটা করা কখনও ঠিক নয়। তার চেয়ে বরং মারের ভয় দেখাবেন।

ম্যয়নে তো খুদ মারহি দে দিয়া! মারকুন্ডে লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলো। ডাগদার সাব আয়েনদার অ্যায়সা গলতি কভি নেহি হোগা!

মারকুন্ডের দোকান ছেড়ে রাস্তাটা এবারে পরপর দুটো ভাঁজ নিয়ে দুই দিকে চলে গেছে। এখানে বেশ কিছু দোকানপসার আছে। চাল, ডাল, তেল, মশলা, কেরোসিন, চ্যালা কাঠ, সস্তা দরের জামা কাপড়, গামছা, থালা-বাসন, সেলুন, টেলারিং শপ মোটামুটি সবই অল্পবিস্তর হাজির। কানবর্গীর এই এলাকাটাকে বাজার বলা হয়। বাজারের পরেই আবার মুড়ির মতো ছড়ানো এলোপাতাড়ি ঘরবাড়ি। কোথাও ঘিঞ্জি, কোথাও আবার একটু বেশি জমি নিয়ে ছড়ানো সব ধরনের বাড়িই পাশাপাশি

রয়েছে।

ডাগদার সাব, হেই কৃষ্ণজি—

ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ো পড়লো কৃষ্ণেন্দু। কয়েকটা বাড়ির ফাঁক দিয়ে গাছ-গাছালির ঘেরাটোপের পাশ কাটিয়ে নীরজ কান্ননকে হাত তুলে ডাকতে দেখা গেল। কৃষ্ণেন্দু পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই নীরজ কান্নন খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, এটাই আমাদেব বাড়ি। ভেতরে আসুন কৃষ্ণজি।

কৃষ্ণেন্দু দেখলো, দশ পা পায়চারি করাব মতো এক ফালি বাগানের পরিচর্যায় নীরজ কান্নন ব্যস্ত ছিলেন। এই মুহূর্তে তার পরনে একটা চেক চেক লুঙ্গি। খালি পা। হাতে মাটি কোপানোর খুরপি। সারা শরীরের জায়গায় জায়গায় মাটি আর ঘামের মিলে-মিশে থাকার ছাপগুলো বেশ ভালোই ফুটে উঠেছে। জমিব দু'পাশে চারটে ইউক্যালিপটাস আর দুটো পাম্থপাদপের ছন্দময় সারি। মাঝখানে ছোট্ট একটা পাকা বাড়ি। উপরে অবশ্য খোলার চালের টালি। সেই কারণে অনেকটা বাংলো বাংলো দেখায় বাড়িটাকে।

নীরজ কান্ননের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। মাঝারি ধরনের বসবার ঘরখানায় চার-পাঁচটা বেতের চেয়ার। একটা গোল টেবিল। ঘরের এক কোণে একটা ছোট সাইজের আলমারি। তাতে বইপত্র খাতা ইত্যাদিতে ঠাসাঠাসি। দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো ময়ূরের ছবি যেন জীবন্ত। আসলে ওই ময়ূর দুটো সূচীশিল্পের বাহার। কৃষ্ণেন্দু যখন খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখছে নীরজ কান্নন খুব আস্তে বললেন, জানেন, সূঁচ সুতো দিয়ে এটা আমার মেয়ে এঁকেছে।

তাই বুঝি? কৃষ্ণেন্দু মুগ্ধ কণ্ঠে বললো, আমি তো ভেবেছিলাম ক্যালেন্ডারের ছবি থেকে এটাকে বাঁধানো হয়েছে।

নেহি-নেহি। তারপর একটু থেমে নীবজ বললেন, এই বছরেই কঙ্কণা বি. এ. পাশ করেছে। আর আজকেই ওর চাকরির প্রথম দিন। কঙ্কণা ওর মাকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছে। ফিরে আসার সময়ও হয়ে গেছে। আপনি শুভদিনে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, সুতবাং মিষ্টি মুখ না-করে কিছুতেই যেতে পারবেন না।

সে তো বুঝলাম—আপনার শরীরের কথা তো এখনও বললেন না। কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে বললো, নাকি ডাক্তার বাড়িতে আসতে সেও পালিয়েছে।

এটা মন্দ বলেননি। সত্যি এখন বিলকুল ভালো হয়ে গেছি। গলা থেকে বুকের মাঝখান পর্যন্ত যতো জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল সব উধাও। মনেই হয় না এতো দিন অনেক কষ্টে ছিলাম।

সেটা অবশ্য খুবই ভালো কথা, তবে যা-যা বলেছিলাম সব মনে আছে তো? কাঁচা পেঁয়াজ, হিং, রান্না রসুন ইত্যাদি আরও সপ্তাহ দুয়েক খাবেন না।

খুব মনে আছে। তবে তিন দিন ভুল করে ও গুলো খেতে যাচ্ছিলাম, কঙ্কণাই বাধা দিয়েছে।

কঙ্কণা আবার তোমাকে কী বাধা দিল বাবা—কথাটা বলতে বলতে তেইশ বছরের মেয়েটা ঘরে পা দিয়েই থমকে গেল। কৃষ্ণেন্দু ডাক্তার তাদেরই বাড়িতে বসে রয়েছে, যার সঙ্গে আজকে সকালেই তার প্রথম দেখা। অথচ ওর কথা বাবার মুখে বহুবারই শোনা হয়েছে। সারা কানবর্গী গ্রামেও যে কৃষ্ণেন্দুর বিরাট প্রভাব পড়েছে এবং সপ্তাহে দু'দিন মেডিক্যাল সেন্টারে বসা বা যাতায়াতের মধ্যেও কঙ্কণা এতো দিনেও কৃষ্ণেন্দুর মুখোমুখি হয়নি। যা কিছু সবই কী আজকের এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল? নয়তো সকালেই-বা গুন্ডাপ্পা আর মহেশের মাথা ফাটবে কেন?

স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মুখখানা এখন যেন আরও বেশি লাবণ্যময়। কৃষ্ণেন্দু একপলক দেখলো মাত্র। তারপরেই দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিতে নীরজ কান্নন বললেন, ডাগদার সাব এই হলো কঙ্কণা। আমার মেয়ে।

কৃষ্ণেন্দু বললো, আজ সকালেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

কী রকম?

ওঁর স্কুলের দুই ছাত্রের মাথা ফেটে যাওয়ায় ওঁকেই নিয়ে আসতে হয়েছিল মেডিক্যাল সেন্টারে।

সে-কী রে? নীরজ কান্নন গভীর এক উৎকণ্ঠায় বললেন, প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই ছেলেদের

পিটিয়েছিস? ওদের মা-বাবা যে এতোক্ষণেও কেন আমাদের বাড়ি.........

ব্যাপারটা তা নয়। সামান্য হেসে কৃষ্ণেন্দু উত্তর দিল, ওরা খেলা করতে গিয়েই নিজেদের মাথা ফাটিয়েছে।

তাই বলুন—আমি তো বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম। নীরজ কান্নন জমিয়ে গল্প কবার ভঙ্গিমায় মেয়েকে বললেন, তা কঙ্কণা, তুই তো ডাগদার সাবকে আমার পরিচয় দিতে পারতিস?

খুব সম্ভব উনি বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না। নয়তো তখনই জানতে পারতাম কঙ্কণাজি আপনারই মেয়ে।

অথচ জানেন—নীরজ কান্নন মেয়ের দিকে চেয়ে বলে ফেললেন, ভুল করে কয়েকবার কাঁচা পেঁয়াজ, হিং, রান্না রসুন খেতে যাচ্ছিলাম দেখে এই কঙ্কণাই কতোবার বলেছে, দাঁড়াও এক্ষুণি গিয়ে ডেকে আনছি কৃষ্ণজি ডাক্তরকে। আসল সময়েই বোধহয় মানুষ সব কিছু গুলিয়ে ফেলে তাই না ডাগদার সাব?

সেটা ঠিক বলতে পারবো না। তবে আপনি কি এখনও আমাকে ডাগদার সাব বলেই চালিয়ে যাবেন? মাঝে মাঝে যে কৃষ্ণজি বলে ডাকেন সেটাই তো শুনতে ভালো লাগে। আর আপনি আপনি করে কথা বলার পাটটাও চুকিয়ে দিন।

নেহি কৃষ্ণজি নেহি—আপকা ইজ্জত কুছ আলগ হোতা হ্যায়। আপনার সম্মানই আলাদা।

সেই আমিই যখন বলছি তখন আর আপত্তি থাকার কথা নয়।

আপনাব এই কথাটাও ঠিক। সরল বিশ্বাসে নীরজ কান্নন হাসতে লাগলেন। তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন কঙ্কণাকে, তোর মা কোথায় রে? মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরিসনি?

মা বাইরে হিমাদ্রির মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

তা তুই মন্দির থেকে ফিরলি, আমাদের প্রসাদ-টসাদ দিবি না?

দেওয়াব সুযোগ পেলাম কোথায়—সলজ্জ হাসি নিয়ে কঙ্কণা বাবার কাছে গিয়ে ওঁর হাতে ফল এবং মিষ্টির প্রসাদ তুলে দিল। কৃষ্ণেন্দু মাথা নিচু করেই বসেছিল। কঙ্কণা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে তাকালো। কাজলে জড়ানো দুটো গভীর চোখ চেয়ে রয়েছে তারই দিকে। কঙ্কণার পরনে টকটকে লালপেড়ে শাড়ি। কপালে পুজোর লাল টিকা। হাতে প্রসাদের থালাটা তাকে সার্থক পূজারিণী করে তুলেছে। কঙ্কণা অস্ফুট স্বরে বললো, প্রসাদ নিন।

মুম্বাইয়ের বাড়িতে গিয়ে তিন দিনের ছুটি কাটিয়ে আবার বেলগাঁওতে ফিরে এলো কৃষ্ণেন্দু। স্টেশনে ভাস্কররাও গিয়েছিল ওকে আনতে। টাঙ্গায় করে ফেরার পথে সে খুব গভীর সুরে বললো, জানিস কৃষ্ণেন্দু, তোকে ছেড়ে এই ক'টা দিন থাকতে আমার কেমন লাগছিল! সাঁতাব না-জানা একজন মানুষের জলে পড়ে যাওয়ার কথাই মনে হচ্ছিলো। তোকে ছাড়া আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না।

কী ব্যাপার?

আমার ব্যাপারটা অবশ্য পরে বললেও চলবে। ভাস্কররাও স্বাভাবিক ভাবেই বললো, তার আগে তোর বাড়ির কথা বল। এই ক'দিন টেরিফিক আনন্দ করেছিস তাই না?

ওহ্ দারুণ! কৃষ্ণেন্দুর চোখে-মুখে এখনও সেই ভালো-লাগার ছাপ। বাড়ি যাওয়ার আনন্দ যে কী হতে পারে সেটা এবারে টের পেলাম। প্রথম দিন তো আমরা সারা রাত জেগে গল্প করেছি। প্রতিটা চিঠিতে এখানকার সব কিছু নিখুঁত ভাবে তুলে ধরার পরেও নতুন করে আবার নিজের মুখে বলতে হয়েছে, কী খাই, কী পড়ি, কার সঙ্গে বেশি বন্ধুত্ব হয়েছে, সবাই আমাকে পছন্দ করে, না শত্রুও কেউ কেউ হয়েছে? নাতিবাগিশের মতো সব সময়ে এগিয়ে গিয়ে অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার রোগটা আমার বন্ধ হয়েছে কিনা, সেটা জানতে চাইলেন আমার বাবু। ভাস্কররাও তুই বিশ্বাস করবি না, রাত ঠিক দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে বাবু বিছানাতে যাবেনই যাবেন। সেই বাবু সারা রাত জেগে আমাদের গল্প শুনেছেন, ভাবতে পারিস? একবার বললেন, কৃষ্ণেন্দুকে

মনে হচ্ছে দশ বছর বাদে দেখছি।

আর তোর মা?

মায়ের কথা বলিস না—টাঙ্গায় নড়ে-চড়ে বসলো কৃষ্ণেন্দু। সারারাত এক ঘরে সবাই মিলে গল্প করেছি। কেউ সোফায় বসে, কেউ ডিভানে, কেউ আধশোয়া অবস্থায় মেঝেতে, আমি কোথায় বসেছিলাম বল তো? আজ্ঞে হ্যাঁ, সারাক্ষণ মা আমাকে কোলের কাছে নিয়ে বসেছিলেন। একবার শুধু উঠে গিয়েছিলাম......উঃ সে কী ফায়ারিং! অর্পিত্রমাজিও আমাকে অতো অ্যাটাক করেনি।

টাঙ্গা ছুটছিল একই গতিতে। কৃষ্ণেন্দু বাইরের দিকে একবার চোখ বোলালো। সামনেই বগেরভইস এলাকা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই অঞ্চলটা মানুষেব দখলে চলে যায়। এতো ভিড়ে কোনও যানবাহনই স্বাভাবিক গতিতে যাতায়াত করতে পারে না। ফলে টাঙ্গাওয়ালাও তার গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখলো। কৃষ্ণেন্দু এই সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে ভাস্কররাও, তোর কী ব্যাপার বলছিলি যেন?

বাঙ্গালোরের হিন্দুস্তান এরোনেটিক্স লিমিটেডের কথা তোকে বলেছিলাম না—

হ্যাঁ মনে আছে।

ওরা ইন্টারভিউর জন্য আমাকে চিঠি দিয়েছে। উনিশ তারিখ যেতে হবে।

নিশ্চয়ই যাবি।

আমি আসলে ভয় পাচ্ছিলাম অন্য কারণে। ভাস্কররাও কথাটা পরিষ্কার করলো, ধর ইন্টারভিউ দিয়ে এলাম অথচ চাকরিটা হলো না। সেক্ষেত্রে ওক অ্যালুমিনিয়াম যদি জানতে পারে আমি অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজছি, তাহলে ওরা আমাকে এখানে কনফারম নাও করতে পারে। আবার সুযোগটাও হারানো উচিত নয়। বাঙ্গালোরের এই চাকরিটা হলে আমি আমার বাড়িতেই থাকতে পারবো। ওখানে যদি স্যালারি একশো টাকা কমও হয় তাহলেও লাভ! কেন-না এখানকার এস্ট্যাবলিশমেন্ট খরচটা তো পুরো বেঁচে যাবে। দ্বিধাটা হচ্ছে শুধু......

ও-সব দ্বিধাটিধা ছাড়—কৃষ্ণেন্দু বললো, সান্তারা খাবো অথচ খোসা ছাড়াবো না, ছাড়াবার দায়িত্ব নেবো না— সেটা হয় না। আর ব্যাপারটা যখন উদ্দেশহীন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অহেতুক ছোটাছুটিও নয় সুতরাং ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সাহস দেখাতেই হবে। তোর চাকরিটা যে বাঙ্গালোরেই হওয়া দরকাব।

হঠাৎ হইহই করে একটা গেল-গেল আওয়াজ উঠতেই কৃষ্ণেন্দু রাস্তার দিকে তাকালো। বছব সতেরো-আঠারোর এক কিশোর সাইকেল চালাতে চালাতে কর্ণাটক পরিবহনের যাত্রীবোঝাই একটা বাসের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ড্রাইভার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিশোরটিকে বাঁচাতে পারলো না। আর সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক ম্যাজিকের মতো রাস্তার মানুষগুলো এক হয়ে উত্তাল আওয়াজ তুললো, মারো শালেকো। ড্রাইভারকে তার কেবিন থেকে হাজারো হাতে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে শুরু হলো বেদম মার। পুরো ব্যাপারটাই অমানবিক। মানুষ এই সময় তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে গভীর এক অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে যায়।

ভাস্করাওকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়েই কৃষ্ণেন্দু টাঙ্গা থেকে এক লাফে নেমে পড়লো। উন্মাদ, হিংস্র সেই জনতার মধ্যে থেকে ড্রাইভারকে আড়াল করে ঘুরে দাঁড়ালো কৃষ্ণেন্দু। ওর সমস্ত মুখখানা তখন রক্তে ভাসছে। জনতার অধিকাংশই মারাঠিতে কথা বলছিল দেখে কৃষ্ণেন্দুও মারাঠি ভাষায় আবেদন জানালো, অনুগ্রহ করে আপনারা আর এ-ভাবে ওকে মারবেন না। একটা মৃত্যুর বিনিময়ে আপনারা আর একটা মৃত্যু চাইছেন। এই ড্রাইভারটি কিন্তু ওই কিশোরটির মৃত্যু চায়নি। নিহতের জন্য আমার আপনার থেকেও ওর অনুশোচনা সব থেকে বেশি। আপনারা এটা কেন বুঝতে পারছেন না—কে শোনে কার কথা। জনতার সমুদ্র গর্জনে কৃষ্ণেন্দুর গলা অনায়াসেই বুজে গেল। নতুন আর একটা আওয়াজ উঠলো, মারো মারো ওকেও মারো।

বেলগাঁও সিভিল হাসপাতালের একটা ঘরে কৃষ্ণেন্দু এই মুহূর্তে চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। গত তিন দিন ধরে সে এখানেই রয়েছে। তবে জ্ঞান ফিরেছে আজ সকালে। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

দ্রুত অন্ধকারে নেমে আসা বাইরের পৃথিবীটাকে দেখার জন্য জানলায় চোখ রাখলো কৃষ্ণেন্দু। অসহায় সেই ড্রাইভারের কথা ভাবতে ভাবতে সে চোখ বুজলো। মাথার যন্ত্রণাটা একটু একটু করে বাড়ছে। বাড়ুক। একটু ঘুমুতে পারলেই সব কিছু ভুলে থাকা যায়।

হাসপাতালে কৃষ্ণেন্দুর আরও কয়েকটা দিন কাটলো। ক্রমশই সে এখন সুস্থ হয়ে উঠছে। বিপদ যেটা ছিল তা কেটে গেছে। সম্ভবত পরশু দিনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ক'দিন তাকে হাসপাতালে এসে অনেকেই দেখে গেছেন। কী ফ্যাক্টরি কী কানবর্গী এতো মানুষের ভালোবাসা যে ওর জন্য সঞ্চিত ছিল, কৃষ্ণেন্দু এর আগে সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। মিঃ এল.কে. ওকের মতো ব্যস্ত মানুষও দু'দিন এসে তাকে দেখে গেছেন। অর্পিত্রিমাজি বেলগাঁওয়ে নেই। কোম্পানির কাজে সে মুম্বাইয়ের অফিসে গেছে। চার দিন ধরে ওখানেই রয়েছে। এ-এক দিকে ভালোই হয়েছে। অর্পিত্রিমাজি নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেও যদি তাকে দেখতে আসতো ব্যাপারটা তাহলে কৃষ্ণেন্দুর কাছে খুবই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াতো।

কৃষ্ণেন্দুকে দেখতে সবচেয়ে বেশি এসেছে কানবর্গী গ্রামের মানুষরা। বংশীলাল, শ্রীধর, মারকুন্ডে, নীরজ কান্নন, চন্দ্রাপা, বেলুয়া কে নয়? এমন কী নীরজ কান্ননের স্ত্রী যশোদার সঙ্গে গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধা সাতাশি বছরের চিন্তামণি পর্যন্ত। এদের এতো স্নেহ কৃষ্ণেন্দু দু'হাত ভরে নিয়েছে। কিন্তু তার চোখ দুটো কেন জানি কেবল একজনকে দেখার জন্যই বারবার আকুল হয়ে উঠেছে। তার সেই স্নিগ্ধ চোখের আলোকেই কৃষ্ণেন্দু নিজেকে দেখতে চেয়েছিল।

এখন পৌষ মাস। বেলগাঁওতে তেমন ঠান্ডাই নেই। কোয়ার্টারের ব্যালকনিতে বসেছিল কৃষ্ণেন্দু। কয়েক দিন ধরেই ওর মনটা খারাপ। বেলগাঁওয়ে কৃষ্ণেন্দুর একমাত্র বন্ধু ছিল ভাস্কররাও। সে চলে গেছে তার বাঙ্গালোরের বাড়িতে। চলে গেছে মানে ওক অ্যালুমিনিয়াম-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর সেখানকার হিন্দুস্তান এরোনেটিক্স লিমিটেডে যোগ দিয়েছে। ওর চিঠিখানা হাতে নিয়েই কৃষ্ণেন্দু মনমরা হয়ে বসে আছে। ভাস্কররাও চলে যাবার পর থেকেই কোনও কাজে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছে না। প্রতি ছুটির দিনে দুজনে এক সঙ্গে শহরে গিয়ে কেনাকাটা করতো, সিনেমা দেখতো এবং সিনেমা দেখার শেষে রেস্টুরেন্টে রাতের খাওয়া সেরে কোয়ার্টারে ফিরতো। এখন সব কিছুই একা একা করতে হয়।

ভাস্কররাও চিঠিতে লিখেছে,

কৃষ্ণেন্দু, নিজের শহরে, নিজের বাড়ির আপন মানুষগুলোর মধ্যেই ফিরে এসেছি। ফিরে এসেছি ছোটবেলাকার একান্ত প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে। কিন্তু মন বোধহয় অন্য কাউকে খুঁজছে। বন্ধু অনেক আছে এখানে। শুধু একজনও কৃষ্ণেন্দু নেই। দুঃখ এটাই। আর একটা কথা দোস্ত, মানুষ এখন প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। অপরাধ হতে দেখলে লোকে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। এই অবস্থায় তুই কতো আর আবর্জনা সরাবি? দোহাই ইয়ার, প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই ভাবে পড়ে পড়ে মার খাস না। এটা আমার অনুরোধ। আমি জানি, আমার এই চিঠি পড়ে তুই আমাকে নীতিভ্রষ্ট এক সুবিধেবাদী বলেই ভাবছিস। কী করা যাবে? তোর ভালোর জন্য এটুকু আমাকে লিখতেই হলো। এবং সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আর এও জানি, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে প্রয়োজনে তুই আবারও প্রতিবাদে গর্জে উঠবি। সবশেষে যে-কথাটা বলতে হচ্ছে তা হলো তুই এখানে কবে নাগাদ আসতে পারবি? আমার মা-বাবা, ঠাকুমা এবং ভাইবোনেরা তোকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আর আমি? যাদের কথা লিখলাম আমিও তাদেরই দলে।

এই একটা জায়গায় ভারী কোমল কৃষ্ণেন্দু। তার প্রিয়জনদের জন্য সে একটু গভীর ভাবেই আলাদা একটা টান অনুভব করে। বাঙ্গালোর সে নিশ্চয়ই যাবে। এমন বন্ধুর কাছে না-যাওয়াটাই তো অপরাধ।

কানবর্গী গ্রামে কৃষ্ণেন্দুর এখন আলাদা সম্মান। ছোট-বড়ো সবার মধ্যেই আলাপ-আলোচনার সময় যে-কথাটা বারবার উঠছে তা হলো বগেরভইসের ওই ঘটনাটা। ব্যাপারটা সবার মনেই বিশেষ

বেখাপাত কবেছে। নিবপবাধ একজন ড্রাইভাবকে বাঁচাতে কৃষ্ণেন্দু যা-কবেছে তাব মূল্য অকল্পনীয। ক্ষিপ্ত এক বিশাল জনতাকে তাদেব অন্যায বোঝাতে যাওযা সেই সময়ে যে কী সাঙ্ঘাতিক হতে পাবে এটা জেনেও কৃষ্ণেন্দু তাব কর্তব্য থেকে এক বিন্দুও সবে আসেনি। এই জিনিসটাই কানবর্গী গ্রামেব মানুষদেব অভিভূত কবেছে।

বিকেল ঠিক পাঁচটায মেডিক্যাল সেন্টাব থেকে বেবিযে কৃষ্ণেন্দু কয়েক পা এগোতেই দেখতে পেলো তিনজন শিক্ষযিত্রীব সঙ্গে কঙ্কণাও স্কুলেব গেট থেকে বেবিযে আসছে। বাকি তিনজনেব সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুব ঠিক আলাপ নেই। এই অবস্থায কঙ্কণাব সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা কৃষ্ণেন্দু যখন ভাবছিল তখন কঙ্কণাই লাজুক সুবে জিজ্ঞাসা কবলো, আপনাব ছুটি হলো?

তা হলো। তবে আপনাব বোধহয আজ একটু দেবি হয়ে গেল তাই না?

হ্যাঁ। কঙ্কণা বন্ধুদেব দিকে তাকিযে সামান্য একটু হাসলো। স্কুলে একটা মিটিং ছিল। তাবপবেই সে তাব স্বভাবসুলভ লাজুক ভঙ্গিমায় বললো, আমাব বন্ধুদেব সঙ্গে আপনাব আলাপ কবিযে দিই। এ-হলো বাসানী পুবোহিত। আস্তা গ্রামে থাকে। ইতিহাস পডায। কালো গোলগাল ধবনেব মেযেটিব দিকে তাকিযে কঙ্কণা বললো, এব নাম কপিলা কার্লেকাব। ওব সাবজেক্ট হলো ম্যাথামেটিকস। কপিলা থাকে হোনগা গ্রামে। আব ও হলো শীর্ষা উবস। ইংলিশ-এব টিচাব। ও থাকে বগেবভইস এলাকায।

আবাব বগেবভইস? কৃষ্ণেন্দু কৌতুকেব সুবে হেসে উঠতেই শীর্ষাও হেসে উত্তব দিল, বগেবভইসে আমি আমাব মাসিমাব বাডিতে থাকি। আমাদেব বাডি বাঙ্গালোবেব গান্ধীনগবে। মাসে দু'বাব আমি সেখানে যাই।

আমাব এক বন্ধুও বাঙ্গালোবে থাকে। ওখানে যাবাব জন্য ভাস্কববাও চিঠিও দিয়েছে। কৃষ্ণেন্দু নিশ্চিন্তেব সুবে বললো, আপনাব কাছ থেকে পথ নির্দেশ-টির্দেশ পাওযা যেতে পাবে কী বলেন?

নিশ্চযই।

বাসানী এবাব চোখ ফেবালো কঙ্কণাব দিকে। মুখ ভঙ্গিমা অবশ্যই নিবীহ কিন্তু চোখ দুটিতে বঙিন বহস্য অনুসন্ধানেব পব মজা খেলা কবছে, এক পক্ষেবই তো পবিচয দিলি। অপব পক্ষেব পবিচয কি আজকাল উহ্য বাখাই নিযম?

সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠতেই কঙ্কণা আবও বেশি লজ্জা পেলো। পাবলে যেন মাটিব সঙ্গে মিশে যায। অপ্রস্তুত গলায বললো, সেই সুযোগটা আমি পেলাম কোথায?

কৃষ্ণেন্দু এবাবে নিজেই নিজেব পবিচয দিতে বলে উঠলো, আমাব নাম কৃ—

থাক, থাক। বাসানী, কপিলা এবং শীর্ষা একই সঙ্গে জানিযে দিল, আমবা সবাই আপনাকে চিনি বললেও খুবই কম বলা হবে।

সেটা আমাব সৌভাগ্য। কৃষ্ণেন্দুব সতেজ হাসি এবং স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বব পবিবেশটাকে চমৎকাব ভাবে মুখবিত কবে তুলতেই কপিলা আবও খোলাখুলি বললো, আসল কথাটা কী জানেন, আপনাব ভেতবে একটা জেদী সংগ্রামী মানুষ বাস কবে। সেই জন্যেই আপনি সবাব থেকে আলাদা। সকলেব মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট এক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হযে গেছেন।

কী বকম? কপিলাব কথাগুলো শুনে কৃষ্ণেন্দু হাসিব দ্যুতি ছডিযে জানতে চাইলো, আমি তো ব্যাপাবটা কিছুই বুঝতে পাবছি না।

এই যে আপনি বগেবভইসে উত্তেজনায অন্ধ মানুষগুলোকে পথ দেখাতে গিযেছিলেন, কানবর্গী গ্রামেব সাধাবণ শ্রমিক-কর্মীবা মদ খেযে তাদেব সংসাব যাতে বববাদ কবতে না-পাবে, গ্রামেব উন্নয়নেব জন্য নতুন নতুন পবিকল্পনা নেওয়া এবং সৃষ্টিধর্মী কাজেব মধ্যে সবাইকে সর্বক্ষণ অনুপ্রেবণা দেওযা, মেডিক্যাল সেন্টাবেব ওষুধ চুবি শুধু বন্ধ কবা নয নিযমিত ওষুধ সবববাহ কবা, মাবাঠি এবং কান্নাড়ীদেব মধ্যে সম্প্রীতিব সম্পর্ক বজায বাখাব জন্য আপনি যা-কবছেন তাকে সংগ্রাম ছাড়া আব কী বলা যায বলুন?

দাঁডান—দাঁডান, আপনাবা আমাব সম্পর্কে যা-শুনেছেন তা অতিমাত্রায অতিবঞ্জিত। কৃষ্ণেন্দু আগেব মতোই হাসি মুখে বললো, মূল ব্যাপাবটা হলো, মানুষ হিসেবে আমি আমাব দাযিত্ব পালন

করার চেষ্টা করছি মাত্র। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বলেন কী? শীর্ষার ভুরু ধনুকের মতো বেঁকে উঠলো, খ্যাতির ও সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছে দিতে বিধাতা যে মানুষকে বেছে নেন তার লক্ষণ তাহলে কী কী?

অতো শতো বলতে পারবো না। কৃষ্ণেন্দু কৌতুক করে বললো, বগেরভইসে জনতা আমাকে কী রকম সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল তাতো ভালো করেই জানেন।

কৃষ্ণেন্দুর এই শেষ কথাটা শোনামাত্র কঙ্কণা ব্যথাতুর দৃষ্টি নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকালো। কতো সিরিয়াস ঘটনাটাকে কী সহজ হাসির মোড়কে জড়িয়ে রেখেছে। কৃষ্ণজি ডাক্তার হয়তো এমনি করেই রুক্ষ পৃথিবীর যাবতীয় মলিনতা ধুয়ে মুছে দিতে চায়।

বাসানী, কপিলা আর শীর্ষা তিনজনেই কৃষ্ণেন্দুকে তাদের বাড়িতে যাবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল। এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু কৃষ্ণেন্দু আর কঙ্কণা। কৃষ্ণেন্দু সোজাসুজি তাকিয়ে আছে কঙ্কণার চোখের দিকে। আর কঙ্কণা? কৃষ্ণেন্দু ডাক্তার না-হয়ে চিত্রশিল্পী হলে এই মুহূর্তে লজ্জানত নায়িকার সেরা ছবিটা খুব সহজেই এঁকে নিতে পারতো।

অস্ফুট সুরে কঙ্কণা বললো, আমি তাহলে আসি?

কৃষ্ণেন্দু ভেতরের উচ্ছ্বসিত আবেগকে আড়াল করে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, আসুন।

চলে যেতে গিয়েও কঙ্কণা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো। কৃষ্ণেন্দু ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কঙ্কণা কী যেন একটু ভাবলো তারপরেই দু-এক পা পিছিয়ে এসে মৃদু স্বরে বললো, মা বলছিলেন, আপনি অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাননি।

মা বলছিলেন? কৃষ্ণেন্দুর ঠোঁটে হাসি।

ওর প্রশ্নের ধরন দেখে কঙ্কণা নিজেকে কোথায় লুকোবে ভেবে না-পেয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। এবারে আর পেছন ফিরে তাকানো নেই। যে-ব্যস্ততা নিয়ে সে পা বাড়ালো সেটা আর যাই হোক বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা যে কিছুতেই নয় তা বুঝতে কৃষ্ণেন্দুর অসুবিধে হলো না।

বেশ কয়েকটা কাজ সেরে কৃষ্ণেন্দু যখন কানবর্গীর বাজার এলাকায় এসে সবে পৌঁছেছে কোথা থেকে যেন হুড়মুড় করে ছুটে এলেন সাতাশি বছরের বৃদ্ধা চিন্তামণি। তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন। কান্নার সেই আওয়াজে স্বাভাবিক ভাবেই আশপাশের বাড়ি এবং দোকানের মানুষজনেরা ছুটে এলো।

কৃষ্ণেন্দু কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন করে কাঁদছেন কেন?

কেন কাঁদবো না কৃষ্ণজি? চিন্তামণি আগের চেয়েও কান্নার ঢেউ একটু বেশ পরিমাণে তুলেই বললেন, মোহন বাড়ি থেকে একটু আগে বেরিয়ে গেছে। বলেছে ও আর ফিরবে না এবং অবশ্যই আত্মহত্যা করবে।

মোহন হচ্ছে চিন্তামণির অতি আদরের একমাত্র নাতির ছেলে। মোহনের বয়স বছর আঠারো হবে। পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ রাখতেই সে বিশেষ আগ্রহী। ফলে না হলো পড়াশুনা, না হলো একটা চাকরি। অবশ্য সে-গরজও তার নেই। তার ওপর স্বভাবটা হয়েছে খিটখিটে। মোহনের মেজাজ বলতে গেলে সারাক্ষণই উঁচু পর্দায় বাধা থাকে। ওর একটাই চাহিদা এবং সেটা হলো টাকা। টাকা না-পেলেই মোহনের মন বিগড়ে যায়। ওর বাবা এবং মা ছেলের সম্পর্কে কোনওরকম মোহ রাখেননি, কিন্তু চিন্তামণির ব্যাপারটা আলাদা। নাতির ঘরের ছেলেকে অতিরিক্ত স্নেহ দেখিয়ে সেই বিষে তিনি নিজেও যে জ্বলছেন না তা নয়। তবে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। মোহনকে মাঝে মাঝে তিনিই টাকা জুগিয়ে থাকেন এবং মোহনও তার দাবির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াতেই থাকে। অবস্থাটা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সে-দাবি মেটানোর সাধ্য চিন্তামণির নেই। মোহন আজ পুরো একশো টাকার দাবি জানিয়েছিল। চিন্তামণির কাছে ওটা চিন্তারও বাইরে। কোথা থেকে তিনি দেবেন একসঙ্গে অতো টাকা? মোহন তাই তাকে কথা শুনিয়েছেন। বলেছে, এই আমি চললাম আর ফিরবো না। আজ আমি আত্মহত্যা করবো। নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবো।

বাজারের মাঝখানে কৃষ্ণেন্দুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ি তাই সমানে কেঁদেই চলেছেন। মোহনের যদি

কিছু হয়ে যায়—চিন্তামণি তাহলে গ্রামে মুখ দেখাবেন কেমন করে? কৃষ্ণেন্দু একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, মোহন মোটেই আত্মহত্যা করার ছেলে নয়। তাছাড়া ওই ভাবে লোক জানিয়ে কেউ অমন কাজ করে না। মোহন আসলে একটি বিচ্ছু ছেলে এবং চিন্তামণির অন্ধ স্নেহের ফায়দাটা পুরোপুরিই তুলতে চায়। সে-কথাই সে বললো চিন্তামণিকে, নানি আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার মোহন আপনার কাছেই ফিরবে। শুধু শুধু এমন করে কান্নায় ভেঙে পড়বেন না। আপনি বাড়ি ফিরে যান। আমি দেখছি ওকে কোথায় পাওয়া যায়।

এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে হঠাৎ সবাইকে গুঁতোগুঁতি করে জল কাটার মতো তরতরিয়ে একেবারে কৃষ্ণেন্দুর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত মুখখানা নিটোল প্রত্যয়ে এক খুশির আলোয় ভরে উঠলো। সে ছেলেটির কাঁধে একখানা হাত রেখে চিন্তামণির দিকে তাকালো। বললো, নানি, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল আপনার পুতা মিঠাইয়ের দোকানে বসে কুলপি লাড্ডু খাচ্ছে। মিথ্যেই আপনি ভয় পেয়ে........

কৃষ্ণেন্দুর কথাটা পুরো হলো না, তার আগেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন সরস মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, সায়েদ মরনে কা পহেলে মোহন আখরি লাড্ডু খা রহে হ্যায়।

মোহন কেন শেষ খাওয়া খাবে রে উল্লুক? সাতাশি বছরের চিন্তামণি কোমর টান করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ওই কাজটা তুই গিয়ে কর না—তবে আমি তোকে অমন কথা কখনও বলবো না। তোর এখন ঠাট্টার বয়স, তুই যা-খুশি তাই বলতে পারিস—আমি কী তাই পারি?

জনতার মধ্যে ওই সময় একটু গুঞ্জন উঠলো। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে নিজের আনন্দে নিজেই উদ্বেল হয়ে জনপ্রিয় একটা মারাঠি গান 'ফু বাই ফু, ফু গাড়ি ফু' গাইতে গাইতে মোহন ভিড়ের দিকেই এগিয়ে আসছে। এবং কাছে এসেই অবাক বিস্ময়ে সে প্রথম যে-কথাটা জানতে চাইলো তা হলো, এখানে এতো ভিড় কীসের?

কৃষ্ণেন্দু সে-কথার উত্তর না-দিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, তার আগে বলো, তুমি ক'টা কুলপি লাড্ডুকে হত্যা করে এলে?

আরে ডাগদার সাব ম্যায়নে তো স্রেফ ইয়ু হি—মোহনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এতোক্ষণে ওর চোখ পড়লো চিন্তামণির ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ যেন মুহূর্তে আবার নিজের কাছে ফিরে এলো। মোহন কিছুক্ষণ চিন্তামণির দিকে কটমট করে চেয়ে থেকে পরে হুঙ্কার ছাড়লো, কিউ রে নানি, ম্যয় মরা কী নেহি দেখনে আয়ি? তো দেখ ফির চলতে হ্যায় খুদ্‌খুশি কে লিয়ে। মোহন আর কোনও দিকে না-তাকিয়ে প্রায় দৌড়েই বাস রাস্তার দিকে ছুটে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে সম্ভবত আগের ছেলেটিই চিৎকার করে উঠলো, ফির যাকে লাড্ডু খানা মোহন, ভুলো মত।

চিন্তামরি সেদিকে কান দিলেন না। কান্নার দমকে আবার আছড়ে পড়লেন এবং অসহায় ভাবে কৃষ্ণেন্দুর হাতখানা পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে বললেন, উস কো সামাল হো বেটা —

কৃষ্ণেন্দু ভেবে পেলো না এই ধরনের আবেগের অবুঝ মনকে সে কীভাবে সংযত করতে পারে? যুক্তি না-মেনে যারা পুরোপুরি বাৎসল্যের রসে ডুব দিয়ে থাকতেই ভালোবাসে কর্তব্যের দরজা খোলা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং চাবিটা কৃষ্ণেন্দুকেই হাতে তুলে নিতে হলো। সে একটু গম্ভীর হয়েই বললো, আচ্ছা নানি, এরপরেও কি আপনার মনে হয় মোহন আত্মহত্যা করতে পারে? এই সব করে আপনি আর ওকে বাড়িয়ে তুলবেন না। বাড়ি যান—স্নেহে অবশ হবেন না, বরং কঠিন হয়ে শৃঙ্খলার শাসনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করুন।

ঠিক হ্যায় বেটা, ঠিক হ্যায়। তুমহরা কহনা বিলকুল ঠিক হ্যায়। বৃদ্ধা চিন্তামণি কী যেন ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরলেন। মোহনের লাড্ডু খাওয়ার সংবাদটা যে-ছেলেটি কৃষ্ণেন্দুর কানে তুলে দিয়েছিল সেই এবারে বললো, ডাগদার সাব মোহনকে আপনি চেনেন না। এ-ছেলে জলে পড়লে ডুববে না, আগুনে দিলে পুড়বে না। দুটো টাকার জন্য যা-খুশি তাই করতে পারে। গ্রামে বেশির

ভাগ ছেলে তো ওর সঙ্গে কথাই বলে না।

তাই বুঝি? ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলো কৃষ্ণেন্দু। পরে সে আর অপেক্ষা করলো না। গভীর এক ভাবনা নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে দিল!

নীরজ কান্ননের বাড়ির সামনে আসতেই কৃষ্ণেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরের চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে আশ্চর্য এক ভঙ্গিমায় কঙ্কণা তখন বাইরের দিকেই তাকিয়েছিল। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ভেতরে ঢুকে গেল।

কৃষ্ণেন্দু কিন্তু তখনও বাইরের কঞ্চির বেড়ার গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর মাথায় এলো এই ভাবে অপেক্ষা করেই দেখা যাক না, ও কী করে? দরজা থেকে ছিটকে যাওয়া কঙ্কণা ও-দিকে আশ্রয় নিয়েছে ঘরের ভেতরকার জানলায়। গেটের কাছ থেকে কৃষ্ণেন্দু ওর পুরো শরীরটা দেখতে পাচ্ছে। পদ্মপাতায় জলের মতো জানলার দুই শিকের মাঝখানে কঙ্কণার লাবণ্যমাখা মায়াবী চোখ দুটো যেন ভাসছে। কৃষ্ণেন্দুর মনের ভেতরে তখন অন্যরকম খেলা। কঞ্চির বেড়ার গেটটাকে খোলা তো দূরের কথা, সেটাকে সে স্পর্শই করলো না। অর্থাৎ আপ্যায়নের নমুনা যদি এই হয় বাড়ির ভেতরে ঢোকা-না-ঢোকা সমান ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দু চলে যাবার জন্য কয়েক পা এগিয়ে পেছন ফিরে একবার তাকাতেই কঙ্কণার মুখখানা দুরন্ত গতিতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল।

অমাবস্যায় সন্ধ্যা নেমে এলো দুই চোখে। আড়াল ছেড়ে কঙ্কণা তখন দরজার চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়ালো।

পায়ে পায়ে কঙ্কণার সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণেন্দু। প্রায় আধ মিনিট সে ওর চোখের তারায় নিজেকে দেখলো। তারপর খুব আস্তে বললো, আমি আজ আসি—

কঙ্কণা বললো, ভেতরে আসুন।

এতোক্ষণ তাহলে ডাকেননি কেন?

ডাকতে হবে ভাবিনি।

কৃষ্ণেন্দু ছোট্ট মন্তব্য করলো, চমৎকার যুক্তি!

মিথ্যে বললাম?

মোটেই না। বরং আমিই সত্যের মুখোমুখি হলাম।

সত্যটা কিন্তু ভেতরের ব্যাপার। আপনি এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কঙ্কণা কোমল গলায় আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই কৃষ্ণেন্দু মৃদু হেসে উত্তর দিল, আজ আপনারই দিন, কথায় হয়তো পারবো না। তবে না-বলেও পারছি না—

কী?

বলছি। কঙ্কণার উদগ্রীব ভাবটুকু লক্ষ্য করে কৃষ্ণেন্দু ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললো, মুখে আপনি ভেতরে আসতে বলেছেন, অথচ দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরজা জুড়ে। কথা এবং কাজের মধ্যে সত্যি কোনটা সেটুকু বুঝতেও তো কিছুটা সময় দরকার।

কথায় আপনিও কম যান না—কঙ্কণার ঠোঁট দুটো ফুলের পাপড়ি মেলার মতো ঝকঝকে হাসিতে ছড়িয়ে পড়লো। দরজা থেকে সরে গিয়ে নিচু গলায় বললো, এবারে নিশ্চয়ই কোনও বাধা নেই।

ঘরের ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে কৃষ্ণেন্দু বসতে-না-বসতেই কঙ্কণা বলে উঠলো, মাকে ডেকে আনছি।

কথাটা শুনে কৃষ্ণেন্দু হেসে ফেললো। বললো, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গেও গল্প করতে পারি।

আপনি যে পারেন না তাতো আমি বলিনি। কঙ্কণার সমস্ত মুখে সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু সহজেই ছড়িয়ে পড়লো।

আমি শুধু বলেছি, মাকে ডেকে আনছি।

পাশের ঘর থেকে যশোদা 'মুঝে কিউ বোলা রহি রে' বলতে বলতে বাইরের ঘরে এসেই কৃষ্ণেন্দুকে দেখে মহা খুশি হলেন। সেই খুশির গলায় বললেন, বহুত দিন কা বাদ বেটা আয়ে হ্যায়। ইতনা দিন নেহি আয়া তকলিফ ক্যয়া থা?

কৃষ্ণেন্দু বললো, আসতে আমার সব সময়েই ইচ্ছে করে, এতে কষ্ট বা তকলিফের কোনও ব্যাপার নেই। আসল কথাটা হলো সপ্তাহে দুটো দিন তো কানবর্গীতে আসি। ওই দু'দিন ডাক্তারি করা ছাড়াও অন্যান্য কাজ এতো থাকে যে আসা হয়ে ওঠে না।

অন্য দিনেও তো আসতে পারো। যশোদার সস্নেহ দৃষ্টির আবেগমাখা কিরণ কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত মুখখানাকে ভরিয়ে দিল। সে ছোট্ট সুরে শুধু বললো, তা পারি।

তাহলে কেন আসো না?

ওই যে বললাম খুব বেশি ইচ্ছে করে বলেই কি যখন-তখন আসাটা ঠিক হবে?

ইয়ে ক্যা বোল রহে হ্যায় বেটা? এটাকে তুমি নিজের বাড়ি বলেই ভাবতে পাবো। সেখানে ইচ্ছে হলেও আসবে না—এমনটা করা কি ভালো?

কৃষ্ণেন্দুর জন্য চা কবতে উঠে যাচ্ছিলো কঙ্কণা। যশোদা বাধা দিয়ে বললেন, তুই বোস মা—আমিই করে আনছি।

যশোদা চলে যাবার পরমুহূর্তেই কঙ্কণা এবং কৃষ্ণেন্দু নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিয়েই নিঃশব্দের প্রহর গুনতে লাগলো। কথা বলার চেয়ে না-বলার পরিবেশটুকুই অনেক সময় বেশি ভালোলাগার এক অনুভূতি এনে দেয। কঙ্কণা আস্তে আস্তে বললো, একটু আগে মোহন এদিক দিয়েই চলে গেল। ওর মুখেই শুনলাম আপনি বাজারের মোড়ে দাঁড়িযে নানিকে সামলাচ্ছেন। তখন ভাবলাম হয়তো আসতে পারেন।

কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছিল মোহন আপনাকে?

ওর তো একটাই কথা। কঙ্কণা কোনওরকম গুরুত্ব না-দিয়ে বললো, দেখা হলেই দিদি দুটো টাকা দাও। আজকেও সেটা চেয়ে বললো, নানি বাড়িতে ওকে বকাঝকা করেছে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি! দুটো টাকা পেলে পেটে কিছু দিতে পাবে।

আবও আপনিও তাই বিশ্বাস করলেন?

কেন মোহন খেয়েছে বুঝি?

প্রশ্নটা খাওয়া-না-খাওয়ার নয়—এই ভাবে একটা ছেলেকে ভিখিরি করে তুলছেন কেন?

ব্যাপারটা কী জানেন—কঙ্কণা কী যেন একটা বলতে গিয়ে আবার চুপ হয়ে গেল। পরে খুব উদাস গলায় বললো, আমার একটা ভাই ছিল। চিপ্পু। বছর দশেক হলো মারা গেছে। মোহনের সঙ্গেই সব সময় খেলাধুলো করতো। চিপ্পু বেঁচে থাকলে মোহনের বয়সই হতো। মোহনের ব্যাপারগুলো যে মেনে নিচ্ছি ঠিক তা নয়, যা-কিছু করছি ওই এক দুর্বলতা থেকে। মনে হয় টাকাটা চিপ্পুর হাতেই তুলে দিচ্ছি। তবে এটাও স্বীকার করি, আমাদের বাড়ি থেকে মোহন সেই সুযোগটুকু পুরোপুরিই গ্রহণ করে চলেছে। যেমন মাকে এসে প্রথমেই বলবে, ফুফি জব ম্যয় চিপ্পু কা সাথ এক রোজ খেল রহে থে, অথবা বলবে, ম্যয় নে তো চিপ্পুকে ছোড় কর দুসরা কোই দোস্ত দেখাই নেহি। অর্থাৎ যে-কোনও কথার মধ্যেই ও একবার চিপ্পু প্রসঙ্গ টেনে আনবেই। এ-গুলো মা-বাবার মনের ওপর বেশ চাপ ফেলতো। সেটা এড়াবার জন্যেই মোহনকে মাঝে মধ্যে দু-একটা টাকা দিতে হয়। তবে ও এখন বাড়িতে খুব একটা আসে না।

আপনারা যদিও একটা কঠিন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তবু—কৃষ্ণেন্দু একটু ইতস্তত করলো, বলবে কী বলবে না।

কঙ্কণা ওকে অনুরোধ জানালো, বলুন না, কী বলবেন।

কৃষ্ণেন্দু দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

যশোদা যখন চা-জলখাবার ইত্যাদি নিয়ে বাইরেব ঘরে এলেন সেই সময়েই ফ্যাক্টরি থেকে নীরজ কান্ননও এসে ঢুকলেন। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটলেন, আপ আয়ে তো খানা ভি আয়ে।

কেন, ফ্যাক্টরি থেকে এসে তুমি কী কোনওদিন খাবার পাওনি? যশোদার ক্রুদ্ধ ঝঙ্কারে সকলেই হেসে উঠলো। নীরজ কান্নন শান্ত গলায় বললেন, আচ্ছা কৃষ্ণজি, আমি কি তা বলেছি কখনও? আজ এমন একটা আনন্দের দিনে একটু ঠাট্টা করলেও দোষ!

এতো আনন্দটা কীসের? যশোদার উজ্জ্বল চোখে ছদ্ম কোপের লক্ষণ।

এই মাস থেকে আমার তংখা আরও একশো টাকা বাড়লো। ইনক্রিমেন্ট লেটার পর অর্পিত্রিমাজি নে সিগনেচর কর দিয়া। শেষের কথাটা নীবজ কান্নন আরও মজার সুরে বলে উঠলেন। লেকিন কৃষ্ণজি আপ তো—

ও-সব লেকিনটেকিন নয়। একরাশ উচ্ছ্বাস এবং উৎফুল্লতার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু যশোদা ও কঙ্কণার দিকে তাকিয়ে বললো, এখানে আপনারা যখন সবাই রয়েছেন এই মুহূর্তে একটা ব্যাপারের ফয়সালা হওয়া দরকার। নীরজজি দাবি করেন আমি নাকি ঘবের ছেলে। তা ঘরের ছেলের সঙ্গে কে কবে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলেছেন? ওঁকে কিছুতেই এই কথাটা মানাতে পারলাম না।

নেহি কৃষ্ণজি এটা আমি কিছুতেই পারবো না। নীরজ কান্নন খুব লজ্জা পেলেন।

না-পারার কী আছে? অবাক হয়ে যশোদা জানতে চাইলেন। পরে সহজ ভাবেই ব্যাখ্যা করলেন, কৃষ্ণেন্দু তো আমাদেব ছেলের বয়সী। তাছাড়া ও নিজেই যখন বলছে তখন আর আপত্তির কী থাকতে পারে? আমাকে নিয়ে এই সব ঝামেলায় তোমাকে পড়তে হয়নি, তাই না কৃষ্ণেন্দু? যশোদা মাতৃত্বের গর্ব অনুভব কবলেন।

তুমি তো সারাদিন ঘরে থাকো—নীরজ কান্নন এই পর্যন্ত বলছেন, বাকিটা না-শুনেই সঙ্গে সঙ্গে যশোদা প্রশ্ন রাখলেন, সেটা কি আমার অপরাধ?

আরে না-না, আমি সে-কথা বলছি না। নীরজ কান্নন এই সময়ে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে অসহায় ভাবে হেসে উঠলেন, বাইরের জগৎটা তো তুমি দেখোনি কৃষ্ণজি কী এবং কতোখানি বিরাট সেটা তুমি জানবে কেমন করে? আমাদের কোম্পানিটা একা অর্পিত্রিমা ওকের দাপটে চলছে। সেই অর্পিত্রিমাজি পর্যন্ত কৃষ্ণজি ডাক্তারের কাছে ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর আমি কি না ওকে নাম ধরে তুমি করে কথা বলবো?

কঙ্কণা এতোক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল। ইতিমধ্যে সে সবাইকে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। খেতে খেতেই কথাবার্তা হচ্ছিলো। কৃষ্ণেন্দু, মা এবং বাবা তিনজনের বক্তব্যই অত্যন্ত পরিষ্কার। না বোঝার কোনও ব্যাপার নেই। কঙ্কণার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিলো তার সিদ্ধান্তটা এই ফাঁকে জানিয়ে দেয় কিন্তু লজ্জার ফাঁস যে গলায় আটকে রয়েছে। সে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলো।

যশোদা বললেন, কিন্তু কৃষ্ণেন্দু যে তোমার ছেলের বয়সী।

বেলগাঁওয়ের ম্যাজিস্ট্রেটও আমার ছেলের বয়সী হবে। নীরজ কান্নন চাপা হেসে গোল গোল চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। পরে খোলাখুলিই বললেন, তুমি একটা জিনিস ভুল করছো যশোদা, আমি হলাম একজন সাধারণ শ্রমিক আর কৃষ্ণজি হলেন কোম্পানির একজন বড়ো অফিসার। সব কিছুকে এক করে গুলিয়ে ফেললে কেমন করে হবে? নীরজ কান্নন এবার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কী বলিস?

এরমধ্যে আমি কী বলবো? কঙ্কণার কোমল ঠোঁটে একচিলতে হাসি।

কেন? আপনি কি আমাদের থেকে আলাদা? কৃষ্ণেন্দু বললো, আপনি আপনার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ওপর নির্ভর করে, যা-বলবেন সেটা হয়তো আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

বাবার কথার ওপরই আমাকে যুক্তিগুলো দাঁড় করাতে হচ্ছে। কঙ্কণা নীরজ কান্ননের চোখের

দিকে তাকিয়ে সরাসরি বললো, আপনি বা তুমি এই সম্বোধনটা গড়ে ওঠে রিলেশনের ওপর। সেখানে ছেলের বয়সী বা নাতির বয়সীটা কোনও ব্যাপার নয়। তেমনই ব্যাপার নয় কে ম্যাজিস্ট্রেট, কে অফিসার, এবং কে শ্রমিক। সম্পর্ক ভালো হলে মনের দূরত্ব কমে যায়। তখন যে কেউ কাউকে তুমি বা তুই বলতে পারে। সামাজিক মর্যাদা সেখানে মোটেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় না।

কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো একসঙ্গে এতো কথা কঙ্কণা এর আগে যেমন বলেনি তেমনি বোঝা যায়নি তার স্বচ্ছ ধ্যান-ধাররার চেহারাটা সে এতো সহজ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কৃষ্ণেন্দু স্বভাবতই মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকালো। বললো, ভারী সুন্দর বলেছেন তো?

যশোদা মুখ টিপে হাসলেন, ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়ালো?

তুমি নিজে সেটা বুঝতে পারছো না—নীরজ কান্নন উদাস গলায় বলে উঠলেন, সম্মানের চূড়ায় বসে থাকা ছেলেটাকে এবার থেকে নাম ধরে ডাকতে হবে। 'তুমি' করে বলতে হবে। কঙ্কণাও ওর স্কুলের ছাত্র ভেবে আমাদের জলের মতো বুঝিয়ে দিল, সেটাই এখন মেনে নিতে হবে, এই আর কী। তা তোমরা সবাই যখন এক মত তখন শুরু করে দিই কী বলো কৃষ্ণেন্দু? কথাটা বলেই নীরজ কান্নন প্রাণখোলা হাসির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন শ্রেণী-সমাজ ও প্রদেশগত সংস্কারের আবিলতা।

একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলো কৃষ্ণেন্দু। কানবর্গী বা ফ্যাক্টরি কোথাও যাবার তাড়া নেই। এই রবিবার দিনটা সম্পূর্ণই ওর নিজের। অখন্ড আলস্যের। অবসরের এই দিনটাতে কৃষ্ণেন্দুব প্রথম কাজ হলো ধীরে-সুস্থে উঠে দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া। তারপর সকালের জলখাবার খেয়ে চিঠি লিখতে বসাটা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। ওই খানে কোনও ফাঁকি-জুকির ব্যাপার নেই। প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা চিঠি লিখবে। মা-বাবু থেকে শুরু করে দিদিব ছেলে উৎসবকে পর্যন্ত লেখা চাই। উৎসবের অবশ্য পড়ার বয়স হয়নি কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর কাছে সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। দিদি সংহিতাই ছেলেকে তার চিঠি পড়ে শোনাবে। আসল কথা হলো কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না।

এরপরে রয়েছে ভাস্কররাও। ওকে আবার আধ পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠার লিখলে চলবে না। সেটা নাকি বড়োই দায়সারা ব্যাপার হয়ে যায়। ভাস্কররাও পরিষ্কার জানিয়েছে, চার পৃষ্ঠার কমে কোনও চিঠি ও নেবে না। প্রতিদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাব বিরবণ চাই।

দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে সিটিতে যাওয়া, কেন-না কেনাকাটা এবং সিনেমা দেখা ইত্যাদি দিনের পববর্তী অধ্যায়। শহরে যাবার জন্য কোম্পানির মিনিবাস বয়েছে। যাতায়াতেব সেই সুযোগটুকু অফিসার এবং তাদের ফ্যামিলিবা পেলেও প্রথম দুটো সপ্তাহ ছাড়া কৃষ্ণেন্দু আর কখনও ওই বাসে ওঠেনি। কারণ অতো ঘন্টা মিনিটেব হিসেব ধরে আর যাই হোক নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যায় না। অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে বাস ছাড়ে ঠিক সওয়া-দুটোয়। বাস গিয়ে থামে হ্যাভলক রোডে এবং সেখানেই অপেক্ষা করবে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত। সেখান থেকে কেউ যদি খানাপুর রোড বা হাই স্ট্রিট যেতে চায সেটা না-হয় পায়ে হেঁটেই যাওয়া যাবে, কিন্তু কারো যদি কেনাকাটা করার প্রয়োজনে খাদেবাজার, গণপতপল্লী, পোলক রোড বা মার্কেট স্ট্রিট যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে তাকে অবশ্যই সরকারি বাস, অটো বা ট্যাক্সি করতেই হবে। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো বেলগাঁও শহরের যে-প্রান্তেই তুমি থাকো এবং যতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যস্ত থাকো-না কেন—কোম্পানির মিনিবাস ধরার জন্য হ্যাভলক রোডে সন্ধ্যা ঠিক সাতটার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে। এতো বাধ্যবাধকতা যেখানে এবং সময়ের প্রাচীরে সহজেই মাথা ছুঁয়ে যায় তেমন জায়গায় গিয়ে পৌছানো কৃষ্ণেন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। সে তাই ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির মিনিবাসকে এড়িয়েই চলে। এই নিয়ে কৃষ্ণেন্দু অবশ্য বিন্দুমাত্র হইচই করেনি, করেনি কোনও প্রতিবাদ। সেটা ওর রুচিতে বাধে। সে শুধু নিঃশব্দে সরে এসেছে। অন্যরা যেটা ধরতে পাবেনি সেটা বুঝতে পেরেছিল শুধু একজন। সে ভাস্কররাও। পরে সে-ও কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

সরকারি বাস থেকে নেমে কৃষ্ণেন্দু প্রথমেই এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো। এই এলাকার নাম

দামনি স্ট্রিট। বেলগাঁও শহবেব এই একটা জিনিস, সব রাস্তাই যে চওড়া ঠিক তা নয়। বরং মাঝারি সাইজের সরু সরু রাস্তাতে একের-পর-এক লাগোয়া চোখ জুড়ানো সব দোকান। সুপার-মার্কেট, শার্টিং-স্যুটিং এর মনোরম শো-রুম, বিচিত্র এবং চোখ ঝলসানো শাড়ির প্রদর্শনী, ইলেকট্রনিকসের সম্ভার, সাজানোগুছানো হোটেল, রেস্টুরেন্ট, কার্পেটের মেলা, সর্বাধুনিক কসমেটিকসের বৈচিত্রপূর্ণ সমাবেশ, বিলাসবহুল সেলুন এবং সিনেমা হল। ছোট্ট এই বেলগাঁও শহরে এখনই চোদ্দটার ওপরে সিনেমা হল এবং আরও দু-একটা তৈরি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও একটু সময় হাতে নিয়ে না-এলে টিকিট পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এখানকার লোকদের এই এক বিলাসিতা। সিনেমা দেখা চাই এবং একই ছবি দু-তিনবার।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কৃষ্ণেন্দু যে-হলটার সামনে এসে দাঁড়ালো তার নাম রেডিও। চারপাশে থিকথিক করছে শুধু মানুষ আর মানুষ। কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো এ-যেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিন। হলের সামনে হাউস ফুলের গর্ব ভরা নোটিশ। ব্ল্যাকাররা মুখের ড্রাম পিটিয়ে চলেছে, পঁচিশ-কা-টিকিট পচাশ রুপাইয়া। প্রচন্ড সাজগোজ করা ছেলে-মেয়েদের গা থেকে সেন্টের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দু সিগারেট খেতে খেতে ভাবছিল ব্ল্যাকে সে কখনও টিকিট কেটে সিনেমা দেখেনি, দেখবেও না। অতোএব এখানে আব অপেক্ষা না-করাই ভালো। হঠাৎ ওর পেছনে কে যেন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, টিকিট মিলা কী নেহি? কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো শীর্ষা আর কঙ্কণা সুস্মিত সুললিত ভঙ্গিমায়। কৃষ্ণেন্দুও হেসে ফেললো। বললো, এখনও পাইনি। আপনারা?

আমাদের তো আগে থেকেই কাটা ছিল। শীর্ষা আফসোসের গলায় বললো, আগে জানলে আপনারটাও কেটে রাখতাম। এখন উপায়?

একজন ব্ল্যাকাব ওদের ধারে-কাছেই ঘোরাঘুরি করছিল। সে সবাসরি কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলো, ক্যায়া সাব টিকিট চাহিয়ে? পঁচিশ-কা-পচাশ জলদি বলিয়ে—

কৃষ্ণেন্দু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ওকে একবার দেখলো। নিচু সুরে বললো, আমার টিকিটের কোনও প্রয়োজন নেই। ব্ল্যাকারটা অন্য দিকে চলে যাওয়ার পর কঙ্কণা কৃষ্ণেন্দুব চোখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। শীর্ষা ছটফট করছিল। কৃষ্ণেন্দুকে বাইরে রেখে তারা কী করে হলে ঢোকে? সে তাই জিজ্ঞেস করলো, কী করবেন এখন?

কৃষ্ণেন্দু মুখের হাসিটা বজায় রেখে বললো, এই ভাবে সিনেমা দেখতেই হবে তার কী মানে? তারপরই সে তাড়া দিল, আমার কথা ছেড়ে দিন তো—আপনাদের দেবি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা আসুন—

কী রে কঙ্কণা কী কববি? শীর্ষা যেন প্রচন্ড মুশকিলে পড়ে গেল।

আমাদের সিনেমা দেখাটা কি ঠিক হবে?

আমিও তো সেটাই ভাবছি। তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক—তুই আর কৃষ্ণেন্দুজি ঢুকে পড়। আমার বাড়ি কাছে আছে যে-কোনও একদিন দেখে নেওয়া যাবে।

তাই বুঝি হয়? কঙ্কণা ধমকে উঠলো।

এটা হয় না, ওটা হয় না, তাহলে হয়টা কী?

আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা না-হওয়াই ভালো ছিল। কৃষ্ণেন্দু দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েই হতাশার ভঙ্গিতে বললো, সবচেয়ে বিপদে এখন দেখছি আমিই পড়লাম।

শীর্ষা খুব চটপট কাজ সেরে সমস্যার সমাধান করে দিল। ওদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একজোড়া অল্প বয়সী দম্পতি। শীর্ষা প্রায় আচমকা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের টিকিট আছে, না বিনা টিকিটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

বিনা টিকিটে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলেটি বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করলো না।

নিন ধরুন। শীর্ষা তার ব্যাগ খুলে টিকিট দু'খানা ছেলেটির হাতে দিতেই সে দামের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে শীর্ষাকে টাকাটা ফেরত দিয়ে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে জানাতে এন্ট্রান্সের

দিকে পা বাড়ালো স্ত্রীর হাতটা খুশিতে চেপে ধরে।

কৃষ্ণেন্দু নতুন করে আবার একটা সিগারেট ধরালো। কঙ্কণার মুখের ওপর চোখ দুটোকে আলগা ভাবে রেখে কৃষ্ণেন্দু যেন শীতের রোদ পোহাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো তারপর?

ছুটির দিনে ছুটি পাওয়া সহজে হয়ে ওঠে না। সেদিক দিয়ে এটা ভালোই হলো। কঙ্কণার প্রতিটা কথায় এক ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে বেড়ায়। সে আবও শীতল গলায় বললো, আপনি কখনও পপ-ইন-এ গেছেন?

না।

কঙ্কণা শীর্ষার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, যাবি ওখানে?

তাই চল। কৃষ্ণেন্দুজিরও নতুন একটা জায়গা দেখা হবে।

বেলগাঁও রেল স্টেশন ছাড়িয়ে চওড়া পিচঢালা রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে বাঁ দিক দিয়ে তিলকবারির দিকে চলে গেছে। ডান পাশের উঁচু-নিচু বিস্তীর্ণ এলাকার মাঝখানে ফুটবল খেলার মাঠের মতো সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতা একখণ্ড সমতল জমি। একই ডিজাইনের কিন্তু নানা রঙের সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে পুরো মাঠটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। নানা রঙের কারুকাজ করা বিশাল গেটের ভেতরে ঢুকলেই এক কোণে ঘন লাল রঙের টালির চমৎকাব একটা কুটির। বাকি সারা মাঠ জুড়ে গার্ডেন আমব্রেলার নীচে ছোট ছোট গোল-টেবিল ঘিরে চার-পাঁচটা করে চেয়ারের গুচ্ছ যেন বোগেনভিলিয়ার বাহার। এক একটা চেয়ার এবং টেবিলের এক এক রকম রং। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এতো রঙের উৎসব বেলগাঁওয়ের আর কোথাও দেখা যাবে না। সারাক্ষণ যে-কথাটা মনে হবে তা হলো সমস্ত মানুষ বোধহয় আজ সকালেই এখানে হোলি খেলে গেছে।

এই জায়গাটার নামই পপ-ইন। এখানে লোকে আসে তৃষ্ণা মেটাতে। গন্না কা রস অর্থাৎ আখের সরবত ওই লাল কুটির থেকে কিনে নিয়ে টেবিল-চেয়ার দখল করে বসে যায় সবাই।

পপ-ইনে সারাক্ষণই যেন অষ্টমী পুজোর ভিড়। কেন, সেটা দু'গেলাস আখের সরবত খেয়েই কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারলো। বরফের টুকরো, পাতিলেবুর রস এবং মশলা মেশানো এই আখের রস লিমকা, থামস-আপ, গোল্ড স্পট আর ক্যাম্পাকোলার চেয়েও উপাদেয়।

সরবত খেতে খেতে কৃষ্ণেন্দু মুখোমুখি বসা কঙ্কণার দিকে তাকালো। ওকে আজ দারুণ সতেজ আব ঝরঝরে দেখাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু এই মুহূর্তে কোনওরকম সঙ্কোচ বোধ করলো না। বরং এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মধ্যে সুখের এবং ওইশ্বর্যের গরিমা অনুভব করলো। কঙ্কণারও বোধহয় একটু একটু করে লজ্জা ভাঙছে। নয়তো সেই-বা কী করে হঠাৎ এতো সহজ হয়ে উঠলো।

শীর্ষা ব্যাপারটা উপভোগ করলো। কঙ্কণা এবং কৃষ্ণেন্দু যখন দুজনেই দুজনকে পড়ন্ত বিকেলের শীতল ছায়ায় আবিষ্কার করতে ব্যস্ত সে তখন পপ-ইনের পুরো এলাকার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে। চমৎকার ঝকঝকে চেহারার এক নীল নয়না অপলকে চেয়ে আছে কৃষ্ণেন্দুর দিকে। শীর্ষা টেবিলের ওপর ঝুঁকে চাপা সুরে বললো, কৃষ্ণেন্দুজি, চট করে আপনার টেবিলের মানে ডান পাশের কোনাকুনি টেবিলে তাকাবেন না। তাহলে ভাববে আমি শিখিয়ে দিয়েছি। মেয়েটি আপনাকে একেবারে চোখে চোখে রেখেছে। মনে হচ্ছে আপনাকে চেনে।

কৃষ্ণেন্দু তাকালো না। তবে সঙ্গে সঙ্গে যে-তাকালো সে হলো কঙ্কণা। মেয়েটি নিঃসন্দেহে অসাধারণ সুন্দরী। কৃষ্ণেন্দুকে যে মনোযোগ দিয়ে দেখছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। সামান্য কিছুটা সময় পার করে কৃষ্ণেন্দু ওর ডান দিকের কোনাকুনি তাকাতেই যার সঙ্গে চোখাচোখি হলো সে অর্পিত্রমা ওক।

অর্পিত্রমা বসেছিল ওর মায়ের সঙ্গে। মিনিট সাত-আট হবে ওরা এখানে এসেছে। অর্পিত্রমা সাধারণত এ-সব জায়গায় এলে বড়ো একটা চোখ বোলায় না চারপাশে। নিজের খেয়ালেই থাকে এবং মিনিট দশেক বসে দু'গেলাস আখের রস খেয়েই উঠে পড়ে। আজ কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হলো। পপ-ইনে ঢুকবার সময়ে কৃষ্ণেন্দুকে চোখেই পড়েনি। এতো ভিড়ে পড়বার কথাও নয়। কোনও

আসনও ফাঁকা ছিল না। অর্পিত্রমা ওর মা শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রস খেয়েই চলে যাবার কথা ভাবছিল। ঠিক তখনই যে-টেবিলটা ফাঁকা হলো সেখানে বসতে গিয়ে সোজা তাকাতেই কৃষ্ণেন্দুকে চোখে পড়লো। কৃষ্ণেন্দু দারুণ ঝকঝকে স্মার্ট ছেলে এটা অর্পিত্রমাও অস্বীকার করে না। ছেলেটা পাল্লা দিয়ে দু-দুটো মেয়ের সঙ্গে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। তা দিক। অর্পিত্রমা ও-সবে মাথা ঘামায় না। প্রশ্ন হলো, কৃষ্ণেন্দু মুম্বাই থেকে বেলগাঁওয়ে এসেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে এই শহরে ওর কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় নেই। অর্থাৎ এখানে এসেই ও এই সব মেয়ে-টেয়ে জুটিয়ে ফেলেছে। অবশ্য এতে অর্পিত্রমারই-বা কী বলবার আছে?

অর্পিত্রমা অন্য একটা কথাও ভাবছিল। শুভলক্ষ্মীও দু'দিন জিজ্ঞেস করেছেন, হ্যাঁরে কৃষ্ণেন্দু দেখতে কেমন? খুব সাহসী বুঝি? যে-ছেলে তোর মুখে মুখে সমানে তর্ক করতে পারে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হতেই পাবে। শুভলক্ষ্মী কী অর্থে কথাগুলো বলেছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করেনি অর্পিত্রমা।

নিজের মেয়ের অসম্ভব জেদ-তেজ ইত্যাদি শুভলক্ষ্মী নিজেও পছন্দ করেন না। সেই মেয়েকে কাবু হতে দেখেই তিনি কৃষ্ণেন্দুকে মনে মনে বোধহয় একটু প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বাবা-মা হয়ে তাঁরা যে-মেয়েকে ঠান্ডা করতে পারেননি কৃষ্ণেন্দু সেখানে আর যাই হোক মাথা নত করেনি। অর্পিত্রমাকে জিজ্ঞাসা করার কারণটা হলো সেটা।

মায়ের কথাটা অর্পিত্রমার মাথায় ছিল। কৃষ্ণেন্দুকে চিনিয়ে দেবে কী-না সেটাই ভাবছিল সে। কেন-না সামান্য একটা ব্যাপারেও ওই ছেলেটা গুরুত্ব পাক এটা তার ইচ্ছে নয়। আবার সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে মাকে দেখাতেই-বা আপত্তি কীসের? নামের শেষে 'জি' সম্বোধন করার রেওয়াজ বা সৌজন্য না-দেখিয়ে বললো, কৃষ্ণেন্দুকে দেখতে চেয়েছিলে না, ওই দেখো। সাদা প্যান্ট আর হালকা স্কাই কালারের শার্ট পরা ছেলেটা।...ওই যে দুটো মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে—

মাথায় হাত দিয়ে পেছনের দিকে চুলগুলোকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে যে-ছেলেটা সে?

হ্যাঁ।

তোকে ও দেখতে পেয়েছে?

জানি না। অর্পিত্রমা খুব বিরক্তির সঙ্গে কথাটা ছুড়ে দিল।

তাহলে তো তোর একবার ওর কাছে যাওয়া উচিত।

কেন? অর্পিত্রমার ভুরু দুটো ধনুকের মতো বেঁকে গেল।

যেহেতু তুই-ই ওকে দেখতে পেয়েছিস। সহজ প্রকৃতির শুভলক্ষ্মী আরও সহজ ভাবে বললেন, পরিচিত কাউকে এড়িয়ে যাওয়া কি ভালো?

ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কীসের? অর্পিত্রমার সারা মুখে অসন্তোষের জমাট মেঘ। পরিবেশ ভুলে গিয়ে সে শুভলক্ষ্মীকে প্রায় ধমকের সুরেই বললো, কৃষ্ণেন্দু আমার কাছে চাকরি করে। ওর কাছে আগে আমি এগিয়ে যাবো কেন? ওর ভদ্রতা-জ্ঞান নেই?

এই তো বললি কৃষ্ণেন্দু তোকে দেখেনি। মেয়ের ধমক খেয়ে শুভলক্ষ্মী নিজেকে গুটিয়ে নিলেও সত্যি কথাটা বলতে ছাড়লেন না। এতো দিন ধরে কিছু না-বলতে বলতে অর্পিত্রমা কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না।

অন্ধ নাকি? অর্পিত্রমা গজরাতে লাগলো। কৃষ্ণেন্দু ঠিকই দেখেছে। ওর যদি সৌজন্য দেখানোর কোনও গরজ না-থাকে তুমি কী জোর করে সেটা আদায় করবে? গন্নার রস খাচ্ছো তাই-ই খাও—

শীর্ষা আবার জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বলুন তো কৃষ্ণেন্দুজি, মোনালিসা মেয়েটি আপনাকে দেখছে বটে, তবে খুব একটা সন্তুষ্ট চিত্তে নয়।

থাকার কথাও নয়।

কেন? কঙ্কণা কৃষ্ণেন্দুর চোখে চোখ রাখলো এবারে।

ওই মেয়েটির নাম অর্পিত্রমা ওক। ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি নিয়ে কৃষ্ণেন্দু আরও যোগ করলো, ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির মালিক।

বেশিক্ষণ আর দেখবেন না। কৃষ্ণেন্দু বললো, এবারে আমারই চাকরি চলে যাবে।

চাকরি আপনার এমনিতেও থাকবে না। দু-দুটো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আপনার ডাক্তারি সম্পর্কে অর্পিত্রিমাজির আর বিন্দুমাত্র আস্থা রইলো না। কালকে অফিসে গিয়েই চিঠিটা পেয়ে যাবেন, পপ-ইনে দুটো মেয়ের সঙ্গে গন্নার রস পান-করার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। নিজের কথায় শীর্ষা নিজেই একরাশ উচ্ছ্বাসেব হাসিতে মেতে উঠতে গিয়েও চারপাশের কথা চিন্তা করে সঙ্গে সঙ্গে আঁচলের অংশটুকু মুখের ওপর চেপে ধরে রিমোট কন্ট্রোলের কাজ সারলো।

কৃষ্ণেন্দু ছোট্ট গলায় বললো, চলুন ওঠা যাক।

সত্যি সত্যি আপনি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? বিশুদ্ধ আনন্দে কঙ্কণার চোখ দুটো ঝিলিক তুলতেই কৃষ্ণেন্দু সন্ধ্যার শীতল বাতাসের মতো স্নিগ্ধ হেসে উত্তর দিল, দারুণ বলেছেন তো? এতো দিনে আপনিও বোধহয় লজ্জাব ভয় ভেঙে এই প্রথম বেরিয়ে আসতে পারলেন। চাকরি চলে গেলেও আর কোনও দুঃখ রইলো না।

পুরো দশ দিনের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে কৃষ্ণেন্দু আজ বেলগাঁওয়ে ফিরে এলো। ছুটিটা একটু বেশি নেওয়ার কারণ গত দু'মাসের মধ্যে সে একবারও মুম্বাই যায়নি। অথচ প্রতি মাসে তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাওয়াটা প্রায় নিয়মের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিল।

বেলগাঁওয়ে এখন বসন্তকাল। আকাশে-বাতাসে শুধু কোকিলের মন-কাড়া কুহু ডাক। নেপথ্য শিল্পীর মতো গাছের ফাঁক-ফোঁকরে বসে আপন মনে সঙ্গীতের সাধনা করে চলেছে, কাউকে দেখা দেবার বিন্দুমাত্র বাসনাও তার হয় না। জোয়ার আর বাজরার ক্ষেতে যৌবনের ঢল নেমেছে। এতো চমৎকার পরিবেশের মধ্যেও কৃষ্ণেন্দুর মনটা একটু গুমরে আছে। থেমে থেমেই ভেতরের হাহাকারটা সীমাহীন প্রান্তরের ওপর ঢেউ খেলানো বাতাসের মতো কোথায় যে বহু দূরে গিয়ে হারিয়ে যায়, মনটাই ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠে। আসলে এবারে বাড়ি থেকে আসার সময়ে মার অস্থির কান্নাটাই কৃষ্ণেন্দুর সমস্ত মনটাকে ভিজিয়ে রেখেছে। তাঁর অভিযোগ, দিব্যি তো প্রতি মাসে বাড়ি আসছিলি, সময়টা বাড়িয়ে দিলি কেন? কারণটা অবশ্য কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছে। বাঙ্গালোরে ভাস্কররাওর বাড়িতে গিয়েছিল। মার পরের কথাটাই ছিল, যেখানেই যাস আমাকে ফাঁকিতে ফেলিস না বাবা। ছোট মেয়েব মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন তিনি।

ওই সময়ে অর্পিত্রিমা একদিন কৃষ্ণেন্দুকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালো। ওর ডাকা মানেই তো জট পাকানো ব্যাপার। জট খোলার ব্যক্তিটি অর্থাৎ ওক সাহেব এখন দেশের বাইরে। কৃষ্ণেন্দু সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবাতে অর্পিত্রিমার শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। সে প্রায় ঠিক করেই রেখেছে অর্পিত্রিমা উল্টো-পাল্টা বললে ওক সাহেবের ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে না। রিজাইন দিয়ে আজই মুম্বাই চলে যাবে।

কৃষ্ণেন্দুকে বসতে বলে অর্পিত্রিমা কিছু কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো। একটু সময় লাগবে, অর্পিত্রিমা তাই সৌজন্য দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, চা বা কফি খাবেন কিছু?

আমি এই মাত্র খেয়েই এসেছি।

আমাকে তাহলে প্লিজ পাঁচ মিনিট সময় দিন। পেপারগুলো একটু দেখে নিচ্ছি।

নিশ্চয়ই। কৃষ্ণেন্দু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো ব্যাপারখানা কী? এটা তো সেই জলে শিলা ভাসার ঘটনা হয়ে গেল। অর্পিত্রিমা ওক শান্ত গলায়, ঠান্ডা মেজাজে এবং যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে যে-কথাগুলো এইমাত্র বললো দিশেহারা হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী? সেটাই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কাগজপত্র দেখার জন্য একটু সময় চেয়ে নিয়েছে। ও-গুলো কীসের? সীমাহীন সমুদ্রে সাঁতার কাটা বৃথা। তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভালো। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কৃষ্ণেন্দু খোলা জানালা দিয়ে সবুজ পাহাড়টাকে দেখতে লাগলো।

কাগজপত্র সরিয়ে রেখে অর্পিত্রমা এবারে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকালো। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বললো, আপনাকে ডেকেছি একটু পরামর্শ করে নেবো বলে। অবশ্য আমার জেনে নেবার ব্যাপারও রয়েছে।

বলুন।

ব্যাপারটা হলো মাস পাঁচেক আগে আপনি বলদেও নামে আমাদের একজন শ্রমিকের চিকিৎসা করেছিলেন।

মনে আছে। কৃষ্ণেন্দু আরও যোগ করে বললো, প্রজিং সোলডারের যন্ত্রণায় ছেলেটা কষ্ট পাচ্ছিলো। হাড়ের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের গ্রোথ হওয়ার ফলে এই কষ্ট ক্রমশ বাড়ে ছাড়া কমে না। সেই কারণেই আমি রেফার করেছিলাম স্পেশালিস্ট কোনও অর্থোপে......

সেটা ঠিক আছে। কৃষ্ণেন্দুকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে অর্পিত্রমা রিভলবিং চেয়ারে হেলান দিয়ে দু'বার দোল খেয়ে সোজা হয়ে বসলো। বলদেও হাড়ের মধ্যে ইঞ্জেকশান-টিঞ্জেকশান নিয়েছে। সেখান থেকে গিয়েছে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে। বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ, হিট, আলট্রাসেনিক রে ইত্যাদি এই পাঁচ মাস ধরেই নিয়েছে। প্রশ্নটা হলো, ও কোম্পানিকে একটা বিল দিয়েছে। খরচ দেখিয়েছে সাতাশ হাজার টাকা। আপনার কাছে আমার জানবার বিষয় হলো এই চিকিৎসায় এতো টাকা খরচ হওয়া কী সম্ভব?

বলদেও ক'টা সিটিং দিয়েছে খরচটা নির্ভর করছে তারই ওপর। কৃষ্ণেন্দু হাত বাড়িয়ে অর্পিত্রমার কাছ থেকে ডাক্তারের কাগজপত্র এবং বিল-টিলগুলো নিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। পড়ে যাওয়া এই সময়টুকু অর্পিত্রমা ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে কৃষ্ণেন্দুর মুখের ওপর চোখ দুটোকে ধরে রাখলো। হঠাৎ তার মনে হলো, সত্যিই কি সে এই ছেলেটার সঙ্গে অহেতুক এবং অন্যায় আচরণ করেছে? সে নিজে অবশ্য সেটা মনে করে না। আসল কথাটা হলো বাবা বাইরে যাবার সময় খুব অনুনয় করে বলে গেছেন, আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত সব দিক ভালো করে দেখিস। আর মেজাজটা যেন ঠিক তোর মায়ের মতো থাকে। অন্য সময় হলে অর্পিত্রমা শেষের ওই কথাতেই প্রচন্ড রেগে উঠতো। কিন্তু বিদায় মুহূর্তে সে আশ্চর্য ভাবে নিজেকে মেজাজ হারানোর উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল।

এ-গুলো সব ঠিকই আছে। কৃষ্ণেন্দু কাগজগুলো ফেরত দিযে শেষ মুহূর্তে আর একবার বললো, এমন ধরনের চিকিৎসায় এই টাকাই ব্যয় হয়।

আমি বলতে চাইছি—অর্পিত্রমা হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিল।

কী বলতে চাইছেন বলুন।

এরমধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই তো? অর্পিত্রমা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলো। আমাদের এই কোম্পানিতে একজন অফিসার থেকে শুরু করে একজন শ্রমিক পর্যন্ত মেডিক্যালের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে পায়। কারো মাথার ওপরেই খরচার কোনও সিলিং নেই। আমাদের চিকিৎসায় সুস্থ হওয়া সম্ভব নয় মনে করলে স্পেশালিস্টের কাছে পর্যন্ত পাঠিয়ে দিই। টোটাল ট্রিটমেন্টটা যখনই বাইরের ডাক্তারের কাছে চলে যায় গন্ডগোলটা পাকিয়ে যায় ঠিক তখনই। মেডিক্যাল বিলটা পাহাড়ের সাইজ নিয়ে প্রায়শই আমাদের খটকায় ফেলে দেয়। এর আগে বেশ কয়েকটা কেস ধরাও পড়েছে। অর্পিত্রমা খুব সহজ সুরেই কথাগুলো বলতে লাগলো, প্লিজ কিছু মনে করবেন না, এ-সব ব্যাপারে আমাদের কর্মীরা যেমন দায়ী ঠিক সমান দোষী বেশ কিছু ডাক্তাররাও। উভয়ের যোগ-সাজসেই এই ধরনের ট্রাবলগুলো আমাদের ফেস করতে হয়।

ডাক্তার মাত্রই বিবেকবান এই দাবি আমিও করি না। টাকা নেওয়ার ব্যাপারে বা ভুয়া বিল করার ক্ষমতায় তারা অনেক কনট্রাক্টরের, পুলিশের ওপরে। কিন্তু—কৃষ্ণেন্দু তার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে উত্তর দিল, সবাইকেই এক করে ফেলবেন না। ব্যতিক্রম আছে বলেই সব জায়গাতেই এখনও কিছু কিছু কাজ হয়, নয়তো দেশটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই ডুবে যেতো। কৃষ্ণেন্দু কথাটা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই অর্পিত্রমা একটু সঙ্কোচ নিয়েই জিজ্ঞেস করলো, আপনি আজ বিকেলে কি ফ্রী রয়েছেন?

কেন বলুন তো? অর্পিত্রমার কোমল ব্যবহার এবং কথা-বার্তার চমৎকার ধরন-ধারণ দেখে কৃষ্ণেন্দু ক্রমশই অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। মেজাজী মেয়ে যদি তার মেজাজই হারিয়ে ফেলে ভেতরের উদ্দেশ্যটার কথাই সবার আগে মনে পড়ে। নাকি নতুন করে আক্রমণের প্রস্তুতি? কৃষ্ণেন্দু একটা জিনিস বোঝে, অতিরিক্ত বিনয় দেখানোও একটা ইনসালটিং ব্যাপার। অর্পিত্রমাজির মতলবটা কী?

বাবা বাইরে চলে যাবার আগের দিনের পার্টিতে আপনি আমাদের বাড়িতে যাননি। অর্পিত্রমা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলো। মায়ের ধারণা আপনার সঙ্গে আমার সেই আগের একটা

ওটা কোনও ব্যাপার নয়। আর সেদিনের না যাওয়ার কারণ তো আপনি জানেন—মুথু চন্দ্রাপ্পার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য ওকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

সেটা তো আমি জানি। আমার মা বুঝতে চাইছেন না।

আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে?

গেলে ভালো হয়। মায়ের ধারণাটা পাল্টাবে।

বেশ যাবো।

পৌনে ছ'টার সময় আপনার কোয়ার্টারে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আপনি ফিরে এলে আমরা এক সঙ্গে রওনা দিতে পারবো।

তাই হবে।

অর্পিত্রমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা সে এখন কিছুতেই পর পর সাজিয়ে তুলতে পারবে না। সারা দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করা মেয়ে পরিমার্জিত হয়ে এতো তাড়াতাড়ি নিজেকে মেলে ধরতে পারবে এটা শুধু মহা বিস্ময়ের নয়, অসম্ভব এক কল্পনার মধ্যেও আসে না। কিন্তু অর্পিত্রমাজি নিজে যখন আমন্ত্রণ জানাতে পেরেছে, ভদ্রতা বা সৌজন্যের দিক থেকে কৃষ্ণেন্দুর পিছিয়ে পড়াটা বড়ই বেমানান দেখাবে। সে কেন ছোট হবে? প্রতিশোধ সবাই নিতে পারে, উদার হতে পারাটাই কঠিন। সেই কঠিন কাজটাই কৃষ্ণেন্দু খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই করতে চায়। আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সাবধান হওয়া ভালো, কিন্তু সেটাকে প্রতিনিয়ত মনে রেখে ব্যবহারের তাপমাত্রা প্রথম থেকেই তুঙ্গে রাখাটা ঠিক নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে না-পারাটাই দুর্বলের লক্ষণ। তেমন কাজ কৃষ্ণেন্দু করবে না। সে-কথা দিয়েছে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে।

কাঁটায় কাঁটায় পৌনে ছ'টার সময় ওক সাহেবের বিশাল ইম্পালা কৃষ্ণেন্দুর কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই গাড়িটা কার সেটা সকলেরই জানা। সুতরাং আশপাশের কোয়ার্টারের অনেকেরই জানার আগ্রহ কাকে নিতে এই ইম্পালাটা এলো? কৃষ্ণেন্দুদের বাড়িটায় মোট চারটে ফ্ল্যাট। সুতরাং কে হতে পারে সেটা অনুমান করাও মুশকিল।

জানালা এবং ব্যালকনিতে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। তারা অবাক চোখে দেখলো, কৃষ্ণেন্দু কোনওরকম ব্যস্ততা না-দেখিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার ভজনলাল সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরলো।

বেলগাঁওতে তখনও সন্ধ্যা নামেনি। আকাশে রোদ রয়েছে বটে তবে তেজ আর তেমন নেই। সূর্য যে এখন রীতিমতো ক্লান্ত সেটা আলগা আলোর ভালো লাগার মধ্যেই বোঝা যায়। ইম্পালা মসৃণ গতিতে তিলকবাবির উঁচু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। দুটো পাক দেওয়ার পর কৃষ্ণেন্দু দেখলো বেলগাঁও রেল স্টেশনটা বেশ কিছুটা নিচুতে যেন কুন্ডলী পাকানো সারমেয়র মতো ঘুমিয়ে রয়েছে। হঠাৎ ওর মনে হলো, প্রথম যেদিন সে এই স্টেশনে পা রেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন এই তিলকবাবির সবুজ বনানী ঘেরা অঞ্চলের দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তখন অবশ্য এলাকাটার নাম জানতো না।

গুঞ্জরানায় গাড়ি ঢুকতেই কৃষ্ণেন্দু অর্পিত্রমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললো, বাঃ আপনাদের বাড়ির নামটা তো চমৎকার! কে রেখেছেন?

আমার মা।

অপূর্ব সিলেকশন! কৃষ্ণেন্দু বললো, সারাদিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে আমরা যে সত্যি সত্যিই মাথা গুঁজতেই বাড়িতে ফিরে আসি।

অর্পিত্রমার ফোন পাওয়ার পর থেকেই শুভলক্ষ্মী ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এইমাত্র ইম্পালাটাকে বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। ভজনলাল গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করাব আগেই উর্দিপরা একঝাঁক বেয়ারা ছুটে এলো। কেউ দরজা খুলে ধরলো, কেউ অর্পিত্রমার অ্যাটাচি কেস, জলের বোতল, টিফিন ক্যারিয়ার ইত্যাদি বের করে আনতে ব্যস্ত, তবে একটা ব্যাপারে সকলের মধ্যে দারুণ মিল। এই বাড়ির নতুন অতিথিকে প্রত্যেকেই লম্বা সেলাম জানিয়ে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করলো। গুজরানায় কৃষ্ণেন্দু একে তো প্রথম, তার ওপর অর্পিত্রমার সঙ্গে এসেছে। পুরো ব্যাপারটারই একটা আলাদা তাৎপর্য আছে।

কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন শুভলক্ষ্মী। তিনি নীচে নেমে আসছিলেন। অর্পিত্রমা কৃষ্ণেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে পৌঁছে মায়ের মুখোমুখি হয়েই সামান্য একটু হাসলো। কৃষ্ণেন্দুকে বললো, আমার মা। মায়েদের বোধহয় একই রকমের মূর্তি। কৃষ্ণেন্দুর কাছে তার নিজেব মা, কঙ্কণার মা, ভাস্কররাওয়ের মা এবং অর্পিত্রমার মা সবাই এক। কৃষ্ণেন্দু পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতেই শুভলক্ষ্মী কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, আও বেটা। আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা কবছিলাম।

গুজরানা শুধু একটা বাড়ি নয়—ঐশ্বর্য, বিলাস আর রুচিব সমন্বয়ে গড়া একটা স্থির তৈলচিত্র যেন। প্রতিটি পদক্ষেপে চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার। কিন্তু কোনও কিছুই চোখকে আঘাত করে না। বিশাল নয়নাভিবাম একটা ঘরের ডুবে যাওয়া সোফায় বসে কৃষ্ণেন্দু কথাগুলো শুনছিল। শুভলক্ষ্মী বলছিলেন, আট মাস হতে চললো তুমি এখানে এসেছো। প্রথম মাসেই অবশ্য তোমার নামটা শুনেছিলাম, আর একবার দেখেছিলাম পপ-ইনে একটু দূর থেকেই। উনি চলে যাবার আগে যে-পার্টি হলো তাতে তোমাকে আশা কবেছিলাম। তুমি কি সে-সব মনে রেখেই আমাদের বাড়িতে আসোনি? মায়েরা বোধহয় রাখ-ঢাক করে কোনও কথা বলতে পারেন না। সোজাসুজি কথা বলাই তাঁদের পছন্দ।

বিশ্বাস করুন, তেমন কোনও ব্যাপারই নয়।

কী জানি বেটে, আমি ভাবলাম বুঝি তুমি এখনও মন খারাপ করেই আছো। শুভলক্ষ্মী পরিষ্কাব জানালেন, আমি কিছুটা সংস্কার মানি। উনি বিদেশে যাবার আগে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রিত সবাই এলো, এলে না শুধু তুমি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি সেদিন নিশ্চয়ই আসতাম। আসতে পারিনি শুধু—কৃষ্ণেন্দু শুভলক্ষ্মীর সন্দেহ দূর করতে মুথু চন্দ্রাপ্পার দুর্ঘটনার কাহিনীটা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। ওই অবস্থায় আমি একজন আহত মানুষকে কী করে ফেলে আসি? আপনি যেটা ভাবছেন তেমনটা হলে তো আমি আজকেও আসতাম না—

এটা অবশ্য ঠিক কথাই বলেছো। শুভলক্ষ্মী নিশ্চিন্তের হাসি হাসলেন। বললেন, আমি অবশ্য আরও একটা কথা ভাবছিলাম। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য হতেই পারে সেজন্য আমাদেরও তুমি যাতে ভুল না-বোঝ সেই সুযোগটুকুও তো আমাদের পাওয়া দরকার।

আপনি এতোটা গভীর ভাবে কেন চিন্তা করছেন? কৃষ্ণেন্দু অনায়াস ভঙ্গিতে সব কিছুকেই সহজ করে তুললো, সঠিক পদ্ধতিতে এগোতে গেলেও সকলের সঙ্গে হাতের মিল হয় না। তার মধ্যেও মন কষাকষি হয়। সেজন্য আপনারা কী দোষ করলেন?

এরপর আলোচনাটা একটু পারিবারিক ঘেঁষা হয়ে পড়েছিল। শুভলক্ষ্মী একের-পর-এক প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, মুম্বাইতে কোন অঞ্চলে কৃষ্ণেন্দুদের বাড়ি, মা-বাবা আছেন কিনা, ক'ভাইবোন, কার কার বিয়ে হয়েছে এবং ক'টি ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। দাদারা এবং জামাইবাবু কোথায় চাকরি করেন সে-সবেরও খোঁজ-খবর নিলেন। কৃষ্ণেন্দু যখন বললো, মুম্বাইয়ের একটা হাসপাতালে সে চাকরি করতো এবং সেটা ছেড়ে এখানে এসেছে বৈচিত্র্যের খোঁজেই। কথাটা শুনে শুভলক্ষ্মী হাসলেন। বললেন, তবে তো তুমি একই উদ্দেশে এখান থেকেও একদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। সেই

নমুনাও তুমি প্রায় প্রথম দিকেই একবার দেখিয়েছো কী বলো কৃষ্ণেন্দু? শুভলক্ষ্মীর কথায় সদা সপ্রতিভ কৃষ্ণেন্দুও এবার লজ্জা পেলো। বললো, না-না, তেমন কিছু ভাবিনি এখনও।

শুভলক্ষ্মী বললেন, একটা কথা বলছি তোমাকে। ভেবো-না মেয়ের হয়ে ওকালতি করছি। আমার অর্পিত্রমার মায়া-দয়া কিছু কম নেই। তবে ওর রাগটাই ওকে অন্য এক মানুষ তৈরি করে দিয়েছে। ও নিজেও এখন সেটা বুঝতে পারছে।

অর্পিত্রমার প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইছিল কৃষ্ণেন্দু। ঠিক তখনই অফিসের শাড়ি টাড়ি বদলে অর্পিত্রমা সেই ঘরে ঢুকলো একেবারে তরতাজা হয়ে সিল্কের চমৎকার একটা চুড়িদার কুর্তা পরে। কাঁধ সমান চুলগুলো এখন আর ফিতের শাসনে নেই। খোলামেলা অবস্থায় ফুলে-ফেঁপে রয়েছে। নীল চোখে নতুন করে কাজলের সজীব রেখা। দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে পেস্তা গ্রীন কালারের চুড়িদারের সঙ্গে ম্যাচ করে ওই রঙেরই মাঝারি সাইজের একটা টিপ। ও শুভলক্ষ্মীর পাশের বড়ো সোফাটায় গিয়ে যে-ভাবে বসলো সেই ভঙ্গিমাটুকুও রাজকীয়!

সৌজন্যের হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করে শুভলক্ষ্মীর দিকে দৃষ্টি ফেরালো কৃষ্ণেন্দু, বললো, আমি চাকরি করি এটা আমার বাড়ির কারওরই ইচ্ছে নয়। এতো দূরে আসাটা তো আরও নয়।

মুম্বাই থেকে বেলগাঁও দূর হলো? শুভলক্ষ্মীর পরিবর্তে অর্পিত্রমা বিস্মিত মন্তব্য প্রকাশ করতে কৃষ্ণেন্দু তাকেই উত্তর দিল, আমার মায়ের কাছে বাড়ি না-ফেরাটাই বিরাট দূরত্বের। সেখানে বেলগাঁও আর বার্সিলোনার বিন্দুমাত্র তফাত নেই।

চাকরি করবেন না, দূরে যাবেন না তাহলে আপনার পরিকল্পনাটা কী? অর্পিত্রমা এবারে একটু সিরিয়াস, ব্যাপারটা তো সত্যিই ভাববার।

আমার বাড়ির সবাই বলছেন, চেম্বার সাজিয়ে দেবো প্র্যাকটিস করো।

করছেন না কেন?

তার আগে চাকরির স্বাদটা নিয়ে নিই। এখানেও যে বিরাট সংখ্যক লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের রোগ-ভোগ, সুখ-দুঃখে অংশ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নেবো। আশা করি সেই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই প্র্যাকটিসের সময়ে কাজে দেবে। প্রথম জীবনেই নিজেকে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে গুটিয়ে রাখতে চাই না।

তোমার এই সাধনার মূল্য কে দেবে? অর্পিত্রমা কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই শুভলক্ষ্মী বললেন, নীরবে তুমি শুধু কাঠই কেটে যাবে, বাকি লোকেরা সেই আগুনে নিজেদের গা গরম করবে। এটা হওয়া কী ঠিক?

দেখুন, আমরা বেঠিক কাজ করতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। উল্টো-পাল্টা কাজ করাটাই এখন প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে সঠিক কাজের হিসেব কে রাখছে বলুন?

তাহলে তুমি নিজেকে এতো নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে তুলছো কেন?

কথাটা বললে অনেকটা লেকচারের মতো শোনাবে। কৃষ্ণেন্দু এক স্বপ্ন দৃষ্টি নিয়ে গভীর গলায় বললো, বহু ব্যবহারে 'সেবা' কথাটা পুরোনো হয়ে গেছে, সেবার মধ্যেও ফাঁকি ঢুকে গেছে, কেন না নেতাদের দেশসেবার হুঙ্কার এবং নমুনা দুটোই দেখতে পাচ্ছেন। নিজেকে তুলে ধরার প্রশ্ন নয়— আমি কিন্তু সত্যিই মানুষের জন্যে আমার সাধ্যমতো করতে চাই। এর জন্য আমি প্রশংসা চাই না। প্রশংসাকে বরং আমার ভয়ই লাগে।

সারা ফ্যাক্টরি এবং কানবর্গী গ্রামে এখন যেটা পাচ্ছেন সেটা তাহলে কী? অর্পিত্রমা মুখ নিচু করে রেখে খুব মন দিয়ে শুনছিল কৃষ্ণেন্দুর কথাগুলো। আটলান্টিক সাগরে ভেজানো চোখ দুটো একটু ওপরের দিকে তুলে ধরে এবারে সে জিজ্ঞেস করলো, কোন মানুষটা প্রশংসা না-চায়?

বিশেষ কোনও গুণের জন্য যে-কোনও মানুষই প্রশংসা পেতে পারে।

আপনার ব্যাপারটা কী আলাদা?

নিশ্চয়ই। কৃষ্ণেন্দু দৃঢ় এক প্রত্যয় নিয়ে বললো, আমি মনে করি না এটা আমার গুণ। আমি একজন ডাক্তার। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করাই তো আমার একমাত্র কাজ।

রোগের চিকিৎসা করা ছাড়াও তো আপনি.......

সে-গুলোও তো সামাজিক। কৃষ্ণেন্দু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে অর্পিত্রমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে এক অনায়াস ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, আমি যদি কোনও কাজে এগোতে ভয় না-পাই, দায়িত্ব এড়িয়ে না-চলি, ডাক্তারি করা ছাড়াও ওই মানুষগুলোর ছোটখাটো দুর্বলতা যদি কাটিয়ে দিতে পারি, কিংবা ওদেরই একজন হয়ে ওদের ত্রুটিগুলো শুধরে দিই সেটা নিশ্চয়ই ভুল হবে না।

ভুল না-হলে ওটা নিশ্চয়ই বিশেষ গুণের পর্যায়ে পড়ে? অর্পিত্রমা এবারে হেসে ফেললো।

আমি তো আগেই বলেছি, আমরা বড়বেশি ফাঁকি দিই বলেই সামান্য কাজকেও বড়ো বলে ভাবি। আর ফ্যাক্টরি বা কানবর্গী গ্রামের প্রশংসার কথা যেটা বলছিলেন ওটা ঠিক তা নয়। স্বার্থবাজ লোকেরাই অহেতুক প্রশংসা করে। ফ্যাক্টরি বা কানবর্গী গ্রামের মানুষরা আমাকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসে—এটা আপনি বলতে পারেন।

ওই সময়ে একজন বেয়ারা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই অর্পিত্রমা জিজ্ঞেস করলো, কী রেডি?

জি মেমসাব।

আসবো?

জি, আ সকতে হ্যায়।

কৃষ্ণেন্দু আর মাকে নিয়ে উঠে পড়লো অর্পিত্রমা। কয়েক পা সোজা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরেই ডাইনিং হল। সেখানে সত্যিই এক চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার। হলের বিশাল কাচের দরজা জুড়ে সাদা লেসের কারুকাজ করা পাতলা পর্দা বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে। জানলার স্যাটিন পর্দাগুলোকে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যে গুটিয়ে সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাইরের পাম্বপাদপ গাছের পাতাগুলো যেন ঘরের মধ্যেই ওদের স্থান করে নিয়েছে। চার কোণে চারটে পেতলের ঝকঝকে ফুলের টব। ফুলের নাম কৃষ্ণেন্দু বলতে পারবে না। তবে রঙের শিল্প সুষমায় সে-গুলো গোটা হলকেই আলোকিত করে রয়েছে। আর ঘরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে এসে মনকে ভরিয়ে দেয়।

হলের ঠিক মাঝখানে ডিমালো গড়নের মস্ত ঝকঝকে টেবিল। টেবিলকে ঘিরে সাত-আটটা চেয়ার। মেহগনি কাঠের এই ফার্নিচারগুলোর নিখুঁত পালিশে নিজের মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। টেবিলের পালিশ যাতে নষ্ট না-হয় সেজন্য খাবার আগে অনেকে কাপড়-টাপড় দিয়ে টেবিল ঢাকা দেয়। এখানে সে-সবের বালাই নেই। কতো নষ্ট হবে হোক। টেবিলের ফুলদানির সতেজ ফুলগুলো মাথা দুলিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালো।

শুভলক্ষ্মী, অর্পিত্রমা এবং কৃষ্ণেন্দু চেয়ারে বসতেই উর্দিপরা চারজন পরিবেশনকারী যে-যার কাজে লেগে গেল। খাবার-দাবারের সে-এক বিরাট আয়োজন। কৃষ্ণেন্দু অবশ্য জানে এ-সব কোনও স্পেশাল ব্যাপার নয়। এটা ওক পরিবারের প্রাত্যহিক রুটিন-এর মধ্যেই পড়ে। তবে সে লক্ষ্য যেটা করলো তা হলো, খাওয়ার চেয়ে প্রদর্শনীটাই বেশি। বিশেষ করে অর্পিত্রমার ক্ষেত্রে। আঙ্গুলের ডগায় তুলে সে কী খাচ্ছে, কতোটুকু খাচ্ছে সেই-ই জানে। কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো এই একদিনের খাবারে অর্পিত্রমা তিরিশটা দিন অনায়াসে খেতে পারে। কী বিরাট অপচয় চিন্তা করা যায় না। কৃষ্ণেন্দুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো। এই একটু আগেই শুভলক্ষ্মী বলছিলেন, নীরবে তুমি শুধু একাই কাঠ কেটে যাবে—বাকি সবাই সেই আগুনে নিজেদের গা গরম করবে। এটা হওয়া কী ঠিক? শুভলক্ষ্মী কথাটা ভুল বলেছিলেন। এই দেশে বাকি লোকেরাই নীরবে কাঠ কেটে চলেছে—মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাপ পোয়াচ্ছে।

পরিবেশনকারীরা একের-পর-আর এক পদ পরিবেশন করে চলেছে। প্রথমে দিয়েছিল উখেপম, বটেটা বড়া, স্যালাড এবং আলুর কাশ্মীরি তারপরে এলো ডিমের ডেভিল, ফিসরোল। ওই কোর্সটা শেষ হতেই ফ্রায়েড রাইস আর মটনকারি। খেতে খেতে কথাবার্তা চলছিল। কৃষ্ণেন্দু মাপা খাবার নিচ্ছিলো দেখে শুভলক্ষ্মী বারবার অভিযোগ করছিলেন। কৃষ্ণেন্দুর ওই এক উত্তর। নষ্ট করে কী লাভ? যেটুকু পারবো তা নিশ্চয়ই নেবো। অর্পিত্রমার মুখ দেখে মনে হলো কথাটা তার পছন্দ

হয়নি। সে ফেলে ছড়িয়ে খেতেই অভ্যস্ত। কৃষ্ণেন্দু এক সময়ে বললো, আপনাদের বাড়িতে তাহলে মাছ-মাংস ঢোকে? আমি ভেবেছিলাম পুরোপুরিই নিরামিষ।

এটা আমাদের বরাবরের অভ্যেস। শুভলক্ষ্মী বলতে লাগলেন, শুধু আমরা কেন, অনেক মারাঠিই মাছ-মাংস খাচ্ছে। খাওয়ার ব্যাপারে ওক সাহেবের কোনও বাছবিচার নেই। সেই কারণে বিয়ের পর থেকেই তা ধরো এই বছর সাতাশ-আঠাশ হতে চললো, এ-ব্যাপারে তোমার মতোই আমরা পুরোপুরি বাঙালি। বিয়ের আগে অবশ্য আমি খেতাম না। শুভলক্ষ্মী গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বললেন, ওক সাহেব খেতেন। বিয়ের ছ'দিনের মাথায় মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয় টার্মিনাসের রিফ্রেশমেন্ট রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ ভাতের সঙ্গে তোমাকে নতুন একটা জিনিস খাওয়াবো, জীবনেও ভুলতে পারবে না। সত্যিই তাই! শুভলক্ষ্মী যেন এখনও সেই স্বাদটা পাচ্ছেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, রসুন, টকদই আর পোস্ত দিয়ে পমফ্রেট মাছের ঝোল রেঁধেছিল। কী বলবো তোমাকে কৃষ্ণেন্দু, একবারও মনে হয়নি জীবনে সেই প্রথম আমি মাছ খাচ্ছি। গা বমি বমি করেনি, বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি হয়নি বরং চেটেপুটে প্লেটটা এমন পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম ওক সাহেব ঠাট্টা করে বলেছিলেন, একজনের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে। সেই শুরু......

শুভলক্ষ্মীর গল্পের শেষে একজন ফ্রুট স্যালাডের বাটিটা এগিয়ে দিল। এরপর আইসক্রিম এবং কর্ণাটকের বিখ্যাত মিষ্টি কুন্দা। কৃষ্ণেন্দু অবশ্য চায়নি তার আগেই একজন পরিবেশনকারী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললো, সাব আপকো আউর কুন্দা দু?

কৃষ্ণেন্দু মাথা নাড়লো।

সত্যিই তো আপনি আর নিচ্ছেন না কেন? ছোট্ট অভিযোগ অর্পিত্রমার।

আমার যেটুকু প্রয়োজন আমি নিয়ে নিয়েছি। কৃষ্ণেন্দু হেসে উত্তর দিল, জানেন তো মানুষ খেয়ে মরে না। যতো গন্ডগোল সব ওই অতিরিক্ত খেয়েই।

হ্যাঁ আপনি তো আবার ডাক্তার। অর্পিত্রমার গলায় ঠাট্টার আমেজ।

ডাক্তার না-হলেও ওই একই কথা বলতাম। কৃষ্ণেন্দু মৃদু সুরে উত্তর দিল, আপনি কি মনে করেন ডাক্তাররাই সব কিছু বোঝে? সাধারণ মানুষও এক একজন ছোটখাটো ডাক্তার।

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। তবে কি জানেন—অর্পিত্রমা একটু থামতেই শুভলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তুই কি আবার তর্ক জুড়ে দিলি নাকি?

তা কেন? অন্য সময়ে অর্পিত্রমার প্রতিক্রিয়া কী হতো সেটা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারতেন। এখন কিন্তু সে একটুও রাগ করলো না। মায়ের কথা শুনে কৌতুক অনুভব করে কৃষ্ণেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো, মায়ের ধারণাটা দেখলেন তো। আমাকে শুধু তর্ক করতেই দেখেন।

কৃষ্ণেন্দু সহজ সুরে উত্তর দিল, এই ধারণার জন্য ওনাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কী?

ও আপনিও মায়ের দলে? কথাটা বলেই অর্পিত্রমা এই প্রথম বাঁধভাঙা হাসির ঢেউয়ে দুলতে লাগলো। নীল চোখ দুটো দিয়ে কৃষ্ণেন্দুকে গভীর ভাবে দেখতে দেখতে অর্পিত্রমা ঘন হাসির অরণ্যে নিজেকেই যেন হারিয়ে ফেললো। মানুষের বড় সৌন্দর্য তার মুখের হাসি। অর্পিত্রমা সমানে সেই সৌন্দর্যের কিরণ ছড়াতে লাগলো।

রাত সাড়ে-দশটারও পরে ভজনলাল কৃষ্ণেন্দুকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিল। একতলার ফ্ল্যাটের দুই বাসিন্দা বিনায়ক প্রসন্ন এবং হেমু কানিৎকার রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর সস্ত্রীক লনে বসে গল্প করছিলেন। ওঁরা চারজনেই কৃষ্ণেন্দুর চেয়ে দশ থেকে পনের বছরের বড়ো। কৃষ্ণেন্দুকে ওঁরা যথেষ্ট স্নেহ করেন। এবং সেই সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কিও চলে সমান বয়সীর মতো। কৃষ্ণেন্দু যে মুহূর্তে গ্রীলের গেট খুলে লনে পা রাখলো, সিমলি প্রসন্ন এবং জয়ললিতা কানিৎকার দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলেন, কৃষ্ণেন্দু প্লিজ, আমাদের কৌতূহল মিটিয়ে দিয়ে যাও, নচেৎ নির্ঘাৎ মারা পড়ে যাবো। পেট ফুলে আছে।

হেমু কানিৎকার জয়ললিতার দিকে চোখ রেখে বললেন, ওটা নতুন কোনও ব্যাপার নয়। জয়ললিতা স্বামীকে ধমক লাগাতে গিয়ে নিজেই ঝরঝর করে হেসে ফেললেন, সত্যি সাঙ্ঘাতিক মানুষ তুমি। মুখে কিছু আটকায় না। বিনায়ক প্রসন্ন আর সিমলি প্রসন্ন তখনও হাসছেন। হেমু

কানিৎকার আবার বললেন, আটকাবে কী? তোমরা এই দুজন বিগ ভদ্রমহিলা কৃষ্ণেন্দুকে আটকাচ্ছো কেন উত্তর দাও?

আপনি দয়া করে একটু থামবেন? সিমলি প্রসন্ন হেসে হেসেই শাসন করাব চেষ্টা করলেন।

আমরা কোনও দযা দেখাবো না। ঢালাও ফতোযা জাবি করে বসলেন বিনায়ক প্রসন্ন।

হেমু কানিৎকার তাঁকে সমর্থন করলেন, হ্যাঁ, আমরা বিন্দুমাত্র দয়া দেখাবো না।

জয়ললিতা গম্ভীর সুরে হুঙ্কার ছাড়লেন, এতোক্ষণ এঁরা দুজন বন্ধুতে বলাবলি করছিলেন, অর্পিত্রমাজি কৃষ্ণেন্দুকে নিশ্চয়ই খাইয়ে ছাড়বে। আর খাওয়া মানেই ফেঁসে যাওয়া। নুন খেলে গুণ গাইতেই হয়। তা কৃষ্ণেন্দু তুমি রাতের খাওয়া সেরে এসেছো কি না আগে সেটা বলো?

কৃষ্ণেন্দুর ছোট্ট উত্তর, তা এসেছি।

হাঃ হাঃ দেখলে এর নাম অনুমান! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বিনায়ক প্রসন্ন আর হেমু কানিৎকার। বিনায়ক বললেন, এই খাইয়ে দেবার মধ্যেই থাকে প্রাণের ছোঁয়া। অর্পিত্রমাজি যখন গাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে নিয়ে গেলেন তখনই বুঝেছিলাম হাউসবাজি জ্বলবেই। আর আজকে উনি বোধহয় একটুও রাগ বা চড়া মেজাজে কথা বলার সাহস দেখাননি। কি কৃষ্ণেন্দু সত্যি কি না বলো? অর্পিত্রমাজি নিশ্চয়ই প্রাণ ভবে হেসেছেন।

আচ্ছা দাদা—আপনারা কি অর্পিত্রমাজির ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিলেন? কৃষ্ণেন্দু ক্রমশই অবাক হচ্ছিলো।

বাইপাশ করো না কৃষ্ণেন্দু। হেমু কানিৎকাবেব সস্নেহ ধমক। আমরা অদৃশ্য টিভির পর্দায চোখ রেখে দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম অতীব শান্ত এবং সুখী পোষমানা বেড়ালের মতো অর্পিত্রমাজি তোমার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে চলেছেন। তাঁর দেহে মনে তখন আবিষ্কারেব গতি। অর্পিত্রমাজি বদ্ধ এক জলাভূমির মতো রুগ্ন নদীতে পড়েছিলেন—এবার কৃষ্ণসাগরের দেখা পেলেন।

আরে দারুণ দারুণ! বিনায়ক বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

জয়ললিতা খুশির কণ্ঠে বললেন, চমৎকার বলেছো কিন্তু। মনে হচ্ছে তোমাকে নতুন করে চিনছি।

সে-সব তো বুঝলাম। সিমলি আলোচনার শাখা-প্রশাখাকে ছেঁটে ফেললেন। আসল জায়গায় আবার ফিরে গিয়ে বললেন, কৃষ্ণেন্দু যদি এতো চুপচাপ থাকে কৃষ্ণপ্রেমকথা শুনবো কার মুখ থেকে?

আমি আব কী বলবো—অসহায় ভঙ্গিতে বিষণ্ণ হাসি নিয়ে কৃষ্ণেন্দু চারজনের মুখের দিকেই তাকালো। আপনাদেব কল্পনা-শক্তি কতো প্রখর হতে পাবে তারই নমুনা পেলাম। একটা খরগোশকে আপনাবা কি চমৎকার রং তুলির টানে হাতি পর্যন্ত বানিয়ে দিলেন।

তবে রে ছেলে! এখন সব দোষ আমাদের। জয়ললিতা এতোক্ষণে আসল রহস্য প্রকাশ করলেন। ওক সাহেবের বাড়িব সেই পার্টিতে আমবা এতো লোক গেলাম তবুও অর্পিত্রমাজির মন ভরলো না। যেহেতু আমরা এক বিল্ডিংয়ে থাকি সেই আমাদের কাছে এসে বারবার এক জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণেন্দুজি আসবেন না? ওঁর এতো দেরি হচ্ছে কেন? আপনারা জানেন কিছু?

কৃষ্ণেন্দু নিশ্চয়ই আমাদের কালা-হাবা মনে করে না। হেমু মুখ টিপে হাসলেন।

এবং নিরেট গবেটও নয়। সঙ্গে সঙ্গে বিনায়ক বন্ধুকে সমর্থন জানিয়ে কৃষ্ণেন্দুর মাথার চুলগুলোকে পরম স্নেহে এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ আমরা তোমাকে জ্বালালাম, আর দেরি করো না—ঘুমিয়ে পড়ো গিয়ে যাও।

আরও বিস্ময় কৃষ্ণেন্দুর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওঁদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজাব দিকে তাকালো। ওটা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার পদ্মকর মির্ধার এলাকা। কৃষ্ণেন্দু বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে নিজের দরজা খুললো। জুতো এবং মোজা খুলে কৃষ্ণেন্দু হাত-পা ছড়িয়ে সোফার গায়ে সবে দেহটা ছেড়ে দিয়েছে, ঘরের মধ্যে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন পদ্মকর মির্ধা এবং তাঁর স্ত্রী সারদা। নীচের দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মতোই এঁরাও সমান মাতোয়ারা। হাসি, ঠাট্টা এবং কৌতুকপ্রিয় এই তিনটি ফ্যামিলি কৃষ্ণেন্দুকে সযত্নে আগলে রেখেছেন। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, ওই তিনজন মানুষই তাদের কাজের ক্ষেত্রে কী অসাধারণ সিনসিয়ার এবং এই সব ঠাট্টা-ফাজলামোকে দূরে সরিয়ে রেখে

গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব নিয়ে কী বিরাট ভাবে অফিস বা ফ্যাক্টরির মধ্যে চলাফেরা করেন।

সারদা এবং পদ্মকর মির্ধার যুগল আবির্ভাবে বিস্মিত কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করলো, আপনাবা ঘুমোননি? একটু আগেই যে দরজা বন্ধ দেখছিলাম—

ঘুমোচ্ছিলাম এবং ঘুম থেকেই উঠে এলাম।

সে-কী? কেন?

পরে আরও ঘুমোতে পারবো—পদ্মকর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? অর্পিত্রমাজি নিঃশব্দে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, ফিরবার আর নামই নেই! আমরা তো ভয়েই সারা। ওঁর মুখ মানেই তো একঝাঁক কামানের গোলা। সবাইকে মুহূর্তে শুইয়ে দিচ্ছেন। গুলি-টুলি লাগেনি তো তোমার।

পদ্মকরের কথাবার্তা শুনে কৃষ্ণেন্দু আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলো না। হেসে ফেললো। এঁরা যে-স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন সেও সেই পথেই যাবে। তাতে আর যাইহোক ব্যাপারটা খুব সাদামাটা হয়ে তাড়াতাড়ি মিইয়ে যাবে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই সারদা ঘুম ঘুম চোখে ঝিরঝিরে হাসি নিয়ে স্বামীর কথার উত্তরে বললেন, কৃষ্ণেন্দুর কেন গুলি লাগবে? ও তো গুলি করে এলো। দেখো গিয়ে তোমাদের অর্পিত্রমাজি এখন নিজেই শুয়ে আছেন।

কৃষ্ণেন্দু বেশ বুঝতে পারলো, ফাজলামিতে এই মির্ধা দম্পতির ওপরে যেতে না-পারলে তাকে এই এগারোটার সময় পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। অতোএব—

অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক গলায় কৃষ্ণেন্দু বললো, আপনি খুব একটা ভুল বলেননি। ব্যাপারটা ঠিক তাই।

তার মানে? সারদা আঁতকে উঠলেন।

পদ্মকর সন্দেহ প্রকাশ করলেন, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছো না তো?

ঘুমবো কেন? সাবা রাতেও আমার ঘুম আসবে কি না সন্দেহ!

বলো কী? পদ্মকর বিজ্ঞের মতো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এক ফাঁকে বলে ফেললেন, আমরা তাহলে ঠিক সময়েই ঘুম থেকে উঠে এসেছি, কী বলো?

তোমার বকবকানি আপাততো একটু বন্ধ রাখো। সারদা বড়ো বড়ো চোখে কৃষ্ণেন্দুকে জরীপ করছেন। তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বলো তো তোমাদের মধ্যে ঠিক কী কী কথা হয়েছে? যে-মেয়ে তোমাকে পায়ের নীচে রাখতে চাইছিল সেই এখন টেনে তুলে ধরতে চাইছে। ব্যাপারটা কী কৃষ্ণেন্দু?

বিয়ে।

বিয়ে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইরকম কথাই অর্পিত্রমাজি শোনালেন।

তুমি অর্পিত্রমাজিকে বিয়ে করবে?

কী করবো বলুন। সেই ভদ্রমহিলা কিছুতেই ছাড়লেন না। কথা একেবারে আদায় করেই নিলেন। ওক সাহেব ফিরে এলেই দিনক্ষণ স্থির হবে।

আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমবো। পদ্মকর হাই তুললেন। স্বামীর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে সারদা বললেন, আমারও। ফিরে যেতে যেতে আরও একবার ওঁর জড়ানো গলা শোনা গেল, আমাদের পাল্লায় পড়ে কৃষ্ণেন্দুটাও ভারী ফাজিল হয়ে উঠছে। কাল সকালে ওকে একটু ধমক-টমক দিয়ো।

ওঁরা চলে গেলে কৃষ্ণেন্দু নিজেকে একটু হালকা বোধ করলো। এ-যাত্রায় পার হওয়ার ফলে এক বিন্দু সুখ যে তাকে স্পর্শ করেনি তা নয়। কৃষ্ণেন্দু দরজা-টরজা বন্ধ করে দিয়ে লাইট নিভিয়ে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। অন্ধকার ঘরে চোখ দুটো বন্ধ রেখে ওর মনটাই শুধু জেগে রয়েছে। কতো মুখের মিছিল সেখানে। বাবু-মা, দাদা-বৌদি, ভাই-বোন, দিদি-জামাইবাবু, ভাগ্নে, ভাইপো,

ভাইঝি, স্কুল-কলেজের বন্ধুর দল, হাসপাতালের পরিচিত জনেরা, ওক অ্যালুমিনিয়ামের অসংখ্য মানুষ, কানবর্গী গ্রামের কাছের মানুষগুলো, কোয়ার্টাবের গুরুজন কাম বন্ধুর দল, ভাস্কররাও এবং ওর পরিবারের আপনজনেরা ওক ফ্যামিলির তিনজনের মুখই চিন্তার আয়নায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু......কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে যে-মুখটা ভাসছে সেটা কঙ্কণা কান্ননেব। কৃষ্ণেন্দুর হঠাৎ মনে হলো তার এই ঘরখানা এখন মোটেই অন্ধকারে ডুবে নেই। সেই একজনের লাজুক হাসিতে শুধু ঘরখানা নয়, সারা পৃথিবীটাই বুঝি কোজাগরী জ্যোৎস্নায় ভাসছে।

মেডিক্যাল সেন্টারে একজন রোগীকে দেখার পর কৃষ্ণেন্দু যখন প্রেসক্রিপশন লিখছিল তখন থেকেই একটা হই-হট্টগোলের আওয়াজ তার কানে আসছিল। আওয়াজটা অবশ্য দশজনের নয়, একজনই যে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে এটা বোঝা যাচ্ছে। চিৎকারটা আরও একটু কাছে এলে কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো গলাটা বংশীলালের। নিশ্চয়ই আবার মদ-টদ খেয়েছে। ওর কাছে দুনিয়া একদিকে মদ আব এক দিকে। ওর জীবনও বোধহয় ওটার চেয়ে প্রিয় নয়।

হ্যাঁচড়াতে হাঁচড়াতে একটা ভারী বস্তাকে টানার মতো বংশীলাল একজন মানুষকে টানতে টানতে একেবারে কৃষ্ণেন্দুর পায়ের কাছে এনে ফেলে দিল। তখনও ওর আস্ফালন এতোটুকু কমেনি। দলা পাকানো কাগজের মতো যাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সে খুব কাতরাচ্ছে। বছর কুড়ি-একুশের ছেলেটা যন্ত্রণায় শুধু একটা কথা বলে চলেছে, আমাকে মেরে ফেলেছে, হামকো মার ডালা—

তু আভিতক জিন্দা হ্যায়। মারের এখনও কিছুই হয়নি। এই তো শুরু—বাঘের হুঙ্কার দিয়ে বংশীলাল বললো, তবে হ্যাঁ এই কৃষ্ণজিব পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলে এইবারেব মতো ছেড়ে দেবো।

কৃষ্ণেন্দু মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলেটাব বাঁ দিকটা দেখতে পাচ্ছিলো না। যন্ত্রণায় উঃ আঃ করে এ-পাশ ফিরতেই দেখা গেল ওর পাঁজরের সম্পূর্ণ অংশটা রক্তে মাখামাখি। কোথায় কতোটুকু ক্ষত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসলো। বংশীলাল তখনও ফুঁসছে, ইয়ে মেরা ছোটাভাই ছোটেলাল হ্যায়—

কৃষ্ণেন্দু ইশারায় বংশীলালকে থামিয়ে ছেলেটাকে ভেতরেব ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। রক্ত-টক্ত পরিষ্কার করার পর দেখা গেল একটা জায়গায় গভীর ক্ষত। সেখান থেকেই রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। ড্রেসিং করে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে কৃষ্ণেন্দু ওকে শুইয়ে বেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বংশীলালের কান্নাভেজা গলা শোনা গেল, কৃষ্ণজি আমার ভাই ভালো হয়ে যাবে তো?

যাবে। কৃষ্ণেন্দু ছোট্ট গলায় জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কী হয়েছে?

ব্যাপারটা শোনার পর কৃষ্ণেন্দুই অপার বিস্ময় নিয়ে বংশীলালের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এর চেয়ে বড়ো সার্থকতা আর কী হতে পারে? একজন রোগীকে সারিয়ে তোলার চেয়ে এটা কী কোনও অংশে কম! একজন মানুষ 'মানুষ' হয়ে উঠলো। কৃষ্ণেন্দুর খুশির কারণ সেটাই। বংশীলাল নাকি বেশ কয়েকদিন ধরেই ওব ভাই ছোটেলালকে মদ খেতে বারণ কবে আসছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এককালে বড়ো ভাই নিজেই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক গেলাসে মদ খেয়েছে। মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে এসে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছে। সেই বংশীলালের কথা ছোটেলাল এখন শুনবে কেন? সে-ও সমান মেজাজে গলা ফাটিয়েছে, মদ খেতে বারণ করার তুমি কে? তুমি নিজে কী, সেটা ভুলে গেছো? কানবর্গী গ্রামের এক নম্বর মাতালের নামটা তোমারই। লোকে বলতেই বলে, মাতাল বংশী।

ছোট ভাইয়ের এই বেয়াদপি বংশীলাল নীরবে হজম করলো। সেই সঙ্গে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলো, ছিলাম, এখন আর নেই।

ভারী তো তিন-চার মাস হলো মদ ছেড়েছো। আবার ধরতে কতোক্ষণ?

সে-হিসেব তোকে দেবো না। বংশীলাল অনেক কষ্টে নিজের চন্ডাল রাগকে দমিয়ে রেখে বললো, রোজ রোজ ও-সব বাজে জিনিস খেয়ে এসে বৌমাকে ধরে পেটাস না। মেয়েটা রাত-দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে আর তুই এই ভাবে সর্বনাশ ডেকে আনবি দাদা হয়ে এ-সব যে আমি দেখতে

পারি না।

তুমি যেটা পারো সেটাই করো না—খামোকা আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? ছোটেলাল আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলো, তুমি এখন কৃষ্ণজি ডাগদারের বাতেলায় প্রাণেব ঠার্‌রা, কাজু ফেনির মদ ছেড়ে নিম্বুপানি খাচ্ছো। এই সব ভড়ং বুজরুকি ছেড়ে চলো দু'ভাই মিলে ভাটিখানার ড্রামটাকে বিলকুল ফাঁকা করে দিয়ে আসি। দেখবে ও-সব কৃষ্ণজি-ফৃষ্ণজি....না আর সহ্য করেনি বংশীলাল। সামনে পড়ে থাকা চ্যালা কাঠটা তুলে নিয়ে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দু বাইরের চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধবালো। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস কবলো, তুমি তাহলে একেবারেই মদ ছেড়ে দিলে বংশীলাল?

জি ডাগদার সাব। আপন কসম খায়া না, নেহি পিউঙ্গা, সচমুচ নেহি পিউঙ্গা। দেখ্ লে না—

তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো। তোমার প্রতিবাদটা আরও ভালো লাগলো—খারাপ যেটা লাগছে তা হলো ছোটেলালকে তোমার ওই ভাবে মারাটা উচিত হয়নি।

ডাগদার সাব, আমি তো মারতেই চাইনি। বংশীলাল নিস্তেজ গলায় জানালো, ছোটেলাল আপনাকে পর্যন্ত অপমান কবলো।

তাতে আমি ছোট হয়ে যাইনি। তাছাড়া ছোটেলাল ঠিক আমাকেও ছোট করতে চায়নি, তুমি বারবার একই কথা বলছো—ও তাই বাধাব প্রাচীরটাকেই সরাতে চেয়েছে। তুমি কিন্তু অন্যায় করেছো অমন ভাবে মেরে। কৃষ্ণেন্দু চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দিল, এ-ভাবে কাউকে শোধরানো যায় না। বরং তার জিদটাকেই আবও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মারধর না-কবে শুধু বুঝিয়ে যাও—তার জন্য সবার আগে দরকার ধৈর্য। তুমি নিজেই যদি সেই ধৈর্য হারিয়ে বসো শাসন করবে কাকে? তুমি জানো, গায়ে হাত না-তুলেও কী বিবাট কঠিন সাজা দেওয়া যায়! তখন দেখবে অনুতাপেব আগুনে পুড়ে সে নিজেই শুদ্ধ হয়ে গেছে।

ডাগদার সাব এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আব কখনও মারবো না।

ছুটিব পর কৃষ্ণেন্দু হাঁটতে হাঁটতে সোজা কানবর্গী গ্রামের বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে বগেরভইসের বাস ধরে সে সিটিতে যাবে। গত সপ্তাহে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কেনাকাটাব ছিল। সে-গুলোই কিনবে। বাস-স্টান্ডে কৃষ্ণেন্দু মিনিট দুয়েকও দাঁড়ায়নি, ঝড়ের মতো সেখানে এসে উপস্থিত হলো কঙ্কণা। সে বাসেব জন্য অপেক্ষারত মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে এক সময় কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। কৃষ্ণেন্দু খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার এখানে?

বাবাকে খুঁজতে এসেছিলাম। খুব সম্ভব আগের বাসেই তিনি সিটিতে চলে গেছেন। কঙ্কণা মৃদু হেসে বললো, আর বলবেন না, বাবা সবার জন্য সবই কেনাকাটা করবেন, শুধু নিজেরটা নয়। আসলে ইচ্ছে করেই এটা করছেন।

সরি ম্যাডাম, কিছুই বুঝলাম না।

বাবা কখনও দামি ধুতি পরেননি। অথচ ফিনফিনে ব্রেসলেট পরার আকাঙ্ক্ষা যে নেই তা নয়। কিন্তু কিনবেন না। শুধু বলবেন, অতো দাম দিয়ে একটা মাত্র ধুতি কেনার কোনও যুক্তি নেই। এমন শখ থাকাও ঠিক নয়। প্রতিবারই বাবার হাতে টাকা গুঁজে দেওয়া হয়েছে আর প্রতিবারই বাবা টাকাটা মায়ের হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজও তাই হয়েছে। মাকে বলে এলাম এ-ভাবে হবে না। নিজেরা না-কিনলে অথবা বাবাকে দিয়ে জোর করে না-কেনালে এমনটাই চলবে। বাবা আমাদের জিনিসপত্র কিনতেই সিটিতে গিয়েছেন। একটু থেমে কঙ্কণা এবারে জানতে চাইলো, আপনি?

আমিও সিটিতে যাবো। আমারও কিছু...কৃষ্ণেন্দু কথাটা পুরো করতে পারলো না। ভজনলাল ইম্পালা নিয়ে কৃষ্ণেন্দুর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। পেছনের সিটে অর্পিত্রমা ওক। ভোরের বাতাস ছড়াবার মতো চিকন এক হাসি নিয়ে অর্পিত্রমা সামান্য একটু ঝুঁকে কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলো, যাবেন কোথায়?

বগেরভইস।

উঠে আসুন—

কৃষ্ণেন্দু একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। একপলক কঙ্কণাকে দেখে নিয়েই সে অর্পিত্রমার দিকে

তাকালো। নিচু সুরেই বললো, আমার সঙ্গে একজন—

অর্পিত্রমা প্রথমে খেয়াল করেনি। কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনে কঙ্কণাকে দেখতে পেয়ে তার মুখের চেহারাটাই বদলে গেল। হ্যাঁ, মেয়েটাকে মানে এই মেয়েটাকে সে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে পপ-ইনে দেখেছিল। মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু তাব চেয়েও কী? হঠাৎ ওই প্রশ্নটা অর্পিত্রমার মাথায় কেন এলো তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পাবলো না। কৃষ্ণেন্দুব কথা তার দুই কানে এখন বাজছে, আমার সঙ্গে একজন—

সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে অর্পিত্রমা নয়। সাধারণ ঘরের একটি মেয়ে তা সে যতোই সুন্দরী হোক কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গিনী হবার গরবে তার দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকাবে এটা হজম করা অর্পিত্রমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সে এ-সব ছোটখাটো ব্যাপাবের ঊর্ধ্বে উঠতে চাইলো। যেন কিছুই নয়— এমনই এক সহজ সুরে অর্পিত্রমা বললো, আপনার সঙ্গিনীকে নিয়ে উঠে আসতে বলছি। তাবপর অর্পিত্রমা আধিপত্য বিস্তারের ভঙ্গিমায় কঙ্কণার চোখের দিকে তাকালো। বললো, উঠে আসুন।

ইম্পালা তখন নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। পেছনের সিটে ওরা তিনজন। অর্পিত্রমা, কঙ্কণা এবং কৃষ্ণেন্দু। অর্পিত্রমা কৃষ্ণেন্দুর দিকে একবারও তাকালো না। কঙ্কণাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর সুরে এক সময় বললো, আমার নাম অর্পিত্রমা ওক।

আমি জানি। দুই ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে কঙ্কণা হাত তুলে নমস্কার জানিযে মৃদু গলায় বললো, আমাব নাম কঙ্কণা কান্নন।

কোথায় থাকেন?

এই কানবর্গী গ্রামেই। আমার বাবার নাম নীবজ কান্নন। উনি আপনাদের অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিতেই চাকবি করেন।

ও! অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরে অর্পিত্রমা এবারে কঙ্কণাকে দেখতে দেখতে বলে উঠলো, আপনি কী করেন?

আমি এবারেই বি.এ. পাশ করলাম। নিরুচ্চার কণ্ঠে কঙ্কণা বললো, কয়েক মাস হলো কানবর্গীর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষযিত্রীর চাকরি পেয়েছি।

আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারের উল্টোদিকেই তো প্রাইমারি স্কুলটা তাই না?

হ্যাঁ!

সেখান থেকে আপনাদের বাড়ি কতো দূর?

মিনিট পাঁচেকের পথ।

তার মানে খুব কাছেই—

হ্যাঁ। সহজ-সরল কঙ্কণা প্রতিটা কথার উত্তর দিতে লাগলো কেমন যেন এক নিতান্তই বাধ্য মেয়ের মতো।

স্কুলে পড়াশোনা ঠিক মতো হচ্ছে?

নিশ্চয়ই, কঙ্কণার দ্বিধাহীন উত্তর, আমরা পড়াতে শেখাতে যেমন আগ্রহী, শিখতেও ঠিক তেমনই আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরাও।

আপনারা তাহলে খুবই সিনসিয়ার বলছেন? অর্পিত্রমা অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো। কিন্তু ওরই মধ্যে তার হঠাৎ মনে হলো, এই মেয়েটা কী যেন একটা জয় করতে চলেছে। কী সেটা?

বগেরভইসের মোড়ে কৃষ্ণেন্দু ও কঙ্কণাকে নামিয়ে দিয়ে ইম্পালাটা চলে গেল। কঙ্কণা চকিতে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকালো। ভারভার মুখ। হঠাৎ ও এতো গম্ভীর হয়ে উঠলো কেন? কঙ্কণা খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো আপনার কী হয়েছে? কথা বলছেন না যে?

কী আর বলবো? কৃষ্ণেন্দু একটু অসহিষ্ণু হয়েই উত্তর দিল, আপনি তো বি.এ. পাশ করেছেন, যথেষ্টই বিদ্যে-বুদ্ধি আছে—অর্পিত্রমা ওক নামের সেই মহিলাটি যে আপাতনম্র ঔদ্ধত্য নিয়ে আপনাকে কথা শোনাচ্ছিল, রীতিমতো অপমান করছিল সেটা কি আপনি বুঝতে পারছিলেন না? ওই যে কাটা কাটা কথাগুলো মেডিক্যাল সেন্টারের উল্টোদিকেই তো স্কুল, কাছাকাছিই বাড়ি, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা তাহলে বোধহয় ঠিকমতো হওয়া সম্ভব নয়। আর আপনাকেও বলি, আপনি যেন পড়া

মুখস্থ কবা এক ছাত্রীর মতো গড়গড় করে ওর প্রতিটা কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন—কী দরকার ছিল? অর্পিত্রমা যখন ওর নাম নিজে থেকেই বললো, তখন নমস্কাব করে 'জানি' বলার? অর্পিত্রমাজি আপনাকে নমস্কার করেছিল? প্রথমেই আপনি ওকে অতোখানি প্রাধান্য দিলেন তাই অতো অবজ্ঞায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী করেন?

এই ব্যাপার! কঙ্কণার পাতলা দুই ঠোঁট থেকে হাসির মোম গলে পড়তে লাগলো। নিষ্পাপ ওই হাসির কুসুম সারা মুখে মেখে কঙ্কণা অনুচ্চ অথচ এক নিবিড় গলায় বললো, এতে আমি অপমানিত হলাম এটা ভাবছেন কেন? অর্পিত্রমাজি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেছেন, আমি আমার মতো। সব মানুষের আচার-ব্যবহার তো এক রকম হতে পারে না।

গুজরানায় পৌঁছে অফিসের শাড়ি-ব্লাউজেই অর্পিত্রমা নিজের বিছানায় গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়লো। এই মুহূর্তে তার কোনও কিছুই ভালো লাগছে না। না স্নান করতে, না কিছু খেতে। আসলে অর্পিত্রমা মনে মনে এক জটিল জালে আটকা পড়ে গেছে। হরিণীব নূপুর ছন্দ সেখানে স্তব্ধ। সে নিজেকে আজ বিশ্লেষণ করতে বসলো। এম.এ. পাশ করে সে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স কমপ্লিট করেছে লন্ডন থেকে। ওক অ্যালুমিনিয়ামেব মতো বিবাট একটা কোম্পানির মালিক। তার চেয়েও বড়ো কথা সে অসাধারণ সুন্দরী একটি মেয়ে। অথচ কঙ্কণা নামের গ্রাম্য সাধারণ একজন মেয়ের কাছে সে যেন হেরে যাচ্ছে। তার কী নেই যা ওই মেয়েটির মধ্যে আছে? অর্পিত্রমা আপন মনে বারবার বলে উঠলো, কৃষ্ণেন্দু তুমি অন্ধ! তুমি অন্ধ!!

ঘরে ঢুকলেন শুভলক্ষ্মী। মেয়েকে ওই ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, কী রে শরীর খারাপ নাকি?

না।

তাহলে? কী তাহলে? অর্পিত্রমা মায়ের ওপরেই রাগ মেটাতে চাইলো।

অফিস থেকে এসে স্নান-টান না-কবেই এই ভাবে.....শুভলক্ষ্মী হঠাৎ নিচু সুরে জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়নি তো?

সব সময় শুধু কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু করো না তো। কে কৃষ্ণেন্দু? অর্পিত্রমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, ও কি আমার সম পর্যায়ের? কৃষ্ণেন্দু আমার কাছে হাত পাতে আমি ওকে মায়না দিই, বুঝলে? অর্পিত্রমা আর কথা না-বাড়িয়ে ও-পাশ ফিবে বালিশে মুখ গুঁজে রইলো। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুভলক্ষ্মী ভাবলেন, অর্পিত্রমা মুখে যাই বলুক—ও নিশ্চয়ই কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কিছু একটা বাধিয়ে এসেছে।

সেদিন লাঞ্চের পব কৃষ্ণেন্দু যখন কানবর্গীর মেডিক্যাল সেন্টারে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, হঠাৎ তার ঘবে এসে উপস্থিত হলেন সারদা, জয়ললিতা এবং সিমলি। ওঁদের চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওঁরা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে একটু মজা করার মতলবেই এসেছেন। ইতিমধ্যে কঙ্কণা দু'দিন কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে এই কোয়ার্টারে এসেছে। সেই থেকে ওই তিন বিগ ভদ্রমহিলা কৃষ্ণেন্দুকে প্রায় কোণঠাসা করে রেখেছেন। তোমার কী কপাল গো কৃষ্ণ! সব সুন্দরী মেয়েরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। কেউ ইস্পালা পাঠাচ্ছে, কেউ নিজে এসে ঘব-দোর সাজিয়ে দিচ্ছে।

সিমলি চাপা হেসে বললেন, আজকে তো তোমার ডিউটি সেই কানবর্গী গ্রামে, তাই না?

কৃষ্ণেন্দু রাগ করতে গিয়েও পারলো না। এঁদের ওপর রাগ করা বৃথা। যে-দেবতা যেমন পুজো চান তাঁকে সেই ভাবেই বরণ করা উচিত। কৃষ্ণেন্দু উত্তর দিল, না, কঙ্কণাদের বাড়িতে।

ও-মা! মেডিক্যাল সেন্টারটা কবে ওদের বাড়িতে শিফট হয়ে গেল? জয়ললিতা কপট বিস্ময়ে বললেন, আমরা তো কিছুই জানি না!

আমি তো আজই প্রথম শুনলাম। সারদা হেসে ফেলতেই কৃষ্ণেন্দুও হাসলো। তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললো, দরজা-টরজা বন্ধ করার আর সময় নেই। আপনারা যেমন এসেছেন, তখন সামলান সব কিছু। আমি চললাম—

এই ছোকরা, ও-সব আমাদের কাজ নয়। জয়ললিতা উঁচু গলায় বলে উঠলেন, কঙ্কণাকে পাঠিয়ে দিয়ো। সেই-ই সামলাবে—

নয়তো মেডিক্যাল সেন্টারটা উঠিয়ে এখানেই নিয়ে এসো। সারদা আরও কিছু বলতেন। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে নামতে কৃষ্ণেন্দু ওঁদের উদ্দেশে একটা কথাই বললো, যে-হারে অসুস্থ লোকের সংখ্যা বেড়েছে উঠিয়ে আনা-টানা নয়—যত্র-তত্র মেডিক্যাল সেন্টার খুলতে হবে। সম্ভব হলে ঘরে ঘরে! ওর কথা শুনে সারদা, জয়ললিতা এবং সিমলি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

বিকেল সাড়ে তিনটে-নাগাদ কৃষ্ণেন্দু একেবারেই ফ্রী হয়ে গেল। এই মুহূর্তে তার সামনে কোনও রোগী বসে নেই। এখানে আসার পর এই প্রথম সে একটা সিগারেট ধরালো। মেডিক্যাল সেন্টারের দুজন কর্মচারীর সঙ্গে গল্প করতে করতে সিগারেটটার আয়ু যখন অর্ধেক করে ফেলেছে, কৃষ্ণেন্দু দূর থেকে ভেসে আসা একটি বিরাট জনতার আওয়াজ শুনতে পেলো। তারপরেই দেখতে দেখতে জোয়ারের জলের মতো মুহূর্তে মেডিক্যাল সেন্টারের পুরো এলাকাটা মানুষে মানুষে ভরে উঠলো। হই-হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি, উত্তেজনা সে-এক চরম বিশৃঙ্খলা। পরক্ষণেই কৃষ্ণেন্দু দেখতে পেলো চারজন লোককে ধরাধরি করে বারান্দার মেঝের উপরে শুইয়ে দিল এক বিশাল জনতা। রক্তের মধ্যে সেই চারজন লোক যেন ভাসছে। জনতার মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কে যে কী বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বোঝার দরকারও নেই। কৃষ্ণেন্দু তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কাজে নেমে পড়লো। কিন্তু প্রথম দুজনকে পরীক্ষা করে কৃষ্ণেন্দু নিজেই স্তব্ধ হয়ে গেল। ওদের মৃত অবস্থায় এখানে আনা হয়েছে। বাকি দুজনও অন্তিম মুহূর্তের জন্য ধুঁকছে। কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারছিল, কিছুই আর করার নেই। তবুও ডাক্তারকে তো চেষ্টা করতেই হয়। সে পরপর কয়েকটা ইঞ্জেকশান দিয়েই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ ফোন করে জানিয়ে দিল, শীগগির এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিন। হাসপাতালকে তৈরি থাকতে বলুন.....দুজনের কন্ডিশন খুবই খারাপ....দুজন অলরেডি ডেড। হ্যাঁ ব্যাপারটা এখনও কিছুই জানি না। ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়েই কৃষ্ণেন্দু আবার ছুটে গেল বারান্দায়। দুজনকে পরীক্ষা করে আরও দুটো ইঞ্জেকশান দিল। ইতিমধ্যে ভিড়টা যেন আরও বেড়ে গিয়ে গোটা মেডিক্যাল সেন্টারের চত্বরটাকেই গ্রাস করে ফেলবে। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষয়িত্রীরাও ভিড় করে এসেছে দেখবার জন্য।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধ হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাগদার সাব তুমি ওই দুজনকে একটাও সুঁই দিলে না। কেন? ওদের কী ইঞ্জেকশানের জরুরৎ নেই? বড়ো কঠিন প্রশ্ন ওটা। কৃষ্ণেন্দু কোনও উত্তর না-দিয়ে করুণ চোখে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এই কারণেই সে প্রথম থেকেই ওদের মুখটা ঢেকে রাখেনি। চাদরে ঢাকার অর্থ তো খুবই পরিষ্কার। উত্তেজনা নতুন মোড় নিতে পারে অনুমান করেই কৃষ্ণেন্দু সাময়িক ভাবে অবস্থা সামলে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বৃদ্ধ সেই কঠিন অবস্থার মুখেই তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

বোলতা কিঁউ নেহি ডাগদার সাব?

অপরাধীর দৃষ্টি নিয়ে কৃষ্ণেন্দু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলো। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থই হলো ধরা পড়ে যাওয়া। কৃষ্ণেন্দু জনতার দিকে চোখ ফেরালো। পাগলের মতো অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িটা ছুটে আসছে এদিকে। যে-দুজনকে ইঞ্জেকশান দিয়েছিল তাদের আর একবার পরীক্ষা করতে গিয়েই বুঝতে পারলো আর কোনও প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণেন্দু বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকালো এবারে। মৃত এই চারজনের সঙ্গে ওঁর ঠিক কী সম্পর্ক তা সে জানে না। নিস্তেজ গলায় শুধু বললো, এদের কারোরই আর কখনও ইঞ্জেকশানের প্রয়োজন হবে না।

আকাশে-বাতাসে তখন কান্নার ঢেউ। ওই চারজনেরই স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তাদের প্রিয় মানুষটির বুকের ওপর আলুথালু হয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা কান্নায় গোটা কানবর্গী গ্রামের আবহাওয়াটাকেই ভারী করে দিল। সুস্থ মানুষের পর্যন্ত সেই বাতাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। জনতার মধ্যে অনেকেই চোখের জল ধরে রাখতে পারছে না। কৃষ্ণেন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করছিল। চিরতরে শুয়ে থাকা চারজনের ওপরেই বোবা দৃষ্টিটাকে একে একে ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি প্রথম দুজনের কাছে গিয়ে এমন ভাবে বসে পড়লেন যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। শুধুই কী প্রার্থনা? সম্ভবত শেষ অভিযোগটাও এই বেলা জানিয়ে রাখলেন। ছেলে-মেয়েরা যারা মৃতদেহ

ঘিরে অঝোরে কাঁদছিল, কেউ কেউ এবারে বৃদ্ধাকে শেষ আশ্রয় হিসেবে আঁকড়ে ধবলো। পরম মমতায় ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে নির্বাক সান্ত্বনা দিতে দিতে বৃদ্ধ আবার চোখ ফেবালেন দেহ দুটোর দিকে। দু'হাতে ওদের মুখটা তুলে ধবে অসীম আগ্রহে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর নিজেকে আরও কঠিন করে গড়ে দুজনের কপালে দুটো দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলেন। তারপর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

ধরাধরি করে ওঁকে ভেতরের ঘরে টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। একটু আগে যিনি অপরকে ইঞ্জেকশান দেওয়ার কথা বলছিলেন তাঁকেই সেটা দিতে হলো। মেডিক্যাল সেন্টারের একজন কর্মী সেই সময়ে কৃষ্ণেন্দুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বললো, এই বুড়োটার নাম প্রকাশচাঁদ। ওই দুজন ওরই ছেলে। চমকে কৃষ্ণেন্দু সহকর্মীর চোখে চোখ রাখলো। ভাগ্যিস ইঞ্জেকশানটা আগেই প্রকাশচাঁদকে দেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু নিজেই এখন মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি বিধ্বস্ত। দু-দুটো জোয়ান ছেলে একই সঙ্গে মৃত্যুব কোলে ঢলে পডলে তাদের বাবার অবস্থাটা কী হতে পারে— শুধুমাত্র এটুকু চিন্তা করলেই যে-কোনও সুস্থ লোকেরও মাথা ঝিমঝিম কববে। কৃষ্ণেন্দু ডাক্তার, কিন্তু তার আগে সে একজন মানুষ।

ইতিমধ্যে পুলিশের একটা দলও এসে গেছে। জিপ এবং ভ্যান ভর্তি সেই সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। গাড়ি থেকে নেমে সবার আগে এগিয়ে এলেন থানা অফিসার জগদীশ প্যাটেল। প্রথমেই তিনি কৃষ্ণেন্দুব সঙ্গে দেখা করলেন এবং ঘরের মধ্যে একান্তে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা সেরে নিলেন। কৃষ্ণেন্দুর কাছে এই সময়েই পুরো ছবিটা পবিষ্কাব হলো। অবশ্য উপস্থিত জনতার কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও কিছু কিছু টুকরো কথা তার কানে এসেছিল। জগদীশ প্যাটেল বললেন, ওয়েল কৃষ্ণেন্দুজি, আমরা আর দেরি করবো না। এরপর প্রচুর কাজ রয়েছে। আমবা তাহলে ডেড বডিগুলো থানায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে যাবো মর্গে। যদি পাবি আজকের বাতেব মধ্যেই ওদের আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেবো, নয়তো আগামীকাল সকালে।

মৃতদেহগুলো যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছিলো তখন নতুন করে কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়লো। হোক প্রাণ-শূন্য তবুও তো প্রিয়জন। তাকে ছেড়ে দিতে কী মন ওঠে? কিন্তু কর্তব্য বড় কঠিন। ওই হাহাকারের মধ্যেও পুলিশরা তাদেব কাজ কবে যেতে লাগলো। জগদীশ প্যাটেলও জনতার মধ্য থেকে দু-চারজনের সঙ্গে কথা বললেন এবং থানায় যাবার জন্য অনুবোধ জানালেন।

মেডিক্যাল সেন্টার, বারান্দা এবং উঠোন এখন মোটামুটি ফাঁকাই বলা যায়। শুধু এক কোণে বছর ষাট একষট্টির একজন মহিলা দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে বসে আছেন। তাঁকে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে, তিনি কিছুতেই বাড়ি ফিরে গেলেন না। মুখে একটাও কথা না-বলে শক্ত হয়ে মেঝেতেই পড়ে রইলেন। যারা জোরাজুরি করছিল কৃষ্ণেন্দু তাদের অনুরোধ করলো, এ-ভাবে চাপ দেবেন না। আপনারা দু-একজন থাকুন এখানে। বাকি সবাই চলে যান। আমিই ওঁকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবো। দু-একজন যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে কঙ্কণাও একজন। স্কুল ছুটির পর এক কোল বই এবং খাতাপত্র নিয়ে সে-ও এসেছিল অন্যদের সঙ্গে।

আরও কিছুটা সময় পার করে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু সেই মহিলার সামনে এসে মেঝের ওপরেই বসে পড়লো। কীভাবে যে-কথা আরম্ভ করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না। বুক খালি করে চল্লিশ বছরের সন্তান যাঁর চলে গেল তাঁকে কীভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে? তাছাড়া কথার কচকচি করারও সময় এটা নয়। মহিলা তাঁর ছেলেকে হারিয়ে এতো বেশি দুঃখ পেয়েছেন যে ওই বোধটাই অসাড় হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট মেয়েকে হাঁটা শেখাবার মতো কৃষ্ণেন্দু ওঁর হাতটা ধরে কোমল গলায় বললো, বাড়ি চলুন।

একষট্টি বছরের বৃদ্ধা মহিলা বেশ কিছুক্ষণ কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হুহু করে এবারে কেঁদে ফেললেন। কী হবে বাড়ি গিয়ে?

ছেলের বৌ রয়েছে। নাতি-নাতনিরা রয়েছে।

আমি সেখানে গিয়ে কী করবো?

ওদের মধ্যেই আপনার ছেলে বেঁচে রয়েছে। আপনি বাঁচবেন ওদের নিয়েই। সেখানে তো আপনাকে

ফিরে যেতেই হবে। বৃদ্ধার দুই চোখে তখন নতুন দৃষ্টি। কৃষ্ণজি ডাগদাব খুব একটা ভুল বলেনি। সোমাইয়া তো চলে গেল। যাদের রেখে গেল সেই ছোট নাতি আর নাতনিটা যে রাত-দিন ঠাকুমার আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায়—ওদের কী হবে? বৃদ্ধা নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমার আর মুক্তি নেই। আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।

বৃদ্ধাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু আর কঙ্কণা ফিরে আসছিল। রাস্তার মোড়ে এবং বিভিন্ন দোকানের সামনে তখনও চাপ চাপ জটলা। আলোচনার সঙ্গে উত্তেজনাও মিশে রয়েছে। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে অনেকেই এগিয়ে এসে কিছু কিছু অভিযোগ করে গেল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরনো এই সমস্যার ওপর কেউ কেউ সুস্থ চিন্তা-ভাবনাও করলেন। কৃষ্ণেন্দু সবাইকেই একই উত্তর দিল, আপনারা গ্রামের বয়স্ক এবং অনেক দিনের বাসিন্দা। আপনারা যদি এটার গুরুত্ব বুঝে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসেন তবেই স্থায়ী ভাবে কিছু একটা করা সম্ভব। বাইরে থেকে কেউ এসে ম্যাজিকের মতো কিছু করে দেবে এটা মনে ঠাঁই দেবেন না। দায়িত্ব আপনাদের প্রত্যেকের। নয়তো প্রায় প্রতি বছর এই ভাবে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে কিছু প্রাণ চলে যাবে, কানবর্গী গ্রামের শিশুরা এই দেখেই তো বড়ো হচ্ছে। ওদের ভবিষ্যতের কথা কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভাবছেন কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সেটা বুঝবার চেষ্টা করছেন না।

কৃষ্ণেন্দু এবং কঙ্কণা এখন যে-রাস্তাটায় এসে পড়লো এই জায়গাটা একটু ফাঁকা। ঘর-বাড়ি যা-রয়েছে সবই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এদিকটায় দোকান-পসারও নেই। তবে পূর্বদিকের এই রাস্তাটা ধরে মিনিট বারো হাঁটলেই বাজার এলাকা পড়বে। কানবর্গীর সেই পরিচিত ভিড়ের ছবি। কৃষ্ণেন্দুরা অবশ্য সেদিকে গেল না। কেন-না কঙ্কণাকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। সুতরাং বাজার এলাকা ঘুরে যাবার কোনও দরকার নেই। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে সরু কাঁচা একটা রাস্তা পড়বে। ওই রাস্তাটা ধরে মিনিট ছয়েক হাঁটলেই কঙ্কণাদের বাড়ির সামনের মোড়টা পড়বে। ওরা ওই দিকেই হাঁটতে লাগলো।

আর ঠিক তখনই ওখানে যে-ছেলেটি হাজির হলো সে মোহন। কঙ্কণাকে দেখে তার সেই একই রকমের অভিনয় এবং দাবি, দিদি, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। পাঁচটা টাকা দাও। কঙ্কণা আড়চোখে কৃষ্ণেন্দুকে একবার দেখে নিয়ে মোহনের দিকে চোখ ফেরালো। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, খাসনি কেন?

কী করে খাই বলো—খাবার দিয়ে অমন ট্যাকর-ট্যাকর করে কথা শোনালে কেউ খেতে পারে? ওই যে বুড়িটা গো, তোমাদের চিন্তামণি এখন একটাই বোল শিখেছে। সব কথাতেই চমৎকার না-বলে দেয়। মোহন তেরছা চোখে কৃষ্ণেন্দুকে একবার দেখে নিয়ে গজর গজর করতে লাগলো, বুঝলে দিদি, আমাকে শাসন করা হচ্ছে। বুড়ি রাত দিন উপদেশ দেয়।

সে ভাবে চললেই পারিস।

তুমিও কথা শোনাচ্ছো দিদি, শোনাও—ছোট ভাই পাঁচটা টাকা চেয়েছে অমনি না। দেবার ফন্দি।

মোহনের অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কথা বলাটা প্রথম থেকেই কঙ্কণার ভালো লাগছিল না। তাছাড়া আজকে সারা কানবর্গী গ্রামেই শোকের স্তব্ধ ছায়া। থমথমে সেই পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মনটা ভালো নেই। এইরকম মন নিয়ে মোহনের ওই ধরনের কথার উত্তর দেওয়া যায় না। কঙ্কণা শুধু বললো, তাই যদি মনে করে থাকিস তবে তো ঠিকই ধরতে পেরেছিস। আর তুই যদি খেতে চাস বাড়িতে চল। টাকা তোর হাতে কখনও দেবো না।

এটা কি তোমার কথা দিদি?

তার মানে? কঙ্কণা ভুরু কোঁচকালো।

মনে হচ্ছে তোমাকেও কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।

তোর মনে হওয়া নিয়ে তুই থাক। তোকে আমি আর একটা পয়সাও.....

দিদি, কথাটা অতো গর্ব করে না-বললেও হবে। তবে আমিও তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি—মোহন হাত-টাত ছুড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই একটা মোটর-বাইক ঠিক ওর সামনে

এসে থেমে পড়লো। আরোহী মোট তিনজন। তিনটে ছেলের বয়সই আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে। তিনজনের পরনেই জিনসের প্যান্ট এবং বুক খোলা শার্ট। গলায় চেন ঝুলছে। সারা গা থেকেই ভুরভুর করছে মদের গন্ধ। সামনের ছেলেটি অর্থাৎ মোটর বাইক যার হাতে সে পা দুটো মাটিতে রেখে কৃষ্ণেন্দুকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে কঙ্কণাকে দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলো। একটি অপরিচিত মেয়ের দিকে যে অমন করে তাকিয়ে থাকাটা রীতিমতো অভদ্রতা সে-বোধশক্তিও ওর নেই। অন্য দুজন নিজেদের মধ্যে একবার নীরবে চোখ মিলিয়ে নিল।

স্বভাবতই কঙ্কণা একটু ভয় পেলো। এখন আর লজ্জা-টজ্জার সময় নেই। সে কৃষ্ণেন্দুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওই তিনজনের চোখের আড়াল হবার চেষ্টা করতেই বাইকের ওপর বসে ওরাও একটু নড়েচড়ে উঠলো। কৃষ্ণেন্দু এই সময় পরম নির্ভরতায় কঙ্কণার চোখে চোখ রেখে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে ওকে যেন এক বিশ্বাসের ছায়ার নীচে দাঁড় করিয়ে দিল।

দাড়িঅলা ছেলেটা এবারে মোহনের দিকে চোখ ফেরাতেই লম্বা একটা সেলাম ঠুকে সে মাটির সঙ্গে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গিমায় নীরবে হাসতে লাগলো। সেটা উপভোগ করে লম্বা সেলাম পাওয়া ছেলেটা ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাত ক্যয়া হ্যায় মোহন?

ইয়ে আপন কা মামলা হ্যায় ওস্তাদ। দিদির কাছে স্রেফ পাঁচটা টাকা চেয়েছিলাম। মেবা বদনসিব হ্যায়—দিদি জানিয়ে দিয়েছে আর কখনও আমার হাতে একটা পয়সাও দেবে না।

তো ক্যায়া হুঁয়া! দাড়িঅলা হাসতে লাগলো, ম্যয়নে তো আভিতক মরা নেহি। কিত্‌না রূপেয়া চাহিয়ে তেরা বোল?

স্রিফ পাঁচ রূপেয়া ওস্তাদ।

এই নে দশ টাকা। কঙ্কণা আর কৃষ্ণেন্দুকে একঝলক দেখে নিয়েই দাড়িঅলা ছেলেটা মোহনের হাতে টাকাটা গুঁজে দিল। ওই সময়ে মোটর-বাইকের পেছন থেকে একজন বলে উঠলো, তোর কপালে আরও অনেক টাকা আছে রে মোহন। যাকে বলা সে খুশি হলেও দাড়িঅলাটাকেই তোয়াজ করতে বড়বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একগাল হাসি নিয়ে মোহন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই দাড়িঅলা বড়ো বড়ো চোখ করে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে গভীব ভাবে দেখতে দেখতে এক সময়ে বলে উঠলো, তো আপ হি হ্যায় ডাগদার সাব! নমস্তেজি—দাড়িঅলা এবারে দু'হাত বুকের ওপর জড়ো করে হেসে ফেললো, আপকা নাম তো বহুত শুনা লেকিন দেখা নেহি। আজ উয়োভি পুরা হো গিয়া। মেরা নাম ডেভেগৌড়া হ্যায়। এরা আমার দোস্ত। মুদনাল আর মঞ্জুনাথাচা। ডাগদার সাব আমরা তাহলে চলি—মোটর-বাইকের আওয়াজ তুলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ডেভেগৌড়া মুহূর্তে অনেক দূরে চলে যেতেই মোহনও ভাটিখানার রাস্তায় পা বাড়ালো।

আশ্চর্যের ব্যাপারটা হলো কঙ্কণা তখনও কৃষ্ণেন্দুর গা ঘেঁষে রয়েছে। বলা যেতে পারে ভীরু পাযরার মতো সে কাঁপছে। কৃষ্ণেন্দু এতোক্ষণের মধ্যে একবারও ওব হাতটা ছেড়ে দেয়নি। আশ্রয়ের ভরসা দেবার মতোই এখনও কঙ্কণার সেই ডান হাতখানাকেই ধরে আছে। এইবারে ছেড়ে দিয়ে ওর মুখের ওপর চোখ রাখলো। লাবণ্যের সেই ঢলঢলে ভাবটা হারিয়ে গিয়ে ফুটে আছে আতঙ্কের ছবি। মোটর-বাইকের তিনজনকে দেখে কৃষ্ণেন্দু প্রথম থেকেই একটা আন্দাজ করতে পারছিল। ওদের নামও সে অবশ্যই শুনেছে তবে দেখলো এই প্রথম। এই তাহলে সেই ডেভেগৌড়া আর তার দুই সাগরেদ মুদনাল এবং মঞ্জনাথাচা। পাহাড়ের গোড়ায় বেশ কিছুটা জঙ্গলের ভেতরে ওদের দিশী মদের কারখানা টারখানা রয়েছে। বিষাক্ত সেই মদ খেয়ে দু-একজন মারাও যাচ্ছে। সে-সবের জন্য ডেভেগৌড়া বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয়। হাজারো কাজে সে ব্যস্ত, দুঃখ করার সময় কোথায়? বেলগাঁও রেল ইয়ার্ড-এর দামি দামি মালপত্র উধাও করা থেকে আরম্ভ করে সুন্দরী মেয়েদের তুলে নিয়ে এসে ফুর্তির খেলায় মেতে ওঠা কিছুই বাদ যায় না। অত্যন্ত প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক দাদার স্নেহের ছায়ায় ডেভেগৌড়া ক্রমশই দুর্বার হয়ে উঠছে। পুলিশও এখন ওর পেছনের শক্তিটুকু আন্দাজ করে ওকে ভয় এবং সেই সঙ্গে সমীহ করতে শুরু করেছে। সে যাক, ডেভেগৌড়ার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে অতো শত ভাবার সময় নেই কৃষ্ণেন্দুর। সে কঙ্কণার নিস্তেজ ভাবটুকু কাটিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক করে তুলবার জন্য বললো, অতো ভয় পেয়েছিলেন কেন? মানসিক দিক দিয়ে তো ওরাই

বেশি দুর্বল। আপনার এই ভয় পাওয়াটাই ওদের সাহসী করে তুলবে।

আপনি জানেন না ওরা কী সাংঘাতিক!

আমি সব জানি।

আপনি নীলার কথা জানেন? কঙ্কণা চোখ তুলে তাকালো। ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা ধরবে ধরবে করছে। একটা ঝিম ভাব হয়ে আছে। কপালের দু'পাশটা একটু টিপে ধরে পরে কৃষ্ণেন্দু একটা সিগারেট ধরালো। আস্তে আস্তে বললো, শুনেছি। মেয়েটা সব হারিয়েও কাঁদতে কাঁদতে আদালতকে জানিয়েছিল, ডেভেগৌড়া আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।'

তবে?

জীবনের শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়েও সাহস রাখার প্রয়োজন আছে।

কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কৃষ্ণেন্দুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে কঙ্কণা জিজ্ঞেস করলো, ভেতরে আসবেন না।

খুব টায়ার্ড লাগছে, আজ থাক। মাথার চুলগুলোকে পেছনের দিকে হালকা ভাবে টেনে দিতে দিতে কৃষ্ণেন্দু বললো, আপনাদের এখানে একবার বসে পড়লে শরীরকে আর টেনে তুলতে পারবো না।

কালকে আসবেন তো? বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কঙ্কণা এতো আস্তে কথাটা বললো যে ওরই একবার সন্দেহ হলো কৃষ্ণেন্দু শুনতে পেয়েছে তো? কাঁপা কাঁপা দৃষ্টি নিয়ে চোখে চোখ রাখতেই কৃষ্ণেন্দু ছোট্ট সুরে বললো, চেষ্টা করবো। এখন আসছি কেমন?

আসুন। কঙ্কণা নতুন একটা কথা যোগ করলো, সাবধানে যাবেন।

যে-সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে আন্তরিকতাব টানকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায় 'সাবধানে যাবেন' কথাটা বোধহয় সবার ওপরে। কেউ একজন ভাবছে—এই বোধটাই সমস্ত মনকে উদাসী বাউলের মতো আত্মতৃপ্তি এনে দেয়। এ-এক পরম পাওয়া। কৃষ্ণেন্দু ওখানে আর না-দাঁড়িয়ে কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলো। কিন্তু বাজার এলাকায় আসতেই আবার সেই ছোট্ট ছোট্ট জটলার গুঞ্জন। কৃষ্ণেন্দুকে দেখতে পেয়ে শ্রীধরই সবার আগে এগিয়ে গেল। স্যার আপনি এখন কোয়ার্টারে যাচ্ছেন তো?

কেন বলুন তো? কৃষ্ণেন্দু অবাক হলো।

অন্য কিছু নয়। শ্রীধর গলা নামিয়ে বললো, যেতে যেতে আমরা আপনাকে কয়েকটা কথা জানাবো। কিন্তু এই ভাবে দাঁড়িয়ে সেটা বলা ঠিক হবে না। কৃষ্ণেন্দু চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিল শ্রীধরের সঙ্গে খুব কম করেও সতেরো-আঠারোজনের মতো ওরই বয়সী একদঙ্গল ছেলে। পাঁচ-ছজন রয়েছেন বয়স্ক মানুষ। ওঁদের মধ্যে নীরজ কান্ননও রয়েছেন। সব ক'জন মানুষই উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

বলছি স্যার। শ্রীধর পুরোপুরি ফর্মালিটি বজায় রেখে কথা বলতেই অভ্যস্ত। এই মানুষটার তেজের দাপট সে দেখেছে। কৃষ্ণজি অথবা ডাগদার সাব বলার মধ্যে সহজ ভাবে মিশে যাওয়ার ব্যাপারটা থাকলেও যাঁকে ওই নামে ডাকা হয় তিনি কিন্তু মোটেই সহজ পর্যায়ের মানুষ নন। তাই শ্রীধর সব সময়েই সম্ভ্রমের সুরে কথা বলে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। সে বয়স্ক পাঁচ-ছজনের উদ্দেশে বললো, আপনাদের আর কষ্ট করে স্যারের সঙ্গে হেঁটে যেতে হবে না। আপনারা এখন বাড়ি যান। আমাদের মধ্যে যা-যা কথা হয়েছে সবই ওঁকে জানিয়ে দিচ্ছি।

নিঃশব্দে বেশ কিছুটা হেঁটে আসার পর শ্রীধর মুখ খুললো। এটা তো জানাই ছিল কথা ওরাই আগে বলবে। সেই কারণে কৃষ্ণেন্দু এই রেললাইন পর্যন্ত এসেও একটা কথা জিজ্ঞেস করেনি। ওদের ভেতরেরটাই আগে বেরিয়ে আসুক। হিসেব মতো সেটাই হলো। কৃষ্ণেন্দুকে মাঝখানে রেখে দলটা মোটামুটি মাঝারি গতিতে হেঁটে চলেছে। শ্রীধর হঠাৎ বললো স্যার, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? টাঙ্গি, হাঁসুলির কোপে আজকে যে-চারজন মারা গেল তারা কিন্তু একজনও মারাঠি নয়। সবাই কান্নাড়ী।

ওই একটা কথাতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সঙ্গের এই বারো-তেরোজন ছেলেরা কারা। ওদের

দুঃখ এবং ক্ষোভ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অন্য একটা বীজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সেটা সাঙ্ঘাতিক ধারালো হয়ে উঠতে পারে এবং যে-কোনও মুহূর্তে। কৃষ্ণেন্দু সেই মনোভাব থেকে ওদেব সরিয়ে আনবার জন্য জিজ্ঞেস করলো, মারাঠি গেলে তোমরা কী খুশি হতে?

না স্যার, আমাদের বলার উদ্দেশ্য সেটা নয়।

যেটা বলতে চাইছো তাহলে পরিষ্কার করে খুলে বলো।

এই কানবর্গী গ্রামে আমরা কান্নাড়ীরা সংখ্যায় কম। আমাদের জন্মের আগে থেকে এবং এখন আমরা নিজেরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, প্রায় প্রতি বছরেই মারাঠি কান্নাড়ীদের পাশাপাশি বাড়ির এক হাত জমি নিয়ে, জমির সীমানা নিয়ে আবস্ত করে ফসল কাটার ঠিক এই সময়টাতে দু'পক্ষে মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে এবং তার খেসারত এমন করেই দিতে হচ্ছে। আরও একটু গুছিয়ে বলার জন্য শ্রীধর সামান্য সময় নিয়ে পরে আবার বলতে লাগলো, স্যার, যে-সংঘর্ষে এতোগুলো প্রাণ চলে গেল আমরা কিন্তু সেই সংঘর্ষের পথে যেতে চাইছি না। গ্রামের পঞ্চায়েত সমিতি-টমিতি রয়েছে। জোড়াতালি দেওয়া দু-একটা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে শান্তির কথা বলে প্রতিবারেই ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। কিন্তু আবার সেই একই নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছি আমরাই। অর্থাৎ কান্নাড়ীরা। আমরা বিদ্বেষ ছড়াতে চাইছি না। কারো বিরুদ্ধে হিংসার আগুনও পুষে রাখতে চাইছি না—আমরা স্যার, এই সব রক্তপাতের অবসান চাই। সাময়িক নয়, চিরদিনের জন্য শান্তি চাই।

আমাকে কী করতে হবে? কৃষ্ণেন্দু ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইলো। তাছাড়া সত্যি সত্যি শ্রীধর যদি নতুন পথের সন্ধান দিতে পাবে সেটাও জানা যাবে। ওর ওপব বিশ্বাসটা একটু একটু করে বাড়ছিল, কেন-না এই শ্রীধর অফিসের তকমা আঁটা সামান্য একজন বেয়ারা নয়, চিন্তা-ভাবনা করে যথেষ্ট বুদ্ধি নিয়ে চমৎকার কথা বলতে পারে। চলতে চলতে কৃষ্ণেন্দু মাঝে মাঝেই সেই কারণে শ্রীধরেব মুখের ওপব চোখ বোলাচ্ছিল। অফিসের সাধাসিধে নিরীহ ছেলেটার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু কিছুতেই মিল খুঁজে পাচ্ছে না। আর সেটা না-পেয়েই সে ক্রমশ মুগ্ধ হচ্ছিলো।

কানবর্গী গ্রামের মোটামুটি সবাই আপনাকে মানে। শ্রদ্ধা করে। শ্রীধর একটু ইতস্তত কবে বললো, এতোদিন যে-পন্থায় দমবন্ধ একটা ঘরের মধ্যে দু-চারজনের উপস্থিতিতে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া শান্তির মুখোশ পরে মিটিং হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরা যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই বয়েছি। আমরা এবারে একটু অন্যরকম ভাবছি। অবশ্য এটা ঠিক আপনি আমাদের মধ্যে এসে পড়ার জন্যই আমরা এই নতুন ভাবনাটা ভাবতে শুরু করেছি।

কী সেটা?

চার দেওয়ালের মধ্যে মুষ্টিমেয় চারজনের ওই দেখানো মিটিং আমরা চাই না। আমাদের ইচ্ছে খোলা আকাশের নীচে কানবর্গী গ্রামের বাচ্চা থেকে বুড়ো প্রতিটি মানুষ—কী মারাঠি কী কান্নাড়ী সবাই এসে জড়ো হোক। ঝড়, ভূমিকম্পের থেকেও এই বিষয়টা বিন্দুমাত্র ছোট নয়—সবাইকে এক এক করে বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আমার কথা সকলে শুনবে বলছো?

নিশ্চয়ই। এতে তো স্যার আপনার কোনও স্বার্থ নেই। সেই জন্যই শুনবে। কানবর্গী গ্রামের জন্য আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে ভাবছেন, মঙ্গল চাইছেন এটা একটা বিরাট কথা। আমরা স্যার আপনার সঙ্গে রয়েছি, থাকবোও। যখন যেমন নির্দেশ দেবেন নিশ্চয়ই পালন করবো। আমরা শুধু একটা জিনিসই চাই, মানুষের রক্তে কানবর্গী গ্রামের মাটি যেন আর না-ভেজে।

তোমরা যেটা ভেবেছো মন্দ নয়। আমিও কিছু কিছু চিন্তা করেছি এবং করছিও। কৃষ্ণেন্দু ধীরে ধীরে বললো, যে-বাড়ির মানুষগুলো চলে যাচ্ছে সেই বাড়ির হাহাকারের ছবিটাকেই প্রত্যেকটা মানুষের বুকের ভেতরে টাঙিয়ে দিতে হবে। সবাই মিলে এক জোট হয়ে সত্যিই একটা কিছু করা দরকার। আগে গ্রামের বড়োদের সঙ্গে কথা বলে নিই তারপরে কী কী পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে সেটা ভাবা যাবে।

কথা বলতে বলতে ওরা কোয়ার্টারের কাছাকাছি চলে এসেছিল। রাত সওয়া-সাতটা, সাড়ে-সাতটা হবে। ফ্লুরোসেন্ট লাইট এদিকটায় প্রায় দিনের আলো এনে দিয়েছে। ঝকঝকে এলাকার ঝকঝকে

মানুষগুলো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বেশ কিছু লোক কানবর্গী গ্রামের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ছিলেন। কোয়ার্টারের গেটে কৃষ্ণেন্দু পা রাখতেই বিনায়ক-সিমলি প্রসন্ন, হেমু কানিৎকার-জয়ললিতা, পদ্মাকর ও সারদা মির্ধা ছাড়া আরও কয়েকজন বাসিন্দা উদ্বিগ্ন মুখে ছুটে এলেন। এঁরা নিজের জন পরের জনের সীমারেখা টানতে জানেন না। যে-কোনও মানুষের মৃত্যুই এদের হৃদয়ের কোমল অনুভূতিকে স্পর্শ করে।

আমরা তাহলে চলি স্যার?

এসো। কৃষ্ণেন্দু সবার দিকেই তাকিয়ে বললো, তোমরা তো এখন থানা মর্গে ছোটাছুটি করবে। যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ডাকতে সঙ্কোচ করো না যতো রাতই হোক, কেমন?

আচ্ছা স্যার।

ওরা সবাই চলে গেলে কৃষ্ণেন্দুরা লনের ওপর গোল হয়ে বসলো। সকলেরই মোটামুটি একই জিজ্ঞাসা, কানবর্গী গ্রামের সঠিক ঘটনাটা কী? বিকেল থেকে এই পর্যন্ত উড়ো উড়ো অনেক খবর আসছিল। প্রতিটা দুর্ঘটনার শেষে কল্পনার রং চড়াতে মানুষের অদ্ভুত আগ্রহ। বাড়িয়ে বললেই যেন দুঃখটা খুব বেশি বেশি হবে। এদিকটায় রটে গেছে কম করেও জনা-বারো মারা গেছে। দুটো অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি করে দেহগুলো সরাতে হয়েছে।

কৃষ্ণেন্দু অল্প কথায় ঘটনা যা-তুলে ধরলো তা এই রকম ঃ

কানবর্গী গ্রামের শেষ মাথায় চারজন কান্নাড়ী কৃষকের জমিতে এবারে নাকি দারুণ ফসল হয়েছে। জোয়ার আর মকাইয়ে সারা ক্ষেত যেন আলো হয়ে আছে। আজকে ওদের সেই ফসল কাটার দিন ছিল। কিন্তু ক্ষেতে গিয়ে দেখে তাদের এতো পরিশ্রমের সোনার ফসল বেশ কিছু মারাঠি কেটে নিচ্ছে। এটাকে কেউই চুপচাপ মেনে নিতে পারে না। মেনে নেওয়ার অর্থ তো অনাহারে থাকা। সেই চারজন কান্নাড়ী কৃষক জবর-দখলকারীদের বাঁধা দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। টাঙ্গি-হাঁসুলির কোপে ওই চারজনেই মারা গেছে।

কেউ ধরা পড়েনি? সিমলি প্রসন্ন প্রশ্নটা করেই কৃষ্ণেন্দুব মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

একজনও না। কৃষ্ণেন্দু একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, কোনওবারেই ধরা-টরা খুব একটা কেউ পড়ে না। পড়লেও পার্টি-ফার্টির দাপটে ছাড়া পেয়ে আসছে। আসলে মানুষ মরছে এই বোধটাই কাউকে নাড়া দিতে পারছে না।

সারদা মির্ধা জিজ্ঞেস করলেন, ওদের বাড়িতে কে কে আছে।

মা-বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কে নেই?

জয়ললিতা খুব করুণ গলায় বললেন, ইস্, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

সত্যি কথা। পদ্মাকর মির্ধা ম্লান সুরে বললেন, রোগ-ভোগে মারা গেলে তবুও না-হয় একটা সান্ত্বনা থাকে—কিন্তু এই ভাবে চলে যাওয়াটা কিছুতেই মন মানে না। অথচ কানবর্গী গ্রামের এটা একটা......

পলিটিক্যাল রিক্রিয়েশান। বিনায়ক প্রসন্ন কথাটা পুরো করে দিলেন।

দারুণ বলেছেন তো। হেমু কানিৎকার আরও একটু যেন যোগ করলেন, কিন্তু প্রায় প্রতি বছরের রিক্রিয়েশানের সেই এক অনুষ্ঠান বন্ধ হবে কবে? ফসল কাটার মরসুমকে উপলক্ষ্য করে, দু'হাত এগিয়ে জমিতে বেড়া দেওয়া নিয়ে মারাঠি কান্নাড়ীতে এ-এক পুরনো রেষারেষি। আমরা তো বহু বছর ধরে একই জিনিস দেখছি। হিংসা এবং আগ্রাসী মনোভাবকে এক্ষুণি থামিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু সেটা কীভাবে হবে তা আমি জানি না।

আমি জানি। বিজয় ঘোষণার মতো নয়, খুবই শান্ত এবং নিচু গলায় কৃষ্ণেন্দু বললো, আমি খোঁজ খবর নিয়েছি, এখন পর্যন্ত এই কানবর্গী গ্রামের ভেতরে মারাঠি এবং কান্নাড়ীর মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু হয়নি। এই জিনিসটাকেই চালু করতে হবে। দেখবেন জাতিগত ভেদাভেদের সীমানা, সঙ্কীর্ণতার গন্ডি ইত্যাদি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবেই। একাত্মবোধ এলে আত্মকেন্দ্রিকতা কিছুতেই

বাসা বাঁধতে পারে না। দেখা যাক সকলে মিলে আমরা কতো দূর কী করতে পারি। জীবনের কিছু মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে সবাইকেই চেষ্টা করতে হবে। এখান থেকে কারও পিছিয়ে আসা চলবে না। কী হয় দেখা যাক।

এখন শ্রাবণ মাস। বেলগাঁওয়ে কৃষ্ণেন্দুর প্রায় এক বছর হতে চললো। কৃষ্ণেন্দু নিজের মনেই একটু হিসেব করলো, বছর পুরোতে এখনও দেড় মাস বাকি আছে। ও হিসেব থাক। তার আগে একটা আনন্দের হিসেব আছে। আর আটদিন পরেই গণেশ পুজো। ওক অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিতে চারদিন ছুটি থাকছে। রবিবারটা ধরে পাঁচদিন। কৃষ্ণেন্দু কিন্তু মুম্বাই যাচ্ছে না। ছোট ভাই দিবাকর এবং বোন সোহিনী ছাড়া বাড়ির সবাই ওই সময়ে বেলগাঁওয়ে আসছেন। এমন কী দিদি, অভিষেকদা, উৎসব পর্যন্ত। মা-বাবু আসছেন—ব্যাপারটা ভাবতেই কৃষ্ণেন্দুর দারুণ ভালো লাগছে। মুম্বাইয়ের বাইরে প্রায় সবাইকে একসঙ্গে বার করে আনা একটা মস্ত ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দু সবাইকে একসঙ্গে কাছে পাবে পুরো দুটো সপ্তাহ ধরে। তার আগে কাউকে ছাড়বে না। দিদি আর অভিষেকদা একটু ঝামেলা করতে পারেন, ওঁদের বলবে, বেলগাঁও থেকে মুম্বাই যাবার ট্রেন লাইনেয় গন্ডগোলের জন্য চলাচল আপাততো বন্ধ আছে। অভিষেকদা বুদ্ধিমান লোক। তবু মনে হয় তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য জিদ করবেন না।

নীচের থেকে গাড়িব হর্নের আওয়াজ উঠতেই কৃষ্ণেন্দু বাস্তবে ফিরে এলো। ডিউটির সময় হয়ে গেছে। ব্যালকনিতে এসে ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণেন্দু তিন মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুটো দুটো সিঁড়ি টপকে গাড়িতে এসে বসলো। বসবার পর মনে পড়লো সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটারটা টেবিলের ওপরেই রেখে এসেছে। সে যাক গিয়ে, মোটামুটি সময় মতো বেরিয়ে আসতে পেবেছে এই যথেষ্ট। সকালের নাস্তাটা শুধু হলো না, কী আর করা যাবে?

আজকের ডিউটি মেডিক্যাল সেন্টারে। কানবর্গী গ্রাম এখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো শান্ত। দু-আড়াই মাস আগে ফসল কাটার মরসুমে চার-চারজন মানুষ এক সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছে সেটা আর বোঝার উপায় নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কানবর্গী গ্রামের জীবনযাত্রাব ব্যস্ততা ববং আগের থেকে আরও বেড়েছে। নতুন যেটা হয়েছে তা হলো সারা গ্রাম ওই চারটি কান্নাড়ী কৃষক পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে এ-ভাবে যাতে আর কারো দায়িত্ব নিতে না-হয় সেই ব্যবস্থাই করবে তারা। ওই চারটে পবিবারে চাকরি করার মতো কোনও পুরুষ নেই। ওদের বৌরা এখনও শোক সামলে উঠতে পারেনি। ওরা একটু সামলে উঠুক তখন তাদের ওক অ্যালুমিনিয়ামে দিনমজুরের কাজ দেওয়া হবে। গ্রামের পাঁচজন মুখিয়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে কৃষ্ণেন্দু এ-ব্যাপারে ওক সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছে। ওক সাহেবও সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়েছেন।

আরও একটা দারুণ পরিবর্তন এসেছে। কানবর্গীতে এখন কে মারাঠি আর কে কান্নাড়ী তা বোঝার উপায় নেই, সবাই মানুষ—এই বোধটাই কাজ করছে সবার মধ্যে। এই আড়াই মাসের মধ্যে দুজন কান্নাড়ী মেয়ের বিয়ে হয়েছে মারাঠি পরিবারে। কানবর্গী গ্রামে এ-এক নতুন ঘটনা। নতুন ভাবে বাঁচার নতুন মন্ত্র।

গাড়ি থেকে নেমে মেডিক্যাল সেন্টারে ঢুকবার মুখেই কৃষ্ণেন্দু চিন্তামণির মুখোমুখি হলো। গলায় দড়ি বাঁধা গরুটিকে নিয়ে কোন মাঠে ঘাস খাওয়াতে চলেছেন সেটা তিনিই জানেন। চিন্তামণি কিছুক্ষণ কৃষ্ণেন্দুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে এক সময় বলে উঠলেন, এই যে বেটা, তোমাকে কতো আর আমাদের অসুবিধের কথা বলবো? তুমি ডাগদারি করবে, আমাদের অভিভাবক হবে, যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে দিতে হবে, শান্তির জন্য ঘটকালি করবে, যেখানে যতো রকমের অন্যায়....

কী হয়েছে আপনার? কৃষ্ণেন্দু সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করলো।

আমার মোহনটা একেবারেই বাজে হয়ে গেল। চিন্তামণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ও এখন ডেভেগৌড়ার সাগরেদ হয়েছে। অনেক সরাব-টরাব খেয়ে বাড়িতে আসে এবং এসেই হুজ্জোতি শুরু করে দেয়। এ-সব দেখতে আর ভালো লাগে না বেটা, বয়স তো কম হলো না কবে আর মরবো?

অমন করে বলতে নেই।

তা না-হয় নাই বললাম। কিন্তু কতো আর সহ্য হয় বলো?

আপনাকে তো এর আগে বহুবার বলেছি, অতিরিক্ত স্নেহ হচ্ছে বিষ। সেই বিষ এখন আপনাকেই পান করতে হবে। দুনিয়া থেকে পালাতে চাইছেন তাই কী কখনও হয়? প্রশ্রয় দিয়ে মোহনকে কোথায় তুলেছেন সেটা দেখে যাবেন না?

তুমি ঠিকই বলেছো বেটা। এতো সহজে আমার মুক্তি নেই। চিন্তামণি গরুটাকে টেনে নিয়ে অন্য দিকে যেতে যেতে করুণ সুরে বললেন, আরও কতো কী দেখবো কে জানে? মরতে না-পারি তার আগে যেন এই চোখ দুটো নষ্ট হয়ে যায়। মোহনের এই নোংরামি দেখার চেয়ে অন্ধ হওয়া অনেক ভালো।

মেডিক্যাল সেন্টারে রোগীদের ভিড়টা আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশিই। আসলে বর্ষার এই মরসুমটাতে পেটের গন্ডগোলে প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কষ্ট পাচ্ছে। রোগীদের আনাগোনা এই সময়টাতে তাই বেড়েই চলেছে। কৃষ্ণেন্দু এখন খুবই ব্যস্ত। ফাঁকি দেওয়ার মনোভাবটা কোনও দিনই তার মধ্যে না-থাকার ফলে সাধারণ কেসগুলো পর্যন্ত সে দারুণ ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বিশদ জেনে নিয়ে তবেই ওষুধপত্র দিচ্ছে। একবারের জায়গায় দু-তিনবার করে। কেন-না অনেকেই ঠিকমতো গুছিয়ে মনের ভেতরে নিতে পারছিল না। বারবার জিজ্ঞাসা করছিল। কৃষ্ণেন্দু একটুও বিরক্ত না-হয়ে শান্ত গলায় একই কথা অনেকবার বলার জন্য প্রস্তুত। ঠিক এই কারণেই খুব সহজেই সে সবার মন কেড়ে নিতে পেরেছে।

বিকেলে ছুটির পর মেডিক্যাল সেন্টারে থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো অনেক দিন কঙ্কনাদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আজ একবার সেখানে যাবে। মারকুন্ডের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার পথেই বাধা পেলো। চা না-খাইয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। চা খাওয়ার পর আর এক বিপদ। পয়সা নেবে না। কৃষ্ণেন্দু যতোই বোঝায় এ-ভাবে আমি চা খেতে পারি না—পয়সা আপনাকে নিতেই হবে। মারকুন্ডেও ঠিক ততোটাই বেঁকে বসে। আমি কী আপনাকে এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারেন। কৃষ্ণেন্দু হাসতে হাসতে বললো, সেটা বাড়িতে, চায়ের দোকানটা ব্যবসার জায়গা। এখানে ও-সব চলে না।

একটা চায়ের দাম না-পেলে আমার ব্যবসা কী লাটে উঠবে?

কথাটা তা নয়। প্রশ্নটা হলো নীতির। গ্রামের লোকে এরপরে আমাকে পরম সুবিধেবাদী বলে ভাবতে শুরু করে দেবে।

এই তো ডাগদার সাব, দিলেন তো আমার মুখটা বন্ধ করে। মারকুন্ডের মুখে অসহায়ের হাসি ফুটে উঠলো। আমরা মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া জানা লোকের কাছে এই একটা জায়গাতেই মার খেয়ে যাই। কেমন সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন বলুন তো। দিন দিন দেড় টাকা চায়ের দাম দিন।

পয়সা দিতে গিয়েই কৃষ্ণেন্দুর নজরে পড়লো মারকুন্ডের আট বছরের ছেলেটা চায়ের গেলাস-টেলাস ধোওয়া-ধুয়ি করছে। ওকে এখনও স্কুলে পাঠানো হয়নি এটা কৃষ্ণেন্দুর জানা আছে। সে আগের কথার রেশ ধরে বললো, শিক্ষাটা কারো একচেটিয়া নয় মারকুন্ডেজি, যে কেউ শিখতে পারে। কিন্তু আপনি আপনার ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না কেন? ও এখন যেটা করছে সেটা কী ওর কাজ?

আমাদের ঘরে কী হবে ডাগদার সাব লেখাপড়া শিখে?

তার মানে?

বলছি যে.....

ও-সব বলছি-টলছি নয়। কৃষ্ণেন্দুর গলায় ধমকের সুর, আপনি কেন ওর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করবেন? কী যেন একটু চিন্তা করে সে আবার বললো, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তো চলে গেছে। তার মানে আরও একটা বছর নষ্ট। কঙ্কণাজিকে দেখি একবার বলে, উনি যদি কিছু একটা করে দিতে পারেন।

কঙ্কণাদের বাড়ির কঞ্চির বেড়ার গেটটা খোলাই ছিল। কৃষ্ণেন্দু সেটা পার হয়ে বাইরের ঘরে পা রাখতেই সমবেত কলোচ্ছ্বাস উঠলো, আইয়ে কৃষ্ণেন্দুজি আইয়ে। বড়ি অচ্ছে টাইম পর আপ আ গয়ে। আভি হাম লোগ ভোজন মে কুছ..... কৃষ্ণেন্দু ঘরের মধ্যে চোখ বোলালো। কঙ্কণা এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর তিন বন্ধু অর্থাৎ বাসানী পুরোহিত, কপিলা কার্লেকার আর শীর্ষা উরস একটা বড়ো থালা ভর্তি বটাটা বড়া নিয়ে সম্বরের চাট মিশিয়ে মনের সুখে খাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করলো, ভোজনে আপনারা যে-ভাবে ব্যস্ত রয়েছেন, আমার থাকাটা কী এখন ঠিক হবে?

আরে বাবা আপনিও পাবেন। শীর্ষা একেবারে বন্ধুর মতো বলে উঠলো, মেয়েদের খেতে দেখলেই ছেলেদের মাথায় গন্ডগোল শুরু হয়ে যায়। আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ার কী হয়েছে?

বাসানী বললো, আপত্তি না-থাকলে চুপচাপ বসে পড়ে এখান থেকেই খেতে আরম্ভ করে দিন।

যদিও আপনিও এক থালা পাবেন। কপিলা হাসতে হাসতে বন্ধুর দিকে চেয়ে জানতে চাইলো, তাই নারে কঙ্কণা?

কঙ্কণা কারো কথার উত্তর না-দিয়ে প্রায় ছুটেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। মিনিট সাতেক বাদে আরও এক থালা বটাটা বড়া এবং সম্বরের বাটি নিয়ে ফিরে এলো। শীর্ষা একগাল হেসে কাছে ডাকলো, আয় এদিকে নিয়ে আয়।

এটা তোদের না।

নাও, কথা শোনো? শীর্ষা নকল বিস্ময়ে কপিলা আর বাসানীর দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে আস্তে আস্তে বললো, এবারে বোধহয় আমাদের চলে যাবাব সময় হয়েছে।

কপিলা ধমকে উঠলো, তুই কী মেয়ে রে? বন্ধুরা বাড়িতে এলে তাদের খেতে দিস না?

এতোক্ষণ তাহলে কোন কাজটা করছিলি? স্নিগ্ধ হাসি কঙ্কণার মুখে। কৃষ্ণেন্দু সামান্য সময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিল। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে সে বললো, স্কুলের চারজন টিচারকে এক সঙ্গে পেয়ে ভালোই হয়েছে। আমি একটা প্রবলেমে পড়েছি সলভ করে দেবেন?

সমস্যায় পড়েছেন আপনি? শোনাই যাক ব্যাপারটা, বাসানী বন্ধুদের দিয়ে চেয়ে একরাশ শুভ্র হাসি ছড়ালেও কঙ্কণা কৃষ্ণেন্দুর কথাটাকে অতোটা হালকা ভাবে নিতে পারলো না। সে নিচু গলায় বললো, আপনি বলুন—

একটা বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে।

এখন?

সেই জন্যই তো আপনাদের বলছি।

শীর্ষা, বাসানী, কপিলা আর কঙ্কণা প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখ চাওয়া-চাউযি করলো কিছুক্ষণ। ব্যাপারটা যে প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে সেটা ওদের ভাব-ভঙ্গি দেখে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। তবু কৃষ্ণেন্দু বললো, চায়ের দোকানের মারকুন্ডের ছেলে। বছর আট-নয় বয়স হবে, এখনও স্কুলে যায়নি। আজকে দেখলাম চায়ের গেলাস ধুচ্ছে। আপনারা সবাই মিলে একটা কিছু না-করলে ছেলেটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সেটা তো আপনি বুঝলেন, ওর বাবা কী বুঝতে পারছেন? কথাটা বলেই শীর্ষা বুঝলো ও-সব প্রশ্ন তুলে খুব একটা লাভ নেই। সুতরাং সমস্যার সমাধান যাতে হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে। শীর্ষা আবার বললো, আমরা তো চেষ্টা করবোই তবে বড়ো দিদিমণি কঙ্কণাকে নিজেব মেয়ের মতোই ভালোবাসে। কাজেই ও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

কঙ্কণাও আন্তরিক ভাবে বলে উঠলো, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।

প্লিজ একটু দেখুন—

আপনাকে অতো করে বলতে হবে না। কাজটা করতে পারলে আমরাও কম সুখী হবো না। কঙ্কণা বললো বটে তবে সে কিন্তু সারাক্ষণ অন্য একটা চিন্তায় ডুবে ছিল। একটা ছেলে স্কুলে না-গিয়ে চায়ের দোকানের গেলাস ধুচ্ছে—এই ব্যাপারটা কৃষ্ণেন্দুর মতো আর ক'জনকে এমন ভাবে নাড়া দেয়?

একটানা দু'দিন বৃষ্টির ফলে সারা বেলগাঁওয়ের চেহারাটা অন্যরকম হয়ে উঠেছে। গাছের পাতাটাতা

এখন আগের চেয়েও সবুজ আর অনেক বেশি সতেজ মনে হয়। মাটির ভিজে গন্ধ বাতাসকে সুবাসিত করে তুলেছে। যে-দিকেই তাকানো যাক-না কেন সর্বত্রই একটা ঝকঝকে পরিষ্কার ছবি। কারো গায়েই কোনওরকম ময়লা লেগে নেই বলেই নিজেকেও বড়বেশি পবিত্র ভাবতে ইচ্ছে হয়।

দুপুর থেকে বৃষ্টিটা ধরে গেল। তারপর আকাশে রোদটোদ ছড়িয়ে এমন কান্ড করে দিল, মনেই হয় না যে গত দু'দিন এখানে ওই জিনিসটার দেখাই পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশীর হাসি নিয়ে বেলগাঁও সূর্যকে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে। এই সময়ে যেন মনটা ছুটির টানে গা ভাসিয়ে দেয়। ফ্যাক্টরি ছুটির পর কৃষ্ণেন্দু যখন ওর চেম্বারে বসে ভাবছে এখন কোথায় যাওয়া যেতে পারে—ঠিক তখনই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে ওক সাহেবের ফোন এলো।

তোমার এখন কাজ কী কৃষ্ণেন্দু?

আপাততো কোনও প্রোগ্রাম নেই শুধু কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়া ছাড়া—

কোয়ার্টারে না-গিয়ে তুমি আমার অফিসে একবার চলে এসো। আসছো তো?

আপনি ডাকলে আমি যাবো না—এটা কী স্যার কখনও হয়? আমি এক্ষুণি আসছি।

ওক সাহেবের চেম্বারে ঢুকতেই কৃষ্ণেন্দুর মনে হলো সে বুঝি গুজরানার ড্রইং-রুমেই এসে পড়েছে। ওক সাহেবের পাশে শুভলক্ষ্মী এবং অর্পিত্রমাকে বসে গল্প করতে দেখে একটু ধাক্কা লাগতেই পারে। সবার আগে শুভলক্ষ্মী কথা বললেন, আও বেটা। কৃষ্ণেন্দু কী করবে বুঝতে পারছিল না। সে অফিসের নিয়ম-কানুনের বাইরে গিয়ে সৌজন্যের আন্তরিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে নিয়ে শুভলক্ষ্মীকে প্রণাম করতেই তিনি ওর মাথায় হাতখানা রেখে সস্নেহে বললেন, প্রণাম না-পেলেও তোমাকে আমি দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবনের জন্য আশীর্বাদ করতাম।

স্ত্রীকে এই বিশেষ সম্মান জানানোতে ওক সাহেব খুশিই হলেন। সত্যি কথা বলতে কী এমন চমৎকার ছেলে তিনি তাঁর জীবনে আব একটিও দেখেননি। ওক সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ওয়েল কৃষ্ণেন্দু, তুমি আমাদের দুজনকে দেখতেই এখানে অভ্যস্ত। আজ একসঙ্গে তিনজনকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো। কয়েকটা মিটিংয়ে একজন অংশীদার হিসেবে ওঁকে আসতেই হয়। শুভলক্ষ্মীর আজকের আসাটা সেই কারণেই। সে যাক গিয়ে, ওক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তোমার জন্য একটা সুখবর আছে।

কী হতে পারে বলুন তো? অর্পিত্রমা কাচের টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে রক্তিম ঠোঁটের ওপর নাড়াতে নাড়াতে জিজ্ঞেস করলো।

কৃষ্ণেন্দু মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, আমাকে আর প্রয়োজন নেই এটাই জানিয়ে দিন।

সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। ওক সাহেব হাসতে হাসতে একটা চিঠি এগিয়ে ধরে বললেন, দিস ইজ ইয়োর কনফারমেশান লেটার।

রবিবার। কৃষ্ণেন্দু বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে। বাড়িতে চিঠি লেখার তাড়া নেই। আগামীকাল বেলা দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে বাড়ির সকলে বেলগাঁওয়ে পৌছচ্ছেন। তার পর কী যে হবে কৃষ্ণেন্দু ভাবতে পারছে না। অজস্র রঙিন ছবি চোখের সামনে ফুটে ফুটে উঠছে। কৃষ্ণেন্দুর হঠাৎ মনে হলো, মা-বাবু, দাদা-বৌদিদের এখানে আসার ব্যাপারটা সে কাউকেই জানায়নি। অন্তত একজনকেও কী বলা উচিত ছিল না? যাক গিয়ে, কাল সবাইকেই এক সঙ্গে চমকে দেওয়া যাবে।

কৃষ্ণেন্দু এক ফাঁকে মেসে গিয়ে নাস্তা-টাস্তা সেরে এসে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। আজ সিটিতে যাবার কোনও প্রোগ্রাম নেই। গোটা তিনেক মেডিক্যাল জার্নাল এসেছে। সে-গুলো পড়তে হবে।

পড়ার মধ্যেই ডুবে ছিল কৃষ্ণেন্দু। বেলা তখন সওয়া-এগারোটা হবে। কোয়ার্টারের নীচে জমাট হই-হট্টগোল। বাচ্চাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। দু-তিনজন যেন একসঙ্গে ডাকাডাকি করছে, এই কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু কোথায় তুই? কোনটা তোর কোয়ার্টার?

জার্নাল-টার্নাল ফেলে রেখে কৃষ্ণেন্দু দৌড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই যে-দৃশ্যটা ওর চোখে পড়লো তাতে এখান থেকেই নীচে একটা লাফ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছে হলেও সেটা সম্ভব নয়। ধুপধাপ করে তিন-চারটে সিঁড়ি ভেঙে নীচে গেটের কাছে পৌছেই মা-বাবুকে চটপট দুটো প্রণাম সারতে

গিয়ে দু'জনেরই পা'কে বুকের মধ্যে টেনে নিল। অক্ষয় এবং মন্দিরা ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ওরে ছাড়, ছাড়! শেষে তোর গায়ের ওপরেই পড়ে যাবো যে। মা-বাবুকে ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু কৌশিক, রাহুল, ঝুপসী আর উৎসবকে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে টেনে নিতে গিয়ে সবাই মিলেই মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। বাচ্চাদের হাসির ফোয়ারায় আশেপাশের কোয়ার্টারের সবাই তখন দু'পাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। জয়িতা আর নীনা দুই বৌদি তখন দু'পাশ থেকে কৃষ্ণেন্দুর কান ধরে মাটি থেকে দাঁড় করাতে ব্যস্ত। বাচ্চারা নয়—হাসির পালা এবার বড়োদের। সিমলি, জয়ললিতা, সারদা তো হেসেই অস্থির। দুটি বৌয়ে কেমন নির্দ্বিধায় কৃষ্ণেন্দুর কান টেনে চলেছে। এই একটুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়েই পুরো পারিবারিক ছবিটার একটা আঁচ পাওয়া যায়।

প্রত্যেকেই জিনিসপত্র হাতে হাতে নিয়ে হইচই করতে করতে সিঁড়ি ভেঙে কৃষ্ণেন্দুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল। দুই বৌ আর মেয়েকে নিয়ে মন্দিরা কোয়ার্টারটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

পথশ্রমের ক্লান্তিতে অক্ষয় একটা বড়ো সোফায় দেহটাকে আলগা করে দিয়েছেন। কৃষ্ণেন্দুর গলাটা আনন্দে বুজে এলো, ব্যাপার কী অভিষেকদা? আমি তো আগামীকাল স্টেশনে গিয়ে কীভাবে আপনাদের সংবর্ধনা জানাবো তাই নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। আর হঠাৎ কিনা আপনারা পুরো একটা দিন আগে চলে এসেছেন—

তুমি একাই শুধু সারপ্রাইজ দেবে তা তো হয় না! অশোক আর দীপঙ্করের দিকে একবার তাকিয়ে পরে গোপন কথাটা ফাঁস করে দিল অভিষেক, দাদা-বৌদিদের অথবা আমাদের কারোরই প্ল্যান এটা নয়। যা-কিছু করার বাবুই করেছেন।

কৃষ্ণেন্দু বললো, বাবু তুমি?

না-না, আমাকে খুব একটা দায়ী করা যায় না। অক্ষয় সারা ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন, তোদের মা হঠাৎ বললো একটা দিন আগে গিয়ে কৃষ্ণেন্দুকে আরও বেশি আনন্দ দেওয়া যায় না? তা আমি কেন কম আনন্দ পাবো বল?

জয়িতা ছুটে এসে ঘর থেকে সবাইকে তাড়া দিয়ে ব্যালকনিতে নিয়ে গেল। সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়টার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেড়, দু'মিনিট কেউই কোনও কথা বলতে পারলো না। পরে বাঃ! ফ্যানটাসটিক, ইত্যাদি ধরনের দু-একটা শব্দ উঠতেই অশোক আক্ষেপের সুরে বললো, আমি যদি ডাক্তার হতাম কৃষ্ণেন্দুকে আমার জায়গায় পাঠিয়ে এখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিয়ে যেতাম।

সত্যি বড়দা, বেলগাঁওটা দারুণ জায়গা! দীপঙ্কর আরও উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বললো, সবচেয়ে সুন্দর এই কোয়ার্টারগুলো আসলে প্রকৃতির কোলে এমন ভাবে বসবাস করার মূল্যই আলাদা। তোদের কোম্পানির মালিক জায়গাটা চমৎকার সিলেকশান করেছেন রে কৃষ্ণেন্দু!

নীনা জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে গোয়া কতো দূর?

তিন ঘণ্টা সাড়ে-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, দু'দিন যাক একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম নাও—সব ঘুরিয়ে দেখাবো।

কৌশিক অনেকক্ষণ ধরেই তার সেজ কাকুকে লক্ষ্য করছিল। ইতিমধ্যে সে তার ছোট্টবাহিনী নিয়ে অর্থাৎ রাহুল, ঝুপসী আর উৎসবকে সঙ্গে করে সারা ফ্ল্যাট তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে অসহায় দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিতে তাকিয়ে একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলো, সেজকাকু আমাদের রান্না হবে না?

ওটাও তুই চিন্তা করবি? ও-সব ভাবনা আমাকেই ভাবতে দে বাবা। সবাই মিলে মেসে গিয়ে চারবেলা কী রকম খাই দ্যাখ না! মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি সব মাপের বাটিতে পাবি কিন্তু ডাল, চাপাটি, ভাত সবজি সব ফ্রী—যতো পারিস লুটেপুটে খাস। কৃষ্ণেন্দু ছোটদের দলে মিশে গিয়ে নিজেও এক শিশু হয়ে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠলো।

স্কুলে গণেশ পুজোর ছুটি পড়ে গেল। কঙ্কণা বাড়ি ফিরে শাড়ি-টাড়ি না-ছেড়ে স্কুলের পোশাকেই বাইরের ঘরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। কৃষ্ণেন্দুজি তিন-চারদিনের মধ্যে এদিকে

আসেনি। কঙ্কণা আজ ওকে একটু বেশিই আশা করছে। তার কারণ আছে। বড়ো দিদিমণিকে বলে মারকুন্ডের ছেলেকে ভর্তি করাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা। গণেশ পুজোর পরেই বাচ্চাটাকে ভর্তি করিয়ে নেওয়া হবে। এই খবরটা কৃষ্ণেন্দুজিকে দেবার জন্যই কঙ্কণা উতলা হয়ে পড়েছে। একটা মানুষের খুশি মুখ দেখার আগ্রহ যে এতো, এটা ওর আগে জানা ছিল না। কঙ্কণার বারবারই মনে হচ্ছিলো, কৃষ্ণেন্দু আজ একবার আসবে।

তখন প্রায় সন্ধ্যার মুখ। মোহন হাঁপাতে হাঁপাতে কঙ্কণার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লো। দিদি, শীগগির চলো, ডেভেগৌড়া কৃষ্ণজিকে এমন মার মেরেছে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

কোথায় রে? মুহূর্তে কঙ্কণার সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলেও জোর করে নিজেকে শক্ত করলো সে। কৃষ্ণেন্দুজিই শিখিয়েছে সহজে ভেঙে পড়তে নেই, হাল ছাড়তে নেই।

পাহাড়ের রাস্তায় যেতে বড়ো নালাটার পাশে।

যশোদাকে ব্যাপারটা জানিয়ে কঙ্কণা মোহনকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে ঠিক হাঁটছিল না, দৌড়াচ্ছিল প্রায়। মোহন সমান তালে পা ফেলে এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছিলো, ডেভেগৌড়া মাতাল হয়ে গ্রামে ঢুকে কয়েকজনকে অপমান করছিল। কৃষ্ণজি ওকে অনেক বোঝালো কিন্তু কে শোনে কার কথা! উল্টে ডেভেগৌড়া, মুদনাল আর মঞ্জুনাথাচাকে সঙ্গে নিয়ে বেধড়ক মারলো। বড়ো নালার পাশে কৃষ্ণজিকে পড়ে থাকতে দেখে আমি ছুটতে ছুটতে তোমার বাড়িতে গেলাম। ছুটতে ছুটতে কঙ্কণা শুনে যাচ্ছিলো ওর কথাগুলো। উত্তর দেওয়ার অথবা পাল্টা প্রশ্ন করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। কৃষ্ণেন্দু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—এই একটা কথাই তার মাথায় জাঁকিয়ে বসে সব কিছু অসাড় এবং অবশ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কঙ্কণা শুধু ছুটছে কতো তাড়াতাড়ি আহত মানুষটার কাছে পৌছানো যায়।

বড়ো নালার কাছে পৌছে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলো কঙ্কণা। এ-দিকটা একটু ফাঁকা। লোকজনের চলাচলও কম। অন্ধকারের চাদরটা মাঠ জুড়ে বিছানো। এ-পাশে রাস্তা না-থাকার ফলে কোনও আলো নেই। দূরের আলো যেটুকু ছিটকে এসে পড়েছে তাতে অন্ধকারকেই আরও বেশি জমাট বলে মনে হতে লাগলো। কঙ্কণা মোহনের দিকে তাকিয়ে এক বুক শঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কৃষ্ণেন্দুজি কোথায়?

মাঠের ওপর মানুষগুলো যেন শুয়েছিল। ছায়া ছায়া তিনটে দীর্ঘদেহ উঠে দাঁড়িয়ে কঙ্কণার দিকে এগিয়ে গেল। আবছা অন্ধকারেও চিনতে ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। ডেভেগৌড়া, মুদনাল এবং মঞ্জুনাথাচা কঙ্কণার মুখ চেপে ধরলো। নিজেকে বাঁচাতে কঙ্কণা কিছুক্ষণ তিনটে অমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে বুঝতে পারলো তার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। ক্লান্তি আর অবসাদে যে যখন ভেঙে পড়ছে তখনই অনুভব করলো তিনটে অমানুষ বিষাক্ত হাসি নিয়ে বারবার থাবা বসাচ্ছে তার দেহের ওপর।

কৃষ্ণেন্দুর কোয়ার্টারটা তখন নির্ভেজাল আড্ডার জমজমাট আসর। বাড়ির ক'জন ছাড়াও নিয়মিত আসছেন বিনায়ক প্রসন্ন ও সিমলি প্রসন্ন। হেমু কানিৎকার ও জয়ললিতা, পদ্মকর মির্ধা আর সারদা মির্ধা তো রয়েছেনই। গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে কারো শৈশব, কলেজ জীবন, যৌবনে পৌছেও বাবার কাছে ধমকানি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে বঞ্চনার ইতিহাস—এমনি ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বেরিয়ে আসছিল। কৃষ্ণেন্দু কী যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই কলিং-বেলটা অস্বাভাবিক জোরে বেজে উঠলো। কাছাকাছি বসে ছিলেন পদ্মকর। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেটা শোভন হতো না। কৃষ্ণেন্দু গতিতে তাঁকে পরাজিত করে দরজা খুলে ধরতেই বেশ অবাক হলো। গ্রামের দশ-বারোজন ছেলেকে সঙ্গে করে শ্রীধর বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। অন্যান্য মুখগুলোও বিষণ্ণতার ছায়ায় করুণ দেখাচ্ছে। বেলুয়া, চন্দ্রাপ্পা তো মুখে তুলেই তাকাতে পারছে না।

কী ব্যাপার শ্রীধর?

স্যার....শ্রীধর কৃষ্ণেন্দুকে প্যাসেজের ফাঁকা দিকটায় নিয়ে গিয়ে মিনিট দুয়েক সময় ধরে কিছু বলতেই কৃষ্ণেন্দুর ঋজু দেহটা আরও টানটান হয়ে উঠলো। এই রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, কৃষ্ণেন্দু কোনোদিন ভাবেনি। দীপ্ত গলায় সে শুধু বললো, চলো—

দরজার সামনে এতো ভিড় দেখে অশোক, দীপঙ্কর, অভিষেক, বিনায়ক, হেমু, পদ্মকর এগিয়ে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কৃষ্ণেন্দু বলে উঠলো, আমি কানবর্গী থেকে একটু ঘুরে আসছি।

পদ্মকর বললেন, আমরা তোমার সঙ্গে যাবো?

না-না, দরকার হবে না। কৃষ্ণেন্দু সবাইকে নিশ্চিন্ত করে বললো, আমার জন্য চিন্তার কোনও কারণ নেই। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ো। আমার ফিরতে দেরি হলেও ভয়ের কিছু নেই। বাড়ির দিকটা সামলে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু এবারে ছেলেদের তাড়া দিল, তাড়াতাড়ি পা চালাও।

কানবর্গীতে যেতে যেতে কৃষ্ণেন্দু ছেলেদের কাছ থেকে বিশেষ করে শ্রীধরের মুখ থেকে যা-শুনলো তা মোটামুটি এই রকম ঃ কঙ্কণা মোহনের কথা বিশ্বাস করে পাহাড়গোড়ার দিকে রওনা দেয়। ওর আধা দৌড়ের ব্যস্ততা সবার আগে মারকুন্ডের নজরে পড়ে। সঙ্গে আবার মোহন। মারকুন্ডে যেন বিপদের গন্ধ পায়। কঙ্কণাজি অমন ভাবে ছুটছে সঙ্গে আবার মোহন, একটা কিছু ঘটতে চলেছে অনুমান করেই মারকুন্ডে ক্লাবে জানায়। ছেলেরা তখন গল্প করছিল, তাস খেলছিল। শ্রীধর ওর বন্ধুদের এবং মারকুন্ডেকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেল কঙ্কণাদের বাড়িতে। যশোদা শুকনো মুখে শুধু জানালেন, আমি তো বেশি কিছু জানি না। কৃষ্ণেন্দুর বিপদ শুনে কঙ্কণা মোহনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু ভালো আছে তো? ওঁকে যাহোক করে বুঝিয়ে শ্রীধররা ফ্যাক্টরিতে খোঁজ নিল। কৃষ্ণেন্দুর কোনও বিপদ হয়নি জেনে নিয়েও ড্রাইভার মোতিকে জিজ্ঞেস করা হলো আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য। মোতি জানালো, আমি নিজে ডাগদারসাবকে ছুটির পর তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

কিন্তু ততোক্ষণে সর্বনাশ যা-হবার হয়ে গেছে। ডেভেগৌড়া, মুদনাল আর মঞ্জুনাথাচা নির্জন জায়গায় কঙ্কণাকে একা হাতের মধ্যে পেয়ে ওর সম্মানকে টুকরো টুকরো করে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। খবরটা প্রথম আসে ছোটেলালের কাছ থেকে। গরু এবং ভইসের জন্য পাহাড়ের জঙ্গল থেকে বড়ো বড়ো ঘাস কেটে বহেল গাড়িতে করে ওই রাস্তা দিয়ে ফিরছিল ছোটেলাল। ব্যাপারটা যে দু-একজন দেখেনি তা নয়, কিন্তু ঘটনাটা ঘটাচ্ছে ডেভেগৌড়া। সুতরাং বাধা দেবার জন্য সাহসেরও প্রয়োজন। সাধ করে কে আর নিজের বিপদ ডেকে আনে? তবে ছোটেলাল গ্রামে ফিরে যখন চিৎকার করে কঙ্কণার বিপদের কথা জানালো তখনই সমস্ত মানুষ একসঙ্গে ছুটতে শুরু করলো। গ্রামের চোদ্দ বছরের ছেলেটাও ডেভেগৌড়ার ভয়ে ভীত না-হয়ে প্রতিবাদের প্রেরণায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মোহনসহ ওদের তিনজনকে স্কুলের পাশের মাঠটায় গ্রামের ছোট-বড়ো, ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে ঘিরে রেখেছে। একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল তারপর এমন মার খেয়েছে যে সে শক্তিও নেই। ডেভেগৌড়ার মোটর-বাইকটাও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আর কঙ্কণা? ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তার মিসেস কেলকারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। উনি খবর পেয়েই কঙ্কণাদের বাড়িতে চলে আসেন। পরপর দুটো ইঞ্জেকশান দিয়ে এবং আরও যা-যা করবার করে তিনি কঙ্কণার জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। তখন থেকে ও শুধু কেঁদেই চলেছে।

মাঠের কাছাকাছি পৌঁছতে কৃষ্ণেন্দু চিন্তামণির গলা শুনতে পেলো। ভিড় ঠেলে সামনে এসে দেখলো, সাতাশি বছরের বৃদ্ধার একটানা বিলাপ, তোমরা মোহনকে মারো, আরও মারো। কটা টাকার জন্য ও ওর দিদিকে এই ভাবে ওই শয়তানগুলোর হাতে তুলে দিল। তোমরা ওকে কখনওই ক্ষমা করো না। আমার পুতা বলে একটুও করুণা দেখিও না। ওকে মেরে ফেলছো না কেন? চিন্তামণি নিজেই এবারে মোহনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুল টেনে এলোপাথাড়ি চড়-চাপড় মারতে লাগলেন। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে চিন্তামণি এগিয়ে এসে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। কৃষ্ণেন্দু চিন্তামণিকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। বললো, এ আপনি কী করছেন?

বেটা তোমার কাছে আমার আর মুখ রইলো না।

ও-সব চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। এখন শান্ত হোন।

চিন্তামণিকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে কৃষ্ণেন্দু এবারে ‘পশু’ তিনটের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। গণ পিটুনিতে ওদের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। চোখ বুজে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে তিনটে দেহ। জোরে জোরে শুধু শ্বাস টেনে চলেছে। গ্রামের মানুষদের এতোদিনের সেই পুঞ্জীভূত আক্রোশের

স্বাক্ষর বহন করে ডেভেগৌড়া, মুদনাল, মঞ্জুনাথাচা শেষ প্রহরের জন্য ধুঁকছে।

পুলিশের বিরাট এক বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন জগদীশ প্যাটেল। তিনি তাঁর কাজ শুরু করে দিতেই কৃষ্ণেন্দু নিঃশব্দে পা বাড়ালো কঙ্কণাদের বাড়ির দিকে। বাইরের ঘরে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিলেন নীরজ কান্নন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে কৃষ্ণেন্দুকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে মাথাটা আবার নামিয়ে নিলেন। তাঁর যেন আর কিছু বলার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

কৃষ্ণেন্দু এবারে ভেতরের ঘরে ঢুকলো। বিছানার ওপর যশোদার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে কঙ্কণা। আশপাশের বাড়ির দু-চারজন মহিলাও রয়েছেন। আস্তা গ্রাম থেকে বাসানী আর হোনগা থেকে কপিলা ছুটে এসেছে। শীর্ষা বগেরভইস এলাকায় থাকে। অতো দূরে ও এখনও খবরটা পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই চলে আসতো।

যশোদা বললেন, মুখ তোল মা, কৃষ্ণেন্দু এসেছে। ওঠ, উঠে বোস।

না-না! কঙ্কণা আরও জোরে মাকে আঁকড়ে ধরলো।

অমন করিস না কঙ্কণা। ওঠ এবারে—কপিলা আর বাসানী সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেরাই প্রায় কেঁদে ফেললো। কান্নার সেই ছোঁয়া লাগলো কঙ্কণার কণ্ঠেও, আমাকে দেখার আর কী আছে?

আমি দেখতে এসেছি আপনাকে কে বললো? কৃষ্ণেন্দু ধমকে উঠলো, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কান্নার কী হয়েছে?

আমাকে সবাই ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে, করুণার চোখে দেখবে—এ-আমি সহ্য করতে পারবো না।

কৃষ্ণেন্দু বুঝতে পারছিল ভেতরের এই কান্না থাকবেই। কষ্ট তো হবেই। এতো দিনের শুভ্রতায় আঁচড় পড়েছে। সেই যন্ত্রণায় এই কান্না আসবেই। আজ প্রতিবেশীরা যারা সান্ত্বনা দিচ্ছে সময়ের ক্ষত শুকিয়ে গেলে তাদের অনেকেরই হয়তো অন্য রূপ দেখা যাবে। হাঁটতে চলতে অপমানের সেই খোঁচা কঙ্কণা এখন থেকেই অনুভব করতে শুরু করেছে। এখন যে-যতোই বোঝাক পরে এই কানবর্গী গ্রামেই সহজ ভাবে থাকা কঙ্কণাব পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। আগের সম্ভ্রম বোধটা লোকে একটু একটু করে হারাতে হারাতে এক সময় কঙ্কণাকে তাচ্ছিল্যের শেষ দুয়ারে ঠেলে দেবে। এটাকে সহ্য করে কেউ বাঁচতে পারে না। প্রয়োজন শুধু একটা পরিবর্তনের। তা হলো কানবর্গী নামের এই জায়গাটা। যেখানে সম্মান গেছে, সারা জীবন সেখানে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

কেটে গেছে ক'টা দিন। অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে কঙ্কণা। সেদিন বিকেলে এসে কৃষ্ণেন্দু বললো, চলুন আমার সঙ্গে আপনাকে একটু বেরুতে হবে।

না, তা হয় না।

কেন?

আমি আর আগের কঙ্কণা নেই। হাজার চেষ্টা কবলেও সেই জায়গায় কখনওই আর পৌঁছতে পারবো না। আপনার সঙ্গে বেরুবো কোন মুখে?

সেখানে পৌঁছনোর তো আপনার প্রযোজন নেই। কৃষ্ণেন্দু বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কঙ্কণার হাতটা অনেক ভালোবাসা নিয়ে স্পর্শ করে অনুরোধের গলায় বললো, এমন করে ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি। আমার সঙ্গে চলুন—

কোথায়?

আপাততো আমার কোয়ার্টারে। সেখানে আমার বাবু-মা, দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবু সবাই এসেছেন। তারপর বেলগাঁও ছেড়ে মুম্বাইতে আমরা আমাদের বাড়িতে যাবো!

না-না! চোখের জল কঙ্কণার শুকিয়ে গেছে। বোবা দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণেন্দুর দিকে অল্প সময়ের জন্য তাকিয়ে পরে উত্তর দিল, আমি অপবিত্র, আমি কোথাও যাবো না।

একই ভুল আপনি বারবার করছেন। কৃষ্ণেন্দু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কঙ্কণার চোখের দিকে চেয়ে আবেগের উষ্ণতায় অথচ কঠিন আদেশের সুরে বললো, মানুষ কখনও অপবিত্র হয় না। আপনাকে যেতেই হবে। এটুকু অন্তত বিশ্বাস করুন, দয়া দেখাতে চাইছি না—আপনাকে....আপমাকে পেতে চাইছি এবং স্ত্রী হিসেবেই, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যার কোনও সম্পর্কই নেই। আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। প্লিজ

ফিরিয়ে দেবেন না। অত্যন্ত গাঢ় গলায় শেষের কথাগুলো বলতে বলতে কৃষ্ণেন্দু বিছানার ওপরে বসে পড়লো। অসীম মমতায় কঙ্কণার ডান নাকের নীচের তিল এবং দুই ঠোঁটে হাত বুলিয়ে দিয়ে আরও ঘন গলায় বলে উঠলো, আপনি ফিরিয়ে দিলে আমার আর কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না।

আকাশে অনেকক্ষণ ধরেই মেঘ জমছিল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় থেমে থেমে কয়েকটা পড়াব পরেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এসে গেল।

কঙ্কণাকে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু কোয়ার্টারের দিকে রওনা দেবার জন্য সবে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল—যে-ভাবে চেপে বৃষ্টি নেমেছে কখন থামবে ঠিক নেই। সারা রাত ধরেও এই বর্ষণ চলতে পাবে। চলুক। ওটা এই মুহূর্তে কোনও বাধাই নয়। কৃষ্ণেন্দু গভীর সুরে বললো, বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাবেন?

তাই চলুন—

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজলো। চলতে গিয়েও পায়ে যেন বেড়ি পড়ে যাচ্ছে। ছোট্ট বারান্দায় তখন মুখের মিছিল। নীরজ কান্নন, যশোদা, বাসানী, কপিলা আব আশে-পাশের বাড়ির কয়েকজন বয়স্কা মহিলার মুখগুলো যেন খুশির ঔজ্জ্বল্যে চিকচিক করছে। দুঃখের মধ্যেও এতো সুখের অনুভূতিতে রেখাগুলো দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

গ্রামের বেশ কিছু মারাঠি এবং কান্নাড়ী ওই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে কঙ্কণাদের উঠোনে এসে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। ভিড়টা যেন ক্রমশ বাড়ছে। কে নেই সেখানে? চিন্তামণি, বংশীলাল, ছোটেলাল, শ্রীধর, চন্দ্রাপ্পা, বেলুয়া, মারকুন্ডে, পুত্রহারা সেই বৃদ্ধ প্রকাশচাঁদ, মেডিক্যাল সেন্টারে গুম হয়ে বসে থাকা বৃদ্ধা জননী, মুখিয়া কমিটির লোকেরা এবং কানবর্গী গ্রামের আরও অসংখ্য মানুষ। প্রত্যেকেরই একই জিজ্ঞাসা, ডাগদার সাব, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? চল বহে হ্যায় কৃষ্ণজি? বেটা, কানবর্গীর ওপর রাগ করে তুমি চলে যাচ্ছো?

আমি কঙ্কণাকে নিয়ে আমাদের মুম্বাইয়ের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।

কানবর্গী গ্রামে আব কখনও আসবে না? বৃদ্ধ প্রকাশচাঁদের গলাটা ধবে এলো।

নিশ্চয়ই আসবো। তৃপ্তির হাসি নিয়ে কৃষ্ণেন্দু যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলো, যেখানে থাকি, যতো দূরেই থাকি— প্রতি বছর শ্রাবণের এই মাঝামাঝি সময়ে কঙ্কণাকে নিয়ে এখানে ফিরে আসতেই হবে।

নীরজ কান্নন, যশোদা ওরা বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। বৃষ্টি একটানা পড়েই চলেছে। দু'হাত দূবের জিনিসকেও ঝাপসা দেখায়। তবুও ওঁবা আর একবাব দেখার চেষ্টা করলেন, জরাজির্ণ পৃথিবীর খোলস থেকে বেরিয়ে কঙ্কণা আব কৃষ্ণেন্দু ভরা বাদলের ঐকতানে ধীব পাযে এগিয়ে চলেছে।
